চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ

চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ

চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ

সম্পাদক

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার

গোলপার্ক, কলকাতা ৭০০০২৯

প্রকাশক

স্বামী প্রভানন্দ

অধ্যক্ষ

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার

গোলপার্ক, কলকাতা ৭০০০২৯

E-Mail : rmic@vsnl.com

প্রথম সংস্করণ

জুন ১৯৭৭ : ৩,০০০

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ

অক্টোবর ১৯৮৮ : ৫,০০০

অষ্টম মুদ্রণ : জুলাই ২০০৪ : ৫,০০০

মোট মুদ্রণ সংখ্যা : ৩০,০০০

ISBN : 81-85843-29-5

প্রচ্ছদ

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য : একশ পঁচাত্তর টাকা

মুদ্রক

মানসী প্রেস

৭৩ শিশির ভাদুরী সরণী

কলকাতা ৭০০ ০০৬

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

চিন্তানায়ক বিবেকানন্দের প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। এখন বের হল পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ। এটি প্রায় নতুন বই। ১৪টি নতুন প্রবন্ধ এতে যুক্ত হয়েছে, আবার পুরনো প্রবন্ধেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আরও কিছু নতুনত্ব আছে। যেমন, স্বামীজী সম্পর্কে কয়েকটি স্মৃতিকথা, বিভিন্ন মনীষীদের স্বামীজী সম্পর্কে অভিমত, একটি বিস্তৃত জীবনপঞ্জী এবং স্বামীজীর পনেরোটি আলোকচিত্র।

দ্বিতীয় সংস্করণের ক্ষেত্রে আগাগোড়া মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক দীনেশ শাস্ত্রীও যখনই প্রয়োজন হয়েছে, সাহায্য করেছেন। অদ্বৈত আশ্রম ও বাক্‌সাহিত্য প্রকাশনীর সহযোগিতাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়। এছাড়া প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামীজী সম্পর্কিত স্মৃতিকথার বঙ্গানুবাদে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী মিতা মজুমদার, নির্দেশিকা তৈরীর দুরূহ কাজটি করে দিয়েছেন শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ এবং গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দ। এঁদের সকলকেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও ধন্যবাদ জানাই শ্রীপ্রভাস মজুমদার, আভা প্রেসের শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসোমনাথ হাটুই ও কর্মিবৃন্দ, প্রসেস অ্যান্ড অ্যালায়েডের শ্রীসম্বিৎ সাহা এবং কার্ডো প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কর্মিবৃন্দকে। পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় এই প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা বিভাগের কর্মীদের কথা। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

মহালয়া
২৩ আশ্বিন ১৩৯৫
১০ অক্টোবর ১৯৮৮

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
সম্পাদক

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

এই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য, স্বামীজীর যেসব মৌলিক চিন্তা, তার সঙ্গে সকলকে পরিচিত করে দেওয়া। যাঁরা এতে লিখেছেন, তাঁরা সবাই স্বামীজীর ভাব ও আদর্শের সঙ্গে সুপরিচিত। তাঁদের কেউ কেউ এ-বিষয়ে মূল্যবান কাজও করেছেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে লেখকবৃন্দ যেসকল মতামত প্রকাশ করেছেন, তা তাঁদের নিজস্ব। সকলক্ষেত্রে সম্পাদকগণ বা প্রকাশক তাঁদের মতের সঙ্গে একমত নন। এই গ্রন্থটির আর একটি উদ্দেশ্য, স্বামীজীর প্রতিভা নিয়ে ভবিষ্যতে যে গবেষণা হতে পারে, তার পথনির্দেশ করা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। পাঠক বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন যে, এই সংক্ষিপ্ত আশীর্বাণীর মধ্য দিয়ে পূজ্যপাদ সঙ্ঘগুরু স্বামীজীর এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর শ্রীচরণে আমাদের অসংখ্য প্রণতি। এই গ্রন্থের সকল লেখককে আমরা অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থপ্রকাশে অনেকেই নানাভাবে সাহায্য করেছেন—তাঁদের সকলের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করি। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ঃ ডঃ প্রদ্যোতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার, সাংবাদিক শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী ও শ্রীজ্যোতির্ময় বসুরায়, অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহেমেন্দ্র-নারায়ণ সাহা। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের লাইব্রেরী, ন্যাশনাল লাইব্রেরী এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দের সহায়তাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। মুদ্রণকাজে সহায়তার জন্য আভা প্রেস এবং স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং-এর স্বত্বাধিকারী ও কর্মিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
সম্পাদকবৃন্দ

সূচীপত্র

অনুধ্যান

ধর্ম ও দর্শন

ভারতবর্ষ

রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি

ইতিহাস ও বিজ্ঞান

শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি

তুলনামূলক আলোচনা

পরিশিষ্ট

আশীর্বাণী

আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। স্বামীজীকে আধুনিক ভারতবর্ষের স্রষ্টা বললে অত্যুক্তি হবে না। জাতির কোন একটি বিশেষ দিক নয়, যাতে তার সমগ্র সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়, এই ছিল তাঁর বাণীর লক্ষ্য। মৃতপ্রায় এই জাতির দেহে তিনি নতুন প্রাণের স্পন্দন এনে দিয়েছেন। ভারত জেগেছে। জেগেছে তার যুগ-যুগব্যাপী মোহনিদ্রা থেকে। আমেরিকার ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর যোগদান এক ঐতিহাসিক ঘটনা সমগ্র জগতের পক্ষে, কিন্তু বিশেষ করে ভারতের পক্ষে। সেই মহাসম্মেলনে তথা সমগ্র পাশ্চাত্যদেশ জুড়ে তাঁর যে সাফল্য, তা কোন এক ব্যক্তির সাফল্য নয়, সমগ্র ভারতের সাফল্য। এই সাফল্যের মাধ্যমে ভারতাত্মা নিজেকে জেনেছে ও চিনেছে, আর তার বহুযুগসঞ্চিত আত্মগ্লানি ও হীনম্মন্যতাবোধ নিমেষে অপসারিত হয়েছে। সচকিত হয়ে সে দেখল, গর্বিত পাশ্চাত্যজগৎকেও তার কিছু দেবার আছে। আর তা এমন সম্পদ যা পাশ্চাত্যের আত্মরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। ভারতের আধ্যাত্মিকতা সেই সম্পদ। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ফিরে পেল আত্মমর্যাদা আর আত্মপ্রত্যয়। যে আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস জাতীয় জাগরণ ঘটিয়েছিল, তার রাজনৈতিক প্রকাশ দেখেছি আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং অবশেষে বিদেশী শাসনের অবসানের মধ্যে। বর্তমানে সেই শক্তি ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। লক্ষ্য—জাতির এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক নরনারীর আর্থিক মুক্তি।
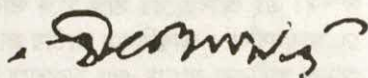
বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি স্বামীজীকে বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেছেন। কেউ তাঁকে দেখেছেন শিক্ষাবিদ্‌রূপে, কেউ দেশপ্রেমিকরূপে, কেউ রাজনীতিজ্ঞরূপে, কেউ সমাজ-সংস্কারকরূপে, কেউ দার্শনিকরূপে, কেউ ধর্মগুরুরূপে। তাঁরা যেসব চিত্র এঁকেছেন, তাতে স্বামীজীর কর্মবহুল জীবনের এক একটি দিক বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃত বিবেকানন্দ এ সবই, কিন্তু আরও কিছু। তাঁর সমগ্র রূপ আমাদের ধারণার অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁর সম্পর্কে আমাদের ধারণা আমাদের ব্যক্তিগত বোধ ও বিশ্বাসের দ্বারা সীমিত। আমাদের অক্ষম কল্পনার এ তুলি দিয়ে তাঁর যে ছবি আমরা আঁকি, স্বভাবতই তা আসলের তুলনায় ম্লান। স্বামীজীকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে, ঐ মহাপুরুষের চরিত্রের ঠিক ঠিক বিশ্লেষণ করতে হলে, ধ্যানের গভীরে তাঁর সান্নিধ্য এবং সংস্পর্শ অনুভব করতে হবে। তাঁকে ধারণা করার একমাত্র উপায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভিতর দিয়ে। তিনি নিজেই কথাপ্রসঙ্গে একবার বলেছিলেনঃ যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কি করে গেল।

শিক্ষাবিদ্, দেশপ্রেমিক, সমাজসংস্কারক—স্বামীজীর এই সব দিক তাঁর কয়েকটি খণ্ডিত দিক মাত্র। তাঁর বহুমুখী সত্তার উৎস কিন্তু তাঁর আত্মজ্ঞান। তিনি ছিলেন ঋষি, মন্ত্রদ্রষ্টা। তাই তিনি তাঁর আত্মজ্ঞানের দিব্য আলোকে মানুষের ঐহিক সত্তার সকল ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তাদের এমনভাবে রূপায়িত করেছিলেন যাতে তারা মানবাত্মার বিকাশ এবং মানবজীবনের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরোপলব্ধির পথে সহায়ক হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা থেকে একটু পৃথক, স্বামীজী তাঁর গুরুর ভাব থেকে কখনও কখনও সরে এসেছেন—এমন কথা মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়।

ধারণাটি কিন্তু সম্পূর্ণ অমূলক। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামীজী অভেদ ; দুজনে যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী এমন একটি উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে নিয়ন্ত্রিত যে, তার সম্যক উপলব্ধি ছিল সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্বামীজী আমাদের কাছে সহজবোধ্য করে তুলে ধরেছেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাঁর বাণী গ্রহণ এবং অনুসরণ করতে শিখিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিবিধ উক্তি যেন এক একটি সূত্র, বিবেকানন্দের বাণী যেন তার ভাষ্যস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি বিখ্যাত উক্তি ঃ 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।' এই উক্তির তাৎপর্য জগতের কাছে হারিয়েই যেত—এবং সেই ক্ষতি হত অপূরণীয়—বিবেকানন্দ যদি তার ভাষ্যরচনা না করতেন। ঐ সূত্র বা মন্ত্রের বিবেকানন্দকৃত ভাষ্য ও তার ফলিত প্রয়োগ আধুনিক মানুষকে এক নতুন সার্থক জীবনদর্শনের সন্ধান দিয়েছে। আধুনিক মানুষের চোখে ধরা পড়েছে ঐ মন্ত্রের বিশাল ব্যাপ্তি।

সুতরাং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেকানন্দ-বাণীর বিচার করাই ঐ মহাপুরুষকে উপলব্ধি করার শ্রেষ্ঠ উপায়। ঐ উপায়ে পাওয়া যাবে তাঁর সান্নিধ্য, তাঁর পূর্ণ দর্শন। আশা করি এই গ্রন্থটি পাঠককে সেই পূর্ণ দর্শনের পথে নিয়ে যাবে।

অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ

অনুধ্যান
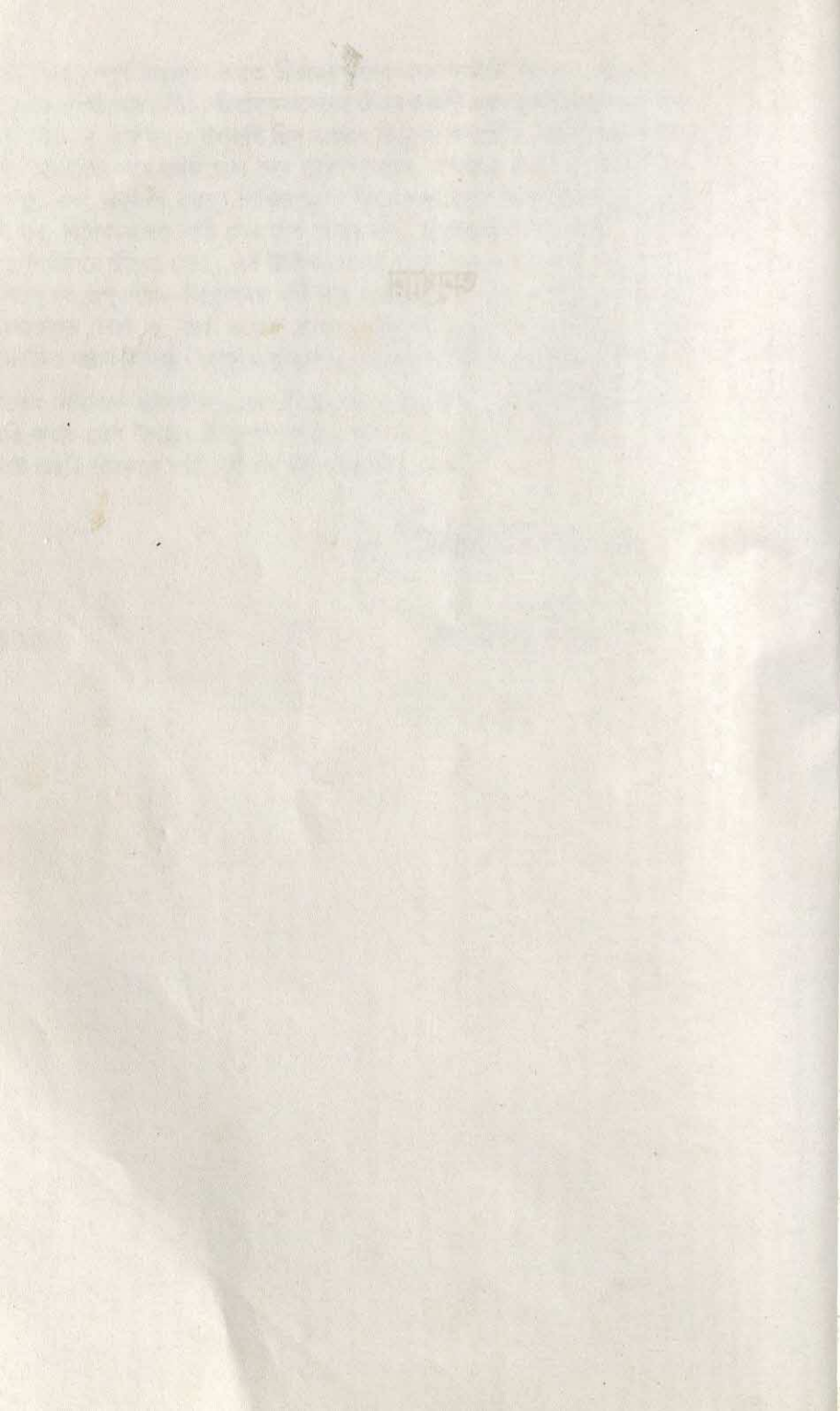
বেলগাঁও (?) অক্টোবর ১৮৯২

হায়দরাবাদ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ঃ বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য

যে মহামানব যোগৈশ্বর্যের উত্তুঙ্গ শিখরে দাঁড়াইয়া ধূর্জটির ন্যায় ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-মন্দাকিনীকে নিজের শিরে ধারণ করিয়া মানবকল্যাণখাতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার উদাত্ত কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষ-বাণী মৃতপ্রায় জাতির জীবনে প্রাণসঞ্চার করিয়াছে, যাঁহার অপাবৃত ও উদার দৃষ্টি জাতীয় জীবনের সকল সমস্যাকে অবেক্ষণ করিয়া তাহাদের সমাধানের উপায় নির্দেশ করিয়াছে, সমগ্র মানবের একত্ব ও সৌভ্রাত্র কামনা করিয়া যে পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য বিশ্বপরিভ্রমণের দ্বারা মানবের মগ্ন-চৈতন্যকে আহ্বান করিয়াছেন আত্মার সর্ববন্ধন-মুক্তির পথে, সেই স্বামী বিবেকানন্দের মহিমা ও মাহাত্ম্যের পরিমাপ করা অসম্ভব। তাঁহার জীবন আমাদের মরুভূমিকে অতিক্রম করিয়া দ্যুলোক স্পর্শ করিয়াছে। ইন্দ্রিয়বদ্ধদৃষ্টি মানব আমরা, যে জীবন ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বলোকে অধ্যাত্মচেতনায় আস্তৃত তাহা আমরা বুঝিব কেমন করিয়া? সমুদ্রের মতো গভীর এবং অপার এই জীবন আমাদের মনে বিরাট বিস্ময় উদ্রিক্ত করে এবং তাহার পরিপ্লাবনে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা জাগতিক ক্ষুদ্র ও বৃহতের সংজ্ঞা বিস্মৃত হই—মনে জাগিয়া উঠে দ্বন্দ্ব-নিরপেক্ষ ভূমার চেতনাবভাস।

স্বামী বিবেকানন্দের মহিমাকে বুঝিবার আর একটি বাধা আছে—সে বাধা হইতেছে তাঁহার কালাবচ্ছিন্ন রূপ। তিনি যে-কালে এই মরজগতে প্রকাশিত ছিলেন সেই যুগায়ত রূপটুকুই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ নহে। কালপ্রবাহের সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনের পূর্ণতর অভিব্যক্তি আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হইতেছে। যুগচিহ্নিত কালের উপর তাঁহার প্রথম পাদক্ষেপ মাত্র ঘটিয়াছে। ঊষার প্রথম অরুণিমা-মাত্র আমাদের নয়নগোচর। তাঁহার জীবনবেদের প্রথম অধ্যায়মাত্র আমাদের সম্মুখে। ইহার পরিসমাপ্তি কোথায় এবং কখন কে বলিবে? স্বামী বিবেকানন্দ নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি 'অশরীরী বাণী'। তাঁহার বাণীমূর্তিই এখন আমাদের মধ্যে কাজ করিতেছে। তাঁহার কম্বুকণ্ঠোৎসারিত ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থ্য আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ 'সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা আগামী পঞ্চাশৎ বৎসরে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে যদি তাহা অধ্যাত্মভিত্তিক না হয়।'[১] অপর স্থানে তিনি বলিয়াছেন ঃ 'সমস্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ড একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থান করিতেছে, আগামীকালই উহা বিস্ফোরিত হইতে পারে, চূর্ণবিচূর্ণ হইতে পারে। উহারা পৃথিবীর সকল স্থান অন্বেষণ করিয়াছে, কোথাও বিশ্রান্তি পায় নাই। সুখের পাত্র গভীরভাবে পান করিয়া দেখিয়াছে যে সবকিছুই বৃথা।'[২]

পারমাণবিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। জড়শক্তিতে বিশ্বাসী যুযুৎসু পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আজ বিরাট ধ্বংস-সম্ভাবনার

১। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, Advaita Ashrama, Calcutta, Ninth Edition (1964), p. 159 ২। ibid., p. 277

সম্মুখীন। অতীতকালের কোন সময়েই পৃথিবী সামগ্রিক প্রলয়ের এত বেশী সন্নিকট হয় নাই।

শুধু তাহাই নহে, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Swami Vivekananda in America : New Discoveries গ্রন্থে (পৃঃ ২৭) গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছেন ঃ 'এবং আমি ইহা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি যে এক সময়ে স্বামীজী এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যখন ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবে তখন চীনাদের দ্বারা ভারতবিজয়ের প্রচেষ্টারূপ একটি মহাবিপদ উপস্থিত হইবে।' ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে চীন-ভারতের যে-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল তাহা হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টি কিভাবে ভবিষ্যৎ ঘটনা নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। আজ রাজনৈতিক মতবাদের অন্তরালে অন্য সবকিছুই চাপা পড়িয়া যাইতেছে বলিয়াই স্বামীজীর বাণীকে আমরা অস্বীকার করিতেছি এবং আমাদের জাতীয় জীবন সমস্যাসঙ্কুল ও সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমরা পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। মহাপুরুষের জীবন ও বাণী সিদ্ধমন্ত্রের মতো। নিয়মিত জপ ও পুরশ্চরণের মধ্য দিয়াই উহাকে জাগরিত করা সম্ভব—নতুবা উহা নিরর্থক হইয়া যায়। আমাদের জীবনকে তপস্যাপূত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের মহাজীবন ও বাণী গ্রহণের উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে প্রস্তুত করিতে হইবে। এই গ্রহণের মধ্য দিয়াই নবীন ভারত এবং নূতন জগৎ গড়িয়া উঠিবে। ভারতের সম্মুখে বিপদ আছে কিন্তু ভয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন ঃ 'সুদীর্ঘ রজনী যেন অপসৃত হইতেছে, পরিশেষে মহাবিপদের অবসান যেন ঘটিতেছে, আপাতপ্রতীয়মান শবের যেন প্রাণসঞ্চার হইতেছে এবং যে অতীতের ঘনান্ধকারে ইতিহাস এমনকি কিংবদন্তীও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে অক্ষম সেখান হইতে অসীম জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া—যে হিমালয় আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ—একটি বাণী আমাদের নিকট আসিতেছে, শান্ত, অবিচল অথচ ব্যঞ্জনায় অভ্রান্ত এবং যতই দিন যাইতেছে সেই বাণী আয়তনে বৃদ্ধি পাইতেছে—দেখ, নিদ্রাগত জাগিতেছে। হিমালয় হইতে প্রবহমান বায়ুর ন্যায় ইহা মৃতপ্রায় অস্থি ও পেশীতে প্রাণাধান করিতেছে, আলস্য-জড়িমা অপগত হইতেছে এবং কেবলমাত্র অন্ধই দেখিতে পায় না কিংবা দুর্মতি যে সে দেখিবে না যে, আমাদের মাতৃভূমি তাঁহার গভীর সুদীর্ঘ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিতেছেন। আর কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সক্ষম নয়, আর তিনি নিদ্রা যাইবেন না, কোন বাহিরের শক্তি তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, কেননা এই বিরাট দেবতা জাগিয়া উঠিতেছেন।'[৩] স্বামী বিবেকানন্দের এই দিব্যদর্শন আমাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে দৃঢ়প্রত্যয়ান্বিত করিয়া তুলুক।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীমূর্তিকে বুঝিতে হইলে তাঁহার জীবনের গতি ও প্রকৃতিকেও বুঝিতে হইবে। যে জীবনবৃন্তের আলম্বনে এই বাণীমঞ্জরী বিকশিত হইয়াছিল সেই জীবনকে না জানিলে বাণীর স্বরূপ-নির্ণয় সম্ভব নহে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের এই স্বরূপের কথাই ভগিনী নিবেদিতা একস্থানে অতি অনবদ্যভাবে বলিয়াছেন ঃ 'আমরা

৩। ibid., pp. 145-46

এমন এক প্রেম দেখিয়াছি যাহা দীনতম এবং অজ্ঞতমের সহিত এক হইয়া যাইত; তাঁহার চক্ষু দিয়া মুহূর্তের জন্যও জগৎ দেখিয়া মনে হইত সমালোচনার কিছু নাই; আমরা মনীষার অপরিমেয় ভাববৈচিত্র দেখিয়া হাসিতাম, আমরা বীরত্বের অগ্নিতে নিজেদের উদ্দীপিত করিতাম এবং দেবশিশুর প্রবোধনের সময় যেন আমরা উপস্থিত থাকিতাম।'[৪] আর-একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন ঃ 'যে দীনতার কাছে সকল দৈন্য দূরীভূত হয়, যে ত্যাগ অত্যাচারীর প্রতি প্রচণ্ড ধিক্কারে এবং উৎপীড়িতের জন্য অসীম করুণায় আত্মবলিদানে উন্মুখ, যে প্রেম তীব্র উৎপীড়ন এবং মৃত্যুর আসন্ন পদসঞ্চারকেও আশিস-বচনে স্বাগত-সম্ভাষণ করে—সে দীনতা, সে ত্যাগ, সে প্রেম আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।'[৫] ভগিনী নিবেদিতার উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই স্বামী বিবেকানন্দের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত আচরণের মধ্য দিয়া প্রেম ও পৌরুষের যুগ্ম-প্রকাশ। সর্বপ্রকার হীনতার ও ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে তাঁহার জীবন 'স্বে মহিম্নি' বিরাজিত ছিল। মনীষী রোমাঁ রোলাঁও তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ 'পৃথিবীর যুগব্যাপী দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁহার চারিদিকে ক্ষুধিত সামুদ্রিক পক্ষীর মতো অহরহ ডানা ঝাপটাইয়া বেড়াইত। দুর্বলতার নহে—শক্তির আবেগ তাঁহার সিংহহৃদয়ের মধ্যে উদ্বেল হইত। তিনি ছিলেন মূর্তিমান শক্তি; কর্মই ছিল মানুষের কাছে তাঁহার বাণী। বীঠোফেনের মতো তাঁহার কাছেও সকল সদ্‌গুণের মূল ছিল কর্ম। নিষ্ক্রিয়তাই প্রাচ্যের স্কন্ধে গুরুভার হইয়া চাপিয়া বসিয়াছিল। নিষ্ক্রিয়তার প্রতি তাঁহার ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা।'[৬]

স্বামী বিবেকানন্দের এই যে প্রেম ও পৌরুষ ইহার উৎস কোথায় ইহা জানিতে হইলে আমাদিগকে তাঁহার ভাবজীবন-গঠনের ইতিহাসের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে তিনটি তত্ত্বের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটিয়াছিল। প্রথম তত্ত্ব—শাস্ত্র। ভারতীয় শাস্ত্রপাঠে তিনি দেখিয়াছিলেন, যে অনুভূতির কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত তাহা আকস্মিকভাবে ঋষিদের জীবনে আসে নাই। উহার পশ্চাতে ছিল সত্যনির্ধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী মনোবৃত্তি। যদি তাহাই হয় তবে শাস্ত্র-প্রবেদিত সত্যসমূহের প্রমাণীকরণের প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন তাঁহার গুরুর মধ্যে। এই মহাজীবনে তিনি দেখিয়াছিলেন সেই সকল সত্যের প্রকাশ যাহা শাস্ত্রে অর্ধস্ফুট বা অস্ফুটভাবে প্রকাশিত। এই জীবনে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে সমাধি দ্বারাই অবিরত জ্ঞান আহৃত হইতেছে। প্রত্যেক দণ্ডে মনের বহুত্ব হইতে একত্বে গতি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এই জীবনে। প্রত্যেক মুহূর্তে এই জীবনে তিনি অতিমানসক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত বোধির প্রকাশ দর্শন করিয়াছিলেন। যিনি ছিলেন সকল শাস্ত্রের জীবন্ত বিগ্রহ তিনি নিজে কিন্তু কোন পুস্তক পাঠ করেন নাই। এই জীবনের দীপ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জীবনদীপের শিখা জ্বালাইয়া লইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে স্বামী বিবেকানন্দও প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন

৪। Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda—Sister Nivedita, Udbodhan Office, Calcutta, Fifth Edition (1967), p. 1 ৫। ibid., p. 2

৬। The Life of Vivekananda and the Universal Gospel—Romain Rolland, Advaita Ashrama, Calcutta, 1970, p. 4

আত্মোপলব্ধির চির-অতন্দ্রিত মহিমায়।

কিন্তু এই অপরোক্ষানুভূতির প্রসাদমাধুর্যও তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য-সাধনে পর্যাপ্ত ছিল না। সমগ্র ভারতভূখণ্ডের উপর দিয়া তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণের মধ্য দিয়া তিনি দেশের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ কেবলমাত্র ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ ভূমিমাত্র নহে, ভারতবর্ষ একটি অধ্যাত্মজীবন-সমৃদ্ধ প্রাণের স্পন্দন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, সর্বাবগাহী সমগ্রতার মধ্যে ভারতবর্ষ অনন্তকাল ধরিয়া তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে যাহার সংক্ষিপ্তসার তাঁহার গুরুর জীবন।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এই তত্ত্বত্রয়ের সংমিশ্রণ ত্রিবেণী-সঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার পুণ্যতরঙ্গ 'সমগ্র মানবজাতিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া মুক্তি-মুখে লইয়া যাইবে।' কিংবা ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়ঃ 'এইগুলি হইতেই তিনি উপাদান পাইয়াছেন যাহা দিয়া তিনি পৃথিবীর জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন তাঁহার অধ্যাত্মবদান্যতার সর্বরোগহর মহৌষধি। এইগুলি হইতেছে সেই শিখাত্রয়—একটি দীপাধারে প্রজ্বলিত—যাহা ভারতবর্ষ তাঁহার হস্ত দিয়া জ্বালাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন নিজ সন্তানের ও সমগ্র বিশ্বের পথনির্দেশের জন্য।'[৭]

স্বামী বিবেকানন্দকে বলা হয় 'স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী—জাতীয় জীবনের সংক্ষিপ্তসার।' ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলা হয় যে, 'তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসার পাত্রী ছিলেন তাঁহার জন্মভূমি।' কিন্তু কেবলমাত্র স্বজাতীয়তাবোধই তাঁহার স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি ছিল না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি ভারতবর্ষকে দেখিয়াছিলেন আধ্যাত্মিকতার জীবন্ত বিগ্রহরূপে। তাই সমগ্র বিশ্বের উজ্জীবনের জন্যই ভারতবর্ষের উন্নতি প্রয়োজন। ভারতবর্ষ যে মৃতসঞ্জীবনীর অধিকারী একমাত্র তাহাতেই মরণোন্মুখ বিশ্বের কল্যাণ আহিত। তাই তিনি বলিয়াছেনঃ 'ভারত কি মরিবে? তাহা হইলে সমগ্র বিশ্ব হইতে আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে, সকল নৈতিক উৎকর্ষ লোপ পাইবে, ধর্মের প্রতি সকল মধুর সহৃদয়তাপূর্ণ সহযোগিতা নির্বাপিত হইবে, সকল আদর্শবাদ বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহার স্থানে রাজত্ব করিবে স্ত্রী ও পুরুষ-দেবতারূপ কাম ও ভোগপরায়ণতা এবং অর্থ হইবে তাহাদের পুরোহিত, প্রবঞ্চনা, বলপ্রয়োগ এবং প্রতিযোগিতা হইবে উহাদের উৎসব এবং মানবাত্মা হইবে উহাদের বলি। এইরূপ কখনই ঘটিতে পারে না।'[৮] তিনি বলিয়াছেনঃ 'সত্যই আমার ঈশ্বর এবং সমগ্র বিশ্ব আমার দেশ।'[৯] তিনি আরও বলিয়াছেনঃ 'আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্য জানি এবং আমার সম্বন্ধে বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। আমি যতটা ভারতবর্ষের ততটা বিশ্বের—এ-বিষয়ে ছলনার প্রয়োজন নাই।... কোন দেশের আমার উপর কোন বিশেষ অধিকার নাই। আমি কি কোন জাতিবিশেষের ক্রীতদাস?'[১০] কিন্তু স্বামীজী জানিতেন যে, 'জড়শক্তির প্রকাশের কেন্দ্র

৭। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I, Eleventh Edition (1962), p. xvii (Introduction) ৮। ibid., Vol. IV, Eighth Edition (1962), p. 348

৯। ibid., Vol. V, Eighth Edition (1964), p. 93 ১০। ibid., p. 95

ইউরোপ আগামী পঞ্চাশৎ বৎসরে ধূলিরাশিতে চূর্ণিত হইবে যদি সে তাহার স্থান পরিবর্তনে মন না দেয়, তাহার অবস্থিতি হইতে সরিয়া না যায় এবং আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের ভিত্তিরূপে না গ্রহণ করে। এবং যাহা ইউরোপকে রক্ষা করিবে তাহা হইতেছে ঔপনিষদিক ধর্ম।'[১১] সেইজন্যই তিনি উদাত্তরবে আহ্বান করিয়াছেন ঃ 'উঠ ভারত, সমগ্র বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জয় কর।'[১২]

সমগ্র বিশ্বের রক্ষার জন্যই ভারতের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন। এই পুনরুজ্জীবন আসিবে কোন্ পথে? স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ 'আমি দেখিতেছি, প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন, প্রত্যেক জাতিরও তেমনি এক বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে। উহাই তাহার জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ।

'...ভারতের ধর্মজীবনই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, উহাই যেন জাতীয় জীবনরূপ সঙ্গীতের প্রধান সুর। যদি কোন জাতি, তাহার এই স্বাভাবিক জীবনীশক্তি, শত শত শতাব্দী ধরিয়া উহার যেদিকে বিশেষ গতি হইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সেই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। সুতরাং যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকেই জাতীয় জীবনের জীবনীশক্তি না করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অপর কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। যাহাতে এরূপ না ঘটে তজ্জন্য তোমাদিগকে তোমাদের জীবনীশক্তি-স্বরূপ ধর্মের মধ্য দিয়া সকল কার্য করিতে হইবে।'[১৩]

সুতরাং ভারতের প্রথম প্রয়োজন ধর্মের অভ্যুত্থান। এইজন্যই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁহার জীবনের আলোকে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বিভিন্ন ধর্মমতসমূহের সমন্বয় সাধন করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পর ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম যুগে যুগে যুগপ্রয়োজনে প্রচারিত মতসমূহের সঙ্গতিবিধান করিলেন একটি বিরাট মনীষা। হিন্দুধর্মে ইহারই প্রয়োজন ছিল। বহুশাখ, বিচ্ছিন্ন পরস্পর-বিরোধী ও সঙ্কীর্ণদৃষ্টি হিন্দুধর্মের এই নবরূপায়ণ ভিন্ন সার্বজনীনতালাভের কোন উপায় ছিল না। আর এই সার্বজনীনতা-ব্যতিরেকে হিন্দুধর্মকে জাতীয় জীবনের ঐক্যসম্পাদনে প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না।

যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ লোকাচারকে অস্বীকার করিয়া সমুদ্র পার হইয়া শিকাগো ধর্মমহাসভার মঞ্চে পদার্পণ করিলেন সেদিন ভারতের ইতিহাসেও নব অধ্যায়ের সূচনা হইল। যে হিন্দুধর্ম ছিল বহিঃসংস্পর্শব্যাবর্তক তাহাকে তিনি গতিশীল করিলেন। ভগীরথের ন্যায় ভারতের অধ্যাত্ম-জাহ্নবীকে শঙ্খরবে আহ্বান করিয়া মৃতপ্রায় মানববংশের উদ্ধারের আয়োজন তিনি করিলেন। একটি ভাববিপ্লবও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘটিত হইল। মুমূর্ষু একটি জাতিও হিন্দুধর্মের জয়ধ্বনিতে আত্মসম্বিৎ ও শ্রদ্ধা ফিরিয়া পাইল। এই ভাববিপ্লবের পটভূমিতেই ভারতে উত্তরকালীন রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজবিপ্লবের মূল উৎস নিহিত।

১১। ibid., Vol. III, p 159 ১২। ibid., p. 277 ১৩ ibid., p. 220

স্বামী বিবেকানন্দ সর্বধর্মমতের সমন্বয় করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি অদ্বৈতমতকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন এই তত্ত্ব বিশিষ্ট অধিকারীর জন্য। কিন্তু স্বামীজী ইহা স্বীকার করেন নাই। শঙ্করের ন্যায় অদ্বৈতকে ব্যক্তিগত উপলব্ধির উত্তুঙ্গ শিখরে চিরতুহিনাবৃত না রাখিয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রেমের উত্তাপে উহাকে গলাইয়া উহার সঞ্জীবনীধারা সমাজদেহে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ 'শত শত শতাব্দী ধরিয়া লোককে মানবের হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদসমূহ শিখান হইয়াছে; তাহাদিগকে শিখান হইয়াছে—তাহারা কিছুই নহে। সমগ্র জগতের সর্বসাধারণকে চিরকাল বলা হইয়াছে—তোমরা মানুষ নও।...তাহাদিগকে কখনও আত্মতত্ত্ব শুনিতে দেওয়া হয় নাই। তাহারা এক্ষণে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করুক—তাহারা জানুক যে, তাহাদের মধ্যে অতি নিম্নতম ব্যক্তির ভিতর পর্যন্ত আত্মা রহিয়াছেন—যাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, যাঁহাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, যিনি অবিনাশী, অনাদি, অনন্ত, শুদ্ধস্বরূপ, সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী।'[১৪] অপর স্থানে বলিতেছেন ঃ ' উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মানব কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে, মানবের দুর্বলতা কি নাই? উপনিষদ্ বলেন, আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্বলতা দ্বারা কি এই দুর্বলতা দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর হইবে? উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই "অভীঃ"—ভয়শূন্য এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি "অভীঃ"—ভয়শূন্য এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই।'[১৫]

এই তত্ত্ব সমাজক্ষেত্রে প্রচারিত হইলে কি হইবে? স্বামীজী বলিতেছেন ঃ 'মৎস্যজীবী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে; বিদ্যার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল উকিল হইবে।'[১৬]

এবং এই উপনিষদ্-প্রবেদিত আত্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসিতে পারিব। অদ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই নৈতিকতার যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যে একত্ব একমাত্র পারমার্থিক তত্ত্ব তাহার ব্যবহারিক প্রকাশ কেবলমাত্র প্রেমে। উপনিষদ্ এই কথাই বলিতেছেন ঃ

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥[১৭]

এই কথাই স্বামীজীও বলিতেছেন ঃ

I cannot hate, I cannot shun
Myself from me, I can but love.[১৮]

১৪। ibid., p. 224 ১৫। ibid., p. 237 ১৬। ibid., p. 245 ১৭। ঈশোপনিষদ্, ৬

১৮। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VIII, Third Edition (1959), p. 164

সুতরাং এই তত্ত্বকে জীবনে বরণ করিয়া লইলে আমরা শৌর্যে, বীর্যে, প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইব। সুতরাং এই আত্মতত্ত্বই সকলকে প্রতিনিয়ত শুনাইতে হইবে।

এই আত্মতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়াই তিনি সমাজদেহে ভোগাধিকার-তারতম্যের নিরাকরণ করিতে বলিয়াছেন। বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে তিনি বলিয়াছেন ঃ 'সমাজে যাহাকে সমাজনীতি বা politics বলে, তাহা কেবল এই ভোগতারতম্য-সমুত্থিত অধিকার-প্রাপ্ত ও অধিকার-নিরাকৃত জাতিসমূহের সংগ্রামের নাম। এই অধিকার-তারতম্যের মহাসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ভারতবর্ষ গতপ্রাণপ্রায় পতিত হইয়াছে। অতএব বাহ্যজাতির সহিত সাম্যস্থাপন অতি দূরের কথা, যতদিন এ ভারত নিজগৃহে সাম্যস্থাপন করিতে না পারিবে, ততদিন তাহার পুনর্জীবনীশক্তিলাভের আশা নাই। অর্থাৎ সার কথা এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিবিভাগ কোন দোষের নহে, কিন্তু ভোগাধিকার-তারতম্যই মহা অনর্থের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমাদের উদ্দেশ্য জাতিবিভাগ নষ্ট করা নহে; কিন্তু ভোগাধিকারের সাম্যসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। আচণ্ডালে যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অধিকার-সহায়তা হয়, তাহার সাধন করাই আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত।'

এইভাবে পৌরুষে ও প্রেমে, একত্বে এবং স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় নূতন ভারত গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই নূতন ভারতকে তিনি ডাক দিয়াছেন ঃ

জাগো আরো একবার!
মৃত্যু নহে, এ যে নিদ্রা তব,
জাগরণে পুনঃ সঞ্চারিতে
নবীন জীবন, আরো উচ্চ
লক্ষ্য ধ্যান তরে, প্রদানিতে
বিরাম, পঙ্কজ-আঁখিযুগে।
হে সত্য! তোমার তরে হের
প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন,
—তব মৃত্যু নাহি কদাচন।

হও পুনঃ অগ্রসর,
তব সেই ধীর পদক্ষেপে
নাহি যাহে হরে শান্তি তার,
নিরুদ্বেগে পথিপার্শ্বে স্থিত
দীনহীন ধূলি-কণিকার;
শক্তিমান তবু, মতি স্থির,
আনন্দ-মগন, মুক্ত, বীর;
হে সুপ্তিনাশন, চিরাগ্রণি!
ব্যক্ত কর তব বজ্রবাণী।[১৯]

১৯। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪৫৬-৫৭

আজ ভারতের দুর্দিনে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া স্বামীজীর এই দিব্যবাণী আমাদের প্রাণে সাহস সঞ্চারিত করিবে। স্বামীজী আমাদিগকে বলিয়াছেন গৃহস্থের ধর্ম প্রতিবিধানের। আমরা তাহা গ্রাহ্য করি নাই বলিয়াই বারংবার বহিঃশত্রুর হাতে আমাদের এত দুর্গতি হইয়াছে এবং হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা যদি সাহস অবলম্বন করি, আত্মার শক্তিতে জাগিয়া উঠি, তবে সমস্ত বিপজ্জালই ছিন্ন হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষ চিরন্তন, ভারতবর্ষ মৃত্যুঞ্জয়। স্বামীজী বলিতেছেনঃ 'এই সেই ভারত, যাহা শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্যয় সহ্য করিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে। এই সেই ভূমি যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য ও জীবন লইয়া পর্বত অপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি, অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ, আমাদের এই ভারতভূমির জীবনও সেইরূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।'[২০]

আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী—সুতরাং একটি প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে তাহার বিশদ আলোচনা সম্ভব নহে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, সেবাধর্মী বিবেকানন্দ, সাহিত্যিক বিবেকানন্দ, জ্ঞানী বিবেকানন্দ, কর্মী বিবেকানন্দ, ভক্ত বিবেকানন্দ, যোগী বিবেকানন্দ, দার্শনিক বিবেকানন্দ—প্রভৃতি বিভিন্নরূপে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। আমরা কেবলমাত্র তাঁহার জীবনের মূল সূত্রটির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি—কিন্তু তাহাতেও সফলতার স্পর্ধা মনে জাগে না। তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই পুষ্পদন্তের শিবমহিম্নঃস্তোত্রের নিম্নলিখিত শ্লোকটি মনে পড়েঃ

> অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
> সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
> লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
> তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥

স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ বজ্রবাণী আমাদের চৈতন্য সম্পাদন করিবে। রোমাঁ রোলাঁ তাঁহার বাণী সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ 'তাঁহার বাণীগুলি ছিল সঙ্গীতের মতো; বীঠোফেনের মতো ছিল সেগুলির বাক্যাংশের বিন্যাস এবং হ্যাণ্ডেলের মিলিত সঙ্গীতের মতো ছিল সেগুলির প্রাণমাতানো ছন্দ। তাঁহার এই সকল কথা ত্রিশ বৎসর পূর্বের লেখা বইগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্ত আছে। কিন্তু তবুও শরীরে তড়িৎ-স্পর্শানুভব না করিয়া আমি ঐগুলি স্পর্শ করিতে পারি না।'[২১] স্বামীজীর বাণীর মন্ত্রশক্তি আমাদিগকে শ্রেয়ের পথে, ঋতের পথে নিয়ন্ত্রিত করুক।

২০। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১৮১
২১। The Life of Swami Vivekananda and the Universal Gospel, p. 146

আচার্য বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবরাশি এবং শিক্ষা তাঁহার রচনা ও বক্তৃতাগুলির মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে। তাহাদের বিষয়বস্তুও বহু-বিস্তৃত। বস্তুত, জীবনের প্রায় কোন দিকই বাকি নাই, যাহা লইয়া তিনি আলোচনা করেন নাই। তাহাদের প্রতিটির বিশ্লেষণ করা, এমনকি তাহাদের সবগুলির উল্লেখ করাও অসম্ভব। আমরা কেবল কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তাহার মোটামুটি রূপরেখা উপস্থিত করিতে পারি।

স্বামী বিবেকানন্দ সর্বাগ্রে একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু, অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন এক মহাপুরুষ। তাঁহার অনুরাগীরা এমন অনেক কাহিনী বলিয়াছেন যাহার একমাত্র ব্যাখ্যা ইহাই যে, তিনি অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের এই দিকটি তাঁহার জীবনীগুলিতে—বিশেষত যে-জীবনীগুলি তাঁহার অনুরাগীদের রচনা, তাহাতে—বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐগুলি সকলই অল্প-বিস্তর বিশ্বাসের বিষয় এবং বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য যেহেতু ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, ঐগুলি ইহার উপজীব্য হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবন হইতে একজন সংশয়বাদীও উপলব্ধি করিতে পারেন যে, বিবেকানন্দ প্রকৃত অর্থেই ছিলেন অসাধারণ ধর্মীয় বোধ এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। সুস্পষ্ট কারণেই জগতের মানুষ তাঁহার এই দিকটি সম্বন্ধেই মনোযোগী রহিয়াছে। ইহার ফলে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের অন্যান্য এমন অনেক বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিপথের অন্তরালে থাকিয়া গিয়াছে, যেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে লইয়া বিচার করিলেও তিনি একজন উল্লেখযোগ্য মানুষরূপে পরিগণিত হইতেন। 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত' হৃদয় ও মস্তিষ্কের যে-সকল অসাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন, 'ধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের' উপস্থিতিতে তাহাদের অনেকগুলিই দৃষ্টি এড়াইয়া যায়—ঠিক যেমন চোখ-ধাঁধানো শক্তিশালী আলোর নিকট কম শক্তির আলো নিষ্প্রভ মনে হয়, স্বতন্ত্রভাবে যে-আলো কিন্তু স্পষ্টই দৃশ্যমান হয়।

বাগ্মী

বিবেকানন্দের জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার বই এবং বক্তৃতাগুলিই তাহার নিদর্শন। কিন্তু সেগুলিকে তাহাদের বিষয়বস্তুর জন্যই গুরুত্ব দেওয়া হয় বলিয়া আমরা সচরাচর উপলব্ধি করিতে পারি না যে, তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভা এবং বাগ্মিতার শক্তি কত উচ্চমানের ছিল। তাঁহার বাগ্মিতা-শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া বর্তমানে সম্ভব নয়—কারণ, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছে এরূপ কেহ এখন জীবিত নাই। কিন্তু সমসাময়িককালের উদ্ধৃতি হইতে আমরা ইহার নিদর্শন পাই। শিকাগো ধর্মমহাসভায় শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার প্রথম বক্তৃতা শুনিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেরূপ করতালি দিয়াছিল তাহা সর্বজনবিদিত। কিন্তু ধর্মমহাসভার পূর্বেই যে তাঁহার বক্তৃতা আমেরিকার

বিদগ্ধজনের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল, তাহা সম্ভবত অনেকেই জানেন না। ম্যাসাচুসেটস-এ অ্যানিস্কোয়ামের একটি চার্চে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্টের শেষ সপ্তাহে তিনি একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। স্থানীয় সংবাদপত্রে (Gloucester Daily Times) তাহা প্রশংসিত হয়। 'Mr. Sivanei Yivcksnanda, a Hindoo monk, gave a fine lecture in the church last evening on the customs and life in India.'[১] মিসেস রাইট তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : 'He is wonderfully clever and clear in putting his arguments and laying his trains [of thoughts] to a conclusion. You can't trip him up, nor get ahead of him.'[২] ধর্মমহাসভায় আত্মপ্রকাশ করিবার পর তিনি একজন বাগ্মীরূপে প্রসিদ্ধ হইলেন। 'নিউইয়র্ক ক্রিটিক' তাঁহাকে 'দৈবীশক্তিসম্পন্ন বক্তা'রূপে বর্ণনা করিল। সুপ্রসিদ্ধ মহিলা কবি মিস হ্যারিয়েট মনরো (যিনি বহু বছর ধরিয়া Poetry, a Magazine of Verse-এর সম্পাদিকা ছিলেন এবং ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলেন) ধর্মমহাসভা এবং স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন : '...the handsome monk in the orange robe gave us in perfect English a masterpiece. His personality, dominant, magnetic ; his voice, rich as a bronze bell ; the controlled fervour of his feeling ; the beauty of his message to the Western world he was facing for the first time—these combined to give us a rare and perfect moment of supreme emotion. It was human eloquence at its highest pitch.'[৩] ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ এপ্রিল 'নর্দাম্পটন ডেইলি হেরাল্ড' পত্রিকা লিখিয়াছে : '...At the Parliament of Religions Vivekananda was not allowed to speak until the close of the programme, the purpose being to make the people stay until the end of the session. On a warm day when some prosy professor talked too long, and people would leave the hall by hundreds, it only needed the announcement that Vivekananda would give a short address before the benediction was pronounced to hold the vast audience intact, and thousands would wait for hours to hear a fifteen minutes talk from this remarkable man.'[৪]

সাহিত্য এবং সঙ্গীত প্রতিভা

স্বামীজীর সাহিত্য-প্রতিভার সর্বোত্তম নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁহার বাংলা রচনাগুলিতে। তাঁহার বাংলা রচনার সংখ্যা বেশী নয়। অধিকাংশ রচনা এবং বক্তৃতাই ইংরাজীতে। 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য তিনি বাংলা ভাষায় কিছু কিছু রচনা করিয়াছেন।

১। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Vol. I—Marie Louise Burke, Advaita Ashrama, Calcutta, Third Edition (1983), p. 40

২। ibid., p. 28 ৩। ibid, p. 86 ৪। ibid., p. 103

পরে তাহা লইয়া চারটি ছোট পুস্তক হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বাংলা ভাষায় কিছু চিঠি লিখিয়াছেন। তাঁহার বাংলা রচনা এইগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরিমাণে স্বল্প হইলেও চিন্তা এবং তথ্যের ঐশ্বর্যে ঐ রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ প্রমাণ রহিয়াছে তাঁহার চলিত বাংলার রচনাগুলিতে। সেই সময় সংস্কৃতঘেঁষা গুরুগম্ভীর চালই বাংলা ভাষায় প্রচলিত ছিল। অথচ তখনও তিনি চলিতভাষায় বাংলা লিখিয়াছেন—ইহা তাঁহার বাংলা সাহিত্যকীর্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তখনকার প্রচলিত ধারণা ইহাই ছিল যে, চলিতভাষায় ভাবগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব। স্বামীজী চলিতভাষায় উচ্চ তত্ত্ব পরিবেশন করিয়া দেখাইলেন যে, উহা সম্পূর্ণ সম্ভব। তিনি নিজেই এ-সম্পর্কে তাঁহার ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন ঃ 'সরলতাই রহস্য। আমার গুরুদেবের কথ্য অথচ গভীরভাব-প্রকাশক ভাষাই আমার আদর্শ। যে-ভাব প্রকাশের অভিপ্রায় থাকে, সেই ভাবই প্রকাশ করিবে।'[৫] কিন্তু 'উদ্বোধনে' যখন তিনি এই আদর্শ অনুযায়ী স্বীয় উদ্ভাবিত নূতন ধরনের চলিতভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করিলেন তখন তাঁহাকে বিদ্রূপ ও বিরূপ মন্তব্য কম শুনিতে হয় নাই। তাঁহার নূতন চলিত গদ্যরীতিকে সর্বপ্রথম মর্যাদা দেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চলিত বাংলা কতটা সজীব এবং শক্তিময় হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ 'এমন ভাব, ভাষা ও উদার মতবাদের সংমিশ্রণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় সাধনের আদর্শবহনকারী এ-গ্রন্থ প্রত্যেকের কাছেই এক নতুন আবিষ্কার।'[৬]

একজন ভারতীয় লেখক ইংরাজীতে রচনা করিয়া সাহিত্যিক প্রশংসা লাভ করিবে ইহা অবাস্তব আশা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী গদ্যরচনার সুন্দর ভাষা-শৈলীর জন্য তাঁহাকে কৃতিত্ব না দিয়া পারা যায় না। তাঁহার কিছু কিছু ইংরাজী কবিতাও ভাবগাম্ভীর্যের সমুন্নত স্তরে উপনীত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'Kali the Mother'। ইহাতে ভয়ঙ্কর এবং প্রলয়ের দিব্যরূপ—একটি মহৎ সুন্দর কাব্যিক রূপকের মাধ্যমে চিত্রিত হইয়াছে। এছাড়াও 'My play is done', 'The Song of the Sannyasins', 'To the Awakened India', 'Hold on yet a while, brave heart' প্রভৃতি কবিতাও চমৎকার। তাঁহার রচিত কয়েকটি বাংলা কবিতা সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। মোটকথা, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, নরেন্দ্রনাথ দত্ত যদি স্বামী বিবেকানন্দ না হইতেন তবে বঙ্গভূমিতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে বহু সংখ্যক সুকবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের তালিকায় আরও একটি নাম যুক্ত হইত। একই কথা তাঁহার গভীর এবং ব্যাপক ঐতিহাসিক জ্ঞান সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। তিনি ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া কেবলমাত্র একটি দুইটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার বক্তৃতা ও রচনাবলীর

৫। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩১৬

৬। Swami Vivekananda : Patriot-Prophet—Bhupendranath Datta, Nababharat Publishers, Calcutta, 1954, p. 294

বিভিন্ন জায়গায় ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীনকাল হইতে শুরু করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত ইতিহাসের বিবর্তন বিষয়ে তাঁহার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্ট। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার সমকালীন যুগের কথা বিবেচনায় রাখিয়া বলা যাইতে পারে তাঁহার ঐ ব্যাখ্যার মধ্যে সুগভীর জ্ঞান এবং বিশ্লেষণমূলক বিচারদৃষ্টির প্রকাশ রহিয়াছে। 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' নিবন্ধে তিনি এই সত্যটির উপর জোর দিয়াছেন যে, 'প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযুগেই মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়।'[৭] এই সত্যটির উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি প্রাচীনকাল হইতে শুরু করিয়া ইংরাজ-রাজত্ব পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের সমগ্র ধারাটির ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ঐতিহাসিক গবেষণার বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্লেষণমূলক (critical) পদ্ধতি এবং স্থাপত্য ও নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে তৎকালে যেসব অগ্রগতি হইয়াছিল তাহার সহিতও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। এছাড়াও নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অতি উচ্চ সঙ্গীত-প্রতিভার অধিকারী। তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে নিয়মিতভাবে তালিম লইয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত অভিভূত হইতেন।

শিল্পের সমঝদার

স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়াছেন যে, স্বামীজী তাঁহার শিল্পবোধ পাইয়াছেন পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে। তাঁহার আর এক ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়াছেনঃ 'দাদা (অর্থাৎ স্বামীজী) বাল্যকালে ছবি আঁকিতেন। তখন চার আনায় এক বাক্স জলরঙ পাওয়া যাইত। তাহার সাহায্যে তিনি রঙীন ছবি আঁকিতেন।...এছাড়া তাঁহার গানের গলাও সুন্দর ছিল।'[৮] স্বামীজী পরিণত বয়সে শিল্প-সমীক্ষার গুণটি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক জীবনের একটি ঘটনা হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। স্বামীজী তখন প্রায়-অখ্যাত এবং পুনের এক ব্যারিস্টারের গৃহে অতিথি।

'একদিন কেহ একজন তাঁহার সহিত রবিবর্মার চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। ভারতীয় চিত্রকলায় এক নূতন রীতির প্রবর্তক হিসাবে রবিবর্মা তখন বিখ্যাত। ...ভিক্ষান্নজীবী এক সন্ন্যাসী তদানীন্তনকালের ভারত-বিখ্যাত শিল্পী রবিবর্মার সমালোচনা করিতে কি করিয়া সাহসী হয় ইহা ভাবিয়া আলোচক বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরে গৃহস্বামী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, স্বামীজী শিল্পতত্ত্বে বিশেষ পারঙ্গম।'[৯] প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা সম্বন্ধেও তিনি চিন্তাভাবনা ও পড়াশুনা করিয়াছেন। নিবেদিতাকে তিনি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে নিউইয়র্কে 'Fine Arts of Ancient India' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'Congress of the History of Religions'-এ স্বামীজী ভারতীয় শিল্পে গ্রীক-প্রভাব

৭। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩৮৯

৮। Patriot-Prophet, p. 299 ৯। ibid., p. 300

সম্পর্কে তদানীন্তনকালের স্বীকৃত তত্ত্বটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তাঁহার মত পরবর্তীকালে সুপণ্ডিত ভারতীয় শিল্পবেত্তারাও গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামীজী অনেক প্রসঙ্গে শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। সেগুলি হইতে বোঝা যায় শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কতটা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ছিল। নিম্নে তাঁহার দুইটি শিল্পবিষয়ক উক্তি উদ্ধৃত হইল: 'মানুষ যে জিনিষটি তৈরী করে, তাতে কোন একটা idea express করার নামই art। যাতে idea-র expression নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art বলা যায় না।'[১০] 'শিল্প মানে যা সুন্দর, তাকে ফুটিয়ে তোলা। প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই শিল্পের প্রকাশ থাকা চাই। স্থাপত্য ও বাড়ির মধ্যে তফাৎ হল, প্রথমটি একটি ভাবকে প্রকাশ করে, পরেরটি নিছক একটি কাঠামো, প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তৈরী। কোন জিনিসের মূল্য নির্ভর করে কি পরিমাণ ভাবকে প্রকাশ করতে পেরেছে তার উপরে।'[১১] কিন্তু ভাবপ্রকাশক হওয়া সত্ত্বেও তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণীয় শিল্পকলার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন: 'আদর্শবাদী হিন্দুদের মধ্যে... বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল...। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের কথাই ধর। হিন্দুর চিত্রকলায় কি দেখিতে পাও? সর্বপ্রকার কিম্ভূতকিমাকার ও অস্বাভাবিক মূর্তি। হিন্দু মন্দিরে কি নজরে পড়ে? "চতুর্ভঙ্গ" নারায়ণ বা ঐ জাতীয় কোন মূর্তি। কিন্তু কোন ইতালীয় পট অথবা গ্রীসদেশীয় মূর্তি সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ, ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের কি অপূর্ব প্রকাশ!'[১২] অন্যত্র তাঁহার অনুরূপ আর একটি উক্তি পাই: 'গ্রীক আর্টের মূল কথা প্রকৃতির হুবহু অনুসরণ, অপরপক্ষে ভারতীয় আর্টের মূল উদ্দেশ্য আদর্শকে প্রতিফলিত করা। ...অপরদিকে আদর্শকে—অতীন্দ্রিয়কে—পরিস্ফুটন ভারতের অভিপ্রায়। তার পরিণতি বিকট সব মূর্তি রচনায়। খাঁটি শিল্পকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যা মাটি থেকে ওঠে, সেখান থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে, মাটির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সম্পৃক্ত থাকে, তবুও তার পাপড়ি খুলে ছড়িয়ে থাকে উপরের দিকে। সুতরাং শিল্পকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হবে। যেখানে সেই সংযোগ হারিয়েছে সেখানে শিল্পের পতন হয়েছে। তবু, প্রকৃতিকে অতিক্রম করতেও হবে শিল্পকে।'[১৩]

প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর সূত্রে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, স্বামীজীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় চারুকলার আধ্যাত্মিক মাধুর্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং নন্দলাল বসু প্রমুখ ভারতীয় শিল্পী ও ই. বি. হ্যাভেল ভগিনীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট হয় যে, 'স্বামী বিবেকানন্দ' না হইলে নরেন্দ্রনাথ দত্তকে আমরা হয়তো একজন শিল্পী কিংবা শিল্প-সমালোচকরূপে বিখ্যাত হইতে দেখিতাম।

১০। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৮৭

১১। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition (1964), p. 259 ১২। বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, পৃঃ ২১১-১২

১৩। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, p. 258

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে

স্বামী বিবেকানন্দের নিকট প্রধান ও প্রথম আগ্রহের বিষয় ধর্ম। ধর্মকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর বলিয়া মনে করিতেন। এ-সম্পর্কীয় তাঁহার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তাহা নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইতে পারে ঃ 'আমি দেখিতেছি—ব্যক্তির পক্ষে যেমন, প্রত্যেক জাতির পক্ষেও তেমনি জীবনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। উহাই তাহার জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। উহাই যেন তাহার জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর, অন্যান্য সুর যেন সেই প্রধান সুরের সহিত সঙ্গত হইয়া ঐকতান সৃষ্টি করিতেছে। কোন দেশের—যথা ইংলন্ডের জীবনীশক্তি রাজনীতিক ক্ষমতায়। কলাবিদ্যার উন্নতিই হয়তো অপর কোন জাতির জীবনের মূল লক্ষ্য। ভারতে কিন্তু ধর্মই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, উহাই যেন জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর। আর যদি কোন জাতি তাহার এই স্বাভাবিক জীবনীশক্তি—শত শতাব্দী ধরিয়া যেদিকে উহার নিজস্ব গতিধারা চলিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সেই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। সুতরাং যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকেই জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি না করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফলে তোমরা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। যাহাতে এরূপ না ঘটে, সেজন্য তোমাদিগকে তোমাদের প্রাণশক্তি—ধর্মের মধ্য দিয়া সব কাজ করিতে হইবে।'[১৪] কিন্তু ধর্ম বলিতে তিনি কোন সঙ্কীর্ণ মত বা আচার-অনুষ্ঠান না বুঝাইয়া হিন্দুধর্মের সারভাগকেই বুঝাইয়াছেন এবং ধর্মমহাসভায় 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতাটির মধ্যে তাহা সর্বজনগ্রাহ্যভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। বক্তৃতাটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ 'বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের যে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান হইতে নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত সবকিছুরই, এমনকি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ—এগুলিরও স্থান হিন্দুধর্মে আছে। কোন্ সাধারণ ভিত্তি আশ্রয় করিয়া এই আপাতবিরোধী ভাবগুলি অবস্থান করিতেছে? আমি এখন এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

'...বেদ হইতে হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বেদসমূহকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে অনাদি ও অনন্ত বলিলে...তাহা হাস্যকর বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু "বেদ" শব্দদ্বারা কোন পুস্তক-বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেই-সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডারস্বরূপ। আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মনুষ্য-সমাজ ভুলিয়া গেলেও যেমন ঐগুলি বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত

১৪। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১০৯-১০

সকলের পিতাস্বরূপ পরমাত্মার যে দিব্য সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিস্মৃত হইয়া গেলেও এগুলি থাকিবে।'[১৫] ইহার পর স্বামীজী 'আত্মা' কি তাহার ব্যাখ্যা করেনঃ 'আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার সত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করিবার চেষ্টা করি—"আমি" "আমি" "আমি", তাহা হইলে আমার মনে কি ভাবের উদয় হয়? এই দেহই আমি—এই ভাবই মনে আসে। তবে কি আমি জড়ের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নই? বেদ বলিতেছেনঃ না, আমি দেহমধ্যস্থ আত্মা—আমি দেহ নই। দেহ মরিবে, কিন্তু আমি মরিব না। আমি এই দেহের মধ্যে আছি, কিন্তু যখন এই দেহ মরিয়া যাইবে তখনও আমি বাঁচিয়া থাকিব এবং এই দেহের জন্মের পূর্বেও আমি ছিলাম। ...হিন্দু নিজেকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করে। ...হিন্দু বিশ্বাস করেঃ সেই আত্মা এমন একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি কোথাও নাই, কিন্তু যাহার কেন্দ্র দেহমধ্যে অবস্থিত, এবং সেই কেন্দ্রের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু।'[১৬] ইহার পরে তিনি পুনর্জন্মবাদ এবং কর্মবাদ প্রসঙ্গ আলোচনা করেনঃ 'বিশেষ কোন প্রবণতাসম্পন্ন জীব সদৃশবস্তুর প্রতি আকর্ষণের নিয়মানুসারে এমন এক শরীরে জন্মগ্রহণ করিবে, যাহা তাহার ঐ প্রবণতা বিকশিত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় হয়।'[১৭] কাজেই মানুষের বর্তমান জন্ম '...পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা, এবং ভবিষ্যৎ বর্তমান কর্ম দ্বারা নিরূপিত হয়। আত্মা জন্ম হইতে জন্মের পথে—মৃত্যু হইতে মৃত্যুর দিকে কখন বিকশিত হইয়া, কখন সঙ্কুচিত হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠেঃ প্রচণ্ড বায়ুমুখে ক্ষুদ্র তরণী যেমন একবার ফেনময় তরঙ্গের শীর্ষে উঠিতেছে, পরক্ষণেই মুখব্যাদানকারী তরঙ্গ-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মাও কি সদসৎ কর্মের একান্ত বশবর্তী হইয়া ক্রমাগত একবার উঠিতেছে ও একবার পড়িতেছে? ...আত্মা কি একটি ক্ষুদ্র কীটের মতো কার্যকারণ চক্রের নিম্নে স্থাপিত? আর ঐ চক্র সম্মুখে যাহা পাইতেছে, তাহাই চূর্ণ করিয়া ক্রমাগত বিঘূর্ণিত হইতেছে—বিধবার অশ্রুর দিকে চাহিতেছে না, পিতৃমাতৃহীন বালকের ক্রন্দনও শুনিতেছে না? ...বেদ ঘোষণা করিতেছেন—কতকগুলি ক্ষমাহীন নিয়মাবলীর ভয়াবহ সমাবেশ নয় বা কার্যকারণের কারাবন্ধন আমাদের নিয়ন্তা নয়; কিন্তু এই সকল নিয়মের ঊর্ধ্বে প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে এক বিরাট পুরুষ অনুস্যূত রহিয়াছেন, "যাঁহার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু জগতে পরিভ্রমণ করিতেছে।" '[১৮] ইহারই অনুবর্তিরূপে আসিয়াছে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কীয় আলোচনা। স্বামীজী বলিলেনঃ 'তিনি সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান—সকলের উপরেই তাঁহার করুণা।'[১৯] কিভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে? স্বামীজী বলিতেছেনঃ 'প্রীতি ভালবাসা দিয়া। প্রেমাস্পদরূপে—ঐহিক ও পারত্রিক সমুদয় প্রিয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তররূপে তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে। ...বেদ শিক্ষা দেনঃ আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ, কেবল জড় পঞ্চভূতে বদ্ধ হইয়া আছেন; এই বন্ধনের শৃঙ্খল চূর্ণ হইলেই আত্মা পূর্ণত্ব উপলব্ধি করেন। অতএব

১৫। তদেব, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৩-৪ ১৬। তদেব, পৃঃ ১৫-৭
১৭। তদেব, পৃঃ ১৬ ১৮। তদেব, পৃঃ ১৮-৯ ১৯। তদেব, পৃঃ ১৯

এই পরিত্রাণের অবস্থা বুঝাইবার জন্য ঋষিদের ব্যবহৃত শব্দ "মুক্তি"! মুক্তি, মুক্তি—অপূর্ণতা হইতে মুক্তি—মৃত্যু ও দুঃখ হইতে মুক্তি।

'ঈশ্বরের কৃপা হইলেই এই বন্ধন ঘুচিয়া যাইতে পারে এবং পবিত্র-হৃদয় মানুষের উপরই তাঁহার কৃপা হয়। অতএব পবিত্রতাই তাঁহার কৃপালাভের উপায়। ...নির্মল বিশুদ্ধ মানুষ ইহজীবনেই ঈশ্বরের দর্শনলাভ করেন। ...হিন্দু কেবল মতবাদ ও শাস্ত্রবিচার লইয়া থাকিতে চায় না; সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির পারে যদি অতীন্দ্রিয় সত্তা কিছু থাকে, হিন্দু সাক্ষাৎভাবে তাহার সম্মুখীন হইতে চায়। যদি তাহার মধ্যে আত্মা বলিয়া কিছু থাকে, যাহা আদৌ জড় নয়—যদি করুণাময় বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা থাকেন, হিন্দু সোজা তাঁহার কাছে যাইবে, অবশ্যই তাঁহাকে দর্শন করিবে। তবেই তাহার সকল সন্দেহ দূর হইবে। অতএব আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ দিতে গিয়া জ্ঞানী হিন্দু বলেন, "আমি আত্মাকে দর্শন করিয়াছি, ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছি।" সিদ্ধি বা পূর্ণত্বের ইহাই একমাত্র নিদর্শন। ...ক্রমাগত সংগ্রাম ও সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা—দিব্যভাবে ভাবান্বিত হইয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়া ও তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া সেই "স্বর্গস্থ পিতা"র মতো পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম।

'পূর্ণ হইলে মানুষের কি অবস্থা হয়? তিনি অনন্ত আনন্দময় জীবন যাপন করেন। আনন্দের একমাত্র উৎস ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তিনি পরমানন্দের অধিকারী হন এবং ঈশ্বরের সহিত সেই আনন্দ উপভোগ করেন...।'[২০]

অর্থাৎ সে তখন ব্রহ্মের সহিত একাত্ম হইয়া যায়। স্বামীজী দেখাইয়াছেন যে, বেদান্তের এই অদ্বৈতবাদ বিজ্ঞানের সহিত অ-বিরোধী। কারণ, বিজ্ঞানেরও লক্ষ্য একত্ব।

ঐ বক্তৃতাতে স্বামীজী ইহার পর হিন্দুদর্শনের আলোচনা হইতে সাধারণ একজন হিন্দুর কাছে ধর্ম কিরূপ তাহার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই মূর্তিপূজার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন: 'ভাবানুষঙ্গ-নিয়মানুসারে (by the law of association) জড়মূর্তি দেখিলে মানসিক ভাববিশেষের উদ্দীপন হয়, বিপরীতক্রমে মনে ভাববিশেষের উদ্দীপন হইলে তদনুরূপ মূর্তিবিশেষও মনে উদিত হয়। এইজন্য হিন্দু উপাসনার সময়ে বাহ্য প্রতীক ব্যবহার করে। সে বলিবে, তাহার উপাস্য দেবতায় মন স্থির করিতে প্রতীক সাহায্য করে। সে তোমাদেরই মতো জানে, প্রতিমা ঈশ্বর নয়, সর্বব্যাপী নয়।...

'দেখা যাইতেছে—যেভাবেই হউক—মানুষের মনের গঠনানুসারে অনন্তের ধারণা অনন্ত নীলাকাশ বা সমুদ্রের প্রতিচ্ছবির সহিত জড়িত; সেজন্য আমরা স্বভাবতই পবিত্রতার ধারণা গির্জা, মসজিদ বা ক্রুশের সহিত যুক্ত করিয়া থাকি। হিন্দুরা পবিত্রতা, সত্য, সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি বিভিন্ন মূর্তি ও প্রতীকের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ...ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মানুষকে দেবতা হইতে হইবে। মন্দির, প্রার্থনাগৃহ, দেব-বিগ্রহ বা ধর্মশাস্ত্র—সবই মানুষের ধর্মজীবনের প্রাথমিক অবলম্বন ও সহায়ক মাত্র, তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে।

'শাস্ত্র বলিতেছেন: "বাহ্যপূজা—মূর্তিপূজা প্রথমাবস্থা; কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে মানসিক

২০। তদেব, পৃঃ ১৯-২১

প্রার্থনা পরবর্তী স্তর ; কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষাৎকারই উচ্চতম অবস্থা।" ...হিন্দুধর্মে বিগ্রহ-পূজা যে সকলের অবশ্য কর্তব্য, তাহা নয়। কিন্তু কেহ যদি বিগ্রহের সাহায্যে সহজে নিজের দিব্যভাব উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে কি উহাকে পাপ বলা সঙ্গত ? সাধক যখন ঐ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, তখনও তাঁহার পক্ষে উহাকে ভুল বলা সঙ্গত নয়। হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য হইতে সত্যে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হইতেছে। হিন্দুর নিকট নিম্নতম জড়োপাসনা হইতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সাধনার অর্থ অসীমকে ধরিবার—উপলব্ধি করিবার জন্য মানবাত্মার বিবিধ চেষ্টা। জন্ম, সঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী প্রত্যেকের সাধন-প্রচেষ্টা নিরূপিত হয়। প্রত্যেকটি সাধনই ক্রমোন্নতির অবস্থা। প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল-পক্ষীর শাবকের মতো ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে থাকে এবং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া শেষে সেই মহান সূর্যে উপনীত হয়।

'বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, হিন্দুগণ এই রহস্য ধরিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সম্মুখে তাহারা একমাপের জামা রাখিয়া দেয় ; জ্যাক, জন, হেনরি প্রভৃতি সকলকেই ঐ একমাপের জামা পরিতে হইবে। যদি জন বা হেনরির গায়ে না লাগে, তবে তাহাকে জামা না পরিয়া খালি গায়েই থাকিতে হইবে। হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছেন ঃ আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরমতত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব; এবং প্রতিমা ক্রুশ বা চন্দ্রকলা প্রতীকমাত্র, আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিবার অবলম্বনস্বরূপ। এই প্রকার সাহায্য যে সকলের পক্ষেই আবশ্যক তাহা নয়, তবে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই প্রকার সাহায্য আবশ্যক। যাহাদের পক্ষে ইহা আবশ্যক নয়, তাহাদের বলিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই যে, ইহা অন্যায়।'[২১]

স্বামীজী হিন্দুধর্মের উদারতার উপর বিশেষ জোর দিয়া দেখাইলেন যে, এই ধর্মের দৃষ্টিতে জগতের 'প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্য-স্বরূপ—দেবত্ব বিকশিত করে, এবং সেই এক চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা।'[২২] তিনি বলিলেন ঃ 'আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, সমুদয় সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে এরূপ ভাব কেহ দেখাইতে পারিবে না যে, একমাত্র হিন্দুই মুক্তির অধিকারী, আর কেহ নয়।'[২৩]

স্বামী বিবেকানন্দের মানসলোকে একটি বিশ্বজনীন ধর্মের ছবি সর্বদা জাগরূক ছিল। ধর্মমহাসভায় উপর্যুক্ত বক্তৃতার শেষ অংশে প্রকাশ্যে তিনি তাহা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ 'হিন্দু তাহার সর্ব পরিকল্পনা হয়তো কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। কিন্তু যদি কখনও একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তাহা কখনও কোন দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবে না ; যে অসীম ভগবানের বিষয় ঐ ধর্মে প্রচারিত হইবে, ঐ ধর্মকে তাহারই মতো অসীম হইতে হইবে ; সেই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত খ্রীষ্টভক্ত, সাধু অসাধু—সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে ; সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইবে না, পরন্তু সকল ধর্মের সমষ্টিস্বরূপ হইবে, অথচ

২১। তদেব, পৃঃ ২৪-৬ ২২। তদেব, পৃঃ ২৬ ২৩। তদেব

তাহাতে উন্নতির সীমাহীন অবকাশ থাকিবে; স্বীয় উদারতাবশতঃ সেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে...সেই ধর্মের নীতিতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না; উহাতে প্রত্যেক নরনারীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হইবে এবং উহার সমগ্র শক্তি মনুষ্যজাতিকে দেবস্বভাব উপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকিবে। এইরূপ ধর্ম উপস্থাপিত কর, সকল জাতিই তোমার অনুবর্তী হইবে।'[২৪]

গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের যে-রূপ সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন, উল্লিখিত উক্তিগুলি হইতে সে-সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সাধারণ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম হইতে ইহা অনেক পৃথক। সেই সময় একদিকে ব্রাহ্মধর্ম ও অপরদিকে গোঁড়া হিন্দুধর্মের মধ্যে যে-বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তাহার সমন্বয় সাধন করেন। তাঁহারা হিন্দুধর্মকে যে-রূপ দিয়া গিয়াছেন বর্তমান যুগে তাহাই হিন্দুধর্মের স্বরূপ বলিয়া ভারতের শিক্ষিত সমাজে গৃহীত হইয়াছে এবং হয়তো ইহার আদর্শেই হিন্দুধর্ম ভবিষ্যতে নূতন আকার ধারণ করিবে।

স্বামীজীর নববেদান্ত

স্বামীজী হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বার বার বলিয়াছেন যে, হিন্দুধর্মের মূলভিত্তি হইল বেদান্ত। বেদ সাধারণভাবে হিন্দুধর্মের ভিত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বেদান্তকে স্বামীজী সেই বেদের প্রকৃত নির্যাসস্বরূপ মনে করিয়াছেন। কিন্তু স্বামীজী-প্রচারিত বেদান্ত-মতের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহা ইহাকে শঙ্করাচার্য-প্রচারিত বেদান্ত-মত হইতে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এই কারণে স্বামীজীর বেদান্ত-মতকে আজকাল সাধারণতঃ নববেদান্তবাদ বলিয়া বুঝানো হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্যের বেদান্তের মূলকথা হইল শুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব। ইহাকে সেইহেতু কখনও কখনও 'কেবল-অদ্বৈত' অথবা নির্গুণ অদ্বৈতবাদ বলা হইয়া থাকে। যেহেতু এই মতে পরমসত্তা ব্রহ্ম নির্গুণ এবং নির্বিশেষ সেহেতু শঙ্করাচার্যের বেদান্তকে বিমূর্ত অদ্বৈতবাদও (abstract monism) বলা যাইতে পারে। নববেদান্তও অদ্বৈতবাদের কথা বলে—ইহা এই মত পোষণ করিয়া থাকে যে, পরমসত্তা ব্রহ্ম এক এবং দ্বিতীয়রহিত (একমেবাদ্বিতীয়ম্)। কিন্তু অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে শঙ্করাচার্যের প্রচলিত যে-মত, তাহার সহিত ইহার পার্থক্য রহিয়াছে। স্বামীজীর নববেদান্ত একটি সমন্বয়ী বেদান্ত যাহা দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ এবং চরম সত্য সম্পর্কিত অন্যান্য মতবাদেরও সমন্বয় সাধন করিয়াছে। সুতরাং ইহাকে মূর্ত অদ্বৈতবাদ (concrete monism) বলা যাইতে পারে—যেহেতু এই মতবাদ অনুযায়ী ব্রহ্ম সগুণ আবার নির্গুণ, সাকার আবার নিরাকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মধ্যেই, নববেদান্তবাদের সূত্র, তাহার মূলনীতি এবং উহার বাস্তব প্রয়োগের বীজ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। স্বামী

২৪। তদেব, পৃঃ ২৭

বিবেকানন্দ তাহাকে নববেদান্তবাদ নামক দার্শনিক মতবাদের রূপ দিয়া কর্ম-পরিণত-বেদান্তের ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন। এই নববেদান্তের মূল রেখাঙ্কন শ্রীরামকৃষ্ণই করিয়া গিয়াছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে বিশদ যুক্তিসহায়ে সমৃদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে একটি দার্শনিক মতে পরিণত করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষ্য বলা হইয়া থাকে, তাহা যথার্থ। কিন্তু এই ভাষ্যকার তাঁহার দুর্দান্ত মেধা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সহায়ে এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান রাখিয়াছেন যে, তাঁহার ভাষ্য এক দর্শন-মত রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যেমন বেদান্তসূত্রের উপর শঙ্করাচার্যের ভাষ্য একটি দার্শনিক মত বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা বুঝিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপদেশ এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্ম এবং শক্তি বা কালী এক, ইঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই অথবা তাঁহারা কোন পৃথক সত্তা নহেন। ইঁহারা অচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত। তাঁহারা একই সত্যের দুইটি রূপমাত্র অথবা একই বস্তুর দুইটি অবস্থামাত্র, সুতরাং অভেদ। যেমন সাগরের জলরাশি কখনও হেলিতেছে দুলিতেছে আবার কখনও স্থির রহিয়াছে; অথবা একই সাপ কখনও বুকে ভর দিয়া চলিতেছে আবার কখনও কুণ্ডলী পাকাইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে।

সুতরাং সেই একই সত্তাকে বলা হয় কালী অথবা ব্রহ্ম। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন তখন তাঁহাকে শক্তি বলা হয়...।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন সেই একই সত্তা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নিরূপাধিক, নিরাকার ব্রহ্ম, যোগী বা ধ্যানীর দৃষ্টিতে তিনি আত্মা, ভক্তের নিকট তিনি ভগবান। সমুদ্রের জল যেরূপ প্রবল হিমে জমিয়া তুষার-আকারে পরিণত হয় আবার প্রবল সূর্যতাপে গলিয়া পুনরায় সেই তুষার নিরাকার জলে পরিণত হয়, সেইরূপ সেই পরমসত্তা ভক্তের জন্য সাকার রূপ ধারণ করেন এবং জ্ঞানী ও যোগীর জন্য নিরাকার হন। তাহার অর্থ এই যে, সেই পরমসত্তা সাকার ও নিরাকার উভয়ই হইতে পারেন। সুতরাং সাকার-উপাসনা নিরাকার-উপাসনার তুলনায় হীন বা অযৌক্তিক নয়। ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার—এই সত্যটি বুঝাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই বহুরূপী গিরগিটির গল্প বলিতেন—গিরগিটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙ ধারণ করে আবার কখনও কখনও তাহার কোনও রঙ নাই।

তৃতীয়তঃ ব্রহ্ম সর্বত্র রহিয়াছেন এবং জগতের চেতন অচেতন সর্ববস্তুর মধ্যেই ব্রহ্ম। ইহা তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে সর্ববস্তুই মূলতঃ এক। বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুর বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বুঝাইয়াছিলেনঃ ইহা ঠিক নয় যে, ব্রহ্ম-বিচারে বস্তুজগতের কোন অস্তিত্ব নাই। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে যদিও বলা হইয়াছে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, কিন্তু একহিসাবে জগৎও সত্য।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে বর্জন করিতে বলে না। বেদান্ত জগৎকে দেবত্বমণ্ডিত করিতে বলে। জগৎ বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি; বা জগৎরূপে যাহা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়—বেদান্ত আমাদিগকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া জগতের প্রকৃত স্বরূপকে চিনিতে বলে। স্বামীজী বলিয়াছেনঃ জগৎকে দিব্যায়িত

কর; ঈশ্বরই জগৎ। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেনঃ 'জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে।' তিনি আরও বলিয়াছেনঃ 'তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা নয়; কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে তোমাকে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ কর—ইহার অর্থ কি? ...সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন কর। এইরূপ সকল বস্তুতেই, জীবনে-মরণে, সুখে-দুঃখে—সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ; কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর।'[২৫] স্বামীজীর মতে, ইহাই বেদান্তের শিক্ষা—সর্ববস্তুতে ঈশ্বরদর্শন।

প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত (কর্ম-পরিণত-বেদান্ত)

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তিনি তাঁহার দার্শনিক তত্ত্বগুলি প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োগ করিয়াছেন। সনাতনপন্থীদের ন্যায় সংসারত্যাগ-পূর্বক নির্জনবাসের অপেক্ষা ঈশ্বরের বিগ্রহ জানিয়া মানুষের সেবাকে মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে তিনি অধিকতর শ্রেয় মনে করিয়াছেন এবং বর্তমান যুগে সেই পন্থার উপরেই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাসী-সঙ্ঘকে তিনি এই ব্যবহারিক বেদান্তের ভিত্তির উপরেই গড়িয়া তুলিয়াছেন। স্বামীজী-উদ্ভাবিত এই নূতন পন্থাকে তাঁহার গুরুভ্রাতারা পর্যন্ত প্রথমে সমর্থন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার স্বীয় মতে অবিচল থাকেন। ৯ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে আলমোড়া হইতে মিস মেরী হেলকে তিনি লিখিয়াছেনঃ 'কেবল একটা ভাব আমার মাথার ভিতর ঘুরছিল—ভারতবাসী জনসাধারণের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া। আমি সে-বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যদি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভেতর কেমন কাজ করছে, কলেরা-আক্রান্ত "পারিয়া"র মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের সেবাশুশ্রূষা করছে এবং অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে—প্রভু আমাকে সাহায্য করছেন, তাদেরও সাহায্য পাঠাচ্ছেন! মানুষের কথা আমি কি গ্রাহ্য করি? ...আমি দেখতে চাই যে, আমার যন্ত্রটা বেশ প্রবলভাবে চালু হয়ে গেছে; আর এটা যখন নিশ্চয় বুঝব যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে অন্ততঃ ভারতে এমন একটা যন্ত্র চালিয়ে গেলাম, যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমবো। আর নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান—একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ! এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।'[২৬]

২৫। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৬৮, ১৬৯

২৬। তদেব, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪১১-১২

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশে স্বামী বিবেকানন্দের বহুধা অবদানের কথা এইস্থলে সবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত রূপরেখাই শুধু অঙ্কন করিব। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোয় অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে তিনি যে হিন্দুধর্মের সপক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সর্বজনবিদিত। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে বিশ্বসংস্কৃতির আধুনিক মানচিত্রে সেদিন তিনি হিন্দুধর্মের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সভ্যজাতিগুলি হিন্দুধর্মকে অত্যন্ত হেয় করিয়া দেখিত। তাহারা মনে করিত, হিন্দুধর্ম কুসংস্কার, দুরাচার এবং নীতিহীন লোকাচারের সমষ্টি এবং বর্তমান প্রগতিশীল জগতে হিন্দুধর্ম কোনরকম গুরুত্ব পাইবার দাবি রাখিতে পারে না। বিবেকানন্দের ব্যাখ্যার ফলে এই প্রথম তাহারা হিন্দুধর্মের উচ্চ তত্ত্বগুলিকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাইল। শুধু তাহাই নহে, বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মকে তাহারা অত্যন্ত উচ্চ আসন দান করিল। ইহার সুদূরপ্রসারী প্রত্যক্ষ প্রভাব হিন্দু-সম্প্রদায়ের উপর কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এতকাল পর্যন্ত হিন্দু ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যখনই কোন তুলনামূলক বিচার হইয়াছে তখনই শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে সর্বদাই একটি আত্মরক্ষামূলক এবং ক্ষমাপ্রার্থী-মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্যের সহিত তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতি নিম্নমানের, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই প্রবল দাবি ভারতীয়রা প্রায় সত্য বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিল। এখন আকস্মিকভাবেই পট পরিবর্তন হইয়া গেল। পাশ্চাত্য প্রতিনিধিরা একযোগে হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যগুলির উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিল। ইহা এমন একটি ঘটনা যাহা হিন্দুদের শত্রু-মিত্র কেহই কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। ইহার ফলে হিন্দুদের মধ্যে তাহাদের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে জাতীয় গৌরববোধ ও দেশাত্মবোধের চেতনাও দ্রুত জাগিয়া উঠিল। ক্রম-বর্ধমান হিন্দু-জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে ইহা ছিল এক বিরাট অবদান।

ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছিলেন যে, আধ্যাত্মিকতাই হিন্দুসভ্যতার ভিত্তি। তাঁহার রচনায় ও বক্তৃতায় তিনি দেখাইলেন, মানবজাতির কল্যাণের জন্য ভারতের আধ্যাত্মিকতার মূল্য বা গুরুত্ব পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার চেয়ে কোন অংশে কম নয়—যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমৃদ্ধিকে খুব বড় করিয়া প্রচার করা হয়। তিনি অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে পাশ্চাত্যের চাকচিক্যে হতবুদ্ধি ভারতবাসীরা তাহাদের দৃষ্টি স্বীয় আদর্শের দিকে ফিরাইয়া লয়। পাশ্চাত্যের সহিত তুলনামূলক মূল্যায়নে তিনি হিন্দু আদর্শ ও রীতি-নীতির শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিয়াছিলেন, আর দেশবাসীকে সচেতন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারা যেন সোনার বিনিময়ে রাঙ গ্রহণ না করে।

তাই বলিয়া বিবেকানন্দের কিন্তু পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে কোন গোঁড়ামি ছিল না। তাহাদের কৃতিত্বের সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতিও সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। পাশ্চাত্যের নিকটে

ভারতকেও অনেক কিছুই শিখিতে হইবে, কিন্তু তাহা কখনই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির বিনিময়ে নয়।

স্বামীজীর ভবিষ্যৎ ভারতের পরিকল্পনা যে-দুইটি প্রধান স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা হইল ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং পদদলিত ভারতীয় জনসাধারণের পুনরুজ্জীবন। তিনি বলিয়াছিলেনঃ 'ভারতের একমাত্র ভরসার স্থল জনসাধারণ—অভিজাত সম্প্রদায় তো শারীরিক ও নৈতিক হিসাবে মরে গেছে।'[২৭] তিনি আরও বলিয়াছেনঃ 'আমাদের কার্যের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে—"ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতিবিধান"।'[২৮] 'যে-সকল যুবক ভারতের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নরূপ একমাত্র কর্তব্যে মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে কাজ কর...।'[২৯] বিবেকানন্দের সমাজ-পরিকল্পনার চিন্তায় সর্বদাই জনসাধারণের উন্নতিসাধনের বিষয়টি সম্মুখভাগে স্থান পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ 'আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য সকল সংস্কারকার্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না; উহা নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর।'[৩০]

জনসাধারণের স্বার্থে তিনি নিজের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একবার আবেগভরে বলিয়াছিলেনঃ 'Who cares for your Bhakti and Mukti ? ...I will go to hell cheerfully a thousand times, if I can rouse my countrymen, immersed in Tamas, and make them stand on their own feet...'[৩১] ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেনঃ 'এখন আমি চাই—একদল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রচারক।'[৩২] কয়েকবছরের মধ্যেই তিনি এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়াছিলেন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের লইয়া তিনি রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাহার মূলকেন্দ্র হইল বেলুড় মঠ। এই মঠের নিয়মাবলী তিনি স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই নিয়মাবলীর এক স্থলে রহিয়াছেঃ 'The root of all misery in India is the wide gulf between the lower and upper classes. Unless this difference is made up, there is no hope of any well-being for the people. Therefore we must send preachers to all places to give the masses education and religious teaching.'[৩৩] এই কাজের জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মঠের সহযোগীরূপে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সেই মিশনের পরিচালনায় জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন নিবেদিত-প্রাণ সন্ন্যাসীগণ, যাঁহারা অধিকাংশই

২৭। তদেব, পৃঃ ২৭৬ ২৮। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২

২৯। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৫২-৫৩ ৩০। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২

৩১। The Life of Swami Vivekananda, Vol. 2—His Eastern and Western Disciples, Advaita Ashrama, Calcutta, Fifth Edition (1981), p. 252

৩২। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১০২

৩৩। History of the Ramakrishna Math and Mission—Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama, Calcutta, 1957, p. 137

আসিয়াছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে। বর্তমানে সেই রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত।

পূর্বেই বলিয়াছি, বিবেকানন্দ বেদান্তের সুপ্রাচীন সত্যগুলিকে নবরূপে প্রচার করিলেন। বেদান্তের মূলকথা হইল ঃ প্রতিটি মানুষই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এবং মায়া বা অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে হইবে। অতীতে সমাজ-সংসার ত্যাগ করিয়া অতীন্দ্রিয় তত্ত্ববিচারের (metaphysical abstraction) মাধ্যমে এই সত্যকে উপলব্ধি করিবার কথা বলা হইত। কিন্তু বিবেকানন্দ বলিলেন ঃ ঈশ্বরলাভের জন্য পার্থিব জীবনকে অস্বীকার করিয়া অরণ্যে বা পর্বতে স্বেচ্ছা-নির্বাসনের কোনই প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরলাভ করিতে হইবে জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গগুলিকে, প্রাত্যহিক কর্মগুলিকে সর্বাংশে আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত করিয়া। আমরা যেন আমাদের চারিপাশের মানুষজনের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করিতে চেষ্টা করি। কারণ, তাহারাই ঈশ্বরের জীবন্ত প্রতিমূর্তি এবং বেদান্তও প্রকৃতপক্ষে ইহাই শিক্ষা দিয়া থাকে। তিনি বলিলেন যে, যে-জনসাধারণকে আমরা এতকাল অবজ্ঞা করিয়াছি কিংবা পদদলিত করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদের সেবাই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা। তিনি সেইজন্য সকল দেশবাসীর উদ্দেশে এই আহ্বান রাখিলেন যে, তাহারা প্রত্যেকেই যেন দেশজননীর মধ্যেই ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করে এবং তাহার সেবায় আত্মোৎসর্গ করে। ধর্মীয় শ্রদ্ধাবোধে উদ্দীপ্ত হইয়া, গর্ব বা ভয় হইতে মুক্ত হইয়া জাগতিক সর্বপ্রকার ফলাফলে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থাকিয়া তিনি এই কাজ করিতে বলিলেন এবং 'দরিদ্র-নারায়ণ' শব্দটি ব্যবহার করিয়া তিনি এই ভাবটির মধ্যে প্রাণের সজীব স্পর্শ আনিয়া দিলেন। 'দরিদ্র-নারায়ণ' অর্থাৎ দীন-দরিদ্রের রূপ-ধারী ভগবান। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে গৃহ-সংসার ত্যাগ করিয়া যিনি অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সত্যের অনুসন্ধানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি কিন্তু অবিরাম এই বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, ভারতের জন্য ধর্ম ও দর্শন ততটা প্রয়োজনীয় নহে; ধর্ম ও দর্শন তাহার যথেষ্ট রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজন তাহার লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য অন্ন, নিম্নশ্রেণীর মানুষের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার, দুর্বল জনগণের বুকে শক্তি ও উৎসাহ, পৃথিবীর মধ্যে একটি মহান জাতি বলিয়া গৌরব ও আত্মমর্যাদা বোধের চেতনা। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী এবং আদর্শ জাতীয় জীবনস্রোতে নববেগ যুক্ত করিয়াছিল, নূতন উদ্যম এবং আশার সঞ্চার করিয়াছিল এবং দেশসেবাকে ধর্মীয় সাধনার স্তরে উন্নীত করিয়াছিল। তিনি সর্বদা এই বিষয়টির উপর জোর দিতেন যে, হিন্দু-মানসের কাছে আবেদন জানাইয়া সফল হইতে হইলে ধর্মের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়াই সর্বোত্তম উপায়। তাই জনসাধারণের ধার্মিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক, পার্থিব প্রভৃতি জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যে-জনসেবার কথা তিনি এত করিয়া বলিয়াছেন, তাহাকে তিনি কোন রাজনৈতিক কর্মসূচীরূপে উপস্থিত করেন নাই—ধর্মীয় সাধনপদ্ধতিরূপে আধ্যাত্মিক মুক্তির পন্থারূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে জাতীয় জাগরণের স্বার্থে দেশবাসীর চরিত্রে যে-গুণগুলির অবশ্য প্রয়োজন—আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীলতা, নৈতিক এবং শারীরিক বল—সেগুলিকেও

তিনি ধর্মীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 'আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক এই কথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি।...তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরও ভাল বুঝিবে।'[৩৪] '...আমি চাই এমন লোক—যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ!'[৩৫] '...উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর।...উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল উপনিষদেই "অভীঃ" এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি "অভীঃ" বা ভয়শূন্য এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। "অভীঃ"—ভয়শূন্য হও।...উপনিষদুক্ত এই তেজস্বিতাই আমাদের জীবনে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি, শক্তি—ইহাই আমাদের চাই।'[৩৬] '...আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হউক, অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য—এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ।'[৩৭] '...আমরা চাই—রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশী লৌহদৃঢ় হউক। মস্তিষ্ককে দুর্বল করে, এমন সব ভাবের প্রয়োজন নাই...।'[৩৮] তিনি ভারতবাসীকে বার বার করিয়া বেদান্তের এই তত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, তাহারা সকলেই স্বরূপত ঈশ্বর, দৈবী-স্বভাব-সম্পন্ন, অতএব তাহাদের কর্তব্য সর্বপ্রকার ভয় বর্জন করা। আমরা এই সত্য সম্বন্ধে যতক্ষণ অজ্ঞ থাকি; ততক্ষণই শুধু নিজেদের দুর্বল ও শক্তিহীন মনে করি। উদাহরণস্বরূপ তিনি মেষশাবকদের সহিত একত্রে লালিত ব্যাঘ্রশিশুর গল্পটি প্রায়ই বলিতেন। ব্যাঘ্রশিশু নিজেকে মেষ ভাবিয়া মেষের মতোই আচরণ করিত। একদিন একটি ব্যাঘ্র মেষের পালে পড়িল এবং ব্যাঘ্রশিশুটিকে একটি জলাশয়ের নিকট লইয়া গিয়া নিজের এবং ব্যাঘ্রশিশুর প্রতিবিম্ব দেখাইল। ব্যাঘ্রশিশু দেখিল, উভয়ের প্রতিবিম্ব একই প্রকার। সে বুঝিতে পারিল যে, সে মেষ নয়—ব্যাঘ্র। সঙ্গে সঙ্গে সে মেষের মতো আচরণ পরিত্যাগ করিল এবং ব্যাঘ্রের দলে মিশিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেল। স্বামীজী বুঝাইতে চাহিতেন যে, যে-মুহূর্তে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা বস্তুতই অমৃতের দিব্য সন্তান, সেই মুহূর্তে ঐ মেষশাবকটির মতোই আমরা সকল ভয় দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শরীর ও মনে অমিত তেজ অনুভব করি। নিম্নের উদ্ধৃতিটিকে একটি দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করিতেছি যাহার মধ্যে স্বামীজীর ঐ শক্তি-বাণীর প্রকাশ ঘটিয়াছে:

৩৪। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪
৩৫। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫ ৩৬। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১২৯
৩৭। তদেব, পৃঃ ১৩৩ ৩৮। তদেব, পৃঃ ১৭৪

'সকলেরই সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলো—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। উঠ, জাগো—যতদিন না চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না। উঠ জাগো—নিজদিগকে দুর্বল ভাবিয়া তোমরা যে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছ, তাহা দূর করিয়া দাও। কেহই প্রকৃতপক্ষে দুর্বল নহে—আত্মা অনন্ত, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। উঠ, নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর—তোমার ভিতর যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর, তাঁহাকে অস্বীকার করিও না। আমাদের জাতির ভিতর ঘোর আলস্য, দুর্বলতা ও মোহ আসিয়া পড়িয়াছে। হে আধুনিক হিন্দুগণ, এই মোহজাল ছিন্ন কর। ইহার উপায় তোমাদের শাস্ত্রেই রহিয়াছে। তোমরা নিজ নিজ স্বরূপের চিন্তা কর এবং সর্বসাধারণকে ঐ শিক্ষা দাও। ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ কর। আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে শক্তি আসিবে, মহিমা আসিবে, সাধুত্ব আসিবে, পবিত্রতা আসিবে—যাহা কিছু ভাল সকলই আসিবে।'[৩৯] স্বামীজী আরও বলিতেন যে, এই শরীর একটি আবরণ মাত্র যাহা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে। শরীর ধ্বংস হয়, কিন্তু আত্মা মৃত্যুঞ্জয়—কোন কিছু তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে না। মানুষ যেমন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র দূরে ছুঁড়িয়া ফেলে এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করে তেমনি যে-মানুষের মৃত্যু হয়, সে কেবল একটি শরীর বদলাইয়া অপর শরীর গ্রহণ করে কিন্তু তাহার আত্মা অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়। অতএব এই জগতে প্রকৃত ভয়ের কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষের কত বিপ্লবী বীর যে বিবেকানন্দের ঐ শক্তিগর্ভ বাণী কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া বক্ষে মুদ্রিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বন্দুকের গুলিতে কিংবা ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা মহা আশ্চর্যজনক ঘটনা সন্দেহ নাই।

স্বামীজীর জাতীয়তাবাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য তাঁহার স্বদেশপ্রেম। তাঁহার রচনা ও বক্তৃতাবলীর বিভিন্ন জায়গায় ইহার অজস্র প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহার সর্বজনপরিচিত স্বদেশমন্ত্র ঃ 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা--এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার

৩৯। তদেব, পৃঃ ৮২

শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"'[৪০]

লন্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার একজন ইংরাজ বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: 'স্বামীজী, শক্তি ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার কেন্দ্র পাশ্চাত্যদেশে তিন বৎসর বাস করিবার পর দেশে ফিরিয়া আপনার কেমন লাগিবে?' স্বামীজী উত্তর দিয়াছিলেন: 'আমি দেশ ত্যাগ করিবার পূর্বেও জন্মভূমি ভারতবর্ষকে ভালবাসিতাম—কিন্তু এখন ভারতের প্রতি ধূলিকণা আমার নিকট পবিত্র—ভারত আমার তীর্থস্থান।'[৪১] সংসারত্যাগী হইয়াও স্বামী বিবেকানন্দ দেশপ্রেমিকদের মধ্যেও অগ্রগণ্য। তিনি বুঝিয়াছিলেন: যে-আধ্যাত্মিকতা ভারতীয়দের প্রাণশক্তি তাহা লুপ্ত হয় নাই, সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে শুধু। ভারতীয় সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক শক্তিকে পুনর্জাগরিত করিয়া ভারতবর্ষকে তাহার সনাতন পবিত্র গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চিন্তাই তাঁহার অন্তরে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য পাইত। তাঁহার অন্যতমা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন: 'যে বছরগুলিতে আমি প্রায় প্রত্যহই তাঁহাকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি—ভারতের চিন্তা তাঁহার কাছে ছিল নিঃশ্বাসবায়ুর ন্যায় নিত্য সঙ্গী।'[৪২]

স্বদেশপ্রেমের এই সুতীব্র অনুভূতির দ্বারা তাড়িত হইয়াছিলেন বলিয়াই স্বয়ং রাজনীতি হইতে দূরে থাকিলেও বার বার করিয়া তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের কথা বলিয়াছেন। দেশবাসীকে, বিশেষত যুবসমাজকে স্বামীজী স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভই তাহাদের সর্বপ্রথম লক্ষ্য। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন ঢাকা গিয়াছিলেন তখন একদল যুবক তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদের বলিয়াছিলেন: বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার দেশভক্তি এবং সনাতন ধর্ম অনুসরণ কর। জন্মভূমির সেবা তোমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। সর্বাগ্রে চাই রাজনীতিক স্বাধীনতা।[৪৩] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করিয়া তিনি তাঁহাদের বলিয়াছিলেন: 'এই পদ্ধতিতে কোন স্থানেই স্বদেশপ্রেম গড়িয়া তোলা যায় না। যন্ত্র, অর্থ ও বাণিজ্যসম্ভার পূর্ণ বণিকের দুনিয়ায় ভিক্ষাপাত্রের কোন স্থান নাই। মানুষের বিবেককে জাগাইয়া তুলিয়া সেই জাগ্রত বিবেকের নির্দেশেই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। ...শরীরচর্চা এবং দুঃসাহসিকতাই হওয়া চাই যৌবনোচ্ছল বর্তমান তরুণ সমাজের প্রধান লক্ষ্য!'[৪৪] অতঃপর স্বামীজী তাঁহাদের বলিয়াছিলেন: 'ভারতের অতীত ছিল গৌরবোজ্জ্বল, ভারতের ভবিষ্যৎও হবে উজ্জ্বলতর। ...সত্তা-আলোড়নকারী মৃত্যুঞ্জয়ী অভীমন্ত্রের

৪০। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯

৪১। Vivekananda : A Biography—Swami Nikhilananda, Advaita Ashrama, Calcutta, 1971, pp. 211-12

৪২। The Master as I saw Him—Sister Nivedita, Udbodhan Office, Calcutta, Twelfth Edition (1977), p. 40

৪৩। Patriot-Prophet, p. 334

৪৪। ibid., p. 332

প্রভাবে যুগ-যুগ-সঞ্চিত দাসমনোবৃত্তি, কুসংস্কার ও হীনম্মন্যতা নিঃশেষে দূরীভূত হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলির পাশাপাশি সমপদক্ষেপে বীরদর্পে চলিতে হইলে, হে বাংলার তরুণদল, তোমাদের ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর সাহসিকতার গুণ অনুশীলন করিতে হইবে...অন্যান্য দেশের গুণগুলি আয়ত্ত কর, তাহাদের কারিগরি-দক্ষতা শিক্ষা কর...তাহার পর, নৈতিক গুণাবলী এবং দক্ষতা অর্জন করিয়া বিদেশী শাসনকর্তাদের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দাও, তাহাদিগকে বাধ্য কর প্রাচ্যসংস্কৃতির এই পীঠস্থান হইতে তাহাদের নাগপাশ খুলিয়া লইতে। কিন্তু ইহা নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ, শুধুমাত্র অনুকরণ করিলে কিছুই হইবে না।'[৪৫]

তাঁহার 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, ভারতবাসীদের মধ্যে একতা এবং স্বজনপ্রীতির একান্ত অভাব। যে-কোন জাতির বড় হইবার মূলে ঐ দুইটি গুণ কাজ করে। তিনি এই প্রসঙ্গে জাপানের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন কিভাবে ঐ দুইটি গুণের বলে ক্ষুদ্র একতাবদ্ধ দেশগুলি অনৈক্যগ্রস্ত বৃহৎ দেশগুলিকেও শাসন করিয়া থাকে। ঐ বক্তৃতায় ইহার পর তিনি বলিয়াছেন ঃ 'আর যে-জাতির লোকসংখ্যা যত অধিক, তাহার পক্ষে সমবেতভাবে কার্য পরিচালনা করা তত কঠিন। উহা যেন একটা অনিয়ন্ত্রিত জনতা, তাহারা কখনও একত্র মিলিতে পারে না। যাহা হউক, এই-সব মতবিরোধের ইতি করিতে হইবে। ...যদি তোমাদের দেশে একজন কেহ বড় হইতে চেষ্টা করে, তোমরা সকলেই তাহাকে নামাইয়া আনিতে চেষ্টা কর, কিন্তু একজন বিদেশী আসিয়া যদি লাথি মারে, মনে কর—ঠিকই হইয়াছে। তোমরা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছ। এই দাসত্বতিলক কপালে লইয়া তোমরা আবার বড় বড় নেতা হইতে চাও? আগে দাস-মনোভাব ছাড়িয়া দাও। আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত...।'[৪৬]

স্বামীজী বার বার করিয়া বলিয়াছেন যে, আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা বিশাল ত্রুটি হইল ঈর্ষা এবং একতার অভাব। বিভিন্ন সময়ে তিনি এই সম্পর্কে তীব্র নিন্দা এবং কষাঘাত করিয়াছেন ঃ '...আমরা একসঙ্গে মিলিতে পারি না; আমরা পরস্পরকে ভালবাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর; আমরা তিন জন একসঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, ঈর্ষা করিয়া থাকি।'[৪৭] 'কি কারণে হিন্দুজাতি তাহার অদ্ভুত বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণাবলী সত্ত্বেও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল? আমি বলি, হিংসা। এই দুর্ভাগা হিন্দুজাতি পরস্পরের প্রতি যেরূপ জঘন্যভাবে ঈর্ষান্বিত এবং পরস্পরের খ্যাতিতে যেভাবে হিংসাপরায়ণ, তাহা কোন কালে কোথাও দেখা যায় নাই। যদি আপনি কখনও পাশ্চাত্যদেশে আসেন, তবে এতদ্দেশবাসীর মধ্যে এই হিংসার অভাবই সর্বপ্রথম আপনার নজরে পড়িবে।'[৪৮] 'একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ—চার কোটি ইংরেজ

৪৫। ibid., pp. 333-34 ৪৬। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮-৯৯
৪৭। তদেব, পৃঃ ১৩৩ ৪৮। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬

ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতেছে!... এই চার কোটি ইংরেজ তাহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করিতে পারে, এবং উহার দ্বারাই তাহাদের অসীম শক্তিলাভ হইয়া থাকে; তোমাদের ত্রিশ কোটি লোকের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই সংহতি—শক্তিসংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন।'[৪৯]

স্বামীজীর মতে ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ সম্ভব কেবলমাত্র ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতে। 'অন্যান্য দেশের সমস্যাসমূহ অপেক্ষা এদেশের সমস্যা জটিলতর, গুরুতর। জাতির অবান্তর বিভাগ, ধর্ম, ভাষা, শাসনপ্রণালী—এই সমুদয় লইয়াই একটি জাতি গঠিত। ...কেবল আমাদের জাতির পবিত্র ঐতিহ্য—আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলনভূমি, ঐ ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ইউরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। ...অতএব ভাবী ভারত-গঠনে ধর্মের ঐক্যসাধন অনিবার্যরূপে প্রয়োজন। এই ভারতভূমির পূর্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ—সর্বত্র সকলকে এক ধর্ম স্বীকার করিতে হইবে। এক ধর্ম—এ-কথা আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি? খ্রীষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধগণের ভিতর যে-হিসাবে এক ধর্ম বিদ্যমান, আমি সে-হিসাবে "এক ধর্ম" কথাটি ব্যবহার করিতেছি না। আমরা জানি, আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসমূহ যতই বিভিন্ন হউক, উহাদের যতই বিভিন্ন দাবি থাকুক, তথাপি কতকগুলি সিদ্ধান্ত এমন আছে—যেগুলি সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ই একমত। ...আর ঐগুলি স্বীকার করিবার পর আমাদের ধর্ম সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাব পোষণ করিবার, ইচ্ছামতো চিন্তা ও কাজ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া থাকে।'[৫০]

'ধর্ম যে সর্বোচ্চ আদর্শ—ইহা তো সত্যই, কিন্তু আমি এখানে সে-কথা বলিতেছি না; আমি বলিতেছি, ভারতের পক্ষে কাজ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়—প্রথমে ধর্মের দিকটা দৃঢ় না করিয়া এখানে অন্য কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টা করিতে গেলে সর্বনাশ হইবে। সুতরাং ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়-সাধনই ভবিষ্যৎ ভারতগঠনের প্রথম কর্মসূচী...।'[৫১]

'ভারতের বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিকে একত্র করাই ভারতের জাতীয় একত্বসাধনের একমাত্র উপায়। যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একই প্রকার আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা, তাহাদের সম্মিলনেই ভারতের জাতি গঠিত হইবে।'[৫২]

অতএব স্বামীজী যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করিলেন তাহা চারিটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:
১। জাতির ভিত্তি জনসাধারণ। সেই জনসাধারণের জাগরণ।
২। মানুষের শারীরিক এবং নৈতিক বলের উন্নতি।
৩। সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ভাবগুলির ভিত্তিতে জাতীয় একত্ব।
৪। ভারতবর্ষের প্রাচীন মহিমা সম্পর্কে সচেতনতা এবং গর্ববোধ।

৪৯। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৯৭ ৫০। তদেব, পৃঃ ১৮২-৮৩
৫১। তদেব, পৃঃ ১৮৪ ৫২। তদেব, পৃঃ ২৭৩

ভারতীয় জাতীয়তাকে উপরোক্ত চারিটি স্তম্ভের উপরে নির্মিত হইতেই হইবে, ইহাই স্বামীজীর মত। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তিনিই সর্বপ্রথম এই চিন্তাগুলি স্পষ্টরূপে এবং দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়াছেন এবং ঐ আদর্শের ভিত্তিতে দেশের জাতীয় উন্নতির বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁহার প্রত্যক্ষ অবদান অন্য যে-কোন নেতা অপেক্ষা বেশী। ইহা ভিন্ন, আমেরিকায় তাঁহার যুগান্তকারী সাফল্য কিভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নির্মাণে পরোক্ষ সহায়তা করিয়াছে তাহাও সর্বজনবিদিত। এই প্রসঙ্গে দুইটি তথ্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। স্বামীজী যেইসময় ভারতীয় জনসাধারণের উন্নতিকে জাতীয় জাগরণের অন্যতম অঙ্গরূপে গুরুত্ব দিয়াছেন, সেইসময় সাধারণ রাজনীতিবিদ্‌দের কথা দূরে থাকুক, বিপিনচন্দ্র পালের ন্যায় অগ্রণী নেতাও সাধারণ মানুষের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের চিন্তাকে সভয়ে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, সাধারণ মানুষ রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা লইলে অরাজকতা এবং ধ্বংসাত্মক বিপ্লব দেখা দিবে। দ্বিতীয়তঃ, যখন আমাদের রাজনৈতিক নেতারা সভা-সমিতি এবং আবেদন-নিবেদনকেই বন্ধনমুক্তির একমাত্র পন্থারূপে অবলম্বন করিতেছিলেন তখন স্বামীজীই সর্বপ্রথম সেই ভিক্ষাপাত্রের নীতির বিরুদ্ধে স্বীয় মত ঘোষণা করিলেন। উভয়ক্ষেত্রেই তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় রাজনীতি কোন্ পথ ধরিবে। এবং পরবর্তীকালের রাজনীতির সেই গতিপথ স্থির হইবার মূলেও বহুলাংশে কাজ করিয়াছে তাঁহার আলোড়নকারী বাণীস্ফুলিঙ্গ।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাম্প্রতিককালের এক ঐতিহাসিক স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন-পূর্বক বলিয়াছেন : 'Swami Vivekananda might well be called the father of Modern Indian Nationalism ; he largely created it and also embodied in his own life its highest and noblest elements.'[৫৩] ঐতিহাসিকের এই উক্তি অনেকাংশেই সত্য—ইহাই বর্তমান নিবন্ধকারের অভিমত।

বিংশ শতকের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয়ের উপর স্বামীজীর প্রভাব

পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে, স্বামীজী যে ভবিষ্যৎ ভারতের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার প্রধান স্তম্ভ দুইটি। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। দ্বিতীয়তঃ, বঞ্চিত ও নিপীড়িত জনসাধারণের পুনর্জাগরণ। বিংশ শতাব্দীর দুইজন দেশবরেণ্য ভারতপুরুষ, অরবিন্দ ঘোষ এবং মহাত্মা গান্ধী, স্বামীজীর ভারতচেতনার উপর্যুক্ত দুইটি দিককে—অরবিন্দ প্রথমটিকে এবং গান্ধীজী দ্বিতীয়টিকে—স্বীয় কর্মপদ্ধতির মূল লক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের অসারতা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মতাবলম্বী ছিলেন ও বোম্বে নগরীতে প্রকাশিত 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় এগারোটি প্রবন্ধে তাঁহার অনুরূপ মন্তব্য

৫৩। India's Struggle for Swaraj—R. G. Pradhan, Daya Publishing House, Delhi, 1985, p. 60

করিয়াছেন। আবার ধর্মই যে হিন্দুদের জাতীয় জীবনের কেন্দ্র অরবিন্দ শেষ জীবনে পণ্ডিচেরিতে আশ্রম স্থাপন করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন ঃ '১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর সমস্ত বাংলাদেশ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছিল, তখন তিনি বুঝিলেন বাংলার শিয়রে যিনি জাগ্রত প্রহরীর মতো ছিলেন এবং যাঁহার কার্য সবেমাত্র শুরু হইয়াছিল সেই কর্মযোগী বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর বাংলাকে পথ দেখাইবার আর কেহ নাই।...শ্রীঅরবিন্দ আর নিষ্ক্রিয় হইয়া অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। সুদূর প্রবাস হইতেই তিনি যেন বঙ্গমাতার শোকবিহ্বল কণ্ঠের করুণ আহ্বান শুনিতে পাইলেন।'[৫৪]

ইহার কিছুকাল পরে শ্রীঅরবিন্দ একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন ঃ 'বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করা যায় তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ—নরকেশরী বিবেকানন্দ। আমরা দেখিয়াছি তাঁহার প্রভাব আজও প্রবলভাবে কাজ করিতেছে। সেই প্রভাব ভারতের আত্মাকে আলোড়িত করিয়াছে। আমরা বলিব ঃ বিবেকানন্দ এখনও বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার দেশজননীর আত্মায়, দেশজননীর সন্তানদের আত্মায়।'[৫৫]

রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন ঃ 'স্বামী অশোকানন্দ আমাকে লিখিয়াছেন যে, অরবিন্দ ঘোষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক জীবন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।'[৫৬]

সাধারণের ধারণা যে, মহাত্মা গান্ধীই সর্বপ্রথম জাতীয় জাগরণে ও মুক্তিসংগ্রামে অনুন্নত শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতার উপর জোর দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বহু পূর্বেই বিবেকানন্দ যে ইহা উদাত্তস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন ঃ 'গান্ধী প্রকাশ্যভাবেই একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, বিবেকানন্দের রচনাগুলি হইতে তিনি প্রচুর সাহায্য পাইয়াছেন এবং ভারতবর্ষকে আরও ভালবাসিতে ও আরও ভাল করিয়া বুঝিতে সেগুলি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে।'[৫৭]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপরও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

> 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়॥'
> 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

ইহা উপনিষদের বাণী নহে—বিবেকানন্দের পূর্বোল্লেখিত উক্তির প্রতিধ্বনি। ইহা অপেক্ষাও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'অপমানিত' নামক কবিতায়। ইহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে। কয়েকটি পঙ্ক্তির উল্লেখ করিতেছি ঃ

৫৪। ভারত পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ—উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯৫০, পৃঃ ৪০-১

৫৫। তদেব, পৃঃ ৪০

৫৬। The Life of Swami Vivekananda and the Universal Gospel—Romain Rolland, Advaita Ashrama, Calcutta, 1970, p. 288 f.n. ৫৭। ibid.

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥
মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।

* * *

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে স্বামীজীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাই নিম্নলিখিত কয়েক লাইনেঃ

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।

এই 'মানুষের নারায়ণ' যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'দরিদ্র-নারায়ণ' হইতেই উদ্ভূত তাহা অস্বীকার করা কঠিন। কারণ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির যে সার্ধ তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস আমরা জানি তাহাতে 'জীবে-শিব' বা 'দরিদ্র-নারায়ণ'—এই দুইটি অনুভূতির উল্লেখ আছে এরূপ প্রমাণ আমার জানা নাই। মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন' ও রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের নারায়ণ' এই দুইটি সংজ্ঞাই যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব সূচিত করে ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেনঃ '...রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের এবং রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নয়া বেদান্তবাদের দুই স্রোতধারা মিলিত হইয়া সঙ্গতিলাভ করিয়াছিল। ...বিবেকানন্দের মতো একজন অগ্রদূতের প্রভাব যে তাঁহার মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।'[৫৮]

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহা সর্বজনপরিচিত সত্য—ইহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। সাহিত্যিক মোহিতলাল বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেগুলি সংকলিত হইয়া 'বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' নামক গ্রন্থ-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সপ্তম অধ্যায় 'বিবেকানন্দের উত্তরসাধকঃ অরবিন্দ, গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র'। এই অধ্যায়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছিঃ 'মহাত্মা গান্ধীর পতিতোদ্ধার-ব্রত ও গণ উদ্বোধন-নীতির মূলে বিবেকানন্দের সেই বাণীই যে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান তাহা অস্বীকার করিবে কে?

'বিবেকানন্দের "কর্ম"-মন্ত্র যেমন মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্র হইয়াছে, তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণ-

---

৫৮। ibid., pp. 288-89 f.n.

বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-তত্ত্ব এযুগের এক মহাশক্তিমান সাধকের সাধনার সহায় হইয়াছে,—শ্রীঅরবিন্দ যে সেই সাধন-মন্ত্রেরই উত্তরসাধক, এ-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; তাঁহার নিজেরই রচনাবলীতে ইহার স্পষ্ট আভাস আছে।

'বিবেকানন্দের মতো সন্ন্যাসী অথচ দেশ-প্রেমিক ভারতবর্ষে পূর্বে আর দেখা যায় নাই।'[৫৯]

'নেতাজী যে এক অর্থে স্বামীজীর মানসপুত্র তাহাতে সন্দেহ নাই;...তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তিতত্ত্বকেও গৌণ করিয়া যে সাক্ষাৎ-মুক্তি স্বামীজীর অন্তরে একটি প্রবল শক্তিরূপে বিরাজ করিত, নেতাজীও সেই মুক্তিকে অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন—দুইজনের প্রেমও সেই মুক্ত-প্রাণের পরার্থ-প্রীতি।'[৬০]

বিংশ শতকে ভারতের কয়েকজন যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষের উপর স্বামী বিবেকানন্দের কিরূপ প্রভাব ছিল তাহার কিছু আভাস দিলাম। ধর্মজগতের বাহিরেও স্বামী বিবেকানন্দের অবদান কত বড় ছিল ইহা হইতে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইবে।

নবযুগের বার্তাবহ

স্বামীজী কেবল একজন একনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদীই ছিলেন না—তিনি একজন মহান আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং মানবতাবাদী। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ রূপ কি তাহা তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইউরোপে যখন তিনি প্রথমবার গিয়াছিলেন তখন তিনি আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ এবং তাহার ভয়াবহ ধ্বংসলীলা যেন প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি বলিয়াছিলেনঃ 'Europe is on the edge of a volcano. If the fire is not extinguished by a flow of spirituality, it will erupt.'[৬১] স্বামীজী মনে করিতেন, পাশ্চাত্যজগতের বাঁচিবার জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এবং সেই জ্ঞান দান করিবার মহান দায়িত্ব ভারতবর্ষকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি জানিতেন, বিজিত কোন দেশের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে এইরূপ উদারতা পাশ্চাত্যের নিকট আশা করা মহাভ্রান্তি। অতএব, মানবিকতা ও আন্তর্জাতিকতার স্বার্থেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ একান্ত প্রয়োজনীয়। বিশ্বসভায় যে-গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে ভারত বিধাতৃ-নির্দিষ্ট, যে ভূমিকা পালনের যোগ্যতা তাহাতে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত, তাহার বাস্তবায়নের জন্যও সর্বপ্রথম প্রয়োজন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। তাই স্বামীজী ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের উপর সর্বাগ্রে জোর দিয়াছেন। অনেক ভারতীয় নেতাই সেইসময় মানবতাবাদের তুলনায় জাতীয়তাবাদের আদর্শকে নিম্নস্থান দিয়াছেন। স্বামীজী কিন্তু তাহা করেন নাই। তিনি উহাদের একটিকে অন্যটির পরিপূরক ও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। স্বামীজীকে ভবিষ্যদ্দৃষ্টিসম্পন্ন মনে করিবার অনেক কারণ

৫৯। বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—মোহিতলাল মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ (১৩৬৯), পৃঃ ১৩৯-৪০

৬০। তদেব, পৃঃ ১৪৪

৬১। The Life of Swami Vivekananda, Vol. 2, p. 554

আছে। তিনি দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যখন গিয়াছিলেন, তখন মন্তব্য করিয়াছিলেনঃ 'Europe is a vast military camp.'[৬২] তিনি যে ইউরোপের আসন্ন দুর্যোগকেই শুধু দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহা নহে, কম্যুনিজমের উত্থান সম্বন্ধেও তিনি বহু পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন! সেই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি ভগিনী ক্রিস্টিনের কাছে বলিয়াছিলেনঃ 'পরবর্তী যে অভ্যুত্থানের ফলে যে নতুন যুগের সূচনা হবে তা ঘটবে রাশিয়া অথবা চীনে। কোন্‌টাতে ইহা প্রথম ঘটবে তা আমি স্পষ্ট বলতে পারছি না। তবে এই দুই দেশের একটিতে নিশ্চয়ই।'[৬৩] জগতের ইতিহাসের নিখুঁত পর্যালোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেনঃ পৃথিবীর সর্বত্র ক্রমান্বয়ে ধর্মীয় গোষ্ঠী, সামরিক গোষ্ঠী এবং বণিকশ্রেণীর প্রভুত্ব দেখা যায়। ভারতবর্ষে ইহাদের যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতিরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, শ্রমজীবী ও নিপীড়িত মানুষের—ভারতবর্ষে যাহারা শূদ্র বলিয়া অভিহিত তাহাদের—উত্থান হইতে চলিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেনঃ 'পৃথিবীতে এখন তৃতীয় যুগ চলছে বৈশ্যশ্রেণীর প্রভুত্বে। চতুর্থ যুগ আসবে শূদ্রদের প্রভুত্ব নিয়ে।'[৬৪] শূদ্র বলিতে স্বামীজী 'প্রলেতারিয়েত' অর্থাৎ শ্রমজীবী ও শোষিত জনসাধারণকে বুঝাইয়াছেন। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থেও তিনি এই শূদ্র জাগরণের কথা বলিয়াছেনঃ 'তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে,...সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।'[৬৫]

আমরা বর্তমানে তাঁহার দূরদৃষ্টির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। যে-দুইটি দেশের নাম তিনি করিয়াছিলেন, সেই রাশিয়া এবং চীন উভয়ত্রই শূদ্রজাগরণ অর্থাৎ শ্রমজীবী ও নিপীড়িত গণশক্তির উত্থান হইয়াছে। ঢাকাতে তাঁহার সহিত যে যুবকেরা দেখা করিয়াছিল, তাহাদের কাছে তিনি আরও অধিক কিছু বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন স্মৃতিচারণা করিয়া বলিয়াছেনঃ 'আরও আলোচনার পর ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা স্বামীজী যেন স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগলেনঃ "হ্যাঁ, পৃথিবীর শূদ্রদের অভ্যুত্থান ঘটবে। সামাজিক গতিশীলতার নির্দেশই এই, সেই হল শিবম্। নতুন পৃথিবী গঠনের জন্য সমগ্র প্রাচ্যভূমিতে নবজাগরণ ঘটবে, আজ দিবালোকের মতো তা স্পষ্ট। চেয়ে দেখো চীনের ভবিষ্যৎ, মহান অভ্যুত্থান এবং তার অনুসরণে সমগ্র এশিয়ার দেশসমূহের জাগরণ।" আমি বিনীতভাবে বললাম, তিনি কিভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেনঃ "তোমরা দেখতে পাচ্ছো না, আমি আবরণের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ছায়া প্রত্যক্ষ করছি। ভগবানের আশীর্বাদে এই অন্তঃশক্তি আমি অর্জন করেছি। অধ্যয়ন করো এবং ভ্রমণ করো, তা-ই হল সাধনা। দূরবীক্ষণের সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্‌রা যেমন নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, তদনুরূপ পৃথিবীর ঘটনাবলীর গতিও আমার দৃষ্টিপথে ধরা পড়ে! তোমরা আমার কাছ থেকে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে যাও, শূদ্রের অভ্যুত্থান প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং পরে চীনে। ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে তার পরেই এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

৬২। ibid., p. 553 ৬৩। Patriot-Prophet, p. 13
৬৪। ibid. ৬৫। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪১

গ্রহণ করবে এই ভারত।" '৬৬

এই সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত যে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে শূদ্ররা যে বিরাট ভূমিকা পালন করিবে, তাহা পূর্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াও স্বামীজী জনসাধারণের উন্নয়নের উপর এত বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের জনসাধারণকে তাহাদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তখন হইতেই প্রস্তুত করিয়া তোলা যাহাতে উপযুক্ত মুহূর্তে সমগ্র দেশের কল্যাণার্থে তাহাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে তাহারা সম্পূর্ণ যোগ্য প্রমাণিত হয়।

স্বামীজীর সমন্বয়

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনে স্বামী বিবেকানন্দ একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহন রায়ের অনুপ্রেরণায় বঙ্গভূমিতে সংস্কার-আন্দোলনের প্রবল উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল। ইংরাজীশিক্ষার প্রসারের সহিত পাশ্চাত্যসংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ঐ আন্দোলন সঞ্জীবনীশক্তি পাইয়াছিল এবং ত্বরান্বিত হইয়াছিল। সেই সময়কার সংস্কার-আন্দোলনে বৌদ্ধিক চেতনার (rational spirit) যে উন্মেষ লক্ষিত হইয়াছিল তাহার প্রথম ফসল হইল ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ শীঘ্রই হিন্দুসমাজের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বসিল। আবার ইংরাজী-শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুদের এক বিরাট সম্প্রদায় পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তিমত্তা ও অগ্রগতির আলোকচ্ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহারা সর্ববিষয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করিতে ছুটিল। প্রাচীন ভারতের সমস্ত চিন্তা, আদর্শ, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে তাহারা জীর্ণ বস্ত্রের মতো দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। বলিতে লাগিলঃ ঐ সকল আদর্শই বর্তমান ভারতের সকল দুর্গতির মূলে। কিন্তু ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এত সহজে মাথা নত করিতে সম্ভবত রাজী ছিল না। শীঘ্রই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সপক্ষে একটি গোঁড়া রক্ষণশীল সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। উভয়েই অন্ধ—নূতনেরা পাশ্চাত্যপ্রভাবে, ইহারা প্রাচীন ভারতের গৌরবে। ইহারা প্রাচীন ভারতের সবকিছুকেই, মন্দ দিকগুলিকেও, গৌরবান্বিত করিয়া দেখাইতে চাহিল। বলিলঃ পাশ্চাত্যের কাছ হইতে ভারতের কিছুই গ্রহণীয় নাই। আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে তো নয়ই, এমনকি বৌদ্ধিক এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও নয়। ভারতের সনাতন সংস্কৃতিই তাহাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইতে পারে। এই দুই পরস্পর বিবদমান দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিবেকানন্দ তাঁহার মাতৃভাষায় অননুকরণীয়ভাবে প্রকাশ করিয়াছেনঃ 'একদিকে নব্যভারত বলিতেছেন—পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্যসম্পন্ন হইব; অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—মূর্খ! অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহচর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়? একদিকে

৬৬। Patriot-Prophet, pp. 334-35

নব্যভারত বলিতেছেন—পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান!'[৬৭]

স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁহার কর্মজীবন শুরু করিতে চলিয়াছেন, তখন ভারতবর্ষের ইহাই ছিল অবস্থা। উপরোক্ত দুই বিরুদ্ধ ভাবধারার আবর্তে পড়িয়া ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ তখন হতবুদ্ধি। হেগেলীয় পরিভাষায় ঐ দুই ভাবধারাকে যথাক্রমে 'Thesis' এবং 'Anti-thesis' বলা যায়। পাশ্চাত্যপন্থী ভাবধারাটি 'Thesis' আর সনাতনপন্থী ভাবধারাটি 'Anti-thesis'। এবং বিবেকানন্দের কাছ হইতে দেশ যাহা পাইল তাহা 'Synthesis' বা সমন্বয়। বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেনঃ আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে এবং তাহার জন্য পাশ্চাত্যের নিকট হইতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করিতেই হইবে। হিন্দুদের অনেক প্রথা এবং কুসংস্কারের তিনি সুতীব্র সমালোচনা করিলেন, আবার যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ স্তুতি করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদেরও তিনি ছাড়েন নাই। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত হইলঃ '...ঘণ্টা ডাইনে বাজবে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দিম দুবার ঘুরবে বা চারবার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিন রাত ঘামতে চায়, তাহাদেরই নাম হতভাগা...।'[৬৮] 'গত ছয়-সাত শত বৎসর ধরিয়া কি ঘোর অবনতি হইয়াছে দেখ! বড় বড় কর্তা-ব্যক্তিরা শত শত বৎসর ধরিয়া এই মহা বিচারে ব্যস্ত—একঘটি জল ডান-হাতে কি বাঁ-হাতে খাইব, হাত তিনবার ধুইব না চারিবার, কুলকুচা করিব পাঁচবার কি ছয়বার! যাহারা সারাজীবন এইপ্রকার দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসায় ও এই-সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ বড় বড় দর্শন লিখিতে ব্যস্ত, তাহাদিগের নিকট আর কি আশা করিতে পারা যায়?'[৬৯] '"আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তাহলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে?" "১৪ বার হাতে-মাটি না করিলে ১৪ পুরুষ নরকে যায় কি ২৪ পুরুষ?"—এইসকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন আজ দু হাজার বৎসর ধরে। এদিকে 1/4 of the people are starving (সিকি ভাগ লোক না খেতে পেয়ে মরছে)। ৮ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বৎসরের পুরুষের বে দিয়ে মেয়ের মা-বাপ আহ্লাদে আটখানা। ...আবার ও কাজে মানা করলে বলেন, আমাদের ধর্ম যায়!'[৭০] 'একদিকে পাশ্চাত্য-বিদ্যার মদিরাপানে মত্ত হইয়া আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে; তাহারা প্রাচীন ঋষিগণের কথায় উপহাস করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট হিন্দুজাতির সমুদয় চিন্তা কেবল কতকগুলি আবর্জনার স্তূপ, হিন্দুদর্শন কেবল শিশুর আধ-আধ বুলি এবং হিন্দুধর্ম নির্বোধের কুসংস্কারমাত্র! অপরদিকে আবার কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা কিন্তু কতকটা বাতিকগ্রস্ত, তাঁহারা আবার উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত; তাঁহারা সব ঘটনাকেই

৬৭। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৭ ৬৮। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৭৯
৬৯। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৮ ৭০। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১০৭

একটা শুভ বা অশুভ লক্ষণরূপে দেখিয়া থাকেন। ঐ ব্যক্তি যে জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত তাহার, তাঁহার বিশেষ জাতীয় দেবতার বা তাঁহার গ্রামের যাহা কিছু কুসংস্কার আছে তাহার দার্শনিক আধ্যাত্মিক এবং সর্বপ্রকার ছেলেমানুষী ব্যাখ্যা করিতে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার নিকট প্রত্যেকটি গ্রাম্য কুসংস্কারই বেদবাণীর তুল্য এবং তাঁহার মতে সেইগুলি প্রতিপালন করার উপরই জাতীয় জীবন নির্ভর করিতেছে।'[৭১] 'পাশ্চাত্যদেশ শাইলকগণের অত্যাচারে আর্তনাদ করিতেছে; প্রাচ্যদেশ আবার পুরোহিতদের অত্যাচারে কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে। ধনী ও পুরোহিত পরস্পরকে শাসনে রাখিবে। মনে করিবেন না, ইহাদের মধ্যে মাত্র একটি দ্বারা জগতের কল্যাণ হইবে।'[৭২]

এইরূপে পাশ্চাত্য অনুকরণকারী নব্যগোষ্ঠী এবং সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টিপরায়ণ গোঁড়া সনাতনপন্থী উভয়কেই তীব্র নিন্দা করিয়া বিবেকানন্দ সিদ্ধান্ত দিয়াছেন: 'There are two great obstacles on our path in India, the scylla of old orthodoxy and the Charybdis of modern European civilization.'[৭৩] 'We have to find our way between the Scylla of old superstitious orthodoxy and the charybdis of materialism—of Europeanism. . . .'[৭৪]

প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ সমাজ এবং পাশ্চাত্যের জড়বাদ উভয়কেই প্রতিবন্ধক রূপে নির্দেশ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ অবশেষে সিদ্ধান্ত দিলেন যে, নবভারত গঠনের পথ খুঁজিতে হইবে সনাতন ভারতীয় সভ্যতা এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের মধ্য হইতেই।

স্বামীজীর ভারত-সংস্কারের আদর্শ

বলা বাহুল্য, নবভারত গঠনের সেই পথ বিবেকানন্দ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন—পূর্বে 'Synthesis' বলিয়া আমরা যাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের সংস্কার সাধনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যে-সকল চিন্তা করিয়াছেন এবং যে-সকল পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে তাহাদের সর্বত্র একটি সুর স্পষ্ট হইয়া উঠে। ভারতীয়দের ধর্মীয় চিন্তা ও সাধনা হইতে, সামাজিক নীতি ও প্রথা হইতে, তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থা হইতে; নারী ও নিম্নবর্ণীয়দের প্রতি আচার-আচরণ-দৃষ্টিভঙ্গি হইতে; এককথায় জীবনের সর্বক্ষেত্র হইতে তিনি সেই সকল বস্তুগুলি নির্মমভাবে দূর করিতে চাহিয়াছেন, যেইগুলি তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অসমঞ্জস এবং প্রতিকূল। কারণ, আধ্যাত্মিকতাকেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্রুবতারা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিকতার নিরিখেই ভারতবর্ষের সকল সংস্কারের উৎকর্ষ-অপকর্ষ, সাফল্য এবং ব্যাপ্তি নির্ধারিত হইবে। এবং এই আধ্যাত্মিকতা বলিতে তিনি বেদান্তের ধ্রুবসত্যগুলিকে উপলব্ধি করিবার কথাই বুঝাইয়াছেন।

৭১। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩ ৭২। তদেব, পৃঃ ৫১

৭৩। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, Ninth Edition (1964), p. 151

৭৪। ibid., p. 172

তিনি দেশের সংস্কার সাধনের জন্য যে-সকল পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। আমরা কেবল সংক্ষেপে সেই সময়কার নারীজাতি, নিম্নবর্ণের মানুষ এবং শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার দু-একটি বক্তব্য উপস্থিত করিব।

প্রথমে নারীদের কথা ধরা যাউক। স্বামীজী বলিয়াছেনঃ 'ভারতের দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো, আর "জাতি জাতি" করে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা।'[৭৫] সেইজন্য তিনি বলিতেনঃ 'মেয়েদের আগে তুলতে হবে, mass-কে (জনসাধারণকে) জাগাতে হবে; তবে তো দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।'[৭৬]

নারীদের প্রতি যে-অবিচার আমরা করিয়াছি, তাহার বিরুদ্ধে ক্ষোভে-দুঃখে ফাটিয়া পড়িয়া বহু সময় তিনি অগ্নিবর্ষণ করিয়াছেন। তাহার একটি নমুনা দিতেছিঃ 'আমরা মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে।'[৭৭] এইক্ষেত্রেও স্বামীজী পুনরায় বেদান্ত-তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়াছেন। মানুষ স্বভাবতই দৈবীসত্তাসম্পন্ন এবং দেহসীমানার ঊর্ধ্বস্থিত সেই দৈবীস্বরূপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে দেখা যায়, নারী-পুরুষ প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন-সত্তা। কারণ, উভয়েই প্রকৃতপক্ষে আত্মা। স্বামীজী বলিয়াছেনঃ 'যখন সর্বাবভাসক আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন দেখবি—এই স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হবে; তখনই মেয়েদের ব্রহ্মরূপিণী বলে বোধ হবে।'[৭৮]

সেই সময়কার নারীজাতির অবর্ণনীয় দুর্দশা সম্বন্ধে স্বামীজী পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, তাহাদের সমগ্র দুর্দশার কারণ হিসাবে তিনি অশিক্ষাকে নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি সেইজন্য বলিয়াছেনঃ নারীদের মধ্যে জাগরণ আনিতে হইলে তাহাদের উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিতে হইবে এবং তাহাদের সম্পর্কে পুরুষদের কর্তব্য ঐ শিক্ষাদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহার পরে নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে যাহাতে তাহারা নিজস্ব পছন্দমতো পথ বাছিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে পারে।

স্বামীজী সীতাকে এক আদর্শ নারীচরিত্র বলিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীদের উপর তিনি জোর করিয়া কোন আদর্শ চাপাইয়া দিতে চাহেন নাই। নারীদের তিনি স্বাধীনভাবে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলিতে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হইয়াছেঃ '...শিক্ষা পেলে মেয়েদের problems (সমস্যাগুলো) মেয়েরা নিজেরাই solve (মীমাংসা) করবে। আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হলে কেবল কাঁদতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সময়ে তাদের মধ্যে self-defence (আত্মরক্ষা) শেখা দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ দেখি ঝাঁসির রানী কেমন ছিল!'[৭৯] 'উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন—স্বাধীনতা। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ একথা বলিতে সাহসী হয় যে, আমি

৭৫। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩

৭৬। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৯ ৭৭। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১১

৭৮। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ২০৪ ৭৯। তদেব, পৃঃ ৪২৬

এই নারীর বা ঐ ছেলেটির মুক্তির জন্য সাধনা করিয়া দিব, তবে সেটি অতি অন্যায়, অত্যন্ত ভুল কথা। আমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, “আপনি বিধবাদিগের ও নারীজাতির উন্নতির উপায় সম্বন্ধে কি চিন্তা করেন?” এ প্রশ্নের আমি শেষ বারের মতো উত্তর দিতেছি—আমি কি বিধবা যে, আমাকে এই অর্থহীন প্রশ্ন করিতেছ? আমি কি নারী যে, আমাকে বারংবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কে যে, গায়ে পড়িয়া নারীজাতির সমস্যা সমাধান করিতে অগ্রসর হইতেছ? তুমি কি প্রত্যেক বিধবা ও প্রত্যেক নারীর ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বর? তফাৎ হও! তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই পূরণ করিবে।'[৮০]

শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজী বলিয়াছেনঃ 'মাথায় কতকগুলি তথ্য ঢুকানো হইল, সারাজীবন হজম হইল না, অসম্বদ্ধভাবে সেগুলি মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না। বিভিন্ন ভাবকে এমনভাবে নিজের করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ তৈরী হয়, চরিত্র গঠিত হয়। যদি তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র ঐভাবে গঠিত করিতে পারো, তবে যে-ব্যক্তি একটি গ্রন্থাগারের সবগুলি পুস্তক মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা তোমার অধিক শিক্ষা হইয়াছে বলিতে হইবে।'[৮১] তৎকালে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তিনি নিন্দা করিয়াছেন। কারণ উহার মধ্যে ভাল দিক কিছু কিছু থাকিলেও উহা মানুষ গড়ার শিক্ষা নয় এবং সম্পূর্ণভাবে নেতিভাবমূলক। যে-আধ্যাত্মিকতাকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মমূল বলিয়া মনে করিতেন, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি তাহার গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ঐহিক জ্ঞানের সহিত যদি আধ্যাত্মিক আদর্শের শিক্ষাও না দেওয়া হয়, তবে সেই শিক্ষার বিশেষ মূল্য নাই। 'আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি। এটি কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আমি আমার নিজের বা অপর কাহারও ধর্মসম্বন্ধে মতামতকে “ধর্ম” বলিতেছি না।'[৮২] স্বামীজী চাহিতেন, যে-শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার প্রকৃতি যেন সামগ্রিক হয়। চরিত্র গঠন, শরীরচর্চা, শিল্প-সংস্কৃতির অনুশীলন, কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান যেন শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য হয়। ব্রহ্মচর্যপালন এবং আদর্শ শিক্ষকের সান্নিধ্যলাভ—এই দুটিকে তিনি সুশিক্ষালাভের অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্রহ্মচর্য ও নির্ভীকতার উপর তিনি জোর দিয়াছেন। তিনি একটি স্ত্রীমঠের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যেখানে নারীদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হইবে। সেই মঠের শিক্ষাসূচীতে থাকিবে ধর্মীয় শাস্ত্র, সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য, সেলাই, রন্ধনবিদ্যা, গৃহস্থালি এবং সন্তান-প্রতিপালন। ছাত্রজীবনের নিয়মিত অঙ্গ হইবে পূজা ও ধ্যান।

শিক্ষার সম্পূর্ণ আদর্শটির সারাংশ স্বামীজী একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেনঃ 'শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।'[৮৩] 'শিশু নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে। তবে তাহাকে তাহার নিজের ভাবে উন্নতি করিতে

৮০। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৩৮ ৮১। তদেব, পৃঃ ২০০

৮২। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৮২ ৮৩। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪০০

আপনারা সাহায্য করিতে পারেন। সাক্ষাৎভাবে কিছু দিয়া আপনারা তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন না, তাহার উন্নতির বিঘ্নগুলি দূর করিয়া পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতে পারেন। নিজস্ব নিয়মানুসারেই জ্ঞান তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মাটিটা একটু খুঁড়িয়া দিন, যাহাতে অঙ্কুর সহজে বাহির হইতে পারে; চারিদিকে বেড়া দিয়া দিতে পারেন, যেন কোন জীব-জন্তু চারাটি না খাইয়া ফেলে; এইটুকু দেখিতে পারেন, অতিরিক্ত হিমে বা বর্ষায় যেন উহা একেবারে নষ্ট হইয়া না যায়—ব্যাস্, আপনার কাজ ঐখানেই শেষ। উহার বেশী আপনি আর কিছু করিতে পারেন না। বাকিটুকু অন্তর্নিহিত প্রকৃতির বহির্বিকাশ। শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধেও এইরূপ। শিশু নিজে নিজেই শিক্ষা পায়।'[৮৪]

বর্তমান ভারতে শিক্ষা লইয়া যেসকল ভাবনা চিন্তা চলিতেছে তাহা হইতে মনে হয় স্বামীজীর শিক্ষাসম্পর্কীয় বাণীগুলি বাতাসে হারাইয়া যায় নাই।

ইহার পর জাতিভেদপ্রথা লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। স্বামীজী দেখাইয়াছেন ঃ জাতিভেদপ্রথা বস্তুত সামাজিক গোষ্ঠীবিভাগ এবং এইরূপ গোষ্ঠীবিভাগ পৃথিবীর সর্বত্র, এমনকি ইউরোপেও দেখা যায়। কিন্তু অন্যান্য দেশের জাতিভেদপ্রথা এবং ভারতের জাতিভেদপ্রথার মধ্যে বিরাট মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। '...অন্য সব দেশে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়েরা। ...ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেন প্রশান্তচিত্ত পুরুষগণ—শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, সাধক ও মহাপুরুষেরা।'[৮৫] 'ধনসম্পদ বা তরবারি দ্বারা নয়—আধ্যাত্মিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শোধিত বুদ্ধি দ্বারাই এই আর্যজাতি অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে সমগ্র ভারতবর্ষকে চালিত করিয়াছিল। ভারতের প্রধান জাতি আর্যদের শ্রেষ্ঠ বর্ণ—ব্রাহ্মণ।'[৮৬] 'জাতিবিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি অন্য কাজ করিতে পারো। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পারো, আমি একজোড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না। তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পার? আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি? এই কার্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করিতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু। তাই বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না।'[৮৭] 'মূলে "জাতি"র অর্থ ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ প্রকৃতি, নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই অর্থই প্রচলিত ছিল—এমনকি, খুব আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই; আর প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। তবে ভারতের পতনের কারণ কি? জাতি সম্বন্ধে এই ভাব পরিহার। ...বর্তমান বর্ণবিভাগ (caste) প্রকৃত "জাতি" নহে, বরং উহা জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক। ...কোন বদ্ধমূল প্রথা বা জাতিবিশেষের জন্য বিশেষ সুবিধা বা কোন আকারের বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগ প্রকৃত

৮৪। তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ১৫৪

৮৫। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮

৮৬। তদেব ৮৭। তদেব, পৃঃ ১৩৭-৩৮

"জাতি"কে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইতে দেয় না...। অতএব আমি আমার স্বদেশবাসিগণকে ইহাই বলিতে চাই যে, "জাতি" উঠাইয়া দেওয়াতেই ভারতের পতন হইয়াছে। প্রাণহীন অভিজাত অথবা সুবিধাভোগী শ্রেণী-মাত্রই "জাতি"র প্রতিবন্ধক—উহা "জাতি" নহে। জাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে যাহা কিছু বিঘ্ন আছে, সব ভাঙিয়া ফেলা হউক—তাহা হইলেই আমরা উঠিব।'[৮৮]

স্বামীজী যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা হইল ঃ অতীতের জাতিভেদপ্রথা বাস্তবিক শ্রমবিভাগ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সমাজের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া বিভিন্ন মানুষের যোগ্যতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন কর্ম নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ প্রথা অনেক নমনীয় ছিল। জাতি স্থির হইত কর্মের ভিত্তিতে— বংশানুক্রমিক পদ্ধতিতে নহে। কিন্তু কালক্রমে জাতিবিভাগ-পদ্ধতি তাহার মূল আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। কর্মভিত্তিক জাতিপ্রথা বংশানুক্রমিক জাতিপ্রথায় পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমানে ব্রাহ্মণোচিত গুণের অধিকারী না হইলেও কেবলমাত্র জন্মসূত্রেই মানুষ ব্রাহ্মণোচিত সম্মান পাইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, উহার বলে সে নিম্নবর্ণের উপর অত্যাচারও চালাইয়া থাকে। এইরূপে একদা যে প্রথাটি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থেই উদ্ভূত হইয়াছিল, বহু বছর তাহা নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়া বর্তমানে বিকৃতরূপ ধারণ করিয়া বিভেদ ও অনৈক্যের কারণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান জাতিপ্রথা সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন ঃ '...পুরোহিতগণ যতই আবোল-তাবোল বলুন না কেন, জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া কিছুই নহে। উহা নিজের কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের হারানো সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ফিরাইয়া আনা যায়।'[৮৯] স্বামীজীর মতে, জাতিভেদপ্রথার এই আদর্শগত বিকৃতি ভারতবর্ষের পতনের অন্যতম কারণ। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে (অর্থাৎ প্রথমবার পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর) তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিয়াছিলেন ঃ '...আমার দিন দিন দৃঢ় ধারণা (হইতেছে) এই যে, জাতি-বুদ্ধিই মহাভেদকারী...।'[৯০] 'আধুনিক জাতিভেদ ভারতের উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক। উহা সঙ্কীর্ণতা ও ভেদ আনয়ন করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একটা গণ্ডি কাটিয়া দেয়।'[৯১] তবে তিনি আশা পোষণ করিয়াছেন ঃ 'চিন্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে।'[৯২]

স্বামীজীর বজ্রনির্ঘোষ বিশেষ করিয়া গর্জিত হইয়াছিল অস্পৃশ্যতার উদ্দেশ্যে। 'আমরা এখন বৈদান্তিকও নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই, আমরা এখন কেবল "ছুঁৎমার্গী", আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে। ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর, আর ধর্মমত—"আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি মহাপবিত্র!" যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলাগারদে যাইতে হইবে!'[৯৩] 'আমাদের

৮৮। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৯২-৩ ৮৯। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪
৯০। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৯১ ৯১। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮
৯২। তদেব ৯৩। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৮

কি আর ধর্ম? আমাদের "ছুঁৎমার্গ", খালি "আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না"। হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু-হাজার বৎসর খালি বিচার করছে—ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে; ডান দিক থেকে জল নেব, কি বাঁ থেকে...তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে? ...যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য!'[৯৪]

ভাবিতে অবাক লাগে হিন্দুধর্ম যাঁহাকে তাহার পরিত্রাতারূপে পাইয়াছে, উপর্যুক্ত বাক্যগুলি তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ইহার কারণ, তিনি দেখিয়াছিলেন, কিছু কিছু বিরুদ্ধভাব হিন্দুধর্মের প্রাণ রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি সেই ভাবগুলিকে নির্মমভাবে উৎপাটন করিয়া হিন্দুধর্মের মূল আদর্শগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

উপসংহার

আধুনিক ভারতের নির্মাণে স্বামী বিবেকানন্দ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে এই নিবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। তিনি প্রাচীনকে সম্পূর্ণ বর্জন বা গ্রহণ করেন নাই, নূতনের শুভ দিকগুলিকে স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই—প্রাচীন এবং নূতনের সমন্বয় করিয়াছেন তিনি। ভারতের জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে তিনি একটি নূতন যুগের সূচনা করিয়াছেন এবং তাহা করিয়াছেন প্রাচীন ও নবীন উভয়ের মন্দ দিকগুলিকে দূর করিয়া এবং উভয়ের শুভ দিকগুলিকে জারিত করিয়া। ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবিত সংস্কারপন্থী এবং ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উদ্ভূত রক্ষণশীল হিন্দু গোষ্ঠী—এই উভয়ের মধ্যে যে-ভাবসঙ্ঘর্ষ দেখা দিয়াছিল, তিনি সমন্বয়ের পথে সেই সঙ্ঘর্ষের সমাধান করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তিনি যেমন তৎকালে বিরাজিত দুইটি পরস্পর-বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে সমন্বয় করিয়াছেন, অনুরূপ সমন্বয় তিনি করিয়াছেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বিপরীত ভাবাদর্শের মধ্যেও। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য যদি তিনি প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতা এবং পাশ্চাত্যের জড়সংস্কৃতির যুগপৎ অনুশীলনের কথা বলিয়া থাকেন, পাশ্চাত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যও তিনি একই কথা বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের মানুষের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা যতটা প্রয়োজন পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে ঠিক ততটাই প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতার। এই দুইটির একটিকে—জড়সভ্যতাকে—সম্পূর্ণ বর্জন করিতে গিয়া ভারতবর্ষের অধঃপতন হইয়াছিল। স্বামীজী পাশ্চাত্য দুনিয়াকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন: যদি তাহারা আধ্যাত্মিকতাকে উপেক্ষা করিয়া শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রগতিকেই সর্বস্ব করিয়া তোলে তবে তাহাদেরও ধ্বংস অনিবার্য। বিগত দুই মহাযুদ্ধ এবং বর্তমানকালে শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের

৯৪। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১১

যে প্রতিযোগিতা লক্ষিত হইতেছে—তাহা হইতে মনে হয় স্বামীজী ভুল বলেন নাই।

স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের নৈতিক বলও দিয়াছে। ঐ ভবিষ্যদ্বাণী হইতেই আমরা প্রথম শিখিলাম যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখে আমাদের নিজেদের কোনরূপ হীনম্মন্যতাবোধ জাগা উচিত নয়। পাশ্চাত্য যদি জড়সভ্যতায় ভারতবর্ষ অপেক্ষা উচ্চস্থানে আসীন হইয়া থাকে এবং ভারতবর্ষকে নিজের সমকক্ষ হইবার জন্য সাহায্য করিতে চায়—ভারত ভিক্ষুকরূপে সেই সাহায্য গ্রহণ করিবে না। বিনিময়ে তাহারও এমন কিছু দিবার আছে, যাহা না পাইলে প্রতীচ্য সভ্যতার সৌধ ধূলায় মিশিয়া যাইবে। অতএব ভারতবর্ষ আদান-প্রদানের নীতি অনুসরণ করিবে। তাহার শির চির-উন্নত থাকিবে। কারণ, যে-সম্পদ তাহার রহিয়াছে, তাহার বলে এইটুকু সে বলিতে পারে যে, পাশ্চাত্যের তুলনায় সে কোন অংশে হীন নয়। এই মহা সত্যটি ঘোষণা করিয়া স্বামীজী ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদকে এক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

স্বামীজী মনে করিতেন : বর্তমানে ভারতের সম্মুখে মহান ব্রত হইল পাশ্চাত্যকে আধ্যাত্মিকতা দান। আমেরিকাতে তিনি এই কাজের ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সচেতন ছিলেন যে, যতদিন ভারতবর্ষ পরাধীন থাকিবে, ততদিন সে এই ব্রত যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন দেশ। স্বাধীন ভারতবর্ষের এখন কর্তব্য স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ ব্রতের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং যে সুদৃঢ় ভিত্তি তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপরে জাতীয় জীবনের গৌরবময় সৌধ গড়িয়া তোলা।

স্বামী বিবেকানন্দের অবদান

স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল কর্মকাণ্ডের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল আমার তেরো বৎসর বয়সে, তাঁহার রচনাবলীর মাধ্যমে। সেটি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার কিছুদিন পূর্বে তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক আমি তাঁহার কাছে তখন কি পাইয়াছিলাম ? প্রথমতঃ একটি অসীমের অনুভূতি। সেইসঙ্গে এই বোধ যে, প্রতিটি মানুষেরই প্রয়োজন ও কর্তব্য নিজের অভ্যন্তরে সেই অসীমকে অনুভব এবং একটি স্বাভাবিক নৈতিক ও পরার্থপর জীবনের অনুশীলনের মাধ্যমে অন্তঃস্থ সেই অসীমের সহিত সুরসঙ্গতি রাখিয়া চলা।

বিবেকানন্দ সেই সময়ই আমার কাছে প্রতিভাত হইলেন এমন একজন ব্যক্তিরূপে—মানুষের দুঃখবেদনায়, বিশেষতঃ ভারতবাসীর দুঃখবেদনায় যিনি প্রবলভাবে আলোড়িত। উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁহার বজ্রনির্ঘোষ আমাদের অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত মথিত করিয়া তুলিয়াছিল। মানব-মহিমার স্বরূপ—বিশেষতঃ ভারতীয় সমাজে যাহারা নিন্দিত ও বঞ্চিত তাহাদের মহিমা তিনি আমাদের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহারই সহিত তিনি ভারতের বেদান্তনিহিত মহত্তম ও প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলির মূল্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করাইয়া দিলেন। তিনি আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ বেদান্তদর্শনের মধ্যে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহার একটি চিরন্তন মূল্য আছে এবং তাহা শুধু ভারতের জন্যই নহে, সমগ্র মানবজাতির জন্য। ইহার ফলে আমাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল ; সৃষ্টি হইয়াছিল এক নূতন ধরনের উদ্দীপনার যাহার মূলে ছিল একটি বোধ যে, আমরা সেই জনসমষ্টির অন্তর্গত—মানবজাতির সেবায় চিরকাল যাহারা এক পবিত্র জীবনব্রত পালন করিয়া আসিয়াছে। হিন্দুজাতি আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছিল ; বিবেকানন্দই আমাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইতে সাহায্য করিয়াছেন। সেই সময় আমাদের চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেকেই অযৌক্তিক নির্মম সমালোচনা করিতেন। বিশেষতঃ তাহা করিতেন প্রাচীনপন্থী খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ। বিবেকানন্দ এগুলির মূলোচ্ছেদ করিলেন। এই সকল কারণেই আমরা তাঁহাকে অন্তরের নিকটে স্থান না দিয়া পারি নাই। এই কারণেই আমরা তাঁহাকে একজন মহান আচার্য বলিয়া মনে করি।

॥ ১ ॥

ভারত-ইতিহাসের সূচনাপর্ব হইতেই বিভিন্ন উপায়ে ভারতবর্ষ মানুষের সেবা করিয়া আসিয়াছে এবং মানুষের আত্মোপলব্ধি ও সুখের জন্য সর্বস্ব দান করিয়াছে, আধুনিক কালের ভারতবাসী ইঁহার জন্য বিনয়-নম্র গর্ববোধ করিতে পারেন। অন্তর্দৃষ্টি, পরমত-সহিষ্ণুতা, অপরের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, শান্তি, সহযোগিতা, প্রেম,

মানবসেবা প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারত একটি বিশেষ পন্থায় তাহার ভবিষ্যৎকে সার্থক ও সফল করিতে চাহিয়াছিল। যে বেদের মধ্যে দেহ, মন ও আত্মা সম্পর্কীয় ভারতের প্রাচীনতম ঐতিহ্য ও ধ্যানধারণা নিহিত আছে, সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে এদেশে লোকশিক্ষক, জননেতা, মুনি-ঋষি, সন্ত-সাধক, বস্তু-বিজ্ঞানী, মননশীল মনীষী ও কর্মীদের আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে সকলের ভাবাদর্শই ভারতের গৌরবময় ঐশ্বর্য ও বিস্ময়কর ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে। বুদ্ধদেবের উক্তি হইতেছে 'ধর্মদান সর্বদানের উপরে'। মিশর, মেসোপটেমিয়া, গ্রীস, রোম, ইরান, চীন, আরব, মোঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দেশের মতো ভারতবর্ষও বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, দর্শন, শিল্পকলা, সংগঠন ও কর্মযোগের নানা বিচিত্র ব্যাপার বিশ্ববাসীকে দিয়াছে, কিন্তু চিন্তা ও মানসিক সমন্বয়ের জগতেই ভারতের বিশিষ্ট ভূমিকা স্মরণীয়। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে এবং উপনিষদের যুগে—অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জগৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ তাহার নিজস্ব weltanschauung অর্থাৎ জীবনদর্শন ও আচার-আচরণের বিশেষ বিকাশ সাধন করিয়াছে। এই জীবনাদর্শ উপলব্ধি করিবার পরই ভারতবর্ষ ইহাকে বিশ্বে সঞ্চারিত করিবার ব্রত লইয়াছে; এই আদর্শের নাম দেওয়া যায়, Indianism বা ভারতীয়তা অথবা 'ভারত-ধর্ম'—ভারতীয় আদর্শকে কর্মের মধ্য দিয়া উপলব্ধির চেষ্টা। বুদ্ধিগত হেতুবাদ ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের দ্বারা লব্ধ এমন কয়েকটি ধারণা ও আচরণের উপর এই ভারতীয় পন্থা বা 'ভারত-ধর্ম' প্রতিষ্ঠিত, যাহার উদার প্রয়োগ ও প্রভাব দেশ-কাল-পাত্রকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, ভাগ্যের উত্থান-পতন এবং পুনঃপুনঃ আদর্শচ্যুতি সত্ত্বেও চিন্তাশীল লোকশিক্ষক ও সমাজ-সংগঠকদের কৃপায় 'ভারত-ধর্ম' বা ভারতীয়ত্বের মর্মবাণীটি আমরা আজও বজায় রাখিতে পারিয়াছি।

যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ 'ভারত-ধর্ম' অনুশীলনের জন্য সমগ্র জীবন দান করিয়াছেন, তাঁহাদের মতানুসারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভারতীয় জীবনদর্শনের মৌলিক তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে:

(১) সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত, জগদ্ব্যাপী ও জগদতীত এক অখণ্ড নিত্যবস্তুতে বিশ্বাস।

(২) জীবাত্মা বা ব্যক্তিচৈতন্য এই নিত্যবস্তু বা ব্রহ্মস্বরূপের অংশীভূত এবং ইহার উপলব্ধিই জীবের একমাত্র লক্ষ্য।

(৩) ভারতীয় চিন্তাধারা এই নিত্যবস্তু সম্বন্ধে কোন যুক্তিহীন ও বদ্ধমূল মতবাদে বিশ্বাসী নহে, বরং ব্যক্তির বুদ্ধি ও অধ্যাত্মশক্তি এবং সাধনানুসারী বহুবিধ বিভিন্ন মতের স্বাধীনতাকেই স্বীকার করিয়া থাকে।

(৪) ইহার ফলে, কোন ঐক্যমতাবলম্বী আদর্শ ও ধর্মপন্থা সকলের উপর বলপূর্বক আরোপিত হয় নাই, বরং ইহাতে উদারতম সহনশীলতা এবং চিন্তা, দর্শন ও ঈশ্বরোপাসনার অসীম স্বাধীনতা সূচিত হইতেছে।

(৫) জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ—ইহাদের যে কোনও একটি বা একাধিক পথের মাধ্যমে নিত্যবস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে।

বহুবিধ জাতি-সংমিশ্রণে ভারতের ইতিহাস ও সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাতে এমন সমস্ত শ্রেণীবিন্যাস ও আশ্রমব্যবস্থা, বিশেষ ধরনের ধর্মীয় কৃত্য ও আচার-বিচার বিকাশলাভ করিয়াছিল, যেগুলিকে কোনও দিন অপরিবর্তনীয় ও মৌলিক বলিয়া মনে করা হয় নাই। কর্মবাদ, সংসার অর্থাৎ আত্মার দেহান্তর গ্রহণ ও অহিংসা প্রভৃতি কতকগুলি মতবাদ ও আচরণকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। জীবনের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের যথাযথ সাধনকেই মানুষের পুরুষার্থ বলা হইয়াছে।

ইহাকেই ভারতীয় জীবনাদর্শ বলে। ভারতীয় আদর্শ বা 'ভারত-ধর্মে'র মূল কথা—নিত্যবস্তুর একত্ববোধ এবং বিশ্বপ্রপঞ্চের সমস্তর সমন্বয়, এই বোধের সংজ্ঞা ও সূত্র বেদ, উপনিষদ্ এবং মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত ভগবদ্গীতায় পাওয়া যাইবে—ইহাই বাহ্যতঃ ভারতের 'বেদান্তদর্শন'। পৃথিবীতে এমন কোনও ধর্মবিশ্বাস নাই যাহাতে পরিস্ফুট অথবা প্রচ্ছন্নভাবে বেদান্তানুসারী তত্ত্বকথার কিছু না কিছু নিহিত নাই। বিগত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া বেদান্ত ও ইহার নানা শাখাপ্রশাখা ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় মধ্যমণি বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ এই দর্শনের মূল তাৎপর্য প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনে প্রয়োগ করিয়াছে; ভারতের বাহিরে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও ইহার অর্থ অনুধাবন ও উপলব্ধি করিয়াছেন। নানা দেশের সূক্ষ্ম চিন্তাধারা বিভিন্ন সময়ে এইরূপ ভাবাদর্শে, বিশেষতঃ চৈতন্যের সর্বব্যাপী একত্বে উপনীত হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্যজগতের বিখ্যাত ইংরাজ লেখক ও চিন্তানেতা আলডুস হাক্সলি (Aldous Huxley) তাঁহার Perennial Philosophy অর্থাৎ 'শাশ্বত দর্শন' অথবা 'সনাতন ধর্ম' নির্ণয়ে বেদান্তের এই সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত বিশ্বাসকেই অবলম্বন করিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভারত এবং ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট অঞ্চলে একত্বে বিশ্বাসী ভাবাদর্শ ও পরমত-সহিষ্ণুতা বিশেষভাবে কার্যকর হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমে ইহার স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে সকলে অবহিত হইতে পারেন নাই; কারণ সেখানে অলীক গালগল্প-সমন্বিত সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত ধর্ম এবং যুক্তিবিরোধী জ্ঞান-বিশ্বাস লোকচিত্তে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, মানুষের মুক্ত-বুদ্ধি ও স্বাধীন জিজ্ঞাসা কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষেও আমরা মাঝে মাঝে এই ভারত-তত্ত্ব বা 'ভারত-ধর্ম'কে হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাই আমাদের দেশে যুগে যুগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ন্যায় লোকশিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছে। ইঁহারা ব্রহ্মের সর্বব্যাপী একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং সাধারণ লেখা, গান ও কথার মাধ্যমেই এই তত্ত্বের জ্যোতির্ময় স্বরূপ প্রচার করিয়া পরব্রহ্মের সঙ্গে জীবের একত্ব-তত্ত্ব অনির্বাণ দীপশিখায় ভাস্বর করিয়া রাখিয়াছেন। নিজ নিজ বিশিষ্ট পদ্ধতিতেই তাঁহারা এই সমস্ত তত্ত্বোপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। এক এক যুগের নরনারীগণের ও তাহাদের সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজনানুসারে ইঁহারা উদ্দিষ্ট তত্ত্বকে বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার ও ভাষায় সজ্জিত করিতেন। এইজন্য ভারতে আমরা বিচিত্র প্রতিভার ও বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মুনি-ঋষি, জিন-বুদ্ধ, ভক্ত-যোগী নয়ন্মার, অঝ্বার এবং সূফী পীর-মুর্শিদদের লাভ করিয়াছি। অন্যান্য দেশেও Akhenaten (আখেন-আতেন), Moses (মুসা), Isaiah (ইশায়াহ), Lao-tsze (লাউ-ৎসে), Confucius (কনফুশিউস), Mo-tsze (মো-ৎসে), Zarathushtra

(জরথুস্ত্র), Pythagorus (পিথাগোরাস), Socrates (সোক্রাতেশ), Plato (প্লাতোন), Jesus Christ (যীশুখ্রীষ্ট), নবী মুহম্মদ এবং মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ অধ্যাত্মবাদী লোকশিক্ষকগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

গীতায় আছে, মানবহিতার্থে জগতে ধর্ম-সংরক্ষণের জন্য ও অধর্মের দূরীকরণের জন্য অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এবং অজ্ঞান ও পাপের নাশের জন্য ভগবান পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হন। ঐশী নির্দেশে গত শতাব্দীতে এই ব্যাপার আর একবার সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের যুগ্মসত্তা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়া যাওয়ায়, এযুগে আবার নূতন করিয়া মানুষের জীবনে নিত্যবস্তুঘটিত তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন হইল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষায় প্রাচীন মুনি-ঋষিদের তত্ত্বদর্শন, বেদান্ত এবং অন্যান্য দেশের অনুরূপ চিন্তাপ্রণালী সমন্বয়লাভ করিয়াছে।

সমগ্র বিশ্ব ও ভারতবর্ষের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে বিবেকানন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যের অন্তরশায়ী নিদ্রিত গুণ ও শক্তিকে জাগরিত করিয়া বাহিরে আনিলেন, নিদ্রিত সিংহকে জাগাইয়া দিয়া তাঁহার আত্মার ক্ষুধা দূর করিলেন। বিবেকানন্দ যেমন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, তেমনি গুরুর নির্দেশে ভারতের সমাজ-নির্যাতিত দীনদুঃখী মানবের সেবায় এবং পাশ্চাত্যদেশের ঈশ্বরচেতনায় উদাসীন বা অজ্ঞ জনসাধারণের চিত্তের উদ্বোধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করিয়া তিনি ঐকান্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করিয়াছেন, এবং দরিদ্রতম অসহায় ভারতবাসীর দুঃখদুর্দশা নিজে মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া, তাহার প্রতিবিধানে তাঁহার দেহ ও মনের সমস্ত নিরুদ্ধ কর্মশক্তিকে প্রয়োগ করিয়াছেন ; ইহাদিগকে সর্বপ্রথম বাস্তব জীবনে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি, নীতি ও অধ্যাত্ম জগতে মানুষের অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। এইভাবে গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে বিবেকানন্দ ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ জননেতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন।

॥ ২ ॥

আমি যখন বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখন মাঝে মাঝে নিজেকেই প্রশ্ন করি, বিবেকানন্দ আমার জন্য কি করিয়াছেন ; আমার দেশবাসীদের সম্বন্ধে তিনি কি করিয়াছেন ; এবং সমগ্র মানবজাতির জন্যই-বা কি করিয়া গিয়াছেন?

তিনি আমার জন্য কি করিয়াছেন, তাহা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, অন্য কোন উপযুক্ত সময়ে তাহার আলোচনা চলিতে পারে। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারি। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে আমার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন যে, আমি নিজের সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে সচেতন হইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, আমি কি, আমার দেহ-মন-আত্মার দিক হইতে কি হওয়া মানুষ বলিয়া আমার পক্ষে অপেক্ষিত। তাঁহারা আমার চিত্তের ও আত্মার রিক্ততা হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া এমন কিছু তাৎপর্যপূর্ণ অর্থবহ সদ্বস্তুর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন, যাহার ফলে আমার মধ্যে চিন্তা ও কর্মের আকাঙ্ক্ষা

জাগ্রত হইয়াছে। উপনিষদ্ ও গীতায় যাহাকে 'সনাতন ধর্ম' বা 'শাশ্বত দর্শন' (আলডুস হাক্সলির Perennial Philosophy) বা বেদান্ত বলা হয়, এবং অতীত ভারতে ভূয়োদর্শন ও বর্তমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা—ইহারই অভিমুখে তাঁহারা আমাকে পরিচালিত করিয়াছেন ; সংশয় ও নৈরাশ্য এবং আশা ও আশঙ্কার মানসিক সঙ্কটে কেবল এই তত্ত্বই অধ্যাত্ম ও অধিমানসের মধ্যে একপ্রকার সমানুপাত রক্ষা করিতে পারে। সৌভাগ্যবশতঃ কৈশোর হইতেই আমি স্বামীজীর বাণী ও রচনা পাঠ করিয়াছি, চিন্তা করিয়াছি, তাঁহার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছি—আমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা তাঁহার বাণীর দ্বারাই বিকাশলাভ করিয়াছে। অনুরূপভাবে আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও রচনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছি। পরবর্তীকালে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কবিগুরুর তিরোধান পর্যন্ত, দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল ; ইহার ফলে সৌন্দর্যচেতনা, অধ্যাত্মবোধ ও বিশ্বমানবতার মধ্য দিয়া সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া মনন ও সৌন্দর্যবোধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমার ব্যক্তিত্ব নীরস হইয়া যায় নাই, প্রাণদ সূর্যকর ও জলবিন্দুর সহায়তায় চিত্তকুসুমের দলগুলি কিয়ৎ পরিমাণে বিকশিত হইতে পারিয়াছে।

॥ ৩ ॥

বিবেকানন্দ তাঁহার স্বদেশের জন্য কি করিয়াছেন ? সর্বপ্রথমে তিনি দেশবাসীকে ক্লৈব্য হইতে, জড়ধর্মী তমোগুণ হইতে, আত্মঘ্ন আত্মতৃপ্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। বিশ্বদ্রষ্টা অবতারপুরুষের মতো দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে তিনি বহু শতাব্দী পরে দেখাইয়া দিলেন যে, বেদান্তাশ্রয়ী হিন্দুধর্ম বর্তমানকালের সম্পূর্ণ উপযোগী ; পরাচেতনা-সম্পর্কিত যে-কোনও নৈষ্ঠিক চিন্তা ইহাতে সাদরে গৃহীত হইতে পারে, পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালে এই আদর্শ মানুষকে সৎ-জীবনের অভিমুখে পরিচালিত করিবে। তাঁহার অগ্নিবাণীর স্পর্শে আমাদের জড়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়তা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। যে দর্শন মানুষকে দেবতা বলিয়াছে, তাহার ভ্রান্তব্যাখ্যার ফলে আমরা আমাদের ভাইয়ের প্রতি, আমাদেরই আত্মার অপর প্রকাশের প্রতি অবিচার করিয়াছি। তাই তিনি এই সমস্ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আমাদের আহ্বান করিয়াছেন।

বিবেকানন্দ প্রথমতঃ আমাদের জীবন হইতে বহু ভ্রান্ত সংস্কার দূর করিয়া দিলেন। জগতের সামনে তিনি মূল হিন্দুধর্মের একটি সংজ্ঞা উপস্থাপিত করিলেন এবং ইহার দ্বারা তিনি কেবল ভারতেরই নহে, সমগ্র মানবজাতিরই প্রভূত কল্যাণ সাধন করিলেন। তিনি আমাদিগকে হিন্দুধর্মের সেই সকল মূল সত্যের প্রতি আস্থাবান হইতে বলিলেন, আধুনিক পৃথিবীতে শুধু ভারতবাসীদের জন্যই নহে, অন্য দেশবাসীদিগের জন্যও যে-সত্যসমূহের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। আমরা প্রায়শই সামাজিক প্রথা ও শিষ্টাচার সমূহকে ধর্ম বলিয়া ভুল করিয়া থাকি। তিনি আমাদিগকে এই 'লৌকিকধর্ম' ছাড়িয়া 'নিত্যধর্মে'র প্রতি মনোযোগী হইতে বলিলেন—যাহা শাশ্বত সত্য, সর্বযুগে সর্বদেশেই সত্য, তাহার

প্রতি মনোনিবেশ করিবার কথাই তিনি বলিলেন। ভারতে যাহা 'জাতিভেদপ্রথা'রূপে কথিত, বিবেকানন্দ ছিলেন তাহার আপসহীন শত্রু। অস্পৃশ্যতা বস্তুটিকে তিনি সর্বদাই ঘৃণা করিয়াছেন—তাহা একজন সন্ন্যাসীর দৃষ্টিকোণ হইতেই হউক কিংবা একজন সাধারণ হিন্দুর দৃষ্টিকোণ হইতেই হউক। ভারতীয় ইংরাজীতে আজকাল প্রায়ই 'ডোন্ট-টাচ্ইজম' বলিয়া একটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শব্দটি তাঁহার সৃষ্টি। জনসাধারণের প্রতি ভালবাসা এবং করুণায় তাঁহার হৃদয় প্লাবিত হইয়াছিল। তিনি তাহাদের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসাবে, বেদান্ত-বিশ্বাসীরূপে—যে-বেদান্ত সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। ভারতীয় ভাষার জন্য তিনি একটি নূতন শব্দ চয়ন করিয়াছেন—'দরিদ্র-নারায়ণ'। কথাটির অর্থঃ 'দরিদ্র এবং অনুন্নতদের মধ্যস্থিত ভগবান।' সমগ্র ভারতবর্ষ এই শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছে এবং এক অর্থে ইহা সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের দায়িত্ববোধ জাগাইয়াছে। এই দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রত্যেকটি মানুষ দরিদ্র, অনুন্নত, পীড়িত ও হতাশাগ্রস্তদের ঈশ্বরের মূর্তিমান বিগ্রহ অথবা ঈশ্বরের অংশরূপে দেখিবে। তাহাদের সেবাই সকলের কাছে ঈশ্বরের সেবা হইয়া উঠিবে। গুজরাটের বৈষ্ণব কবিদের ব্যবহৃত 'হরিজন' (অর্থাৎ 'ঈশ্বরের মানুষ') এই পুরাতন শব্দটি মহাত্মা গান্ধী পুনরায় প্রবর্তন করিলেন। শব্দটি একটি সুন্দর ভাব প্রকাশ করিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'দরিদ্র-নারায়ণ' শব্দটির সহিত একটি কর্তব্যবোধের নির্দেশ জড়িত আছে। সেই নির্দেশ হইল—যদি কেহ ভগবানের সেবা করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে মানুষের সেবা করিতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দকে একজন বিরাট ধর্মাচার্যরূপে শ্রদ্ধা করা হয়। হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের চর্চার ক্ষেত্রে তিনি বাস্তবিকই এক সুনির্দিষ্ট অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রয়াসে বিশ্ববাসী হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ব্যাপকতররূপে জানিতে পারিয়াছে; ইহার মর্যাদাও দিতে শিখিয়াছে। বেদান্তের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে তাঁহার যে-সকল রচনা আছে, তাহা আজও সমগ্র পৃথিবীর হাজার হাজার তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাও সর্বজনবিদিত যে, ধর্মীয় তাত্ত্বিক এবং ধর্মাচার্য অপেক্ষাও তাঁহার বড় পরিচয়—তিনি একজন মানবপ্রেমিক, মানবসেবায় নিবেদিতপ্রাণ পুরুষ। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বকে কাহারও এইরূপে বিশ্লেষণ করিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। সর্বোত্তম হইল মানবসেবাকে ঈশ্বরসেবা-রূপে গণ্য করা। কারণ, ব্যবহারিক ধর্মের দিক হইতে দেখিলে মানুষ এবং ঈশ্বর একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ রূপে পরিস্ফুট হয়। ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম তীব্র আবেগের সঙ্গে এই আবেদন করিয়াছেন যে, অবহেলিত জনসাধারণের প্রতি সুবিচার না করিলে আমাদের আর রক্ষা নাই। আজ যে জনকল্যাণের জন্য নানা চেষ্টা করা হইতেছে, ইহার মূলে রহিয়াছে তাঁহার বিদ্যুদ্গর্ভ বক্তৃতা ও উদ্দীপক মন্তব্য। তাঁহার এই সমস্ত মতামত ও ক্রিয়াকর্মের পরিচয় পাইয়া হয়তো কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, অধ্যাত্মধর্ম অপেক্ষা মানুষের বাস্তব কল্যাণ ও অবহেলিত জনসাধারণের সামাজিক অধিকারের কথাই তিনি বুঝি অধিকতর আবেগের সঙ্গে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাত্মবাদ তাঁহাকে এই দীক্ষা দিয়াছে যে, মানবসেবা ও দেবসেবা একে অপরের পরিপূরক। ইহা যেন একই বস্তুর দুই দিক

মাত্র। কর্মকেন্দ্রিক করুণা-মৈত্রী, বিশ্বপ্রেম ও মানবকল্যাণ, ভক্তি ও জ্ঞানের অনুপন্থী মাত্র।

ভারতীয় চিন্তাধারা এবং জীবনবোধকে বিশ্বসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং ইহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি আমাদের জন্য একটি মহৎ কর্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া হৃত উদ্দীপনাকে পুনরুজ্জীবিত করাও তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁহার শ্রেষ্ঠা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা যথার্থই দেখাইয়াছিলেন, ভারতের বহু-আকাঙ্ক্ষিত ঐতিহ্য ও দর্শনকে রক্ষা করিতে হইলে শুধু অন্তরঙ্গাশ্রয়ী প্রচেষ্টার এখন আর প্রয়োজন নাই। আত্মজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞান লাভ করিয়া হিন্দুকে আজ নৈষ্ঠিক ও উদ্যমশীল হইতে হইবে, নিজ আদর্শের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ও সঙ্কুচিত হইলে চলিবে না। অবশ্য এই aggressive অর্থাৎ প্রতিস্পর্ধী মনোভাবের মধ্যে কোন মন্দ জিনিস নাই। এখন এমন এক সময় আসিয়াছে যে, সকলের কল্যাণের জন্য হিন্দুর সংস্কৃতি, চিন্তাপ্রণালী, ধর্ম ও কর্মপন্থা জগতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের যুবক-যুবতীরা যাহাতে গভীরভাবে জীবনকে উপলব্ধি করিয়া, মনোবল ও শারীরিক শক্তির অনুশীলন করিতে পারে, লৌহের মতো পেশী, ইস্পাতের মতো কঠিন স্নায়ুর অধিকারী হয়—ইহাই ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। তিনি যে ত্যাগব্রতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন, বহু উৎসাহী যুবকের হৃদয়েও সেই উদ্দীপনা ও ইচ্ছাশক্তি সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ সর্বান্তঃকরণে স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন এবং তাহারই সঙ্গে ছিলেন মার্জিতবুদ্ধি আন্তর্জাতিক বিশ্বমানবতাবাদী, কারণ তাঁহার নিকট প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরেরই অংশমাত্র বলিয়া শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিল।

ভারতের নবজাগ্রত স্বদেশী আন্দোলন, কর্মপন্থা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় তাঁহার প্রভাবই বিশেষভাবে কার্যকর হইয়াছিল; তাঁহার তিরোধানের অল্প পরেই সর্বভারতীয় জাতীয় উদ্দীপনার প্রথম সূচনা হয়। তাঁহার আদর্শ ও উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া, সশস্ত্র পন্থায় দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য এদেশের যুবকগণ গীতার শ্লোক কণ্ঠে ধারণ করিয়া ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা হিংসার পন্থা অনুমোদন করিতেন না, তাঁহারাও বিবেকানন্দের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশবাসীর হৃদয়ে জনসেবা ও দেশসেবার ব্রত উজ্জীবিত করিবার জন্য সর্বপ্রকার দুঃখ-নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। ইহাকে মনগড়া ভাবের সহিত অলস লীলাখেলা বা ভাববিলাস বলা উচিত হইবে না। তাঁহারই আদর্শে আত্মবিচার ও কর্মৈষণা জাগ্রত হইয়াছে—যাহার পরিণতি 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর প্রতিষ্ঠা। আজ বহু বৎসর ধরিয়া মিশন মানবসেবা ও মানুষকে নবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব বহন করিয়া চলিয়াছেন। ইহারই সঙ্গে তাঁহারা মন ও আত্মাকে দীক্ষিত করিয়া ভারতবর্ষকে আত্মধর্মে অবিচল রাখিতে সাহায্য করিয়াছেন; বিশ্বমানবের বুদ্ধির জগতে সংহতিসাধনেরও পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন।

॥ ৪ ॥

অতঃপর তৃতীয় প্রশ্নের অবতারণা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বিবেকানন্দ সমগ্র মানবজাতির জন্য কি করিয়াছেন? রামকৃষ্ণ মিশন ও বেদান্ত-কেন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণ-পন্থী সন্ন্যাসীরা, যাঁহারা বিবেকানন্দের রচনা ও কর্মাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়াতে এই আদর্শ প্রচারে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাই এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারিবেন।

তবে দুইটি ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের নূতনত্ব স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়। তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বগুলিকে একটি সুসংবদ্ধ চিন্তাপদ্ধতির রূপ দান করিলেন এবং দেখাইলেন যে উহা আধুনিক যুগে জীবনযাপনের একটি পথ। দ্বিতীয়তঃ তিনি পাশ্চাত্যজগতের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা সম্পর্কীয় একটি নূতন দৃষ্টিকোণ, বিশ্বাসের সঙ্কটগুলির প্রতি এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি—পাশ্চাত্যবাসীদের নিকট যাহার প্রয়োজন ছিল সুতীব্র। তাঁহার পরিকল্পনায় সকল বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি সুসংহত হইয়া এক অখণ্ডরূপে প্রতিভাত হইল এবং ইহার ফলশ্রুতিরূপে তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বমানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মসম্মেলনে বিবেকানন্দের যোগদানের ফলে একটা বিশিষ্ট মানব-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত সমাজে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসায় যে বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল, তাহা অপক্ষপাত ও বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই নিঃসংশয়ে স্বীকার করিবেন। বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, শিল্পকলা ও সাহিত্যে ইউরোপ ও আমেরিকা বিশেষ উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু মানবসত্তা ও নিত্যসত্তার সম্পর্ক-বিষয়ে, দুই একজন জ্ঞানী ও গুণীকে বাদ দিলে, আর সকলে এ-বিষয়ে নিতান্ত নিম্নস্তরের অধিবাসী। তাহারা নিজ নিজ দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, অনৈসর্গিক, অযৌক্তিক ও সঙ্কীর্ণ ধর্মবিশ্বাসকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট ছিল; কেহ বা মনে করিত, তাহাদের বিচারধারা ধর্মমত পুরাপুরি গ্রহণ না করিলে ক্রুদ্ধ ভগবান অবিশ্বাসীদিগকে শাস্তি দিবেন। সংস্কৃতিবান যে-সকল মানুষ উচ্চমার্গের তত্ত্বজিজ্ঞাসু, এই আদিম ধর্ম তাহাদের সন্তোষবিধান করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। বিবেকানন্দের বাণী তাহাদের নিকট তৃষ্ণার্ত মৃত্তিকায় বারিবর্ষণের ন্যায় আসিয়াছিল। তিনি বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত যে সুষম যুক্তিবাদ প্রচার করিলেন, তাহার দ্বারা শুধু আমেরিকাবাসী নহে, বিশ্বের সমস্ত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মানুষ পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়াছে। যেখানে ছিল অজ্ঞাতপ্রসূত ঔদ্ধত্য ও স্বার্থপর ব্যক্তিদের যুক্তিহীন প্রতিবাদ, সেখানে বিবেকানন্দ আনিলেন বিশ্বমানবতার পটভূমিকায় উপস্থাপিত বিনয় ও বিচারবুদ্ধি। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব তাঁহার 'যত মত তত পথ' বাণীতে সূত্রাকারে যাহা বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, কারণ তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে হিন্দু দার্শনিক চিন্তার মূলতত্ত্বটি। তিনি বলিলেন যে, যাহারা খ্রীষ্টান নয়, তাহাদের নিকটেও ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইয়াছেন এবং সেই ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিরই ঈশ্বর—কোন বিশেষ ধর্ম, ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট দেবতা-বিশেষ তিনি নহেন। আত্মানুসন্ধিৎসু ও সত্যসন্ধ ব্যক্তিদের চিত্তলোকে তাঁহার

প্রভাব যাদুমন্ত্রের মতো অতি দ্রুত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আজ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া বেদান্তের প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকর হইতেছে। বেদান্তগ্রন্থই শুধু প্রচারিত হয় নাই, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহাদের গুরুর জীবনের পটভূমিকায় বেদান্তকে কর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রচার করিয়া চলিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম ও অধ্যাত্ম-দর্শনের প্রতি পাশ্চাত্য-মানব যে অসহিষ্ণু মনোভাব পোষণ করিত এবং নিজেদের ধর্মের প্রতি তাহাদের যেরূপ অন্ধ আসক্তি ছিল, তাহার প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে। বিচক্ষণ পাশ্চাত্য নরনারীর আধুনিক মনোভঙ্গি বিশ্লেষণ করিলেই আজ একথা অতি স্পষ্ট হইবে। অন্যের ধর্ম যথাযথভাবে বুঝিবার জন্য তাঁহাদের মনোভাবও ধীরে ধীরে সকলের অগোচরেই পরিবর্তিত হইতেছে। একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্ররূপে আমি যখন লন্ডনে, একজন যুবক আমেরিকানকে মিশনারি কাজের প্রশিক্ষণ লইতে দেখিয়াছিলাম। তাহার আগ্রহ ও অধ্যবসায় আমাকে অভিভূত করিয়াছিল। একদিন কথোপকথনকালে সে আমার নিকট একটি বিস্ময়কর উক্তি করিয়াছিল। আমরা সাধারণতঃ যে-ধরনের খ্রীষ্টানের সংস্পর্শে আসিয়া অভ্যস্ত, তাহা বিচার করিলে একজন পেশাদার খ্রীষ্টানের মুখ হইতে ঐরূপ উক্তি বাস্তবিকই বিস্ময়কর। সে বলিয়াছিলঃ 'আমি অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের বাণী প্রচার করিতে যাইতেছি। কিন্তু কোন মানুষকে ধর্মান্তরিতকরণ কখনই আমার অভিপ্রায় নহে। আমি যথাশক্তি মানুষকে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাহার সাধ্যমতো পবিত্র জীবনযাপনে সাহায্য করিব। একজন মানুষ যদি পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিতে পারে তাহা হইলে আমার মতে সে তাহার জীবনে খ্রীষ্টকে সত্যই গভীরভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে।' আমি অত্যন্ত অভিভূত হইয়া বলিয়াছিলামঃ 'এই ব্যাপারে আপনার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। মানুষকে ধর্মদান করিবার ব্যাপারে হিন্দুগণও একই মনোভাব পোষণ করিয়া থাকেন।' তৎক্ষণাৎ আমার স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-বক্তৃতার কথা স্মরণপথে উদিত হইয়াছিলঃ 'আমি কি ইচ্ছা করি যে খ্রীষ্টান হিন্দু হয়?—ঈশ্বর তাহা না করুন। আমার কি ইচ্ছা যে, কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রীষ্টান হউক?—ভগবান তাহা না করুন।' পাশ্চাত্য খ্রীষ্টানদের মধ্যেও মানসিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার অনুরূপ দিগন্ত-বিস্তার আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি, যখন দেখি ভারতে, ইউরোপে এবং আমেরিকায় খ্রীষ্টান মিশনারী ও চিন্তানায়কগণ মহাত্মা গান্ধীকে কিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অ-খ্রীষ্টান মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহারা আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জীবনে 'একজন প্রকৃত খ্রীষ্টান' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বেদান্তের ব্যাপক পরিবর্তন-সাধক-ক্ষমতা বিবেকানন্দের মাধ্যমে এইরূপে কাজ করিয়া চলিতেছে। ডি. এইচ. লরেন্স মেক্সিকোর জীবনযাত্রার বিষয়ে 'দি প্লুমড সারপেন্ট' নামক একটি উপন্যাস রচনা করেন। উহাতে আমরা মেক্সিকোর একশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে প্রাক্‌ক্যাথলিক আজটেক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চিত্র পাইয়া থাকি। এই আন্দোলনের কোন কোন নেতা যে-মানসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বিস্ময়করভাবে আধুনিক। এই উপন্যাসের নায়ক র‍্যামন রোমান ক্যাথলিক বিশপের সহিত কথোপকথনকালে যে-মতামত প্রকাশ

করিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই সম্ভবতঃ অবিকলভাবে বিবেকানন্দের রচনাবলী হইতে গৃহীত। এইরূপে দেখিতে পাই—বিবেকানন্দ আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যজগৎকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভায়, এবং পরবর্তীকালে আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং ভারতে যে-বাণী শুনাইয়াছিলেন তাহা মানুষকে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করিবার পথে একটি কার্যকরী শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যদিও সাধারণ মানুষ এই শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন নহে।

॥ ৫ ॥

এইভাবে বিবেকানন্দ তাঁহার মাতৃভূমিকে পরম গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন; তাঁহার কৃপায় ভারতবর্ষ তাহার মৌলিক 'ভারত-ধর্ম'কে অনুধাবন করিতে পারিয়াছে, অধ্যাত্ম-চেতনার মধ্য দিয়া জীবসেবা পুনরায় সার্থক হইয়াছে। তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন মূর্ত বেদান্ত, তিনিও তেমনি 'ভারত-ধর্মে'র মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহার ছিল বলিষ্ঠ উদার হৃদয় যাহার জন্য নির্দ্বিধায় বলিতে পারিতেন যে, যেসকল একান্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ ভারতের নিজস্ব ভাণ্ডারে নাই, তাহা বহির্দেশ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। সেইজন্য তিনি তাঁহার সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ গঠন করিবার সময় খ্রীষ্টান মিশনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। এবং ইংরাজী 'মিশন' শব্দটিকে অবিকল গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের নামকরণও করিয়াছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন।

সমাজে যাহারা অবিচারের বলি, বিবেকানন্দ তাহাদের সকলকেই ভালবাসিয়াছেন। তাহাদের মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখ-দারিদ্র বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিবার নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না অথবা কাহাকেও ঐরূপ নীতি অনুসরণ করিবার পরামর্শও তিনি দিতেন না। তাঁহার মন ছিল চির-অনুসন্ধিৎসু এবং তিনি পক্ষপাতী ছিলেন দুঃসাহসিক কর্মের। তাঁহার জীবনে কাপুরুষতার কোন স্থান ছিল না। সেইজন্য তিনি একসময় বলিয়াছিলেনঃ 'ধর্ম তাহাকেই বলে যাহা আমাদিগকে শক্তি প্রদান করে আর অধর্ম তাহাই যাহা আমাদিগকে শুধু দুর্বল করিয়া থাকে।'

ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা ও আধ্যাত্মিক শূন্যতার সেই দিনে যখন সমস্ত কিছুই নৈরাশ্যজনক মনে হইয়াছিল এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিল তখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার আহ্বান লইয়া বিবেকানন্দ নামক একটি শক্তির আবির্ভাব কি করিয়া সম্ভব হইল, তাহা নিঃসন্দেহে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এইরকম একজন ব্যক্তি ঠিক তখনই আসিয়াছিলেন যখন আমাদের সম্মুখে কোন পথ ছিল না, আমরা যেন সমস্ত আশাই হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, করুণাময় ঈশ্বর মানুষকে কখনই পরিত্যাগ করেন না। এই ঘটনা গীতার বহু-উদ্ধৃত সেই বাণীই সমর্থন করিতেছে—যখন ধর্মের অধঃপতন এবং অধর্মের উত্থান হইয়া থাকে ভগবান তখন অবতাররূপে অবতীর্ণ হন—মানুষকে মুক্তির সঠিক পথ প্রদর্শন করিতে ভগবান পথ-প্রদর্শক হইয়া আসেন। এই অর্থে বিবেকানন্দ একজন অবতারপুরুষ,

দৈব-অনুপ্রাণিত এবং ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথ-প্রদর্শক—কেবলমাত্র ভারতের জন্যই নহে, বর্তমান যুগের সমগ্র মানবজাতির জন্য। তাই আজ বিশ্ববাসী কৃতজ্ঞচিত্তে ভারতের সঙ্গে একযোগে এই মহাপ্রাণের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকে। জ্যোতিঃস্বরূপ বিবেকানন্দের দিব্যবিভা ক্রমশঃ সহস্রমুখী হইয়া উঠিতেছে, এই জ্যোতিঃশিখা বিশ্বের দূরতম প্রান্তে পৌঁছাইবে। এই আলোকের তলেই আমরা মানুষকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি—এ দীপ চিরদিন অনির্বাণ থাকিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিকতা

আবাল্য শুনে এসেছি মানবচরিত্র সর্বত্রই এক। রটনাটা যে মূলত অসত্য এমন কথাও বলা চলে না। কিন্তু তবু ওদেশের বহু নরনারীর সঙ্গে মেলামেশা করে আমার বার বারই মনে হয়েছে যে, ওদের মনপ্রাণ আমাদের থেকে বেশ একটু আলাদা। সাধারণভাবে যে-কোন সূত্র দিতে গেলেই মুশকিলে পড়তে হয় মানি, তবু বলব—না, দৃষ্টান্ত দিয়েই বলি না কেনঃ ওদের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রতিভার স্ফুরণ সহজ, আমাদের মধ্যে দার্শনিকতার প্রভাব বেশী। ওদের মধ্যে রাজসিকতা প্রবল, আমাদের মধ্যে তামসিকতাই বেশী চোখে পড়ে, অথচ সেইসঙ্গে এ-ও না বলে পারি না যে, আমাদের মধ্যে মহাজনরা যত সহজে সাত্ত্বিক হতে পারেন ওদের মহাজনরা কিছুতেই তত সহজে নিরীহ নিবৃত্তিমার্গী হতে পারেন না। অন্যভাবে বলা যায়—ওরা প্রকৃতিতে ঐহিক, বহির্মুখী, আমাদের শ্রেষ্ঠ মানুষ বেশ একটু অন্তর্মুখী, অনৈহিক—otherworldly। ওদের দেশে পরিবর্তন দ্রুত হলে মানুষ শঙ্কিত হয় না, আমরা হই। অন্য ভাষায়, আমরা ওদের চেয়ে সমাজে ও ধর্মে ঢের বেশী রক্ষণশীল—conservative—অন্তত এ-পর্যন্ত হয়ে এসেছি। আর এইজন্যেই হয়তো ইংরেজকে চড়াও হতে হয়েছিল এদেশে। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেও ওদের মতিগতির পরিচয় পেতে বিদেশ গেলে আমাদের জাত যেত—একঘরে হতে হত। কিন্তু ওরা যখন এদেশে এসে জাঁকিয়ে বসল তখন প্রাণপণে চোখ বুজে থাকতে চাইলেও চোখে পড়ল বইকি ওদের কীর্তিকলাপ—রেল রে, হোটেল রে, ক্লাব রে, শৈলাবাস রে, গ্রামোফোন রে, মোটর রে, রেডিও রে—কী নয় রে? দেখতে দেখতে আর চমকে উঠতে উঠতে আমাদের একটু একটু করে চৈতন্য হলঃ তাইতো, এ ম্লেচ্ছদের দেখি চলার ছন্দ আমাদের চেয়ে অনেক বেশী জলদ—ওদের তুলনায় আমরা চলি যেন প্রায় ঢিমাতেতালায় বা আড়াঠেকায় মনে হল। এ-ও সয়েছিলাম—ওদের উঠতে বসতে আমাদের নেটিভ বলা, কিন্তু সেইসঙ্গে ঘটল একটি অঘটনঃ ওদের প্রাণশক্তির ছোঁয়াচে আমাদের ঘুম ভাঙল, ওদের গতির ছোঁয়াচে আমাদের গজেন্দ্রগমন লজ্জা পেল। ফলে আমাদের প্রাণে না হোক মানে বাঁচতে দীক্ষা নিতে হল ওদের ত্বরিতগতির; মন্থরকর্মাকে মন্ত্র দিল বিশ্বকর্মার দল—নেটিভকে গাইতে হলঃ

আমরা বিলাত ফের্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।[১]

জবাই না করে উপায়ও ছিল না—অফিসে চাকরি করতে হলে ফার্সি ছেড়ে ইংরেজি শিখলে সুবিধে, ধুতিচাদর ছেড়ে হ্যাটকোট। এসব হয়তো বাহ্য, কিন্তু এইসঙ্গে আর

১। দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন—দিলীপকুমার রায়, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৪

একটি অঘটন ঘটল—আমরা ইংরেজি ভাষাটায় হঠাৎ চমৎকার পোক্ত হয়ে উঠলাম—বিশেষ করে বাংলাদেশে শিক্ষিতরা সত্যিই রসিয়ে উঠলেন এ আশ্চর্য উদ্দীপনাময়ী, প্রাণদা, বলদা, বরদা ভাষায়। আমরা শুধু শেলী কীট্স্ বাইরন সেক্সপীয়র আওড়ানোই নয়—এমন বক্তৃতা দিতে শুরু করলাম সাহেবি ভাষায় যে, ওদেরও সত্যিই তাক লেগে গেল। এরই ফলে আমরা এসে পড়লাম সেকাল থেকে একালে—হলাম আধুনিক।

সূর্যোদয়ের প্রথম রশ্মিকে অভিনন্দন করে সর্বপ্রথম উচ্চতম শিখরগুলি। স্বামীজী ছিলেন আমাদের দেশের শিখরচারী পুরুষদের মধ্যেও অগ্রণী। তাই তাঁর মন যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অরুণাভায় সব আগে রঙিয়ে উঠবে এ তো জানা-ই। অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমরা সজাগ হয়ে উঠলাম যে, তিনিই করলেন এক অভিনব আধুনিক যুগের সূচনা, ওদেশের নানা ভাবধারার শ্রেষ্ঠ রঙরাগ নিয়ে অকুতোভয়ে আমাদের মনকেও সে-আভায় রঞ্জিত করে তুললেন। বললেন ঃ ওদের কাছে আমরা শিখব সঙ্ঘ গড়তে, কর্মতৎপরতা—efficiency—আর ওরা আমাদের কাছে শিখবে ধ্যান তপস্যা যোগ বেদান্ত। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—আমরা দেব আমাদের যা দেওয়ার আছে, তোমরা প্রতিদানে দাও তোমাদের যা দেওয়ার আছে। রচনাবলীর নবম খণ্ডে 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ'-এর প্রথম অধ্যায়ে স্বামীজী একথা চমৎকার ফলাও করে বলেছেন।

এ-সম্পর্কে একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি আজও মনে জেগে আছে, থাকবেও চিরদিন। স্মৃতিটি রবীন্দ্রনাথের একটি দীপ্ত উক্তির—আমার 'স্মৃতিচারণ' প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বে ফলিয়েই লিখেছি। তাই শুধু শেষটুকু উদ্ধৃত করি—যেটুকুতে স্বামীজীর কথা বলেছিলেন তিনি লন্ডনে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। বলেছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে লন্ডনে সভা ডাকা সম্পর্কে ঃ দিলীপ, আমরা এ স্বাধীন দেশে এসেও কি আমাদের জাতীয় অগৌরব লজ্জা হীনতা ভীরুতা প্রচার করে এদের আদর কাড়তে ছুটব ? এ হয় কখনও ? এরা আর যাই পারুক না কেন কাপুরুষকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না—নিশ্চয় জেনো। এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয় তবে আমরা যেন কেবল সেই সেই গুণ, সেই সেই সম্পদ, সেই সেই সাধনার কথাই বলি যাদের দৌলতে ভারত বড় হয়েছিল—যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাইতো তিনি এদের শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন। তিনি এদেশে এসে এদের ডাক দিয়েছিলেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' বলে—কাঁদুনি গাননি আমাদের হাজারো দুর্দশার কথা জানিয়ে। আমার মনে আছে নিবেদিতাকেও তিনি কিভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভারতের সত্য কীর্তির তত্ত্বে, তার কাছে একবারও বলেননি—আমরা বড় আর্ত, দীনহীন, কৃপার পাত্র। বলতেন ঃ 'ভারতের বড় দিকটার পানেই চোখ তুলে তাকাও—তার বাইরের দারিদ্রকেই বড় করে দেখো না।' আমেরিকার সামনে তিনি মাথা উঁচু করেই বলেছিলেন ভারতের ধর্মতত্ত্বের মহিমার কথা—যদি কেঁদে ভাসাতেন 'দুটি ভিক্ষে পাই গো' বলে, তাহলে না পেতেন ভিক্ষা, না সমাদর।

তাঁর পরে স্বামী রামতীর্থ, শ্রীরাধাকৃষ্ণন ও কবি নিজেও ঠিক এই কাজই করেছিলেন—এই পারস্পরিক দান-প্রতিদানের সম্বন্ধের বনেদ গেঁথে নিজের নিজের

ঢঙে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীজীই ছিলেন পুরোধা—ভারতের প্রথম ধর্মীয় সংস্কৃতিদূত, ওদেশে বেদান্তের প্রথম উদ্গাতা। তাঁকে এজন্যে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছিল, বহু নিন্দা সইতে হয়েছিল—সর্বোপরি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল যার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কিন্তু এ হল তাঁর আধুনিক প্রচার-মিশনের মাত্র একটি দিক। ওদেশে এদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদের হরির লুট বিলিয়ে তিনি দেশে ফিরে, এর পালটা—converse—ঘোষণায় লেগে গেলেন এদেশে খানিকটা ইউরোপীয় ঢঙেই সেবাধর্মকে লোকপ্রিয় করে এবং কুসংস্কারবর্জিত মঠের পত্তন করে। ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে আমাদের দেশে তাঁর আগেও কয়েকজন বরেণ্য মনীষী বরণ করেছেন, যথা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের পত্তন করে ও মধুসূদন-বঙ্কিম ইউরোপীয় সাহিত্যের রস বাংলায় আমদানি করে। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম তথা কর্মলোকে পাশ্চাত্য প্রাণশক্তিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন প্রথম স্বামীজী—তাঁর তীব্র বৈরাগ্যে, প্রাণোন্মাদী বক্তৃতায়—সর্বোপরি, তাঁর রোমান্টিক নবজাগৃতি-মন্ত্রের তথা বহ্নিময় ব্যক্তিরূপের ফুলঝুরিতে। মানুষের ঘুমন্ত শক্তি সবচেয়ে সহজে জেগে ওঠে দিগ্বিজয়ীর টঙ্কারে। স্বামীজী এ-টঙ্কারের সঙ্গে জুড়ে দিলেন পরমহংসদেবের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞানভক্তির ওঙ্কার ও ঝঙ্কার। ফলে দেশের ঝিমিয়ে-পড়া মনে উঠল শিহরণ জেগে।

'রোমান্টিক' বিশেষণটি অনুধাবনীয়। কারণ স্বামীজীর চুম্বকশক্তির মধ্যে এই রোমান্টিক উদ্দীপনার মালমশলা ছিল প্রচুর। এযুগে আমরা হয়ে পড়েছিলাম খানিকটা দিনগত পাপক্ষয় করে চলারই পক্ষপাতী। তাই সুভাষ প্রায়ই বলত ঃ 'আমাদের বরণ করতেই হবে স্বামীজীর aggressive Hinduism-এর বাণী—নির্বিবাদী ভালোমানুষির দিন গত—স্বামীজীর কথায় কান দিতে হবে—চড়াও হতে হবে, আর তারই জন্য চাই সর্বপ্রথম স্বাধীন হওয়া।' কিন্তু আমাদের মনে এ-স্বাধীনতার অভীপ্সা ব্যাপকভাবে জেগে উঠেছিল যখন স্বামীজীর আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারের তুরীধ্বনিতে আমরা চমকে উঠলাম—এ-অঘটনের রোমান্সে। স্বামীজী যখন আমেরিকায় দুরবস্থায় পড়েন তখন তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। কিন্তু তার পরেই যখন শিকাগোর বিশ্বমানবিক ধর্মসভায় স্বামীজীর বিদ্যুৎপ্রবেশে হাজার হাজার মার্কিন নরনারী বিচলিত হয়ে উঠল, তখন আমরা বললাম ঃ 'তাই তো হে। চিরদিন ওরাই আমাদের চমকে দিয়েছে। এখানে দেখি শোধ তুলল আমাদেরই মতন এক ভেতো বাঙালী—যাকে আমরা কর্মনাশা নাম দিয়ে শাপমন্যিই দিয়ে এসেছি অনেকগুলি ভালোমানুষের পো-র মস্তক ভক্ষণ করার অপরাধে। অতএব ও গোঁসাই, এসো হে, চাদর গায়ে দিয়ে ছোটা যাক্, দেখে আসি কী ব্যাপার—শুনে আসি কী বলে নরেন্দর। মনে হচ্ছে বুঝি বা এ-ঘুমের দেশে হঠাৎ একটা কিছু ঘটবার মতন ঘটল! নইলে কি তোমার-আমার মতন ছাপোষা মনিষ্যির বুকেও কেমন যেন ঘরছাড়া ডাক বেজে ওঠে?—চলো চলো!' আমরা বাল্যকালে স্বামীজীর তিরোধানের পরেও এই রোমান্সের কিছু রেশ শুনেছি প্রাণ ভরে—এ একটুও অত্যুক্তি নয়।

এই রোমান্সের শিহরণ ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসে এসে লেগেছিল স্বামীজীর দিগ্বিজয়ী হয়ে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে। কান পেতে শুনলে আজও চমকে উঠতে

হয় কলম্বোয় ১৬ জানুয়ারিতে (১৮৯৭) তাঁর প্রথম বক্তৃতার শঙ্খধ্বনিতে। বললেন স্বামীজী সঘনে ঃ আগে আগে আমি ভাবতাম যে, ভারত পুণ্যভূমি, আজ আমি আপনাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে এ-বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।...এই পুণ্যভূমি থেকেই ধর্মনায়কেরা বার বার পৃথিবীতে অধ্যাত্ম-সত্যের বান বইয়ে দিয়েছেন। এখান থেকেই দর্শনের বিপুল জোয়ার প্রবহমান হয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে প্লাবিত করেছে, আর এখান থেকেই ফের সে-স্রোত বইবে যার স্পর্শে জগতের বস্তুতান্ত্রিকতা শুদ্ধিলাভ করবে। আপনাদের বলছি আমি—এ হবেই হবে।[২]

'গেরুয়া-পরা সন্নিসি বলে কি হে?' শুধালেন মুরুব্বি প্রবীণরা চোখ কপালে তুলে। 'আমরা জগতের চেহারা বদলে দেব আমাদের অধ্যাত্ম-শক্তির পরশপাথরের ছোঁওয়ায়? অ্যাঁ?' আমরা—যারা—ডি. এল. রায়ের ভাষায়—

> পাঁচশ বছর এমনি করে আসছি সয়ে সমুদায়,
> এইটি কি আর সইবে নাকো—দু ঘা বেশী জুতার ঘায়?
> সেটা নিয়ে মিছে ভাবা—দিবি দু ঘা, দে না বাবা!
> দু ঘা বেশী দু ঘা কমে, এমনি কি আসে যায়?[৩]

অ গোঁসাই, ছাপোষা মনিষ্যি আমরা—সাতেও নেই পাঁচেও নেই, অথচ নরেন্দর বলে কি ঃ 'The mild Hindu...has always been the blessed child of God.'[৪] 'Abhih, Abhih. We have to become Abhih, fearless, and our task will be done.'[৫] নিরীহ হিন্দু ভগবানের মানসপুত্র, আমরা অভীঃ হলেই সিদ্ধিলাভ! এ কী ব্যাপার, গোঁসাই? শুনে তাক লেগে গেল যে! বলে কি নরেন্দর?—'To the other nations of the world, religion is one among the many occupations of life.'[৬] অপরদেশে ধর্ম আর পাঁচটা বৃত্তির মধ্যে একটা—রাজনীতি রে, সামাজিকতা রে, অর্থসুখ রে, ক্ষমতাবিলাস রে, রকমারি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি রে—কত কী রে—কেবল ঐ পাঁচ মিশেলের সঙ্গে থাক্ না একটু ধর্মেরও অনুপান! ওদেশের লোককে গিয়ে শুধাও, দেখবে তারা এ-ও-তা অনেক কিছুরই খবর রাখে। কিন্তু যদি ধর্মের কথা পাড়ো, তাহলে তারা বলবে যে, তারা নিয়মিত গির্জায় যায় ও অমুক খ্রীষ্টীয় অভিধায় অভিহিত। তারা ভাবে এইটুকু জানাই যথেষ্ট[৭]—শুনছ গা, নরেন্দর বলছে?

স্বামীজী অতঃপর বক্তৃতার পর বক্তৃতায় আরও কত কী-ই না বললেন—দেখালেন কত দৃষ্টান্ত দিয়ে যে, ওরা এইভাবে বললেও আমাদের চলার ছন্দ ঠিক উলটো—অর্থাৎ, আমরা এই আর পাঁচটার খবর রাখি না; বলি এসব অবান্তর; রাখার মতন খবর কেবল একটি—ধর্ম—মনে পড়ে পরমহংসদেবের বিচিত্র কথিকা ঃ

> চলে পণ্ডিত নৌকায়, মাঝি অদূরে আসীন হালটি ধরে।
> পণ্ডিত পুছে ঃ 'জানিস কি তুই দর্শন বেদ পুরাণ ওরে?'

২। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, Advaita Ashrama, Calcutta, Ninth Edition (1964), pp. 104-05 ৩। দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন, পৃঃ ৪

৪। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, p. 105 ৫। ibid., p. 318

৬। ibid., p. 107 ৭। ibid., pp. 103-15

'না ঠাকুর।' —'সে কি ? ন্যায়, বেদান্ত ?'— 'জানি না ঠাকুর।' —'তন্ত্রসার ?'
মাঝি হাসে ঃ 'আমি মুখ্যু ঠাকুর, কোনো বিদ্যাই নেই আমার।'
পণ্ডিতও হাসে গোঁফে চাড়া দিয়ে ঃ 'তা বটে, এসব কজন জানে ?'
সহসা উঠল ঝড়। মাঝি বলে ঃ 'সামাল ঠাকুর! স্রোতের টানে
নাও বুঝি ডোবে—তবে নিশ্চয় সাঁতার জানেন আপনি, স্বামী ?'
পণ্ডিত বলে ঃ 'বলিস কি ? ওরে, সাঁতার দিতে তো জানি না আমি।'
মাঝি বলে ঃ 'আমি জানি না পুরাণ বেদ বেদান্ত তন্ত্রসার,
হাবিজাবি আরও কত কী জানি না, কেবল ঠাকুর, জানি সাঁতার।'

আমার মাতামহ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দক্ষিণেশ্বরে যেতেন পরমহংসদেবের গলক্ষতের চিকিৎসা করতে। (কথামৃতে তাঁর নাম আছে।) তিনি আমাকে বলেছিলেন—এ কথিকাটি তিনি ঠাকুরের শ্রীমুখেই প্রথম শোনেন। আরও বলেছিলেন যে, ঠাকুর প্রায় গাইতেন একটি গান ঃ রামকো জো ন জানা সো ক্যা জানা হ্যায় রে ? কলম্বোয় ও অন্যত্র স্বামীজীর নানা বক্তৃতার বাদী সুর ছিল এই কথাই যে, হিন্দু এ-ও-তা হাবিজাবির খবর না রাখলেও একটি জিনিসের খবর রাখে—ধর্ম, যার নাম সে দেয় পরমার্থ। অর্থাৎ, পরম বস্তু হলেন তিনি, তাই তাঁকে জানার নামই জ্ঞান—আর সব জ্ঞান—কিনা ঐহিক জ্ঞান—না হলেও চলে, যদি এই জ্ঞানের জ্ঞান একবার অন্তরে আলো জ্বালায়।

এই প্রত্যয় আবহমানকাল ভারতের কাছে পরম ঈপ্সিত বলেই গণ্য হয়েছে—নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ—তাঁকে জানলে সবই জানা হয়। স্বামীজী তাঁর নানা ভাষণে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল এই বাণীরই ভাষ্য করেছেন—ধর্মবুদ্ধির নামই বুদ্ধি, ফন্দির নাম দুর্বুদ্ধি। তাঁর একটি প্রিয় বচন ছিল ঃ 'চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না।'[৮] প্রায়ই বলতেন—ভাবের ঘরে চুরি করলে সব ডুববেই ডুববে—যেজন্যে ধর্ম-যে ধর্ম, সেও ডুবেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন ঃ 'ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না; আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ !! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই—এখন ভাতের হাঁড়িতে...।'[৯]

এযুগের একটি মহৎ প্রবণতা—সবকিছু পড়ে পাওয়া বুলির যাচাই করা। স্বামীজীর মধ্যে এ-প্রবণতা দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল তাঁর অন্তরের তেজোদীপ্তিতে। বলীয়ান মানুষের একটি ধর্ম সবকিছুকেই প্রবলভাবে অনুভব করে। স্বামীজী ছিলেন বীরসিংহ, কাজেই তাঁর প্রাণ ধিকধিক করে উঠত চালাকি ছুঁৎমার্গ ও ভাবের ঘরে চুরি দেখে। তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন বইকি যে, আমরা ধর্মকেই একান্ত হয়ে বরণ করি, কিন্তু চারিদিকে কপটতা ও মিথ্যাচার দেখে আহত হয়ে আমাদের অধঃপতনের জন্যে

৮। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৪৪
৯। তদেব, পৃঃ ৮২-৩

আমাদের তিরস্কার করতেন। আর তাঁর প্রাণোচ্ছল মন সবচেয়ে গভীর বেদনায় ছেয়ে যেত যখন তিনি দেখতেন তামসিকতাকে আমরা প্রশ্রয় দিচ্ছি। 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনায় তিনি লিখছেন ঃ 'দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে...যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে ; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?'[১০]

এখানে কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, স্বামীজী তো তাহলে অপরের উপরে যে অভিযোগ আনছেন নিজেই সে অপরাধে অপরাধী, যেহেতু তিনি ভারতের অতীত মহিমা—'পিতৃপুরুষের নামকীর্তন'—যত্র তত্র প্রচার করে এসেছেন—তিনি তাহলে ভুল বলবেন। খ্রীষ্টদেবের একটি কথিকা ঃ এক গৃহস্থের তিনটি চাকর ছিল। তিনি বিদেশে যাবার সময় তাদের হাতে কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে যান। ফিরে এলে দুজন চাকর বলে তারা গচ্ছিত মুদ্রা খাটিয়ে বাড়িয়েছে। প্রভু খুশি হয়ে তাদের পুরস্কার দেন। তৃতীয় চাকরটি তাঁর দেওয়া মুদ্রাটি ফেরৎ দিয়ে বলে সে টাকাটি সযত্নে রক্ষা করে এসেছে পাছে খোওয়া যায় এই ভয়ে। প্রভু তাকে তামসিক বলে তিরস্কার করে শাস্তি দেন, বলেন যে, যে জন্মালস অল্প নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে তার কাছ থেকে সে-অল্পও কেড়ে নেওয়া হবে। 'For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance : but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.'[১১]

স্বামীজী চাইতেন বইকি যে, আমরা অতীত মহিমার জয়ধ্বনি করি—কেবল সেইসঙ্গে বার বার বলেছেন এই মহিমার যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে হবে, হাতেপাওয়া পুঁজি খাটিয়ে যে বাড়াতে না চায় সে হয়ই হয় দেউলে। এইখানে তিনি ছিলেন বিশেষ করেই আধুনিক প্রগতিশীলদের দলে যাদের জীবনের মন্ত্র—স্বামীজীর ভাষায়ই বলি ঃ 'বলো "অস্তি অস্তি", "নাস্তি নাস্তি" করে দেশটা গেল।...প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে, ওরে হতভাগাগুলো, নেই নেই বলে কি কুকুর-বেরাল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহম্। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। রাম রাম, গরু তাড়াতে তাড়াতে জন্ম গেল। ঐ যে ছুঁচোগিরি, "দীনাহীনা" ভাব—ও হল ব্যারাম। ও কি দীনতা?... "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী"। ছুঁচোগিরি করবি তো চিরকাল পড়ে থাকতে হবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। ...Avalanche-এর মতো দুনিয়ার উপর পড়..."উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্"।'[১২]

১০। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩৩

১১। The Holy Bible, New Testament, Saint Matthew, Authorized or King James Version, Universal Book and Bible House, Philadelphia, U.S.A., 1948, 25/29

১২। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৯

এই ধরনের উদ্দীপক ভাষণ পত্র কবিতা প্রবন্ধ লিখতেন তিনি উঠতে বসতে—একদিকে দেবভাষার বীর্যবাণী অন্যদিকে ভর্ৎসনা—দেখ্ কী ছিলি, কী হয়েছিস? এ-দুই মনোভাব তাঁর তেজস্বী চরিত্রের দুটি দিক—অতীত থেকে প্রেরণা নিতে হবে, অতীত মহিমাকে মনেপ্রাণে বরণ করতে হবে—কিন্তু আরও এগিয়ে যেতে হবে—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়ঃ We do not belong to the past dawns but to the noon of the Future—অতীতের ঊষাবিলাসী হলে চলবে না, হতে হবে আমাদের ভবিষ্যতের মধ্যাহ্নচারণ। এর কেন্দ্রীয় বাণীটি হল তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের শিরোনামা—বীরবাণী। তাতে 'সখার প্রতি' কবিতায় স্বামীজী লিখছেনঃ

ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।[১৩]

তাই শুধু নিজের মুক্তিসাধনায় মুক্তি নেই, মুক্তি সর্বসেবায়, জীবপ্রেমেঃ

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।[১৪]

সত্ত্বগুণের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তিনি ঠিকই ধরেছিলেন যে, বাইরে থেকে দেখতে অনেক সময়েই তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতা বলে ভুল হয়। তাই বলতেন বার বারই—তামসিকতা থেকে রাজসিকতায় আরূঢ় হবার পরে তবে সাত্ত্বিকতার নাগাল পাওয়া যায়ঃ 'সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংসপদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে (হইবার) আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়?'[১৫]

দ্রষ্টব্য—বরাবরই দুটি আদর্শ পাশাপাশি চলেছে সমতালে—ঐহিকতা ও পারমার্থিকতা, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, ভক্তিবাদ ও শক্তিবাদ, গুরুবাদ ও সোঽহংবাদ। আর সবার প্রেরণা তাঁর বীরাত্মার প্রবল গ্রহণবর্জনঃ 'আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি। আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে চাই না। আমি কোন প্রকার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।'[১৬]

আবার সেইসঙ্গে বললেন একনিঃশ্বাসেঃ 'দাদা, মুক্তি নাই বা হল, দু-চার বার নরককুণ্ডে গেলেই বা। একথা কি মিথ্যে?—

মনসি বচসি কায়ে পুণ্যপীযূষপূর্ণঃ
ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ।
পরগুণপরমাণুং পর্বতীকৃত্য কেচিৎ
নিজহৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ॥*

১৩। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬৯ ১৪। তদেব

১৫। তদেব, পৃঃ ৩৩ ১৬। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৯৭

* এমন সাধু জগতে আছে যাঁহারা ত্রিভুবনে/সাধি নিখিলজনের হিত বাক্যে কায়ে মনে,
পরের অণুগুণও তুলি শৈলকায় করি/বিকাশলাভ করেন প্রীতি-পীযূষ নির্ঝরি। —লেখক-কৃত অনুবাদ

নাই বা হল তোমাদের মুক্তি। কি ছেলেমানুষি কথা! রাম রাম! ...ও কোন্ দিশি বিনয়—"আমি কিছু জানি না, আমি কিছুই নই"—ও কোন্ দিশি বৈরাগ্যি আর বিনয় হে বাপ! ও রকম "দীনাহীনা" ভাবকে দূর করে দিতে হবে! আমি জানিনি তো কোন্ শালা জানে? তুমি জান না তো এতকাল করলে কি? ওসব নাস্তিকের কথা, লক্ষ্মীছাড়ার বিনয়। আমরা সব করতে পারি, সব করব; যার ভাগ্যে আছে, সে আমাদের সঙ্গে হুহুঙ্কারে চলে আসবে, আর লক্ষ্মীছাড়াগুলো বেরালের মতো কোণে বসে মেউ মেউ করবে।'[১৭]

কী উদ্দীপক কথা! যেন বল্গা মানতে নারাজ তেজী ঘোড়া! মনে পড়ে সুইজারল্যান্ডে রোলাঁর কথা: 'গায়ে কাঁটা দেয় আমাদেরই তাঁর বীরবাণী শুনে—সোজা গিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে। ঢাকঢাক-গুড়গুড় নেই।' এই ভাবের কত কথাই না তিনি বলেছিলেন আমাকে সোচ্ছ্বাসে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২ আগস্ট একটি পত্রে আমাকে স্বহস্তে লিখেছিলেন: 'বিবেকানন্দের প্রথম ভাষণ পড়ো ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে—মায়ার উপরে। জগৎ সম্বন্ধে তাঁর দুঃখবাদ ও অকুতোভয় কর্মবাদ আমার এত মন টানে!...আমরা মনে করি এজগতে সব আগে চাই শক্তিবাদ [আর এ শুধু বীঠোফেনেরই কথা নয়—তোমাদের বিবেকানন্দের বাণীও এই-ই], শক্তি ছাড়া মহৎ কিছুর প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, আর শক্তি থাকলে ক্ষীণ কিছু টিকতে পারে না—না পাপ, না পুণ্য।'*

ইউরোপের একটি শ্রেষ্ঠ অনুভব এই শক্তিবাদ—ভাইটালিটি—এনার্জি। ওদেশে যাবার পরে প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে ওদের এই গতিতন্ত্র—চলো চলো চলো—থেমো না। এর ফলে ওরা অনেক সময়েই খানায় পড়ে—চলার মোহ পেয়ে বসলে মানুষ সেই মোহবশে অনেক সময়েই অন্ধ হয়ে পড়ে বলে। কিন্তু তবু সব জড়িয়ে উদ্ভিদের মতন অনড় হয়ে বসে থাকার চেয়ে চলা ভাল—এই-ই হল আধুনিক যুগের একটি প্রধান বাণী—অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ নয়, প্রবৃত্তিমন্ত্র। স্বামীজীর মধ্যে দেখতে পাই এ-দুয়ের সামঞ্জস্য: অশ্রান্ত কর্মযোগের সঙ্গে ধ্যানযোগ। ধ্যানের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখেছিলেন ভারত পুণ্যভূমি, কর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন এ-পুণ্যভূমিকে নির্মল করতে। তাই তিনি আধুনিক যুগের সাম্যবাদ মেনে নিয়েছিলেন ছুঁৎমার্গের প্রতি আমাদের ঘৃণা জাগাতে এবং লোকাচারের অসারতা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতে। এ-সম্পর্কে তাঁর একটি পরম উপভোগ্য নক্সায় তিনি লিখেছেন: 'সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেথা না-ই বা কি? বেদান্তীয় নির্গুণ ব্রহ্ম হতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূয্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুচোদেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি—নাই কি? ...আমারও কৌতূহল হল, আমিও ছুটলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুণ্ড, একশত হাত, দু-শ পেট, পাঁচ-শ ঠ্যাঙওয়ালা মূর্তি খাড়া! সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করার উত্তর পেলুম যে, ওই

১৭। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১০৩-০৪

* মূল ফরাসী ভাষা থেকে লেখক-কৃত অনুবাদ।

ভেতরে যে-সকল ঠাকুর দেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই—যিনি দ্বারদেশে; আর ঐ যে বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ—শাস্ত্রসকল দেখছ, ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এঁর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম—তবে এ দেবতার নাম কি? উত্তর এল—এঁর নাম "লোকাচার"।'[১৮]

ধর্মকে মেনে লোকাচারকে তুচ্ছ করার এই যে রোখ, এ আমাদের আগের যুগে ছিল না বললেই হয়। তাই অমন যে তেজস্বী পুরুষ বিদ্যাসাগর তিনিও বিধবা বিবাহ-প্রবর্তনের সময়ে চলতি লোকাচারকে খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন পরাশর সংহিতার 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ/পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে'[১৯]—জাতীয় শ্লোকের আশ্রয় নিয়ে, দেখিয়ে যে পুরাকালে বিধবাদের বিবাহ লোকাচারবিরুদ্ধ ছিল না। স্বামীজী কিন্তু এযুগের যুগধর্মকে অঙ্গীকার করে লোকাচারকে অবান্তর বলেছিলেন—সোজাসুজিই। শাস্ত্র তিনি আওড়ালেন চিরন্তন পরাবিদ্যাকে প্রামাণ্য করতে, আর হেয় লোকাচারকে বরখাস্ত করতে চাইতেন আধুনিকতার সহজ যুক্তিবাদের পথে। তাঁর পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে পাই—তিনি অধ্যাত্মসত্যকে মনে করতেন অমূল্য ফল ফুল, আর গতানুগতিক লোকাচার কুসংস্কার ভয়-পাওয়াকে মনে করতেন আগাছা কাঁটাবন। তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে একটি পত্রে লিখেছিলেন: 'আমার motto (মূলমন্ত্র) এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে...অনেকে মনে করে যে, গুরুভক্তির লাঘব হইবে। আমি ঐকথা পাগল এবং গোঁড়ার কথা বলিয়া মনে করি। কারণ, সকল গুরুই এক এবং জগদ্‌গুরুর অংশ আভাসস্বরূপ।'[২০]

এখানে লক্ষণীয়—তিনি চিরন্তন সত্যকে মেনেও সাময়িক লোকমতকে উপেক্ষা করছেন সমান তেজে। এই ভেদজ্ঞানকে বলা যায় চিরন্তন ও অবান্তরের তফাৎ—the difference between the essential and non-essential. ভারত পুণ্যভূমি—এ চিরন্তন সত্য, ভারতীয় লোকাচার অন্য সব লোকাচারের মতনই কখনও শুভ কখনও অশুভ—কাজেই চিরন্তন নয়। বেদান্তের সূত্র চিরন্তন, কেননা তার ভিত্তি অপরোক্ষ অনুভব—কিন্তু লোকাচারকে প্রতি পদেই আধুনিক যুগধর্মের নিকটে যাচিয়ে দেখতে হবে—কখনও কিছু জুড়তে, কখনও কিছু বাদ দিতে। অন্যথা গোঁড়ামির অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে—উদারতার হবে ভরাডুবি। প্রমদাদাস মিত্রকেও তিনি লিখেছেন এই কথাই: 'পূজ্যপাদেষু,...আমি গৃহস্থও বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না; যথার্থ সাধুতা এবং উদারতা এবং মহত্ত্ব যথায়, সেই স্থানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হউক—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।'[২১] এ-প্রসঙ্গে গুরুভক্তি সম্বন্ধে তাঁর আধুনিক বলিষ্ঠ মনোভাবের দৃষ্টান্ত দেওয়া অবান্তর হবে না। আমেরিকায় তিনি বলেছিলেন: তাঁকে (গুরুকে) মনেপ্রাণে ভালবাসতে হবে কিন্তু সেইসঙ্গে ভাবতে শিখতে হবে তোমাকে।

১৮। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৫

১৯। আর্য্যশাস্ত্র: পরাশর-সংহিতা, ৪।২৬

২০। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১৮ ২১। তদেব, পৃঃ ২৯১

অন্ধ বিশ্বাসে মুক্তি নৈব চ। তোমাকে নিজের মুক্তির পথিকৃৎ হতে হবে নিজেরই সাধনায়।[২২]

আমাদের আগের যুগে খুব বেশী জোর দেওয়া হত সবটাতেই শাস্ত্র মেনে চলার পরে। মুনি ঋষি মনু গুরু—বাপ্‌রে! তাঁদের কথা বেদবাক্য। কিন্তু এযুগের একটি প্রধান প্রবণতা হল—যা সবাই মেনে নিয়েছে, একবাক্যে ও না ভেবেচিন্তে, তাকেও ভেবেচিন্তে দেখতে হবে—কতখানি রাখতে হয় আর কতখানি ফেলতে। এ-মনোবৃত্তির একটি বড় চমৎকার পরিচয় মেলে মহামনীষী বারট্রান্ড রাসেলের একটি উক্তিতে। তাঁর দাদা তাঁকে ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়াতে এলে বলেন, প্রথমে কয়েকটি সূত্রকে স্বতঃসিদ্ধ (axiom) বলে মেনে নিতে হবে। রাসেল বলেন, তা কেন? প্রমাণ বিনা কিছুই মানতে পারব না। তাতে তাঁর দাদা বলেন, তাহলে তোমাকে জ্যামিতি শেখাতে পারব না। এসূত্রে বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে কে বড় সত্যদিশারি সে দারুণ তর্ক তুলতে চাই না, কেননা তর্কের পথে এ-প্রশ্নের নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একথা বলা যায় খানিকটা অকুতোভয়েই যে, আধুনিক মনের একটি শুভ প্রবণতা হল ব্যবচ্ছেদ করা, খুঁটিয়ে দেখা, পড়ে-পাওয়া ঐতিহ্যকে (tradition) অপৌরুষেয় বলে মেনে নেওয়াও নয়, হাতের পাঁচ রূপে ভোগ করাও নয়—খাটিয়ে বাড়ানো। শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে একবার আমাকে লিখেছিলেন: 'The tradition of the past is a great thing in its own place but that is no reason why we should go on repeating the past. A great past should be followed by a greater future.' এককথায়, গতিবাদ আর শক্তিবাদ—এই দুই বাদ আমাদের মনকে যেমন অভিভূত করে, আমাদের পূর্বসূরীদের মনকে তেমন করত না। স্বামীজীর মহান ব্যক্তিরূপের পটভূমিকায় এই গতিবাদ ও শক্তিবাদ আশ্চর্য দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল অধ্যাত্মশক্তির সঙ্গে অভূতপূর্ব সমন্বয়ের ফলে। এ-সমাহারকে পুণ্যভূমি ভারতেরই অবদান বললে অত্যুক্তি হবে না।

আধুনিক যুগের আর একটি অনস্বীকার্য প্রবণতা, জটিলতার বৃদ্ধি—ফলে, শুধু মহত্ত্বের বিকাশ নয়—সুষম-এর (হার্মনি) মঞ্জরণ। এ-মঞ্জরণের শোভা সবচেয়ে বেশী বিচিত্র হয়ে ওঠে মহাজনদের জীবন পর্যালোচনা করলে। স্বামীজী ছিলেন এযুগে মহাজনদের মধ্যেও মহাজন—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়: A king among men! তাই তাঁর চরিত্রের মহনীয় বিকাশ একটু পর্যালোচনা করলে আমরা লাভবান হব দেখতে পেয়ে একটি চিত্ত-চমৎকার দৃশ্য—কতরকম বিরুদ্ধ ভাবধারার সমুচ্চয়ে তাঁর ব্যক্তিরূপ এমন অপরূপ হয়ে উঠেছে।

পয়লা নম্বর: স্বামীজীর মধ্যে দেখতে পাই আশৈশব ধ্যানের প্রবণতা। কৈশোরেও ধ্যান করতে বসতে না বসতে তিনি মগ্ন হয়ে যেতেন। একদিন তিনি ধ্যানে বসেছেন—সার সার মশায় পিঠ কালো হয়ে গেছে, তবু তাঁর ধ্যান ভাঙেনি। অথচ অন্যদিকে তিনি ছিলেন এমন প্রাণচঞ্চল যে একদিন তাঁর মাতৃদেবী উত্ত্যক্ত হয়ে

২২। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VII, Sixth Edition (1964), p. 86

বলেছিলেনঃ 'অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটা ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটি ভূত।'[২৩]

দোসরা নম্বরঃ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল তাঁর সহজাত কবচ-কুণ্ডল বললেই হয়, অথচ সহজে ভক্তিবিশ্বাস করবার পাত্র ছিলেন না তিনি। পরমহংসদেব-যে পরমহংসদেব—তাঁকেও তিনি নানাভাবেই পরখ করে তবে গ্রহণ করেছিলেন—এমনকি তাঁর সমাধি সম্বন্ধেও রীতিমতো সন্দিহান হয়েছিলেন। অগাধ ভক্তি করতেন গুরুদেবকে অথচ তাঁর কোনও কথাই সহজে মেনে নিতেন না, তিনি জগন্মাতা কালীকে দর্শন করেন শুনে প্রথমে বলেছিলেন—ও মনের ভুল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের তৃতীয় ভাগের পরিশিষ্টে পাই (পরমহংসদেবের দেহান্তের পরে বরাহনগর মঠে)ঃ

'বারান্দার উপর মাস্টার নরেন্দ্রের সহিত বেড়াইতেছেন...। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি তো কিছুই মানতুম না।—জানেন?

মাস্টার—কি, রূপ-টুপ?

নরেন্দ্র—তিনি যা যা বলতেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতুম না। একদিন তিনি বলেছিলেন, "তবে আসিস কেন?" আমি বললাম, "আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়।"

মাস্টার—তিনি কি বললেন?

নরেন্দ্র—তিনি খুব খুশি হলেন।'[২৪]

তেসরা নম্বরঃ কর্মোদ্যম ছিল তাঁর অসামান্য, অথচ তিনি নিবেদিতাকে একদিন বলেছিলেন যে, জগতে তাঁর কাম্য শুধু একটি গাছতলা, যার নীচে তিনি সমাধিস্থ হয়ে থাকতে পারেন। পরের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদত—যেমন খুব কম মহাপ্রাণেরও প্রাণ কাঁদে, অথচ তাঁর প্রকৃতি ছিল স্বভাববৈরাগী—ঘুরতেন তীর্থে তীর্থে, বনে-জঙ্গলে—পদব্রজে। স্বভাব-নিঃসঙ্গ, অথচ শুধু যে বহুকে সঙ্গ দিতেন তা-ই নয়, বহুর সাহচর্যে তাঁর প্রতিভা হয়ে উঠত খরদীপ্ত—তর্কে বিচারে হাসিতে গল্পে।

কিভাবে তিনি বহুলোককে সঙ্গ ও আশ্রয় দিতেন তার আমি বিশদ বর্ণনা করেছি আমার 'এদেশে ওদেশে' ভ্রমণকাহিনীতে—'মাদাম কালভে' নিবন্ধে। সমস্ত প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মাদাম কালভের কথা তাঁর নানা জীবনীতেই আছে। তাই আমি শুধু আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিধারা হিসাবে এ-প্রবন্ধটি থেকে অল্প একটু উদ্ধৃত করি দেখাতে—মানুষ এ-জন্মবৈরাগী স্বভাব-নিঃসঙ্গের পুণ্যসঙ্গে কত কী পেত!

আমি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন দ্বিতীয়বার ইউরোপে যাই তখন দক্ষিণ ফ্রান্সে সিন্ধুসৈকতা সুন্দরী নীস নগরীতে এক কার্বন্টেসের ওখানে ফরাসী ভাষায় একটি বক্তৃতা দিই ভারতীয় রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে। সেখানে আমার গান শুনে মাদাম কালভে আমার সঙ্গে আলাপ

২৩। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩১

২৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ—শ্রীম-কথিত, শ্রীম-এর ঠাকুরবাটী, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃঃ ২৭২

করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর নাম আমি জানতাম—বিখ্যাত গায়িকা—Prima Donna—পরমা সুন্দরী—কিভাবে মনঃকষ্টে পড়ে স্বামীজীর কাছে এসে আলো পান ও পরে ভারতে আসেন—পড়েছিলাম আগেই। এইবার উদ্ধৃতি দেবার সময় এলো। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি এইভাবে শুরু করেনঃ

'মাদাম কালভেঃ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অলোকসামান্য মহাপুরুষ। আমি তাঁর কাছে যে কত ঋণী—বলব কোন্ ভাষায়? তাঁর সঙ্গে সেই জাহাজে তিনমাস থাকা—অবিস্মরণীয়।

'আমিঃ তাঁর সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপ হয় কী সূত্রে?

'মাদাম কালভেঃ সে-সময়ে আমার বড় দুর্দিন। গভীর মনঃকষ্টে আছি। আমার স্বামী ও মেয়ে মারা যান, আরও নানা উপসর্গ ছিল। সেই সঙ্কট-সময়ে হঠাৎ আমার এক বন্ধু বললেনঃ "চলো তোমাকে নিয়ে যাই এক হিন্দু মহাত্মার কাছে—তিনি হয়তো তোমাকে শান্তি দিতে পারবেন।" আমি বিশ্বাস করলাম না, কিন্তু গেলাম। ভাবলাম, দেখাই যাক না।

'সেই সময় তিনি মাটিতে বসে ধ্যান করছিলেন। আমি পাশে বসলাম একটি চেয়ারে। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটল। আমি ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠলাম—কে এ rustic (চাষা), আমার মতন জগদ্বিখ্যাতা গায়িকাকে কিনা ঠায় অপেক্ষা করায় এতক্ষণ! উঠে যাব যাব ভাবছি, এমন সময় তিনি বললেনঃ "ব্যস্ত হোয়ো না, আমি ধ্যান করে দেখে নিচ্ছি তোমার ঠিক কোন্খানে ব্যথা ও কি প্রয়োজন। মুখে তো তুমি সব বলবে না।" চমকে গেলাম বইকি—আরও যখন—খানিক বাদে—স্বামীজী আমাকে আমার অতীত জীবনের এমন সব কথা বললেন যা আমি ছাড়া কেউ জানত না!

'আমি তো মন্ত্রমুগ্ধ! এ কী ব্যাপার! তারপর তাঁর সঙ্গে তুর্কী, গ্রীস, মিশর—কত জায়গায়ই না ঘুরেছি! আমার সব ব্যথা যেন জুড়িয়ে গেল তাঁর কথালাপে ও স্নেহস্পর্শে! তাঁর কথাই ছিল আমার কাছে একমাত্র অমৃত আর মুগ্ধ হতাম তাঁর মাতৃসম্বোধনে—যদিও তখন আমার বয়স কম।

'কার্বন্টেস (আর্দ্রস্বরে)ঃ হিন্দুর এই নারীমাত্রকেই মাতৃসম্বোধন করাটা কী সুন্দর!

'মাদাম কালভেঃ অথচ এমন মানুষেরও আমি নিন্দা শুনেছি মসিয়ে রায়—শুনে সত্যই আমার লজ্জা হত—মন ধিকধিক করে উঠতঃ কী করে পারে তারা এমন পুণ্যশুভ্র মানুষের নামে কুৎসা রটাতে! ইউরোপে আমেরিকায় যে তিনি এইভাবে দিয়েছেন কত আর্তকেই শান্তি, কত অন্ধকেই দৃষ্টি! তাঁর কাছে শুনতাম—দৃষ্টিদাতার নামই গুরু।'

চৌঠা নম্বরঃ তাঁর প্রতিষ্ঠিত নানা মঠে তিনি আদৌ চাননি গুরুপূজা, অথচ গুরুভক্তিতে কে পারত তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে? স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একবার একটি চিঠিতে তীব্র ভর্ৎসনা করে লিখেছেনঃ '...সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেও তোদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়! ধিক্ তোদের জীবনে!!...তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য যে, তাঁর পায়ের ধূলা পেয়েছিস।...সকল জায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি, কেবল তাঁর ঘর ছাড়া। তিনি যে রক্ষে করছেন, দেখতে পাচ্ছি যে। ওরে পাগল, পরীর মতো

মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা—এসকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে ?'[২৫]

কলকাতায় তাঁর একটি বিখ্যাত ইংরেজি ভাষণে বলেছিলেন—এখানে তার অনুবাদ দিলাম : তোমাদের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম শুনে আমার হৃদয়ের একটি গভীর তন্ত্রী বেজে উঠল। আমি যদি চিন্তায় কথায় কি কাজে কোনও সিদ্ধিলাভ করে থাকি, যদি আমার মুখ দিয়ে কখনও একটি সার্থক বাণীও উচ্চারিত হয়ে থাকে তবে সে-বাক্য আমার নয়—তাঁর। আর যদি কখনও কাউকে কোন কটু কথা বলে থাকি, কি কোন দ্বেষের বাণী রটিয়ে থাকি, তবে সে কুকীর্তি আমার—তাঁর নয়। দুর্বল ক্ষীণ যা কিছু—সব আমার, আর যা কিছু শুচিশুভ্র তার মূলে—তাঁর প্রেরণা, তাঁর বচন, তাঁর ব্যক্তিরূপ।[২৬]

অন্যদিকে এই মানুষটিই আমাদের পদে পদে শাসিয়েছেন, নিষ্করুণ কশাঘাত করেছেন যেখানেই দেখেছেন ভণ্ডামি, জালজালিয়াতি, ভাবের ঘরে চুরি, শুচিবাই, সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশে তামসিকতার উঁকিঝুঁকি। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এ শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন : গোরক্ষিণী সভার প্রচারক এসে স্বামীজীকে একবার ধরেন কসাইয়ের হাত থেকে গোরুদের রক্ষার জন্যে পিঁজরাপোলে টাকা দিতে।

স্বামীজী প্রশ্ন করেন : মধ্য-ভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছে, নয় লক্ষ লোক অনশনে মারা গেছে। আপনাদের সভা এ ব্যাপারে কোন সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে কি ? ভদ্রলোক বললেন : না। লোকের পাপে, কর্মফলে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছে। 'যেমন কর্ম তেমন ফল' হয়েছে। একথা শুনে স্বামীজীর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন : তাহলে বলতে পারি গরুরাও নিজের নিজের কর্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছে আর মরছে, আমাদের ওতে কিছু করবার দরকার নেই। ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন : তা ঠিক, কিন্তু শাস্ত্রে বলে গরু আমাদের মাতা। স্বামীজী বললেন : হাঁ, গরু আমাদের যে মা তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি— তা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন ?[২৭]

পাশ্চাত্য দেশ থেকে একটি মস্ত গুণ আমরা পেয়েছি—আত্মপ্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয় স্বামীজীর মধ্যে রূপ নিয়েছিল আত্মবোধের। এ-আত্মবোধের দীপ্তি বিশেষ করে ফুটে উঠত যখন ভারতের কোন পাশ্চাত্য নিন্দুক আমাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইত। নিবেদিতা লিখেছেন : 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে কি বোঝায় সেবিষয়ে তাঁর মনে কোনও দ্বিধা ছিল না। কতবারই না তিনি আমাকে বলেছেন, "তোমরা ভারতকে বুঝতে পারোনি আজও। আমরা খতিয়ে নরপূজারী। আমাদের নারায়ণ নর।" '[২৮] প্রতিমা পূজার সম্বন্ধেও সমানই স্পষ্টভাষায় বললেন তাঁর প্রত্যয়ের কথা : 'প্রতিমাকে ভগবান বলতে পারো—একশবার, কেবল ভগবান প্রতিমা এই ভুলটি কোরো না।'[২৯] শ্রীঅরবিন্দ

২৫। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২০৫

২৬। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, p. 312

২৭। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৮-৯

২৮। The Master as I saw him—Sister Nivedita, Udbodhan Office, Calcutta, Twelfth Edition (1977), pp. 174-75 ২৯। ibid., p. 175

আমাদের একবার বলেছিলেন যে, তাঁর মনে আশ্চর্য আলো নামতো যার ফলে তিনি এমন সব সত্য দেখতে পেতেন যা সে-আলো বিনা দেখা যায় না। ইংরেজিতে এই জাতীয় বাণীকে বলে aphorism—জ্ঞানোক্তি ; 'Inspired Talks' নামে অপূর্ব বইটির ছত্রে পাই এই জ্ঞানোক্তি প্রায় মন্ত্রের মতো ঝঙ্কারে। কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করি—কী চমৎকার ঃ

একদেশদর্শিতায়ই জগৎ ডুবল। নিজের যত দিক বিকশিত হবে তত পাবে যেন নব আত্মা আর দেখতে পাবে জগৎকে বহু আত্মার দৃষ্টিতে।[৩০]

যার কিছুই নেই ভগবান তারই।[৩১]

যারা ঈশ্বরৈকান্ত তারা কর্মীদের চেয়ে অনেক বেশী কৃতী। যে নিজেকে নির্মল করেছে, প্রচারক-সঙ্ঘের চেয়েও বেশী সংসাধিত করেছে।[৩২]

সিংহ হতে না দিলে মানুষ শৃগাল হবে।[৩৩]

ভগবানের সন্ধানে মরাও ভালো কিন্তু কুকুর হয়ে মাংসের জন্যে কাড়াকাড়ি কোরো না।[৩৪]

এমন অবস্থা লাভ করতে হবে যেখানে তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাস হবে প্রার্থনা।[৩৫]

অনুমান—আমার তোমার—আনে সঙ্ঘর্ষ। বলো তুমি কী দেখেছ, দেখবে তোমার কথা সবাই বরণ করবে।[৩৬]

যখন মানুষ বোঝে যে, সুখের অন্বেষণে বিড়ম্বনা, তখনই ধর্মের সূচনা হয়।[৩৭]

মানুষ এগোয় প্রেমের প্রেরণায়, সমালোচনার অঙ্কুশে নয়। হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষ চেষ্টা করেছে শাসন করে সমাজ সংস্কার করতে। কিন্তু ফল হয়নি। কারুর দোষ দেখিয়ে তাকে নির্দোষ করা যায় না।[৩৮]

এ-উক্তিগুলি মূল ইংরেজিতে পাঠ্য—বাংলা তর্জমায় এ-জাতীয় ধ্যানলব্ধ বাণীর দীপ্তি ম্লান হয়ে আসে। আমি তবু বাংলা তর্জমা দিলাম শুধু আভাস দিতে কী ধরনের মণিমুক্তা তাঁর কথালাপে নিরন্তরই বিচ্ছুরিত হত ফুলঝুরির সোনার ফিনকির মতো। এ তিনি পারতেন বুদ্ধিবলে নয়—প্রাতিভজ্ঞানের প্রেরণায়। এ-সম্পর্কে একটি ব্যক্তিগত আলোচনা অবান্তর হবে না।

অনেকদিন আগে একদা আমার মনে প্রশ্ন উঠে—অত্যধিক আত্মপ্রত্যয় সাধকের পক্ষে ভাল কিনা—এর ফলে মনের মধ্যে অহমিকা প্রশ্রয় পায় কিনা—যার গোড়াকার কথা এই যে, আমি আর পাঁচজনের চেয়ে অনেক বড়—ইংরেজীতে যাকে বলে—sense of superiority। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একটি গভীর পত্র লিখেন। সেটি তাঁর পত্রাবলীতে ছাপা হয়েছে বলে আমি অনুবাদে তার সারমর্মটুকু পেশ করি। তিনি আমাকে লিখেছেন ঃ 'যখন আমাদের দৃষ্টির সামনে কোন নবদিগন্ত উদ্ঘাটিত হয় তখন অনেক সময়ে মনে আত্মপ্রত্যয়ের তেজ জেগে ওঠে যাকে বাইরে থেকে দেখে মনে

৩০। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VII. p. 6

৩১। ibid., p. 10 ৩২। ibid., p. 16 ৩৩। ibid., p. 22 ৩৪। ibid., p. 45

৩৫। ibid., p. 46 ৩৬। ibid., p. 65 ৩৭। ibid., p. 103 ৩৮। ibid., p. 28

হতে পারে আত্মাভিমান। স্বামীজীর সঙ্গে এক মাদ্রাজী পণ্ডিতের তর্ক হয় জানো নিশ্চয়ই? পণ্ডিত বলেছিলেনঃ "কিন্তু শঙ্করাচার্য তো কই এমন কথা বলেননি?" বিবেকানন্দ পিঠ পিঠ উত্তর দিয়েছিলেনঃ "না। কিন্তু আমি, বিবেকানন্দ, বলছি।" তাঁর এ-উক্তির মূলে অহমিকা ছিল না—ছিল রণবীরের ব্যুত্থান, যে দাঁড়ায় নিজের আদর্শের জন্যে লড়তে, কেননা নিজেকে সে মনে করে কোন মহৎ সত্যের প্রতিভূ, যার অমর্যাদা হবে যদি সে হার মানে।' (This is not mere egoism, but the sense of what he stood for and the attitude of the fighter who, as the representative of something very great, would not allow himself to be put down or belittled.)

বিবেকানন্দের তেজস্বিতার মূলে ছিল যে এই ভাগবত প্রতিভূর প্রাণের প্রত্যয় ও অন্তরের আলো—এই সত্যটি শ্রীঅরবিন্দের এই কয় ছত্রে আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁর পত্রের উল্লেখ করলাম। স্বামীজীর অজস্র নিবন্ধ, ভাষা, কথালাপের মাধ্যমে নিত্যই ফুটে উঠত এই আদিষ্ট প্রতিনিধির অঙ্গীকারঃ 'Thou lead and I follow.' তিনি ছিলেন ধ্যানে শিবপূজারী, কর্মে কালীর সন্তান। তাঁর 'attitude of the fighter'-এর আত্মপ্রত্যয়ী সুর ফুটে উঠেছে তাঁর বিখ্যাত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতার বাণীতেঃ

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥[৩৯]

শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় এরই নাম—'Divine Warrior'—কিন্তু শুধু দিব্য প্রেম নয়, সেইসঙ্গে দিব্য শক্তি। শ্রীঅরবিন্দ বার বারই বলতেন জগতে প্রেম ও জ্ঞানের মূল ভিত্তি হল আত্মশক্তির নিত্যপ্রতিষ্ঠা। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখতে পাই উভয়েই ছিলেন সমানধর্মী। তাইতো শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দের বিদেহী আত্মার পেয়েছিলেন দেখা আলিপুরের কারাগৃহে। একটি চিঠিতে তিনি স্বহস্তে লিখেছিলেনঃ জেলে ধ্যানের মধ্যে আমি ক্রমাগতই শুনতাম বিবেকানন্দের স্বর দু-সপ্তাহ ধরে।[৪০] এ-অঙ্গীকার তিনি পরেও করেছিলেন তাঁর কথালাপেঃ বিবেকানন্দই প্রথম আমাকে অতিমানস তত্ত্বের সন্ধান দেন...এই এই ঐ ঐ ইত্যাদি নির্দেশ দিয়ে নানা ভাবে। আলিপুর জেলে পনের দিন ধরে তিনি আমাকে শেখান ও বোঝান।[৪১] অপিচ শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেনঃ আলিপুর তিনি আমার কাছে আসবেন এ আমি মোটেই ভাবিনি, কিন্তু তবু তিনি এসে আমাকে শিখিয়েছিলেন, আর তিনি দিয়েছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ।[৪২] ['I never

---

৩৯। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৭১

৪০। Sri Aurobindo and His Ashram, Arya Publishing House, Calcutta, 1948, p. 44

৪১। Mother India, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, June 1962, pp. 11-2

৪২। ibid., p. 12

expected him and yet he came to teach me. And he was exact and precise even in the minutest details.']

শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই বলতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি বহু সাহায্য পেয়েছিলেন। উভয়কেই তিনি গভীর ভক্তি করতেন। একবার বলেছিলেন একটি অতি চমৎকার কথাঃ The capitulation of Vivekananda to Sri Ramakrishna is a capitulation of the West to the East. তিনি দেখেছিলেন তাঁর যোগদৃষ্টিতে—যেকথা স্বামী বিবেকানন্দও বার বার বলেছেন যে, ভারতই হবে জগতের অধ্যাত্ম-দিশারি।

শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দের গভীর অনুরাগী ছিলেন আরও একটি কারণে—কর্ম, লেখা ও তেজস্বিতার দিক দিয়ে এই দুই মহাপুরুষই ছিলেন সমধর্মী—এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমার অবস্থা—বড়-ছোটর প্রশ্ন ওঠে না কেননা উভয়েই ছিলেন ভারত-আত্মার বরেণ্য বাণীবাহ, আত্মবোধের আলোকস্তম্ভ। ওদেশে বলে—শুধু খ্রীষ্টই পারেন খ্রীষ্টকে বুঝতে। কথাটা অত্যুক্তি নয়। শ্রীঅরবিন্দ স্বামীজীর মহিমার মর্মজ্ঞ হতে পেরেছিলেন—তিনি নিজেও সেই একই প্রজ্ঞা-পারমিতার আলোর প্রসাদ পেয়েছিলেন বলে। তাই তিনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'দয়ানন্দ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন তাঁর মন্ত্র-ঝঙ্কারিত ভাষায় যার জুড়ি মেলে নাঃ বিবেকানন্দ ছিলেন আত্মশক্তির মূর্ত বিগ্রহ; নরকেশরী। তাঁর প্রভাব আজও প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় রয়েছে অনুভব করা যায়, যদিও ঠিক ধরতে পারি না কিভাবে ও কোথায়। মনে হয় শুধু—যেন কোন সিংহবিক্রম অন্তর্মুখী ঊর্ধ্বায়িত মহাশক্তি ভারতের আত্মায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, আর আমরা বলিঃ দেখ দেখ বিবেকানন্দ তাঁর চিরজননীর ও তাঁর সন্তানদের আত্মায় আজও চিরঞ্জীবী।[৪৩]

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় আত্মার একজন দীপ্ত বাণীবাহ একথা আমরা সবাই জানি ও মানি। কিন্তু তাঁর দিব্যকর্মপ্রতিভা যে আজও আমাদের মধ্যে সক্রিয় একথা আমরা সময়ে সময়ে ভুলে বসে থাকি বলেই শ্রীঅরবিন্দের বিবেকানন্দ-তর্পণ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁদের কাছে যাঁরা এই দুই বীরকেশরীকে দিতে চান তাঁদের প্রাণের প্রণামী।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের এ-তর্পণ শুধু কথার কথা নয়। স্বামীজীর প্রেরণা আজও হাজার হাজার আদর্শবাদী তরুণ-তরুণীকে নিষ্কাম কর্মে উদ্বুদ্ধ করছে—যাদের মধ্যে একজনের মাথা আকাশে ঠেকেছিলঃ আমাদের দেশবরেণ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে স্বামীজীর মধ্যে তাঁর তপঃশক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন, আমার মনে হয় স্বামীজীর সিংহবিক্রম মহাশক্তি ঠিক তেমনিভাবেই তাঁর উত্তরসাধক সুভাষচন্দ্রের রক্তে সঞ্চারিত হয়ে দিয়েছিল তাকে দিব্য উন্মাদনা। এ আমার বন্ধুপ্রীতির কাব্যোচ্ছ্বাস নয়। কারণ যাঁরা একটু গভীরদর্শী তাঁদের চোখে পড়বেই পড়বে যে, স্বামীজীর দুঃসাহসের মন্ত্রে সুভাষ কৈশোরে দীক্ষা নিয়েছিল বলেই সে 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' মন্ত্র জপতে জপতে বিশ্বপরিক্রমা করতে পেরেছিল, তাঁর দিব্যপ্রেম তার মনে অনুরণিত

৪৩। Sri Aurobindo, Vol. 17, Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1972, p. 332

হয়ে উঠেছিল বলেই ভারতের দীন দুঃখী দুর্গতদের জন্যে তার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাই কল্পনা করতে পারি—যখন সে বর্মায় সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলে মহাবিক্রমী দুঃসাহসে 'দিল্লী চলো' রণদুন্দুভি বাজিয়ে তুলেছিল তখন তার দুর্দম অন্তঃশক্তির উদ্বোধন করেছিল স্বামীজীর দিব্য দেশভক্তির প্রাণোন্মাদী তূর্যধ্বনি—কোন সাবধানী রাজনৈতিক বুলি নয়। স্বামীজীর 'My Plan of Campaign' ভাষণ থেকে একটু উদ্ধৃতি দিলে একথার ভাষ্য করা হবে। স্বামীজী বললেন : শুনি দেশভক্তি সম্বন্ধে কত বুলি! আমিও বিশ্বাস করি দেশভক্তিতে, তবে আমার দেশভক্তির আদর্শ অন্য। এজন্যে চাই তিনটি জিনিস : প্রথম অন্তরের দরদ। বুদ্ধি যুক্তির সাধ্য কতটুকু? প্রেরণার উৎসমূল—হৃদয়। শুধু প্রেমই খুলে দিতে পারে চিররুদ্ধ দুয়ার, বিশ্বরহস্যের চাবি তারই হাতে। যদি সত্যি সংস্কারক কি দেশভক্ত হতে চাও তবে সব আগে হৃদয়ে গভীরভাবে অনুভব করতে শেখো। বুক ফেটে যায় কি তোমার ভাবতে যে, আমাদের দেশে কোটি কোটি দেবসন্তান ঋষিসন্তান আজ নিরন্ন—অজ্ঞানের কালো মেঘে দেশ অন্ধকার? বলতে পারো কি—তোমার রাত্রে ঘুম হয় না, প্রাণ কেঁদে ওঠে একথা ভাবতে? অঙ্গীকার করতে পারো কি যে, পরের ব্যথা, তোমার ধমনীর রক্তের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে হৃৎস্পন্দনে কেঁপে কেঁপে উঠছে?

কিন্তু শুধু এই-ই নয়। পর্বতপ্রমাণ বাধা এলেও তাকে অতিক্রম করবার দৃঢ় সঙ্কল্প আছে কি তোমার? সমস্ত জগৎ যদি কৃপাণ হাতে তোমার বিপক্ষে দাঁড়ায়, তাহলেও তুমি একলা চলতে পারো কি কর্তব্য পালন করতে—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনের পণ নিয়ে? শেষতঃ, তোমার নিষ্ঠা আছে কি? এই তিনটি গুণ যদি থাকে তবেই তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে! এমনকি, যদি গুহাবাসীও হও তাহলেও তোমার চিন্তা ও অভীপ্সা পাষাণ ভেঙে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়বে স্পন্দমান হয়ে শত বৎসর ধরে যতদিন না তারা এমন কোন আধার পায় যার মধ্যে দিয়ে তারা মূর্ত হয়ে উঠবে পরম সিদ্ধিতে। চিন্তা, অভীপ্সা, আন্তরিকতা ও পুণ্যসঙ্কল্পের মধ্যে এমনই দিব্যশক্তি নিহিত।[৪৪]

স্বামীজীর দেশভক্তির এই দিব্য-আদর্শ যে সুভাষকেও আকৈশোর অনুপ্রাণিত করেছিল এ আমার কথার কথা নয়। বিনিদ্র রাতে কতদিনই তার সঙ্গে এ আলোচনা হয়েছে আমার, শুধু এদেশে নয় বিলেতেও। তাই আমি একথা অকুতোভয়েই বলতে পারি যে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের তপঃশক্তিই বিবেকানন্দের প্রসূতি তেমনি বিবেকানন্দের তেজঃশক্তিই নেতাজীর দেশাত্মবোধের জনয়িত্রী তথা ধারয়িত্রী ছিল প্রথম থেকেই। একথার সপক্ষে বহু প্রমাণ আছে—আমি কেবল সুভাষের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েই সমাপ্তি টানব দেখাতে—স্বামীজীর প্রাণের সুর তার প্রাণের তারেও কিভাবে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল। সুভাষ বলেছিল : '...আমি আপনাদের আহ্বান করছি বাংলার আনন্দ-উৎসবের মধ্যে নয়, সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, বিত্তমানের মধ্যে নয়, শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্যে নয়, আমি আপনাদের আহ্বান করছি দুঃখ, দারিদ্র, নির্যাতনের মধ্যে, অভাব,

৪৪। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, pp. 225-27

অজ্ঞানতা, অবসাদের মধ্যে, অত্যাচার, অবিচার অনাচারের মধ্যে—সবার উপর মনুষ্যত্বের পদে পদে অপমানের মধ্যে।'[৪৫]

'মনে রাখিবেন যে আমাদিগকে সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে। ...জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আদর্শের নিকট যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বলিদান দিয়াছে—শুধু সেই ব্যক্তিই অমৃতের সন্ধান পাইতে পারে। আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র, কিন্তু, আমরা ক্ষুদ্র অহমিকার দ্বারা পরিবৃত বলিয়া অন্তর্নিহিত অমৃত-সিন্ধুর সন্ধান পাই না। আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আসুন—আপনারা আসুন—মায়ের মন্দিরে গিয়া আমরা সকলে দীক্ষিত হই! আসুন, আমরা সকলে এক বাক্যে এই প্রতিজ্ঞা করি যে, দেশসেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে—দেশমাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্বস্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব। তাহা যদি আমরা করিতে পারি তবে নিশ্চয়ই জানিবেন—

"ভারত আবার জগৎ-সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"'[৪৬]

এই কথাই যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন তাঁর অনুপম ভাষণে স্বামীজীর সিংহবিক্রম প্রেরণার চিরস্মরণীয় তর্পণেঃ 'দেখ দেখ বিবেকানন্দ তাঁর চিরজননীর ও তাঁর সন্তানদের আত্মায় আজও চিরঞ্জীবী।'

৪৫। তরুণের আহ্বান—সুভাষচন্দ্র বসু, জয়শ্রী প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ১

৪৬। তদেব, পৃঃ ৩৬-৭

বিবেকবাণীর উৎস ও গতি

স্বামী বিবেকানন্দ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন সত্য, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি জীবনকে অস্বীকার করেছেন। তিনি সবকিছুর মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ দেখেছেন, সবকিছুই তাঁর কাছে মহৎ, পবিত্র ও সুন্দর। মানুষ তাঁর কাছে শুধু মানুষ নয়, দেবতা। সে ভুল করতে পারে, অন্যায় করতে পারে, তবু দেবতা। তার ভুল, তার অন্যায় সাময়িক ; সুযোগ-সুবিধা, উৎসাহ এবং শিক্ষা পেলে, তার সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হলে সে নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কেউ তাকে বড় করবে না, সে নিজের শক্তিতে বড় হবে। বড়র সম্ভাবনা তার মধ্যে বীজাকারে আছে, সেই বীজ মহীরুহে পরিণত হবে সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে। স্বামীজীর কাছে জীবন সার্থক ও সুন্দর এই কারণে যে, তার মধ্যে মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে ; তার সাহস, ধৈর্য, অনমনীয় দৃঢ়তার স্বাক্ষর রয়েছে। তার ভুলভ্রান্তি, পরাজয়, ভীরুতা, এগুলিও আছে, কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিতে এসব কিছুই নয়। শেষ যুদ্ধে সে জয়ী হবেই। তাই স্বামীজী মানুষকে ভালবাসতেন, মানবজীবনের প্রতিটি দিকই তাঁর কাছে মূল্যবান।

জীবন মানে পূজা, নিজেকে দেবতা জ্ঞান করে পূজা। এই জীবনের কোন ঘটনাই তাঁর কাছে ক্ষুদ্র বা নগণ্য নয়। তাই দেখি, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আপাতদৃষ্টিতে যা ধর্মবহির্ভূত, তা নিয়েও চিন্তা করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ যিনি সংসারকে অনিত্য বলে ত্যাগ করেছেন, তাঁর চিন্তাজগতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, আর্য ও অনার্য, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, হিন্দু ও মুসলমান, ইংরেজ ও ভারতীয় এইসব প্রসঙ্গ আনাগোনা করে কেন? নারীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে কিনা, তা দেখবার কি প্রয়োজন তাঁর? কেন তিনি শূদ্রশক্তির জাগরণ কামনা করেছেন? সব দেশই তো তাঁর দেশ। তাহলে ভারতের প্রতি বিশেষ দরদ কেন তাঁর? এককথায়—শুধু বেদান্তপ্রচার নিয়ে তিনি থাকেননি কেন? 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—এই বেদান্তের বাণী। যা মিথ্যা, সেই জগৎ নিয়ে সময় নষ্ট করার কারণ কি? কেন তিনি একথা বলেছেন যে, যতক্ষণ দেশের একটিমাত্র কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ তাঁর ধর্ম হবে সেই কুকুরকে খাওয়ানো?[১] এসবের কারণ, জীবনকে তিনি অস্বীকার করেননি। প্রকৃত বেদান্তবাদীর মতো তার ব্যবহারিক সত্যতা মেনেছেন ; বুঝেছেন, এই জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের ঊর্ধ্বে যেতে হবে, মৃত্যুকে জয় করতে হবে, অমৃতত্ব লাভ করতে হবে। তাই দেখি, তিনি অত্যন্ত বাস্তববাদীর মতো দারিদ্র দূর করতে চান, বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার প্রসারের ভিতর দিয়ে জীবনের মান উন্নত করতে চান, সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক পরিবেশ গড়তে চান, প্রাচ্যের চিন্তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের বাস্তববুদ্ধির সমন্বয় ঘটাতে চান।

স্বামীজী অনেক বিষয়ে চিন্তা করেছেন, অনেক সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হয়েছেন,

---

১। The Life of Swami Vivekananda, Vol. II—His Eastern and Western Disciples, Advaita Ashrama, Calcutta, Fifth Edition (1981), p. 440

মানুষের মনের অনেক অন্ধকার দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু সবকিছুর পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে উন্নীত করে, সর্বশেষে তাকে পর্বতশীর্ষে পৌঁছিয়ে দেওয়া, যেখানে সে নিজেকে জানবে, জানবে সে জগৎ থেকে ভিন্ন নয়, সে সকলের মধ্যে বিরাজ করছে বিভিন্ন নামে ও মূর্তিতে। জানবে, সে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, সে স্বয়ং পরমাত্মা, ঈশ্বর। স্বামীজী সমস্ত পুঁজিবাদী ও সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তথাকথিত উচ্চশ্রেণীদের তিনি শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে বলেছেন ; স্বাগত জানিয়েছেন ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল থেকে, হাট-বাজার থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে বেরিয়ে-আসা নতুন ভারতকে। এই ভারত বেদান্তের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাবে, নতুন যে-সমাজ ভারতে রূপ নেবে তা মুসলিম সমাজের মতো শ্রেণীবিহীন হবে, কিন্তু তার জীবনদর্শন বেদান্তই থাকবে—এ এক নতুন সমন্বয়ধর্মী পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ভিতর দিয়ে নতুন এক সভ্যতা রূপ নেবে ভারতে, যা ধীরে ধীরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, য়াতে সে নিজের মধ্যে যে ঐশ্বরিক সত্তা আছে, তাকে সম্ভোগ করতে পারে এবং নিজের চরিত্রে তাকে প্রকাশ করতে পারে—এই বাণীই হচ্ছে স্বামীজীর সব বাণীর প্রাণকেন্দ্র। এই জীবনদর্শনই ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিয়ামক হয়ে থাকবে—এই ছিল তাঁর আশা।

বাস্তবিক, জীবনের এমন কোন সমস্যা নেই, এমন কোন দিক নেই, যে-বিষয়ে এবং যেদিকে স্বামীজী চিন্তা করেননি এবং নতুন আলোকসম্পাত করেননি। তাঁর সঙ্গে সব বিষয়ে আমরা একমত না হতে পারি, কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, তাঁর প্রত্যেক চিন্তা গভীর ও মৌলিক, এবং তার মধ্যে তাঁর সর্বজনবিদিত মানবপ্রেমের স্পর্শও সুস্পষ্ট।

কিন্তু কোথা থেকে পেলেন স্বামীজী তাঁর এতগুলি অভিনব চিন্তা ? কি করে পেলেন তাঁর এই অভূতপূর্ব মানবপ্রেম ? কি তার উৎস ? কার যাদুস্পর্শে তাঁর চিন্তা ও বাণীর এই তেজ, এই বেগ, এই গভীরতা ? স্বামীজী পড়েছিলেন অনেক, আর একবার যা পড়তেন, তা কখনও ভুলতেন না। সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের যেসব চিন্তা, তার সঙ্গে স্বামীজী সুপরিচিত ছিলেন। মিল, বেন্থাম, স্পেন্সার, ডারউইন—এইসব দিক্‌পালের যাবতীয় গ্রন্থ স্বামীজীর অধীত। ইতিহাস ও দর্শন ছিল তাঁর পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। আবার প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডারও তাঁর আয়ত্ত ছিল। সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ উত্তমরূপে অধিগত করেছিলেন। কিন্তু শুধু তথ্যসংগ্রহ করা তাঁর পাঠের উদ্দেশ্য ছিল না, তথ্যের পিছনে যে ভাবের ইঙ্গিত আছে, তার অনুধাবন করাই ছিল তাঁর জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য। কোন ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। ঘটনার পিছনে অতীত ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রয়েছে। তার মর্মগ্রহণ করাই হচ্ছে শিক্ষার মূল কথা, এ-বিষয়ে স্বামীজী ছিলেন সবিশেষ সচেতন। তাঁর 'ভাববার কথা' বা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পড়লেই বুঝতে পারা যায় কী তাঁর মর্মভেদী দৃষ্টি ! শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বার বার তিনি বলেছেন ঃ তথ্যসংগ্রহ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য মননশীলতা।[২] এবিষয়ে তিনি নিজেই ছিলেন শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

২। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ৪৩৭

কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানসমুদ্র যতই তিনি মন্থন করে থাকুন, স্বামীজীর এই জ্ঞান, এই বুদ্ধি, এই দৃষ্টিশক্তি ধার করা নয়। এ তাঁর নিজস্ব। তাঁর যে বিদ্যা, তা পুঁথিগত বিদ্যা নয়। পুঁথিগত বিদ্যা কৃত্রিম, নিষ্প্রাণ, স্বাচ্ছন্দ্যবিহীন। স্বামীজীর বিদ্যা সহজ, সাবলীল ও গতিময়। তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত। দুর্বার পর্বতভেদী নির্ঝরের মতো। এ তাঁর অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ—জ্ঞানবহ্নির স্ফুলিঙ্গ, ব্রহ্মানুভূতির লক্ষণ। তিনি ব্রহ্মময় জগৎ দেখেছেন, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য দেখেছেন। সকল জীব তাঁর কাছে ব্রহ্ম। সত্যদ্রষ্টা স্বামীজীর দৃষ্টি উদার, স্বচ্ছ, সংবেদনশীল ; জ্ঞান শুদ্ধ, সত্য, মুক্ত, গভীর ও সুদূরপ্রসারী। উপনিষদে শিষ্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।'[৩] উত্তরে গুরু বলেছিলেন ঃ আত্মা। স্বামীজী সেই আত্মাকে জেনেছিলেন। গুরুকৃপায় এবং নিজের সাধনবলে। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিতে তিনি শক্তিমান। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর সব দিয়ে ফকির হয়েছিলেন। যোগদৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজীর বিচারশক্তি তাই অভ্রান্ত, প্রতিটি সিদ্ধান্ত নির্ভুল। মানুষের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে দেখতেন, স্বামীজীকে তিনি সেই দৃষ্টি দান করেছিলেন—তাই স্বামীজীর সব প্রচেষ্টা মানবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত।

প্রথম থেকেই স্বামীজী একজন 'চিহ্নিত' ব্যক্তি। তাঁর গুরুর লীলাসহচর। লোকশিক্ষার জন্য তাঁর জন্ম। নরঋষি। অখণ্ডের ঘর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে মর্তে আগমন। যুগ-প্রয়োজনে বার বার অবতারের সঙ্গী। স্বতই মন ঈশ্বরমুখী। ধ্যানসিদ্ধ, তাই খেলাচ্ছলেও ধ্যান করতে ভাল লাগে এবং জমাট ধ্যান হয়। সমাধি সর্বদাই করায়ত্ত, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে চাবিকাঠি।[৪] যে উদ্দেশ্যে দেহধারণ, তা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে বন্দী, মুক্তি নেই। নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। বড় আধার। পুরুষের সত্তা। পদ্ম মধ্যে সহস্রদল। একাধারে অনেক গুণ—গাইতে, বাজাতে, লিখতে, পড়তে, আবার জিতেন্দ্রিয়। খাপখোলা তরোয়াল, অপরের কথা কচ কচ করে কেটে দেন। যুক্তিতে কেউ তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। নেতৃত্বে তাঁর জন্মগত অধিকার।

স্বামীজী যেযুগের মানুষ, সেই যুগটা একটা ভাঙাগড়ার যুগ। পাশ্চাত্য-প্রভাবের ফলে ভারতের মানসজগতে তখন দারুণ এক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। শিক্ষিত ভারতবাসী পুরাতন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে মত্ত। সর্বত্র তখন প্রচণ্ড বিতর্ক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে কেন্দ্র করে এবং স্বভাবতই পাশ্চাত্যের প্রাধান্য স্বীকৃত। বলা বাহুল্য, স্বামীজীও এই যুগপ্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাঁরও মনে নানা দ্বন্দ্ব, নানা প্রশ্ন। মনে দ্বন্দ্ব ছিল বলেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আবার এই দ্বন্দ্বের জন্যই তিনি ব্রাহ্মসমাজের বাইরে চলে এসেছিলেন। এই দ্বন্দ্বে বিশেষভাবে ইন্ধন জুগিয়েছিল তাঁর বাড়ির পরিবেশ। তাঁর মা-ই তাঁকে প্রথম প্রাচ্যজগতের সঙ্গে

৩। মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।১।৩

৪। 'শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে (স্বামীজীকে) দেখিয়া বলিলেন, "কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন? চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব।" ' [যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৮৪]

পরিচয় করিয়ে দেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ব্রতকথা—তাঁর মায়ের কণ্ঠস্থ ছিল। মুখে মুখে তিনি তাঁর আদরের 'বিলে'কে শিখিয়েছিলেন ত্যাগের মহিমার কথা, সত্য কি করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়, প্রেম ও অহিংসার মহত্ত্বই যে শ্রেয়, তার কথা। পিতামহ ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁর স্মৃতিচারণ শুনে শুনেও স্বামীজীর স্বভাবসিদ্ধ ত্যাগ নিশ্চয়ই আরও উদ্দীপিত হয়েছিল। আবার, তাঁর ব্যবহারজীবী বাবার মজলিসের আলোচনাও তাঁকে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে বাধ্য করত। মায়ের সাহচর্য তাঁকে বিশ্বাসের যে দৃঢ় ভূমির উপর দাঁড় করিয়ে দিত, বাবার বন্ধুবান্ধব ও মক্কেলদের সাহচর্য তাঁকে সেই দৃঢ় ভূমি থেকে পরমুহূর্তেই উৎক্ষিপ্ত করে দিত। তাঁর বাবার মজলিস এক অদ্ভুত শিক্ষাস্থল ছিল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সব মতের ও পথের লোকের অবাধ যাতায়াত ছিল সেখানে। সবাই স্বাধীনভাবে নিজের কথা বলতে পারতেন সেখানে। তবে যিনি যা-ই বলুন, যুক্তির সঙ্গে বলতে হবে। ঈশ্বর আছেন যেমন বলা চলবে, ঈশ্বর নেই তেমনই বলা চলবে। সুতরাং প্রচুর তর্কবিতর্ক হত, যুক্তির লড়াই লেগেই থাকত। আশ্চর্যের বিষয়, স্বামীজী যখন বালক, তখন থেকেই এই লড়াই-এর একজন উৎসাহী শরিক। তর্কের বিষয়বস্তু যা-ই হোক, তাঁর বাবা নরেন্দ্রনাথের কি মত জানতে চাইতেন, আর আত্মসচেতন বালক নরেন্দ্রনাথও অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তাঁর যা বক্তব্য তা জানিয়ে দিতেন। প্রতিপক্ষ বিদ্যায় ও বয়সে যতই বড় হোন, তাঁদের মত অযৌক্তিক মনে হলে তাকে আক্রমণ করতেও স্বামীজীর এতটুকু দ্বিধা হত না। সে প্রতিপক্ষ তাঁর বাবা হলেও না। এ ডেঁপোমির জন্য পাড়ায় স্বামীজীর যে যথেষ্ট দুর্নাম ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু তিনি বকাটে বা ডেঁপো যা-ই হোন, কথায় ও যুক্তিতে তাঁর বুদ্ধি পরিণত বয়সের মানুষের মতো। তাঁর বাবা বিশ্বনাথবাবু নিজে স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী, অপরের স্বাধীন চিন্তাতেও হস্তক্ষেপ করা পছন্দ করতেন না। তাঁর ছেলের স্পষ্টবাদিতায় তাঁর বন্ধুরা ক্ষুব্ধ হলেও তিনি বাধা দিতেন না, কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, স্বামীজী বয়সে কম হলেও সব সময়েই যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতেন।

স্বামীজী তাঁর বাবা-মার কাছ থেকে অনেক মানবিক গুণ পেয়েছিলেন যা পরে পূর্ণভাবে বিকশিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্তের প্রভাবে। বিশ্বনাথবাবু অকাতরে দান করে যেতেন (মধ্যম পুত্র মহেন্দ্রনাথের মতে, এ তাঁর একটা ব্যামোর মতো ছিল) এবং এ-বিষয়ে পাত্রাপাত্র বিচার করতেন না। যে ব্যক্তি নেশাখোর, যাকে সাহায্য করলে সে হয়তো সবটুকু নেশার জন্যই খরচ করবে, সব জেনেশুনেও তিনি তাকে সাহায্য করতে দ্বিধা করতেন না। এ-বিষয়ে একবার স্বামীজী আপত্তি করলে বিশ্বনাথবাবু বলেছিলেনঃ 'জীবনটা যে কত দুঃখের তা তুই এখন কি বুঝবি? যখন বুঝতে পারবি, তখন এ দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিক নিস্তারলাভের জন্য যারা নেশাভাঙ্গ করে, তাদের পর্যন্ত দয়ার চক্ষে দেখবি।'[৫] পরবর্তী জীবনে এসব লোককে দয়ার চোখে দেখেননি স্বামীজী, শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। শ্রদ্ধা এই কারণে যে, তাদের মধ্যেও দেবত্ব আছে।

৫। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১-২

দয়া করলে ছোট করা হয়। কেউ তাঁর কাছে ছোট নয়, ঘৃণ্য নয়—তা সে যত অন্যায়ই করুক।

স্বামীজীর সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মন আমাদের মুগ্ধ করে। যাচাই না করে শুধু অমুক বলেছেন বলে কোন জিনিস মেনে নেওয়া তাঁর ধাতে ছিল না। ডানপিটে স্বভাব তাঁর চিরকালের। গাছে ব্রহ্মদৈত্য আছে বলে সেই গাছে তিনি উঠবেন না, এমন পাত্র তিনি ছিলেন না। সেই গাছে উঠতেই হবে তাঁকে, শুধু দেখবার জন্য সত্যি সত্যিই ব্রহ্মদৈত্য আছে কিনা। অপর জাতের হুঁকোয় তামাক খেলে জাত যায় বলে শুনেছিলেন বালক নরেন্দ্রনাথ। সত্যিই কি যায়? কিভাবে যায়, কোন্ দিক দিয়ে যায়? তা পরীক্ষা না করে মেনে নেওয়া সেই আশ্চর্য বালকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরীক্ষার জন্য তিনি বিভিন্ন হুঁকোয় টান দিয়ে দেখেছেন। বাবার কাছে ধরা পড়ে গেলেন, কিন্তু এমনই বাবা যে, আপত্তি করলেন না। এই ডানপিটে স্বভাব বোধহয় সবচেয়ে খুশি করেছিল তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণকে। এক জায়গায় দেখছি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেনঃ '(নরেন্দ্র) আমারই অপেক্ষা রাখে না!' এ বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন গর্ববোধ করছেন। কেন করছেন? কারণ বুঝেছেন, সত্যের অনুসন্ধান যে করছে, তার কোন অবস্থাতেই আপস করা চলে না। সে নিষ্ঠুর হয়, নির্মম হয়, রূঢ় ব্যবহার করে, মোলায়েম কথা বলতে সে জানে না। স্বামীজীকে শেষ দিন পর্যন্ত লোকে ভুল বুঝেছে তাঁর স্পষ্টবাদিতার জন্য। কিন্তু কোমলহৃদয় স্বামীজী কখনও কাউকে জেনেশুনে বা ইচ্ছা করে আঘাত করেননি। সত্যকথা বলতে গিয়ে তাঁকে লোকদেখানো সৌজন্য ত্যাগ করতে হয়েছে হয়তো, কিন্তু তা করেছেন আঘাত করার উদ্দেশ্যে নয়, শুধু সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য। তাঁর এক অপূর্ব বাণীঃ 'সত্যের জন্য সবকিছুকেই ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোন কিছুরই জন্য সত্যকে বর্জন করা চলে না।'[৬] এই বাণীই স্বামীজীর প্রকৃত পরিচয়, কিন্তু এই বাণী তিনি প্রথম শোনেন তাঁর মায়ের মুখে যখন তিনি সত্য ভাষণের জন্য শিক্ষকের হাতে নিগৃহীত হয়ে স্কুল থেকে বাড়িতে ফেরেন। তাঁর মা বলেনঃ 'বাছা, তোমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে এতে কি আসে যায়? ফল যা-ই হোক না কেন, সর্বদা যা সত্য বলে মনে করবে, তা-ই করে যাবে। অনেক সময় হয়তো এর জন্য অন্যায় ও অপ্রীতিকর ফল সহ্য করতে হবে, কিন্তু তবু সত্য কখনও ছাড়বে না।'[৭] মায়ের এই শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হল যখন তিনি গুরুকে বলতে শুনলেন এবং তাঁর আচরণে দেখলেন, 'সত্যই কলির তপস্যা।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব সব ত্যাগ করতে পেরেছিলেন, পারেননি কেবল সত্যকে ত্যাগ করতে। স্বামীজী মায়ের কাছে যা শিখেছিলেন, তার অখণ্ড, বাস্তব রূপ দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

মায়ের কাছে স্বামীজী যে-ধর্মশিক্ষা পেয়েছিলেন, তাতে বিশ্বাস ছিল, যুক্তি তত ছিল না। যুক্তির তুলাদণ্ডে পরীক্ষা করার প্রথম শিক্ষা পেলেন যখন তিনি বাবার মজলিসে যাতায়াত শুরু করলেন। কলেজে ও ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে যুক্তি

৬। বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩২১
৭। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৫

দিয়ে বিচার করার ঝোঁক তাঁর অভ্যাসে পরিণত হল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যখন গেলেন তখন এ অভ্যাস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে তাঁকে প্রিয়তর করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে তর্ক করতে উৎসাহ দিতেন, বাধা দেওয়া দূরে থাকুক। তাঁর অনেক কথা স্বামীজী মানতেন না, তাতে তিনি খুশিই ছিলেন। হয়তো জানতেন ক্রমে সবই মানবেন স্বামীজী। একসময়ে তিনি স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেন। দেখা গেল, স্বামীজী কিন্তু তবু তাঁর কাছে আসেন। আসেন আর যান, শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু একটি কথাও তাঁর সঙ্গে বলেন না। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি তো তোর সঙ্গে কথা বলি না, তবু তুই আসিস কেন? স্বামীজী বলেছিলেন ঃ ভালবাসি আর আপনাকে দেখতে চাই তাই আসি, আমি কি আপনার কথা শুনতে এখানে আসি?[৮] অনেক সময় আমরা দেখি শ্রীশ্রীঠাকুর হয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বা গিরিশচন্দ্র ঘোষ বা আর কারও সঙ্গে স্বামীজীর তর্ক বাধিয়ে দিচ্ছেন। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, যুক্তি দিয়ে সবকিছু যাচাই করে নেবার যে-গুণ স্বামীজীর তা আরও ফুটে উঠুক।

বস্তুত আদর্শ শিক্ষক ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজী স্বয়ং এই সাক্ষ্য দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাস্টারমশায়কে বলছেন তর্ক না করতে, আর স্বামীজীকে বলছেন তর্ক করতে। অর্থাৎ যার যা ভাব। স্বামীজী যুক্তিবাদী, তাই যুক্তি দিয়ে কত এগুনো যায়, তা দেখতে উৎসাহ দিচ্ছেন; বোধহয় স্বামীজী লোকগুরু হবেন এইজন্যই। লোকশিক্ষা দিতে গিয়ে তাঁকে বহু প্রকার মতের সম্মুখীন হতে হবে, তাঁর যুক্তিতর্ক পাকা হোক, এই চেয়েছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। নিজেকে মারতে একটা নরুন যথেষ্ট; অপরকে মারতে হলে ঢাল-তরোয়াল দরকার—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সার্থক উক্তির সমর্থনে এই ব্যবস্থা।

স্বামীজীকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।[৯] তাঁর নিজের প্রয়োজনে। কি সেই প্রয়োজন? শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে যে, সে ক্ষুদ্র নয়, মহৎ। স্বয়ং ঈশ্বর। সে নিজেকে জানে না, তাই এত দুঃখ পায়। অসহায় মনে করে, তাই কেবল কাঁদে। নিজের যে-দিকটা দেখেছে, তা নিশ্চয়ই মলিন, কিন্তু সেই দিকটাই তার আসল দিক নয়। ইচ্ছা করলেই সে সমস্ত ধুলোকাদা ঝেড়েমুছে ফেলতে পারে, তার যে আসল রূপ, যে রূপ সুন্দর, মহৎ, পবিত্র, যে রূপে সঙ্কীর্ণতা নেই, দ্বেষ-হিংসা নেই, প্রেম আছে, সত্য আছে, সেই রূপ অর্থাৎ তার স্বরূপ, প্রকাশ করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে আশা, আশ্বাস ও সাহস দিতে এসেছিলেন। মানুষ ভয়ার্ত, তার নিজের কাছে সে পরাস্ত; কিন্তু এইটাই সব নয়। তার পতন আছে, কিন্তু উত্থানও আছে। পতনের পরেই হয়তো বিরাট উত্থান অপেক্ষমাণ। শুধু সে জানে না।

৮। Life of Swami Vivekananda, Vol. I, Fifth Edition (1979), p. 99

৯। 'Shri Ramakrishna...moulded him according to the ideal he had in view—the ideal which became incarnate in the Swami Vivekananda.' [Life of Swami Vivekananda, Vol. I, p. 145]

ধর্মের সার্থকতা এই যে, তা মানুষকে তার ঊর্ধ্বতম যে নিয়তি, সেই নিয়তির দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে তাকে এগিয়ে যেতে বলে। শুধু তাকে লক্ষ্যের কথা বলে না, সেই লক্ষ্যে কি করে পৌঁছাতে হবে সেকথাও বলে দেয়। যেযুগে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, ধর্ম নিয়ে তখন অনেক তর্কবিতর্ক। একদল ধর্মকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছিলেন, কারণ তাঁদের মতে ধর্ম যুক্তিবিরোধী। অন্যেরা নিজেদের ধর্মমতই সত্যিকারের ধর্ম, একমাত্র ধর্ম বলে জানতেন। পরস্পরে কী ঈর্ষা! আবার আর একদল ধর্ম মানে আচার-বিচার, লৌকিকতা, যা ধর্মের বাইরের দিক, তা ছাড়া আর কিছু জানতেন না। ধর্মের যা মর্মকথা, প্রাণকেন্দ্র—ত্যাগ-বৈরাগ্য, সত্যনিষ্ঠা, মানবপ্রেম—তা জানার বা অনুশীলনের কোন উৎসাহ ছিল না তাঁদের। ধর্ম আচরণের বিষয়, শুধু তর্ক ও বিচারের বিষয় নয়, শুধু কথা ও মত নয়, বুদ্ধির খেলা নয়। ধর্ম নিয়ে যখন এত সঙ্ঘর্ষ ও কোলাহল, সেই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি তাত্ত্বিক বিচার জানতেন না বা বুঝতেন না, বুঝতেন যো-সো করে লক্ষ্যে পৌঁছানো, ঈশ্বরলাভ করা। আম খাওয়া বুঝতেন, আমবাগানে কত গাছ, কত আম ফলেছে, কত তার দাম—এ হিসাবে তাঁর দক্ষতা বা রুচি ছিল না। ধর্মমত তাঁর কাছে গৌণ, ধর্মই মুখ্য। ঈশ্বর সব ধর্মের কেন্দ্রস্থল। ছোটবড় সব মত ও পথ দিয়ে ঈশ্বরকে তিনি জেনেছিলেন ও পেয়েছিলেন—নানা ভঙ্গিতে, নানা ভাবে। ঈশ্বর কারও একচেটে নয়, সকলের। চাঁদামামা সকলের মামা। কেউ তাঁর 'ইতি' করতে পারে না। নুনের পুতুল সমুদ্রে কত জল মাপতে পারে না। তিনি কে এবং কি একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। তবু মানুষ তার জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করে। প্রত্যেকে তার রঙীন চশমা দিয়ে তাঁকে দেখে। এই দেখা সার্থক যদি তার পিছনে ব্যাকুলতা থাকে। যে ব্যাকুল, তাঁকে সত্যি সত্যিই চায়, একদিন সে তাঁকে পাবেই পাবে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ কোন মত ও পথকে তুচ্ছ মনে করেননি। সব মত ও পথকে শ্রদ্ধা করেছেন। বলেছেনঃ 'যত মত তত পথ।' লক্ষ্য এক কিন্তু পথ বহু। বহু পথের প্রয়োজন এই কারণে যে, সব মানুষ এক রকমের নয়। 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।' যার পেটে যা সয়। শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন মানুষ তার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোক। যেভাবে তা সম্ভব, সেইভাবেই হোক। সে যেন অল্পে সন্তুষ্ট না হয়। '...নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্...।'[১০] এগিয়ে যাও, আরও, আরও—এই ছিল তাঁর বাণী। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম তিনি প্রচার করেননি। কোন দল তিনি গড়েননি। যা নিত্য-সত্য, সর্বজনীন, শুধু তা-ই প্রচার করেছেন। খালি পেটে ধর্ম হয় না—বলতেন। কিন্তু ভরা পেটই সব, দৈহিক সুখই একমাত্র সুখ—এ মানতেন না। মানুষই ভগবান, বলতেন। জীব শিব। তাই জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে পূজা।

অপূর্ব মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, অপূর্ব তাঁর বাণী। 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'[১১]—কথা নতুন নয়, কিন্তু তার প্রয়োগকৌশল নতুন। সমাজজীবনে কি এর প্রয়োগ করা যায়? মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কি এই ভিত্তিতে সম্ভব? সবার মধ্যে এক ঈশ্বর, সবাই আমরা এক—এই বাণী কি বাস্তবে রূপায়িত করা যায়? এক মানবগোষ্ঠী, এক পরিবার, এক

১০। ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৭।২৩।১ ১১। ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা—শঙ্করাচার্য, ২১

মানুষ, এক পৃথিবী—এ ঐক্য কি শুধু স্বপ্নবিলাস? ঐক্য স্বপ্নবিলাস হোক আর যা-ই হোক, বৈচিত্রকে স্বীকার করতেই হবে। বৈচিত্র প্রকৃতির নিয়ম। মত ও পথ, ভাষা, বিশ্বাস, আচার ও আচরণ, আহার, বেশভূষা, বিবাহ, দেহের রঙ, সমাজব্যবস্থা—এর বৈচিত্র থাকবেই। কিন্তু এই অনৈক্যের পশ্চাতে যে মহান ঐক্য বিদ্যমান, তার স্বীকৃতিও চাই। সুখসমৃদ্ধি অবিভাজ্য। শান্তি অবিভাজ্য। প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনও নয়। এমনকি কেবল সহাবস্থানও নয়। শুধু ভালবাসা আর সহমর্মিতা। একের জন্য অপরের। একের দুঃখে অপরের দুঃখ, একের সুখে অপরের সুখ। বঞ্চনা নয়, প্রেম, প্রীতি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই আদর্শের প্রতীক। শুধু ধর্মের রাজ্যে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও। তিনি এমন একজনকে চেয়েছিলেন যিনি তাঁর হয়ে এই বাণী মানুষকে শোনাবেন। সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দ। রূপে, গুণে, চরিত্রে অদ্বিতীয় পুরুষ। বুদ্ধের হৃদয়, শঙ্করের মেধা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সব শক্তি উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁকে। নিজের ভাবে নিজের হাতে তাঁকে গড়েছিলেন। কাদার তালের মতো।[১২] বলেছিলেনঃ 'নরেন শিক্ষে দিবে।' নরেন্দ্র বলেছিলেনঃ 'আমি ওসব পারব না।' তবুও ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেনঃ 'তোর ঘাড় করবে।'[১৩] স্বামীজীর পরবর্তী জীবন সাক্ষ্য দেয় কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে খাটিয়ে নিয়েছিলেন। স্বামীজী যা-কিছু বলেছেন বা করেছেন, তা তাঁর নিজস্ব নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের।

শ্রীরামকৃষ্ণ যন্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ যন্ত্র। একথা বলছেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং। বলছেনঃ ' তিনি (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ) অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনই তৈরী হতে পারে। তবে তিনি তা না করে ইচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এরূপ করাচ্ছেন...।' [১৪] এ গুরুভক্তির উচ্ছ্বাস নয়, সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া। স্বামীজী বলতেনঃ '...এ জন্ম এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।'[১৫] এই আত্মনিবেদন একদিনে হয়নি। অনেকদিন তাঁকে দেখেছেন, অনেকভাবে দেখেছেন, দেখতে গিয়ে অনেক সময় নিষ্ঠুরও হয়েছেন। স্বামীজীর ভাব বরাবরই এই ছিল, যেটা ভুল বলে জানব, সঙ্গে সঙ্গে তা ত্যাগ করব। তার আওতায় সব পড়ে—গুরু, ধর্ম, সন্ন্যাস। তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় গাজীপুরের পওহারী বাবার কাছে তাঁর যাতায়াত করার ঘটনা থেকে। পওহারী বাবা যদি বড় হন, তবে তিনিই তাঁর গুরু হবেন—এই চেয়েছিলেন স্বামীজী। কিন্তু পওহারী বাবা তাঁরই সাহায্যপ্রার্থী দেখে ভুল বুঝলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বুঝেছিলেন, তাঁর গুরু অতুলনীয়, তাঁর কোন কথা বা সিদ্ধান্ত ভুল হয় না। নিবেদিতাকে লেখা এক পত্রে দেখি এই স্বীকারোক্তি।

স্বামীজীর কথা আমাদের চমক লাগিয়ে দেয়, কিন্তু তাঁর সব কথার উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজী নিজে একথা বার বার বলেছেনঃ '...আমি যা তা সর্বদা তাঁরই কল্যাণে হয়েছে; আমাতে, আমার কথাতে যা-কিছু মঙ্গলময়, সত্য বা শাশ্বত আছে, তা আমি তাঁরই

১২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ—স্বামী সারদানন্দ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃঃ ৯৩-৪ ১৩। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯৭-৯৮

১৪। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৫৮

১৫। তদেব, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২০৪

শ্রীবদন, তাঁরই হৃদয়, তাঁরই আত্মা থেকে পেয়েছি।'[১৬] '...যদি আমি জগতের কোথাও সত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি কথাও বলিয়া থাকি, তাহা আমার গুরুদেবের—আর ভুলভ্রান্তিগুলি আমার।'[১৭] কথাগুলো অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু সত্য। স্বামীজীর সমস্ত বাণীর মূল সুর—জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়, জীব শিবই। তাই জীবপ্রেম শিবপ্রেম। তিনি ঘোষণা করেছিলেনঃ আমরা সেই ভগবানেরই সেবক যাদের অজ্ঞেরা মানুষ বলে।[১৮] দুষ্ট যারা, সমাজের হেয় যারা, তারাও তাঁর কাছে নারায়ণ। কিন্তু এই দৃষ্টি তিনি পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। দক্ষিণেশ্বরে একদিন বৈষ্ণবদের 'জীবে দয়া' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন, তারপর অর্ধবাহ্যদশায় বললেনঃ 'জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!'[১৯] উপস্থিত সকলেই কথাগুলো শুনে গেলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ কথাগুলোর মধ্যে নতুন আলো খুঁজে পেলেন। বুঝলেনঃ বেদান্তজ্ঞান শুষ্ক, কঠোর, নির্মম নয়; অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করবার জন্য জগৎসংসারকে ঘৃণা করে অরণ্যে চলে যাবারও প্রয়োজন নেই। সংসারের সব কাজে বেদান্তকে অবলম্বন করা যায়, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়। শুধু প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। প্রয়োজন এই সত্যের উপলব্ধি যে, জীবজগৎ ঈশ্বরেরই প্রকাশ; প্রতিটি জীবই আসলে শিব। নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প করলেনঃ আজ যে অদ্ভুত সত্য শুনলাম, যদি ভগবান দিন দেন জগতের সর্বত্র তা প্রচার করব।[২০] এই সঙ্কল্প রক্ষা করেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে জগৎ বিবেকানন্দের কাছ থেকে কর্ম-পরিণত-বেদান্তের অপূর্ব তত্ত্ব শুনে মোহিত হয়েছে, 'নরনারায়ণ সেবা'র মহামন্ত্র লাভ করে ধন্য হয়েছে কিন্তু তা বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'রই বাণী। কেবল ভাষা ভিন্ন, প্রকাশ-কৌশল ভিন্ন। বিবেকানন্দের মানবপ্রেমও তাঁর গুরুদেবেরই দান। তিনি চেয়েছিলেন নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে, শুকদেবাদির মতো শরীর রক্ষার জন্য যতটুকু দরকার, শুধু ততটুকু মন শরীরের দিকে দেবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেনঃ 'ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা! নারে, এত ছোট নজর করিসনি।'[২১] শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি দেখছেন, গলরোগের দুঃসহ যন্ত্রণা উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্মপ্রসঙ্গ করতে। কেউ নিষেধ করলে তিনি বলেছেনঃ 'কি! দেহের কষ্ট!... যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, সেজন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।'[২২]

১৬। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৫), পৃঃ ২৮৮

১৭। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৯০

১৮। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VIII, Advaita Ashrama, Calcutta, Third Edition (1959), p. 349

১৯। লীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৪০ ২০। তদেব, পৃঃ ২৪১

২১। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৮২-৮৩ ২২। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৮

শ্রীরামকৃষ্ণ

শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে গৃহীত ১৮৯৩

বলেছেন ঃ আমি বার বার জন্মাতে রাজী আছি, এমনকি কুকুর হয়েও জন্মাতে রাজী—যদি তাতে একজন লোকেরও সাহায্য হয়।[২৩] শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখেছিলেন বলেই, যে-নরেন্দ্রনাথ এক সময় নির্বিকল্প সমাধির জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে বলেছেন ঃ '...আমায় যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেব। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব।'[২৪]

যত উচ্চ চিন্তা, যত উচ্চ ভাব, সবই স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব, তিনি ভাষা। শ্রীরামকৃষ্ণ সূত্র, তিনি ভাষ্য। বস্তুত এক সত্তা, যেমন অগ্নি, আর তার দাহিকাশক্তি। যেমন দেহ, আর আত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—এঁদের দুজনকে আলাদা করে ভাবা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং স্বামীজীকে একবার বলেছিলেন ঃ '...তুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি ওটাও আমি।'[২৫] স্বামীজী বলতেন ঃ 'আমি দেহহীন এক কণ্ঠস্বর।'[২৬] কিন্তু কার কণ্ঠস্বর? শ্রীরামকৃষ্ণের। যে ভারত নিত্য ও শাশ্বত তার প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ। এ ভারত ধ্যানমগ্ন, আত্মসমাহিত। সত্যানুসন্ধান তার তপস্যা। দরিদ্র, নিষ্পিষ্ট, তবু সতেজ, বলীয়ান, তরুণ। অতি প্রাচীন, অথচ অতি নতুন। আত্মা অমর, দেহ মরণশীল—এই সত্যের সার্থক উদাহরণ। ভারতের অধ্যাত্মসাধনার রূপকার, জ্যোতির্ময়, অমর ভারতের আত্মা এই শ্রীরামকৃষ্ণ। বিবেকজীবনের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি, তা আগামীকালের জন্যই রাখা আছে। সেদিনই প্রমাণিত হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অগ্নি, আর বিবেকানন্দ তাঁরই দাহিকাশক্তি।

স্বামীজী যেসব ভাব প্রচার করেছেন, তা কতটা শ্রীরামকৃষ্ণের এবং কতটা তাঁর নিজস্ব এ-বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ ভাবতেন, এ তাঁর বিদেশ থেকে ধার করে আনা জিনিস। একবার স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী যোগানন্দ এই সন্দেহ প্রকাশ করে বসলেন। তিনি বললেন ঃ 'তোমার এসব বিদেশী ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরকম ছিল?' স্বামীজী বললেন ঃ 'তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।'[২৭] স্বামীজী বলতেন ঃ '...ঠাকুরের মতো এমন পুরুষোত্তম জগতে এর আগে আর কখনও আসেননি।'[২৮] আর তাঁর এবং তাঁর গুরুভাইদের জন্ম হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব ত্রিজগতে ছড়িয়ে দিতে। পাশ্চাত্যদেশে থাকার সময় স্বামীজীকে অনেক সময় সপ্তাহে বারো/চৌদ্দটা করে বক্তৃতা করতে হত। কি বিষয়ে বলবেন, এই ছিল তাঁর সমস্যা। রোজ তো আর নতুন বিষয় খুঁজে বের করা যায় না। কি বিষয়ে পরের বক্তৃতাটা দেবেন এই নিয়ে চিন্তা করতে করতে অনেক সময় তন্দ্রাগত হতেন। ঠিক এই সময়ে

২৩। The Life of Ramakrishna—Romain Rolland, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition (1970), p. 258 ২৪। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪২১
২৫। লীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২২৭
২৬। 'I am a voice without a form.' [বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৫৫]
২৭। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৫৭ ২৮। তদেব, পৃঃ ৬০

তিনি দেখতেন কে যেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে যাচ্ছে। কত নতুন কথা, নতুন ভাব—যা তিনি কখনও শোনেননি, ভাবেনওনি। এইভাবে ঘুমের ঘোরে যা শুনতেন তা থেকেই তিনি বক্তৃতার বিষয়বস্তু পেয়ে যেতেন। পরের বক্তৃতায় ঠিক তা-ই বলতেন। এতেই লোকে তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হত। এমন সব কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুত যা তিনি কখনও ভাবেননি। তাঁর কথাই তাঁকে অবাক করে দিত।[২৯] শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে দিয়ে বলাতেন এসব কথা।

স্বামী বিবেকানন্দ অনেক কথা বলেছেন যা আশ্চর্যজনকভাবে নতুন, বিজ্ঞানসম্মত। আবার অনেক কথা বলেছেন যা অতি পুরাতন। বস্তুত যা সত্য তা-ই বলেছেন। সত্য চির নতুন, চির পুরাতন। পরিবর্তন জীবনের ধর্ম। পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। আহার, পোশাক, জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা, ধর্মাচরণ, সাহিত্য, শিল্প—অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, আদরণীয়, তেমনই জীবনের উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয়। কিন্তু কি এই উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য—মানুষের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে তার বিকাশ। বিকাশ মানে শুধু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য নয়, মনের উৎকর্ষও। মনের সম্পদই প্রকৃত সম্পদ। বুদ্ধ খ্রীষ্ট নমস্য, কারণ তাঁদের মনের সম্পদ সর্বাধিক। এই সম্পদকেই স্বামীজী দেবত্ব বলেছিলেন। এ সম্পদের বৃহত্তম রূপকেই ঈশ্বর বলা হয়। তাই চরম বিকাশ ও ঈশ্বরলাভ একার্থক। ধর্ম এই বিকাশে সাহায্য করে, তাই ধর্ম সার্থক। ধর্ম মানে মতবাদ নয়, ধর্ম মানে সংগ্রাম। যে সংগ্রামে দেহ-মনের উৎকর্ষ হয়, যার দ্বারা সুপ্ত দেবত্ব জাগ্রত হয়, মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে, নিজের মহত্ত্বকে জানে বা চেনে, তা-ই ধর্ম। বিজ্ঞানও এই অর্থে ধর্ম। দেহের জন্য বিজ্ঞান এবং মনের জন্য ধর্ম। ধর্ম ও বিজ্ঞান একই সত্যের এপিঠ-ওপিঠ। অঙ্গাঙ্গি। ধর্মকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে ধর্ম অসম্ভব। তাই উভয়ের সমন্বয় স্বামীজী চেয়েছিলেন। মানবমুক্তির পথ এই সমন্বয়ে।

স্বামীজী জন্মেছিলেন বিরাট প্রতিভা নিয়ে, কিন্তু সেই প্রতিভার উন্মেষ হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্যে। তাঁর সেই প্রতিভা স্বামীজী উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায়। বলেছিলেনঃ

> গাই গীত শুনাতে তোমায়,
> ভাল মন্দ নাহি গণি,
> নাহি গণি লোকনিন্দা যশকথা।[৩০]

কিন্তু কে এই শ্রীরামকৃষ্ণ? কোন ব্যক্তি, কোন মত, সম্প্রদায়? শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ, মানবকল্যাণের আদর্শ। যে আদর্শ মানুষকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর, সুন্দরতম করে, মহৎ থেকে মহত্তর, মহত্তম করে। মানুষের 'কাঁচা আমি'কে ভেঙে 'পাকা আমি'কে আরও পাকা করে। যে আদর্শ মানুষকে শেখায় 'নাহং, তুঁহু'; আমি নই, তুমি। তুমি অর্থাৎ ঈশ্বর, যিনি জীব, জগৎ সব হয়েছেন। যে আদর্শ বলতে শেখায়ঃ মুচি মেথর আমার রক্ত, আমার ভাই, যতক্ষণ একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমার ধর্ম

২৯। তদেব, পৃঃ ৭৩-৪ ৩০। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ২৭২

হবে তাকে খাওয়ানো। যে আদর্শ মানুষকে একাত্মতা শেখায়, শেখায় অন্যের দুঃখ আমার দুঃখ, অন্যের সুখ আমার সুখ। শেখায়ঃ 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। শেখায়ঃ

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।[৩১]

শ্রীরামকৃষ্ণ উৎস, স্বামী বিবেকানন্দ গতি, পরিণতি। শ্রীরামকৃষ্ণ গোমুখী, স্বামী বিবেকানন্দ গঙ্গাসাগর। এ দুয়ের মাঝখানে অসংখ্য ভাব, চিন্তা, অনুভূতি, কল্পনার তরঙ্গ, আলোড়ন। দেব ও মানব প্রকৃতির অভিনব বিলাস। স্বর্গ ও মর্তের সেতুসংযোগ। ঈশ্বর মানবরূপে এসেছেন, হেসেছেন, কেঁদেছেন, কতভাবে লীলা করেছেন। বিবেকচিন্তা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রাপ্তির সোপান, জীবকে শিব করার প্রক্রিয়া। এ চিন্তা মানুষকে 'মানহুঁশ' করে। মানুষের মধ্যে চৈতন্য জাগিয়ে তুলতেই তো এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ! তারজন্যই তো তাঁর বিবেকানন্দ-যন্ত্রের প্রয়োজন হয়েছিল। তারই জন্য তো সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে তাঁকে টেনে এনেছিলেন।

৩১। তদেব, পৃঃ ২৬৯

বিবেকানন্দ-বিচার

॥ ১ ॥

বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রের 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদটির ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর লিখেছেন ঃ 'ব্রহ্মণঃ ইতি কর্মণি ষষ্ঠী।' 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—এই সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য হচ্ছে, 'ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা'—ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা। 'ব্রহ্মের'—এই ষষ্ঠ্যন্ত পদে কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়েছে বুঝতে হবে, অর্থাৎ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসার অর্থ ঃ ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছা। আচার্যের চরণচিহ্ন অনুসরণ করে 'বিবেকানন্দ-বিচার'—এই সমাসবদ্ধ পদটিতেও আমরা 'কর্মণি ষষ্ঠী'—কর্মে ষষ্ঠী গ্রহণ করছি। কারণ, যদি কর্তায় ষষ্ঠী গ্রহণ করি, তাহলে পদটির অর্থ দাঁড়ায় বিবেকানন্দ-কৃত বিচার, অর্থাৎ বিবেকানন্দের চিন্তাধারা। ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিবেকানন্দের নানান বিচার রয়েছে। সেগুলির অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও একটি অতি দীর্ঘ প্রবন্ধেও করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই গ্রন্থেই বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীজীর বিচারসমূহ প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা আলোচিত। সুতরাং 'বিবেকানন্দ-বিচার' বলতে আমরা 'বিবেকানন্দকে বিচার' এই অর্থ গ্রহণ করছি। স্বামীজীকে তাঁর বাণী এবং কর্ম সম্পর্কে অনেকেই বিচার বা সমালোচনা করেছেন, তাঁর জীবৎকালেই এবং পরেও— স্বদেশে এবং বিদেশে ; এখনও বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি তা করে থাকেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। এতে কিছু দোষ নেই, যদি সত্যনির্ণয়ের জন্যই সে বিচার হয়—যদি কোন গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের স্বার্থে কলুষিত দৃষ্টি নিয়ে সে বিচার করা না হয়। মহামনীষীদের সম্পর্কে যুগে যুগে এই ধরনের বিচার করা হয়েছে ; সুতরাং মহান চিন্তানায়ক বিবেকানন্দকেও যে চিন্তাশীল মানুষ নিজ নিজ সীমিত বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই প্রমাণ করে যে, স্বামীজী লোকোত্তর মহামানব। ভবভূতি বলেছেন ঃ 'লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি।'—লোকোত্তর পুরুষদের মনের কথা বোঝবার সামর্থ্য কার আছে? স্বামীজীর ক্ষেত্রে একথার সত্যতা যে কত গভীর ও ব্যাপক তা বিবেকানন্দ-বিচার পরিক্রমায় অনায়াসেই বোঝা যায়।

॥ ২ ॥

বিবেকানন্দ-বিচার প্রসঙ্গে যেকথা প্রথমেই বিশেষ করে মনে পড়ে সেটি হচ্ছে সন্ন্যাসীর কর্মযোগ। এই বিচারের সূত্রপাত রামকৃষ্ণ মিশনের জন্মকালেই এবং এখনও তা অল্পবিস্তর অব্যাহত আছে। ১ মে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে বলরাম-মন্দিরে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। ৫ মে দ্বিতীয় অধিবেশনে ঐ সমিতির কার্যপ্রণালী আলোচিত ও গৃহীত হয়। কার্যপ্রণালীতে ছিল ঃ 'মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ,

শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহ-বর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণ-জীবনে যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।'[১] স্বামীজী স্বয়ং ঐ সমিতির সাধারণ সভাপতি হন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ তাঁর সহকারী হন। সভাশেষে সভ্যগণ চলে গেলে স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীকে বলেনঃ 'তোমার এসব বিদেশী ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরকম ছিল?'[২] স্বামীজী উত্তর দেনঃ 'তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।...

'স্বামী যোগানন্দ। তুমি যা ইচ্ছে করবে, তা-ই হবে। আমরা তো চিরদিন তোমারই আজ্ঞানুবর্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এসব করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জানো, মধ্যে মধ্যে কেমন খটকা আসে—ঠাকুরের কার্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কিনা; তাই মনে হয়, আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চলছি নাতো? তাই তোমায় অন্যরূপ বলি ও সাবধান করে দিই।

'স্বামীজী। কি জানিস, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়।... তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনই তৈরী হতে পারে। তবে তিনি তা না করে ইচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এরূপ করাচ্ছেন, তা আমি কি করব—বল্?'[৩]

স্বামীজীর উপরি-উক্ত কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ঈশ্বরকোটি স্বামী যোগানন্দের মনের সংশয় মিটে যায়। কিন্তু তিনিই যে একা এই ধরনের সংশয় পোষণ করেছিলেন তা নয়। কথামৃতকার শ্রীম-র মনেও এই সংশয় জেগেছিল। একদিন তিনি স্বামীজীকে বলেনঃ 'দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বলো, সে তো মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ—সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটানো, তখন ওসব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি?'[৪] স্বামীজী বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই উত্তর দেনঃ 'মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা তো নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি?' শ্রীম নীরব।

তখনকার মতো নীরব হলেও শ্রীম-র মনে এই সংশয় পরবর্তীকালেও ছিল। তিনি এবং আরও কেউ কেউ বলতেনঃ 'ওরা (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী-শিষ্যেরা) ঠাকুরের প্রকৃত জীবন ভুলে অন্যপথে চলেছে।'[৫] স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থটির রচনার অন্যতম কারণ উল্লিখিত মন্তব্য। বস্তুত শ্রীম লিখিত বা 'কথিত' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তাবৎ কথা নেই। তিনি যে তাঁর

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৫৬

২। তদেব, পৃঃ ৫৭ ৩। তদেব, পৃঃ ৫৭-৮ ৪। তদেব, পৃঃ ৩৩৬

৫। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, প্রথম ভাগ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩২৯

ত্যাগী-ভক্তদের পরিচালনার ভার নরেন্দ্রনাথের উপর দিয়ে সে-বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়েছিলেন—এসব কথা স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে লিখে গেছেন।[৬] শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে ত্যাগী-ভক্তদের ধর্মজীবন গঠনে অধিকতর যত্নশীল ছিলেন এবং তাদের একান্তে যোগধ্যানাদি ধর্মের উচ্চাঙ্গ-সকলের উপদেশ এবং অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য উৎসাহিত করতেন আর সাধারণ ভক্তদের 'কলিতে কেবলমাত্র নারদীয়-ভক্তি—উচ্চরোলে নামকীর্তন করিলেই জীব উদ্ধার' ইত্যাদি কথা বলতেন তা লীলাপ্রসঙ্গে লিখিত হয়েছে।[৭]

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা থেকেই যে নরেন্দ্রনাথ শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা-ও স্পষ্টাক্ষরে লীলাপ্রসঙ্গেই বর্ণিত হয়েছে।[৮]

স্বামী সারদানন্দ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ লিখতে শুরু করেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। তখন মাস্টারমশায়ের (শ্রীম) মনোভাব যা ছিল, তা আমরা দেখেছি। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীমা সারদাদেবী সদলবলে কাশী যান। মাস্টারমশায় ঐ দলে ছিলেন। কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম পরিদর্শন করে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন ঃ 'দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন—তাই এসব কাজ হচ্ছে। এসব তাঁরই কাজ।' স্বামী ব্রহ্মানন্দ কয়েকজন ভক্ত ও ব্রহ্মচারীকে বলেন মায়ের এই কথা মাস্টারমশায়কে জানাতে, কারণ তিনি জানতেন; মাস্টারমশায়ের ধারণা—সাধন-ভজন সহায়ে ভগবানলাভ না করে সমাজসেবায় ব্রতী হওয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবের অনুকূল নয়। মাস্টারমশায়কে মায়ের ঐকথা পরিবেশিত হলে, তিনি সহাস্যে মন্তব্য করেন ঃ 'আর অস্বীকার করবার জো নেই।'[৯]

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দের বিচারের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'কথামৃতে' সন্ন্যাসী সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের—সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না, এমন স্থানে থাকবে যেখানে স্ত্রীলোকের মুখ দেখা যায় না, টাকা স্পর্শ করবে না, দোর-বাক্সে চাবি দেবে না—ইত্যাদি উক্তিনিচয়ের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সন্ন্যাসীর কর্মযোগের সামঞ্জস্য কিভাবে হতে পারে সে-বিষয়ে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অধ্যক্ষ-পদে সমাসীন হবার পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একদিন বেলুড় মঠে সমবেত সন্ন্যাসীদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ 'আমার এক একবার এ-ও মনে হয় যে, এসব কাজকর্মের প্রবর্তন করে স্বামীজী মহা অনর্থের সূচনা করেছেন। এতে জগতের লোকের খুব উপকার হচ্ছে সন্দেহ নেই; কিন্তু যারা ঐসব কাজ করছে তাদের জীবন করে দিয়েছেন খুবই বিপদ-সঙ্কুল। তবে এ-ও খুব সত্যি যে, বসে বসে পশ্চিমে সাধুদের মতন কুঁড়েমি করে আর পাঁচরকম গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করার চাইতে এসব সেবাদি কর্মে মনকে লিপ্ত রাখা সহস্রগুণে শ্রেয়। কিন্তু যারা ঠিক ঠিক সাধনভজন করতে পারে, সর্বক্ষণ

৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ—স্বামী সারদানন্দ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃঃ ৩৪৫ ৭। তদেব, পৃঃ ২৩৮ ৮। তদেব, পৃঃ ২৪০

৯। শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৯২

ভগবচ্চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতে পারে, তাদের পক্ষে এসব কাজকর্মের কোনই প্রয়োজন নেই। স্বামীজীর সঙ্গে একদিন এ-বিষয়ে আমার অনেক কথাবার্তা হয়েছিল...।'[১০]

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন স্বামীজী স্বামী অখণ্ডানন্দকে একটি অগ্নিগর্ভ পত্রে লেখেন : 'কর্ম কর, কর্ম, হাম আওর কুছ্ নহি মাঙ্গতে হেঁ—কর্ম কর্ম কর্ম even unto death (মৃত্যু পর্যন্ত)। দুর্বলগুলোর কর্মবীর মহাবীর হতে হবে...ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্। ...এই তো পুজো, নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পুজো, আর যা কিছু "নেদং যদিদমুপাসতে"।'[১১] এই প্রেরণাপূর্ণ পত্রটি বারংবার পাঠ করে স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর প্রবর্তিত সন্ন্যাসীর কর্মযোগে নিজেকে আদেহান্ত সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে কৃতসঙ্কল্প হন। মুর্শিদাবাদে অনাথ আশ্রম-প্রতিষ্ঠা করে তিনি যেসব হিতৈষী বন্ধুবান্ধবের কাছে অর্থসাহায্যের জন্য চিঠি লিখেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম অনুরাগী, কাশীর জমিদার প্রমদাদাস মিত্র তাঁদের অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' পাঠক মাত্রেই জানেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর স্বামী বিবেকানন্দ প্রমদাবাবুকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত বহু পত্র লিখেছিলেন। প্রমদাবাবুর গৃহেও শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ অতিথি হিসাবে বিশেষ আদর-আপ্যায়ন পেতেন। কিন্তু স্বামী অখণ্ডানন্দের চিঠি পেয়ে প্রমদাবাবু লেখেন : সাধুসন্ন্যাসীর পক্ষে সেবাকাজের চেয়ে প্রব্রজ্যা, তপস্যা ও স্বাধ্যায়ই প্রশস্ত।[১২] সে চিঠির উত্তরে স্বামী অখণ্ডানন্দ যা লিখেছিলেন, তা আমরা পরে আলোচনা করব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে, এমনকি স্বামী অখণ্ডানন্দের মনেও একবার স্বামীজীর কর্মধারা সম্বন্ধে সংশয় জেগেছিল।[১৩]

বিংশ শতকের শুরুতে স্বামীজীর দুই শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দ যখন শ্রীগুরুর প্রদর্শিত শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে হরিদ্বার হৃষীকেশ অঞ্চলে পীড়িত সাধুসন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী ও অনুন্নত জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন সেখানকার সাধুসমাজ তাঁদের 'ভাঙ্গী সাধু' এই শ্লেষাত্মক আখ্যা দিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা রোগীদের মলমূত্র পর্যন্ত নিজেরাই পরিষ্কার করে দিতেন। আচার্য শঙ্করের মতে সন্ন্যাসীর ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ করে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য শমদমাদিসহায়ে বেদান্তের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতীত অন্য কোনও কর্ম থাকতে পারে না; কর্মযোগ

১০। সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—সংকলন : স্বামী অপূর্বানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, এলাহাবাদ, ১৩৬০, পৃঃ ১৮২-৮৩

১১। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪০১-০২

১২। স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৬৭, পৃঃ ১৫৮

১৩। '...though the Swami was a staunch follower of Swami Vivekananda, even he could not bridge the mental gulf between God and public responsibility without a struggle. ...The conflicting aims of religion and organized social service seemed irreconcilable indeed. Swami Akhandananda was not alone in his doubts about the methods followed, if not the objectives aimed at, by Swami Vivekananda.' [History of the Ramakrishna Math and Mission—Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama, Calcutta, 1957, p. 123]

গৃহস্থদেরই অবলম্বনীয়—সন্ন্যাসীদের নয়। সুতরাং স্বামী নিশ্চয়ানন্দ দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েও রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা, মৃতদেহের সৎকার ইত্যাদি কাজে লিপ্ত থাকবেন কেন? এই ছিল তাঁদের প্রশ্ন। বাস্তবপক্ষে এটি বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত আদর্শেরই বিচার বা সমালোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ পর্যন্ত আমরা সন্ন্যাসীর কর্মযোগ সম্পর্কে যেসব সংশয়-সন্দেহ-শ্লেষের উল্লেখ করেছি, তার বেশী যাবার প্রয়োজন নেই। এখন আমাদের দেখতে হবে সমস্যাটির সমাধান কোথায়। প্রথমেই বলা যায় স্বামীজী একেবারে নতুন কিছু করেননি। যেযুগে সেবাব্রত সন্ন্যাসী উপগুপ্তের মুখে—কবির ভাষায় বলি—উচ্চারিত হয়েছিল, 'আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা', সেযুগ থেকে শত শত বৎসর অতীত হয়ে গিয়েছে বলেই আজ লোকের মনে হয় সন্ন্যাসীর কর্মযোগ একটা সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। কিন্তু বস্তুত যে তা নয়—এটি নিঃসন্দেহে বলা চলে। ৪ জুলাই ১৮৯৭, স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে লিখেছিলেন: 'বুদ্ধের পরে এই আবার প্রথম দেখা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণসন্তানেরা অন্ত্যজ বিসূচিকা-রোগীর শয্যাপার্শ্বে সেবায় নিরত।'[১৪] ঐসময়ে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ এবং ব্যাপকভাবে কলেরা দেখা দেওয়ায় স্বামী অখণ্ডানন্দ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে অসহায় রোগীদের প্রাণপণে সেবা করছিলেন। তাঁর ছিল ব্রাহ্মণ শরীর। তাঁর সহায়ক যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও কারও কারও ব্রাহ্মণ শরীর হয়তো ছিল। মনে হয় এইজন্যই স্বামীজী 'ব্রাহ্মণসন্তানেরা' বলে উল্লেখ করেছিলেন। আসলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সেবাকার্যের প্রায় দু-হাজার বছর পরে সন্ন্যাসীর কর্মযোগের পুনরভ্যুদয় ঘটল। সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম বৌদ্ধদের দ্বারাই। সঙ্ঘ কখনও কর্মহীন হয়ে জীবিত থাকতে পারে না। তাই শত শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যাঁরা এক একটি বৌদ্ধ-মঠে থাকতেন, তাঁরা ধ্যানাদির অতিরিক্ত কর্মযজ্ঞেও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। পরবর্তীকালে নানা কারণে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটলে বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে নির্বাসিত হলে বৈদিক যাগযজ্ঞ যা ভগবান বুদ্ধ নিষেধ করে গিয়েছিলেন, আবার তার আবির্ভাব শুরু হল। ভারতের আকাশ-বাতাস যখন কর্মকাণ্ডীদের যজ্ঞীয় ধূমে আচ্ছন্ন হবার উপক্রম, তখন আবির্ভাব হল আচার্য শঙ্করের। তিনি বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। যুগের প্রয়োজনেই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যে বারংবার লিখে গেলেন সন্ন্যাসীর কোন কর্ম নেই—সন্ন্যাসের অর্থই সর্বকর্মসন্ন্যাস।

তারপর প্রায় বারোশ বছর কেটে গেছে। যুগ পালটেছে। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই আবার সন্ন্যাসীদের কর্মযোগ অবলম্বন করতে হয়েছে। শিষ্যা মৃণালিনী বসুকে স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: 'ঋষি, মুনি, দেবতা কাহারও সাধ্য নাই যে, সামাজিক নিয়মের প্রবর্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্মরক্ষার জন্য আপনা-আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়।'[১৫] যদিও স্বামীজী যে-বিষয় সম্পর্কে উক্ত মন্তব্য করেছেন, তা এখানে তেমন প্রাসঙ্গিক নয়, তবু

১৪। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৪০৮

১৫। তদেব, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২২

বলা যেতে পারে, ঐ মন্তব্যের ভিতর একটা সনাতন সত্য নিহিত রয়েছে। চিঠিটির ইংরেজি অনুবাদেও 'institution' শব্দটি লক্ষণীয়ঃ 'Rishi, Muni, or God—none has power to force an institution on society.'[১৬] ইত্যাদি। রামকৃষ্ণসঙ্ঘ এবং সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের শিবজ্ঞানে জীবসেবাব্রত স্বামীজী জোর করে সমাজে চালিয়ে দেননি। সমাজের প্রয়োজনেই সঙ্ঘের আবির্ভাব এবং সমাজের প্রয়োজনেই সন্ন্যাসীর কর্মযোগ। এ-বিষয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রমদাদাস মিত্রকে ১০।১।১৮৯৯ তারিখে যে-পত্র লিখেছিলেন—যার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি—তা থেকে আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে বিবেকানন্দ-বিচারের এই প্রথম ও মুখ্য পর্যায়ের উপসংহার করা যেতে পারেঃ ' "আত্মজ্ঞানই মানুষের কল্যাণস্বরূপ, এবং সেই আত্মজ্ঞান ভগবদ্ভক্তি ও ভগবৎপ্রসাদ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না"—ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু যদি স্বীয় ক্রিয়ার নিদর্শনদ্বারা ও বাক্যদ্বারা ভগবদারাধনার উপদেশ করিতে হয়, তবে (তাহার পূর্বে) লোকের প্রধান অভাব দূর করিতে হইবে।

'দেশের রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্য জমিদারগণ যদি লোকের সেই অভাব দূর করিতেন, তাহা হইলে আর সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা লোকদুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের অন্নকষ্ট-নিবারণের জন্য এত শ্রম ও যত্ন করিতেন না। দেশের বড় বড় গৃহস্থেরা পাষাণ দিয়া বুক বাঁধাইয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয় এমন বজ্রোপম কঠিন উপাদানে নির্মিত বা বর্মদ্বারা আবৃত যে, আর্তের কাতর ক্রন্দনধ্বনিও সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না। আর শুষ্ক শাস্ত্রীয় কথায় প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না।

'আমার প্রভু আমার হৃদয়েই আছেন এবং সদাকালই থাকিবেন। আমার প্রভু গিরিশৃঙ্গে বা নীলাকাশে বসিয়া নাই, আমার প্রভু আমার আত্মা—সর্বজীবে। সেই সর্বজীবরূপী ভগবানকে আমি মুহুর্মুহুঃ বলিতে শুনিতেছি যে, ওরে মানুষেই বৈদিক ঋষিবৃন্দ, মানুষের মধ্যেই রাম-কৃষ্ণাদি অবতার, সেই মানুষের কি শোচনীয় অবস্থা—দেখছিস্‌নি? একথা যে শোনে তার কি স্থির থাকবার জো আছে? এই মানুষ-ভগবানের সেবায় এ জীবন দিয়াছি; আরও কত জীবন যে দিতে হইবে বলিতে পারি না।'[১৭]

॥ ৩ ॥

বিবেকানন্দ-বিচারের দ্বিতীয় পর্যায়ে চতুর্বিধ যোগের সমন্বয় বা সামঞ্জস্যের বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। স্বামীজী তাঁর একাধিক বক্তৃতায়, কথাপ্রসঙ্গে এবং বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের সমন্বয়ের আদর্শ উপস্থাপিত করেছেন। ইংলন্ডে প্রদত্ত 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেনঃ 'ভগবানের ইচ্ছায় যদি সকল লোকের মনেই এই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের প্রত্যেকটি ভাবই

১৬। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition (1964), p. 144 ১৭। স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৬০

পূর্ণমাত্রায় অথচ সমভাবে বিদ্যমান থাকিত, তবে কী সুন্দরই না হইত! ইহাই আদর্শ, ইহাই আমার পূর্ণ মানবের আদর্শ। যাহাদের চরিত্রে এই ভাবগুলির একটি বা দুইটি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে একদেশী বলি এবং সমস্ত জগৎই সেইরূপ একদেশদর্শী মানুষে পরিপূর্ণ এবং তাহারা কেবল সেই রাস্তাটিই জানে, যাহাতে নিজেরা চলাফেরা করে; এতদ্ব্যতীত অপর যাহা কিছু সমস্তই তাহাদের নিকট বিপজ্জনক ও জঘন্য। এই চারিটি দিকে সামঞ্জস্যের সহিত বিকাশলাভ করাই আমার প্রস্তাবিত ধর্মের আদর্শ...।'[১৮]

বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য চাই।'[১৯]—'চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য করে সাধন করা চাই...।'[২০]

স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখিত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে আছেঃ 'জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করা এই মঠের উদ্দেশ্য। ইহার একটিতেও যিনি ন্যূনতা প্রদর্শন করেন, তাঁহার চরিত্র পূর্ণরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী নহে।'[২১]

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আদর্শের প্রতীক, '...বিকশিত-কমলদলযুক্ত হ্রদমধ্যে হংসবিরাজিত সর্পবেষ্টিত' উদীয়মান সূর্যশোভিত চিত্রটি স্বামীজী নিজেই অঙ্কিত করেছিলেন এবং তার ব্যাখ্যা করে বলেছিলেনঃ 'চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংস-প্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান—যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়, চিত্রের ইহাই অর্থ।'[২২]

মিস ম্যাকলাউডকে লেখা স্বামীজীর ২৪ জুলাই ১৯০০ তারিখের পত্রেও আছেঃ 'সূর্য=জ্ঞান; তরঙ্গায়িত জল=কর্ম; পদ্ম=প্রেম; সর্প=যোগ; হংস=আত্মা; উক্তিটি*=হংস (অর্থাৎ পরমাত্মা) আমাদিগকে উহা প্রেরণ করুন। এটি হৃৎ-সরোবর। কল্পনাটি তোমার কেমন লাগে? যা হোক, হংস যেন তোমায় এ সমস্ত দিয়ে পরিপূর্ণ করেন।'[২৩]

চতুর্বিধ যোগের এই সমন্বয়াদর্শ সম্পর্কে বিবেকানন্দকে বিচার করা হয় এই বলে যে, তিনি রামকৃষ্ণদেবের বাণীবহ হয়েও তাঁর আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেই একটা নতুন আদর্শ স্থাপন করেছেন। সমালোচকদের অভিমত এই যে, 'কথামৃত', যা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর রত্নভাণ্ডার তাতে এই ধরনের সাধনার কথা কোথাও নেই, বরং এর বিপরীত কথাই আছেঃ 'অনন্ত মত অনন্ত পথ!...একটা জোর করে ধরতে হয়।...এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধরতে

১৮। বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ১৬৩-৬৪

১৯। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪১৫ ২০। তদেব, পৃঃ ৪১৮

২১। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, তৃতীয় খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৬), পৃঃ ২৩৫ ২২। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৯০

* 'তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ' ২৩। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯-৫০

হয়। ঈশ্বরলাভ করতে হলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।'[২৪] 'একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে নয় নিরাকারে। তবে ঈশ্বরলাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হলে সাকারবাদীও ঈশ্বরলাভ করবে...।'[২৫]

বিবেকানন্দ-বিচারে প্রবৃত্ত সমালোচকরা আরও বলেন যে, স্বামীজী স্বয়ং যে-আদর্শের প্রতীক, তা-ই তিনি সকলের আদর্শ বলে উপস্থাপিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে ঐ আদর্শ রূপায়িত দেখা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে প্রথমে ভক্তি ও পরে জ্ঞানসাধনা দেখা যায়—কর্মযোগ বা রাজযোগের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই বিচারের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, স্বামীজী চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্যের কথা বললেও, বেশ জানতেন যে, সকলের পক্ষে ঐরূপ সমন্বিত সাধনা সম্ভব নয়। তাই বহুস্থলেই তিনি একটি সাধনপথের অথবা দুইটি বা তিনটি যোগের সমন্বয়ের কথা বলেছেন। পাতঞ্জল দর্শনের সাধনপাদের ২৫ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যায় স্বামীজী লিখেছেন ঃ 'আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান, এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় দ্বারা এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।'[২৬]

এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর নিম্নোক্ত কথাগুলিও অনুধাবনীয় ঃ 'মঠবাসী প্রচারকেরা পর্যায়ক্রমে ভক্তি জ্ঞান যোগ ও কর্ম সম্বন্ধে উপদেশ করিবেন, এবং তৎসম্বন্ধে দিবস ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া উক্ত শিক্ষাগৃহের দ্বারে লটকাইয়া দিবেন—অর্থাৎ যাহাতে ভক্তি-জিজ্ঞাসু জ্ঞানশিক্ষার দিনে আসিয়া আঘাত না পায় ইত্যাদি।'[২৭]

'...অধিকাংশ স্থলে কেবল একটা পথই প্রয়োজন।'[২৮] '...বিভিন্ন প্রণালী নিয়ে মারামারি করো না; কেবল যাতে তোমার অপরোক্ষানুভূতি হয়, তার চেষ্টা কর; আর যে সাধনপ্রণালী তোমার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হয়, তা-ই অবলম্বন কর।'[২৯]

'জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম—এর মধ্যে যে-কোন একটি ভাবকে মূল ভিত্তি কর; কিন্তু অন্যান্য ভাবগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দাও।'[৩০]

'আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো একজনও সেই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না; তবু আমরা...সমষ্টিগতভাবে ঐ পূর্ণতা পেতে পারি। এতে প্রত্যেকের জীবনেই সমন্বয়ভাবের প্রকাশ হল না বটে, কিন্তু কতকগুলি লোকের মধ্যে একটা সমন্বয় হল, আর সেটা অন্যান্য প্রচলিত ধর্মমত হতে সুনিশ্চিত অগ্রগতি, তাতে সন্দেহ নেই।'[৩১]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আদর্শের যে-প্রতীক স্বামীজী স্বহস্তে অঙ্কিত করেছিলেন, তার পরিপূর্ণ সার্থকতা, মনে হয়, শেষোক্ত উদ্ধৃতিটিতেই নিহিত। একটি বিরাট সঙ্ঘে বিভিন্ন

২৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ—শ্রীম-কথিত, শ্রীম-এর ঠাকুরবাটী, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃঃ ১৩৫
২৫। তদেব, প্রথম ভাগ, ১৩৮৭, পৃঃ ১৪৯
২৬। বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৬১ ২৭। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭
২৮। তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ২৬৭ ২৯। তদেব, পৃঃ ২৭৩
৩০। তদেব, পৃঃ ৩১৬ ৩১। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩৯৭-৯৮

রকমের অধিকারী থাকাই প্রত্যাশিত এবং সকলেই ব্যক্তিগতভাবে চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য করতে না পারলেও, সঙ্ঘবদ্ধভাবে তা পারবে, এই ছিল স্বামীজীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সম্প্রদায়বিশেষে কোথাও কেবলমাত্র জ্ঞানের উপরই প্রচণ্ড জোর, কোথাও বা শুদ্ধা ভক্তির উপর, কোথাও কর্মের উপর, কোথাও বা যোগের উপর। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে তা চাননি, তাই এটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়।

ভক্তিযোগের একজন পথিক, যিনি 'দাসোঽহং'-ভাবে সাধনা করেছেন, তাঁর পক্ষে যুগপৎ জ্ঞানপথের 'সোঽহং'-ভাবের সাধনা সম্ভব নাও হতে পারে, তবে তিনি যা করতে পারেন তা হল বৌদ্ধিক অদ্বৈতবেদান্ত-বিচার এবং স্বীয় ইষ্টদেবতা সর্বভূতে বিরাজ করছেন জেনে ব্যবহারিক জীবনে সর্বকর্মের অনুষ্ঠান। তেমনি জ্ঞানী, যোগী এবং কর্মীরও কর্তব্য অন্যান্য পথের সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুটা বৌদ্ধিক পরিচয় লাভ এবং অন্যান্য পথগুলিকেও সত্যলাভের পথরূপে জেনে সেইসব পথের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ। তার ফলে কোন সম্প্রদায়ের সাধকের ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি যে বিদ্বেষবুদ্ধি বা উন্নাসিক ভাব দেখা যায়, তা দূর হবে। ভক্তই হোন, জ্ঞানীই হোন, কর্মী কিংবা যোগীই হোন, মানুষ তখন সব পথের সাধককে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে শিখবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য দেখা যায় কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে অতি সংক্ষেপে দুটি কথা বলা চলে। প্রথমত, শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশেরই ধারণা শুধুমাত্র কথামৃত-ভিত্তিক। কিন্তু কথামৃতের গুরুত্ব কিছুমাত্র ছোট না করেও সত্যের খাতিরে একথা বলা যায় যে, কথামৃতেই শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত উপদেশ নেই।[৩২] একথা এই নিবন্ধে আগেই উল্লেখিত হয়েছে। কথামৃতকার 'শ্রীম' শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতেন শনি-রবিবার কিংবা ছুটির দিনে।[৩৩] অন্যান্য দিনগুলির বিবরণ কথামৃতে নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের যে কয়টি দিনের কথা কথামৃতে প্রকাশিত হয়েছে তার সংখ্যা দুইশতের কম। এর বাইরেও শ্রীরামকৃষ্ণের যে অনেক উপদেশ আছে তা বলাই বাহুল্য। ত্যাগী-সন্তানদের (বিশেষত নরেন্দ্রনাথকে) তিনি একান্তে উপদেশ দিতেন এবং সেই সময় গৃহীরা যাতে উপস্থিত না থাকেন, সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করতেন।[৩৪] সেইসব উপদেশের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের যে-জীবনাদর্শ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর ত্যাগী-সন্তানদের জীবনে যার প্রতিফলন ঘটেছে, তার পরিচয় কথামৃত-সূত্রে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, সাধারণ লোকের দৃষ্টি এবং স্বামীজীর মতো লোকোত্তর পুরুষের দৃষ্টি এক হতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অনেক ঘটনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক উপদেশের তাৎপর্যই যে স্বামীজী অন্যদের থেকে পৃথক এবং অধিকতর ভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর গুরুভাইরা পর্যন্ত যে প্রথমে সেই তাৎপর্য বুঝতে সবসময়

৩২। শিবানন্দ-বাণী, দ্বিতীয় ভাগ—সংকলনঃ স্বামী অপূর্বানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ৬৬-৭ এবং প্রেমানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ—ওঁকারেশ্বরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মন্দির, বৈদ্যনাথ-দেওঘর, ১৩৫৩, পৃঃ ২৭

৩৩। শিবানন্দ-বাণী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৬২

৩৪। প্রেমানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৮

সক্ষম হননি,[৩৫] পরে পেরেছেন—তার প্রমাণও আমাদের জানা আছে। কাজেই, আমাদের বিশ্বাস, স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছিলেন এবং তারপরেই তা প্রচার করেছেন।

॥ ৪ ॥

বিবেকানন্দ-বিচারের তৃতীয় পর্যায়ে কর্মযোগের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে পাতঞ্জল দর্শনের সাধনপাদের ২৫ সংখ্যক সূত্রের স্বামীজী-কৃত ব্যাখ্যার যে-অংশ আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি, তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় স্বামীজী কর্ম-আদি প্রত্যেকটি যোগকেই স্বতন্ত্র সাধনপথ বলে নির্দিষ্ট করেছেন। অন্যত্রও স্বামীজী বলেছেনঃ 'জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম—এই চার রাস্তা দিয়েই মুক্তিলাভ হয়। যে যে-পথের উপযুক্ত, তাকে সেই পথ দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু বর্তমানকালে কর্মযোগের ওপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিতে হবে।'[৩৬] স্বামী তুরীয়ানন্দকে স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'হরি ভাই, এবারে নূতন একটা পথ করে দিয়ে গেলুম। এতদ্দিন লোকে জানত, ধ্যান, জপ, বিচার প্রভৃতি দ্বারাই মুক্তি হয়। এবারে এখানকার ছেলেরা মেয়েরা তাঁর কাজ করে জীবন্মুক্ত হয়ে যাবে।'[৩৭] স্বামী সদানন্দকেও স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—"মুক্তিঃ করফলায়তে"।'[৩৮]

স্বামীজীর এইসব উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা বিবেকানন্দ-বিচার করেন তাঁরা ভাষ্যকার শঙ্কর, টীকাকার শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি আচার্যদের মত উল্লেখ করে বলেন যে, কর্মযোগ কখনও সরাসরি মুক্তি দিতে পারে না। গীতায় যেখানে (৩।২০) পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, কর্মেরই দ্বারা জনকাদি সম্যক সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সেখানেও আচার্যেরা ক্রমশ চিত্তশুদ্ধির ফলেই জ্ঞানের প্রাপ্তির কথা বলেছেন। বিষয়টি খুব জটিল। কারণ স্বামীজীও বলেছেনঃ

'কোন প্রকার কর্ম তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হতে পারে।'[৩৯]

'...ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশও নেই; সৎকর্ম দ্বারা বড় জোর চিত্তশুদ্ধি হয়।'[৪০]

'...সাধনভজন না করলে কর্মযোগও হবে না।'[৪১]

৩৫। এ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী সারদানন্দের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেনঃ লোকোত্তর ঠাকুর...সমাধিরাজ্যে নিরন্তর প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞান, প্রেম, যোগ ও কর্ম সম্বন্ধে অদৃষ্টপূর্ব আলোক প্রতিনিয়ত আনয়নপূর্বক মানবের জীবনপথ সমুজ্জ্বল করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা তাঁহার কথা তখন ধারণা করিতে পারিতাম না। মনস্বী নরেন্দ্রনাথই কেবল ঐসকল দেববাণী যথাসাধ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশপূর্বক আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেন।' [দ্রষ্টব্যঃ লীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৩৯-৪১]

৩৬। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮

৩৭। স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃঃ ৩০০

৩৮। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪১

৩৯। তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৬০

৪০। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৮৪

৪১। তদেব, পৃঃ ৪১৫

'Jiva-seva can give Mukti not directly but indirectly, through the purification of the mind. But if you wish to do a thing properly, you must, for the time being, think that that is all-sufficient.'[৪২]

এই শেষোক্ত উদ্ধৃতিটিতেই, মনে হয়, সমস্যাটির সম্পূর্ণ সমাধান নিহিত।

॥ ৫ ॥

চতুর্থ এবং শেষ পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়—চাতুর্বর্ণ্য ও অসবর্ণ বিবাহ। স্বামীজী গুণগত বর্ণবিভাগ মানতেন—জন্মগত নয়। পাশ্চাত্যে তাঁর শিষ্যদের তিনি প্রণব-সংযুক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন শুনে তাঁর বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ মন্তব্য করেন, প্রণবে তো ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কারও অধিকার নেই। সুতরাং স্বামীজী কি করে ম্লেচ্ছদের ঐভাবে দীক্ষিত করলেন। তার উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'আমি যাকে যাকে মন্ত্র দিয়েছি, তারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ওকথা ঠিক, ব্রাহ্মণ নইলে প্রণবের অধিকারী হয় না। ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তার মানে নেই; হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে। বাগবাজারে—চক্রবর্তীর ভাইপো যে মেথর হয়েছে, মাথায় করে গুয়ের হাঁড়ি নে যায়! সেও তো বামুনের ছেলে।'[৪৩]

মহাভারতে আছে, প্রাচীনকালে প্রথমে এক ব্রাহ্মণজাতিই ছিল। পরে কর্মের বিভাগ হতে থাকে এবং ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের সৃষ্টি হয়। তখনও কিন্তু গুণ ও কর্ম অনুযায়ী ঐ চারিটি বিভাগ ছিল।[৪৪]

পরবর্তীকালে সামাজিক বিবর্তনে চাতুর্বর্ণ্য বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। স্বামীজী একাধিক বক্তৃতায় মহাভারতের এই বর্ণবিভাগের উল্লেখ করেছেনঃ

'জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছেঃ সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ-সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণে পরিণত হইবেন।'[৪৫]

আমরা শ্রেণীহীন সমাজের কথা শুনতে পাই। স্বামীজীও শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলে গিয়েছেন। সেই আদর্শ সমাজের রূপ স্বামীজীর অনবদ্য ভাষায় এইভাবে অভিব্যক্ত হয়েছেঃ 'এই জগতের আদর্শ সেই অবস্থা যখন "সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" পুনরায় হইবে, যখন শূদ্রবল, বৈশ্যবল ও ক্ষত্রিয়বলের আর আবশ্যকতা থাকিবে না, যখন মানবসন্তান যোগবিভূতিতে বিভূষিত হইয়াই জন্ম-পরিগ্রহ করিবে, যখন চৈতন্যময়ী শক্তি জড় শক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিবে, যখন রোগ-শোক আর মনুষ্যশরীরকে

৪২। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, p. 325

৪৩। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪০৯

৪৪। মহাভারত—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং, ১২।১৮১।১০, ১৩।১২১।৫০-১

৪৫। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১৯০

আক্রমণ করিতে পারিবে না, পশুবল প্রয়োগ পুরাকালের স্বপ্নের ন্যায় লোকস্মৃতি হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইবে...তখনই সমগ্র মনুষ্যজাতি ব্রাহ্মণ্যবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে, তখনই জাতিভেদ লুপ্ত হইয়া প্রাচীন ঋষিদিগের দৃষ্ট সত্যযুগ সমুপস্থিত হইবে।'[৪৬]

অসবর্ণ বিবাহের সপক্ষেও স্বামীজী তাঁর পরিষ্কার সিদ্ধান্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বহু বার ব্যক্ত করেছেনঃ '...ভারতবর্ষে inter-marriage (অন্তর্বিবাহ)-টা হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে।'[৪৭]

'...আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে একশ বছর ধরে বিয়ে হয়ে হয়ে এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হতে আরম্ভ হয়েছে। তাতেই শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সেইসঙ্গে যত রোগও এসে জুটছে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভেতর চলাফেরা করেই রক্তটা দূষিত হয়ে পড়েছে। তাদের শরীরগত রোগাদি নবজাত সকল শিশুই নিয়ে জন্মাচ্ছে। সেইজন্য তাদের শরীরের রক্ত জন্মাবধি খারাপ। কাজেই কোন রোগের বীজকে resist করবার (বাধা দেবার) ক্ষমতা ওসব শরীরে বড় কম হয়ে পড়েছে। শরীরের মধ্যে একবার নূতন অন্যরকম রক্ত বিবাহের দ্বারা এসে পড়লে এখনকার রোগাদির হাত থেকে ছেলেগুলো পরিত্রাণ পাবে এবং এখনকার চাইতে ঢের active (কর্মঠ) হবে।'[৪৮]

গোঁড়া হিন্দুরা স্বামীজীর এইসব মতের. তীব্র সমালোচনা করে থাকেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা হিন্দুধর্মের বনিয়াদ—বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা গেলেই হিন্দুধর্মের সর্বনাশ। আর অসবর্ণ বিবাহের কথা বলাই তো মহাপাপ, কারণ তা ঐ বর্ণব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করে।

স্বামীজীর সিদ্ধান্ত হচ্ছে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা একটি সামাজিক প্রথা মাত্র। তা সনাতন নয় এবং সেই কারণে সনাতন ধর্মের সঙ্গে তার কোন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। বহু বার তিনি একথা বলেছেন। তাঁর চিঠি থেকে একটা উদ্ধৃতিঃ '...পুরোহিতগণ যতই আবোল-তাবোল বলুন না কেন, জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া কিছুই নহে। উহা নিজের কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের হারানো সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ফিরাইয়া আনা যায়।'[৪৯]

আসলে যেসব গোঁড়া হিন্দু বিবেকানন্দ-বিচার করেন, তাঁদের অনেকেরই ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা নেই। পুরানো কয়েকটি আচারকেই তাঁরা আঁকড়ে ধরে থাকতে চান—গুটিকতক অর্বাচীন স্মৃতিগ্রন্থকে সারসর্বস্ব করে।

তাঁদের জানা নেই যে, বিদেশী অনেক জাতিই ভারতে বসবাস করার ফলে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। গুর্জর ও হূন জাতি ভারতে এসে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বলে

৪৬। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ (৫) প্রাগ্‌বাণী

৪৭। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪২০ ৪৮। তদেব, পৃঃ ৪২৫

৪৯। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪

গৃহীত হয়েছিল এবং হূনজাতি রাজপুতদের একটি শাখা বলে গণ্য হত। মুসলমানদের আগে বিদেশ থেকে আক্রমণকারী শক, কুশাণ, হূন, গ্রীক, পার্থিয়ান প্রভৃতি জাতি এদেশে বহু সংখ্যায় বাস করত, কালক্রমে তারা সব বিরাট হিন্দুসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মনুসংহিতায় (১০।৪৩-৪) চীন, পারদ প্রভৃতি বিদেশী জাতিকে ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু মনুসংহিতায় অসবর্ণ বিবাহের কথা আছে। বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ চার বর্ণ থেকেই স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবেন, ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই তিন বর্ণ থেকে, বৈশ্য—বৈশ্য ও শূদ্র, এই দুই বর্ণ থেকে এবং শূদ্র শুধু শূদ্র বর্ণ থেকেই স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবেন।[৫০] অবশ্য মনুর যুগের অনেক প্রথাই বর্তমানে অচল। সেগুলির পুনরভ্যুদয় বাঞ্ছনীয় নয়—হবেও না। তবে যেটুকু ভাল আছে, তাকে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত করে নেওয়া যেতে পারে। স্বামীজীর অভিমতও তা-ই ছিল। তিনি একাধিকবার বলেছেন ঃ 'ঋষিগণের মত চালাতে হবে ; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিদের মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত করতে হবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন করে দিতে হবে।'[৫১]

॥ ৬ ॥

ভূমিকাতে বলা হয়েছে, বিবেকানন্দ-বিচারের পরিধি খুব বিস্তৃত, কারণ শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে বিবেকানন্দের আত্মপ্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে এবং ভারতের বাইরে তাঁর বাণী ও কর্ম সম্পর্কে অনেক সমালোচনা হয়েছে। বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 'শনিবারের চিঠি'র বিবেকানন্দ-সংখ্যায় জনৈক লেখকের বিবেকানন্দ-বিচারের উত্তরে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ 'উদ্বোধন' পত্রিকার বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যায় পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ লেখেন। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজী হিন্দুধর্মের উপর যে রচনা পাঠ করেন, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ নভেম্বর 'The Statesman and Friend of India' পত্রিকায় তার সমালোচনা করে Rev. J. Hudson একটি প্রবন্ধ লেখেন।[৫২] একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের দ্বারাই সেই সমালোচনার উত্তর দিতে পারা যায়। ঐ জাতীয় আরও অনেক সমালোচনা সেই সময়ে ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতেতর দেশের কথা বাদই দিলাম, এদেশেই স্বামীজী-সম্পর্কে যেসব সমালোচনা হয়েছে, তার জবাব দিতে গেলে 'বিবেকানন্দ-বিচার' নিবন্ধায়িত করা যায় না, গ্রন্থায়িতই করতে হয়। আর সে-জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। আমরা শুধু ঘরোয়া মহলে যে 'বিবেকানন্দ-বিচার' শুনে থাকি, তারই আংশিক আলোচনা করেছি এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে।

৫০। মনুসংহিতা, ৩।১৩ ৫১। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪

৫২। Vivekananda in Indian Newspapers (1893-1902)—Edited by Sankari Prasad Basu and Sunil Bihari Ghosh, Basu Bhattacharyya and Co. (Pvt.) Ltd., Calcutta, 1969, pp. 645-50

উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় পাশ্চাত্যে বিবেকবাণীর তাৎপর্য*

॥ ১ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-পাঠকের কাছে এটি সুবিদিত যে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে শিকাগোয় অনুষ্ঠিত সেই বিখ্যাত ধর্মমহাসভার মাধ্যমেই স্বামীজী পাশ্চাত্যজগতের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর এই আবির্ভাব যেমন নাটকীয়, তেমনি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সেযুগের মানুষের মধ্যে যে আর্তি জেগেছিল তারই উত্তরে স্বয়ং বিশ্বনিয়ন্তাই যেন এই ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দী ছিল এক গোত্রহীন কাল (an age without a name)। এর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে থেমে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি, আবার কোন সময়ে কোন একটি বিশেষ চিন্তাও এযুগে প্রাধান্য লাভ করেনি। বিচ্ছিন্নতা ও ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিল গত শতাব্দীর পৃথিবী ; বিভিন্ন চিন্তার স্রোত ও নানামুখী গতি পরিণামে বিশ্বাস ও সন্দেহ, আশা আর নিরাশার মধ্যে, মানুষের মনকে করে তুলেছিল দোদুল্যমান, অস্থির করে তুলেছিল সমগ্রভাবে মনুষ্যজাতিকে। প্রকৃতপক্ষে, দার্শনিক মতবাদ যেন তখন ক্রমাগত কূল পরিবর্তন করছিল, একটি করে দার্শনিক চিন্তার সৌধ গড়ে উঠছিল, আর কিছুদিন পরেই তাতে অসামঞ্জস্য আবিষ্কৃত হচ্ছিল। এদিকে তাকিয়েই হোয়াইটহেড বলেছিলেন ঃ 'বিগত শতাব্দীগুলির তুলনায় উনবিংশ শতাব্দী সত্যিই এক অস্থিরতাময় যুগ। ...তখন প্রতিটি মানুষেরই চেতনা ছিল দ্বিধাবিভক্ত। ...ধর্মতত্ত্ববিদ্ ও দার্শনিকেরা সমস্যাকে ক্রমশই বাড়িয়ে তুলছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে তাঁদের মতবাদই চরম সত্য ; ফলে তাঁদের সকল প্রয়াসই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়ছিল।'[১]

চিন্তাক্ষেত্রে এই বিপর্যয়ের মূলে কিন্তু ছিল নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গতানুগতিক খ্রীষ্টধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্য। আধুনিক জগতে এ দুয়েরই অবদান রয়েছে বলে এর কোনটিকেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়, অথচ এদের চিন্তাধারা আলাদা। এদের দুই পক্ষেই যেমন তীক্ষ্ণধী মনীষীরা ছিলেন, বিপক্ষেও তেমনি ছিলেন চিন্তাশীলেরা। কিন্তু যুগের প্রশ্ন ছিল, এ দুয়ের মধ্যে মিলন সম্ভব কিনা। এই মিলনের চেষ্টাই, হোয়াইটহেডের মতে, একটা বিতর্কের সৃষ্টি করছিল। গত শতাব্দীর শেষদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই ক্রমশ জয়লাভের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে ক্রমপ্রসারিত জ্ঞান

---

* বর্তমান গ্রন্থের জন্য আমেরিকা থেকে শ্রীমতী মারি লুইস বার্ক এই প্রবন্ধটি পাঠিয়েছেন। মূল ইংরেজি প্রবন্ধটির নাম ঃ 'SCIENCE, RELIGION AND SWAMI VIVEKANANDA : Swami Vivekananda's Work in the West as seen against the Nineteenth-Century World'। প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ করেছেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ।

১। Science and the Modern World—Alfred North Whitehead, The Macmillan Company, New York, 1925, p. 119

ও কারিগরিবিদ্যার সাহায্যে, মানুষের জাগতিক সুখের উপকরণ সংগ্রহের পথ ধরে। এটি কিন্তু হচ্ছিল মানুষের অন্তরের নিভৃততম আর্তির বিনিময়ে, যে আর্তি জড়িয়ে আছে তার শাশ্বত চেতনাকে ঘিরে। বর্তমান শতাব্দীর একেবারে প্রথমদিকে, সঠিকভাবে বলতে গেলে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বারট্রান্ড রাসেল এই কথাটিই তুলে ধরলেন তাঁর বক্তব্যে ঃ 'মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত ও অসহায়। তার নিজের ও সমগ্র মানবজাতির উপরে ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে এক নিশ্চিত অন্ধকার। ভালমন্দ সম্পর্কে উদাসীন, ধ্বংসোদ্যত, সর্বগ্রাসী জড়পুঞ্জ অস্থির গতিতে এগিয়ে আসছে। নিজের প্রিয় জিনিসগুলি ক্রমশই চলে যাচ্ছে হাতের বাইরে; আগামীকাল মানুষকে নিজেই যেতে হবে অন্ধকারের রাজত্বে। চরম বিপর্যয় এখনও আসেনি। ভাগ্যের হাতে ক্রীতদাস হয়ে তাকে চলতে হবে, নিজের তৈরী মন্দির হবে তার উপাস্য, দৈব-ঘটনায় হতবাক্ হয়ে কাটাতে হবে জীবন। অস্থির জীবনের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে, নয়তো তার জ্ঞান ও অসহায় অবস্থা এক জরাজীর্ণ পৃথিবীর সৃষ্টি করবে, যে-পৃথিবী অচেতন শক্তির ক্রিয়া হিসাবে তার নিজেরই সৃষ্টি।'[২]

যদিও সাহসী উক্তি তবুও মানবমনের অসহায় অবস্থার কথাই এতে ব্যক্ত হয়েছে। মানুষের যুক্তি যেখানে তাকে নিয়ে গিয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে তার ভবিতব্যকে সম্মানের সঙ্গে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু সাহসের সঙ্গে এই শূন্যতাকে মেনে নিতে তো সবাই পারে না। তাছাড়া গত শতাব্দীর পাশ্চাত্যজগৎ তখন এমন এক অবস্থার সম্মুখীন যেখানে ধর্মের পতন দেখা দিয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, অনৈতিকতা তখন সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলছিল। আসলে তখন এমন এক ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে চলেছিল যেখানে অনৈতিকতার জন্ম ও বিস্তার একান্ত স্বাভাবিক। সবকিছুর উপরেই মানুষের অবিশ্বাস, নৈতিকতা তখন তার স্বর্গীয় আসন থেকে বিচ্যুত, জীবনের উদ্দেশ্য সীমিত পরিসরে আবদ্ধ, শাশ্বত সত্তার উপরে সন্দেহ, চরম সত্যের সন্ধান অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে। সংক্ষেপে, অনুপ্রেরণাময় শক্তি হিসাবে ধর্ম তখন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও নির্বাসিত।

এটাই কি সে অবস্থা নয়, যে অবস্থায় নিজেকে প্রকাশিত করবেন বলে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন? তিনিই তো বলেছিলেন যে, যখন মানুষ তাঁকে ভুলে যাবে, কিন্তু তাদের সমস্ত আর্তি ঈশ্বরের জন্য উন্মুখ হবে, তখনই তিনি আসবেন। 'হে অর্জুন, যখন ধর্মের পতন আর অধর্মের উত্থান দেখা যায়, আমি তখনই নিজেকে প্রকাশিত করি।'[৩] সন্দেহ নেই, উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এমন অবস্থাই এসেছিল। এবং ভগবানও আবির্ভূত হলেন।

পাশ্চাত্যজগতে তাঁর আবির্ভাবের, সঠিক অর্থে তাঁর বার্তাবহের আগমনের, ক্ষেত্র তিনি নিজেই প্রস্তুত করলেন। ঘটনার সূত্রপাত মাদ্রাজে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে। স্বামীজী তখনও আমেরিকায় যাওয়া না-যাওয়া নিয়ে মনস্থির করে উঠতে পারেননি।

২। 'A Free Man's Worship', in Mysticism and Logic—Bertrand Russell, Doubleday and Company, Inc., New York, 1957, p. 54

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪।৭

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখা দিয়ে আদেশ করলেন পাশ্চাত্যে যেতে। 'আমার শিকাগো ধর্মমহাসভায় যাবার ইচ্ছা ছিল না, মনে মনে না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করেছিলাম। কিন্তু ঠাকুর আমাকে দেখা দিয়ে কয়েক দিন ধরে বার বার বলতে লাগলেন, "আমার কাজের জন্য এসেছিস; তোকে যেতেই হবে। তোর জন্যই ঐ সভার আয়োজন জানবি"।'[৪] যারা এই ঘটনার সাক্ষী তাদের কারও জীবিতাবস্থায় এটি লিপিবদ্ধ করা হয়নি, কিন্তু অন্য একটি ঘটনায় এর সমর্থন মেলে। এতেই মনে হয়, স্বামীজী তাঁর ধর্মমহাসভায় যোগদানের পিছনে ঐশ্বরিক পরিকল্পনা দেখতে পেয়েছিলেন। আমেরিকায় যাবার কয়েক মাস আগে তিনি তাঁর গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে আবু পাহাড়ে বলেছিলেন: হরি ভাই, ঐ ধর্মমহাসভা-টভা যা হতে চলেছে তা এর জন্যই (নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে)। আমার মন তাই-ই বলছে। দেখবে, শিগ্‌গিরই এটি ফলে যাবে।[৫]

বিরাট সেই ধর্মমহাসভা, যার প্রস্তুতি ও আয়োজন ছিল বিশ্বব্যাপী, সেটা কি একজন তরুণ অপরিচিত হিন্দু সন্ন্যাসীর জন্য? স্বামীজীর গুরুভাই ও শিষ্য ছাড়া অন্যদের কাছে এটি অতিরঞ্জন বলেই সম্ভবত মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই মহাসভার অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই সকলের কাছে এটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, 'দৈবীশক্তির অধিকারী এই বক্তা' স্বামী বিবেকানন্দই সভার প্রধান চরিত্র, মূল নায়ক। সত্যি কথা বলতে কি, অগণিত ধর্মনায়কদের উপস্থিতি সত্ত্বেও পাশ্চাত্যজগতের কাছে স্বামীজীকে পরিচিত করে দেওয়া ছাড়া এই ধর্মমহাসভা স্থায়ী কোন সুফল রেখে যেতে পারেনি।

এরপর প্রায় তিন বছর ধরে স্বামীজী আমেরিকা ও ইংলন্ডের অধিবাসীদের কাছে এমন এক বাণী প্রচার করলেন যা পাশ্চাত্যজগতের তৎকালীন দুরূহ জটিল সব সমস্যার সমাধান এনে দিল। সমকালীন কোন দার্শনিক মতকে খণ্ডন কিংবা স্থাপন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। যদিও তিনি পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন তবুও তাঁকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্টি বলাটা ঠিক নয়। তাঁর চিন্তাধারা কখনই পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল না, বরং বহু শতাব্দীর ভাবধারায় পরিপুষ্ট ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পরিস্নাত হয়েই তিনি বড় হয়েছিলেন। তিনি লালিত হয়েছিলেন এমন এক সভ্যতার কোলে যা পাশ্চাত্যজগৎ কোনদিনই সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। যদিও সংস্কৃতজ্ঞ ও প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের শিক্ষিত জনসাধারণ ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করেছিল, তবুও সাধারণভাবে বলা যায় হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাবধারা সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধি ছিল একান্ত অগভীর। অবজ্ঞা ও একটা রহস্যময় চমৎকারিত্বের দৃষ্টি—এই মিশ্র মনোভাব ছিল তাদের, এবং সাধারণভাবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তারা মোটামুটি অজ্ঞই ছিল বলা যায়। ভারতবর্ষের প্রতি এরকম মনোভাবের দরুনই স্বামীজীর পক্ষে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি সম্মানিত ও বিশদ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক ছিল। নতুবা, সাধারণ শ্রোতাদের আকর্ষণ করতে হয়তো আরও কিছুটা সময় লাগত। এই ধর্মমহাসভার ফলেই জনসাধারণ স্বামীজীর প্রতি তাদের দরজা উন্মুক্ত

৪। উদ্বোধন, ৭৫ বর্ষ, পৃঃ ৫২৯

৫। Spiritual Talks, Advaita Ashrama, Calcutta, 1955, p. 254

করল এবং তাদের আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করার জন্যই যে স্বামীজীর আবির্ভাব—এই সত্যকে স্বীকৃতি জানাল। তারা বুঝতে পেরেছিল, স্বামীজী এমন এক সংস্কৃতিকে বহন করে নিয়ে এসেছেন যা বহু যুগ আগে থেকেই অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এসেছে।

স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার অব্যবহিত পরেই পাশ্চাত্যবাসীরা বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করল; একথা ঠিক নয়। অবশ্য অনেকে করেছিল— একথাও সত্যি। তারা নিজেদের অন্তর্দৃষ্টিকে আরও গভীরতা ও স্থায়িত্ব দিয়েছিল। আরও একদল নারী-পুরুষ, সংখ্যায় কয়েক হাজার, তারাও স্বামীজীর ভাবধারার মহত্ত্ব ও গভীরতা বুঝতে পেরেছিল, এবং পরিণামে নিজেদের উন্নতও করেছিল। অনেকে এভাবে রূপান্তরিত হলেও স্বামীজীর প্রভাবের শক্তি শুধু তাঁর তৎকালীন সাফল্য দিয়ে বিচার করলে চলবে না। যদিও তিনি উইলিয়াম জেমস, এডোয়ার্ড কার্পেন্টার, ম্যাক্সমূলার, ক্যানন এইচ আর হাওয়েইস, মনকিওর কনওয়ে, ক্যানন উইলবারফোর্স, রেভারেন্ড জন হ্পস, লুই জি জাঁ, লিও টলস্টয়, জোশিয়া রইস, চার্লস ভোয়সে প্রমুখ তৎকালীন পাশ্চাত্য মনীষীদের প্রভাবিত করেছিলেন নিঃসন্দেহে, যদিও তাঁর ভাবধারা ও চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য সাধারণ নারী-পুরুষের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, তবুও একথা বলা যায় না যে, তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তৎকালীন দর্শন বা ধর্মতত্ত্বকে সম্পূর্ণ পালটে দিয়েছিল। শিক্ষিত সমাজের মূল যে চিন্তাধারা তাতে গভীর আধ্যাত্মিকতার ভাব প্রবেশ করেছিল, একথাও বলা যায় না।

তাহলে স্বামীজীর অবদান কি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার যে তাঁর পাশ্চাত্যভ্রমণের একটি প্রত্যক্ষ ফল ছিল তৎকালীন পাশ্চাত্যজগতের উপর তাঁর প্রভাব। ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমেরিকায় এতদিন যে গোঁড়া মনোভাব ছিল তা দূর হয়েছিল স্বামীজীর বক্তৃতায়। ১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বক্তৃতা-সফরে আমেরিকাবাসীদের মনে ক্রমশ এই ভাব জেগে উঠল, যে সভ্যতা স্বামী বিবেকানন্দের মতো এমন একজন বিরাট ও মহৎ পুরুষ সৃষ্টি করেছে সেই সভ্যতা নিঃসন্দেহে এক মহান ও উজ্জ্বল সংস্কৃতির পরিবাহক। ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির তাৎপর্যের উপরে স্বামীজীর বক্তৃতা, ভারতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শের সমর্থনে তাঁর অগ্নিময় ভাষণ, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তাঁর গভীর আলোচনা—এ সবই আমেরিকান মনোভাবের উপরে একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল, এটি স্বামীজীর একটি বিরাট অবদান। কিন্তু এছাড়া আরও আছে।

তাঁর পাশ্চাত্যভ্রমণে, বিশেষত ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি আধুনিক পাশ্চাত্যজগতের চিন্তাধারা ও জীবনচর্যার গভীর সমস্যার যথার্থ সমাধান তুলে ধরেছিলেন। আর এটি করতে গিয়েই তিনি তাঁর বাণীর (কিংবা তাঁর ভাষায় 'গুরুদেবের বাণীর') বীজ বপন করে দিচ্ছিলেন মানুষের জীবনে, পাশ্চাত্যজগতের সামগ্রিক চেতনায়, এবং সে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। এবং এভাবেই পাশ্চাত্যবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ক্রমশ একটা পরিবর্তন আসছিল। বর্তমান যুগে প্রাচ্য ভাবধারা ও আদর্শের প্রতি আমেরিকাবাসীর যে আগ্রহ, সমগ্র পাশ্চাত্যজগতে ভারতের সনাতন আদর্শের প্রতি

যে শ্রদ্ধা দেখা যায়, তার মূলে রয়েছে স্বামীজীরই প্রভাব।

তা যাই হোক না কেন, আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য স্বামীজীর বাণীর একটি বিশেষ দিক আলোচনা করা—পাশ্চাত্য সভ্যতা যে চিন্তার বা মতবাদের সঙ্ঘর্ষে জর্জরিত হচ্ছিল তার সমাধানে স্বামীজীর প্রভাব কি, তা দেখা।

॥ ২ ॥

বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে সঙ্ঘর্ষ বহু যুগ ধরে চলছিল তা অনেকেরই জানা। সংক্ষেপে বিষয়টি আলোচনা করে নেওয়া যাক। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কোপার্নিকাস যখন সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণের কথা বললেন, তখন থেকেই এই সঙ্ঘর্ষের শুরু। মানুষের চিন্তাধারার এটি বিরাট এক পরিবর্তন নিয়ে এল। এরপরে এলেন গ্যালিলিও যিনি মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের উপরে এক বিরাট আঘাত হানলেন। খ্রীষ্টীয় চার্চের ঈশ্বরকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যবাদকে (God-oriented teleology) বাতিল করে দিলেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে গ্যালিলিওই পরিবর্তিত বিশ্বদৃষ্টির ভিত্তিস্থাপন করলেন। অ্যারিস্টটলের অনুসরণ করে মধ্যযুগীয় রিজ্ঞান 'উদ্দেশ্য'র পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বস্তু ও ঘটনাকে বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের তখন প্রশ্ন ছিল ঃ কি উদ্দেশ্যে ঘটনাগুলি ঘটছে? যে-কোন ঘটনার উদ্দেশ্যকে মানুষের প্রয়োজনের নিরিখে বিচার করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, মানুষকে কেন্দ্র করেই বিশ্বের সবকিছুর ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছিল। চার্চের পাদ্রী ও পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই বাইবেল ও অ্যারিস্টটেলীয় লজিকের সাহায্যেই এই উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করছিলেন। চার্চ ও গ্রন্থাগারের বাইরে এসে বিশ্বরহস্যকে জানার কোনও তাগিদ তাঁরা দেখাননি।

গ্যালিলিওই প্রথম এই অচলায়তনের দরজা খুলে বাইরে এলেন, তাঁর টেলিস্কোপ এবং কেপলারের জ্যোতির্বিজ্ঞান-সূত্রাবলীর সাহায্যে বিশ্বের নানান ঘটনার ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিলেন; তিনি কিন্তু এই ঘটনাবলীর পিছনে 'কেন'র চেয়ে 'কিভাবে' ঘটছে তার উপরেই জোর দিলেন। এডুইন আর্থার বার্টের ভাষায় ঃ 'গ্যালিলিওর দর্শনে...এই জগৎ হল কতকগুলি বস্তুপুঞ্জ যা গাণিতিক সূত্রাবলীর সাহায্যে চলে, অর্থাৎ স্থান ও কালের মধ্য দিয়ে প্রবহমান বস্তুপুঞ্জই হচ্ছে জগৎ।'[৬] এর তাৎপর্য, বাস্তব জগতে সব বস্তুই গাণিতিক সূত্র মেনে চলছে, এর মধ্যে কোন 'উদ্দেশ্য' খুঁজে বের করার চেষ্টা বৃথা। বার্টের উক্তি আবার উল্লেখ করা যায় ঃ 'বাস্তব জগৎ (অর্থাৎ মৌলিক গুণাবলী-সমন্বিত জগৎ) গাণিতিক সূত্রানুসারে ভাসমান পারমাণবিক গতিসমূহ ছাড়া আর কিছু নয়। এই অবস্থায় পরমাণুসমূহের গতির মধ্যে কারণতত্ত্ব নির্দেশ করা একটা তাত্ত্বিক খেয়াল মাত্র; যা কিছু ঘটছে তা এইসব বস্তুপুঞ্জের গাণিতিক পরিবর্তন মাত্র।'[৭] উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে এই যে যান্ত্রিকতাবাদ, এ ধারণার ফলে গ্যালিলিও সিদ্ধান্ত করলেন যে, একটি বস্তুকে চালিত কিংবা গতিশক্তির তারতম্য করার জন্য একটি যান্ত্রিক শক্তি দরকার।

৬। The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science—Edwin Arthur Burtt, Doubleday Anchor Books, New York, 1954, p. 93 ৭। ibid., p. 99

পরে এটিকেই নিউটন তাঁর 'গতির প্রথম সূত্রে' লিপিবদ্ধ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, যখন বস্তুর ব্যাখ্যায় উদ্দেশ্যের বদলে যান্ত্রিক ও গাণিতিক সূত্র যুক্ত হল, আদিকারণ হিসাবে ঈশ্বরও সিংহাসনচ্যুত হলেন। গ্যালিলিও অবশ্য মনে করতেন যে, ঈশ্বরই মূল কারণ, তিনিই বস্তুতে প্রথম গতিসঞ্চার করেছিলেন এবং তারপর থেকে বস্তুগুলি নিজে নিজেই কাজ করে যাচ্ছে। বার্টের উক্তি: 'একটি প্রয়োজনীয় কর্তা হিসাবে ঈশ্বরের কাজ সেখানেই শেষ হল। তিনি এক বিশাল যান্ত্রিক স্রষ্টা বলে পরিগণিত হলেন যাঁর কাজ পরমাণুর প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল।'[৮] খ্রীষ্টীয় গির্জার ধর্মধ্বজীরা গ্যালিলিওকে এর জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন।

কেপলার, গ্যালিলিও এবং ডেকার্টের পর আইজাক নিউটন (গ্যালিলিও যে বছর মারা যান সেই ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর জন্ম) আধুনিক বিজ্ঞানকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড় করালেন। যে দৃষ্টিভঙ্গি দৈব উদ্দেশ্যের বদলে যান্ত্রিক কারণকে তুলে ধরে, তাঁর প্রচেষ্টাতেই সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। বস্তুর স্থান-পরিবর্তন ও গ্রহনক্ষত্রের গতিতে দৈবনির্দেশের যুগ শেষ হয়ে এল।

পাশ্চাত্যজগতে নবজাগরণের (Renaissance) মতোই এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নতুন চেতনার সঞ্চার করল। বিশ্ব সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা মানুষকে তৃপ্ত করতে পারল না। বিজ্ঞানের স্পর্শ মানুষকে অসীম শক্তিশালী করে তুলল। যদিও নিউটনের আবির্ভাবে পৃথিবীকেন্দ্রিক নক্ষত্রজগতের কল্পনা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হল, যদিও মহাশূন্যের একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণা ছাড়া মানুষের অস্তিত্বের আর কোনও অর্থ রইল না, তবুও যুক্তির সাহায্যে মানুষ সমস্ত রহস্যের সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগল—যে রহস্যের মধ্যে সে নিজেও একটি। মানুষ দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর নতুন নামকরণ হল 'যুক্তির যুগ' (The Age of Reason)। বিভিন্ন রকমের চিন্তা ও মতবাদ এর অন্তর্ভুক্ত হলেও মোটামুটিভাবে সবেরই উদ্দেশ্য ছিল যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও আশাবাদ। শুধু বিজ্ঞানই নয়, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় সবকিছুই গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হল এবং মানুষের কাছে তা বোধগম্য হয়ে উঠতে লাগল। সবাই আশা করেছিল, এভাবে যদি সবকিছুকে দেখার চেষ্টা করা হয় তবে তা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হবে এবং পরিশেষে একটি আদর্শ মানবসমাজ গড়ে উঠবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভূত দার্শনিক মতবাদগুলির আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, ঈশ্বরকে কেবলমাত্র আদি কারণ হিসাবে স্বীকার করা এবং দৈব উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা অস্বীকার করায় মানুষের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ল, কেননা সবকিছুই যখন উদ্দেশ্যহীনতায় পর্যবসিত, ভালমন্দ স্থির হবে তাহলে কিভাবে? এই প্রশ্ন দেখা দিল। পাশ্চাত্যজগতে এই ধারণাগুলি মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসায় মানুষের জীবনে ধর্ম ক্রমশই কম কার্যকরী ও কম অর্থবহ হয়ে উঠতে লাগল। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গতানুগতিক ধর্মচিন্তার পুনর্জাগরণের চেষ্টা চলল,

---

৮। ibid.

সাহিত্যে শুরু হল 'রোমান্টিসিজম'-এর সুর যা পরবর্তী শতাব্দীতে চরমে উঠল। এগুলি কিন্তু কোনও মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারল না; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তর্কমূলক যৌক্তিক (rational) ধর্মতত্ত্ব, যাকে 'Deism' বলা হত, মানুষের মন জুড়ে থাকল। দৈব-অনুপ্রেরণা, অলৌকিকত্ব ও ভবিষ্যদ্বাণী অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। অলৌকিক কার্যকলাপে বিশ্বাস করাটা কুসংস্কার হয়ে দাঁড়াল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভল্টেয়ারের উক্তিঃ মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে যা নৈতিক বলে মনে হয়, তার মিলিত রূপই ধর্ম, বিচারমূলক ধর্ম।[৯]

কিন্তু এই বিচারমূলক ধর্মের ভিত্তিও খুব তাড়াতাড়ি ধ্বসে পড়ল। বিভিন্ন দার্শনিকেরা এতে সাহায্য করলেও সবচেয়ে বড় আঘাত হানলেন ইম্যানুয়েল কান্ট। তিনি দেখালেন যে, ঈশ্বর-অস্তিত্বের প্রধান তিনটি যুক্তি—সৃষ্টিমূলক (argument from Design), আদি-কারণমূলক (argument from a first cause) এবং অধিবিদ্যামূলক (ontological argument)—এর কোনটিই শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে না। তিনি বললেনঃ 'আমি মনে করি যে ঈশ্বরতত্ত্বে যুক্তির অবতারণা করার সমস্ত প্রচেষ্টাই অর্থহীন এবং এই যুক্তিগুলি মিথ্যা যুক্তি মাত্র।'[১০] স্বীয় সিদ্ধান্ত জানানোর পর তিনি তা প্রমাণ করতে এগিয়ে গেলেন। শিক্ষিতমহলের কাছে ঈশ্বর আর একবার সিংহাসনচ্যুত হলেন। অজ্ঞেয়বাদ ও নিরীশ্বরবাদ তখন যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমার্থক হয়ে দাঁড়াল।

কান্ট অবশ্য বলেননি যে ঈশ্বর নেই। তাঁর দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'a priori knowledge'-এর প্রতিস্থাপন যেটিকে ডেভিড হিউম বাতিল করে দিয়েছিলেন। কান্টের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় জ্ঞানের একটি ভিত্তিভূমি খুঁজে বের করা যেটিকে তিনি আগেই খণ্ডন করেছিলেন। তাঁর দর্শনের এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি অবিচ্ছেদ্য, কিন্তু এতে বোঝা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাস্রোত কিরকম ঘূর্ণির মধ্য দিয়ে চলছিল। কান্ট অবশ্য শেষ পর্যন্ত এমন একটি ভূমি খুঁজে পেয়েছিলেন যেখানে ধর্ম দাঁড়াতে পারে। তাঁর দর্শনকে সংক্ষেপে বিবৃত করতে গেলে বলতে হয়, তিনি বিশ্বকে দুইভাগে ভাগ করেছিলেন। এর মধ্যে একটি হল কাল-আকাশ-কার্যকারণের জগৎ (world of time, space and causation)—আমরা যে জগৎকে জানি ও যার মধ্যে বাস করি। এটির মূল ভিত্তি মানবমনের অন্তর্গত স্বাভাবিক বৃত্তির উপরে, যেটি কেবলমাত্র স্থান কাল ও কতগুলি প্রত্যয় (categories of concepts) যেমন সার্বিকতা, বহুরূপত্ব, কারণত্ব ইত্যাদির উপরে নির্ভরশীল। আমাদের মনে হল একটি স্থানিক (spatial) ও ক্ষণস্থায়ী মাধ্যম যার সাহায্যে সত্য জগৎ (things in themselves) আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। তাই যে জগৎকে আমরা জানি সেটি হল আপাত-স্থানিক জগৎ (temporal-spatial world) যা পরিচালিত হয় এমন কিছু সূত্রের সাহায্যে যার

৯। Elements de la philosophic de Newton—Voltaire, chap. 6

১০। Critique of Pure Reason—Immanuel Kant, The Macmillan Company, New York, 1957, p. 512

স্রষ্টা হল মন। এটি আগাগোড়াই পূর্বনির্দিষ্ট। এর মধ্যে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই, দৈব নির্দেশে এটি পরিচালিত হয় না। এটি সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক। বিপরীতপক্ষে, সত্য জগৎ যাকে ইন্দ্রিয় বা মনের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায় না, হয়তো সেটি ঈশ্বরের নির্দেশে পরিচালিত এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত। কিন্তু আমরা কি করে সে জগৎকে উপলব্ধি করতে পারি? কান্ট মনে করেন যে, আমাদের নৈতিক চেতনা, ধর্মীয় উপলব্ধির সাহায্যে আমরা সেই জগতের আভাস পেতে পারি। এইভাবে তিনি যান্ত্রিক জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে একটা সূত্র মেনেছিলেন। যদিও স্থানকালিক জগতের মধ্য দিয়ে সত্য জগতের প্রবহমানতাকে বহুবর্ণে রঞ্জিত উজ্জ্বল শাশ্বত আলোকবর্তিকার সঙ্গে কোন তুলনা কান্ট করেননি, তবুও ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ ক্রমশ এদিকেই ঝুঁকছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অজ্ঞেয়বাদ রোমান্টিসিজমের আবর্তে গিয়ে পড়ল। এটা যেন একটা সাময়িক অবকাশ। যদি যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো না যায় তবে বিশ্বাসের পথে তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়া সম্ভব—এটাই ছিল সে যুগের মনোভাব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে এভাবে হৃদয়ের ধর্মকে (religion of the heart) মানুষ আঁকড়ে ধরল। রুশো-প্রবর্তিত রোমান্টিসিজমের প্রভাবে কবিরা ঈশ্বরকে খুঁজে পেলেন প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত অবস্থায়, উপলব্ধি করলেন:

> '...a sense sublime
> Of something far more deeply interfused,
> Whose dwelling is the light of setting suns,
> And the round ocean and the living air,...'[১১]

ভাববাদী দার্শনিকেরা কান্টকে অনুকরণ করে তাঁকেই আবার দুর্বোধ্য বলে বাতিল করে দিলেন, যদিও যুক্তির দিক দিয়ে তা করতে পারলেন না। হেগেল চরম সত্তা (Absolute) সম্বন্ধে ধারণা করলেন, এটি যেন একটি সর্বগ্রাসী কারণ-প্রজ্ঞা যা এই ক্ষুদ্র জগৎকে উন্মুক্ত করে এবং এই বিশ্বজগৎ আবার পরিণামে সেই চরম সত্তার মধ্যে দ্বান্দ্বিক কালপ্রবাহে বিকশিত হচ্ছে। অবশ্য আমি যত সংক্ষেপে বললাম, হেগেলের দর্শন তার চেয়ে বহুগুণ বিস্তৃত এবং বিভিন্ন যুক্তিপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাববাদী দর্শনসমূহের বিশ্লেষণে আমরা এগুতে চাই না, কারণ এগুলিকে বহু পূর্বেই এক পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তবুও সেই শতাব্দীতে ফিক্টে, হেগেল, স্পেন্সার, শেলিং কিংবা কার্লাইল বা এমার্সন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেই তত্ত্বগুলিকেই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্লেষণ ও খণ্ডন করেছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনের এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: '"অনন্তই সান্ত হইয়াছেন"—জার্মানিতে এই সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর দর্শনশাস্ত্র-প্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছিল। এরূপ চেষ্টা এখনও ইংলন্ডে হইতেছে। কিন্তু এই সকল দার্শনিকের মত বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়—অনন্তস্বরূপ নিজেকে জগতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। একদিন

১১। The Poetical Works of William Wordsworth, Oxford University Press, Bombay, 1916, p. 207

অনন্ত নিজেকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা অতি শ্রুতিমধুর, এবং আমরা—অনন্ত, বিকাশ, অভিব্যক্তি প্রভৃতি দার্শনিক শব্দও ব্যবহার করিলাম। কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করেনঃ সান্ত যে অনন্তকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারিবে—এ সিদ্ধান্তের ন্যায়সঙ্গত মূলভিত্তি কি? নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা সোপাধিক হইয়াই এই জগৎ-রূপে প্রকাশিত হইতে পারে। এ জগতে সবকিছুই সীমাবদ্ধ। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির মধ্য দিয়া আসিবে, তাহাকে স্বতই সীমাবদ্ধ হইতে হইবে; অতএব সসীমের অসীমত্ব-প্রাপ্তি নিতান্ত অসম্ভব। ইহা হইতে পারে না।'[১২]

॥ ৩ ॥

সংক্ষেপে বলতে গেলে, পাশ্চাত্যজগতের মূল সমস্যাটি ছিল এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি আসলে কোন যান্ত্রিক নিয়মের বশবর্তী, অথবা চরম বিশ্বপ্রজ্ঞার দ্বারা চালিত? এ দুটোর একটাও হওয়া সম্ভব নয়। এর কারণ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা কোন গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয় না, এমন কিছুকে মানতে রাজী নয় যা ইন্দ্রিয়বেদ্য বা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এবং এটি আত্মিক শক্তির (Spiritual Force) অস্তিত্ব বিষয়েও কোন প্রমাণ পেয়ে ওঠেনি। তাই ব্যক্তি-ঈশ্বরকে (Personal God) মেনে নিতে তৎকালীন মানুষের পক্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আপস করে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতেই হয়েছিল। সনাতনী খ্রীষ্টধর্ম এই পথেই সমাধান খুঁজছিল। স্বামীজী কিন্তু এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেনঃ '...কাহারও মতে মত দিয়া বিশ লক্ষ দেবতা বিশ্বাস করা অপেক্ষা যুক্তির অনুসরণ করিয়া নাস্তিক হওয়াও ভাল।'[১৩]

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির (দ্বৈত চেতনা) মধ্যে যেমন কোন যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান ছিল না, তেমনি মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও এরা ছিল বিপরীত মেরুর। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিকে বজায় রাখতে গিয়ে পাশ্চাত্য মানুষ নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করছিল। বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার সাহায্যে, যার জন্য সে গর্ব অনুভব করত, সে তার ভবিষ্যৎ প্রগতির কোন সীমা খুঁজে পাচ্ছিল না। কর্মতৎপরতা ও উৎসাহের সাহায্যে সে তার পারিপার্শ্বিক জগৎকে স্বীয় অধীনে এনে স্বপ্ন দেখত যেন এই পৃথিবীতেই সে তার ঈপ্সিত স্বর্গ গড়ে তুলবে। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যুক্তি-অনুসারী, ব্যবহারিক, মানবকল্যাণকামী ও আত্মবিশ্বাসী। যুক্তির সাহায্যে সকল সমস্যারই সমাধান সম্ভব, এই ধারণা তার ছিল। এটাই ছিল তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি যার সাহায্যে সে তার পারিপার্শ্বিক জগতে চালিত হচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তার গতানুগতিক ধর্মচিন্তা যা তাকে ছোটবেলা থেকেই শেখাত যে, সে একজন মহাপাপী এবং এজন্য তার অনুগত হওয়া উচিত ঈশ্বরের প্রতি, যে ঈশ্বরের কাজকর্ম সে বুঝে উঠতে পারে না। এই তত্ত্ব কম-বেশী মেনে নিয়ে মানুষকে ঈশ্বরের উপরে একান্ত-নির্ভর করে তোলাই

১২। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৫
১৩। তদেব, পৃঃ ২৬৭

খ্রীষ্টধর্মের প্রধান কর্তব্য। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিজ্ঞান ও খ্রীষ্টধর্মের উভয়কেই মেনে নেওয়ার ফলে পাশ্চাত্যজগৎ এক মানসিক রোগগ্রস্ত সংস্কৃতির কবলে পড়েছিল। এই দুয়ের মধ্যে মিলন ঘটাবার জন্য ভাববাদী দার্শনিকেরা যে চেষ্টা করতে লাগলেন তা সমস্যাকে কেবল জটিলতর করেই তুলল। কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল না।

প্রকৃতপক্ষে, যুক্তি ও বাস্তবের দ্বারা চালিত না হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক ও ধর্মীয় ভাববাদ সমাজের সর্বস্তরে প্রবেশ করতে লাগল। ফলে, পাশ্চাত্যজগৎ ভরে উঠল প্রেততত্ত্ববিদ্‌, ফেইথ-হীলার্স, জ্যোতিষী, থিওসফিস্ট প্রমুখ গুপ্তবিদ্যা-পারদর্শীদের দ্বারা। সাধারণের মধ্যে কেউ কেউ তাদের আন্তরিক অনুসন্ধান চালিয়ে গেলেও অধিকাংশই উত্তেজনা-সন্ধানী (sensation-seekers) হয়ে উঠল। কেউ কেউ বা এসবে অনাগ্রহী হয়ে রইল। স্বামীজী এসব গুপ্তবিদ্যাকে তীব্র ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন ঃ 'একজন নির্বোধ অথবা অর্ধোন্মাদ ব্যক্তি মনে করে যে, তাহার মস্তিষ্কে যে-সকল পাগলামি চলিতেছে, সেগুলিও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং সে চায় লোকে তাহার অনুসরণ করুক। জগতে সর্বাপেক্ষা পরস্পর-বিরোধী যত প্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বিকৃতমস্তিষ্ক কতগুলি উন্মাদের সহজাত জ্ঞানানুযায়ী প্রলাপবাক্যকে অতীন্দ্রিয়-বোধের ভাষা বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।'[১৪]

ধর্মনেতাদের মধ্যে একাংশ অযৌক্তিক ও কাল্পনিক তত্ত্বচিন্তায় গা ভাসালেন, বাকিরা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হলেন, অর্থাৎ এঁরা মনে করলেন যে, মানুষের মধ্যে যে সৎ গুণগুলি রয়েছে সেগুলি বাড়িয়ে তুললেই মানবসমাজকে আদর্শস্তরে নিয়ে যাওয়া যাবে। তাঁদের সকল প্রয়াসের মধ্যে মানুষের জীবনে নৈতিকতাকে ক্রিয়াশীল করে তোলা, যান্ত্রিক অপসংস্কৃতিকে দূর করা, ন্যায়বিচারকে উচ্চ স্থান দেওয়া ইত্যাদিই প্রধান হয়ে উঠল। আর এভাবেই 'লিবারেল ক্রিশ্চিয়ানিটি'র উদ্ভব হল যার মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার চেয়ে সামাজিক ও নৈতিক ক্রিয়াকলাপই মুখ্য হয়ে উঠেছিল। এই উদার খ্রীষ্টানরা তাঁদের ব্যবহারে ক্রমশই উপযোগবাদে (utilitarianism) অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। ধর্ম তাঁদের জীবনে ঐশ্বরিক চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে থাকল। অনুরূপভাবে আর এক শ্রেণীর লোক যাঁরা মূলত একই লক্ষ্য নিয়ে চলছিলেন, তাঁরা কিন্তু ঈশ্বরকে পটভূমিকার বাইরেই রেখেছিলেন। তাঁরা ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। গত শতাব্দীর শেষ দশকে আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং লন্ডন এই শ্রেণীর নাস্তিকে ভরে গিয়েছিল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, গত শতাব্দীর চিন্তাশীল মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনা, অথবা একটির সাহায্যে অন্যটিকে ব্যাখ্যা করা। এরই ফলে যেসব বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হয়েছিল তার মধ্যে গতানুগতিক ক্যাথলিক মতবাদ থেকে খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্র (Christian Socialism), উপযোগবাদ, র‍্যাডিক্যালিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে নাস্তিক্যবাদ পর্যন্ত সবই ছিল।

১৪। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ১৬৬

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সব রকম প্রয়াসই দেখা গিয়েছিল। নানান সংগঠন তাদের পত্রিকা, অধিবেশন, বক্তৃতা ও মতবাদের মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীকে মুখর করে রেখেছিল।

এমন সময় নানা রকম চিন্তাধারার ঘনকৃষ্ণ মেঘের মধ্যেই দেখা দিল বিদ্যুতের ঝলকানি যা এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্যকে প্রকট করে তুলল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বর চার্লস ডারউইনের 'ওরিজিন অব স্পেসিজ' ইংলন্ডে প্রকাশিত হল। গ্যালিলিওর 'সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বে'র মতো এই ক্রমবিকাশবাদও সনাতনী খ্রীষ্টধর্মের উপরে বিরাট আঘাত হানল। বাইবেলের 'হায়ার ক্রিটিসিজম'*-এর কথা বাদ দিলেও এই ক্রমবিকাশবাদ সপ্তদশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানের চেয়েও মারাত্মক আঘাত হেনেছিল।

অন্যদিকে, বহু উদারপন্থী প্রোটেস্ট্যান্ট নেতারা ক্রমবিকাশবাদকে নিজেদের মতবাদের কাজে লাগিয়ে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বগুলিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন যাতে সেগুলি মানবজীবনে কার্যকরী হয়ে ওঠে। তাঁরা ক্রমশই আশাবাদী হয়ে উঠলেন। তাঁরা বললেনঃ সৃষ্টির পর থেকেই ঈশ্বর এমনভাবে কাজ করে যাচ্ছেন যাতে এই জগৎ ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ খ্রীষ্টান-সমাজ হয়ে উঠতে পারে, যে সমাজে সকলেই হবে কর্মী, সুখী এবং অন্যের প্রতি প্রেমে পূর্ণ। 'আধুনিক সমাজতন্ত্রীরা পরবর্তী শতাব্দীকে এমন এক যুগ বলে চিহ্নিত করছেন যেখানে সকলেই তাদের স্বর্গরাজ্য ফিরে পাবে'—মন্তব্য করেছিলেন অজ্ঞেয়বাদী লেসলী স্টিফেন। সেটি ছিল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশবাদীদের সঙ্গে স্বামীজী কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হননি, কিন্তু ক্রমপ্রগতির (steady progress) ব্যাপারে উনবিংশ শতাব্দীর কবিকল্পনার অযৌক্তিকতা দেখিয়ে দিতে তিনি কাউকে ছেড়ে কথা বলেননি। '...তোমরা যাহাকে উন্নতি বলো, তাহাও তো আমি বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না—উহা তো বাসনারই ক্রমাগত বৃদ্ধি।'[১৫] অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ 'এরূপ শোনা যায়, দোষাংশের ক্রমপরিহার ক্রমবিকাশবাদের একটি বিশেষত্ব ; সংসার হইতে ক্রমাগত এইরূপ দোষভাগ পরিত্যক্ত হইলে অবশেষে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। ...বেশ কথা, কিন্তু এ যুক্তি আগাগোড়া ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ তাহারা বিনা প্রমাণে স্বীকার করিয়া লয় যে, জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা অপেক্ষা দোষাবহ একথা স্বীকার করা যে, মঙ্গলের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান, এবং অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দিষ্ট, অতএব এমন একসময় উপস্থিত হইবে, যখন অমঙ্গল-ভাগ এইরূপে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়া একেবারে নিঃশেষিত হইবে, তখন কেবল মঙ্গলই থাকিবে। এরূপ বলা অতি সহজ। কিন্তু অমঙ্গল যে ক্রমশঃ কমিতেছে, ইহা কি প্রমাণ করা যায়? ...আমাদের সুখী হইবার শক্তি যতই বৃদ্ধি পায়, যন্ত্রণাভোগের শক্তিও সেই পরিমাণে বর্ধিত হইয়া থাকে। কখন কখন আমার

---

* এই হায়ার ক্রিটিসিজমে যীশুখ্রীষ্টের ঐতিহাসিকতা, বাইবেলের নানান কাহিনী এবং ধর্মতত্ত্ব হিসাবে খ্রীষ্টধর্মের উপরে নানা রকম সন্দেহ ও বিতর্ক উপস্থিত করা হয়েছিল।

১৫। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৯

মনে হয়, আমাদের সুখী হইবার শক্তি যদি সমযুক্তান্তর শ্রেণীর নিয়মে অগ্রসর হয়, তবে অপর পক্ষে অসুখী হইবার শক্তি সমগুণিতান্তর শ্রেণীর নিয়মে বর্ধিত হইবে। অরণ্যবাসী মানুষ সমাজ সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞ নহে। কিন্তু উন্নতিশীল আমরা জানি, যতই আমরা উন্নত হইব, ততই আমাদের সুখদুঃখের অনুভবশক্তি তীব্র হইবে। ...কেবল সুখের সংসার বা কেবল দুঃখের সংসার হইতে পারে না। এরূপ ধারণাই স্ববিরোধী। কিন্তু এরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা বেদান্ত এই একটি মহারহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পৃথক সত্তা নহে।'[১৬]

বিশ্বজগৎ ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক কি, তা জানার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের মানুষ তার সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করেছিল। বিভিন্ন রকম আপাত-সমাধানও তার কাছে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু মূল সমাধানটি তখনও ছিল অজানা। তার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সমগ্র সংস্কৃতিটিই সেই শতাব্দীর শেষদিকে হয়ে পড়েছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী। একদিকে সে তার সকল বন্ধন ছিঁড়ে সর্ববিষয়ে যেন মুক্তির আস্বাদ পেতে লাগল, তার শক্তি ও জ্ঞান যেন চরম সীমায় পৌঁছে যাবার মতো হল। কিন্তু অন্যদিকে তার জীবনদর্শন জাগতিক সত্তার ঊর্ধ্বে তার সেই মহান অপ্রতিরোধ্য আত্মিক চেতনাকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হল তার সকল প্রয়াস সত্ত্বেও। তার কোন আত্মা আছে কিনা সে-বিষয়ে মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। একদিকে তার জাগতিক জীবন যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু ছন্দোবিহীন, অন্যদিকে রয়েছে তার আত্মিক জীবন যার মধ্যে যুক্তির ছিটেফোঁটাও সে দেখতে পারছে না। এই দুই জগৎকে যতবারই সে মেলাতে চায়, প্রশ্ন ও সন্দেহ ততবারই তার সামনে গভীরভাবে ভেসে ওঠে। এ ধরনের দ্বন্দ্বময় সাংস্কৃতিক চেতনা বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না।

॥ ৪ ॥

এই সঙ্কটলগ্নে যখন যান্ত্রিক ও বাস্তবজীবন প্রসঙ্গে একটি আধ্যাত্মিক চেতনার সমন্বয় সর্বতোভাবে কাম্য ছিল, তখনই শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভূত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি যে বাণী শোনালেন তা যেন হঠাৎ এক পরিবর্তনের সূচনা করল। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল বেদান্তের সার্বভৌম-একত্ব বিষয়ক। পাশ্চাত্যজগৎ তখনও দাঁড়িয়েছিল দ্বৈতবাদের উপরে। বিষয় (object) ও বিষয়ীর (subject) পার্থক্য, চেতনার আধার হিসাবে স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব, তা সে পদার্থটি জড়, মন বা আত্মা যা-ই হোক না কেন—এই দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী পাশ্চাত্যজগতের সামনে বেদান্তের একত্ববাদ প্রথমদিকে দুরূহ এবং অগ্রহণীয় বলেই মনে হয়েছিল। তাদের এই সমস্যাকে গভীরভাবে অনুধাবন করে স্বামীজী নিজেকে প্রতিভাত করলেন তাদের কাছে মানবদরদী হিসাবে। পাশ্চাত্য লোকেদের জীবন ও চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করে প্রেমিক পিতার মতো তাদের ভাষাতেই এমনভাবে প্রকাশ

১৬। তদেব, পৃঃ ১১-৩

করলেন নিজেকে যা তাদের অন্তরকে স্পর্শ করল। প্রজ্ঞাদৃষ্টির আলোকে তাঁর শিক্ষা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করল এক দৈবী ঋষি রূপে, যিনি রক্ষা করতে এসেছেন শুধু মানুষকেই নয়, তার ধর্মকেও—যে ধর্মের তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিগ্রহ। পাশ্চাত্যজগতের কাছে তাই তাঁর কথাগুলি যেন স্বতঃসিদ্ধের মতো মনে হতে লাগল।

স্বামীজী তাদের মূল সমস্যাটিকে ধরেই নাড়া দিলেন, সবকিছুকে তুলে ধরলেন আত্মার আলোকে। তাঁর মূল শিক্ষাটি কি ছিল? প্রথমত, যান্ত্রিক বিশ্ব ও অ-যান্ত্রিক বিশ্বের মধ্যে তিনি কোন আপস করতে রাজী ছিলেন না। একটি অপরিবর্তনীয় অদ্বৈত সত্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলেই দু-ধরনের মতবাদের উৎপত্তি—একথাটিই তিনি বুঝিয়ে বললেন। এ দুটির কোনটিই চরম সত্য নয়। চরম সত্য যা তা সকল দৃষ্টিভঙ্গিকেই নিজের মধ্যে টেনে নেয়, সাগর যেভাবে সকল নদীকে স্থান দেয় নিজের বুকে। চরম সত্য 'এক'—সমস্ত নাম-রূপের ঊর্ধ্বে তা একটি অনন্ত শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় সত্তা। '...এই জগৎই সেই নিরপেক্ষ অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা; আর ব্যবহারিক সত্তা তাহাকেই ভিন্নভাবে দর্শনমাত্র।'[১৭]

লক্ষ্য করার বিষয়, স্বামীজীর দৃষ্টিতে জড়ের মতো ব্যক্তি-ঈশ্বরও এই জাগতিক বিশ্বের একটি অংশ মাত্র। 'ঈশ্বর হইতে ক্ষুদ্রতম জীব পর্যন্ত, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সেই এক মায়ার রাজত্ব। একই প্রকার যুক্তিতে ইহাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বা নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।'[১৮] অন্যত্র তিনি বলেছেন: 'আমরা যে-কোন ব্যবহারিক সত্তা অনুভব করি বা চিন্তা করি, দেখিতে পাই—উহা অবশ্যই আমাদের জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, অতএব সসীম হইয়া থাকে; আর সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা, তাহাতে তিনিও ব্যবহারিক সত্তা। কার্যকারণ-ভাব কেবল ব্যবহারিক জগতেই সম্ভব, আর তাঁহাকে যখন জগতের কারণ বলিয়া ভাবিতেছি, তখন অবশ্যই তাঁহাকে সসীমরূপে ধারণা করিতে হইবে। তাহা হইলেও কিন্তু তিনি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম। ...এই জগৎই আমাদের বুদ্ধির মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই নির্গুণ ব্রহ্মমাত্র। প্রকৃতপক্ষে জগৎ সেই নির্গুণ সত্তামাত্র, আর আমাদের বুদ্ধির দ্বারা উহার উপর নাম-রূপ দেওয়া হইয়াছে। এই টেবিলের মধ্যে যতটুকু সত্য, তাহা সেই সত্তা; আর এই টেবিলের আকৃতি ও অন্যান্য যাহা কিছু—সবই সদৃশ-মানববুদ্ধি দ্বারা তাহার উপর আরোপিত হইয়াছে।'[১৯]

চেতনার একটি স্তর (one state of consciousness) থেকে দেখতে গেলে এ জগৎ জড়পুঞ্জ ছাড়া কিছু নয় যা তার নিজস্ব নিয়ম ও সূত্র মেনে চলে। অন্য একটি স্তর থেকে দেখলে এই জগৎই আবার ভাবস্রোত বলে অনুভূত হয়; আরও ঊর্ধ্বস্তর থেকে দেখলে এটি শুদ্ধ চৈতন্যে রূপায়িত হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় যা 'মোমের বাগান', মোম দিয়েই যার গাছ-ফুল-ফল তৈরী। জগৎ সম্বন্ধে এই যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, বেদান্ত যেগুলিকে বিভিন্ন স্তর বলে বর্ণনা করেছে, স্বামীজী তাকেই প্রকাশ করে বললেন: 'দ্বৈতবাদে এই বিশ্বকে ঈশ্বর-কর্তৃক চালিত একটি সুবৃহৎ যন্ত্ররূপে কল্পনা

১৭। তদেব, পৃঃ ২৬৯ ১৮। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৫

১৯। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৭০

করা হয়; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ইহাকে জীবদেহের মতো একটি জীবন্ত ও পরমাত্মার দ্বারা অনুস্যূত অখণ্ড সত্তারূপে কল্পনা করা হয়। ...অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ইহা অর্থহীন কথা। ...অদ্বৈতবাদীগণ বলেন, "এই বিশ্বের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, এ সকলই মায়া। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, এই দেবগণ, দেবদূতগণ, জন্মমৃত্যুর অধীন অন্যান্য প্রাণী, এবং চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ এই অনন্তকোটি আত্মা—এই সমস্তই স্বপ্নমাত্র"।'[২০] অদ্বৈতবেদান্তের ভূমিতে দাঁড়িয়েই এইসব আপাত-বিভিন্ন জগৎ-সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে একই সত্তার বিভিন্ন স্তর বলে প্রতীয়মান হয়। স্বপ্নের মধ্যে সবকিছুকেই যৌক্তিক বলে মনে হয়, সত্য বলে বোধ হয়। কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পর এর সবকিছুর মধ্যেই ধরা পড়ে অসঙ্গতি। 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডার ল্যান্ড'-এর মতোই এর কার্যকারণ-সূত্র। স্বামীজীর ভাষায়ঃ 'এই জগতে নিয়ম বা সম্বন্ধ বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, পরস্পর যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। ...যখন আমরা এই জগদ্রূপ স্বপ্নদর্শন হইতে জাগিয়া উঠিয়া ঐ স্বপ্নকে সত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিব, তখন ঐ সমুদয়ই অসম্বদ্ধ ও নিরর্থক বলিয়া প্রতিভাত হইবে—কতকগুলি অসম্বদ্ধ জিনিস যেন আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল—কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইতেছে, কিছুই জানি না। কিন্তু আমরা জানি যে, উহা শেষ হইবে।'[২১]

স্বামীজী কিন্তু বুদ্ধদেবের মতো (এবং আধুনিক যুগের কিছু কিছু অভিজ্ঞতাবাদীর মতো) 'এ জগতের সবকিছুই অসামঞ্জস্যপূর্ণ' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। আর, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় জগতের দ্বৈত-অস্তিত্বও তিনি মেনে নেননি। তাঁর ভাষায়ঃ 'বৌদ্ধ দার্শনিক বলিতেছেনঃ ...একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই; এই গুণগুলিরই কেবল অস্তিত্ব আছে। ইহার অতিরিক্ত তুমি আর কিছুই দেখিতে পাও না। ইহাই অধিকাংশ আধুনিক অজ্ঞেয়বাদীদের মত, এই দ্রব্যগুণের বিচার আর একটু উচ্চভূমিতে লইয়া গেলে দেখা যায়, ইহা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার বিচারে পরিণত হইয়াছে। এই দৃশ্য জগৎ—নিত্যপরিণামশীল জগৎ রহিয়াছে, এবং ইহার পিছনে এমন কিছু আছে, যাহার কখনও পরিণাম হয় না; কেহ কেহ বলেন, এই দ্বিবিধ পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আবার অধিকতর যুক্তির সহিত অপরে বলেন, এই উভয় পদার্থ মানিবার কোন আবশ্যকতা নাই, আমরা যাহা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, তাহা "দৃশ্য" মাত্র। দৃশ্যের অতিরিক্ত কোন পদার্থ মানিবার কোন অধিকার আমাদের নাই। এই কথার কোন সঙ্গত উত্তর প্রাচীনকালে কেহ দিতে পারেন নাই। কেবল বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হইতে আমরা ইহার উত্তর পাইয়া থাকি—কেবল একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহাই কখন দ্রষ্টারূপে—কখন বা দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সত্য নহে যে, পরিণামশীল বস্তুর সত্তা আছে, আর তাহারই অভ্যন্তরে অপরিণামী বস্তু রহিয়াছে; সেই এক অপরিণামী বস্তুই পরিণামশীল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।'[২২]

স্বামীজীর মায়া-ব্যাখ্যা বা জগতের আপাতপ্রতীয়মানতা পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে

২০। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬২-৬৪ ২১। তদেব, পৃঃ ৭৪-৫
২২। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬৩

কান্টীয় দর্শন (Philosophy of Kant) বলে মনে হয়েছিল প্রথমদিকে। কান্টীয় দর্শনে এই স্থান-কালিক জগৎ মানবমনের দ্বারাই নিরূপিত হয়। এবং এই মন একটি সত্যবস্তু যাকে অতিক্রম (transcend) করা সম্ভব নয়। এই জগতের সত্যরূপ জানা অসম্ভব; বস্তুর সত্তা চিরদিনই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে। বেদান্তদর্শনে কিন্তু মায়া বা আপাতপ্রতীয়মান এই জগৎ নিত্য নয়, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই এর মূল কারণ। অবিদ্যার কোন কারণ নেই। মনের বহুবর্ণ-রঞ্জিত কাচের মধ্য দিয়ে এই সান্ত সীমিত জগৎ অসীম অনন্তে ভাসছে। এই জগৎ চিরন্তন সত্য নয়; এটিও বিলীন হয় নিত্য অনন্ত চরম সত্যকে রেখে। এই চরম সত্য বা সত্তাকে বিষয়রূপে (object) কখনও জানা যায় না। এটি শাশ্বত চৈতন্য; আর একে উপলব্ধি করা যেতে পারে যখন মানুষ এর সঙ্গে একত্ব অনুভব করে। এটি বাইরে কোথাও নেই। এটি রয়েছে মানুষের নিজের মধ্যেই; উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই।

স্বামীজীর শিক্ষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এই অনন্ত চরম সত্তাকে অনুমানের দ্বারা জানা যায় না, একে জানতে হবে অপরোক্ষ উপলব্ধির সাহায্যে। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর মুনিঋষিরা এই চরম সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন। স্বামীজী চেয়েছিলেন, জগতের প্রত্যেকেই এরকম উপলব্ধিবান হোক; নতুবা ধর্ম কথার কথা হয়েই থাকবে। তাঁর ভাষায়ঃ 'ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন। সমুদয় যুক্তি ও তর্কই কতকগুলি অনুভূতির উপর স্থাপিত। ...কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অধিকাংশ লোক—বিশেষতঃ বর্তমানকালে—ভাবিয়া থাকে, ধর্মে প্রত্যক্ষ করিবার কিছু নাই; যদি ধর্ম লাভ করিতে হয়, তবে বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারাই তাহা লাভ করিতে হইবে।... যেমন বহির্বিজ্ঞানে তেমন পরমার্থবিজ্ঞানেও আমাদিগকে কতকগুলি সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, মতামত সেগুলির উপরই স্থাপিত হইবে। ...জগতের সাধুপুরুষগণের আমাদিগকে শুধু এইটুকু বলিবার অধিকার আছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যের কথাই তাঁহারা বলিতেছেন; তাঁহারা আশ্বাস দেন যে, আমরা সত্য লাভ করিব। সত্য লাভ করিলে তখনই আমরা বিশ্বাস করিব, তাহার পূর্বে নহে। ...এই বিষয়টি বিশেষ করিয়া বুঝা এবং অপরোক্ষানুভূতির ভাব সর্বদা মনে জাগরূক রাখা উচিত। ...ইহাই বেদান্তের মূলকথা—ধর্ম সাক্ষাৎ কর, কেবল কথায় কিছু হইবে না...।'[২৩]

স্বামীজীর পাশ্চাত্যবাসের অধিকাংশ সময়ই নিয়োজিত হয়েছিল এই চরম সত্তার উপলব্ধির বিষয়ে শিক্ষা দিতে। তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেবার দরকার নেই। কেবল এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, মানুষের চিন্তা, এষণা ও আবেগকে পরিশুদ্ধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য; ব্যক্তিকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সর্বত্র ব্যাপ্ত আত্মাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তরণ, অনিত্য থেকে নিত্যে উত্তরণই ছিল তাঁর শিক্ষার মূলকথা। জগৎ সম্বন্ধে এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব কোপার্নিকাসীয় বিপ্লবের চেয়েও অনেক সুদূরপ্রসারী; স্বামীজী যেমন বলতেন, দৃষ্টিভঙ্গির এই আমূল পরিবর্তনই ধর্মচর্চার মূল লক্ষ্য।

২৩। তদেব, পৃঃ ১৮৭-৯১

তিনি যেসব পথ বা যোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন তা ছিল বহুমুখী। তিনি শিখিয়েছিলেন ত্যাগ, অনাসক্তি, নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে বিচার, ধ্যান, নিষ্কাম কর্ম, ভক্তিযোগ—সংক্ষেপে, মনকে শুদ্ধ ও উন্নত করার সমস্ত পথই ছিল তাঁর শিক্ষাসূচীর অন্তর্গত। শুধু কতগুলি ভাল ভাল চিন্তা বা অস্বচ্ছ অনুভব নয়, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হলে মানুষের মনকেই পরিবর্তিত করে ফেলতে হবে, নিজেকে এক নতুন সত্তায় উত্তীর্ণ করতে হবে। যে-জগৎকে আমরা দেখি, কান্ট যাকে অপরিবর্তনীয় বলেছেন, স্বামীজীর ভাষায় তা আমাদের অস্থির মনেরই প্রতিফলন। মন যখন বিশুদ্ধ হবে, চরম সত্তার উপলব্ধি তখনই সম্ভব। আসলে, চরম অতীন্দ্রিয় অবস্থায় মন বিলীন হয়ে যায়, এবং সাধক তখন নিজেকে উপলব্ধি করতে পারেন চরম সত্তার সঙ্গে একীভূত রূপে। এটিই হল ধর্মের মূল। 'যতদিন না তোমার এই উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন তোমাতে এবং নাস্তিকে কোন প্রভেদ নাই। নাস্তিকেরা তবু অকপট; কিন্তু যে বলে, "ধর্ম—আমি বিশ্বাস করি", অথচ কখন উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না, সে অকপট নহে।'[২৪]

এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যে সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে, বিজ্ঞানের কাছে যা অজানা। এই যে বিশ্বজগৎ, সুদূর অতীত থেকে যা আবর্তিত হয়ে চলেছে, এর মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ-বিষয়ে স্বামীজীর সঙ্গে বারট্রান্ড রাসেলেরও একই মত। স্বামীজী বলেছিলেনঃ '...সবকিছুই বৃথা, সবই মিথ্যা। সর্বসংহারক কাল আসিয়া সবই গ্রাস করে, কিছু আর অবশিষ্ট রাখে না...।'[২৫] মায়ার জগতে সবকিছুর কারণ খুঁজতে যাওয়া বৃথা, এমনকি মায়ার নিজেরও কোন কারণ নেই। এর অর্থ হল, মানবীয় যুক্তির ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না; জড়ের মধ্যেও পাওয়া যাবে না সবকিছুর সমাধান, ব্যক্তি-ঈশ্বরের সর্বগ্রাসী ইচ্ছার মধ্যে বা দর্শনের তর্কবিতর্কের মধ্যেও নয়—এ সমাধান পাওয়া যাবে তখনই, মানুষ যখন প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে শিখবে, ব্রহ্মকে স্বীয় স্বরূপ বলে উপলব্ধি করতে পারবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কি মুক্ত নই? অদ্বৈতবেদান্ত কি এই শিক্ষাই আমাদের দিচ্ছে না? স্বামীজী বার বার এ-বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেনঃ 'আমরা যে মুক্ত হইব, তাহা নয়, আমরা সদাই মুক্ত—আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে। আমরা বদ্ধ—এরূপ ভাবনামাত্রই ভ্রম;... আর এক ভ্রম আসিবে যে, আমাদিগকে মুক্ত হইবার জন্য সাধনা, উপাসনা ও চেষ্টা করিতে হইবে; এই ভ্রম আসিয়া প্রথম ভ্রমটিকে সরাইয়া দিবে; তখন উভয় ভ্রমই দূর হইয়া যাইবে।'[২৬]

মুক্তির জন্য এই যে সংগ্রাম, এর মধ্যেই রয়েছে যথার্থ নৈতিকতা, কারণ এ তো শুধু স্বীয় মুক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস নয়, এ সকলের মুক্তিরই প্রয়াস। সকল জীবের একত্ব ও প্রতিটি প্রাণীর অন্তর্নিহিত দেবত্বকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করার মধ্যেই এই প্রয়াস

২৪। তদেব, পৃঃ ৬১ ২৫। তদেব, পৃঃ ৮২
২৬। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৬

ক্যালিফোর্নিয়া ১৯০০

ক্যালিফোর্নিয়া

এপ্রিল ১৯০০

নিহিত। জগতের নিম্নতর সত্যকে এই প্রয়াস অস্বীকার করে। বলছেন স্বামীজীঃ '...সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ; কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর।'[২৭] 'যদি তোমার প্রত্যেক চালচলনে, তোমার বস্ত্রে, তোমার কথাবার্তায়, তোমার শরীরে—আকৃতিতে, সকল জিনিসে ভগবানকে স্থাপন কর, তবে তোমার চক্ষে সকল দৃশ্য বদলাইয়া যাইবে এবং জগৎ দুঃখরূপে প্রতিভাত না হইয়া স্বর্গরূপে পরিণত হইবে।'[২৮] পৃথিবীতে এই স্বর্গরাজ্যের অবতরণের কথাই স্বামীজী বলেছেন—চেতনার উত্তরণে যে স্বর্গ আবির্ভূত হয়। সনাতনী খ্রীষ্টধর্মের কল্পিত অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের ধারণাকে তিনি বার বার খণ্ডন করেছেন। এইসব ধারণার দ্বারা যে নৈতিকতাকে রক্ষা করা যায় না সেকথা তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়েছেন। 'আমার ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য যে, উচ্চতম দার্শনিক ধারণার সহিত নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার উচ্চতম আদর্শ পাশাপাশি যাইতে পারে। আমার দেখানো উদ্দেশ্য যে, নীতিপরায়ণ হইতে গেলে তোমার দার্শনিক ধারণাকে খাটো করিতে হয় না; বরং নীতির ভিত্তিভূমি লাভ করিতে হইলে উচ্চতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণা-সম্পন্ন হইতে হইবে। মানুষের জ্ঞান মানুষের কল্যাণের বিরোধী নয়। বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। জ্ঞানই উপাসনা। আমরা যতই জ্ঞানলাভ করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল।'[২৯]

কিন্তু, হৃদয়াবেগকে ধ্বংস করে অত্যধিক জ্ঞান ও যুক্তির প্রাধান্য স্বামীজীর কাছে ভাল ঠেকেনি। তাঁর ভাষায়ঃ 'এখন প্রয়োজন—উচ্চতম জ্ঞানের সহিত মহত্তম হৃদয়, অনন্ত জ্ঞানের সহিত অনন্ত প্রেমের সংযোগ। সুতরাং বেদান্তবাদী বলেন, সেই অনন্ত সত্তার সঙ্গে এক হওয়াই একমাত্র ধর্ম; আর তিনি ভগবানের এই তিনটি গুণের কথাই বলেন—অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ; আর বলেন, এই তিনই এক। জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সত্তা কখনও থাকিতে পারে না। আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত জ্ঞান এবং জ্ঞান ব্যতীত আনন্দ বা প্রেম থাকিতে পারে না। আমরা চাই এই সম্মিলন—এই অনন্ত সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের চরম উন্নতি—একদেশী উন্নতি নহে।'[৩০]

বিজ্ঞান ও যুক্তির অনুসারী পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে তিনি প্রায়ই বলতেন যে, বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও অনুসন্ধানলব্ধ-তথ্য, সূত্রাদি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের সামঞ্জস্য রয়েছে, কোনও বিরোধ নেই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যে বিভেদ তার সমাধান স্বামীজী এইভাবে করেছেন যে, এগুলি একই চরম সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ। তাঁর ভাষায়ঃ 'মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী—সে এমন এক মীমাংসা করিতে চায়, যাহাতে জগতের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে। প্রথমে এমন এক জগৎ আবিষ্কার কর, এমন এক পদার্থ আবিষ্কার কর, যাহা সকল জগতের এক সাধারণ তত্ত্বস্বরূপ—যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু যাহাকে যুক্তিবলে সকল জগতের ভিত্তিভূমি, সকল জগতের ভিতরে মণিগণমধ্যস্থ সূত্রস্বরূপ

২৭। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৯ ২৮। তদেব, পৃঃ ১৭১

২৯। তদেব, পৃঃ ২৮৬-৮৭ ৩০। তদেব, পৃঃ ১০৮

বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যদি আমরা এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি, যাহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে না পারিলেও কেবল অকাট্য যুক্তিবলে উচ্চ নীচ সর্বপ্রকার স্তরের সাধারণ ভূমি—সর্বপ্রকার অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি—বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমস্যা কতকটা মীমাংসার কাছাকাছি হইল বলা যাইতে পারে; সুতরাং আমাদের দৃষ্টিগোচর এই জ্ঞাত জগৎ হইতে মীমাংসার সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহা সমগ্র ভাবের আংশিক অনুভূতি মাত্র। অতএব এই সমস্যার মীমাংসার একমাত্র উপায়—অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে।'[৩১]

পাশ্চাত্যে স্বামীজীর শিক্ষাদানের পূর্ণ বা আংশিক আলোচনা সংক্ষেপে করা কঠিন। অদ্বৈতবেদান্তের যে ব্যাখ্যা তিনি জগতের কাছে তুলে ধরেছিলেন, পাশ্চাত্যবাসীর কাছে তা নতুন আলো নিয়ে এসেছিল। ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ সম্বন্ধীয়, এমনকি যুক্তি হৃদয়াবেগ সম্পর্কীয় সকল সমস্যার সমাধান তারা খুঁজে পেয়েছিল স্বামীজীর মধ্যে। অদ্বৈতবেদান্তের ভূমিতে দাঁড়িয়েই তারা সবকিছুর ব্যাখ্যা খুঁজে পেল; ধর্ম ও বিজ্ঞানের জগৎ, যুক্তি ও বিশ্বাসের জগৎ, জড় ও ব্যক্তি-ঈশ্বরের জগৎ—সবকিছুই চরম সত্তার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। কিন্তু এ সবই আপাত সত্য; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ ব্যাখ্যা পেতে গেলে এসবের একটিমাত্রকে সম্পূর্ণ বলে ধরলে চলবে না। স্বামীজীর ভাষায়ঃ 'আমাদিগকে আরও উচ্চতর ধারণা অর্থাৎ নির্গুণের ধারণা করিতে হইবে। উহা দ্বারা যে সগুণ ধারণা নষ্ট হইবে, তাহা নহে। সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই—এরূপ প্রমাণ করিতেছি না, কিন্তু দেখাইতেছি, যাহা আমরা প্রমাণ করিলাম, তাহাই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। ...সেই নির্গুণ সত্তাই সত্য, তিনিই মানুষের আত্মা...।'[৩২]

স্বামীজীর শিক্ষার মধ্যে এটাই দেখা যায় যে, গত তিনটি শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্যজগৎ যেসব সমস্যায় আবর্তিত হচ্ছিল—ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমস্যা, হৃদয় ও মস্তিষ্কের সঙ্ঘাতের সমস্যা—তার সবকিছুই অদ্বৈতবেদান্তের মধ্যে সমাধান পেতে পারে। তিনি সত্যই বুঝেছিলেন যে, বর্তমান জগতের কাছে অদ্বৈত দর্শন ও ধর্মই একান্ত প্রয়োজনীয়। '...যদি কেহ একই সঙ্গে যুক্তিবিচারশীল এবং ধর্মপরায়ণ হইতে চায়, তবে তাহার পক্ষে অদ্বৈতবাদই একমাত্র পন্থা।'[৩৩] '...ইউরোপের মুক্তি এখন এই যুক্তিমূলক ধর্ম—অদ্বৈতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে; আর একমাত্র এই অদ্বৈতবাদই, ব্রহ্মের এই নির্গুণ ভাবই পণ্ডিতদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। যখনই ধর্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ইহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এইজন্যই ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা প্রবেশ করিয়া দৃঢ়মূল হইতেছে।'[৩৪]

এবং, সম্ভবত এজন্যই উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশিত করেছিলেন এবং এই মহান আচার্যকে পাঠিয়েছিলেন পাশ্চাত্যজগতে।

৩১। তদেব, পৃঃ ১৮০-৮১   ৩২। তদেব, পৃঃ ২৬৪-৬৫

৩৩। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩০৯

৩৪। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৩

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী

ভারতীয় সনাতন আদর্শের চিরন্তন গতিধারা শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাই আজ থেকে এক শতাব্দী আগেও যা সত্য ছিল, আজও তা-ই সত্য—সত্যের কোন সময়সীমা নেই। 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের উপসংহারে স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রশ্ন করেছেন ঃ 'ভগবৎ-পথসঞ্চারী ইতিমূলক সক্রিয় প্রীতি ও শক্তির মূর্তবিগ্রহ যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীর হৃদয়দ্বারে নববার্তা লইয়া সমুপস্থিত—কে তাঁহাকে বরণ করিয়া নবযুগের রূপায়ণ ত্বরান্বিত করিবে?' এই প্রশ্নের উত্তর দেবে ইতিহাস। আজ আমরা যেভাবে যে পথে এগিয়ে যেতে চাই, সেই পথকে আলোকিত করে রাখতে পারে স্বামী বিবেকানন্দের প্রদীপ্ত বাণী, আবার আগামীকালের বক্ষেও সেই একই আলোকবর্তিকা সংশয়াচ্ছন্ন মানুষকে ঘোর অন্ধকারে পথ দেখাবে। রাষ্ট্র, সমাজ এবং মানবজীবন—সকল বিষয়ে স্বামীজীর তত্ত্বজ্ঞান সমুন্নত আদর্শকে চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে। আবার চিন্তা, কর্ম এবং ধর্মের পথেও স্বামীজীর চেতনা পূর্ণায়ত জীবনবেদের পথপ্রদর্শক।

যে কোন কালেই এবং একালেও আছে মানুষের অতীতের অপূর্ণ আশা, পাওয়া ও হারানো; আর আছে তার আজকের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের দেশকালের সীমায় আমরা এই হিসাবে কি পাই, দেখা যাক। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে স্বামী বিবেকানন্দ কি দিয়েছেন বা কি দিতে পারেন।

অতীতের অনেক আশাই পূর্ণ হয়েছে। তবু একটি যেন চিরকালের অপূর্ণতা আজও মানুষের মনকে নাড়া দেয়। সে তার জীবন, সুখ ও আনন্দের চাহিদা।

সবচেয়ে বড় যে বস্তু আমরা হারিয়েছি তা হল মূল্যবোধ। মানুষ ভুলেছে তার আপন মহিমা, যথার্থ মনুষ্যত্ব ও মর্যাদাবোধ। হারিয়েছে প্রাণের প্রাচুর্য, হৃদয়ের অনুভব, বিচারের বুদ্ধি, আর কাজের উদ্যম। সবল আশাবাদের স্থান নিয়েছে নৈরাশ্যবোধ।

আজ আকাঙ্ক্ষা নেই, আছে প্রয়োজন। খাওয়া চাই, পরা চাই, একটা আচ্ছাদন চাই, এসব জোটাতে একটা বৃত্তি চাই, তার জন্য যতটুকু না হলে নয়, ততটুকু চাই শিক্ষা বা দক্ষতাপত্র, আর চাই একটু চিত্তবিনোদন। চাই এসব যেন তেন প্রকারেণ। কারণ এগুলো প্রয়োজন! এর নাম দিয়েছি একালে 'বাস্তবতা'। কি মূল্য এখানে মূল্যবোধের?

এই সাধারণ পরিবেশ আজ। কিন্তু আজকের এই সাধারণ জীবনদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর কোন স্থান আছে কি? তিনি তো সেই সন্ন্যাসী, সেই হিন্দুধর্মের প্রবক্তা, সেই তত্ত্বজ্ঞানী! বাস্তবের কথা—বিশেষ করে আজকের কালের জীবনের কথা, তার জীবনের প্রয়োজন—তিনি জানবেন কি করে? সনাতন তত্ত্ব ছাড়াও দেশকালের সঙ্গে সম্পর্কিত কাজের কথা তিনি যা বলেছেন সে তো অনেকদিন আগে—আজকে তার উপযোগিতা কতটুকু? এসব প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয়।

স্মরণ করলে দেখা যাবে—চিরকালের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার পথ, সবকিছু পার্থিব

পাওয়ার মধ্যে থেকে পরমকে পাবার উপায়, আর আজকের কালে খুঁজে না পাওয়া বিলুপ্ত মূল্যবোধগুলির পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা—এ সবই স্বামীজী দিয়েছেন। অর্থাৎ আজকের সব আকৃতি মেটাবার উপায় স্বামীজীর কাছে জানা সম্ভব।

তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি জানতেন ঃ 'পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে...সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।'[১]

স্বামীজীকে হিন্দুধর্মের প্রবক্তা বললে তাঁর খণ্ডিত পরিচয় দেওয়া হয়। তাঁর প্রচারিত বার্তা ছিল আসলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর একটি সর্বজনীন ধর্ম বা জীবনের উপজীব্য। তাঁর কথা ঃ 'শাস্ত্র যদি সমস্ত লোককে সকল অবস্থায় সকল সময়ে সাহায্য করিতে না পারে, তবে সে শাস্ত্রের কি প্রয়োজন? শাস্ত্র যদি কেবল সন্ন্যাসীর জীবনের পথপ্রদর্শক হয়... শাস্ত্র যদি কর্ম-চঞ্চল পৃথিবীতে দৈনিক শ্রম, রোগ, শোক, দারিদ্রের মধ্যে, অনুশোচনাময় হতাশ হৃদয়ে, নিপীড়িতের আত্মগ্লানিতে, যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতার মধ্যে, লোভে, ক্রোধে, সুখে, বিজয়ের আনন্দে, পরাজয়ের অন্ধকারে এবং অবশেষে মৃত্যুর ভয়াবহ মুহূর্তে মানুষকে আশার আলো জ্বালাইবার উপায় দেখাইতে না পারে, তবে দুর্বল মানুষের কাছে এই শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই।'[২] হিন্দুধর্মের প্রবক্তারূপে তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখনও তাঁর মুখে শোনা গিয়েছিল ঃ 'ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো তাহাকে অপমান করা।'[৩] 'আমার কিছু বলিবার আছে, উহা আমি নিজের ভাবে বলিব, হিন্দুভাবেও নয়, খ্রীষ্টান ভাবেও নয়, বা অন্য কোন ভাবেও নয়...।'[৪]

তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর তত্ত্বের স্বরূপ কি? 'যিনি সনাতন, অসীম, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ নন—তত্ত্বমাত্র। তুমি, আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপ মাত্র। এই অনন্ত তত্ত্বের যত বেশী কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে, তিনি তত মহৎ; শেষে সকলকেই তার পূর্ণ প্রতিমূর্তি হতে হবে...।'[৫] এই তত্ত্ব আজ ফুটিয়ে তোলবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কেন? স্বামীজীর উত্তর ঃ 'আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরীব—গরীবদের আমি ভালবাসি।'[৬] এই তত্ত্ব নিয়েই তিনি 'নূতন'কে আহ্বান করে বলছেন ঃ '...প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতন করে আরম্ভ করব—একেবারে সম্পূর্ণ নূতন, সরল অথচ সবল—সদ্যোজাত শিশুর মতো নবীন ও সতেজ।'[৭] '...এখন নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নূতন বেদ।'[৮]

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪৯

২। তদেব, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৩২-৩৩

৩। তদেব, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৯

৪। তদেব, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১১৭ ৫। তদেব, পৃঃ ২৯৩

৬। তদেব, পৃঃ ৮৮ ৭। তদেব, পৃঃ ২৯৩ ৮। তদেব, পৃঃ ২৮৯

এখানে উচ্ছ্বাসের স্থান নেই; তথ্য ও তত্ত্বের বিশ্লেষণ যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে। কারণ একালের একটি প্রধান প্রবৃত্তি—যুক্তি বা বিচারের দ্বারা সবকিছুকে গ্রহণ করা। প্রমাণ চাই। এই বুদ্ধিবাদ যেমন বস্তুবিজ্ঞানের প্রধান পদ্ধতি, তেমনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের তত্ত্ব-প্রস্থানে অতি সূক্ষ্ম ব্যবহারে বন্দিত। বিবেকানন্দও এই বুদ্ধিবাদে শ্রদ্ধাশীল। তিনি নিজের কথা সম্বন্ধেও বলেছেনঃ 'যা বলি সেসব কথাগুলি বুঝে নিবি, মূর্খের মতো সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও বিশ্বাস করবিনি। বুঝে তবে নিবি।'[৯]

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর চিন্তাধারার প্রভাব কতটা সক্রিয় এবং কতটা শাশ্বত সে বিচার দুদিক থেকে হতে পারেঃ স্বামীজীর তুলে ধরা তত্ত্বের বিচার, যাতে দেখতে হবে তাঁর তত্ত্ব কি শুধু তাঁর কালের উপযোগী, না একালেও সমান প্রযোজ্য, অথবা সেগুলি চিরকালের; আর সেই বাণীর উৎস সন্ধান অর্থাৎ প্রবক্তার অন্তর্গঠনের উপাদান আবিষ্কার।

যিনি স্বামীজীকে গভীরভাবে বুঝেছিলেন, সেই নিবেদিতার দৃষ্টিতে দ্বিতীয়টি অতি সংক্ষেপে বিচার করলে দেখা যায়—এ উপাদান ছিল তিনটিঃ শাস্ত্র (অর্থাৎ জ্ঞানচর্চা); গুরু (যিনি দুর্লভ অপরোক্ষকে সুলভ করেন); আর মাতৃভূমি (যা বাস্তবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেয়)।[১০] তাই স্বামীজী বস্তু-নিরপেক্ষ জ্ঞানের রাজ্যে বাস করেননি। পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ অনুভূতির ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করেছেন ও তাকেও হৃদয়ের স্পর্শে আত্মসাৎ করেছেন। এই ত্রিবেণী সঙ্গম থেকেই তাঁর বাণী উৎসারিত হয়েছিল। নিবেদিতা যথার্থই দেখেছেন স্বামীজীর '...মনের গঠন ছিল সম্পূর্ণভাবে আধুনিক। মনের যে অবস্থায় মানুষ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে—সেই শাশ্বত-প্রজ্ঞালোকে তাঁহার চিত্তও উদ্ভাসিত থাকিত, কিন্তু সেইসঙ্গে বর্তমান যুগের মনীষী ও কর্মিবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত সকল প্রশ্ন ও সমস্যার উপরেও তাহার আলোক আসিয়া পড়িত।'[১১] অন্যত্র নিবেদিতা বলেছেনঃ '...যে নিয়তি তাঁকে তীব্র বৈরাগ্যের জ্বলন্ত তৃষ্ণায় অস্থির করেছে, সেই নিয়তিই তাঁর মধ্যে মূর্ত করেছিল গৃহীর আদর্শকে—পালনে ও রক্ষণে ব্যগ্র, পার্থিব বস্তুর প্রয়োজন অনুধাবনে ও অনুধাবন করানোয় উৎসুক, জীবনের সংগঠন ও ইতিহাস রচনায় অগ্রসর।'[১২] রোমাঁ রোলাঁ 'বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী' গ্রন্থে বলেছেনঃ 'কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পরেই কেবল তিনি লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আর্ত মানবতাকে—তাহার সকল সকরুণ নগ্নতার মধ্যে তাঁহার দেশমাতৃকাকে—স্বহস্তে ও স্বচক্ষে স্পর্শ ও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।'[১৩] এ বিচারে সহজেই বোঝা যায়, এ প্রবক্তার

৯। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪০ ১০। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২/০ (ভূমিকা)

১১। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা (অনুবাদঃ স্বামী মাধবানন্দ), উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৭৯

১২। The Complete Works of Sister Nivedita, Vol. 1, Advaita Ashrama, Calcutta, Third Edition (1982), p. 370

১৩। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী—রোমাঁ রোলাঁ (অনুবাদঃ ঋষি দাস), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৭৬), পৃঃ ৮

পক্ষে কালের উপযোগী তত্ত্ব পরিবেশন সম্ভব। এবার অন্যটির কথা।

আমরা দেখেছি মানুষের সমাজজীবন দেশকালের সীমায় বাঁধা হলেও নিছক মানুষ চিরকালের। চিরকালের মানুষের বিকাশের জন্য কতকগুলো চিরকালের তত্ত্ব আছে। বিবেকানন্দ আজকের জন্য আবার তাদের সংগ্রহ করেছেন। স্বামীজীর চিন্তায় কিছু তত্ত্ব আছে যা শুধু একালেই নয়—ভবিষ্যৎ কালেও অচল হয়ে যাবে না। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর মূল্য সেইজন্যই সবচেয়ে বেশী।

আবার যে তত্ত্ব নিছক আজকের জন্য, যে বাণী আজকের বাস্তব জীবনের উপযোগী, আজকের প্রয়োজন যা মেটাতে পারে—আজকের কালে বর্তমান না থেকে স্বামীজীর পক্ষে তা-ও দিতে পারা সম্ভব হয়েছিল দুটো কারণে ঃ প্রথমত, ইতিহাস শুধু অতীতের অনুলিপি নয়, অনাগতের আভাসও তার মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়। স্বামীজী তাঁর ইতিহাসচেতনার ফলে যে দূরদৃষ্টি বা ভবিষ্যৎজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তাতে শুধু বর্তমানে দাঁড়িয়েই কর্তব্য নির্ণয় করেননি। আগামী দিনের রূপও সে চেতনায় প্রত্যক্ষ করে সেদিনের কর্তব্যও নিঃসংশয়ে নির্দেশ করেছেন। দ্বিতীয়ত, স্বামীজীর সময়ে যা তৎকালবর্তী বাস্তব ছিল, তার অনেক কিছুই আজকের কালেও বর্তমান। কাজেই যুক্তি দিয়ে বোঝা যায়, স্বামীজীর কাছে আজকের পরিপ্রেক্ষিতেও পাবার মতো কিছু থাকা সম্ভব।

সাধারণ মানসিকতার পরিবর্তনের একটি বিশেষ গতি দিয়ে সমাজজীবনের কাজ নির্ধারণ করা যেতে পারে। সে হিসাবে রামমোহন থেকে রামকৃষ্ণ একটি নির্দিষ্ট কাল—যদিও বেশ দীর্ঘ। বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এরপর একটি স্বল্পস্থায়ী কালের সীমা টানতে পারি—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ বিবেকানন্দের প্রবচন-যুগ। স্বামীজীর দেহান্তের পরই আর এক নতুন কাল, যে কালে সকল চিন্তা আর কাজে স্বামীজীর বাণীর ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা যায়—যখন তিনি 'অশরীরী বাণী'[১৪]—এরই শুরুতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে বিপ্লববাদের নব উদ্দীপনার যুগ, যা শেষ হল ভারতের স্বাধীনতালাভে। এই মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসরে মানসিকতা কিন্তু অতি দ্রুত অধিবৃত্তের ভঙ্গিতে বদলে গেছে। এই যুগসৃষ্টির শুরুতে বিবেকানন্দ-প্রবচনের আধ্যাত্মিক ভাব নবজাত রাজনৈতিক চেতনাকে প্রভাবিত করে ও পরে ধীরে ধীরে রাজনীতি এমনই রূপ নেয় যে, তা বস্তুত জাতীয় জীবনের কেন্দ্রে নিজেকে আধ্যাত্মিক ভাবের স্থলাভিষিক্ত করে, যে সম্বন্ধে স্বামীজীর স্পষ্ট উক্তি ছিল ঃ 'যদি কোন জাতি তাহার এই স্বাভাবিক জীবনীশক্তি—শত শতাব্দী ধরিয়া যেদিকে উহার নিজস্ব গতিধারা চলিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সেই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

'সুতরাং যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকেই জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি না করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফলে তোমরা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে।' 'আমি একথা বলিতেছি না যে, রাজনীতিক বা সামাজিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই; আমার বক্তব্য এইটুকু—আর আমার ইচ্ছা

১৪। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৫৫

তোমরা ভুলিও না যে, ঐগুলি গৌণ, ধর্মই মুখ্য।'[১৫] '...রাজনীতিক উন্নতি, সমাজসংস্কার বা কুবেরের ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও ধর্মই যে ভারতের প্রাণ, ধর্ম লুপ্ত হইলে যে ভারতও মরিয়া যাইবে...।'[১৬] মানুষের ভিতরেই যে দেবত্ব আছে তাকে প্রকাশ করাই স্বামীজীর কাছে ধর্ম।[১৭]

এক চিন্তাশীল গ্রন্থকার এই ঘটনাকেই লক্ষ্য করে লিখেছেন ঃ '...আধুনিক ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী তেমনই একটা বিশিষ্ট যুগ; সেযুগে সমাজ, ধর্ম ও চরিত্রনীতির সমস্যাই এমন আকার ধারণ করিয়াছিল যে, সেই সমস্যাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে ছিল একটা আধ্যাত্মিক সঙ্কটের যুগ—সেই সঙ্কটে জাতির আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল—শ্রেষ্ঠ প্রতিভারও বিকাশ হইয়াছিল। অতঃপর সে সমস্যাই যেন লোপ পাইল, বাঙালীর সকল বুদ্ধি—হৃদয়বৃত্তি ও চিন্তাশক্তি একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল; সে এক অকাল-সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশায় মাতিয়া উঠিল।'[১৮] বাঙালীর সম্বন্ধে হলেও একথা সারা ভারতের সম্বন্ধেই নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ '...সে একটা সেন্টিমেন্টমাত্র সম্বল করিয়া পলিটিক্সের পথে দেশোদ্ধার করিতে অধীর হইয়াছিল। এই আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া ক্রমে সে আদর্শভ্রষ্ট ও ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রাণশক্তি হ্রাস পাইয়াছে, এবং নৈরাশ্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পরধর্ম (অ-বাঙালী বা অ-ভারতীয়) আশ্রয় করিতেও তাহার বাধে না।'[১৯]

এর পরের কালই আমাদের আজকের কাল যা শুরু হয়েছে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের সময় থেকে। একেবারে নতুন কাল—যখন ভারতবাসীর বেশভূষা, কেশ-শ্মশ্রু-বিন্যাস, কথা কইবার ভঙ্গি থেকে শুরু করে যানবাহন, পথঘাট, শহর, পল্লী, সামাজিক সম্পর্ক, রাজনীতি, সাংসারিক সম্বন্ধ, শিক্ষার ধারা, ভাষা—লিখিত ও কথ্য—সাংবাদিকতা, শিল্প, সাহিত্য সবকিছুর মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন এসেছে যে তাকে আগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। একালেও বিচারবুদ্ধি ও শ্রেয়োজ্ঞানের অভাবে আমরা ভেবে নিয়েছি, বোধহয় সবই পেয়ে গেছি; চেষ্টার আর প্রয়োজন নেই; চিন্তা ও মননের সাহায্যে লক্ষ্যকে স্পষ্ট করে জেনে সেদিকে এগুনোর পথ বোধহয় নতুন করে আবিষ্কার করতে আর হবে না; যে পথ-হারানোর পথ ধরেছি তা-ই বোধহয় সকল আকূতিকে প্রাপ্তির প্রশান্তি দেবে।

দারিদ্র-পীড়িত, অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত, নিরন্ন, পদদলিত, অবহেলিত, শোষিত, নির্যাতিত নীচের তলার মানুষের হাহাকার সে মহাপ্রাণের কণ্ঠে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, নারী ও গণজাগরণ, ঐহিক উন্নতি, চরিত্র, মনুষ্যত্বের বিকাশ, আত্মবোধের প্রসার, সর্বজনীনতা, মুক্তি, পূর্বপশ্চিমের তত্ত্ববিনিময়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মিলন—অনেক বিষয়েই স্বামীজীর সুচিন্তিত ও উপলব্ধ দৃষ্টির প্রকাশ

১৫। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১১০, ১৮৬ ১৬। তদেব, পৃঃ ৩৯
১৭। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৪০০
১৮। বাংলার নবযুগ—মোহিতলাল মজুমদার, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ১৬৮ ১৯। তদেব, পৃঃ ১৭০

রয়েছে তাঁর বাণীতেঃ 'কিন্তু ইহাতে জগতের কি উপকার হইয়াছে বা হইবে, সে প্রশ্ন এখন মুলতুবী থাকাই উচিত; বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর, এই পঞ্চাশ বৎসরে, জগৎময় মানুষের ব্যাধি যে আকার ধারণ করিয়াছে—যে আগুন তাহার মস্তিষ্কে জন্মলাভ করিয়াছে, এবং যাহার ফলে মনুষ্যত্বের চেতনাই এক্ষণে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, সেই আগুন প্রশমিত হইবার পূর্বে কোন সত্যই স্থিতিলাভ করিবে না; অতএব এখন সকল প্রশ্নই বৃথা।'[২০]—এ মন্তব্যে একমত হওয়া সম্ভব নয়। এখন এ প্রশ্ন মুলতুবী রাখবার অবকাশ নেই। বরং সে বাণীতে, সে জীবনে জগতের কি উপকার সাধিত হয়েছে, কি হচ্ছে, আর কি হতে পারে তা বোঝাবার এই উপযুক্ত কাল।

নবযুগের পথপ্রদর্শক স্বামীজী তাই—কি ভারতের কি বিশ্বের—আজকের ব্যাধির নিদান হিসাবে এই মানুষকেই সবল করতে চাইলেন। বললেনঃ 'এস, মানুষ হও। ...তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি।'[২১] 'রোগ কি বুঝিলে, ঔষধ কি তাহাও জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। ...বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। ...পশ্চাতে চাহিও না।... এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে।'[২২] মানুষ যদি স্ব-মহিমায় স্ব-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে দৈহিক মানসিক সব ব্যাধিই দূর হবে। এই হওয়াই চরিত্রগঠন। তার উপায় শিক্ষা। '...নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম...।'[২৩] তাই দেখা যায় স্বামীজী সাধারণ জীবনীশক্তিবর্ধক নিদান দিয়ে বিভিন্ন দেশে কালে প্রকাশিত ব্যাধিলক্ষণের নিরাময়ের ব্যবস্থা দিয়েছেন। তাই তিনি একটি ব্যক্তিমাত্র নন, কোন কালোপযোগী বাণীমাত্র নন, তিনি একটি পদ্ধতি যা সকল কালেই মানুষের কাজে লাগবে সব দেশেই।

চিরকালের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার পথ মানুষের যথার্থ স্বরূপকে জানা। একালে তা জানার এক নতুন চেষ্টা দেখা যাচ্ছেঃ '...এক অবিভক্ত সমষ্টিস্বরূপ অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, তিনিই মানুষের যথার্থ "আমি", তিনিই "প্রকৃত মানুষ"।'[২৪] 'এখন যাহাকে "মানুষ" বলা যাইতেছে, সে জগতের অতীত অনন্ত সত্তার সামান্য আভাসমাত্র, সেই সর্বস্বরূপ অনন্ত অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র। কিন্তু সেই অনন্তই তাহার প্রকৃত স্বরূপ।'[২৫] '...অবিনাশী নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আত্মা হইয়াও আমরা ভাবি, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহমাত্র; ইহাই সমুদয় স্বার্থপরতার মূল। ... যদি আজ মনুষ্যজাতির খুব সামান্য অংশও স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণতা ক্ষুদ্রত্ব ত্যাগ করিতে পারে তবে কালই এই জগৎ স্বর্গে পরিণত হইবে—নানাবিধ যন্ত্রপাতি এবং বাহ্যজগৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতিতে তাহা কখনও হইবে না।'[২৬]

সমস্ত অভ্যুদয়ের জন্যও মানুষের এই স্বরূপ জানা প্রয়োজন। আমাদের দারিদ্র

২০। তদেব, পৃঃ ১৫৮ ২১। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৯ ২২। তদেব, পৃঃ ৩৬৭
২৩। তদেব, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৮
২৪। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৩
২৫। তদেব, পৃঃ ৩৫ ২৬। তদেব, পৃঃ ৩৬

বেকারত্ব দূর করতে, জাতীয় সম্পদ ও উৎপাদন এবং সেইসঙ্গে সাংসারিক ও সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে; অর্থনৈতিক সমস্যা, যুবজীবনের অস্থৈর্য ও শিক্ষাক্ষেত্রের নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতেও এ তত্ত্বেরই প্রয়োজন। '...আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে...'[২৭]—একথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। স্বামীজী বলেছেনঃ 'সকলকে গিয়ে বল্—"ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, একথা বিশ্বাস করো, তা হলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে।"'[২৮] স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশে মানুষকে বলেছেনঃ 'ইংরেজ "পাপ, পাপী" ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকে; বাস্তবিক যদি সকল ইংরেজ নিজেদের পাপী বলিয়া বিশ্বাস করিত, তবে আফ্রিকার অভ্যন্তরে নিগ্রোদের অবস্থার সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য থাকিত না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে একথা বিশ্বাস করে না, বরং বিশ্বাস করে—সে জগতের অধীশ্বর হইয়া জন্মিয়াছে; সে নিজের মহত্ত্বে বিশ্বাসী; সে বিশ্বাস করে—সে সব করিতে পারে, ইচ্ছা হইলে সে সূর্যলোকে চন্দ্রলোকে যাইতে পারে; তাহাতেই সে বড় হইয়াছে।'[২৯] '...এ দেশের মতো এত অধিক তামসপ্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ...আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই।'[৩০] আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় স্বামীজীর সেইকথা শোনবার বিশেষ প্রয়োজন, যেখানে বলছেনঃ '...বলিও না—আমরা দুর্বল। আমরা সব করিতে পারি। ...আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন। ...বেদান্তের এই সকল মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত হইবে, কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা—সে যে-কাজই করুক না কেন, সে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন—সর্বাবস্থায় বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।'[৩১]

স্বামীজীর এই কথার সঙ্গে যে প্রশ্ন উঠবে এযুগের প্রবণতায়—তা এবং তার উত্তরও আমরা স্বামীজীর কাছেই শুনতে পারিঃ 'আর এক প্রশ্ন—এই ভাব কি কার্যে পরিণত করা সম্ভব? বর্তমান সমাজে ইহা কি কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই, সত্য প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান করে না, সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক।'[৩২] 'আমাদের জীবনে দুইটি প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়—একটি আমাদের আদর্শকে জীবনের উপযোগী করা, আর অপরটি এই জীবনকে আর্দর্শের উপযোগী করা। এই দুইটির পার্থক্য বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, কারণ আমাদের আদর্শকে জীবনের উপযোগী করিয়া লইতে—নিজেদের মতো করিয়া লইতে—আমরা অনেক সময় প্রলুব্ধ হই। ...আমি

২৭। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১২ ২৮। তদেব, পৃঃ ১৩
২৯। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫ ৩০। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩-৬৪
৩১। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬-৩৭ ৩২। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬

যাহা কাজে লাগাইবার মতো বলিয়া বোধ করি, জগতে তাহাই একমাত্র কার্যকর। ...আমি যদি চোর হই, আমি মনে করি—চুরি করিবার উত্তম কৌশলই সর্বোত্তম কার্যকর ধর্ম। তোমরা দেখিতেছ, আমরা সকলে কেমন যাহা পছন্দ করি ও করিতে পারি, শুধু সেই বিষয়েই এই "কার্যকর" শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকি।'[৩৩] 'সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্বোচ্চ সত্য কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে— ইহাই আমার মত। আর যদি সমাজ উচ্চতম সত্যের উপযুক্ত না হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও। যত শীঘ্র করিতে পারো ততই মঙ্গল।'[৩৪]

স্বামীজী কালের তথাকথিত প্রয়োজন, প্রবণতা, চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত হননি। তিনি স্পষ্ট বলেছেনঃ 'মানুষের মনযোগানোর সময় আমার নাই, উহা করিতে গেলেই আমি ভণ্ড হইয়া পড়িব। বরং সহস্রবার মৃত্যু বরণ করিব, তবুও (মেরুদণ্ডহীন) জেলি মাছের মতো জীবনযাপন করিয়া নির্বোধ মানুষের চাহিদা মিটাইতে পারিব না—তা আমার স্বদেশেই হউক অথবা বিদেশেই হউক।'[৩৫] 'যদি আমায়—জগৎকে সন্তুষ্ট করতে হয়, তাহলে তাতে জগতের অনিষ্টই হবে। অধিকাংশ লোক যা বলে তা ভুল, কারণ দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে যে, জগৎ শাসন করছে তারাই, অথচ জগতের অবস্থা অতি শোচনীয়।'[৩৬]

তিনি একালের চাহিদা জেনেও তথাকথিত বস্তুবাদীদের মতো মানুষের অসংস্কৃত মনুষ্যত্ব-বিনাশকারী সাধ-আহ্লাদ মেটানোর জন্য তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করতে পারেননি। সকল মানুষকে প্রকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। কারণ একমাত্র তাতেই সকল যুগের সকল মানুষের সকল ক্ষুধা মেটাবার উপায় নিহিত। তাই তিনি দেখালেনঃ '...আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা—আধ্যাত্মিক উন্নতি...।'[৩৭] আর মননের দীনতায়, জীবনৈষণার কার্পণ্যে, অভাবের তাড়নায়, প্রয়োজনের তাগিদে জাতি যে আকাঙ্ক্ষা খুঁজে পাচ্ছিল না তাকে রূপ দিয়ে বললেনঃ '...ভারত আবার জাগিতেছে এবং জগতের উন্নতি ও সভ্যতায় তাহার যাহা দিবার আছে, দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ...ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরাশি আবার সমগ্র পৃথিবী জয় করিবে। ...আমাদের শুধু যে স্বদেশকে জাগাইতে হইবে তাহা নহে...আমার ধারণা হিন্দুজাতি সমগ্র জগৎ জয় করিবে।'[৩৮] '...ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে—ইহা অপেক্ষা নিম্নতর আদর্শে আমি কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারি না।'[৩৯] 'চিরকাল শিষ্য হইয়া থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে। ...এখনও বহু শতাব্দী যাবৎ জগৎকে শিখাইবার বিষয় তোমাদের যথেষ্ট আছে। এখন এই কাজ করিতেই হইবে।'[৪০] 'ইহাই আমার জীবনস্বপ্ন; আর আমি ইচ্ছা করি...সকলের মনে এই কল্পনা জাগ্রত হউক...।'[৪১] স্বামীজী আমাদের না-খুঁজে পাওয়া এক জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সন্ধান দিলেন

৩৩। তদেব, পৃঃ ২২২ ৩৪। তদেব, পৃঃ ৩৭-৮ ৩৫। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১১৭
৩৬। তদেব, পৃঃ ৪১৩ ৩৭। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১১০
৩৮। তদেব, পৃঃ ১৭১ ৩৯। তদেব, পৃঃ ২১৩
৪০। তদেব, পৃঃ ২১৫ ৪১। তদেব, পৃঃ ১৭১

আজকের কালের হিসাবে যাকে আমরা একেবারে খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আজকের পাশ্চাত্যজগতে জড়বাদের মদিরার ঘোর ধীরে ধীরে ছুটে যাচ্ছে। সেখানে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একবাক্যে বলছেন ঃ বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, প্রগতি, সভ্যতার নব নব বস্তুসম্ভার মানুষকে জীবনের যথার্থ সুখের, আনন্দের সন্ধান দিতে পারবে না। মানুষ সভ্যতার আতিশয্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। দুর্নিবার জনবিস্ফোরণের মধ্যে মানুষ ক্রমশ নিঃসঙ্গ একাকিত্বে নিজেকে নির্বাসিত করে এক প্রচ্ছন্ন আতঙ্কে শিহরিত। এ সভ্যতার ফল হচ্ছে—নানান বিরুদ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি। ভৌগৈশ্বর্যের উত্তুঙ্গ শিখরের পাশেই দারিদ্রের গভীর খাদ।

এইটাই আজকের যুগসমস্যা। মানুষ মনুষ্যত্বহারা, ব্যক্তিত্বহারা হয়ে যাচ্ছে, ঐক্যচ্যুত নিঃসঙ্গ হচ্ছে, বন্যার-জলে মূলহারা উদ্ভিদের মতো ভেসে চলেছে, নিজের চারদিকে বড় বড় অসঙ্গতি তার—বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও নিজের উন্নতির মধ্যে, বুদ্ধি আর বিবেকের মধ্যে, স্বার্থ আর প্রেমের মধ্যে। হেনরী হুইলর, মার্লো পন্টি, লিউইস মম্ফোর্ড, এরিক ফ্রন্ট, এরিক কাহলার, নরম্যান কাসিন্স, লেকমতে-দ্য-ন্যুই, নোয়াম চমসকী, ভজটেক কিন্সকী, পিতিরিম সোরোকিন, জুলিয়ান হাক্সলী, আর্নল্ড টয়েনবী এবং আরও অনেকে এই সমস্যাই আবিষ্কার করছেন আর সমাধানের যা ইঙ্গিত দিচ্ছেন তা হচ্ছে ঐ—মানুষকে পূর্ণ করে তোলা।

আজকের বিশ্বের এই পরিস্থিতিতে স্বামীজী ভারতের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে পরিস্ফুট করলেন—যার অভাবে জগতের প্রাণ ওষ্ঠাগত। গুরুর আসনে বসে তার সন্ধান তাকে দিতে হবে। মানুষকে বলতে হবে ঃ তোমার স্বরূপ জান ও জেনে তাকে প্রকাশ কর। মানুষের জন্য সভ্যতা, সভ্যতার জন্য মানুষ নয়। কোন তত্ত্বের কাছে স্বামীজী মানুষকে বলি দেননি। মানুষের জন্য তত্ত্ব। মানুষের জন্যই ধর্ম। 'যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার জন্য সংগ্রাম করে, ততক্ষণ তাহাকে যথার্থ মানুষ বলা চলে।'[৪২] 'বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার...ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।'[৪৩] 'এই অন্তর্জগতের সমীক্ষাতেই প্রাচ্যপ্রতিভা সম্যক বিকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য প্রতিভা। ...এই দুইটি আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্যই হইবে বর্তমানকালের মীমাংসা।'[৪৪]

রোমাঁ রোলাঁ যথার্থই বলেছেন ঃ 'ভারসাম্য ও সমন্বয়, এই দুইটি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের সংগঠন-প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সম্পূর্ণ চারিটি যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক হইতে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক সকল কর্ম—এই সমস্ত মানস পথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ...তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রকাশ।'[৪৫]

স্বামীজী বলেছেন ঃ 'বর্তমানকালে চিন্তাজগৎ ধীরে ধীরে ভারতের ভাব গ্রহণ

৪২। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ১২৬

৪৩। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬১ ৪৪। তদেব, দশম খণ্ড, পৃঃ ২২৪

৪৫। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, পৃঃ ২৬৮

করিতেছে। এখন ইহার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।'[৪৬] 'তোমরা কি দেখিতেছ না, সকল বিষয়েই কিরূপ গুরুতর পরিবর্তন হইতেছে? তোমরা কি দেখিতেছ না, পূর্বে সবকিছুকে স্বভাবতঃ মন্দ বলিয়া মনে করিবার রীতি ছিল, কিন্তু এখন সবকিছু স্বভাবতঃ ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে? ...আধুনিক নিয়ম কি? আধুনিক বিধান বলে—শরীর স্বভাবতই সুস্থ, নিজ প্রকৃতিবশে উহা ব্যাধির উপশম করিয়া থাকে। ঔষধ বড়জোর শরীরের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে, তাহা সঞ্চয় করিতে সাহায্য করে। অপরাধী সম্বন্ধে এই নববিধান কি বলে? নূতন বিধান স্বীকার করিয়া থাকে—কোন অপরাধী ব্যক্তি যতই হীন হউক, তাহার মধ্যে যে-দেবত্ব আছে, তাহার কখনও পরিবর্তন হয় না; সুতরাং অপরাধিগণের প্রতি আমাদের তদনুরূপ ব্যবহার করা উচিত। এখন পূর্বের ভাব সব বদলাইয়া যাইতেছে। এখন কারাগারকে অনেকস্থলে "সংশোধনাগার" বলা হয়। সব বিষয়েই এরূপ ঘটিয়াছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই দেবত্ব আছে—এই ভারতীয় ভাবটি ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও নানাভাবে ব্যক্ত হইতেছে।'[৪৭] এ যেমন ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি লক্ষ্য করেছেন: 'রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যে-সকল সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান করা যায় না। ...আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই এযুগের মূলমন্ত্র। সকলের ভিতর একত্ব-ভাব বিস্তৃত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।'[৪৮]

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর শিকাগো শহরে লুথেরিয়ন স্কুল অব থিয়লজি গৃহে বিখ্যাত শিকাগো ধর্মমহাসভার পঞ্চসপ্ততিতম বার্ষিক উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি সর্বধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রতিনিধি দ্য-পল (ক্যাথলিক) বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার রবার্ট ক্যাম্বেল তাঁর ভাষণে খ্রীষ্টধর্মের বর্তমান ধারার বিশ্লেষণ করে বলেন: 'আধুনিক গোষ্ঠীর খ্রীষ্টানরা যীশুকেই একমাত্র ঐশ্বরিক বলতে ইতস্তত করেন; তাঁরা বলেন, আমাদের যে কেউই ঐশ্বরিক হতে পারেন। অবশ্য এটা হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গির কাছে—যাতে সকল মানুষেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের কথা বলা হয়—খুবই সমর্থন পাবে। বস্তুত বহু বিষয়েই দেখতে পাবেন আজকের উদার খ্রীষ্টান দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচ্যের দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে—বিশেষ করে নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর-সত্তা ও সকল মানুষই ঐশ্বরিক সত্তাময়, এই তত্ত্বদ্বয়ে। মানুষের ক্ষেত্রেও একই কথা: উদার গোষ্ঠীর মতে—গোঁড়া খ্রীষ্টান-চিন্তা "আদি পাপ" প্রভৃতি বিশ্বাসের দ্বারা দুষ্ট। উদার গোষ্ঠী এই মতবাদকে আদৌ সহ্য করতে চায় না। তারা বিশ্বাস করে, যথার্থ শিক্ষা ও প্রয়াসের দ্বারা মানুষ পূর্ণতালাভ করতে পারে। আমি জানি, স্বামী বিবেকানন্দ এই নতুন ঝোঁকগুলিকে সমর্থন করতেন। স্বামীজী আমাদের বলেছেন: "প্রাচীন ধর্ম বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম

৪৬। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৪১

৪৭। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৩১-৩২ ৪৮। তদেব, পৃঃ ১৩৩

বলিতেছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক।" আজকে এই ভাব মানবধর্মী আধুনিকরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছেন।'[৪৯]

স্মরণ করা যেতে পারে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে বক্তৃতাকালে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ ' "জগতে পাপ নাই"—আমি নাকি এই ঘোর পৈশাচিক তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকি; জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লোকে আমাকে এজন্য গালি দিয়াছে। ভাল কথা, কিন্তু এখন যাহারা আমায় গালি দিতেছে, তাহাদেরই বংশধরগণ আমাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিবে যে—আমি অধর্ম প্রচার করি নাই, ধর্মই প্রচার করিয়াছি।'[৫০]

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। যাঁরা তাঁকে গালি দিয়েছিলেন, তাঁদের বংশধরদের অনেকে আজ তাঁকে সাধুবাদ দিচ্ছেন। এঁদের একজন স্বামীজীকে তাঁর ঐ ভাব প্রচারের জন্য সেদিন সাধুবাদ জানালেন সেই শিকাগো শহরেই—যেখানে পঁচাত্তর বছর আগে 'পাপে'র মাথায় প্রথম বজ্রপাত হয়। এ তো গেল ধর্মক্ষেত্রের কথা, আজকের বিজ্ঞানক্ষেত্রের কথা কি?

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে যুগোশ্লাভিয়ার তৃতীয় আন্তর্জাতিক সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মহাসভার অধিবেশনে পঠিত একটি বিজ্ঞান-প্রবন্ধে সেখানকার মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা হাসপাতালের প্রধান ডক্টর যুরিখ জালোকর বলেন ঃ 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্বের বিচারে মানুষের সত্তার সবটা কখনও আবিষ্কার করা যায় না। মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করলেই যে সবসময় তার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া যায় না—এর নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ এ থেকে ক্রমাগতই পাওয়া যাচ্ছে। মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কিছু নব্য ধারাও একদেশদর্শী। এর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি যা সামনে হাজির করে তা কতকটা একটা বস্তু-মানব। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের বাইরের প্রকাশের দিকটাকেই আদর্শায়িত করে মানুষকে বেশী মূল্য দিতে চেষ্টা করে। এরূপ করায়, তাকে তার আসল সত্তা থেকে মারাত্মকভাবে ছিন্ন করে আনা হচ্ছে; যার ফলে সে নিজেকে অবচেতনে গুটিয়ে ফেলে আর এক কিম্ভূত মেঘময় রূপ নেয়। মানুষ এর অজানা ভয়ে কম্পিত হতে থাকে। আমাদের যুগে যে একটি বিশিষ্ট উদ্বেগ আছে তার মূল রয়েছে এইখানেই।

'অন্তত আর একটু সামগ্রিক চিত্র বেরিয়ে আসছে। মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাক্ষেত্রের কিছু গবেষক ইতোমধ্যেই এর বর্তমান দৈন্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন এবং নিজেদের নতুন দিগন্তের সামনে উন্মুক্ত করতে চাইছেন। পরস্পর পৃথকভাবে—তবু যেন কোন অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে—মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও অন্যান্য শাখায় এমন কিছু নতুন বিশেষজ্ঞ উঠছেন, যাঁরা মানুষের সত্তার আধ্যাত্মিক দিকটারও মূল্য দিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত কয়েকজন নিঃসন্দেহে ভারতীয় চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন—বিশেষ করে বিবেকানন্দের ভাষ্যের দ্বারা, যাতে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য সমন্বয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়।'[৫১]

৪৯। শিকাগোর বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি প্রকাশিত প্রতিবেদন (১৯৬৮)

৫০। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৩২

৫১। Prabuddha Bharata, Vol. LXXVI, 1971, p. 173

পাশ্চাত্যে যখন আজ জড়বাদের ঘোর কাটছে আমাদের দেশেও তখন তামসিকতার মোহনিদ্রা ভাঙছে। রজোগুণের রক্তিম আভা পূর্ব দিগন্তে দেখা দিতে শুরু করেছে, যদিও নিদ্রোত্থিতের পাদচারণার জড়িমা আজও কাটেনি। আজকের ভোরে কে তাকে শোনাবেঃ 'জগতের ধারাই এই যে, অনেকের পতন হবে, বহু বাধা আসবে, দুর্লঙ্ঘ্য বিপদ উপস্থিত হবে এবং আধ্যাত্মিকতার আগুনে ভস্মীভূত হবার সময়েও মানুষের ভিতরের স্বার্থপরতা ও অন্যান্য দানবীয় ভাব প্রাণপণে লড়াই করে। "ভালো"র দিকে যাবার পথটি সবচেয়ে দুর্গম ও বন্ধুর। ...সহস্র পদস্খলনের ভেতর দিয়েই চরিত্র গড়ে তুলতে হবে।'[৫২] 'তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল-মন্দ-বিচারের শক্তি সকলের আছে। কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন!'[৫৩]

স্বামীজীর বাণী ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। বিচারের জন্য উদ্ধৃত অংশগুলি আজকের পরিপ্রেক্ষিতে কি এই কথাই প্রমাণ করে না যে, একালে যুগব্যাধির মহৌষধি এই বাণীতেই বর্তমান?

৫২। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩১৫

৫৩। তদেব, পৃঃ ৩৭১

ধর্ম ও দর্শন

কার্যে পরিণত বেদান্ত

স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব ও পূর্ণত্বকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার জীবনবেদ ও সামাজিক পরিকল্পনা বা 'কার্যে পরিণত বেদান্তে'র কাঠামো রচনা করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্ম-বিষয়ে পূর্বাচার্যেরা অনেক কথা বলিয়াছেন, অনেক বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত ব্রহ্মবাদী স্বামীজীর সামঞ্জস্য বা পার্থক্য কোথায়— তাহা বোঝা আবশ্যক। অদ্বৈতবাদী স্বামীজী এবং পূর্ববর্তী আচার্যদের মধ্যে তত্ত্বগত কোন ভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু শঙ্করাচার্য যেখানে তত্ত্বকে বিশুদ্ধরূপে নিষ্কাশিত করিয়া দেখাইতে বদ্ধপরিকর, স্বামীজী সেখানে সেই তত্ত্বকে সর্বানুস্যূতরূপে দেখিয়া কার্যে প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। আচার্য (শঙ্কর) যেখানে প্রতি পদে কর্ম ও জ্ঞানের বিরোধ দেখাইতেছেন, স্বামীজী সেখানে কার্যক্ষেত্রে উভয়ের সমন্বয়-স্থাপনে যত্নপর। আচার্যের দৃষ্টিতে জ্ঞানের রূপটি যেখানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত স্বয়ং ব্রহ্ম, স্বামীজীর দৃষ্টিতে সেখানে উহা মানবের উন্নতিপথের পথপ্রদর্শক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। অতএব স্বামীজীকে বুঝিতে হইলে শঙ্করাচার্যকেও কিছুটা বোঝা আবশ্যক; আমি সেখান হইতেই আরম্ভ করিতেছি।

স্বামীজীর পথ উপনিষদ্ ও গীতা নিরপেক্ষ নহে; এই সকলই স্বামীজীর দর্শনের ভিত্তি, অতএব উহাদের সহিতও স্বামীজীর সম্বন্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। সর্বশেষ আমাদের বিবেচ্য স্বামীজীর রচিত পরিকল্পনা। আমরা এইভাবেই স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতেছি।

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বনের বেদান্তকে লোকালয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত নরনারায়ণ-সেবার আকর এই অদ্বৈতবেদান্ত; এবং মানবসমাজের উন্নতির জন্য তিনি যে-পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাও এই অদ্বৈতভূমির উপরই প্রসারিত। তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠেঃ যে-অদ্বৈতবেদান্তকে এককথায় বর্ণনা করিতে গিয়া আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'[১]—সেই অদ্বৈতবাদের জগদতীত তত্ত্বের সহিত ইহজগতে নরনারায়ণসেবার বা সামাজিক অভ্যুদয়ের সামঞ্জস্য হইবে কিরূপে? আধুনিককালে কোন কোন মনীষী ইহাও বলিতেছেন যে, ভারতের ধর্মগুলি সংসারবিমুখ, উহার মূলীভূত দার্শনিক মতগুলির পরিবর্তন না ঘটিলে ঐ ধর্মগুলি কিরূপে জাগতিক উন্নতির প্রেরণা দিবে?

আপত্তি দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্তরের হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি মৌলিক সাদৃশ্য আছে। উভয় প্রশ্নই আমাদের মনে সন্দেহ জাগাইতেছে যে, নেতিমূলক বেদান্ত বা যে-কোনও সংসারবিমুখ ধর্মমত কোন ইতিমূলক চেষ্টার খোরাক জোগাইতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে তাহাই মনে হয় বটে, অথচ চরম নেতিপরায়ণ অদ্বৈতবেদান্তই স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদের এবং কার্যধারার ভিত্তি। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও তাঁহাকে সযত্নে অদ্বৈতমতে উপদেশ দিলেন, এবং স্বয়ং অদ্বৈতের শেষ সীমা নির্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হইয়া ঘোষণা করিলেন, 'অদ্বৈত সব শেষের কথা;

১। ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা—শঙ্করাচার্য, ২১

অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তা-ই কর।' অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতানুভূতি এবং ব্যবহারিক ক্রিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখিতেন না।

পূর্বাচার্যদের জীবনেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই অবিরোধই লক্ষিত হয়। শঙ্করাচার্য জ্ঞানী ছিলেন—এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই, এবং বর্তমান যুগে তিনি অদ্বৈতদর্শনের সর্বপ্রধান আচার্য—ইহাও সর্ববাদিসম্মত; অথচ জ্ঞানলাভের পরও তিনি অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য গ্রন্থরচনা, মঠস্থাপন, বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া, তীর্থভ্রমণ, ভক্তিমূলক স্তোত্রাদি রচনা প্রভৃতি কার্য করিলেন, এই অসামঞ্জস্যের একটা সমাধান প্রয়োজন। এবং সেই সমাধানের মধ্যেই দ্বৈতাদ্বৈতের মিলনক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে।

অদ্বৈতবাদী আচার্য দেখিলেন, জ্ঞানলাভের পরও ব্রহ্মজ্ঞানীরা উপদেশাদি দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ উপদেষ্টাকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার না করিলে তদুপদিষ্ট জ্ঞানের প্রামাণ্যই ব্যাহত হইয়া যায়। অতএব জ্ঞানীদের জীবন দেখিয়া এবং শাস্ত্রের বচন শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইল যে, 'জীবন্মুক্তি' নামক এমন একটি অবস্থা আছে, যেখানে পূর্ণ জ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়াও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ক্রিয়া করা সম্ভবপর, অথচ যুক্তি-দৃষ্টিতে দ্বৈতাদ্বৈতের মিলন অসম্ভব। তাই এই অবস্থার ব্যাখ্যাকল্পে 'প্রারব্ধ', 'অজ্ঞানলেশ', 'বাধিতের অনুবৃত্তি' ইত্যাদি কথার অবতারণা করা হইল। আবার কেহ কেহ বলিলেন, জ্ঞানীর নিজের দৃষ্টিতে—তিনি কিছুই করেন না, কিন্তু অপরের দৃষ্টিতে করেন বলিয়া মনে হয়। ব্যাখ্যা যাহাই হউক আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে জ্ঞানীর ক্রিয়া আছে, যদিও সে ক্রিয়া ঠিক আমাদের মতো নহে; উহা লোকসংগ্রহ প্রভৃতি উদ্দেশ্যের দ্বারা, প্রারব্ধের দ্বারা বা ভগবদাদেশের দ্বারা নিয়মিত। এই কাজ থাকা ও না-থাকার অবস্থা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে প্রকাশ করিলেন:

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥[২]

—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, স্বপ্ন, শ্বাস, প্রলাপ, বিসর্গ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ প্রভৃতি কার্য করিয়াও তত্ত্বজ্ঞানী ও সমাহিতচেতা ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, ইন্দ্রিয়সকল (স্বভাবের বশে) ইন্দ্রিয়ার্থে প্রবৃত্ত হইতেছে। (আমার ইহাতে কোন বিকার নাই; সুতরাং) তিনি ইহাই ভাবিয়া থাকেন যে, আমি কিছুই করিতেছি না।

আর দৃষ্টান্ত দিলেন:

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥[৩]

—হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কিছুই কর্তব্য নাই, আমার ইদানীং অপ্রাপ্ত অতএব ভবিষ্যৎকালে প্রাপ্তব্য এমন কোন বস্তুও নাই, তথাপি আমি কর্মেতেই বর্তমান আছি।

আর একটি দৃষ্টান্ত পাই রাজর্ষি জনকের জীবনে—'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়।'[৪]—জনক প্রভৃতি (রাজর্ষিগণ) বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই সম্যক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫।৮ ৩। তদেব, ৩।২২ ৪। তদেব, ৩।২০

ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শঙ্করাচার্য বলিলেন যে, 'সংসিদ্ধি' কথাটা চিত্তশুদ্ধি বা জ্ঞানলাভ দুই অর্থেই গৃহীত হইতে পারে। যদি বলি 'চিত্তশুদ্ধি'ই অর্থ, তবে জনকের পক্ষে কর্মদ্বারা সংসিদ্ধিতে অবস্থিত হওয়া কিছু অযৌক্তিক নহে। আর যদি জ্ঞানলাভই সংসিদ্ধির অর্থ হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞানলাভের পরও কোন কারণে জনকের কর্মত্যাগ হয় নাই, কর্মসহই তিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এখানেও জ্ঞানীর পক্ষে কর্মের সম্ভাবনা রহিয়া গেল। এই কর্ম ও কর্মশূন্যতার মাপকাঠি হিসাবে শঙ্কর গ্রহণ করিলেন—ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান থাকা বা না-থাকা। যেখানে ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান নাই, সেখানে 'ন তৎ কর্ম, যেন বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ'[৫]—উহা তো কর্মই নহে যে, উহাকে জ্ঞানের সঙ্গে জুড়িয়া জ্ঞান-কর্ম-সংমিশ্রণের তর্ক তুলিবে। আর বহির্দৃষ্টিতে যে-অবস্থা ক্রিয়াযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়, সত্যদৃষ্টিতে উহা জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠা। রাজর্ষি জনক সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যাহাই হউক, অদ্বৈতবেদান্তের অনুভূতিতে উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষেও কর্মসম্ভাবনার একটা যুক্তি এখানে পাওয়া গেল। আবার মনে রাখিতে হইবে, প্রাচীন আচার্যগণ যখন জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় অস্বীকার করিলেন, তখন তাঁহাদের বিচার চলিয়াছিল জাগতিক ক্ষেত্রে নহে, প্রত্যুত তাত্ত্বিক ভূমিতে। তত্ত্বদৃষ্টিতে জ্ঞানের সহিত কর্মসন্ন্যাসের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকিলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বাহ্যত্যাগের উপর তাঁহারা তেমন জোর দেন নাই। স্বয়ং শঙ্করাচার্যের বিচারধারাও এখানে প্রধানতঃ মানসিক অবস্থাকে লইয়াই ব্যাপৃত। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে আমি কর্ম করিতেছি এবং আমি নিষ্ক্রিয় আত্মা—এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে পর্বতপ্রমাণ অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান বর্তমান। তবু উপনিষদের চিন্তাধারা ও ব্যবহারক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শঙ্করভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরি মুণ্ডকোপনিষদের 'তপসা বাপ্যলিঙ্গাৎ' সন্ন্যাসরহিত তপস্যা জ্ঞানলাভের কারণ নহে—এই শ্রুতির ব্যাখ্যাকল্পে বলিলেনঃ 'শ্রুতিতে তো ইন্দ্র, জনক, গার্গী প্রভৃতির আত্মলাভের কথা আছে! সত্য কথা। সন্ন্যাস বলিতে যে সর্বত্যাগরূপ আন্তর সন্ন্যাস বুঝায়, তাহা তাঁহাদেরও ছিল; কারণ স্বত্বাভিমান তাঁহাদের ছিল না। বস্তুতঃ এখানে সন্ন্যাসের বাহ্যচিহ্ন-ধারণরূপ অর্থ গ্রহণীয় নহে।'[৬]

আবার সিদ্ধ ব্যক্তির অবস্থা আপনাতে আরোপ করিয়া সাধক সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া থাকে—ইহাই চিরাচরিত প্রথা। তাই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণের ভূমিকা করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য লিখিলেনঃ 'অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে সর্বত্রই কৃতার্থ ব্যক্তিদের যাহা লক্ষণ তাহাই সাধনরূপে উপদিষ্ট হয়, কারণ ঐগুলি যত্নসাধ্য।'[৭] ফলতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষ কর্তব্যাতীত হইলেও নানা কারণে তাঁহারা কর্তব্যপরায়ণ বলিয়া যে লোক-প্রতীতি

৫। শঙ্করভাষ্য, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, অবতরণিকা

৬। 'ইন্দ্রজনকগার্গিপ্রভৃতীনামপ্যাত্মলাভশ্রবণাৎ। সত্যম্। সন্ন্যাসো নাম সর্বত্যাগাত্মকস্তেষামপি স্বত্বাভিমানাভাবাদস্ত্যেবাহন্তরঃ সন্ন্যাসো বাহ্যং তু লিঙ্গমবিবক্ষিতম্ "ন লিঙ্গং ধর্মকারণম্" ইতি স্মরণাৎ।' মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।২।৪ নং মন্ত্রের শঙ্করভাষ্যের আনন্দগিরি-কৃত টীকা।

৭। 'সর্বত্রৈব হি অধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থলক্ষণানি যানি তান্যেব সাধনান্যুপদিশ্যন্তে যত্নসাধ্যত্বাৎ।' শঙ্করভাষ্য, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ২।৫৫

হয়, সেই সিদ্ধাবস্থা আপনাতে আরোপ করিয়া সাধক অগ্রসর হইতে পারেন। এইজন্য গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বাচার্যদের এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের কর্মে থাকিয়াও 'কর্ম না করা'-রূপ আচরণের অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন।

এইসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যখন জগৎ 'বাধিতের অনুবৃত্তি'রূপে প্রকাশিত হয়, তখন উহার সহিত তাঁহারা কিরূপ সম্বন্ধস্থাপন করিয়া থাকেন? মায়ারচিত বিশ্বকে তাঁহারা স্বপ্নবৎ অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, অর্থাৎ মনোরাজ্যে তাহার স্বপ্নসদৃশ ছায়াপাত হইলেও তাহার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া অবজ্ঞাভরে মনকে তাহা হইতে সরাইয়া লইতে পারেন, অথবা তাহাকে ঐশী শক্তির বিকাশ মনে করিয়া তাহার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিয়াও উদাসীন থাকিতে পারেন। শঙ্করাচার্য মায়াকে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ—এই ঔদাসীন্যের স্থলে মায়োপহিত ভগবানের এই অপূর্ব রূপের প্রকাশ দেখিয়া তাঁহার সহিত একটি প্রীতির সম্বন্ধও স্থাপন করিতে পারেন। অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে এই সর্বপ্রকার মনোভাবই দেখা যায়। শঙ্করাচার্যের নামে এমন বহু ভক্তিমূলক স্তোত্র প্রচলিত আছে, যাহা সন্ন্যাসীরাও শ্রদ্ধাসহকারে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারই একটি স্তোত্রে আছে ঃ

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গো ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥[৮]

—হে নাথ, দ্বৈতবুদ্ধি অপগত হইলেও আমি তোমারই, তুমি আমার নহ; কেননা সমুদ্রেরই তরঙ্গ হয়, কখনও তরঙ্গ হইতে সমুদ্র হয় না।

মধুসূদন সরস্বতীও সজ্ঞানে জ্ঞান এবং ভক্তির মিলন সাধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নামে এই শ্লোকটি প্রচলিত আছে ঃ

অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢ়াস্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥

—আমরা অদ্বৈতসাম্রাজ্যের পথে অধিরূঢ় হইলেও, ইন্দ্রের বৈভব তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিলেও কোন এক গোপবধূ-লম্পট, শঠকর্তৃক আমরা বলপূর্বক দাসীকৃত হইয়াছি।

শ্রীধরস্বামীও এই পথেরই পথিক। আর শ্রীমদ্ভাগবতকার লিখিয়াছেন ঃ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥[৯]

—হরির এতাদৃশ গুণরাশি যে, যে-সকল মুনি আত্মারাম, যাঁহাদের সকল বন্ধন চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারাও ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, অদ্বৈতভাবপরম্পরার ক্ষেত্রেও এমন কয়েকটি স্থল আছে যেখানে সিদ্ধের জীবনে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির একই সঙ্গে বিকাশ অন্ততঃ ব্যবহারিক দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠে এবং সাধকের জীবনে উহা সজ্ঞানে গৃহীত হইয়া থাকে। আর সহজেই মনে হয় অদ্বৈতবাদী স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার উপর এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ ক্রিয়া করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার মতে

৮। বিষ্ণুষট্‌পদী—শঙ্করাচার্য, ৩ ৯। শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৭।১০

এই সক্রিয় অদ্বৈতবাদই সর্বপ্রকার ধর্ম, নীতি ও সমাজব্যবস্থার মূল এবং অটুট ভিত্তি হইতে পারে। আর কোনও মতবাদের মধ্যে সেরূপ সার্বভৌমিক উদার দৃষ্টি এবং সত্যের প্রতি অবিচল অভিযানের জন্য আহ্বান পাওয়া যায় না। সিদ্ধির স্থিরতার সহিত সাধনার অবিরাম অগ্রগতি একমাত্র অদ্বৈতের মধ্যে নিহিত আছে, সে আলোচনায় আমরা ক্রমে অগ্রসর হইতেছি। প্রথমে অধ্যাত্মক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদের প্রয়োগের কথাই ধরা যাক।

উপনিষদুক্ত অদ্বৈতসাধনার আলোচনায় অগ্রসর হইলে দুইটি বিশেষ বাক্য আমাদের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে—বৃহদারণ্যকের 'নেতি নেতি'[১০] এবং ছান্দোগ্যের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।[১১] এই দুইটি বাক্য আপাততঃ বিরোধী মনে হইলেও শঙ্করাচার্যের মতে উভয়ই একার্থক। প্রথম বাক্য নেতিমুখে যেমন ব্রহ্মের পরিচয় দেয়, দ্বিতীয় বাক্যও তেমনি ব্রহ্মেরই পরিচয় দেয়, সর্বের নহে। তত্ত্বের দৃষ্টিতে তাহাই বটে। কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রেও কি তাহাই ? তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে জ্ঞান স্ববিরোধী অজ্ঞানের নাশক হয়। এই অজ্ঞান-নাশের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের সহকারী বলিয়া বা সহগামী বলিয়া আর কোন কিছু স্বীকৃত হইতে পারে না। একমাত্র জ্ঞান অন্যনিরপেক্ষভাবে অজ্ঞানের নাশ করে। অজ্ঞান নষ্ট হইলে ব্রহ্ম স্বতঃপ্রকাশিত হন ; তাঁহার প্রকাশের জন্য আর কোন ইতিমূলক প্রচেষ্টা নিরর্থক।

মন্দান্ধকারে রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, সে ভ্রম নিরাশের জন্য আলোক আনা আবশ্যক ; কিন্তু তদ্দ্বারা রজ্জুতে প্রকাশরূপ কোন নূতন ধর্মের আবির্ভাব হয় না। নেতিমুখে বিচার করিয়া যখন সর্বত্যাগ হইয়া গেল, তখন ব্রহ্ম আপনিই প্রকাশ পাইবেন।

এদিকে ছান্দোগ্য বলিলেন ঃ 'এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই ; কারণ তাঁহা হইতেই উহা জাত হয়, তাঁহাতে লীন হয় ও তাঁহাতে জীবিত থাকে। অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। মানুষ ভাবরূপী। সে ইহজীবনে যেরূপ নিশ্চয়শীল হয়, দেহত্যাগের পর সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব সে তদ্ভাবে-ভাবিত-হওয়া-রূপ দৃঢ় উপাসনা অবলম্বন করিবে।'[১২] আর উপাসনার পদ্ধতি দেখাইতে গিয়া উপনিষদে বলা হইল ঃ 'হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার এই আত্মাই ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক, কিংবা শ্যামাকতণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর ; হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার এই আত্মাই পৃথিবী হইতে বিশালতর, অন্তরীক্ষ হইতে বৃহত্তর, দ্যুলোক হইতে বৃহত্তর—এই সমস্ত লোক হইতে বিশালতর। যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া বিদ্যমান ; ...ইনিই হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম।'[১৩] স্তরে স্তরে বিবিধরূপে আত্মার সহিত ব্রহ্মের এই যে ঐক্য স্থাপন ও ঐক্যানুভূতি ইহাই ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে ধ্বনিত হইয়াছে ঃ

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥[১৪]

—ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এ সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়।

১০। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।৩।৬ ; ৩।৯।২৬ ; ৪।২।৪ ; ৪।৪।২২ ; ৪।৫।১৫

১১। ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩।১৪।১ ১২। তদেব

১৩। তদেব, ৩।১৪।৩-৪ ১৪। ঈশোপনিষদ্, ১

উত্তমরূপ ত্যাগের দ্বারা (আত্মাকে) পালন কর। কাহারও ধনে লোভ করিও না। অথবা—(ধনের) আকাঙক্ষা করিও না, (কারণ) ধন আবার কাহার?

উপনিষদের উপাসনাতত্ত্বের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্ব স্থাপনের একটি ক্রমিক ধারা এবং তদবলম্বনে অদ্বৈতবাদের উপর মানবজীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার ইঙ্গিত পাইলেন। তিনি দেখিলেন এবং উল্লেখ করিলেন কিভাবে ছান্দোগ্যোপনিষদের সত্যকাম জাবাল স্বীয় গুরু হারিদ্রুমত গৌতমের আদেশে গভীর অরণ্যে গরু চরাইতে গিয়া এই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মে'র সাক্ষাৎকার পাইলেন। বৃষ তাঁহাকে উপদেশ দিলেনঃ 'পূর্ব দিক ব্রহ্মের এক অংশ, পশ্চিম দিক এক অংশ, উত্তর দিক এক অংশ, দক্ষিণ দিক এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের "প্রকাশবান্" নামক চারিকলা-বিশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ।' অগ্নি তাঁহাকে উপদেশ দিলেনঃ 'পৃথিবী এক অংশ, অন্তরীক্ষ এক অংশ, দ্যুলোক এক অংশ, সমুদ্র এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের "অনন্তবান্" নামক চতুষ্কল এক-চতুর্থাংশ।' হংস তাঁহাকে উপদেশ দিলেনঃ 'অগ্নি এক অংশ, সূর্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, বিদ্যুৎ এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের "জ্যোতিষ্মান্" নামক এক-চতুর্থাংশ।' মদগু (এক প্রকার জলচর পাখী) তাঁহাকে উপদেশ দিলেনঃ 'প্রাণ এক অংশ, চক্ষু এক অংশ, শ্রোত্র এক অংশ, মন এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের "আয়তনবান্" নামক চতুষ্কল এক-চতুর্থাংশ।'[১৫] শঙ্করাচার্যের মতে এখানে বৃষ ইত্যাদি শব্দে দিকের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। এই মত অস্বীকার না করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা লইয়া সত্যকাম যখন গোচারণরূপ সাধারণ কর্মের মধ্যেও ব্রহ্মদর্শনে বদ্ধপরিকর হইলেন, তখন বৃষ অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃত প্রাণী ও বস্তুগুলিও মুখর হইয়া তাঁহাকে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-এর সন্ধান দিতে বাধ্য হইল। ছান্দোগ্যের পরবর্তী উপাখ্যানটিও অনুরূপ। গুরু শিষ্যকে উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন। তবু শিষ্যের পরিচর্যায় তুষ্ট অগ্নিসকল তাঁহাকে ব্রহ্মোপদেশ দিলেন, 'প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম'; আর প্রত্যেক অগ্নি পৃথক পৃথক উপদেশ দিলেন। গার্হপত্য অগ্নি বলিলেনঃ 'পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য (আমার তনু)। আদিত্যমণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই আমি।' অন্বাহার্যপচন (দক্ষিণাগ্নি) বলিলেনঃ 'জল, দিক্‌সমূহ, নক্ষত্রবৃন্দ ও চন্দ্রমা (আমার তনু)। চন্দ্রমণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই আমি।' আহবনীয়াগ্নি বলিলেনঃ 'প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক ও বিদ্যুৎ (আমার তনু)। এই যে বিদ্যুন্মধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই আমি।'[১৬] এখানেও স্বাভাবিকভাবে শিষ্যের হৃদয়মধ্যে স্বতঃই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-এর প্রকাশ সঙ্ঘটিত হইল।

ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, ভূমা। বহু রূপে বহু শব্দে তাঁহার এই সর্বব্যাপিত্বের বর্ণনা আছে এবং বেদান্তে স্বীকৃত হইয়াছে। বিভিন্ন উপনিষদে বিবিধরূপে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা সর্বত্র আত্মানুভূতির বিধি রহিয়াছে। এবং অনুভূতির মধ্যে একটা

১৫। ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৪।৫।২; ৪।৬।৩; ৪।৭।৩; ৪।৮।৩

১৬। তদেব, ৪।১০।৪; ৪।১১।১; ৪।১২।১; ৪।১৩।১

ক্রমিক অগ্রগতিও স্বীকৃত হইয়াছে—ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের দিকে এই অবিরাম অভিযান। দৈনন্দিন সাধারণ বস্তুও এই সর্বব্যাপী দৃষ্টির বাহিরে থাকিতে পারে নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্ন, প্রাণ, মন প্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনার বিধান দেওয়া হইয়াছে।[১৭] এই সকল দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অন্ততঃ ঔপনিষদিক যুগে ব্রহ্মোপাসনাকে এইভাবে জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া এক করিয়া লওয়া হইয়াছিল—সমস্ত জীবন এক উপাসনায় পর্যবসিত হইয়াছিল। ইহার আরও ইঙ্গিত বা প্রমাণ পাওয়া যায় ছান্দোগ্যোপনিষদের পুরুষযজ্ঞে। সেখানে বলা হইয়াছে, 'পুরুষই যজ্ঞ, তাহার প্রথম চব্বিশ বৎসর আয়ুই প্রাতঃসবন; বসুগণ পুরুষযজ্ঞের প্রাতঃসবনে অনুগত আছেন; প্রাণসমূহই বসু।...অতঃপর যে চুয়াল্লিশ বৎসর আয়ু, উহা মাধ্যন্দিন সবন। ...অতঃপর যে আটচল্লিশ বৎসর আয়ু, উহা তৃতীয় সবন' ইত্যাদি।[১৮] তারপর বলা হইয়াছে : সেই পুরুষযজ্ঞের অনুষ্ঠাতার যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এবং সুখের অভাব ইহাই তাঁহার দীক্ষা। অতঃপর তাঁহার আহার পান ও আনন্দোপভোগ দীক্ষার পরবর্তীকালে লভ্য আহারাদির তুল্য। তাঁহার তপস্যা, দান, আর্জব, অহিংসা ও সত্যবাদিতা পুরুষযজ্ঞের দক্ষিণা।[১৯] ইহা যেন কতকটা রামপ্রসাদের সুপরিচিত বাংলা গানেরই অনুরূপ :

> শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
> ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে ॥

ইহার পরে তৈত্তিরীয় উপনিষদে যখন মন্ত্রোচ্চারিত হইল 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব'[২০] তখন স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে উহার সহিত সুর মিলাইয়া বলা সহজ হইয়া পড়িল, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'[২১] ইত্যাদি। ইহা উপনিষদের চিন্তাধারারই পরিণতি এবং ইহা অদ্বৈতবেদান্তের চতুঃসীমার মধ্যেই সাধনের আধুনিকতম ব্যবস্থা।

কিন্তু ইহাতেও বিবেকানন্দের প্রাণে শান্তি আসিল না। উপনিষদের যুগে যে চিন্তাধারা এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, উহার পরিসমাপ্তি উহাতেই হইতে পারে না, উহার গতিবেগ এখানেই অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহার মর্মার্থ অনুধাবন করিলে আমাদিগকে আরও দূরে, বহু দূরে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে :

> ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
> ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥[২২]

—তুমি নারী, তুমি নর, তুমিই কুমার ও কুমারী; তুমি জরাগ্রস্ত হইয়া দণ্ডসহায়ে স্খলিতপদে চল এবং তুমিই জাত হইয়া নানা রূপ ধারণ কর।

ইহা শুধু শাস্ত্রে নিবদ্ধ না থাকিয়া সামাজিক এবং প্রাত্যহিক জীবনে উপলব্ধ হওয়া এবং কার্যে পরিণত হওয়া আবশ্যক। আবার ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে প্রাতিস্বিক প্রকাশের

১৭। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।২-৫ ১৮। ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩।১৬।১ ; ৩।১৬।৩ ; ৩।১৬।৫
১৯। তদেব, ৩।১৭।১-২ ; ৩।১৭।৪ ২০। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ১।১১।২
২১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৬১
২২। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৪।৩

ঊর্ধ্বে যে সামূহিক দৃষ্টি বর্ণিত হইল তাহাও প্রণিধানযোগ্য। মন্ত্রে বলা হইলঃ

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥[২৩]

—সেই পূর্ণস্বরূপের অনন্ত মস্তক, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ। তিনি ভুবনকে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াও নাভির দশাঙ্গুল ঊর্ধ্বে হৃদয়মধ্যে অবস্থিত আছেন। [অথবা জগৎকে অতিক্রম করিয়া অসীমস্বরূপে বিদ্যমান আছেন।]

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমঁল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥[২৪]

—সকল প্রাণীর হস্ত ও পদ সেই ব্রহ্মেরই; সর্বজীবের চক্ষু, মস্তক ও মুখ তাঁহারই; এবং সকল প্রাণীর কর্ণও তাঁহারই; তিনি প্রাণিদেহে প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থানপূর্বক সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান আছেন।

এই যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে বিরাটের বিকাশ, ইহা শুধু ধ্যানের বিষয় বা তত্ত্বের প্রকাশক না হইয়া বাস্তব জগতে পূজার বিষয় হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মবাদ ও জীবনের মধ্যে যে বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসান বাঞ্ছনীয়। বিবেকানন্দ তাই লিখিলেনঃ

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।[২৫]

বিবেকানন্দের সাধনায় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এক অবিচ্ছেদ্য রূপ ধারণ করিল। ইহা কল্পনাপূর্বক প্রতীকে দেবতার আরোপ নহে; অথবা গুণবিশেষ অবলম্বনে মনকে বা প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করা নহে। এখানে সর্বজীবে চৈতন্যরূপী সাক্ষাৎ ব্রহ্মের দর্শন এবং তদনুরূপ উপাসনার মন্ত্র উচ্চারিত হইল। আরোপ এখানে অনাবশ্যক; এখানে সত্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার। আবার ইহা অধুনা-প্রচলিত মানবতার পূজাও নহে; কারণ পূজ্য এখানে 'মানবতা' নহে, পরন্তু সহস্রশীর্ষা বিরাট পুরুষ, যিনি পূজকের সহিত অভিন্ন। বিবেকানন্দ যেখানেই দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, যেখানে তিনি জীবের সেবায় সাধককে আহ্বান করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের উপর। শঙ্করদর্শনে নেতি-মার্গে সকলকে বাদ দিয়া যে সাধনার আবশ্যক প্রদর্শিত হইয়াছিল, এখানে তাহাও পূর্তিলাভ করে; কারণ সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিতে গেলেই সর্বের সর্বত্ব অনেকখানি খর্ব হইয়া যায়; সর্বত্র আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্রহ্মদর্শন এবং সর্বাতীত অদ্বৈতের দর্শন একার্থক হইয়া দাঁড়ায়। তখন দ্বৈতজনিত নানাত্ব-দর্শনের ফল তিরোহিত হইয়া যায়।

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥[২৬]

২৩। তদেব, ৩।১৪ ২৪। তদেব, ৩।১৬

২৫। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ২৬৯ ২৬। ঈশোপনিষদ, ৭

—সমুদয় বস্তু যে কালে জ্ঞানীর আত্মাই হইয়া গেল, তখন সেই একত্বদর্শীর মোহই বা কি, আর শোকই বা কি? [অথবা—জ্ঞানীর যে আত্মায় সমুদয় বস্তু আত্মরূপে এক হইয়া গেল, সেই একত্বদর্শীর আত্মায় মোহই বা কি, আর শোকই বা কি?]

সর্বত্র আপনার সহিত অভিন্ন ব্রহ্ম দর্শনের ভিত্তিতে জ্ঞানভক্তির এই মিলন বিবেকানন্দের নরনারায়ণ-সেবাকে কর্মযোগ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কর্মযোগে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কর্তৃত্ববুদ্ধি ও ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেই কর্মযোগী বলা চলে; তজ্জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস অত্যাবশ্যক নহে। কর্তব্যবোধে কর্ম করাকেও কর্মযোগ বলা চলে, এবং সে হিসাবে বুদ্ধদেব একজন শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী। ইহা একটি অতি চরম দৃষ্টান্ত মাত্র। ইহা ছাড়িয়া দিয়া সেশ্বর কর্মযোগের কথা ধরিলেও বিবেকানন্দ-প্রচারিত সেবাধর্মের সহিত পার্থক্য সুস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। গীতায় কর্মযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় পাই এই কয়টি শ্লোকেঃ

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥[২৭]

—হে কুন্তীনন্দন, তুমি যাহা কর, যাহা ভোজন কর, যে হোম কর, যে দান কর ও যে তপস্যা কর, সে সকলই আমাতে অর্পণ কর।

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥[২৮]

—কর্মফলের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সন্ন্যাসী ও যোগী (বলিয়া উক্ত হন); যে ব্যক্তি অগ্নি পরিত্যাগ করিয়াছেন বা ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই যে সন্ন্যাসী বা যোগী হইবেন, তাহা নহে।

এখানে কর্মফল ত্যাগ ও ভগবানে সমস্ত কর্ম অর্পণের কথা পাইলাম; ইহাই সাধারণতঃ কর্মযোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আবার কর্ম বলিতে অনেকে শাস্ত্রীয় যজ্ঞাদি বা লোকহিতকর কার্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। স্বামীজীর দৃষ্টির সম্মুখে কিন্তু আছে সর্বপ্রাণী এবং সর্বকর্ম; আর সেখানে শুধু ঈশ্বরে ফলার্পণ নহে, পরন্তু যাহাদের সেবা করিতেছি তাহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে সম্মুখে বিদ্যমান। আবার সেবক নিজেও ব্রহ্ম। এখানে কর্তা ব্রহ্ম, উপাদান ব্রহ্ম, দাতা ব্রহ্ম, গ্রহীতা ব্রহ্ম, কর্ম ব্রহ্ম, ফলও ব্রহ্ম। গীতারই একটি শ্লোক বলা যায়ঃ

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥[২৯]

—যাহা দ্বারা হবিঃ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা ব্রহ্ম, হবনীয় দ্রব্যও ব্রহ্ম, যে অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহাও ব্রহ্ম। হবন ক্রিয়াও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মরূপ হবনক্রিয়াতে যাঁহার সমাধি আছে, তাঁহার দ্বারা যে ফল লব্ধ হইয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্ম।

গীতায় স্বামীজীর এই ভাবটি বিভিন্ন প্রকরণে বিভিন্নরূপে বিকীর্ণ হইয়া আছে বলিয়া এবং ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যায় গীতাশাস্ত্র গতানুগতিক কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতিতে বিখণ্ডিত

২৭। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ৯।২৭ ২৮। তদেব, ৬।১ ২৯। তদেব, ৪।২৪

হইয়া আছে বলিয়া স্বামীজীর পরিকল্পিত সেবার রূপ ও আদর্শটি পূর্ণাঙ্গরূপে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। যথা গীতায় সর্বব্যাপী ভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন আছে; কিন্তু বিশ্বরূপ-দর্শনটিকে শুধু দর্শনরূপে গ্রহণ না করিয়া উহাকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে রূপপ্রদানের বিধি বা ইঙ্গিত দেখানো হয় নাই। সর্বত্র সমদর্শন, সর্বভূতের হিতসাধনের কথা থাকিলেও একই স্থানে কর্মযোগের প্রকরণে সমদর্শন ও হিতসাধনের কথা না থাকায় প্রকৃত অর্থবোধ হয় না। যথাঃ

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥[৩০]

—জীব ও ব্রহ্মের একত্বদর্শী যে ব্যক্তি আমাকে সর্বভূতস্থিত এই বুদ্ধিতে ভজনা করিয়া থাকেন, সেই যোগী (এই জগতে) যে কোন অবস্থাতে থাকুন না কেন, (প্রকৃতপক্ষে সর্বদা) তিনি আমাতেই বিদ্যমান থাকেন (অর্থাৎ তিনি জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন)। এখানে ভজন আছে; সেবা নাই, পূজাও নাই। এ ভজন কতকটা মানসিক দর্শনমাত্র, যেমন ঠিক পূর্বের শ্লোকে আছেঃ

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি* স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥[৩১]

—যে ব্যক্তি সর্বত্র আমাকে দেখিয়া থাকেন এবং সকল বস্তুকেও আমাতে দেখিয়া থাকেন, তাঁহার নিকটে আমি (কখনই) অদৃষ্ট থাকি না। তিনিও আমার অদৃষ্ট হন না। আর আছেঃ

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।[৩২]

—যাঁহারা সকল প্রাণীর কল্যাণে নিযুক্ত তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। স্বামীজীর দর্শনে সর্বভূতে হিত নয়, সর্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা বা সেবা। দৃষ্টি ও ফলের তফাৎ অত্যন্ত অধিক।

ফলতঃ স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গির সহিত উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য অধিকতর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু স্থলবিশেষে তিনি উপনিষদের চিন্তাধারা অবলম্বনে আরও দূরে অগ্রসর হইয়াছেন। সর্বভূতে সর্বক্ষেত্রে ব্রহ্মদর্শন হইলে জীবনের মধ্যে পুণ্য ও পাপের অবিচ্ছেদ্য গণ্ডি টানিয়া মানুষ হইতে মানুষকে আর পৃথক করা চলে না। অদ্বৈতবাদী বলেনঃ মানুষ ভালই আছে, সে আরও ভাল হইতে পারে; তাহার গতি উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতরের দিকে, অপকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টের দিকে নহে। সত্য কথা বলিতে গেলে—পাপ বা পাপী বলিয়া কিছু বা কেহ নাই; আছে শুধু ব্রহ্মের স্বল্প বা অধিক বিকাশ। সমাজের কর্তব্য পাপীকে শাস্তি দেওয়া নহে, প্রত্যুত তাহার অজ্ঞান দূর করিয়া অন্তর্নিহিত সত্যব্রহ্মকে প্রকাশ করার অবকাশ দেওয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ছাত্রকে শুধু নূতন নূতন তথ্য শুনাইয়া বা তাহা গলাধঃকরণ করাইয়া স্বকর্তব্য শেষ করিতে পারেন না। সেবক হিসাবে বালক-নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার অন্তর্নিহিত

৩০। তদেব, ৬।৩১ * ন প্রণশ্যামি—ন পরোক্ষতাং গচ্ছামি। শঙ্করভাষ্য
৩১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬।৩০ ৩২। তদেব, ১২।৪

পরিপূর্ণ আত্মার বিকাশের পথের বাধা অপসারিত করাই তাঁহার প্রধান কর্তব্য। ভালবাসা অবলম্বনে তিনি সেই আত্মবিকাশের পথে বালক-নারায়ণের পূজারী হইবেন। গুরু অধ্যাত্মপথে শিষ্যের পরিচালক না হইয়া তাহার সত্যের পথে চলিবার সখা হইবেন। সেখানেও তিনি শিষ্য-নারায়ণের পূজারীর আসন গ্রহণ করিবেন। ব্যক্তিজীবনে প্রতি ক্ষেত্রও তেমনি মন্দিরে এবং প্রতি কার্য পূজায় রূপান্তরিত হইবে। সে মন্দিরের গঠন হইবে প্রতি ক্ষেত্রে বিচিত্র, আর সে পূজা হইবে প্রতিস্থানে বিভিন্ন। ধর্মের কোন বাঁধা-ধরা রূপ থাকিবে না। এখানে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী। এখানে প্রত্যেকের ধর্ম অর্থাৎ আত্মবিকাশের ধারা হইবে সম্পূর্ণ নিজস্ব। শুধু তাহাই নহে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা অধর্ম বলিয়া মনে হয় বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে স্থলবিশেষে তাহাও ধর্ম হইতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের পক্ষে হিংসাত্মক যুদ্ধই কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন; আর স্বামীজী কাহাকে কাহাকেও বলিয়াছিলেন, গীতা অপেক্ষা ফুটবলের মাধ্যমে তোমরা সহজে ভগবানের কাছে পৌঁছিবে। এই চিন্তাধারার মধ্যে ছিল একটা গতিশীলতা। স্বামীজীর ধর্ম একটা সজীব, গতিশীল বস্তু যে ক্রমেই স্বীয় চরম আদর্শের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ এই অবিরাম অগ্রগতি তাঁহার দৃষ্টিতে ধর্মের প্রকৃষ্ট কষ্টিপাথর। যেখানে চলা নাই, সেখানে তিনি সত্ত্বগুণ না দেখিয়া জড়তাই দেখিয়াছেন। কারণ বর্তমান যুগে সত্ত্বের নামে জড়তারই অভিনয় চলিয়াছে। ধর্মক্ষেত্রে ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়ত্বের সহিত মানবের পরিপূর্ণতা লাভার্থে এই অবিরাম গতি স্বীকার করা স্বামীজীর একটা নিজস্ব ব্যাপার। সকলেরই ভিতর পূর্ণব্রহ্ম—শুধু বিকাশের পার্থক্য। একদিন এই পার্থক্যকে সমূলে বিনাশ করিয়া সকলেই স্বীয় পূর্ণ ব্রহ্মত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বর্তমানে আমাদের উচিত এই পূর্ণ ও সর্বব্যাপী অথচ অপ্রকাশিত ব্রহ্মের প্রকাশে সর্বতোভাবে সর্বক্ষেত্রে সাহায্য করা এবং নিজ জীবনেও তাহারই সাধনা করা। স্বামীজীর এই ভাব লক্ষ্য করিয়া Romain Rolland লিখিয়াছেন ঃ 'Religion is never accomplished. It is ceaseless action and the will to strive—the out-pouring of a spring, never a stagnant pond.'[৩৩] অবশ্য ইহা একপক্ষপাতী দৃষ্টি। স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধিও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সে অন্য কথা। স্বামীজীর আর একটি মনোভাব লক্ষ্য করিয়া Rolland লিখিয়াছেন ঃ 'It is the quality of thought and not its object which determines its source and allows us to decide whether or not it emanates from religion. If it turns fearlessly towards the search for truth at all costs with singleminded sincerity prepared for any sacrifice, I should call it religious ; for it presupposes faith in an end to human effort higher than the life of the individual, at times higher than the life of existing society, and even higher than the life of humanity as a whole.'[৩৪]

৩৩। The Life of Ramakrishna—Romain Rolland, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition (1970), p. 6 ৩৪। ibid., pp. 5-6

ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বামীজীর পরিকল্পিত সমাজে স্বামীজীর দৃষ্টিতে অসাম্য থাকিতে পারে না। বর্তমানে সমাজ যাহা এবং যেরূপই হউক না কেন বেদান্ততত্ত্বের প্রয়োগের ফলে তাহাকে বর্তমানের সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠিতেই হইবে; আর বেদান্তের তথ্যগুলি শুধু পুঁথিগত হইয়া থাকিবার জন্য নহে; উহাদিগকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেই হইবে। ভারতের অবনতির কারণ আদর্শের ন্যূনতা নহে; প্রত্যুত আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার ঐকান্তিকতার অভাব। শাস্ত্র বলিলেন ঃ

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥[৩৫]

—যাঁহাদের আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত-ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও শ্বপাক (চণ্ডাল) প্রভৃতি সকল জীবেই সমদৃষ্টিযুক্ত হইয়া থাকেন।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥[৩৬]

—যিনি সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি নিজে আত্মাকে বিনষ্ট করিতে পারেন না এবং সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা পরম গতি (মোক্ষ) লাভ করিয়া থাকেন।

কিন্তু কার্যতঃ আমরা বলিলাম ঃ 'দূরমপসর রে চণ্ডাল!' গীতায় শ্রীভগবান বলিলেন ঃ 'সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ'[৩৭]—আমি সকল ভূতেই সমান, আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। কিন্তু আমরা 'পারিয়া পঞ্চম' সৃষ্টি করিয়া বলিলাম, ইহারা চলমান শ্মশান। প্রকৃতপক্ষে অস্পৃশ্যতার সহিত বেদান্তের কোন আপস হইতে পারে না। ইহা সমাজের একটি ব্যাধি এবং প্রকৃত বেদান্তীর কর্তব্য হইবে—ইহা হইতে সমাজকে মুক্ত হইতে সাহায্য করা। আত্মায় স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। অতএব নারীজাতির প্রগতির মুখে বাধাপ্রদান অসহনীয়। আবার আত্মা স্বাধীন। অতএব নারীরা কি করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে কি কর্তব্য, তাহা তাঁহারাই স্থির করিবেন। পুরুষের কর্তব্য শুধু শিক্ষাদি দ্বারা অজ্ঞান নাশপূর্বক দূর হইতে তাঁহাদিগকে সাহায্য করা। নারী ভগবতীরই রূপ, সুতরাং তাঁহারা আমাদের পূজনীয়া। বর্তমান যুগে যে সাম্যবাদ প্রভৃতির কথা শুনিতে পাই, স্বামীজীর যুগে তাহার সূত্রপাত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই বিষয়ে তিনি কি বলিতে চাহেন, তাহা জানিবার জন্য স্বতঃই আমাদের আগ্রহ হয়। ইহারও সমাধান তিনি বেদান্ত অবলম্বনেই করিতে চাহিয়াছিলেন। গীতা বলিয়াছেন ঃ

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥[৩৮]

—যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, তাঁহারা এই লোকেই জন্ম জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন; যেহেতু তাঁহারা ব্রহ্মতেই অবস্থিত—যেহেতু ব্রহ্ম ব্রাহ্মণচণ্ডালাদিতে সর্বত্র অভিন্ন এবং তাহাদের গুণদোষাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট। বেদান্তের এই সাম্যের কথা স্বামীজী বহু স্থলে

৩৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫।১৮ ৩৬। তদেব, ১৩।২৮
৩৭। তদেব, ৯।২৯ ৩৮। তদেব, ৫।১৯

বলিয়াছেন এবং ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা চাই বা না চাই, সাম্য নানা বেশ ধরিয়া ভাবী সমাজে আত্মপ্রকাশ করিবেই। কিন্তু আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত স্বামীজী এই সাম্যকে শুধু অর্থসাম্য বা জাতিসাম্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এইসব সাম্য স্থলবিশেষে এবং সমাজবিশেষে কারণ-পরম্পরায় অনিবার্য হইলেও আত্মিক সাম্যই আমাদের অভিপ্রেত। আর সে সাম্যের সামাজিক নিকটতম রূপ হইতেছে কৃষ্টিসাম্য। আত্মার অধিকতর বিকাশের দ্বারা অর্থাৎ নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক উদ্বর্তনের দ্বারাই এই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক; উচ্চতরদিগকে নিম্নে টানিয়া আনিয়া যে সাম্য, তাহা স্বামীজীর মনঃপূত ছিল না, এবং স্পষ্ট ভাষায় তিনি তাহার নিন্দাও করিয়াছেন।

এই বেদান্ততত্ত্ব অবলম্বনে তিনি ধর্মের দ্বন্দ্বও শেষ করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রহ্ম যদি এক হন এবং তাঁহার প্রকাশের ভঙ্গি যদি বিচিত্র এবং রূপ যদি বিভিন্ন হয়, তবে বিবাদের স্থান কোথায়? একত্বের ভূমিতে স্থাপিত বৈচিত্র অবলম্বনে তিনি জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে এক মনুষ্যসমাজ স্থাপনে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই ভাব লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক Floyd Ross লিখিয়াছেনঃ 'The oneness of mankind in its deepest dimension is something which persons everywhere need to learn if we are to move creatively into the world where the richness of diversity does not mean an anarchy of foolish competition at the level of our prejudices or blind spots. Each needs continually to explore the meaning of that "Oneness" in his own selfhood even as he is seeking to discover more about his brother. It is as the quality of our togetherness becomes richer and more meaningful that a One World worth having emerges both as a by-product and a goal.'[৩৯]

একের বহুরূপে প্রকাশের তথ্য ভারতবর্ষ সুদূর অতীত হইতেই অবগত আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে গৌড়পাদও স্বীকার করিয়াছেন যে, অদ্বৈত মত স্বীকার করিলে পরমতের সহিত বিরোধ করার কথাই উঠিতে পারে না। আর বস্তুতঃ অদ্বৈত অবলম্বনেই বিরোধের নিষ্পত্তি হইতে পারে। গৌড়পাদ-কারিকার সিদ্ধান্তঃ

স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে ॥[৪০]

—দ্বৈতবাদিগণ আপন আপন বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিশ্চিত হইয়া পরস্পরে বিরোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু আত্মৈকত্বদর্শী তাঁহাদের সহিত বিরোধ করেন না; কারণ, তাঁহাদের উপর আত্মৈকত্বদর্শীর পার্থক্য বোধই নাই।

শঙ্করাচার্য দেখাইয়াছেন যে, মূলতত্ত্বকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াও অপর সব মতবাদের অনেকখানি অংশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয়

৩৯। Vedanta Kesari, Vol. XLII (May 1955), p. 32
৪০। মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদ-কারিকা। শ্লোক নং ৮৪

গুরুর পথ অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, শুধু অপরমতকে সহ্য করাই যথেষ্ট নহে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশও আবশ্যক। এই অদ্বৈতভিত্তির উপরই সর্বধর্ম-সমন্বয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াও তিনি ভক্তি, জ্ঞান, যোগ, কর্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম প্রকাশ সম্বন্ধে ঔদার্য ও শ্রদ্ধা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, অদ্বৈত অবলম্বনেই সর্বপ্রকার বিবাদ-নিষ্পত্তি সম্ভবপর।

শুধু তাহাই নহে। তাঁহার মতে সমস্ত নীতির সর্বোত্তম ভিত্তি হইতে পারে এই অদ্বৈতবাদ। ভগবানের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব বা মানবতার একত্ব বা সাম্য প্রভৃতি মতবাদ অবলম্বনে যে সৌভ্রাত্রের সৌধ গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা এ-যাবৎ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এখন আত্মার মহত্ত্ব ও একত্ব অবলম্বনে উহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সময় আগত, এবং ইহার অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দ! মানবাত্মার মহত্ত্ব স্বীকারের দ্বারা মানবকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে যে মর্যাদা দান করা হয় তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সত্যকারের মিলন ঘটিতে পারে। এই মিলন হইবে দাবি-দাওয়ার ফলে নহে, পরন্তু স্বীয় আত্মার বিকাশ এবং অপরের আত্মার পূজা অবলম্বনে।

মানবের অগ্রগতির মূলে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন আত্মবিশ্বাস অর্থাৎ আত্মার অমরত্ব, নির্গুণত্ব, আবিকারিত্ব প্রভৃতিতে আস্তিক্যবুদ্ধি। এই আত্মবিশ্বাসের ফলে যে আত্মশ্রদ্ধা জাগরিত হয়, তাহাই মানবকে হীন কর্ম হইতে নিবৃত্ত করে এবং উচ্চতর কর্মের প্রতি প্রেরণা দিয়া থাকে।

মানবজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে বিরাট পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, আমরা এখানে তাহার কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন মাত্র করিলাম, অনুসন্ধিৎসুকে পূর্ণ জ্ঞানের জন্য তাঁহার আকর-গ্রন্থেই যাইতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম

ধর্ম শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত। স্বামীজী সাধারণত যে-দুটি অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এখানে আমাদের তা-ই আলোচ্য, এবং বিশেষভাবে আলোচ্য—যে-অর্থে ধার্মিক হওয়া বলতে তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা বা জ্ঞানলাভ করাকে বুঝিয়েছেন ; এ অর্থে 'ধর্ম' ও 'মোক্ষ' সমার্থক।

আজকাল আমরা ধর্ম শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করি তা উভয়ার্থক। কোন বাঞ্ছিত ফল—ইহলোক ও পরলোকে কোন বাঞ্ছিত বস্তুলাভ বা অভ্যুদয়ের জন্য অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকেও ধর্ম বলি, আবার ইহ-পর-লোকাতীত ভগবান লাভের জন্য অনুষ্ঠিত প্রচেষ্টাকেও ধর্ম বলি।

চরম সত্যের বাচক হিসাবে 'ঈশ্বর' শব্দটি স্বামীজীর প্রিয় ছিল। ঈশ্বরের সগুণ প্রকাশ ও নির্গুণ স্বরূপ উভয় অর্থেই আমরা শব্দটি ব্যবহার করব।

'চতুর্বর্গে'র 'ধর্ম'—মীমাংসকদের 'ধর্ম'

স্বামীজী পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন ঃ আমাদের চরম লক্ষ্য মোক্ষলাভ বা জ্ঞানলাভ বা ভগবানলাভ হলেও মীমাংসকদের অর্থে ব্যবহৃত ধর্ম, চতুর্বর্গের ধর্ম, যা ক্রিয়ামূলক, যা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয় আনে, তা অধিকাংশ অধিকারীর পক্ষেই একান্ত প্রয়োজন। ক্রিয়ামূলক বলেই প্রয়োজন, কারণ তা তামসিকতা বা জড়ত্বকে কাটিয়ে দিতে পারে। আর এই কর্মের সঙ্গে ভগবচ্চিন্তা বা আত্মচিন্তাকে যে কোন ভাবে জড়িয়ে রাখলে তার ফল রাজসিকতাকে দমিয়ে ক্রমে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় ঘটিয়ে মানুষকে মোক্ষলাভের যথার্থ অধিকারী করে তোলে। অবশ্য 'কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলই বা ; উপোসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয় ? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভাল-মন্দ-মিশ্র কর্ম করা ভাল নয় ?' প্রাথমিক অবস্থায় কিছু না করাকে সাত্ত্বিকভাব বলে অনুকরণ করতে গিয়ে মানুষ মহা তামসিকতায় ডুবে যায়। কিন্তু এ দু-রকমের 'কিছু না করা'র মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত—'সত্ত্বপ্রাধান্য-অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরমধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভাল-মন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়।' 'প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন মহাতামসিক অবস্থা' থেকে 'সুখদুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব-অবস্থায়', যা ঈশ্বরলাভ করার জন্য অবশ্য প্রয়োজন, যেতে হলে আমাদের রাজসিকতার ভিতর দিয়ে যেতেই হবে ; কর্ম সহায়ে তামসিকতাকে কাটিয়ে ঈশ্বরচিন্তা সহায়ে রাজসিকতার দোষ কাটিয়ে যেতে হবে। এজন্যই '"ধর্মের" চেয়ে "মোক্ষ"টা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই।'[১] কর্মের মাধ্যমে মোক্ষ লাভের যথার্থ অধিকারী হওয়ার জন্য কেবল কর্ম নয়,

---

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১৫৩

সেইসঙ্গে যে-কোন ভাবে ভগবচ্চিন্তাকে জড়িয়ে রাখার কথা বলে গেছেন স্বামীজী ঃ 'ভগবানের পূজা জ্ঞানে কাজ কর', '"অহং"-টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাজ কর', ইত্যাদি ; ভক্তি বা জ্ঞান অবলম্বনে কর্ম কর, যা 'কর্মযোগ'। যা গীতার 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম', 'মামনুস্মর যুধ্য চ' প্রভৃতি ভক্তিভাবাশ্রিত বাণীর অনুসরণ করে, অথবা 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ/অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে', সবকিছু করেও 'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ'—এই জ্ঞান অবলম্বন করে কর্ম করারই নির্দেশ, অন্য ভাষায়।

এই কর্ম যেমন পূজা-হোমাদি কর্ম, তেমনি পারিবারিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্তব্যকর্মও। নবযুগে স্বামীজীর বিশেষ বাণী ঃ যে-কোন কর্মক্ষেত্রে মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করা ; 'আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন...'[২] ; 'কাউকে কিছু দিতে গেলে নতজানু হয়ে দেবে —ভাববে ভগবান ঐরূপে তোমাকে দেবার সুযোগ দিচ্ছেন' ; '...ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র...।'[৩] স্বামীজীর এই উক্তিগুলি কেবল লোককল্যাণ-সাধন নয়—ঈশ্বরের পূজা জ্ঞানে মানুষের সেবা—যা একদিকে ব্যষ্টিকে ঈশ্বরলাভের পথে এগিয়ে দেবে, অপরদিকে সর্ববিধ অকল্যাণের মূল কর্মীর ব্যক্তিগত স্বার্থকে ক্ষীণ ও পরিশেষে বিনষ্ট করে পারিবারিক, সামাজিক, দেশগত ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধুনিক সর্ববিধ সমস্যার সমাধানও এনে দেবে। তাই স্বামীজীর এই ঈশ্বরের পূজা জ্ঞানে কর্মকে নবযুগের মহামন্ত্রও বলা যায়। এ মন্ত্রে নিজের জন্য কিছু চাওয়ার স্থান নেই, আছে 'কর্তব্যে'র আহ্বান—অপরকে কিছু দেবার প্রেরণা যা ভারতের সনাতন সমাজব্যবস্থা-ধারার একান্ত অনুসারী।

স্বামীজী বলেছেন ঃ '...ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্রপিণ্ড, যাহাকে আমরা জগৎ বলি, এবং ইহার অতীত অনন্ত সত্তা—এই দুইটি বিষয়ই ধর্মের অন্তর্গত। যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত, তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্মকে এই উভয় বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে।'[৪] বলেছেন ঃ যথার্থ ধর্মে, সর্বজনীন ধর্মে এ দুটোই থাকা চাই। কারণ সাধারণ মানুষকে স্থূল অবলম্বন করেই সূক্ষ্মকে ধারণা করতে হয়, তাছাড়া উপায় নেই। স্বামীজীর এই কর্মাশ্রয়ী ধর্মের আদর্শ তাই সর্বজনীন এবং সর্বদেশের সর্ববিধ অধিকারীরই উপযোগী। এই আদর্শ ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভেদের সীমারেখাটি মুছে দিয়েছে, এবং আমাদের শিখিয়েছে গৃহস্থালি, অফিস, বিদ্যায়তন, খেতখামার, কলকারখানা—সবকিছুতে মন্দিরের, সাধুর আশ্রমের পরিবেশ নিয়ে আসতে। এ আদর্শ, যাকে 'মোক্ষ' ও 'ধর্মে'র সমন্বয় বা 'মোক্ষাভিলাষী ধর্ম'ই বলব (আসলে চতুর্বর্গের ধর্মের লক্ষ্যও তাই), মানবজাতির যথার্থ প্রগতির একমাত্র পথও। সেজন্য স্বামীজী রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের কথা প্রধানত বলেছেন রজঃপ্রধান পাশ্চাত্যে ;

২। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১৯৮

৩। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯ ৪। তদেব, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩২৬

আর কর্মের উপর জোর দিয়েছেন তৎকালে সাময়িকভাবে মহা তামসিকতায় আচ্ছন্ন ভারতে। ধর্ম ও মোক্ষের এই সমন্বিত আদর্শকেই তিনি অন্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন 'ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজে'র সমন্বয় বলে, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র—প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের কর্মোদ্যমের সমন্বয় বলে। বলে গেছেন, ভারতবাসীর অন্তরে এখনও আধ্যাত্মিক ভাব বর্তমান; 'যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।'[৫] আর তার সঙ্গে আমাদের সমন্বিত করতে হবে পাশ্চাত্যের '...আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ'[৬]-কে। পাশ্চাত্যের যথার্থ উন্নতির জন্য, স্বার্থসঞ্জাত পরস্পর-সঙ্ঘাত থেকে বেঁচে থাকারই জন্য স্বামীজী যা বলে গেছেন তারই প্রতিধ্বনি করেছেন আর্নল্ড টয়েনবীঃ ভারতীয় ধারায়—সম্রাট অশোক, মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত ধারায়—জীবনযাপনই এযুগে বিজ্ঞান ও শিল্পে অতি উন্নত মানবজাতির বাঁচার একমাত্র পথ—সামগ্রিক ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচবার পথ।[৭]

মোক্ষ বা ঈশ্বরলাভ অর্থে ধর্ম

ধর্ম বলতে এখন আমরা যা সাধারণত বুঝি—ঈশ্বরলাভ বা জ্ঞানলাভ বা তার জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম বা সাধনা—সে-বিষয়ে স্বামীজী সংক্ষেপে বলেছেনঃ

'আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযোগ অথবা জ্ঞান—ইহাদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।

ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।'[৮]

আত্মা ও ব্রহ্মঃ আত্মা বলতে এখানে খুব সহজ ভাষায়, আমাদের মধ্যে যে চেতন সত্তা, যে চিন্তা করে, যে বিচার করে, সুখদুঃখাদি অনুভব করে, দেহাদিকে 'আমি' 'আমার' মনে করে, তাকেই বোঝায়। এর অন্য নাম জীবাত্মা। একটি স্থূলদেহ ত্যাগের পর এই আত্মা বা জীবাত্মাই দেহান্তর গ্রহণ করে। ব্রহ্ম বলতে বোঝায় জগৎ ও জীবনের যা মূল সত্য তা-ই। সেই সত্য থেকেই জীবজগৎ সৃষ্ট হয়েছে, তাকে অবলম্বন করেই আছে, আবার বিনাশের পর তাতেই লীন হয়। এই ব্রহ্ম বা মূল সত্য জীবাত্মারও আত্মা। এরই চৈতন্যের সংস্পর্শে এসে মন-বুদ্ধিকে চেতন বলে মনে হয়, মন-বুদ্ধি-সীমিত 'অহং'বোধ জাগে—যা আমাদের সাধারণ 'আমি' বোধ, যা দেহ-মন-বুদ্ধিকেই 'আমি'

৫। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১ ৬। তদেব, পৃঃ ৩২

৭। Sri Ramakrishna and His Unique Message—Swami Ghanananda, Ramakrishna Vedanta Centre, London, Third Edition (1970), p. viii (Foreword)

৮। বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০৪

বলে মনে করে। এই ব্রহ্মই—শুদ্ধ চেতনাই—মন-বুদ্ধ্যাদি-বিযুক্ত চেতনাই—বিশ্বে একমাত্র চেতন সত্তা; আমার-আপনার ভিতর, পশু-পক্ষী-কীটপতঙ্গের ভিতর, দেবতাদের ভিতর এমনকি অবতার-ঈশ্বরাদির ভিতরও এই এক অদ্বিতীয় চেতনারই প্রকাশ। বিভিন্নতা যা প্রকাশ পায় তা মন-বুদ্ধ্যাদি প্রকাশের মাধ্যমের বিভিন্নতার জন্যই।

এই ব্রহ্ম বা চরম সত্যকেই বিভিন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায় সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, কালী-শিব-নারায়ণ প্রভৃতি, আল্লা-গড প্রভৃতি নামে আখ্যাত করেছে। এই ব্রহ্ম এক আনন্দময় চেতন অবিনাশী সত্তা—সচ্চিদানন্দ। এই ব্রহ্মই আমাদের স্বরূপ—দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি আমাদের স্বরূপ নয়। আমরা ভুল করে, অজ্ঞান বা মায়ার জন্য বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজেদের দেহমনাদিযুক্ত বলে ভাবি। এই ব্রহ্ম শুধু আমাদেরই না, বিশ্বের সবকিছুরই স্বরূপ—মূল সত্তা। এই ব্রহ্মই জীবজগৎ-রূপে প্রকাশিত হয়েছেন (বা হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে)।

স্বামীজী এই সত্যটিকে অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে বলেছেন—ভগবানলাভের দুটি প্রধান পথ জ্ঞান ও ভক্তির[৯] দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন: 'হয় বলো—সবই আমি, না হয় বলো—সবই তুমি।'[১০] সত্তা বলতে বস্তু বলতে বিশ্বে দুটি কিছু নেই। যা কিছু বৈচিত্র প্রতিভাত হয়, তা ভ্রমবশত—অজ্ঞান বা মায়াবশত। সূত্রাকারে বলেছেন: 'এই যে বৃক্ষটি—এর ভেতর সত্তা হচ্ছেন ব্রহ্ম, আর বৃক্ষত্বটা মায়া।' মায়া বলতে, স্বামীজীর মতে, যা ঘটছে তারই বিবৃতিমাত্র (statement of facts)—সত্যকে অন্যরূপে দেখার বিবৃতিমাত্র। সত্যকে অন্যরূপে দেখার অন্যতম উদাহরণ দিয়েছেন, একটা জ্বলন্ত মশালকে যখন খুব জোরে ঘোরানো হয়—আমরা তখন একটা আলোকের বৃত্ত দেখি। যদিও আলোকের বৃত্তের কোন অস্তিত্ব নেই, যদিও সত্য হচ্ছে যে একটা আলোকবিন্দু ঘুরছে, তবু আমরা সত্যকে অন্যরূপে দেখি, না দেখে পারি না। মানসিক ক্ষেত্রেও যা ঘটছে তা না মেনে নিয়ে যে আমরা পারি না এবং 'স্নেহ' প্রভৃতি গালভরা যে নামই দিই না তার আসলে যে তা মায়া—তাও তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন। এই মায়া বা অজ্ঞানের জন্যই আমরা জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে তাঁর কার্য জীবজগৎ-রূপে দেখি। অজ্ঞান চলে গেলে আর জীবজগৎ দেখা যায় না— একমাত্র ব্রহ্মই প্রত্যক্ষ হন—দুটো একসঙ্গে প্রত্যক্ষ হয় না। কার্য ও কারণ একসঙ্গে দেখা যায় না। ঘূর্ণমান আলোকবিন্দু ও আলোকবৃত্ত—একসঙ্গে একটিকেই দেখতে পারি আমরা, একই কালে উভয়কে নয়।

এক অদ্বিতীয় চেতন আনন্দময় সত্তা, ব্রহ্ম ছাড়া বিশ্বে দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই—তাঁকেই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপে দেখি আমরা। এক অবস্থায়, স্বামীজী বলেছেন: 'যখন বহিরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখি', তাঁকে স্থূল জগৎ-রূপে দেখা যায়; 'যখন সোজাসুজি মন-বুদ্ধির মাধ্যমে দেখি', তখন সূক্ষ্ম জগৎ-রূপে দেখা যায়, সূক্ষ্মদেহী

৯। যেসব মত বা পথ ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে তাঁর কাছে প্রার্থনাদি করে, তা সাকার সগুণ রূপেই হোক বা নিরাকার সগুণ রূপেই হোক—তা সবই ভক্তিপথ। তাঁর নৈর্ব্যক্তিক নির্গুণ নিরাকার স্বরূপের উপলব্ধির প্রচেষ্টাই জ্ঞানপথ।

১০। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৫১

দেবতাদির বা ঈশ্বরীয় রূপের দর্শন হয়; তাকেই আবার 'যখন মন-বুদ্ধির পারে গিয়ে প্রত্যক্ষ করি', অদ্বিতীয় নির্গুণ নিরাকার আনন্দময় অবিনাশী চেতন সত্তারূপে নিজেরই স্বরূপ-রূপে প্রত্যক্ষ করি।

'আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম'ঃ একথা স্বামীজী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতো কেবল বুদ্ধি-যুক্তি সহায়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলেননি—এ তাঁর অনুমান বা যুক্তির সিদ্ধান্তমাত্র নয়; বেদাদি শাস্ত্রে বলেছে বলে, এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনেছেন বলেই উদ্ধৃতিমাত্ররূপেও বলেননি; বলেছেন নিজে প্রত্যক্ষ করে, ভারতীয় দার্শনিক ধর্মাচার্যগণের মতো আগে সিদ্ধান্তকে প্রত্যক্ষ করে পরে কালোপযোগী যুক্তির মাধ্যমে—আধুনিক মনের গ্রহণযোগ্য করে তা বলেছেন। এখানে আমরা তাঁর সত্যোপলব্ধির পূর্বের কিছু ঘটনার বিবৃতি দিচ্ছি, যে পটভূমি স্বামীজীর ধর্মচিন্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমরা জানি, ছাত্রাবস্থাতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনাদি, অসংখ্য পুস্তক পড়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে ঈশ্বর আছেন কি নেই, বই পড়ে যুক্তিতর্ক সহায়ে তা প্রমাণিত হয় না, '...যুক্তি উভয় দিকেই সমান।'[১১] ঈশ্বরের অস্তিত্বে নিঃসংশয় হওয়ার একমাত্র উপায়—'যা সর্ববিধ জ্ঞানেরই মূল ভিত্তি'—তাকে 'প্রত্যক্ষ' করা। ঈশ্বরকে দেখেছেন এমন একজন লোকের সন্ধান করতে করতে তিনি যখন প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলেন এবং 'ঈশ্বরকে দেখেছেন কিনা'—এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে বলতে শুনলেন, 'হাঁ দেখেছি, তোকে যেভাবে দেখছি, তার চেয়ে আরও স্পষ্টভাবে দেখেছি'—তখন তিনি সর্ববিধ আধুনিক সংশয়ের মূর্ত প্রতীক। আমরা জানি, সেসময় 'আধুনিক বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি পর্যন্ত কাচপাত্রের মতো ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে', পাশ্চাত্যে চিন্তাশীল মানুষ তখন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হতে শিখেছে, শাস্ত্রে বা কোন মহাপুরুষের কথা বিশ্বাস করে নেবার মতো মনের অবস্থা তাঁদের নেই—বৈজ্ঞানিক ধারায় প্রভাবিত হওয়ার ফলে সবকিছুই তারা যাচিয়ে বাজিয়ে, পরীক্ষা করে নিতে চাইছে; ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে রাজশক্তির রথে সে চিন্তাধারা তখন ভারতেও—বিশেষ করে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের কাছেও পৌঁছে গেছে। স্বামীজী সে চিন্তার সঙ্গে তখন বিশেষভাবে পরিচিত। 'যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞানের বিরোধী যা, তা কিছুতেই মেনে নেব না'—এই তৎকালীন এবং আধুনিক ভাবের মূর্ত প্রতীক তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সেভাবেই গ্রহণ করেছিলেন এবং সেভাবেই শিক্ষা দিয়েছিলেন—সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত পথেই তাঁকে ঈশ্বরোপলব্ধির দিকে চালিত করেছিলেন। অবাক হয়ে স্বামীজী তাঁর মুখে শুধু 'ঈশ্বরকে আমি দেখেছি' নয়, শুনলেন, 'যদি চাস্ তোকেও দেখাতে পারি।' বার বার শুনলেন, কোন কথা মেনে নেবার প্রয়োজন নেই; এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার তাঁকে বলেছেনঃ 'আমি বলছি বলেও মেনে নেবার প্রয়োজন নেই, নিজে যাচাই করে নে।' 'আমি দেখেছি' বলেই বিশ্বাস করার, 'আমি বলছি' বলেই কোন সত্য মেনে নেবার প্রয়োজন নেই—যে

১১। তদেব, পৃঃ ১৮৮

পদ্ধতি ধরে আমি এ সত্যে পৌঁছেছি, তোমায় বলছি, তুমিও সে পদ্ধতি অবলম্বনে নিজে পরীক্ষা করে, 'যাচাই' করে দেখে নাও তা সত্য কিনা। কোন বৈজ্ঞানিক সত্য কেবল কোন বিজ্ঞানী বললেই গৃহীত হয় না, যে পদ্ধতি ধরে তিনি সে সত্যে পৌঁছেছেন তা জানাতে হয়, অন্যান্য বিজ্ঞানীরা (অবশ্য যাঁদের যোগ্যতা আছে) সে পদ্ধতি ধরে তার সত্যতা যাচাই করে দেখার পর তবে তা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গৃহীত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ঠিক সেই বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিসম্মত কথাই স্বামীজী শুনলেন—শাস্ত্রের কথা, তাঁর কথাও মেনে নেবার প্রয়োজন নেই—পদ্ধতি বলা আছে, নিজে যাচাই করে দেখে নাও এসব সত্য কিনা।

সেই সময় (এবং এখনও) বিজ্ঞানের কথায় বিশ্বাস, স্বামীজীর ভাষায়, 'এক ধরনের কুসংস্কারের মতো' শিক্ষিত ব্যক্তির মন জুড়ে বসেছে; অথচ যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভাবের, যথার্থ যুক্তিসম্মতভাবের অভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। শুধু তখন নয়, এখনও আমরা অনেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও যুক্তির দোহাই দিই, কিন্তু ঋষিদের কথায়, রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-খ্রীষ্টের কথায় অবিশ্বাস করতে শিখি আর একজনের কথায় 'বিশ্বাস' করে। এর চেয়ে অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক আর কি হতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই স্বামীজীকে 'আমি দেখেছি' বলার পরেই বললেন, 'যদি চাস্ তোকেও দেখাতে পারি।' বললেন, কারও কথাই মেনে নেবার প্রয়োজন নেই—নিজে যাচাই করে দেখে নাও এসব সত্য কিনা। স্বামীজী যথার্থই যুক্তিবাদী ছিলেন। যুক্তির দোহাই দিয়ে তিনি একটা কুসংস্কার ছেড়ে আর একটাকে আঁকড়ে ধরতেন না। তাই সেই সময় শুধু সগুণ নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী হলেও, মা কালীকে 'পুত্তলিকা' বললেও, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় যেদিন মা কালীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করলেন, সেদিনই তাঁর মনে হয়েছিল, ধর্মবিষয়ক সত্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেসব কথা লিপিবদ্ধ আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ উপলব্ধি সম্বন্ধে যেসব কথা বলেন, সেসবের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন মতামত দেবার অধিকারই কারও আসে না, যতক্ষণ না নির্দিষ্ট পদ্ধতি ধরে গিয়ে সে নিজে তার সত্যাসত্য যাচাই করে দেখছে। পরে একথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন।[১২]

অবশ্য নিজে পরীক্ষা করে দেখার প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা-অর্জনের প্রশ্ন ওঠে; অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে বিনা প্রতিবাদে ঘাড় পেতে একথা স্বীকার করে নিলেও ধর্মের ক্ষেত্রে একথা আমরা ভুলে যাই। আগেই বলেছি, স্বামীজী আধুনিক চিন্তার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন বলে আধুনিক চিন্তার এই দৈন্য লক্ষ্য করে পাশ্চাত্যে একটি বক্তৃতায় বলেছেনঃ 'বিষয়কর্মে উন্নতি লাভের জন্য—একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার কি ডাক্তার হবার জন্য—দীর্ঘকাল কঠোর শ্রম করে বিদ্যার্জন করি আমরা। এরূপ করেছি বলেই কিন্তু পরে কেউ বসে খেতে দেয় না—পরেও কঠোর শ্রম করে বিষয়কর্ম করতে হয়। হয়তো ছেলে মরে গেছে, বুক ফেটে যাচ্ছে, তবুও বিষয়কর্ম ছাড়ে না—সেই অবস্থাতেই কার্যক্ষেত্রে যেতে হয়। এর বিনিময়ে পাই কি আমরা? সাধারণের চেয়ে ভাল থাকা-খাওয়ার একটু সুযোগ! আর ঈশ্বরলাভের মতো এতবড় একটা

১২। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১৫

বস্তুলাভ করতে চাই বিনা শ্রমে, বিনা যোগ্যতা-অর্জনে!'

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ছেঃ স্বামীজীর পূর্বোক্ত প্রসঙ্গের সঙ্গে এবং আমাদের দেশের একজন আধুনিক বড় বিজ্ঞানীর সঙ্গে ঘটনাটি জড়িত বলেই আমরা বাহুল্য হলেও সেটি এখানে উল্লেখ করছি। আমরা তখন ছাত্র, রামকৃষ্ণ মিশনের একটি ছাত্রাবাসে থাকি। ছাত্রাবাসটির অধ্যক্ষ (স্বামী নির্বেদানন্দ) মাননীয় সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের সহপাঠী ছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁকে ভালও বাসতেন খুব—আমরাই ছাত্রাবস্থায় ঐ আশ্রমে বহুবার তাঁদের আসতে দেখেছি। একবার এমনিভাবে সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি কয়েকজন এসেছেন, দুপুরে খাওয়ার পর একসঙ্গে বসে গল্প করছেন। এত বড় বড় পণ্ডিতদের একত্র সমাবেশ দেখে আমরাও স্বভাবতই তাঁদের কথা শুনতে সেখানে গেছি। স্বামী নির্বেদানন্দ তখন 'The Cultural Heritage of India' গ্রন্থের অন্যতম প্রবন্ধ 'Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance' লিখছেন। তার ভিতরে এক অধ্যায়ে দেখানো আছে বেদান্তের সত্য বিজ্ঞানের সত্যের বিরোধী নয়—যা স্বামীজী বলে গেছেন। প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞান বিষয়ক অংশটি স্বামী নির্বেদানন্দ ডক্টর সাহাকে দেখতে দিলেন। তিনি পুরো অধ্যায়টিই পড়ে ফেলে বললেনঃ 'কিন্তু স্বামীজী একটা কথা আছে। বিজ্ঞানের কোন সত্য কেউ মানতে না চাইলে তখনি তাকে আমরা ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে হাতে-নাতে দেখিয়ে দিতে পারি। তোমরা (ধর্মের সত্য সম্বন্ধে) তা পার না।' স্বামী নির্বেদানন্দ বললেনঃ 'তোমরাও পার না।' কথা শুনে সকলেই জিজ্ঞাসুনেত্রে নির্বেদানন্দজীর দিকে চাইলেন। সামনের মাঠে একটি চাষী লাঙল দিচ্ছিল। নামটি এখনও মনে আছে, গোলামবারী। স্বামী নির্বেদানন্দ তাকে দেখিয়ে ডক্টর সাহাকে বললেনঃ 'একে আজ তোমার ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে তোমার অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্সের লেটেস্ট থিওরিটা বুঝিয়ে দিতে পার?' ডক্টর সাহা বললেনঃ 'না, তার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন।' স্বামী নির্বেদানন্দ বললেনঃ 'এ ক্ষেত্রেও তা-ই।'

একদিকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতো বই পড়ে বুদ্ধি-যুক্তি দিয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার প্রচেষ্টায় আধুনিক অবিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক রূপে হলেও অন্যদিকে স্বামীজী প্রাচ্য ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের বিদ্যার্থীর মতোই ধর্মজগতের সত্যগুলিকে নিজে যাচাই করে দেখার মতো পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করার পরই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন—অটুট ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ, ধ্যানপরায়ণচিত্ত, অসীম মনোবলের অধিকারী, তীব্র বৈরাগ্যবান, সত্যলাভের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাই মা কালীকে দর্শন করার পর শ্রীরামকৃষ্ণের কথামতো চলে ধর্মজগতের চরম উপলব্ধি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন—অদ্বয় আনন্দময় অবিনাশী চেতনার সঙ্গে, ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের একত্ব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন এই অদ্বয় সত্তা ব্রহ্মকেই বহুভাবে উপলব্ধি করেছিলেন—সাকার রূপে আবার সর্বভূতে সাকার মা কালী রূপে এবং চৈতন্য রূপেও—'দেখছি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন, বিচার আর কি করবো', 'মা দেখিয়ে দিলেন মন্দিরের মেজে চৌকাট মার্বেল কোষাকুষি সব চৈতন্যে জরে রয়েছে'—স্বামীজী নিজেও তেমনি সর্বভাবে সেই একই সত্তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে সেই

সত্যকে সাকার মা কালী রূপে ও কাশীপুর উদ্যানে নির্বিকল্প সমাধিতে অদ্বয় ব্রহ্ম রূপে, নিজেরই স্বরূপ রূপে উপলব্ধির কথা সর্বজনবিদিত; এই সত্যকেই আবার সর্বভূতে দেখেছিলেন—যার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করেছিলেন স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধির পর ঃ 'এর চেয়েও উঁচু অবস্থা হতে পারবে, তুই না গান করিস, যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়?' আমাদের বিশ্বাস, এটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন হরিদ্বার থেকে হিমালয়ে কোন নির্জন প্রদেশ খুঁজতে যাবার পথে এক বটবৃক্ষতলে বসে, যার পর তিনি লিখেছিলেন ঃ 'যা আছে ভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে' ইত্যাদি।

ব্রহ্ম বা চরম সত্য '"অবাঙ্‌মনসোগোচরম্", বোঝে—প্রাণ বোঝে যার,'[১৩] যুক্তি দিয়ে তা ধরা যায় না, তবু স্বামীজী বলেছেন, যুক্তি যতদূর যেতে পারে তার ভিতর এ সত্য সম্বন্ধে যুক্তিবিরোধীও কিছু নেই। সেজন্য নিজ প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির পথেই এ-বিষয়ে আধুনিক মন-বুদ্ধির সংশয়গুলির নিরসন করেছেন। এখানে সেগুলির দু-একটি মাত্র উল্লেখ করছি ঃ

(১) অদ্বয় আনন্দময় অবিনাশী সত্তাই—ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই—এই বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত। মন-বুদ্ধির উপলব্ধিগম্য জগতের সবকিছুই, আমাদের মন ও বুদ্ধি এবং তাতে সীমিত বা তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত আমাদের চেতনা, অর্থাৎ 'অহং'বোধও তিনিই হয়েছেন। সবকিছুর ভিতরই তিনি অন্তর্নিহিত। সত্তা হিসাবে একমাত্র তিনিই আছেন, বাকি সবই তাঁর অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্থূল রূপান্তর বা প্রকাশমাত্র। '...আত্মা ছাড়া অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই নাই, বাকি যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা বিভিন্ন স্তরে আত্মারই ক্রমবর্ধমান স্থূলাকারে অভিব্যক্তি মাত্র। ...এই বিশ্ব জুড়িয়া একটি স্থূল অভিব্যক্তি রহিয়াছে, আর তাহার পিছনে রহিয়াছে সূক্ষ্ম স্পন্দন, যাহাকে "ঈশ্বরেচ্ছা" বলা যায়।'[১৪] জগৎ-রূপে তাঁর প্রকাশের মূল কারণ তিনিই— তবে আপেক্ষিক ক্ষেত্রে তাঁর সূক্ষ্মতর প্রকাশই স্থূলতর প্রকাশের কারণ। অর্থাৎ সূক্ষ্মই স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে; আবার স্থূলের বিনাশের সময় তা সূক্ষ্মেই পরিণত হয়। সৃষ্টি বা বিনাশ বলে কিছু নেই। সবই রূপান্তরমাত্র। পূর্ব ও পরবর্তী ধাপগুলি ছেড়ে দিয়ে বলা যায় চেতনাই মনরূপে এবং মনই জগৎ-রূপে প্রকাশিত।[১৫]

এখন আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে সূক্ষ্মই স্থূলের কারণ, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। এটাও সত্য যে, কোন জড় পদার্থের (ম্যাটার) কারণ সূক্ষ্মতর পরমাণু, তারও কারণ তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর ইলেকট্রনাদি, তারও কারণ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ, বা অন্যরূপে বিশ্বব্যাপী একটি শক্তি (energy)—আমরা যা কিছু বহু বিচিত্র রূপগুণবিশিষ্ট বস্তু দেখি সবই এই শক্তিরই রূপান্তরমাত্র। সত্তা হিসাবে, 'বস্তু' হিসাবে তার ভিতর আর কিছুই নেই। জগতের 'বিনাশ'কালে সবই আবার শক্তিই হয়ে যেতে পারে—এসব আজ আমরা বুঝি। জগতের যত মূলের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, ততই বৈচিত্র কমে

১৩। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬৭। কাশীপুরে নির্বিকল্প সমাধিলাভের পর স্বামীজী কর্তৃক রচিত গানের শেষ পঙ্‌ক্তি। ১৪। বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ৪৪২

১৫। তদেব, প্রথম খণ্ড, 'রাজযোগ'-এর 'ভূমিকা', 'অবতরণিকা' ও 'প্রাণ' অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য।

আসে, ততই তা একত্বাভিমুখী হয়, এও আজ আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারে যুক্তিসম্মত। স্বামীজী তাই বলেছেনঃ ভারতের ঋষিরা যে সত্য এতদিন হৃদয়ে পোষণ করে আসছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে তা সারা জগতে ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে দেখে তিনি আনন্দিত। অবশ্য পরিণামবাদের দিক থেকে দেখলে—তা-ও বলেছেন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি এক জায়গায় এসে থমকে যাচ্ছে। জড় পদার্থ, শক্তি প্রভৃতি অচেতন পদার্থেরও কারণ যে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর পদার্থ মন, তারও কারণ চেতনা—এটা সে গ্রহণ করতে পারছে না। অথচ দেখা যাচ্ছে মন-বুদ্ধি-চেতনা-বিশিষ্ট প্রাণী জগতে রয়েছে—অচেতন পদার্থের ভিতর থেকেই বিশেষ অবস্থায় চেতনাদির প্রকাশ ঘটছে। এই বিকাশকে আধুনিক যুক্তি অচেতন বস্তুরই 'গুণ' বলে ধরে নিচ্ছে—একটা পরিবেশে তা প্রকাশ পায়, সে পরিবেশ না থাকলে তার অস্তিত্বই থাকে না। যেমন, বিশেষ পরিবেশে জলরূপে প্রকাশ পেলেও তার ভিতর অধিকতর সূক্ষ্ম হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর বা তারও ভিতর ইলেকট্রনাদির অস্তিত্ব থেকেই যায়—জলরূপ প্রকাশের আগেও থাকে, জল বিনষ্ট হবার পরেও থাকে—আধুনিক বিজ্ঞানের মতে মন, চেতনা প্রভৃতি সেরকম কোন 'বস্তু' নয়। দেহযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হলেই সেগুলিরও অস্তিত্ব লোপ পায়।

স্বামীজী এ-বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেছেন, বিজ্ঞানভিত্তিক বা জড়বাদভিত্তিক যুক্তির দিক থেকে সে প্রশ্নের কোন উত্তরই নেই। অবশ্য মনকে দেহাতীত 'বস্তু'রূপে প্রত্যক্ষ করেই তিনি একথা বলেছেন। স্বামীজী বলেছেন যে, কোন কিছুর ভিতর তার সূক্ষ্ম কারণ রূপে কিছু অন্তর্নিহিত না থাকলে কোন পরিবেশ সৃষ্টি করেই তার ভিতর থেকে তার প্রকাশ ঘটানো যায় না। যেমন, কোন জড় পদার্থের ভিতর হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ইলেকট্রনাদি বা শক্তি অন্তর্নিহিত না থাকলে কোন পরিবেশ সৃষ্টিতেই তার ভিতর থেকে এসবের প্রকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। তেমনি মন-বুদ্ধি-চেতনাদি যদি বস্তুর ভিতর পূর্ব থেকেই অন্তর্নিহিত না থাকত, তাহলে সেগুলির ভিতর থেকে এসবের বিকাশ হয় কিরূপে? 'শূন্য হইতে কিছুই নির্মাণ করা যায় না।'[১৬]

পূর্বেই বলেছি, স্বামীজী ভারতীয় ধর্মপ্রবর্তক দার্শনিকদের চিরাচরিত প্রথানুসারে আগে সিদ্ধান্তকে প্রত্যক্ষ করে পরে যুক্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন—অবশ্য যুক্তি যতদূর যেতে পারে ততদূরই। সেজন্যই একটি বক্তৃতায় আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, তাঁরা মনকে প্রত্যক্ষভাবে বিশ্লেষণ না করেই অনুমান সহায়ে মনস্তত্ত্বের বই লিখছেন—যার ফলে এসব বিষয়ে বিভ্রান্ত মানুষ আরও বিভ্রান্ত হচ্ছে।[১৭] মন দেখা যায়—শুধু স্বামীজীই নন, বহু সত্যদ্রষ্টা দেখেছেন, সূক্ষ্ম বস্তু দেখার যোগ্যতা অর্জন করে সবাই তা দেখতে পারে। আধুনিক যুগেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্তানগণও বলে গেছেনঃ 'মন দেখা যায়','কেউ সামনে এসে দাঁড়ালে তার মন দেখতে পাই—কাচের আলমারির ভিতরকার জিনিস যেমন দেখা যায় তেমনি দেখতে পাই।'

১৬। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪২ ১৭। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪১

এরূপ সূক্ষ্মদ্রষ্টার সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমাদেরই হয়েছে।

যোগ-অভ্যাসের ফলে নিজের মনকে নিজেই পর্যবেক্ষণ করার শক্তি আসে।[১৮] তেমনি, মনেরও পিছনে আছে চৈতন্য। কাজেই যতদূর যুক্তি যেতে পারে তার ভিতর আত্মা মাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম—এই বাণীর বিরোধী কিছুই নেই, বরং তার সপক্ষেই যুক্তি আছে।

(২) জগতের আর পাঁচটা জিনিস যেমন দেখি, ঈশ্বরকে সেভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। কাজেই ঈশ্বর নেই—এই আধুনিক যুক্তির (অবশ্য অগভীর যুক্তি এটি) উত্তর স্বামীজী কি দিয়েছেন, আগেই পরোক্ষে তা বলা হয়েছে—দেখার যোগ্যতা অর্জন করে নিজে যাচাই করে দেখ, পরে এ-বিষয়ে মতামত দেবার অধিকার আসবে। যুক্তির দিক থেকে বলেছেন, কোন বিশেষ পরিবেশে প্রকৃতিতে একবার যে ঘটনা ঘটে সর্বকালেই ঠিক সেই পরিবেশে সেই ঘটনাই ঘটবে। তা যদি না ঘটে তা সত্যই নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, 'তোকেও দেখাতে পারি', এরই ইঙ্গিত। যাঁরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছি বলে ঘোষণা করছেন তাঁরা যেভাবে চলে মনকে শুদ্ধ একাগ্র করে তা করেছেন, যে-কেউ ঠিক সেভাবে চলে মনকে সেরকম করতে পারলে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবেই। সেভাবে চলে নিজে দেখার আগে মন্তব্য করা—অন্য বিষয়ে যত বড় মনীষীই হই না আমরা—সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত স্থূল জগতের সত্যগুলির মধ্যে পরমাণু প্রভৃতি অনেক কিছুই সাধারণ প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, তাই বলে সেগুলির অস্তিত্ব কি অস্বীকৃত?

(৩) আধুনিক জড়বাদীদের বিশিষ্ট মনীষী বারট্রান্ড রাসেলের একটি যুক্তি হল, ঈশ্বর থাকলে সব ধর্মই তাঁর সম্বন্ধে একই প্রকার বর্ণনা দেবে; কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম ঈশ্বরকে বিভিন্নরূপে বর্ণনা করে, কাজেই 'সব ধর্ম অ-সত্য, ঈশ্বরও অসত্য'।

এই যুক্তির উত্তরও স্বামীজীর কথায় পাওয়া যায়। সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) কয়েকজনকে নিয়ে তাঁদের জীবনগঠনের জন্য যেসব আলোচনা তিনি করতেন, তার ভিতর এক জায়গায় বলেছেন: 'আমার গুরুদেব বলতেন: ধর্ম এক; সকল অবতারকল্প পুরুষ একপ্রকার শিক্ষাই দিয়ে যান, তবে সকলকেই সেই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে কোন-না-কোন আকার দিতে হয়। সেইজন্য তাঁরা তাকে তার পুরাতন আকার থেকে তুলে নিয়ে একটি নূতন আকারে আমাদের সামনে ধরেন।'[১৯]

যতক্ষণ না আমরা মন-বুদ্ধির পারে যাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত মন-বুদ্ধির ধারণাশক্তির গণ্ডির ভিতরকার কিছু অবলম্বন করেই আমাদের মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করতে হবে। মন-বুদ্ধির পারে গেলে তখন ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধ হবে। সাধারণ মানুষের অবলম্বনের জন্য সেই সত্যের একটা স্থূলরূপ চাই-ই। মূল সত্য এক হলেও তার স্থূলরূপ অসংখ্য হতে পারে—যেমন কোন বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু এক হলেও কেন্দ্রবিন্দুর সন্নিহিত নিকটতম ক্ষেত্রে বৃত্ত টানলেও তার ভিতর অসংখ্য বিন্দু অবস্থান করতে পারে। স্থূল বলতে সেই সত্যকে সাকার সগুণ—আমাদের মতো একজন মানুষ, মানুষের মতোই গুণবিশিষ্ট

১৮। তদেব   ১৯। তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ২১৫

ভাবা বোঝায়। কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম ইত্যাদি ভাবাত্মক অবলম্বনও সেই সত্যের তুলনায় যেমন স্থূল, তাঁকে নিরাকার সগুণ—গড, আল্লা ইত্যাদি ভাবাত্মক অবলম্বনও তা-ই, তাঁর নির্গুণ নিরাকার স্বরূপ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নির্গুণা নিরাকারা মা প্রভৃতি ভাবে চিন্তা রূপ মন-বুদ্ধিগ্রাহ্য অবলম্বনও তা-ই। যা কিছু চিন্তা করা সম্ভব, বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব—তার কোনটিই চরম সত্য বা ঈশ্বরের স্বরূপ নয়, সে সবই তাঁর স্থূলরূপ। তাঁর স্বরূপ মাত্র উপলব্ধিগম্য—ভাষায় বা চিন্তায় কখনও তা প্রকাশ করা যায় না। নাম ও রূপ ছাড়া—মনে মনে কথা বলা বা ছবি দেখা ছাড়া, বা দুই-ই একসঙ্গে করা ছাড়া চিন্তার কোন পৃথক্ অস্তিত্বই নেই। তাই বিভিন্ন ধর্মাচার্যেরা সেই 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' সত্যে মানুষের উপলব্ধিকে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের পথের অবলম্বনরূপে মন-বুদ্ধির সীমায় সেই একই সত্যের একটা স্থূল আকার দিয়ে গেছেন—বিভিন্ন দেশ-কালের, বিভিন্ন রুচি ও শক্তিবিশিষ্ট মানুষের উপযোগী করে বিভিন্ন 'আকার' দিয়ে গেছেন। আর কালের অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হয়ে চলে বলে প্রতিবারেই তাঁরা এই একই সত্যের 'স্থূলরূপে'র—মন-বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপের—একটা নতুন আকার দিয়ে যান। স্বামীজী বলেছেন ঃ এই সব স্থূলরূপের যে-কোন একটি অবলম্বনে মন একাগ্র করে মন-বুদ্ধির পারে যেতে পারলে সেখানে সকলেই—মন-বুদ্ধির সীমার ভিতর থাকাকালীন ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা যার যা-ই হোক না কেন—একই সত্যকে প্রত্যক্ষ করে, 'সকল ধর্মের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ—এমনকি যারা কোন প্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলের ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে।'[২০] যেকথা শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্ষেপে বলেছেন ঃ 'সেখানে সব শেয়ালের এক রা।'

অন্তর্নিহিত ব্রহ্মভাব বা নিজের স্বরূপ উপলব্ধিই ধর্ম

আমরা আসলে যা—আমাদের ব্রহ্মভাব—যা আমাদের স্বরূপ, সেটি উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করাই ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা সাধারণত দেহ-মন-বুদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে নিজের চেতনাকে অনুভব করি—এগুলি থেকে নিজেকে আলাদা ভাবতে পারি না। দেহ নেই, চিন্তা নেই, বিচার নেই—অথচ 'আমি'বোধ আছে—এটা সাধারণ অবস্থায় আমাদের ধারণার অতীত। দেহ-মন-বুদ্ধিতে জড়িয়ে থাকা ছাড়া যে চেতনা থাকতে পারে, তা আমরা ভাবতেই পারি না। 'চেতনা' বললে মানুষ, গরু, পিঁপড়ে প্রভৃতি দেহ-মন-বুদ্ধি-জড়িত চেতন কোন প্রাণীর কথাই ধারণায় আসে, বড় জোর স্থূলদেহহীন কেবল মন-বুদ্ধি (সূক্ষ্মদেহ)-বিশিষ্ট দেবতা বা ভূতপ্রেতাদির কল্পনা করতে পারি। দেহ-মন-বুদ্ধি থেকে পৃথক শুদ্ধচেতনার অস্তিত্ব সাধারণ অবস্থায় আমাদের ধারণাতীত—শাস্ত্রাদি পড়ে 'শুদ্ধচেতনা' শব্দটিই শুধু মনে ভাবতে পারি, তা নিয়ে

২০। তদেব, পৃঃ ২৪৫

আলোচনা করতে পারি—বড় জোর এই পর্যন্ত। অথচ সত্য হল—পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতো বুদ্ধি-যুক্তি সহায়ে লব্ধ সিদ্ধান্তমাত্র নয়, কারও বলা বা লেখা কথার উদ্ধৃতিমাত্র নয়, অসংখ্য সত্যদ্রষ্টার প্রত্যক্ষ করা সত্য হল—আমরা সকলেই, বিশ্বের সবকিছুই আসলে তা-ই। এই সেদিনকার কথা—স্বামী বিবেকানন্দই এই সত্য বহু বার উপলব্ধি করেছেন, আবার নিজেকে দেহমনের সীমায় ফিরিয়ে এনেছেন। বলেছেন : '...মানুষ "বিবেকানন্দ" নিজেকে ব্রহ্মসত্তাতে পরিণত করতে পারে, আবার সেই অবস্থা থেকে মানবীয় অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।'[২১] বহু বার স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে তিনি বলেছেন : 'আমার মন সর্বক্ষণ ব্রহ্মে লীন হয়ে থাকে। ঠাকুর বলেছেন তাই কাজ করছি।' এটা অবশ্য বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করা যায় না ; যা আমাদের বুদ্ধি ধারণা করতে পারে, তা হল তিনি বহু বার নিজের শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, আবার দেহ-মন-বুদ্ধির সীমায় ফিরে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে এরূপ করতে প্রায় প্রতিদিনই বহুজন দেখেছেন। যেটুকু দেখা যায় বাইরের লোক তা-ই দেখেছেন, বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হওয়া, বাকিটা তাঁরই মুখে শোনা।

আমাদের এই 'আমি'বোধকে ক্রমে দেহ-মন-বুদ্ধি থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের আসল রূপ—শুদ্ধচেতনা, যা পরমানন্দময়, যা অবিনাশী—উপলব্ধি করাই ধর্ম। স্বামীজী বহুভাবে এই কথাটি বলেছেন : 'প্রত্যক্ষই ধর্ম', 'উপলব্ধিই ধর্ম', 'আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধই ধর্ম', 'আত্মারাম হওয়াই ধর্ম' ইত্যাদি। আমাদের স্বরূপই 'পরমাত্মা', আমরা যখন এই স্বরূপ ভুলে নিজেদের মন-বুদ্ধির সঙ্গে জড়াই—'আমি চিন্তা করি, বিচার করি, সুখদুঃখ অনুভব করি' ইত্যাদি ভাবি, তখনই আমরা আত্মা বা জীবাত্মা। 'আত্মারাম' অর্থাৎ নিজের আনন্দেই নিজে বিভোর, আনন্দের জন্য যাকে বাইরের কোন কিছুর উপর নির্ভর করতে হয় না ;—'আমি আনন্দস্বরূপ' এই উপলব্ধি হলেই মানুষ আত্মারাম হয়। তার আগে কোন স্থূল ভোগ্য বস্তুই হোক, নামযশ বা অন্য কিছু হোক, বাইরের কিছু একটা না পেলে আমরা আনন্দ পাই না। এই আনন্দলাভের জন্য বাইরের কিছু চাই আমরা—পেতে 'বাসনা' করি, এই আনন্দলাভের প্রেরণাই আমাদের, সব প্রাণীরই, জীবনের সর্ববিধ প্রচেষ্টার মূল প্রেরণা। অথচ মজা হল, আনন্দ আমাদের ভিতরে ঠাসা আছে, আনন্দই আমাদের স্বরূপ। সেটি উপলব্ধি হলে, আমাদের 'ব্রহ্মভাব' উপলব্ধি হলে আনন্দের জন্য বাইরের আর কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না—আমরা আত্মারাম হই। 'আত্মারাম হওয়াই ধর্ম', 'প্রত্যক্ষই ধর্ম', 'আত্মার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করাই ধর্ম', 'অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশই ধর্ম'—স্বামীজীর ধর্মের এই সংজ্ঞাগুলি মূলত তাই একই—আসলে যা সত্য, তা-ই প্রত্যক্ষ করা। এই উপলব্ধিলাভের সহায়করূপেই ব্যবহার করেছেন, 'নিঃস্বার্থপরতাই ধর্ম' 'পরোপকারই ধর্ম' ইত্যাদি।

বার বার বহুভাবে বলেছেন : 'প্রত্যক্ষই ধর্ম—শাস্ত্রাদি পাঠ ধর্ম নয়। বুদ্ধিতে সায় দেওয়া ধর্ম নয়।' 'ধর্ম মতবাদ বিশেষ নয়, সাম্প্রদায়িকতা নয়।' এমনকি, যাকে আমরা সাধারণত ধর্ম বলি—জপ, ধ্যান, মন্দির, মসজিদ বা গির্জায় যাওয়া, শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা,

২১। তদেব, পৃঃ ২৪৭

মনঃসংযম, নিষ্কাম কর্ম ইত্যাদি—এসবের কোনটিই ধর্ম নয়। এসব ধর্মলাভের, সত্যদ্রষ্টা বা শাস্ত্রবর্ণিত সত্যকে প্রত্যক্ষ করার উপায়, সহায়কমাত্র, 'ধর্মের গৌণ অংশ।' স্বামীজী বলেছেনঃ যতক্ষণ না কারও সত্য উপলব্ধ হচ্ছে, প্রত্যক্ষ হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে 'ধার্মিক' বলা যায় না, বলা যায়, সে 'ধার্মিক হবার চেষ্টা করছে' মাত্র।

আমরা সাধারণত এইসব অনুষ্ঠানগুলিকেই ধর্ম বলে ভাবি, তাই ধর্ম নিয়ে যত বিবাদের, ধর্মোন্মত্ততার উদ্ভব, যে ধর্মোন্মত্ততা 'পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বার বার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে।'

ধর্মের গৌণ অংশে বিভিন্নতা স্বাভাবিক নিয়মে, প্রাকৃতিক নিয়মেই থাকবে। স্বামীজী বলেছেনঃ সব মানুষের মুখ যেমন ঠিক এক রকম হয় না, তেমনি মনও—চিন্তা বা ভাবও—সব মানুষের ঠিক এক রকম হয় না। তাই, যা যথার্থ ধর্ম—সত্যোপলব্ধি, ঈশ্বরোপলব্ধি বা জ্ঞানলাভ যে নামই তার দিই না আমরা—তা সব মতবাদেই এক হলেও সেই অদ্বিতীয় সত্যলাভের পথ কিন্তু মানুষের মনের—মানসিক প্রবণতার—বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন হবেই। শুধু হবে নয়, এতদূর পর্যন্ত বলেছেন, 'পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, ততগুলি ধর্মমত'—ততগুলি মনের গ্রহণোপযোগী করে একই সত্যকে উপস্থাপন এবং তত অনুষ্ঠানপদ্ধতি—সাধন-পদ্ধতি—থাকলে তিনি খুশি হতেন। শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথা অন্য ভাষায় বলেছেন তিনি, 'মত (পথ) ধর্ম নয়, ধর্ম ঈশ্বরোপলব্ধি।' আমরা দেহমনাতীত, আমরা আনন্দময়, আমরা অমর—ধর্মের এইসব কথাগুলি কেবল বোঝা বা বলাই, বা কোন মতানুসারে চলাই ধর্ম নয়, ধর্ম এইগুলিকে প্রত্যক্ষ করা। স্বামীজী তাই বলেছেনঃ 'যতদিন না ধর্ম অনুভূত হইতেছে, ধর্মের কথা বলা বৃথা।' 'তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলকধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম হয় না। ...যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়, তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক নাই।'[২২]

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার উপায়

'ইন্দ্রিয়ের—এমনকি মনেরও সমুদয় সুখ অনিত্য; কিন্তু আমাদের ভিতরেই সেই নিরপেক্ষ সুখ রয়েছে, যে-সুখ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। ...সুখের জন্য বাইরের বস্তুর উপর নির্ভর না করে যত ভিতরের উপর নির্ভর করব—যতই আমরা "অন্তঃসুখ, অন্তরারাম" হব, ততই আমরা আধ্যাত্মিক হব।'[২৩]

এই নির্ভরতা বুদ্ধি-যুক্তি দিয়ে আনা যায় না—অন্তরস্থ ব্রহ্মভাবের বা ঈশ্বরের বা আমাদের স্বরূপের 'অস্তিত্বে' ঠিক ঠিক 'বিশ্বাসই' আসে না—নির্ভরতা তো দূরের কথা—'যুক্তিতর্কে ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত হয় না।' 'জ্ঞানাতীত ভূমিতে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হয়। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।' আমাদের বুদ্ধি সন্ধানী আলোর মতো—যার বুদ্ধি যত প্রখর,

২২। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৭৯ ২৩। তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৭

যত মার্জিত, পথ সে তত ভালভাবে, তত বেশী দূর পর্যন্ত দেখতে পাবে, এই পর্যন্ত। কিন্তু পথে চলা নির্ভর করে মনের উপর, মনের যা ভাল লাগে, বুদ্ধি তাকে অকল্যাণের এমনকি সর্বনাশের পথ বললেও মন বুদ্ধির সেকথা অগ্রাহ্য করে আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে সেই পথে টেনে নিয়ে যায়। কাজেই মনকে ঈশ্বরাভিমুখী, তার ভোগলালসাজনিত বহির্মুখিতা থেকে টেনে এনে 'বাহ্য ও অন্তঃ প্রকৃতিকে বশীভূত করে'—তাকে অন্তর্মুখী করাই ঈশ্বরলাভের পথ। 'ত্যাগ ছাড়া হবে না। ত্যাগেই, বৈরাগ্যেই ধর্মের সূত্রপাত।' 'একাগ্রতাই পথ।' সংসারত্যাগ অতি অল্প কয়েকজন অধিকারীর জন্য, কিন্তু ভোগত্যাগ, ভোগেচ্ছাত্যাগ—এ সকলের পক্ষেই সম্ভব। এরই অন্য নাম সংযম। সংযম ছাড়া মন অন্তর্মুখী হয় না। ঈশ্বরে বা স্বরূপে একাগ্র হয় না। 'জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা।' শুধু আত্মজ্ঞানলাভের নয়, স্বামীজী বলেছেন, সর্ববিধ জ্ঞানলাভেরই একমাত্র পথ একাগ্রতা। ভোগেচ্ছার মধ্যে যৌনভোগেচ্ছাই মানুষের মনে সর্বাধিক প্রবল, যে সে-ইচ্ছা সংযত করতে পারে, তার মনের শক্তি, 'ইচ্ছাশক্তি' প্রচণ্ড হয়, অন্য সব ভোগেচ্ছা জয় করে মনকে ঈশ্বরে বা স্বরূপে একাগ্র করা তার পক্ষে সম্ভব হয়, সহজ হয়। তাছাড়া, স্বামীজী বলেছেনঃ ব্রহ্মচর্যের ফলে মস্তিষ্কে বিশেষ শক্তি জন্মায়, যা ছাড়া ধর্মের সর্বোচ্চ তত্ত্বগুলি ধারণা করা যায় না—'...ব্রহ্মচর্যের অভাবে আধ্যাত্মিক ভাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজ—সবই চলিয়া যায়।'[২৪] তাই ধর্মলাভের জন্য স্বামীজী বার বার বহু ভাবে সংযম ও একাগ্রতা অভ্যাসের উপর জোর দিয়েছেন। এতদূর পর্যন্ত বলেছেনঃ '...ব্রহ্মচর্যপালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়...এই ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।'[২৫] 'ব্রহ্মচর্য পালন ঠিক ঠিক' যে করতে পারে বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতিকে সে জয় করেছে, অন্যান্য বিষয়ে প্রকৃতিকে জয় করা তার অসীম মনোবলের কাছে অতি সহজ ব্যাপার; মনকে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র করে 'নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত' করে সে 'মুক্ত' হয়।

এটাই পৃথিবীর সব ধর্মের সব অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য—আমাদের মন বিষয়ভোগ করে আনন্দ পেতে চায়—সেজন্য বিষয়ের চিন্তাতেই মগ্ন থাকতে চায়। সেখান থেকে মনকে সরিয়ে এনে ভিতরে একাগ্র করানোই জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ, যোগাভ্যাস, তপস্যা, মসজিদে গির্জায় প্রার্থনাদি পৃথিবীর সব ধর্মের সব বাহ্যানুষ্ঠানেরই লক্ষ্য। মনের প্রবণতা সকলের এক রকম নয়, মনের জোরও এক রকম নয়। তাই যে যে-অবস্থায় রয়েছে, সেখান থেকেই ঈশ্বরলাভরূপ তীর্থের পথে চলা শুরু করার জন্য, তার উপযোগী একাগ্রতার সাধনা করানোর জন্য, বিভিন্ন ধর্মমতের ও বহু বিচিত্র ধর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতির প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেনঃ এইজন্যই ঈশ্বরেচ্ছায় বিভিন্ন ধর্মপথ হয়েছে। স্বামীজী বলেছেনঃ একই মাপে তৈরী জামা পৃথিবীর সব মানুষকে পরতে হবে বললে যা ফল হবে—বহুজনের জামা পরাই সম্ভব হবে না—একইভাবে সবাইকে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করতে হবে বা ঈশ্বরলাভের জন্য একই বাহ্যানুষ্ঠান

২৪। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬২

২৫। তদেব, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২১০

সবাইকে করতে হবে—একথা বলার ফলও তা-ই। উপমা দিয়েছেন—একই পুষ্টিকর শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য সবাই খায়, ভাত, রুটি, পাঁউরুটি প্রভৃতি আকারে, রুচি অনুসারে ; আবার কেউ খায় আসনে বসে, কেউ টেবিল-চেয়ারে, কেউ হাত দিয়ে, কেউবা কাঁটা-চামচ বা কাঠি দিয়ে। খাওয়ার এসব বিভিন্নতায় ক্ষতি তো কিছুই নেই, যদি খাওয়ার মূল লক্ষ্য শরীরের পুষ্টিসাধন তাতে হয়। ধর্মমত, ধর্মানুষ্ঠান, যার যা ভাল লাগে মানুক, করুক—তার ফলে, মূল লক্ষ্যের দিকে, ঈশ্বরলাভের দিকে, সে এগিয়ে গেলেই হল ; যেভাবেই চলুক, তার ফলে তার মন ক্রমশ পবিত্র, অন্তর্মুখী ও একাগ্র হলেই হল।

ত্যাগ বা স্বার্থত্যাগের জন্য রাজপথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন তিনি ঃ 'ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবা।' নবযুগের মহামন্ত্র এটি। সেবার জন্য ত্যাগ তো অনিবার্য, আর ঈশ্বরের সেবাজ্ঞানে তা করলে ঈশ্বরে মন একাগ্রও হবে ; ঠিক ভাব নিয়ে করতে পারলে তাতে জপধ্যান করার সমানই ফল হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবার ভাব আধুনিক সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সব ক্ষেত্রেরই সর্ববিধ সমস্যার সু-সমাধান আনতে পারে ; কারণ তা সর্ববিধ সমস্যার মূল মানুষের স্বার্থপরতাকে খর্ব করে।

জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ ঃ ঈশ্বরলাভের বা জ্ঞানলাভের জন্য যত পথ আছে, যতভাবে মানুষ চেষ্টা বা সাধন করতে পারে, করে থাকে, তাকে মোটামুটি এই চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। আমরা যেন মনে রাখি সব পথেই মানুষকে সংযম ও একাগ্রচিত্ততার অধিকারী হতে হয় ; জ্ঞানপথ ও যোগ বা রাজযোগের পথে এ দুটির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দিয়েই চলা শুরু করতে হয়, ভক্তি ও কর্মের পথে অভ্যাসের ফলে ক্রমে এই ভিত্তি গড়ে ওঠে।

জ্ঞানপথে প্রথম থেকেই, যা সত্য, বিচার করে মন থেকে তার বিরোধী চিন্তাগুলিকে সরিয়ে দিয়ে সত্যে মনকে নিবিষ্ট করার চেষ্টা করতে হয়। প্রথম থেকেই চিন্তা করতে হয় আমি এই দেহ-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদি থেকে ভিন্ন আনন্দময় অবিনাশী চেতন সত্তা—ব্রহ্ম। বিচারপ্রবণ যাঁরা, সেইসঙ্গে সংযমী ও একাগ্রচিত্ত, তাঁদের পক্ষে এপথ প্রশস্ত, এপথের অধিকারী খুব কম।

যোগ বা রাজযোগের পথ হল জোর করে মনকে বাইরে থেকে টেনে এনে সত্যে নিবিষ্ট রাখার পথ। পূর্ণ সংযমী যাঁরা, অসীম মনোবল যাঁদের, সর্বাবস্থায় মনের রাশ টেনে রাখার মতো শক্তি যাঁদের আছে, তাঁদের জন্য এপথ প্রশস্ত। এপথেরও অধিকারী বিরল।

ভক্তিপথ, ভালবাসার পথ—ভগবানকে আমাদের মতো মানুষ ভেবে[২৬] তাঁকে ভালবেসে তাঁর চিন্তা, তাঁর কাছে প্রার্থনা, তাঁর সেবা, তাঁর নাম জপ কীর্তন, তাঁর রূপের ধ্যান ইত্যাদি করে তাঁতে পুরো মন একাগ্র করার চেষ্টাই ভক্তিপথ। এপথ সর্বসাধারণের জন্য। অন্যান্য পথের চেয়ে সহজও। ভগবানে ভালবাসা বা ভক্তি যত বাড়ে, মনে ততই বিষয়ভোগেচ্ছা কমে যায়, ততই বেশী করে মন তাঁতে একাগ্র হয়।

২৬। মানুষের মতো রূপগুণবিশিষ্ট বা কেবল গুণবিশিষ্ট—সাকার সগুণ, অথবা নিরাকার সগুণ, দুই ভাবে ঈশ্বরোপাসনাই ভক্তিপথ, পূর্বেই বলা হইয়াছে।

কর্মের পথ হল নিজের জন্য প্রতিদানে কিছু না চেয়ে, কর্মের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করে অনাসক্তচিত্তে কর্ম করা। ঠিকমতো করতে পারলে এতেও ক্রমে মন পূর্ণ একাগ্র হয়। সত্যলাভ হয়। সাধারণত জ্ঞান বা ভক্তি অবলম্বনে—সর্বসাধারণের পক্ষে ভক্তি অবলম্বনে—কর্মের পথে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়াই সহজ।

বিশুদ্ধ জ্ঞান, যোগ, কর্ম বা ভক্তির পথ ধরে চলার লোকও আবার খুব কম। সাধারণত আমাদের সাধনায় একটি ভাব প্রবল থাকে, তার সঙ্গে একাধিক পথের সাধনাও কিছু কিছু করি আমরা। তাতে কোন ক্ষতি নেই, বরং ভালই। আসল কথা হল, মনকে পবিত্র ও একাগ্র করা—কেবল বিচার, কেবল ধ্যান, কেবল জপ-পূজা-প্রার্থনাদি বা কেবল কর্ম করে যদি তা হয়, ভালই; যদি এগুলির একাধিক বা সবগুলি একসঙ্গে করে তা হয়, তাও ভাল। সেজন্যই স্বামীজী বলেছেন: 'কর্ম, উপাসনা (ভক্তি), মনঃসংযম (যোগ) অথবা জ্ঞান—এইগুলির মধ্যে এক বা একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।' মুক্ত হওয়া মানে, দেহাত্মবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করা—নিজেকে যে দেহ-মন-বুদ্ধি ও তৎসীমিত 'অহং' বলে মনে হচ্ছে, সেই মনে হওয়া থেকে মুক্ত হওয়া। জ্ঞানিগণের মতে এই বন্ধন অজ্ঞান, মায়া বা ভ্রমসঞ্জাত। ভক্তগণের মতে, ঈশ্বরেচ্ছায়, তাঁর লীলায় এটি হয়। তন্ত্র এই বন্ধনকে পাশ বা বন্ধনরজ্জু বলেন। এই মায়ায় বা পাশে যতক্ষণ আমরা বাঁধা আছি, যতক্ষণ নিজেকে দেহ-মনাদি বলে বোধ হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা 'জীব' বা 'আত্মা'। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে 'আমি' বোধ থেকে মুক্ত হলেই আমরা 'শিব' বা 'ব্রহ্ম'। দেহাত্মবোধ কাটিয়ে, যেভাবেই হোক, নিজের 'ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই' সব ধর্মাচরণের, সব ধর্মের লক্ষ্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম

'সকল ধর্মাচার্যই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আত্মদর্শন করিয়াছিলেন...তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।'[২৭]

'কতকগুলির শাস্ত্র বা গ্রন্থ আছে...যেগুলি শাস্ত্রের উপর স্থাপিত, সেগুলি সুদৃঢ়; উহাদের অনুগামীর সংখ্যাও অধিক। শাস্ত্র-ভিত্তিহীন ধর্মসকল প্রায়ই লুপ্ত...উহাদের শিক্ষা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ।'[২৮]

স্বামীজী বলেছেন: প্রত্যেক ধর্মেই তিনটি ভাগ—দার্শনিক, পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক। দার্শনিক অংশই সার। এখানে যেন আমরা মনে রাখি, দর্শন বলতে স্বামীজী এখানে কেবল বুদ্ধি-যুক্তি সহায়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার কথা বলছেন না; বলছেন: সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ করার পর সে-বিষয়ে বুদ্ধি-যুক্তি যতটা ধরতে পারে ততটা পর্যন্ত তাদের অবলম্বন দেওয়ার কথা; অথবা কোন সত্যদ্রষ্টার উপলব্ধ সত্যকে যতটা সম্ভব যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করার কথা। আগেই বলেছেন, সব ধর্মই এরূপ প্রত্যক্ষদ্রষ্টার অভিজ্ঞতার

২৭। বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১৩ ২৮। তদেব, পৃঃ ২১২

উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইসব ধর্মের দর্শনভাগও এইসব সত্যদ্রষ্টাগণের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই রচিত। পৌরাণিক অংশ তার বিবৃতিমাত্র—গল্পের মাধ্যমে সাধারণকে উচ্চতত্ত্বগুলি বোঝাবার চেষ্টা।

আনুষ্ঠানিক ভাগ ধর্মের স্থূলরূপ; প্রকৃতপক্ষে দার্শনিকভাগেরই স্থূলরূপ। এই স্থূলরূপের প্রয়োজন, স্বামীজী বলেছেন, সব ধর্মেই আছে। '...যতদিন না আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিতেছে, ততদিন (মানুষ) সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ধারণা করিতে অসমর্থ।'[২৯] কাজেই প্রত্যেক ধর্মেই এই স্থূলরূপ প্রয়োজন। সাধারণ লোকের একটি স্থূল অবলম্বন চাই। আগেই বলেছি, শুদ্ধচৈতন্য আমাদের স্বরূপ, তিনিই ঈশ্বর—একথা আমরা মুখে বলতে পারি সকলেই। ধারণায় আনতে পারি না। কিন্তু সেই অরূপ, অসীম, নির্গুণ সত্তার স্থূলরূপ—তিনি সাকার বা নিরাকার যা-ই হোন না, তিনি আমাদেরই মতো গুণসম্পন্ন, অবশ্য তা অনন্তগুণে অধিক—তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি করুণাময়, তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন ও পূর্ণ করেন, তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করছেন, তিনি সাকার বা নিরাকার ঈশ্বর—এটি আমাদের মন-বুদ্ধির ধারণাগম্য। বিভিন্নরূপে তাই ধর্মাচার্যেরা দেশকালোপযোগী করে একই সত্যের বিভিন্ন স্থূলরূপ দিয়ে গেছেন। অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও একই কথা। 'মন্দির ও গির্জা, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান—এগুলি কেবল ধর্মের শিশুশিক্ষা মাত্র, যাহাতে প্রবর্তক—প্রাথমিক সাধক শক্ত সবল হইয়া ধর্মের উচ্চতর সোপান অবলম্বন করিতে পারে। আর যদি কেহ ধর্ম চায়, তবে এই প্রাথমিক সোপানগুলি একান্ত প্রয়োজন।'[৩০] সব ধর্মেই প্রয়োজন।

আর একটি বিশেষ কথা স্বামীজী বলেছেনঃ '...ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছে। ...যাহাকে আমরা জগৎ বলি, এবং ইহার অতীত অনন্ত সত্তা—এই দুইটি বিষয়ই ধর্মের অন্তর্গত। যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত, তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্মকে এই উভয় বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে।'[৩১] প্রসঙ্গান্তরে একথা পূর্বেও বলেছি। এইটি এযুগে বিশেষ করে আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন। স্বামীজীর ধর্মচিন্তায়—বিশেষ করে বিশ্বজনীন ধর্মচিন্তায় এই সমন্বয় অতি প্রকট। এ নিয়ে প্রথমেই আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের মনে হয় দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত অনুভূতিকে চরম সত্যাভিমুখী সাধকের একই সত্যের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন অনুভূতিমাত্র বলে, বিভিন্ন সোপানমাত্র বলে এগুলির সমন্বয়সাধনের মতো, স্বামীজীর এই অবদানটিও এযুগের ধর্মচিন্তায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান—এটিকেই নিবেদিতা ব্যক্ত করেছেন এভাবেঃ 'স্বামীজী আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয়ের মধ্যকার ভেদরেখাটি মুছে দিয়ে গেছেন।'

২৯। তদেব, পৃঃ ৯৬ ৩০। তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৭
৩১। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩২৬

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন কতকগুলি প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি-প্রসূত ভাব বা চিন্তাধারার সমন্বয় নহে—উহা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের বহুতর প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। যেমন, প্রত্যেক মানুষের দৈবসত্তা তাঁহার নিকট কথার কথা বা কবিকল্পনা ছিল না, দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে তিনি উহা সর্বদা দেখিতে পাইতেন। অতএব স্বামীজীর জীবনদর্শনে যেখানে মানুষের প্রসঙ্গ আসিয়াছে, ঐ প্রসঙ্গের উৎস তাঁহার কোন একটি বিশিষ্ট মত নহে, একটি অসন্দিগ্ধ অনুভূতি। মানুষের যে-কোনও সমস্যা তিনি পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন, উহাতে কোনক্ষণেই তিনি মানুষের হৃদয়-গুহাবাসী নারায়ণকে ভুলিয়া যান নাই। বুভুক্ষু মানুষ, অপমানিত বা নির্যাতিত মানুষ, নিরক্ষর অথবা পীড়িত মানুষ, পুরুষ-মানুষ, স্ত্রী-মানুষ, ধর্মপ্রাণ মানুষ কিংবা পাপ-মলিন মানুষ, যে-কোন অবস্থা বা ক্ষেত্রের মানুষ তাঁহার দৃষ্টিতে মুখোশপরা নারায়ণ। স্বামীজীর জীবনদর্শনে মানবিকতা অন্যান্য বহু প্রখ্যাত মনীষীর উপস্থাপিত মানবিকতা হইতে যে আলাদা হইবে তাহা স্বাভাবিকই।

যে-কোনও জীবনদর্শনে জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। বিবেকানন্দের জীবনদর্শনেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। তাঁহার জীবনদর্শন বিশেষভাবেই জগৎ-কেন্দ্রিক। কিন্তু বিবেকানন্দ জগৎ বলিতে কি বুঝিতেন? জগৎ সম্বন্ধে নানা আলোচনা তাঁহার বক্তৃতাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে অপর মনীষীদের চিন্তাধারা আলোচনা করিয়া যখন তিনি তাঁহার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন তখন তিনি স্বকীয় প্রত্যক্ষানুভূতির উপর দাঁড়াইয়া তাহা করিতেছেন। তাই যখন তিনি সংসারকে মায়া বলিতেছেন আমরাও যেন তাঁহার সঙ্গে অন্তত সেই সময়ে সংসারের অবাস্তবতা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। প্রত্যক্ষানুভূতি হইতে যে-বাক্য উচ্চারিত হয় তাহার এতই শক্তি। আবার তিনি যখন জগৎকে ব্রহ্মময় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, আমরাও তখন জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া ঈশ্বরের জ্যোতিতে ভাস্বর ভাবিতে উৎসাহিত হইতেছি। এই ঘোষণাও স্বামীজীর প্রত্যক্ষানুভূতি হইতে উদ্ভূত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় স্বামীজীও ঈশ্বরের নানা উপলব্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনদর্শনে সেইজন্য ঈশ্বরের একটা একটানা প্রকাশের পরিবর্তে ভগবৎতত্ত্বের বহুমুখী ব্যঞ্জনা দেখিতে পাওয়া যায়। সাকার, নিরাকার, দ্বৈত, অদ্বৈত, নির্বিশেষ, সবিশেষ, কোমল, কঠোর, সুন্দর, ভয়ঙ্কর, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ অথবা অলিঙ্গ—শ্রীভগবানের এই জাতীয় বিবিধ ভাবের কথা স্বামীজী বলিয়াছেন। প্রত্যেকটি কথাই জোর দিয়া বলা। এই জোরের সূত্র তাঁহার অনুভূতি। তাঁহার জীবনীপাঠক জানেন যে, কোন কোন সময়ে তিনি নিরীশ্বরবাদের কথাও বলিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুরা ভয় পাইয়াছে, তাঁহার জন্য কাঁদিয়াছে, কিন্তু তিনি 'ঈশ্বর নাই' একথা বলিতে ভয় পান নাই। ঐসময়ে সত্য তাঁহার নিকট নিরীশ্বরতার পরিচ্ছদ পরিয়া আসিয়াছিলেন। সত্যকে যে সর্বদা ঈশ্বর বলিতে হইবে এমন গোঁড়ামি নরেন্দ্রনাথের ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন মাকে সব দিয়াও

'সত্য' দিতে পারেন নাই, সেইরূপ স্বামীজীরও সত্যসন্ধতার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ তাঁহার আচরণ ও বাণীতে আমরা পাই। তাঁহার নিকট সত্য ছিল সকল প্রকার মতবাদের ঊর্ধ্বে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যুবক নরেন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দেখিবার পর মন্তব্য করিয়াছিলেন ঃ '...বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব ?'[১] নরেন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা ঠাকুরের পর্যবেক্ষণে যে তাঁহার উন্নত আধারত্বের অন্যতম উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনে সত্যের খ্যাপন যেমন সবল তেমন চিত্তস্পর্শী।

যে তত্ত্বানুভূতি তাঁহার জীবনদর্শনকে নিয়ন্ত্রিত ও সক্রিয় করিয়াছিল উহা স্বামীজী একটি সহজাত সংস্কাররূপে সঙ্গে লইয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন ইহা বলা বোধহয় অতিরঞ্জিত নহে। বালক নরেন্দ্র বা 'বিলে'র মধ্যে দুই প্রকার প্রবণতা ছিল। প্রথমটি হইল বাল্যপ্রতিভা—যাহা বহু কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির ভিতর দেখা যায়। ইঁহারা যখন একান্ত তরুণ তখনই কাব্য, শিল্প বা বিজ্ঞান প্রভৃতির কিছু না কিছু প্রতিভা ইঁহাদের কার্যকলাপে সচরাচর লক্ষিত হয়। 'The child is the father of the man.'—কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর এই উক্তি খুবই খাঁটি। বালক নরেন্দ্র বা 'বিলে'র বাল্যকালের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এই জাতীয় 'প্রতিভা'র পর্যায়ে অবশ্যই পড়ে—যেমন, তাহার বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিশক্তি, খেলাধূলায় বিচক্ষণতা, সাথীদের নেতৃত্ব, সাহসিকতা প্রভৃতি। বালকের পিতা-মাতা, আত্মীয়-বান্ধব, শিক্ষক বা প্রতিবেশিগণ অবশ্যই দুরন্ত ছেলেটির আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তাহার স্কুল-কলেজ বা কর্মজীবনের একটি গৌরবময় ছবি কল্পনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সে যে কৃতী পিতার উপযুক্ত সন্তান ইহাতে পর্যবেক্ষকদের মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। নরেন্দ্র যদি অবতারকল্প মহাপুরুষ বিবেকানন্দ নাও হইতেন তথাপি তাঁহার জীবন সাংসারিক দিক দিয়া যে অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। গুরুভ্রাতা স্বামী যোগানন্দকে একদিন স্বামীজী তর্কচ্ছলে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন ঃ 'আমি যদি প্রচার না করতুম, তোমাদের ঠাকুরকে কে চিনত?' স্বামী যোগানন্দ উত্তর দিয়াছিলেন ঃ 'তিনি না থাকলে তুমি বড় জোর একজন ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জীর মতো ব্যারিস্টার হতে।'[২] শ্রীরামকৃষ্ণদেবও নরেন্দ্রের সাংসারিক দিক দিয়া একজন দিক্পাল হইবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিতেন। বলিতেন ঃ ও যেদিকে যাবে সেদিকেই একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে।[৩]

বাল্যপ্রতিভা ছাড়া 'বিলে'র মধ্যে দ্বিতীয় একপ্রকার প্রবণতা লক্ষিত হইত। এই সংস্কারগুলিকে ধরিতে পারা বা উহাদের মূল্য নিরূপণ করা খুব কম লোকের পক্ষেই

১। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৯৬

২। A Comprehensive Biography of Swami Vivekananda, Part II—Sailendra Nath Dhar, Vivekananda Prakashan Kendra, Madras, First Edition (1976), p. 955

৩। 'ও যেদিকে যাবে সেই দিকেই একটা কিছু বড় হয়ে দাঁড়াবে।' [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ—শ্রীম-কথিত, শ্রীম-এর ঠাকুরবাটী, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃঃ ৭৮]

সম্ভবপর ছিল। এই দ্বিতীয় স্তরের সংস্কারগুলিই স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর-জীবনের মহত্ত্বের বীজ। যেসকল ভাব ও শক্তি তাঁহার চরিত্রে, কর্মে ও উপদেশে পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল তাহারা বীজাকারে বালক 'বিলে'র মধ্যে যে ছিল ইহাই অনুধাবনীয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনে মানুষের দেবত্ব একটি প্রধান প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস রাখিলে মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া যায়। প্রত্যেক মানুষকে সম্মান করিতে, ভালবাসিতে, সেবা করিতে ইচ্ছা হয়। কোন মানুষকেই ঘৃণা করিতে, অপমান করিতে, নির্যাতন করিতে কুণ্ঠা আসে। স্বামীজীর জীবনীপাঠক জানেন সকলকে নির্বিচারে ভালবাসা বালক 'বিলে'র ছিল স্বভাবগত। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির জন্য আলাদা হুঁকা কেন থাকিবে তা সে বুঝিতে পারিত না। বালকের দরিদ্রের প্রতি দয়া কখনও কখনও এত মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত যে জননী ভুবনেশ্বরী সময়ে সময়ে কতই না বিব্রত হইতেন। স্বামী বিবেকানন্দের নরনারায়ণ-সেবা তাঁহার জন্মগত সংস্কার। বালক বিবেকানন্দের আর একটি অসাধারণ স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার তাঁহার ধ্যানশীলতা। পরবর্তীকালে স্বামীজীর জীবনদর্শনের ইহা অন্যতম অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খেলার সাথীদের লইয়া অন্য নানা খেলার বদলে 'ধ্যান, ধ্যান' খেলা 'বিলে'র এত প্রিয় কেন তাহার মর্ম তাহার পরিজনবর্গ কি বুঝিতে পারিতেন? পারিবার কথা নহে। তাঁহারা বড় জোর বলিতেন 'বিলে'র দশটা খামখেয়ালের ইহা একটা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু জানিতেন এই বালক পৃথিবীতে আসিবার আগে অন্য এক লোকে দিব্যদেহে ধ্যানস্থ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ নিত্যসিদ্ধ, ধ্যান তাহার প্রকৃতি। 'বিলে'র ধ্যান-সংস্কার তাহার খামখেয়াল নহে—সারা জীবনের শক্তি।

বালক নরেন্দ্রের অস্বাভাবিক নির্ভীকতা ও আত্মপ্রত্যয়ের কথা স্বামীজীর জীবনীপাঠকের অবিদিত নহে। নরেন্দ্রের বাল্যকালের অনেকগুলি ঘটনার মধ্যে উহার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে স্বামীজীর সমগ্র জীবনের আচরণে ও উপদেশে ঐ বৈশিষ্ট্যদ্বয় বিশেষভাবে অভিব্যক্ত। 'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর' বিবেকানন্দ-জীবন-দর্শনের অন্যতম মর্মবাণী। সাহসের কথা অনেক বাগ্মীর মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু স্বামীজীর মুখের বা লেখনীর নির্ভীকতার উৎসাহ একটুও বাগাড়ম্বর নহে, উহা দুর্বলতা ও মোহান্ধকার-বিদারী জ্বলন্ত তেজস্ক্রিয়া। উহার আকর তাঁহার মস্তিষ্ক নহে, যে বীরেশ্বর মহাদেবের শক্তি লইয়া তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছিলেন উহা সেই দীপশিখা। তাঁহার আত্মীয়স্বজন সঙ্গীসাথীদের পক্ষে উহা বুঝিতে পারা সুকঠিন ছিল। তাঁহারা ভাবিতেন এই ছেলেটি বড় বেপরোয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নরেন্দ্রকে দেখিয়াই এই আগুনের যথার্থ মূল্য দিয়াছিলেন। বলিতেন: 'নরেন্দ্র খাপখোলা তলোয়ার।'

উপর্যুক্ত আলোচনার নিষ্কর্ষ এই যে, বালক নরেন্দ্রের মধ্যে প্রতিভার সংস্কার এবং সুপরিপক্ক আধ্যাত্মিক সংস্কার—এই দুই প্রকার সংস্কারই পরিস্ফুট ছিল। প্রথমোক্তটি ধরিতে পারা কঠিন ছিল না, দ্বিতীয়টির সম্পূর্ণ মূল্যনির্ণয় একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিচার অনুসরণ করিয়া পরে অবশ্য অনেকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং এখন করেন। যাহা শৈশবে ও বাল্যে নরেন্দ্রের মধ্যে কতকগুলি যোগসংস্কাররূপে ক্রিয়াশীল হইয়াছিল তাহাই ধীরে ধীরে যৌবনে এবং পরে ধর্ম ও

কর্ম জীবনে তাঁহার বৈশিষ্ট্যরূপে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের মূল তাঁহার সহজাত 'নিত্যসিদ্ধ' যোগসংস্কার। শিক্ষাদীক্ষা সাধনাদি যাহা তিনি করিয়াছিলেন তাহা এই সংস্কারগুলিকে পরিস্ফুট করিয়াছিল মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় নরেন্দ্রনাথ যদি 'নিত্যসিদ্ধ', 'ধ্যানসিদ্ধ', তাহা হইলে সিদ্ধি অর্থাৎ তত্ত্ববোধের জন্য তাঁহার কোন চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না। তত্ত্ববোধ আবাল্য তাঁহার শোণিতপ্রবাহ, স্নায়ুস্পন্দন, মানসিক চিন্তা, কল্পনা এবং হৃদয়াবেগের সহিত মিশিয়াছিল। এই স্বাভাবিক তত্ত্ববোধই তাঁহার জীবনদর্শনের বিভিন্ন ধারায় অনুসঞ্চারিত।

* * *

স্বামীজীর জীবনদর্শন মুখ্যতঃ মানবকেন্দ্রিক। জার্মান দার্শনিক রুডলফ অয়কেন (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত) বলিয়াছিলেনঃ 'Man is the meeting point of various stages of reality.' উপনিষদ্ পাঠক ইহাতে উপনিষদের ভূরি ভূরি ঘোষণার প্রতিধ্বনিই শুনিতে পাইবেন। মানুষকে নানা স্তরে বিশ্লেষণ করিয়া, প্রত্যেক স্তরের সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়া অবশেষে মানুষের নিগূঢ়তম সত্যের পরিচয় প্রদানই উপনিষদের লক্ষ্য। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে উপনিষদের দৃষ্টি দিয়াই দেখিতেন। মানুষের দেহ-মন আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনটাই অবহেলা করিবার নহে—কিন্তু তাহার অন্তরতম সত্য সর্বাপেক্ষা আদরণীয়। মানুষ যদি এই সত্যকে ভুলিয়া তাহার বহিরঙ্গ সত্যগুলিকেই বড় করিয়া তুলিতে চায় তাহা হইলে সে শ্রেয়ের পথ হইতে বিচ্যুত। সে নিজের ব্যক্তিগত কল্যাণকে সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ করিতে তো পারিবেই না উপরন্তু সমাজকল্যাণকেও সে পদে পদে ব্যাহত করিবে—কেননা, মানুষের দৈবসত্তাকে বাদ দিলে মানুষ স্বার্থপর হইতে বাধ্য। হিংসা, ঘৃণা, লোভ, দম্ভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেনঃ 'For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul ? Or what shall a man give in exchange for his soul ?'[৪] 'মানুষ যদি তাহার আত্মাকেই হারাইয়া বসে তাহা হইলে সারা পৃথিবী অধিকার করিয়াই বা তাহার কি লাভ? এমন কি দামী বস্তু আছে যাহা মানুষ তাহার আত্মার বদলে লইতে পারে?' এই উক্তির মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ীকে কথিত উপদেশের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দকে মানুষের মহিমা খ্যাপনে ভারত-বহির্ভূত অপর কাহারও চিন্তা বা ভাব ধার করিতে হয় নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন মানুষের চরম সত্য যাহা উপনিষদে ঘোষিত হইয়াছে তাহাই মানুষের সম্বন্ধে শেষ কথা। এবং ঐ শেষ কথা কখনও পুরান হইবার নহে। উহা যত স্মরণ করা যায়, আলোচনা করা যায়, প্রচার করা যায় ততই মানুষের পক্ষে মঙ্গল। মানুষের যথার্থ একতা তাহার আত্মসত্যে।

৪। The Holy Bible, New Testament, Saint Matthew, Authorized or King James Version, Universal Book and Bible House, Philadelphia, U.S.A., 1948, 16/26

আত্মসত্যের কথা শুনিলেই যে শ্রোতা আত্মজ্ঞানী হইয়া যাইবে এমন অবাস্তব গোঁড়ামি স্বামীজীর ছিল না। কিন্তু সত্যের অপরিসীম শক্তিতে তাঁহার ছিল অবিচলিত বিশ্বাস। বুঝিতে পার আর নাই পার সত্যকে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিয়া যাও, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দীপ্ত বাণী। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ যদি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিত্যপূর্ণ আত্মা হন, তবে মানুষ যে-কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন তাহার সেই স্বরূপ তো লুপ্ত হইবার নহে। এই কথাটি মনে রাখিয়া মানুষের সম্মুখীন হও। তাহার সহিত আচরণে তাহার বাহিরের রূপটি শুধু না দেখিয়া তাহার আভ্যন্তর সত্যটি যদি স্মরণে রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে মানুষের পারস্পরিক লেনদেন ও সংস্পর্শ মৈত্রী ও প্রেমে অনুরঞ্জিত হয়—অনেক বিদ্বেষ, ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা সংযত হয়। 'যদি পৃথিবীর নরনারীগণের লক্ষ ভাগের এক ভাগ শুধু চুপ করিয়া বসিয়া খানিকক্ষণের জন্যও বলেন, "তোমরা সকলেই ঈশ্বর ; হে মানবগণ, পশুগণ, সর্বপ্রকার প্রাণিগণ, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ", তাহা হইলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমুদয় জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। তখন চতুর্দিকে ঘৃণার বীজ নিক্ষেপ না করিয়া, ঈর্ষা ও অসৎ চিন্তার প্রবাহ বিস্তার না করিয়া সকল দেশের লোকেই চিন্তা করিবে—সবই তিনি।'[৫]

স্বামীজীর মনঃপ্রাণে মানুষের এই দেবত্ববোধ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ হইয়া গিয়াছিল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তিনি পর্যটন করিয়াছেন, রাজা-মহারাজা ও দীন-দরিদ্র-জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত আবার চাষা-মজুর-মূর্খ—সকল স্তরের মানুষের সঙ্গেই মিশিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে মানুষের প্রতি ঊর্ধ্বদৃষ্টি কখনও নামিয়া আসে নাই। ইউরোপে ও আমেরিকাতেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। স্বামীজীর জীবনীপাঠক তাঁহার লোকব্যবহার সংক্রান্ত নানা স্থানে নানা পরিবেশে ছোটখাটো ঘটনাগুলি পড়িয়াও মুগ্ধ না হইয়া পারেন না। মানুষকে তিনি কী দৃষ্টিতেই দেখিতেন! স্বামীজী বিশ্বাস করিতেন মানুষের দেবত্ব-উপলব্ধি ব্যাপকভাবে অভ্যাস করিবার সময় আসিয়াছে। মানুষের শ্রেষ্ঠ সত্য তাহার জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োগ করা যায় এবং করিতে হইবে। নতুবা মানবসভ্যতার সমূহ সঙ্কট। স্বামীজীর জীবনদর্শনে এই প্রয়োগের নাম 'কর্ম-পরিণত বেদান্ত' (Práctical Vedanta)। 'ভারতে প্রাচীনকালে এই সকল ভাব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া ব্যক্তিগত জীবনে অনেকে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষাদাতা গুরুগণের সঙ্কীর্ণতা এবং দেশের পরাধীনতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে এই সকল চিন্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে পায় নাই।...এখন এই সকল ভাব জগতে প্রচারিত হইবার সময় আসিতেছে। মঠে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল পণ্ডিতদের পাঠের জন্য দার্শনিক গ্রন্থগুলিতে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল কতকগুলি সম্প্রদায়ের এবং কতকগুলি পণ্ডিত ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকারে না থাকিয়া ঐগুলি সমুদয় জগতে প্রচারিত হইবে ; যাহাতে ঐসকল ভাব সাধু পাপী, আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত অশিক্ষিত—সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইতে পারে। তখন এই সকল ভাব

৫। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৬৩

জগতের বায়ুতে খেলা করিতে থাকিবে, আর আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসে যে-বায়ু গ্রহণ করিতেছি, তাহার প্রত্যেক তালে তালে ধ্বনিত হইবে—"তত্ত্বমসি"। এই অসংখ্য চন্দ্রসূর্যপূর্ণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে ভাষণক্ষম প্রত্যেক জীবের কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হইবে—"তত্ত্বমসি"।'[৬]

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনে 'অভয়' একটি প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। শিকাগো ধর্মসম্মেলনে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও সমাদর বিশেষ করিয়া তাঁহার এই নির্ভীক বীর ভাবটিকে কেন্দ্র করিয়াই ঘটিয়াছিল। তাঁহাকে 'Cyclonic Hindu' (প্রভঞ্জনকল্প হিন্দু) আখ্যা সাংবাদিকরা দিয়াছিলেন। ধর্মসম্মেলনে তাঁহার অনন্যসাধারণ খ্যাতির পর শিকাগোর রাস্তায় রাস্তায় তাঁহার যে বড় পোস্টার-ছবি টাঙানো হইয়াছিল উহা তাঁহার বীরমূর্তিরই চিত্র। এই ছবি দেখিলে স্বতঃই মনে হয় এই ব্যক্তি আর কিছু না হোন সর্বকাপুরুষতামুক্ত নির্ভীক পুরুষ বটেন। নির্ভীকতা যে তাঁহার জন্মগত সংস্কার ইহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার সূত্র খুঁজিতে গেলে বলিতে হয় উহা তাঁহার 'নিত্যসিদ্ধতা'রই অঙ্গ। যিনি সংসারের সর্বপ্রকার অজ্ঞান ও মোহ হইতে বিনির্মুক্ত তিনি স্বভাবতঃই ভয়হীন। উপনিষদ্ নানা স্থানে ভয় এবং অভয়ের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিবেকানন্দ উপনিষদের আত্মজ্ঞানের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন বলিয়া নির্ভীকতা তাঁহার সকল আচরণ ও কর্মে ওতপ্রোত হইয়া থাকিত। 'ক্লৈব্য পরিত্যাগ কর', 'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর', 'অভীঃ, অভীঃ, অভীঃ', 'ভগবানকে বিশ্বাস করিবার আগে নিজেকে বিশ্বাস কর', ইত্যাকার বহু উক্তিতে স্বামীজীর এই বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে সাহস ও শক্তিমত্তা সর্বস্তরেই মানুষকে অগ্রগতিতে সাহায্য করে। সেইজন্য তিনি কি ব্যক্তিগত, পরিবারগত, অথবা সমাজগত, শিক্ষাগত কিংবা ধর্মগত—সকল-ক্ষেত্রেই উদ্যম, সাহস এবং নির্ভীকতার অনুশীলনের কথা বলিতেন। '...expansion is life, and contraction is death'[৭] (পরিবিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু)—স্বামীজীর একটি বহু-উদাহৃত উক্তি। স্বামীজীর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অনুধ্যান এই সাহস ও শক্তিমত্তার অনুভব হইতেই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভে অনেক নেতা ও কর্মী স্বামীজীর নির্ভীক দাসত্বমুক্তির উদাত্ত বাণী হইতে যে বহুল প্রেরণা পাইয়াছিলেন ইহা আজ সুবিদিত। এই সকল দেশকর্মীদের অনেকে স্বামীজীকে দেশের মুক্তিযজ্ঞের এক প্রধান হোতা বলিয়া মনে করিতেন। স্বামীজীর নিকট স্বাধীনতা শব্দটির একটি ব্যাপক অর্থ ছিল। যে-কোন স্তরের শৃঙ্খলমুক্তির প্রচেষ্টাকে তিনি সম্মান করিতেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, সামাজিক অত্যাচার হইতে মুক্তি অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা—এই সকলের উৎপত্তিস্থান স্বামীজীর দৃষ্টিতে একই। উহা মানুষের অন্তর্নিহিত নিজস্ব নিত্যমুক্ত স্বভাব। অতএব যে-কোনও প্রকার মুক্তিপ্রচেষ্টা আধ্যাত্মিক মুক্তি-সাধনারই রূপান্তর। মানুষ যেখানেই মাথা তুলিয়াছে, দুর্বলতা ছাড়িয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উৎসাহে দুর্গমকে জয় করিতে ছুটিয়াছে, স্বামী

৬। তদেব, পৃঃ ৬৪

৭। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. II, Advaita Ashrama, Calcutta, Tenth Edition (1963), p. 500

বিবেকানন্দ সেখানেই হৃদয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেন। আমেরিকায় গিয়া ঐদেশের সমাজ, শিক্ষা ও কর্মব্যবস্থায় স্বাধীন প্রচেষ্টার প্রভূত সুযোগ লক্ষ্য করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আইরিশ অধিবাসীদের আমেরিকায় প্রথম জাহাজ হইতে নামিবার সময় ভীরু ও সন্ত্রস্ত ভাব এবং আমেরিকার মুক্ত পরিবেশে কয়েকমাস থাকিবার পরে তাহাদের সেই ভাবের দ্রুত পরিবর্তন, তথা মুখে, চোখে, কথায় আত্মপ্রত্যয়, সাহস ও উদ্যমের অভিস্ফূর্তি—এই ঘটনা স্বামীজী গভীর মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনদর্শনের অন্যতম প্রতিজ্ঞা—সকল মানুষের অন্তরশায়ী আত্মা যিনি সর্বশক্তির আকর, চিরমুক্ত, চিরস্বচ্ছ, তাঁহার জাগরণই মানুষের সকল কল্যাণের নিদান। আইরিশ অধিবাসীদের ক্ষেত্রে স্বামীজী বলিতেন ঃ আমেরিকার মুক্ত পরিবেশে আসিয়া তাহাদের ভিতরকার সুপ্ত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিলেন। স্বদেশে ধর্মীয় ও সামাজিক নানা বাধা ও অত্যাচারের ফলে তাহাদের সেই ব্রহ্ম ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন।

একথা সত্য যে ইউরোপ-আমেরিকায় এবং স্বদেশেও স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত-বেদান্ত বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন কিন্তু তিনি শুধু অদ্বৈতবাদী ছিলেন ইহা বলিলে তাঁহার জীবনদর্শনের প্রতি অবিচার করা হয়। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—বেদান্তের এই তিন ধারা যে পরস্পর বিরোধী নহে স্বামীজী ইহা বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। উহারা আধ্যাত্মিক জীবনের তিনটি ধাপ। দ্বৈত হইতে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতে অদ্বৈত—এই ক্রমে জীব-জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধের উপলব্ধি উপস্থিত হয়। ইহা ন্যায়ের যুক্তিসহায়ে বোধগম্য না হইলেও প্রত্যক্ষানুভূতি দ্বারা সিদ্ধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই নানা দ্বৈতভাবের দর্শনাদি লাভ করিয়াছিলেন এবং অদ্বৈতপথের চরম অনুভূতি নির্বিকল্প সমাধিও তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'জ্ঞানের পর বিজ্ঞান।' নির্বিকল্প সমাধি হইতে নামিয়া আসিয়া জগৎকে ব্রহ্মময় দেখা—ইহাই তাঁহার কথিত 'বিজ্ঞানে'র নিষ্কর্ষ। স্বামীজীর জীবনীপাঠক জানেন, কাশীপুর উদ্যানবাটীতে স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধিতে একটানা কিছুকাল ডুবিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঠাকুর তাঁহাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ 'তুই তো বড় হীন বুদ্ধি। সমাধির পারে যা। সমাধি তো তুচ্ছ কথা।' নরেন্দ্র সুফী সাধক জাফরের একটি গান ঠাকুরের নিকট গাহিতেন ঃ 'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।' ঠাকুর সমাধির পারের অবস্থা বুঝাইতে গিয়া নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন ঃ ঐ গানের ভাবের মধ্যেই ঐ অবস্থার ইঙ্গিত আছে। স্বামী বিবেকানন্দ অনেক বক্তৃতায় যেমন অদ্বৈতবেদান্তের মায়াবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি অন্যান্য একাধিক বক্তৃতায় জগৎ-সংসারকে ব্রহ্মময় বলিয়া ভাবিবার উপর জোর দিয়াছেন। প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। স্বামীজীর কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ এই গ্রন্থচতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি যোগকেই প্রকৃষ্ট মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। স্বামীজীর জীবনদর্শনে যোগসমন্বয় এবং বেদান্তের ত্রিধারার সমন্বয় অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণের তিনি সত্যই সার্থক বার্তাবহ। যুক্তিদ্বারা এই সমন্বয়কে স্থাপিত করা যায় না। যুক্তি করে এক পক্ষকে সমর্থন এবং অন্য পক্ষকে প্রত্যাখ্যান। তাহাতে বুদ্ধিচাতুর্য এবং পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় কিন্তু মানুষের

আধ্যাত্মিক সমস্যার সুসমাধান হয় না। পরন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে আনে গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা। এই বিষয়ে স্বামীজী প্রাচীন আচার্যগণকেও সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। স্বামীজীর মতে উপনিষদে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত তিন ভাবেরই উক্তি বিকীর্ণ। তিন ভাবেরই প্রামাণিকতা স্বীকার্য। অদ্বৈতের ভাষ্যকারগণ দ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈতের বাক্যগুলিকে ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের কৌশলে অদ্বৈত-প্রতিপাদক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈতের ব্যাখ্যাতাগণ সুস্পষ্ট অদ্বৈতপর উক্তিগুলি নিজেদের ভাবে টানিয়া আনিয়াছেন। এই উভয় প্রচেষ্টাই স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে অসমীচীন। স্নেহময়ী মাতা যেমন বিভিন্ন সন্তানের পরিপাকশক্তি অনুযায়ী একই খাদ্যকে নানাভাবে প্রস্তুত করেন সেইরূপ সর্বলোক-কল্যাণকারিণী শ্রুতি বিভিন্ন অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুর জন্য জীব-জগৎ-ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন। স্বামীজী শ্রুতির ভাষ্য, টীকা-টিপ্পনী অপেক্ষা মূল বাক্যগুলিকে স্বাধীনভাবে বুঝিবার উপর জোর দিতেন। তাঁহার বেদান্ত-ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্যপ্রকাশের প্রচেষ্টা নাই। আছে স্বানুভূতির নিঃসন্দিগ্ধ সরলতা। স্বামীজীর দর্শন সর্বতোভাবে তাঁহার জীবনদর্শন। নিত্যসিদ্ধ মহাযোগীর উদার তত্ত্বোপলব্ধি মানুষের সর্বস্তরের সঙ্কীর্ণতা, দুর্বলতা ও অসহিষ্ণুতা দূর করিবার জন্য তাঁহার বাণী ও রচনায় অভিব্যক্ত হইয়াছিল। যতই দিন যাইতেছে ততই ঐ বাণীর গভীরতা ও কার্যোপযোগিতা প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসমন্বয়ের উপদেশ নানাভাবে দিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ উহাতে যোগ করিয়াছেন দর্শনসমন্বয়, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় এবং আধ্যাত্মিকতা ও ইহলৌকিকতার সমন্বয়। ধর্ম ও বিজ্ঞান যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী নহে বরং পরস্পর অনুকূল, স্বামী বিবেকানন্দের এই মননধারার অপূর্ব মৌলিকতা অবশ্যই স্বীকার্য।

স্বামীজী কি শঙ্করাচার্যের ন্যায় মায়াবাদী ছিলেন? অবশ্যই ছিলেন এবং মায়াকে statement of facts (প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহের উপন্যাস) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া তিনি শঙ্করাচার্যের এবং অপরাপর অদ্বৈতবাদিগণের মায়ার ধারণাকে একটি বৈজ্ঞানিক দৃঢ়তা দিয়াছেন। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী অষ্টম বা একাদশ শতাব্দী নহে। শঙ্করাচার্য ও রামানুজাচার্যকে বেদান্ত-ব্যাখ্যায় যেসকল বিপক্ষকে নিরস্ত করিতে হইয়াছিল স্বামীজীর সময়ে ঐসকল বিপক্ষ অন্তরালে। কিন্তু ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে নূতন নূতন শক্তিশালী বিপক্ষ শুধু অদ্বৈতবাদকে নহে দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকেও নাড়া দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল (এবং এখনও হইতেছে)। এই বিপক্ষগুলি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের চিন্তাধারা হইতে প্রসূত। প্রাচীন বেদান্তাচার্যগণের সময়ে যেসকল লোকপ্রত্যক্ষ ঘটনা, আচার এবং নৈয়ায়িক ও দার্শনিক যুক্তি পরিচিত ও প্রচলিত ছিল তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বিচারধারাকে পরিপুষ্ট করিতেন। বর্তমান কালের বিপক্ষকে নিরস্ত করিবার জন্য ঐসকল বিচারধারা পর্যাপ্ত নহে। এখন প্রয়োজন প্রকৃতিবিজ্ঞানের নূতন নূতন ঘটনা পর্যবেক্ষণের ফলে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠ বিচারধারা। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত বেদান্ত উপনিষদ্-প্রতিষ্ঠ কিন্তু বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারগুলির সহিত সুসমঞ্জস।

স্বামী বিবেকানন্দ একস্থানে ঈশ্বরের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা তাঁহার জীবনদর্শনে

ঈশ্বরের স্থান সম্বন্ধে প্রচুর আলোকসম্পাত করে। আলমোড়া হইতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুলাই তিনি শিকাগোর মিস মেরী হেলকে লিখিয়াছিলেনঃ '...নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান—একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ! এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।'[৮]

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন দার্শনিক প্রতিভা, বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্য, ভাবসমৃদ্ধি বা চিন্তার উৎকর্ষের জন্য যত না আদরণীয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আকর্ষক উহার মানুষকে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ভাবে যথার্থ কল্যাণের দিকে লইবার প্রত্যক্ষ উপায় নির্দেশের জন্য। তাঁহার জীবনদর্শনের প্রত্যেকটি দিক তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির উপর স্থাপিত বলিয়া উহার আবেদন প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভিমুখে। তাঁহার জীবনদর্শন সহস্র সহস্র জীবনে শক্তিসঞ্চারের জন্য। মানুষের নিত্যশুদ্ধ নিত্যমুক্ত চৈতন্যসত্তা, উহার অনুধ্যানজনিত সকল প্রকার দুর্বলতা বর্জন, সর্বব্যাপী চৈতন্যের জ্ঞানসঞ্জাত প্রেম সমুদয় মানবগোষ্ঠীর প্রতি প্রয়োগ, সকল পরিবর্তনের পশ্চাতে অপরিণামী চিরপ্রশান্ত অন্তরাত্মাকে কেন্দ্র করিয়া সংসারের সকল কর্ম সম্পাদন, ঈশ্বরকে লোক-লোকান্তরে না খুঁজিয়া মানুষের মধ্যে উহার আবিষ্কার চেষ্টা—এইগুলিই স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের মূল কথা।

৮। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪১২

স্বামী বিবেকানন্দের নববেদান্ত

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে যে ধর্মাচার্যেরা অবতীর্ণ হয়ে অধ্যাত্মরাজ্যের স্ব-অনুভূত উপলব্ধি বহন করে এনে মানুষের কল্যাণে প্রচার করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের মধ্যে এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি। গত শতাব্দীর বেশ কিছু আগে থেকেই সমস্ত বিশ্ব এমন এক যুগসঙ্কটে পড়েছিল যা পরিণামে এক প্রলয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি করতে পারত। সেসময়ে করুণাময় বিধাতার আশীর্বাদে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তাঁর আবির্ভাব পৃথিবীর সেই প্রলয়োন্মুখ গতিকে স্তব্ধ করে চালিত করল কল্যাণময় পথে, মানবসমাজে করল নতুন প্রাণসঞ্চার।

সকল যুগে সমস্ত ধর্মাচার্যই যে সামগ্রিক পথের আলোকে ধর্ম-উপদেশ দেন, তা নয়। যদিও 'ধর্ম' শব্দটি শাস্ত্রবিহিত কল্যাণকর সাধনপথ হিসাবে সম্প্রদায়গত পথকে বোঝায়, তবুও এই প্রবন্ধে আমরা 'ধর্ম' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করব। অর্থাৎ কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, বা কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান—এই সামগ্রিক দৃষ্টিতেই আমরা 'ধর্ম' শব্দটিকে ব্যবহার করব। শাস্ত্র-উপদিষ্ট যজ্ঞ, দান, হোম, গঙ্গাস্নান ইত্যাদি কর্মে মানুষ স্বর্গে যায়। আর এইসব কাজ নিষ্কামভাবে করলে মানুষের মনে বৈরাগ্য হয় ও জ্ঞানলাভের ইচ্ছা জন্মে। রাজযোগ বা সমাধি, জ্ঞান বা মুক্তির সাধন। ভক্তিও তেমনি জ্ঞানের সাধন। অর্থাৎ যোগ বা ভক্তির ফলে মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হয় যার পরিণামে সাধক মুক্ত হন। কর্মমীমাংসক আচার্যেরা কর্মরূপ ধর্মের প্রচার করেছিলেন। সাংখ্য, বৌদ্ধ প্রমুখ আচার্যেরা জ্ঞানরূপ ধর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব রকম ধর্মের (জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগ) উপদেশ দিয়ে সমন্বয়সাধন করেছিলেন। ভগবান শঙ্করাচার্য জ্ঞানরূপ ধর্মের এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিরূপ ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন। সাম্প্রতিককালে স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত ধর্মপথের সমন্বয়সাধন করেছেন।

স্বামীজী সকল পথকেই শ্রদ্ধা জানালেও আমরা এখানে তাঁর উপদিষ্ট জ্ঞানপথ সম্বন্ধে আলোচনা করব। 'বেদান্ত' শব্দটি একদিকে যেমন উপনিষদ্-গীতা-ব্রহ্মসূত্র এবং তার ভাষ্য টীকা ইত্যাদি গ্রন্থকে বোঝায়, তেমনি বেদান্ততত্ত্বের প্রতিপাদক সবকিছুকেই বোঝায়। এই হিসাবে স্বামীজীর বাণীকেও 'বেদান্ত' শব্দে উল্লেখ করা যায়।

অনেকে স্বামীজীর মতন 'নববেদান্ত' (Neo-Vedanta) বলেন। এই নববেদান্ত বলতে কি বোঝায়? সাধারণত 'নব' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথমত, অ-পূর্ব (নতুন) অর্থাৎ যা পূর্বে ছিল না কিন্তু বর্তমানে সত্তালাভ করেছে তাকে 'নব' বলা যায়। যেমন নবজাতক। কোন লোকের সন্তান জন্মালে তাকে 'নব' বলা যায়। সেই পুত্র (সঠিকার্থে পুত্রশরীর) পূর্বে ছিল না, এখন হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারে 'নব',—যেমন—যদু নামে কোন লোকের শরীর কঠিন অসুখে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, পরে ওষুধ খেয়ে রোগমুক্ত হয়ে নতুন হল। স্বামীজীর 'নববেদান্ত'-এর 'নবত্ব'টি দ্বিতীয় প্রকারের। পূর্ব পূর্ব যুগে যে-বেদান্ত প্রচারিত হয়েছিল, তা কালপ্রবাহেই হোক, কি মানুষের কামনাবাসনার ফলেই হোক, বিকৃত হয়ে অন্যভাবে প্রচারিত হচ্ছিল অথবা

লোকে তা ভুলে গিয়েছিল। স্বামীজীর আবির্ভাবে আবার সেই বেদান্ত নবীনভাব ধারণ করল। স্বামীজী সেই মুমূর্ষু বেদান্তের প্রাণকে সঞ্জীবিত করলেন। কিভাবে তিনি এই বেদান্তের উপদেশ করেছেন তা আমরা এখন আলোচনা করব।

উত্তরগীতায় বেদান্তের মূলতত্ত্ব বলা হয়েছে ঃ

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥

—অর্থাৎ অসংখ্য গ্রন্থে যে বেদান্ততত্ত্ব বলা হয়েছে, তা আমি (ভগবান) অর্ধেক শ্লোকে বলছি—ব্রহ্মই সত্য। জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। অদ্বৈতবেদান্তের যত গ্রন্থকার, ব্যাখ্যাকার, প্রবন্ধকার রয়েছেন, বেদান্তের এই মূলতত্ত্বে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ নেই, যদিও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সামান্য কয়েকটি বিষয়ে তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

বেদান্তে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই আত্মা বলা হয়। এই ব্রহ্ম বা আত্মার কোন ভেদ নেই। স্বামীজী এই আত্মার একত্ব নানা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন।

'...হিন্দুদর্শনের চূড়ান্ত বিচার আসিল। "অনন্ত" কখন দুইটি হইতে পারে না। যদি আত্মা অনন্ত হয়, তবে একটি মাত্র আত্মাই থাকিতে পারে, আর এই যে অনেক আত্মা বলিয়া বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে—তোমার এক আত্মা, আমার আর এক আত্মা—ইহা সত্য নহে। অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সেই এক অনন্ত ও সর্বব্যাপী...।'[১]

আত্মার একত্ব বিষয়ে অদ্বৈতবাদীদের যুক্তি স্বামীজীরই অনুরূপ। তাঁরা বলেন—'আত্মত্ব' ধর্মটি (attribute) বহু বস্তুতে থাকতে পারে না। কারণ আত্মত্ব হল বিভুমাত্র-বৃত্তি (significative function)। সর্বব্যাপী পদার্থকে 'বিভু' বলে এবং বিভুত্ব (একমাত্র) সর্বব্যাপী পদার্থমাত্রেই থাকে। অতএব উহা নানা পদার্থে থাকে না।

দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক প্রমুখ যদি প্রশ্ন করেন—এর দৃষ্টান্ত কি? অথবা বিভুমাত্রবৃত্তি ধর্মে নানা-বৃত্তিত্ব-অভাবের ব্যাপ্তির (invariable concomitance ; পাশ্চাত্য লজিকে major premise)[২] উদাহরণ কি?

অদ্বৈতবাদী তার উত্তরে নৈয়ায়িকের স্বীকৃত পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করে বলেন—'আকাশত্ব'। নৈয়ায়িক-বৈশেষিক প্রমুখ বাদী আকাশকে বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩০

২। অনুমান (inference)-এর ব্যাপারে বৈদান্তিক ও পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের মিল বোঝাতে একটি উদাহরণ দেখা যাক।

বৈদান্তিক ন্যায়	উদাহরণ	পাশ্চাত্য ন্যায়
উপনয়—	পাহাড়ে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে	—Minor premises
উদাহরণ—	যেখানে ধোঁয়া সেখানেই আগুন যেমন রান্নাঘরে	—Major premises
নিগমন—	সুতরাং পাহাড়ের মধ্যে আগুন আছে	—Conclusion

এই দৃষ্টান্তে আগুন হল 'সাধ্য' (thing to be inferred, major term), ধোঁয়া 'হেতু' (middle term) এবং পাহাড় 'পক্ষ' (minor term)। ধোঁয়া সব সময়ে আগুনের সঙ্গেই থাকে—এই জ্ঞানকেই 'ব্যাপ্তিজ্ঞান' (ever-dependence of the middle term on the major term) বলা হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞানই হচ্ছে অনুমানের আসল কারণ। বিস্তৃত আলোচনার জন্য বেদান্ত-পরিভাষার দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এবং নিত্য ও এক বলেন। তাহলে আকাশত্ব ধর্মটি কেবলমাত্র বিভু আকাশকেই আশ্রয় করে থাকছে। আর যেহেতু আকাশ একটিই, সেহেতু আকাশত্ব একাধিক পদার্থে নেই। (অবশ্য যদিও অদ্বৈতবাদীরা একাধিক সর্বব্যাপী পদার্থ স্বীকার করেন না, তবুও দ্বৈতবাদীর মতানুসারে একাধিক সর্বব্যাপী পদার্থ আপাতত স্বীকার করে নিয়েও আত্মার একত্ব প্রমাণ করেন।)

এর বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদী বলেনঃ আকাশের ধর্ম যে আকাশত্ব, তা কোন 'জাতি' (generic attribute) নয়।[৩] আকাশত্ব জাতি নয় বলেই তা কেবলমাত্র একমাত্র সর্বব্যাপী আকাশে থাকে। জাতি বহু পদার্থে থাকে; একমাত্রবৃত্তি ধর্ম জাতি নয়। আত্মত্ব ধর্মটি জাতি বলে বহু পদার্থে থাকে, অর্থাৎ আত্মা অনেক।

অদ্বৈতবাদী এর উত্তরে বলেনঃ (১) আত্মত্ব ধর্মটি অনেক পদার্থে থাকে, একথা বললে আত্মত্ব জাতি বলে গণ্য হবে; এবং (২) আত্মত্ব জাতি বলে তা বহু পদার্থে থাকবে। তাহলে এখানে অন্যোহন্যাশ্রয় (mutual dependence) দোষ ঘটছে। তাই আত্মত্ব ধর্মের সাহায্যে বহু আত্মার প্রমাণ করা যায় না।

অদ্বৈতবাদীরা আরও বলেন যে, আত্মায় অবস্থিত আত্মত্বটি কোন জাতি নয়। যে জাতিগুলি ব্যাপক (inclusive) নয়, কিন্তু একটা মধ্যবর্তী ব্যাপক জাতির ব্যাপ্য, সেই রকম জাতি বিভু দ্রব্যে থাকে না। যেমন, 'দ্রব্যত্ব' জাতি (substancehood) সত্তা (existence) অপেক্ষা ব্যাপ্য হলেও 'পৃথিবীত্ব' 'জলত্ব' ইত্যাদি জাতির চেয়ে ব্যাপক এবং সেজন্য মধ্যবর্তী ব্যাপক জাতি। তা পৃথিবীত্ব জলত্ব প্রভৃতিকে ব্যেপে থাকে; কিন্তু বিভু আকাশে থাকে না। এইভাবে আত্মাও বিভু বলে তাতে দ্রব্যত্ব ব্যাপ্য জাতি থাকতে পারে না। অতএব আত্মত্ব জাতি নয়। আত্মত্বকে জাতি বলে মানলে তা দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য হয়ে যায়; এবং তা আত্মাতেও থাকায় আত্মা আর বিভু হতে পারে না। অথচ নৈয়ায়িক প্রমুখ দ্বৈতবাদী আত্মাকে বিভু (সর্বব্যাপী) বলেন। এইভাবে যুক্তিদ্বারা আত্মার একত্ব স্থাপিত হয়।

তখন প্রশ্ন—উল্লিখিত যুক্তির সাহায্যে আত্মা এক বলে প্রমাণিত হলেও আকাশ (space)-কাল (time)-দিক (direction) এই তিনটি বিভু পদার্থ এবং পৃথিবী-জল ইত্যাদি দ্রব্য (substance), গুণ (quality), কর্ম (action) প্রভৃতি আরও অনেক পদার্থের সত্তা (existence) থাকায় অদ্বৈতবাদ তো দাঁড়াতে পারে না? এর উত্তরে স্বামীজী বলেছেনঃ 'যেমন সূর্য লক্ষ লক্ষ জলকণার উপরে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রত্যেক জলকণার উপরেই সূর্যের একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে, তেমনি সেই এক আত্মা, সেই এক সত্তা অসংখ্য নাম-রূপের বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা রূপে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু স্বরূপতঃ উহা এক। বাস্তবিক "আমি" বা "তুমি" বলিয়া কিছু নাই—সবই এক। ...দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা...একটি বস্তুই আছে...সে নিজেই এই

৩। 'জাতি' হল এক ধরনের classification, 'গোত্ব' (cowhood) একটি জাতি। গরুতে এই গোত্ব-জাতি রয়েছে। একটি গরু মরে গেলে গোত্ব-জাতি নষ্ট হয় না, কারণ অন্যান্য গরুতে এটি তখনও থাকছে। জাতি একাধিক পদার্থে থাকে। কিন্তু 'আকাশত্ব' কেবলমাত্র আকাশেই থাকে এবং আকাশ একটি। সেজন্য আকাশত্ব জাতি নয়।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ।'[৪] দ্বৈতমাত্রই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলে এক অদ্বৈত আত্মা সিদ্ধ হয়। এখন দ্বৈতমাত্রই মিথ্যা—এটা কি করে প্রমাণিত হয়? এর উত্তরে স্বামীজী একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন: '...আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক করিয়াছে। মনে কর, তরঙ্গটি মিলাইয়া গেল, তখন কি ঐ আকৃতি থাকিবে? উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে; কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না।'[৫]

সমুদ্রই সত্য, তরঙ্গ বুদ্বুদ ইত্যাদি যেমন মিথ্যা, তেমনি এক আত্মাই সত্য, সমগ্র জগৎ সেই আত্মাতে কল্পিত। অতএব আত্মা ভিন্ন সব মিথ্যা বলে এক অদ্বিতীয় আত্মাই সিদ্ধ হয়। অদ্বৈতবাদীরা জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণে অসংখ্য যুক্তি দিয়েছেন।[৬] তার কিছু আলোচনা করা যাক।

আত্মা বা ব্রহ্মই সত্য। ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন সবকিছুই তাহলে মিথ্যা। স্বপ্নে যা দেখি তা ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলে তা মিথ্যা। শুক্তিতে (ঝিনুক) ভ্রমবশত দৃশ্যমান রজতও (রূপা) মিথ্যা যেহেতু এটি ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। প্রশ্ন উঠতে পারে—স্বপ্নের দৃশ্য এবং শুক্তিতে দৃশ্যমান রজত মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু এই জগতের বিভিন্ন পদার্থও কি করে মিথ্যা হবে? এইগুলি মিথ্যা বলে কেউ তো অনুভব করে না? এর উত্তর: সাধ্যের

৪। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫১

৫। তদেব, পৃঃ ৫১-২

৬। স্বামীজীর মতে 'মায়া' হল 'Statement of facts'—ঘটনার বর্ণনাই মায়া। একটি বস্তুই সবকিছুর মূলে, সবকিছুর কারণ; ঐ একটি মূল বস্তুর বদলে অন্য কিছু দেখাটাই মায়া। বেদান্তে 'মায়া' একটি পারিভাষিক শব্দ (technical term)। যা অনুভব করা যায় (seeming reality) অথচ যুক্তিবিচারে টেকে না (invalid from the logical standpoint) তা-ই মায়া। যেমন, পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের ঘোরা। সূর্যের এই পৃথিবী-প্রদক্ষিণ সকলেই অনুভব করে কিন্তু যুক্তিবিচারে মানতে পারে না। সূর্যের এই ঘোরা ব্যাপারটি তাহলে মায়া। স্বামীজী বলছেন যে, মানুষের সকল ব্যবহারই এরকম মায়া; বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্বও মায়া। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও ক্রমশ এই সিদ্ধান্তের দিকে ঝুঁকেছেন। অতীতে বৈজ্ঞানিকেরা 'জড়' (matter) ও 'শক্তি' (energy) এই দুই ভাগে সবকিছুকে গণ্য করতেন, পরে তাঁরা দেখলেন, জড় আর কিছুই নয়, তা শক্তিরই বিশেষ অবস্থামাত্র (matter is nothing but bottled-up energy)। সাম্প্রতিককালে তাঁরা 'তরঙ্গ' (wave) দিয়ে সবকিছুকে বোঝাতে চাইছেন এবং 'সম্ভাবনার তরঙ্গ' (wave of probability) নামে একে নির্দেশ করছেন। যদি প্রশ্ন হয় যে, তরঙ্গ কিসের? বিজ্ঞানীরা তার উত্তর দিতে পারছেন না। আসলে এই তরঙ্গও শুধুমাত্র গাণিতিক ব্যাখ্যামাত্র (mathematical interpretation)। কোন কোন বিজ্ঞানী এই তরঙ্গকেও 'অলীক' বলে মনে করছেন। স্যার জেম্স্ জীন্স্ তো সরাসরিই বলে দিলেন: '...the waves which form the universe, are in all probability fictitious.' [The Mysterious Universe, Penguin Books Limited, England, 1938, p. 100] এডিংটন আরও এক পা এগিয়ে বললেন: 'The frank realization that physical science is concerned with a world of shadows is one of the most significant of recent advances.' 'In the world of physics we watch a shadow graph performance of the drama of familiar life. The shadow of my elbow rests on the shadow table as the shadow ink flows over the shadow paper. It is all symbolic, and as a symbol the physicist leaves it.' [The Nature of the Physical World, Cambridge University Press, 1933, pp. xvii, xvi (Introduction)]

(Major term) ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট হেতু (Middle term) যদি পক্ষে (Minor term) থাকে তাহলে পক্ষধর্মতার কারণে সাধ্য অনুমিত (inferred) হবেই।[৭] সুতরাং এখানেও শুক্তি-রজতাদি দৃষ্টান্তে মিথ্যাত্বের ব্যাপ্তি (invariable concomitance) ব্রহ্ম-ভিন্নত্ব হেতুতে নিশ্চিত হওয়ায় তার দ্বারা সমগ্র জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন হতে পারেঃ সকলের প্রত্যক্ষ (perception) দ্বারা জগতের সত্যত্ব অনুভূত হয়, এবং প্রত্যক্ষ অনুমানের চেয়ে বলবত্তর বলে পূর্বোক্ত অনুমানে বাধদোষ থাকায় ঐ অনুমানের দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয় না।

এর উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেনঃ প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা এই জগৎকে যে সত্য বলে অনুভব করি [যেমন চোখ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নদী, বন, পর্বত, গাছ ইত্যাদিকে 'এটি সৎ (it exists) ঐটি সৎ (that exists)' বলে অনুভব করি] এই 'সত্য' বলতে আমরা কি বুঝি? এই সত্যত্বটি কি প্রমাবিষয়ক (regarding right knowledge) অথবা ভ্রমাবিষয়ক (regarding the superimposed knowledge)?[৮] এই দুটোর মধ্যে যাকেই সত্যত্ব বলা হোক না কেন, এরকম 'সত্যত্ব' চোখ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হতে পারে না। অতএব ঐ প্রমা বা ভ্রমঘটিত বিষয়তা বা বিষয়তার অভাবও প্রত্যক্ষ হতে পারে না।

প্রত্যুত্তরে বলা যায়ঃ সত্তা জাতি (existence as a generic attribute), কার্যকারিতা (utility) বা অসৎ-ভিন্নতাকে (opposite to non-existence) সত্যত্ব বলে। যেমন, 'জল সৎ, পর্বত সৎ, বৃক্ষ সৎ' ইত্যাদি রূপে সত্তা জাতির প্রত্যক্ষ হয়। আর এই জগতের সব বস্তুই কিছু না কিছু প্রয়োজন সাধন করে বলে এগুলির

স্বামীজী আর এক দিক দিয়ে 'মায়া' ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেনঃ জগৎটাকে যেভাবে আমরা দেখছি সেটাই কি তার প্রকৃত রূপ? এক-ইন্দ্রিয় প্রাণী এই জগৎকে একভাবে অনুভব করে। দুই-ইন্দ্রিয় প্রাণী অনুভব করে অন্যভাবে। পঞ্চেন্দ্রিয় প্রাণী মানুষের অনুভূতি আরও ব্যাপক। অ্যামিবা, কেঁচো, কুমীর, মানুষ—প্রত্যেকেই নিজস্ব শক্তিসামর্থ্য দিয়ে জগৎটাকে অনুভব করছে। অ্যামিবা-কেঁচো-কুমীর মানুষের অনুভবকে নিশ্চয়ই স্বীকার করবে না! অতএব ভবিষ্যতে ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে যদি ছয় বা সাত-ইন্দ্রিয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে, তবে সে প্রাণীর জ্ঞান মানুষের চেয়েও ব্যাপক হবে। তখন কার অনুভবকে আমরা 'সত্য' বলব? আসলে সব প্রাণীই আলোছায়া-ঘেরা অনুভূতির রাজ্যে বর্তমান। এই ঘটনাটিই মায়া। বিখ্যাত বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ (১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী) তাঁর অনির্দেশ্যবাদতত্ত্বে (Theory of Indeterminacy) বলেছেন যে, জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষ কোনদিনই জানতে পারবে না। প্রকৃতির (nature) মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মায়ার গণ্ডি (margin of error) রয়েছে যেখানে সূক্ষ্মতম মাপজোখের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইলেকট্রনের স্থিতি (position) ও ভরবেগের (momentum) গণনা একই সঙ্গে করা অসম্ভব—এই তথ্য থেকেই হাইজেনবার্গ স্বীয় তত্ত্ব রচনা করেছেন। বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই মায়ার পিছনে অপরিবর্তনীয় সত্য কোন সত্তাকে ধরতে পারছেন না। স্বামীজী বলছেনঃ 'মায়া ঠিক ভ্রান্তি নহে; যে বস্তু প্রকৃত যাহা, তাহাকে সেইরূপ না দেখিয়া অন্যরূপ দেখাকেই "মায়া" বলে।' অনেকটা একই ধরনের কথা বলেছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার জেম্স্ জীন্স্ঃ 'We can only see nature blurred by the clouds of dust we ourselves make... .' [The New Background of Science, Cambridge University Press, 1933, p. 4]

৭। বর্তমান প্রবন্ধের ২নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৮। একটি দড়িকে যখন অন্ধকারে সাপ বলে মনে করছি, তখন সেই 'সর্পজ্ঞানটি' হচ্ছে ভ্রমাবিষয়ক জ্ঞান। আর যখন দড়ি বলে দেখব তখন তা প্রমাবিষয়ক জ্ঞান।

কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ এবং আকাশকুসুম ইত্যাদি অসৎ (non-existence, unreal)। নদী-বন-পর্বত-গাছ সমন্বিত জগৎকে সেই অসৎ-ভিন্ন বলে দেখি। সুতরাং জগতের সত্যত্ব প্রত্যক্ষের সাহায্যে প্রমাণিত হচ্ছে।

এর উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেনঃ দেখ, তুমি যে তিন রকম সত্যত্ব বলছ (অর্থাৎ সত্তা জাতি, কার্যকারিতা ও অসৎ-ভিন্নতা) সেরকম সত্যত্ব তো দড়িতে ভ্রমবিষয়ীভূত সাপেও থাকে। (অন্ধকারে একটা দড়ি পড়ে থাকলে মানুষ ভুলবশত সেটিকে যেমন সাপ বলে মনে করে। সেই সর্পজ্ঞানকে এখানে বিচার করা হচ্ছে।) সেই সর্পজ্ঞানের সময়ে সাপে সত্তা জাতি থাকে। কার্যকারিতাও থাকে, কারণ মানুষ তখন ভয় পেয়ে পালাতে চায়। আর ঐ সাপ তো আকাশকুসুমের মতো একেবারে অসৎ বা অলীক নয়। অসৎ হলে সাপটিকে দেখা যেত না, সর্পজ্ঞানও হত না। অতএব এটি অসৎ-ভিন্ন। তাহলে এরকম সত্যত্ব (অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম) মিথ্যাত্বের বিরোধী হয় না বলে জগতের মিথ্যাত্ব বিষয়ক যে অনুমান আমরা করি তা-ও প্রমাণিত হয়।

মিথ্যাত্বের অভাব, মিথ্যা-ভিন্নত্ব বা মিথ্যাত্বের অধিকরণে (substratum) অবৃত্তি ধর্ম—এইগুলি মিথ্যাত্বের বিরোধী[৯] হতে পারে।

পূর্বপক্ষী যদি বলেনঃ বেশ, তোমরা যাকে বা যে রূপকে (form) মিথ্যা বল, তার অভাবকেই আমরা সত্য বলব। আর এরকম সত্যত্ব তো লোকেরা জগতেও প্রত্যক্ষ করে।

তার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেনঃ দেখ, এরকম মিথ্যাত্বের অভাব আকাশকুসুমের মতো অলীকেও থাকে। তাহলে কি আকাশকুসুম সত্য?

এবারে যদি প্রশ্ন হয়ঃ অদ্বৈতবেদান্তীর মিথ্যাত্বটির স্বরূপ কি? তবে তার উত্তর হলঃ যা (that) কোন না কোন আশ্রয়ে (substratum) সৎ বলে (existing) জ্ঞাত হয়েও (appearing) বস্তুত তিন কালে (অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ) থাকে না, তা-ই মিথ্যা। আকাশকুসুম ইত্যাদি অলীক বস্তু কোন আধারে (substratum) সৎ বলে কখনও প্রত্যক্ষ হয় না। শুক্তি-রজত, মরীচিকা-জল ইত্যাদিতে 'এই রজত', 'এই সাপ' ইত্যাদি ভ্রমকালে (during illusion) সৎ বলে প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু ভ্রম দূর হলে বোঝা যায় যে, ওখানে সাপ বা রজত কোন কালেই ছিল না।

এইভাবে স্বপ্নের দৃশ্যগুলিও মিথ্যা।[১০] সেরকম সমস্ত জগৎকেই কোন না কোন আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি দ্বারা জানা গেলেও ব্রহ্ম থেকে জগৎ ভিন্ন বলে

৯। মিথ্যাত্বের অভাব—absence of unreality
মিথ্যা-ভিন্ন—other than unreal
মিথ্যাত্বের অধিকরণে অবৃত্তি ধর্ম—the attributes which are not present in an unreal substratum

১০। স্বপ্ন সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেনঃ 'যতক্ষণ মন স্বপ্নাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ কিছুই অস্বাভাবিক মনে হয় না, কিন্তু যখনই স্বপ্নের বিষয়কে বাস্তব বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করা হয়, তখনই উহা অদৃশ্য হইয়া যায়। কেন? স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া নয়, স্বপ্নের স্বরূপ আমাদের যুক্তি বিচার ও বুদ্ধির অগোচর বলিয়া।' [বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৫] অর্থাৎ স্বপ্নদেখাকালীন অবস্থায় (in dream) আমরা স্বপ্নের স্বরূপ

সেগুলিও মিথ্যা এটা প্রমাণিত। এই জগতের সত্যত্ব প্রত্যক্ষের দ্বারা যখন প্রমাণিত হল না, তখন অনুমান ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণিত হবে না। অতএব বেদান্তীর জগৎমিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়ে যায়।

উল্লিখিত অনুমান ছাড়াও অদ্বৈতবাদী প্রত্যেক জড় বস্তুকে বিশ্লেষণ করে সেগুলির মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করেন। পর্বত মিথ্যা কারণ পর্বত জড়, অথবা যেহেতু এটি দৃশ্য, বা পরিচ্ছিন্ন (দেশ-কাল ইত্যাদির দ্বারা সীমিত), যেমন স্বপ্নদৃশ্য। এখানে দৃশ্য বলতে 'জ্ঞানের বিষয়' (object of knowledge) বুঝতে হবে। এই জগতে যা কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়, তা-ই মিথ্যা—এটাই অদ্বৈতবেদান্তীর বক্তব্য। স্বপ্নে আমরা যা কিছু অনুভব করি তা যে মিথ্যা, এটা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। মরুভূমিতে যে জলের ভ্রম হয় সেই জল মিথ্যা। এইভাবে স্বপ্ন ও অন্যান্য সকল দৃশ্যও মিথ্যা। এটি প্রমাণিত হওয়ায় জ্ঞানের বিষয়ীভূত সমস্ত পদার্থই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। পৃথিবী, জল, আগুন, বাতাস, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অজ্ঞান ইত্যাদি সবই জ্ঞানের বিষয় হয় বলে সবই মিথ্যা।

প্রশ্ন হতে পারেঃ এমন কোন বস্তু তো থাকতে পারে যা আমাদের জ্ঞেয় নয়? অজ্ঞেয় বস্তু আছে—একথা অজ্ঞেয়বাদীরা বলেন—এবং সেই বস্তুই সত্য?

এর উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেনঃ ভাল কথা, আমরাও তা-ই বলি। তবে অজ্ঞেয়বাদীরা যাকে অজ্ঞেয় বস্তু বলছেন, তা জড় অথবা চেতন? যদি জড় হয় তাহলে তো তাকে অজ্ঞেয় বলা চলে না। তাছাড়া সত্য বস্তুটি যদি সত্যিই অজ্ঞেয় হয় তাহলে 'সেটি আছে' একথা তাঁরা কি করে বলেন? কোন কিছুর জ্ঞান ছাড়া তো 'সেটি আছে' বলা চলে না। লোকে জগতে 'জ্ঞেয় বস্তু' সম্বন্ধে দুভাবে বলেন। কোন বস্তু বিশেষভাবে (particularly) জ্ঞেয়, কোন বস্তু সামান্যভাবে (in some aspect) জ্ঞেয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলিকে আমরা বিশেষভাবে জানি বলে সেগুলি বিশেষভাবে জ্ঞেয়। আর যেগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যেগুলি অনুমানের সাহায্যে জানতে হয় সেগুলি সামান্যভাবে জ্ঞেয়। অতএব অজ্ঞেয়বাদীরা যাকে 'অজ্ঞেয়' বলেন, সেটি যদি জড় হয় তাহলে তা সামান্যভাবে জ্ঞেয়।

অর্থাৎ অজ্ঞেয়বাদীরা বা কোন বৈজ্ঞানিক বহু অনুসন্ধান করে বলছেন যে, একটা কিছু বস্তু সমস্ত জগতের কারণরূপে আছে, যেটিকে আমরা ঠিক বলতে পারছি না। এর স্বরূপটা (essential nature) কি? তাঁরা বুঝতে পারছেন না। তাঁদের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সেই বস্তুকে তাঁরা সামান্যভাবে একটা সত্তা বা শক্তি বলে অনুমান করছেন, কিন্তু তার বিশেষ রূপ জানতে পারছেন না।

কোন বস্তু যদি সামান্যভাবেও জ্ঞেয় হয় তবে আর তা অজ্ঞেয় রইল না। সামান্যভাবে

(real nature of dream) সম্বন্ধে সচেতন থাকি না বলেই স্বপ্নের ঘটনাগুলিকে স্বাভাবিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করি। স্বপ্নের স্বরূপ সম্বন্ধে জানতে গেলে আমাদের এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তা বিচার করতে হবে যে অবস্থা স্বপ্ন থেকে ভিন্ন। জাগ্রতাবস্থাতেই আমরা স্বপ্নকে বিচার করতে পারি। ঠিক তেমনি জাগ্রতাবস্থাকে সঠিকভাবে বিচার করতে গেলে তুরীয়াবস্থায় আমাদের যেতে হবে। জাগ্রতাবস্থায় আমরা সবকিছু স্বাভাবিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখি, তার কারণ জাগ্রতাবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই।

যা জ্ঞেয় তা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়ে পড়ল। সুতরাং তা জড় এবং জড় হলেই তা অনিত্য ও মিথ্যা হবে। আর যদি অজ্ঞেয়বাদীরা সেই অজ্ঞেয় বস্তুকে 'অ-জড়' বলেন, তাহলে অদ্বৈতবেদান্তীর সঙ্গে তাঁদের মতের বিরোধ হয় না, যেহেতু বেদান্তীরা তাকে 'জ্ঞান', 'চৈতন্য', 'আত্মা' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বোঝান।

যদিও সেই বস্তু ব্যবহারের যোগ্য নয়, তাহলেও বেদান্তী তাকে 'নেতি নেতি' অর্থাৎ ব্যতিরেক-মুখে কিছুটা বোঝাতে চান। যা জ্ঞেয় তা-ই জড়। অতএব যা অ-জড় বা জ্ঞান তা অজ্ঞেয়। 'অজ্ঞেয়' এইজন্য যে, সেই বস্তুর দ্বারা সবকিছু প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাকে প্রকাশিত করার অন্য বস্তু নেই। সুতরাং তা স্বয়ংপ্রকাশ, চৈতন্যস্বরূপ বা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। আর ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞান 'জ্ঞেয়' নয় বলে তা 'মিথ্যা' নয়। অতএব ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানই একমাত্র সত্যবস্তু। এটিই আমাদের আত্মার স্বরূপ বা আত্মা। এইকথাই স্বামীজী সূত্রাকারে বলেছেনঃ 'দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর সমুদয় জগৎ এই দ্বৈতজ্ঞানের ফল।' বিচারজ্ঞানের উদয় হইলে মানুষ দেখিতে পায় দুইটি বস্তু নাই, একটি বস্তুই আছে, তখন তাহার উপলব্ধি হয়—সে নিজেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। আমি এই পরিবর্তনশীল জগৎ, আমিই আবার অপরিণামী নির্গুণ নিত্যপূর্ণ নিত্যানন্দময়।'[১১]

আত্মা যে জ্ঞানস্বরূপ তা বোঝাতে স্বামীজী বলেছেনঃ 'মনের দ্বারা যাহা কিছু সীমাবদ্ধ, সে-সবই সসীম। অতএব সেই "ব্রহ্মকে জানা"—এ-কথা আবার স্ববিরোধী। ...তাঁহাকে জানা যায় না, 'তিনি সর্বদাই অজ্ঞেয়।'[১২] 'তিনি সাক্ষিস্বরূপ, সকল জ্ঞানের তিনি অনন্ত সাক্ষিস্বরূপ। ...জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন, কিন্তু উভয় হইতেই অনন্তগুণ ঊর্ধ্বে, তিনি তোমার আত্মস্বরূপ।'[১৩]

স্বামীজী স্পষ্টই বলেছেনঃ সেই ব্রহ্ম বা আত্মা জ্ঞাতও নন, অজ্ঞাতও নন, জ্ঞাত হতে আরও অধিক কিছু। ব্রহ্ম জ্ঞাত নন—কথাটার অর্থ কি? এখানে 'জ্ঞাত' মানে জ্ঞানের বিষয়, আর জ্ঞান বলতে বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষকে ধরা হয়েছে। এই জগতে সবকিছুই আমরা বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জানি (যদিও কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে কোন কিছুরই জ্ঞান বা প্রকাশ হয় না, কারণ বুদ্ধি জড় বলে বুদ্ধিবৃত্তিও জড়)।

জড়ের দ্বারা জড়কে বা চেতনাকে প্রকাশ করা যায় না। নিত্যচৈতন্যস্বরূপ সাক্ষীর দ্বারা প্রকাশিত হয়ে বুদ্ধিবৃত্তি জড়বস্তুকে প্রকাশ করে। তখনই আমরা বলি বা বুঝি যে, পর্বত আমার জ্ঞাত, আকাশ জ্ঞাত, নদী সমুদ্র প্রভৃতি জ্ঞাত। কিন্তু এইভাবে (অর্থাৎ জড় বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা) আত্মা বা ব্রহ্ম বা নিত্য বিশুদ্ধ জ্ঞান জ্ঞাত হয় না। যেহেতু সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ জ্ঞানের দ্বারাই বুদ্ধিবৃত্তি অন্য সব বস্তুকে জানে, তখন আবার সেই বুদ্ধিবৃত্তি কি করে সেই চৈতন্যাত্মক জ্ঞানকে জানবে বা প্রকাশ করবে? সূর্যের আলোয় প্রকাশমান হয়ে চন্দ্র অন্যান্য বস্তুকে প্রকাশিত করলেও সূর্যকে সে প্রকাশিত করতে পারে না। সেরকম বুদ্ধিবৃত্তিও চৈতন্যের প্রতিবিম্ব দ্বারা বা চৈতন্য-প্রতিবিম্বযুক্ত হয়ে চৈতন্যকে জানতে পারে না। এই হিসাবে বলা হয়েছে যে, তিনি (ব্রহ্ম বা আত্মা) জ্ঞাত নন।

১১। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫১ ১২। তদেব, পৃঃ ৯৫ ১৩। তদেব, পৃঃ ৯৫-৬

যে বস্তুর জ্ঞান বা প্রকাশ হয় না তাকে আমরা অজ্ঞাত বলি; অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বা চিৎপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা আমরা যাকে জানতে পারি না তা-ই অজ্ঞাত। বুদ্ধির কারণ অবিদ্যা (nescience)। সেই অবিদ্যাকে আমরা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা জানতে পারি না। সেজন্য অবিদ্যাকে আমরা অজ্ঞাত বলতে পারি। অর্থাৎ চিৎপ্রতিবিম্বযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে অবিদ্যার প্রকাশ হয় না বলে এই হিসাবে অবিদ্যা অজ্ঞাত। অথচ অবিদ্যা জড়, নিজেও নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু নিত্যজ্ঞান বা চৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ বলে তাঁর অপ্রকাশ সম্ভব নয়। তিনি সদাপ্রকাশ-স্বভাব। সেজন্য তাঁকে অজ্ঞাত বলা চলে না। তিনি অজ্ঞাত হতে ভিন্ন।

তারপর স্বামীজী বলেছেন যে, ব্রহ্ম বা আত্মা জ্ঞাত নন কিন্তু জ্ঞাত থেকে আরও অধিক কিছু। এর অর্থও তিনি বলেছেন। সেই আত্মা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা জ্ঞাত না হলেও স্বয়ংপ্রকাশ বলে জ্ঞাত থেকে অধিক কিছু। কখনও তাঁর অপ্রকাশ হয় না। (এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে—বুদ্ধিবৃত্তি বা চিৎপ্রতিবিম্বযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অবিদ্যাকে জানা যায় না বলে এই হিসাবে অবিদ্যা অজ্ঞাত হলেও বেদান্তসিদ্ধান্তে অবিদ্যা অজ্ঞাত নয়, কারণ সাক্ষিচৈতন্য দ্বারা অবিদ্যা প্রকাশিত হয়। এইজন্য অবিদ্যাকে কেবল-সাক্ষিভাস্য বলা হয়।)

এই পর্যন্ত আলোচনায় বোঝা গেল, জড়বস্তুমাত্রই মিথ্যা, অ-জড় বা চৈতন্য অথবা অন্য ভাষায় বিশুদ্ধ জ্ঞানই সত্য। প্রশ্ন হতে পারেঃ কেন জ্ঞান সত্য? জ্ঞানকেও মিথ্যা বলি যদি?

তার উত্তরে বেদান্তী বলছেনঃ দেখ, মিথ্যা পদার্থ একটা সত্যবস্তুতে অধ্যস্ত বা আরোপিত (superimposed) হয়ে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। যেমন, মিথ্যা সাপ দড়িতে অধ্যস্ত, মিথ্যা রজত সত্য ঝিনুকে অধ্যস্ত, মিথ্যা মরুমরীচিকা-জল সত্য সূর্যরশ্মিসংযুক্ত বালিতে অধ্যস্ত। এইভাবে সমস্ত মিথ্যা জড়পদার্থই একটা কোন কিছু সত্যতে অধ্যস্ত হয়ে আছে। যেহেতু মিথ্যা জড়বস্তুর জ্ঞান হচ্ছে, সুতরাং তার অধিষ্ঠান (substratum)-রূপে একটা সত্যবস্তুকে স্বীকার করতেই হবে। জড়বস্তুমাত্রেই যখন মিথ্যা, তখন জড়াতিরিক্ত চৈতন্যকেই সত্যবস্তু বলতে হবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারেঃ বেশ, চৈতন্য বা বিশুদ্ধজ্ঞান সত্যবস্তু হোক। তাহলেও তা অনিত্য হবে। বৌদ্ধেরাও বলেন যে, সত্যবস্তুমাত্রই ক্ষণিক, অর্থাৎ একক্ষণ মাত্র থাকে। যা সৎ তা ক্ষণিক, চৈতন্য নিত্য হতে পারে না।

উত্তরে বেদান্তী সংক্ষেপে বলবেনঃ জ্ঞান ক্ষণিক বললে তার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, একথা মানতে হয়। এখন জ্ঞানের উৎপত্তি বা বিনাশ বুঝবে কিসের সাহায্যে? জ্ঞানের দ্বারা নিশ্চয়? (কারণ জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তো প্রমাণ করা যায় না।) তাহলে একটি জ্ঞানের সাহায্যে অন্য একটি জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ বোঝা যাবে কি করে? 'ক' জ্ঞানের সাহায্যে 'খ' জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ বুঝতে হলে 'ক' জ্ঞানকে 'খ' জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ দুইকালেই থাকতে হবে। তাহলে 'ক' জ্ঞানকে আর ক্ষণিক বলা যাবে না, কারণ 'খ' জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ একই ক্ষণে হতে পারে না, অন্তত দুইক্ষণ প্রয়োজন। যদি বলা যায়, 'ক' জ্ঞানকে দুইক্ষণ-স্থায়ী বলব, তাহলে

প্রশ্ন হবে এই দুইক্ষণ-স্থায়ী 'ক' জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ বুঝতে হলে তিনক্ষণ-স্থায়ী আর একটি 'গ' জ্ঞানের দরকার। এই 'গ' জ্ঞানকে বুঝতে আবার চারক্ষণ-স্থায়ী 'ঘ' জ্ঞান দরকার। এইভাবে শেষ পর্যন্ত একটা চিরস্থায়ী জ্ঞান স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং যা নিত্য বা সত্য তাই-ই বস্তুত জ্ঞান।

আশঙ্কা হতে পারে, এই যে নিত্যজ্ঞান প্রমাণিত হল সেই জ্ঞানকে আত্মা না বলে ঐ জ্ঞানসম্পন্ন নিত্যদ্রব্যকেই আত্মা বললে ক্ষতি কি? বৈশেষিক প্রমুখ দার্শনিকেরা আত্মাকে জ্ঞানবান বলেন। [অবশ্য তাঁদের মতে জীবাত্মার জ্ঞান অনিত্য এবং ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য। জীবাত্মা ও ঈশ্বরের ভেদ তাঁরা স্বীকার করেন। কিন্তু বেদান্তে ঈশ্বর ও জীবাত্মার বাস্তব ভেদ (ultimate difference) স্বীকার করা হয় না। একটি মাত্র আত্মা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান, এবং তিনি ঈশ্বর হতে অভিন্ন। স্বামীজীও এটা প্রতিপাদন করেছেন যার উল্লেখ আমরা পরে করব।] এর উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেনঃ আত্মা 'জ্ঞানবান' (Atman possesses knowledge) এইকথা বললে 'জ্ঞান' ও তার আশ্রয় (substratum, এখানে 'আত্মা') দ্রব্যের সঙ্গে ভেদ (different) অথবা অভেদ (identical) কিংবা ভেদাভেদ (different yet identical) এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি সে-বিষয়ে প্রশ্ন উঠবে। যদি জ্ঞান ও তার আশ্রয়দ্রব্যের ভেদ স্বীকার করা হয়, তাহলে আত্মা ও জ্ঞান অনিত্য হয়ে পড়বে, কারণ যেখানে যেখানে 'ভেদ' আছে সেখানে সেখানে 'অনিত্যত্ব'ও থাকে। সর্ববাদিসম্মত ঘট, বস্ত্র ইত্যাদি পদার্থে ভেদ থাকায় সেগুলি অনিত্য। তাহলে তো বিপক্ষ মতাবলম্বীদের আকাশ ইত্যাদিও অনিত্য হয়ে পড়ে। আর জ্ঞান ও আশ্রয়দ্রব্যের অভেদ স্বীকার করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ যা অদ্বৈতবাদীরা মানেন। জ্ঞান ব্যতীত সবই মিথ্যা—এটা আগেই প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে জ্ঞানই আত্মা। আর ভেদাভেদ বিরুদ্ধ বলে এটি স্বীকৃত হতে পারে না।

তাহলে দেখা গেল যে, বিশুদ্ধজ্ঞান নিত্য বা সত্য, আর এটিই আত্মা। এখন একটা আশঙ্কা উঠতে পারেঃ এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা নিত্য হলেও বহু নিত্যজ্ঞান অর্থাৎ বহু আত্মা স্বীকার না করে এক অদ্বিতীয় আত্মা স্বীকার কেন করব? লোকেরা নিজের নিজের আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বলে মনে করে। তাছাড়া 'আত্মা একটি' স্বীকার করলে একজনের মুক্তি হলেই সকলের মুক্তি হয়ে যায় বলে ধরতে হবে। 'এক আত্মা' মানলে একজন বদ্ধ আর একজন মুক্ত কিভাবে হতে পারে?

এর উত্তরে স্বামীজী বলছেনঃ 'বাস্তবিক একজনই আছেন, একটি আত্মাই আছেন, আর সেই এক আত্মা তুমি। ...শুধু তাহাই নহে, তুমিই তিনি। তুমি তাঁহার সহিত অভেদ। যেখানেই দুই—সেখানেই ভয়, সেইখানেই বিপদ, সেইখানেই দ্বন্দ্ব, সেইখানেই বিবাদ।'[১৪] আত্মা জানেন—তাহা নহে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ; আত্মার অস্তিত্ব আছে—তাহা নহে, আত্মা অস্তিত্বস্বরূপ; আত্মা সুখী—তাহা নহে, আত্মা সুখস্বরূপ।'[১৫]

'জ্ঞান তো সসীম;...তিনি (ব্রহ্ম)...এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ, তোমারই আত্মা-স্বরূপ।'[১৬]

১৪। তদেব, পৃঃ ১৪৭ ১৫। তদেব, পৃঃ ১২৪ ১৬। তদেব, পৃঃ ৩৪

"“অনন্ত” কখন দুইটি হইতে পারে না। যদি আত্মা অনন্ত হয়, তবে একটি মাত্র আত্মাই থাকিতে পারে, আর এই যে অনেক আত্মা বলিয়া বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে...ইহা সত্য নহে।'[১৭]

অনন্ত (Infinite) বললে দেশ (space), কাল (time) বা বস্তুর (matter) দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন (unlimited) বোঝায়। পদার্থ তিনভাবে সান্ত (with an end) হতে পারে। যেমন, হিমালয় পর্বত বিশেষ দেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (limited) ; আবার কালের দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন। যেহেতু হিমালয় পর্বত একটি সময়ে উৎপন্ন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কোন এক কালে বিনষ্ট হবে। এটি আবার বস্তুর দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন ; যেমন, বিন্ধ্য পর্বত ইত্যাদি থেকে হিমালয় ভিন্ন। আকাশ (sky) দেশের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন না হলেও কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। যাঁরা আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করেন না, তাঁদের মতেও আকাশ বস্তু-পরিচ্ছিন্ন, কারণ পৃথিবী ইত্যাদি হতে আকাশ ভিন্ন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি বস্তু স্বীকার করলেই তাদের পরস্পর ভেদ থাকায় তারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সান্ত হবেই। কিন্তু আত্মা অনন্ত বলে একমাত্র আত্মাই আছে, দ্বিতীয় কোন বস্তু নেই। যে দ্বৈত জগৎ আমরা অনুভব করছি, তা মিথ্যা। আগেই এ-বিষয়টি আমরা আলোচনা করে এসেছি।

এখন জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ বলে দুটি সত্যজ্ঞান রয়েছে একথা প্রমাণ করা যায় না। দুটি স্বীকার করলেই তা সান্ত হয়ে যাবে। তবে যে আমরা রূপের জ্ঞান, গাছের জ্ঞান, জলের জ্ঞান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান অনুভব করি, বস্তুত সেটি জ্ঞানের স্বরূপতভেদ (difference in true sense) নয়। আসলে এক অদ্বিতীয় আকাশকে ঘট, গৃহ ইত্যাদি উপাধি (limiting adjunct)-ভেদে ঘটাকাশ, গৃহাকাশ ইত্যাদি রূপে ভিন্ন ভিন্ন আকাশ বলে মনে করি। ঠিক সেরকম ঘট, জল, পৃথিবী ইত্যাদি উপাধিরূপ বিষয়ের ভেদবশত জ্ঞানের ভেদ মনে করি। উপাধিগুলিকে বাদ দিলে জ্ঞানের কোন ভেদ থাকে না। চিন্তা করেও শুদ্ধ জ্ঞানে (knowledge in its true sense) ভেদ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অদ্বৈতবাদীরা অতি বিস্তৃতভাবে ভেদের খণ্ডন করেছেন। ভেদ খণ্ডিত হলে এক অদ্বৈত বস্তুই অবশিষ্ট থাকে। এ-বিষয়ে দু-একটি যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে।

প্রথমত, প্রত্যক্ষের দ্বারা ভেদ জ্ঞাত হয় না ; কারণ আমাদের প্রত্যক্ষ হয়—এই জল, এই পাহাড়, এই গাছ ইত্যাদি রূপে। ভিন্ন জল, ভিন্ন পাহাড় এভাবে তো প্রত্যক্ষ হয় না। সবিকল্পক প্রত্যক্ষে (determinate perception) জল, জলত্ব ও তাদের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হয়, ভেদের জ্ঞান হয় না। পূর্বপক্ষী হয়তো বলতে পারেন 'এই জল' ইত্যাদি প্রত্যক্ষে জল, জলত্ব ও তাদের যে বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হয়, সেখানে বৈশিষ্ট্য বলতে জল ও জলত্ব থেকে অন্য কোন বস্তুর জ্ঞান হয় না, কিন্তু জলে জল-ভিন্ন বস্তুর ভেদই দেখা যায়। তাছাড়া এখানে বৈশিষ্ট্য বলতে জল ও জলত্বের সম্বন্ধকে (relation between water and watery) বোঝায়—একথাও বলা চলে না, কারণ 'জল-জলত্ব-সম্বন্ধ' এরকম জ্ঞান আর 'এটি জল' এরকম জ্ঞানের একরূপতা-আপত্তি

১৭। তদেব, পৃঃ ৩০

হয়। সুতরাং জল, জলত্ব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যই ভেদ এবং এটি সবিকল্পক প্রত্যক্ষে জানা যায়।

এর উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেনঃ বৈশিষ্ট্যকে ভেদ বলা চলে না। কারণ যেখানে 'নীল পদ্ম' বলা হয়েছে, সেখানে অ-নীল বা নীলভিন্নের জ্ঞান হয় না বলে নীলভিন্নের ভেদের জ্ঞান হয় না। যদি বলা যায়, সেখানে পূর্বানুভূত অ-নীলের স্মৃতি হতে পারে, তাহলে তার উত্তর হবে যে, যার প্রথমেই নীল পদ্মরূপে নীলের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হয়, তার এ জন্মে অ-নীলের অনুভব হয়নি বলে অ-নীলের স্মৃতি হতে পারে না, এবং সেজন্য অ-নীলের ভেদের জ্ঞানও হতে পারে না। যদি বল যে, সেই ব্যক্তির পূর্ব-জন্মানুভূত অ-নীলের স্মৃতি হয়, তাহলে বলব যে, এতে অনেক গুরুতর কল্পনার প্রসঙ্গ হয়। তাছাড়া 'এটি জল', 'এটি গরু' এভাবেই আমাদের প্রত্যক্ষ হয়। 'এটি অ-জল ভিন্ন', 'এটি অ-গো ভিন্ন' এইভাবে কারও জ্ঞান হয় না। আর জলে জলত্ব বা গরুতে গোত্বকে অ-জল ব্যাবৃত্তি (অ-জল ভেদ) বা অ-গো ব্যাবৃত্তি রূপে জল, গরু ইত্যাদি পদার্থের অবচ্ছেদক (পদার্থতাবচ্ছেদক, determining characteristic) বললে 'জলত্ব', 'গোত্ব' ইত্যাদি ধর্মের (attribute) উচ্ছেদ হয়ে যায়। অতএব সবিকল্পক প্রত্যক্ষে ভেদ বিষয় হয় না।

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষেও (indeterminate perception) ভেদ জ্ঞান হয় না, কারণ এতে জল ও জলত্ব অবিশিষ্ট (non-different) রূপেই জানা যায়।

যদি বলা হয়ঃ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে যে জল ও জলত্ব বিষয় হয়, তাতেই ভেদও বিষয়রূপে সিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ জলের স্বরূপ (essential nature) হচ্ছে স্বরূপভেদ, আর জলত্ব হচ্ছে বৈধর্মভেদ।

তার উত্তর হবেঃ না, জল বা জলত্বকে ভেদত্বরূপে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে জানা যায় না।

যদি পূর্বপক্ষী বলেনঃ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে ভেদত্বরূপে ভেদের জ্ঞান না হোক, জল আর জলত্ব এই বস্তুগুলি তো স্বরূপত ভেদই। তাহলে ভেদের জ্ঞান হল না কি করে?

তার উত্তরে বলা হয়ঃ দেখ, 'ভেদ' বিষয়টিই এখনও প্রমাণিত হল না। তাহলে কি করে তা বস্তুর স্বরূপ বলে প্রতিপাদিত হবে? বাস্তবিক পক্ষে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে নির্ধর্মক (without any attribute) বস্তুমাত্রই বিষয় হয় বলে অভেদই এই জ্ঞানের বিষয় হয়। অতএব নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষেও ভেদ বিষয় হয় না।

প্রত্যক্ষের দ্বারা ভেদ প্রমাণিত না হওয়ায়, অনুমানাদি দ্বারাও ভেদ প্রমাণিত হয় না। তবে যে অদ্বৈতবাদী ব্রহ্ম-ভিন্ন বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন, সেখানে সাধারণ লোকের ভ্রান্তিজ্ঞানের বিষয় কল্পিত ভেদকে অবলম্বন করেই তার মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করেন। এতে ভেদের পারমার্থিকত্ব (ultimate existence) প্রমাণিত হয় না। এইভাবে ভেদই যখন কোনভাবে প্রমাণিত হয় না, তখন একটি সত্য বস্তুই প্রতিপাদিত হয়। আর সেই বস্তু 'জ্ঞান' ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। একথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ জ্ঞান অনেক নয়, কিন্তু এক, অদ্বিতীয়। আর ঐ জ্ঞানই আত্মা।

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ—এটাও স্বামীজী পরিষ্কারভাবে বলেছেন। আবার ঐ জ্ঞান নিত্য বা সত্য, তা-ও বলেছেন। সত্য মানে সত্তাবান (possessing existence) নয়। কিন্তু সত্তাস্বরূপ। অবাধিত সত্তাস্বরূপ জ্ঞানই আত্মা। আত্মাকে সত্তাবান বললে সত্তা (existence) আত্মার ধর্ম (attribute) এবং আত্মা ধর্মী—একথা বলতে হয়। কিন্তু ধর্ম-ধর্মীভাব যেখানেই থাকে, তা অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন (limited) ও জড় হয়। সেজন্য আত্মা অবাধিত সত্তাস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। এই আত্মা আবার আনন্দস্বরূপও। কারণ সমস্ত প্রাণীরই স্বীয় আত্মার প্রতি অকৃত্রিম প্রেম রয়েছে। কেউই ইচ্ছা করে না বা চিন্তা করে না যে, সে একসময়ে একেবারে থাকবে না। সকলেই চায়, আমি বরাবর থাকব। অন্য বিষয়ে বা অন্য লোকের উপরে যে ভালবাসা তা সব সময় থাকে না। কিন্তু নিজেকে সবাই ভালবাসে এবং এই ভালবাসা অব্যভিচারী (non-ceasing)। অন্যের উপর ভালবাসা সোপাধিক (mixed with an attribute, a quality) বা কৃত্রিম। এইভাবে মানুষের নিজের উপর ভালবাসা দেখে বোঝা যায় যে, আত্মা সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ না হলে আত্মাতে প্রত্যেক জীবের অকৃত্রিম ভালবাসা হত না। স্বামীজী এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন। আত্মা বস্তুত এক হলেও দেহাদিরূপ উপাধির (limiting adjuncts) ভেদবশত বহু বলে মনে হয়। তাই একদেহ-অবচ্ছেদে (limited to one body) আত্মার মুক্তি হলেও অপরদেহ-অবচ্ছেদে আত্মার বন্ধন সম্ভব হওয়ায় বন্ধন ও মুক্তির অব্যবস্থা (contradiction) হয় না। সকল দেহে বস্তুত একই আত্মা আছেন—এটি না জানার জন্যই জগতে যত বিভেদ, মারামারি দেখা যায়।

বেদান্তের এই অদ্বৈততত্ত্ব অর্থাৎ সর্বভূতে এক আত্মা—এটি সকলে উপলব্ধি করতে পারে না, সাধনা (spiritual practice) না থাকায়। অনেকে এই অভিন্ন (non-dual) আত্মার ধারণাই (conception) করতে পারে না। সেজন্য অতীতে এই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারীর উপর খুব জোর দেওয়া হত। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীকেই এই জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হত। কিন্তু স্বামীজী বলেছেন ঃ এই অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানে সকল মানুষের অধিকার আছে; বিশেষত এই আধুনিক যুগে পৃথিবীর সবাইকে এই তত্ত্ব শোনানো প্রয়োজন। এইখানেই স্বামীজীর উদারতা ও অপূর্বতা। কারণ অতীতে প্রায় কেউই সকল মানুষকে এই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করেননি। স্বামীজী বলছেন ঃ 'অদ্বৈতবেদান্ত যেভাবে আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশ করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল। ...কিন্তু আমি আদৌ বিশ্বাস করি না যে, জগতে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারিত হইলে দুর্নীতি ও দুর্বলতার প্রাদুর্ভাব হইবে। বরং ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ইহাই দুর্নীতি ও দুর্বলতা নিবারণ করিবার একমাত্র ঔষধ। ...এই মুহূর্তেই সমুদয় জগৎকে এই শিক্ষা দাও না কেন? সাধু-অসাধু, নর-নারী, বালক-বালিকা, বড়-ছোট—সকলকেই বজ্রনির্ঘোষে ইহা শিক্ষা দাও না কেন?'[১৮] বেদান্তের এই অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে স্বামীজী বহু প্রশংসা করে একেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন। 'আর অদ্বৈতবাদ যেরূপ বল, যেরূপ শক্তি প্রদান করে, আর কিছুই সেরূপ করিতে পারে না।'[১৯] পৃথিবীর সকল মানুষকে বেদান্ততত্ত্বজ্ঞানের

১৮। তদেব, পৃঃ ২১৪ ১৯। তদেব, পৃঃ ২১৬

অধিকার দেওয়া স্বামীজীরই সম্পূর্ণ নতুন এক মহান অবদান।

এ ছাড়াও আর একটি নতুনত্ব স্বামীজীর অবদান। অতীতে ভাবা হত যে, যাঁরা বেদান্ততত্ত্বের বিচার করবেন বা বেদান্ততত্ত্বজ্ঞানের সাধন করবেন, তাঁরা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে ঐরকম সাধনা করবেন। কিন্তু স্বামীজী বলেছেন ঃ এই বেদান্তকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও লাগাতে হবে। ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করার দরকার নেই। যাঁরা বেদান্ততত্ত্বের বিচার করবেন তাঁরা কর্মকেই সেই দৃষ্টিতে কাজে লাগাবেন। যোদ্ধা যুদ্ধ করুক, ব্যবসায়ী ব্যবসা করুক, কৃষক জমি চাষ করুক, কিন্তু তারা যেন সকলেই নিজের নিজের কর্মকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে অনুষ্ঠান করে। অর্থাৎ গাড়ি ব্রহ্ম, চালক ব্রহ্ম, চালনক্রিয়া ব্রহ্ম—এরকম চিন্তা করেই কাজ করতে হবে। অথবা সকল জীবকে শিব বা ব্রহ্মবুদ্ধিতে সেবা করতে হবে। এরকম দৃষ্টিতে কর্ম করলে সেই কর্ম আর বন্ধনের কারণ হবে না। বরং জ্ঞানের উৎপাদন দ্বারা মুক্তির কারণ হবে। '...বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে একান্তভাবে কার্যকর হইতে হইবে। ...শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে...।'[২০]

এখানে স্বামীজী বলতে চান যে, উপনিষদে সর্বত্র বেদান্তবেদ্য আত্মচিন্তার কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রেও সেই চিন্তার ধারা চালানোর উপদেশ রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্' ইত্যাদি ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, সমস্ত জগৎকে ঈশ্বর বা পরমাত্মারূপে চিন্তা করতে হবে ; আবার 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি' ইত্যাদি মন্ত্রে বলা হয়েছে ঈশ্বরাত্মবুদ্ধি করে কর্মও করতে হবে। গীতাতে ভগবান সর্বত্র এই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্মযোগের কথাও বলেছেন। সেই গীতাতেই ভগবান বলছেন ঃ পূর্বে এই জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ আমি সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য মনুকে বলেছিলেন, মনু তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন। এই ক্রমে ক্ষত্রিয় রাজারা এই যোগ জানতেন। তাঁরা মহাকর্মীও ছিলেন, আবার একাধারে জ্ঞানীও ছিলেন। ক্ষত্রিয় অজাতশত্রুও এই জ্ঞান ব্রাহ্মণ গার্গ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, যতক্ষণ অপরোক্ষানুভূতি না হচ্ছে, ততক্ষণ বেদান্ততত্ত্বজ্ঞানের সাধনাও করতে হবে এবং তার সহায়ক হিসাবে কর্মযোগের অনুষ্ঠানও করতে হবে। অপরোক্ষানুভূতি দৃঢ় হলে তখন আর কর্ম না করলে ক্ষতি নেই। অবশ্য ঐরূপ জ্ঞানী বা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ কর্ম করেন না, আবার কেউ কেউ লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করেন।

'...যাঁহারা এই সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বনে অথবা পর্বত গুহায় বাস করিতেন না, অথবা তাঁহারা সাধারণ মানুষও ছিলেন না—আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে—তাঁহারা অত্যন্ত কর্মময় জীবন যাপন করিতেন...তথাপি তাঁহারা এই-সকল তত্ত্ব চিন্তা করিবার, সেগুলি জীবনে পরিণত করিবার ও মানবজাতিকে শিক্ষা দিবার সময় পাইতেন।'[২১] 'বেদান্ত আমাদিগকে কার্য করিতে নিষেধ করে না, তবে

২০। তদেব, পৃঃ ২১৯ ২১। তদেব, পৃঃ ২২৪

ইহাও বলে যে, প্রথমে "সংসার" ত্যাগ করিতে হইবে,...ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য—সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন। সর্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধি করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে কার্য করিতে সক্ষম হইবে।'[২২] 'বেদান্ত বলে, এইভাবে কার্য কর—সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর... প্রত্যেক কার্যে, প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক ভাবে তিনি পূর্ব হইতেই অবস্থিত। এইরূপ জানিয়া আমাদিগকে অবশ্য কার্য করিয়া যাইতে হইবে।... এইরূপ করিলে কর্মফল আমাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারিবে না।'[২৩]

'যাঁহারা কাঁচা অহং-বোধ বিসর্জন দিয়া কর্ম করেন, দোষ তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ জগতের হিতের জন্য তাঁহারা কর্ম করেন। নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে সর্বাধিক আনন্দ ও মুক্তিলাভ হয়।'[২৪]

এইভাবে স্বামীজী বেদান্ততত্ত্বের প্রচার আর তার সহায়ক উপাসনারূপে কর্মযোগের প্রচার করে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মুক্তির পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। তিনি বেদান্ততত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি-সম্পন্ন বরাবরই ছিলেন বলে তাঁর কথাগুলির মধ্যে এত জোর। আর তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, এই বেদান্ততত্ত্বকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করতে হবে। কেবল মুখে আওড়ালে চলবে না।

'যখনই আত্মা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হইবে, তখনই ধর্ম আরম্ভ হইবে।'[২৫] 'ধর্ম চিরকালই ব্যবহারিক বিজ্ঞানরূপে থাকিবে।'[২৬] 'ইহা দেখিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কেবল ঐ বিষয় আলোচনা করিলে বা চিন্তা করিলে চলিবে না।'[২৭]

স্বামীজী বেদান্ততত্ত্বকে যেমন সহজভাবে বুঝিয়েছেন সেরকম সেই তত্ত্বকে উপলব্ধি করার উপায়ও সরল এবং বিস্তৃতভাবে বলেছেন। সেসব তাঁর 'বাণী ও রচনা' থেকে আমরা দেখতে পাই। সেসব আলোচনা এত বিস্তৃত ও বিশাল যে তার ব্যাখ্যা করতে অসংখ্য গ্রন্থ ভবিষ্যতে রচিত হবে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা যথাসম্ভব স্বীয় বুদ্ধিতে তা সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করলাম।

২২। তদেব, পৃঃ ১৭২-৭৩ ২৩। তদেব, পৃঃ ১৭৩
২৪। তদেব, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৬৮ ২৫। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯০
২৬। তদেব, পৃঃ ২৪৭ ২৭। তদেব, পৃঃ ২৪৮

স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত

বিবেকানন্দ একালে বেদান্ত-তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ইহা আমরা একরকম মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু ইহা যতখানি মানিয়া লইয়াছি ততখানি বুঝিয়াছি এমন বলিতে পারি না। ইহার কারণ বোধহয় এই যে, আমরা সাধারণ মানুষ বেদান্ত লইয়া বড়াই করি কিন্তু ব্যস্ত হই না। বেদান্ত বস্তুটি কি, উহার মূলকথা কি এবং উহার সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক বা নৈতিক জীবনের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে এ প্রশ্ন আমাদের মনে বড় আসে না। ইহা এক মহৎ তত্ত্ব, এমন তত্ত্ব পৃথিবীর আর কোথাও নাই, ইহা পাশ্চাত্যের প্রাচীন ও আধুনিক দর্শনসমূহকে একেবারে ম্লান করিয়া দিয়াছে, এইরূপ ভাবিতে বড় মন্দ লাগে না। কিন্তু ইহা আমাদের চিত্তে কতখানি প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের ধর্ম-কর্ম-চিন্তাকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এ জিজ্ঞাসা আমাদের হয় নাই। আমাদের হিমালয়ের ন্যায় আমাদের বেদান্ত একজাতীয় গর্বের স্থল হইয়া আছে। হিমালয় অগম্য হইলেও দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আমরা বেদান্ত দেখি নাই।

বেদান্ত লইয়া আমাদের গর্বের কথা বলিলাম, কিন্তু বেদান্ত যে আবার এক ভয়াবহ দর্শন বলিয়া কোন সময়ে পরিত্যক্ত হইয়াছিল সেকথাও স্মরণ করিতে হয়। বস্তুতঃ বিবেকানন্দের বেদান্তব্যাখ্যার মর্ম বুঝিতে হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেদান্তবর্জনের তাৎপর্যও বুঝিতে হয়। তবে এই অনুসন্ধান বড় সোজা বলিয়া মনে হয় না। কারণ যে বেদান্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যাখ্যান করিলেন, আর যে বেদান্ত বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা অভিন্ন নাও হইতে পারে। শঙ্করের বেদান্তও বেদান্ত, আবার রামানুজের বেদান্তও বেদান্ত, কিন্তু এই দুই বেদান্ত কি এক বস্তু? আমরা যদি কোন বেদান্ত-শাস্ত্রবিদ্‌কে জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়, আপনি আপনার শাস্ত্রগ্রন্থখানিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিন—তাহা হইলে তিনি কোন্ গ্রন্থখানি দেখাইয়া দিবেন? যদি বলি তিনি বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থখানিকে তাঁহার তত্ত্বের আধার বলিয়া অঙ্গীকার করিবেন তাহা হইলে গোলমাল মিটিবে না। কারণ উপনিষদ্‌কে আমরা বেদান্তের শাস্ত্র বলিতে পারি না। যদি 'ব্রহ্মসূত্র'কে বেদান্তের সার বলিয়া মানিতে হয় তাহা হইলে উপনিষদ্‌কে ইহার মূল বলিতে হয়। অপরপক্ষে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্-আশ্রয়ী ভর্তৃপ্রপঞ্চের তত্ত্বকে যেমন বেদান্ত বলিতে হয়, গৌড়পাদের 'মাণ্ডূক্যকারিকা'কেও সেইরূপ বেদান্ত বলিতে হয়।

বেদান্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ ধরিয়া বলিতে পারি বেদান্ত কি, না যাহা বেদের অন্তে প্রাপ্য—অর্থাৎ বেদ যাহাতে পরিণত। কিন্তু যদি বলি অমুকে বেদান্ত পড়িয়াছেন তখন তিনি কি পড়িয়াছেন বুঝিব? তিনি যদি উপনিষদ্ পড়েন তাহা হইলে যেমন বলিতে পারি তিনি বেদান্ত পড়িয়াছেন তেমন যদি তিনি 'ব্রহ্মসূত্র' পড়িয়া থাকেন তাহা হইলেও বলিতে পারি তিনি বেদান্ত পড়িয়াছেন। এমন কি তিনি যদি Deussen বা Max Muller-এর বেদান্ত সম্বন্ধে বই পড়িয়া থাকেন তাহা হইলেও তিনি বেদান্তই পড়িয়াছেন। কিন্তু শব্দটি এমন ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিলে বেশ গোলযোগের সম্ভাবনা।

কেহ হয়তো উপনিষদ্ পড়িয়া তাহার তত্ত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু শঙ্করের ভাষ্য গ্রহণ করিলেন না। এমন লোক সম্বন্ধে বলিতে পারি না যে তিনি বেদান্তই গ্রহণ করেন নাই। কারণ উপনিষদ্ও বেদান্ত, শঙ্করভাষ্যও বেদান্ত। অপরপক্ষে একথা বলিতে পারি না যে, উপনিষদের তত্ত্ব ও শঙ্করবেদান্ত সকলের কাছে এক বস্তু। এই অসুবিধাটি দূর করিবার জন্য বলিব, বেদান্ত কি, না উপনিষদ্। পণ্ডিতসমাজে ব্রহ্মসূত্রকে বেদান্ত বলা হয় এই অর্থে যে, উপনিষদের তত্ত্ব ইহাতে বিধৃত হইয়া আছে। এই ব্রহ্মসূত্রের অপর নামগুলি হইল বেদান্ত-মীমাংসা, বেদান্তসূত্র, ব্যাসসূত্র, বাদরায়ণসূত্র, শারীরক সূত্র, উত্তরমীমাংসা, ঔপনিষদি মীমাংসা ইত্যাদি। কিন্তু এই গ্রন্থকে বেদান্ত বলিতে পারি না, কারণ ইহা উপনিষদের ন্যায় শ্রুতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তবে ইহা শ্রুতির ন্যায় অপৌরুষেয় না হইলেও ঋষি-প্রণীত বলিয়া শ্রদ্ধেয়। উপনিষদের মধ্যেই উপনিষদ্ বেদান্ত বলিয়া কথিত। যেমন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছেঃ

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥[১]

—উপনিষদ্সমূহে পরমপুরুষার্থরূপ অতি গুহ্য তত্ত্ব পূর্বকল্পে উপদিষ্ট হইয়াছিল। যে শান্ত নহে এবং পুত্র বা শিষ্য নহে, তাহাকে ইহা প্রদেয় নহে।

মুণ্ডকোপনিষদেও বেদান্ত ও উপনিষদ্ অভিন্ন।[২]

তাহা হইলে উপনিষদের ঋষির কথায় আমরা উপনিষদ্কেই বেদান্ত বলিব এবং 'বেদান্তসূত্র' এবং তাহার ভাষ্যসমূহকে বেদান্তশাস্ত্র বলিব। অমুকে বৈদান্তিক বলিতে বুঝিব তিনি উপনিষদের তত্ত্বকে পরমতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সে তত্ত্ব শঙ্করের বিশুদ্ধ বা নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ হইতে পারে, রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ হইতে পারে, মধ্বের দ্বৈতবাদ হইতে পারে অথবা তাহা তাঁহার নিজের কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে। বিবেকানন্দের বেদান্ত-মত কি প্রকৃতির সেই সংবাদ লইবার পূর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীতে চিন্তাশীল বাঙালীর বেদান্ত-মতটি বুঝিয়া লইতে হইবে।

ঐ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দেখি রাজা রামমোহন রায় বেদান্তের এক বিশেষ অধ্যাপক। 'বেদান্ত গ্রন্থে'র ভূমিকায় তিনি লিখিলেনঃ '...যদি রূপগুণবিশিষ্ট কোন দেবতা কিংবা মনুষ্য বেদান্তশাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন তবে বেদান্ত পঞ্চাশদধিক পাঁচ শত সূত্রে কোন স্থানে-সে দেবতার কিংবা মনুষ্যের প্রসিদ্ধ নামের কিংবা রূপের বর্ণন অবশ্য হইত...।'[৩] ঐ বৎসরেই 'বেদান্তসার' গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি লিখিলেনঃ 'সমুদয় বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে জানা অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে ইহার উল্লেখ বেদান্তের প্রথম সূত্রে ভগবান বেদব্যাস করিয়া শ্রুতি এবং শ্রুতিসম্মত বিচারের দ্বারা দেখিলেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ কোন মতে জানিতে পারা যায় না অর্থাৎ ব্রহ্ম কি আর কেমন এমত নিদর্শন হইতে পারে না...।'[৪] এই দুই উক্তি হইতে বুঝিলাম (১) রামমোহন বেদান্ত

১। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৬।২২ ২। মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।২।৬

৩। রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৪), 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য। ৪। তদেব, পৃঃ ১১৭

বলিতে ব্রহ্মসূত্রকেই বুঝিতেন। (২) উপনিষদ্‌কে শ্রুতি বলিয়া মানিতেন (অবশ্য ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে রামমোহন উপনিষদ্‌কেও বেদান্ত আখ্যা দিতেন না। বরং তাঁহার গ্রন্থসমূহ পড়িয়া বুঝি তিনি উপনিষদ্‌কে বেদান্ত বলিয়া জানিতেন।) (৩) তাঁহার বেদান্তমত ব্রহ্মসূত্রাশ্রিত। (৪) বেদান্তের ব্রহ্ম অরূপ ও অগম্য এই তত্ত্ব পৌরাণিক ধর্মের অলীকতা প্রমাণ করিতেছে বলিয়াই তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করিতে তৎপর।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে যিনি নিরাকার এবং জ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা অভেদ্য তাঁহার উপাসনা হইবে কিরূপে? আর তিনি যখন নির্বিকার তখন জীবের উপাসনায় তিনি হৃষ্ট হইতে পারেন না। আর জীব যদি তাঁহার উপাসনা হইতে বিরত থাকে তাহা হইলেও তিনি অহৃষ্ট হইতে পারেন না। এই বুদ্ধিতে বেদান্তের ব্রহ্ম জীবের ধার ধারেন না আর জীব যদি ব্রহ্মের ধার না ধারেন তাহা হইলে ধর্মহানি হয় না। অর্থাৎ বেদান্তের ব্রহ্মকে লইয়া ধর্মজীবন গড়িয়া লইতে পারি না। তাঁহাকে লইয়া ঘর করিতে পারিবে না এবং বনে গিয়াও তাঁহার সন্ধান পাইবে না। রামমোহনের ধর্ম-নিদর্শনের মূলতত্ত্ব এই যে তিনি বেদান্তের এই নিরাকার নির্বিকার ব্রহ্মকে উপাস্য ঈশ্বর বলিয়া বুঝাইয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রামমোহনের বৈদান্ত-মূল ধর্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার অভিপ্রায় এই যে রামমোহনের এই বৈদান্তিকতা এমন কি ব্রাহ্মসমাজেও গ্রাহ্য হয় নাই। বেদান্ত ছয় দর্শনের সার দর্শন, কিন্তু বেদান্ত লইয়া বাঙালী বড় গোলে পড়িল। ভক্তিরসে আপ্লুত বাঙালী হৃদয়ে উহার স্থান হইল না। দেবেন্দ্রনাথের কাছে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ বড় অদ্ভুত ঠেকিল। শঙ্করাচার্যের শারীরক মীমাংসায় জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধান্তের কথা পাইয়া তিনি বেদান্ত বর্জন করিলেন। তিনি বুঝিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ ছাড়া ধর্ম হয় না। বেদান্তে যখন সেই সম্বন্ধ অসম্ভব তখন উহাকে বাদ দিয়া অন্য তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রাহ্মধর্ম গড়িয়া তুলিতে হইবে। তারপর তিনি যখন বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে সোহহস্মি ও তত্ত্বমসি প্রভৃতি কথা পাইলেন তখন তিনি উপনিষদে কিছুটা আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রনাথের এই মনোভাবের কথা তাঁহার জীবনীকার বেশ সরল করিয়া বুঝাইয়াছেন। স্বামীজীর বেদান্ত-ব্যাখ্যার মূল বুঝিতে হইলে দেবেন্দ্রনাথের বেদান্তে আপত্তির কথাটি আগে বুঝিতে হইবে বলিয়া অজিতকুমারের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিলাম: 'তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, বেদ ছাড়িয়া তিনি প্রামাণ্য এগারোটি উপনিষদের উপরে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিস্থাপন করিবেন। কিন্তু এ কৈবল্য মুক্তির আদর্শ তো কখনই ধর্মের আদর্শ হইতে পারে না—ইহাতে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ থাকে কোথায়? ইহাতে ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তি জাগে কোথায়? সুতরাং উপনিষদ্-বেদান্তের এই একটি প্রধান তত্ত্বের অংশ দেবেন্দ্রনাথকে একেবারেই বাদ দিতে হইল। এ যে বাদ, এ এক হিসাবে বেদান্তের, অন্ততপক্ষে শাঙ্কর বেদান্ত দর্শনের একটি মূল তত্ত্বকেই বাদ।'[৫] এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্ পড়িবার পূর্বে শাঙ্কর বেদান্ত পড়িয়াছিলেন এবং শাঙ্কর বেদান্তের মূলতত্ত্ব উপনিষদের মূলতত্ত্ব হইতে অভিন্ন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কেহ যদি পল ডসন-এর On

৫। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অজিতকুমার চক্রবর্তী, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯১৬, পৃঃ ১৯৭

the philosophy of the Vedanta পড়িয়া উপনিষদের তত্ত্ব স্থির করিতে অগ্রসর হন তাহা হইলে তিনি যেমন অদ্বৈত সিদ্ধিকেই উপনিষদের সার কথা বলিয়া মনে করিবেন, শারীরক মীমাংসা পড়িয়া তারপর উপনিষদ পড়িলেও ঠিক ঐ একই ফল হইবে।

যাহা হউক আমরা দেখিতেছি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বেদান্ত লইয়া বড় গোল। রামমোহন বেদান্ত গ্রহণ করিলেন, দেবেন্দ্রনাথ বেদান্ত বর্জন করিলেন, এই সোজা কথাটি বুঝিলেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বেদান্তের অবস্থা বুঝা যাইবে না। সে যুগের বেদান্তচর্চার পূর্ণ ইতিহাস রচিত হইলে দেখিব যে, বেদান্তের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ লইয়া বাঙালীর মন কিভাবে দ্বিধা ও সংশয়ের মধ্যে পড়িয়াছিল। এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, রামমোহন পর্যন্ত কোন সময়ে বেদান্তের অপ্রশংসা করিয়াছিলেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশিত হইবার আট বৎসর পর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টের নিকট লিখিত শিক্ষা সম্বন্ধে এক পত্রে লিখিলেন : 'Neither can much improvement arise from such speculations as the following, which are the themes suggested by the Vedanta : In what manner is the soul absorbed into the deity ? What relation does it bear to the divine essence ? Nor will youths fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence ; that as father, brother, etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better.'[৬] অনুমান করিতে পারি, মেকলে সাহেব যখন তাঁহার Education Minute-এ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫) 'Mysteries of absorption in the Deity' লইয়া উপহাস করিলেন, তখন তিনি রামমোহনের এই চিঠিখানির কথা স্মরণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসের এক বিচিত্র বিধানে বেদান্তবাদী ভারতীয় বেদান্তে অবিশ্বাসী ইংরাজের সহায় হইলেন। আবার যেকথা রামমোহন বলিলেন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই কথা ৩০ বৎসর পর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বলিলেন বিদ্যাসাগর। কাশীর সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর ব্যালান্টাইনের নিকট লিখিত এক পত্রে তিনি বলিলেন : 'That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute.'[৭]

অক্ষয়কুমার দত্ত দেখি বেদান্তের নানা ভাষ্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন ভাষ্যতেই বিজ্ঞানসম্মত বিচার নাই। ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্র, শঙ্করাচার্যকৃত শারীরক-মীমাংসা ভাষ্য, সদানন্দকৃত বেদান্তসার, মধুসূদনকৃত বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিন্দু ও বেদান্ত কল্পলতিকা

৬। The English Works of Raja Rammohun Roy, Part-IV, Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, 1947, p. 107

৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫০), পৃঃ ১৩২

প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসঙ্গে তিনি লিখিলেন ঃ 'উল্লেখিত দার্শনিক গ্রন্থকারেরা অনেকেই সতেজ বুদ্ধির সুস্পষ্ট বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি তত্ত্বানুসন্ধানে প্রকৃত পন্থাবলম্বন পূর্বক বিশুদ্ধ বিজ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে পারিতেন, তবে বহুকাল পূর্বে ভারতভূমিও ইউরোপভূমির ন্যায় এ অংশে ভূস্বর্গ পদে অধিরূঢ় হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিশ্বের যথার্থ প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়মাবলী নির্ধারণপূর্বক কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণের নিশ্চিত উপায় কেবল আপনাদের অনুধ্যান বলে দুই একটি প্রকৃত মতের সহিত অনেকগুলি মনঃকল্পিত মত উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের একটি পথ প্রদর্শকের অভাব ছিল। একটি বেকন, একটি বেকন, একটি বেকন তাঁহাদের আবশ্যক ছিল।'[৮] অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যে দর্শনকে বিদ্যাসাগর ভ্রমাত্মক বলিলেন, প্রায় ৩০ বৎসর পরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার সেই দর্শনের ভাষ্যকারদের ভ্রমাত্মক বলিলেন। ১৮২৩ হইতে ১৮৮২ এই ৬০ বৎসরের মধ্যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বেদান্তমতের নিন্দা করিলেন।

অন্যদিকে পাদরিদের বেদান্ত-নিন্দার ফলে হিন্দুসমাজ এই সময়ে বেদান্তের বড় পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাফ্ India and India's Missions গ্রন্থে বেদান্তকে অর্থহীন এবং নীতিহীন বলিয়া প্রমাণ করিতে তৎপর হইলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবরে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' উহার প্রতিবাদ বাহির হইলে খ্রীষ্টীয় পক্ষ Calcutta Review, Christian Herald, Friend of India প্রভৃতি পত্রিকায় বেদান্তের কুৎসা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ ১৮৪৪-এই হিন্দুপক্ষ Vedantic Doctrines Vindicated নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কেহ কেহ মনে করেন এই গ্রন্থ রাজনারায়ণ বসুর রচনা। লেনার্ভ সাহেব তাঁহার A History of Brahmo Samaj গ্রন্থে রামমোহনের বন্ধু চন্দ্রশেখর দেবকে এই গ্রন্থের লেখক বলিয়াছেন। খুব সম্ভব ইহা দেবেন্দ্রনাথের সাহায্যেই চন্দ্রশেখর রচনা করেন। দেখা যাইবে যে পাদরির আক্রমণ হইতে বেদান্তের মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে বেদান্তবাদীরা রামমোহনের যুক্তিই অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, যে-তত্ত্বকে পাদরির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা হইল তাহাকেই কিছু পরে বর্জন করিতে হইল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিলেন ঃ 'আবার যখন উপনিষদে দেখিলাম, ব্রহ্মোপাসনার ফল নির্বাণমুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করিল। "কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি।" কর্মসকল এবং বিজ্ঞানময় আত্মা, অব্যয় পরব্রহ্মে সকলই এক হয় ; ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, বিজ্ঞানাত্মার আর পৃথক সংজ্ঞা থাকে না, তবে ইহা তো মুক্তির লক্ষণ নহে, ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ। কোথায় ব্রাহ্মধর্মে আত্মার অনন্ত উন্নতি, আর কোথায় এই নির্বাণমুক্তি! উপনিষদের এই নির্বাণমুক্তি আমার হৃদয়ে স্থান পাইল না।'[৯] ইহা ১৮৪৮-এর কথা অর্থাৎ Vedantic Doctrines Vindicated গ্রন্থের চার

৮। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ—অক্ষয়কুমার দত্ত, পাঠভবন, কলিকাতা, ১৮৮২, পৃঃ ৫১-২

৯। আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৯৬২), পৃঃ ১২৮

বৎসরের পরের কথা। বেদান্তের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধ হইয়া পাদরি যেকথা বলিয়াছিলেন ধর্মপ্রবণ দেবেন্দ্রনাথ প্রায় সেই কথাই পরে বলিলেন। বাঙালী পাদরি রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'ষড়দর্শন সংবাদ' গ্রন্থে (১৮৬৭) বেদান্ত সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা সেকালের ব্রাহ্মদিগের নিকট বড় অযথার্থ মনে হয় নাই। শাঙ্কর মতের প্রসঙ্গে কৃষ্ণমোহন লিখিলেনঃ 'শঙ্করের মতে আত্মাতে অবিদ্যারোপ করা অবিদ্যার কার্য সুতরাং বস্তুত আত্মা অবিদ্যা সংযুক্ত নহেন, তিনি যদি অবিদ্যা যোগ ব্যতীত সৃষ্টি করিতে না পারেন তবে তো তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা বলাও অবিদ্যার কার্য সুতরাং অবিদ্যা একাকিনী জগৎজননী হইলেন।' বৈদান্তিকদের সরল ভাব থাকিলে স্পষ্টরূপে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতেন। এ সিদ্ধান্ত কাপিল সিদ্ধান্ত হইতে বড় পৃথক নহে, তবে কিনা কপিলের সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধোক্তি নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরাজ ধর্মবিদ্ এ. এইচ. বোম্যান বেদান্তের তত্ত্ব সম্বন্ধে যে আপত্তি তুলিয়াছিলেন উহাকে আমরা দেবেন্দ্রনাথের বেদান্ত-ব্যাখ্যার পুনরুক্তি বলিয়া ধরিতে পারিঃ 'All that he can say is that the individual soul will sink into and blend with the Absolute Being, as a drop of water returns to and mingles with its mother ocean. Such a hypothetical condition may be attractive to the speculation of the philosophers, but such a condition of being, of which we can know absolutely nothing, can never inspire hope, or kindle ambition.'[১০]

অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে বেদান্তপন্থী গত শতাব্দীতে কেহই ছিলেন না এমন কথা বলিতে পারি না। নব্য হিন্দুর দল অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি বেদান্তে আস্থাশীল, কিন্তু তাঁহারা সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র মন্থন করিয়া একটি সুস্পষ্ট বেদান্ত-মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। বোধহয় বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয়ও তেমন ছিল না। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেনঃ '. . .in the early eighties of the last century, our people had hardly any knowledge of the *Shareeraka Bhashya*, and neither Pandit Sashadhar nor Pandit Shree Krishna Prasanna seemed to have had any knowledge of these old Hindu exegetics. Their position was practically an agnostic position: Brahman is unknown and unknowable.'[১১] ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ধর্মবিদ্‌গণ বেদান্ত বর্জন করিলেন, নব্য হিন্দুসমাজের সনাতনপন্থীগণ ব্রহ্মের নিন্দা করিলেন, কিন্তু বেদান্তের অভ্রান্ততা সার্থকভাবে প্রমাণ করিতে পারিলেন না। বরং বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মপক্ষের নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'ধর্মজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে যেমন তত্ত্বজ্ঞতা ও বিচারশীলতার পরিচয় দিয়াছেন সেরূপ

১০। Christian Thought and Hindu Philosophy—Arthur H. Bowman, The Religious Tract Society, London, 1917, p. 91

১১। Memories of My Life and Times—Bipin Chandra Pal, Modern Book Agency, Calcutta, 1932, p. 442

নব্যহিন্দুদের মধ্যে কেহ দিতে পারেন নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী 'তত্ত্বকৌমুদী'তে (১৮৯০) এবং সীতানাথ তত্ত্বভূষণ 'ব্রহ্মতত্ত্বে' (১৮৯৬) এই গ্রন্থের যে প্রশংসা করিয়াছেন তাহা যথার্থ স্বীকার করিয়াও বলিতে হয় যে, নগেন্দ্রনাথ ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে ভক্তিবাদের সমন্বয় করিতে পারেন নাই। বেদান্তের আশ্রয় ব্যতিরেকে সে সমন্বয় অসম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্র গীতার অবলম্বনে তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব' খাড়া করিয়াছেন। অবশ্য ইহার জন্য তাঁহাকে বেদান্তবিরোধী বলিতে পারি না। কারণ গীতার মূলতত্ত্ব ও বেদান্তের তত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখানো সম্ভব। কিন্তু বঙ্কিম বেদান্ত লইয়া বড় ব্যস্ত হন নাই। বরং বেদান্তের নির্বিকল্প, নিরুপাধি, নির্বিশেষ ও নির্গুণ ব্রহ্মকে দূরে রাখিয়া বেদান্ত-ব্যাখ্যার বড় প্রয়োজনীয়তা চুকাইলেন। বাস্তবিকপক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মের কল্পনা সম্বন্ধে তিনি 'কৃষ্ণ চরিত্রে' যাহা লিখিলেন তাহা পড়িয়া দেবেন্দ্রনাথের উক্তির কথাই মনে হইবে। ব্রাহ্ম ও নব্য হিন্দু বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যেন প্রায় এক কথাই বলিলেনঃ 'আমি জানি যে বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়াই মানেন। আমি পণ্ডিতও নহি, ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পণ্ডিতগণও আমার মতো, নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারেন না, কেননা মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি না, কেননা আমাদের সে শক্তি নাই। মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নির্গুণ, এবং এই কথার উপর একটা দর্শনশাস্ত্র গড়িতে পারি, কিন্তু যাহা কথায় বলিতে পারি, তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিত। "চতুষ্কোণ গোলক" বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু "চতুষ্কোণ গোলক" মানে তো কিছুই বুঝিলাম না। তাই হার্বার্ট স্পেন্সার এতকাল পরে নির্গুণ ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া সগুণেরও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর (something higher than personality) তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। অতএব আইস, আমরাও নির্গুণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিলে স্রষ্টা, বিধাতা, ধাতা, ত্রাণকর্তা কাহাকেও পাই না। এমন ঝকমারিতে কাজ কি ?'[১২] বঙ্কিমের সগুণবাদের প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়াছেন যে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে এই মতের পোষকতা করা হইয়াছে।[১৩] কিন্তু গীতার এস্থলে ভগবান যে বেদান্ততত্ত্বের কথা বলিলেন সে-বিষয়ে সেই কালের শ্রেষ্ঠ হিন্দু ধর্মবেত্তা যে নীরব ইহা আমাদের ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসের একটি আশ্চর্য ব্যাপার।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥[১৪]

—যাহারা ঐ অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করে, তাহাদিগকে অধিকতর ক্লেশ পাইতে হয়। কারণ দেহধারী অতিকষ্টে অব্যক্তা গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

এই ক্লেশের সাধনা সম্বন্ধে বঙ্কিম নীরব।

১২। কৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৪৮, পৃঃ ৫০-১
১৩। দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রকাশকঃ কনকেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা, ১৩৪৭, পৃঃ ৯১
১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২।৫

আমরা দেখিয়াছি ব্রাহ্মসমাজ অদ্বৈতবেদান্ত বর্জন করিয়াছে এবং হিন্দুসমাজও নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু স্বামীজীর ধর্মজীবনের আরম্ভকালে অন্ততপক্ষে দুইজনের বেদান্তপ্রীতি বেদান্তের প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শেষ জীবনে কেশবচন্দ্র সেন যে পরমহংসের প্রভাবে বেদান্ততত্ত্ব ভক্তিসাধনের মূলতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা এখন আমরা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি। কেশবের ভক্তিতত্ত্বে বৈষ্ণবপ্রভাব, খ্রীষ্টীয় প্রভাব সম্বন্ধে কম আলোচনা হয় নাই। কিন্তু কেশব যে পরে অদ্বৈততত্ত্বকে সারতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন সেকথা স্বামীজীর বেদান্ত-ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ সেপ্টেম্বরের এক প্রার্থনায় কেশবের এই অদ্বৈতবাদ পরিস্ফুট: 'বুদ্ধির অতীত দুর্জ্ঞেয় পদার্থ তুমি, একথা বিজ্ঞানবিদেরা বলেন। কে তুমি, কি তুমি, কেহই জানে না—কিছুই বুঝা যায় না। আমরা কিছু বুঝিতে পারি না। অচিন্ত্য পরব্রহ্ম। ...আমি ডুবিব হরিতে, না, হরি ডুবিবেন আমাতে? আমি যাব হরির বাড়িতে, না, হরি আসিবেন আমার বাড়িতে? একই কথা। প্রবিষ্ট আর প্রবেশ। নির্বাণ হয়ে গেল। আমি আনন্দ হয়ে গেলাম, পুণ্য হয়ে গেলাম, ব্রহ্মেতে মিশে গেলাম।'[১৫] জীব ও ব্রহ্মের এই অভেদ শাক্তের ভক্তিতত্ত্বে মিলিবে না একথা যাঁহারা বলিবেন তাঁহাদের শাক্ত সাধকের গানগুলি পড়িতে বলি। রামপ্রসাদের 'চিনি হতে চাই না মা, চিনি খেতে ভালবাসি' অবশ্য দ্বৈতবাদীর কথা। কিন্তু শাক্ত ঐ দ্বৈততত্ত্বে উপনীত হইয়া থামিয়া যায় নাই। উপনিষদের অবাঙ্‌মনসোগোচর ব্রহ্মের কথাও রামপ্রসাদ বলিয়াছেন:

> কে জানে গো কালী কেমন।
> ষড় দর্শনে না পায় দরশন॥
> ... ...
> প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
> আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না,
> ধরবে শশী হয়ে বামন॥[১৬]

আর অদ্বৈতসিদ্ধির ভাবও বহু গানে প্রচারিত হইয়াছে:

> প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
> এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে,
> ধর্মকর্ম সব ছেড়েছি॥[১৭]

উডরফসাহেব বলিতেন, শাক্ত বৈদান্তিক। তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা না করিয়াও বলিতে পারি বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব শাক্ত সাধনায় মিশিয়া আছে।

কেশব সেনের পর আর একজন বৈদান্তিক মিসেস অ্যানী বেসান্ত; তিনি 'থিয়োসফির' পথে ক্রমে বেদান্তে আসিয়া উপনীত হইলে বাংলা দেশে বেদান্তচর্চার উৎসাহ কিছুটা

১৫। আচার্য্য কেশবচন্দ্র, তৃতীয় খণ্ড—গৌরগোবিন্দ রায়, নববিধান প্রেস, কলিকাতা, শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃঃ ১৯১১ ১৬। রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী, বসুমতী কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩১৭, পৃঃ ৯৭
১৭। তদেব

বৃদ্ধি পায়। তবে স্বামীজীর বৈদান্তিক ভাবটির উৎস শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। তিনি ভক্তির পথেই তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। এবং এইখানেই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রভেদ। দেবেন্দ্রনাথ ভক্তিরস শুকাইয়া যাইবে এই ভয়ে অদ্বৈতবেদান্ত বর্জন করিলেন। বিবেকানন্দ ভক্তির পথেই অদ্বৈতবেদান্তে উপস্থিত হইলেন। কেশবও এই পথেই বেদান্তকে পাইয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কি বলিলেন দেখা যাউক। 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থের 'ব্রহ্ম ও জগৎ' সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি বলিলেনঃ 'তখন আবার জড়বাদের মেঘে ভারত-গগন আচ্ছন্ন হইল—সম্ভ্রান্ত লোক যথেচ্ছাচারী ও সাধারণ লোক কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইল। এমন সময়ে শঙ্করাচার্য আসিয়া বেদান্তকে পুনরুদ্দীপিত করিলেন। তিনি উহাকে একটি যুক্তিসঙ্গত বিচারপূর্ণ দর্শনরূপে প্রচার করিলেন। উপনিষদে বিচারভাগ বড় অস্ফুট। বুদ্ধদেব উপনিষদের নীতিভাগের দিকে খুব ঝোঁক দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য উহার জ্ঞানভাগের দিকে বেশী ঝোঁক দিলেন। উহা দ্বারা উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিবিচারের সাহায্যে প্রমাণিত ও প্রণালীবদ্ধরূপে লোকের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে।'[১৮] অর্থাৎ বিবেকানন্দ শাঙ্কর অদ্বৈতবাদকে বেদান্তের সারতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই কথা কয়টি বলিয়া স্বামীজী আর যাহা বলিলেন তাহা বিশেষ অর্থপূর্ণঃ 'এই দর্শন সম্পর্কে আর একটি কথা বলিব। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি অতি উচ্চ স্তরের কবিত্বে পূর্ণ। এই-সকল উপনিষদ্বক্তা ঋষিগণ মহাকবি ছিলেন। প্লেটো বলিয়াছেন—কবিত্বের ভিতর দিয়া জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। কবিত্বের মধ্য দিয়া উচ্চতম সত্যসকল জগৎকে দিবার জন্য বিধাতা যেন উপনিষদের ঋষিগণকে সাধারণ মানুষ হইতে বহু ঊর্ধ্বে কবিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রচার করিতেন না, দার্শনিক বিচার করিতেন না বা লিখিতেনও না; তাঁহাদের হৃদয় হইতে সঙ্গীতের উৎস প্রবাহিত হইত। বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি, মহৎ সর্বজনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষ্ণুতা; তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য উহাকে যুক্তির প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এখন চাই প্রখর জ্ঞানের সহিত বুদ্ধদেবের এই হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও করুণা সম্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, ইহা যুক্তিমূলক হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, গভীর প্রেম ও করুণার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চনযোগ হইবে, তবেই বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরকে কোলাকুলি করিবে। ইহাই ভবিষ্যতে ধর্ম হইবে, আর যদি আমরা উহা ঠিক ঠিক গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে, উহা সর্বকাল ও সর্বাবস্থার উপযোগী হইবে।'[১৯]

বিবেকানন্দ শাঙ্করমত গ্রহণ করিলেন, কিন্তু উপনিষদ্‌কেই তত্ত্বের জ্ঞান করিলেন ও বলিলেন যে উপনিষদে তত্ত্ব ও কাব্য একাকার হইয়া আছে।

অদ্বৈতবাদের মহিমা কীর্তন করিয়া স্বামীজী দ্বৈতবাদের সঙ্কীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা

১৮। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১০৩
১৯। তদেব, পৃঃ ১০৪

দেখাইলেন ঃ 'পৃথিবীর সকল দ্বৈতবাদী স্বভাবতই এমন এক সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন যিনি একজন উচ্চশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যমাত্র এবং মানুষের যেমন কতকগুলি প্রিয়পাত্র থাকে আবার কতকগুলি অপ্রিয় ব্যক্তি থাকে, দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরেরও তেমনি আছে। ...আপনার দ্বৈতবাদাত্মক এমন কোন ধর্ম দেখান, যাহার ভিতর এই সঙ্কীর্ণতা নাই। ...গভীর চিন্তায় অক্ষম সাধারণ লোক সকল দেশেই দ্বৈতবাদী হইয়া থাকে।'[২০]

এই অদ্বৈতমতে ভালমন্দের বিচার নাই, এই আপত্তির উত্তরে স্বামীজী বলেন ঃ 'বেদান্ত বলে শুধু ভালমন্দেরই অস্তিত্ব আছে, তাহা নহে। ইহাদের পশ্চাতে এমন জিনিস রহিয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমার, যাহা তোমার স্বরূপ; যাহা সর্বপ্রকার শুভ ও সর্বপ্রকার অশুভের বাহিরে—সেই বস্তুই শুভ বা অশুভরূপে প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমে এই তত্ত্ব জানো,—তখন—কেবল তখনই তুমি পূর্ণ সুখবাদী হইতে পারিবে, তাহার পূর্বে নহে।'[২১]

বেদান্তের মায়াবাদ পার্থিব জীবনের প্রতি উদাসীন এই আপত্তির উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চায় না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, তেমন আর কোথাও নাই, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ "আত্মহত্যা" নহে—নিজেকে শুকাইয়া ফেলা নহে। বেদান্তের বৈরাগ্যের অর্থ "জগতের ব্রহ্মভাব"—জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি, উহাকে আমরা যেমন জানি, উহা যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ত্যাগ কর এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও। জগৎকে ব্রহ্মভাবে দেখ—বস্তুতঃ উহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই কারণেই আমরা প্রাচীনতম উপনিষদে—বেদান্ত সম্বন্ধে লিখিত প্রথম পুস্তকে—দেখিতে পাই, "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং"—জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে।'[২২]

অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আর এক আপত্তি এই যে, জ্ঞানসাধ্য অভেদ উপলব্ধিতে ভক্তির সন্ধান নাই। এই আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে ভক্তিযোগ গ্রন্থে। এবং ভক্তিতত্ত্বের প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ শাঙ্কর বেদান্তেরই উল্লেখ করিলেন। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিলেন ঃ 'তথা হি লোকে "গুরুমুপাস্তে", "রাজানমুপাস্তে" ইতি চ যস্তাৎপর্য্যেণ গুর্বাদীননুবর্ততে, স এবমুচ্যতে। তথা ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি—যা নিরন্তরস্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা, সৈবমভিধীয়তে।' —লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে,—অমুক গুরুর ভক্ত, অমুক রাজার ভক্ত। যে গুরুর বা রাজার নির্দেশানুবর্তী হয়, ও সেই নির্দেশানুবর্তনকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করে তাহাকেই ঐরূপ বলিয়া থাকে—'পতিপ্রাণা স্ত্রী বিদেশাগত পতির ধ্যান করিতেছে।' এখানেও এইরূপ সাগ্রহ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিই লক্ষিত হইয়াছে। স্বামীজী ইহাকেই শঙ্করের ভক্তিতত্ত্ব বলিয়াছেন। পূজার্চনা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ যেমন রামানুজের উল্লেখ করিয়াছেন তেমন শঙ্করেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের পঞ্চম সূত্রের শঙ্করভাষ্যে আছে ঃ '...আদিত্যাদ্যুপাসনেঽপি ব্রহ্মৈব দাস্যতি সর্বাধ্যক্ষত্বাৎ...।

২০। তদেব, পৃঃ ১০৬-০৭ ২১। তদেব, পৃঃ ১৫৬ ২২। তদেব, পৃঃ ১৬৮

ঈদৃশঞ্চাত্র ব্রহ্মণোপাস্যত্বং, যৎ প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যা ধ্যারোপণং প্রতিমাদিম্বিব বিষ্ণ্বাদীনাম্।'
—আদিত্যাদি উপাসনার ফল ব্রহ্মই দেন, কারণ তিনি সকলের অধ্যক্ষ। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু-আদি দৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, সুতরাং এখানে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

বাস্তবিকপক্ষে হীন ধর্মাচরণের পক্ষপাতী হইয়া এবং লোকধর্মের প্রতি মূঢ় আসক্তি বশতঃ আমরা আজ বহুকাল শঙ্করকে এক অদ্ভুত ও অসম্ভব তত্ত্বের প্রবক্তা করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু যদি আবার ভারতবর্ষে খাঁটি ভক্তিরসের সঞ্চার হয়, যদি কোনদিন অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকার দূর হয় এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতের সমস্ত জনপদ ও অরণ্য আবার বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়, তখন যে মহাত্মার মূর্তি সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে সে মূর্তি আচার্য শঙ্করের মূর্তি। আমরা আজ বিস্মৃত হইয়াছি তিরোভাবের পূর্ব মুহূর্তে আচার্য তাঁহার চারি শিষ্য পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক ও তোটককে ভারতের চারিদিকে চারিটি মঠ সংস্থাপন করিয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রচার করিবার অনুজ্ঞা দিয়াছিলেন। যাঁহার শেষ ইচ্ছা মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা, তাঁহার ধর্মচিন্তাকে অনধিগম্য বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে পারি না। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', ইত্যাদি মন্ত্রকে যিনি সাধনভজনের পরিপন্থী বলিবেন তিনি শঙ্করের গোঁড়া হইবেন না। যিনি দ্বৈতবাদীর পক্ষ টানিয়া ঈশ্বরকে স্নেহশীল মাতামহের স্থানে বসাইবেন বা নির্মম শাসনপরায়ণ গুরুমহাশয় করিয়া তুলিবেন তিনি এই অদ্বৈততত্ত্বকে ধর্মতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন। শঙ্কর মতের যথার্থ ব্যাখ্যা এই দ্বিধা দূর করিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই ব্যাখ্যা উপস্থিত করিয়া অদ্বৈতের মাহাত্ম্য প্রকট করিলেন। তিনি দেখাইলেন সোঽহং মন্ত্রে ভক্তির অবসান নয়, ভক্তির পরিণতি। এবং তাঁহার মতে এই তত্ত্বই হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলেন ঃ '...বেদান্তই কার্যতঃ হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থ, এবং ভারতীয় দর্শনে যতগুলি আস্তিক মতবাদ আছে, তাহাদের সবগুলিকেই স্বীয় ভিত্তিরূপে বেদান্তকে গ্রহণ করিতে হয়। এমনকি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপযোগী হইলে বৌদ্ধ এবং জৈনেরা পর্যন্ত প্রমাণরূপে বেদান্তের বাক্য উদ্ধৃত করেন।'[২৩]

আমেরিকায় প্রদত্ত আর একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন ঃ 'আমি এদেশে একটি ভারতীয় দর্শনমতের প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলাম; তাহা বেদান্ত-দর্শন নামে পরিচিত। ...বহু শতাব্দী ধরিয়া সংগৃহীত এবং সংকলিত সেই বিশাল সাহিত্যে যেসব উপলব্ধি, তত্ত্বালোচনা, বিশ্লেষণ এবং অনুধ্যান সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, ইহা যেন তাহা হইতেই প্রস্ফুটিত একটি সুকোমল পুষ্প।... পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া বহু দর্শনমত ও ধর্মতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে—যথা বৌদ্ধধর্ম কিংবা আধুনিককালের কয়েকটি ধর্মমত। ...কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের স্থান যাবতীয় ধর্মমতের পটভূমিকায়। বেদান্তের সহিত পৃথিবীর কোন ধর্ম বা দর্শনের বিবাদ-বিসংবাদ নাই।'[২৪]

২৩। তদেব, পৃঃ ৪৪২ ২৪। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ৩২৫-২৬

বস্তুতঃ বিদেশে বেদান্ত প্রচার করিতে যাইয়া স্বামীজী অদ্বৈততত্ত্বের সার্বভৌমিকতা এমন গভীরভাবে বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি ইহাকে সর্ব ধর্মের মূল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। স্বামীজীর বিদেশ ভ্রমণের বড় লাভ বেদান্তের এই মাহাত্ম্যের আবিষ্কার।

'বেদান্ত একটি মৌলিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করিয়াছে এবং বেদান্ত দাবি করে যে, উহা পৃথিবীর সব ধর্মমতের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। এই তত্ত্বটি হইল এই যে, মানুষ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন; আমরা আমাদের চতুষ্পার্শ্বে যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই সেই ঐশী চেতনা হইতে প্রসূত।'[২৫]

মানুষের গভীরতম ও মহত্তম অনুভূতি অদ্বৈতের অভিমুখী। 'জীবনে এরূপ অনেক মুহূর্ত আসে, যখন প্রত্যেক মানুষই অনুভব করে যে, সে বিশ্বের সহিত এক ও অভিন্ন, এবং সে জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক এই অনুভূতিই জীবনে প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই ঐক্যের প্রকাশকেই আমরা প্রেম ও করুণা নামে অভিহিত করিয়া থাকি এবং ইহাই আমাদের সমস্ত নীতিশাস্ত্র ও সততার মূলভিত্তি। বেদান্ত-দর্শনে ইহাকেই "তত্ত্বমসি"—"তুমি সেই"—এই মহাবাক্যে সূত্রাকারে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

'প্রত্যেক মানুষকে বেদান্ত এই শিক্ষাই দেয়—সে এই বিশ্বসত্তার সহিত এক ও অভিন্ন; তাই যত আত্মা আছে, সব তোমারই আত্মা; যত জীবদেহ আছে, সব তোমারই দেহ; কাহাকেও আঘাত করার অর্থ নিজেকেই আঘাত করা এবং কাহাকেও ভালবাসার অর্থ নিজেকেই ভালবাসা। তোমার অন্তর হইতে ঘৃণারাশি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অপর কাহাকেও তাহা আঘাত করুক না কেন, তোমাকেই আঘাত করিবে নিশ্চয়। আবার তোমার অন্তর হইতে প্রেম নির্গত হইলে প্রতিদানে তুমি প্রেমই পাইবে, কারণ আমিই বিশ্ব—সমগ্র বিশ্ব আমারই দেহ। আমি অসীম, তবে সম্প্রতি আমার সে অনুভূতি নাই। কিন্তু আমি সেই অসীমতার অনুভূতির জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং যখন আমাতে সেই অসীমতার পূর্ণ চেতনা জাগরিত হইবে, তখন আমার পূর্ণতা-প্রাপ্তিও ঘটিবে।'[২৬]

এই অদ্বৈতবাদ হইতে স্বামীজী সাম্যবাদে উপনীত হইলেন। যেখানে জীবে ব্রহ্মে ভেদ নাই সেখানে জীবে জীবে ভেদ নাই। '...অতি মূর্খ মানব, অতি অজ্ঞান শিশুও ঈশ্বরপ্রেরিত, এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা মহামানব হইবেন, তাঁহারা তাহাদেরই মতো; মূর্খতম ও অজ্ঞানতম মানবগণও সমভাবে মহান। প্রত্যেক জীবের অন্তস্তলে চিরকালের জন্য সেই অনন্ত শাশ্বত বাণী রক্ষিত আছে। জীবমাত্রেরই মধ্যে সেই "মহতো মহীয়ান্" ব্রহ্মের অনন্ত বাণী নিহিত রহিয়াছে। ইহা তো সদা বর্তমান। সুতরাং অদ্বৈতের কাজ হইল এইসকল অধিকার ভাঙিয়া দেওয়া।'[২৭]

আমেরিকা প্রবাসে স্বামীজী বেদান্ত সম্বন্ধে কি ভাবিতেন তাহা আলাসিঙ্গাকে লিখিত একখানি পত্রে সুস্পষ্ট করিয়া বলিলেন: 'এখন তোমাদের কাছে আমার নূতন আবিষ্কারের কথা বলছি। ধর্মের যা কিছু সব বেদান্তের মধ্যেই আছে, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই তিনটি স্তরে আছে, একটির পর একটি এসে থাকে। এই

২৫। তদেব, পৃঃ ৩২৬ ২৬। তদেব, পৃঃ ৩২৮ ২৭। তদেব, পৃঃ ৩৩৯

তিনটি মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভূমিকা। এদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে। এই হল ধর্মের সারকথা। ভারতের বিভিন্ন জাতির আচার-ব্যবহার মত ও বিশ্বাসে প্রয়োগের ফলে বেদান্ত যে রূপ নিয়েছে, সেইটি হচ্ছে হিন্দুধর্ম; এর প্রথম স্তর অর্থাৎ দ্বৈতবাদ—ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাবের ভেতর দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে খ্রীষ্টধর্ম, আর সেমেটিক জাতিদের ভেতর হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান ধর্ম; অদ্বৈতবাদ উহার যোগানুভূতির আকারে হয়ে দাঁড়িয়েছে বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি। এখন "ধর্ম" বলতে বুঝায় বেদান্ত। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে তার প্রয়োগ অবশ্যই বিভিন্ন হবে।'[২৮] ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২ আগস্ট তারিখের এক পত্রে তিনি লিখিলেনঃ '...মানুষ যখন বেদান্তের মহিমা বুঝিতে পারে, তখনই তাহাদের হিজি-বিজি ধারণাগুলি দূর হইয়া যায়।'[২৯]

বিবেকানন্দ যে সর্ব মানবের এক ধর্ম কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাও এই অদ্বৈত-বেদান্তের ধর্ম। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুন তারিখের এক পত্রে তিনি তাঁহার এক মুসলমান বন্ধুকে লিখিলেনঃ '...কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, উহাই ভাবী শিক্ষিত মানবসমাজের ধর্ম। ...কর্মপরিণত বেদান্ত (practical Advaitism)—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সর্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টিলাভ করে নাই।'[৩০] তিনি তাঁহার শিষ্য ও সহকর্মীদের এই সার্বজনীন ধর্মই প্রচার করিতে আহ্বান করিয়াছিলেনঃ 'ঐ শুন, বেদান্তদুন্দুভি ঘোষণা করিতেছে—"ভয় নাই, ভয় নাই।" সেই দুন্দুভিধ্বনি নিখিল জগদ্বাসিগণের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ হউক।'[৩১]

সমস্ত বিশ্বে সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিবেকানন্দ দেশে বিদেশে যে ধর্ম ও নীতি প্রচার করিয়াছেন তাহার উৎস এই অদ্বৈতবেদান্ত। এবং যদি পৃথিবীতে কোন দিন সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে এই তত্ত্বের আশ্রয়েই হইবে। মানুষের ভয়ে মানুষ দায়ে পড়িয়া যে সাম্যনীতি মানিয়া লয় তাহা সেই দায় ফুরাইলে আর টিকিতে পারে না। বিনাশের ভয়ে যে আন্তর্জাতিক ঐক্য আমরা আজ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি তাহাও কোন দিন যথার্থ ঐক্যের সন্ধান দিবে না। ঈশ্বরের ভয়ে বা তাঁহার কৃপা লাভ করিবার আশায় যেটুকু ঐক্য ও সাম্যের কথা মুখে বলি বা নিজেদের গা বাঁচাইয়া কোনভাবে কার্যে দেখাই তাহাও স্থায়ী মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। অন্ধকারে অগ্রসর নাই। নিজের স্বরূপ না জানিয়া নিজের উন্নতি করিতে পারি না। জগতের স্বরূপ না জানিয়া জগতের উন্নতি করিতে পারি না। নিজের আত্মার সহিত সমস্ত জীবাত্মার এবং সমস্ত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একত্ব না বুঝিলে জীবলোকের কল্যাণকল্পে এক পা অগ্রসর হইতে পারিব না। সকল নীতিনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা,

---

২৮। তদেব, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৫৭ ২৯। তদেব, পৃঃ ১৮৭

৩০। তদেব, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৮-৯

৩১। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯

সকল প্রেম ও দয়া ঐ একত্বের বোধ হইতেই নিঃসৃত হইবে। স্বামীজী বলিয়াছেনঃ 'অদ্বৈতবাদ—কেবল অদ্বৈতবাদের দ্বারাই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারে। ...অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া অবগত হও যে, অপরকে হিংসা করিতে গিয়া তুমি নিজেকেই হিংসা করিতেছ—কারণ তাহারা সকলেই যে তুমি! তুমি জানো আর নাই জানো, সকল হাত দিয়া তুমি কাজ করিতেছ, সকল পা দিয়া তুমি চলিতেছ, তুমিই রাজারূপে প্রাসাদে সুখসম্ভোগ করিতেছ, আবার তুমিই রাস্তার ভিখারীরূপে দুঃখের জীবন যাপন করিতেছ। অজ্ঞ ব্যক্তিতেও তুমি, বিদ্বানেও তুমি, দুর্বলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তুমি। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও। যেহেতু অপরকে হিংসা করিলে নিজেকে হিংসা করা হয়, সেইজন্য কখনও অপরকে হিংসা করা উচিত নহে।... কাজেই দেখিতেছ, অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি, একমাত্র ব্যাখ্যা। অন্যান্য মতবাদ তোমাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হইব, ইহার কোন হেতু নির্দেশ করিতে পারে না। ...একমাত্র অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।'[৩২] আর অদ্বৈততত্ত্বভিত্তিক সেই নীতিপরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা, প্রেম ও দয়া কখনই ফুরাইবে না, কারণ অদ্বৈত পরম সত্যকে অফুরন্ত করিয়া রাখিয়াছে। সান্ত ঈশ্বরের সঙ্গ প্রিয়জনের সঙ্গের ন্যায় কোন দিন বিরস হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু অনন্ত ঈশ্বর অনন্ত আনন্দের আধার। যদি ব্রহ্মের কৃপায় পৃথিবীতে এই অদ্বৈততত্ত্বের আবির্ভাব না হইত তাহা হইলে আমাদের এই জগৎসংসার, আমাদের সমস্ত ধর্ম-কর্ম, সমস্ত জ্ঞান ও ভক্তি বড় ক্ষুদ্র ও হীন বলিয়া মনে হইত। অদ্বৈত আমাদের অনন্তের সন্ধান দিয়া অনন্ত আশায় উদ্দীপিত করিতে পারে। আমি ঈশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইলাম ইহা আমার ভাগ্য—আমি ঈশ্বর এই বোধ আমার শ্রেষ্ঠ পরিণতি। সেই বোধে যে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার একমাত্র তাহা দ্বারাই আমাদের সার্থক আত্মোন্নতি সম্ভব। এবং এই অদ্বৈতানুগ আত্মবিশ্বাস আমাদের সর্বজীবে সমদর্শী করিতে পারে। স্বামীজী তাঁহার বেদান্ত-ব্যাখ্যায় এই সত্যটিই বুঝাইয়াছেন। নূতন জগতে নূতন ভারতবর্ষ কোন্ আদর্শ কর্মে ও কথায় প্রচার করিতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর স্বামীজীর এই বেদান্ত-ব্যাখ্যায়ই মিলিবে। অন্ততপক্ষে আজ যদি বাংলা দেশে বেদান্তকে নূতন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয় তাহা হইলে বিবেকানন্দের এই বেদান্ত-ব্যাখ্যার সংবাদ লইতে হইবে।

৩২। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩৩১-৩৩

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন

॥ ১ ॥

মানুষমাত্রেই মননশীল জীব। সকলেই আপন মনন অনুসারে জীবনকে দেখে থাকে। যার মনন নেই তার যেন জীবনই নেই, সে মানুষপদবাচ্যই নয়। প্রাচীনকালের একটি উক্তিতে আমরা পাইঃ 'স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।' সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেই যদি মননের এতখানি মূল্য দেওয়া হয়, যার উপর যেন তার মরণ-বাঁচন বা স্বকীয় সত্তাই নির্ভরশীল তখন যাঁরা মনস্বী পুরুষ তাঁদের যে একটা স্বকীয় মনন বা চিন্তাধারা থাকবে এবং সেই মননের আলোকেই তিনি জীবনকে ও জগৎকে দেখবেন, এ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। আবার তাঁদের সেই চিন্তাধারা বা দর্শনের আলোক শুধু তাঁদের নিজেদের জীবনকেই পরিচালিত করে তা নয়, তাঁদের স্বকীয় জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে তা আবদ্ধ থাকে না, সে-আলোকের পরিমণ্ডল সুদূরপ্রসারী হয়, অন্য অনেক মানুষকেও অনেকদিন ধরে তা প্রভাবিত ও পরিচালিত করে। স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে এমনই একজন মহামনস্বী মানুষ, যাঁর অভিনব চিন্তাধারাপ্রসূত স্বকীয় দর্শন এখনও তার আলোক-প্রভায় অগণিত মানুষকে, শুধু এদেশে নয় বিদেশেও, প্রভাবিত করে চলেছে। সুতরাং তাঁর দর্শনের ভিত্তি কি, তার স্বকীয়তাই বা কোথায়, বর্তমান যুগে তার মূল্য বা প্রাসঙ্গিকতাই বা কতটুকু—এসবের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ তা না হলে আমরা শুধু একটি মহাজীবনের জয়গান করেই ক্ষান্ত থেকে যাব, সেই মহাজীবনের পশ্চাৎপটে যে দর্শন বা চিন্তাধারা কাজ করেছে তার দ্বারা নিজেরা উপকৃত বা লাভবান হব না অথবা এতে কোনও উপকার বা লাভ নেই, সেকথা জানারও সুযোগ পাব না। সেই কারণেই তাঁর দর্শনের অনুধ্যানে এই সামান্য প্রয়াস।

প্রত্যেক দর্শনেরই উৎস হল জীবন-জিজ্ঞাসা এবং সেই জিজ্ঞাসাও মূলত জাগে ঘাত-প্রতিঘাত থেকে, সঙ্কটের সম্মুখীনতা থেকে, বেদনাবিদ্ধ চেতনা থেকে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন কোনদিনই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়েছে। পিতার পরলোকগমনের পর সাংসারিক নানা বিপর্যয়ের তিনি সম্মুখীন হয়েছেন, রূঢ় বাস্তবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা উদগ্র করেছে। তখন তিনি কলেজে পাঠরত, শিক্ষাগ্রহণে ব্যাপৃত, জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজের পণ্ডিত, দার্শনিক ও কবি উইলিয়াম হেস্টির ছাত্র। তাঁর সহপাঠী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বিবরণ অনুযায়ীঃ 'তাঁর মানস-ইতিহাসের এক সঙ্কট-মুহূর্তের সূচনাকাল এই সময়েই; এই কালেই তিনি আত্মচেতনার জগতে জাগরিত হলেন, যার দ্বারা তাঁর ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের ভিত্তি স্থাপিত হল।...সৃষ্টির হেতুবাদী এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা তাঁর কাছে খড়কুটোর মতো নির্ভরের অযোগ্য হয়ে উঠল, এবং তিনি প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্বের সমস্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার মঙ্গলময় স্বভাবের সঙ্গে সৃষ্টির এই অমঙ্গলকে

তিনি কিছুতেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবতে পারলেন না।'[১] ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর সহপাঠী বন্ধুর তৎকালীন মানসিক সঙ্ঘাতের প্রসঙ্গে আরও বলেছেন : 'সেই একই কালে তিনি সত্তার নিভৃত আলয়ে বাসনার সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত, মায়ার সূক্ষ্ম মোহজাল ছিন্ন করতে উদ্যত। বিবেকানন্দ বারে বারে সন্ধান করতে লাগলেন সেই শক্তিকে যা তাঁকে বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে, উদ্ধার করবে এই দুষ্কর সংগ্রাম থেকে।'[২]

এখানে এই বিবরণ থেকে যেটি বিশেষ করে লক্ষ্য করবার জিনিস তা হল এই যে, জীবন-জিজ্ঞাসা হয়তো অনেকের মধ্যে জাগে কিন্তু তা জীবন-যন্ত্রণার আকারে সকলের মধ্যে দেখা দেয় না। জীবন-জিজ্ঞাসার তর্পণ বা নিবৃত্তি তাই অনেক সময় নানা চিন্তাশীল মতবাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও সম্পাদিত হয়। কিন্তু তাতে যন্ত্রণা বা বেদনার অবসান ঘটে না কারণ সে-বেদনা বন্ধনের চেতনা বা উপলব্ধি থেকে সঞ্জাত। সেই বন্ধন-মোচন কেমন করে সম্ভব তারই উপায় অন্বেষণে তখন সে একান্তভাবে তৎপর হয়। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় এঁরই নাম মুমুক্ষা বা মুক্তির ইচ্ছা। যার মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটেছে তার ভিতর মননশীলতা নিশ্চয়ই দেখা দেয় কিন্তু মননশীল সব মানুষের মধ্যে মুমুক্ষা জাগে না। এটি একটি দুর্লভ সম্পদ, যা শুধু তেমন সংবেদনশীল মানুষের মধ্যেই জেগে থাকে যার জীবন-তন্ত্রী এমনই সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত যে, সাধারণ মানুষ যাকে সুখের কোমল স্পর্শ বলে মনে করে পরম পরিতৃপ্ত হয় তা-ই তাঁর অন্তরে বেদনার প্রদাহ সৃষ্টি করে। পাতঞ্জল যোগ-দর্শনের 'দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ'[৩] এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে তাই বলা হয়েছে : 'অক্ষিপাত্রকল্পো হি বিদ্বান্।'[৪] যথার্থ বিদ্বান বা জ্ঞানী যিনি তিনি চোখের পাতার মতোই স্পর্শকাতর হয়ে থাকেন। যে লূতাতন্তু বা মাকড়সার জালের মতো কোমল জিনিস দেহের অন্য অঙ্গে বুলালে বড় আরাম লাগে তা চোখে পড়া মাত্র জ্বালার সৃষ্টি করে থাকে। তেমনি জগতের সমস্ত আপাত সুখের উপকরণ যথার্থ জ্ঞানীকে কোন আরাম দিতে পারে না, তিনি সেসবের মধ্যেও শুধু দুঃখেরই দাবদাহ অনুভব করে থাকেন। বুদ্ধির মনগড়া কোন সমাধানই তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে না, অন্তরের জ্বালা ঘুচাতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে বা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় তখনকার দিনের নানা দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। হিউমের সংশয়বাদ, হার্বার্ট স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদ, ইন্টুইশানিস্ট (প্রজ্ঞাবাদী)-দের মতবাদ, কমনসেন্স (সাধারণ বুদ্ধি)-বাদীদের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটল। কিন্তু সহপাঠী ব্রজেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন এসব 'তাঁর অবিশ্বাসকেই প্রবল করে তুলল। ...কারণ বুঝলাম, তিনি নিষ্পত্তি করতে চান ঐকান্তিকভাবে।'[৫] ব্রজেন্দ্রনাথ ভাবলেন বিবেকানন্দ

১। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৬৮-৯ ২। তদেব, পৃঃ ৭১

৩। পাতঞ্জল যোগদর্শন, সাধনপাদ, সূত্র ১৫

৪। তদেব, ব্যাসভাষ্য ; যথোর্ণাতন্তুরক্ষিপাত্রে ন্যস্তঃ স্পর্শেন দুঃখয়তি নান্যেষু গাত্রাবয়বেষু, এবমেতানি দুঃখানি অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনমেব ক্লিশ্নন্তি নেতরং প্রতিপত্তারম্।

৫। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৯

ভাববাদী, তাই যুক্তিবাদী নানা দার্শনিক মতবাদে তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারছেন না, সেজন্য বন্ধুকে তখন তিনি শেলীর প্রজ্ঞাময় সৌন্দর্যতত্ত্ব বা তার চেয়েও উচ্চতর ঐক্যতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত করালেন। তাতে 'বিবেকানন্দের বুদ্ধিকে তৃপ্ত করল এবং তা তাঁকে সংশয়বাদ ও জড়বাদের উপর জয়ের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিল। তারও বেশী, তা তাঁকে জীবনের মত-পথের দিগ্‌দর্শন করিয়ে দিল। সবই হল কিন্তু শান্তি মিলল না।'[৬]

এর থেকে এটি সুস্পষ্ট, বিবেকানন্দের জীবন-জিজ্ঞাসা ঐকান্তিক নিষ্পত্তি-সন্ধানী, শান্তি-সন্ধানী ছিল প্রথম থেকেই এবং তিনি এ-ও জানতেন যে কোন গ্রন্থ থেকে তা আহরণ করা যাবে না, 'অন্য জীবনের সহযোগ থেকে ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে' তা সংগ্রহ করতে হবে। 'প্রাণ থেকে প্রাণ, চিন্তা থেকে চিন্তার প্রজ্বলনই তাঁর প্রকৃতিসিদ্ধ'[৭], এটি বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথও লক্ষ্য করেছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁর দিকে 'সুগভীরভাবে আকৃষ্ট' হয়েছিলেন। 'প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ'[৮]—মহাকবি কালিদাসের এই সুগভীর উক্তির তাৎপর্য যেন বিবেকানন্দ মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন এবং সেই প্রজ্বলন্ত প্রদীপের জন্য ব্যাকুলভাবে সন্ধান করেছিলেন যার অনির্বাণ শিখা থেকে নিজের জীবন-দীপটি তিনি জ্বালিয়ে নিতে পারেন। সেই 'ক্লেশতিমিরবিনাশো যোগপ্রদীপঃ'[৯]-ই কেবল তাঁর অন্তরের অতলান্ত অন্ধকারকে দূর করতে পারে, এই ছিল তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।

নিরন্ন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের বুভুক্ষার মতো যখন মননশীল মানুষের মধ্যে মুমুক্ষা জাগে তখন সে ব্যাকুল হয়ে খোঁজে কোন 'রক্তহীন বিবর্ণ হেতুবাদ' নয়, 'রক্তমাংসের মূর্তি নিয়ে দর্শনীয় সত্য', 'যার বাহু তাঁকে রক্ষা করবে, উন্নীত করবে, উদ্ধার করবে এই নিষ্ফলতা থেকে—তাঁর শূন্য মনে আনবে মহিমার প্লাবন।'[১০] এরই নাম দিয়েছেন প্রাচীন শাস্ত্রে 'মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ'। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এই তিনটি দুর্লভ জিনিসেরই একত্র সমাবেশ ঘটেছিল ঃ মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষসংশ্রয়। মনুষ্যত্ব অর্থাৎ যথার্থ মানুষ হয়ে জন্মানোর ফলে তাঁর মধ্যে যেমন মননশীলতা দেখা দিয়েছিল, সেই মননশীলতা তার তীব্রতার পরাকাষ্ঠায় তাঁর মধ্যে মুমুক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল এবং শেষে এই মুমুক্ষার প্রেরণাই তাঁকে সৌভাগ্যক্রমে এমন এক মহাপুরুষের সংশ্রয়ে এনে পৌঁছে দিয়েছিল, যিনি নিজে মুক্তিলাভ করে অপরকেও মুক্তির পথ দেখাতে পারেন, যিনি 'তমসস্পারং দর্শয়তি'[১১], তমসার পারে নিয়ে যেতে পারেন।

তমসার পারে তিনিই নিয়ে যেতে সক্ষম, যিনি 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্', সেই মহান পুরুষকে স্বরূপত জেনেছেন, তেমনি কোন সাক্ষাৎকৃতধর্মা ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ। বিবেকানন্দ তাঁরই সন্ধানে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন, তবু পিপাসার বারি মেলেনি, সংশয় মেটেনি, অতৃপ্তি ঘোচেনি। বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথই আরও জানাচ্ছেন ঃ 'বিবেকানন্দ শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও আচার্যদের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। ...বহু

৬। তদেব, পৃঃ ৭০ ৭। তদেব, পৃঃ ৬৯ ৮। রঘুবংশ, ৫।৩৭

৯। পাতঞ্জল যোগদর্শন, বিভূতিপাদ, সূত্র ৫১, ব্যাসভাষ্য

১০। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭২ ১১। ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৭।২৬।২

মত, পথ ও শিক্ষকের কাছে তিনি গেলেন, এবং এমন এক সংশয়ী সন্ধানই তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের নিকট হাজির করল, যিনি অন্যের অসাধ্য অধিকারের সুরে কথা বললেন এবং নিজ শক্তিতে বিবেকানন্দের আত্মায় আনলেন শান্তি, সত্তার ক্ষতকে করলেন নিরাময়।'[১২]

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনের যথার্থ পরিচয় লাভ করতে হলে তাঁর চিন্তাজগতের ক্রমোন্মীলনের এই পটভূমিকা বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন এবং সেটি তাঁরই এক মননশীল সহপাঠী বন্ধুর এজাহারে তাই আমরা এত বিশদভাবে আবার শুনে নেবার প্রয়াস করলাম। বন্ধুটির মানসিক গঠন ছিল অন্যরকম। তাঁর নিজেরই ভাষায়, আত্মপরিচয়ে তিনি 'তরুণ ও উগ্র বৈদান্তিক তথা হেগেলবাদী' অর্থাৎ প্রধানত দার্শনিক চিন্তাশ্রয়ী তাঁর মন। তাই তিনি একটু অবাক হলেন যখন দেখলেন 'বিবেকানন্দের মতো একজন জন্ম-বিদ্রোহী—যিনি চিন্তায় স্বাধীন, বুদ্ধিতে সৃষ্টিশীল এবং প্রচণ্ড প্রতাপশালী—মানুষকে যিনি বশীভূত করেন অক্লেশে, সেই বিবেকানন্দ কিনা স্বয়ং বিদ্‌ঘুটে অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার ফাঁদে ধরা পড়লেন!'[১৩]

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনের পর্যালোচনার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান কারণ পরবর্তী কালেও অনেকে তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তা, সৃজনশীল বুদ্ধি, অপরিমিত বীর্যের অনুরাগী হয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন যে, এমন মানুষ কিনা শেষ পর্যন্ত ধর্মধ্বজী হয়ে পড়লেন! একজন আধুনিক লেখক অনুযোগ করেছেনঃ 'বিবেকানন্দের মানবধর্মও তাই অধ্যাত্মবাদের কুয়াসা থেকে মুক্ত হতে পারেনি।' কিন্তু বিবেকানন্দ সমস্ত সমস্যার সমাধান কোন্ অধ্যাত্মবাদ বা ধর্মের মধ্যে খুঁজে পেলেন, দর্শনের নীরক্ত আলোচনায় কেন পেলেন না এবং তাঁর সেই ধর্মের কোন দার্শনিক ভিত্তি আছে কিনা অথবা তা শুধু অন্ধ বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত—এসব বিষয়ের আমরা তেমন করে অনুসন্ধান করি না এবং সেই কারণেই তাঁর দর্শনের যথার্থ মূল্যায়নও আমরা করে উঠতে পারি না।

॥ ২ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার যে বিবরণ আমরা তাঁর সহপাঠী বন্ধুর মারফৎ লাভ করলাম তাতে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে যে, তাঁর চিন্তাধারা কখনই অব্যক্তাশ্রয়ী ছিল না, তা ব্যক্ত, মূর্ত, দর্শনীয়, প্রত্যক্ষযোগ্য সত্যকে অবলম্বন করতে চেয়েছে প্রথম থেকেই। দর্শনের গ্রন্থাদিতে বা নানা ধর্মশাস্ত্রে নিশ্চয়ই নানা সমুন্নত চিন্তাধারা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত ও বিধৃত হয়ে আছে কিন্তু সেই শব্দকে যতক্ষণ আমরা মূর্তি ধারণ করতে না দেখি, word made flesh, 'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং' হতে না দেখি, পরোক্ষ শব্দকে অপরোক্ষ অনুভবে প্রমূর্ত না করতে পারি ততক্ষণ আমাদের হৃদয়ের পরিতৃপ্তি

১২। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭২ ১৩। তদেব, পৃঃ ৭৩

নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ জানিয়েছেনঃ 'বিবেকানন্দ তিক্তভাবে অভিযোগ জানালেন—তিনি সুনীতি-সন্দর্ভ যথেষ্ট পড়েছেন, তত্ত্বকথা শুনতে বাকি নেই; কিন্তু ঐসব নীরস বিস্বাদ জিনিসে আর রুচি নেই।'[১৪]

বিবেকানন্দের দর্শন তাই শুধু কতকগুলি অব্যক্তাশ্রয়ী নীরস চিন্তাধারার সমষ্টিমাত্র নয়, তা রসজারিত, প্রাণস্পন্দিত, জীবনাশ্রিত, বাস্তবায়িত তত্ত্বভিত্তিক। বিবেকানন্দের দর্শনের কেন্দ্রস্থলে তাই মানুষ, যে রক্তমাংসে গড়া একটি বাস্তব সত্তা। অথচ সেই রক্তমাংসের জৈব সত্তার অন্তরালে আছে এক চিন্ময় দৈব সত্তা। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি একেই প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হলেন, অব্যক্ত তত্ত্বই যে ব্যক্ত বিগ্রহ ধারণ করতে পারে তা দেখে চমৎকৃত হলেন। হৃদয়-কেন্দ্রিক বিবেকানন্দের জীবন এতদিনে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি খুঁজে পেল, সার্থকতা লাভ করল।

'দর্শন' শব্দটির মধ্যেও এই দেখা বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট এবং যত দার্শনিক চিন্তাধারা এদেশে প্রবর্তিত হয়েছে, তার ভিত্তি এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অনুভূতি। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ'[১৫], এই দর্শনের জন্যই মূল বিধি বা নির্দেশ এবং সেই দর্শনলাভের উপায় হিসাবেই 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'[১৬]—এই পরবর্তী শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের সমস্ত বিধান। অনুভবে, উপলব্ধিতে, সাক্ষাৎ দর্শনেই এই সমস্ত জ্ঞানের প্রক্রিয়ার পর্যবসান। শঙ্করাচার্যও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এই কথাই স্মরণ করিয়েছেন 'অনুভবাবসানত্বাদ্ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানস্য'[১৭]—এই উক্তির মাধ্যমে। যোগ-দর্শনও এই প্রত্যক্ষের জন্য সকল সাধককে উদ্বুদ্ধ করেছেন এই বলে যে, যদিও আমরা সেই সেই শাস্ত্র বা আচার্যের উপদেশ থেকে যা-কিছু শুনে থাকি তা সবই সত্য ও যথার্থ, তবুও তার অনন্ত এক অংশও যতক্ষণ প্রত্যক্ষগোচর না হয় ততক্ষণ সবই যেন পরোক্ষ, মনগড়া, ভাসাভাসা কথাই থেকে যায় এবং তার ফলে আমাদের মনে তেমন কোন দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় না। সেই কারণেই অবশ্য বিশেষ কিছু প্রত্যক্ষ করা, নিজের করণগোচর করা একান্ত প্রয়োজন।[১৮]

বিবেকানন্দ এই প্রত্যক্ষ করার প্রথম সুযোগ পেলেন দক্ষিণেশ্বরে। হৃদয়ে অনুভূতি জাগল ঠিকই কিন্তু সংশয়ী মন বা তাঁর মনীষা তখনও এই অনুভবের পিছনে কোন যুক্তি খুঁজে পেল না। অনেক পরে ধীরে ধীরে বেদান্ত-দর্শনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে এই অনুভূতির পিছনে যে অভ্রান্ত যুক্তি রয়েছে, তা তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং সারাজীবন ধরে সমস্ত জগদ্বাসীকে সেই বেদান্তের অভ্রভেদী বাণী মেঘমন্দ্রস্বরে শুনিয়ে শুনিয়ে সকলের মধ্যে সেই অনুভূতি জাগিয়ে তোলার প্রয়াসেই আত্মনিয়োগ করলেন। বিবেকানন্দের দর্শন তাই যেমন প্রত্যক্ষভিত্তিক বা অনুভবমূলক তেমনি বেদান্তভিত্তিক বা যুক্তিমূলক। এখন তাই তাঁর দর্শন প্রধানত কোন্ কোন্ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তার পরিচয় গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ তাঁর আকুল জিজ্ঞাসার উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পেলেন কিভাবে,

---

১৪। তদেব, পৃঃ ৭২ ১৫। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।৪।৫ ১৬। তদেব

১৭। ব্রহ্মসূত্র, ১।২, শঙ্করভাষ্য ১৮। পাতঞ্জল যোগদর্শন, সমাধিপাদ, সূত্র ৩৫, ব্যাসভাষ্য

তার সামান্য বিশ্লেষণ করলেই তাঁর দর্শনের ভিত্তিও প্রকাশ হয়ে পড়বে। বিবেকানন্দ দেখলেন এই একটি মানুষের মধ্যে সমস্ত ভেদ-বিভেদ এক পরম ঐক্যে এসে মিলিত ও মূর্ত হয়েছে। তাঁর কাছে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সমাজে পতিত ও উন্নত সবাই সমান সমাদরে গৃহীত, একেরই প্রকাশরূপে আদৃত। জগতে সবকিছুই যেন ভিন্ন ভিন্ন, নানা এবং এই ভেদের দৃষ্টিই সমস্ত অনর্থের মূল। এই মানুষটি যেন সব ভেদের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে পরম আনন্দে আছেন এবং তাঁকেও সেই আনন্দের সাক্ষাৎ আস্বাদন তিনি এনে দিয়েছেন। আস্বাদন বা অনুভব তিনি পেলেন, কিন্তু এর পিছনে যুক্তি কি? মানুষকে কেমন করে বোঝানো যাবে যে, এই ভেদবোধ একান্ত মিথ্যা, আসলে আমরা সবাই এক? এই যুক্তির অন্বেষণই বিবেকানন্দকে বেদান্তের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করল।

দর্শন হিসাবে বেদান্ত আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই সুপরিচিত ও সমাদৃত এবং দ্বৈত-দ্বৈতাদ্বৈত-অদ্বৈত প্রভৃতি নানা শাখায় প্রবাহিত। এই দুই বা ভেদের সঙ্গে সেই এক বা অভেদের সম্বন্ধ কি, তারই অন্বেষণে এই দর্শন ব্যাপৃত। আমরা দুই বা নানাকে নাকচ করতে পারি না। সংসার মানেই ভেদের কারবার অথচ এই ভেদের ফলেই আমাদের যত অশান্তি, যত দুঃখতাপ, যত সমস্যা। যে-উপনিষদেরই অপর নাম বেদান্ত বা যে-উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করেই বেদান্ত-দর্শনের উদ্ভব, সেই উপনিষদ্ স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করছেঃ 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'[১৯]—মৃত্যু থেকে মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয় যে এখানে সবকিছুকে নানার মতো অর্থাৎ আলাদা করে দেখে। 'নানার মতো' এই কথার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আসলে নানা নেই এবং সেকথাও সুস্পষ্ট ভাষায় উপনিষদেই অন্যত্র বলা হয়েছেঃ 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।'[২০] এখানে কিছুমাত্র নানা নেই।

তাহলে কি অনন্ত বৈচিত্রে পরিপূর্ণ এই জগৎকে, এই নানার পশরাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হচ্ছে? তাহলে সে তো আমাদের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার একান্ত বিরোধী কথা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বহুকে দেখছি, অনুভব করছি, বহুকে নিয়েই ঘর করছি এবং তাকে তো নেই বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। কিন্তু যেটা আমরা দেখতে পারছি না, উপলব্ধি করতে পারছি না তা হল যে, এই নানা বা বহু সেই একেরই আত্মপ্রকাশ এবং উপনিষদ্ সঙ্গে সঙ্গে আর একটি উদ্‌ঘোষণে তা জানিয়ে দিয়েছেনঃ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'[২১], এ সবই হল সেই ব্রহ্মস্বরূপ, সেই বৃহতেরই বিচিত্র প্রকাশ। আরও নির্দেশ দিয়েছেনঃ 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'[২২], এই যে সব 'ইদং'রূপে তোমার বাইরে নানা বস্তু রয়েছে সেসবকে ঈশের দ্বারা আচ্ছাদন কর অর্থাৎ সেই একের অন্তর্ভূত করে নাও।

॥ ৩ ॥

বেদান্তের এই বাণীতে বিবেকানন্দের প্রাণের বীণা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল কারণ এর

১৯। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৪।৪।১৯ ২০। কঠোপনিষদ্, ২।৪।১১
২১। ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩।১৪।১ ২২। ঈশোপনিষদ্, ১

মধ্যেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর সব সমস্যা সমাধানের স্বর্ণসূত্র। সেইজন্য বেদান্তই হয়ে উঠল তাঁর দর্শনের ভিত্তি বা অটল আশ্রয়স্থল। কিন্তু সে কোন্ বেদান্ত? তা প্রধানত শঙ্করাচার্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবেদান্ত, কারণ একমাত্র তার মধ্যেই অকাট্য যুক্তি-পরম্পরায় এই ঐক্যকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সেই পরম ঐক্যে সরাসরি পৌঁছান এক দুঃসাধ্য কর্ম। বিবেকানন্দ তাই বেদান্তের অন্যান্য মতকেও সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং এক সোপান-পরম্পরায় তাদের গাঁথবার চেষ্টা করেছেন, যার সু-উচ্চ শিখরে তিনি অদ্বৈতবেদান্তের মতবাদকে স্থাপন করেছেন। তিনি বড় সুন্দর সমন্বয়ী দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বলে এই অপরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই-সকল মতের প্রত্যেকটি যেন এক-একটি সোপানস্বরূপ; একটি সোপান অতিক্রম করিয়া পরবর্তী সোপানে আরোহণ করিতে হয়, সর্বশেষে অদ্বৈতবাদে স্বাভাবিক পরিণতি, এবং ইহার শেষ কথা "তত্ত্বমসি"।'[২৩]

'তুমিই তাই'—এই পরম ঐক্যের সন্ধানী বিবেকানন্দের কাছে তাই অদ্বৈতবেদান্তই চরম সত্যরূপে ধরা দিয়েছে এবং তাঁর দর্শনের মধ্যমণিরূপে তা সমুজ্জ্বল মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। দেশেবিদেশে, সারা পৃথিবীতে সর্বজনগ্রাহ্য করে সহজ, সরল অথচ মর্মস্পর্শী ভাষায় এই অদ্বৈতবেদান্তের বাণীকে পৌঁছে দেওয়া তাঁর জীবনব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তাতেই যেন তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ও অত্যধিক পরিশ্রমের দরুন অকালমৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। বেদান্তের নানা দুরূহ বিচারের জটিলতা উপস্থাপন করে তিনি তাঁর শ্রোতাদের বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত করতে চাননি অথচ মূল সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে তাঁর এমন স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল যা অনেক নিপুণ বেদান্ত-পাঠকের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। যেমন উদাহরণস্বরূপ তাঁর মায়ার প্রসঙ্গ আলোচনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।

প্রথমেই তিনি বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করতে গিয়ে বলেছেন: 'মায়াবাদ-রূপ অন্যতম স্তম্ভের উপর বেদান্ত স্থাপিত বলিয়া মায়ার যথার্থ তাৎপর্য বুঝা আবশ্যক।'[২৪] এর কিছু পরেই তিনি মায়া সম্বন্ধে এমন একটি সুগভীর মন্তব্য করেছেন যাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি বেদান্তের কত অন্তরঙ্গ মর্মগ্রাহী ছিলেন। সাধারণত অনেকেরই ধারণা বেদান্ত তার মায়াবাদ খাড়া করে আমাদের সামনে যে সংসার বর্তমান, তাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে বা অস্বীকার করেছে। বিবেকানন্দ কিন্তু বলছেন, 'সংসারের ঘটনা যেভাবে চলিতেছে, মায়া তাহারই বর্ণনামাত্র'[২৫] অর্থাৎ statement of fact; মায়া তাই denial of fact নয়। মায়াকে অনির্বচনীয় কেন বলা হয়েছে, সে-প্রসঙ্গেও কী প্রাঞ্জলভাবেই বুঝিয়েছেন এখানে: 'একমাত্র চরম সত্যকে "সৎ" বলা যাইতে পারে; সেদিক দিয়া দেখিলে মায়া অসৎ, মায়ার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু মায়া অসৎ—একথা বলা যায় না; কারণ তাহা যদি হইত, তবে ইহা কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সৃষ্টি করিতে পারিত না। কাজেই ইহা এমন একটা কিছু, যাহা সৎ বা অসৎ কোনটিই নয়; এজন্য

২৩। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩৪৭
২৪। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩ ২৫। তদেব, পৃঃ ১৩

বেদান্তদর্শনে ইহাকে "অনির্বচনীয়" অর্থাৎ বাক্য দ্বারা অপ্রকাশ্য বলা হইয়াছে।'[২৬]

এরকম আরও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যায় বিবেকানন্দ বেদান্তসিদ্ধান্তকে কত যথার্থভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি গতানুগতিক পারিভাষিক পাণ্ডিত্যের দুর্বোধ্য ভাষায় তা পরিবেশন করেননি সেজন্য কোন কোন আধুনিক সমালোচক মন্তব্য করে বসেছেন যে, 'শঙ্করাচার্য নিজে তাঁর মায়াবাদ যেভাবে বুঝেছিলেন, শঙ্করানুবর্তী পরবর্তী দুর্ধর্ষ তার্কিক দার্শনিকবৃন্দ এই মায়াবাদকে যেভাবে অনির্বচনীয়তা-সর্বস্ব বলে ব্যাখ্যা করেছেন, বিবেকানন্দ মায়াবাদকে সেই একই অর্থে গ্রহণ করেছেন কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বিবেকানন্দ যেখানে বেদান্তের ব্যাখ্যা করেছেন সেই "জ্ঞানযোগে" অথবা "কলম্বো থেকে আলমোড়া" পর্যন্ত বক্তৃতাবলীতে কোথাও শ্রীহর্ষ, চিৎসুখাচার্য বা মধুসূদন সরস্বতীর মতো মায়াবাদের ব্যাখ্যা করেননি। সর্বত্রই তিনি হৃদয়ের দরদ মিশিয়ে এক মানবধর্মী বৈদান্তিক ব্যাখ্যার উপর জোর দিয়েছেন।'[২৭]

বিজ্ঞ সমালোচকের বিভ্রান্তি ঘটেছে দুটি কারণে ঃ এক, বিবেকানন্দ শ্রীহর্ষ, চিৎসুখাচার্য বা মধুসূদন সরস্বতীর মতো দুর্ধর্ষ তার্কিক পদ্ধতিতে মায়াবাদের ব্যাখ্যা করেননি বলে এবং দ্বিতীয়ত তিনি 'হৃদয়ের দরদ মিশিয়ে এক মানবধর্মী বৈদান্তিক ব্যাখ্যা' দিয়ে বসেছেন বলে। এটুকু হয়তো মানা যেতে পারে যে সাধারণ লোককে, বিশেষ করে বিদেশীদের কাছে, বেদান্তের তত্ত্বকে বোঝাতে হবে বলে বিবেকানন্দ শ্রীহর্ষাদির পথ অবলম্বন করেননি, যদিও হয়তো তাঁর সেসব গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় ঘটেও থাকতে পারে বা বেদান্তের সূক্ষ্ম বিচারও তাঁর কিছু জানা ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তে হৃদয় বা মানব, এসব আসে কোথা থেকে? বিজ্ঞ সমালোচকের মতে এ সবই তো মায়া, মিথ্যা। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করে বসেছেন ঃ বিবেকানন্দের শাঙ্করী মায়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না।'[২৮] অথচ আমরা মায়া সম্বন্ধে বিবেকানন্দের যে সংক্ষিপ্ত উক্তিটুকু তুলে ধরেছি, তা ছত্রে ছত্রে শঙ্করেরই অনুগামী, কোথাও এতটুকু অস্পষ্টতা নেই।

কিন্তু বিবেকানন্দ শুধু শ্রীহর্ষাদির মতো মায়ার স্বরূপের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেই থেমে থাকেননি, সেই মায়া ভেদ করে জীব ও জগৎকে কিভাবে দেখতে হবে তারও পথনির্দেশ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, মায়া তিরোহিত হলে জীব ও জগৎ আর কোথায় থাকে? এ তো মায়ারই সৃষ্টি। জীবের প্রসঙ্গে তাই পুরোপুরি শঙ্করের মতানুবর্তী হয়েই বিবেকানন্দ বলছেন ঃ 'জীবাত্মাই নির্বিশেষ ব্রহ্ম। প্রকৃতির ভিতর যাহা সৎ বস্তু, তাহাই ব্রহ্ম; মায়ার অধ্যাসের জন্য তিনিই এই নানাত্ব বা প্রকৃতি বলিয়া প্রতীত হইতেছেন।'[২৯] অন্যত্রও দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন ঃ 'সূর্য এক, কিন্তু প্রতিবিম্ব-সূর্য বহু।

২৬। তদেব, পৃঃ ৪৪৭

২৭। সমাজ সাহিত্য ও দর্শন—হেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃঃ ১১৮ ২৮। তদেব, পৃঃ ১২৬

২৯। বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ২৯২

মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ এক, কিন্তু নানা দেহে প্রতিবিম্ব-আত্মা বহু।'[৩০] স্বামী বিবেকানন্দের মূল লক্ষ্য এই যে, মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ এক, তা উপলব্ধি করা এবং তার যথাযথ যুক্তি উপস্থাপন করা। এই একত্বের উপলব্ধি করতে হলে যা সেই একত্বকে খণ্ডিত করছে সেই মায়ার পারে যেতেই হবে। কিন্তু মায়ার পারে যাওয়া মানেই জীব ও জগতের বিলোপসাধন নয়। সেই মায়া কেমন করে এককেই বহুরূপে দেখিয়ে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছিল, তা বহুর মধ্যে আবার এককে না দেখতে পারা পর্যন্ত সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। সেই ঐক্যের উপলব্ধির কথাও বড় মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ 'প্রাকৃতিক দৃষ্টিতে দেখিলেও আমরা অমর, সমগ্র জগতের সহিত এক। ...আমি এই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র ব্যষ্টি জীব নই, আমি সমষ্টিস্বরূপ। অতীতে যত প্রাণী জন্মিয়াছিল, আমি তাহাদের সকলের জীবনস্বরূপ।'[৩১]

॥ ৪ ॥

এই সমষ্টিচেতনাই, সর্বাত্মভাবই বেদান্তের মূল লক্ষ্য বা আদর্শ। সর্বকে খর্ব করে, সমষ্টিকে বা বহুকে নিশ্চিহ্ন করে একক পাওয়া তার কাম্য নয়। এই কারণেই বেদান্তবাদ একত্ববাদ নয়, অদ্বৈতবাদ। দুই সেখানে সমাহৃত, একত্রিত, অতিক্রান্ত। আধুনিক এক বিশিষ্ট সন্ন্যাসী-সাধক 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' নামক গ্রন্থের এক প্রোজ্জ্বল মনীষা-সমুদ্ভাসিত ভূমিকায় তাই যথার্থই বলেছেন যে 'বিস্ফারিতলোচনত্রয়াস্তু বেদান্তিনঃ আন্তরবাহ্যপ্রপঞ্চমনবধীর্যৈব তাদৃশাদ্বৈতসরসি নিমজ্জনাৎ' অর্থাৎ যথার্থ বেদান্তীর তিন চোখই খোলা, বাইরের বা ভিতরের এই প্রপঞ্চ অর্থাৎ স্থূল বা সূক্ষ্ম জগৎ কোনটার থেকেই তিনি চোখ ফেরান না বা চোখ বোজেন না। তাঁর বিস্ফারিত নয়নের সম্মুখে এ সবকিছুই যেমন তেমনি সমুদ্ভাসিত বা প্রকাশিত অথচ তিনি অদ্বৈতের মহাসরোবরেই ডুবে থাকেন। কোথাও এতটুকু অদ্বৈতহানি বা অদ্বৈতবিলোপ ঘটে না তাঁর, কারণ তিনি যে মায়ার পারে চলে গিয়েছেন, যে-মায়া এই দ্বৈতের ইন্দ্রজাল বা বিভ্রান্তি রচনা করেছিল। বেদান্তকে তাই ঠিক ঠিক বোঝা বা উপলব্ধি করা এত কঠিন। তাই বিজ্ঞ সমালোচক যখন বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেন, 'তিনি যেখানে মায়ার ব্যাখ্যা করেছেন সেখানে আরও দশজন সংসারবিরাগীর মতোই—ঈশ্বর সত্য, জগৎ মায়াময় এইটুকু বলেই ছেড়ে দিয়েছেন'[৩২]—তখন অনুকম্পাই জাগে এই ভেবে যে, তিনি স্বয়ংও সেই দশজন সংসারবিরাগীর মতোই মায়াকে এবং তার স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদান্তকে বুঝে বসে আছেন!

অদ্বৈতবেদান্তের অনুভূতির যেসব বিবরণ উপনিষদের ছত্রে ছত্রে আকীর্ণ হয়ে আছে, তার দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করলেও দেখা যায় যে, এই অনুভূতি জগৎকে কোথাও

৩০। তদেব, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪২

৩১। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৪-১৫ ৩২। সমাজ সাহিত্য ও দর্শন, পৃঃ ১২৬

বাতিল করে না বা উড়িয়ে দেয় না, জগতের সবকিছুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। যেমন, এই মন্ত্রটিতে বলা হয়েছেঃ 'তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ'[৩৩]—অর্থাৎ সেই আত্মাকেই জেনেছিলেন, আমি হচ্ছি ব্রহ্ম (এইরূপে) এবং তার ফলে তিনি সব হয়েছিলেন, অর্থাৎ সর্বের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে একীভূত হয়েছিলেন।

আরও সুস্পষ্টভাবে অন্যত্রও বলা হয়েছেঃ

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি ॥[৩৪]

এই আত্মানুভবকে লাভ করে ঋষিরা যেমন জ্ঞানে পরিতৃপ্ত, রাগ বা আসক্তি থেকে মুক্ত, প্রশান্ত, কৃতকৃত্য হন তেমনি সেই সর্বত্র প্রসারিত সর্বব্যাপী সত্তাকে সব দিক দিয়ে পেয়ে কৃতার্থ হয়ে তাঁরা সকলের মধ্যেই আবিষ্ট, প্রবিষ্ট অর্থাৎ একীভূত হয়ে যান।

গীতাতেও উপনিষদের এই বাণীর প্রতিধ্বনি শুনে আমরা চমকে উঠি যখন ভগবান স্বয়ং বলেন যে যারা সেই অনির্দেশ্য, অক্ষর, অব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা করে তারা কিনা সর্বত্র সমবুদ্ধি স্থাপন করে 'সর্বভূতহিতে রতাঃ'[৩৫] হয়ে থাকেন! আমরা ভাবি যাঁর আরাধ্য সেই অব্যক্ত, কূটস্থ, অচল নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম তিনি আবার ব্যক্ত জগতের দিকে তাকাতে যাবেন কেন? তাঁর কাছে এসব তো তুচ্ছ মায়া, মিথ্যা, অলীক, ভ্রান্তিবিলাস মাত্র। তিনি আবার সেই সমস্ত ভূতগণের হিতসাধনে আত্মনিয়োগই বা করতে যাবেন কোন্ দুঃখে?

আমরা ভুলে যাই অদ্বৈত সাম্রাজ্যে সমারূঢ় সাধক পরের হিতসাধন করতে যান না, এ তাঁর নিজেরই হিতসাধন, কারণ তাঁর কাছে পর কেউই নেই, সবই সেই এক অদ্বয় অখণ্ড আত্মস্বরূপ। এখানে অন্য কারুর প্রতি অনুকম্পা বা দয়াপরবশ হয়ে তিনি তার সেবা করতে যান না। শিবজ্ঞানেই জীবসেবা অর্থাৎ সেই এক আত্মারই আরাধনা বা উপাসনা করে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দও যখন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এই কথা শোনেন তখন চমকে উঠেছিলেন এবং এর গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করে গুরুভাইদের বলে উঠেছিলেনঃ 'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম!... ভগবান যদি কখন দিন দেন তো...এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব!'[৩৬]

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন সেইদিন থেকে এক নতুন মোড় নিল। তিনি বুঝলেন বেদান্তের উপলব্ধিকে জীবনে সক্রিয় রূপ দিতে হবে। এরই নাম তিনি দিলেন বাস্তব বা ক্রিয়াশীল বেদান্ত। 'ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।'[৩৭] 'যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষ স বিদ্বান্'—এসব উপনিষদেরই উদ্‌ঘোষণ, যা আমরা এতদিন যেন ভুলে ছিলাম। একদা

৩৩। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ১।৪।১০ ৩৪। মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।২।৫ ৩৫। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ১২।৪

৩৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ—স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৮৬, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৪০-৪১ ৩৭। মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।১।৪

পাঞ্চজন্যের নির্ঘোষে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে গভীর তামসিকতার অন্ধকারে নিমগ্ন অর্জুনকে যেমন শ্রীকৃষ্ণ এই কর্মযোগে সমুদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যে-যোগ কালেনেহ মহতা নষ্টঃ[৩৮], দীর্ঘকালের ব্যবধানে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আবারও এযুগে যেন সেই যোগেরই পুনর্ঘোষণ বিবেকানন্দের কণ্ঠে আত্মবিস্মৃতির অতলান্ত গহ্বরে নিমগ্ন ভারতবাসীর প্রতি। এ যোগ বিবস্বান্ থেকে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত এক স্বচ্ছ আলোকধারার উৎসারণ, যা যুগে যুগে ভারতবর্ষের মুমূর্ষু মানুষকে সঞ্জীবিত করেছে প্রাণ-সঙ্কটের লগ্নে। বিবেকানন্দের দর্শনে তারই নিখুঁত প্রতিফলন, তাঁর প্রচারিত নব-বেদান্তে তারই বাস্তব রূপায়ণ, যার ভিত্তি ত্যাগে, অভয়ে ও অমৃতে। ভারতবর্ষের এই শাশ্বত ত্যাগের বাণী গ্রহণের জন্যই তিনি জগৎকে আহ্বান জানিয়ে গিয়েছেন, নতুবা জগতের মহতী বিনষ্টি। এইখানেই তাঁর দর্শনের বর্তমান যুগে প্রাসঙ্গিকতা। আমরা কি আত্মবিলোপের প্রত্যন্ত পরিধিতে আজ দাঁড়িয়েও তাঁর সেই সতর্ক-বাণীতে কর্ণপাত করব?

'ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা, যাহা সে সমগ্র জগতে উড়াইতেছে। যে-সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত ঐ মৃত্যুহীন ভাবসহায়ে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—সর্বপ্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে: তাহাদিগকে যেন বলিতেছেঃ সাবধান! ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে।'[৩৯]

॥ ৫ ॥

অন্য সব জাতির উদ্দেশে উচ্চারিত স্বামী বিবেকানন্দের এই জাতীয় সাবধানবাণী থেকে আর একটি জিনিসও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর দর্শন ভারতবর্ষের সনাতন মৃত্তিকা থেকেই সমুদ্ভূত, তারই রসে জারিত, লালিত ও বর্ধিত। এ যেন ভারত-আত্মারই মর্মবাণী। সেই কারণেই তখনকার পরাধীন ভারতবর্ষের হীনম্মন্য সন্তানদের মধ্যে স্বদেশ সম্বন্ধে গরিমাবোধও প্রথম সঞ্চার করেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং এদেশে জাতীয়তাবাদের জনকরূপেও অনেকে তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিদেশিনী হলেও শিষ্যা নিবেদিতার মধ্যে এই ভারত-বোধ তিনি এমনভাবে সঞ্চার করেছিলেন যে তিনিই আবার প্রেরণাদাত্রী হয়ে ওঠেন ভারতের নিজস্ব শিল্পকলা, বিজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে নব ভাবনা-উন্মেষের, যার ফলে অবনীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি অনেকে উদ্বুদ্ধ হন ভারতীয় দৃষ্টি দিয়ে শিল্প, বিজ্ঞান সবকিছুকে নতুন করে দেখতে।

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনের এই ভারতীয় ভিত্তির কথা উল্লেখ করতে হয় এই কারণেই যে, শুধু পাশ্চাত্যদেশের বিশিষ্ট মনীষীরাই নন, এদেশেরও অনেক জ্ঞানী-গুণীরাই মনে করেন বিবেকানন্দ যে মঠ-মিশন স্থাপন করলেন এবং জীবসেবার প্রবর্তন করলেন এ সবই পাশ্চাত্যদেশের আমদানী। তার কারণ যে বেদান্তদর্শনের ভিত্তিতে তিনি এটি প্রবর্তন করলেন বলে দাবি করা হয়, সে বেদান্ত তো জগৎ ও জীবনকে অস্বীকারই

৩৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪।২ ৩৯। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৪১

করে থাকে সুতরাং তার ভিত্তিতে জগতের বা জীবের জন্য কিছু করার প্রবৃত্তি আসবে কোথা থেকে? বেদান্ত সম্বন্ধে এই মূল ভ্রান্তির কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি এবং আবারও উল্লেখ করছি এই কারণে যে, আমরা পাশ্চাত্য মনীষীদের দ্বারাই প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়ে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আছি আজও। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা যেমন দেখেছি অনুযোগ করে থাকেন বিবেকানন্দ শঙ্করের বেদান্তকে ঠিকমতো বোঝেননি বা ব্যাখ্যা করেননি, পাশ্চাত্যদেশের মনীষীদেরও তেমনি অনুযোগ ঃ 'He did not penetrate far enough into Western thought to be able to establish relations with it and realize its right value.'[৪০] অর্থাৎ তিনি পশ্চিমী চিন্তাধারার তেমন গভীরে প্রবেশ করেননি যাতে তার সঙ্গে ঠিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন ও তার যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে পারেন। পাশ্চাত্যদেশের মনীষীদের এই আক্ষেপের মূল কারণ তাঁদের স্বকীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতাবোধের এক মিথ্যা অভিমান, যা বিশেষভাবে জন্ম নিয়েছে প্রভুজাতি হওয়ার ফলে। যারা তাঁদের অধীন বা দাস তাদের চিন্তাধারা তাঁদের চেয়ে উন্নত হবে কেমন করে? তাই বের্গসঁ-এর মতো চিন্তাশীল দার্শনিক রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-ভাবনায় সোৎসাহ বদান্যতা লোকহিতকারিতা লক্ষ্য করেও তাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিল্পবিপ্লবের সংস্পর্শে আসার ফল বলেই বর্ণনা করেছেন এবং খ্রীষ্টান অধ্যাত্মবাদের সমগোত্রীয় বলেই ধরে নিয়েছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতাই যেন এখানে মুক্তিদাতা বা পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং ভারতীয় অধ্যাত্মবাদকে তার বহুযুগসঞ্চিত নৈষ্কর্ম্যের মোহ থেকে মুক্ত করেছে বলে তিনি মনে করেন।[৪১]

আর এক বিশিষ্ট পাশ্চাত্য মনীষী সোয়াইৎজারও ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের লগ্নে আবির্ভূত ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ধর্মনেতাদের নাম উল্লেখ করে, তারই মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকেও অন্তর্ভুক্ত করে আক্ষেপ করেছেন যে, এঁরা কর্মের মধ্য দিয়ে প্রেমকে প্রসারিত করতে চেয়েছেন বটে কিন্তু জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করে যে অধ্যাত্মবাদ তার সঙ্গে একে কেমন করে খাপ খাওয়ানো যায়, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই নৈতিক জগৎ ও জীবনের অস্তিত্ব কিভাবে বজায় রাখা চলে তার সম্বন্ধে যেন কোন চিন্তা করেননি বা তার জন্য কোন মাথাব্যথা বা ক্লেশও যেন তাঁদের নেই।[৪২]

৪০। Indian Thought and Its Development—Albert Schweitzer, Adam & Charles Black, London, 1956, p. 220

৪১। 'That enthusiastic charity, that mysticism comparable to the mysticism of Christianity, we find in a Ramakrishna or a Vivekananda...it was industrialism, it was our Western civilization, which unloosed the mysticism of a Ramakrishna or a Vivekananda.' [The Two Sources of Morality and Religion—Henri Bergson, Doubleday & Company, New York, 1954, p. 226]

৪২। '...Ramakrishna and Vivekananda stood for the furtherance of love in action without troubling about the question whether and how this ethical world and life affirmation could be united with their mysticism of world and life negation.' [Indian Thought and Its Development, p. 223]

সোয়াইৎজারের বদ্ধমূল ধারণা যে একমাত্র খ্রীষ্টধর্মই মানুষকে কর্ম ও প্রেমের প্রেরণা দিতে পারে, কারণ তার মধ্যে নীতিবোধ, জগতের বাস্তব অস্তিত্ববোধ পূর্ণভাবে স্বীকৃত, প্রাচ্য বা ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারায় তা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত বা তিরস্কৃত।

স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধারাতেই পূর্ণ অবগাহন করেছিলেন এবং উভয়েরই মর্ম ও মূল্যের যথাযথ অনুধাবনও করেছিলেন। পাশ্চাত্যের কর্মোদ্যম, ব্যবহার-কুশলতা, জাগতিক উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সবই তাঁকে মুগ্ধ করেছে এবং প্রাচ্যের মানুষের মধ্যে তা সঞ্চারিত করার জন্যও তিনি ব্যাকুল হয়েছেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ভারতের স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে তার বিনিময়ে পাশ্চাত্য জীবনধারার প্রবর্তন বা পাশ্চাত্য আদর্শকে সর্বতোভাবে বরণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। আবার ভারতবর্ষের স্বকীয় মহিমা সম্বন্ধে অপার গৌরববোধ সত্ত্বেও তিনি কোথাও কখনও ঊর্ধ্ববাহু হয়ে কেবল ভারতের গুণকীর্তনে বিহ্বল বা উন্মত্ত হননি, ভারতবর্ষের অধোগতি, দৈন্যদশা সম্বন্ধেও তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং সেসব বিষয়ে তাঁর তীব্র ধিক্কারও নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি আত্মবিস্মৃত অধঃপতিত ভারতবাসীকে বার বার সচেতন করতে চেয়েছেন তার অতীত আদর্শের মহত্ত্ব সম্বন্ধে, 'হে ভারত! ভুলিও না' এই জাতীয় নানা বাণীর মধ্য দিয়ে। সেইসঙ্গে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনও একান্তভাবে কামনা করেছেন, যাতে উভয়েরই স্ব স্ব ক্ষেত্রের অপূর্ণতা দূর হতে পারে এবং তার ফলে সমস্ত জগতেরই কল্যাণ সংসাধিত হতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন তাই ভারতভিত্তিক হলেও তা জগতের সমস্ত চিন্তাধারা থেকে যা-কিছু কল্যাণকর তা সযত্নে আহরণ করে নিজেকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত করেছে। অনেকে তাই তাঁর মধ্যে মার্কসীয় চিন্তাধারার সাধর্ম্য দেখতে পেয়ে পুলকিত বোধ করেন আবার কখনও ধর্মীয় চিন্তার ছায়া দেখতে পেয়ে প্রগতিশীলেরা পিছিয়ে আসেন, মনে করেন তিনি প্রতিক্রিয়াশীল! কিন্তু বিবেকানন্দের দর্শন আবর্তিত হয়েছে শুধু একটি মূল লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে, তা হল মানুষ। মানবধর্মী তাঁর দর্শনের একটিই লক্ষ্য, একটিই উদ্দেশ্য : মানুষ তৈরী করা। 'আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ'[৪৩], সেই মানুষকে তিনি চেয়েছেন, যার শরীর হবে 'বিচর্ষণ', জিহ্বা হবে 'মধুমত্তমা', যার কাছে 'ইয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ'[৪৪], অর্থাৎ সব দিক্ দিয়ে সমৃদ্ধ জীবন যার। যে-মানুষ হবে সব দিক্ দিয়ে 'অভীঃ', ভয়শূন্য কারণ তার বাইরে দ্বিতীয় বলে কিছু থাকবে না যার থেকে তার ভয় সঞ্চারিত হতে পারে এবং সেইজন্যই সে-মানুষ হবে অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত। বিবেকানন্দের দর্শন এই কারণেই বেদান্ত-ভিত্তিক বা অদ্বৈতমূলক, কারণ শুধু এই দর্শনের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের সব দ্বন্দ্বের চরম সমাধান, পরম ঐক্য। মানুষকে এই ঐক্যের বোধে উদ্বুদ্ধ করাই তাঁর দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য, একান্ত কাম্য আদর্শ ছিল, যার ফলে মানুষ হয়ে উঠবে যথার্থ মানুষ, শ্রেষ্ঠ মানুষ, নর-ইন্দ্র বা নরশ্রেষ্ঠ। তাঁর দর্শনকে তাই তাঁরই নামাঙ্কিত করে এক কথায় বলা চলে 'নরেন্দ্রবাদ'।

৪৩। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।৮।১ ৪৪। তদেব

ভারতবর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতবর্ষ

॥ ১ ॥

ভগিনী নিবেদিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ 'মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই "পীপ্‌ল"কে, এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।'[১] একথার তাৎপর্য—সম্পূর্ণ অপরিচিত, অনগ্রসর, ভিন্ন-মানসিকতায় লালিত মানবসঙ্ঘকে নিবিড়ভাবে নিজের করে পেতে হলে তাকে স্নেহ-বাৎসল্যের দ্বারাই পেতে হয়। জীবনকে দেখার একটি সাধারণ রীতি হল বস্তু-তন্মাত্রের পদ্ধতি। সেখানে মানুষ জীবধর্মের প্রতীক ছাড়া কিছু নয়। আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তাকে বলা যেতে পারে রসের দৃষ্টি, প্রেমের বোধ। যখন বাস্তব পরিচয়ের খণ্ডতা, খর্বতা ও অসম্পূর্ণতা মুছে গিয়ে একটি ব্যাপক সর্বগ্রাসী ভালবাসা প্রবল হয়ে ওঠে, তখন অনাত্মীয়কে আত্মীয় করবার ইচ্ছা জাগে, প্রতিকূল বিরোধকেও মিত্রতার বন্ধনে বাঁধতে হৃদয় প্রস্তুত হয় এবং কদাকার কুৎসিৎ শিশুকেও দেবশিশু বলে বুকে রেখে ঘুম পাড়াবার জন্য মাতৃভাব জেগে ওঠে। নিবেদিতার ভারতবর্ষ সম্পর্কে চেতনা হল মাতৃভাবের সাধনা। এর দীক্ষা তিনি তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই মাতৃভাব অনুশীলনের দ্বারা লাভ করা যায় না। এটি একটি স্বয়মাগত দিব্যানুভূতি। জাতি, সংস্কার, পরিবেশ—সবকিছু ভুলে গিয়ে, ভারতবর্ষের বাহ্যিক-দুর্দশা ও পাতিত্য সত্ত্বেও, তাকেই সন্তানরূপে গ্রহণ করা, লালন করা, মনুষ্যত্বের পোশাকে সজ্জিত করা—এ একাধারে ভাবের বস্তু, অন্যদিকে কঠিন বাস্তব ব্যাপার। মানসিকতায় সত্ত্বগুণ ও রজোগুণের একত্র সমাবেশ না হলে এই ধরনের কর্মযজ্ঞে অবতীর্ণ হওয়া যায় না। এর প্রাণরস নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকে আহরণ করেছিলেন।

বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন ও সাধনা ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। বিস্মৃতকে স্মরণের পথে টেনে আনা, হারানো কুলপরিচয়কে উদ্ধার করা এবং মূঢ় দেশবাসীকে অতীত ও বর্তমান জীবনচর্যা সম্বন্ধে অবহিত করা—এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে আবির্ভাবের মূল তাৎপর্য। বিশ্বের যেখানে যে উদ্দেশ্যেই তিনি পরিভ্রমণ করেছেন, সেখানে ধ্যানের ভারতবর্ষই তাঁর মানসনয়নে প্রত্যক্ষবৎ অবস্থান করত।

১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৮৫, পৃঃ ৪৯২

॥ ২ ॥

বিবেকানন্দ নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের জন্য পথে নামেননি। প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের ভারতবর্ষের মূল তাৎপর্য সন্ধান, তাকে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির আলোকে বুঝে নেওয়া এবং জগতের ইহ ও পরত্রের সমন্বয়সূত্রে মনুষ্যত্বকে ধারণ করা—তাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এই দিকেই ধাবিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের শাস্ত্র-সংহিতা, বেদ-উপনিষদ্-তন্ত্র-পুরাণ-ষড়দর্শন, বৌদ্ধ শীল-সদাচার, বিনয়, অভিধর্ম ও দার্শনিক তাৎপর্য, মধ্যযুগের সগুণাত্মক ভক্তিপন্থী ও নির্গুণাত্মক জ্ঞানপন্থী সন্তসাধকদের ভাবভঙ্গিমা তিনি তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সাধকের দৃষ্টিতে তাকে ব্যক্তির জীবনে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন।*

উত্তর-বৈদিক কালে ঔপনিষদিক তত্ত্বকথা—রাজযোগ রাজধর্মাবলম্বীদের অর্থাৎ ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচলিত ছিল এবং ব্রাহ্মণ, যাজক ও পুরোহিত সমাজ বৈদিক কর্মকাণ্ড নিয়ে অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ, অথবা নিঃশ্রেয়স ভক্তিমার্গ—এর একটি মুষ্টিমেয় জ্ঞানবাদী সমাজে, অপরটি সংখ্যাগুরু ভক্তসমাজে প্রচারিত হয়েছিল; কিন্তু বৌদ্ধ ভাবধারার প্রবল প্লাবনে আর্য সভ্যতার মূল বনিয়াদ—বেদের প্রতি আনুগত্য এবং চাতুর্বর্ণের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ভেঙে পড়ল। বৌদ্ধ সমাজে ও সঙ্ঘে কাম্য-কর্মানুষ্ঠান ও বৈদিক যাগযজ্ঞ অহরহ নিন্দিত হতে লাগল। চতুরাশ্রমও বৌদ্ধ 'ত্রিশরণে'র খোঁচায় হীনবল হয়ে পড়ল। ফলে এতদিন ধরে বেদপন্থী আর্যসমাজের বৃহৎ অট্টালিকা যে-সমস্ত স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েছিল, বৌদ্ধ মতাদর্শের প্রবল আক্রমণে তার অনেকগুলিই বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তার ফলে ভারতীয় সমাজের যে মূল আদর্শ—গার্হস্থধর্ম, তার স্থলাভিষিক্ত হল 'সঙ্ঘ'। জীবনচর্যা ও প্রব্রজ্যা প্রায় সমার্থ হয়ে পড়ল, গার্হস্থ জীবনকে সঙ্ঘারাম প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলল। একদিকে পায়ের তলার ভূখণ্ড সরে গেল,

* ভারতীয় সমাজের অতীত যুগ সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন: 'জম্বুদ্বীপের তামাম সভ্যতা—সমতল ক্ষেত্রে, বড় বড় নদীর উপর, অতি উর্বর ভূমিতে উৎপন্ন—ইয়ংচিকিয়ং, গঙ্গা, সিন্ধু, ইউফ্রেটিস-তীর। এ সকল সভ্যতারই আদি ভিত্তি চাষবাস। এ সকল সভ্যতাই দেবতাপ্রধান (সভ্য লোকের প্রাধান্য)। আর ইউরোপের সকল সভ্যতাই প্রায় পাহাড়ে, না হয় সমুদ্রময় দেশে জন্মেছে—ডাকাত আর বোম্বেটে এ সভ্যতার ভিত্তি, এতে অসুরভাব অধিক।' [স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ২০৪] 'ভারতীয় আবহাওয়া এই জাতির প্রতিভাকে উন্নততর লক্ষ্যে চালিত করিয়াছিল। এ দেশের প্রকৃতি ছিল কল্যাণময়ী, পরিবেশ ছিল আশু ফলপ্রসূ। সুতরাং জাতির সমষ্টি-মন সহজেই উন্নত চিন্তাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনের বৃহত্তর সমস্যাসমূহের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল এবং সেইগুলিকে জয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। ফলে দার্শনিক এবং পুরোহিত ভারতীয় সমাজে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় নয়।' [বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩৮৭] স্বামীজী ভারতের সঙ্গে চীন, সুমেরীয়, ব্যাবিলন, মিশর, ইরান, ইহুদী রাষ্ট্রগুলির প্রথম যুগে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতের সমাজনেতৃত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। [বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২২৯] বলছেন তিনি: 'এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো ভারতে ঐক্যের বন্ধন হল ধর্ম, ভাষা বা গোষ্ঠী (race) নয়। ইউরোপে গোষ্ঠী (race) নিয়েই জাতি (nation)। কিন্তু এশিয়ায়—যদি ধর্ম এক হয়, তবে বিভিন্ন বংশোদ্ভূত এবং বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের নিয়ে এক একটি জাতি গড়ে ওঠে।' [বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪০২]

অপরদিকে শূন্য, অনিত্য ও অনাত্ম—এই নেতিবাচক মানসিক মূল্যবোধ সাধারণশ্রেণীকে এমনভাবে গ্রাস করল যে, নির্বাণ ও মোক্ষ সাত্ত্বিক লক্ষণ হারিয়ে তামসিক ভোগবাদের দিকে ঢলে পড়ল। বৌদ্ধ 'সব্বং সূন্নং' ও 'নিব্বানং সান্তং'—এই দুই তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে সুখময় ঐহিকবাদের আফিমের রসে ঝিমিয়ে এল। এই সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। তন্ত্রের ভুক্তি-মুক্তিবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ যান-উপযানের আনন্দ-বিরমানন্দ-পরমানন্দ মিশ্রিত হয়ে গিয়ে দেহচর্যাকেন্দ্রিক গোপনচারী উপধর্ম বা 'কাল্ট' (cult) গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে সমাজের অন্ধ গুহায় শিকড় চালিয়ে দিল। উত্তর-বৈদিক যুগে ক্ষত্রিয় সমাজ এবং জ্ঞানবাদী ব্রাহ্মণ সমাজ ঔপনিষদিক তত্ত্বকথা ও সেশ্বরবাদী দর্শনচর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও দেশের আবালবৃদ্ধ এই সমস্ত সুখময় 'যানের' কাছে আত্মবিক্রয় করল এবং রহস্যবাদী দেহচর্যাকেন্দ্রিক গুপ্তপন্থার দিকে সমাজের একটা বড় অংশ মোহাবিষ্ট হয়ে চলে গেল।* এইভাবে অন্তত পাঁচশত বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে অর্ধচন্দ্রচিহ্নিত ধ্বজপতাকাধারী নবজাগ্রত ইসলামধর্ম ভারতে প্রবেশ করেছে উন্মুক্ত তরবারি হাতে করে। এই নবপ্রবুদ্ধ মৃত্তিকা-তলচারী বাস্তব ধর্মবোধের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে ভারতবর্ষ পরাজিত হল। ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের প্রবল আক্রমণের মুখে গ্রাম-জনপদ-নগরচত্বর-মঠ-মন্দির সব ভেসে গেল। রাজ্যশাসন ক্রমে ইসলাম-ধর্মাবলম্বী সারাসেন (Saracen) জাতির অধিকারে চলে গেল। ভোগকেন্দ্রিক পার্থিব ব্যাপার, রাজ্যশাসন, সমাজবিন্যাস, সামরিক বিদ্যা এবং তার সঙ্গে স্বল্প পরিমাণে ভক্তিবাদ ('সূফী') ইসলামের সাহচর্যে ভারতবর্ষের জীবনেও নানা বিক্ষোভ, বিস্ময়, পরিশেষে অসাড় নিষ্ক্রিয়তা এনে দিল।

ইসলামের নব অভ্যুদয় ও অভিযান ভারতীয় আর্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জনজীবনে বেশ চাপ সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু চিত্তের গভীরে আঁচড় কাটতে পারেনি। পার্থিব জীবন সম্বন্ধে একটা বলিষ্ঠ প্রত্যয়যুক্ত আসক্তি এবং নৈতিক একমুখীনতা ইসলামকে কেন্দ্র করে এদেশে সঞ্চারিত হল। কিন্তু দার্শনিক মননের ক্ষেত্রে এবং অধ্যাত্মচেতনা সম্পর্কে ইসলামের বিশেষ কোন গভীর প্রভাব ভারতীয় মানসিকতায় অতি অল্পই দেখা যায়। কারণ জীবনচর্যা ও দার্শনিক মননের দিক থেকে ভারতবর্ষকে নতুন কিছু শেখাবার গুরুদায়িত্ব নিয়ে ইসলামের আগমন হয়নি। ভারতীয় শিথিল সমাজব্যবস্থা ও বিবদমান 'ক্ষত্রপে'র (satrap) বিশৃঙ্খলাকে ইসলামের 'মনোলিথিক' প্রকৃতি অনেকটা আয়ত্ত করেছিল এবং ভারতীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে কয়েকশত বৎসরের জন্য মুমূর্ষু করেও রেখেছিল। তাতে প্রচণ্ড মানসিক বলের পরিচয় আছে, কিন্তু সুদূরবিস্তারী অধ্যাত্মচেতনার কোন লক্ষণ নেই। এইজন্য প্রায় হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের সমাজ ও রাষ্ট্রকে অধিকার ও শাসন করলেও ইসলামধর্ম ভারতের প্রাণের গভীরে আবেগের তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারেনি। অবশ্য ভক্তিবাদী কয়েক শ্রেণীর 'বে-সরা'-পন্থী মুসলমান-সম্প্রদায়

---

* স্বামীজীর ভাষায়ঃ '...চুলচেরা বিচারসত্ত্বেও সমগ্র বৌদ্ধধর্মের প্রাসাদ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল, আর চূর্ণ হইবার পর যে ভগ্নাবশেষ রহিল, তাহা অতি বীভৎস। ...অতি বীভৎস অনুষ্ঠানপদ্ধতিসমূহ, অতি ভয়ানক ও অশ্লীল গ্রন্থরাজি...এ-সবই অবনত বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি।' [বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮]

ভারতীয় সাধনার অত্যন্ত নিকটে এসেছিলেন। তবে তারও পিছনে ছিল প্রচ্ছন্ন আর্য (ইরানীয়) সংস্কার। 'ইরান' শব্দটি সেমেটিক ভাষার শব্দ নয়, এটি খাঁটি ইন্দো-ইরানীয় শব্দের ('আর্যাণাম্') অপভ্রংশ। সে যাই হোক, ইসলামের প্রবল মর্তপ্রীতি, জাতপাতের বেষ্টনীভঙ্গ এবং ভ্রাতৃত্ববোধের নিবিড় অনুভূতি ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় যে বাইরের দিকে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মধ্যযুগের সন্তসাধক-সম্প্রদায় আত্মনিবেদন-মূলক ভক্তিপন্থা প্রচার করে সাময়িকভাবে ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ইসলামের গতিরোধ ও ধর্মান্তরীকরণের প্রবল প্রচেষ্টাকে কিছুটা রুখতে পেরেছিলেন।* কিন্তু ভারতীয় আর্যসভ্যতাকে আর বেদ-উপনিষদের যুগে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হল না। ছত্রিশখানি পুরাণে-উপপুরাণে মিলে তারস্বরে আর্তনাদ শুরু করলেও পৌরাণিক যুগে মানবমহিমার নতুন কোন বাণীমন্ত্রে ভারতীয় সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করতে পারল না। কোটি কোটি দেবদেবী পূজাভোগরাগাদি গ্রহণ করতে লাগলেন। ভারতীয় হিন্দুসমাজ মোটামুটিভাবে পৌরাণিক মতে চললেও ইসলামের আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারল না। তখন সমগ্র দেশ নৈতিক আদর্শ ও অধ্যাত্ম-সংস্কারের দিক থেকে প্রায় দেউলে হতে বসেছে, ধর্মান্তরীকরণের দ্বারা মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি হলেও ভারতীয় ঐতিহ্য মননের দিক থেকে বিশেষ লাভবান হতে পারেনি। তিন-চার শত বৎসর আগে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে বিচিত্রতর জীবনচর্যা ও কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী শ্বেতাঙ্গ বণিক ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং গঞ্জে, পত্তনে, বন্দরে পশরা বিছিয়ে বসে। এরাই যথার্থ ভারতীয় ভাবের প্রতিকূল সংস্কার ভারতবর্ষে নিয়ে আসে। ইসলাম ও তার সেবকেরা প্রধানত প্রাচ্যভূমিতে আবির্ভূত। প্রথমদিকে তার সঙ্গে ভারতের অমিত্র-সম্পর্ক থাকলেও ভারতীয় ভাবভাবনা এবং সারাসেনীয় সভ্যতা মোটামুটি এক মাটির রসে লালিত হয়েছে—উভয়ের প্রাণবিন্দু হচ্ছে প্রাচ্য সংস্কার।

কিন্তু ইউরোপ থেকে আনীত খ্রীষ্টানধর্ম প্রাচ্যের ধর্ম হলেও পশ্চিমের ঘরে গিয়ে সে কুলত্যাগ করেছে। সেই ধর্মাবলম্বীরা কোন দিক দিয়েই নিদ্রাতুর প্রাচ্যভূমির আত্মীয় হয়ে ওঠেনি। অপরদিকে ইসলামের সঙ্গে আপাত বিরোধ ঘটলেও পরস্পরের বোঝাবুঝি হতে অধিক বিলম্ব হয়নি। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকার খ্রীষ্টানধর্মাবলম্বী শ্বেতাঙ্গ সমাজ আগাগোড়া কর্মঠ, বাস্তব, সদাজাগ্রত এবং ইহজীবনের প্রতি অতিশয় আসক্ত। তারা সপ্তাহব্যাপী জীবনের মধ্যে ছদিন ব্যয় করে তৈল-তণ্ডুল-ইন্ধন সংগ্রহে এবং 'সাবাথ ডে'-কে পৃথক করে রাখে ধর্মচর্যার জন্য। পাঁচ বার নমাজ-পাঠ বা ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী-পাঠ তাদের দৈনন্দিন কর্মজীবনে ঠাঁই পায় না। তারা কর্ম ও ধর্ম, পার্থিব ও অপার্থিব, মর্ত ও অমর্ত— এই দুই পৃথক শ্রেণীতে জীবনধারণকে স্পষ্ট ভাগ করে নিয়েছে। বস্তুত খ্রীষ্টানী আদর্শের ও জীবনযাপন-প্রণালীর সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার যথার্থ অনাত্মীয়তার সম্পর্ক, ইসলামের সঙ্গে নয়।

---

* এই যুগ সম্বন্ধে স্বামীজী মন্তব্য করেছেন : 'মুসলমানযুগে উত্তরভারতে বিজয়ী জাতির ধর্মে দীক্ষা-গ্রহণ হইতে জনসাধারণকে নিবৃত্ত রাখাই ছিল সকল আন্দোলনের মুখ্য প্রয়াস; তাহারই ফলে সে-সময়ে ধর্মজগতে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় সমানাধিকারের ভাব দেখা দিয়াছিল।' [বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৩]

॥ ৩ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে নতুন ধরনের এক উৎকট শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনাদর্শের প্রবল উচ্ছ্বাস আসতে শুরু করল। ইসলামের তরবারি ও তসবি তাকে সন্ত্রস্ত করলেও মূল থেকে আশ্রয়চ্যুত করতে পারেনি। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূঢ় আঘাতে শিক্ষিত-সম্প্রদায় বিহ্বল হয়ে পড়ল। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সেই বন্যাধারায় গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। এদেশের ইংরেজিনবিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণী মনে করেছিল, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের মধ্যেই বর্তমান ভারতের মুক্তি রয়েছে। এই পাশ্চাত্য-প্রেমিকেরা আরও মনে করেছিল, বিদেশী সংস্কৃতির অবাধ-অনুশীলনের ফলে ভারতীয় সংস্কার মুছে ফেলা যায়। কিন্তু সংস্কৃতি ও জীবনচর্যা শুধু বাইরের দিক থেকে অনুকরণের ব্যাপার নয়, জাতির পূর্বতন কুলধর্মের সঙ্গে নাড়ির অচ্ছেদ্য বন্ধন সহজে কেটে ফেলা যায় না। সেকথার মূল তাৎপর্য উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কেউ কেউ অনুধাবন করেছিলেন। তাঁরা একথা নিশ্চয় বুঝেছিলেন যে, জাতীয় সংস্কার পিরান-কামিজের মতো নয় যে, ইচ্ছে হলেই তা খুলে ফেলা যায় বা যথেচ্ছা বদলানো যায়।

ভারতবর্ষের ধর্মকর্ম, শীলসদাচার, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মীয় আচার-আচরণ কালের প্রয়োজনে নানা পরিবর্তন স্বীকার করে নিয়েছে। বস্তুত পরিবর্তন ভারতচেতনার একটি প্রধান লক্ষণ। ব্রহ্ম আছেন, সগুণ সোপাধিক ঈশ্বর আছেন, পৌরাণিক দেবদেবী-সঙ্ঘ রয়েছেন, যতিজীবনের আদর্শ নন্দিত হয়েছে, আবার ভোগজীবনকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর-কারুণ্যলাভে ব্যাকুল ভক্তসম্প্রদায় এবং নিছক কার্যকারণতত্ত্বে বিশ্বাসী বার্হস্পত্য-সম্প্রদায়, পরম আস্তিক এবং ষোল আনা নাস্তিক—ভারতবর্ষীয় মানবযাত্রার মিছিলে সকলেই স্থান পেয়েছেন। ইউরোপের ইতিহাসে যাঁরা খ্রীষ্টানধর্ম সম্বন্ধে বা এর কৃত্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেছেন, তাঁরা সকলেই সদলে 'হেরিটিক' বা 'অ্যান্টিখ্রাইস্ট' আখ্যায় নিন্দিত হয়েছেন এবং জ্বলন্ত চিতায় ভস্ম হয়ে গেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যমত ও বৌদ্ধমতের দর্শনপ্রস্থানগত প্রচণ্ড বিরোধের দিনেও এরকম তীব্র সঙ্ঘর্ষের সংবাদ দুর্লভ। বিশেষ ধরনের মানসিকতা, শিক্ষা, মননচর্যা, ধর্মীয় কৃত্য, আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি ব্যাপার কোন একটা অচল অজড় আদর্শে সমস্ত জাতিকে শিলীভূত ও নিষ্ক্রিয় করে রাখেনি, কালগতিকে পরিবর্তনের অমোঘ নীতি জীবনে, চিন্তায় ও আদর্শে স্বীকৃত হয়েছিল বলে এমন একটি সর্বজনগ্রাহ্য মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল, যাকে আমরা একালে 'ভারতধর্ম' আখ্যা দিতে পারি।* পাশ্চাত্য জাতিরা একে বলেন 'রেলিজিয়ন'। লাটিনে

* ভারতীয় সমাজব্যবস্থার নীতি সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন : 'ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকব। আর্যদের (ভারতীয়দের) উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করব, আমাদের চেয়ে বড় করব। ইউরোপের সভ্যতার উপায়—তলওয়ার; আর্যের উপায়—বর্ণবিভাগ। ...ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।' [বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১১] ভারতের বর্ণপ্রথা সম্বন্ধে আরও বলেছেন স্বামীজী : 'সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন।' [বাণী ও

'religare' শব্দটি যদি 'religion' শব্দের উৎস হয় তাহলে দেখা যাবে religion-এর মধ্যে 'বাঁধাবাঁধি নিয়ম'—এই ধরনের অর্থ লুকিয়ে আছে। 'Creed' শব্দটির অন্তরালে রয়েছে আর একটি লাটিন শব্দ 'credo' অর্থাৎ বিশ্বাস। তাই creedal religion-ও শক্ত ধরাবাঁধা বিশ্বাসের অধীন। হিন্দুধর্ম, যা ইসলাম অভিযানের পূর্বে আর্যধর্ম নামেই সাধারণ সমাজে পরিচিত ছিল, তা কিন্তু পশ্চিমদেশের religion নয়, creed-ও নয়। আর্যধর্মপ্রণালী হল এক ধরনের জীবনচর্যা, যা দেশ-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্তনসাপেক্ষ।

দেবদেবী-সংক্রান্ত বহু লৌকিক ধর্মবিশ্বাস হিন্দুধর্মের কায়া গঠন করলেও এ-ধর্ম মূলত বহুদেববাদী নয়, একদেববাদীও নয়। এ হচ্ছে আত্মাবাদী। আত্মার স্বরূপসন্ধান আর্যসাধনার মূল কথা। আত্মা ও তাঁর পরিপার্শ্ব এ-দুয়ের প্রকৃত সম্পর্ক নির্ধারণ ভারতীয় ধর্মানুশীলন, দার্শনিক চর্চা ও বিবিধ কৃত্যের একমাত্র ফলশ্রুতি। এক সদ্বস্তু সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলে বাইরের ইন্দ্রিয়জ জগৎচেতনা সম্পর্কে কোন ভ্রান্তিরই অবকাশ থাকবে না। উনিশ শতকের ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলা দেশে, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ এই অন্তর ও বাইরের সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। ইংরেজিভাবে লালিত কয়েকজন ক্রুদ্ধ তরুণকে বাদ দিলে দেখা যাবে, পাশ্চাত্য জলতরঙ্গ এদেশের মনোমৃত্তিকায় প্রবল বেগে আছড়ে পড়লেও তাতে আত্মভ্রষ্ট হয়েছিলেন গুটিকয়েক ব্যক্তি—সমগ্র জাতি ও সমাজের তুলনায় যাঁরা সমুদ্রতটের বালুকণা মাত্র। রামমোহন ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় উপনিষদ্ ও বেদান্তের উপর ধর্মসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করে মনে করেছিলেন, পৌরাণিক যুগটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার এবং তাকে ইতিহাস থেকে স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুরাগীরা বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা না করে ঐতিহাসিক তথ্যাদির বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন ঃ উপনিষদ্, বেদান্ত ও ষড়দর্শনের নানা প্রস্থান সাধারণের মনে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং পৌরাণিক সংস্কার সমগ্র ভারতবর্ষকে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলকেই আশ্রয় দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র পৌরাণিক ঐতিহ্যকে ভারতের মানচিত্র থেকে মুছে না দিয়ে তার বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে প্রস্তুত হলেন। এই সময়ে সাগরপারের শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতদের কেউ কেউ নিছক কৌতূহল ও গবেষণাবৃত্তির বশে বিবিধ পুরাণ-উপপুরাণ সম্বন্ধে নানা তথ্য সন্ধান করতে লাগলেন। দেখা গেল, উত্তর-বৌদ্ধ ভারতবর্ষ প্রধানত পৌরাণিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। অতিনিন্দিত পুরাণের যথার্থ তাৎপর্য কি, দেশের আপামর

রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৯০] '...পুত্র সর্বক্ষেত্রে পিতার বৃত্তি গ্রহণ করবে—এই রীতি থেকেই এর উৎপত্তি। কালক্রমে এই বৃত্তিগত সম্প্রদায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়। এই প্রথা মানুষকে যেমন বিভক্ত করেছে, তেমনি আবার সম্মিলিতও করেছে, কারণ এক শ্রেণী- বা জাতি-ভুক্ত ব্যক্তি তার স্বজাতিকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করতে দায়বদ্ধ...।' [বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪০৩] 'জাতিভেদ বৈদান্তিক ধর্মের বিরোধী। জাতিভেদ একটি সামাজিক প্রথা...। জাতিভেদ রাজনীতিক ব্যবস্থাসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। উহা বংশপরম্পরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির সমবায় (Trade Guild)।' [বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড. চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪৯৩]

জনসাধারণ পৌরাণিক-ভাবের দ্বারা কেন পরিচালিত হয়েছে, সে-বিষয়ে ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

॥ ৪ ॥

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বাস্তব ভারতবর্ষ ও ধ্যানের ভারতবর্ষ একসূত্রে মিলিত হয়েছিল। আমরা ইতিপূর্বে ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে বলেছি যে, ভাবের দৃষ্টিতে দেখলে, চোখে ভালবাসার রঙ ধরলে বাস্তব ক্ষুদ্রতা ও অসম্পূর্ণতা দূর হয়ে যায় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ বোধ জন্মলাভ করে—এ বোধ নিষ্কাম ও অহেতুক। একেই বলতে পারি উপযোগবাদের এলাকা বহির্ভূত বিশুদ্ধ চিদানন্দময় অনুভূতি। ভালবাসার দৃষ্টিকে রসের দৃষ্টি ও আনন্দের বোধ বলা যেতে পারে। স্বামীজী এই বোধের প্রতীকপুরুষ, এবং তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের অন্তরে তিনি এই ভালবাসা জাগাতে চেয়েছিলেন, নিজেও এই ভূমি থেকে তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করেছিলেন।

যাঁরা স্বামীজীর ইংরেজি গ্রন্থ ও বাংলা রচনা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অবহিত আছেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, ইতিহাসচেতনা তাঁর একটি বিশিষ্ট মনোভঙ্গি। তিনি সমাজবেত্তা, ধর্মের সংগঠক, ব্যক্তিগত চরিত্রের নিয়ামক এবং সর্বোপরি, সেবাধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ। কিন্তু তাঁর যাবতীয় কর্মপ্রবাহ, লোকহিতৈষণা, অধ্যাত্মসংস্কার—সমস্ত কিছুর মূলে আছে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ভারতবর্ষকে উপলব্ধির চেষ্টা। কালপ্রবাহের মতো সূক্ষ্মচেতনা ও পরিদৃশ্যমান বিশ্বের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা—এই দুয়ের পরম্পরাক্রমে ইতিহাস অগ্রসর হয় এবং অখণ্ড কালপ্রবাহ বাস্তব জীবন ও বোধের সংস্পর্শে এসে খণ্ড খণ্ড বোধে রূপায়িত হয়। ভারতবর্ষের জীবন, ইতিহাস ও সাধনার বিকাশধারা, পরিবর্তন ও পরিণাম বুঝতে গেলে তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের গতিপথটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন, এবং স্বাভাবিকভাবেই স্বামীজী ভারতবর্ষের ধ্যান ও কর্মের মূল প্রেরণা বুঝতে চেয়েছিলেন ইতিহাসের কালক্রম অবলম্বন করে। বৈদিক ও উত্তর-বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক, মর্তজীবী ইসলাম ও ভারতীয় ভক্তিধর্ম, একালের পাশ্চাত্যের ইহবাদী, জীবনসমুখ ভোগকামনা—এ সবই বিবেকানন্দ কালের ক্রমগতি অবলম্বন করে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন।

প্রাচীন, মধ্যযুগ ও উনিশ শতক—এই তিনটি কালপর্যায় ভারতবর্ষের জীবন ও সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে—ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, প্রাচীন ভারতবর্ষ কখনই একান্তভাবে বৈরাগ্যবাদী ছিল না, নৈষ্কর্ম্যের সাধনা করলেও নিষ্কর্মা ছিল না। সেকালে রাজা রাজ্যপাটে বসতেন, যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন, দরকার পড়লে পররাজ্য গ্রাস করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। আবার অন্যদিকে গো-ব্রাহ্মণের সেবা করতেন, চাতুর্বর্ণ্য ও চতুরাশ্রমের বিশুদ্ধি রক্ষা করতেন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের এক-ষষ্ঠাংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত সমাজের উপদেশে তিনি বিনয়-শীলসদাচার ও বর্ণাশ্রমধর্মের নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতেন। একদিকে দৈনন্দিন জীবনধারণের স্বাভাবিক

প্রবণতা, আর একদিকে জীবনাতীত অধ্যাত্মসাধনা, দুদিকেই যাতে সমানুপাতিক ভারসাম্য থাকে, প্রাক্-বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষ তার প্রতি সদাসতর্ক ছিল। ফলে সমস্ত সমাজ ও ব্যক্তিজীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য বর্ণাশ্রমধর্মের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনকে সমন্বয়ের মধ্যে স্থাপন করতে হলে তাকে যে 'বিনয়'-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, তাকেই বলা যেতে পারে জীবনচর্যার চারিটি পর্ব অর্থাৎ চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস)। চতুরাশ্রম ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করত এবং চাতুর্বর্ণ্যের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) দ্বারা শ্রেণীবিন্যাস রক্ষিত হত।* কিন্তু এর ব্যতিক্রম হল বৌদ্ধযুগে, যখন 'আশ্রম' ও 'বর্ণ' ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেল, সঙ্ঘারাম ও প্রব্রজ্যা মানুষের গৃহধর্ম নিয়ন্ত্রিত করতে লাগল, এবং তার ফল হল—বৈরাগ্যের বিকার, মনুষ্যত্বের অপহ্নব, তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতার ধনুষ্টঙ্কার। উত্তর-বৌদ্ধযুগে এক ধরনের রহস্যবাদী, সঙ্গুপ্ত দেহচর্যা 'কাল্ট' ও উপসম্প্রদায়ের সুড়ঙ্গপথে ছড়িয়ে পড়লে কামনাকে দমন করতে গিয়ে প্রচ্ছন্ন কামকে ধর্মের নামে সেবা শুরু হয়ে গেল। তন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান, নাথপন্থ, অঘোরপন্থ প্রভৃতি 'যান' ও 'পন্থ' ক্রমে ক্রমে সমাজের মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়ে দিল। পরস্পর বিবদমান ভারতীয় জাতি-সম্প্রদায় এবং দেহচর্যাকেন্দ্রিক রহস্যময় কৃত্য বিবিধ শ্রেণী ও উপশ্রেণীর মধ্যে অবাধে অনুশীলিত হতে লাগল। এতে অধ্যাত্মবাদের সীলমোহর ছিল। এ বিষাক্ত ভাবপ্রবাহ শঙ্খবিষের মতো সমস্ত জাতিকেই আচ্ছন্ন করে ফেলল।

দর্শনযুগে ভারতের মনন ও সাধনা যে নিষ্কাম কর্মতত্ত্বকে মোহমুক্তির প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল এবং অদ্বৈততত্ত্ব যে জীবনচর্যার চূড়ান্ত বিকাশ বলে গৃহীত হয়েছিল, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য সেই তত্ত্বের বিদ্যুৎ সঞ্চার করে জাতির মোহাচ্ছন্ন দেহমনকে আবার স্বস্থ করতে চাইলেন। কিন্তু তখনই সমগ্র দেশ ও সমাজ এতটা অসাড় হয়ে পড়েছে যে, মুষ্টিমেয় সাধকসম্প্রদায় ও কিছু মননশীল ব্যক্তি এই তত্ত্বকে মানবচেতনার শেষ নিদান বলে গ্রহণ করলেও বৃহৎ জনসঙ্ঘ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রইল। তারপর ইসলামের অভিযানে ভারতীয় ধ্যানধর্মের অনেকটাই আত্মরক্ষার তাগিদে আত্মগোপনশীল গুহাবাস বেছে নিল। অবশ্য মধ্যযুগে আত্মসমর্পণমূলক ভক্তির প্লাবনে এই মানসিক জাড্য দূর করবার চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু সুদৃঢ় মনননিষ্ঠ প্রত্যয় ভাবাবেগে কিছু আত্মহারা হয়ে পড়েছিল, একথাও স্বীকার্য। শ্রীচৈতন্যদেব, তুলসীদাস, কবীর, নানক, রজ্জব, দাদু, মীরাবাঈ, নরসি মেহ্‌টা—এঁরা ভক্তিকে মানবজীবনের চরম

---

* ভারতীয় উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বামীজীর মত হল যে, 'ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির তাগিদে গঠিত বংশানুক্রমিক একটি সমাজ'-ই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। উৎপন্ন পণ্যের মালিক এবং উৎপাদনব্যবস্থার পরিচালক ছিল সমাজ। ব্যক্তি সেই সমাজের সভ্য হিসাবে সমাজ-নির্দেশিত কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখত। প্রধানত কৃষিকার্য এবং দ্বিতীয়ত কুটিরশিল্পের উপরে ভিত্তি করে সমাজগুলি অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার চেষ্টা করত। বৃত্তি অনুযায়ী বংশানুক্রমিক সঙ্ঘ (Guild) উৎপাদক হলেও যোগ্য ব্যক্তিরা অন্যস্তরে যাবার সুবিধা পেত। স্বামীজীর ভাষায়ঃ 'বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ-দ্রোণ-কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল...।' [বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪২]

পুরুষার্থ বলে প্রচার করেছিলেন। মধ্যযুগের ভ্রষ্ট অবস্থা বিবেচনা করলে এঁদের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সহজেই বোঝা যাবে।* অদ্বৈতপন্থা ভিন্ন জাতির বাঁচবার আর কোন উপায় নেই, একথা একালের ভারতবর্ষে রাজা রামমোহন সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। অবশ্য একথা তর্কসাপেক্ষ যে, তাঁর অদ্বৈতপন্থা প্রকৃত অদ্বৈতপন্থা কিনা, অথবা ইসলামি 'মোতাজেলা' ও 'মুওয়াহিদ্দিন' সম্প্রদায়ের যুক্তিপন্থী একেশ্বরবাদ তাঁকে প্রথম জীবনে উদ্বুদ্ধ করেছিল এমন কথাও কেউ কেউ বলতে পারেন। সে যাই হোক, পরবর্তীকালে তাঁর অনুরাগী ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ উপসম্প্রদায় কখনও জ্ঞানমার্গীয় ভক্তিবাদ, কখনও আবেগমূলক ভক্তির রসে নিজেদের আর্দ্র করে, কখনও এই মতকে সামাজিক প্রয়োজনে নিয়োগ করে অদ্বৈতপন্থার উনিশ শতকী টীকাভাষ্য রচনা করেছিলেন। এই সময়ে বাংলা দেশকে কেন্দ্র করে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 'আইডিয়া' দানা বেঁধে ওঠে। একদিকে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ, আর একদিকে লোকহিতৈষণা ও সমাজসংস্কার; একদিকে নব্য পৌরাণিকতা, আর একদিকে ব্রাহ্মসমাজ-অবলম্বিত বেদান্ততত্ত্ব; একদিকে ভারতীয় জীবনের নিষ্কাম কর্ম, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের প্রবল কর্মোদ্যম ও জ্ঞানানুশীলন—এই উভয় কোটির মধ্যে ভারতীয় মানস যখন দুলছিল, ঠিক তখনই ভারতীয় সমাজ ও ভাবজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর মানসসন্তানদের আবির্ভাব হল। বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতের মূল তত্ত্বকথা, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ বুঝে নিয়ে তাকে দেশকালের উপযোগী করে নতুন রূপে ও ভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। এইটি হচ্ছে ভারতসংস্কৃতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনার সর্বোৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

॥ ৫ ॥

স্বামীজী ভারতবর্ষের প্রকৃত পরিচয় সন্ধান করবার জন্য ভারত-পরিক্রমায় বহির্গত হন। বাসনা ছিল—সমস্ত ভারতবর্ষের মূল প্রাণরহস্য আবিষ্কার করবেন। তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন, বহু আঘাত ও বিপদসত্ত্বেও ভারতসভ্যতা যে জাতিকুল হারিয়ে ফেলেনি, বা সংস্কৃতির দিক থেকে বর্ণসঙ্কর হয়ে যায়নি, এর মূল রহস্য সন্ধান করা প্রয়োজন। ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতার বহু অংশ হয় স্বাভাবিক নিয়মে অদৃশ্য হয়ে গেছে, নয় খ্রীষ্টানধর্মের চাপে এমনভাবে রূপান্তরিত হয়েছে যে আজ সেসব ধর্মচর্যা, cult প্রভৃতি জীবন থেকে সরে গিয়ে স্মৃতির যাদুঘরে স্থান পেয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে অনুরূপ বা অধিকতর প্রবল আঘাত এলেও প্রাচীন ভারত কি মন্ত্রবলে মধ্যযুগের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগে উদ্বর্তিত হয়েছে, স্বামীজী সমস্ত ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে, সর্বশ্রেণীর

* স্বামীজী লিখেছেন : 'রামানন্দ, কবীর, দাদু, শ্রীচৈতন্য বা নানক এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্তগণ দার্শনিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও মানুষের সম-অধিকার-প্রচারে সকলে একমত ছিলেন। সাধারণের মধ্যে ইসলামের অতি দ্রুত অনুপ্রবেশ রোধ করিতেই ইঁহাদের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে; ...শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকার লাভ করিবার জন্যই তাঁহারা প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছিলেন।' [বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৩-৯৪]

মানুষের সঙ্গ লাভ করে সে রহস্যের স্বরূপ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।*

তিনি দেখলেন, ভারতভূমির মূল তাৎপর্য হচ্ছে এক ধরনের ভাবের সমন্বয়। একদিকে ব্রহ্মতত্ত্ব, আর একদিকে বহুদেববাদ; একদিকে ঈশ্বরকরুণা, আর একদিকে নিরীশ্বরবাদ; একদিকে সর্বাস্তিবাদ, আর একদিকে নাস্তিক্যবাদ; একদিকে বৈরাগ্য, আর একদিকে ভোগ; একদিকে ব্রহ্মসংহিতা, আর একদিকে কামসংহিতা; একদিকে যুগযুগান্ত ধরে নানা ধর্মীয় কৃত্য ও চর্যার অবাধ অনুশীলন, আর একদিকে জাতিপাতিহীন, পুঁথিপত্রবর্জিত ব্রাত্য সংস্কার। একদিকে আসক্তির পঙ্ককুণ্ডে কর্দমবিলাস, আর একদিকে অনাসক্তির শূন্যতা—এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জীবনপ্রবাহ ধীর মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। বৌদ্ধ, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সংস্কার এই প্রবাহে মাঝে মাঝে কিছু আবর্ত সৃষ্টি করেছে, পরে আবার তা স্তিমিত হয়ে গেছে—জীবন ও ভাবপ্রবাহ যেমন চলছিল, তেমনি চলতে শুরু করেছে। প্রবাহের এই নিরবচ্ছিন্নতার কারণ, বিপরীত ও বিষমকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া ভারতবর্ষের মূল ধর্ম। বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, ধর্ম অনুশীলন ও জীবনচর্যা বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দ একথা সার বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষের সাধনা হচ্ছে বেসুরোকে সুরের মধ্যে আনা, বিরোধকে রোলার চালিয়ে সমভূমি করে দেওয়ার চাইতে তাকে যথাসম্ভব ঐক্যের মধ্যে রক্ষা করা—যাকে ইতিহাসের ভাষায় বলা যেতে পারে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, বিরোধের মধ্যে মিলন, বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি। নানা ছোটখাট ভেদবৈষম্যসত্ত্বেও ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত একপ্রকার ভাবের ঐক্যকে অনুসরণ করেছে এবং সে ঐক্যবোধের মূল প্রেরণা হল ব্রহ্মবাদ। বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব বিচ্ছিন্ন

* ভারতীয় সমাজকে 'স্থবির' আখ্যা দিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে অপবাদ দিয়েছেন, স্বামীজী তার প্রতিবাদ করেছেন। নিম্নোক্ত কারণগুলি স্বামীজীর মতের যথার্থতা প্রমাণ করে ভারতীয় সমাজের প্রাণচাঞ্চল্যের প্রমাণ রেখেছে:

(১) বিভিন্ন চিন্তা ও ভাবধারাকে ভারত চিরদিনই সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্যে সে পরদেশকে আমন্ত্রণ করেছে সাদরে। পরমতসহিষ্ণুতায় ভারত চিরদিনই অনন্য।

(২) যে ঐস্লামিক শক্তি সুদূর আরব থেকে মিশর, জর্ডন, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশে সকলকেই ধর্মান্তরিত করে নতুন সংস্কৃতি নিয়ে এল, ভারতে এসে সে শক্তি সেরকম সাফল্যলাভ করতে পারেনি।

(৩) যে ইউরোপীয় শক্তি আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি উপনিবেশে স্থানীয় অধিবাসীদের নির্মূল করেছে, সে শক্তি ভারতে এসে এ-বিষয়ে বিফল হয়েছে।

(৪) যুগে যুগে বিভিন্ন বহিরাগত জাতি এসে যেভাবে ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে, তেমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

(৫) দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প তথা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সংস্কৃতি-ধর্ম-দর্শন প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে যাওয়া—সকল বিষয়েই ভারত চিরদিনই বিশ্বে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে থেকেছে।

(৬) প্রাচীন সভ্যতার কোন চিহ্ন মিশরে, চীনে, গ্রীসে বা দক্ষিণ আমেরিকায় আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। একমাত্র ভারতই তা আজও অম্লান রাখতে পেরেছে।

(৭) সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভারতীয়দের চিরকালই এমন একটি অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে যা একদিকে যেমন সকল প্রতিঘাতকে সহ্য করেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে, অন্যদিকে তেমনি সকল বহিরাগতকে আত্মস্থ করেছে।

পরস্পর-সম্পর্কহীন কোটি কোটি জীবকে একটি পারমার্থিক ঐক্যবোধের মধ্যে আনতে পেরেছে, যার সঙ্গে ইন্দ্রিয়জ জগতের বিরোধ নেই। তারই ফলে বাইরের ইতিহাসের কুশীলবেরা আকাশ বিদীর্ণ করলেও জাতির অন্তঃপুরে তার কর্কশ কলরব পৌঁছায়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে বিবেকানন্দ যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তাতে তিনি দেখেছিলেন—গোটা জাতটাই যে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেনি বা খ্রীষ্টান হয়ে যায়নি, তার কারণ—নিজের মূল স্বরূপে এ জাতির আস্থা কখনও পুরোপুরি টলে যায়নি। টলে গেলে প্রাচীন ইরানের মতো এদেশে সর্বত্র ইসলামের ধর্মীয় আধিপত্য স্থাপিত হত, অথবা আরবীয় ইসলাম ও ইরানীয় আর্যদের সংমিশ্রণে যেভাবে পারস্যের সূর্যোপাসক জাতি অর্ধচন্দ্রের প্রতীক-পতাকাকে শিরে ধারণ করেছিল, ভারতবর্ষেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারত এবং এদেশেও একটি মিশ্রধরনের ইন্দো-সারাসেনীয় সংস্কার, ধর্মবোধ ও আচরণমূলক বৃহৎ জাতি-সম্প্রদায় গড়ে উঠত। অথবা ইউরোপীয় খ্রীষ্টানধর্মের যেমন নানা আঞ্চলিক রূপ আছে, ভারতবর্ষের মূল ধর্মমত তেমনি তত্ত্বের দিক থেকে নানা ভাগে উপবিভাগে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেত। অবশ্য বৈদিক-ঔপনিষদিক, বৌদ্ধ এবং পৌরাণিক যুগের ধর্মমত ও আচারানুষ্ঠানের অনেক রূপান্তর হয়েছে, দেবদেবী-সঙ্ঘও কায়া বদলিয়ে ফেলেছেন। তবু মূল কুলধর্মে হাত পড়েনি। সে মূল বৈশিষ্ট্য হল রঙ্গনটী প্রকৃতির জড় ও জীবকে কেন্দ্র করে নর্তনবিলাস এবং আকার-অবয়বহীন, কালত্রয়াব্যবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ চিদাত্মাবোধ—যাকে চলতি কথায় বলা হয় ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্মবিহার—এই দুয়ের ভেদ ও বিকল্পের প্রতিভাস সম্পূর্ণরূপে নিরসন। বৌদ্ধযুগের শেষ পর্বে এ সমন্বয়-বন্ধন ছিন্ন হল, কিন্তু পৌরাণিক যুগের কিছু কিছু ভাবগত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও এই সম্পর্ক অস্বীকৃত হয়নি—শুধু অধিকারীভেদ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। বিবেকানন্দ সেই ভারতবর্ষকে পুনরাবিষ্কার করলেন।* এর ফলে নিষ্কাম নিদিধ্যাসন এবং সকাম জীবনচর্যা ও যৌবন, যোগক্ষেম ও ত্যাগ—সর্ববিধ দ্বৈতভাব অদ্বয় ঐক্যের মধ্যে স্থান লাভ করিল। ইংরেজপ্রভাবের পূর্ব পর্যন্ত, ইসলামের অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের এই মনঃপ্রকৃতি মোটামুটি একইভাবে চলছিল। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য ও

---

* পাশ্চাত্যসমাজ ও ভারত একই নীতি বা সূত্র অনুসরণ করে গড়ে ওঠেনি; সমাজব্যবস্থা নিয়ে দুটি পক্ষ 'দুই বিরাট পরীক্ষার' মধ্য দিয়ে চলেছে। [বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৪৪] স্বামীজী লক্ষ্য করেছেন, ভারতে 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বেড়া দেওয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা' এবং পাশ্চাত্যে 'সাম্যবাদের বেড়া দেওয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক সমাজ'। [বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪] ভারতীয় সমাজের আর যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে তা হলঃ

(১) পাশ্চাত্যসমাজের মতো 'তরবারির দাপট' নয়, যুগ যুগ ধরে ভারত চলেছে 'জ্ঞানের প্রদীপ'কে সম্বল করে। ভারতীয় সমাজকে পথনির্দেশ করেছেন বিদ্বজ্জনেরাই, সেনানায়কেরা নন।

(২) পাশ্চাত্যের মতো দাসপ্রথা (Slavery) ও আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) ভারতে দেখা যায়নি।

(৩) সামন্তপ্রথা (Feudalism) ভারতে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেনি।

(৪) ভারতীয় সমাজে ভূমির রাষ্ট্রায়ত্ত চরিত্র অতীতকাল থেকেই দেখা যায়।

(৫) উৎপাদন-ব্যবস্থায় (mode of production) ভারতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

(৬) কোন কোন ঐতিহাসিক ভারতীয় সমাজকে 'স্থবির' অপবাদ দিলেও ভারত চিরকালই প্রাণচাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়ে এসেছে।

জীবনসাধনার যথার্থ প্রতিকূলতা নিয়ে উপস্থিত হল ইউরোপীয় সভ্যতা।

খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ এদেশে করুণার ধর্ম (religion of mercy) প্রচার করলেও ইউরোপীয় জীবনধারার প্রবল আসক্তিযোগই ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের আলোড়িত করেছিল। বৌদ্ধদের সর্ববৈনাশিক শূন্য যেমন শঙ্করাচার্য-ব্যাখ্যাত ব্রহ্মতত্ত্বের সহোদর নয়, তেমনি খ্রীষ্টানসঙ্ঘ প্রচারিত ধর্ম ও নীতিচর্যা ভারতধর্মের নিকটতম আত্মীয় নয়। কারণ শিক্ষিত ভারতীয়দের অনেকেই দেখেছিলেন পাশ্চাত্য ধর্মানুষ্ঠান ও জীবনচর্যা ধর্মের জীবন ও কর্মের জীবন, ত্যাগের জীবন ও ভোগের জীবন, রবিবাসরীয় ক্রিয়াকর্ম ও অন্য ছ-দিনের জীবিকার্জন প্রচেষ্টা—এই দুই ব্যাপারকে পৃথক রেখে চলতে উপদেশ দিয়েছিল। ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু অংশ এই ইহকামী এবং বাস্তব-জীবনে সফল পাশ্চাত্য ভোগবাদী জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ক্রমে খ্রীষ্টান ধর্মান্তরীকরণের জোয়ার মন্দীভূত হয়ে পড়ল। প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ এবং ঈষৎ পরে বঙ্কিম-নেতৃত্বে নব্য হিন্দুসমাজ প্রাচীন ভারতকে নতুনভাবে আবিষ্কারের চেষ্টা আরম্ভ করলেন। স্বামীজী এই সমস্ত ভাব ও আদর্শের প্রতিক্রিয়া প্রথম যৌবনেই উপলব্ধি করেছিলেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে ও তত্ত্বোপদেশে ভারতবর্ষের যথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করলেন। বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য অথবা শঙ্করকৃত উপনিষদ্-ব্যাখ্যা সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর পূর্ববর্তী না হলেও এই তত্ত্বটি ভারতীয় চেতনায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা রূপান্তর ও পরিবর্তন হলেও এই চিন্তাটি ভারতবর্ষ কোনও দিন বর্জন করেনি। কিন্তু বৌদ্ধ ও ইসলাম আদর্শের সঙ্ঘাতে এই চিন্তাচর্যা কিছু আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। এবং জাগ্রত জীবন থেকে সরে গিয়ে ক্রমেই 'বনের বেদান্ত' হয়ে উঠেছিল। দ্বৈতবাদী নানা প্রস্থান, ভক্তিবাদের পুলকময় বিপুল প্লাবন এবং দেহকেন্দ্রিক ভুক্তি-মুক্তিবাদী রহস্যময় কৃত্যানুকৃত্য সত্ত্বেও মধ্যযুগের তত্ত্বাদর্শ থেকে এই মননধারা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়নি। কারণ এটাই ভারতবর্ষের নিজস্ব কুলধর্ম। কুলধর্ম পরিত্যক্ত হলে সমস্ত জাতীয় কাঠামোই ভেঙে পড়ে এবং দেশ ও সমাজ অবশ্যম্ভাবী বিনাশের দিকে ছুটে চলে। তখন কিছু গ্রন্থ ও স্থাপত্যকর্ম ছাড়া একটা বিশাল জাতির আর কোন স্থাবর চিহ্ন থাকে না। উদাহরণস্বরূপ মনে পড়বে প্রাচীন আইওনীয় সভ্যতা, মধ্যপ্রাচ্য-ঐতিহ্য প্রভৃতির কথা। ভারতবর্ষকে সে অপঘাত থেকে রক্ষা করেছে এমন একটি মননধর্ম ও জীবনচর্যা, যা জীবনের কোন একটিকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি, বা মানুষের ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে পুরাতন স্মৃতিসংহিতার অনুশাসনে অচল করে রাখেনি। মধ্যযুগে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ভেঙে পড়লে এবং বৈদেশিক শাসকশক্তির প্রবল চাপের ফলে এই অদ্বৈত সমন্বয়বোধ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কিছু অসাড় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ইউরোপীয় ভাবধারার প্রবল সংঘর্ষে সেই পুরাতন ভাববস্তু আবার নবরূপে জেগে উঠল। রামমোহন—দয়ানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ—কেশবচন্দ্র—বিবেকানন্দ সেই সত্যটিকেই নানা দিক থেকে দর্শন করে জাতীয় জীবনের অনুকূলে তাকে ব্যক্তিজীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই তত্ত্বই ইউরোপ-আমেরিকার বুদ্ধিজীবী সমাজের যুক্তিবুদ্ধিকে কৌতূহলী করে তুলেছিল। তাঁরাও অনুভব করেছিলেন, এই

ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বটি আসলে কোন দেশকালের গণ্ডিবদ্ধ ব্যাপার নয়। সর্ব দেশে ও কালে এর একটা সর্বজনীন আবেদন আছে।* স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ততত্ত্বের মূল কথাকে একালের মানবসমাজে একালের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করেছেন।

কালক্রমে ব্রহ্মতত্ত্বের লোকপ্রচলিত অর্থ হয়ে পড়েছিল—ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত সবই মায়িক ও প্রাতিভাসিক অর্থাৎ ব্যক্তিপ্রত্যয়জাত এবং ইন্দ্রিয়জ বস্তুচেতনা আসলে একটি শূন্যগর্ভ বিরাট নেতিবাদ—এই ধরনের একটি অর্ধদার্শনিক তত্ত্বকথা শুধু লোকসমাজে নয়, সুধীসমাজেও গৃহীত হয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়া হল বাস্তব ভীরুতা ও প্রতিদিনের জীবনচর্যার প্রতি অনীহা, নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা—যাকে চিত্তের জড়ত্ব ছাড়া আর কিছু নাম দেওয়া যায় না। পারমার্থিক দৃষ্টিতে নিষ্কল ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণ এবং জগদ্ব্যাপারের প্রতি অলস ঔদাসীন্য—ভারতবর্ষের সমাজজীবনের অধোগতি এই কারণেই ত্বরান্বিত হয়েছিল। নৈষ্কর্ম্য ও বিগতস্পৃহার অর্থ জীবনকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া নয়। এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল ও সাধককে 'নির্মম' পলাতক সন্ন্যাসীতে পরিণত করেছিল, মানুষের দুঃখ-দুর্গতিকে 'স্বপ্নো নু, মায়া নু'** বলে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। বিবেকানন্দ এপথের পথিক নন। বেদান্ত তাঁকে বেশী করে মানব-পথিক করে তুলেছে, নিজ জীবন সম্পর্কে অনাসক্ত হয়েও তিনি পতিত ও আত্মবিশ্বাসহীন জাতির পাতিত্যমোচনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব যে 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্'*** বলে সুদুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মোক্ষ-নির্বাণেচ্ছাই নয়। দুঃখ-ব্যাধির ত্রিবিধ পীড়নে জীবের সকরুণ পরিণাম দেখেই এই রাজসন্ন্যাসী তত্ত্বকথার গহনতা ছেড়ে দিয়ে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য শুধু নিজস্ব তত্ত্বোপলব্ধি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে ভারতের চতুঃসীমায় মঠ প্রতিষ্ঠিত করে বৌদ্ধধর্মের বিকার থেকে আর্যমানসিকতাকে পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হতেন না, এবং স্বামীজীও হিমাচলগুহাবাস ছেড়ে আধুনিক জীবনের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন না।

বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্বই যে আধুনিক বিশ্বের একমাত্র পরিত্রাণের পথ, এবং এটি কোন সাম্প্রদায়িক বা বিশেষ দেশের কুক্ষিগত তত্ত্বকথা নয়, পরন্তু যে-কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তিই (তিনি যে দেশের এবং যে সময়েরই হোন না কেন) এই তত্ত্বদৃষ্টির সাহায্যে মানসিক প্রদাহ মেটাতে নিজেই সক্ষম, পাশ্চাত্যবিশ্বে বিবেকানন্দ সেই কথাই অসাধারণ যুক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পশ্চিমের বাস্তববাদী ও কর্মনিষ্ঠ জাতিকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ না করলে তাদের চিরচঞ্চল রাজসিক সংস্কার কখনও সুগভীর আত্মপ্রত্যয়ে পৌঁছাতে পারবে না। তাই স্বামীজী পাশ্চাত্যে বেদান্ততত্ত্বকে

---

* স্বামীজী মন্তব্য করেছেন ঃ 'ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে, যে-কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের পরে, তাহারই অনুবর্তিভাবে একটি রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে এবং ঐ বোধই আবার যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে শক্তিশালী করিয়া থাকে।' [বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪] বিভিন্ন মহাপুরুষের ধর্মীয় আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে এক এক অধ্যায়ে এক একটি নবযুগের সূচনা করেছে। বিভিন্ন যুগের ভারতীয় 'রেনেসাঁস'গুলি এসেছে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকেই কেন্দ্র করে।

** অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, ৬।১০ *** ললিত-বিস্তর, ১৯।৫৭

প্রধানত জ্ঞানবাদের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে যেসব ভক্ত তাঁর ঘনিষ্ঠতর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের তিনি জ্ঞানবাদ থেকে আত্মোপলব্ধিমূলক সূক্ষ্ম চেতনায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এই তত্ত্বটিকে একালের প্রাণ-সঞ্জীবনী মন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি মূলত কর্মযোগ ও সেবাধর্মের দিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। নিদ্রাতুর প্রাচ্যজাতিকে মানবত্বের মহিমায় উন্নীত করতে হলে তাকে রাজসিক কর্ম ও সাত্ত্বিক সেবাধর্মের মধ্যে টেনে আনতে হবে। তা নইলে তার বহু-শতাব্দী-ব্যাপী মানসিক জড়তা, যাকে আমরা অধ্যাত্মসাধনা বলে ভুল করি (মোহনিদ্রাকে বাহ্যত যোগনিদ্রা বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক), এই চিত্তবৃত্তির নিষ্ক্রিয়তা শেষ পর্যন্ত একটা জাতির কর্মজীবনকে তামসিক জড়তার কুম্ভীপাকে নিক্ষেপ করবে। এ-সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন। সেইজন্য অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্শ্বচরদের শুধু ধ্যানধারণার তুরীয় লোকে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করতে দেননি। ভারতের কোটি কোটি মানুষের পাতিত্যমোচনের জন্য অনুরাগী শিষ্যদের সেবাধর্মের মধ্যে বেদান্তের নতুন তাৎপর্য খুঁজতে বলেছেন। লোকশিক্ষা, জীবসেবা, সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা, শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্বোপদেশ প্রচার—এগুলি অতি প্রত্যক্ষ সত্য। ব্রহ্মতত্ত্বের দোহাই দিয়ে যাঁরা এসব জগদ্ব্যাপারের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকেন এবং এ সমস্ত প্রচেষ্টাকে কর্মবন্ধন বলে মনে করেন, তাঁরা জীবনভীরু পলাতক, যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞ মাত্র। একালের ভারতবর্ষের জীবনযাত্রাকে পরিত্যাগ এবং ইতিহাসের ধারাপ্রবাহকে অস্বীকার করে নয়, পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্যাপারের প্রতি উদাসীন থেকেও নয়,—সমে ও বিষমে, সুরে ও বেসুরে যে মানবসঙ্গীত অহরহ বেজে চলেছে, যাতে ভাল-মন্দ, আলো-অন্ধকার একাকার হয়ে গেছে, তাকে অতিপ্রত্যক্ষ সত্য বলে গ্রহণ করে লোকজীবনকে তার প্রতি আকৃষ্ট করা এই নব্য বেদান্ততত্ত্বের মূল লক্ষ্য। ভারতবর্ষের এই স্বরূপটি একালের ইতিহাস ও সমাজের পটে বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই হচ্ছে স্বামীজীর ধ্যানের ভারতবর্ষ। এই বিশাল দেশ-কাল-পাত্রকে তিনি নবজীবনের এক উদার উপলব্ধির মধ্যে ধারণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই দৃষ্টি ও ধারণা বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের দৃষ্টি নয়, রাগানুরাগ বিবর্জিত ত্যাগের দৃষ্টিও নয়। এ হচ্ছে নিষ্কাম ভালবাসার আবেগ। কথাটা বাহ্যত অযুক্তিযুক্ত বলে মনে হলেও পরমার্থত সম্পূর্ণরূপে প্রাসঙ্গিক। সকাম ভালবাসা হচ্ছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা'। নিষ্কাম ভালবাসা হল 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা'—একালের ভাষায়—জীবসেবা। এই বিরাট জীবনপ্রবাহ ও ইতিহাসের ধারাকে বিবেকানন্দ এই মানবপ্রেমের রসেই উপলব্ধি করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গুরুর কাছে এই দীক্ষা লাভ করেছিলেন। দেশ-কাল-পাত্রের খণ্ডিত ভৌগোলিকতা ভুলে গিয়ে সীমাবদ্ধের মধ্যেই অসীমতাকে, সহস্র বন্ধনের মধ্যে মুক্তিকে, স্নেহ-ভালবাসা-সেবার মধ্যে দুঃখাভিভূত মানুষকে জীবন্ত সত্যরূপে এবং খণ্ড তুচ্ছের মধ্যে বৃহতের স্বরূপ উপলব্ধি—মানসিক এই প্রবণতা বিবেকানন্দের দান। কারণ তিনি ভারতবর্ষের যথার্থ রূপটি শুধু ধ্যানের মধ্যে নয়—জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পরবর্তীকালে যাঁরা রাজনীতি, সমাজসংস্কার, সংস্কৃতি ও শিল্পকলায় নানা আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই তাঁরই করধৃত দীপবর্তিকার সাহায্যে

পথের সন্ধান করেছিলেন। যে আধুনিকতা ফ্যাশন মাত্র নয়, যে শিল্পকলার অনুশীলন ও আলোচনা 'ডিলাটেন্টে'র অবসর বিনোদনের সঙ্গী নয়, যে সমাজবিজ্ঞান শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয় এবং যে রাজনীতি শুধু শূন্যগর্ভ আন্দোলনসর্বস্ব নয়, পরন্তু যার মধ্যে ভারতের যথার্থ পরিচয় নিহিত আছে—স্বামী বিবেকানন্দ সেই ভারতবর্ষকেই আবিষ্কারের প্রয়াস করেছিলেন, সেই ভারতের ধ্যানমূর্তি তিনি প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন গৌরব ও একালের পাতিত্য, আরণ্যক যুগের মহর্ষি এবং একালের 'পারিয়া', অনন্ত ও সান্ত—সমস্ত বিপরীতকে বৃহত্তর মানবচেতনালোকে উপস্থাপিত করে ভারতবর্ষের নিত্যস্বরূপের যে মূর্তি তিনি ধ্যান করেছিলেন, তাকেই মানব-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলা যেতে পারে। তাই বিবেকানন্দই যথার্থ 'ভারতপথিক'। ভারতবর্ষ অস্তি ও নাস্তির মধ্যে সংশয়চিত্তে দোদুল্যমান নয়, জীবনকে মায়া বলে পরিত্যাগ করাও তার অভীষ্ট নয়, 'হেডনিস্ট' ও 'এপিকিউরিয়ন'দের মতো ঐহিক সুখানুভূতিকে পরম পুরুষার্থ বলে উদ্বাহু হওয়া ভারতের স্বভাববিরোধী। পিপ্পলী শাখাস্থিত দুই সুপর্ণের মতো ভারতবর্ষ ইহ ও পরত্রের যে সমন্বয়ের সাধনা করেছে, নিষ্কাম জ্ঞানসাধনা ও সকাম ভক্তিসাধনাকে যেভাবে সমন্বিত করেছে, তা শুধু দেশকালে পরিব্যাপ্ত কোন সীমাবদ্ধ তত্ত্বকথা নয়, বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপও নয়—তার মূল এ জীবনমৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত। স্বামী বিবেকানন্দ সেই নিত্যকালের ভারতবর্ষকে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নবরূপে দর্শন করেছেন এবং সমগ্র জাতিকে ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে তার মধ্যে আহ্বান করেছেন। নরের মধ্যে নরোত্তম এবং নরোত্তমকে নারায়ণে উন্নীত করাই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপদেশ। সে সাধনা কুটিলগতিতে প্রায় হাজার বৎসর ধরে অবহেলিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে বিবেকানন্দ সেই নরনারায়ণতত্ত্ব দুঃখহত ভারতবাসীর মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। এই হচ্ছে তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে প্রচারিত ধ্রুববাদে (positivism) বা উপযোগবাদে (utilitarianism) মানুষের কল্যাণ স্বীকৃত হয়েছে বটে, কিন্তু সে কল্যাণ নিতান্তই জীবধর্মী-মানুষের আহার-নিদ্রার কথা। সে মানুষ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক। সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র বা সমাজশক্তি হস্তগত করে বহুজনের কল্যাণসাধনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে কল্যাণসাধনার মূল কারণটি কিছু অস্পষ্ট। নর-কে নরোত্তমে পরিণত করা ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সমাজের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু নরোত্তম নারায়ণে উদ্বর্তিত না হলে মানবজীবনের মৌলিক তাৎপর্য বোঝা যাবে না। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতচেতনাকে এই দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। এইজন্য কোঁত, মিল, জেরিমি টেলর প্রভৃতির তুলনায় স্বামীজীর সাধনরীতি ও ক্রিয়াপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। মানুষকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রশাসনগত অধিকার দিলেই তার একান্ত কল্যাণ করা যায় না, তার অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থা করলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। তার মধ্যে অন্তর্লীন বৃহৎ সত্তার উদ্বোধন, ক্ষুদ্রতম অণুকে বৃহত্তমের সমপর্যায়ে উপলব্ধি, কারণ প্রকৃতির দিক থেকে দুই-ই এক—ভারতবর্ষের এই অদ্বৈতবাদ স্বামীজী নতুনভাবে জাগিয়ে তোলেন। মুমূর্ষু ভারতের বাঁচবার একমাত্র পথ এই অদ্বয়বোধ, যা মানবকল্যাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। স্বামীজী বর্তমান ভারতের কানে সেই মহামন্ত্র জপ করেছিলেন।

ভারতসংস্কৃতিতে স্বামীজীর অবদান

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এঁকেছেন উইল ডুরান্ট ঃ 'বিশলক্ষ বর্গমাইলব্যাপী এই বিশাল উপদ্বীপ; আয়তনে আমেরিকার দুই-তৃতীয়াংশ এবং ভারতের অধিভূ গ্রেট ব্রিটেনের বিশগুণ। এখানে বাস করে বত্রিশ কোটি মানুষ—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সমবেত লোকসংখ্যার চাইতেও বেশী এবং পৃথিবীর জনসংখ্যার একপঞ্চমাংশ। খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ২৯০০ বা তারও পূর্বেকার মহেঞ্জোদারো থেকে উদ্ভূত বিকাশ ও সংস্কৃতির গভীর প্রভাবশালী অবিচ্ছিন্ন ধারাটি সাম্প্রতিককালে প্রকটিত হয়েছে গান্ধী, রমন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। বর্বর পৌত্তলিকতা থেকে শুরু করে প্রতিটি উন্নত পর্যায়ের ধর্মমত এবং সর্বোপরি সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক সর্বেশ্বরবাদ দেখা যাবে এদেশে। খ্রীষ্টধর্মের আটশ বছর পূর্ব থেকে আটশ বছর পরে শঙ্করাচার্য পর্যন্ত এদেশের দার্শনিকগণ ঔপনিষদিক অদ্বৈততত্ত্বের ভিত্তিতে হাজার রকমের ভাববৈচিত্র সৃষ্টি করেছেন। এদেশের বৈজ্ঞানিক তিন হাজার বছর পূর্বে জ্যোতির্বিদ্যা বিকাশ করেছেন এবং ইদানীংকালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। এদেশের গ্রামে-গঞ্জে অনির্ণেয় অতীতকাল থেকে গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এদেশের রাজধানীগুলিতে রাজত্ব করেছেন অশোক ও আকবরের ন্যায় প্রাজ্ঞ ও হিতকারী প্রজাপালক। এদেশে হোমারের মতো সুপ্রাচীন চারণকবি মহাকাব্য গেয়ে শুনিয়েছেন। এদেশেই জন্মেছেন সেসব মহাকবি যাঁদের বর্তমানেও জগৎ জুড়ে সমাদর। এদেশের নিপুণ শিল্পী তিব্বত থেকে শ্রীলঙ্কা এবং কাম্বোডিয়া থেকে জাভা পর্যন্ত হিন্দু দেবদেবীর জন্য অসংখ্য বিশাল মন্দির গড়েছেন; মুঘল বাদশাহ ও বেগমের মনোরঞ্জনের জন্য নিখুঁত সুন্দর সৌধ নির্মাণ করেছেন—ভারতের এই ভাবমূর্তি ইদানীংকালে আত্মপ্রকাশ করছে ধৈর্যশীল গবেষণার মাধ্যমে। সেদিন পর্যন্তও পাশ্চাত্য-মানসে দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইউরোপের একচেটিয়া সম্পদ। ভারতবর্ষ সেই পাশ্চাত্যের মানসলোকে নবীনপ্রতিভাসম্পন্ন একটি মহাদেশরূপে উদ্ঘাটিত হচ্ছে।'[১] এই হল ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্যের এক সুপণ্ডিত ঐতিহাসিকের চিত্তপটে বিধৃত ভারতবর্ষের একটি পরিলেখ। নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে সুমহান ভারতবর্ষের বিপুল বিচিত্র সংস্কৃতির অনেক কিছুই এখনও অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত এবং জ্ঞাতাংশটুকুরও যথার্থ মূল্যায়ন এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

উত্তরে চিরতুষারাবৃত নগাধিরাজ ও পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমে ফেনিল সুনীল জলধি বেষ্টিত ভারতভূখণ্ড একটি বিশিষ্ট দেশ। ভৌগোলিক সংস্থান, ঐতিহাসিক ঘাতপ্রতিঘাত এবং সর্বোপরি যুগযুগান্ত ধরে নিজস্ব একটি ভাবধারার চর্চা ও চর্যা এই দেশের ঐতিহ্যকে দিয়েছে একটি বিশিষ্ট সত্তা, এদেশে গড়ে উঠেছে একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, বিকশিত

১। The Story of Civilization, Part I, Our Oriental Heritage—Will Durant, Simon and Schuster, New York, 1942, p. 391

শিকাগো অক্টোবর ১৮৯৩

কাশীপুর ১৮৮৬
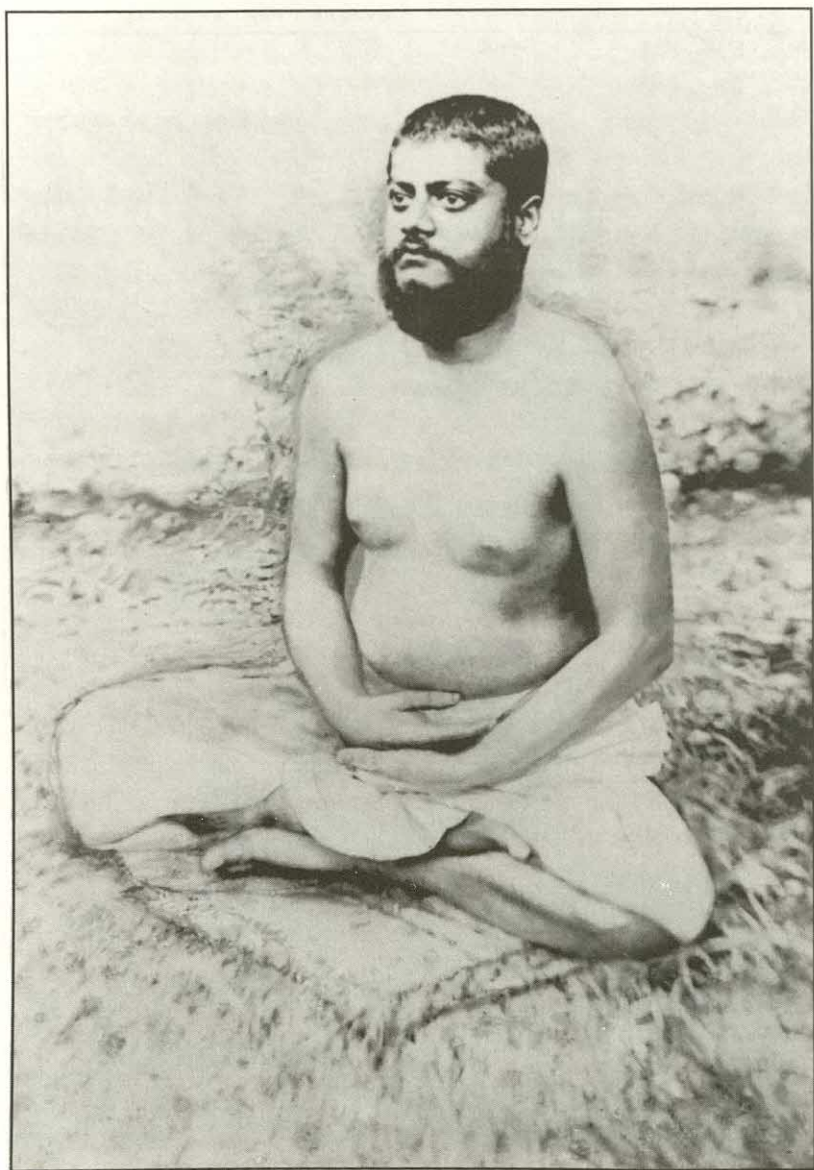
হয়েছে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এক অনন্যসুন্দর ব্যক্তিত্ব। ভারতবর্ষের আকৃতির যেমন বৈশিষ্ট্য, ততোধিক তার প্রকৃতির। ভারতবর্ষের আকৃতি সম্বন্ধে যদিও বা আমরা খোঁজখবর রাখি, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে, অন্তর্নিহিত ভাবজীবন সম্বন্ধে অধিকাংশের জ্ঞান সত্যই সীমিত। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করেছেন: 'ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন-কাহিনীমাত্র। ...রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ...তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ...এরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না—ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না, এবং এখন আমাদিগকে অশনবসন আচারব্যবহার সমস্তই বিদেশীর কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে।'[২] এদেশের মানুষ অতীতে কি করেছিল, কি প্রবল শক্তি অর্জন করেছিল, তারা যা শ্রেয় জ্ঞান করেছিল তাকে কিভাবে আয়ত্ত করেছিল, আয়ত্ত করে কিভাবেই বা তাকে সংরক্ষণ করেছিল—এ-সকল তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেই এই দেশবাসীর বর্তমানের অবস্থা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব। কোন জাতিই তার নিজের গতিপ্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন না হলে তার সহজাত শক্তির স্ফুরণ ঘটে না এবং নিজস্ব স্বাভাবিক গতিপথে তার অভ্যুদয় ও অগ্রগতি সম্ভব হয় না। প্রকৃত ভারতবর্ষকে চিনতে হবে, তার সত্যিকারের ইতিহাস জানতে হবে, ভারতাত্মার মর্মমূলের ভাবটি উপলব্ধি করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: '...কোনও দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কী, দেশের মূল মর্মস্থানটি কোথায়, তাহা এককথায় ব্যক্ত করিতে পারে না—তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে—আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না—তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি।'[৩] এই 'বিচিত্র-উদ্যম-সম্পন্ন গুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে' তার নিজস্ব ধারা অনুসরণ করে জানতে হবে ভারতবাসীর মননের ইতিহাস, ভারতবাসীর বিশ্বাসের ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্মকথা—এককথায় ভারতীয় ভাবধারার প্রকৃত স্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা সহজেই 'নীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আদিম বিকাশভূমি' ভারতবর্ষের বাহ্য ও আন্ত রূপ নির্ণয় করেছিল সুনিপুণভাবে। একজন গৌরবান্বিত ভারতবাসীর ন্যায় তিনি পাশ্চাত্যের বুধমণ্ডলীকে

২। রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ (১৩৬৮), পৃঃ ১০২৭

৩। তদেব, পৃঃ ১০২৯

বলেছিলেন : '...তোমাদের ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয় নাই, তাহার অন্ততঃ তিনশত বৎসর আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের আর একটি দান বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ। সার উইলিয়ম হান্টারের মতে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার এবং বিকল কর্ণ ও নাসিকার পুনর্গঠনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব আরও বেশী। বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও বর্তমান বিজ্ঞানের বিজয়গৌরব-স্বরূপ মিশ্র-গণিত—ইহাদের সবগুলিই ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হয়; বর্তমান সভ্যতার প্রধান ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ সংখ্যাদশকও ভারতমনীষার সৃষ্টি। দশটি সংখ্যাবাচক দশমিক (decimal) শব্দ বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার শব্দ। দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এখনও পর্যন্ত অপর যে-কোন জাতি অপেক্ষা অনেক উপরে রহিয়াছি।...সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়াছে প্রধান সাতটি স্বর এবং সুরের তিনটি গ্রাম সহ স্বরলিপি-প্রণালী। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দেও আমরা এইরূপ প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত উপভোগ করিয়াছি। ইউরোপে উহা প্রথম আসে মাত্র একাদশ শতাব্দীতে। ভাষা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা এখন সর্ববাদিসম্মত যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষার ভিত্তি। ...সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য, কাব্য ও নাটক অপর যে-কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমতুল্য। ...শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলা ও লাল রঙ উৎপাদন করে এবং সর্বপ্রকার অলঙ্কার-নির্মাণেও প্রভূত দক্ষতা দেখায়। চিনি ভারতেই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরেজি "সুগার" কথাটি সংস্কৃত শর্করা হইতে উৎপন্ন। সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দাবা তাস ও পাশা খেলা ভারতেই আবিষ্কৃত হয়। বস্তুতঃ সব দিক দিয়া ভারতবর্ষের উৎকর্ষ এত বিরাট ছিল যে, দলে দলে বুভুক্ষু ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীরা ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হইতে থাকে...।'[৪] এভাবে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাবসম্পদকে পুনরায় আবিষ্কার ও প্রচার করে স্বামীজী আত্মগ্লানিতে নিমজ্জিত দেশবাসীর অবসাদমুক্তি ঘটিয়েছিলেন, স্বদেশকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেশবাসীর অন্তরে। তিনি জাতির চিত্ত থেকে জড়তা, ভীরুতা ও দুর্বলতা দূর করে দেশবাসীর আত্মশক্তির উদ্বোধন করেছিলেন। স্বামীজীর কণ্ঠে উদ্গত জাগরণের মন্ত্র জাতির মেরুদণ্ডে এনেছিল স্বাজাত্যাভিমানের শিহরণ। স্বদেশ-প্রত্যাগত স্বামীজী কলম্বোতে প্রথম বক্তৃতাতেই আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলেছিলেন : আগে আগে আমি ভাবতাম যে ভারত পুণ্যভূমি, আজ আমি আপনাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে এ-বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।[৫]

স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ একটি ভূখণ্ডমাত্র নয়, একটি প্রাচীন জাতির বাসভূমিমাত্র নয় বা একটি দুর্লভ সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্রমাত্র নয়, তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি,

---

৪। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১০৯-১০

৫। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, Advaita Ashrama, Calcutta, Ninth Edition (1964), pp. 104-05

ধর্মভূমি, দেবভূমি। ভারতবর্ষ জগতের ধর্মচেতনার প্রাণকেন্দ্র। ভারতবর্ষ একটি মহান আদর্শের প্রতীক। ভারতবর্ষ একটি শ্রেষ্ঠ জীবনদর্শন। ভারতবর্ষ স্বামীজীর ভালবাসার বস্তু। ভারতের ধূলিকণা তাঁর কাছে পবিত্রতম, ভারতের জল নির্মলতম, ভারতের বায়ু বিশুদ্ধতম। তাঁর মুখের পঞ্চাক্ষর 'ভারতবর্ষ' শ্রোতার প্রাণে শিহরণ তুলত, একটি অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করত। তিনি একদিন সানফ্রানসিস্কোতে স্বীকার করেছিলেন: ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যখন আমি বলতে আরম্ভ করি, তখন- কোথায় গিয়ে থামতে হবে তা কখনো জানি না।[৬] তাঁর এই আবেগ-উচ্ছ্বাসের মূলে ছিল ঐতিহাসিক তথ্য-সমৃদ্ধ প্রবল যুক্তি। স্বামীজী একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন: 'দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা—যা কিছু মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তা বজায় রাখিবার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিরতি আনিয়া দেয়, যেসকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ অপসৃত করিয়া জন্মমৃত্যুহীন চিরপবিত্র অমর আত্মা-রূপে প্রকাশিত হইতে সাহায্য করে—এই দেশ সেই সবকিছুরই পুণ্যভূমি।...আমরা সকলেই ভারতের অধঃপতন সম্বন্ধে শুনিয়া থাকি। এককালে আমিও ইহা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াইয়া, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি লইয়া, সর্বোপরি সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য দেশের অতিরঞ্জিত চিত্রসমূহের বাস্তব রূপ দেখিয়া সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি, আমার ভুল হইয়াছিল। হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো কখনও অবনতি হয় নাই। কত রাজদণ্ড চূর্ণ হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কত শক্তির দণ্ড এক হাত হইতে অন্য হাতে গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা ও রাজসভা অতি অল্প লোককেই প্রভাবিত করিয়াছে। উচ্চতম হইতে নিম্নতম শ্রেণী পর্যন্ত বিশাল জনসমষ্টি আপন অনিবার্য গতিপথে ছুটিয়া চলিয়াছে; জাতীয় জীবনস্রোত কখন মৃদু অর্ধচেতনভাবে, কখন প্রবল জাগ্রতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। শত শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার সম্মুখে আমি স্তম্ভিত—বিস্ময়ে দণ্ডায়মান, সে শোভাযাত্রার কোন কোন অংশে আলোকরেখা স্তিমিতপ্রায়, পরক্ষণে দ্বিগুণতেজে ভাস্বর, আর উহার মাঝখানে আমার দেশমাতৃকা রাণীর মতো পদবিক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন; স্বর্গ বা মর্তের কোন শক্তির সাধ্য নাই—এ জয়যাত্রার গতিরোধ করে।'[৭] অশ্রুতপূর্ব ইতিহাসের মননালোকে উদ্ভাসিত স্বামীজীর দৃষ্টি স্বচ্ছ। এই দৃষ্টিতেই ভারতবর্ষের ইতিহাসকে জানতে হবে। আরও বুঝতে হবে ইতিহাস সব দেশে সমান নয়। প্রকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখলে আমরা সত্যিকারের ভারতবর্ষকে খুঁজে পাব না। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ রোমাঁ রোলাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে বিবেকানন্দের পাঠ গ্রহণ করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন যে, সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে একটিমাত্র টিকে আছে। সেটি ভারতীয় সভ্যতা। ইজিপ্ট, ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া বা মায়া সভ্যতা আজ ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ। গ্রীক ও রোমক সভ্যতার চিহ্নসকল প্রত্নাগারের

৬। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, তৃতীয় খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৬), পৃঃ ২৯৪ ৭। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩৭৪-৭৫

শোভাবৃদ্ধি করছে মাত্র। অপরপক্ষে ভারতীয় সভ্যতা অবিচ্ছিন্নধারায় স্মরণাতীতকাল থেকে প্রবাহিত। সেই ধারা কখনও প্রবল, কখনও দুর্বল, কখনও তার উজ্জ্বল জ্যোতিতে জাতির মানস উদ্ভাসিত, জগদ্বাসী বিমোহিত, কখনও হয়তো ভস্মের ক্রমবর্ধমান আস্তরণে সেই অগ্নি প্রায় নির্বাপিত, কিন্তু নিঃশেষিত নয় কখনই। এই ধারা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সাধনা ও সংস্কৃতির মধ্যে বিধৃত। এই ধারার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে একটি শাশ্বত প্রেরণা, একটি নিত্যসত্য ভাবাদর্শ। এই আদর্শের প্রেরণা গভীর ও ব্যাপক। একে অবলম্বন করেই ভারতবাসী যুগ যুগ ধরে তাদের জীবনসমস্যার সমাধান করেছে, অপর সভ্যতার আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়েও নিজের অস্তিত্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসহকারে রক্ষা করেছে, উপরন্তু নবাগত ভাবনাচিন্তাকে প্রয়োজনমতো আত্মসাৎ করে নিজের মহিমময় ভাবাদর্শকে মাথায় করে রেখেছে, আবার সময়-সুযোগমতো নিজের উন্নত ভাবধারায় আলোকিত করেছে অন্যান্য সংস্কৃতির রঙ্গমঞ্চগুলিকে এবং সেখানে অকাতরে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে সমৃদ্ধি ও কল্যাণ। 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন যেখানেই গিয়াছিল, সেখানে ধ্বংস করিতে যায় নাই, গিয়াছিল পূর্ণতা আনিয়া দিতে। বিভিন্ন দেশে ইহা প্রাণদানকারী বর্ষাবারির মতো আসিয়াছিল...।'[৮] আবহমানকাল থেকে ভারতবর্ষের যে জাতিগত ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য ভারতবর্ষকে বিশিষ্টতা দান করেছে সেটির প্রকৃতি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে এবং সচেতনভাবে আমাদের সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হবে। পাশ্চাত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয়কেতন উড়িয়ে স্বদেশে ফিরেই স্বামীজী তাঁর কুম্ভকোণম্ বক্তৃতায় দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন ঃ '...in the first place, we must try to keep our historically acquired character as a people.' ইতিহাসসমর্থিত এই বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করলেই জাতির স্বাভাবিক জীবনীশক্তি শতধারায় বিকশিত হয়ে জাতির উদ্দেশ্যসাধন সহজ করে তুলবে। এই ভাবাদর্শকে লক্ষ্যে রেখেই স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন ঃ '...আমার উদ্দেশ্য সকলকেই আপনার করিয়া লওয়া, কাহাকেও বর্জন করা নয়। ...আমাদিগকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জাতির মতো উন্নত হইতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবহমানকালের সঞ্চিত সংস্কারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে...।'[৯]

পৃথিবীর জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ঐক্য ও সর্বসাধারণত্ব যেমন দেখা যায় তেমনি দেখা যায় প্রত্যেকটি প্রাচীন জাতির রয়েছে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব, প্রত্যেকটি জাতির জীবনধারায় রয়েছে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে জাতির সাধ্য ও সাধনার স্ফূর্তি সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট। জাতির অন্তর্জীবনের উৎসমূলে অধিষ্ঠিত গভীর ও ব্যাপক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই জাতি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে ও জাতির গতিশীল বিকাশ-অভীপ্সাকে চরিতার্থ করে প্রাণদ বলদ ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে। জাতির এই কৃতির বা সৃজনমূলক প্রয়াসের প্রতিফলন ঘটে তার সংস্কৃতিতে।

একটি জাতির সংস্কৃতি বলতে বোঝায় তার কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ও

৮। ভারত-সংস্কৃতি—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃঃ ৬৫
৯। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৬৪

ধ্যানধারণা। অনেকে মনে করেন আচার-অনুষ্ঠান, শালীনতা-শিষ্টাচার এবং সেসম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা, নীতি-নিয়ম সংস্কৃতির অন্তর্গত। সামগ্রিক দৃষ্টিতে জাতির অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প-বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতির উৎকর্ষ সংস্কৃতির অন্তর্গত। জাতির চর্চা ও চর্যার মূলে থাকে একগুচ্ছ ভাবসম্পদ, জনসাধারণের আচারে ব্যবহারে কর্মনীতিতে থাকে একটি সাধারণ ঐক্য। স্বভাবতই প্রত্যেকটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতির ঐতিহ্যগত ভাবাদর্শ তার অন্তর্গত সকল মানুষের জীবনে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে ব্যক্তিমানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন ঃ 'মানুষের প্রধান সম্পদ তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতিগত ঐশ্বর্যের জন্য চাই ব্যক্তিত্ব ও বৈচিত্র।...রাষ্ট্রীয় জীবনে কিন্তু সংহতিই বড় কথা, ব্যক্তিত্ব সেখানে অনেক সময় বৃথা বাধা মাত্র। অথচ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বৈচিত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।'[১০] ইতিহাসের নিয়ম অনুসারেই দেশ ও কালের অন্তর-প্রেরণা ব্যক্তিবিশেষের ধ্যানধারণার মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় ব্যক্তির গভীর অভীপ্সা ও ব্যাপক সাফল্য ব্যক্তির ক্ষুদ্রতার বন্ধন অতিক্রম করে গোষ্ঠীর অবিচ্ছিন্ন প্রয়াসস্রোতে আত্মসমর্পণ করে; কখনও কখনও সেখানে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে, নতুন শক্তির আবর্ত গড়ে তোলে। ম্যালিনস্কি লিখেছেন ঃ 'Culture, the cumulative creation of man, extends the range of individual efficiency and of power of action ; and it gives a depth of thought and breadth of vision undreamed of in any animal species. The source of all this consists in the cumulative character of individual achievements and in the power to share in common work. Culture thus transforms individuals into organized groups and gives these an almost indefinite continuity.'[১১] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে দেখা যায় ভারতবর্ষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অভ্যুদয়ের অভীপ্সার মধ্যে সুসামঞ্জস্য রক্ষা করেও ইতিহাসের কোন নিগূঢ় নিয়মে নিজস্ব ভাবধারা আশ্রয় করেই তার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল।

যেমন ব্যক্তির জীবনের তেমনি প্রত্যেকটি জাতির জীবনের রয়েছে একটি weltanschauung—যেটি তার জীবনসঙ্গীতের প্রধান সুর; অন্যান্য সুর সেই প্রধান সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঐকতান সৃষ্টি করে। এই আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই জাতির স্বাভাবিক জীবনীশক্তি জাতীয় জীবনকে পরিচালিত করে, জাতিকে স্বকীয়তা প্রদান করে। এবং এই আদর্শ ও উদ্দেশ্য সাধনপথেই জাতীয় সংস্কৃতির সৌধ গড়ে ওঠে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে কি না? উত্তরে বলা যায়, সংস্কৃতি একটি সজীব ভাব, গতিশীল তার প্রকৃতি। কিন্তু প্রত্যেকটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতির সংস্কৃতির

১০। ভারতের সংস্কৃতি—ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫২), পৃঃ ৮-৯

১১। Bronislaw Malinowski in the Encyclopaedia of the Social Sciences, Vols. III & IV, The Macmillan Company, New York, 1957, p. 645

আন্তর ভাবসম্পদটি সনাতন শাশ্বত, তার মৌল কোন পরিবর্তন ঘটে না। মূল ভাবধারাকে আশ্রয় করে বিভিন্নকালে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে জাতির সংস্কৃতির বাহ্য রূপান্তর ঘটে মাত্র। সুপ্রাচীন প্রত্যেকটি জাতির বর্তমান বা ভবিষ্যতের সংস্কৃতি তার প্রাচীন সংস্কৃতির অনুবর্তনমাত্র নয়, স্বাভাবিকভাবেই তার ঘটে রূপান্তর। সেই রূপান্তরে প্রতিবেশ ও পরিবেশের চাহিদা মেটাতে বাহ্য পরিবর্তনমাত্র ঘটে, জাতির চরিত্রের মৌলিকতার অবস্থান্তর ঘটে না। 'জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বাস্তব রূপ আর মানসিক সম্পদ এই তিনেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়'[১২] ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কৃতির রূপান্তর যুগে যুগে ঘটলেও এই সকল রূপান্তরের মধ্যে ফল্গুনদীর মতো প্রবহমান জাতির প্রাণধারা জাতীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যটিকে অটুট রাখে। স্বামীজী ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য ও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে লিখেছেন : 'এখন বুঝতে পারছ তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি কোথায়?—ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে।...আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১,০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে তো ইদিক উদিক ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এই মাত্র। সে নদী যেমন করে হোক সমুদ্রে যাবেই দু-দিন আগে বা পরে, দুটো ভাল জায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় দু-একবার আঁস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই তো নয়।'[১৩]

পশু থেকে ক্রমবিকশিত হয়ে মানুষ। আবার মানুষের বিকাশেরও বিভিন্ন পর্যায়। মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত অনন্তশক্তি। মানুষের বিকাশের সম্ভাবনা অসীম। প্রাচীন ভারতের ঋষিও ঘোষণা করেছিলেন : 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।'[১৪] ভারতের ঋষি আবিষ্কার করেছেন আঁধারের পশ্চাতে জ্যোতি, জড়ের পশ্চাতে চৈতন্য, রূপের পশ্চাতে অরূপ-সত্তা। বোধে বোধ করেছেন জীবাত্মার মধ্যে বিশ্বাত্মাকে। আত্মার অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য, অনন্ত শুদ্ধত্ব উপলব্ধি করেই ভারতীয় ঋষি যুগ যুগ ধরে সমাজকে বিশেষ পথে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, নির্ভরযোগ্য পাথেয় হিসাবে অধ্যাত্মবিদ্যা উপহার দিয়েছিলেন।

ক্রমবিকাশবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে জুলিয়ান হাক্সলী বলেছেন : 'In the light of our present knowledge, man's most comprehensive aim is seen not as mere survival not as numerical increase, not as increased complexity of organization or increased control over his environment, but as greater fulfilment—the fuller realization of more possibilities by the human

১২। সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার, পুঁথিঘর, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫১), পৃঃ ৩৭
১৩। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১৬০-৬১
১৪। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ২।৫

species collectively and more of its component members individually.'[১৫] ব্যক্তি ও সমষ্টি মানুষের 'greater fulfilment'-এর অভীপ্সা পূরণের জন্য ভারতবাসী আশ্রয় করেছে সুপরীক্ষিত অধ্যাত্মবিদ্যা। অধ্যাত্মবিদ্যা অনুশীলন করেই মানুষ মৃত্যুকে পর্যন্ত জয় করে অভয় হয়, অমৃতস্বরূপ হয়। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ/যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।'[১৬] এই প্রত্যক্ষ আত্মোপলব্ধিই ভারতবাসীর ভাবানুভূতির আশ্রয়, এই তত্ত্বোপলব্ধির ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এই তত্ত্বোপলব্ধিই ভারতাত্মার মৌলশক্তি। ভারতবর্ষ তার সাধনা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে এই উপলব্ধিভিত্তিক সত্যকেই আশ্রয় করে আছে। সত্য সনাতন, তার পতন-অভ্যুদয় নেই, ক্ষয়বৃদ্ধি নেই, সেই সত্যই জাতির জীবনরথের সারথি। এই সত্যপথে যাতায়াত করেই ভারতবাসী অর্জন করেছে স্বকীয়তা, সাফল্যের সঙ্গে পৌঁছেছে জাতীয় উদ্দেশ্যের শীর্ষে। এই জাতীয় উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত রেখে ভারতীয় সমাজ সময়োপযোগিভাবে বিন্যস্ত করেছে ভারতবাসীর মূল্যবোধ, বিচারবোধ, নীতি ও সংস্কারবোধ। এই সকল পরিবর্তনের অন্তরালে ভারতবাসী প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে সামাজিক রীতিনীতি বিধিব্যবস্থা জীবন-উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী করে গড়ে তুলছে। ফরাসী ও ইংরেজের সঙ্গে তুলনা করে স্বামীজী লিখেছেন ঃ 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড। ...ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ—ইংরেজের আসল কথা। ...হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা—বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা—"মুক্তি"। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য; বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বল সব ঐখানে এক মত। ঐখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্বনাশ...।'[১৭]

স্বামীজী ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসমূল ও প্রাণধারা নির্ণয় করেছেন; ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার প্রভাবের গভীরতা ও ব্যাপকতার মূল্যায়ন করে বলেছেন ঃ 'আর দেখবে যে, এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয়তো হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার...।'[১৮] এখানে ধর্ম কি? মানুষ স্বরূপত নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান। এই স্বরূপ উপলব্ধির জন্য মানুষ জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে চেষ্টা করে চলেছে। এই স্বরূপ উপলব্ধিই

১৫। Quoted by Swami Ranganathananda in 'The Essence of Indian Culture', The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, 1965, p. 22

১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬।২২ ১৭। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৯

১৮। তদেব, পৃঃ ১৬১; এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত স্মরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ 'প্রাচ্যসভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র; তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন, পলিটিক্স সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে; কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির অন্য কোন আশ্রয় নাই।' [রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ১০৯২] অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ 'পলিটিক্স এবং নেশন কথাটা যেমন ইউরোপের কথা, ধর্ম কথাটাও

মুক্তি, এই মুক্তিই মানুষের চিরন্তন লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যই মানুষের মধ্যে দেখা যায় একটি সর্বজনীন বুভুক্ষা। এই ক্ষুধা মিটাবার তাগিদায় ধর্ম মানুষকে পৌঁছে দেয় আত্মানুভূতির লক্ষ্যে। সকল ধর্মের চরম লক্ষ্য আত্মানুভূতি। যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ, ধর্মবিশ্বাস, আচার-আড়ম্বরের ঊর্ধ্বে অপরোক্ষ আত্মানুভূতি। এই আত্মানুভূতিই অমৃতত্ব। স্বামীজীর নিজের জীবন ও বাণীর মর্মমূলেও অপরোক্ষ আত্মানুভূতি ও তৎসঞ্জাত অধ্যাত্মদৃষ্টি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ভারতীয় শোণিতে প্রবহমান ধর্মপ্রবণতা—ভব-বন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। ভারতীয় জীবনের লক্ষ্যবিন্দু অপরোক্ষানুভূতিভিত্তিক মোক্ষ।

আবার ধর্ম শব্দটি মীমাংসকদের মতে ব্যবহার করে স্বামীজী দেখিয়েছেন ভারতবর্ষে মোক্ষেচ্ছালাভের প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে ধর্মের। এখানে ধর্ম হচ্ছেঃ 'যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে। মোক্ষ কি?—যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তা-ই। এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে তো এ-লোকও নয়, পরলোকও নয়, তবে সে দাসত্ব—লোহার শিকল আর সোনার শিকল।...অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর-বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না। এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই।'[১৯] ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সে ধর্ম ও মোক্ষের একটি সামঞ্জস্যবিধান করেছিল। সেকারণে ভারতবর্ষে যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনককে দেখা গিয়েছিল। বৌদ্ধমতের প্রাধান্যের ফলে ধর্মের অনাদর ও মোক্ষের প্রাবল্য সমাজকে ক্রমে পঙ্গু করে ফেলেছিল। প্রকৃত ভারতীয় আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে স্বামীজী অধিকাংশের জন্য উপদেশ দিয়েছিলেনঃ 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তা-ই। এইটি শাস্ত্রের মত।'[২০] হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী নির্দেশ দিয়েছেন বর্ণাশ্রমভিত্তিক জাতিধর্ম বা স্বধর্মই ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের পথ—ক্রমমুক্তির সোপান।

ধর্ম ভারতের অবনতির কারণ নয়, ধর্মকীর্তনের আফিম ভারতবাসীকে মোহগ্রস্ত করেনি। প্রকৃত ধর্মের অভাবই ভারতবাসীর দুঃখের কারণ। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে দুর্বল করে না। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, পরোপকারই ধর্ম, অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, আত্মায় স্বাধীনতাই ধর্ম, ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, ঈশ্বর ও আত্মাতে অভেদদর্শনই ধর্ম। ভারতীয় পরা ও অপরা সকল বিদ্যার উৎস এই ধর্মচেতনা। ভারতের জ্ঞান,

---

তেমনি ভারতবর্ষের কথা। ...তেমনি ধর্ম শব্দের প্রতিশব্দ ইউরোপীয় ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য। এজন্য ধর্মকে ইংরাজী রিলিজন-রূপে কল্পনা করিয়া আমরা অনেক সময় ভুল করিয়া বসি।' [রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ (১৩৬৮), পৃঃ ৬৬২]

১৯। তদেব, পৃঃ ১৫২ ২০। তদেব, পৃঃ ১৫৩-৫৪

বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রেরণার মূলে এই ধর্মভাবনা। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ-উৎস এই ধর্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে স্বামীজী ঘুমন্তপ্রায় জাতির মর্মমূলে শিহরণ তুলেছিলেন, মোহগ্রস্ত দেশবাসীর আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে এনেছিলেন, দেশের জনমানসে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে স্বামীজীর প্রধান একটি অবদান হচ্ছেঃ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ-উৎসের স্বরূপ আবিষ্কার এবং তার বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, ভারতীয় জীবনে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত ধর্ম। এবং সেই ধর্মের ভিত্তি সর্বানুস্যূত আত্মোপলব্ধি। মানুষ বিশ্বসংসার থেকে ভিন্ন একটা ব্যক্তিপরিচ্ছিন্ন সত্তামাত্র, এই বুদ্ধি তো যত ভয় ও দুঃখের মূল। এই বুদ্ধি মিথ্যা বুদ্ধি, এই মিথ্যা বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে একটিমাত্র সত্তাই আছে, যে সত্তার উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিভেদ একটা ভ্রান্তিমাত্র। ভারতের ঋষি বলছেনঃ তুমি জগৎসংসার থেকে পৃথক একটি ব্যক্তিপরিচ্ছিন্ন সত্তামাত্র নও, তুমি ভূমা, বিশ্বসংসারের যাবতীয় দৃশ্যবস্তু তোমার সত্তায় সত্তাবান। এই সর্বাত্মীয়তার বোধে মানুষের মধ্যে যে অনন্ত আত্মশক্তির প্রবোধন ঘটে, সেই প্রবোধনের অমৃতালোকে মরমানুষ মরজগতেই অমরত্ব অনন্তত্ব অনুভব করে। এই সত্যের উপলব্ধি ভারতবাসীর জীবনে একটি মজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হয়েছে, ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতিতে এনেছে চিরসজীবতা ও অমোঘতা, দিয়েছে একটি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। এই সর্বাবগাহী ধর্মানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতাত্মার প্রাণসত্তা, এই অনুভূতিই যুগে যুগে ভারতবর্ষকে সঞ্জীবিত রেখেছে, সময়ে সময়ে এই অনুভূতিভিত্তিক ভাবধারা উৎসারিত হয়ে বৃহৎ মানবসভ্যতাকে রসসিক্ত করেছে।

ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে যে গ্লানি সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়েছে তার কারণ প্রকৃত ধর্মের অভাব, ধর্মের যথাযথ প্রয়োগের অভাব। সেই অভাব দূর করার জন্য স্বামীজী ধর্মকে ধর্মবিজ্ঞানের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন এবং উপস্থাপিত করেছেন সর্বাবগাহী বেদান্তধর্ম। বেদান্ত ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। 'বেদান্ত এক বিশাল পারাবার-বিশেষ, যাহার উপরে একটি যুদ্ধজাহাজ ও একটি ভেলার পাশাপাশি স্থান হইতে পারে। এই বেদান্ত-মহাসাগরে একজন প্রকৃত যোগী—একজন পৌত্তলিক বা এমনকি একজন নাস্তিকের সহিতও সহাবস্থান করিতে পারেন। শুধু তা-ই নয়, বেদান্ত-মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী সব এক—সকলেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান।'[২১] এই সর্বভাবগ্রাসী ধর্মমত বলে মানুষ ভ্রম থেকে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে এগিয়ে চলে। নিম্নতম জড়োপাসনা থেকে অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত যাবতীয় সাধনার উদ্দেশ্য নিখিল বিশ্বাত্মাকে উপলব্ধি করবার জন্য মানবাত্মার বিবিধ বিচিত্র প্রয়াস।

এই ধর্ম মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, জনমানস হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বনের কোণে ঠাঁই নিয়েছিল। সেই বনের বেদান্তকে স্বামীজী ঘরে ঘরে এনে দিলেন। সুস্পষ্টভাবে দেখালেন যে, এই ধর্মানুসারী জীবন ভারতবাসীর প্রকৃত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

২১। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ৩২০

জীবন। এই ধর্মভাবসম্পৃক্ত জীবনের মধ্যেই ভারতবাসীর যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর ধ্যানে-জ্ঞানে মননে-প্রাণনে কর্মে-সাধনায় অনুরণিত হচ্ছে এই ধর্মভাব। স্বামীজীর প্রচারিত বেদান্তধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভগিনী নিবেদিতা যথার্থই লিখেছেন: 'বহু এবং এক—যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি—সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্য হইয়া যায়। যোগ ও ক্ষেম—ত্যাগ ও বর্জনের মতোই দায়স্বরূপ। এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান প্রচারকে পরিণত করিয়াছে, তবে এই কর্ম—জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, পরন্তু উহাদের প্রকাশক। তাঁহার নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটিয়া ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই, তাঁহার নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নাই। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার সকল বাণীই এই মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্য বলিয়া বোধ হয়।'[২২] বেদান্তের এই অসীম সর্বাবগাহিত্ব মানবপ্রগতির সকল দ্বার উন্মুক্ত করেছে এবং সেই দ্বার দিয়ে দেশবিদেশের নতুন নতুন কল্যাণকারী ভাবসমূহকে সাদরে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

ধর্মের সর্ববিস্তারী ভাব লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়—বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয় দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম, তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে; ...ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী মানবের সমস্ত-জীবন-ব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।'[২৩] ধর্মের ঐক্যসূত্রেই ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিধৃত। এই ধর্মসূত্রকে অবলম্বন করেই ভারতবাসীর বুদ্ধি-বিশ্বাস-আচরণ নিয়মিত হচ্ছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিচালিত হচ্ছে।

যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও অনুভূতিতে পরিস্ফুট হয়েছিল একটি মহান সত্য—সর্ববস্তুতে দ্বৈতরহিত ঐক্যোপলব্ধি-ভিত্তিক অদ্বৈত-দর্শনের বিকাশের পথে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত তিনটি পর্যায় বা ক্রমিক স্তরমাত্র। স্বামীজী প্রাচীন আচার্যদের মতো হিন্দুদের সর্বোচ্চ শাস্ত্র শ্রুতিকে কোন বিশেষ মতবাদের সমর্থনের জন্য ব্যাখ্যা করেননি। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি ভেঙে তিনি দেখিয়েছেন যে, অধ্যাত্মজীবনের ক্রমবিকাশের পথে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ তিনটি সোপান বা স্তরমাত্র। এবং এই তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন মতের পরিপোষক শ্রুতিবাক্যের

২২। তদেব, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১/-১,
২৩। রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ১০৩১-০৩২

মধ্যে সুসামঞ্জস্য দেখিয়ে স্বামীজী হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের দীর্ঘকালের বিরোধ মিটিয়েছেন, এক মহাসমন্বয় করেছেন।

ব্যক্তিমানুষের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের উপর নির্ভর করছে পরমসত্য সম্বন্ধে তার পরিজ্ঞান ও উপলব্ধি। এই আপেক্ষিকতা না মানলেই ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতপার্থক্য উপস্থিত হয়। সে-কারণে আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি মেনে নিয়ে স্বামীজী বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে সম্মিলিত ও বিদ্বেষশূন্য এক মহাজাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সর্বাবয়ব বেদান্তের আলোকে পৃথিবীর সকল ধর্ম ও জাতির মহামিলনের ইঙ্গিত করেছিলেন।

ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে স্বামীজীর আর একটি বৃহৎ অবদান, ধর্মবিজ্ঞানের ন্যায় নীতিবিজ্ঞানেরও একটি দৃঢ় ভিত্তিভূমি আবিষ্কার। 'ভারতপথিক' রামমোহন পর্যন্ত শাস্ত্র ও যুক্তির ভিত্তিতে অদ্বৈতবেদান্তের মধ্যে ধর্মবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট নীতিবিজ্ঞানের জন্য New Testament-এর আশ্রয় খুঁজেছিলেন। রামমোহনের প্রতিভা এক্ষেত্রে বিফল হয়েছিল, সন্দেহ নেই। শুধু তিনি নন অনেক সংস্কারকই ব্যর্থ হয়েছেন। এর কারণ অনুসন্ধান করে স্বামীজী বলেছেনঃ '...(সংস্কারকেরা) বিফলমনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ—তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন, আর তাঁহাদের একজনও "সকল ধর্মের প্রসূতি"কে বুঝিবার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন, সেই সাধনার মধ্য দিয়া যান নাই! ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবি করি।'[২৪] তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের সুস্পষ্ট স্বীকৃতির অন্যতম প্রকাশ, নীতিবিজ্ঞানের সুষ্ঠু দার্শনিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার আলোকে তিনি অদ্বৈততত্ত্বের মধ্যেই নীতিবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা আবিষ্কার করেন। তিনি কুম্ভকোণম্ বক্তৃতায় বলেনঃ 'একমাত্র অনন্ত সত্য তোমাতে, আমাতে—আমাদের সকলের আত্মায় বর্তমান রহিয়াছেন; অনাদি অনন্ত আত্মতত্ত্ব ব্যতীত নীতিবিজ্ঞানের সনাতন ভিত্তি আর কি হইতে পারে? আত্মার অনন্ত একত্বই সর্বপ্রকার নীতির মূলভিত্তি...।'[২৫] এইভাবে অদ্বৈততত্ত্বের উপর নীতিবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করার ফলে নীতিবিজ্ঞান শুধুমাত্র যে বিতর্কাতীত দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়েছে তাই নয়, ঐতিহ্যবাহী ভাবধারা-অনুসারী হওয়াতে ভারতবাসীর কাছে তা সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। লাহোরে 'বেদান্ত' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতত্ত্বের সার—অন্যের হিতসাধন। কেন অপরের হিতসাধন করিব? সকল ধর্মই উপদেশ দিতেছে—নিঃস্বার্থ হও। কেন নিঃস্বার্থ হইব? ...অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া অবগত হও যে, ...অজ্ঞ ব্যক্তিতেও তুমি, বিদ্বানেও তুমি, দুর্বলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তুমি। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও।...অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি, একমাত্র ব্যাখ্যা। অন্যান্য মতবাদ

২৪। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৮-৯

২৫। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৭৮

তোমাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হইব, ইহার কোন হেতু নির্দেশ করিতে পারে না।'[২৬] এভাবে ভারতগৌরব অদ্বৈততত্ত্বকে স্বামীজী নীতিবিজ্ঞানের একমাত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এই ভারতীয় তত্ত্বের ভিত্তিতেই ভারতবাসীর নৈতিক জীবন দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

অধ্যাত্মবিদ্যার লক্ষ্য মানবের অন্তর্নিহিত ভগবৎ-সত্তার ক্রমবিকাশ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে ভগবৎ-সত্তা, তার বিকাশই ধর্মের উদ্দেশ্য। ধর্মের মূল তত্ত্ব অধ্যাত্মবাদের পাদপীঠে সকল ধর্ম মিলতে পারে। এখানে যাবতীয় সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ম ও ব্যক্তিগত অনুসৃত ধর্মাভীপ্সার মিলনে কোন বাধা নেই। আত্মবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ধর্মের সর্বজনীনতা বা সার্বভৌমত্বের বীজ আত্মানুভূতি। সেখানে সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, অনুদারতার স্থান নেই। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই 'যত মত তত পথ', সব ধর্মই সত্য। এই সত্যকে শুধুমাত্র কথায় ভাবনায় সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। পরমতসহিষ্ণু হলেই চলবে না, নিঃসঙ্কোচে আত্মীয়বোধে গ্রহণ করতে হবে পরধর্মসেবীদের। বিশ্বসম্মেলনে ধর্মসেবীদের আহ্বান করে স্বামী বিবেকানন্দ তুলে ধরেছিলেন নতুন যুগের আদর্শ ঃ 'বিবাদ নয়, সহায়তা ; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।' ধর্মীয় ঐক্যের সাধারণ ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে তিনি দেশবাসী ও জগদ্বাসীকে সচেতন করে তুলেছিলেন, সেইসঙ্গে ধর্মসমন্বয়ের ভিত্তিতে নতুন মানবসমাজ সংগঠনের পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উপলব্ধ, বিবেকানন্দ-জীবনে পুনঃপরীক্ষিত এই ধর্মসমন্বয় বিভিন্ন ধর্মের একত্রীকরণ নয় বা বিভিন্ন ধর্মমতের অংশবিশেষের চয়ন নয়। এই সমন্বয় সকল ধর্মের মানুষকে স্বধর্ম আন্তরিকভাবে পালন করতে প্রেরণা যোগায়, পরধর্মকে আত্মীয়বোধে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। পৃথিবীর সব জাতি সব ধর্ম এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে স্বামী বিবেকানন্দের চেতনালোকে বিধৃত হয়েছিল, সেই কারণে তাঁর ধর্মসমন্বয়ের বাণী এত জীবন্ত প্রাণবন্ত হয়ে জগদ্বাসীকে আকৃষ্ট করেছিল এবং বর্তমানেও সকলকে ঐক্যসাধনের পথে অনুপ্রাণিত করছে।

ধর্মের মৌলিক সাধনপ্রণালীগুলি জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান ও কর্ম—এই চারটি পর্যায়ে বিভক্ত। মনস্তাত্ত্বিক স্বামীজী দেখালেন যে বিকশিত মানুষের মধ্যে বিচার, হৃদয়বত্তা, আপনার যাবতীয় শক্তি সংহত করে নিষ্ক্রিয় অবস্থানের ক্ষমতা ও পরোপচিকীর্ষার প্রেরণায় কর্ম—সবকিছুই বিদ্যমান। পরিপূর্ণ মানব শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এই চারটি ভাবাদর্শের সার্থক সম্মেলন ও সমন্বয়। ধর্মবিজ্ঞানভিত্তিক যে নতুন মানবসমাজ সংগঠনের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, তার জন্য আদর্শ মানুষ হবে জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-কর্ম-সাধন-সম্ভূত ব্যক্তি। মানবকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলার এই পরিকল্পনা যেমন মহান, তেমনি বর্তমান যুগের উপযোগী। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ মানবের এই ভাবাদর্শ তুলে ধরে স্বামীজী মানবতাবাদকেই মহীয়ান করে তুলেছেন, সন্দেহ নেই।

২৬। তদেব, পৃঃ ৩৩১-৩৩

স্বামীজীর আর একটি অবদান, কারও কারও মতে শ্রেষ্ঠ অবদান, 'কর্মে পরিণত বেদান্ত' বা Practical Vedanta। আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ ভারতবাসীর জীবনে কালো ছায়া বিস্তার করেছিল, সেই ভেদ দূর করে স্বামীজী উপস্থাপিত করলেন কর্মে পরিণত বেদান্তের বলিষ্ঠ চিন্তাসূত্র। অদ্বৈতবাদের উচ্চ ও মহান সত্য সহজ ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করে স্বামীজী 'কর্মে পরিণত বেদান্ত' বিষয়ে লণ্ডনে চারটি ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রস্তাবনায় তিনি বলেছিলেনঃ '...বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে একান্তভাবে কার্যকর হইতে হইবে। আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে, কারণ বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তু সম্বন্ধে উপদেশ দেন; বেদান্ত বলেন, এক প্রাণ সর্বত্র বিরাজিত। ধর্মের আদর্শসমূহ সমগ্র জীবনকে যেন আচ্ছাদন করে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তার ভিতরে যেন প্রবেশ করে এবং কার্যেও যেন ঐগুলির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।'[২৭] বক্তৃতামালার উপসংহারে তিনি শ্রোতাদের উদার আহ্বান জানিয়েছিলেনঃ 'এস আমরা একমনে ধর্মকে সহজ করিবার চেষ্টা করি, আর সেই সত্যযুগ আনিবার সহায়তা করি, যখন প্রত্যেকটি মানুষ উপাসক হইবে, আর প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্তা—সেই সৎস্বরূপই উপাস্য হইবেন।'[২৮] ধর্মের নামে প্রচলিত ভণ্ডামী, জাল-জালিয়াতি, সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশে তামসিকতার প্রশ্রয়, ভাবের ঘরে চুরি প্রভৃতিকে নির্মম কশাঘাত করে স্বামীজী কর্মে পরিণত বেদান্তের আদর্শে সকল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, আত্মপ্রত্যয় জাগরিত করে নরের মধ্যে নারায়ণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। সত্যদর্শী স্বামীজীর দৃষ্টিতে কর্মে পরিণত অদ্বৈততত্ত্বই জগদ্বাসীর ভবিষ্যতের আশ্রয়, এবং মানবজাতির স্থায়ী কল্যাণ করতে সমর্থ। স্বামীজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুন একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ '...অদ্বৈতবাদ ধর্মের এবং চিন্তার শেষ কথা, এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, উহাই ভাবী শিক্ষিত মানবসমাজের ধর্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌঁছানোর কৃতিত্বটুকু পাইতে পারে...কিন্তু কর্মপরিণত বেদান্ত (practical Advaitism)—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সর্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টিলাভ করে নাই।'[২৯] এই ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের জন্য নিদান দিয়েছিলেন 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ' সূত্র। এভাবে বেদান্তনীতির যথার্থ প্রয়োগ করে নতুন মানুষ, নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। মানবসত্তা অনাদি অসীম, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। মানবের প্রতিকূল পরিবেশরূপ কারাবন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে, মানবকে আবরণমুক্ত করে অমৃতের অংশীদার ও পূর্ণতার অধিকারী করে তুলতে হবে। সেই আবরণ বা

২৭। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২১৯

২৮। তদেব, পৃঃ ২৯০ ২৯। তদেব, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৮-৯

বাধা দূর করার সহজ উপায় স্বামীজী-প্রদর্শিত কর্মে পরিণত বেদান্ত। এখানে বেদান্ত বলতে মনে রাখতে হবে স্বামীজীর বাণী: '...the word Vedanta must cover the whole ground of Indian religious life....'[৩০] জাতির জীবনে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত এই বেদান্ত-ভাবনাকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতের মহিমময় ভারত গঠন করবার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

ভাবের জগতে স্বামীজীর আর একটি অবদান পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ বা Humanism-কে ভারতীয় ভাবরসে অঙ্গীকৃত করে নতুন ও গভীর তাৎপর্য দান। এক সময়ে কৈবল্যমুক্তির জন্য লালায়িত ও পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ-ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত স্বামী বিবেকানন্দ আর্ত, পীড়িত, দীন, দরিদ্র মানুষকে যেমন ভালবেসেছিলেন তেমন বোধহয় আর কেউ বাসেননি। অজ্ঞানের ঘেরাটোপে আবদ্ধ পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা। কিন্তু অবহেলিত লাঞ্ছিত সর্বহারা মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা বোধ করি অনেক বেশী। শুদ্ধ পবিত্র অকুণ্ঠ তাঁর মানবপ্রেম।[৩১] সর্বভূতে একাত্মার অনুভূতিতে প্রদীপ্ত তাঁর মানবপ্রেম। সেই কারণে বিশাল-হৃদয় স্বামী বিবেকানন্দ বলতে পেরেছিলেন: 'Above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races.' সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর এই খাঁটি মানবপ্রেম মানবতাবাদের মধ্যে যে গভীর ব্যঞ্জনা দান করেছে তার তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তাশীল মোহিতলাল লিখেছেন: '...হয়তো মানব-মাহাত্ম্যের এই অভিনব রূপ এযুগের শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দান—Humanism-এর অন্তর্গত যে গভীরতম তত্ত্ব, তাহারই চরম ও পরম প্রকাশ। ...ইহার এই রূপকে—বুদ্ধির দ্বারা নয়, একরূপ মিস্টিক চেতনার দ্বারাই—উপলব্ধি করা সম্ভব।'[৩২] এই তত্ত্ব পুরাতন হলেও আমাদের বোধগম্যভাবে ঝঙ্কৃত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীমন্ত্রে, উচ্ছ্বসিত হয়েছিল জ্ঞান ও পৌরুষের সমন্বিত আধার স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। পুরাতন হলেও চিরনবীন এই তত্ত্ব মরজগৎ ও অমরলোকের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়েছে, লোকায়ত ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে। এই সমন্বয়ে উৎসারিত হয়েছে মহান এক শক্তি, উদ্ভাসিত হয়েছে নবযুগের দিগন্ত। মানুষকে 'মানহূঁশ' হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, সেই আহ্বানে সুর মিলিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: 'Everything seems to me to lie in manliness. This is my new Gospel.' নিপীড়িত নরের মধ্যে নারায়ণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে নরনারায়ণের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছিলেন স্বামী

৩০। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, p. 230

৩১। যথার্থ মানবদরদী স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসংশয়িত ভাষায় বলেছিলেন: 'You may invent an image through which to worship God, but a better image already exists, the living man. You may build a temple in which to worship God, and that may be good, but a better one, a much higher one, already exists, the human body.' [The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. II, Tenth Edition (1963), p. 313]

৩২। বাংলার নবযুগ—মোহিতলাল মজুমদার, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৮৭৯ শকাব্দ, পৃঃ ১২৩

বিবেকানন্দ। তিনি মানবের অন্তর্নিহিত ভগবৎ-সত্তার বিকাশের গতি ত্বরান্বিত করে নরজীবনেই পূর্ণতা আনতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, পথনির্দেশ করেছিলেন, তাই তিনি শ্রেষ্ঠ নরঋষি।

ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সর্বজন-অভিনন্দিত। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক সত্তামাত্র নয়, ভারতবর্ষ তাঁর মাতৃভূমি। তাঁর দৃষ্টিতে মাতৃভূমি বিরাটের মূর্তি যে মূর্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে বৈদিক ঋষির ভাবানুভূতি ঃ 'সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।'[৩৩] অধ্যাত্ম-অনুভূতির ভিত্তিতেই স্বামীজীর দেশপ্রীতি। এই বিশুদ্ধ দেশপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ স্বামীজী গর্বিত সন্তানের মতো বলতেন ঃ 'দর্শন ধর্ম বা নীতিবিজ্ঞানই বলুন, অথবা মধুরতা কোমলতা বা মানবজাতির প্রতি অকপট প্রীতিরূপ সদ্‌গুণরাজিই বলুন, আমাদের মাতৃভূমি এ সবকিছুরই প্রসূতি। ...এখনও ভারত এইসব বিষয়ে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'[৩৪]

হীনম্মন্যতার কালো মেঘের আড়ালে দীর্ঘকাল পরাধীন ভারতবর্ষ ধুঁকছিল, সেই সময় শৌর্যবীর্যের স্ফুরিত আধার বীর সন্ন্যাসী জাতিকে দিয়েছিলেন মোহমোচনের মন্ত্র—ভারতবর্ষের জীয়নকাঠি ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবাদ। ভারতবাসী জড়তা ত্যাগ করে, নবপ্রাণতরঙ্গে প্রাণবন্ত বলশালী হয়ে ওঠে। ধর্মই ভারতবাসীর ভাবানুভূতির আশ্রয়। ধর্মকেন্দ্রিক চিত্তোত্থানে জাতীয় জীবনে উপস্থিত হয় সর্বপ্রথম ব্যাপক সর্বভারতীয় জাগরণ। ধর্মভিত্তিক এই জাগরণে প্রাণচাঞ্চল্য জাতির শিরায় উপশিরায় সঞ্চালিত হয়। জাতির সামাজিক জীবনে, বৈজ্ঞানিক প্রতিভায়, বাণিজ্যিক প্রয়াসে সর্বদিকে যে বৈদ্যুতিক উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছিল তার ব্যাপকতা ও তাৎপর্য সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু।[৩৫] 'ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ' এই মন্ত্রের উদ্গাতা ধর্মনিষ্ঠ নির্ভীক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক শক্তির বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধ। বহু জাতি ও ধর্মের মিলনভূমি 'ভারততীর্থে'র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে স্বামীজী ভারতের জাতিগঠনের নিজস্ব উপায় নির্দেশ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক দৃষ্টি অনুসরণ করে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ লিখেছেন ঃ '...ত্যাগ ও চরমসত্যের অপরোক্ষজ্ঞানকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়াই ভারতের জাতীয়তারূপ সুমহান সৌধ চিরকাল দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ঐ জাতীয়তার প্রাণশক্তি ভারতের ধর্মের ভিতরেই নিহিত...।'[৩৬] সেইসঙ্গে স্মরণযোগ্য,

---

৩৩। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৩।১৬

৩৪। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৯ ; এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য তাঁর অন্যতম জীবনীকারের মন্তব্য ঃ 'He had become spiritually patriotic and patriotically spiritual.' [Life of Swami Vivekananda, pp. 99-100]

৩৫। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, প্রথম খণ্ড—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৮৬), 'ভারতের নবজাগরণ ঃ বিবেকানন্দের ভূমিকা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৬। ভারতের সাধনা—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৫৫), পৃঃ (৩)-(৪)

জাতীয় ঐক্যের নীতি ঘোষণা করে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'A nation in India must be a union of those whose hearts beat to the same spiritual tune.'[৩৭] উদার ও গভীর এইরূপ অধ্যাত্মচেতনার ঐক্যভূমিতে স্বামীজী রোপণ করেছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবোধবৃক্ষ। স্বামীজীর এই প্রয়াসের ফলে সহজেই স্বাভাবিক জাতীয়তাবোধ স্ফুরিত হয়েছিল, জাতির পুনরুত্থান সহজসাধ্য হয়েছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বামীজীর অবদানের স্বীকৃতি জানিয়ে লিখেছেন ঃ 'Vivekananda vitalised the nationalism of India by putting it on a spiritual level....'[৩৮] স্বামীজী কর্তৃক প্রচারিত আধ্যাত্মিকতা-নিষ্ণাত এই জাতীয়তাবোধ ভারতবাসীকে কিরূপ উদ্বুদ্ধ করেছিল তার প্রমাণস্বরূপ তিনটি উদ্ধৃতি দিলেই যথেষ্ট হবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ঃ 'ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাই বারিসিঞ্চনে বর্ধিত করিয়াছিলেন...বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবন গঠনকর্তা। তিনিই ইহার প্রধান নেতা।'[৩৯] নেতাজী সুভাষচন্দ্র লিখেছেন ঃ 'রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্বধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি।'[৪০] জাতীয় জীবনের গঠনকর্তা স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য অবদানের প্রতি ঋণ স্বীকার করে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী লিখেছেন ঃ 'Swami Vivekananda saved Hinduism and saved India. But for him we would have lost our religion and would not have gained our freedom. We therefore owe everything to Swami Vivekananda.'[৪১]

শতাব্দীর দর্পণে দেখতে পাই, ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ আবিষ্কার ও তদনুযায়ী সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রবাহ ও সামগ্রিক গতিকে নিয়মিত করেই জাতির ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছিল। স্বামীজী তাঁর 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ 'ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে, যে-কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের পরে, তাহারই অনুবর্তিভাবে একটি রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে এবং ঐ বোধই আবার যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে শক্তিশালী করিয়া থাকে।'[৪২] রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনায় যে মহান আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবোধন ঘটেছিল তারই অন্যতম ফলশ্রুতি ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। স্বামীজী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করেও ভারতীয়

৩৭। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, p. 371

৩৮। Three Phases of India's Struggle for Freedom—R. C. Majumdar, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, Second Edition (1967), p. 21

৩৯। বিশ্ববিবেক—সম্পাদনা ঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শঙ্কর, বাক্-সাহিত্য, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৭৩), পৃঃ ১৬৭

৪০। World Thinkers on Ramakrishna-Vivekananda—Editor : Swami Lokeswarananda, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, Second Edition (1983), p. 47

৪১। ibid., p. 54   ৪২। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪

যুবকদের দিয়েছিলেন দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগের অতুলনীয় অনুপ্রেরণা। এই বীর্যবান বলপ্রদ প্রেরণা দেশসেবীদের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়ে মহান জাতীয়তাবোধকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মহাশক্তিধর স্বামীজীর ভাবসঞ্চারের সুদূরপ্রসারী ফল আলোচনা করে ঐতিহাসিক পানিক্কর লিখেছেন ঃ 'What gave Indian nationalism its dynamism and ultimately enabied it to weld at least the major part of India into one state was the creation of a sense of community among the Hindus to which the credit should to a very large extent go to Swami Vivekananda. This new Sankaracharya may well be claimed to be a unifier of Hindu ideology. Travelling all over India he not only aroused a sense of Hindu feeling but taught the doctrine of a universal Vedanta as the background of the new Hindu reformation.'[৪৩] ভারতের জাতীয়তাবোধের নবোন্মেষের জনয়িত্রী যে আধ্যাত্মিক অভ্যুন্নতি তার প্রেরণাস্থল ছিলেন স্বামীজী। এবং তাঁর হাতিয়ার ছিল সর্বাবয়ব বেদান্ত।

ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর জীবনে একদিকে শাস্ত্রশরিয়ৎ, প্রচলিত রীতিনীতি ও দীর্ঘকালের সংস্কারের প্রবল টান, অপরদিকে সংস্কারকগণের নিছক যুক্তি ও বিচারের আঘাতে অবসন্ন ভারতের ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও আশা-আকাঙ্ক্ষা—এদের টানাপোড়েনে ভারতীয় জীবন যখন পর্যুদস্ত, হীনপ্রভ ও অনেকাংশে বিপন্ন, সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ প্রতিভার বলে জাতীয় জীবনের পুনর্বাসন সম্ভব হয়েছিল। মোহান্ধের মতো শাসক ইংরেজ জাতির বোধবুদ্ধি, মনন ও রুচির আদর্শের অনুসরণ হতে নিবৃত্ত হয়ে ভারতবাসী কিছুটা স্বস্থ হয়েছিল, জাতীয় জীবনের চিরন্তন উৎস শাশ্বত ভাবজীবনকে ভারতবাসী আবিষ্কার করেছিল ; ভারতবর্ষের মধ্যে স্বদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ-বিষয়ে স্বামীজীর অবদান ঃ '...the clarification in a new and exciting way of the role of the Indian tradition as a source for a vigorous patriotism.'[৪৪]

স্বামীজীর নেতৃত্বে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের চিন্তা পুনর্জাগ্রত, আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন ও আধুনিকতা প্রাপ্ত হয়ে 'নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নূতন বেদ' সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। নবজাগরণের প্রবোধনকারী জাতীয়তাবাদ স্বামীজীর নেতৃত্বে দাঁড়িয়েছিল চারটি স্তম্ভের উপর ঃ (১) জাতীয় সৌধের ভিত্তি যে জনসাধারণ তাদের জাগরণ ; (২) দৈহিক ও নৈতিক শক্তির বিকাশ ; (৩) সাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতির ভিত্তিতে ঐক্য এবং (৪) প্রাচীন ভারতের যশ ও মহিমা সম্বন্ধে সচেতনতা ও গর্ববোধ।[৪৫] এই চারটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ

৪৩। The Determining Periods of Indian History—K. M. Panikkar, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1962, p. 53

৪৪। Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume, Swami Vivekananda Centenary Committee, 1963, p. 524

৪৫। Swami Vivekananda : A Historical Review—R. C. Majumdar, General Printers & Publishers Private Limited, Calcutta, 1965; p. 123

জাতির অবিসংবাদিত নেতারূপে গৃহীত হন, কারণ তাঁর হৃৎপিণ্ডে স্পন্দিত হয়েছিল ভারতভারতীর অমর বাণী, তাঁর মস্তিষ্কে স্থান পেয়েছিল সমগ্র জাতির পক্ষে চিন্তা, তাঁর চিন্তা ও কর্মে প্রকাশিত হয়েছিল সমগ্র জাতির ভাবানুভূতি।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ ভারতবর্ষের অবনতির পূর্বোক্ত অন্যান্য কারণ ছাড়াও আরও কয়েকটি কারণকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিল—অপর জাতির সঙ্গে মেলামেশা লেনদেন বন্ধ করা, সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে না পারা, নারীজাতিকে পদদলিত করা, দরিদ্রগণকে নিষ্পেষিত করা এবং দেশের নীচুতলার লোককে অবহেলা করা। জাতির দীর্ঘকালের পাপস্খালনের জন্য 'ধর্ম ও সাধনার উপর জাতীয়তার পালিশ চড়াইয়া, সেবাব্রতকে জাতীয় ধর্মে পরিণত করিয়া বিবেকানন্দ—সব্যসাচী অর্জুনের ন্যায়—ভোগবতীর জল টানিয়া শুষ্ক তৃষ্ণার্ত সমাজের উপরের স্তরগুলিকে স্নিগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গরীব-দুঃখী, মূর্খ-পণ্ডিত সবাই এখন একসূত্রে বাঁধা হইয়াছে, সবাই এক আদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে।'[৪৬] এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম সার্থক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা। এই জাতীয়তাবাদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করে অতীন্দ্রনাথ বোস লিখেছেন: 'Vivekananda did not die in 1902. He lived till 1946. His ideas, his *sadhana* flowed in different channels to enrich and vitalise the nation and enabled it to win the first round. With Gandhi and Bose closes the epoch which he had opened. A new chapter has begun. The future will show whether his soul has died or it will reincarnate to spiritualise the nation and to guide it to the conquest of mankind.'[৪৭]

স্বামী বিবেকানন্দের স্বজাতির প্রতি নিবিড় অনুভূতি ও আগ্রাসী জাতীয়তাবোধ কিন্তু কোন সময়েই মানবতার বিশ্বজনীন মঙ্গলাদর্শের পরিপন্থী হয়নি। দেশের জন্য 'সর্বজনীন আত্মম্ভরিতা' বিশ্বমৈত্রীর ভাবনার বিরোধী হয়নি। অদ্বৈততত্ত্বভিত্তিক তাঁর স্বদেশপ্রেম তাঁর বিশ্বপ্রেমের পরিপূরক। প্রকৃতপক্ষে তিনি অধ্যাত্মচেতনার পাদপীঠে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় করেছিলেন। সমন্বয়ান্বেষী স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান: 'Instead of antagonizing, therefore, we must help all such interchange of ideas between different races, by sending teachers to each other, so as to educate humanity in all the various religions of the world ; but we must insist,... not to abuse others, nor to try to make a living out of others' faults ; but to help, to sympathize with, and to enlighten all.'[৪৮] বলা যেতে পারে বিশ্বমনা স্বামীজীর বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণভাবনা তাঁর

৪৬। বিশ্ববিবেক, পৃঃ ৯৫

৪৭। Studies in the Bengal Renaissance—Editor : Atulchandra Gupta, The National Council of Education, Bengal, Calcutta, 1958, pp. 120-21

৪৮। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Vol. 2—Marie Louise Burke, Advaita Ashrama, Calcutta, Third Edition (1984), p. 376

জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারিত রূপমাত্র।

বর্তমানে রাজনীতি বা সমাজনীতিতে যে সাম্যবাদ প্রচলিত, তার লক্ষ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তির সমান অধিকার। বৈদান্তিক স্বামীজীর দৃষ্টিতে মানুষমাত্রেই পূর্ণতার প্রতীক, অমৃতের অধিকারী। সমাজজীবনে আমরা যেখানেই কোন বিশেষ-অধিকারের দাবিকে স্বীকার করি সেখানেই আমরা মানুষ ও মানুষের মধ্যে একটা মৌলিক ভেদ মেনে নিই। এই বিশেষ-অধিকারের বিরুদ্ধেই স্বামীজীর কর্মে পরিণত বেদান্তের বিদ্রোহ। অদ্বৈতবাদের মহত্তম অনুভূতির আলোকে স্বামীজী ঘোষণা করলেনঃ 'None can be Vedantists, and at the same time admit of privilege to anyone, either mental, physical, or spiritual ; absolutely no privilege for anyone. The same power is in every man, the one manifesting more, the other less ; the same potentiality is in everyone. Where is the claim to privilege ?'[৪৯] ধর্মানুভূতির সমত্ববোধের উপর সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজী আমাদের সর্বমানুষে সমদর্শী হতে শিখিয়েছেন। প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের মধ্যে নিহিত বিদ্বেষ ও হিংসা থেকে মুক্ত করেছেন।

সমাজের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টি কখনই কুহেলি-আচ্ছন্ন ছিল না। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, হিন্দুধর্ম মানবতার মহিমা তারস্বরে ঘোষণা করছে, আবার এই হিন্দুধর্মই নিম্ন ও দরিদ্রশ্রেণীকে এমনভাবে পদদলিত করছে যার তুলনা বিরল। দীন, দরিদ্র, দুর্বল জনসাধারণকে উপেক্ষা ও অবহেলা করাকে তিনি 'জাতীয় পাপ' বলে চিহ্নিত করেছিলেন, এবং এই পাপস্খালনের জন্য তিনি সমস্যার মূলদেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ভারতের নিজস্ব জাতীয় পথে সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতির বিধান করতে হবে। সংস্কারের চাইতে স্বাভাবিক বিকাশের উপর জোর দিতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন অধ্যাত্মশক্তির ভিত্তিতে বিকাশ। স্বামীজী সংস্কারকদের আহ্বান করে বলেছিলেনঃ তাহাদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা নষ্ট না করিয়া তুমি কি তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্বের উদ্ধারসাধন করিতে পার? তুমি কি সমতা, মুক্তি ও কর্মশক্তির দিক দিয়া সমভাবে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়াও যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সহজাত প্রকৃতির দিক দিয়া হিন্দু হইতে পার? এইরূপই করিতে হইবে এবং আমরা তাহাই করিব।[৫০] 'চলমান শ্মশান' বলে ঘৃণিত লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষকে স্বামীজী 'আমার রক্ত, আমার ভাই' বলে সাদরে ও অপার সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, সেইসঙ্গে শিক্ষারূপ উপকরণ দিয়ে নরের মধ্যে নারায়ণের পূজা করেছিলেন। জনসাধারণের স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করে স্বামীজী সাবধান করে বলেছিলেন যে, ধর্মবর্জিত আস্তিক্যবুদ্ধিহীন আধুনিক শিক্ষার কারখানায় যে লৌকিক জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা দেখা যায়, তাতে মানুষ তৈরী হবে না, গোষ্ঠীজীবনের ভিত সুদৃঢ় হবে না। জনগণের মধ্যে

৪৯। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I, Eleventh Edition (1962), p. 423

৫০। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, Eighth Edition (1964), pp. 29-30

আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদাবোধ, সাম্যবুদ্ধি ও ঐক্যবুদ্ধি জাতির অভ্যুদয়ের সোপান। জনগণকে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে স্থাপন করাই হবে আমাদের লক্ষ্য।

যেমন জনগণের জাগরণ, তেমনি ভারতীয় নারীজাতির উন্নয়ন স্বামীজী-পরিকল্পিত ভারতজাগৃতির একটি প্রধান কার্যসূচী। নারীমাত্রেই স্বামীজীর দৃষ্টিতে 'মা জগদম্বার জাত'। দুটো পাখা শক্ত সক্রিয় না হলে পাখী যেমন গন্তব্যস্থলে উড়ে যেতে পারে না, সমাজপাখীর একটি ডানা পুরুষকে সবল ও অপর ডানা নারীকে দুর্বল হতে দিলে সমাজপাখী প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। ভারতজাগৃতির সাধনায় নারীশক্তির জাগরণ একান্তই আবশ্যক। নারীজাগৃতি সম্বন্ধে স্বামীজীর মৌলিক একটি চিন্তা, তিনি তাঁর নিজস্ব বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেছিলেন ঃ '...নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।'[৫১] '...নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে, কোন্ জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক।'[৫২] নারীগণকে পূর্ণ মর্যাদায় ও স্বমহিমায় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বামীজীর এই পরিকল্পনা অভিনবত্বে ও অতুলনীয় সম্ভাবনায় আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল কোলাহলকে ছাপিয়ে এখনও বাস্তববাদী আদর্শরূপে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে জনগণ। স্বামীজীর ঐতিহাসিক প্রজ্ঞায় বিধৃত তত্ত্ব ঃ 'সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।'[৫৩] সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হয়েও প্রায়ই নিজেদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রকৃতির নিয়মের বশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে 'বসুন্ধরা ভোগ' করে। স্বামীজী তাঁর দূরদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে শ্রমিকশক্তি কর্মে, শক্তিতে, ঐশ্বর্যে উন্নত হয়ে অদূর ভবিষ্যতে মানবজীবনের সার্বিক অধিকার আয়ত্ত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ '...এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।'[৫৪] জেলে মুচি মেথর চাষাভুষো শ্রমজীবীদের মধ্য থেকেই 'নূতন ভারত'কে আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বামীজী। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে প্রগতির পথে অগ্রসর করিয়ে দেবার জন্য তিনি শূদ্রজাগরণে শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। বর্ণবৈষম্য সমাধানের জন্য তিনি levelling up অর্থাৎ অনগ্রসরকে অগ্রসর করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। উন্নত বা অগ্রসরকে পিছিয়ে দেওয়া প্রগতির বিরোধী

৫১। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪৭৯ ৫২। তদেব, দশম খণ্ড, পৃঃ ২২১
৫৩। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪২ ৫৪। তদেব, পৃঃ ২৪১

মনে করেছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি আদর্শরাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক চিন্তা ভবিষ্যতের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর কল্পিত আদর্শরাষ্ট্রে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়যুগের সংস্কৃতি, বৈশ্যযুগের বিতরণ-আকাঙ্ক্ষা ও শূদ্রযুগের সাম্যের সমন্বয় ঘটবে, সেইসঙ্গে উপরোক্ত কোন যুগেরই বিশেষ দোষত্রুটি তাতে থাকবে না। স্বামীজীর চিন্তালোকের রাষ্ট্রে থাকবে মানুষের বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্মপালনের উপযুক্ত পরিমণ্ডল।

পশ্চিমে পার্লামেন্ট, সেনেট, ভোট, ব্যালট, মেজরিটি প্রভৃতি রাজনীতির দাপট দেখে স্বামীজীর ধারণা হয়েছিল যে শক্তিমান কিছু সংখ্যক পুরুষ ইচ্ছামতো সমাজকে পরিচালনা করছে, জনসাধারণ 'ভেড়ার দলের' মতো অনুসরণ করছে মাত্র। স্বামীজী বলেছেনঃ '...রাজনীতির নামে...চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে খাচ্ছে...।'[৫৫] পাশ্চাত্যের এই রাজনীতি অনুসরণ করে স্বামীজীর আদর্শরাষ্ট্রের রূপায়ণ সম্ভব নয়। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য তিনি নিদান দিয়েছিলেন আধ্যাত্মিকতার নির্যাস, যার সাহায্যে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমাজের সকল নরনারীকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অধিকার ও সুযোগ দেওয়া সম্ভবপর হবে। এই সমাজ ও রাষ্ট্রের চলার পথের পাথেয় হবে ভারতাত্মার বাণী তথা স্বামীজীর জীবনের ভাবানুভূতি। ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর মহাসমাধির একমাসের মধ্যেই লিখেছিলেনঃ 'ভারতের জাতীয়-জীবনের পরিণতি যেন তাঁহার মধ্যেই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল যাহার ফলে এক নতুন জীবনবোধের চাঞ্চল্য এই ধর্মের নেতাদের মধ্যে সর্বদাই সূচিত হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যেই যেন আমরা ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ বেদ পাইয়াছিলাম।'[৫৬] স্বামী বিবেকানন্দই ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ তথা ভারতীয় সংস্কৃতির দিশারি।

কেশবচন্দ্রের তুলনায় আঠারোগুণ শক্তির আধার স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে যে অসাধারণ প্রতিভা শ্রীরামকৃষ্ণ আবিষ্কার করেছিলেন সেই প্রতিভার দ্যুতি তাঁর জীবনের বিভিন্ন পাদে বিকীর্ণ হয়ে বিরাট বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। তাঁর প্রতিভার রশ্মিচ্ছটায় মুগ্ধ রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই লিখেছেনঃ '...if Narendranath Datta had not been Swami Vivekananda, Bengal might have one more addition to the large number of her good poets of the nineteenth century. The same thing may be said of his historical knowledge, which was both profound and extensive.'[৫৭] এই ধরনের অনেক স্তুতি উদ্ধৃত করা যেতে পারে, কিন্তু তার সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে স্বামীজীর বিশাল প্রতিভার বিপুল অবদান অবধারণ করা সম্ভবপর হবে না।

সংখ্যার পরিমাপে স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা রচনা অতি অল্প। তৎসত্ত্বেও সেই স্বল্প রচনার মধ্যে স্ফুরিত হয়েছে তাঁর প্রতিভা-দীপ্তি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৫। তদেব, পৃঃ ১৬১-৬২

৫৬। The Complete Works of Sister Nivedita, Vol. I, Advaita Ashrama, Calcutta, Third Edition (1982), p. 371

৫৭। Swami Vivekananda : A Historical Review, p. 95

লিখেছেন ঃ '...স্বামীজীর বাংলা রচনা পরিমাণে স্বল্প হলেও গুণগত উৎকর্ষে তা ঋজু, কঠিন ও সংযত এবং প্রসন্ন মনের সহাস্য রসোত্তীর্ণতায় বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি বিস্ময়।'[৫৮] সাহিত্যচর্চার সময় তাঁর ছিল না, তাঁর সামান্য যা কিছু রচনা তা প্রয়োজনের তাড়নায়। 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতির সামান্য কয়েকটি রচনার মধ্যে লেখক বিবেকানন্দের মুনশীয়ানা সুস্পষ্ট। বিষয়বস্তু অনুসারে তাঁর সাধু ও চলিত গদ্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ, তাঁর সাধু গদ্যের রসাস্বাদন করে প্রণবরঞ্জন ঘোষ লিখেছেন ঃ 'সাধু গদ্যে তিনি অতিমাত্রায় সংহত ও ঋজু। কিন্তু এই ঋজুতার ফলে ভাবপ্রকাশের এমন এক ঘনবদ্ধতা দেখা দিয়েছে যা বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য-অনুযায়ী। অথচ সেই সুগভীর বাক্‌সংযমও অনুভূতির আবেগে মাঝে মাঝে তরঙ্গায়িত হয়ে "বর্তমান ভারতে"র শেষ অনুচ্ছেদের মতো অমর কাব্যরচনা করেছে।'[৫৯] আর বাংলা ভাষায় চলিত গদ্যে স্বামী বিবেকানন্দের দান চিরস্মরণীয়। তাঁর চলিত গদ্য-রীতির বৈশিষ্ট্য 'শব্দযোজনায় তৎসম শব্দের স্বল্প ব্যবহার, বাক্যগঠন হ্রস্ব, ঢঙটা সংলাপের মতো'। যে ভাষায় আমরা আলাপ করি, চিন্তা করি, সেই সর্বজনবোধ্য চলিত গদ্য-রীতি তাঁর লক্ষ্য। স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যের বিষয়বস্তুও লক্ষণীয়। 'সাহিত্যের সৃষ্টিমূলক কল্পনাজগৎ বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রধান বিষয় নয়। তাঁর কবিতা ও গদ্য রচনাবলী প্রধানত মননধর্মী। অথচ চলমান জগৎ ও জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে এই মননধর্ম সজীব ও গতিময়।'[৬০] কবিতা ভাবলোকের ভাষা। তিনি জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দেননি, তাকে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি দিয়েছেন। বেদান্তের পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে সমন্বয়সেতু স্থাপন করে তিনি তাঁর তথাকথিত কাব্যসাধনার মধ্যে বিমূর্ত অদ্বৈততত্ত্বকে যেভাবে কবিত্বময় করে তুলেছেন, সেই প্রয়াস তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বিকাশমাত্র। কাব্যসমালোচক তাঁর বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি তিন ভাষাতে লেখা কবিতাগুলি সম্বন্ধে বলেছেন ঃ 'এগুলির মধ্যে আছে সত্য কবিত্বের শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, অভ্রান্ত স্বাক্ষর। নরেনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ যতগুলি শক্তির অস্তিত্ব টের পেয়েছিলেন তার মধ্যে এই কবিত্বও নিশ্চয় একটি। এই কবিপ্রাণ যুবক কবিতা লিখে শুধু শখই মেটাননি, অপ্রতিরোধ্য প্রেরণা তাঁর হৃদয়মনকে হিমশিলার মতো গলিয়ে বইয়ে দিয়েছে কবিতায়। দীর্ঘ চর্চার অভাবকে ছাপিয়ে, ভাষা ও ছন্দের অনভ্যস্ততার বাধা এড়িয়ে ভিতরের সেই কাব্য বাইরে মুক্তি পেয়েছে। মৌলিকতা তাই ছন্দে বা ভাষাসজ্জায় ততটা স্পষ্ট না হয়ে উঠলেও তা আছে বিবেকানন্দের অনন্য মন ও প্রেরণার সবল স্পন্দনে—যা একটু মনোযোগ দিলেই এই কবিতাগুলির মধ্যে চিনে নেওয়া যায়। তিন ভাষাতেই বিবেকানন্দের কবিতা কাব্যরাজ্যে বিশেষ স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা লাভ করেছে।'[৬১]

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে যে 'সত্যযুগে'র প্রবর্তন হয়েছে, তার 'প্রবোধনের

৫৮। বিশ্ববিবেক, পৃঃ ৩৭৪-৭৫

৫৯। বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য—প্রণবরঞ্জন ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃঃ ১৯

৬০। তদেব, পৃঃ ১৪ ৬১। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২১ বর্ষ, পৃঃ ১৯০

সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়।' এই প্রবোধনের প্রাণচ্ছটা সাহিত্য শিল্প ভাস্কর্য সঙ্গীত—সংস্কৃতির আঙিনার সর্বত্র প্রাণোচ্ছল করে তুলেছে। জাতীয় জাগরণের ধারা অনুসরণ করে স্বামী বিবেকানন্দ 'ভাববার কথা'তে লিখেছিলেনঃ 'জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।' তিনি আবার রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে বলেছিলেনঃ 'আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যার ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে।' শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সিদ্ধির যোগসূত্র ধরে স্বামী বিবেকানন্দের স্বল্পপরিসর জীবনে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল যুগ-জাগরণের প্রাণের প্রাচুর্য, ভাবের মাধুর্য। সেসময়ে ভারতীয় শিল্পকলা ম্রিয়মাণ হয়ে হীনাবস্থার আবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা সহজেই আবিষ্কার করেছিল ভারতীয় শিল্পবোধের ভিত্তিভূমি নিগূঢ় অধ্যাত্ম-সত্য, সকল শিল্পপ্রয়াসের আকৃতি জীবন ও জগতের গূঢ়তম সত্যের অনুসন্ধিৎসা। ভারতীয় শিল্প পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতিকে উত্তরণের পথে অতিক্রম করে একটি মহৎ ভাবপ্রাপ্তিকে করেছিল আদর্শ।

শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবময়। স্বামীজী বলেছেনঃ 'ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি ললিতকলার ক্ষেত্রেও ভারত সমস্ত পৃথিবীর আদি গুরু।'[৬২] স্বামীজীর গভীর শিল্পবোধ আবিষ্কার করেছিল যে, বৌদ্ধধর্মের প্রসারকালে এদেশে শিল্পসৌন্দর্যের যে বিকাশ ঘটেছিল তার তুলনা নেই। শিল্পতত্ত্বের বিশ্লেষণে স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পভাবনার নিজস্ব রূপটি ফুটে উঠেছে তাঁর একটি উক্তিতে। তিনি বলেছেনঃ '...true Art can be compared to a lily which springs from the ground, takes its nourishment from the ground, is in touch with the ground, and yet is quite high above it. So Art must be in touch with nature—and wherever that touch is gone, Art degenerates—yet it must be above nature.'[৬৩] ভারতীয় শিল্পের গোপন কথা আদর্শের রূপায়ণ, প্রকৃতির অনুকরণ নয়। ভারতীয় চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্যের স্বর্ণযুগে দেখা যায় সবকিছু শিল্পপ্রয়াসের মধ্যে রয়েছে উপরোক্ত ভাবাদর্শের মধুর ব্যঞ্জনা।

ভারতবর্ষের প্রাণসত্তায় ঝঙ্কৃত ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের মূল সুরটিকে উদ্ধার করে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ও ভবিষ্যতে তার ভূমিকা নির্দেশ করে স্বামীজী লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্পাদর্শের পুনর্বাসন করেছিলেন। ভারতবর্ষে শিল্প মুখ্যত ধর্মকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এখানে শিল্পসাধনাও ধর্মসাধনের অঙ্গ। অধ্যাত্মভাবপুঞ্জকে পরিব্যক্ত ও রূপগ্রাহ্য করার মাধ্যমরূপে গৃহীত হয়েছিল শিল্প। ভারতীয় শিল্পসাধনা তার এই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করেও, সাধারণ উদ্দেশ্য যে নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দের সাধন তাতেও কখনই কার্পণ্য করেনি। ভারতীয় শিল্পী জানেন ঋষির উপলব্ধ সত্য

৬২। বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪

৬৩। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, p. 258

সে-ঈশ্বরই '...মহৎ কবি, প্রাচীন কবি—সমগ্র জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত, এবং নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত'।[৬৪] আনন্দপিপাসু শিল্পীরও উদ্দেশ্য আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের রচিত বিশ্বকবিতা পাঠ ও রসাস্বাদন করা।

ডক্টর কালিদাস নাগ 'উদ্বোধন' সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেনঃ 'বিবেকানন্দ-নিবেদিতার যুগকে অস্বীকার করে কোন শিল্প-ইতিহাস দাঁড়াতে পারে না।' ভারতীয় শিল্পের রীতি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা পাঠ গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। নিবেদিতা হ্যাভেল সাহেবকে ভারতীয় কান্তিবিদ্যা ও শিল্পদর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন। হ্যাভেলের অনুসরণ করেছিলেন আচার্য অবনীন্দ্রনাথ। ক্রমে নন্দলাল বসু ও অবনীন্দ্রনাথের অপরাপর শিষ্যেরা স্বামীজীর শিল্পভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[৬৫] ভবিষ্যতের ভারতীয় শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে স্বামীজীর ইঙ্গিত 'art' ও 'utility'-র সামঞ্জস্য সাধন।

ভারতাত্মার জীবনছন্দকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছিল ভারতীয় সঙ্গীত। এদেশের সঙ্গীতসাধকের বিশ্বাস ললিতকলাসকলের মধ্যে সঙ্গীতের চাইতে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা আর নেই,'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরঃ'। ভারতীয় সঙ্গীতের মর্মবাণীর সঙ্গে পরিচিত স্বামীজীর দৃষ্টিতে সঙ্গীত 'নিরাবিল আনন্দ, জাগ্রত প্রেরণা ও সাধনপথের সহায়ক'। প্রতিভাধর স্বামীজী নিজে যেমন ছিলেন সঙ্গীতকুশলী, তেমনি ছিলেন সঙ্গীতের সমঝদার। ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, আমাদের দেশের যথার্থ সঙ্গীত রয়েছে কেবল কীর্তনে আর ধ্রুপদে। কোমল ভাবোদ্দীপক কীর্তনকে সাময়িকভাবে বর্জন করে তিনি উচ্চ ও গম্ভীর ভাবোদ্দীপ্ত ধ্রুপদগান অনুমোদন করেছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতে cadence বা মিড়-মূর্ছনার প্রশংসা যেমন করেছিলেন, harmony-র অভাবহেতু বীররসের স্বল্পতার সমালোচনাও তিনি করেছিলেন। ভবিষ্যতের ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাব, জাতির ভাবানুভূতি থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করে 'মিউজিক'-এর 'সায়েন্স' বিকাশ করতে হবে। তবে সঙ্গীতের কবিত্বমাধুর্য স্ফুরিত হয়ে সঙ্গীত ব্যক্তি ও জাতির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হবে।

দুঃখের বিষয়, ভারতসংস্কৃতিতে স্বামী বিবেকানন্দের দানের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় ও পরিমাপের চেষ্টা হয়েছে সামান্যই। অবশ্য, এর যথার্থ মূল্যায়ন করবেন ভবিষ্যতের চিন্তাবিদ্‌গণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ভারতীয় মানস তথা বিশ্বের চিন্তাসরোবরে বিবেকানন্দ-আলোড়ন তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছিল চতুর্দিকে। প্রবল তরঙ্গাভিঘাত ভারতসংস্কৃতির ভাবধারা নবকলেবরে ও শক্তিযুক্ত করে উপস্থাপিত করেছে। বুঝতে হবে, দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেনঃ 'এইরূপে জাতীয়

৬৪। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭২

৬৫। Swami Vivekananda: Patriot-Prophet—Bhupendranath Datta, Nababharat Publishers, Calcutta, 1954, pp. 306-13

চাঞ্চল্যের শতাব্দীব্যাপী বহুবিধ স্রোতধারা কখন মিলিত হইয়া, কখন বিচ্ছিন্ন হইয়া, কখন এক পথে, কখন বিপরীত পথে, কখন একটানা স্রোতে, কখন ঘুরিতে ঘুরিতে, একদিন শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে, স্বামী বিবেকানন্দে আসিয়া জমিয়া ভরিয়া উঠিয়াছে। ...শত বৎসরের জাতীয় চাঞ্চল্য, যাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, তাহা শতাব্দীর শেষভাগে নানা দিক ও কেন্দ্র হইতে আহূত ও সংহত হইয়া বাণী লাভ করিয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে। স্বামী বিবেকানন্দ একটা জাতির দীর্ঘ এক বিচিত্র বিক্ষিপ্ত শতাব্দীর যোগফল।'[৬৬] শুধুমাত্র যোগফল নয়, শতাব্দীর সাধনার সার্থক ফসল স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ভারতাত্মার প্রাণবন্ত ভাবমূর্তি নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার স্ফুরিত শক্তিতে ভারতবর্ষের দীর্ঘকালের অন্ধকার-অনড় সংস্কৃতি জাগ্রত ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে, বিশ্বসভায় ভারতবর্ষের মহান ভূমিকা পুনরায় গ্রহণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে।

বৃহত্তর পটভূমিকায় বিবেকানন্দ-আলোড়নকে বিচার-বিশ্লেষণ করে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন ঃ 'I see in him the heir to the spiritual discoveries and religious struggles of innumerable teachers and saints in the past of India and the world, and at the same time the pioneer and prophet of a new and future order of development.'[৬৭] নিঃসন্দেহে, বহির্বিশ্বের ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মসাধনের আয়াসপ্রয়াসের আকৃতি মিলিত হয়েছিল বিবেকানন্দ-মানসে, তাঁর চেতনে বিধৃত হয়েছিল বিপুল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য। সেই কারণে যুগাচার্য বিবেকানন্দ যে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা যেমন ছিল ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী, তেমনি হয়েছিল কালোপযোগী ও স্বর্ণসম্ভাবনাপূর্ণ।

সর্ব শুভ শক্তি ও ভাবনার প্রসূতি ভারতবর্ষকে জগৎসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, ততোধিক আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর পুনরভ্যুদয়ের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থাপিত করেছিলেন নতুন ধরনের জাতীয়তাবোধ। আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক এই জাতীয়তাবোধের লক্ষ্য সার্বিক জাগৃতি। আধ্যাত্মিক অভ্যুন্নতির অধিনায়ক স্বামীজী তাঁর লক্ষ্য ঘোষণা করে বলেছিলেন ঃ 'আমি সেই ভারতকেই আবার দেখিতে চাই, যে-ভারতে প্রাচীন যুগে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব ছিল, তাহার সহিত বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি স্বাভাবিকভাবে মিলিত হইয়াছে। এই নূতন অবস্থার সৃষ্টি ভিতর হইতেই হইবে, বাহির হইতে নয়।'[৬৮] ভারতাত্মার বাণীমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ যে 'নূতন ভারতের' স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই ভারত জগতের যাবতীয় মহৎ ভাবের সমন্বয়ভূমি। তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়েই তার সমাজ ও রাষ্ট্র, শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্প, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে হবে, এবং ভারতীয় ঐতিহ্যে শিকড়বদ্ধ হয়ে জগতের বিভিন্ন মহৎ ভাবকে আত্মসাৎ করতে হবে।

৬৬। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৩৪, পৃঃ ৯-১০ ৬৭। উদ্বোধন, ৩৮ বর্ষ, পৃঃ ১৮৫

৬৮। বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, পৃঃ ৩৪১-৪২

ভারতজাগৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বজনীন ভূমিকা। তা হল মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর। এই বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ অথচ অত্যাবশ্যক গুরুদায়িত্ব স্থান পেয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের পৌরুষ, প্রতিভা ও মহাপ্রাণতার মধ্যে। বুদ্ধিচাতুর্যে উদ্‌ভ্রান্ত, বস্তুতান্ত্রিকতার মদে প্রমত্ত, জাগতিক বৈভবে ক্লিষ্ট পীড়িত পাশ্চাত্যকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি উদারহস্তে উপহার দিয়েছিলেন ভারতের আধ্যাত্মিকতা। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ঃ 'সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর—ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী।'[৬৯] নিঃসন্দেহে স্বামীজীর জাতীয়তাবোধের পরিপূরক তাঁর জগদ্ধিতায় ভাবনা এভাবে স্বামীজীর পরিকল্পনায় বিশ্বকল্যাণের পটভূমিকায় সুনিশ্চিত স্থান পাওয়াতে ভারতীয় সংস্কৃতির সাধনভূমি উদারতর ব্যাপকতর হয়েছে, সার্বভৌমত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সংস্কৃতির চিন্ময় ভাবাদর্শ। তিনি সারাজীবন এই ভাবাদর্শ বহন করেই ক্ষান্ত হননি, ভারতসংস্কৃতিতে নিগূঢ় পরম আশ্বাসের ভাবটি আত্মস্থ করে জগদ্বাসীকে ভরসা দিয়ে বলেছিলেন ঃ I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere, until the world shall know that it is one with God. স্বামীজীর বিমূর্ত শক্তি ভারতীয় সংস্কৃতির মহান ভূমিকা—জগদ্বাসীর আধ্যাত্মিক রূপান্তরসাধনে সাহায্য করছে, ভবিষ্যতেও করবে।

৬৯। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৬

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

জাতীয় জীবনের এক চরমতম অন্ধকারের দিনে দারিদ্র, দুর্নীতি, অজ্ঞতা, রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা, নৈতিক শিথিলতা, হীন স্বার্থপরতা ও অভাবনীয় অযোগ্যতার বিষবাষ্পে যখন মুঘল সভ্যতার প্রাচীন সৌধ ভেঙে পড়েছে—এমনই একদিনে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুষ্টিমেয় সৈন্যের হাতে পরাজিত হলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি নবাব সিরাজউদ্দৌলা। ইংরেজ শাসনের এই নতুন অধ্যায়কে স্বাগত জানালেন অনেকেই নতুন প্রত্যাশায়।

পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মৃতপ্রায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ ও জনজীবনে এক নতুন প্রাণস্পন্দন দেখা দিল—শুরু হল আধুনিকতার পাদপীঠে চিরাচরিত শাস্ত্রীয় বিধি ও নীতিশাস্ত্রের এক যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ মূল্যায়ন। সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূত্রপাত হল ভারতবর্ষে—এর নাম নবজাগরণ বা 'Renaissance'। এই নবজাগরণ বাঙালী-চিত্ত আলোড়িত করে যে নতুন ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল তারই উচ্ছ্বসিত ধারায় অবগাহন করে ধীরে ধীরে সমগ্র ভারত নবজন্ম লাভ করল। সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনৈতিক চেতনার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে লাগল স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় লাঞ্ছনার স্বরূপ এবং ভারতবাসীর মুক্তির আকৃতি। ধীরে ধীরে ভারতবাসী তখন সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছে। বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৬), জমিদার সভা (১৮৩৮), ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৩৯), বেঙ্গলী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১) প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা। আবার, এরই সঙ্গে সঙ্গে চলছে ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে দেশজোড়া কৃষক-শ্রমিকদের বিরামহীন বিক্ষিপ্ত সশস্ত্র সংগ্রাম। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের দেশজোড়া অভ্যুত্থানের পরও চলল বিদ্রোহের মিছিল। বস্তুত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে এক উদ্দীপনাময় যুগের সূত্রপাত হয়েছিল—স্বাদেশিকতার জোয়ার সর্বত্র। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা, কেশবচন্দ্রের ধর্ম নীতি সেবা ও দেশপ্রেমের ব্যাখ্যা, বাংলা নাট্যমঞ্চের কার্যকলাপ, 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা, 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের নিত্যনতুন চমক জাতীয় চেতনাকে তখন নানাভাবে সঞ্জীবিত করছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, বাণী ও হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যানে আকৃষ্ট হয়ে লোক ছুটছে দক্ষিণেশ্বরে। এদিকে, অসাধারণ মেধা, মনীষা ও বাগ্মিতা নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ দেশে শুরু করেছেন 'বাস্তববাদী' রাজনৈতিক আন্দোলন। এককথায়, তখন কলকাতার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন চরম উদ্দীপনাময় স্বাদেশিকতার রঙে রঞ্জিত।

সমকালীন কলকাতার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, গণ-আন্দোলন, সাহিত্যচর্চা এবং বিদেশী শাসকের স্বৈরাচারী নীতি ছাত্রাবস্থাতেই স্বামী বিবেকানন্দকে একজন

জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকে পরিণত করেছিল। শিমলার ডানপিটে নরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র একজন জাতীয়তাবাদীই ছিলেন না, তিনি তাঁর জীবন, বাণী ও কর্মের দ্বারা ভারতবাসীর নবলব্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নানাভাবে সঞ্জীবিত করেছেন—যার ফলে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন এক প্রচণ্ড শক্তি আহরণ করেছে।

স্বাধীনতা বা মুক্তির প্রত্যয় হল জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের এক শ্রেষ্ঠ অবদান; আর এই মুক্তির সাধনা হল বেদান্তভিত্তিক। উপনিষদ্ বলছেঃ 'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্'[১]—মন, বাক্, শ্রোত্র ও বিজ্ঞান—এসকলের উপর আধিপত্যই হল 'স্বারাজ্য' লাভ। এই স্বারাজ্যের পর ব্রহ্মের সঙ্গে একত্বলাভ হয়। হিন্দুদর্শনে এটাই হল সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্তর, অর্থাৎ বিশ্বচেতনার সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে, কেবলমাত্র সর্বপ্রকারের বন্ধনমুক্ত হওয়াই নয়—বরং বিশ্বের সর্বচরাচরের সঙ্গে প্রকৃত একাত্মবোধ স্থাপন। এই হল স্বাধীনতা বা স্ব-অধীনতা। হিন্দুদর্শনে 'স্ব-অধীনতা'র অর্থ হল বিশ্বসত্তার কাছে ব্যক্তিসত্তার আত্মসমর্পণ। সুতরাং স্বরাজ বা স্বাধীনতা কোন প্রকার রাজনৈতিক পরিভাষা নয়—একটি আধ্যাত্মিক শব্দ। শ্রীঅরবিন্দের মতে, মানবসমাজের উন্নয়নের ঊর্ধ্বতন স্তরে 'স্বরাজ' কোন প্রকার বস্তুতান্ত্রিক সামগ্রী নয়—'স্বরাজ' হল আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও যৌগিক অগ্রগতি।[২] বিপিনচন্দ্র পাল বলছেনঃ এই স্বরাজলাভ হলেই আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসবে।[৩]

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় মোক্ষ বা মায়ার বন্ধনমোচনই চাননি, মানুষের বৈষয়িক ও সামাজিক মুক্তিও তাঁর কাম্য ছিল। স্বাধীনতা বলতে স্বামীজী কি বুঝতেন তা তাঁর বহু চিঠিপত্র ও রচনাদিতে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মতেঃ 'স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তাহার আহার পোশাক বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন—তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কাহারও অনিষ্ট না করে।'[৪] আবার, 'সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে-বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যেসকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যেসকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।'[৫] তবে বলে রাখা দরকার যে স্বাধীনতা অর্থে স্বামীজী কখনই স্বেচ্ছাচার বোঝেননি।[৬]

স্বামীজী বলছেন যে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির কথা উপনিষদেই লিখিত আছে। কিন্তু, এবারে প্রশ্নঃ পরাধীন জাতির পক্ষে কি সত্যই দৈহিক মানসিক এবং

১। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ১।৬।২

২। Sri Aurobindo, Vol. I, Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Pondicherry, 1972, p. 465

৩। The Spirit of Indian Nationalism—B. C. Pal, 1910, p. 11

৪। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪০

৫। তদেব, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৪

৬। তদেব, পৃঃ ২৩

আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব? স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই এই চরম সত্যটি জানতেন যে, পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত কোন জাতির স্বাধীন চিন্তা বা কর্মের অধিকার নাই বা তার পক্ষে নিজের ইচ্ছামতো শরীর, বুদ্ধি বা ধন ব্যবহারেরও সুযোগ নাই—সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এই রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথাই তিনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে বলেছিলেন: 'India should be freed politically first.'[৭] মনে পরাধীনতার জ্বালা ছিল বলেই তিনি ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী—অন্য জাতির স্বাধীনতা-প্রাপ্তিতেও তিনি হর্ষোৎফুল্ল।[৮] ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই শ্রীনগরে পালন করলেন আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। 'To The Fourth of July' কবিতার মাধ্যমে অভিনন্দন জানালেন আমেরিকার ইতিহাসের চিরস্মরণীয় এই দিনটিকে এবং এরই সাথে পৃথিবীর সকল জাতির স্বাধীনতা কামনা করলেন। তাই রোমাঁ রোলাঁ সত্যই ভ্রান্ত যখন তিনি লিখলেন যে, স্বামীজীর মধ্যে: 'There was no thought of *Hind Swaraj,* of the political independence of India.'[৯] দেশমাতৃকা ছিলেন 'queen of his adoration', 'India was his day-dream, India was his nightmare'—ভারতের সমাজ ছিল তাঁর শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী—এবং অতি শৈশবকাল থেকেই পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিতা ভারতমাতার সর্বাত্মক মুক্তির স্বপ্ন তিনি দেখতেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অখণ্ড ভারতবোধ, আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা এবং স্বদেশী শিল্পের বিকাশ ও প্রসারের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র দূর করে দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন করার উদ্দেশ্যে নবগোপাল মিত্র 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠা করেন। লুপ্তপ্রায় স্বদেশী শিল্পের পুনরুত্থান, কৃষি, বিজ্ঞান, শরীরচর্চা এবং বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সঙ্গীতের মাধ্যমে হিন্দুমেলা জাতীয় জীবনে এক নবযুগের সূত্রপাত করেছিল। বালক নরেন্দ্রনাথের সঙ্গেও নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা ও জাতীয় ব্যায়ামাগারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।[১০] এসময় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীও তাঁর খুব প্রিয় ছিল।[১১]

ছাত্রসমাজের মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে 'ছাত্র সভা' বা 'Students' Association' প্রতিষ্ঠিত হলে পদচ্যুত সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ তাতে যোগদান করেন। সুরেন্দ্রনাথের ভারতীয় ঐক্য, শিখজাতির অভ্যুদয়,

---

৭। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ ও অপরাপর কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে স্বামীজীর কথাবার্তা সম্পর্কে হেমচন্দ্রের বিবৃতি—দ্রষ্টব্য: Swami Vivekananda : Patriot-Prophet—Bhupendranath Datta, Nababharat Publishers, Calcutta, 1954, p. 334

৮। 'তবু স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামি আর এক...স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ।' [বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১৩৫]

৯। The Life of Vivekananda and the Universal Gospel—Romain Rolland, Advaita Ashrama, Calcutta, 1970, p. 135; এই পৃষ্ঠার পাদটীকায় প্রকাশক মন্তব্য করেছেন: 'But the Swami wanted the political independence of India.'

১০। Patriot-Prophet, p. 156 এবং যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৫১ ১১। Patriot-Prophet, pp. 418-19

ম্যাৎসিনীর জীবন, চৈতন্য প্রভৃতি বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে ছাত্রসমাজ ভিড় জমাত ছাত্রসভার অধিবেশনে। দেশপ্রেমের তপ্ত আগুন জ্বলত সকলের বুকে। ছাত্র নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার নিয়মিত শ্রোতা।[১২]

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি.এ. এবং শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক সংকলিত 'সঙ্গীত-কল্পতরু' পুস্তকটি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমের অন্যতম নজির। এই সঙ্গীতগ্রন্থটি মূলত স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা সংকলিত 'কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায়'[১৩] বৈষ্ণবচরণ বসাক তা শেষ করেন। এই পুস্তকে জাতীয়, ধর্মীয়, শ্যামা, কৃষ্ণ, প্রণয় ইত্যাদি বহু বিষয়ে সঙ্গীত সংকলিত হয়েছে, কিন্তু এর প্রথমেই রয়েছে জাতীয় সঙ্গীত। হেমচন্দ্রের 'বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে' গানটি দিয়ে এর সূত্রপাত। এছাড়া, এতে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'কালরাত্রি পোহাইল উদিত সুখ তপন', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সব ভারত সন্তান', মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন', রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি বিষাদিনী বীণা', 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ' প্রভৃতি বহু জাতীয় সঙ্গীত স্থান পেয়েছে। এই বিভাগের অনেকগুলি গানের তলায় শুধু 'হিন্দুমেলা' লেখা রয়েছে। মনে হয়, এগুলি হিন্দুমেলায় গীত হত। এইসব জাতীয় সঙ্গীতের পর ধর্মসঙ্গীত স্থান পেয়েছে। সুতরাং এসময় স্বদেশচেতনাই যে নরেন্দ্রনাথের অনুভূতিতে সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছিল এই সংকলনটি তার বড় প্রমাণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর বরাহনগর মঠে বুদ্ধের করুণা, শঙ্করের মেধা এবং চৈতন্যের প্রেম—এই মহাত্রিবেণীর সমন্বয় নবভারত গঠনের চিন্তায় বিভোর হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী-সন্তানেরা। পদব্রজে পরিব্রাজকবেশে ভারতপরিক্রমায় বের হয়ে সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ নিজ চোখে দেখে এলেন ব্রিটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় সারা দেশ কিরকম স্থবির হয়ে পড়েছে—দারিদ্র, বুভুক্ষা, অজ্ঞানতা, অসারতা, পরনির্ভরশীলতা, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা এবং নানা ধরনের অশিক্ষা-কুশিক্ষায় মগ্ন সারা জাতি—তমোগুণে আচ্ছন্ন সারা দেশ। দেশের অভ্যন্তরে এই অবস্থা চলছে, আর বিদেশে ভারত সম্পর্কে চলছে নানা অপপ্রচার—ভারতকে বিশ্বসমাজে হেয় করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলেই যে দেশের এই অবস্থা তা তিনি জানতেন—তাঁর চিঠিপত্র এবং কথাবার্তাতেও প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলেনঃ 'ইংরেজি সভ্যতার উপাদান হল তিনটি "ব"—বাইবেল, বেয়নেট ও ব্রাণ্ডি। এরই নাম সভ্যতা। এই সভ্যতাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, একজন হিন্দুর গড়ে মাসিক আয় ৫০ সেন্টে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।' আর এক জায়গায় তিনি বলছেনঃ ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা

১২। 'Amongst those who regularly attended the meetings in those days were Mr. B. Chakravarti, Swami Vivekananda, Mr. Nanda Kishore Bose, Mr. S. K. Agasti, and others.' [A Nation in Making—Surendranath Banerjea, Oxford University Press, Calcutta, 1925, p. 35]

১৩। 'সঙ্গীত-কল্পতরু'র প্রারম্ভে 'বিশেষ কথা'য় বৈষ্ণবচরণ বসাকের বক্তব্য।

রেখে গেছে অপূর্ব সব মন্দির, মুসলমানরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরেজরা? স্তূপীকৃত ভাঙা ব্রাণ্ডির বোতল—আর কিছু নয়। ...ইংরেজদের কৃতকর্মের প্রতিশোধ ইতিহাস নেবেই নেবে। আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে পিষেছে, নিজেদের তৃপ্তির জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটি শুষে নিয়েছে, আর এদেশের কোটি কোটি টাকা নিজের দেশে চালান করেছে।[১৪] সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রতি জাতীয়তাবাদী যুব-সন্ন্যাসীর এই অগ্ন্যুদ্গিরণ যেন আগামী যুগের বিপ্লববাদের পূর্বাভাষ। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর মিস মেরী হেলকে লিখিত এক পত্রে স্বামীজী ভারতে ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতি, চরম অপদার্থতা এবং ঘৃণ্য ও স্বার্থান্বেষী অর্থনৈতিক অপশোষণের এক মর্মন্তুদ চিত্র তুলে ধরে ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। ছত্রে ছত্রে পরাধীনতার জ্বালা আর হতাশা—'মেরী, আমাদের কোন আশা নেই, যদি না সত্যি...ভগবান থাকেন।'[১৫] ভারত-ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারবেন যে স্বামীজীর এই চিঠির মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই। Press Act, Arms Act, পুনা প্লেগ দমনে সরকারী অত্যাচার ও নারীর শ্লীলতাহানি, তিলকের কারাবরণ, লর্ড কার্জনের শিক্ষা-সঙ্কোচন নীতি ও কলকাতা কর্পোরেশন আইন, ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অংশের দুর্ভিক্ষ, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি সরকারী নীতি—এসবের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে স্বামীজীর চিঠিতে।

পরাধীনতার এই জ্বালা থেকে মুক্তির উপায় কি? ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে মানুষকে প্রকৃত সর্বাঙ্গীণ মুক্তির স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে দিতে পারবে? বস্তুত, কংগ্রেস তখন ছিল নরমপন্থীদের (moderates) হাতে। ইংরেজি শিক্ষিত ধনিকশ্রেণী পরিচালিত ও ধনিক স্বার্থেই নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের খেটে খাওয়া বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্কই ছিল না।[১৬] তাঁরা মনে করতেন যে, সমাজের নিম্নস্তরের সর্বহারাদের দুর্দশা ও অজ্ঞানতা দূর করা অনাবশ্যক এবং সেজন্য পরিশ্রম করার এখনও সময় আসেনি।[১৭] তৎকালীন কংগ্রেস একটা তিনদিনের রাজনৈতিক 'তামাশা' ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ইংলণ্ড ছিল তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অনুপ্রেরণার উৎস—তাঁরা কঠোরভাবে সরকারের সমালোচনাও করতে পারতেন না। এর লক্ষ্য (কিছু শাসনতান্ত্রিক সুযোগসুবিধা লাভ) ভ্রান্ত, গঠনতন্ত্র (মধ্যবিত্ত শ্রেণী) অবৈধ এবং কর্মপদ্ধতি (আবেদন-নিবেদন—'a policy of 3 Ps') ছিল নিন্দনীয়। স্বামীজী কংগ্রেসের দুর্বল মত, পথ ও নীতিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আলমোড়ায় তিনি কংগ্রেস নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তকে বললেন: '...বলতে

১৪। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Part 1—Marie Louise Burke, Advaita Ashrama, Calcutta, Third Edition (1983), pp. 32-3

১৫। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৭২। এছাড়া, বহুস্থানেই স্বামীজী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে নির্মম সমালোচনা করেছেন—দ্রষ্টব্য: New Discoveries এবং মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ'।

১৬। Sri Aurobindo, Vol. I, pp. 34-9 ১৭। ibid., p. 42

পারেন, কংগ্রেস জনসাধারণের জন্য কি করেছে? আপনি কি মনে করেন, কয়েকটা প্রস্তাব পাস করলেই স্বাধীনতা এসে যাবে? তাতে আমার বিশ্বাস নেই। প্রথম জাগাতে হবে জনসাধারণকে। গোড়ায় তাদের পেটপুরে খেতে দেওয়া হোক, তাহলেই তারা নিজেদের মুক্তির পথ করে নেবে। যদি কংগ্রেস তাদের জন্য কিছু করে তবেই কংগ্রেস আমার সহানুভূতি পাবে। সেইসঙ্গে আমাদের ইংরেজদের গুণগুলোও আত্মসাৎ করতে হবে।'[১৮] কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে অধিক ক্ষমতার দাবি জানাচ্ছেন, কিন্তু তাঁরা দেশের সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নন—এর বিরুদ্ধে স্বামীজী বলছেন: 'আমাদের নির্বোধ যুবকগণ ইংরেজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতা লাভের জন্য সভাসমিতি করিয়া থাকে—ইহাতে ইংরেজরা হাসে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে। দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য।'[১৯] কংগ্রেস নেতারা মনে করতেন যে জনসাধারণের দুর্দশা বা অজ্ঞানতা দূর করার সময় এখনও আসেনি—ধনীদের মতো জ্ঞানার্জনের সমান সুযোগ পেলে তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে। স্বামীজী প্রশ্ন তুলেছেন: '...তাঁহারা কি একথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন?'[২০] 'মিরর'-এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনকে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলছেন যে, কেবলমাত্র দিনরাত 'এ দেও, ও দেও' বলে চিৎকার করলে কিছু হবে না,[২১] গোটাকতক লোককে সিভিল সার্ভিসে ঢুকিয়ে দিলে বা কিছু রাজনৈতিক অধিকারের দাবি করলে স্বাধীনতা আসবে না।[২২] 'এই ঘোর দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রোগ-মহামারীর দিনে কংগ্রেসওয়ালারা কে কোথায় বল? খালি "আমাদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দাও" বল্লে কি চলে?'[২৩] আগে জনসাধারণের দুঃখকষ্টের দিনে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে, সেবা করতে হবে—নিজেদের মানুষ হতে হবে—তা না হলে ইংরেজের দেওয়া জিনিস তো রাখাই মুশকিল।[২৪] '...আহাম্মক! ওদের পায়ে ধরে জীবনসংগ্রামোপযোগী বিদ্যা...শিখ্‌গে। যখন উপযুক্ত হবি...ওরাও তখন তোদের কথা রাখবে। কোথাও কিছুই নেই, কেবল Congress (কংগ্রেস—জাতীয় মহাসমিতি) করে চেঁচামেচি করলে কি হবে?'[২৫] বেনিয়ার কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে গিয়ে লাভ নেই—'ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস কংগ্রেস করে মিছামিছি হৈ চৈ করছে কেন? কতকগুলো হাউড়ে লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলাবাজি করলেই কি কাজ হয়? চেপে বসুক, নিজেদের Independent

---

১৮। The Life of Swami Vivekananda, Vol. 2—His Eastern and Western Disciples, Advaita Ashrama, Calcutta, Fifth Edition (1981), p. 354

১৯। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৪১ ২০। তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২৪

২১। তদেব, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৭

২২। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition (1964), pp. 354-55 ২৩। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১০২

২৪। 'Suppose the government give you all you need, where are the men who are able to keep up the things demanded? So *make men* first.' [The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, p. 333] ২৫। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১০৭

বলে declare করুক, হেঁকে বলুক, "আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম", আর সমস্ত স্বাধীন Governmentকে নিজেদের Declaration পত্র পাঠিয়ে দিক, তখন একটা হৈ চৈ উঠবে। ...কেবল কি গলাবাজিতে কাজ হয়? বেপরোয়া হয়ে কাজ করতে হবে। বিধিমতে কাজ করে যাব, তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক।

'...পড়ুক গুলি আমার বুকে; আমেরিকা, ইউরোপ একবার কি রকম কেঁপে উঠবে! ...কংগ্রেস জোর-গলায় নিজেদের স্বাধীনতা declare করুক, শুধু মাগীদের মতন বসে বসে কাঁদুনি গাইলে কি হবে?'[২৬]—তাহলে দেখছি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দ ঘোষের মতামতের সঙ্গে স্বামীজীর প্রবল সাদৃশ্য। অরবিন্দ ঘোষের মতো সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও চান যে কংগ্রেস গণমুখী হোক, রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি বা ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ না করে আত্মশক্তির বলে ('purification by blood and fire'—অরবিন্দ) নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করুক।

'জনসাধারণের মুক্তির অন্যতম উপায় খুঁজতেই' ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী আমেরিকায় গেলেন। বস্তুত, আমেরিকায় স্বামীজীর বিশ্ববিজয়ীর সম্মানলাভ এবং বহির্বিশ্বে স্বামীজীর প্রচারকার্য জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে কেবলমাত্র একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাই নয়—জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি যুগান্তর। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে: বিদেশে বেদান্ত প্রচার করে কিভাবে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসতে পারে অথবা বিদেশে বেদান্ত প্রচারের কি সার্থকতা? দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে—প্রথমত, ইংরেজ শাসনে দেশ স্থবির, জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট—দেশে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য বিদ্যমান, জনমানসে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি বীর্যবত্তা—সবকিছু সম্পর্কেই একটা হীনম্মন্যতা বিদ্যমান; দ্বিতীয়ত, ইংরেজের অপপ্রচারের ফলে বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত—বিদেশীর চোখে ভারত তখন বর্বরের দেশ, এবং তাদের ধারণা ইংরেজের আগমনের ফলেই ভারতে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করেছে। এই অবস্থায় ভারত যদি স্বাধীনতা চায় তবে সে নিশ্চয়ই বিশ্বের সহানুভূতি পাবে না—যা যে-কোন মুক্তিকামী জাতির পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং এমতাবস্থায় বিশ্বের সহানুভূতি লাভের জন্য বিদেশে ভারতের ঐতিহ্যশালী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচারের প্রয়োজন ছিল। বিশ্ব-ইতিহাসের পাতায় এ ধরনের অনেক নজির মিলবে। বিদেশে বিবেকানন্দের কীর্তি ভারতবাসীকে দিল গৌরব, ঐক্যবোধ এবং আত্মপ্রত্যয়, সুদৃঢ় হল জাতীয়তাবোধের ভিত্তি, প্রাণবন্ত হল দেশপ্রেম। বিদেশেও ভারত সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হল। বহু বৎসরের চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা সমবেতভাবে যা করতে পারেননি, বিবেকানন্দ তা করলেন। এ-সম্পর্কে ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: 'He has done much more to elevate our nation in the estimation of the people of the West than

---

২৬। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৩), পৃঃ ১৫৬

what has hitherto been done by all our political leaders together.'[২৭]

'সাইক্লোনিক মঙ্ক' বিবেকানন্দ সত্যিই এবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভারতের বুকে। 'পুণ্যভূমি' ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হীনম্মন্য জাতির সামনে প্রচার করে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাশীল করে তুললেন। চাবুকে চাবুকে সচকিত করে ভারতবাসীকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে কাপুরুষতা, পরানুবাদ, পরানুকরণ এবং দাসসুলভ দুর্বলতাই জাতির পরাধীনতার কারণ। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—'এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?' জাতিকে ডাক দিয়ে তিনি বললেনঃ 'আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত...।'[২৮] জনসাধারণের সেবা করে তাদেরকে 'মানুষ' করে তুলতে পারলেই দেশমাতৃকার মুক্তি আসবে। স্বামীজী 'মানুষ' চেয়েছিলেন—মানুষ, খাঁটি অকপট মানুষ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, যারা অবিচলিত শ্রদ্ধায় আর অটুট বিশ্বাসে একটি উচ্চ আদর্শের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত—যদি এমন একশ আত্মবিশ্বাসী, আদর্শনিষ্ঠ যুবক মেলে তবে ভারতের মুক্তি হবেই। ভাবীকালের দেশপ্রেমিকদের সামনে তিনি রাখলেন স্বদেশপ্রেমের এক নতুন আদর্শ। পশ্চিমের আমদানি-করা দেশপ্রেম নয়, তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মতো তিনদিনের জন্য দেশপ্রেমিক সাজা নয়—প্রকৃত দেশপ্রেমিক হতে গেলে চাই তিনটি জিনিসঃ হৃদয়, দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা।[২৯] স্বামীজীর অগ্নিগর্ভ বাণী, ত্যাগ ও বিশ্বাসের আদর্শ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ, গভীর অবসাদ ও নৈরাশ্য-ক্লিষ্ট ক্ষীয়মাণ মুমূর্ষু জাতির প্রাণে প্রগাঢ় দেশপ্রেম, অপরিসীম আত্মবিশ্বাস ও অত্যুগ্র আশার সঞ্চার করে ভারতে এক নবযুগের সূত্রপাত করল। স্বামীজী তাঁর জীবিতাবস্থাতেই (১৮৯৭) প্রত্যক্ষ করলেন যে, '...আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। ...কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না।'[৩০]

জাতি সত্যই সেদিন জেগেছিল—স্বামীজীর প্রেরণায় ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নতুন পথে ধাবিত হতে লাগল, লক্ষ লক্ষ যুবক জাতীয়তার যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে এলেন। তাঁর দেহত্যাগের পরেই জাতি দেখল বাংলার স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লববাদীদের অভ্যুদয় এবং নতুন রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে তিলক ও গান্ধীর আবির্ভাব। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ওয়েণ্ডেল টমাস লিখিত 'Hinduism Invades America' নামক পুস্তকে বলা হয়েছে যে বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলেই ঘটেছেঃ 'Anarchist movement in Bengal and the more recent drives for "Civil Disobedience" which

---

২৭। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, প্রথম খণ্ড—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃঃ ১৯০ ২৮। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১৯৮-৯৯

২৯। তদেব, পৃঃ ১১৩-১৪ ৩০। তদেব, পৃঃ ৩৮

Manmohandas Karamchand Gandhi, the saintly politician, has been organizing on a nation-wide scale.'[৩১] জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে মানসিকতা, প্রস্তুতি ও জাতীয় চেতনার প্রয়োজন, বস্তুত ভারতের মুক্তিসংগ্রামে এই মহত্তর জিনিসটিই যুগিয়েছেন স্বামীজী। জাতীয় আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে সরকারও ওয়াকিবহাল ছিলেন। বিপ্লবীদের আস্তানা খানাতল্লাস করতে গিয়ে পুলিশ বিবেকানন্দের পুস্তিকাদি পেত। স্বামীজীর উপরেও পুলিসী দৃষ্টি ছিল এবং তাঁর চিঠিপত্রও খোলা হত।[৩২] সিডিসন কমিটির রিপোর্ট[৩৩] (১৯১৮), উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জেমস ক্যাম্বেল কার (I.C.S.) সম্পাদিত 'Political Troubles in India 1907-17'[৩৪] এবং সরকারী বিভিন্ন গোপন রিপোর্টে[৩৫] বিপ্লব-আন্দোলনের উপর স্বামীজীর প্রভাবের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা সেলুলার জেলে বন্দী বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তীকে তৎকালীন গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'তুমি কি বৈদান্তিক ?...তুমি কি বিবেকানন্দের ভক্ত ?'[৩৬] বেলুড় মঠও পুলিসী সন্দেহ থেকে রক্ষা পায়নি।[৩৭]

এবার স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে, নিজে পূর্ণ স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী এবং জনজীবনে স্বাধীনতার পূর্ণ প্রেরণাস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগ দিলেন না ?[৩৮] প্রথমত, স্বামীজী সন্ন্যাসী, তাঁর কাছে ঈশ্বরই সত্য—আধ্যাত্মিক আলোকে মানুষের মনের অজ্ঞানতা দূর করাই তাঁর কাম্য। দ্বিতীয়ত, তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হল 'man-making'—তাঁর মতে দেশের ভালমন্দ, স্বাধীনতা-পরাধীনতা দেশবাসীর উপর নির্ভরশীল। জনসাধারণ যে শাসনব্যবস্থার উপযুক্ত, দেশে সেই শাসনব্যবস্থাই স্থাপিত হয়।[৩৯] উদাহরণস্বরূপ, তিনি চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধ্বংসের কথা বলেছেন কারণ চীন 'could not produce men equal to the system.'[৪০]

সুতরাং আগে চাই মানুষ। প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হয়ে বৃথা সময় ও শক্তি ক্ষয় করা অপেক্ষা 'মানুষ' তৈরী করে জাতি গঠন করা অধিকতর

৩১। উদ্ধৃতি ঃ উদ্বোধন, ৪৮ বর্ষ, পৃঃ ৫১৮ ; গান্ধীজীর নামের বানানটি লক্ষণীয়।

৩২। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লিখিত পত্রে ঃ 'ভারতের ডাক-বিভাগ আমার চিঠিগুলিকে একটু ভদ্রভাবে খুলবারও চেষ্টা করে না।' [বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৯০]

৩৩। বর্তমানে New Age Publishers Private Ltd., Calcutta গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন (১৯৭৩), দ্রষ্টব্য ঃ পৃঃ ১৬-৭

৩৪। Editions Indian (Calcutta) কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত (১৯৭৩), দ্রষ্টব্য ঃ পৃঃ ১৯৬-৯৮

৩৫। কংগ্রেস—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পৃঃ ১৮০-৮২

৩৬। বিশ্ববিবেক—সম্পাদনা ঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর, বাক্‌সাহিত্য, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৬৬), পৃঃ ২৫২

৩৭। History of the Ramakrishna Math and Mission—Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama, Calcutta, 1957, pp. 202-23

৩৮। '...আমি একজন রাজনীতিক নই, অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই।' [বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৫]

৩৯। 'You can only get the government...you deserve, and no better.' [The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I, Eleventh Edition (1962), p. 455]

৪০। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, p. 200

ফলপ্রসূ নয় কি? তবে সরাসরি রাজনীতির কথা না বললেও বাক্যপ্রয়োগের সতর্ক ভঙ্গিতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার ইঙ্গিত দিয়েছেন—যেকথা তিনি সরাসরি বলতে পারেননি, তা ঘুরিয়ে বলেছেন। 'বর্তমান ভারত'-এ স্বামীজী বলছেন যে স্বজাতি-বাৎসল্য এবং বিজাতির প্রতি বিদ্বেষ—এই দুই কারণে জাতীয় ভাব বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলে গেলেন: 'একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মূর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানির এবং ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির...এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।'[৪১] এত কথার পর স্বামীজী কিন্তু একবারও বললেন না যে ভারতের উন্নতির উপায় হল একান্ত স্বজাতি-বৎসল ও একান্ত ইংরেজ-বিদ্বেষী হওয়া। সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করলে স্বামীজীর রচনাবলীতে এ ধরনের অসংখ্য নজির মিলবে। তবে স্বামীজীর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে ভারত স্বাধীন হবেই। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন যে, 'আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে। কিন্তু যেভাবে সাধারণত দেশ স্বাধীন হয়, সেভাবে নয়।...not with bloodshed.'[৪২] স্বামী গম্ভীরানন্দও জানিয়েছেন যে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে একথাটা বহুকাল প্রচলিত ছিল যে এক 'অভূতপূর্ব উপায়ে' ভারতের স্বাধীনতা আসবে।[৪৩] ভারতের স্বাধীনতা কখনই বিনা রক্তপাতে অর্জিত হয়নি—তা ঠিকই; তবে এই চরম সত্যটিকেও স্বীকার করতে হবে যে পৃথিবীর অপরাপর দেশের মুক্তিসংগ্রামের তুলনায় সে রক্তপাত বা আত্মদান ব্যাপকতার দিক থেকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

জাতীয় আন্দোলনে স্বামীজীর ভূমিকা ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়ায়নি—ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তিনি 'আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক'।[৪৪] স্বামীজীর কার্যাবলীর মূল্যায়ন করলে এই উক্তিটির যথার্থতা মিলবে।

প্রথমত, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ভারতে জাতীয়তাবাদের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। তখন বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, মারাঠী প্রভৃতি জাতি থাকলেও 'ভারতীয়' নামে কোন জাতি ছিল না। ব্রাহ্মসমাজ, বিদ্যাসাগর-দয়ানন্দের আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথের কর্মপ্রয়াস বা কংগ্রেসী রাজনীতিও তখন সমগ্র দেশে কোন সজীবতা আনতে বা কোন জাতির প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। এমতাবস্থায় শিকাগো ধর্মমহাসভার কয়েক বৎসরের মধ্যে স্বামীজী ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত করেন। জগৎসভায় হিন্দুধর্মের

৪১। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৩

৪২। উদ্বোধন, ৬২ বর্ষ, পৃঃ ৫৪৮ এবং Reminiscences of Swami Vivekananda—His Eastern and Western Admirers, Advaita Ashrama, Calcutta, 1961, p. 367

৪৩। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৬), পৃঃ ৪২০

৪৪। 'Swami Vivekananda might well be called the father of modern Indian Nationalism; he largely created it and also embodied in his own life its highest and noblest elements.' [India's Struggle for Swaraj—R. G. Pradhan, p. 60; quoted in History of the Freedom Movement in India, Vol. I—Dr. R. C. Majumdar, Firma K. L. M., Calcutta, Second Edition (1971), p. 319]

গৌরব প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও গৌরববোধের মাধ্যমে এক ঐক্য গড়ে ওঠে। তাঁকে অনেকে 'হিন্দু জাগরণের' নেতা বলে অভিহিত করে থাকেন—কিন্তু স্বামীজীর মতে 'হিন্দু' কোন বিশেষ ধর্মীয় শব্দ নয়।[৪৫] তাঁর কার্যকলাপে হিন্দুদের মধ্যে জাগরণ দেখা দিলেও, '...তাঁর আহ্বান কেবল হিন্দুদের জন্য ছিল না। তিনি সর্বদাই "ভারত" শব্দ ব্যবহার করতেন, এবং ভারতীয় জনসংখ্যার যখন হিসাব দিতেন, তখন মুসলমানদের বা খ্রীষ্টানদের সংখ্যাকে বাদ দিয়ে বলতেন না।'[৪৬] এছাড়া, তাঁর প্রচারিত 'নববেদান্ত' বিশেষ কোন ধর্মমত নয়—এই 'সর্বাবয়ব' বেদান্তের দ্বারা তিনি মানবধর্ম প্রচার করে বিশ্ববাসীকে কর্মযজ্ঞে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অধিকন্তু, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুন মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে লিখিত 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ'র পরিকল্পনা সংবলিত পত্রটি জাতীয়তাবাদী বিবেকানন্দের স্বদেশদ্যোতনার আর এক চিহ্ন[৪৭] এবং এরই মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের সূত্রও নিহিত আছে।

দ্বিতীয়ত, রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে না দাঁড়িয়েও স্বামীজী বললেন যে, 'ভারতের ভবিষ্যৎ জাতির জন্ম হইবে দরিদ্র ও অস্পৃশ্যের কুটিরে'। ভারতের তথাকথিত নীচজাত শ্রমজীবীরাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ—প্রকৃত জাতি গঠন করতে হলে এই বিরাট জনসমষ্টিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্ন দিয়ে 'মানুষ' করতে হবে। তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কেউই গণশক্তির সদ্ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। পরবর্তীকালে গান্ধীজী জনসাধারণের ভিত্তির উপর জাতীয়তাবাদের সূচনা করেছিলেন।

তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদকে ধর্মের স্তরে উন্নীত করে তিনি ভারতবর্ষে আবেগময় আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেন। তিনি মনে করতেন যে কেবলমাত্র অতীত গৌরবের উপর ভিত্তি করেই জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করা সম্ভব।[৪৮] অতীতে আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করেই ভারতের গৌরব ও প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, আধ্যাত্মিকতাই অতীতে ভারতীয় সমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল—সুতরাং এই আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মই জাতীয় জীবনের ধারক। কোন প্রকার সংস্কারসাধন বা রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্বে তিনি ভারতবর্ষে ধর্মীয় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। ধর্ম বলতে স্বামীজী কখনই বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানাদি বোঝেননি। ধর্ম বলতে তিনি বুঝেছেন পৃথিবীর সর্বধর্মের মূলতত্ত্বকে উদারভাবে গ্রহণ, আত্মবিশ্বাস, চরিত্রগঠন, নিষ্ঠা, সততা ও আত্মোপলব্ধি। তাই তাঁর ধর্ম হল 'man-making religion'— জীবনের প্রতিটি ক্রিয়ার মধ্যেই তিনি ধর্মকে দেখেছেন। নিঃস্বার্থ মহান ত্যাগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংস্কারসাধন বা স্বাধীনতা সংগ্রামও তাই তাঁর কাছে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।[৪৯] এছাড়া, স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে 'Renaissance precedes revolution'—আর এই renaissance নিঃসন্দেহে 'spiritual renaissance'। ইতিহাসের মননশীল

৪৫। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৫-৬

৪৬। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮

৪৭। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৩৮-৯

৪৮। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV, Eighth Edition (1962), p. 324

৪৯। দ্রষ্টব্যঃ বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), নিবেদিতা লিখিত ভূমিকা।

পাঠকমাত্রই জানেন যে ভারতে ধর্মবিপ্লবের পরেই সাধিত হয়েছে রাজনৈতিক বিপ্লব। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে সমগ্র বিশ্বের জন্য ভারতের একটি বিশেষ বাণী আছেঃ বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতার আলোকে সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত করতে হবে। '...আমাদিগকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে, ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই; এইরূপই করিতে হইবে, নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত।'[৫০] এদিক থেকে তাঁর সঙ্গে ভারতীয় চরমপন্থী রাজনীতিবিদ্‌দের প্রচুর সাদৃশ্য আছে। চরমপন্থী অরবিন্দের মতে জাতীয়তাবাদ কোন প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রম নয়, 'Nationalism is a religion that has come from God.'[৫১]—সনাতন ধর্মই হল জাতীয়তাবাদ।[৫২] বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেনঃ 'This new Nationalist movement in India is essentially a spiritual movement.'[৫৩] এই সকল নেতৃমণ্ডলী বিশ্বের জন্য ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীতেও বিশ্বাসী ছিলেন।[৫৪] বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে স্বামীজীর জাতীয়তাবাদ হল আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদ, কারণ স্বামীজীর ডাকে ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিজাতীয় ভাবধারায় আচ্ছন্ন তরুণ বুদ্ধিজীবীরা একটি গোঁড়া জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলে এবং গুপ্ত সমিতি গঠন করে হিংসা ও সন্ত্রাসের পথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়।[৫৫]

চতুর্থত, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতেও ভারতভূমি মাতৃরূপে প্রতিভাত। অতীতের গৌরবমণ্ডিত দেশমাতাকে তাঁরা উভয়েই অধিকতর গৌরবশালিনী দেখতে চেয়েছিলেন।[৫৬] দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে স্বামীজী বলছেন যে, অন্যান্য দেবদেবী বাদ দিয়ে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য দেশজননীই সকলের উপাস্যা হোন। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে তিনি বঙ্কিমের 'সন্তান ধর্ম' পালন এবং স্ত্রী-জাতিকে মহামায়া ও দেশজননীর জীবন্ত প্রতীকরূপে সম্মান প্রদর্শনের উপদেশ দেন।[৫৭] 'বর্তমান ভারত'-এর উপসংহারে তিনি স্পষ্টই বলেনঃ 'তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত।' বলা বাহুল্য যে, দেশকে মাতৃরূপে জ্ঞান করে 'সন্তান ধর্ম'-এর সাহায্যে দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনের আদর্শ প্রচারে অগ্রগামীর ভূমিকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও বঙ্কিমের দৃষ্টি কিন্তু বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে তিনি বাংলার কথাই বলেছেন এবং তৎকালীন বাংলারই জনসংখ্যার হিসাব দিয়েছেন। এছাড়া, স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিও বাংলার বুকে উচ্চারিত হয়নি। এক্ষেত্রে স্বামীজীর দৃষ্টি ছিল সমগ্র ভারতের দিকে এবং তিনিই মাতৃপূজার আদর্শকে সর্বপ্রথম জনপ্রিয় করে তোলেন। পরবর্তীকালে চরমপন্থী রাজনীতিকগণ এই আদর্শকেই প্রচার করেছেন—

৫০। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৭২ ৫১। Sri Aurobindo, Vol. 1, p. 652

৫২। ibid., Vol. 2, p. 10 ৫৩। The Spirit of Indian Nationalism, p. 11

৫৪। 'Bande Mataram' and Indian Nationalism (1906-1908)—Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, Firma K.L.M., Calcutta, 1957, p. 85

৫৫। India in Transition—Manabendra Nath Roy, Nachiketa Publications Limited, Bombay, 1971, p. 191

৫৬। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV, p. 353

৫৭। হেমচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি—দ্রষ্টব্যঃ Patriot-Prophet, pp. 331-35

অরবিন্দ ঘোষ স্বদেশকে 'মা' বলে পূজা করেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল ভারতের পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ও সমতলভূমির মধ্যে উপলব্ধি করেছেন ভারতমাতার প্রেম ও জীবনীশক্তি। ভারতের ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, নাটক, শিল্প ও ধর্মের মধ্যে তিনি দেখেছেন মায়ের পবিত্র জীবনকথা, ভাবাবেগ, অভিজ্ঞতা ও সুসংবদ্ধ আত্মার বহিঃপ্রকাশ।[৫৮]

পঞ্চমত, নির্বীর্য জাতির প্রাণে বীর্যবত্তা বা ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রহ্মতেজের সঞ্চার করা স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। উপনিষদের নতুন ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে 'অভয়ম্'-ই হল বেদ-বেদান্তের মর্মবাণী—গীতার মর্মও হল পুরুষার্থ ও শক্তির উন্মেষ। তাঁর জীবন, রচনা ও সাহিত্যের এক প্রধান উপজীব্য বিষয় হল বীররস। 'মেঘনাদবধকাব্যে' রাম নয়—রাবণই তাঁর কাছে প্রধান চরিত্র।[৫৯] লক্ষ্মণ চরিত্র তাঁর কাছে কাপুরুষরূপে প্রতিভাত, স্বদেশদ্রোহী বিভীষণ তাঁর কাছে 'নেমকহারাম, traitor'।[৬০] গীতার শ্রীকৃষ্ণ, রামায়ণের রামচন্দ্র ও মহাবীর হনুমান, প্যারাডাইস লস্টের শয়তান, মেঘনাদবধকাব্যের রাবণ, ইতিহাসের বিজয় সিংহ, রানা প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিং, নেপোলিয়ন, সীজার, চেঙ্গিস খাঁ, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি বীরচরিত্রগুলি তাঁর শ্রদ্ধার পাত্র। জগৎ ও জীবন তাঁর কাছে রণক্ষেত্র—হীনবীর্য জাতিকে বহু বার বহু ভাবে তিনি শক্তিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেছেন; বলেছেনঃ 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে গেলে প্রয়োজন শক্তির উপাসনা—লৌহদৃঢ় পেশী, ইস্পাতকঠিন স্নায়ু এবং বজ্রদীপ্ত উপাদানে গঠিত মন। তিনি বলেছেনঃ সংগ্রামের পথ পিচ্ছিল—দুঃখ মৃত্যু এর নিত্যসঙ্গীঃ

> জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
> দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
> পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
> চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

বেদান্তের 'অভীঃ' মন্ত্র ও মহাকালীর প্রলয়মূর্তি—একই সত্যের নামান্তর। দুঃখ মৃত্যু ও বেদনার এই ভয়াল রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই বিবেকানন্দ বাংলার অকুতোভয় বিপ্লববাদী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চিরনমস্য।

বস্তুত, স্বামীজীর দেশপ্রেম, স্বদেশচেতনা ও জাতীয়তাবাদী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল—কংগ্রেসী আন্দোলন, চরমপন্থী রাজনীতি ও বিপ্লববাদের উপর স্বামীজীর প্রভাব গভীর ও সুস্পষ্ট।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আলমোড়ায় স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের কয়েক মাস পরেই অমরাবতী

৫৮। The Soul of India—Bipin Chandra Pal, Yugayatri Prakashak Limited, Calcutta, Fourth Edition (1958), pp. 133-34

৫৯। 'When Sadananda talks about the Ramayana, I become convinced that Hanuman is really the hero; when Swami talks of it, Ravana is the central figure.' [Reminiscences of Swami Vivekananda, p. 283]

৬০। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, প্রথম খণ্ড—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৪১

কংগ্রেসে অশ্বিনীকুমার দত্ত মডারেট নিয়ন্ত্রণাধীন কংগ্রেসের তীব্র নিন্দা করে প্রকৃত গঠনমূলক কাজের দাবি জানান। পরবর্তীকালে কংগ্রেস সত্যই স্বামীজীর আদর্শেই জনজাগরণ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেবা, অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে জাতি গঠনে নেমেছিল।[৬১] এ-বিষয়ে গান্ধীজীর নাম স্মরণীয়—তাঁর উপর স্বামীজীর প্রভাবের কথা তিনি অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করেছেন।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নরমপন্থীদের বিরুদ্ধবাদী হিসাবে হিন্দুধর্ম, অতীত ইতিহাস, ভিক্ষানীতি-বর্জন ও আত্মশক্তির বলে স্বাধিকার লাভের উপর ভিত্তি করে যে চরমপন্থী দলের (extremist) উদ্ভব হয় তার মতাদর্শ ও কর্মপন্থার উপরেও স্বামীজীর প্রভাব লক্ষণীয়।[৬২] এ-সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পালের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ 'The fundamental point of difference between the older political agitations and the new Nationalist Movement is thus (1) its intensely spiritual and religious character as compared to the absolutely secular spirit of the former and (2) its strong grip on the actualities of Indian life and thought as against the imitative character of the older and earlier social and political activities.'[৬৩] বস্তুত, এই দুটি বস্তুই স্বামীজীর দান।

বাংলার বিপ্লবীদের কাছে 'Swami Vivekananda appeared...to be more a political prophet than a religious teacher.'[৬৪] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোপন আই. বি. রিপোর্টে উল্লেখিত আছে যে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পূর্বে (৪ জুলাই ১৯০২) ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় বিপ্লববাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে অরবিন্দ ঘোষ সুদূর বরোদা থেকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে স্বীয় ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকে কলকাতায় পাঠান। তাঁরা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রমথনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ এবং ঠাকুর পরিবারের কারও কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের ফলাফল কি হয়েছিল তা স্পষ্ট করে জানা না গেলেও, এটা ঠিক যে ঐ একই সময়ে কলকাতা

৬১। 'Even without being connected with the Congress, he largely shaped its policy and promoted its evolution.' [C. F. Andrews, The Rise and Growth of the Congress in India, quoted in 'The Philosophy of Man-Making'—S. L. Mukherji, 1971, p. 308]

৬২। তিলকের সঙ্গে স্বামীজীর যোগাযোগ বহু আলোচিত বিষয়—দ্রষ্টব্য ঃ Patriot-Prophet, pp. 200-02 ; এবং Vedanta Kesari, Vol. XLV, November 1958, article on 'The Relations of Tilak and Vivekananda'. অরবিন্দ বহুস্থানে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৬১। একদা বিবেকানন্দ-বিরোধী চরমপন্থী রাজনীতিবিদ্ সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বামীজীর দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন—দ্রষ্টব্য ঃ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ—হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৬১।

৬৩। The Spirit of Indian Nationalism, p. 29 as quoted in Militant Nationalism in India—Bimanbehari Majumdar, General Printers & Publishers Private Limited, Calcutta, 1966, pp. 64-5

৬৪। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি—দ্রষ্টব্য ঃ Patriot-Prophet, p. 335

এবং বাংলার মফঃস্বলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলি স্পষ্টত বিপ্লববাদী সমিতি না হলেও, এদের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন।[৬৫] বলা বাহুল্য যে, গোয়েন্দা রিপোর্টের ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দটি ঠিক নয়, কারণ যতীন্দ্রনাথ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় আসেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন তত্ত্বে'র অনুকরণে স্বামীজীর আদর্শ ও অগ্নিময়ী বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বামীজীর জীবনকালেই বাংলার প্রথম বিপ্লবী কেন্দ্র 'অনুশীলন সমিতি' ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মার্চ, দোল পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৬] এই সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসুর মতেঃ 'স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল জাগ্রত, সমুন্নত, একযোগে যুক্ত স্বাধীন ভারত।'[৬৭] তিনি বলেন যে স্বামীজী দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার উৎসাহ দিতেন; স্বামী সারদানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর এই ভাবাদর্শের কথা জানতেন এবং এ ব্যাপারে সরাসরি উৎসাহ দিতেন।[৬৮] ভগিনী নিবেদিতা 'অনুশীলন সমিতি'তে যাওয়া-আসা করতেন এবং স্বামী সারদানন্দ এখানে গীতা পড়াতেন।[৬৯] স্বামীজীর জীবিতাবস্থায় তাঁর সম্মতি না থাকলে তাঁদের পক্ষে নিশ্চয় এটা সম্ভব হত না। বিপ্লবী যাদুগোপাল বলেছেন যে, স্বামীজী সানন্দে এই তরুণের দলকে কাজের বহু উপদেশ দিতেন এবং সমিতির অনেকেই আগে থেকে বেলুড় মঠে যেতেন।[৭০] সতীশচন্দ্রের বিবৃতি থেকে আরও জানা যায় যে, 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠার এক সপ্তাহ পরে তিনি জানতে পারেন যে বরোদা থেকে একটি দল (অরবিন্দ-প্রেরিত যতীন্দ্রনাথ) কলকাতায় এসেছে। পরে দুইদল ব্যারিস্টার পি. মিত্রের[৭১] নেতৃত্বে এক হয়ে যায়।

৬৫। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে সংরক্ষিত L. No. 54A সংখ্যক পুস্তক—An Account of the Revolutionary Organizations in Bengal other than the Dacca Anusilan Samiti, vide. Sri Aurobindo's Political Thought (1893-1908)—Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1958, p. 56 এবং ঐ একই লেখকদ্বয়ের 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ', সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৬১, পৃঃ ১৪৮-৪৯ দ্রষ্টব্য।

৬৬। 'অনুশীলন সমিতি'র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, জীবনতারা হালদার। 'মূর্তি গড়া হয়েছিল, অভিষেক হয়েছিল বঙ্কিমবাবুর ছাঁচে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল বিবেকানন্দের অগ্নিমন্ত্রে।' [বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৮২), পৃঃ ২২৭] 'অনুশীলন সমিতি'র প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে মতভেদ আছে—অনেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ বলেন, কিন্তু ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দই গ্রাহ্য।

৬৭। বিশ্ববিবেক, পৃঃ ২৬০

৬৮। ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে সতীশচন্দ্র বসুর বিবৃতি দ্রষ্টব্য; অধুনা দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থটিতে উল্লিখিত পরিশিষ্টের কিছু অংশ রমেশচন্দ্র মজুমদারের History of the Freedom Movement in India, Vol. I, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, Second Edition (1971) গ্রন্থের পৃঃ ৪০৪ এবং তাঁর 'বাংলা দেশের ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড (১৯০৫-১৯৪৭), জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৮২) গ্রন্থের পৃঃ ৮-১১-য় উদ্ধৃত আছে।

৬৯। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ১৬৬, ২৩০ ৭০। তদেব, পৃঃ ১৬৫

৭১। পুরো নাম প্রমথনাথ মিত্র—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৪-পরগনার নৈহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারী পড়ার সময় তিনি বিপ্লববাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। দেশে ফিরে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে রিপন কলেজে অধ্যাপনাও শুরু করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই বাংলায় গুপ্ত

অরবিন্দ ঘোষ তখন পশ্চিম ভারতে ঠাকুর সাহেব[৭২] পরিচালিত গুপ্ত সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—ইতিমধ্যেই তিনি সমিতির পুনা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং বিপ্লবসংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গেও গোপন আলোচনা করেছেন।[৭৩] এগুলো না হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্ধকারের রাজনীতি, কিন্তু বোম্বাই-এর 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী দেশে ইতিমধ্যেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। যে বিবেকানন্দের সঙ্গে তিলক, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা[৭৪] প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, তিনি কি অরবিন্দের রাজনৈতিক ভাবাদর্শ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন? সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যে, গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে বাংলায় বিপ্লববাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে অরবিন্দ-প্রেরিত—যে অরবিন্দ ভয়ঙ্কর বৈপ্লবিক কর্মে নিযুক্ত আছেন—যতীন্দ্রনাথ স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করলে স্বামীজী তাঁকে কি বলেন বা বরোদা-দলের সঙ্গে সংযুক্তির পর 'অনুশীলন সমিতি'র প্রতি স্বামীজীর কি মনোভাব ছিল? বিপ্লবী যাদুগোপাল তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: 'স্বামীজীর দেহান্তের পূর্বে "সমিতি"র প্রতিষ্ঠাকর্তারা সাক্ষাৎভাবে স্বামীজীর সঙ্গে মেলামেশার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন; উপদেশ অনেক নিয়েছিলেন।'[৭৫] সুতরাং এ থেকে এটা অনুমান করলে অন্যায় হবে না যে বরোদা-দলের সঙ্গে সংযুক্তির পরও 'অনুশীলন সমিতি'র প্রতি স্বামীজীর সহানুভূতি ছিল—বিশেষত স্বামীজীর দেহান্তের পরেও যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সেক্রেটারী স্বামী সারদানন্দ 'অনুশীলন সমিতি' এবং 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'তে গীতা পড়াতে আসতেন।[৭৬] প্রখ্যাত বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, হেমচন্দ্র ঘোষ, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, মহানায়ক সুভাষচন্দ্র তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও বিপ্লব-আন্দোলনের উপর স্বামীজীর প্রভাবের কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন। বিপ্লবী যাদুগোপালের মতে: '...রাজনীতির আত্মদানমূলক আন্দোলনকে গোড়ার দিকটায় তিনি ছেয়ে ছিলেন।...বহুদিন পর্যন্ত স্বামীজীর প্রভাব বাংলার রাজনীতিতে ছিল।'[৭৭] ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎকার সম্পর্কে হেমচন্দ্রের বিবৃতিটি স্বামীজীর

সমিতি স্থাপনের ব্যাপারে তিনি বেশ কয়েকবার উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাংলায় গুপ্ত সমিতি বিস্তারের কাজে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

৭২। ঠাকুর সাহেব উদয়পুর রাজ্যের জনৈক রাজপুত রাজপুরুষ—ঠাকুর তাঁর পদবী। 'This Rajput leader was not a prince, that is to say, a Ruling Chief but a noble of the Udaipur State with the title of Thakur.' [Sri Aurobindo, Vol. 26, 1972, p. 14] পশ্চিমভারতে তাঁকে কেন্দ্র করে গুপ্ত আন্দোলন চলছিল। তিনি নিজে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবের বীজ বপন করছিলেন। স্থির ছিল ভাবী নিখিল ভারত প্রজাতন্ত্রে তিনিই হবেন প্রেসিডেন্ট। রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-১৯০৫) শুরু হলে তিনি নিজে জাপানের পক্ষে যোগ দেন—সেখান থেকে আর ফেরেননি। সম্ভবত সেখানেই যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

৭৩। যুগনায়ক অরবিন্দ—জীবন মুখোপাধ্যায়, বিদ্যা, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ৭৫

৭৪। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৬ ও ৭৮

৭৫। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ২২৮

৭৬। বিশ্ববিবেক গ্রন্থে সন্নিহিত হরিকুমার চক্রবর্তীর প্রবন্ধ, পৃঃ ২৫২-৫৭ এবং যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, পৃঃ ২৫৮-৬১ দ্রষ্টব্য। ৭৭। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ১০৪

স্বদেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা-স্পৃহার এক উল্লেখযোগ্য নজির। পরবর্তীকালেও এ-সম্পর্কে হেমচন্দ্র বলেন যে, 'স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তিলাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।" সেদিনই আমি এবং আমার কতিপয় বন্ধু বিপ্লব-ধর্মে যথার্থ দীক্ষিত হয়েছিলাম।'[৭৮]

স্বামীজীর উগ্র রাজনৈতিক চেতনার জ্বলন্ত প্রতীক নিবেদিতা। বিপ্লব-আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকলেও তাঁর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। বস্তুত স্বামীজীর মানসকন্যার পক্ষে স্বামীজীর উগ্র রাজনৈতিক চেতনার অধিকারী হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়—স্বামীজী যদি সূত্র হন, তবে নিবেদিতা তার ভাষ্য। স্বামীজীর জীবনকালেই নিবেদিতা রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েন—এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই স্বামীজীর অজানা ছিল না। স্বামীজী জানতেন যে সম্পূর্ণ ধ্যানধারণা ও তপস্যার জীবন নিবেদিতার নয়—নিবেদিতা কর্মী। তাঁর প্রয়োজন জগন্মাতার উপাসনা—শক্তির আরাধনা। এই কারণে নিবেদিতাকে তিনি শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এছাড়া স্বামীজী কখনও নিবেদিতার প্রতিবন্ধক হননি, তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দিয়েই গেছেন। 'তুমি স্বাধীন, নিজের ইচ্ছামতো চল, নিজের কর্ম বাছিয়া লও'—এ নিবেদিতার প্রতি স্বামীজীর কথা।

স্বামীজীর ভ্রাতা প্রখ্যাত বিপ্লবী ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজীর বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করেছেন। এগুলি ভূপেন্দ্রনাথ নিজে প্রত্যক্ষ করেননি—অন্যের মুখ থেকে শুনেছেন। বর্তমানে ঐসকল তথ্যাদির সত্যতা যাচাইয়ের কোন পথ খোলা না থাকলেও, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও বিপ্লবী নেতৃমণ্ডলী তা গ্রহণ করেছেন।

ভূপেন্দ্রনাথের মতে ঃ স্বামীজীর অন্যতম শিষ্যা ভগিনী ক্রিস্টিনকে স্বামীজী নাকি বলেছিলেন যে দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্যে বৈপ্লবিক পথে তিনি বৈদেশিক শাসনকে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই কারণেই তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন এবং বন্দুক-নির্মাতা হিরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী দেখলেন যে দেশ প্রস্তুত নয়—তাই তিনি জাতিগঠনের কাজে হাত দিলেন।[৭৯] বিপ্লবী দল গড়ার কাজে স্বামীজী আর কি করেছিলেন, তা তিনি ভগিনী ক্রিস্টিনকে বলেন, কিন্তু মন্ত্রগুপ্তির জন্য ভগিনী ক্রিস্টিন তা ভূপেন্দ্রনাথকে বলেননি।[৮০] দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে এক সময় স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ঠিকই—তাদের সঙ্গে গোপনে বিপ্লবসংক্রান্ত কিছু আলোচনাও অসম্ভব নয়। সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, আমেরিকা যাত্রার পূর্বে এবং নয়-এর দশকের প্রথম

৭৮। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুন হেমচন্দ্রের সঙ্গে মহাজাতি সদনের অছি পরিষদের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার (টেপ-রেকর্ডেড), দ্রষ্টব্য ঃ ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৮০, পৃঃ ৫৪৪

৭৯। 'I had the idea of forming a combination of Indian princes for the overthrow of the foreign yoke. For that reason, from the Himalayas to Cape Comorin I have tramped all over the country. For that reason I made friends with the gun-maker Sir Hiram Maxim.' [Patriot-Prophet, pp. viii-ix of Foreword]

৮০। Patriot-Prophet, p. ix of Foreword

ভাগে পশ্চিম ভারতীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠতা তৎকালীন ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানেরও দৃষ্টি এড়ায়নি।[৮১] এদেশের রাজন্যবর্গের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন যে, শাসক সম্প্রদায়ের মনে 'প্রজারঞ্জনের বীজ' উপ্ত করার জন্যই তিনি রাজদ্বারে ঘুরেছিলেন।[৮২] বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লব-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাছে স্বামীজী বিপ্লবীরূপেই প্রতিভাত ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ বলেছেন ঃ '...সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দেশের স্বাধীনতার কথা অবিরত চিন্তা করতেন। এমনও বলা হয় যে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও ভাবতেন।...প্রত্যক্ষভাবে যেকাজ নিজে করেননি, তাঁর শিষ্যাকে তিনি সেকাজের ভার দিয়ে যান।'[৮৩] ভূপেন্দ্রনাথের মতে বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ স্বামীজীর বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং ডক্টর দত্তের প্রবীণ সহযোগী বিপ্লবকর্মী সখারাম গণেশ দেউস্করকে স্বামীজী নিজেই নাকি সে কাহিনী বিবৃত করেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন ঃ 'The country has become a powder magazine. A little spark may ignite it, I will see the revolution in my life-time.'[৮৪] মহাসমাধির কিছুদিন পূর্বে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক কামাখ্যা মিত্রকে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'What India needs to-day is bomb.'[৮৫] বাংলা দেশে এর পরেই অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বোমার আবির্ভাব হয়।

বিপ্লব-আন্দোলন চিরদিনই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে। ডক্টর দত্তের প্রদত্ত তথ্যসমূহের সত্যতা যাচাই-এর কোন পথ খোলা নেই। এ-সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ হাতে এলে স্বামীজীর জাতীয়তাবাদী চরিত্রের এক নতুন দিক উদ্ঘাটিত হবে।

স্বামীজী যে বিপ্লবের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে হয়, স্বামীজী জীবিত থাকলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিতেন। 'খাপ খোলা তরোয়াল' বিবেকানন্দের বিপ্লবী চরিত্র শ্রীমায়েরও অজানা ছিল না—তাই স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্নেহকাতর জননী বলছেন ঃ 'ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আজ তাকে ছেড়ে দিত ? জেলে পুরে রাখত।'[৮৬]

৮১। 'It is, however, found in official records that in the early nineties and before he went abroad Vivekananda's intimacy with some of the "petty princes" of Western India attracted the attention of the then supreme police boss, the Director General of Criminal Intelligence of India.' [Kalipada Biswas, Amrita Bazar Patrika, Independence Day Supplement, 15 August 1971, p: v]

৮২। দ্রষ্টব্য ঃ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৭০

৮৩। দ্রষ্টব্য ঃ পুরোধা, জুলাই ১৯৬৭, পৃঃ ১৭

৮৪। Patriot-Prophet, p. ix of Foreword ৮৫। ibid., p. 212

৮৬। শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৮০

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের জাতীয় সংহতি

বহুর মধ্যে একককে উপলব্ধি করার চেষ্টা সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন নরগোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লোকেরা অতি প্রাচীন কাল থেকে এদেশে পাশাপাশি বাস করেছে, এবং আপাতদৃষ্টিতে তাদের মধ্যে নানা বিভেদ ও সঙ্ঘাত থাকলেও সেগুলি অতিক্রম করে একটি 'ভারতীয় সংস্কৃতি' গড়ে তোলার চেষ্টা রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকেই আমরা লক্ষ্য করি। এই ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলার ব্যাপারে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুধর্ম এক সময় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। হিন্দুধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি তা-ও আসলে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যের পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলেই গড়ে উঠেছে, এবং এর মধ্যে বহু পরস্পর-বিরোধী ভাবও স্থান পেয়েছে। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক, নিরাকার সগুণ ঈশ্বরের ভক্ত, সাকার একেশ্বরবাদী, বহু দেবদেবীর প্রতিমাপূজক এবং বৃক্ষ-প্রস্তরাদির উপাসনাকারী—সকলেই নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে পারে। আহার, ব্যবহার, সামাজিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়েও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের 'হিন্দু' নামধারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। ভগবান তথাগতের সময় থেকেই হিন্দুসমাজের বক্ষে নানা প্রতিবাদী গোষ্ঠী জন্ম নিয়েছে, এবং কালক্রমে তারা বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যেই আবার মিশে গিয়েছে। 'চরম সত্যকে উপলব্ধি করার পথ এক নয়, বহু'— শ্রীরামকৃষ্ণের এই শিক্ষা আসলে সনাতন হিন্দুধর্মেরই বাণী। মধ্যযুগে বিদেশ হতে ইসলামের আগমনে হিন্দুসমাজ কিছুটা আলোড়িত হলেও দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম ভারতীয় ধর্মগুলির অন্যতম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ভক্তি-আন্দোলন ও সুফী মতবাদের প্রসার হিন্দু ও মুসলিম সমাজের মধ্যে ঐক্যের সেতু রচনা করে। এরই ফলে প্রচলিত হয় সত্যপীরের পূজা, যাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই অংশগ্রহণ করত, আর রচিত হয় 'আল্লোপনিষদ্'। মধ্যযুগের স্থাপত্য-শিল্প, সঙ্গীত, চিত্রকলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, নাগরিক সমাজের আচার-ব্যবহার সবকিছুর উপরেই হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়-প্রচেষ্টার প্রভাব দেখা যায়। এমনকি আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্ভার নিয়ে এক নতুন মিশ্রভাষা উর্দুর সৃষ্টি হয়, যা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ব্যবহার করত। মধ্যযুগের শেষদিকে এইভাবে এক মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হলেও আধুনিক রাজনীতির সংজ্ঞায় যাকে 'নেশন' (nation) বা জাতি বলা হয় সেই অর্থে কোন ভারতীয় জাতির অস্তিত্ব তখন ছিল কিনা সন্দেহ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশ (দেশীয় রাজন্যবর্গ-শাসিত অঞ্চলগুলি বাদে) একই প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও একই আইনের নিয়ন্ত্রণে আসে, রেলপথের প্রসার ও ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস পায়, এবং ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে কিছুটা সাযুজ্য দেখা যায়। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষত জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে

যে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম আমাদের দেশে শুরু হয়, তারই ফলে ভারতীয়দের মধ্যে একজাতিত্বের ভাব ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে ও জাতীয় স্বাধীনতার দাবি দুর্বারভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতমাতার বন্দনায় দেশের কবি ও সাহিত্যিকেরা মুখর হয়ে ওঠেন, এক অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতাদের, বিশেষত বিপ্লবীদের, কর্মে অনুপ্রেরণা দেয়। কিন্তু ভাষা, ধর্ম ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির যে-বৈচিত্র ভারতবর্ষে চিরকালই বর্তমান তার মধ্যে বিভেদের বীজও উপ্ত ছিল, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ক্রমশ ভয়াবহ সঙ্ঘর্ষের রূপ ধারণ করে স্বাধীনতা লাভের কালে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে। দেশ-বিভাগের পরেও অনেকে আশা করেছিলেন যে, খণ্ডিত ভারতের জাতীয় সংহতি কালক্রমে দৃঢ়তর হয়ে উঠবে, এবং গুজরাট হতে আসাম এবং পাঞ্জাব ও কাশ্মীর হতে তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল দেশ 'এক জাতি, এক প্রাণ, একতা'র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে। বাস্তবে কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ শত্রু ইংরেজের অপসারণের পর বিভিন্ন ভাষা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে আমাদের দেশে আঞ্চলিকতার মনোভাব, যাকে কেউ কেউ 'উপ-জাতীয়তাবাদ' (Sub-nationalism) বলেছেন, ক্রমশ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে; এবং এখনও পর্যন্ত ভারত-রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন না হলেও তার মধ্যে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং ঐ অঙ্গরাজ্যগুলির পারস্পরিক কলহ দেশবাসীর বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে পাঞ্জাব ও আসামের আন্দোলন, দক্ষিণে দ্রাবিড় স্বাতন্ত্র্যবাদের জয়গান, এমনকি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন ও গোর্খাল্যাণ্ডের দাবি আমাদের এই ইঙ্গিত দেয় যে, এখনই সতর্ক না হলে ভবিষ্যতে ভারত-রাষ্ট্রের অঙ্গচ্ছেদ হয়তো অনিবার্য হবে। আজকের পরিস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও চিন্তাধারা কি ভারতের জাতীয় সংহতিকে দৃঢ়তর করতে পারে? আঞ্চলিক পরিচয় অতিক্রম করে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আমাদের গর্ববোধ জাগ্রত করতে পারে?—এটাই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

স্বামী বিবেকানন্দ যেযুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (১৮৬৩) সেযুগের ভারতীয় সমাজে, ভারতীয় পরিচয়ের চেয়েও আঞ্চলিক পরিচয় (বাঙালী, হিন্দুস্থানী, ওড়িয়া, মাড়োয়ারী ইত্যাদি) এবং ধর্মীয় পরিচয় (হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি) দেওয়ার রীতিই বেশী প্রচলিত ছিল, যদিও শিক্ষিত ও রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তিদের মধ্যে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ যে এক দেশ এবং ভারতীয়েরা এক জাতি ('নেশন' অর্থে) এই বোধ জাগ্রত হচ্ছিল। রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ সেযুগে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে যে অপেক্ষাকৃত অধিক ঘটেছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করবার জন্য কলকাতায় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (Indian Association) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। বিবেকানন্দের বয়স তখন মাত্র তেরো বৎসর। বিবেকানন্দের মনে ভারতীয় ঐক্যের ধারণা দৃঢ়মূল হয় দুটি কারণে—প্রথম, ভারতীয় ইতিহাসের গভীর অধ্যয়ন, যার পরিচয় আমরা তাঁর পরবর্তীকালের নানা বক্তৃতা, রচনা ও আলোচনার মধ্যে পাই; দ্বিতীয়, পরিব্রাজকরূপে

পদব্রজে তাঁর আসমুদ্রহিমাচল ভ্রমণ, যার ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীর লোকেদের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভের সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই যে, একদিকে যেমন ভারতীয় ঐক্যের মূল সূত্রটি তাঁর চোখে সহজেই ধরা পড়েছিল, অপরদিকে তেমনি তিনি ভারতীয়দের মধ্যে জাতিগত বন্ধন দৃঢ় হওয়ার পথে প্রধান অন্তরায়গুলি উপলব্ধি করেছিলেন, এবং সেগুলি দূর করার উপায়ও চিন্তা করেছিলেন।

ইতিহাস পাঠ করে স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোন একটি বিশেষ নরগোষ্ঠী, ধর্মসম্প্রদায় বা সামাজিক শ্রেণীর একক প্রচেষ্টার দ্বারা সৃষ্ট হয়নি, বা এর জন্য কোন একটি শ্রেণী, সম্প্রদায় বা বর্ণের লোক বিশেষ গৌরব দাবি করতে পারে না। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় লিখিত 'Aryans and Tamilians' প্রবন্ধে স্বামীজী বলেছেন যে, ভারতবর্ষ সত্যই 'এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা', এবং এদেশের ইতিহাস এখানকার অসংখ্য জাতির ঘাত-প্রতিঘাত, সঙ্ঘর্ষ ও সমন্বয়ের ইতিহাস। 'আমাদের বিভিন্ন বর্ণবিভাগ এবং নানা উপ-বিভাগের মধ্যে বর্তমান বিবাহপ্রথাকে সীমাবদ্ধ রাখা সত্ত্বেও আমরা পুরাপুরি মিশ্রিত জাতি। ...বর্ণবিশেষের উৎপত্তি সম্বন্ধে দাম্ভিকতাপূর্ণ মতবাদ অসার কল্পনামাত্র।'[১] দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের সঙ্ঘর্ষের সূচনা সেযুগেই হয়েছিল। একে লক্ষ্য করে স্বামীজী বলেছেন ঃ 'বিভিন্ন বর্ণের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হইবে না; যদি এই বিরোধের আগুন একবার প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে সর্ব প্রকার কল্যাণমূলক প্রগতিই কয়েক শতাব্দীর জন্য পিছাইয়া যাইবে।'[২] প্রবন্ধের শেষে স্বামীজী ঘোষণা করেন ঃ 'আমরা বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী—আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি; এ পর্যন্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্য আমরা গর্বিত, এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল পূর্বপুরুষগণের জন্য আমরা গর্বিত, মানবজাতির যে আদিপুরুষেরা প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ফিরিতেন, তাঁহাদের জন্য আমরা গর্বিত...। জড় অথবা চেতন—এই সমগ্র বিশ্বজগতের উত্তরপুরুষ বলিয়া আমরা গর্বিত।'[৩] স্বামীজীর এই ঘোষণা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কোন মানুষকেই প্রত্যাখ্যান করার পক্ষে ছিলেন না, সকলকেই ভারতীয় বলে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা থেকে প্রথমবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন পাঞ্জাবে আর্যসমাজ-আন্দোলন পরোক্ষভাবে হিন্দু ও শিখদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করছিল। এই সময় লাহোরে ধ্যান সিং-এর হাবেলীতে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় স্বামীজী শিখ গুরুদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন ঃ 'এখানেই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া এবং বাহু প্রসারিত করিয়া সমগ্র জগৎকে—শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানগণকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন।

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩৮০

২। তদেব, পৃঃ ৩৮১ ৩। তদেব, পৃঃ ৩৮৩

এখানেই আমাদের জাতির শেষ এবং মহামহিমান্বিত বীরগণের অন্যতম গুরু গোবিন্দসিংহ জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ধর্মের জন্য নিজের এবং নিজপ্রাণসম প্রিয়তম আত্মীয়বর্গের রক্তপাত করিয়াছিলেন...।'[৪] এই বক্তৃতাতেই পঞ্চনদের সন্তানগণের উদ্দেশে স্বামীজী বলেনঃ '...এই আমাদের প্রাচীন দেশে—আমি তোমাদের নিকট আচার্যরূপে উপস্থিত হই নাই, কারণ তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার মতো জ্ঞান আমার অতি অল্পই আছে। দেশের পূর্বাঞ্চল হইতে আমি পশ্চিমাঞ্চলের ভ্রাতৃগণের সহিত সম্ভাষণ বিনিময় করিতে এবং পরস্পরের ভাব মিলাইবার জন্য আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি—আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য নহে, আসিয়াছি আমাদের মিলনভূমি কোথায় তাহাই অন্বেষণ করিতে...।'[৫] বিভিন্নতার ভাব নয়, মিলনভূমির অনুসন্ধানই যে জাতীয় সংহতি দৃঢ়তর করার একমাত্র উপায়, স্বামীজীর বক্তৃতায় তার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে ইসলামের অবদান সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে লিখেছেনঃ 'তিনি উল্লাসপূর্বক ভারতবর্ষের অথবা মোগলবংশের ইতিহাসের সার সংকলন করিয়া দিতেন। মোগলগণের গরিমা স্বামীজী শতমুখে বর্ণনা করিতেন।'[৬] মুঘল যুগের শিল্প ও স্থাপত্যকীর্তি সম্বন্ধে ভারতীয় হিসাবে তাঁর বিশেষ গর্ববোধ ছিল। বাদশাহ শাহজাহান সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'অমন সৌন্দর্যানুরাগ ও সৌন্দর্যবোধ ইতিহাসে আর দেখা যায় না।'[৭] শাহজাহানের চেয়েও 'আকবরের প্রসঙ্গ তিনি আরও বেশী করিয়া করিতেন। আগ্রার সন্নিকটে সেকেন্দ্রার সেই গম্বুজবিহীন অনাচ্ছাদিত সমাধির পাশে বসিয়া আকবরের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর কণ্ঠ যেন অশ্রুগদগদ হইয়া আসিত।'[৮] ভগিনী নিবেদিতার লেখা এই বইটির আর এক জায়গায় আমরা পাই যে, বিবেকানন্দ কাশ্মীর ভ্রমণের সময় শ্রীনগরে তাঁর নৌকার মুসলমান মাঝির শিশুকন্যাটিকে উমারূপে পূজা করেছিলেন (আগস্ট ১৮৯৮)। মুসলমান পাচকের প্রস্তুত আহার্য গ্রহণেও তাঁর কোন আপত্তি নেই বলে তিনি এই সময় জানিয়েছিলেন।[৯] নৈনীতালে অবস্থানকালে স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের যে তিনটি প্রধান শিক্ষার অনুসরণ তিনি নিজে করতে চাইছিলেন, তার অন্যতম হল হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে ভালবাসা।[১০] হিন্দু-মুসলিম সঙ্ঘাত যে ভারতের জাতীয় সংহতির পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক, স্বামীজী তা ভালভাবেই জানতেন। তাই নিজের আচরণ ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি দুই সম্প্রদায়ের মিলনের পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন। স্বামীজীর বহু মুসলমান বন্ধু ও অনুরাগী ছিলেন। পরিব্রাজক জীবনেও তিনি কোন কোন মুসলমানের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন।[১১] পরবর্তীকালে (জুন

৪। তদেব, পৃঃ ২৬৭ ৫। তদেব, পৃঃ ২৬৭-৬৮

৬। তদেব, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৭২ ৭। তদেব, পৃঃ ২৭৩ ৮। তদেব

৯। তদেব, পৃঃ ৩২২ ১০। তদেব, পৃঃ ২৬৯

১১। তদেব, পৃঃ ২৬৯, ২৯৪; The Master as I saw him—Sister Nivedita, Udbodhan Office, Calcutta, Twelfth Edition (1977), pp. 60, 202

১৮৯৮) স্বামীজী তাঁর জনৈক মুসলমান অনুরাগীর কাছে লেখা একটি চিঠিতে বলেন যে, বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় (সমাজ) দেহ নিয়ে নতুন ভারতবর্ষ গড়ে উঠুক, এই তাঁর কামনা।[১২] মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ সাম্যভাব ও ভ্রাতৃত্ববোধ বিবেকানন্দকে মুগ্ধ করেছিল।

অনুরূপভাবে স্বামীজী বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট সম্বন্ধেও যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'The Master as I saw him' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, বিবেকানন্দ বুদ্ধকে আদর্শ চরিত্রের পুরুষ বলে বিবেচনা করতেন। তাঁর নিকট বুদ্ধ কেবল আর্যগণের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নন, অপর দিকে জগতে যত লোক জন্মগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র সম্পূর্ণ স্থিরমস্তিষ্ক ছিলেন।[১৩] স্বামীজীর মতে বুদ্ধের চরিত্রে অসাধারণ স্বাধীনতাবোধ, নিরভিমানতা, পূর্ণ বিচারশক্তি ও সমগ্র জীবজগতের জন্য অসীম অনুকম্পার সমন্বয় ঘটেছিল।[১৪] জৈনধর্মের প্রবর্তক ঋষিদের বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশে জৈনধর্মের বিশেষ অবদান সম্বন্ধেও স্বামীজী যথেষ্ট অবহিত ছিলেন।[১৫] কোন কারণে খ্রীষ্টচরিত্রের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মনে কিছুটা সংশয় উপস্থিত হলেও মেরী-তনয়ের প্রতি তাঁর জ্বলন্ত ভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি।[১৬] ধর্মান্ধ খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারক (missionary) ও পাদরিদের সম্বন্ধে স্বামীজীর স্বাভাবিক বিরূপতা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠে বিভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্মোৎসব পালিত হত,[১৭] এবং আমেরিকা যাত্রার বহু পূর্বে, বাংলা ১২৯৬ সালে, বিবেকানন্দ 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামে তৎকাল-প্রচলিত মাসিক পত্রে টমাস আ কেম্পিস নামধারী ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর লেখা 'Imitation of Christ' নামক বইটির বাংলা অনুবাদ 'ঈশা-অনুসরণ' নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন।[১৮]

স্বামীজী কোন সুযোগ-সন্ধানী রাজনৈতিক নেতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীদের এক পতাকাতলে আনার চেষ্টা করেননি। তিনি বলতেন ঃ 'বিভিন্ন আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের সুপরিচালনার জন্য সম্প্রদায় থাকুক', কিন্তু 'সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক', কারণ তা জগতের উন্নতির পরিপন্থী।[১৯] স্বামীজীর উপরের বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বেদান্তবাদী স্বামীজীর বিচারে জগতের সব কটি প্রাচীন, সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মই ছিল বেদান্তের দেশ-কাল-জাতি সাপেক্ষ বাহ্য রূপ মাত্র। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মে তারিখে আমেরিকা থেকে প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী তাঁর এই ধারণার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখছেন ঃ 'এখন তোমাদের কাছে আমার নতুন আবিষ্কারের কথা বলছি। ধর্মের যা-কিছু সব বেদান্তের মধ্যেই আছে, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই তিনটি স্তরে আছে, একটির পর

১২। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৯

১৩। The Master as I saw him, p. 210 ১৪। ibid., pp. 210-11

১৫। ibid., p. 202 ১৬। ibid., p. 233 ১৭। ibid., p. 56

১৮। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১৬

১৯। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩

একটি এসে থাকে। এই তিনটি মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভূমিকা। এদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে। এই হল ধর্মের সারকথা। ভারতের বিভিন্ন জাতির আচার-ব্যবহার মত ও বিশ্বাসে প্রয়োগের ফলে বেদান্ত যে রূপ নিয়েছে, সেইটি হচ্ছে হিন্দুধর্ম; এর প্রথম স্তর অর্থাৎ দ্বৈতবাদ—ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাবের ভেতর দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে খ্রীষ্টধর্ম, আর সেমিটিক জাতিদের ভেতর হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান ধর্ম; অদ্বৈতবাদ উহার যোগানুভূতির আকারে হয়ে দাঁড়িয়েছে বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি। এখন "ধর্ম" বলতে বুঝায় বেদান্ত। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে তার প্রয়োগ অবশ্যই বিভিন্ন হবে।'[২০] বোস্টনের টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ক্লাবে প্রদত্ত এক ভাষণেও স্বামীজী বলেনঃ 'বেদান্তের দাবি এই যে, এই চিন্তাধারা ভারতের ও বাহিরের সকল ধর্মমতের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়; তবে কোথাও উহা পুরাণের রূপক-কাহিনীর আকারে প্রকাশিত, আবার কোথাও প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপিত।'[২১] পৃথিবীর সব ধর্মই বেদান্তের বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ, এই আন্তরিক প্রতীতিই স্বামীজীকে সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের প্রবক্তা করে তুলেছিল। এই সমন্বয় বা ভাববিনিময় প্রচেষ্টার সাফল্যের উপরেই যে ভারতের জাতীয় সংহতি ও প্রগতি বহুলাংশে নির্ভরশীল, বিবেকানন্দ বর্তমান শতাব্দীর সূচনাতেই তা উপলব্ধি করেছিলেন।

শুধু বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিভেদ ও পারস্পরিক কলহ নয়, আমাদের সমাজের আরও কিছু আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা যে জাতীয় সংহতির পরিপন্থী, স্বামীজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিল। হিন্দুসমাজের ভিতরেই দুটি প্রধান সংহতি-নাশক বস্তু ছিল বংশানুক্রমিক জাতিভেদ ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতা। বিদেশে প্রচার-কালে স্বামীজী প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মতোই আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে বড় একটা প্রকাশ্য আলোচনা করতেন না। জাতিভেদ ব্যবস্থার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন এটা একটা সামাজিক ব্যবস্থা, এর সঙ্গে হিন্দুধর্মের কোন অঙ্গাঙ্গি যোগ নেই। সন্ন্যাসী হিসাবে তিনি এই প্রথার দ্বারা আবদ্ধ নন, এবং সব জাতির (caste) লোকের সঙ্গেই তিনি পানাহার করে থাকেন, একথাও তিনি জানাতে ভুলতেন না।[২২] জাতিভেদ প্রথা যে মূলত শ্রমবিভাজন ব্যবস্থা, এবং এর ফলে বিভিন্ন বৃত্তির লোকেদের মধ্যে জীবিকার নিশ্চয়তা এবং পাশবিক প্রতিযোগিতার অবসান ঘটেছে, একথা বলার পরেও ব্রুকলিনের এক জনসভায় (এপ্রিল ১৮৯৫) স্বামীজী সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেন যে, '...এই প্রথা জাতির কর্মজীবনে জড়তার সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহাতে জনগণের অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হইয়াছে।'[২৩] আপন দেশবাসী—বন্ধু, অনুরাগী, বা ভক্ত—এঁদের সঙ্গে আলোচনায় বা পত্রবিনিময়কালে স্বামীজী কিন্তু হিন্দু সমাজের এই অতি প্রাচীন ব্যবস্থাটিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন, এবং নিজের আচরণের মধ্য দিয়েও একে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২ নভেম্বর শিকাগো থেকে

২০। তদেব, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৫৭

২১। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ৩২৭

২২। তদেব, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৫, ৭, ১২ ২৩। তদেব, পৃঃ ১১৪

আলাসিঙ্গাকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছেনঃ 'এ-বিষয়ে পুরোহিতগণ যতই আবোল-তাবোল বলুন না কেন, জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া কিছুই নহে। উহা নিজের কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ...আধুনিক প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত দ্রুতবেগে জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে। এখন উহাকে নাশ করিতে হইলে কোন ধর্মের আবশ্যকতা নাই। আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণ দোকানদার, জুতাব্যবসায়ী ও শুঁড়ি খুব দেখিতে পাওয়া যায়।'[২৪] বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজী একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ 'ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তার মানে নেই; হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে। বাগবাজারে—চক্রবর্তীর ভাইপো যে মেথর হয়েছে... সেও তো বামুনের ছেলে।'[২৫] বহু অব্রাহ্মণ, এমনকি অ-হিন্দু শিষ্যকে তিনি প্রণবযুক্ত মন্ত্রে দীক্ষা দেন। আমেরিকায় যাঁদের তিনি শিষ্য করেছিলেন, তাঁদের সকলকেই তিনি ব্রাহ্মণ জ্ঞান করতেন।[২৬] শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী বলেছিলেন যে, ব্রাহ্মণেরা বহু কাল ধরে দেশের তথাকথিত নীচ জাতিদের ঘৃণা করার ফলেই বর্তমানকালে জগতের ঘৃণাভাজন হয়ে পড়েছে। তাই তিনি বলতেনঃ 'ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই নেই...।'[২৭]

আধুনিককালে জাতিভেদ প্রথার মূল কথা যে 'রোটি-বেটি'র বিচার, অর্থাৎ ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও বৈবাহিক আদান-প্রদান সম্বন্ধে কতকগুলি প্রাচীন অনুশাসন মেনে চলা, একথা স্বামীজী জানতেন, এবং এই দুটি ব্যাপারেই প্রচলিত নিয়ম-কানুন শিথিল করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ তিনি স্বদেশে ও বিদেশে বহু বার লঙ্ঘন করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে বিদ্রূপ করে বিবেকানন্দ বলছেনঃ '...হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে।'[২৮] শিষ্য আলাসিঙ্গার কাছেও তিনি একই সুরে অভিযোগ করেছেন (আগস্ট ১৮৯৫)ঃ 'তোমাদের ধর্মভাব মোটেই নেই; রান্নাঘর হচ্ছে তোমাদের ঈশ্বর, শাস্ত্র—ভাতের হাঁড়ি।'[২৯] স্বামীজীর অপর এক শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী আহারাদির ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী ছিলেন। তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে স্বামীজী বলেছিলেনঃ ' "অনুভূতি"ই হচ্ছে সার কথা। হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর্, আর হাজার বৎসর নিরামিষ খা—ওতে যদি আত্মবিকাশের সহায়তা না হয়, তবে জানবি সর্বৈব বৃথা হল। আর আচার-বর্জিত হয়ে যদি কেউ আত্মদর্শন করতে পারে, তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার।'[৩০] স্বামীজী স্বীকার করেন যে, আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে অসৎ লোকের দ্বারা স্পৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ না করার নির্দেশ আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেন যে, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকেই তিনি অজানা ব্যক্তির ক্ষেত্রে খাদ্যের এই আশ্রয়দোষ ঠিক মতো ধরতে দেখেননি, এবং যোগী ভিন্ন অন্য কারও

২৪। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪ ২৫। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪০৯
২৬। তদেব ২৭। তদেব, পৃঃ ৭৮ ২৮। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১০৯
২৯। তদেব, পৃঃ ১৯৪ ৩০। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৯৬-৯৭

পক্ষে এটা বিচার করা সম্ভবও নয়। আমিষাহার সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেনঃ 'সত্ত্বগুণের যখন খুব বিকাশ হয়, তখন মাছ-মাংসে রুচি থাকে না।'[৩১] কিন্তু যেখানে তা হয়নি, সেখানে আমিষাহার ত্যাগ '...হয় ভণ্ডামি, না হয় লোকদেখানো ধর্ম।'[৩২] বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীজীর মঠে হিন্দু আচারনিষ্ঠা সর্বথা পালিত হয় না, এবং ভক্ষ্যভোজ্যাদির বাছ-বিচার নেই, এরকম সমালোচনাও সেযুগের বহু রক্ষণশীল হিন্দু করতেন, কিন্তু স্বামীজী তাতে কর্ণপাত করেননি।[৩৩]

বৈবাহিক আদান-প্রদানের ব্যাপারেও স্বামীজীর মত ঠিক শাস্ত্রানুসারী ছিল না। আজকে অনেকেই একথা শুনলে বিস্মিত হবেন যে, সেযুগের অগ্রণী ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের মতো এই গৈরিকধারী সন্ন্যাসীও অসবর্ণ বিবাহের সমর্থক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেন রচিত 'তিন দিনের স্মৃতিলিপি'তে আমরা পাই যে, জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলছেনঃ 'ভারতবর্ষে inter-marriageটা (অন্তর্বিবাহ) হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে।'[৩৪] অবিলম্বে অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তন করার ব্যাপারে বাধা আসতে পারে, এটা স্বীকার করে নিয়ে স্বামীজী প্রশ্নকর্তাকে বলেন যে, ঐদিকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে একই বর্ণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ এখনই প্রচলন করা উচিত।[৩৫] মনে রাখতে হবে, এ-আলোচনার তারিখ জানুয়ারি ১৮৯৮, অর্থাৎ এটি প্রায় নব্বই বৎসর আগেকার কথা।

অস্পৃশ্যতার নিন্দাতেও বিবেকানন্দ চিরদিন মুখর ছিলেন। এ-ব্যাপারে তাঁকে গান্ধীজীর পূর্বসূরী বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। ছুঁৎমার্গ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নয়, শাস্ত্রবহির্ভূত প্রাচীন আচারমাত্র, একথা তিনি নানাভাবে বলেছেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি লিখছেনঃ 'ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান!'[৩৬] মাদ্রাজে ভিক্টোরিয়া হলে প্রদত্ত 'আমার সমরনীতি' শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণে স্বামীজী বলেনঃ 'যদি আমি অতি নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত; কারণ আমি যাঁহার শিষ্য, তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও এক অস্পৃশ্য মেথরের গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।'[৩৭] 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের উপসংহারে বিবেকানন্দ তাঁর দেশবাসীদের যে অনবদ্য 'স্বদেশমন্ত্র' উপহার দিয়েছেন, তার মধ্যেও তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেনঃ '...ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!'[৩৮] ব্রাহ্মণ ভারতবাসী ও চণ্ডাল ভারতবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপনের যে-ব্রত স্বামীজী গ্রহণ করেছিলেন, গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের পরেও তা আজ উদ্‌যাপিত হয়নি, যদিও অকৃপণ হস্তে সরকারী দাক্ষিণ্য বিতরণের ফলে তথাকথিত নীচজাতিদের একটি ক্ষুদ্র অংশ শিক্ষা ও চাকরির

৩১। তদেব, পৃঃ ১৫২ ৩২। তদেব ৩৩। তদেব, পৃঃ ২২৪
৩৪। তদেব, পৃঃ ৪২০ ৩৫। তদেব, পৃঃ ৪২৪ ৩৬। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৮২
৩৭। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৯৯ ৩৮। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯

ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হতে চলেছে, এবং 'জাত-পাতের লড়াই' ভারতে কোন কোন অঞ্চলে তীব্র আকার ধারণ করছে।

সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক কলহ, জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতার অভিশাপ ছাড়াও ভারতের জাতীয় সংহতি স্থাপনের পথে দুটি বড় অন্তরায়—উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আমাদের শুভবুদ্ধির বিনাশ ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সংস্কৃত ভাষা এবং রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্য দীর্ঘদিন ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধনের কাজ করেছিল। স্বামীজী তাই চেয়েছিলেন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এগুলির স্থান সুরক্ষিত করতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদ্ প্রভৃতি বই থেকে গল্প সংকলন করে সহজ বাংলায় বা মাতৃভাষায় সেগুলি লিপিবদ্ধ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৩৯] তাছাড়া ধর্ম ও নীতিশিক্ষাকে তিনি আমাদের শিক্ষার একটি আবশ্যিক অঙ্গ করতে চেয়েছিলেন, যার ফলে বাল্যকাল থেকেই ন্যায়-অন্যায় বোধ, দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি এবং উদারতা, সহনশীলতা প্রভৃতি গুণগুলি আমাদের স্বভাবের অঙ্গীভূত হতে পারে। ধর্ম মানুষকে ত্যাগ ও সেবার প্রেরণা দেয় এবং সর্ববিধ জাগতিক ভয় দূর করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। এই রকম নির্ভীক মানুষই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সিংহবিক্রমে সমাজের সব রকম অনাচার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। তাই শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন ঃ '...গোড়ার কথা—ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলো তরকারি।'[৪০] বলা প্রয়োজন, 'ধর্ম' শব্দের দ্বারা স্বামীজী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মতবাদ বা বিশ্বাসকে বোঝাননি, 'ধর্মের' অর্থ এক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা, যা পৃথিবীর সব ধর্মেরই মূল কথা। স্বামী অখণ্ডানন্দ-প্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রমে বিভিন্ন ধর্মের বালকদের স্থান দেবার পরামর্শ দিয়ে বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে (অক্টোবর ১৮৯৭) তাঁকে লিখেছেন যে, এদের কারও চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাসে যেন আঘাত দেওয়া না হয়। '...যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম—জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখো।'[৪১] কিন্তু আজ আমাদের বালক-বালিকাদের পাঠ্যতালিকায় রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের স্থান একেবারেই গৌণ ; সংস্কৃত ভাষা, যা সারা দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারত, তা মৃত ভাষা বলে অবহেলিত ; এবং ধর্ম ও নীতিশিক্ষার কথা বললে তা বহু লোকের হাস্যোদ্রেক করবে। এর ফলে স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, ঘৃণা ও বিদ্বেষকে আমরা সহজাত, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রেই, বিশেষত রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন হচ্ছে। আজ আমাদের দেশে সরকারী আনুকূল্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা দ্রুত বেড়ে চলেছে ; এই বিষয়ে স্বামীজীর ইচ্ছা নিশ্চয় আমরা পূরণ করেছি। কিন্তু

৩৯। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪০৫

৪০। তদেব, পৃঃ ৪০২ ৪১। তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৮

শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে মানুষ তৈরী করা যায় না এবং শুভবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত না হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা যে মানব-সমাজের প্রভূত অকল্যাণ করতে পারে তা দুটি বিশ্বযুদ্ধ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে।

জাতীয় সংহতি রক্ষার অন্যতম প্রবল প্রতিবন্ধক হল বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, যা কোন ন্যায় বা নীতিবোধের পরোয়া করে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রতিযোগিতা সমাজের বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ যাঁদের কিছু আছে, তাঁরাই আরও কিছু পেতে চাইছেন নিজেদের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং ভোগ-বিলাসের উপকরণ বৃদ্ধির জন্য। তার ফলে আমাদের সমাজ পুনর্গঠনের জন্য যা আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, অর্থাৎ দেশ থেকে দারিদ্র দূর করা এবং সমাজের পীড়িত, শোষিত ও অবহেলিত জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, তার দিকে অনেক সময়েই ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের দৃষ্টি পড়ছে না। স্বামীজীর চেষ্টা ছিল সব সময়েই শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি দরিদ্র, নিপীড়িত ও অবহেলিত জনসমষ্টির দিকে ফেরানোর। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি মাদ্রাজী ভক্তদিগকে শিকাগো থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলছেন ঃ 'আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য সকল সংস্কারকার্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না ; উহা নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পারো ? ...তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম-বিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হইতে পারো ? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব।'[৪২] এই বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকের সঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লেখা চিঠিতে স্বামীজী বিদ্রূপের সুরে বলছেন ঃ 'কয়েক হাজার ডিগ্রীধারী ব্যক্তিদ্বারা একটি জাতি গঠিত হয় না, অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনীও একটি জাতি নহে। ...আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জনই অশিক্ষিত, অথচ কে তাহাদের বিষয় চিন্তা করে ?—এসকল বাবুর দল কিংবা তথাকথিত দেশহিতৈষীর দল কি ?'[৪৩] ভারতের জনগণের দারিদ্র ও অজ্ঞতার জন্য ইংরেজ শাসনকে আংশিকভাবে দায়ী করলেও স্বামীজী এবিষয়ে তাঁর স্বদেশীয় উচ্চবর্ণ ও বিত্তবান লোকেদের দায়িত্ব কখনই অস্বীকার করেননি। এদেশের উচ্চবর্ণের লোকেরা, বিশেষত জমিদার ও পুরোহিতবর্গ, তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকেদের উপর যুগ-যুগান্তর ধরে যে-অত্যাচার করে এসেছে তার সম্যক প্রায়শ্চিত্ত না করলে এদেশের উন্নতি অসম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে একটি চিঠিতে লিখেছেন ঃ 'যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যেসব

৪২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২-৯৩ ৪৩। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৬

বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে, জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি।'[৪৪] অগণিত অজ্ঞ, দরিদ্র, নিপীড়িত দেশবাসীকে কিভাবে অজ্ঞতা ও দারিদ্র হতে মুক্তি দেওয়া যায়, তারই পথ অনুসন্ধানের জন্য স্বামীজী আমেরিকায় গিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যজগতে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভুল ধারণা দূর করা ও বেদান্তের বাণী প্রচার তাঁর গৌণ উদ্দেশ্য ছিল। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতায়[৪৫] এবং দেশে গুরুভ্রাতাদের কাছে লেখা চিঠিতে[৪৬] বিবেকানন্দ তাঁর এই উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। মার্কিনী শিষ্যা মেরী হেলকে লণ্ডন থেকে লেখা একটি চিঠিতে (১ নভেম্বর, ১৮৯৬) স্বামীজী নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে দাবি করলেও এবং শূদ্রযুগের আগমন অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিরোধ্য বলে ঘোষণা করলেও,[৪৭] দেশবাসীকে রক্তক্ষয়ী শ্রেণী-সংগ্রামের পথে যেতে তিনি প্ররোচিত করেননি। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করা ও চরিত্রগঠন এবং বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্পের প্রসারের দ্বারা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন—এই দুটি ছিল স্বামীজীর দেশগঠন বা জাতিগঠন পরিকল্পনার মূল কথা। এই ব্যাপারে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদেরও কিছু দায়িত্ব আছে বলে তিনি মনে করতেন। গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে আমেরিকা থেকে লেখা একটি চিঠিতে (১৯ মার্চ ১৮৯৪) বিবেকানন্দ ভর্ৎসনার সুরে বলছেন: '...এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। "খালি পেটে ধর্ম হয় না"—গুরুদেব বলতেন না?'[৪৮] ঐ চিঠিতেই দেখি, স্বামীজী চাইছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী সন্ন্যাসীরা ভারতের বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে ঘুরে একদিকে যেমন তাঁদের গুরুদেবের উদার, বিশ্বজনীন ধর্মভাব প্রচার করবেন, তেমনি অপরদিকে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যা বিতরণ করে তাদের ঐহিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করবেন। গরীবের ছেলেরা স্কুলে বা পাঠশালায় এসে যদি লেখাপড়া শিখতে না পারে, তাহলে তারা যেখানে বাস করে সেখানে গিয়েই 'ম্যাপ', 'ক্যামেরা', 'গ্লোব' প্রভৃতির সাহায্যে তাদের লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করতে হবে।[৪৯] ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকাকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী বলছেন: '...দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই।'[৫০] তাদের শিক্ষাকেন্দ্রে '...কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখানো যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে।'[৫১] দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ও নতুন কলকারখানা খোলার ব্যাপারে স্বামীজী পরবর্তীকালের বিখ্যাত শিল্পপতি জামসেদজী টাটাকে কিভাবে উৎসাহিত করেছিলেন, আজ তা অনেকেই জানেন না।[৫২] এদেশে যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য 'পলিটেকনিক' জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ইচ্ছাও

৪৪। তদেব, পৃঃ ৮৯ ৪৫। তদেব, দশম খণ্ড, পৃঃ ৫, ৭, ১০, ১৭, ৮৯

৪৬। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১৩ ৪৭। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯, ৩৫০

৪৮। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১২ ৪৯। তদেব

৫০। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৬ ৫১। তদেব

৫২। Prabuddha Bharata, Vol. LXXXIII, October-November 1978, pp. 413-20, 449-58

স্বামীজীর ছিল, একথা আমরা সমসাময়িক মার্কিন সংবাদপত্র 'Pasadena Star' (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০০) থেকে জানতে পারি।[৫৩] দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে-কোন পরিকল্পনায় দরিদ্রদের অগ্রাধিকার দিতে হবে, একথা স্বামীজী বুঝেছিলেন। গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দকে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একটি চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেন (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০০)ঃ 'ভাগলপুরে যে কেন্দ্র স্থাপনের কথা লিখেছ, সেকথা বেশ—স্কুলের ছেলেপুলেকে চেতানো ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের mission (কার্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য।'[৫৪] স্বামীজী তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনে জনগণের আর্থিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ কিছু করে যেতে পারেননি, একথা অবশ্যস্বীকার্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সেবামূলক কার্যও ভারতের মতো বিরাট দেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রায় কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে না। একাজের দায়িত্ব সমগ্র শিক্ষিত সমাজের ও দেশের সরকারের। কিন্তু জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্গতি মোচন করতে না পারলে ভারতের জাতীয় অগ্রগতি হওয়া সম্ভব নয়, একথা বিগত শতাব্দীতে স্বামীজীর মতো স্পষ্টভাবে আর কোন দেশনায়ক ঘোষণা করেননি। আজ দেশে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা যত তীব্র হচ্ছে, ভারতের জাতীয় সংহতিও তত বিপন্ন হচ্ছে। স্বামীজীর সাবধানবাণী আজ তাই বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামতের কথা বাদ দিয়েও আমরা যদি তাঁর জীবনের ইতিহাস আলোচনা করি, তাহলেও দেখা যাবে যে, তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কর্মের পরিকল্পনা ভারতবর্ষ নামক দেশটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। কোন বিশেষ জাতি, ধর্ম বা অঞ্চলের জন্য তিনি বিশেষ সুযোগ বা অধিকার দাবী কখনও করেননি। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ এবং শিক্ষালাভ করলেও স্বামীজী তাঁর পরিব্রাজক জীবনে আসমুদ্রহিমাচল পদব্রজে বা রেলপথে ভ্রমণ করেছিলেন ভারতমাতার প্রকৃত পরিচয় জানবার জন্য। তাঁর আমেরিকা যাত্রার পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল ভারতের সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে এবং তার জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রধানত মাদ্রাজের শিক্ষিত যুবকেরা। বিদেশে চার বৎসর প্রচারকার্যের সময়েও (১৮৯৩-৯৭) সর্বত্র তিনি ভারতবর্ষের সমস্যা এবং তার গৌরবের কথাই পাশ্চাত্যবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন —বঙ্গ-সংস্কৃতির জয়গান কোথাও করেননি, যদিও সেযুগে সেটা করলে খুব একটা বিস্ময়ের ব্যাপার হত না। বঙ্কিমচন্দ্র যে 'সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা' মাতৃভূমির বন্দনা গেয়েছিলেন (১৮৭৫), অনেকের মতে বঙ্গজননীই সেই মাতৃভূমি। কিন্তু স্বামীজী তাঁর 'বর্তমান ভারত' পুস্তকে যে 'স্বদেশমন্ত্র' তাঁর দেশবাসীকে উচ্চারণ করতে বলেছেন তাতে ভারতমাতার কথাই বলা হয়েছেঃ '...তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী

৫৩। Swami Vivekananda—His Second Visit to the West : New Discoveries—Marie Louise Burke, Advaita Ashrama, Calcutta, 1973, p. 252

৫৪। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১০৩

আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ...।'[৫৫] অদূর ভবিষ্যতে ভারতের অভ্যুত্থান ও তার সার্বিক অগ্রগতির কথা চিন্তা করে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেনঃ 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।'[৫৬] রামকৃষ্ণসঙ্ঘের শিক্ষাবিস্তারের কার্য স্বামীজীরই নির্দেশে তাঁর গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দ শুরু করেন সুদূর রাজপুতানার খেতড়িতে ;[৫৭] রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা (১ মে ১৮৯৭) তখনও হয়নি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের প্রথম দুটি ইংরেজি মুখপত্র, পাক্ষিক 'ব্রহ্মবাদিন্' এবং মাসিক 'প্রবুদ্ধ ভারত' স্বামীজীর দক্ষিণ ভারতীয় শিষ্যেরাই প্রকাশ করেছিলেন ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। স্বামীজী তখন বিদেশে এবং বিদেশ থেকেই 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা প্রকাশের জন্য তিনি আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছিলেন।[৫৮] ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিবেকানন্দের নির্দেশে তাঁর গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে যান একটি রামকৃষ্ণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে। আলমবাজার মঠের পরেই এটি ভারতের দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ মঠ।[৫৯] রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবাশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামীজীর শিষ্যদের দ্বারা, সুদূর উত্তরপ্রদেশের কনখলে (জুন ১৯০১)।[৬০] মিশনের সেবাকার্য আজ সারা ভারতে প্রসারিত এবং স্বামীজী মিশনের যে রূপটি দিয়েছিলেন তা-ও সর্বভারতীয়। ভারতবর্ষের প্রতি স্বামীজীর অগাধ শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও একাত্মতাবোধের কথা তাঁর বিদেশী অনুরাগীদেরও মুগ্ধ করেছিল। এঁদের একজন সিস্টার ক্রিস্টিন তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেনঃ আমি মনে করি ভারতবর্ষের জন্য আমাদের ভালোবাসার জন্ম হয়েছিল যখন আমরা প্রথম তাঁকে সেই অপূর্ব সুরে 'India' শব্দটি উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম। পাঁচটি অক্ষরের ঐ ক্ষুদ্র শব্দটির মধ্যে অত কিছু যে ভরে দেওয়া যায়, এটি অবিশ্বাস্য। এর মধ্যে ছিল ভালোবাসা, বাসনা, গর্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূজা, বিষাদ-বেদনা, উদ্দীপ্ত শৌর্য এবং পুনশ্চ ভালোবাসা। কয়েক খণ্ড বড় বড় বইও এইভাবে অপরের মনে অনুভূতি জাগাতে পারত না।... এর পরে চিরকালের মতো ভারতবর্ষ আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত দেশ হয়ে গেল।[৬১] স্বদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় অনুরাগ—যা স্বামীজী নিবেদিতা-প্রমুখ বিদেশী শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যেও সংক্রামিত করতে পেরেছিলেন—ভারতের জাতীয় সংহতি রক্ষার সর্বোত্তম সহায়ক বলে আমরা মনে করি।

৫৫। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯ ৫৬। তদেব, পৃঃ ৩১

৫৭। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৬১ ; History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission—Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama, Calcutta, Third Revised Edition (1983), pp. 87-8

৫৮। History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, p. 82

৫৯। ibid., p. ৬4 ৬০। ibid., p. 119

৬১। Reminiscences of Swami Vivekananda—His Eastern and Western Admirers, Advaita Ashrama, Calcutta, 1961, p. 157

নারী জাগরণ ও স্বামী বিবেকানন্দ

বর্তমান জগতে দেশে-বিদেশে সর্বত্র চলছে নানাবিধ আন্দোলন, কোথাও তার লক্ষ্য সাময়িক সমস্যার দূরীকরণ, কোথাও বা এমন বিশিষ্ট মতবাদ যাকে মনে হয় সর্বকালের সব সমস্যা সমাধানের একমাত্র অপরিহার্য পন্থা বা নীতি। তাছাড়া আছে বিভিন্ন রাজনীতির আলোড়ন। এরই মধ্যে দেখা যায় একটি গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, যার নাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন। মূলত আধ্যাত্মিক এই আন্দোলনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্যই এ আন্দোলন চমকপ্রদ নয়, তাৎক্ষণিক উত্তেজনা বা আড়ম্বরের সঙ্গে তার যোগ নেই। তার প্রকৃতি শান্ত, কিন্তু গভীর। দেখা যাচ্ছে, ধীরে ধীরে এই আন্দোলন ব্যাপকতর ও গভীরতর হচ্ছে, সম্প্রসারিত হচ্ছে ভারতের সর্বত্র, পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলে, চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দের উপর প্রভাব বিস্তার করছে, সমাজের চিন্তাধারার পরিবর্তন আনছে এবং সর্বোপরি, অলক্ষ্যে বহু নরনারীর হৃদয়ে এক মহৎ উচ্চ জীবনযাত্রার প্রেরণা সঞ্চার করছে।

ভারতের পুনরুত্থানকল্পে যে দুটি লক্ষ্য স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাননেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তা হল নারীজাতির মুক্তি ও জনসাধারণের উন্নতিসাধন। তিনি চেয়েছিলেন ঃ যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষের পথ উন্মুক্ত হোক। কোন দেশ বা জাতির সমস্যাগুলি আপাতদৃষ্টিতে পৃথক বলে বোধ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। মূল ভিত্তির উপর স্থাপিত হলে কোন সমস্যার সমাধানই আর দুঃসাধ্য মনে হয় না। স্বামীজীর মতে নারীজাতি ও জনসাধারণের প্রকৃত শিক্ষা বা জ্ঞানলাভের উপরেই নির্ভর করছে ভারতের উন্নতি ও সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান। ভারতের ধর্ম ও শাশ্বত সনাতন অধ্যাত্মভিত্তিক সংস্কৃতি থাকবে সেই শিক্ষার মূলে।

ভারতের সন্ন্যাসিবৃন্দ সাধনপথের অন্তরায়-জ্ঞানে চিরকাল নারীজাতিকে দূরে পরিহার করে এসেছেন। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কিন্তু অত্যন্ত সচেতনভাবে নারীজাতির কথা চিন্তা করেছেন, কারণ যদি নারী এবং পুরুষ উভয়েরই জীবন সমভাবে উন্নত না হয়, তবে দেশের বা জগতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়, যেমন '...এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।'[১]

এই প্রসঙ্গে ভারতের নারীজাতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ভারতের যেযুগে প্রথম সভ্যতার অভ্যুদয়, সেই বৈদিক যুগে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ছিল বলে স্বীকৃত। পতি এবং পত্নীর একত্র যজ্ঞ সম্পাদনের অধিকার ছিল। এটা ছিল তদানীন্তন ধর্মের বৈশিষ্ট্য। বহু নারী ছিলেন 'ঋষি'—অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা—সমাজে যাঁদের স্থান সকলের উচ্চে। বাক্ ঋষির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ ব্রহ্মশক্তির সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করে তিনি সূক্ত রচনা করেন—যার নাম 'দেবী সূক্ত'। সমাজে নারীর অবস্থা পুরুষের অপেক্ষা হীনতর ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৪৪

না। অতঃপর উপনিষদের যুগেও দেখা যায় নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী ও গার্গী ভারত-ইতিহাসে চিরকাল নারীর সর্বোচ্চ অবস্থাপ্রাপ্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকবেন—এবং সেযুগে ব্রহ্মবাদিনীর সংখ্যা নিতান্ত বিরল ছিল না। বৌদ্ধযুগেও অধ্যাত্মজগতে নারীর স্থান উচ্চই ছিল, যদিও একথা স্বীকৃত, পরবর্তীকালে সঙ্ঘে ভিক্ষুণীর স্থান ছিল ভিক্ষুর নিম্নে।

প্রকৃতপক্ষে স্মৃতি ও পুরাণের যুগ থেকে নারীর অবস্থার অবনতি শুরু। যদিও স্মৃতিকার মনুর মতেঃ 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষাণীয়াতিযত্নতঃ' এবং 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'—অর্থাৎ কন্যাকে যত্নপূর্বক পালন ও শিক্ষাদান করা উচিত এবং যেখানে নারীগণ পূজিত সেখানেই দেবতাগণ আনন্দলাভ করেন, ইত্যাদি। তথাপি অন্যান্য স্থলে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আর ছিল না, গৃহে মর্যাদা যদি বা থেকে থাকে, সমাজে কিছুই ছিল না। স্মৃতি-পুরাণাদির রচয়িতা পুরুষ, এবং যত প্রকারে সম্ভব গৃহের শ্রী-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখবার জন্য নারীকে যতটা সম্মান বা মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন তার বিন্দুমাত্র বেশী দেননি। স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার প্রশ্নই ওঠে না। মনে বিস্ময় জাগে, পুরুষ না হয় নারীকে স্ববশে রাখতে চেয়েছিল, নারী কেন তার বিরুদ্ধাচরণ করেনি? মনে হয়, কোমলা, অবলা নারীর দৈহিক কোমলতা অপেক্ষা তার কোমল অন্তঃকরণ ও ভাবপ্রবণ স্বভাবই ছিল প্রধান বাধা। এবং বলা বাহুল্য তার পূর্ণ সুযোগ নিতে পুরুষ বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। তারপর ধীরে ধীরে কেমন করে নারীর অবস্থা হীনতর হয়ে অবশেষে অন্তঃপুরে সীমাবদ্ধ হল, কেমন করে একদা ভারতের তেজস্বিনী ব্রহ্মবাদিনী এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে আদর্শস্থানীয়া উচ্চ অধিকারিণীগণ তাদের ত্যাগবৈরাগ্যপূর্ণ উন্নত জীবনযাত্রা থেকে চ্যুত হয়ে পুরুষের ভোগ্যপণ্য হিসাবে কেবল সংসারযাত্রা নির্বাহে সন্তুষ্ট রইল, তার ইতিহাস সত্যই বিস্ময়কর। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। স্মৃতি যুগ থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু নারীর অবিস্মরণীয় কীর্তিচ্ছটায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল, কিন্তু তা ব্যতিক্রমই! পরবর্তীকালে বৈদেশিক আক্রমণের যুগ থেকে নারীর ভাগ্যচক্রের সম্পূর্ণ পরিবর্তন—যা অন্ধকারময় মধ্যযুগ বলে সূচিত। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের অবস্থা ভয়ঙ্কর। মানুষ মাত্রেরই যে-দুটি বিষয়ে জন্মগত অধিকার থাকা উচিত, সেই শিক্ষা ও স্বাধীনতার দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ। অতঃপর সংসার এবং লোকাচার নিয়ে তার জীবনযাত্রা।

কেবল ভারতেই মেয়েদের অবস্থা হীন ছিল এরূপ মনে করবার কারণ নেই। পশ্চিম বা পূর্বের অন্যান্য দেশগুলিতেও নারীর অবস্থা কিছু উন্নততর ছিল না। তবে শিক্ষার পথ সর্বত্র একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাশিয়ার নারীর অবস্থা কী ভয়ঙ্কর ছিল, গোর্কীর আত্মজীবনী তার উদাহরণ। একমাত্র আমেরিকায় নারীজাতির অবস্থা স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সেখানেও এবং পৃথিবীর সর্বত্র মেয়েদের মধ্যে আজ প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছে 'নারীর আপন ভাগ্য জয় করিবার' এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম অধিকার লাভের জন্য। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ বলে চিহ্নিত বৎসরে তাদের প্রবল কণ্ঠস্বরে শোনা গিয়েছে বিভিন্ন দাবি। সুতরাং বলা যায়, বর্তমান অবস্থা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ উন্নত হলেও নারী সন্তুষ্ট নয়।

আমাদের দেশে জনসাধারণ ও মেয়েদের অবস্থা কতটা শোচনীয় হয়েছিল তা স্বামীজীর এক পত্রের কয়েকটি ছত্রে পরিস্ফুট ঃ '...শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা নারীকে সন্তান ধারণ করিবার দাসীস্বরূপা করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে...।'[২] '...আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।'[৩] আরও লিখেছিলেন ঃ 'তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো ? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।'[৪] শাস্ত্রকারের উক্তি ঃ 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'—অর্থাৎ পুত্রের জন্যই ভার্যার প্রয়োজন। কৃতজ্ঞচিত্তে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেইসব মহাপ্রাণ সমাজ-সংস্কারকগণকে—যাঁরা স্বামীজীর মতোই উপলব্ধি করেন, নারীজাতির উন্নতি ব্যতীত ভারতের পুনরুত্থান সম্ভব নয়। যে পুরুষজাতি নারীকে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠানের শত শৃঙ্খলে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রেখে এবং যত প্রকারে সম্ভব নির্যাতন করে উল্লাস বোধ করেছিল, সেই পুরুষজাতিই বলপূর্বক পতিহীনা সতীকে চিতায় নিক্ষেপ ও বালবিধবার অবরুদ্ধ ক্রন্দনে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করে অগ্রণী হয়েছিল তাদের উদ্ধারকল্পে। সতীদাহপ্রথা রোধ ও বালবিধবার পুনর্বিবাহ প্রবর্তনে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যে প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, আজ তা ঐতিহাসিক কাহিনী।

বলা বাহুল্য, নারী নির্যাতনের এই বীভৎস রূপ তাঁদের মহৎ অন্তঃকরণকে বিচলিত করে এবং সর্বতোভাবে তার অবসান ঘটাতে তাঁরা চেষ্টা করেন। বাল্যবিবাহরোধ এবং বিধবার পুনর্বার বিবাহের প্রবর্তনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যে প্রয়াস তার পেছনে ছিল তাঁর মাতার প্রভাব। আইন পাস করে সতীদাহপ্রথা রোধ ও বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের পরবর্তীকালে নারী জাগরণের জন্য বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে ওঠে যার মূল কথা ছিল স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন। তার সঙ্গে ছিল জাতিভেদপ্রথারহিত। নারী জাগরণের এই ব্যাপক প্রয়াসের মধ্যে স্বামীজীরও বিশেষ অবদান ছিল তবে তাঁর চিন্তাধারা ছিল ভিন্ন। যদিও তিনি নিজেকে অপরের অপেক্ষা বড় সংস্কারক বলে দাবি করেন, তাঁর চিন্তাধারা ছিল মৌলিক কারণ তিনি ছিলেন স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। বস্তুত তিনি কোনপ্রকার সংস্কার আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রকৃত আত্মদর্শী। ব্যবহারিক জগতে বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন ভেদ করেননি। সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান তিনি করতে চেয়েছিলেন যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে যা হবে অধ্যাত্মভিত্তিক। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন ঃ '...আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, নারীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধো, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর...।'[৫]

২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩৬৬ ৩। তদেব, পৃঃ ৩৮৮
৪। তদেব, পৃঃ ৩৮৯ ৫। তদেব, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪৮৩

উনবিংশ শতাব্দী ভারতে নারীর কাছে প্রথম মুক্তির বার্তা বহন করে আনে। তার শিক্ষা ও স্বাধীনতার অধিকার অনুভূত হয়। সেই প্রথমদিকে বিদেশী সরকারের অধীনে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার পত্তন। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত হিন্দু এবং খ্রীষ্টান মিশনারীগণ পরিচালিত স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য আদর্শে প্রভাবিত। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণে গড়ে ওঠা এবং ভারতীয় আদর্শ ও আধ্যাত্মিক প্রভাববিহীন সে-শিক্ষার কতকগুলি অবাঞ্ছিত ফল অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। স্বামীজী কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের সেই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন : 'দেশে নূতন idea-র (ভাবের) প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক ঐ ভাব ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে না পেরে অমন খারাপ হয়ে যায়। তাতে বিরাট সমাজের কি আসে যায়?'[৬] সেইসঙ্গে মন্তব্য করেন : '...ধর্মকে centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা secondary (গৌণ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন...নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই।'[৭] বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই অন্তঃপুরের বাইরে নারীর পদধ্বনি শোনা যায়—দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ নয়, ভীরু, সঙ্কুচিত, বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। প্রত্যুত, সন্ত্রাসবাদ, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর বহু নারীকে সক্রিয় অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। দেখা গেল, নারীর প্রথম অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ। সহজেই সে নিজের স্থান করে নিয়েছিল পুরুষের পাশে। স্বাধীন ভারতে নারীজাতির পটভূমি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। দ্বিখণ্ডিত ভারতে দলে দলে উদ্বাস্তুর আগমন, ফলে আর্থনীতিক চাপ সমাজে বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি করে, বাধ্য করে নারীকে স্বনির্ভর হতে। বর্তমানে স্ত্রীশিক্ষার পরিধি বহুগুণ বিস্তৃত। দেশের সর্বত্র স্কুল-কলেজের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। নারী আর অন্তঃপুরচারিণী ও কেবল গৃহকর্মে রত নয়। শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে যোগ্যতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম। বিভিন্ন প্রকার কর্মে তার সাফল্য আজ বিস্ময়কর। ভারতের মতো বিশাল এবং সমস্যাসঙ্কুল দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন একজন মহিলা।

যেসকল সমস্যা যুগ যুগ ধরে নারীর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল, তার অধিকাংশ আজ অন্তর্হিত। অবশ্য বহুতর নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। তারও সমাধানের চেষ্টা চলছে নানাভাবে। একথা অনস্বীকার্য যে, এসবই আধুনিক শিক্ষার ফল। আধুনিক শিক্ষাই নারীকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছে, শিখিয়েছে বহির্জগতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে, প্রেরণা দিয়েছে বৃহত্তর জগতে পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে স্বাধীন জীবনযাপনে। স্বামীজীর উক্তি স্মরণ করি : 'তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে, কোন্ জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক।'[৮] প্রশ্ন ওঠে, তবে কি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং নারীর বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক? কোনক্রমেই নয়। স্কুল-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়ের সংখ্যা বাড়ছে ঠিক, সুদূর গ্রামাঞ্চলেও মেয়েরা

৬। তদেব, পৃঃ ২০৫ ৭। তদেব

৮। তদেব, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২২১

শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। তবু অশিক্ষিত মেয়ের সংখ্যার হার কী লজ্জাকর! তার উপর যৌথপরিবার ভেঙে যাওয়ার ফলে অবিবাহিতা মেয়ে শিক্ষালাভ করেও অসহায় বোধ করছে। সুতরাং প্রথমেই দেখা প্রয়োজন গলদ কোথায়? আগে নির্ণয় করা প্রয়োজন শিক্ষার লক্ষ্য বা জীবনের উদ্দেশ্য অথবা আদর্শ; শিক্ষাব্যবস্থার কথা পরে। একদা অতীত ভারতের মহীয়সী নারীগণ (যথা গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি) বহু দিন ধরে ছিলেন নারীজাতির আদর্শ। অর্থাৎ তাঁদের চরিত্রের ছাঁচে চরিত্র গঠন করতে হবে বা করা উচিত—এই রকম একটা ধারণা ছিল। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এর মূল ব্যাখ্যা করা হয়েছিল—নারী হবে পতিব্রতা। বর্তমান আদর্শের রূপ পরিবর্তিত। নারী আর কেবল অন্তঃপুরিকা নয়। সুতরাং বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য অন্তঃপুরে অবস্থিত নারীকে যে চরিত্রগুলি একটিমাত্র লক্ষ্য বা আদর্শের প্রেরণা যোগাত, বর্তমানে তার অনুধাবন ও অনুসরণ প্রকৃতই কঠিন। সমুদ্রপারের মোহময় সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ ভারতের সমাজ ও পারিবারিক জীবনে আছড়ে পড়ছে। স্বামীজী তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন: 'সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গি অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, তপোবন-জটাবল্কল, কাষায়-কৌপীন, সমাধি-আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে।'[৯]

বলা বাহুল্য, প্রথম চিত্রের আকর্ষণ বর্তমানে সমধিক এবং যুগের স্বাভাবিক আদর্শ বলে গৃহীত। যুগের আদর্শ উপেক্ষা করে চলা কি সম্ভব অথবা সঙ্গত? সুতরাং প্রাচীনপন্থীরা 'হায়' 'হায়' করছেন—সব গেল। প্রগতিপন্থীরা অবজ্ঞাভরে ভাবছেন, কেবল ভারতীয় ভাবটুকু আঁকড়ে ধরে থাকার প্রচেষ্টা কী নির্বুদ্ধিতার পরিচয়! জগতের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে না? পশ্চিমের ও পূর্বের দেশগুলিতে তো বটেই, ইরাক, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতেও নারী আর পশ্চাৎপদ নয়। জগতে সমস্ত নারীর গতি বা লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা, পুরুষের সমান অধিকার দাবির জন্য এগিয়ে চলা—কেবল ভারতের নারীই অতীতের জয়ঢাক পিটিয়ে পিছনে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে? তাতে কোন্ সিদ্ধিলাভ?

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ আমরা জাগতিক উন্নতিকেই চরম লক্ষ্য বলে মেনে নিতে চলেছি। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা পৃথিবী অতিক্রম করে সুদূর মহাকাশে পরিব্যাপ্ত। বিজ্ঞানসৃষ্ট ভোগবিলাস, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকার বাসনা মানবহৃদয়কে অহরহ আকৃষ্ট করছে। বিজ্ঞানের বিরাট সাফল্য বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদ্‌গণের কাছে যতই মূল্যবান হোক, সাধারণ নরনারীর প্রতিদিনের সুখদুঃখের জীবনে তার বিশেষ অবদান দেখা যায় না—অন্তত আমাদের দেশে নয়। দারিদ্রের অভিশাপ ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী। লোভ ও স্বার্থপরতা জীবনকে ক্লিষ্ট করে তুলছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা মারি লুইস বার্কের এক বক্তৃতার কিছু অংশের সংক্ষিপ্ত মর্ম তুলে ধরছি: মানবজাতির সামনে একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক, যে লক্ষ্যে উপনীত হবার

৯। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৬

আকাঙ্ক্ষা তাকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং পাশ্চাত্যে যখন ধর্মের অবনতি ঘটল, তখন তার স্থান অধিকার করল বিজ্ঞান। পরিপূর্ণতালাভের জন্য পাশ্চাত্যে আমরা যদি ধর্মের স্থানে বিজ্ঞানকে বসিয়ে থাকি, তবে তার অর্থ কয়েকটি গাণিতিক প্রতীকের হাতে আত্মসমর্পণ। প্রকৃতিবিদ্ হয়তো তাতে অগাধ বৌদ্ধিক আনন্দলাভ করতে পারেন। কিন্তু আত্মার খাদ্য তাতে সংগৃহীত হয় না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিজ্ঞান আমাদের সেই চরম সত্যের সন্ধান দিতে পারে না—যা আমরা জানতে চাই; আবার ধর্মও তার বর্তমান রূপে যে পরম সত্তাকে ভালবাসবার জন্য আমাদের হৃদয় আকুল তার আভাস দিতে পারে না। ...এই পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্যবাসী একটা সমাধান করবার চেষ্টা করেছে। গত শতাব্দীর শেষভাগে একটা ধারণা ছিল, মানুষ স্বভাবত সৎ প্রকৃতির এবং তার মধ্যে রয়েছে পূর্ণতালাভের অসীম সম্ভাবনা। সমাজ ও আর্থনীতিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে পারলেই আশ্চর্য ফল পাওয়া যাবে। কারণ তখন সর্বপ্রকার বাধামুক্ত পরিবেশের মধ্যে মানুষের সৎ প্রকৃতি উজ্জ্বল মহিমায় প্রকাশ পাবে। তখন আর লোভ থাকবে না। থাকবে না দ্বেষ অথবা ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষা। এই পৃথিবীতেই তখন স্বর্গরাজ্য গঠনের জন্য থাকবে কেবল প্রেম, বদান্যতা ও দ্রুত প্রগতি—যেখানে মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেকেই জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করবার সুযোগ পাবে। কী সুন্দর! কিন্তু এই ধারণার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের 'মানুষ-গড়া ধর্মে'র কথা কারও চিন্তায় আসেনি।

আমরা জানি, উন্নততর সমাজব্যবস্থা ও আর্থিক উন্নতিই মানবজীবনে পরিপূর্ণতা আনবে এই স্বপ্ন দ্রুত ও নির্মমভাবে চূর্ণ হয়ে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যুগান্তর আনবে এ-ধারণাও হতাশায় পর্যবসিত। মনীষীমাত্রেই বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক ভয়ঙ্কর রূপের চিন্তায় উদ্বিগ্ন। মারি লুইস বার্কের মতে বর্তমান আমেরিকায় প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার সুবিধা ঃ দ্রব্যের প্রাচুর্য, কর্মসংস্থান এবং আমোদপ্রমোদ প্রত্যেকের করতলগত। সাধারণ মানুষ ধনী, তার সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত আহার ও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমেরিকার গৃহিণীর সংসারে আছে সর্বপ্রকার উপকরণের বাহুল্য। দ্রব্যমূল্য ও করভার ক্রমবর্ধমান সত্য, কিন্তু সেই অনুসারে বেতন ও পারিশ্রমিকের হারও ঊর্ধ্বগামী। এই প্রাচুর্য কতদিন চলবে জানা নেই। কিন্তু অনায়াসে বলা যায়, আমেরিকায় এই মুহূর্তে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকের কাছে দারিদ্র শব্দের অর্থ অজ্ঞাত। এ অবস্থা নিশ্চিতই আনন্দের। তথাপি বলা যায়, ঐহিক উন্নতির সঙ্গে আপনা থেকেই অবিমিশ্র সুখ ও সামাজিক শান্তির যে প্রত্যাশা তার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। জীবনে সম্ভোগ অবশ্যই আছে, কিন্তু নেই আনন্দ—নৈরাশ্য ভয়ঙ্কর!

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আজকের দিনে নারী জাগরণের নামে যে আন্দোলন (Women's Liberation Movement), তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আন্দোলনকারীরা যথার্থ অবহিত কিনা সন্দেহ আছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হওয়া এবং সম অধিকার লাভ করাই কি নারীর প্রকৃত লক্ষ্য? সেই কারণে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতরণ এবং সমস্ত শক্তির নিঃশেষ? পুরুষ এবং নারীর শারীরিক ও মানসিক গঠন বিভিন্ন। সুতরাং কিছু পার্থক্য থাকবেই। সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে পুরুষ ও নারীর

বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা ও কার্যের প্রয়োজন আছে। এর দ্বারা একটি শ্রেষ্ঠ ও আর একটি হীন এরূপ বোঝায় না। বরং পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতরণ ও তার অনুকরণ করার মধ্যেই রয়েছে নারীর হীনম্মন্যতার পরিচয়। পুরুষ কখনও নারীর অনুকরণ করে তার সমকক্ষ হতে চায় না। অবশ্যই নারীর কর্মক্ষেত্র পূর্বের ন্যায় অন্তঃপুরে সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত হবে। প্রকৃতপক্ষে নারীকে স্বমহিমায় নিজ ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। পুরুষের সমকক্ষ হওয়া বা সম অধিকার লাভ করার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস নারীকে কোন গৌরব বা মর্যাদা দান করে না।

সেইসঙ্গে ত্যাগ করতে হবে পাশ্চাত্য আদর্শের হাস্যকর বিকৃত অনুকরণ। পাশ্চাত্য নারীর চালচলন বা পোশাক-পরিচ্ছদের অনুকরণের যে প্রবল স্পৃহা বর্তমানে অনেকের মধ্যে দেখা যায়, তার মূলে আছে অবচেতন মানসে পাশ্চাত্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে স্বীকৃতি। অপরের অনুকরণ দ্বারা কোন জাতি কখনও বড় হতে পারে না, পুরুষ অথবা নারী উভয়ের পক্ষেই। পাশ্চাত্যের যা কিছু ভাল গুণ বিচার-সহ অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু কোনক্রমেই নিজের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে নয়। এবং একথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন, যদিও বর্তমানে নারীর কর্মক্ষেত্র অন্তঃপুরের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তথাপি সন্তান প্রতিপালনের জন্য মাতা হিসাবে তার যে বিরাট দায়িত্ব ও ভূমিকা, তা কখনই পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং পরিবার পরিচালনায় তার যে বিশেষ ভূমিকা তা অবশ্যই পালনীয়। নারী শক্তির প্রতীক। তার নিজ শক্তি সম্পর্কে অবহিত হলে, তার মৌলিক অবদানে সমর্থ হলে, তার যথার্থ মহিমোজ্জ্বল রূপ তাকে গৃহে এবং দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যেখানে সর্বাধিক সফল, সেই বস্তুতন্ত্রবাদী আমেরিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা স্বামীজীর দৃষ্টিতে পূর্বেই ধরা পড়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম পরিচয় তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু তাদের সম্পদ ও ক্ষমতার লিপ্সা শীঘ্রই তাঁর ভুল ভেঙে দেয়। তিনি বুঝেছিলেন—পাশ্চাত্য কোন্ পথে ছুটে চলেছে এবং সমাধানকল্পে তিনি বলেছিলেনঃ 'আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এইঃ মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ববিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে। ...জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য।'[১০] নারীর সমস্যা দৈনন্দিন জীবনে যদি বা কিছু পৃথক থেকে থাকে, নরনারী নির্বিশেষে সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য সেই চরম সত্য লাভ। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নিজেকে সমাজসংস্কারক বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি, কিন্তু অন্যান্য সমাজসংস্কারকের সঙ্গে তাঁর মূলগত পার্থক্য ছিল। তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার সংস্কার-আন্দোলনের বিরোধী। তদানীন্তন প্রচলিত উৎকট জাতিভেদ ও বাল্যবিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করলেও তিনি মনে করতেন না, ঐ দুই প্রথা রহিত হলেই

১০। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৯৮

জনগণ ও নারীজাতির উন্নতি আপনা থেকেই হয়ে যাবে। বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবাবিবাহের প্রবর্তন তাঁর কাছে সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি। কারণ, তিনি জানতেন, বিধবার পুনর্বার স্বামীলাভের উপর একটা জাতির ভাগ্য নির্ভর করে না। তিনি স্পষ্টই লিখেছিলেনঃ 'জাতিভেদ থাকা উচিত কি না, স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া উচিত কি না, এ-বিষয়ে আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।'[১১] উপরন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, মেয়েদের বিষয়ে পুরুষের হস্তক্ষেপের অধিকার তাদের শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত—'...নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা-লাভে সমর্থ।'[১২]

আশ্চর্য, যেযুগে মেয়েরা সম্পূর্ণভাবে অন্তঃপুরে বন্দিনী, সেযুগে বিদেশের শত শত শিক্ষিতা উদারহৃদয় মহীয়সী মহিলার সঙ্গে এদেশের মেয়েদের অবস্থা তুলনা করে দুঃখে ক্ষোভে তিনি লিখেছিলেনঃ 'আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হলে কেবল কাঁদতেই মজবুত।'[১৩] সেই যুগেই তিনি লিখেছিলেনঃ 'একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোরা এদের উন্নতি করতে পারলিনি। এদের ভেতর জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করলিনে।'[১৪]

'এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল্ দেখি?'[১৫]

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার যাদুকরী শক্তি আছে এবং শিক্ষাই একমাত্র সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম, কিন্তু সে-শিক্ষা কেবল পাঠ্য পুস্তকের বা আক্ষরিক নয়। যে-শিক্ষায় চরিত্রগঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো যায়, আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাকেই তিনি প্রকৃত শিক্ষা বলতেন। বস্তুত তাঁর মতে লেখাপড়া শিখে কর্মক্ষম হওয়া পুরুষ এবং নারীর পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তাকেই স্বামীজী চরম মুক্তি প্রকৃত স্বাধীনতা বা জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে স্বীকার করতেন না। তাঁর মতে পুরুষ এবং নারী উভয়েরই জীবনের লক্ষ্য পরম সত্য লাভ, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি। ব্যবহারিক জগতে অথবা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে তিনি কোন ভেদ করেননি। উপনিষদের 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী'[১৬]—তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, কুমারীও তুমি—এ তত্ত্ব তাঁর হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল। 'আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা।'[১৭]

১১। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯১ ১২। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯ ১৩। তদেব, পৃঃ ৪২৬
১৪। তদেব, পৃঃ ৩১ ১৫। তদেব, পৃঃ ২০০
১৬। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৪।৩ ১৭। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৯

'আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটি যন্ত্র চালাইয়া যাইব— যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর পুরুষই হউক আর নারীই হউক—নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে।'[১৮]

স্বামীজীর বাণীতেই সর্বপ্রথম নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা বা জাগরণের পরিচয় লাভ করি। আধ্যাত্মিক জাগরণের মাধ্যমেই জগতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। ভগিনী নিবেদিতার মতে, যে সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রনীতি আত্মা ও মনের উপর শরীরের বন্ধন দৃঢ় করে, স্বামীজী তাকে কোনক্রমেই সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, যে নারী যত বড় হবেন, তিনি ততই নারীসুলভ দুর্বলতাগুলি অতিক্রম করতে সমর্থ হবেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ পৃথক। স্বামীজীর মতে প্রাচ্যে মাতৃত্বের আদর্শকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্যে নারীর জায়ারূপ অধিক সমাদৃত। আমেরিকার নারীগণের মধ্যে কর্মশক্তির বিপুল প্রকাশ স্বামীজীকে মুগ্ধ করে। এই উভয় আদর্শের সংমিশ্রণে নারীজাতির যথার্থ আদর্শ নিহিত অর্থাৎ প্রাচ্যের অধ্যাত্মশক্তি ও পাশ্চাত্যের কর্মশক্তির মিলন। এইরূপ এক আদর্শ চরিত্রের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন শ্রীশ্রীসারদাদেবীর মধ্যে যাঁর কথা আমরা পরে বলব।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সমাজে নারীর অবস্থা হীন হলেও সমাজ বা ব্যক্তিজীবনে নারীর প্রভাব যথেষ্ট। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন তাই বলেছেন, যে-কোন সমাজের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক স্তরের যথার্থ পরিচয় বহন করে তার নারীজাতির অবস্থা। মহাকালের যাত্রাপথে বহু উত্থানপতন ও সঙ্কটের মধ্যে সমাজজীবনে হীনতম অবস্থা সত্ত্বেও মেয়েরাই সর্বদেশে—বিশেষত ভারতে, জ্বালিয়ে রেখেছিল ধর্মের অনির্বাণ দীপশিখা। প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাট সকল কর্ম, পূজা, ব্রত, উপবাসের মধ্যে ধরে রেখেছিল ধর্ম ও সংস্কৃতি যা যে-কোন জাতির প্রাণস্বরূপ। অধিকাংশ মনীষীর জীবনে তাই দেখা যায় জননীর প্রভাব সর্বাধিক।

আজ সমাজ ও পারিবারিক জীবনে যথার্থ সঙ্কটকাল উপস্থিত—সেখানে পুরুষ-নারীর ভেদ নেই। সর্বত্র দেখা যাচ্ছে আদর্শের প্রবল সঙ্ঘাত নবীন ও প্রাচীনের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, ধর্ম ও বিজ্ঞানের। ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ পূর্বেই তা অনুধাবন করে সতর্ক করেন। বিজ্ঞানকে স্বাগত জানিয়ে ও যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ধর্মকে কোনক্রমেই বিসর্জন দেওয়া চলবে না। আমাদের আদর্শ হবে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও কর্মকুশলতার সঙ্গে প্রাচীন যুগের মৌন মাধুর্য ও ধ্যানপরায়ণতা।'

'ভারত কি মরিয়া যাইবে? তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে।'[১৯]

'আবার এখান হইতেই তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর জড়বাদী সভ্যতাকে

১৮। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯১

১৯। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৪৬২

আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করিবে। ...বিশ্বাস করুন—ভারতই আবার পৃথিবীকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে প্লাবিত করিবে।'[২০]

'আমাদের পুণ্য মাতৃভূমিতেই ধর্ম ও দর্শনের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি। এখানেই বড় বড় ধর্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখানে—কেবল এখানেই ত্যাগ-ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে; এখানে—কেবল এখানেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের সম্মুখে উচ্চতম আদর্শসমূহ স্থাপিত হইয়াছে।'[২১]

এই লোকোত্তর মহাপুরুষগণের আবির্ভাব প্রধানত মানবজীবনের চরম প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য, কিন্তু তাঁদের জীবন ও শিক্ষার প্রভাব পড়ে জীবনের সর্বস্তরে। বস্তুত ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্র পৃথক নয়। ধর্ম যদি মানবজীবনকে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত না করে, দৈনন্দিন জীবনে তার প্রভাব না থাকে, জীবনের সকল কর্মে তার সুর ধ্বনিত না হয়, তবে সে-ধর্ম সাধারণের কাছে অবান্তর হয়ে পড়ে। ধর্ম কেবল মুষ্টিমেয় ব্যক্তির জন্য নয়, যাঁরা জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে লোকালয় পরিহার করে নির্জনে গিরিগুহায় ধ্যানে সমাসীন থাকবেন, অথবা নির্মম চিত্ত অবলম্বন করে বিচরণ করবেন অরণ্যে, প্রান্তরে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে তা যথার্থ ধর্ম নয়।

ভগবান বুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত বিবেকানন্দ কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন : 'ফল কথা, এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছ, ওটা ঐ ধর্মের অভাব। যদি দেশসুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে তো ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। ...যখন বৌদ্ধরাজ্যে এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে।'[২২]

ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ অতি গৌরবময় উচ্চস্থান অধিকার করে আছে। ভগবান বুদ্ধের চরিত্র, শিক্ষা কেবল বহু নরনারীকে সংসারবিমুখ ও নির্বাণলাভে প্রবুদ্ধ করে তা নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে—মানবতা, সাহিত্য, শিল্প, ললিতকলা, ভাস্কর্যে তার অমিত প্রভাব। অবনতি ঘটল তখনই যখন সে-ধর্ম কেবল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ রইল।

স্বামীজীর মতে ধর্ম সকলের জন্য। যে ধর্ম মোক্ষমার্গে প্রবুদ্ধ করে, সেই ধর্মই স্বধর্মে পরিণত হয়ে সাধারণ নরনারীকে উচ্চ ও সুস্থ জীবন যাপনে প্রেরণা দেয়।

ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধন। বিবেকানন্দ সেই সমন্বয়সাধনের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন সমাধানের সূত্র। তাঁর উক্তি : 'আমরা নির্বোধের মতো জড় সভ্যতার বিরুদ্ধে চিৎকার করিতেছি। ...বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।'[২৩] 'যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে

২০। তদেব, পৃঃ ৩-৪ ২১। তদেব, পৃঃ ৩২
২২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৩ ২৩। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৪০-১

অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" হইয়া যাই। এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান্ বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?'[২৪]

পাশ্চাত্যের প্রতি এই মোহ, অথবা কোন নতুন মতবাদ বা 'ইজম'কে স্বামীজী ভয় পেতেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রাচ্যের অধ্যাত্মশক্তি এত শাশ্বত ও শক্তিশালী যে, প্রতীচ্যের সঙ্ঘাতে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে না। আর প্রতীচ্যের জড় সভ্যতা প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সংস্পর্শে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হবে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মনীষীও আজ এই আশা পোষণ করছেন।

অসাধারণ বিদুষী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ও প্রচণ্ড কর্মপরায়ণা ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামীজী উপনীত করেছিলেন শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পদপ্রান্তে, আধুনিক শিক্ষায় যিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্যা, লজ্জা ও অবগুণ্ঠনে আবৃতা এবং সর্বতোভাবে তদানীন্তন প্রাচ্য প্রথায় সংরক্ষণশীলা। নিজ স্বাতন্ত্র্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে উদার অকপট চিত্তে তিনি গ্রহণ করেছিলেন নিবেদিতাকে, সাহায্য করেছিলেন তাঁর স্ত্রীশিক্ষারূপ কার্যে। নিবেদিতাও দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর অধ্যাত্মশক্তির কাছে নম্র শ্রদ্ধায় নত হয়েছিলেন। অপূর্ব মিলন! নিবেদিতার প্রতি স্বামীজীর আশীর্বাণী ছিল 'মায়ের হৃদয় আর বীরের সঙ্কল্প' (The mother's heart, the hero's will)।

স্বামীজী এই ধারণা পোষণ করতেন যে, অতীত যুগে যেসব মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেছেন, আগামীকালের নারীর মহত্ত্ব তাঁদের কীর্তিকে অতিক্রম করে যাবে। আগামী যুগের নারীর মধ্যে থাকবে একাধারে বীরোচিত দৃঢ় সঙ্কল্প ও জননীর স্নেহকোমল হৃদয়। নারী হবে পবিত্রতা, শক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক। সর্বোপরি, তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিছু সংখ্যক শিক্ষিতা মেয়ে যেন আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণপূর্বক পবিত্র ও আদর্শ জীবন গ্রহণ করে। আধ্যাত্মিক পূর্ণতালাভই হবে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং তারাই গ্রহণ করবে মেয়েদের শিক্ষার ভার।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে উন্নতির পথে পরিচালনার মূলে থাকবে নারীর প্রভাব। থাকবে না পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা অধিকারলাভের দাবি। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা নারী নিজের ভাগ্য, নিজেই জয় অথবা সৃষ্টি করবে। 'জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই...'[২৫]—পাশ্চাত্যে নারীর ঐহিক অভ্যুদয় লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলেও স্বামীজীর মতে যথার্থ অভ্যুদয় তখনই ঘটবে—যখন তার সঙ্গে যুক্ত হবে প্রাচ্য অধ্যাত্মশক্তি। 'হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী,

---

২৪। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৩-৪

২৫। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৪৪

দময়ন্তী...'[২৬] এই উক্তির দ্বারা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অধ্যাত্মশক্তিবলেই ঐ নারীগণ যুগ যুগ ধরে স্মরণীয়া ও পূজিতা, ঐহিক উন্নতির সঙ্গে সেই শক্তি অর্জনই নারীর লক্ষ্য। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে এযাবৎ সকলেই তাঁদের পতিব্রতা রূপটির বিশ্লেষণে মুখর হয়েছেন। আমরা ভুলে গেছি, তাঁরা কেবল পতিব্রতা ছিলেন না, তাঁদের তেজস্বিতা, অসামান্য ব্যক্তিত্ব, অপূর্ব সহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি অধ্যাত্মশক্তি জগতের শ্রেষ্ঠ নারীরূপে তাঁদের মহিমান্বিত করেছে। বিবাহিত জীবনের পরিবর্তে, জীবনের যে-কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও নারীত্বের এই অপূর্ব বিকাশ তাঁদের চরিত্রে দেখা যেত। তাই ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ীর মতোই তাঁরা আমাদের দেশে নারীজাতির আদর্শস্থানীয়া। নতুবা, অতীত যুগের উদাহরণের অর্থ হয় না।

বর্তমান যুগে এমনই একটি সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ চরিত্র আমরা দেখতে পাই শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবনে। কী নিষ্ঠার সঙ্গে ও নিপুণভাবে তিনি কন্যা, জায়া ও জননীর ভূমিকা পালন করে গেছেন! শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা কেবল তাঁর ধর্মপথে বা অধ্যাত্মজীবনে সহায়তা করেননি, পরন্তু লোককল্যাণের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। ধর্মপিপাসু নরনারীকে তিনি পরিচালনা করেছেন শ্রেয়ের পথে, তবে সবই নীরবে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। জননীরূপে তিনি নির্বিশেষে সকলকে মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত করেছেন। 'ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্বে—সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্য ক্ষমাশীলা জননী।'[২৭]—স্বামীজীর এই উক্তি সর্বতোভাবে সারদাদেবীর চরিত্রে পরিস্ফুট। আবার মনে হয় সঙ্ঘজননীরূপেই কি তাঁর পরিচয় শ্রেষ্ঠ নয়? নিজ মহিমায় রামকৃষ্ণসঙ্ঘ-রূপ বিরাট আধ্যাত্মিক সঙ্ঘে তিনিই ছিলেন নেত্রী। সকলের ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর স্থান। শ্রীশ্রীমা অন্তঃপুরবাসিনী কিন্তু স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁর গতিবিধি, আচার-আচরণ সম্পর্কে কোন প্রকার নির্দেশদান কারও পক্ষে কল্পনাতীত। স্বামীজীর ঘোষণা: '...তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।'[২৮] তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করেই নারীর প্রকৃত জাগরণ ঘটবে।

প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী মেয়েদের এক অতি উচ্চ নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অথবা সংসারে পুরুষের তুল্য অধিকার বা সুবিধা অর্জনই তাদের জীবনের একমাত্র কাম্য নয়। পূর্ণ জাগরণ বলতে বুঝি গভীর আত্মবিশ্বাস ও পরিপূর্ণ প্রবল প্রত্যয়ের সঙ্গে নিজের ভাগ্য নির্ধারণ। প্রকৃত শিক্ষাদ্বারা স্বাধীনতার পথ সুগম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাই আধ্যাত্মিক বিকাশ। তখনই নারীর পক্ষে স্থির করা সহজ হবে, কোন্ জীবন সে বেছে নেবে। আধ্যাত্মিক জীবনে উচ্চস্থান অধিকার করবার জন্য সে প্রয়োগ করবে সব শক্তি, অথবা জীবন উৎসর্গ করবে মানবসেবায়। সমাজ, শিক্ষা এবং রাষ্ট্রপরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণই হবে তার লক্ষ্য—অথবা সাধারণভাবে

২৬। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯
২৭। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪৩১
২৮। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৭৬

মাতা ও পত্নীর দায়িত্ব পালনই তার অভিপ্রেত হবে। যে পথই সে গ্রহণ করুক, প্রত্যেকটিই তাকে পরিচালনা করবে শ্রেয়ের পথে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মূল কথা যথার্থ সাম্য, শান্তি ও স্বাধীনতার সঙ্গে নরনারী নির্বিশেষে মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্য ঘোষণা।

আশার কথা, নবযুগের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পূর্ণযৌবনা পত্নীকে মহাশক্তিরূপে পূজা করেছিলেন, আবাহন করেছিলেন বিদ্যাশক্তিকে ভারতের তথা জগতের কল্যাণের জন্য। সমগ্র নারীজাতির মধ্যে সেই শক্তির স্ফুরণ হলেই অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটবে। মনে হয় সেদিন আসন্ন! স্বামী বিবেকানন্দ তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করেই—সেই মহাশক্তির বিকাশ ঘটবে।

রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি

স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক চেতনা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ

স্বামী বিবেকানন্দ ইতিহাসও লেখেন নাই, রাষ্ট্রীয় দর্শন কিংবা রাজনৈতিক কার্যপদ্ধতি লইয়া কোন বৃহৎ পুস্তকাদিও রচনা করেন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, রাজনীতির অনুসরণ তাঁহার কাছে একটা গৌণ ব্যাপার। তাঁহার ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উক্তিগুলি বেদান্তসূত্রের ন্যায় সংক্ষিপ্ত এবং ভাবগর্ভ। ঐসকল উক্তি তাঁহার গ্রন্থ, বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও কথোপকথনের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। অ্যারিস্টটলের ন্যায় তিনি ঐতিহাসিক প্রণালীতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র-বিষয়ক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। স্বতঃপ্রামাণ্য বলিয়া কিছু ধরিয়া তাহা হইতে কোন সিদ্ধান্ত টানা তাঁহার রীতি ছিল না। তিনি ইতিহাসের সন্ধানী আলো ফেলিয়া অতীতকে উন্মোচন, বর্তমানকে বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। অতীত ও বর্তমানের অনুধ্যান করিতে করিতে তিনি সমগ্র বিশ্বের, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনবিধি বিষয়ে এমন কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছে। সাধারণ ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সহিত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষের এইখানেই পার্থক্য।

স্বামীজী তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতে ইতিহাস-প্রীতি পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের পিতাঠাকুর বিশ্বনাথের গ্রন্থাগারে কয়েক খণ্ডে সম্পূর্ণ রোমের ইতিহাস, জুলিয়াস সীজারের জীবনী, সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লসের জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল। স্বামীজী কলেজে ইতিহাস এবং দর্শনশাস্ত্র পাঠ্যবিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কলেজে পড়িবার সময় গ্রীনের লিখিত ইংরেজজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেসময়ে কলেজ-পাঠ্য ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজা-উজিরের কাহিনী ছাড়া বড় একটা কিছু থাকিত না। ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিতে তো তখন শুধু সেকেন্দর শাহ হইতে আরম্ভ করিয়া ডালহৌসির শাসনকাল পর্যন্ত সময়ের ভারতের পরাজয়বৃত্তান্ত বুঝাইত। সেইজন্য ঐ ধরনের ইতিহাস পড়িয়া তিনি তৃপ্তি পান নাই। সেসময়ে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে ভারতীয়দের গবেষণা অতি সামান্যই বাহির হইয়াছিল। সুতরাং স্বামীজীকে প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধান করিবার জন্য বেদ-পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি উৎসের নিকট পৌঁছিতে হইয়াছিল। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যয়নের ব্যাপকতার কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একদিকে তিনি কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী' হইতে বিদেশাগত ট্রাইবগুলির জাতিতত্ত্বের কথা বলিতেছেন, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের বিবরণ লিখিতেছেন, বেদ-উপনিষদ্, পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতাদি হইতে ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রের গতি নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন; অন্যদিকে গ্রীক ও রোমান জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় হইতে ও

আরব এবং মূরজাতির দিগ্বিজয়কাহিনী হইতে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার রাষ্ট্রীয় দর্শনের সমর্থন করিতেছেন। ব্যাবিলন, আসেরিয়া, মিশর ও প্যালেস্টাইনের ইতিহাস জানিবার জন্যও তাঁহার আগ্রহ ছিল অসীম। তিনি ফরাসী লেখক মাস্‌পেরোর লিখিত সুদূর প্রাচ্যের ইতিহাস ইংরাজী অনুবাদ হইতে প্রথমে পড়েন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, অনুবাদক গোঁড়া খ্রীষ্টান বলিয়া মাস্‌পেরোর যেসব উক্তি খ্রীষ্টানধর্মের বিরুদ্ধে যাইতে পারে সেগুলি বর্জন অথবা পরিবর্তন করিয়াছেন, তখন তিনি মূল ফরাসীভাষা হইতে উহা অধ্যয়ন করিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। তবে অনর্থক শত্রু বাড়াইলে তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত উদ্‌যাপনের বিঘ্ন ঘটিবে আশঙ্কা করিয়া তিনি তাঁহার মনের কথা কখনও কখনও কিছুটা রাখিয়া-ঢাকিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মিস মেরী হেলকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রিটিশ কুশাসনের যেসব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন উহা যদি প্রকাশ পায় তাহা হইলে ভারতের ইংরাজ সরকার নবনির্মিত এক আইন বলে তাঁহাকে দেশে লইয়া যাইয়া বিনা বিচারে হত্যা করিবে।[১] তাই ইতিহাসের সমুদ্র হইতে তিনি যেসকল উজ্জ্বল রত্ন আহরণ করিয়াছিলেন সেগুলি কথাচ্ছলে, প্রসঙ্গক্রমে দেশবাসীর কাছে ছড়াইয়া গিয়াছেন। সরাসরিভাবে রাজনৈতিক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখার চেয়ে হয়তো ইহাতে কাজ বেশীই হইয়াছে। তিনি বাল্যকাল হইতে জাতীয় মেলায় যোগ দিতেন ও 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের নিকট যাতায়াত করিতেন। ভারতবর্ষে ন্যাশনালিজমের প্রভাব কি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে সে-সম্বন্ধে সোজাসুজি কিছু না বলিয়া তিনি ইতিহাসের আটটি দৃষ্টান্তের প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তিনি 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে বলিলেন যে, জাতীয়তার ভাব আসে দুইটি কারণে। একটি হইতেছে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সহানুভূতি ও অপরটি হইতেছে অপর কোন জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ। এক-নিঃশ্বাসে ঝড়ের বেগে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উদাহরণ দিয়া বলিলেন : 'একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মূর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানীর এবং ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।'[২] স্বামীজী একবারও বলিলেন না যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বেগ বর্ধিত করিবার জন্য ভারতবাসীকে যেমন 'একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য' করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি বিশেষ কোন বিদেশী শাসকের প্রতি 'একান্ত বিদ্বেষের' ভাব পোষণ করিতে হইবে। কিন্তু অতগুলি দৃষ্টান্তের মর্ম যিনি বুঝিতে পারিবেন, তিনি কি আর এটুকু অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন না? এইভাবে প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই বিপ্লবের যুগে পুলিশ যেখানেই বিপ্লবীদের বাসা তল্লাশ করিয়াছে সেইখানেই বিবেকানন্দের গ্রন্থরাজি

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৭২
২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ২৪৩

দেখিতে পাইয়াছে। শেষ এবং শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রও বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর একান্ত অনুরক্ত পাঠক ছিলেন।

স্বামীজী 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে ভারতের শ্রমজীবীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে তাহাদের শ্রমজাত বস্তু লইয়া ব্যবসা করিয়া অনেক জাতি ধনী হইয়াছে ও পৃথিবীতে প্রাধান্য করিয়াছে। তিনি একের পর এক পনেরটি জাতির নাম করিয়াছেন : 'হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকজেন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য।'[৩] এখানেও বৈদিকযুগে ভারতের সহিত ব্যাবিলনের ব্যবসার কথা হইতে আরম্ভ করিয়া রোমের সহিত বাণিজ্যের উল্লেখ প্রাচীন ইতিহাস হইতে, ভিনিস হইতে সমরকন্দের কথা মধ্যযুগ হইতে এবং বাকিগুলি আধুনিক যুগের ইতিহাস হইতে লইয়া স্বামীজী তাঁহার সিদ্ধান্তের পোষকতা করিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, তিনি মূল কথাটির দিকে একটু ইসারা করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেটি হইতেছে এই যে, কাহারও আধিপত্য চিরস্থায়ী নহে—সুতরাং ইংরাজেরও নহে।

ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রেনেসাঁস বা সংস্কৃতির নবজন্ম ঘটিয়াছিল। স্বামীজী উহার ইতিহাস বলিতে বলিতে চারশত বৎসর অতিক্রম করিয়া ভারতে ও জাপানে কি করিয়া ঐ আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া পৌঁছিল তাহা বলিয়াছেন। তুর্কীদের হাতে প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটিলে সেখানকার পুঁথিপত্র লইয়া পণ্ডিতেরা ইতালিতে পলাইয়া আসিলেন। তাহাতে ইতালিতে নবজাগরণের সূত্রপাত হইল। স্বামীজী বলিতেছেন : 'ইতালি বুড়ো জাত, একবার সাড়া-শব্দ দিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো। সেসময়ে নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠেছিল কিছু, আকবর হতে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পের আদর যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত নানা কারণে আবার পাশ ফিরে শুলো।'[৪] স্বামীজীর মতে রেনেসাঁসের সবচেয়ে বেশী প্রভাব দেখা গিয়াছিল ফ্রান্সে। 'নবীন রক্ত, নবীন জাত সে তরঙ্গে মহাসাহসে নিজের তরণী ভাসিয়ে দিলে, সে স্রোতের বেগ ক্রমশই বাড়তে লাগলো, সে এক ধারা শতধারা হয়ে বাড়তে লাগলো ; ইউরোপের আর আর জাতি লোলুপ হয়ে খাল কেটে সে জল আপনার আপনার দেশে নিয়ে গেল এবং তাতে নিজেদের জীবনীশক্তি ঢেলে তার বেগ, তার বিস্তার বাড়াতে লাগলো, ভারতে এসে সে তরঙ্গ লাগলো ; জাপান সে বন্যায় বেঁচে উঠলো, সে জল পান করে মত্ত হয়ে উঠলো ; জাপান আশিয়ার নূতন জাত।'[৫] জাপানের নবজাগরণের উপর জোর দিয়া স্বামীজী সমগ্র এশিয়ার পটভূমিকায় ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

ভারতের নবজাগরণ ও তাহার ফলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথার উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গান্তরে তিনি লিখিয়াছেন : 'অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না ; বিকৃতমস্তিষ্ক যে, সে বুঝিতেছে না—আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন।

৩। তদেব, পৃঃ ১০৬ ৪। তদেব, পৃঃ ১৯২ ৫। তদেব, পৃঃ ১৯৩

আর কেহই এখন ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না, যেন কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙিতেছে।'[৬]

স্বামী বিবেকানন্দ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ছোটবড় সকল বিষয় আলোচনা করিতেন। জাহাজে করিয়া গঙ্গার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তিনি দেখাইলেন, কিভাবে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন হইবার ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের চার বৎসর পরে সপ্তগ্রামের পতন হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং যথাক্রমে হুগলি, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও কলিকাতার অভ্যুত্থান হইয়াছে। প্যারি নগরীতে লুভার মিউজিয়াম দেখিবার সময় গ্রীকশিল্পের বিবর্তন কি করিয়া ৭৭৬ খ্রীষ্টপূর্ব হইতে ১৪৬ খ্রীষ্টপূর্বের মধ্যে চারটি যুগে ঘটিয়াছিল সেকথা তাঁহার মনে উঠিয়াছে। শিষ্যদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তিনি তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ ইতিহাসের গতির কথা স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি সকলের মধ্যে ঐতিহাসিক চেতনা সঞ্চার করিতে এত বেশী আগ্রহশীল ছিলেন যে, কি করিয়া কোন বইয়ের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ বাহির করিতে হয় তাহার মূলসূত্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

উপনিষদের ভাবধারায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়েই পুষ্ট। উভয়েই প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানে আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রণে ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আর্যেরা বিদেশ হইতে আসেন নাই এবং শূদ্রেরা সকলেই অনার্য ছিলেন না। তিনি মহাভারতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রথমে সকলেই এক বর্ণভুক্ত ছিলেন; কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন জীবিকা গ্রহণের ফলে লোকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল ভারতীয় সমাজের বিকাশধারা ব্যাখ্যার প্রতি; আর স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রীয় শক্তি কোন্ শ্রেণীর হাতে ছিল তাহা আবিষ্কার করা। স্বামী বিবেকানন্দের মতে বৈদিক কর্মকাণ্ডের যুগে পুরোহিতশ্রেণী রাজন্যবর্গের উপর প্রাধান্য করিতেন। পুরোহিতেরা কখনও বা রাজাদিগকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিতেন, কখনও বা কূটনীতির দ্বারা তাঁহাদিগকে পাশবদ্ধ করিতেন। তাঁহারা প্রায়শঃই রাজশক্তিকে নিজেদের অধীন করিয়া রাখিতেন। রাজা ও প্রজা সকলেই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গললাভের আশায় পুরোহিতশ্রেণীর পদানত হইয়া থাকিতেন। স্বামীজী পুরোহিতশ্রেণীর অনেক দোষ দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উপকারিতাও যে ছিল তাহা অস্বীকার করেন নাই। তিনি প্রাচীন ইতিহাস হইতে দেখাইলেন যে, 'চীন, সুমের, বাবিল, মিসরি, খল্‌দে, আর্য, ইরানি, য়াহুদী, আরাব—এই সমস্ত জাতির মধ্যেই সমাজনেতৃত্ব প্রথম যুগে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত-হস্তে।'[৭] পুরোহিতেরাই সর্বপ্রথমে মানবকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে অতীন্দ্রিয় জগতের বার্তা দিলেন। তাই স্বামীজী তাঁহাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া বলিলেনঃ 'পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের

৬। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩৮ ৭। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২২৯

প্রথম অধিকার-বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ। পুরোহিত...রাজা-প্রজার মধ্যবর্তী সেতু।"[৮] স্বামীজী যদি মার্কসবাদী কিংবা বামপন্থী হইতেন তাহা হইলে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সন্ধান দিবার জন্য পুরোহিত-প্রাধান্যের এইভাবে স্তবগান করিতেন না। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা স্বামীজীর এই ধরনের উক্তিগুলি উদ্ধৃত করেন নাই, উল্লেখও করেন নাই।

পুরোহিতরা কিন্তু ক্ষমতার আস্বাদ পাইয়া উহা চিরকাল তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে রাখিবার প্রচেষ্টায় ধর্মকে অনুষ্ঠানবহুল করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে ঐসব অনুষ্ঠান সাধন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাই ক্ষত্রিয়শ্রেণী তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার সন্ধান পাইলেন। কর্মকাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ডের উপর তখন বেশী জোর দেওয়া হইল। ক্ষত্রিয়েরা বাহুবলে আগেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন; এখন জ্ঞানবলেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে লাগিলেন। স্বামীজী বলেন যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কিন্তু কেহ কেহ যেমন যজ্ঞাদি বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতেন, তেমনি দার্শনিকদিগকেও উপহাস করিতেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হইতেছে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকা। আমাদের দেশে লোকায়ত বা চার্বাক দর্শনের প্রভাব জনসাধারণের উপর কতটা পড়িয়াছিল তাহা কেহ দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু স্বামীজী বলেন যে, দলে দলে লোক জড়বাদীদের সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিল। স্বামীজীর অনুমান যদি মিথ্যা হইত তাহা হইলে আমরা ভোগবাদী অপেক্ষা আনুষ্ঠানিক ধার্মিকের এবং দার্শনিকের সংখ্যা বেশী দেখিতাম। স্বামীজী বলেন যে, ঐ তিন শ্রেণীর মধ্যে যে ত্রিকোণ-সংগ্রাম দেখা দিয়াছিল তাহার আজও কোন সমাধান হয় নাই।

ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের যুগে জনসাধারণের কোন স্বাধীনতা বা অধিকার ছিল কি? স্বামীজী বলেন যে, কি হিন্দুরাজাদের সময়, কি বৌদ্ধ নৃপতিদের শাসনকালে, প্রজাদের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি (the common subjects—people) তাঁহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন না। জনসাধারণের ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষ ও বিশৃঙ্খলভাবে প্রকাশ পাইবার জন্য চেষ্টা পাইত মাত্র। স্বামীজীর পরলোকগমনের বহু পরে জয়সোয়াল ইত্যাদি পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বৈদিক যুগে 'সমিতি' নামে জনসাধারণের এক জাতীয় পরিষদ ছিল, এবং 'সভা' ছিল উহার একটি স্থায়ী উপসমিতি।[৯] কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর কানে দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদে (১০।১৯১।৩) 'সমিতি' মানে সভাস্থল এবং ছান্দোগ্যোপনিষদে (৫।৩।১) 'সমিতি' শব্দটি ধর্মবিষয়ক বিচারসভা-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সত্যাষতে শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যে সভা তিনপ্রকার বলা হইয়াছে—মামলা-মোকদ্দমার বিচারের জন্য ধর্মসভা, যজ্ঞ করিবার স্থানে কর্মসভা এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজ-অমাত্য ও অন্যান্য কর্মচারী প্রভৃতি লইয়া রাজসভা। ইহার কোনটিতেই সাধারণ প্রজাদের কোন ক্ষমতা ছিল না। স্বামীজী যাঁহাদিগকে 'সাধারণ

৮। তদেব, পৃঃ ২৩২

৯। Hindu Polity—K. P. Jayaswal, Butterworth & Co. (India) Ltd., Calcutta, 1924, p. 18

প্রজা' বলিয়াছেন, যাঁহারা পরিশ্রম করিয়া দ্রব্যাদি উৎপন্ন করেন বলিয়া তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণীর লোক খাইতে-পরিতে পান, তাঁহাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রাচীন কালে কোন দেশেই ছিল না। পশ্চিমের লোকেরা এথেনীয় গণতন্ত্রের গৌরব করেন, কিন্তু সেখানেও উৎপাদক শ্রেণীকে ক্রীতদাস করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং তাহাদের সংখ্যা নাগরিকদের অপেক্ষা বেশী ছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বামীজীর সিদ্ধান্ত ইতিহাসানুমোদিত। তাঁহার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ও বিচারগুলির ঐতিহাসিকতার আলোচনা করিলে একটি সুন্দর ডক্টরেট থীসিস হইতে পারে। আশা করি, ভবিষ্যতে কখনও 'বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপিত হইলে এই কার্যে উৎসাহপ্রদান করা হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, সমাজের অবিকশিত অবস্থায় রাজশাসনের প্রয়োজনীয়তা আছে। শৈশবে পিতার পালনের ন্যায় সমাজের প্রতিপালন রাজার দ্বারা, কিন্তু ছেলের বয়স যখন ষোল বৎসর হয় তখন যেমন তাহাকে মিত্রের মতন দেখিতে হয়, তেমনি সমাজের বিকাশ ঘটিলে জনসাধারণের মতামত লইয়া রাজকার্য পরিচালনা করা উচিত। ভারতবর্ষে এরূপটি হয় নাই, এবং তাহাই ভারতবর্ষের পরাধীনতার অন্যতম কারণ—'যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, নীরবে সহ্য করে, রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীঘ্রই বীর্যবান অন্য জাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয়।'[১০]

তিনি ভারতবর্ষের অবনতির অন্যান্য কারণের মধ্যে অপর জাতির সহিত মেলামেশা না করা, সকলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে না পারা, স্ত্রীজাতিকে পদদলিত করা, দরিদ্রদিগকে নিষ্পেষিত করা এবং দেশের ইতরসাধারণ লোককে অবহেলা করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যাপারটিকে তিনি 'আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ' বলিয়াছেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মতের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে কবিগুরুর

মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান।—

ইত্যাদি স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের আট-নয় বৎসর পরে রচিত হয়।

স্বামীজী একখানি পত্রে লিখিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়েরা নিষ্ঠুর ও যথেচ্ছাচারী হইলেও তাঁহারা পুরোহিতশ্রেণীর ন্যায় অতটা সংস্পর্শকাতর ছিলেন না। তাঁহাদের প্রাধান্যের সময়ে চারুকলা এবং সামাজিক সংস্কৃতির চরম উন্নতি হয়। তাঁহাদের পরে আসিল বৈশ্য-প্রাধান্য। ইহার নীরব নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণ ভয়ঙ্কর। কিন্তু ইহার একটি উপকারিতা এই যে, বণিক ব্যবসার জন্য সব জায়গায় যান এবং সেইজন্য পূর্বের দুই যুগে যে-সমস্ত ভাবসম্পদ সংগৃহীত হইয়াছে সেইগুলি প্রচারিত হয়। তাঁহাদের প্রাধান্যকালে কিন্তু সংস্কৃতির অবনতি ঘটে। ইহার পর শূদ্র-প্রাধান্য আসিবে। ইহাতে সুবিধা এই হইবে যে, দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়িবে, কিন্তু সম্ভবতঃ সংস্কৃতির মান আরও

১০। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৯

নীচু হইয়া যাইবে।[১১] সাধারণ শিক্ষার খুব প্রসার হইবে, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভার উদ্ভব দিন দিন হ্রাস পাইবে। স্বামীজী কি দিব্যদৃষ্টিতে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও তাহার সংস্কৃতির স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন? সোভিয়েত রাশিয়া বিজ্ঞানে অনন্যসাধারণ উন্নতি করিয়াছে, প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, বিত্ত বাড়াইয়াছে, কিন্তু সেখানকার নেতৃবৃন্দ বা জনসাধারণ নিজেদের চিত্ত জয় করিতে পারে নাই। দর্শনের চর্চা সেখানে নাই বলিলেই চলে। সাহিত্য ও চারুকলাও বাঁধা গণ্ডি ও বাধানিষেধের মধ্যে ভালভাবে ফুটিতেছে না।

এইভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তির অবস্থান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে কিভাবে আসে ও কোন্ জাতির প্রাধান্যে কি ফল হয় তাহা বলিয়া স্বামীজী তাঁহার নিজস্ব আদর্শের কথা বলিতেছেন: 'যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব?'[১২] লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, স্বামীজী ভীষ্ম ও কৌটিল্যের আদর্শ অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রকে জ্ঞান ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক হিসাবে দেখিয়াছেন। রাষ্ট্র তাঁহার নিকট উপায় মাত্র, উপেয় নহে। শুক্র এবং হেগেল রাষ্ট্রকে উপেয় বলিয়া ধরিয়াছেন। শূদ্রপ্রাধান্যের যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে সাম্য স্থাপিত হইবে বলিয়া স্বামীজী আশা করিতেন। বৈশ্যপ্রাধান্যের সময় সামাজিক সাম্য কিছুটা থাকিলেও আর্থিক সাম্য থাকিতে পারে না—কেননা যাঁহাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাঁহারা নিজেদের সুখসুবিধাটা বড় করিয়া দেখেন।

এই ভাবটি তাঁহার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তির কথা দেবতা ও অসুরের সংগ্রামের রূপক দিয়া বলিয়াছেন: 'একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগলো—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেইসব ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগলো। সকলে মিলে সেইসব বিনিময় করতে লাগলো, আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ-জায়গার জিনিসটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে। একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম করে কতকটা আগ ভাগ নিলে। অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে মলো!! পাহারাওয়ালার নাম হলো রাজা, মুটের নাম হলো সওদাগর। এ দু-দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগলো। যে জিনিস তৈরী করতে লাগলো, সে পেটে হাত দিয়ে "হা ভগবান" ডাকতে লাগলো।'[১৩] স্বামীজী কার্ল মার্কসের গ্রন্থাদি পড়িয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু এই ধরনের উক্তির সহিত সমাজতন্ত্রবাদীদের সিদ্ধান্তের খুব বেশী তফাৎ নাই। স্বামীজীর

১১। তদেব, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৪৯

১২। তদেব, পৃঃ ৩৪৯-৫০ ১৩। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০৩-০৪

রচনার মধ্যে সর্বত্র দরিদ্র-উৎপাদকশ্রেণীর উপর অসীম সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। বামপন্থীদের সহিত এ-বিষয়ে তাঁহার মিল থাকিলেও, তাঁহার দরিদ্র-নারায়ণের ধারণা একান্ত নিজস্ব ও মৌলিক। দরিদ্রকে নারায়ণরূপে দর্শন করিতে হইলে যে-প্রজ্ঞার প্রয়োজন তাহা বামপন্থীদের নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জনসাধারণের দুর্গতির জন্য ব্রিটিশ শাসকদিগকে দায়ী করেন নাই, দায়ী করিয়াছেন আমাদের অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত পূর্বপুরুষগণকে। তাঁহারাই সাধারণ লোকদিগকে এমনভাবে পদদলিত করিয়াছেন যে, তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারা মানুষ। তাহাদের দিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী শ্রমসাধ্য কাজ করাইয়া লওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, দাসত্ব করিতেই তাহাদের জন্ম।

বিবেকানন্দের জীবনের ব্রত ছিল ইহাদিগকে পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোলা। প্রত্যেক জীবই শিব। —বেদান্তের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইতেছে প্রত্যেকের মধ্যে ঐ ধারণার সঞ্চার করা। প্লেটো শুধু শাসক-সম্প্রদায়ের চরিত্র গঠন করিবার উপায় বিধান করিয়া পৃথিবীতে আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকালেই হয়তো তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহার 'Republic'-এ যে উঁচু সুর দেখা যায় তাহা তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ 'Laws'-এ প্রায় তিরোহিত। বিবেকানন্দ প্রত্যেক মানুষের ভিতর দেবত্ব জাগাইবার সাধনা করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র শ্রেণীবিশেষের নহে। বাহিরের ভোগস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থামাত্র করিয়া যাঁহারা মানুষের মর্যাদা বাড়াইতে চাহেন তিনি তাঁহাদের দলে ছিলেন না। তিনি অবশ্য রুটি জোগাইবার গুরুদায়িত্বের কথা কখনও কম করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু মানুষের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চারিত্রিক উন্নতিসাধন করা, তাহার মধ্যে নারায়ণত্বের উপলব্ধি জাগানো ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। এ-সম্বন্ধে তিনি কখনও নিরাশ হন নাই। বেদান্তদর্শনের তত্ত্ব তাঁহাকে আশাবাদী করিয়াছে। মানুষের আধ্যাত্মিক জাগরণ না হইলে বাহিরের নিয়ম-কানুন বদলাইয়া তাহার আমূল পরিবর্তন সাধন করা অনেকটা আলেয়ার পিছনে ছোটার মতন। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই মানবের স্থায়ী উন্নতিসাধনের জন্য আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন।

পশ্চিমে যে-গণতন্ত্র তিনি দেখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি উহার অসারত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইংলণ্ড আমেরিকা ও ফ্রান্সে মুখে সাম্যের ও স্বাধীনতার বুলি আওড়ানো হইলেও সেসব দেশে যে বস্তুতঃ শ্রেণী ও ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য পুরা বজায় রহিয়াছে সেকথা তিনি একাধিক স্থানে বলিয়াছেন। আমাদের চিন্তানায়কদের মধ্যে বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই পশ্চিমের গণতন্ত্র যে ভারতের উপযোগী নহে তাহা বলিয়াছেন। স্বামীজী 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ "ও তোমার "পার্লেমেন্ট" দেখলুম, "সেনেট" দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র ! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষরা যেদিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে,

বাকিগুলো ভেড়ার দল।'[১৪] কিন্তু শক্তিমানেরা শক্তিকে জনসাধারণের উন্নতির জন্য প্রয়োগ করার চেয়ে নিজেদের স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বেশী পছন্দ করেন। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন: 'রাজনীতির নামে...চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে খাচ্ছে...।' একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, ইউরোপে নামে গণতন্ত্র চলিলেও দেশের ধন ও ক্ষমতা এমন কতিপয় লোকের হাতে যাঁহারা নিজে কাজ করেন না, কেবল লক্ষ লক্ষ লোককে দিয়া কাজ করাইয়া লন। এই উপায়ে তাঁহারা সমগ্র পৃথিবী রক্তপ্লাবিত করিতে পারেন।

লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার বহু পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপীয় গণতন্ত্রের মুখোসের অন্তরালে সাম্রাজ্য-লোলুপতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন: 'যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিত হলে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো তো সেইখানেই মারা গেল; হে রাম! চমকে যেও না, ভাঁওতায় ভুলো না।'[১৫]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ভারতবর্ষে যাঁহারা রাজনীতি করিতেছিলেন তাঁহাদের রীতি ও নীতির সঙ্গে স্বামীজীর সহানুভূতি অল্প ছিল। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে ক্ষমতা দাবি করিতেছিলেন, তাহা সর্বসাধারণের সঙ্গে বাঁটিয়া ভোগ করিবার জন্য নহে, নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য। তিনি সজোরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নহে সে কোনমতেই স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে। দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য।[১৬]

বিবেকানন্দ যে নূতন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহা গঠন করিবার ভার লইবে মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায়ের কিংবা উচ্চবর্ণের লোক নহে, কিন্তু দেশের কৃষক ও শ্রমজীবীরা। বলশেভিক দলের প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই স্বামীজী কৃষক ও মজুরের কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সুপ্রসিদ্ধ বাণী শতবার উদ্ধৃত হইলেও পুনরায় স্মরণ করা যাইতে পারে: 'তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন।'[১৭] তাঁহার মতে উচ্চতর শ্রেণীরা কি শরীরের দিক দিয়া, কি নৈতিকতার দিক দিয়া, মরিয়া গিয়াছে। এবং কৃষক, মেথর, চামার প্রভৃতি শীঘ্রই তাহাদের চেয়ে বড় হইবে।

১৪। তদেব, পৃঃ ১৬১ ১৫। তদেব, পৃঃ ১৬২
১৬। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৪১ ১৭। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮২

বিবেকানন্দের উপর হেগেল ও জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাব পড়িয়াছিল, যদিও ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্বন্ধে ইঁহারা দুইজন পরস্পর-বিরোধী মতবাদ পোষণ করিতেন। হেগেলের মতে রাষ্ট্রের অধীনতাতেই মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা। রাষ্ট্র সমষ্টির প্রতীক। স্বামীজী লিখিয়াছেন: 'সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য।'[১৮] বেদান্তশাস্ত্রেও এইকথা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। হেগেল ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ করিয়া নাৎসী ডিকটেটরশিপের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ গ্রীনের ন্যায় হেগেলীয় মত অনুসরণ করিয়াও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রচুর অবকাশ রাখিয়াছেন। তিনি জাতীয় ঐক্যস্থাপনের জন্য বলিয়াছেন: 'স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ।'[১৯] এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বিবেকানন্দ হেগেলের ন্যায় সমষ্টির প্রতীক রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে বলি দিতে রাজী নহেন। তাঁহার কাছে প্রধান হইতেছে ব্যক্তির স্বার্থ ও ব্যক্তির কল্যাণ। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমষ্টির প্রতি আনুগত্য। তিনি মিলের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিয়াছেন: 'স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তাহার আহার পোশাক বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন—তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কাহারও অনিষ্ট না করে।'[২০] 'আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোনও বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে-প্রকার ইচ্ছা, সে-প্রকার ব্যবহার করিতে পারিব, ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার; এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের—সকল সামাজিক ব্যক্তির সমান সুবিধা যাহাতে থাকে, তাহাও হওয়া উচিত।'[২১] আধুনিক যুগে সমাজতান্ত্রিক প্রভাবের ফলে ব্যক্তির নিজের ধন-সম্পত্তির যথেষ্ট ব্যবহারের স্বাধীনতা অবশ্য অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা যে ভুয়া একথা স্বামীজী আরও অনেক স্থানে বলিয়াছেন।

স্বামীজী প্রত্যেক জাতির অভ্যুদয়ে আস্থাশীল ছিলেন, কেননা এক একটি জাতির এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন যে, ফরাসী জাতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরাজ জাতির টাকাপয়সার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করা আর হিন্দুদের মুক্তি।[২২] তিনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লস্ এঞ্জেলসে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন: 'এশিয়ায় আজও জন্ম, বর্ণ বা ভাষা লইয়া জাতি গঠিত হয় না; সেখানে একধর্মাবলম্বী হইলেই এক জাতি হয়। সকল খ্রীষ্টান মিলিয়া এক জাতি, সকল মুসলমান মিলিয়া এক জাতি, সকল বৌদ্ধ মিলিয়া এক জাতি, সকল হিন্দু মিলিয়া এক জাতি।'[২৩]

১৮। তদেব, পৃঃ ২৩৮ ১৯। তদেব, পৃঃ ২৪৩
২০। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৪০ ২১। তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২৩
২২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৯ ২৩। তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৩২২

স্বামীজীর এই উক্তি যে কত সত্য তাহা পাকিস্তানের উদ্ভব হইতে বুঝা যায়। ভারতে অবশ্য যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা ধর্মনিরপেক্ষ বা secular।

স্বামী বিবেকানন্দ ঋষিসুলভ দিব্যদৃষ্টি দিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, '...এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে-প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্ম-কর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।'[২৪] তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 'সোস্যালিজম, এনার্কিজম, নাইহিলিজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।'[২৫] রোমাঁ রোলাঁ সিস্টার ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথা (তৎকালে অপ্রকাশিত) হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী ঐ ভগিনীকে বলিয়াছেন যে, পরবর্তী বিপ্লবে যে নবযুগের আবির্ভাব হইবে উহা রাশিয়া বা চীনে উদ্ভূত হইবে।[২৬] ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামক গ্রন্থে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, স্বামীজী ঐ ভবিষ্যদ্বাণী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় তাঁহাদের নিকটও করিয়াছিলেন।[২৭] স্বামীজী একখানি পত্রে নিজেকে সোস্যালিস্ট বলিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিতে ভোলেন নাই যে, তিনি সমাজতন্ত্রবাদকে সম্পূর্ণ দোষহীন মনে করেন না, তবে কিনা কোন রুটি না পাওয়ার চেয়ে আধখানা রুটি ভাল (I am a socialist not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no bread.)। ঐ মন্তব্যকে বিশদ করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, অন্যান্য পদ্ধতি তো চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছে এবং তাহাতে ভাল ফল পাওয়া যায় নাই। এইবার এটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক না কেন—আর কিছুর জন্য না হউক অন্ততঃ উহার নূতনত্বের জন্য।[২৮]

স্বামীজীর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'ভারতের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতায়। তিনি ঐ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেনঃ 'আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন।'[২৯]

স্বামীজী একেবারে পঞ্চাশ বছরের জন্য দেশমাতৃকার পূজার কথা বলিলেন, পুনরায় মাত্র ঐ কয় বছরের জন্য অন্য দেবতাকে ভুলিতে বলিলেন কেন? তাঁহার তৃতীয় নেত্রের সমক্ষে নিশ্চয়ই ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীন ভারতের চিত্র ভাসিয়া উঠিয়াছিল। না হইলে তিনি ত্রিশ চল্লিশ বা ষাট সত্তর বছরের কথা না বলিয়া ঠিক ঠিক পঞ্চাশ বছরের কথা কেন বলিলেন?

২৪। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪১ ২৫। তদেব

২৬। The Life of Vivekananda and the Universal Gospel—Romain Rolland, Advaita Ashrama, Calcutta, 1970, p. 150 f.n.

২৭। স্বামী বিবেকানন্দ—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩০৮ ২৮। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০

২৯। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮-৯৯

ভারত স্বাধীন হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসমন্ত্রের প্রভাব যে ইহার পিছনে অনেকখানি কাজ করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অহিংসনীতির দ্বারা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে কি? স্বামীজী যেন ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির সমস্যা প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ দিতেছেন: 'শত্রুগণকে বীর্যপ্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে। ইহা গৃহস্থের অবশ্য-কর্তব্য। গৃহস্থ ঘরের এককোণে বসিয়া কাঁদিবে না, অপ্রতিকার-বিষয়ক বাজে কথা বলিবে না। গৃহস্থ যদি শত্রুগণের নিকট শৌর্য প্রদর্শন না করে, তাহা হইলে তাহার কর্তব্যের অবহেলা করা হয়।'[৩০] এইকথা স্বামীজী যখন লেখেন তখন আমাদের স্বাধীন ভারতের যৌথপরিবারের অদ্বিতীয় গৃহস্থ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিলেন।

আধুনিক ভারতে যাঁহারা রাষ্ট্রীয় চিন্তার মৌলিকতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন এবং কোন-না-কোন ধর্ম-আন্দোলনের নেতা। রামমোহন, দয়ানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রানাডে, তিলক, অরবিন্দ ও গান্ধী ভারতবর্ষের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতবাসীর ব্যক্তিগত জীবন ও সমষ্টিগত সমাজকে সুগঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এই সামূহিক পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র; সুতরাং উহাকে তাঁহাদের সমগ্র প্রচেষ্টা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে আমরা কেবলমাত্র আংশিক সত্যের সন্ধান পাইব। রামমোহন বেদান্তের ও দয়ানন্দ বৈদিক যুগের মহিমা প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু উভয়েই ভারতের পৌরাণিক যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করিয়াছেন। বিবেকানন্দ পৌরাণিক ভক্তিধর্মের সহিত বেদ-বেদান্তের কর্ম ও জ্ঞান কাণ্ডের সমন্বয়সাধন করিয়া ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। কোন জাতিকে জানিতে ও বুঝিতে হইলে তাহার কোন যুগকেই অগ্রাহ্য করা চলে না। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবন সাধনের জন্য যেরূপ ব্যাপক ও উদার চিন্তাধারার পরিচয় দিয়াছেন সেরূপ অন্যান্য চিন্তানায়কদের মধ্যে বিরল।

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যশিক্ষার যখন ভাল করিয়া বুনিয়াদ পত্তন হয় নাই, সেই সময়ে রামমোহনের পক্ষে এদেশে ইংরাজগণের স্থায়ী ঔপনিবেশিকরূপে বাস ও তাহার ফলে ভারতবাসীদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রসার অপেক্ষা আর অধিক কিছু কামনা করা কঠিন ছিল। স্বামী দয়ানন্দ পাশ্চাত্যবিদ্যার দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবান্বিত হন নাই। তিনি বেদ ও স্মৃতি হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত বিদ্বৎ-আর্যসভা, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের দ্বারা সংগঠিত ধর্মার্যসভা ও আদর্শচরিত্র লোকদের দ্বারা গঠিত রাজার্যসভা পরস্পরকে সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া একদিকে রাজাকে অন্যদিকে প্রজাসাধারণকে সংযত রাখিবে। এই মতবাদ মৌলিক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার দ্বারা গণতান্ত্রিক-শাসন সুরক্ষিত করা কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় রাজকর্মচারীর পক্ষে সাম্যকে শাসনব্যবস্থার ভিত্তি বলিয়া প্রচার করা সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রকে পরায়ত্ত দেখিয়া সমাজের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ

৩০। তদেব, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৬৩

করিয়াছেন। তিনি সামাজিক সংগঠনকে যাবতীয় কল্যাণকর্মের ভার লইতে বলিয়াছেন। পল্লীসংগঠনের দ্বারা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে দয়ানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী অনেকটা একমত। রানাডে কিন্তু রাষ্ট্রের সাহায্যে জনকল্যাণ-সাধন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। হেগেলীয় আদর্শবাদ অনুসরণ করিয়া তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রই তাহার নাগরিকবর্গকে অধিকতর সুখী, মহৎ ও সম্পদশালী করিতে পারে, কেননা সামূহিকভাবে রাষ্ট্রই তাহার শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণের শক্তি, প্রজ্ঞা, দয়া ও দানবৃত্তির প্রতিনিধি। স্বামী বিবেকানন্দও সমষ্টির হিতের জন্য ব্যষ্টির আত্মত্যাগের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি সমষ্টির যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে বলি দিতে রাজী ছিলেন না। তাঁহার মতে 'স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত।' তাঁহার মূল লক্ষ্য হইতেছে ব্যক্তির উন্নতি, এক সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের যন্ত্রের মধ্যে তাহাকে পিষিয়া ফেলা নহে।

স্বামী বিবেকানন্দের মতো শ্রীঅরবিন্দও রাষ্ট্রকে উদ্দেশ্যসাধনের একটি উপায়মাত্র বলিয়া মনে করিতেন। ইঁহারা বা মহাত্মা গান্ধী পশ্চিমের সংসদীয় গণতন্ত্রকে আদর্শস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করেন নাই। জন স্টুয়ার্ট মিল শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচারের কথা বলিয়াছেন, শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, উহার চেয়েও ভয়ঙ্কর হইতেছে গোষ্ঠী ও যূথের উপর আত্মসম্মোহিত জনগণের জবরদস্তি।[৩১] স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সহকারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রত্যেকের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা প্রাচ্যের অথবা পাশ্চাত্যের কোন চিন্তাবীরের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁহার 'বর্তমান ভারত' বেদান্তসূত্রের ন্যায় সংক্ষিপ্ত এবং ভাবগর্ভ। তাহার এক একটি উক্তির টীকা ও ভাষ্য করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক একখানি বই লেখা যায়। একটি উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করি ঃ 'হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে সমাজশরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।'[৩২]

৩১। The Ideal of Human Unity—Sri Aravinda Ghose, British India Press, Madras, 1919, pp. 291-92

৩২। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৫

স্বামী বিবেকানন্দ ও সোস্যালিজম

॥ ১ ॥

বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। অনেকের মতে বিবেকানন্দ ছিলেন 'হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট'। সরকারী মার্কসবাদীরা অর্থাৎ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিকেরা মোটামুটি এই মতেরই সমর্থন করেছেন। বিবেকানন্দের ধর্মমত ও সমাজসংস্কারের কর্মসূচী প্রভৃতি আলোচনা করে এসব তাত্ত্বিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সামগ্রিক বিচারে বিবেকানন্দকে প্রগতিশীল ঐতিহ্যের স্রষ্টা বলা চলে না। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর উপর অনুশীলন করেছেন এমন অন্য অনেকের মতে বিবেকানন্দ 'জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক' ছিলেন। ধর্মকে আশ্রয় করে যদিও বিবেকানন্দ নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন, তবুও একথা অস্বীকার করা চলে না যে, তাঁর বক্তব্যের সারবস্তু প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদেরই অনুকূল। বেসরকারী মার্কসবাদীরা বলেছেন যে, বিবেকানন্দ যে শুধু জাতীয়তার উদ্গাতা তা-ই নয়, ভারতের প্রথম সোস্যালিস্টও বিবেকানন্দ। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদী' দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেকানন্দের সমাজ-বিষয়ক, ধর্ম-বিষয়ক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য মতামতের বিশ্লেষণ করেছেন। ডক্টর দত্তের মতে বিবেকানন্দ 'patriot and prophet', তদুপরি ভারতের প্রথম সোস্যালিস্ট। সরকারী মার্কসবাদীদের সমালোচনা করে ডক্টর দত্ত লিখেছেন ঃ 'Now-a-days, the youngmen imbued with a smattering of Marxism call him a "reactionary". In his life-time the social-reformers of the day called him a reactionary as well ; because he did not advocate that only by giving widows to remarriage or by making some inter-caste marriages and suchlike social reforms India's regeneration would be achieved. ...The desideratum according to him is to raise the masses, to educate them and to elevate them in the scale of advanced humanity.'[১]

॥ ২ ॥

ঐতিহাসিক মহাপুরুষদের ঐতিহাসিক কৃতি এত জটিল এবং তাঁদের চিন্তাভাবনা-কর্ম এত বিচিত্র যে, কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই শেষ কথা বলা শক্ত। হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের উপাদান বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় বিদ্যমান। স্বামীজীর মতো মহৎ প্রাণ অকুতোভয় জাতীয়তাবাদী ভারতীয় রাজনীতিতেও দুর্লভ এবং একথাও সত্য যে

১। Swami Vivekananda : Patriot-Prophet—Bhupendranath Datta, Nababharat Publishers, Calcutta, 1954, pp. 2-3

স্বামীজীই ভারতের প্রথম সচেতন সোস্যালিস্ট।

ব্যক্তিমাত্রেই অনির্বচনীয়। ধরাবাঁধা ছকে ফেলে ব্যক্তিসত্তার স্বরূপকে বোঝা প্রায় অসম্ভব। মহাপুরুষদের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার অনির্বচনীয়তা আরও পূর্ণতা লাভ করে। ফলে ইতিহাস-স্বীকৃত মহাপুরুষদের ভূমিকা বিশ্লেষণে সব সময়ই অতিসরলীকরণের বিপদ থেকে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-আলেখ্য ও কর্মধারা বিচার করলে স্বভাবতই মনে হয় যে, তিনি যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আজ থেকে ষাট বছর আগে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে, মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে বিবেকানন্দের অকাল-তিরোভাব ঘটে। এশিয়ার জাগরণ তখনও ভাল করে আরম্ভ হয়নি। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রবল জোয়ার তখনও এদেশে অনুপস্থিত। এহেন যুগে, যখন ভারতীয় জনসাধারণ ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়নি, মুক্তিসন্ধানী ভারতের প্রকাশ যখন বহুল পরিমাণে অস্ফুট, কেমন করে বিবেকানন্দ ভারতভূমিকে নতুন জীবনবোধে ও চেতনায় উদ্দীপ্ত করে তুললেন? বিবেকানন্দের ভাষণ, পত্রাবলী ও অন্যান্য লেখা পড়লে আজও পাঠকের শিহরণ জাগে, মনে হয় এই অমিতবীর্য গৈরিকধারী আসলে জনগণমন-অধিনায়কই ছিলেন।

আজ থেকে ষাট বছর পিছনে ফিরে বিলীয়মান অতীতের দিকে তাকালে, অবিশ্বাস্য মনে হয় যখন ভেবে দেখি স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের চাইতে দু-বছরের ছোট ছিলেন আর গান্ধীজীর চাইতে ছ-বছরের বড়। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী এ দুজনেই আমাদের জাতীয়জীবনের মহারথী। এই দুই অসাধারণ ব্যক্তি-পুরুষ নানাভাবে আমাদের জাতীয়জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের দীর্ঘ, কর্মবহুল জীবনের ও মননের অভিঘাত আমাদের চিন্তাভাবনা ও কর্মধারায়, মানসে ও অনুভবে মিশে গেছে। এই কিছুদিন আগেও এঁদের সান্নিধ্য আমরা লাভ করেছি, কেননা এঁরা আমাদের যুগেরই মানুষ। স্বামীজী এই দুই মহামনস্বীর সমকালীন হলেও অনেকখানিই ইতিহাসে উপেক্ষিত হয়েই রইলেন। স্বামীজীর স্বল্পপরিসর জীবনের সক্রিয় নেতৃত্বের কাল শুধু পাঁচটি বছর। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করে দেশে ফেরেন। ১৮৯৭ থেকে ১৯০২, এই পাঁচ বছরে স্বামীজী সমকালীন ভারতবর্ষের দিশারি হয়ে উঠলেন, নতুন জ্ঞানকর্মযোগে স্বদেশবাসীকে দীক্ষা দিলেন।

কথাটা ভেবে দেখবার মতো। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কোনও সর্বভারতীয় জাতীয়নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে স্বদেশী আন্দোলন নানাভাবে বাংলার তথা সারা ভারতের চিত্তভূমিকে সরস করে তুলেছিল, সেই আন্দোলনের সূত্রপাতও বিবেকানন্দ-প্রয়াণের কয়েক বছর পরে। অথচ স্বামীজী জাতীয়তার ও স্বদেশপ্রেমের যে-অঙ্কুর বপন করেছিলেন, সেই অঙ্কুর থেকে অগ্নিযুগের মুক্তিসাধনার বিশাল মহীরুহ উদ্গত হয়েছিল। একথা নিশ্চিতরূপে বলা চলে যে, সেই বিশেষ যুগে স্বামীজী ভারতবর্ষে যে চিন্ময়-মূর্তির ধ্যান করেছিলেন, আজও ভারতীয় সামাজিক মুক্তি-সন্ধানীরা অন্যভাবে সেই চিন্ময়-মূর্তির সাধনাই করে চলেছেন। আজকের মুক্তি-সন্ধানীরা যে-সমাজতন্ত্রকে রূপায়িত করতে চান, ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, গৈরিক-পরিহিত স্বামীজীই সেই আদর্শের প্রথম ভারতীয় প্রবক্তা।

বাস্তবিকই বর্তমান ভারতে স্বামীজীর মতো আর কেউই বোধহয় জননেতৃত্বের অনুকূল প্রায় সব গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন না। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে বিবেকানন্দ অপূর্ব মননশীলতার জন্য খ্যাত ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আন্দোলন, অর্থনৈতিক মতবাদ প্রভৃতি সম্পর্কেও স্বামীজীর জিজ্ঞাসা প্রবল ছিল। এইসব আন্দোলনের আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সঙ্গেও তিনি অল্পাধিক পরিচিত ছিলেন। পরিব্রাজক হিসাবে তিনি আসমুদ্রহিমাচল পরিভ্রমণ করেছিলেন, এবং পরিব্রাজকরূপে দরিদ্রের কুটিরে অবস্থান করে, তাঁদের আহার্য গ্রহণ করে, জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলেন। মহৎ হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও স্বামীজীর হিন্দুয়ানি ছিল না। বরং ভারতীয় জীবনপ্রবাহে সব ধর্মেরই বিশিষ্ট অবদানকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতেন। হিন্দুদের কূপমণ্ডুকতা, আচারসর্বস্ব মেকি আধ্যাত্মিকতা, ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি সম্পর্কে এই বৈদান্তিক-সোস্যালিস্টের প্রবল ঘৃণা ছিল এবং সর্বোপরি বিবেকানন্দ ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী, শক্তিশালী লেখক এবং কবি।

ফলে বিবেকানন্দোত্তর যুগে জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছে বিবেকানন্দের আবেদন ছিল অপরিসীম। স্বাধীন, স্বতন্ত্র ভারত—জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, প্রেমে, শৌর্যে মহীয়ান ভারত—জনসাধারণের ভারত, দারিদ্রমুক্ত, মালিন্যহীন এক উদার ভারত—এই ছিল বিবেকানন্দের স্বপ্ন। এই মহা-ভারত হবে প্রজাসাধারণের ; জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এই নতুন ভারতের বনিয়াদ এবং এই ভারতকে ধারণ করবে বেদান্তের জীব-ব্রহ্ম-তত্ত্ব—যে-তত্ত্ব থেকেই মনে হয় বিবেকানন্দ সোস্যালিজমের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

॥ ৩ ॥

আগেই বলেছি স্বামীজী ভারতবর্ষের প্রথম 'সোস্যালিস্ট'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীতে সাম্যবাদের আলোচনা আছে। তৎকালীন সাম্যবাদী সাহিত্যের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল বলে মনে হয়। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনবেদ ছিল স্বতন্ত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সোস্যালিজমের অনিবার্যতায় তাঁর আস্থা ঘোষণা করেননি। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিপ্লবী-আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এসব বিপ্লবী-আন্দোলনের সাহিত্যের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। কথিত হয় যে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর প্রাক্কালে প্রিন্স ক্রপোটকিন ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। যেযুগের কথা আমরা বলছি সেটা বিপ্লবী অভ্যুত্থানের যুগ নয়। এনার্কিজম, নাইহিলিজম, সোস্যালিজম, কমিউনিজম—সেযুগের শৈশব অতিক্রম করে প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। এসব আন্দোলনের তদানীন্তন নেতারা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন ঠিকই, তবে কবে যে বিপ্লব বাস্তবে রূপ নেবে সে-সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দ যখন ঘোষণা করলেন, 'Socialism or some form of rule by the people, ...is coming on

the boards.'[২] এবং 'I am a socialist.'[৩] তখন এই গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর ইতিহাস-চেতনা ও দূরদর্শিতার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, স্বামীজী মার্কসের সূত্র অনুসরণ করে শুধু যে বলেছেন 'দরিদ্র আরও দারিদ্রের পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছে এবং ধনী আরও ধনবান হয়ে উঠছে' তা-ই নয়, তিনি ভবিষ্যৎ-সমাজে শোষিত জনসাধারণের নয়া সংস্কৃতির (Proletocult) কথাও বলেছেন। ডক্টর দত্ত আলোচনা করে আরও প্রতিপন্ন করেছেন যে, স্বামীজী রাশিয়ার জনসাধারণের অভ্যুত্থানের কথা বলে গেছেন এবং অর্ধশতাব্দীরও কিছু পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেনঃ রাশিয়ায় জনসাধারণের শাসন স্থাপিত হবে।[৪] ভারতীয় প্রজাসাধারণের উপর বিত্তবানদের শোষণের তীব্র বিরোধিতা করে স্বামীজী লিখেছিলেনঃ এ শোষণ দানবিক ও পাশবিক।[৫] স্বামীজীর মতে দেশপ্রেমিকের প্রথম কাজ হবে, কোটি কোটি নিরন্ন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসা, তাদের জন্য গভীর বেদনা অনুভব করা। কাজেই আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বামীজীঃ 'কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা থাকিবে।'[৬] আরও বলেছিলেনঃ সামাজিক উন্নয়নের বাণী ছড়িয়ে দাও, সাম্যের বাণী প্রচার কর।[৭]

স্বামীজীর বক্তব্য অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, সবরকম শোষণের তিনি ছিলেন বিরোধী। ধর্মের নামে যে শোষণ অব্যাহত থাকে, দেশপ্রেমের পিছনে যে অলক্ষ্যে শ্রেণী-শোষণ ঘটে, স্বামীজীই বোধহয় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ঐ সত্যকে স্বীকার করেন। স্বামীজী তাই বলেছিলেনঃ 'আমাদের নির্বোধ যুবকগণ ইংরেজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতা লাভের জন্য সভাসমিতি করিয়া থাকে—ইহাতে ইংরেজরা হাসে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে।'[৮]

স্বামীজী শুধু উপরতলার মানুষদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন শোষিত, দীন-দরিদ্র ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। তাঁর মতে 'ভারতের একমাত্র আশার স্থলই ভারতীয় জনসাধারণ;'[৯] কেননা জনসাধারণই সমাজের মূল সঞ্চালক শক্তি, সমাজের অগ্রগতির ধারক ও বাহক।

॥ ৪ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের 'সোস্যালিজম' চিরায়ত ভারতীয় ঐতিহ্যকে স্বীকার করেছিল। ট্র্যাডিশন ও আধুনিকতাকে মেলাবার জন্যই তিনি বেদান্তের পথে সোস্যালিজমে উপনীত হয়েছিলেন। বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, ধর্মসম্প্রদায় প্রভৃতিকে নিয়ে

২। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition (1964), p. 202

৩। ibid., Vol. IV, Eighth Edition (1962), p. 381

৪। Patriot-Propnet, p. xi (Foreword) ৫। ibid., p. xii (Foreword)

৬। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১৩৮

৭। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, p. 15

৮। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪১ ৯। তদেব, পৃঃ ২৭৬

ভারতবর্ষ এক বিচিত্রতায় ভরা মহাদেশ। ইংরেজ-শাসনে এই বিচিত্রতার মধ্যে অনেকখানি শাসন-ঐক্য, শোষণ-ঐক্য এসেছিল। তবুও ভারতীয় সমাজবন্ধনের সূত্র ছিল অন্যত্র। যে-সমন্বয়ী সূত্রের মাধ্যমে ভারত-ঐক্য যুগ যুগ ধরে বেঁচে ছিল, সে-সূত্র হল প্রধানত হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু জীবনবেদ। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ যে বিদেশী শাসনেও অপঘাতমৃত্যু বরণ করেনি তার কারণ বোধহয় এই যে, নৃত্যগীতের মাধ্যমে, অতিকথা ও উপকথার রসাভিষেকে, ভারত-আত্মার বাণী সর্বত্র প্রসারিত হত। শুধু যে উপরতলার জ্ঞানিগুণিজন, পুরোহিত সম্প্রদায় ও অন্যান্য শিক্ষিত বৃত্তিধারী মানুষ ভারতীয় জীবনবেদের শরিক ছিল তা-ই নয়, যুগ যুগ ধরে সাধারণ অশিক্ষিত মানুষও ভারতীয় দর্শনের মূল বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিল। এ পরিচয় ঘটতো সাধুসন্তদের মাধ্যমে, লোকনাট্য, লোকসঙ্গীত, লোকগাথা প্রভৃতির মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে। ফলে দেখা যায় যে, অদ্বৈতবেদান্তের মতো দুরূহ দর্শনপ্রস্থানের সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের কৃষকের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। নানা ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় মানসে মহাপুরুষদের চারিত্র-মাহাত্ম্যও প্রভাব বিস্তার করেছিল। মহাত্মাদের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রভাব গ্রামীণ মানুষ কিংবা শহুরে মানুষ, উভয়কেই যুগ যুগ ধরে আকর্ষণ করেছে। একথার অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীর অন্যদেশের মানুষের তুলনায় সাধারণ ভারতীয়ের আধ্যাত্মিকতা কিংবা নীতিবোধ বেশী প্রবল। ব্যক্তিজীবনে ভারতীয় মানুষটি হয়তো তার প্রতিবেশীর চাইতে বেশী সৎ নয়। কিন্তু যদি প্রশ্ন হয় সঙ্কট মুহূর্তে কোন্ প্রভাব তার উপর বেশী কার্যকরী হবে, তবে যে উত্তর দেওয়া সম্ভব তা হয়তো একেবারে মিথ্যাও নয়। সার্থক সওদাগর, কিংবা অমিতবীর্য সেনাপতি কিংবা কূটবুদ্ধি রাজনীতিকের যে ভারতীয় সমাজে প্রভাব ছিল না এমনটি নয়। তবে শেষ পর্যন্ত সর্বত্যাগী, মহৎ প্রাণ নায়কের কাছেই হয়তো ভারতবাসীর হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার খুলেছে এবং খুলবে। ভারতীয় মানসের এই প্রবণতাকে বড় করে দেখবার যেমন কোন হেতু নেই, তেমনি হিন্দুসমাজের মূল্যবিচারে ঐ প্রবণতাকে ছোট করে দেখাও ভুল। বিবেকানন্দ এ প্রবণতার কথা জানতেন। তাই তিনি সমাজবিপ্লবের তুলনায় আধ্যাত্মিক বিপ্লবের পূর্ববর্তিতা স্বীকার করেছেন।

ভারতীয় মানসকে বুঝতে হলে একথাও স্বীকার করা প্রয়োজন যে, ভারতীয়েরা 'মোক্ষ'কে পরম পুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করেছে। সাবেকী মোক্ষতত্ত্ব অবশ্যই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ভারতীয়েরা মনে করেছে যে,—যে-শক্তির বলে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, ব্যক্তিমানুষও সেই শক্তিরই অংশ। ফলে সৃষ্টির পশ্চাৎপটে যে-সৃষ্টিশক্তি কাজ করে চলেছে সেই শক্তির মানুষও অংশীদার। মানুষ তাই বিদেশ-বিভুঁয়ে নেই, যে জগতে তার স্থিতি, সে জগতে মানুষকে পরবাসীও বলা চলে না। একদিক থেকে মানুষ জগতের সঙ্গে অভিন্ন। ভারতবর্ষের শিক্ষা হল এই যে, প্রগতির কেন্দ্রবিন্দু ব্যক্তিমানুষ এবং প্রগতির লক্ষ্য সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করা। ব্যক্তিমানুষটিকে আজ যেভাবে দেখা যাচ্ছে তার এই রূপ হঠাৎ-আমদানি কোন তত্ত্ব নয়। এই মানুষটির বর্তমান অতীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, আবার তার ভবিষ্যৎও বর্তমানের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিমানুষের আছে মহৎ সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটলে দেখা যাবে যে, মানুষ হয়ে উঠেছে পুরুষোত্তম—বিশ্বলীন সৃষ্টিশক্তির অচ্ছেদ্য অংশ। এর নামই মুক্তি

এবং এই মুক্তিই ব্যক্তিমানুষের অভীষ্ট ও পুরুষার্থ।

ভারতীয় দর্শনে ও ধর্মে এটা স্বীকৃত যে, সব মানুষই শেষ পর্যন্ত মুক্ত হবে। কাজেই সব মানুষই ক্ষমতার (Potentiality) দিক থেকে সমান। বাস্তবে যে অসমানতা লক্ষ্য করা যায়, সে অসমানতার কারণ অতীতের কর্ম। অতীত কর্মফলের প্রভাবে ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের পার্থক্য ঘটে, কেউ উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করে, কেউ বা নিম্নবর্ণে। আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও চিৎপ্রকর্ষগত যে পার্থক্য ও অসমানতা বাস্তবে লক্ষ্য করা যায়, সে সবেরই মূল কারণ অন্তরালবর্তী অতীত। ট্র্যাডিশন্যাল হিন্দুরা যে-যে মূল্যবোধকে গ্রহণ করেছিল, তা বহুলাংশে বর্ণাশ্রমধর্ম-নির্ভর। যার যেমন অবস্থান, তার পক্ষে সেই অবস্থানানুকূল ইষ্টকেই হিন্দুরা শ্রেয়ঃ বলে গ্রহণ করেছে। যোদ্ধা যে, তার কাছে প্রত্যাশিত হল সাহস, কিন্তু ব্রাহ্মণের বেলায় ত্যাগ। এই রকমের বিভিন্ন কর্তব্যাকর্তব্যের কথা হিন্দুরা আলোচনা করেছে। বিবেকানন্দ এই ট্র্যাডিশন্যাল মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিকতাকে মেশাতে চেয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, হিন্দুজীবনবেদে ব্যক্তিসত্তার স্বকীয়তা, মোক্ষ প্রভৃতি স্বীকৃত। বিবেকানন্দ দেখেছিলেন, স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে ঐসব গুরুত্বপূর্ণ মানবিক উপাদানও এর বিপরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আধুনিক ভারতীয় সমাজই এর সাক্ষ্য দেবে। ট্র্যাডিশন্যাল ভারত সহনশীলতাকে অন্যতম গুণ হিসাবে স্বীকার করেছে, কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় সহনশীলতা এদেশে নিষ্ক্রিয়তার রূপ নিয়েছিল। বৈরাগ্য ও অকামও তেমনি এদেশে ঔদাসীন্যে পর্যবসিত হয়েছে। বিবেকানন্দ দেখেছেন যে, প্রেম-মৈত্রীর মহৎ আদর্শ এদেশে অনেক সময় তামসিক ভাবালুতার গলিপথে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এবং জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়-ভারাক্রান্ত সমাজে ব্যক্তিমুক্তির কথা এক নিরুদ্দেশী সমাজবিচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিক প্রহেলিকায় বিলীন হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে অনেক সময় যে এরকমটি ঘটেছিল তার প্রভূত সাক্ষ্য বিদ্যমান। দার্শনিকস্তরে সাম্যের সাধনা করেছেন ভারতীয় দার্শনিক, কিন্তু বাস্তব সামাজিক সাম্যের প্রশ্নে তিনি নীরব। অর্থনৈতিক সাম্যের প্রশ্ন হয়তো সেযুগের অভাবের সমাজে অবান্তরই ছিল এবং হয়তো সেজন্য এ প্রশ্ন অনালোচিতই রয়ে গেছে। তত্ত্বের রাজ্যে ভারতীয়েরা মোক্ষ ছাড়াও ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রভৃতিকে পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছে। তবুও একথাও ঠিক যে 'সুখ' ও 'অর্থ'—এর যে স্বকীয় মূল্য আছে, এ চেতনা ভারতবর্ষে অনেকখানি আধুনিক। হাতে-কলমে কাজ করা, ধনোৎপাদন করা, সমাজহিতে উৎপাদন ব্যবস্থাকে সংহত করা, দেশের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধি হলে গৌরব অনুভব করা—এ সবই নতুন মূল্যবোধের পরিচায়ক। তেমনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক কল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নও ভারতীয় সমাজে অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি, জাতীয়তা, সামাজিক সাম্য—এসব ভাবাদর্শ একদিক থেকে বিদেশী। এই বিদেশী ভাবধারা ভারতীয় চিত্তভূমিকে অধুনা সজীব করে তুলেছে। এবং আজ মনে হয় যে, স্বামী বিবেকানন্দ এই বিদেশী ভাবধারাকে ভারতীয় দর্শনের জারকরসে জারিয়ে আত্মস্থ করবার প্রয়াসই করেছিলেন।

॥ ৫ ॥

'সোস্যালিজম' পদটির নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত, কেননা পদটি বিদেশী এবং এর অনুরূপ পদ ভারতীয় সাহিত্যে প্রচলিত ছিল না। ইংরেজিতে 'ন্যাশনালিজম' বলতে যা বোঝায়, বাংলায় জাতীয়তাবাদ বললে ঠিক সেই অর্থ প্রকাশ পায় না। তেমনি 'সোস্যালিজম' বললে যা বোঝায় আমাদের দেশে বিশ শতকের পূর্বে তার সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ছিল না। 'সোস্যালিজম'-এর ধারণা পাশ্চাত্য থেকে এদেশে আমদানি হয়। বিবেকানন্দের যুগে যে-সোস্যালিজমের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটে সে-সোস্যালিজম মুখ্যত অ-মার্কসবাদী। পরবর্তীকালে, বিশেষত জওহরলাল নেহরুর প্রচেষ্টায় মার্কসীয় সোস্যালিজমের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। অনেক মার্কসবাদী সোস্যালিস্ট দাবি করেন যে মার্কসবাদই একমাত্র সোস্যালিজম। এই প্রসঙ্গে অন্যতম মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি: 'It is necessary to remember that the socialism that is worth the name is the socialism of Marx and Engels, and of their incomparable disciple Lenin.'

'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে স্বয়ং মার্কস নানা ধরনের সোস্যালিজমকে প্রতিক্রিয়াশীল 'সোস্যালিজম' বলে বাতিল করেছিলেন। তখনকার ইউরোপে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদকে কোনটা 'ফিউড্যালিস্টিক সোস্যালিজম', কোনটা 'পেটি-বুর্জোয়া সোস্যালিজম', কোনটা বা 'ক্রিটিক্যাল-ইউটোপিয়ান সোস্যালিজম', এমনি 'নেতি নেতি' করে অগ্রসর হয়ে, স্বকীয় সোস্যালিজমকেই মার্কস এক, অদ্বিতীয়, 'বৈজ্ঞানিক সোস্যালিজম' নাম দিয়েছিলেন। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও তাই তাঁর আলোচনার শিরোনামা দিয়েছেন 'Socialism is Marxism'—অর্থাৎ 'সোস্যালিজম মানেই মার্কসবাদ', অন্য সবই মেকি সোস্যালিজম।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: 'আমি সোস্যালিস্ট।' কোন্ সম্প্রদায়ের সোস্যালিস্ট ছিলেন স্বামীজী? যদি হীরেন্দ্রবাবুর মতো বলা যায় যে, মার্কসবাদই একমাত্র সোস্যালিজম এবং যদি দেখানো যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ মার্কসীয় সম্প্রদায়ের সোস্যালিস্ট ছিলেন না, তাহলে সিদ্ধান্ত করা চলে: স্বামীজী আসলে সোস্যালিস্ট ছিলেন না। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কথাটা তুলেছিলেন: 'In making an analysis of his (Swamiji's) sayings, a Marxist may say that his "Socialism" does not tally with that of Lenin, and may fall short of the socialist ideal of the West ; his was more of the reformistic school. Yet one must not forget that during the time when Swamiji penned these epistles, Socialism did not take a revolutionary attitude.'[১০]

সোস্যালিজমের ভাবাদর্শ মার্কসবাদের একচেটিয়া সম্পত্তি—এ ধরনের মনোভাব

১০। Patriot-Prophet, p. x (Foreword)

মার্কসবাদী সোস্যালিস্টদের মধ্যে বরাবরই আছে। রুশবিপ্লবের সাফল্যের পর সোস্যালিজমের রূপ ও অভিব্যক্তি, গতিপ্রকৃতির একমাত্র ভাষ্যকার হিসাবে রাশিয়ার আবির্ভাব ঘটে এবং বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী দলের প্রচারের ফলে মার্কসীয় সোস্যালিজমই (রুশ ভাষ্যসমেত) একমাত্র নির্ভেজাল সোস্যালিজম বলে বন্দিত হতে থাকে। অধুনা চীনা সাম্যবাদী দলের দৌলতে মার্কসবাদী সোস্যালিজমেরও দ্বৈতরূপ প্রকট হচ্ছে এবং এই অবস্থায় সোস্যালিজমের গতিপ্রকৃতি নিয়ে নতুন করে অনুশীলন চলছে।

সোস্যালিজমের মূল প্রেরণা কি? সোস্যালিস্ট আদর্শের সর্বজনীন মানবিক আবেদন ঠিক কোন্‌খানে? রুশ সোস্যালিস্ট সমাজের ইতিহাস থেকে সোস্যালিস্ট মতবাদ ও কর্মধারার যে বিকৃতি প্রত্যক্ষ হয়েছে এবং চীনের আসুরিক সমাজতন্ত্রের নগ্নরূপ সম্প্রতি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষমাত্রেরই সোস্যালিজম সম্পর্কে নতুন জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে। এই জিজ্ঞাসা ও সংশয় সত্যপ্রাপ্তির পথ বলেই আমরা মনে করি। এবং ঠিক সেইজন্য সোস্যালিস্ট কূপমণ্ডুকতা ও ধর্মান্ধতাকে আমরা পরিহার করতে চাই। যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানবিক সৌভ্রাত্রে অনুপ্রাণিত, শোষণহীন যে-সমাজের কল্পনা সোস্যালিস্ট চিন্তানায়কেরা করেছিলেন, মানবমুক্তিই ছিল তার প্রধান কথা। বিবেকানন্দও মানবমুক্তির প্রশ্নেই সোস্যালিস্ট হয়েছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধের সেটাই আলোচ্য।

সব দেশের অফিসিয়াল মার্কসবাদীরা লেনিন-ব্যাখ্যাত সোস্যালিজমকে বেদবাক্য হিসাবে গ্রহণ করে, অন্ধ গোঁড়ামি নিয়ে সোস্যালিজমের এক ধরাবাঁধা কাঠামো রচনা করতে চেয়েছেন।

তাঁদের মতে সাচ্চা সোস্যালিস্ট হতে হলে কতকগুলি মূল প্রত্যয় মেনে নেওয়া প্রয়োজন, এবং যাঁরা এইসব প্রত্যয়কে পরিবর্তিত করতে চান, তাঁরা সবাই শোধনবাদী (Revisionist)—সোস্যালিস্ট নন।

অফিসিয়াল মার্কসীয় সোস্যালিস্টরা যে প্রত্যয়গুলির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন সেগুলি নিম্নরূপঃ

১। সোস্যালিস্ট হতে হলে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মেনে নিতে হবে।

২। শ্রেণীসঙ্ঘাত মানলেই শুধু হবে না, 'ডিকটেটরশিপ অব দি প্রলেটারিয়েট' তত্ত্বও মেনে নিতে হবে।

৩। সোস্যালিস্ট হতে হলে মার্কসের ক্রমবর্ধমান দুঃস্থতার তত্ত্ব (Pauperization of the proletariat) মেনে নিতে হবে; স্বীকার করতে হবে যে, পুঁজিবাদের সঙ্গে সঙ্কটের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সঙ্কটবিহীন পুঁজিবাদ যে সম্ভব নয়, ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের আবর্তে পড়ে পুঁজিবাদ যে অনিবার্যভাবে ধ্বংসের পথ নেবে, এ তত্ত্বজ্ঞান ও বিশ্বাস না থাকলে সোস্যালিস্ট হওয়া সম্ভব নয়।

৪। সোস্যালিস্ট—বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেবেন না, কেননা তাঁর কাম্য 'প্রলেটরীয় গণতন্ত্র', যেটা কিনা প্রকৃত, 'অধিকাংশের গণতন্ত্র'।

৫। সোস্যালিস্ট যিনি, তাঁর পক্ষে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, দর্শনে নিরপেক্ষ

হওয়া সম্ভব নয়। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষভুক্ত হয়ে সাহিত্যে দর্শনে ও অন্যত্র, 'সোস্যালিস্ট পার্টিজানসিপ নীতি'কে ধরতে হবে।

৬। সাচ্চা সোস্যালিস্ট স্বীকার করবেন যে, সোস্যালিজমের আবির্ভাব সংস্কারের পথে সম্ভব নয়। সোস্যালিজমের জন্য চাই বিপ্লব—প্রয়োজন হলে সশস্ত্র রক্তাক্ত বিপ্লব এবং এ বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে সর্বহারা শ্রেণী, অন্য কোন শ্রেণী নয়।

৭। সাচ্চা সোস্যালিস্ট 'জাতীয় সোস্যালিজমে'র দাবিদার হতে পারেন না। দেশপ্রেমের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতা, স্বদেশের স্বার্থের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বার্থ যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একথা স্মরণ রেখে জঙ্গী জাতীয়তাবাদ ও কাল্পনিক আন্তর্জাতিকতা, এ দুই বিপদকে পরিহার করে সোস্যালিস্টকে পথ করে নিতে হবে।

এসব প্রত্যয় আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অফিসিয়াল সোস্যালিস্টরা সোস্যালিস্ট সমাজের রূপরেখা অঙ্কনের চাইতে অথবা সোস্যালিস্ট সমাজের মূল ও অভীষ্ট নির্ণয়ের প্রচেষ্টার চাইতে সোস্যালিস্ট সমাজ গড়বার পদ্ধতির উপরই বেশী জোর দিয়েছেন। অথচ সোস্যালিস্ট ধর্মান্ধতার ও অমানবিকতার পিচ্ছিল পথ পরিহার করতে হলে আজ আমাদের কর্তব্য হল সোস্যালিস্টদের সাধারণ বিশ্বাসের উপর জোর দেওয়া, মৌলিক সোস্যালিস্ট উদ্দেশ্য খুঁজে বার করা।

নানা মতবাদের সঙ্ঘাতের মধ্যে সোস্যালিস্ট মতবাদের সাধারণ সূত্র হল কতকগুলি মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষা, সম্প্রতি যে মূল্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি অনেকেই নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করছেন।

সোস্যালিস্ট মূল্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যেসব উপাদান মিশে আছে তার মধ্যে প্রধান হল ঃ

(ক) দুঃস্থ নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি আত্যন্তিক সহানুভূতি। পুঁজিবাদী সমাজে, অন্তত উনিশ শতক পর্যন্ত, অধিকাংশ সাধারণ মানুষের দারিদ্র ও দুঃস্থতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই মনুষ্যকৃত দুঃস্থতার বিরুদ্ধে, জনসাধারণের সঙ্গে আত্মীয়তার যোগে কাছাকাছি এসে দাঁড়ানোই সোস্যালিজমের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

(খ) ফলে সদর্থকভাবে, সোস্যালিস্টরা সমাজকল্যাণের দাবি তুলেছিলেন। যারা নির্বিত্ত, যারা শোষিত, যে-কোন কারণেই হোক না কেন—যারা দুর্ভাগা, তাদের সম্পর্কে সমাজকে অবহিত হতে হবে, এ দাবিও তাই সোস্যালিস্ট দাবির অন্যতম।

(গ) তাছাড়া, সোস্যালিস্টরা ছিলেন সাম্যের সন্ধানী। ফলে তাঁরা মনে করেছেন যে, 'শ্রেণীসমাজ' আদর্শ সমাজ নয়। এ সমাজে বিত্তবান-বিত্তহীন, মালিক ও শ্রমিক প্রভৃতির সঙ্ঘাত আছে এবং এ সমাজ জনসাধারণকে তাদের সামাজিক প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। সোস্যালিস্টরা তাই দাবি করেছেন যে, শ্রমজীবী মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার দিতে হবে, কর্মক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বপূর্ণ মর্যাদার আসনে বসাতে হবে।

এছাড়াও সোস্যালিস্টরা প্রতিযোগিতানির্ভর, সঙ্ঘাতমুখর বিরোধকে বরাবরই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা চেয়েছেন এক সৌভ্রাত্রমূলক, সহযোগিতানির্ভর, আদর্শ শোভন সমাজ।

(ঘ) সোস্যালিস্টরা পুঁজিবাদের সঙ্কট সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। অর্থনীতির দিক

থেকে বিচার করে তাঁরা মনে করেছেন যে, পুঁজিবাদে কর্মদক্ষতা অল্প। এ অবস্থায় জনজীবনে বিবিধ সঙ্কট দেখা দেয় এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্লীন প্রবণতার দৌলতে সাধারণ মানুষ বেকারির সঙ্কটে হাবুডুবু খায়।

অর্থাৎ সোস্যালিস্টরা একদিকে যেমন পুঁজিবাদের বাস্তব ফলাফলের কঠোর সমালোচক, অন্যদিকে তেমনি তাঁরা ন্যায়ানুমোদিত, সহযোগিতানির্ভর শ্রেণীহীন সমাজের প্রবক্তা। অধ্যাপক কোল সত্যিই বলেছিলেন যে, সোস্যালিজমের মূল চরিত্রই হল—A broad human movement on behalf of the bottom dog. এই প্রসঙ্গে আরও দু-একটি বক্তব্য রাখা যেতে পারে। সোস্যালিজমের সামাজিক ও অর্থনীতিক আকৃতির কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে এ আকৃতিরও পশ্চাৎপটে, সোস্যালিস্টরা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সোস্যালিস্ট আদি-গুরুদের কাছে 'গণতন্ত্রবিহীন সোস্যালিজম' অসম্ভব বলেই প্রতিভাত হত। যে রাজনৈতিক সামাজিক কাঠামোয় ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বকীয় মূল্য অস্বীকৃত, সেই ব্যবস্থাকে তাঁরা 'সোস্যালিজম' হিসাবে স্বীকার করতেন কিনা সন্দেহ।

পূর্বেকার আলোচনা থেকে এ-সিদ্ধান্ত করা চলে যে, স্বামী বিবেকানন্দ সোস্যালিস্ট—কেননা তিনি A broad human movement for the bottom dog-এর সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। সোস্যালিস্ট-চেতনার যেসব লক্ষণ আলোচিত হয়েছে, স্বামীজীর চিন্তাভাবনায় ও কর্মপ্রচেষ্টায় সে সব লক্ষণই উপস্থিত ছিল। তবে একথাও স্বীকার্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ মার্কসীয়-লেনিনবাদী অর্থে 'সোস্যালিস্ট' ছিলেন না।

॥ ৬ ॥

প্রশ্ন হবে—স্বামীজী সরাসরি ধর্মকে 'opium of the people'—'জনসাধারণের আফিম' বলেননি, 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে' তিনি গ্রহণ করেননি, স্বামীজী ছিলেন ব্যবহারিক বৈদান্তিক—তবে কোন্ দার্শনিক সোপান বেয়ে, স্বামীজী সোস্যালিজমে উপনীত হলেন? সরকারী মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে' মেনে না নিলে 'সোস্যালিজম'কে গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু বর্তমান লেখকের অভিমত এই যে, স্বয়ং মার্কসের চিন্তাভাবনার বিশ্লেষণ করেও এ-সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা শক্ত। মার্কস দার্শনিকভাবে সোস্যালিজমে উপনীত হয়েছিলেন 'আত্মচ্যুতি'-তত্ত্বের পথ বেয়ে (doctrine of self-alienation or self-estrangement)। পাশ্চাত্যে এ তত্ত্বটির প্রতিপাদক হেগেল, অবশ্য হেগেলীয় ব্রহ্মবাদের পটভূমিতে। হেগেলের 'আত্মচ্যুতি ও আত্ম-আবিষ্কারে'র তত্ত্বকে (self-alienation and self-discovery) আশ্রয় করে ফয়েরবাখ যে মানবিক ধর্মে (anthropological religion) উপনীত হন, তার সারমর্ম হল—মানুষই ঈশ্বর। ফয়েরবাখের মনুষ্যকেন্দ্রিক ধর্মের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে মার্কস যে-দাবিটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন সেটি হল এই যে, মানুষকে ঈশ্বর করতে হবে এবং সেজন্যে সমাজরূপান্তরই একমাত্র পন্থা, অন্য পথ আর নেই। মানুষ আত্মচ্যুত কেন? মার্কস বলেছেন যে, পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে মানুষ বিচ্যুত হয়েছে, অন্যদিকে

উৎপন্ন দ্রব্য থেকেও মানুষ বিচ্যুত। মানুষের আত্ম-আবিষ্কারের পথ তাই একটিই। যে ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে মানুষের আত্মচ্যুতি ঘটে, সেই মালিকানা-পদ্ধতির নিষেধ করতে হবে। তবেই মানুষের মুক্তি। মার্কসের যুক্তিধারায় অবশ্যই একদেশদর্শিতা ছিল। আত্মচ্যুতির উৎস হিসাবে শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথাটাই তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল। তিনি এ-ও মনে করেছিলেন যে, উৎপাদন-উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার নিষেধ হলে মানুষ তার স্বরূপ ফিরে পাবে। আত্মচ্যুতির রহস্য আবিষ্কার প্রসঙ্গেই, মার্কসকে অর্থনীতির আলোচনায় তথা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণে মনোযোগ দিতে হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 'আত্মচ্যুতি' কিভাবে নতুন ধরনের শোষণের রূপ নেয়, 'ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থে মার্কস সেই রহস্যেরই আলোচনা করেন। ফলে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষের আত্ম-আবিষ্কারের জন্যেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিরাকরণ চাই, অর্থাৎ সোস্যালিজম চাই। মার্কসীয় সোস্যালিজমের দার্শনিক-বুনিয়াদ যে আত্মচ্যুতি ও আত্ম-আবিষ্কার তত্ত্ব, পাশ্চাত্য সমসাময়িক অনেক দার্শনিক এ দাবি করেছেন। In short human self-alienation and the overcoming of it remained always the supreme concern of Marx and the central theme of his thought.

॥ ৭ ॥

মার্কসীয় সোস্যালিজমের অন্যতম উত্তরাধিকার হিসাবে ক্লাসিকাল জার্মান দর্শন স্বীকৃত। ক্লাসিকাল জার্মান বিজ্ঞানবাদের (Idealism) ঐতিহ্যকেই সাম্যবাদ প্রসারিত করে দেবে এ দাবি স্বয়ং মার্কস এঙ্গেলসও করেছেন। '...the Germans are a philosophical nation, and will not, cannot abandon Communism, as soon as it is founded upon sound philosophical principles ; chiefly if it is derived as an unavoidable conclusion from their own philosophy. And this is the part we have to perform now. Our party has to prove that either all the philosophical efforts of the German nation, from Kant to Hegel, have been useless—worse than useless ; or, that they must end in Communism...'[১১]

অর্থাৎ জার্মান বিজ্ঞানবাদের পরিণত ফল হল কমিউনিজম—সাম্যবাদ। জার্মান বিজ্ঞানবাদের যদি কোনও মূল্য থাকে তবে সাম্যবাদেই সেই মূল্যের অভিব্যক্তি। জার্মান সাবেকী বিজ্ঞানবাদের আবিষ্কার কি ছিল? সেই আবিষ্কার এই যে, ঈশ্বর ও জীব দ্বৈততত্ত্ব নয়, আসলে জীবই ঈশ্বর। হেগেল-দর্শনে এই তত্ত্বটি বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয় এবং আত্মসচেতন মানবীয় চৈতন্যকে হেগেল দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। জার্মান নব্য-হেগেলপন্থী ব্রুনো বাউয়ার ও অন্যান্য অনেকে দাবি করেছেন যে, হেগেল

১১। Philosophy and Myth in Karl Marx—Robert Tucker, Cambridge University Press, 1961, pp. 26-7

নাস্তিক ও খ্রীষ্টধর্মবিরোধী ছিলেন। নব্য-হেগেলপন্থীরা ধর্মের যে সমালোচনা করেছেন, একদিক থেকে সে সমালোচনা হেগেলের দার্শনিক আত্মতত্ত্বেরই নৈয়ায়িক ফলশ্রুতি ছিল। মার্কস আরও অগ্রসর হয়ে প্রতিপন্ন করেন যে, মানুষের পক্ষে দিব্যজীবনলাভ সম্ভব, মানুষ দেবতা হয়ে উঠবে অনুকূল পরিবেশে। সেই অনুকূল পরিবেশ হল পুনর্বিন্যস্ত শোষণহীন সমাজ। 'As Engels put it, German philosophy's discovery that "God is man" called for a rearrangement of the world that would make it possible for man to experience himself in it as a godlike being.'[১২]

সোস্যালিজম ও কমিউনিজমের নিকট-সংস্পর্শে আসবার পূর্বে মার্কসও নব্য-হেগেলপন্থীদের 'Realization of philosophy'—'দর্শনকে বাস্তব রূপ দাও'—এই দাবিটির তাৎপর্য বিস্তারিত করেছিলেন। মার্কস দেখেছিলেন যে, জগতেরও দ্বৈতসত্তা বিদ্যমান। একদিকে রয়েছে হেগেল-দর্শনের সর্বার্থসাধক সমন্বয়ী মননের জগৎ, অন্যদিকে দর্শনবর্জিত লৌকিক জগৎ। এই দর্শনবর্জিত লৌকিক জগতের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করতে হবে। তবেই দর্শনের মুক্তি—'Realization of philosophy.'

'In its original form, the Marxian revolutionary imperative was a demand to "make the world philosophical". It expressed a sweeping indictment and rejection of earthly reality on the ground of its "unphilosophical condition".'[১৩]

ফয়েরবাখের কাছ থেকে মার্কস আত্মচ্যুতি-তত্ত্বের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হন। এই পরিচয়ের ফল হিসাবে মার্কস বলেন যে, লৌকিক, মানবীয় জগৎকে দার্শনিকতায় মণ্ডিত করতে হলে, দর্শনকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে হলে, আত্মচ্যুতিকে পরিহার করতে হবে। আত্মচ্যুতি পরিহার এবং আত্ম-আবিষ্কার, এই দুই হেগেলীয়—তথা ফয়েরবাখীয় তত্ত্বের পথ বেয়ে, মার্কস ইতিহাসের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করবার প্রয়াস পেলেন। মার্কস বললেন, মানুষের চরম লক্ষ্য মানবীয় হয়ে ওঠা, সব রকমের আত্মচ্যুতি পরিহার করে মানবধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আত্মচ্যুতি যে শুধু ধর্মের কল্পলোকের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তা-ই নয়, মানবীয় আত্মচ্যুতি ঘটে সমাজের 'নানা বাধাবিপত্তির ফলে রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের মাধ্যমে।' কাজেই মার্কস লিখছেন ঃ 'The demand to renounce illusions about one's situations is a demand to renounce a situation that required illusions.' মার্কসের তাই দাবি—অস্তিত্বের পরিবেশকে আমূল পরিবর্তিত করতে হবে। তবেই মানুষ আত্মস্বরূপ আবিষ্কার করে সার্থক হয়ে উঠবে। এই যে ভ্রমপ্রসবিনী পরিস্থিতিকে পরিহার করবার আহ্বান—demand to renounce a situation that required illusions—এই আহ্বানের তাৎপর্য এই যে, সব তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান হবে প্রয়োগের মাধ্যমে, কর্মের রথচক্র বেয়ে। 'জার্মান ইডিওলজি'তে মার্কস তাই বলেছিলেন ঃ 'All social life is essentially *practical.* All the mysteries which

১২। ibid., p. 77 ১৩। ibid., p. 79

urge theory into mysticism find their rational solution in human practice and in the comprehension of this practice.'[১৪]

ফয়েরবাখ ধর্মজীবনের উপর আলোচনা নিবদ্ধ রেখে বলেছিলেন, আধ্যাত্মিক জীবনে মানুষের আত্মচ্যুতির স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। মার্কস আত্মচ্যুতির পরিসরকে শুধু আধ্যাত্মিক জীবনে সীমাবদ্ধ না করে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, সমাজজীবনে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। 'Now that the *holy form* of human self-alienation has been exposed, the next task for a philosophy in the service of history is to expose self-alienation in its *unholy forms.* The criticism of heaven thus turns into the criticism of earth, the *criticism* of religion into the *criticism of law,* the *criticism of theology* into the *criticism of politics.*'[১৫]

মানুষের মুক্তির জন্য তাই সব রকমের বন্ধন (alienation) ঘোচাতে হবে। সে বন্ধন ধর্মাশ্রিত; আইনের ক্ষেত্রে, নীতির রাজ্যে, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে সর্বত্র, এই বন্ধনের পরিচয়। মানুষের বন্ধনমুক্তির জন্য প্রয়োজন সমাজের আমূল রূপান্তর—সমাজবিপ্লব। সমাজরূপান্তরের কর্মকাণ্ডকে মার্কস নাম দিয়েছেন 'Praxis'—প্রয়োগ। এই প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাধিকারপ্রাপ্ত মুক্ত মানুষের আবির্ভাব, সোস্যালিস্ট সমাজের অভ্যুদয়।

এই দীর্ঘ আলোচনার হেতু এই যে, অনেকটা একইভাবে ক্লাসিকাল হিন্দু বিজ্ঞানবাদ (বেদান্ত) থেকে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পৌঁছেছেন। অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্ত কি? ব্রহ্ম (অথবা ঈশ্বর) ও জীব দ্বৈততত্ত্ব নয়, আসলে 'জীবই ব্রহ্ম'। 'জীব ও ব্রহ্ম এক', এই তত্ত্বে উপনীত হয়ে বেদান্তদর্শন ধর্মের ঈশ্বরতত্ত্ব—ধর্মের দ্বৈতবাদ বাতিল করেছেন। ধর্মশাস্ত্র বলে জীব সসীম, ঈশ্বর অসীম, জীব অংশ, ঈশ্বর অংশী, জীব যন্ত্রমাত্র, ঈশ্বর হলেন যন্ত্রী। বেদান্ত ধর্মশাস্ত্রের বক্তব্যকে খণ্ডন করে বললেন, জীবাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন, 'জীবই ব্রহ্ম'। শঙ্করদর্শনে তো ঈশ্বরকে পারমার্থিক তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করাই হয়নি। ঈশ্বর ব্যবহারিক স্তরেব তত্ত্ব, নিম্নতর স্তরের কথা। পারমার্থিক স্তরে একমাত্র ব্রহ্মাই সৎ এবং জীবই ব্রহ্ম। ঈশ্বরবাদীরা তাই শঙ্করের বেদান্তের একান্ত বিরোধী। কেননা 'জীবই ব্রহ্ম' এই সত্য প্রচার করে শঙ্কর বহুলাংশে ধর্মকে দুর্বলই করেছিলেন।

জীব-ব্রহ্ম-তত্ত্ব স্বামী বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী বললেন, চিৎশক্তিতে, জ্ঞানবলক্রিয়ায়, আনন্দাস্বাদে, মুক্তিস্বরূপতায় জীবাত্মা তুচ্ছ নয়, ক্ষণভঙ্গুর নয়, অনুকম্পার বিষয় নয়, জীব অসীম—জীব ব্রহ্ম। 'You are free, free, free! Oh blessed am I! Freedom am I! I am Infinite! In my soul I can find no beginning and no end. All is my Self!'

১৪। The German Ideology—Karl Marx and Friedrich Engels, Lawrence and Wishart Ltd., London, 1938, p. 199

১৫। Philosophy and Myth in Karl Marx, p. 102

'In its essence, it is free, unbounded, holy pure and perfect.'

'No books, no scriptures, no science can ever imagine the glory of the Self that appears as man, the most glorious God that ever was, the only God that ever existed, exists, or ever will exist.'[১৬]

'...man, after this vain search after various gods outside himself, completes the circle, and comes back to the point from which he started—the human soul, and he finds that the God whom he was searching in hill and dale, whom he was seeking in every brook, in every temple, in churches and heavens, that God whom he was even imagining as sitting in heaven and ruling the world, is his own Self. I am He, and He is I. None but I was God, and this little I never existed.'[১৭]

জীব অসীম, জীবই ব্রহ্ম। তার আনন্দের, জ্ঞানের, সৃষ্টির, কর্মের কোনও সীমা নেই। পারমার্থিক দিক থেকে এ সবই সত্য। কিন্তু ব্যবহারিক বাধাবিপত্তির জন্য এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি। '...each man is the Infinite already, only these bars and bolts and different circumstances shut him in ; but as soon as they are removed, he rushes out and expresses himself.'[১৮]

বিবেকানন্দ আত্মচ্যুতি সমস্যাটি বুঝেছিলেন। বেদান্তের কথা হল ঃ জীব ব্রহ্ম ঠিকই, তবে অজ্ঞানের প্রভাবে জীব নিজেকে মনে করে সসীম, তুচ্ছ, রোগশোক-ভারাক্রান্ত ইত্যাদি। বিবেকানন্দ বলছেন, প্রত্যেক জীবসত্তাই অনাদি, অসীম, জীবই ব্রহ্ম। তবে নানা রকমের প্রতিকূলতার ফলে জীব জানে না যে, সে-ই ব্রহ্ম। এইসব প্রতিকূল পরিবেশ ঘোচাও, দেখবে জীবের বিপুল সম্ভাবনার দ্যুতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, কারাবন্ধন ভেঙে জীব দিকে দিকে নিজেকে প্রকাশ করবে।

বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষের পিছিয়ে-পড়া সমাজ, অনুন্নত অর্থনীতি, জাতিসম্প্রদায়ের সঙ্ঘাত-মুখর অসম-সমাজ জীবকে জীবত্বে, সসীমত্বে আবদ্ধ রেখেছে। ধর্মের নামে আচারসর্বস্ব গোঁড়ামি, উচ্চবর্ণের শোষণ, মূল্যবিভ্রাট, সব মিলিয়ে জীব যে ব্রহ্ম এ-সত্য স্বপ্রকাশ হয়ে ওঠেনি। এই সত্য প্রকাশের জন্য, জীবের আত্ম-আবিষ্কারের জন্য সমাজের নবজন্ম প্রয়োজন। লৌকিক জগৎকে বেদান্তদর্শনের আলোকে উদ্ভাসিত করতে হলে, সমাজের পুনর্বিন্যাস চাই। Realization of Vedantic philosophy—বেদান্তদর্শনের চরিতার্থতা চাই—এটিই বিবেকানন্দের দাবি। 'The abstract Advaita must become living—poetic—in everyday life....'[১৯]

বিবেকানন্দের কৃতিত্ব এই যে, তিনি ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বেদান্তদর্শনের একটি মূল সূত্রকে নতুন অবস্থা ও নতুন চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন। বিদেশে তিনি সোস্যালিজম, এ্যানার্কিজম প্রভৃতি চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত

১৬। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. II, Tenth Edition (1963), p. 250

১৭। ibid., pp. 250-51 ১৮। ibid., Vol. V, p. 298 ১৯। ibid., p. 104

হন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার গণতন্ত্রের দোষগুণ সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। বিভিন্ন বিদ্যায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। বিবেকানন্দের মনস্বিতার প্রভাবে ভারতের প্রাচীন চিন্তাধারা নতুনের সংস্পর্শে এল। এবং তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন যে, জনসাধারণই ইতিহাসের মহানায়ক।

যুবক মার্কসের কার্যকলাপের পর্যালোচনা করে অধ্যাপক প্যাসকাল লিখেছেন: 'It is his ideal of human emancipation, of "humanism", that inspires him. He hatés the fetters that pervert the practical and spiritual life of men and drives steadily forward to a definition of the barrier that lie in the way of the achievement of "human society or social humanity"—Socialism, this passionate belief in the dignity of man was his abiding inspiration of work.'

বিবেকানন্দও মানবমুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। মানবিকতাই বিবেকানন্দ-দর্শনের কেন্দ্রীয় ভাববস্তু। মানুষের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের শৃঙ্খলকে বিবেকানন্দও ঘৃণা করেছেন। 'কি সেই শৃঙ্খল', এই প্রশ্ন নিয়ে বিবেকানন্দ ভেবেছেন। বিবেকানন্দও শৃঙ্খলমুক্ত 'সামাজিক মানবতা' তথা সোস্যালিজমের আদর্শ উপস্থাপিত করেছেন। বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয় করতে হবে, সমষ্টি-মুক্তি ও ব্যক্তি-মুক্তির মধ্যে সেতুবন্ধন একান্তই প্রয়োজন। এই মুক্তির জন্য দারিদ্র, অজ্ঞান, লোকাচার, কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম প্রয়োজন। ধর্মমোহ, মেকি আধ্যাত্মিকতা, অন্ধ গোঁড়ামি, শ্রেণীশোষণ—এসবের নিরসন না হলে মানুষের ভাস্বর মূর্তি যে প্রকাশিত হবে না, বেদান্তদর্শনের সার্থকতা দেখা যাবে না, বিবেকানন্দ এ বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন। ভারতীয় মানুষের তামসিক জীবনের মোহাবরণ উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন বিবেকানন্দ জাতীয়তা ও সমাজতন্ত্রের পথে। যে পরবশ্যতা ও শোষণ জীবকে তামসিকতায় আচ্ছন্ন রেখেছে, সেই তামসিক উদ্ভিদী জীবন পরিহার করে সত্ত্বের প্রকাশধর্মের ও রাজসিক সামাজিক কর্মের আবাহন করেছেন বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ যে-ভারতের চিন্ময়মূর্তি ধ্যাননেত্রে দেখেছিলেন, সে-ভারতে—কি আর্থিক ব্যবস্থায়, কি রাজনীতিতে, কি শিক্ষাসংস্কৃতির ভোজে জনসাধারণের (people) অবাধ অধিকার। বিবেকানন্দ আশ্চর্য দূরদৃষ্টির সাহায্যে বুঝেছিলেন যে, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি শুধু উপরতলার মানুষের জন্য নয়, এ সমস্তই জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং জনসাধারণের প্রয়োজনানুকূল হলে তবেই এদের সার্থকতা।

বিবেকানন্দ যে-মানুষের বন্দনা করেছেন সে মানুষ বন্ধনমুক্ত—জ্ঞানে, কর্মে, হৃদয়বৃত্তিতে মহীয়ান মানুষ। বন্ধনমুক্ত মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতায় গড়ে-ওঠা নতুন সমাজ—দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে ভাস্বর, সাত্ত্বিক ও রাজসিক উপাদানে গঠিত নতুন ভারতীয় সমাজ—এই সমাজের অভ্যুদয়ই বিবেকানন্দ কামনা করেছেন। এ সমাজে বেদান্তের আধ্যাত্মিকতা ও ইসলামের শক্তির সমন্বয় হবে। এ সমাজে জনসাধারণই হবে ইতিহাসের নায়ক। এ সমাজ বস্তুবাদী সভ্যতার উপকরণ-প্রাচুর্যকে

অবহেলা করবার মূঢ়তা পরিহার করবে, বস্তুবাদী সভ্যতাকে সমষ্টিমুক্তি তথা ব্যক্তিমুক্তির উপায় হিসাবে নিয়োগ করবে। 'We talk foolishly against material civilization. The grapes are sour.... Material civilization, nay, even luxury, is necessary to create work for the poor. Bread ! Bread ! I do not believe in a God who cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven !'[২০]

ভারতের নবজন্ম কোন্ পথে হবে? বিবেকানন্দ বলছেন, এ নবজন্মের পথ সরলরেখার মতো নয়। একদিকে আধ্যাত্মিক প্রহেলিকায় পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা, অন্যদিকে বস্তুপুঞ্জের দাসত্বের সম্ভাবনা। এই দুই সম্ভাবনার কথা মনে রেখে ভারতকে পথ তৈরী করতে হবে। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করেছেন যে, বেদান্তদর্শন মানবমহত্ত্বের দর্শন। তবুও পৃথিবীর কোনও ধর্মই হিন্দুধর্মের মতো সাধারণ দরিদ্র মানুষকে এত শোষণ করেনি। 'পারমার্থিক' এবং 'ব্যবহারিক'—এইসব তত্ত্বকথার আড়ালে স্বেচ্ছাচারের যন্ত্র জনসাধারণকে নিষ্পেষিত করেছে, হিন্দুধর্মের সারবস্তু মূল্যবান হলেও, প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা অনাচার দেখা গেছে। বিশেষ করে আধ্যাত্মিকতার নামে ভারতবর্ষ জনজীবনের অভাবকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে। কিন্তু বিবেকানন্দ বলছেন, নতুন জীবনবোধ আজ একান্তই প্রয়োজন। এই জীবনবোধে অঙ্গীকৃত হবে এই দাবি—'First bread and then religion.'[২১] এই জীবনবোধে জনসাধারণের যথাযোগ্য স্বীকৃতি থাকবে, জনশিক্ষা, জনস্বাচ্ছন্দ্য, জনসমৃদ্ধি জাতীয় চেতনায় ইষ্ট হিসাবে গৃহীত হবে। 'I consider that the great national sin is the neglect of the masses, and that is one of the causes of our downfall. No amount of politics would be of any avail until the masses in India are once more well educated, well fed, and well cared for.'[২২]

আজ বিশ শতকের মধ্যভাগেও ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনার লক্ষ্য যে বিবেকানন্দের বক্তব্যকে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারেনি একথা সকলেই স্বীকার করবেন।

ভারতবর্ষের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। অন্নবস্ত্র, বাসস্থান দিতে হবে। সেজন্যই আজ জাতি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের লক্ষ্য গ্রহণ করেছে।

ভারতীয় সমাজতন্ত্র কোন্ পথে অগ্রসর হবে? বিজ্ঞানের নামে, পরিকল্পনার নামে আমরা কি এদেশে সমষ্টিতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়কতন্ত্র গ্রহণ করব? ব্যক্তিস্বরূপের স্বকীয়তা বিসর্জন দেব সমষ্টির যূপকাষ্ঠে? বিবেকানন্দ-দর্শনে ব্যক্তি ও সমষ্টি, বৈচিত্র ও ঐক্য, সংগঠন ও স্বাধীনতা, বৈষয়িক উন্নতি ও আত্মিক উন্নতি—এ সবেরই সমন্বয় স্বীকৃত।

২০। Letters of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Calcutta, Third Edition (1970), p. 174

২১। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, Ninth Edition (1964), p. 432

২২। ibid., Vol. V, pp. 222-23

ইতিহাস-চেতনা বিবেকানন্দের ছিল। ফলে তিনি বুঝেছিলেন রেজিমেন্টেড সমাজ সভ্যতার অনুকূল নয়। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রে তাই স্বাধীনতাই মূলকথা। নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত জীবসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যেই বিবেকানন্দ শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ চেয়েছেন। ইতিহাসের অনিবার্যতায় অর্বাচীন বিশ্বাস নয়, অসাধারণ মানবিকতাই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে ভারতের প্রথম সমাজতান্ত্রিক হিসাবে আবির্ভূত হবার প্রেরণা দিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক, মানবমুক্তিপ্রয়াসী স্বামীজীকে নমস্কার।

স্বামী বিবেকানন্দ ও গণচেতনা

স্বামী বিবেকানন্দ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, বেদান্তপন্থী মুক্তিসাধক। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, সংসারকে একদিকে ত্যাগ করে আর একদিকে তিনি গ্রহণ করেছেন। সংসারকে মায়া বা অলীক বলে অবহেলা নয়, তার মলিনতা, কলুষ দূর করা ছিল তাঁর কর্মবহুল স্বল্পস্থায়ী মরজীবনের একটি প্রধান অভীপ্সা। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে তিনি দেশী ও বিদেশী গণজীবন নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। গণচেতনার জাগরণ প্রসঙ্গ তাঁর কর্মপ্রয়াসে একটি বড় জায়গা দখল করে আছে। অবশ্য এরও কারণ তাঁর অধ্যাত্মজীবনের মর্মমূলেই নিহিত ছিল। ভারতীয় ঔপনিষদিক তথা বৈদান্তিক দৃষ্টিতে জীবজগতের সর্ববিধ প্রকাশের মধ্যে পরম ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব সুপ্রকট। সুতরাং সাধারণ মানুষ নামে বিশাল জনসমাজকে সমাজের উচ্চবর্গের মানুষেরা যুগ যুগ ধরে যে শোষণ করে আসছে, তা একান্তভাবে ধর্মবিরুদ্ধ। কারণ ঈশ্বর তো 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই সেজন্য স্বামীজীর চিন্তাক্ষেত্রে গণজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

সমকালীন ভারতবর্ষে ভারতীয় গণজীবন যে অধঃপতিত অবস্থায় ছিল, তারজন্য তিনি অনেক জায়গাতেই সমাজের উচ্চবর্গের নেতৃস্থানীয় উৎপীড়ক শ্রেণীকে দায়ী করেছেন। এদের প্রতি তীব্র ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করেছেন।[১] তাঁর অপরিসীম আস্থা ও সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে জনসাধারণ বা 'গণে'র উপর। তাই তাঁর চিন্তায় দেখি একদিকে গণচেতনার উদ্বোধনের ঐকান্তিক প্রয়াস, অন্যদিকে দেশীয় শিক্ষিত বিত্তবান উচ্চবর্গের মানুষের মন থেকে জনসমাজ সম্বন্ধে ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞা এবং শোষণের প্রবৃত্তি দূর করে সমগ্র জনসমাজের সঙ্গে একাত্মবোধ জাগ্রত করার আগ্রহ। স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত' নামীয় পুস্তিকাটি ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে লেখা। তাঁর আগে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'বিড়াল' রচনায় সম-অধিকারবাদের কথা বললেও কার্ল মার্কসের শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত শ্রমিকরাজের কল্পনা তখনও ভারতীয় জীবনে অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে স্বামীজী শোষক এবং উৎপীড়ক সমাজনেতাদের প্রধান ত্রুটি যে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা, একথা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তিনি সাধারণ মানুষ বা জনসাধারণকে বলেছেন 'শক্ত্যাধার'—সমাজশক্তির উৎসস্থল। এই 'শক্ত্যাধার-প্রজাপুঞ্জ'কে অবহেলা করে ভারতবর্ষে ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণী ক্ষমতা হারিয়েছে। বৈশ্য বা পুঁজিপতি ব্যবসায়িক ও শিল্পপতি শ্রেণী যদিও সমকালে ক্ষমতার শীর্ষে বিরাজমান, তবু স্বামীজী অভ্রান্ত ঐতিহাসিক ও

১। 'আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর; আর যতই কেন তোমরা "ডম্‌ম্‌ম্‌" বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের "চলমান শ্মশান" বলে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর "চলমান শ্মশান" হচ্চ তোমরা।' [স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৮১]

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, এরাও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের 'মৃত্যুবীজ' নিজেরাই বুনে চলেছে। কিন্তু সমস্ত শক্তির আধার হয়েও সমকালীন ভারত ও বৃহত্তর বিশ্বে গণজীবনের ঐরকম অসহায় অবনমিত অবস্থা ছিল কেন? কি কারণে তাঁদের এমন দুর্গতি? স্বামীজী নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেছেন: নিজেদের শক্তি ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব, বিফল প্রযত্ন এবং উদ্দেশ্যসাধনে মিলিত উদ্‌যোগের অনস্তিত্বই সেদিন তাদের এই দুরবস্থার কারণ ছিল। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল উচ্চবিত্ত শোষকশ্রেণীর অবিচার এবং কূটকৌশল। কিন্তু একথা তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, গণচেতনার উদ্বোধন এবং দরিদ্র পদানত নিরন্ন সাধারণ দেশবাসীর সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় জীবনের উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নেই। দীর্ঘকাল অবজ্ঞা পেতে পেতে মানুষগুলির নিজেদের উপরই আর কোন আস্থা নেই। স্বামীজীর বিবৃত সেই 'প্যাটের গল্প' মনে পড়ে,[২] কিংবা সিংহশিশুর আবাল্য মেষযূথের সঙ্গে বর্ধিত হবার গল্পটি। জন্মাবধি মেষপালের মধ্যে বর্ধিত সিংহটিকে অন্য একটি সিংহ যে-মুহূর্তে জোর করে ধরে এনে হ্রদের জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখালো, তখনই সে সিংহস্বরূপ বুঝতে পেরে গর্জন করে মেষপাল থেকে বেরিয়ে গেল। এতকাল সে নিজের সত্তাকে ভুলে ছিল, নিজেকে মেষ বলেই ভেবে এসেছিল।[৩]

প্যাট এবং ঐ আত্মবিস্মৃত সিংহের মতোই ভারতীয় জনগণ সেদিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। স্বামীজী তাই এই মানবসমূহ বা 'গণে'র আত্মচেতনার উন্মেষ তথা তাদের ব্যক্তিত্ববোধের জাগরণকে ফলিত বেদান্তের একটি দায়িত্ব বলে মেনে নিয়েছেন। আর এই কারণেই বিশেষভাবে জনশিক্ষা এবং জনসেবার উপর সমধিক জোর দিয়েছিলেন। জনশিক্ষা এবং জনসেবা কোন্ পরিকল্পনা অনুসারে চালিত করতে হবে, তারও সুস্পষ্ট নীতি ও পথনির্দেশ তিনি করে গিয়েছেন। তাঁর ভাষণ, কথোপকথন, পত্রাবলী, কবিতা, প্রবন্ধ অনুধাবন করলেই বোঝা যায়, ভারতীয় গণজীবন সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা কত আন্তরিক ছিল! গণচেতনার জাগরণ এবং গণশক্তির সুসংহতির উপর তাই তিনি খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। এ-বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা যেমন প্রাগ্রসর, তাঁর নির্দেশিত পন্থাও তেমনি বাস্তব ও যুক্তিনির্ভর। এ-সমস্ত বিষয়ের চিন্তায় তিনি তীক্ষ্ণ মনস্বিতার পরিচয় দিয়েছেন, শুধু ভাবের আবেগে উচ্ছ্বসিত হননি। একজন প্রকৃত চিন্তানায়কের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তিনি বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করেছেন। স্বামীজী বিশ্লেষণী দূরদৃষ্টিতে দেশবিদেশে অবশ্যম্ভাবী গণ-অভ্যুত্থান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনা-মুখে স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' ও 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থ দুটি রচিত ও প্রকাশিত হয়।[৪]

২। 'আজন্ম শুনিতে শুনিতে প্যাট-এর তা-ই বিশ্বাস হল...সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল—"প্যাট, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই তো সব করেছে, তোর আমার মতো মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ।" প্যাট ঘাড় তুললো, দেখলে ঠিক কথাই তো; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন...।' [বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৭৫]

৩। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৮-৯

৪। 'পরিব্রাজক' 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১৩০৫-০৬) পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে ক্রমশ প্রকাশিত

এই দুটি রচনায় ভারতীয় গণজাগরণ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ও শিল্প ক্ষেত্রে তার অভ্রান্ততা প্রমাণিত হয়েছে। রাজনীতিতে অধিক সংখ্যায় জনগণের অংশগ্রহণ এবং শিল্প (industry) ক্ষেত্রে কর্মী-ঐক্য-সংগঠন (trade unions) সমূহের মাধ্যমে জনগণ যে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে এবং এই অধিকার আদায় করার জন্য সংগ্রামে রত হয়েছে তা স্বামীজীর সুস্থ, প্রাগ্রসর, মহৎ চিন্তারই ফলশ্রুতি। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে তিনি যে শূদ্রজাগরণের কথা বলেছেন, তা আসলে সাধারণ মানুষের চেতনার উদ্বোধনকেই ইঙ্গিত করে। তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপিত করে দেখিয়েছেন যে, আগামী দিনে শূদ্র বা শ্রমিকশ্রেণীর (মার্কসীয় পরিভাষায় 'প্রলেতারিয়েত') অভ্যুত্থান ঘটবেই। কারণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা বিভিন্ন যুগে জনগণের শোষণের উপরই নিজেদের সম্পদের পাহাড় জমা করেছে; অথচ যাদের প্রাণান্ত রুধিরস্রাবী পরিশ্রমে সম্পদ উৎপন্ন হচ্ছে, তাদের ঘৃণা ও অবহেলায় নীচে ফেলে রেখেছে। সামাজিক নিয়মে ইতিহাসের ধারাপথেই তাই একদিন বিস্ফোরণ ঘটতে বাধ্য। স্বামীজীর ভাষায়ঃ 'সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।'[৫] কিন্তু এই চেতনার জাগরণে প্রধান অন্তরায় ছিল সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে অনৈক্য এবং আপন শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব। কিন্তু ধীরে ধীরে নিজেদের ভিতর সংহতি স্থাপিত হচ্ছিল এবং আপন শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণ সজাগ হচ্ছিল। স্বামীজীর এই সিদ্ধান্তবাক্য ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—'...এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে ...শূদ্রধর্ম-কর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে...।'[৬] ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বিপ্লব এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের বিপ্লব স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে।[৭] কিন্তু ভারতবর্ষে এই গণ-অভ্যুত্থান কোন্ পথে আসবে, সে-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত দেননি। তবে হিংসার পথ যে তাঁর কাম্য নয়, সেকথা সহজে অনুমেয়। কারণ ভারতীয় জীবনাদর্শ এ-পথের সমর্থক নয়।[৮]

হয়। 'বর্তমান ভারত' 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১৩০৫-০৬) ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, দশম, একাদশ সংখ্যায় এবং দ্বিতীয় বর্ষের (১৩০৬-০৭) সপ্তম, অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৫। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৮

৬। তদেব, পৃঃ ২৪১

৭। স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন যে, পরবর্তী গণ-অভ্যুত্থান রাশিয়া অথবা চীনে ঘটবে। এ-প্রসঙ্গে ভগিনী ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথা উল্লেখযোগ্যঃ 'Sometimes he was in a prophetic mood, as on the day when he startled us by saying, "The next great upheaval which is to bring about a new epoch will come from Russia or China."' [Reminiscences of Swami Vivekananda—His Eastern and Western Admirers, Advaita Ashrama, Calcutta, Third Edition (1983), pp. 187-88]

৮। 'ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া...।' [বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ

ভারতীয় গণচেতনাকে সজাগ করার জন্য তাঁর পরিকল্পনায় শিক্ষাবিস্তার একটি বড় স্থান অধিকার করে আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য, ডিগ্রী বা উপাধি লাভ নয়, মানুষের ভিতরে যে অপার সম্ভাবনা আছে, অনন্ত শক্তি আছে সে-সম্বন্ধে বিশ্বাস জাগানো। এই বিশ্বাস জাগানোর জন্য ভারতীয় অধ্যাত্মবোধে গণচেতনাকে পরিপুষ্ট করা প্রয়োজন। তারা যদি বোঝে যে, তারা এসেছে অনন্ত শক্তির উৎস থেকে, অনন্ত শক্তির বিকাশেই তাদের ভাগ্যলিপি নির্ভরশীল, তবে তাদের হীনম্মন্যতা কেটে যাবে, সুপ্ত সিংহ জেগে উঠবে। সমস্ত ভারতবাসী যদি পরস্পরকে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে ভাই বলে গ্রহণ করতে পারে, তবে জনজীবনের উন্নয়নে আর কোন দুঃসাধ্য সমস্যা থাকে না। তাই একদিকে প্রয়োজন সাধারণ শিক্ষার প্রসার, অন্যদিকে আবশ্যক ধর্মশিক্ষার বিস্তার। ভারতীয় জীবনের মূলভিত্তি যেহেতু ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য ধর্মকে সমস্ত জাগরণের কেন্দ্রে রেখে কাজে অগ্রসর হতে হবে, সেইসঙ্গে নিতে হবে জনকল্যাণের নানা প্রকল্প। দুঃখপীড়িত মানুষের দুঃখ দূর করা, অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলা, মহামারীগ্রস্তকে চিকিৎসা ও পরিচর্যা করা—সবই এই জনসেবার লক্ষ্য হতে পারে। আর জনকল্যাণ মানে জনগণকে দয়া নয়, ঈশ্বরবুদ্ধিতে পূজা, নররূপী নারায়ণের পূজা। এই 'পূজা' কথাটির উপর তিনি খুবই জোর দিয়েছেন। এই পূজায় পূজক এবং পূজিত উভয়েরই কল্যাণ হয়।[৯]

এ-প্রসঙ্গ আর বেশীদূর না টেনে আমরা শুধু একথাটিই প্রতিপন্ন করতে চাই যে, স্বামীজী জনসেবাকে ঈশ্বর-আরাধনারই ব্যবহারিক প্রকাশ বলে মনে করেছেন—একে বলেছেন 'কর্মে পরিণত বেদান্ত' (Practical Vedanta)। জনসেবার উদ্দেশ্য যদি শুধু অসহায় মানুষের দুঃখে সহায়তা ও সহানুভূতি বোঝায় তাহলে এর মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। ভারতে পদদলিত, নিপীড়িত জনসাধারণ তখন প্রায় পশুবৎ জীবনযাপন করছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে সেদিন সেবামূলক কাজের খুবই দরকার ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল, জনসাধারণের লুপ্ত মনুষ্যত্বের পুনরুদ্ধার। এরই জন্য শিক্ষা একটি বড় হাতিয়ার। অবশ্য এ-শিক্ষা পরীক্ষা-পাসের জন্য যান্ত্রিক শিক্ষা নয়, নিজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা, নিজের হৃত ব্যক্তিত্ব ফিরে পাবার শিক্ষা।

আমরা এ প্রবন্ধের সূচনাতেই উল্লেখ করেছি, গণচেতনার দুটি দিক : ১। জনগণের চেতনার জাগরণ; ২। সমাজের শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর মানুষের মন থেকে গণজীবন সম্পর্কে অবজ্ঞা দূর করা। দুটিই সেদিনকার ভারতবর্ষে খুব কঠিন কাজ ছিল। 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শুচি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, গুরু রামানন্দ তাঁর আরাধ্য দেবতার আদেশ পেয়ে পথে বেরোলেন অস্পৃশ্য অন্ত্যজদের বুকে তুলে নেবেন বলে। শ্মশানে

৪৬৫] অথবা, '...ভারতের কার্যপ্রণালী আধ্যাত্মিক—সে-কাজ রণবাদ্য বা সৈন্যবাহিনীর অভিযানের দ্বারা হইতে পারে না।' [তদেব, পৃঃ ৩৭৬]

৯। 'যদি মানুষের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না।' [বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫১] অথবা, '...জগতের উপকার করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদেরই উপকার করিয়া থাকি। অপরের জন্য আমরা যে কার্য করি, তাহার মুখ্য ফল—আমাদের চিত্তশুদ্ধি।' [তদেব, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১১১]

চণ্ডাল নাভা শবদাহ করছিল। রামানন্দ তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হওয়ামাত্র নাভা ভয়ে সাত পা পিছিয়ে গেল। তার করুণ মিনতি: 'প্রভু, আমি চণ্ডাল, ...হেয় আমার বৃত্তি, অপরাধী করবেন না আমাকে।' যুগ যুগ অবজ্ঞা আর নিপীড়ন সহ্য করতে করতে নাভাদের এ-ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। তারা মানুষ নয়। একটা নিঃসীম অপরাধ ও হীনতা বোধের গুরুভার চাপে এদের মনুষ্যত্বচেতনা বিলুপ্ত। উচ্চবর্ণের লোকদের নিষ্পেষণে এরা আজ শুধু 'ভারবাহী পশু'। 'পুনশ্চ'[১০] কাব্যগ্রন্থ রচনার অনেক আগেই স্বামীজী 'পরিব্রাজক' ও 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে এরকম ভাবের কথা বলেছেন। পত্রাবলী, কথোপকথন, ভাষণ (ভারতে বিবেকানন্দ), প্রবন্ধাবলীর অনেক জায়গাতেই গণচেতনার শতাব্দী-সঞ্চিত জড়ত্বের কথা বলেছেন। শত শত বৎসরের অবজ্ঞার চাপে যাদের জীবন শুষ্ক, নিরানন্দ মরুভূমি-প্রায়, তাদের চেতনায় নতুন আশার সঞ্জীবনশক্তি আনা কী সহজ কথা! এটা করতে গেলে প্রথমে সুবিধাভোগী শ্রেণীকেই অনেকখানি এগিয়ে আসতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে নিষ্কাম সেবাব্রতী কর্মিদলকে—তা ত্যাগী সন্ন্যাসীর দল হতে পারে, অথবা সেবাপরায়ণ সমাজকর্মী বা রাজনৈতিক কর্মীর দলও হতে পারে। একবার তারা কাজ শুরু করলে ধীরে ধীরে গণমানস থেকে হীনতার ভাব দূর হবে; আস্তে আস্তে নিজেরাই নিজেদের মঙ্গল সম্বন্ধে সচেতন হবে। স্বামীজীর নির্দেশিত পথে কাজ করে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রভূত সাফল্য লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সেবাদল এবং গান্ধীজীর হরিজন-কল্যাণ স্বামীজীর চিন্তার প্রেরণা থেকেই কার্যকর হতে পেরেছিল। অভিজাতবর্গের মন থেকে সাধারণ মানুষের উপর ঘৃণা ও শোষণের মজ্জাগত অভ্যাস দূর করাও সেদিন কঠিন কাজ ছিল। স্বামীজী এ-ব্যাপারেও অনেকখানি সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাঁরই নির্দেশে খেতড়ির রাজা অজিত সিং প্রজাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।[১১] স্বামী অখণ্ডানন্দ খেতড়িতে অবস্থানকালে সাধারণ প্রজার দুঃখদর্শনে ব্যথিত হয়ে ইতিকর্তব্য জানার জন্য আমেরিকায় স্বামীজীর কাছে চিঠি লেখেন।[১২] উত্তরে স্বামীজী তাঁকে লেখেন: 'রাজপুতানার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্মভাব ও পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। ... খেতড়ি শহরের গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম উপদেশ করিবে আর তাদের অন্যান্য বিষয়, ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে।... মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য গ্রামে যাও, উপদেশ কর, বিদ্যা শিক্ষা দাও। কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই কর্ম কর, তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে। ...পড়েছ, "মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব"; আমি বলি, "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব"। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।'[১৩] দু-বৎসর খেতড়িতে অবস্থান করে স্বামী অখণ্ডানন্দ দরিদ্র প্রজাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নৈতিক

১০। 'শুচি' কবিতার রচনাকাল অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ ১১। উদ্বোধন, ৬৪ বর্ষ, পৃঃ ১৯২

১২। স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৭৯), পৃঃ ১০৫

১৩। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৬১

চরিত্রগঠনে ব্রতী হন। গুরুর নির্দেশে খেতড়ির রাজা সানন্দে তাঁকে সব দিক থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেন। পরবর্তীকালে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদের মহুলা গ্রামে দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি পীড়িতদের মধ্যে যে সেবাকার্য করেন, তাতেও স্বামীজীর অকুণ্ঠ উৎসাহ ও অনুপ্রাণনা ছিল।[১৪]

সন্ন্যাসগ্রহণের পর পদব্রজে সারা ভারত ঘুরে ভারতের অবহেলিত জনসাধারণের দুর্দশার চিত্র নিজ চোখে স্বামীজী দেখেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, এই দুর্বল অসহায় বিরাট গণসমাজকে তুলতে হলে আগে সমাজের শিক্ষিত সুবিধাভোগী মানুষদের এগিয়ে আসা দরকার। সেজন্য শিষ্যদের মধ্যে খেতড়িরাজ, রামনাদরাজ, আলাসিঙ্গা প্রমুখকে বার বার জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। 'পত্রাবলী'তে এর অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। তিনি মনে করতেন যে, সমাজের উচ্চবর্গের লোকদের এ-ব্যাপারে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কারণ তারা কোটি কোটি মানুষের প্রাণপাত পরিশ্রমে উৎপন্ন সম্পদ ও অর্থের বিনিময়ে শিক্ষিত ও বিত্তবান হচ্ছে। তাই অগণিত মানুষের প্রতি তাদের একটা কৃতজ্ঞতার ঋণ আছে, বাধ্যবাধকতা আছে। স্বামীজীর এই বজ্রগর্ভ ঘোষণা তাদের এই দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যই উচ্চারিত হয়েছিল ঃ '...যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হইয়া এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের কথা একটিবার চিন্তা করিবার অবসর পায় না—তাহাদিগকে আমি "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া অভিহিত করি।'[১৫]

আবার একথাও তিনি জোর দিয়েই প্রকাশ করেছেন যে, ভারতীয় জনগণের মধ্যে অপার সহিষ্ণুতা, সুদৃঢ় কর্মক্ষমতা এবং সিংহবিক্রম লুকিয়ে আছে। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি বহুজনবিদিত ঃ 'এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে ; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না ; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম !!'[১৬]

ভারতীয় জনগণের অন্তর্নিহিত বিরাট সম্ভাবনায় তিনি আস্থাবান ছিলেন বলেই বার বার এদের প্রশংসায় মুখর হয়েছেন, বিশেষত, তাদের ধর্মজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। 'কর্মযোগ' বক্তৃতায় ভারতের অতি সাধারণ লোকও কিরূপ অসাধারণ ধর্মতত্ত্বোপলব্ধি ও কর্তব্যজ্ঞানের অধিকারী, তার উদাহরণ হিসাবে মহাভারতের 'ধর্মব্যাধ' নামক কসাইয়ের কাহিনীটি বিবৃত করেছেন।[১৭] কসাইয়ের বৃত্তিজীবী ধর্মব্যাধ শুধু নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব এবং মাতৃসেবার সামাজিক কৃত্য সম্পাদন করে উচ্চতম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিল। ভারতের গণসমাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি না থাকুক,

---

১৪। স্মৃতি-কথা, পৃঃ ২৩০ ১৫। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৫

১৬। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮২ ১৭। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯২-৩

কর্মশক্তি এবং ধর্মসম্পদ আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদ্ ইউরোপে নানা জায়গায় গণজাগরণ দেখে তিক্তবিরক্ত এবং শঙ্কাকুল হয়ে যে ঘৃণাসূচক বাক্যবাণ গণ-অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেছেন,[১৮] স্বামীজীর কল্পনাতেও সেরকম ভীতিমিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব আসত না। আমরা এখানে বিশ্ববিশ্রুত স্পেনীয় লেখক গ্যাসেটের কথা বলছি। ইউরোপের স্থানে স্থানে এবং বিশেষ করে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার গণজাগরণ দেখে আশঙ্কা এবং ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে গ্যাসেটের উচ্চারণ ঃ 'We are living, then, under the brutal empire of the masses.'[১৯]

তাঁর মতে জনসাধারণের কোন স্বাধীন মতামত, নীতিবোধ এবং সভ্যতা থাকতে পারে না। এগুলি পূর্বতন বুদ্ধিজীবী-সমাজের মুষ্টিমেয় অসাধারণ মানুষের একচেটিয়া সম্পত্তি। আর জনসাধারণ হল '...the assemblage of persons not specially qualified.'[২০] এবং 'The average man finds himself with "ideas" in his head, but he lacks the faculty of ideation.'[২১] গণসমাজ একটা বুদ্ধিবৃত্তি-বর্জিত জড় মানবসমষ্টিমাত্র, উচ্চ কোন ভাব ধারণের ক্ষমতা তার নেই, সভ্যতাস্থাপনের শক্তি ও কল্পনা তাদের থাকতেই পারে না—তাদের দ্বারা জগতে শুধু 'বর্বরের সাম্রাজ্য'ই (brutal empire) প্রতিষ্ঠিত হবে, গ্যাসেটের এই মত ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শিক্ষিত লোকদের মনোভাবেরই প্রতিফলন। একে সামন্তপ্রভু এবং 'বুর্জোয়া' বুদ্ধিজীবীর আস্ফালন ও আক্ষেপ বলা যেতে পারে।

কিন্তু বৈদান্তিক তত্ত্বজ্ঞান এবং জীবনে তার উপলব্ধি স্বামীজীকে কখনও এই বৃহত্তর গণমানবকে ঘৃণা করার মতো অহঙ্কার বা ভ্রান্তিতে ফেলেনি। ভারতীয় গণসমাজ সম্বন্ধে তাঁর যেমন উচ্চ ধারণা, তেমনি তাদের দুরবস্থার জন্য তাঁর দুঃখবোধও অপরিমেয়। তিনি একথা বার বার বলেছেন যে, ভারতের উন্নতি গণজীবনের উন্নতি ছাড়া কখনও সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ ভারতে যেহেতু শূদ্রযুগ আসবেই, সেই হেতু শূদ্র তথা প্রজাপুঞ্জের আর্থিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশ অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। শূদ্রযুগের আগমন-সম্ভাবনাকে স্বামীজী স্বাগত জানিয়েছেন, গ্যাসেটের মতো আক্রোশে বুদ্ধি-বিবেচনা বিসর্জন দেননি। তবে যত শীঘ্র সম্ভব গণজীবনকে প্রায়াসন্ন দায়িত্ববহনের যোগ্য করে তোলা যায়, ততই মঙ্গল। স্বামীজীর অনুজ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অগ্রজের ভবিষ্যদৃষ্টির প্রশংসা করে লিখেছেন যে, স্বামীজী শূদ্র-অভ্যুত্থানের আগমনী যখন গেয়েছেন, তখন রাশিয়ার লেনিন সর্বহারাদের দ্বারা পরিচালিত শ্রেণীহীন রাষ্ট্রের চিন্তাও করেননি, চীনের মাও-সে-তুঙ-এর তখন অভ্যুদয়ই ঘটেনি।[২২] শূদ্ররাজের যে কল্পনা স্বামীজী করেছিলেন, তাকে এককথায় বলতে পারি গণরাজ। কিন্তু এ গণরাজের দ্বারা পরিচালিত সমাজ ও

১৮। The Revolt of the Masses—José Ortega Y Gasset, Unwin Books, George Allen & Unwin Ltd., Ruskin House, Museum Street, London, W.C.I, 1961. The Spanish Original 'La Rebelion de las Masas' was published in 1930 : See Chapters 1, 2, 5, 8, 14

১৯। ibid., p. 15 ২০। ibid., p. 11 ২১। ibid., p. 56

২২। Swami Vivekananda : Patriot-Prophet—Bhupendranath Datta, Nababharat Publishers, Calcutta, 1954, p. 14

রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। 'বর্তমান ভারত' পুস্তিকায় দৃঢ়কণ্ঠে তিনি জানিয়ে দিয়েছেনঃ '...এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে-প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্ম-কর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।'[২৩]

একজন লেখক মন্তব্য করেছেনঃ '...সমগ্র ভারতে উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী কৃষকের সামন্ততন্ত্র ও ইংরেজশাসন বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াও তিনি (স্বামীজী) সেই সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নাই; শূদ্র-মুচি-মেথর প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেণীসত্তাবর্জিত অর্থহীন কথা দ্বারা কৃষকের সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামকে এড়াইয়া গিয়াছেন।'[২৪] স্বামীজীর রচনার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় থাকলে যে-কোন পাঠকই বুঝতে পারবেন যে, ভারতের কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে তিনি কত সচেতন। 'পত্রাবলী', 'ভারতে বিবেকানন্দ' এবং 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থ তিনটি খুঁটিয়ে দেখলেই আমাদের এ মন্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাঁর লেখায় যে শূদ্র-মুচি-মেথরের কথা আছে, তারা শ্রেণীসত্তাবর্জিত হবে কেন? তারাই তো এযুগের 'প্রলেতারিয়েত'। একথা বুঝবার জন্য উপরি-উদ্ধৃত 'শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য' কথাটার তাৎপর্য অনুধাবন করা দরকার। সর্বহারাশ্রেণীর কাঁধে পূর্ববর্তী যুগের সমাজপ্রভুদের শ্রেণীচরিত্রের অভিমান ভূতের মতো চেপে বসবে না। তাদের অফুরন্ত কর্মশক্তি আপনার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথ পাবে। কিন্তু শূদ্রসংহতি সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজস্ব একটি পরিকল্পনা ছিল। এই পরিকল্পনার মর্মার্থ তাঁর ভাষাতেই পেশ করা যাকঃ 'If it is possible to form a state in which the knowledge of the priest period, the culture of the military, the distributive spirit of the commercial, and the ideal of equality of the last can all be kept intact, minus their evils, it will be an ideal state.'[২৫]

অর্থাৎ ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের বাহুবল, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ যদি মিলিত করে একটি পূর্ণায়ত জীবনাদর্শ গড়ে তোলা যায় এবং তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত করা যায়, তবে আসন্নপ্রায় শূদ্রযুগ হবে পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক বিকাশের যুগ। শূদ্রসংস্কৃতির অন্য নাম গণসংস্কৃতি। ভারতীয় গণসংস্কৃতি হবে একটি বিভেদহীন সমন্বিত সংস্কৃতি। এর গতিপ্রকৃতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজস্ব মৌলিক নির্দেশ আছে। তাঁর মতে ব্রাহ্মণকে শূদ্রে অবনমিত করে নয়, শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করেই এই সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে। এ-বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনা এই রকমঃ 'জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছেঃ সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা

২৩। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪১

২৪। ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়, ডি-এন-বি-এ ব্রাদার্স, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৯৮০), পৃঃ ২১৬

২৫। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VI, Advaita Ashrama, Calcutta, Seventh Edition (1963), p. 381

বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ-সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণে পরিণত হইবেন। সুতরাং ভারতের জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা এরূপ দাঁড়াইতেছেঃ উচ্চবর্ণগুলিকে হীনতর করিতে হইবে না, ব্রাহ্মণজাতিকে ধ্বংস করিতে হইবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ...।'[২৬]

'উচ্চতর বর্ণকে নীচে নামাইয়া (মার্কসীয় পরিভাষায় যাকে declassed হওয়া বলে) এ-সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে।'[২৭] স্বামীজীর মতেঃ ব্রাহ্মণত্বই হচ্ছে 'মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ' আর 'সত্যযুগ' হচ্ছে বিভেদহীন আদর্শ সাম্যসমাজের যুগ। 'সত্যযুগ' সম্বন্ধে তাঁর অভিমত খুবই আধুনিকঃ 'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। ...ঐ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।'[২৮] ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল নিউইয়র্ক থেকে তাঁর মন্তব্য প্রকাশিতঃ '...আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসে পড়েছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে।'[২৯]

দেখা যাচ্ছে, স্বামীজীর দৃষ্টিতে সত্যযুগ হচ্ছে একটি শ্রেণীবৈষম্যহীন সমন্বিত সাম্যসমাজের যুগ। সেযুগে গণজীবনের অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটবে; সব দিক থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে শোষণমুক্ত গণরাজ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আগামী সত্যযুগের প্রত্যাশিত দায়িত্ব।

কিন্তু এই শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপে জনগণের আর্থিক সমস্যা নিরাকরণ, অশিক্ষার অন্ধকার দূরীকরণ এবং দায়িত্বসচেতন ব্যক্তিত্ববোধ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার উন্নতি অনেকখানি কৃষককুলের উন্নতির উপর নির্ভর করে। খুব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বামীজী ভারতীয় কৃষকের দুরবস্থার কথা চিন্তা করেছেন। তাদের অবস্থার উন্নতি কিভাবে করতে হবে সে-সম্পর্কেও তাঁর নির্দেশ যুক্তিভিত্তিকঃ '...আমাদের mission (কার্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য। ...কতকগুলো চাষার ছেলেমেয়েকে একটু লিখতে পড়তে শেখাও ও অনেকগুলো ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও...। চাষাভুষো মৃতপ্রায়; এজন্য পয়সাওয়ালারা সাহায্য করে তাদের চেতিয়ে দিক—এই মাত্র!'[৩০] গণজীবনের মূল্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে স্বামীজীর অভিমতে কোনও

২৬। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৯০ ২৭। তদেব, পৃঃ ১৯২
২৮। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৫২ ২৯। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১৮
৩০। তদেব, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১০৩-০৪

অস্পষ্টতা নেই। খুব জোর দিয়েই বলেছেন ঃ 'মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে। ...জাতির ভবিষ্যৎ...নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পারো? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখাইতে পারো? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হইতে পারো? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব।'[৩১]

স্বামীজীর গণচেতনার একটি বড় দিক হচ্ছে জনগণের কায়িক শ্রমের মর্যাদাকে স্বীকৃতিদান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।'[৩২] কর্ম এবং দক্ষতার উপর নির্ভর করে প্রাচীন চার বর্ণের বিভাগ হয়েছিল কিন্তু কালক্রমে বর্ণভেদ এমন অবস্থায় দাঁড়াল যে, দৈহিক শ্রমজীবী মানুষের উপর উচ্চবর্ণের অবহেলা ঘৃণার নামান্তর হয়ে মানবতা-বিরোধী জাতিভেদের রূপ নিল। কিন্তু বর্ণবিভাগের মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমবণ্টন (division of labour)। এই শ্রমবিভাগের দ্বারা জাতীয় জীবনের কর্মরথটি সচল রাখাই ছিল উদ্দেশ্য। স্বামীজী তাই কায়িক পরিশ্রমজীবী ভারতের অবহেলিত জনসমাজকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং তাদের উপর দৃঢ় আস্থা ঘোষণা করেছেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই এই মনোভাব ব্যক্ত করা যাক ঃ 'এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্দাফরাস—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। ...তোদের মতো তারা কতকগুলো বই-ই না-হয় না পড়েছে, তোদের মতো শার্ট-কোট পরে সভ্য না-হয় নাই হতে শিখেছে; তাতে আর কি এল গেল! কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড—সব দেশে। এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্নবস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা-হুতাশ লেগে যায়, তিন দিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর উজাড় হয়ে যায়! শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্নবস্ত্র জোটে না। এদের তোরা ছোটলোক ভাবছিস, আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই করছিস? ...এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একই ভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐ রকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐ-কথা বুঝতে পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই ঐ-কথা বোঝা যাচ্ছে।'[৩৩]

শুধু শ্রমের মর্যাদা স্বীকার নয়, যে ভারতীয় শ্রমজীবীরা বহু প্রাচীন সভ্যতা-সমূহের ও জাতিসমূহের উদয়-বিস্তারের মূল নেপথ্যনায়ক, তাদের তিনি প্রণতি জানিয়ে

৩১। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২-৯৩ ৩২। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, ৪।১৩

৩৩। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১০৭-০৮

আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেছেনঃ '...ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী!—তোমাদের প্রণাম করি।'[৩৪]

স্বামীজী ভারতীয় শ্রমজীবী গণমানুষের কর্মক্ষমতা, সহনশক্তি, বুদ্ধি ও ধর্মচেতনাকে সাধুবাদ জানিয়ে এযুগের গণচেতনার উদ্বোধন এবং গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। এর মধ্যে তাঁর তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক বিচারের স্বাক্ষর পেয়ে আমরা বিস্ময় মানি। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সর্বসংস্পর্শী মননক্ষমতায় আমরা অভিভূত না হয়ে পারি না।

একটা কথা মনে রাখা দরকার, স্বামীজীর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষে। আজ দেশ স্বাধীন। একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশ পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু স্বামীজী-কল্পিত শ্রেণীহীন সাম্যসমাজ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করে আজকের স্বাধীন ভারতে জাতির কর্তব্যের কথা স্মরণে আনা যাকঃ 'The nation must ponder about the programme of Swami Vivekananda in the perspective of an independent India, and work out its future advancement.'[৩৫] স্বামীজী বলতেন, গণচেতনার উদ্বোধনে সহায়তা, শিক্ষার প্রসার, কর্মের সুযোগ বাড়াতে চেষ্টা করা হচ্ছে সমাজের অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগী শ্রেণীর কর্তব্য। গণচেতনার জাগরণ ঘটলে ভবিষ্যতে জনসাধারণ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি আমেরিকা থেকে মাদ্রাজী শিষ্যগণকে লিখিত পত্রে এ-সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট অভিমত দিয়েছেনঃ 'My whole ambition in life is to set in motion a machinery which will bring noble ideas to the door of everybody, and then let men and women settle their own fate. Let them know what our forefathers as well as other nations have thought on the most momentous questions of life. Let them see specially what others are doing now, and then decide. We are to put the chemicals together, the crystallization will be done by nature according to her laws....Keep the motto before you—"Elevation of the masses without injuring their religion"....Onward for ever! Sympathy for the poor, the downtrodden, even unto death—this is our motto.'[৩৬] আমরা শুধু রাসায়নিক উপাদানগুলি (Chemicals) একসঙ্গে মিলিত করব, তারা প্রকৃতির নিয়মে বিশেষ আকার নেবে। সমাজধারার ক্ষেত্রেও একথাই প্রযোজ্য। শিক্ষার দ্বারা জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে, দারিদ্র দূরীকরণে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। বাকিটা তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে ঠিক করে নেবে। আধুনিক ভারত এবং বিশ্বের অনেক দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র নানা আকারে

৩৪। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০৬ ৩৫। Patriot-Prophet, p. 342

৩৬। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, Eighth Edition (1964), pp. 29-30

প্রচলিত আছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি জাগ্রত জনগণ। কারণ গণ-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। স্বামীজী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পাশ্চাত্যের অনেক দেশ ঘুরে সংসদীয় গণতন্ত্রের (Parliamentary Democracy) যে রূপ দেখেছিলেন, তাতে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচালকদের ত্রুটিতে তাঁর ক্ষোভই জেগেছে। স্বভাবসুলভ পরিহাসবিজল্পিত স্বরে তিনি সেই ক্ষোভের প্রকাশ দেখিয়েছেন ঃ 'ও তোমার "পার্লেমেণ্ট" দেখলুম, "সেনেট" দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল। ...অবশ্য ভোট-ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না, কিন্তু রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নেই। সে ঘুষের ধুম, সে দিনে ডাকাতি, যা পাশ্চাত্যদেশে হয়, রামচন্দ্র! ...যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিত হলে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো তো সেইখানেই মারা গেল; হে রাম!'[৩৭] সেদিন দেশে দেশে গণতন্ত্রের এই চেহারা দেখে স্বামীজী হতাশ হয়েছিলেন। আর সেইজন্যই বলেছিলেন যে, তিনি একজন সমাজতন্ত্রী (Socialist)। অবশ্যই এই ব্যবস্থাকে যে নির্ভুল বলে মনে করতেন, তা নয়।[৩৮] উন্নততর গণকল্যাণমুখী অন্য কোন ব্যবস্থার অভাবেই সেদিন তাঁকে সমাজতন্ত্রের দিকে তাকাতে হয়েছিল।

কিন্তু এই সমাজতন্ত্রও ভারতে সফল হবে না, যদি গণজীবনের অবনতি চলতেই থাকে। স্বাধীন ভারতবর্ষ শাসনব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র গ্রহণ করেছে এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় মিশ্র নীতি অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র-শাসিত সমাজতন্ত্র ভারতে পরীক্ষিত হচ্ছে। এ ব্যবস্থার সফলতাও নির্ভর করে গণজীবনের উন্নতির উপরেই। ব্যবহারিক ও নৈতিক শিক্ষায় গণসমাজকে সুদৃঢ় না করলে ভোট-ব্যালট প্রহসনে দাঁড়ায়। আর শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর অভাবে আর্থিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। সুতরাং ভারতীয় গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত হতে হলে অগণিত সাধারণ মানুষ বা 'গণে'র দিকে তাকাতেই হবে। তাদের নীচে ফেলে নয়, উপরে তুলেই গণতান্ত্রিক সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যম ফলপ্রসূ হতে পারে। এ পরীক্ষায় ভারত স্বাধীনতার আটাশ বছর পরেও খুব উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। ভবিষ্যতে এ পরীক্ষায় সে কৃতকার্য হবে কিনা তা অনুমানের ব্যাপার। তবে স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারত একদিন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে জগতে উন্নত মস্তকে আপন গৌরব ঘোষণা করবে এবং সে গৌরবের ধ্বজা উচ্চে তুলে রাখবে ভারতীয় জনগণ।

৩৭। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬১-৬২

৩৮। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০

স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা—এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করাটাই সম্ভবত বিস্ময়কর। কারণ, আমরা, যারা নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে দাবি করি, যারা গোটা সমাজসংস্কারের যাবতীয় দৃশ্য অদৃশ্য বিষয়ে 'সুচিন্তিত' মতামত প্রকাশ করতেই আগ্রহী, সেই আমরাও যে তাবৎ জ্ঞানের বহর দিয়েও ভারতের মূল চালিকাশক্তির কাছাকাছি আজও যেতে পারিনি—সেটা কি অস্বীকার করা যায়? ভারত কৃষিনির্ভর—প্রাক্-স্বাধীনতা যুগেও যেমন কৃষিনির্ভর ছিল, স্বাধীনতা-উত্তর কালে প্রভূত শিল্পবিস্তারের পরও তেমনি কৃষিনির্ভরই আছে। ভারতের সমস্যার সিংহভাগ যেমন কৃষকদের জীবনেই প্রতিফলিত, তেমনি ভারতীয় জীবনধারার আবর্তন বা বিবর্তন সেই কৃষিকেই কেন্দ্র করে। ভাবতে অবাক লাগে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে ভারতের কৃষি ও কৃষক সম্পর্কে যে-সকল বক্তব্য এবং মতামত প্রকাশ করেছিলেন, যে-সকল চিন্তাভাবনা ধারণ ও বহন করেছিলেন এবং দিয়েছিলেন যে-সকল পথনির্দেশ, তা আজও এই আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের যুগেও সমভাবে প্রযোজ্য। মূল বিষয়ে প্রবেশ করার আগে আমরা তৎকালীন কৃষিজীবনের পরিবেশ এবং পরিস্থিতিটা একটু পর্যালোচনা করে দেখতে পারি এবং সেই অতীত দর্শনের মাধ্যমেই প্রতিপাদ্য বিষয়টি স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পারে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের আগুন নিভতে না নিভতেই বাংলার বুকে দেখা দিল আবার আগুন। নীলচাষীরা মরণ-পণ করে বিদ্রোহ করেছিলেন নীলচাষের সীমাহীন ছলনা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে। সেদিন বিদেশী শাসকরা এই বিদ্রোহের আগুনে শান্তিজল ছিটিয়ে দেওয়ার আশায় 'ইণ্ডিগো কমিশন' গঠন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। উক্ত কমিশনের সামনে বিদ্রোহী নীলচাষী দীনু মণ্ডল স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেনঃ '...আমি নীলচাষ করব না, এই কারণে যে নীলচাষ মৃত্যুযন্ত্রণার সামিল।'[১] সমসাময়িক 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলবিদ্রোহের পটভূমিকায় বলেছিলেনঃ 'বাংলাদেশ তার কৃষককুল সম্পর্কে গর্ববোধ করতে পারে ...শক্তি নেই, অর্থ নেই, রাজনৈতিক জ্ঞান নেই, এমনকি নেতৃত্ব নেই, তবুও বাংলার কৃষকেরা এমন একটি বিপ্লব সংগঠিত করতে পেরেছে যাকে অন্য দেশের বিপ্লবের থেকে কি ব্যাপকতায়, কি গুরুত্বে কোন দিক থেকেই নিকৃষ্ট বলা চলে না।'[২] বিক্ষোভ আর বিদ্রোহের আগুনে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের বুক থেকে নীলচাষ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জমিদারতন্ত্র? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত? নীলচাষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেলেও চাষীরা জমিদারতন্ত্রের নাগপাশে তখনও ছিল বন্দী, একান্ত অসহায়ভাবে বন্দী। 'মাটিতে যাঁদের ঠেকে না চরণ', তাঁরাই 'মাটির মালিক' হয়ে বসলেন, আর যারা বুকের

১। স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা—নরহরি কবিরাজ, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৯৮৬), পৃঃ ১১৭ ২। তদেব, পৃঃ ১১৮

রক্ত দিয়ে ফসল ফলায়, সেই কৃষকরা থাকে অনাহারে, থাকে অন্ধকারে। একদিকে জমিদারতন্ত্রের শোষণ, অন্যদিকে মহাজনদের অত্যাচার কৃষিজীবী সমাজের সবটুকু জীবনীশক্তিকে নিঃশেষে হরণ করে নিয়েছিল। আর তারই ফলে শুধু কৃষকরাই নয়, সমগ্র কৃষিব্যবস্থাই হয়ে পড়েছিল পঙ্গু, হয়ে পড়েছিল অন্তঃসারশূন্য। অবশ্য ইংরেজ সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জাঁতাকল থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য কয়েকটি আইন সংশোধন এবং নতুন আইন সংযোজন করেন। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি, বরং নানাভাবে খাজনার হার বাড়িয়ে জমিদারেরা কৃষকদের উপর অত্যাচারের পরিমাণ ও পরিধি বিস্তৃত করে। যেমন দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেন 'নীল দর্পণ', তেমনি মীর মশারফ রচনা করেন 'জমিদারদর্পণ'—এই দুই দর্পণেই তৎকালীন কৃষকসমাজের যন্ত্রণাকাতর নিঃস্ব রিক্ত কঙ্কালসার চেহারা হয়েছে প্রতিফলিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক প্রবন্ধটির দিকেও দৃষ্টি ফেরাতে পারি। ইংরেজ শাসনের স্নেহচ্ছায়ায় লালিতপালিত শিক্ষিত ও সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় যখন দেশের শ্রীবৃদ্ধির জয়গানে মুখর; তখন হাসিম শেখ এবং রামা কৈবর্তের দল নিঃসীম অন্ধকারে মাথা গুঁজে বহন করে চলেছে অত্যাচারের জ্বালা। কৃষকদের উন্নতির জন্য যে-সকল আইন প্রণীত হয়েছিল, সেগুলিও যে কেন কৃষিজীবীদের সহায় হয়নি, সে-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন: 'আইন—সে একটা তামাসা মাত্র—বড় মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে।'[৩] কৃষক যদি জমির মালিকানা না পায়—তাহলে কৃষির উন্নতি হবে না এবং কৃষির উন্নতি না হলে কৃষকের উন্নতিও ঘটতে পারে না—এই বাস্তব সত্য শুধু আজই স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত নয়, বহু যুগ আগেই একথা আমরা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণও একদা স্বামীজীকে বলেছিলেন: খালি পেটে ধর্ম হয় না। অভুক্ত এবং ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে শুকনো ধর্মের কথা এক নিষ্ঠুর প্রহসনমাত্র। ক্ষুধার্তের কাছে খাদ্যবস্তুই ঈশ্বর হিসাবে উপস্থিত হয়—এটাও এক বহুশ্রুত প্রবচন। বিবেকানন্দের পরবর্তী চিন্তাধারায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তিনি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়াসে নিজেকে সঙ্কুচিত করে রাখেননি, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা সদা-সর্বদাই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের মাধ্যমেই একমাত্র দেশের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব—একথা বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বহু পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। সব থেকে বিস্ময়ের কথা এই যে, আজকের যুগে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি এবং কৃষিসমস্যার সমাধানে আমরা কমিশনের পর কমিশন গঠন করে যে-সকল পথ ও পন্থার সন্ধান করছি, তার প্রায় সবগুলিই বিস্তৃতভাবে না হলেও, স্বামীজী বহু পূর্বেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন। আমরা চোখ মেলে এতকাল সেদিকে তাকাইনি, তাই দেখতে পাইনি।

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষি-পরিকল্পনার গুরুত্ব যে কতখানি, তা স্বামীজী সম্যকরূপেই অবগত ছিলেন এবং সেই গুরুত্বের মূল কারণ সম্পর্কেও তিনি ছিলেন ওয়াকিবহাল।

৩। বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৩৮৭, পৃঃ ২৯১

বিবেকানন্দ জানতেন, যেদেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, সেদেশে কৃষির উন্নতি ঘটিয়ে যেমন মানবিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করা যাবে, তেমনি খাদ্যসঙ্কটের মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। দেশের চাহিদা মেটাবার জন্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে সাফল্য অর্জনের জন্য পাট, চা, আখ, তৈলবীজ প্রভৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পপ্রসারের ভিত্তি হিসাবেও কৃষির প্রসার ঘটাতে হবে। আর বিধ্বস্ত ও বিপন্ন গ্রামীণ অর্থনীতিকে সজীব করে তুলতে পারে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিব্যবস্থা। আধুনিক মন নিয়ে আমরা যখন গ্রামীণ সমস্যা ও কৃষির উন্নতি সম্পর্কে এই পটভূমিকায় চিন্তাভাবনা করি, তখন বিবেকানন্দের ধ্যানধারণাকে অতি আধুনিক বলেই মনে হয়।

কৃষির উন্নতি ঘটাতে হলে কি কি করা প্রয়োজন? এ-সম্পর্কে স্বামীজী প্রথমেই জমির উপর কৃষকের অধিকার মেনে নেওয়ার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছিলেনঃ 'নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় কাজ করতে পারে না।'[৪] সেইসঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত চাষের প্রয়োগকৌশল কৃষকদের শেখাতে হবে, দিতে হবে অন্যান্য সুযোগসুবিধা। মধ্যস্বত্বভোগীদের গ্রাস থেকে যদি জমির মালিকানা উদ্ধার করা যায়, যদি যথার্থ কৃষিজীবীদের হাতেই তুলে দেওয়া যায় জমির মালিকানা—তাহলেই কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন-বিপ্লব সঙ্ঘটিত হতে পারে। উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, শুধু আজকের ধারণা নয়, এ ধারণা কয়েক যুগ আগেই স্বামীজী পোষণ করেছিলেন। কিন্তু শুধু মালিকানা তুলে দিলেই হবে না, সেইসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরির যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে হবে কৃষিক্ষেত্রে—এটা স্বামীজীর নির্দেশ ছিল। লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, তিনি ভারতপথিকরূপে যখনই কোন দেশীয় রাজা বা মহারাজার দরবারে উপস্থিত হয়েছেন, তখনই তিনি সেই সকল রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনাকালে কৃষি বা অর্থনৈতিক উন্নতির প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতেন। দেশীয় রাজাদের তিনি উন্নয়নমূলক কাজে প্রেরণা দিতে সর্বদাই আগ্রহী ছিলেন। বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থ থেকে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, স্বামীজী যখন জুনাগড়ে গিয়েছিলেন, তখন সেই রাজ্যের দেওয়ানের সঙ্গে তিনি রাজ্যের কৃষি ও আর্থিক সমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তবে তিনি এই সত্য মর্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশীয় রাজারা কখনই সাধারণ দুঃস্থ-দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে সবল ও ঋজু করে গড়ে তুলবেন না। অথচ যুগের প্রয়োজনে প্রজাসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি না হলে কোন রাজ্য-মহারাজ্যই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না এবং সমগ্রভাবে বৃহত্তর ভারতের জাগরণও সম্ভব হবে না। তাই তিনি তৎকালীন বহু রাজা-মহারাজাকে মহত্তর মানবকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে অনেক দেশীয় রাজা পরবর্তীকালে প্রজানুরঞ্জকরূপে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ভুজ রাজ্যে যখন তিনি যান, তখন সেখানেও উক্ত রাজ্যের দেওয়ানের সঙ্গে কৃষি, আর্থিক উন্নয়ন এবং শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা

৪। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১৩৫

সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা করেন—এমন তথ্যও বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়।[৫]

ভারতের কৃষিজীবী-সম্প্রদায়ের বন্ধনমুক্তির জন্য শিক্ষাবিস্তার একান্ত অপরিহার্য। আজ সমাজশিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে। এ-সম্পর্কে স্বামীজীর চিন্তাধারা আধুনিক চিন্তার জনক। তিনি গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল সমস্যাটাকে বাস্তব পটভূমিকায় উপলব্ধি করেছিলেন। তাই 'My Life and Mission' শীর্ষক ভাষণে তিনি তাঁর পরিকল্পনা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ '...আমার পরিকল্পনাগুলি ভারতের জনগণকে লক্ষ্য করিয়া। ধরুন, আপনি সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে শুরু করিলেন, তথাপি আপনি তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে পারিবেন না। কেমন করিয়া পারিবেন? চার বৎসরের একটি ছেলে বরং লাঙ্গল ধরিবে, অথবা অন্য কোন কাজ করিবে, তবু সে আপনার বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইবে না।'[৬]

দারিদ্রপীড়িত সমাজে শিক্ষার চাইতে ক্ষুধার অন্ন অনেক বেশী সত্য। অথচ দারিদ্রমুক্তির জন্য এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে আমাদের শোষিত ও বঞ্চিত কৃষকসমাজে শিক্ষাবিস্তার এক অপরিহার্য শর্ত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কৃষিকাজে নিয়োগ করতে হলে শিক্ষিত মন চাই, এটা স্বামীজী মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। তাই তিনি গণশিক্ষা-বিস্তারের পথ বলে দিলেন ঃ '...যদি পর্বত মহম্মদের কাছে না আসে, মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যাইতে হইবে। ...শিক্ষা কেন দ্বারে দ্বারে যাইবে না? চাষার ছেলে যদি বিদ্যালয়ে আসিতে না পারে, তাহা হইলে কৃষিক্ষেত্রে, ...যেখানে সে আছে, সেখানেই তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ছায়ার মতো তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাও।'[৭] আধুনিক সমাজশিক্ষার ধারণা কিংবা নিরক্ষরতা-দূরীকরণের কর্মসূচী যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলেও দেখতে পাব যে, বৃহত্তর জনসমাজ, যারা কৃষিনির্ভর, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্য সামনে রেখেই সেসব রচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বামীজীই এদেশে পথিকৃৎ। তিনি সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে গণশিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ '...দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। ...ক্রমশঃ ঐসকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখানো যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে।'[৮] '...এদিকে (এদেশের) জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে।'[৯] এটা ভারতপথিক স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রতিক্রিয়া হিসাবেই তিনি দেশের কোটি কোটি 'জ্যান্ত ঠাকুর'কে বাঁচাবার জন্য কৃষির উন্নতি করে অন্নের সংস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, শিক্ষার উন্নতি ঘটিয়ে কৃষকের জীবন পূর্ণায়ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা যখন অনুধাবন করি, তখন যেন মনে হয় এই দশকের কোন মনীষী আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিকে নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিচ্ছেন।

৫। স্বামী বিবেকানন্দ—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ২৫৩

৬। বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৭৩ ৭। তদেব

৮। তদেব, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৭৬ ৯। তদেব, পৃঃ ৭৯

শুধু এদেশে নয়, বিদেশের কৃষিবিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। মারি লুইস বার্ক রচিত 'Swami Vivekananda in the West : New Discoveries' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, আমেরিকা পরিভ্রমণকালে স্বামীজী সেদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা ও ক্রিয়াকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে আমরা দেখেছি ঃ 'Nor was this familiarity acquired through contact with intellectuals alone...he spoke...also with labourers and farmers....'[১০] অর্থাৎ তিনি সেদেশের শ্রমিক ও কৃষকদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে সচেষ্ট ছিলেন।

আর এই বিপুল ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বুঝেছিলেন, বিজ্ঞানশিক্ষার পরিপূরক হবে প্রযুক্তিবিদ্যা। প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে আমাদের মতো দেশের ক্ষেত্রে স্বামীজী দেখেছিলেন স্বয়ংনিয়োগ বা আত্মনির্ভরশীলতার প্রশস্ত মার্গ। এর দ্বারা বহু লোককে চাকরির উমেদারি থেকে বাঁচানো যেতে পারে।[১১] অর্থাৎ কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে যদি চিরাচরিত প্রথা ও পদ্ধতিকে বর্জন করে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটানো যায়, তাহলেই কৃষির উন্নতি ঘটতে পারে। কারণ, 'নেহাত চাষাড়ে বুদ্ধিতে চাষ নয়, বিদ্বান বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে করতে হবে। ...উৎপাদন ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না। ...লেখাপড়া-জানা লোক পল্লীগ্রামে বাস করলে আর চাষবাসটা বিজ্ঞান সাহায্যে করলে উৎপাদন বেশী হয়—চাষাদের চোখ খুলে যায়...।'[১২] এই মন্তব্য এবং আধুনিক প্রগতিশীল কৃষকের ধারণা কি সমগোত্রীয় নয়? মান্ধাতা আমলের শ্রম ও পদ্ধতিকে বর্জন করার জন্য আজ যে কৃষি-সম্প্রসারণের কার্যসূচী অনুসৃত হচ্ছে, তা কি উপরে উল্লিখিত বক্তব্যেরই অনুসারী নয়? তিনি নানা ব্যাপারেই পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুসরণ করতে বলেছেন, যদিও অন্ধ অনুকরণের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। কৃষির উন্নতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ 'পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর্—চাকরি গুখুরি করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে।'[১৩] আজ আমরা শিক্ষিত যুবকদের কৃষিকাজে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে নানারকম কর্মসূচী গ্রহণ করেছি এবং পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কৃষির উন্নতিতে বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়েছি। লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, আজ আমরা যা করতে চাই, সেটা করার নির্দেশ স্বামীজী বহু পূর্বেই দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বিদেশীদের কথায় আমরা যতটা কর্ণপাত করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, স্বদেশীয় চিন্তানায়কদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে হয়েছি ততটা উদাসীন। লজ্জার কি শেষ নেই?

কৃষিকাজকে হেয় জ্ঞান করার যে শতাব্দীপ্রাচীন অশুভ প্রবণতা আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, স্বামীজী তার বিরুদ্ধেও সবল প্রতিবাদ

১০। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Vol. 2—Marie Louise Burke, Advaita Ashrama, Calcutta, Third Edition (1984), p. 368

১১। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪০৩

১২। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩১৫-১৬ ১৩। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪

দেশকে স্বয়ম্ভর করে তোলার যে আবেগ আধুনিক ভারতবর্ষে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেই আবেগের প্রথম বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়। তথাকথিত শিক্ষিতজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি বলেছিলেন ঃ 'তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানিগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকিল হওয়া, না হয় বড়জোর কেরানিগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরি—এই তো! এতে তোদেরই বা কি হল, আর দেশেরই বা কি হল? একবার চোখ খুলে দেখ্, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি?'[২১] আত্মস্বার্থপূরণ নয়, জাতীয় জীবনের মানোন্নয়নে স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গি সেদিনও ছিল এক অভ্রান্ত সত্য, আজও কি তা-ই নয়? তিনি চেয়েছিলেন এক আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী সমাজের বিশাল অভ্যুদয়। তাই গ্রামভিত্তিক আমাদের ম্রিয়মাণ সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ঃ 'জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।'[২২]

কৃষি পরিকল্পনার মাধ্যমে এক সুস্থ ও সবল গ্রামীণ জীবন গড়ে তোলাই ছিল স্বামীজীর ধ্যানজ্ঞান। তাই তিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের শহরমুখী প্রবণতাকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন ঃ 'পল্লীগ্রামের ছেলেরা দুপাতা ইংরেজি পড়ে শহরে পালিয়ে আসে, গ্রামে হয়তো অনেক জায়গা জমি আছে, তাতে তাদের পেট ভরে না—মনের তৃপ্তি হয় না; শহুরে হতে হবে, চাকরি করতে হবে। অন্যান্য জাতের মতো আমাদের হিন্দু জাতটা তাই বেড়ে উঠতে পারছে না। ...উৎপাদন ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না। শহরে বাস করার ঝোঁক বেশী, আর একটু পড়াশোনা করলেই চাষার ছেলে স্বধর্ম ত্যাগ করে গোরার গোলামি করতে দৌড়োয়।'[২৩]

এই 'স্বধর্ম ত্যাগ' করার অভিশাপ আজও কি আমাদের গ্রামীণ সমাজকে বহন করতে হচ্ছে না? অসার শিক্ষাব্যবস্থা স্বকর্ম পালনে কখনই উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত করেনি, তাই গ্রামের শিক্ষিতজন শহরবাসী হয়, আর গ্রামগুলি আকণ্ঠ দারিদ্র এবং অশিক্ষার অন্ধকার বক্ষে ধারণ করেই দীনতায় টিকে আছে। গ্রামমুখী বা গ্রামকেন্দ্রিক বৃত্তিশিক্ষা, তথাকথিত উচ্চশিক্ষা নয়—এটাই বর্তমান যুগের দাবি এবং এই দাবিই বিবেকানন্দ উত্থাপন করেছিলেন ঃ 'পল্লীগ্রামে বাস করলে পরমায়ু বাড়ে, রোগ তো প্রায় হয় না; ছোটখাটো খারাপ গ্রামগুলো ভাল হয়ে ওঠে, লেখাপড়া-জানা লোক পল্লীগ্রামে বাস করলে আর চাষবাসটা বিজ্ঞান সাহায্যে করলে উৎপাদন বেশী হয়—চাষাদের চোখ খুলে যায়; তাদেরও একটু আধটু বুদ্ধি খোলে, লেখাপড়া করতে ইচ্ছা হয়, আর যেটা আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বেশী আবশ্যক তা-ও হয়। ...এই ছোট জাত আর বড় জাতের মধ্যে একটা ভাই ভাই ভাবে মেশামেশি হয়।'[২৪] এটাও কি আমাদের সর্বাধুনিক চিন্তারই প্রতিফলন নয়?

২১। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪ ২২। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৪১৯
২৩। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩১৫-১৬ ২৪। তদেব, পৃঃ ৩১৬

আজ যখন বেকার-সমস্যায় বিব্রত হয়ে আমরা কৃষিনির্ভর কর্মসংস্থানের দিকে নজর ফিরিয়েছি, যখন অনুভব করেছি, শুধু উৎপাদনের দিকে নয়, বেকারদের জন্য কাজের সংস্থান করার দিকেও নজর দিতে হবে, তখন স্বামী বিবেকানন্দের সেই উক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন ঃ '...প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।'[২৫]

এবার আমরা সঙ্গত প্রশ্নের অবতারণা করতে পারি। প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দ শোষিত এবং বঞ্চিত কৃষকদের স্বার্থে বিপ্লব বা বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ করেননি কেন? এটাও কি বুর্জোয়া মানসিকতার প্রমাণ নয়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে তৎকালীন অপ্রস্তুত পরিবেশ এবং অসংশোধিত পরিস্থিতির কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। পরবর্তীকালেও জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকবিপ্লব এদেশে খণ্ড খণ্ড চেহারা ধারণ করলেও, সামগ্রিক সাফল্যের পথ খুঁজে পায়নি। তিনি মনেপ্রাণে বিদেশী শাসন এবং শোষণ থেকে এদেশের মুক্তি চেয়েছিলেন এবং তিনি মনে করতেন স্বাধীনতালাভের পরে শোষিত শ্রেণীর মুক্তি সম্ভব। তিনি কোনদিনই হিংসাশ্রয়ী শ্রেণীসঙ্ঘর্ষে বিশ্বাস করতেন না। কারণ তিনি জানতেন ভারতের মাটিতে শ্রেণীবিদ্বেষ এক ভয়াবহ বিষবৃক্ষ রোপণ করবে। তিনি শ্রেণীসমন্বয়ের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই এদেশের আয় ও বণ্টনের সমতাসাধনের জন্য তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল খুবই স্পষ্ট। তিনি বলেছিলেন ঃ 'আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে...তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে! ...আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হল? ...সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে কোন দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—এ নিশ্চয় জানবি।'[২৬] এই দ্বিধাহীন কণ্ঠের সতর্কবাণী, এটাও কি বৃহত্তর মুক্তিসংগ্রামের পূর্বাভাষ নয়?

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ রীতিমতো সোচ্চার ছিলেন এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে তিনি বার বার ধিক্কার জানিয়েছিলেন। রুশনেতা ক্রোপটকিন যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় প্রত্যাশা বিবেকানন্দের কণ্ঠে রীতিমতো সবল ও ঋজু ভঙ্গিতে প্রকাশিত। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল ঃ '...এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে...শূদ্রধর্ম-কর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্যজগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।'[২৭] তবুও কি কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েই আমরা বিবেকানন্দকে বুর্জোয়া হিসাবে চিহ্নিত করব? অজ্ঞতার সীমাহীন প্রতারণা ঐতিহাসিক বিচারে আদৌ ক্ষমার যোগ্য

২৫। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৪১ ২৬। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৩৫-৩৬

২৭। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪১

নয়। নীচতলার শোষিত মানুষের জন্য তৎকালীন সমাজে কোন সুসংগঠিত প্রয়াস না দেখে স্বামীজী উচ্চারণ করেছিলেনঃ 'আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধুম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজসংস্কার-সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা "ভদ্রলোক" নামে প্রথিত ব্যক্তিরা "ভদ্রলোক" হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না!'[২৮] অর্থাৎ শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবী মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়োজন তিনি মনে মনে উপলব্ধি করেছিলেন। সব কথা বলার পরও একথা অবশ্যই স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, বিবেকানন্দ রাজনৈতিক নেতা কিংবা অর্থনীতিবিদ্ ছিলেন না, তিনি ছিলেন অপরাজেয় দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী। তিনি বলেছিলেনঃ 'এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্দাফরাশ—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে!...আর তোরা "হা চাকরি, জো চাকরি" করে করে লোপ পেয়ে যাবি। ...এখন ইতরজাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ। ...এইজন্য বলি, এইসব নীচ জাতদের ভেতর বিদ্যাদান জ্ঞানদান করে এদের ঘুম ভাঙাতে যত্নশীল হ।'[২৯] অর্থাৎ অসংগঠিত এবং অশিক্ষিত মানুষের পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রয়াস সফল হয় না, বিদ্রোহ করাটা নিছক হঠকারিতায় পরিণত হয়, এটা স্বামীজী যেমন বুঝেছিলেন, আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায়ও সেটাই প্রমাণ করেছে। সেইজন্যই তিনি গণশিক্ষা, গণচেতনা এবং গণসংগঠন গড়ার উপর জোর দিয়েছিলেন। তাতেই মানুষ আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে এবং তারই ফলে ঘটবে শোষিত মানুষের জগতে গণজাগরণ। হিংসাশ্রয়ী পথে বিদ্বেষের বীজ বপন করা হয়, সমন্বয়ের পথে সাধিত হয় নতুন সমাজের রূপায়ণ। সুতরাং কৃষক-বিদ্রোহের নামে হঠকারিতার পথ অনুসরণ করাটা যে এক ঐতিহাসিক অপরাধ হত—সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেদিক থেকে তাঁর চিন্তাধারা কি অনেক রাজনৈতিক নেতা বা অর্থনীতিবিদের তুলনায় অনেক বেশী প্রগতিশীল নয়?

২৮। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪ ২৯। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১০৭-০৯

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা

প্রস্তাবনা

আজ আমাদের দেশ ও জাতি এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। আমরা প্রতি মুহূর্তে দেখছি এক পুরাতন সমাজ তার জীর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ও মূল্যবোধ নিয়ে ক্রমবিলীয়মান। তার পরিবর্তে যে নূতন সমাজের রূপমণ্ডন চলছে, তা এখনও সর্বাংশে স্পষ্ট নয়। ইতিহাসের পটপরিবর্তনের এরূপ সন্ধিক্ষণে পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার জন্য গণমানসে বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা স্বাভাবিক। সেজন্য এই আগ্নেয় লগ্নে চিন্তাশীল ব্যক্তি ও মানবকল্যাণ চিন্তায় যাঁরা নিযুক্ত, তাঁদের দৃষ্টি খুঁজে ফিরছে সেই ক্রান্তদর্শী ঋষিকে, পুরাতন থেকে নূতনে উত্তরণ ঘটেছে যাঁর জীবনে, মননে ও চেতনায়। অবশ্য বহু মনীষীর যৌথ মননের ফলশ্রুতিতে নূতন কালের রূপমণ্ডন ঘটে। তবুও যাঁর মধ্যে এই নূতন পূর্ণায়ত হয়ে ওঠে, তাঁকেই বিশেষভাবে সেই নূতন যুগের স্রষ্টাপুরুষ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যাঁর মধ্যে এমনি করে একটি সম্পূর্ণ নূতন কাল রূপায়িত হয়ে ওঠে, তাঁর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। সেটি হল এই যে, যে-সকল মনীষীর মননের যৌথ প্রয়াস নূতন কালের রূপায়ণ ঘটায়, তাঁর মধ্যে তাঁদের চিন্তারাশির সমন্বয় ঘটতে হবে অর্থাৎ তাঁকে একটি দুরূহ কাজ করতে হয়, তাঁকে ঐসকল বিচিত্র চিন্তার মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। সেখানেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় মেলে। সেই সমন্বয় ও সামঞ্জস্য থেকেই পুরাতনের চৌহদ্দী থেকে চিন্তার মুক্তি ঘটে, এবং তারই ফলশ্রুতি নূতনের আবির্ভাব।

বর্তমান সময়ে আমরা নিঃসন্দেহে এসকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দেখি চিন্তানায়ক বিবেকানন্দকে। তাঁর চিন্তার গভীরে প্রবেশ করলে এ সত্য সহজেই প্রতিভাত হয়, যেমন হয়েছিল নিবেদিতার প্রজ্ঞাদৃষ্টির সম্মুখে। নিবেদিতার সমীক্ষান্ত সিদ্ধান্তঃ তাঁর মধ্যে অতীত ভারত ও পৃথিবীর অগণিত গুরু ও ঋষির অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ও সিদ্ধির উত্তরাধিকারীকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি একদিকে, অপরদিকে দেখেছি তাঁর মধ্যে ভাবী নূতন অভ্যুদয়ের এক প্রবর্তক ঋষিকে।[১] বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যায় যে, নিবেদিতার সিদ্ধান্ত নিছক গুরুভক্তিপ্রসূত নয়, এ উক্তি একজন নিপুণ সমাজবিজ্ঞানীর বিজ্ঞান ও যুক্তি ভিত্তিক প্রজ্ঞাপ্রসূত। যুক্তি ও প্রমাণসিদ্ধি ছাড়া নিবেদিতা কোন সিদ্ধান্ত দেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল একমাত্র সত্য। 'কঠিন সত্যের অনুসন্ধান শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পরিণতি'[২]—এ নিবেদিতারই কথা।

বিবেকানন্দের সমাজদর্শন এই নূতন কালের সমাজদর্শন, তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যানধারণাও এই নূতন কালের। বস্তুত বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল এক

১। The Master as I saw him—Sister Nivedita, Udbodhan Office, Calcutta, 1977, p. 80

২। Footfalls of Indian History—Sister Nivedita, Advaita Ashrama, Calcutta, 1956, p. 24

'আমূল রূপান্তর', এই 'আমূল রূপান্তর'কে রূপ দিতেই তাঁর আবির্ভাব। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এই রূপান্তরকে রূপ দিতে চেয়েছে। সেখানেই এই চিন্তাধারার গুরুত্ব।

কিন্তু বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন সময়ের বহু পূর্বে, সেজন্য তাঁর অগ্রগামী চিন্তাধারার সামগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি করার মতো মানসিক প্রস্তুতি আমাদের সেদিন ছিল না। সেদিন আমরা তাঁকে শুধু ধর্মাচার্য ও স্বদেশপ্রেমিক রূপেই দেখেছি। বলাই বাহুল্য, সে দেখা ছিল আংশিক। আজকালের অগ্রগতি তাঁর চিন্তার নূতন নূতন দিগন্ত উদ্ভাসিত করে তুলেছে। তারই ফলে আমাদের মধ্যে তাঁর চিন্তার একটি পূর্ণ মূল্যায়ন করবার প্রয়াস জেগেছে। সেই প্রয়াস হতেই আমরা পেয়েছি তাঁর অনন্য সমাজদর্শন ও তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার দিগ্‌দর্শন।

বস্তুত বিবেকানন্দের মধ্যে যে সকল প্রকার মানসিক শক্তির অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে, তিনি যে মানুষের সকল প্রকার মানসিক শক্তির মূর্ত সামঞ্জস্য—অজস্র নদী-জলধারা যেমন মহাসাগরে এসে মেশে, তাঁর মধ্যে যে ঠিক তেমনি করে পৃথিবীর যাবৎ ইতিবাচক চিন্তা এসে মিলিত হয়েছে—এ পরম সত্যটি ধারণা করতে না পারলে, তাঁর চিন্তার কোনও দিক সম্বন্ধেই সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাঁর চিন্তার যে দিকটি নিয়েই আলোচনা করি না কেন, এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা থাকে যে, তাঁর মধ্যে অসঙ্গতি ও স্ববিরোধ আছে। সেজন্য বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচনার প্রারম্ভেই সেই সামঞ্জস্যের ভিত্তিভূমিটির সন্ধান পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এই সামঞ্জস্যের ভিত্তিভূমিটি হলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক ঈশারউডের (Christopher Isherwood) ভাষায় এমন 'একটি আবির্ভাব' (a phenomenon), যা আশ্চর্য হলেও অনস্বীকার্য সত্য, অভিজ্ঞতার বস্তু।[৩] শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যে সমন্বয় ও ঐক্যকে বিবেকানন্দ মূর্ত দেখেছেন ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে, তারই সম্প্রসারণ তিনি ঘটিয়েছেন চিন্তার আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে, জগতের সমস্ত ইতিবাচক চিন্তাকে সমন্বিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এই সামঞ্জস্য-সূত্রটির সন্ধান পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদের ভিত্তিতে গড়ে তোলা দর্শনমতকে 'বেদান্ত'—এই প্রাচীন নামেই অভিহিত করেছেন। প্রাচীনের সঙ্গে বর্তমানের সঙ্গতি এভাবে রক্ষা করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু বিশ্বের যাবতীয় ইতিবাচক চিন্তার গ্রহণে এ দর্শনমতের ব্যাপকতা ও গভীরতা অনেক বেশী। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মারি লুইস বার্ক বলেছেনঃ স্বামীজী বেদান্ত শব্দটিকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তা তাঁর কিছুটা নিজস্ব। ...ইতিপূর্বে কখনও একে বিশ্বের সকল ধর্ম, সকল বিশ্বাস, মানুষের প্রত্যেক মহৎ প্রচেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করে—আধ্যাত্মিকতা ও জাগতিক উন্নতি, বিশ্বাস ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও মিস্টিক অনুভূতি, কর্ম ও ধ্যান, মানুষের সেবা ও একান্ত

৩। Ramakrishna and His Disciples—Christopher Isherwood, Advaita Ashrama, Calcutta, 1965, p. 1

ঈশ্বরনির্ভরতা—এ সবকিছুকে সমন্বিত করে একক একটি দর্শনমতে পরিণত হতে প্রসার ঘটানো হয়নি।[৪] রোমাঁ রোলাঁ বলেছেনঃ 'কিন্তু এই সামঞ্জস্যের সিদ্ধিকে রামকৃষ্ণের সঙ্গতিময় ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ না করিলে এই "বিচারকের" দৃপ্ত বিচার-বুদ্ধিও ঐ সামঞ্জস্যের সূত্রকে আবিষ্কার করিতে পারিত না।'[৫] রোমাঁ রোলাঁর মতে, 'বিবেকানন্দ এই সঙ্গতিকে...পৃথিবীময় প্রসারিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সেখানেই ছিল তাঁহার সাহস ও স্বকীয়তা।'[৬]

এই দুঃসাহসিক চিন্তার সমগ্রতা হতেই বিবেকানন্দের সমাজদর্শন রূপ নিয়েছে। এই সমগ্রতার তাৎপর্য নিবেদিতার একটি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় উদ্ভাসিত। বিবেকানন্দের রচনাবলীর ভূমিকায় নিবেদিতা এই ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেনঃ 'বহু এবং এক—একই সত্তা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় মনের দ্বারা অনুভূত একই সত্তার বিভিন্ন বিকাশ...। বহু এবং এক—যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি—সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। ...তাঁহার নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটিয়া ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। ...এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "চারুকলা বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়।"'[৭]

বিবেকানন্দের সমাজদর্শনঃ

বিবেকানন্দের সমাজদর্শন চিন্তার সমগ্রতার এই গভীর তাৎপর্য হতে প্রসূত, সেজন্য এ সমাজদর্শন সমগ্রতায় অনন্য, এদিক দিয়ে এর তুলনা নেই। এর মূলে আছে প্রাচীন বেদান্ত-দর্শন, কিন্তু বেদান্ত আর এখানে ব্যক্তির মোক্ষশাস্ত্র হয়ে নেই, এর গভীর তাৎপর্য উদ্ঘাটনে এ একটি অগ্নিগর্ভ বিপ্লব-দর্শন হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণের বেদান্তভিত্তিক 'জীবই শিব' বাণীর পরিপ্রেক্ষিতেই এটা ঘটেছে। বিবেকানন্দের সমাজদর্শন মূলত এই বিপ্লব বা রূপান্তরের দর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদের আলোকে ব্যাখ্যাত নববেদান্ত ব্যতীত বিবেকানন্দের সমাজদর্শনের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে আছে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি যাবতীয় মানবিকী বিদ্যা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিবেকানন্দের গণমানসের

৪। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Part Two—Marie Louise Burke, Advaita Ashrama, Calcutta, Third Edition (1984), pp. 383-84

৫। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী—রোমাঁ রোলাঁ (অনুবাদঃ ঋষি দাস), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৭৬), পৃঃ ২৬৮

৬। তদেব, পৃঃ ২৬৯

৭। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১/.-১৶. (ভূমিকা)

সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়প্রসূত গভীর জ্ঞান। যাঁরা তাঁর বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থের* সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন যে, ভারতে পরিব্রাজক জীবনে এবং বিশ্বপরিক্রমাকালে তিনি সর্বত্র গণজীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং বিভিন্ন দেশের বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন বিশ্বাস, ধর্ম, নৈতিক আচরণ, নিয়ম-শৃঙ্খলা, বিধিনিয়ম, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, আর্থিক সংগঠন প্রভৃতি সব দিক সযত্নে আয়ত্ত করেছিলেন, অগণিত সাধারণ মানুষ—শ্রমিক, কৃষক, শিল্পী প্রভৃতি সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর সমাজদর্শনের অন্যতম ভিত্তি এই প্রত্যক্ষলব্ধ গণমানসের জ্ঞান। সর্বোপরি বিশ্বসত্য সম্বন্ধে আপন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তাঁকে এই সকল উপাদানকে সমন্বিত করবার দৃষ্টি দিয়েছিল।

এই সকল উপাদানে গঠিত তাঁর সমাজদর্শন বৈজ্ঞানিকতায়, যুক্তির সারবত্তায় ও বাস্তবতায় অনন্য। এর পূর্ণ রূপরেখার আলোচনার অবকাশ আমাদের এখানে নেই, প্রয়োজনও নেই, শুধু এর সারমর্মটুকু এখানে উল্লেখ করলেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে, আমরা তাঁর সমাজদর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার মূল সূত্রগুলির সন্ধান লাভ করব।

সমগ্র অদ্বৈতবেদান্ত-তত্ত্বকে বিবেকানন্দ দুটি সরলীকৃত মূল সূত্রে পরিণত করেছেন ঃ

১। মানুষের দেবত্ব ;

২। মানবজীবনের অনিবার্য আধ্যাত্মিক পরিণতি।

বেদান্তের এই দুটি সূত্র যদি সত্য হয়, তাহলে তাকে বাস্তব হতেই হবে। এ দুটি সূত্র হতে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আরও দুটি সূত্র পাই যা বাস্তব রূপায়ণের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যময়। এই দুটি সূত্র ঃ

১। মানুষের সব সমাজ, সব রাষ্ট্র, সব ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের স্বীকৃতির উপর ;

২। মানুষের সব স্বার্থ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে মানুষের অনিবার্য আধ্যাত্মিক পরিণতির প্রয়োজনে।[৮]

বিবেকানন্দের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার ভিত্তি এই দুটি শেষোক্ত সূত্রের উপর।

॥ ১ ॥

বিবেকানন্দের রাষ্ট্রীয় চিন্তা

রাজনীতি-শাস্ত্র ঃ

সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির বিকাশসাধন—বিবেকানন্দের রাষ্ট্রীয় চিন্তার এটিই মূল কথা। রাজনীতি-শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় আলোচনায়

* দ্রষ্টব্য ঃ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ; The Life of Swami Vivekananda—His Eastern and Western Admirers, Advaita Ashrama, Calcutta

৮। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, পৃঃ ২৭৬

লেখনী ধারণ না করেও বিবেকানন্দ বেদান্তের ব্যবহারিক তাৎপর্য আলোচনাক্রমে রাজনীতি-শাস্ত্রকে মৌলিক চিন্তার দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। রাজনীতিশাস্ত্রের আরম্ভ সমাজ সম্পর্কে আলোচনা দিয়ে। বিবেকানন্দ সমাজ সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন একটি চিঠিতেঃ '...এক কথায়, প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ স্বরূপ—ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকেই আমরা অনাদিকাল থেকে বহির্জগতে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছি...।'[৯] বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বিবেকানন্দ বলছেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল করেঃ 'যখন জীবাত্মা একথা বুঝতে পারে, তখনই সে এই জগৎ-কল্পনা থেকে নিবৃত্ত হয়, এবং ক্রমশই বেশী করে নিজের অন্তরাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এরই নাম ক্রমবিকাশ—এতে যেমন শারীর-বিবর্তন ক্রমশ কমে আসতে থাকে, তেমনি অপর দিকে মন উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে উঠতে থাকে; মানুষই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিকাশ। ...ধর্মতত্ত্বে এই ক্রমবিকাশকেই "ত্যাগ" বলা হয়েছে। সমাজ-গঠন, বিবাহপ্রথার প্রবর্তন, সন্তানের প্রতি ভালবাসা, সৎকার্য, সংযম এবং নীতি—এগুলি ত্যাগেরই বিভিন্ন রূপ। প্রত্যেক সমাজে জীবন বলতে বুঝায় ইচ্ছা তৃষ্ণা বা বাসনাসমূহের সংযম। জগতে যত সমাজ ও সামাজিক প্রথা দেখা যায় সেসব একটি ব্যাপারেরই বিভিন্ন ধারা ও স্তরমাত্র; সেটি এই—ইচ্ছার বা কল্পিত "আমি"র বিসর্জন...।'[১০]

বিবেকানন্দের এই উক্তিতে সমাজগঠনের মূল উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সে উদ্দেশ্য ব্যক্তির ক্রমবিকাশে সহায়তা করা। মানুষের ক্ষেত্রে এ ক্রমবিকাশের তাৎপর্য মনের বিকাশ। ম্যাকাইভার তাঁর 'Society' নামক মহাগ্রন্থে সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একথাই বলেছেনঃ সমাজ মানব প্রকৃতির বিকাশ।[১১] কিন্তু বিবেকানন্দ প্রদত্ত ব্যাখ্যা অধিকতর স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। মানুষকে 'ত্যাগের' পথে উন্নীত করা বা তার স্বরূপ উপলব্ধি বা সুপ্ত শক্তিসমূহের বিকাশের জন্যই সমাজ, সমাজের বিধিনিয়ম, প্রথা-প্রতিষ্ঠানসমূহ।

রাষ্ট্রের লক্ষ্য ঃ

রাষ্ট্র সমাজের নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র, সেজন্য রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও সমাজের লক্ষ্য অভিন্ন। সমাজ ও রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও প্রচুর চিন্তা করেছেন। হেগেলের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নৈতিক বিধির রূপায়ণ। হেগেল বলেছেনঃ রাষ্ট্র একটি সচেতন নৈতিক বস্তু এবং একটি আত্মজ্ঞ স্বয়ং ক্রিয়াশীল ব্যক্তিত্ব ('a selfconscious ethical

---

৯। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৪৬

১০। তদেব, পৃঃ ৩৪৬-৪৭

১১। 'Social beings, men, express their nature by creating and re-creating an organization which guides and controls their behaviour in myriad ways. This organization, society, liberates and limits the activities of men, sets up standards for them to follow and maintain....' [Society : An Introductory Analysis—R. M. Maciver and Charles H. Page, Macmillan & Co. Ltd., London, 1961, p. 5]

substance and a self-knowing and self-actualizing individual.')।[১২] বার্জেসের (Burgess) মতে রাষ্ট্রের শেষ লক্ষ্য মানুষের পূর্ণতা আর আশু লক্ষ্য ব্যক্তিস্বাধীনতা।[১৩] স্পষ্টত এঁর মতের সঙ্গে বিবেকানন্দের মতের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বার্জেসের জন্ম আমেরিকায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় তাঁর অগ্নিময়ী ভাষণ দিতে শুরু করেন তখন বার্জেস তরুণ যুবা। এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বিবেকানন্দের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে বিবেকানন্দের মতো ধারণার স্পষ্টতা ও যুক্তির বিস্তার এঁদের কারও মধ্যে দেখা যায় না।

আদর্শবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব ও বিবেকানন্দঃ

হেগেল শেষ পর্যন্ত অভিমত দিয়েছেনঃ রাষ্ট্র 'একটি স্বয়ংসিদ্ধ সংস্থা (An end in itself)।' এ মতের সূচনা দেখা গিয়েছিল গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল-এর মধ্যে, হেগেল ও কান্ট এ মতের বিস্তার ঘটান। কান্ট তাঁর 'Metaphysical First Principles of the Theory of Law' গ্রন্থে বলেছেনঃ রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান, দৈবীসত্তাসম্পন্ন, তার সর্বশক্তির উৎস ঈশ্বর, সুতরাং রাষ্ট্রের কোন ভুলভ্রান্তি হতে পারে না। সুতরাং সর্বাবস্থায় তার প্রতি আনুগত্য রাখতেই হবে।[১৪] কান্টের চিন্তার উত্তরাধিকারী হেগেল বললেনঃ রাষ্ট্র হল মানুষের পূর্ণতা-সিদ্ধির প্রতীক ('the state is man in his fullness and perfection of development')।[১৫] রাষ্ট্রের অধীনতাতেই ব্যক্তির স্বাধীনতা।[১৬]

রাজনীতি-শাস্ত্রে রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় এ তত্ত্বের নাম Idealistic Theory of the State অর্থাৎ আদর্শবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব। কেউ কেউ বিবেকানন্দকে এই মতবাদের অনুবর্তী বলে অভিহিত করেছেন। তার কারণ বিবেকানন্দের একটি প্রখ্যাত উক্তিঃ 'সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য।'[১৭] এ-প্রসঙ্গে রাজনীতি-শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেনঃ '...স্বামী বিবেকানন্দ গ্রীনের ন্যায় হেগেলীয় মত অনুসরণ করিয়াও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রচুর অবকাশ রাখিয়াছেন।'[১৮] বিবেকানন্দ হেগেলের মত অনুসরণ করেছেন আমরা ঠিক

১২। Introduction to Modern Political Theory—C. E. M. Joad, Oxford University Press, London, 1959, p. 13

১৩। Political Science and Government—J. W. Garner, The World Press Private Ltd., Calcutta, 1951, pp. 71-2 ১৪। ibid., 1958, p. 211 ১৫। ibid., p. 212

১৬। ibid., p. 213 ১৭। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ২৩৮

১৮। বিশ্ববিবেক—সম্পাদনাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শঙ্কর, বাক্-সাহিত্য, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৭৩), পৃঃ ২৭৩

এই মতটি গ্রহণ করতে পারছি না। বস্তুত হেগেল ও গ্রীনের সঙ্গে বিবেকানন্দের মতের আকাশপাতাল পার্থক্য। বিবেকানন্দের উপরোক্ত উক্তি 'সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন'—বেদান্তোক্ত সত্য, কিন্তু বিবেকানন্দ উক্তিটি করেছেন যে-প্রসঙ্গে তা হল এই যে, কোন বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের দাবি যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ তাতে সমষ্টি অর্থাৎ জনগণ বঞ্চিত হয়। বিবেকানন্দের উক্তির তাৎপর্য এই যে, শ্রেণীস্বার্থ যেন জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে না যায়। সুতরাং হেগেলের যে মতবাদ রাষ্ট্রই সব, ব্যক্তির কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, আর বিবেকানন্দের যে মত, যে জনগণই সমস্ত রাষ্ট্র-শক্তির উৎস এবং তাদের অধিকারই সর্বাগ্রগণ্য—তা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাছাড়া, বেদান্ত-দর্শন ও হেগেলীয় দর্শনে অনেক পার্থক্য। হেগেলকে তিনি কঠোর সমালোচনাও করেছেন।[১৯] বেদান্তবাদী হিসাবে বিবেকানন্দ হেগেলের এ মত কখনই সমর্থন করেননি যে, অপূর্ণ জগতের কোন প্রতিষ্ঠান সেই পূর্ণত্বের প্রতীক হতে পারে।

বরঞ্চ বিবেকানন্দ যে রাষ্ট্রকে অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত প্রতিষ্ঠান মনে করতেন তার প্রমাণ আছে। ইতিহাস অনুশীলন হতে তিনি জেনেছিলেন যে, ব্যক্তিকে পূর্ণ বিকাশের পথে নিয়ে যাওয়া সমাজের মূল লক্ষ্য হলেও বাস্তবে রাষ্ট্র শ্রেণীশাসকদের হাতে শোষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিটি এ-বিষয়ে প্রচুর আলোকপাত করছে ঃ 'একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগল—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেইসব ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগল। সকলে মিলে সেইসব বিনিময় করতে লাগল, আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ-জায়গার জিনিসটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে। একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম ; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম করে কতকটা আগ ভাগ নিলে। অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে মলো !! পাহারাওয়ালার নাম হল রাজা, মুটের নাম হল সওদাগর। এ দু-দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগল। যে জিনিস তৈরী করতে লাগল, সে পেটে হাত দিয়ে "হা ভগবান" ডাকতে লাগল।'[২০] এখানে দেখা যাচ্ছে রাজশক্তি ও তার রাষ্ট্রযন্ত্র কিরূপে শোষক-শ্রেণীর সহায়তা করছে—বিবেকানন্দ তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

বিবেকানন্দের উপরোক্ত উক্তিতে যে মত প্রকাশিত হয়েছে, মার্কসীয় মতবাদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে। মার্কসীয় মতবাদেও মূলকথা এই যে, রাষ্ট্র হল শোষণের যন্ত্র।[২১] এই ধরনের কিছু সাদৃশ্যের জন্য কেউ কেউ বিবেকানন্দকে মার্কসীয় চিন্তার

১৯। 'Fortunately for us, Hegelianism was nipped in the bud and not allowed to sprout and cast its baneful shoots over this motherland of ours.' [The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, Advaita Ashrama, Calcutta, Ninth Edition (1964), p. 342]

২০। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০৩-০৪

২১। 'The cohesive force of civilized society is the state, which in all typical periods is exclusively the state of the ruling class, and in all cases remains essentially a machine

অনুবর্তী মনে করেছেন।[২২] কিন্তু বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তার পার্থক্য একবারে মৌলিক। বিবেকানন্দ মূলত অধ্যাত্মবাদী, মার্কস কট্টর জড়বাদী, বিবেকানন্দ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূজারী, মার্কসের মতে সমাজই সব, এবং সমাজের প্রতিভূ রাষ্ট্রের সর্বনিয়ন্ত্রক ক্ষমতার কাছে ব্যক্তির আত্মসমর্পণেই সার্থকতা—অবশ্য যখন সে রাষ্ট্র শ্রমিক রাষ্ট্র আর তখন ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নই ওঠে না। বিবেকানন্দ সমাজের 'যূপকাষ্ঠে ব্যক্তির বলিদান' কোন অবস্থাতেই সমর্থন করেননি, তাঁর মতে ব্যক্তির স্বাধীনতা ব্যতীত কোন বিকাশ, কোন কল্যাণ সম্ভব নয়।

বিবেকানন্দের চিন্তার স্বকীয়তা ঃ

সুতরাং দেখা যাচ্ছে হেগেল ও মার্কস—দুই প্রান্তের দুই চিন্তানায়ক—এঁদের মধ্যে কারও অনুবর্তী নন বিবেকানন্দ। কিন্তু উভয়ের চিন্তার মধ্যে যা সত্য, যা সারবস্তু, তা বিবেকানন্দের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। সেজন্য উভয়ের চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তার কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। বিবেকানন্দের চিন্তার মূল ভিত্তি বেদান্ত। এজন্য বিবেকানন্দের মত স্বকীয়তায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। রাষ্ট্র সম্পর্কে বিবেকানন্দ যা বলেছেন তার সারমর্ম হলঃ রাষ্ট্রের শেষ লক্ষ্য ব্যক্তির সুপ্ত শক্তিসমূহের বিকাশের সুযোগ প্রদান, কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র এ পর্যন্ত সে উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেনি, শক্তিশালী শ্রেণীর কবলিত হয়ে পড়ায় রাষ্ট্র তাদের বিশেষ সুবিধা সংরক্ষণ করে আসছে, ফলে জনসাধারণ তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্র কোন অন্যায় করতে পারে না, অবিচার করতে পারে না বা রাষ্ট্রের অধীনতাতেই ব্যক্তির স্বাধীনতা—যে মত হেগেল পুরোপুরি, মার্কসও অবস্থা বিশেষে সমর্থন করেছেন, বিবেকানন্দ কোন অবস্থাতেই তা সমর্থন করেননি।

রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপত্তি ঃ

রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ মূলত ক্রমবিকাশবাদী। দেবাসুরের সংগ্রামের রূপক সহায়ে বিবেকানন্দ রাষ্ট্র ও সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস উপস্থাপিত করেছেন অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে ঃ 'দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস করতো, তারা অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো ; যারা সমতল জমিতে, তাদের—চাষবাস ; যারা পার্বত্য দেশে, তারা ভেড়া চরাত ; যারা মরুময় দেশে, তারা ছাগল উট চরাতে লাগলো ; কতকদল জঙ্গলের মধ্যে

---

for keeping down the oppressed, exploited class.' [Selected Works of Karl Marx and Frederick Engels, Vol. II, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1955, p. 323]

২২। Swami Vivekananda : Patriot-Prophet—Bhupendranath Datta, Nababharat Publishers, Calcutta, 1954, See : Foreword

বাস করে, শিকার করে খেতে লাগলো। যারা সমতল দেশ পেলে, চাষবাস শিখলে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পেলে, তারা অধিকতর সভ্য হতে লাগলো। ...শিকারী বা পশুপাল বা মৎস্যজীবী আহারে অনটন হলেই ডাকাত বা বোম্বেটে হয়ে সমতলবাসীদের লুঠতে আরম্ভ করলে। সমতলবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য ঘনদলে সন্নিবিষ্ট হতে লাগলো, ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হতে লাগলো।

'...ক্রমে দু-দিকেই দল বাড়তে লাগলো, লক্ষ লক্ষ দেবতা একত্র হতে লাগলো, লক্ষ লক্ষ অসুর একত্র হতে লাগলো। মহাসঙ্ঘর্ষ, মেশামেশি, জেতাজেতি চলতে লাগলো।

'এ সব রকমের মানুষ মিলেমিশে বর্তমান সমাজ, বর্তমান প্রথাসকলের সৃষ্টি হতে লাগলো...।'[২৩]

উপরোক্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তিনটি সিদ্ধান্ত ঃ

১। প্রথম, রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপত্তি কোন সামাজিক চুক্তির ফল নয়, ক্রমবিকাশের ফল। রুশো, হব্‌স্, লক এই সামাজিক চুক্তির কথা বলেছেন।[২৪] তাঁদের মতে রাষ্ট্র একটি সামাজিক চুক্তির ফল। হিউম, বার্ক, গ্রীন প্রভৃতি লেখকগণ এই সামাজিক চুক্তি-তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন।[২৫] তাঁদের বক্তব্য—এরূপ কোন সামাজিক চুক্তি যে ঘটেছিল তার কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এ মত বর্তমানে রাজনীতিশাস্ত্রে প্রমাণসিদ্ধ নয় বলে পরিত্যক্ত। বিবেকানন্দ যে ক্রমবিকাশ তত্ত্বের কথা বলেছেন, সেটিই বর্তমানে রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে সর্বজনগৃহীত।

২। দ্বিতীয় যে সিদ্ধান্ত বিবেকানন্দ এখানে দিয়েছেন তা হল এই যে, রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সঙ্ঘর্ষ ও বলপ্রয়োগ নিহিত আছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বলপ্রয়োগবাদ বা Theory of Force প্রচলিত আছে তার মধ্যে যে কিছু সত্য আছে তা আজকের রাষ্ট্রনীতিবিদেরা স্বীকার করেন।

৩। বিবেকানন্দের তৃতীয় সিদ্ধান্ত হল এই যে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিশেষ সুবিধার মাধ্যম হিসাবেও ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, বিবেকানন্দের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে মার্কসীয় সিদ্ধান্তের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

বর্তমানকালে রাজনীতি-শাস্ত্রবিদেরা বলেন যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তির পশ্চাতে বলপ্রয়োগবাদ ও অন্যান্য মতবাদগুলি যেসকল উপাদানের কথা বলেছে সে সবগুলিই কিছু কিছু বর্তমান। রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে এ সব উপাদানেরই কিছু কিছু অবদান রয়েছে। বিবেকানন্দও ঠিক সেই কথাই বলেছেন বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি ঃ

সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিবেকানন্দের সুনির্দিষ্ট অভিমত হল এই যে, এগুলি জীবদেহের অনুরূপ এই অর্থে যে এদের বিকাশ ঘটে আভ্যন্তরীণ স্বধর্মে, এদের বিকাশ

২৩। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০২-০৩

২৪। Political Science and Government, pp. 205-06 ২৫। ibid., p. 207

বাহ্য শক্তির চাপে যান্ত্রিক নিয়মে ঘটে না। ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'Philosophy of Man-making' নামক গবেষণা গ্রন্থে বলেছেন, রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ধারণা আংশিকভাবে যান্ত্রিক, আংশিকভাবে জৈবিক।[২৬] কিন্তু রাষ্ট্র যান্ত্রিক নিয়মের অধীন—এ মতের সপক্ষে তিনি বিবেকানন্দের কোন উক্তি উল্লেখ করেননি। এ-বিষয়ে নিবেদিতা স্বামীজীর মত স্পষ্ট উদ্ধৃত করেছেন তাঁর 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে। নিবেদিতা বলছেন ঃ 'কোন জাতিতে বল সঞ্চার করিতে হইলে উহাকে কিরূপ ভাব দেওয়া উচিত ? তাহার নিজের উন্নতির গতি একদিকে চলিতেছে, তাহাকে "ক" বলা যাউক। যে নূতন বল সঞ্চারিত হইবে, তাহা কি সঙ্গে সঙ্গে উহার কিঞ্চিৎ হ্রাসও করিবে, যেমন "খ" ? ইহার ফলে এতদুভয়ের মধ্যপথবর্তী এক পরিণতি হইবে, যেমন "গ"। ইহা তো জ্যামিতিক পরিবর্তন মাত্র। এরূপ তো চলিবে না। জাতীয় জীবন জৈবিক শক্তির ব্যাপার। আমাদিগকে সেই জীবনস্রোতটিকেই বলাধান করিতে হইবে, অবশিষ্ট কার্য উহা নিজে নিজেই করিয়া লইবে। বুদ্ধ "ত্যাগ" প্রচার করিলেন, ভারত উহা শুনিল ; এবং এক সহস্র বৎসর মধ্যে ভারত জাতীয় সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিল। ত্যাগই ভারতের জাতীয় জীবনের উৎস।'[২৭] এখানে স্পষ্টতই সমাজ-জীবনের বিকাশ জৈবিক নিয়মের অধীন সেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র সমাজ-জীবনের অঙ্গ, সুতরাং একই নিয়মের অধীন।

'বর্তমান ভারত' পুস্তকে বিবেকানন্দ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী কিভাবে শাসনক্ষমতা হতে চ্যুত হয় তা বোঝাতে গিয়ে জীবদেহতত্ত্বের[২৮] সাহায্য নিয়েছেন। সেখানে বিষয়টির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'শক্তিসঞ্চয় যে-প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।'[২৯] এখানে জীবদেহের সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে বিবেকানন্দ সমাজ-জীবনের এই একান্ত সত্যটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন যে, কোন বিদ্যা বা শক্তি যা হয়তো কোন বিশেষ শ্রেণী অর্জন করেছে, তাতে সেই বিশেষ শ্রেণীরই একচেটিয়া অধিকার থাকবে তা নয়, সর্বস্তরের মানুষের তাতে অধিকার, সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে হবে। সমাজের

২৬। The Philosophy of Man-making—Shanti L. Mukherji, New Central Book Agency, Calcutta, 1971, p. 146 ২৭। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩১১

২৮। Political Science and Government, pp. 194-95

২৯। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৫

সর্বস্তরে যদি অধিকৃত বিদ্যা বা শক্তি না পৌঁছাতে পারে, তাহলে সে সমাজ ক্রমে ধ্বংসকবলিত হয়—এ সিদ্ধান্তও তিনি এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ 'বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য—যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য ; একথা মনে থাকে না—গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।'[৩০]

শুধু সমাজই নয়, বিশেষ করে রাষ্ট্রের সংগঠনও যে জৈবিক সংগঠনের অনুরূপ এইটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ আরও বলেছেন ঃ 'রাজরূপ কেন্দ্র তজ্জন্যই সমাজ দ্বারা সৃষ্ট। শক্তিসমষ্টি সেই কেন্দ্রে পুঞ্জীকৃত এবং তথা হইতেই চারিদিকে সমাজশরীরে প্রসৃত।'[৩১]

রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ধারণার মূল্যায়ন ঃ

রাষ্ট্রের শক্তি প্রজার স্বার্থসাধনের জন্য, শাসকশ্রেণীর স্বার্থসাধনের জন্য নয়—বিবেকানন্দের রাষ্ট্র সম্বন্ধে এ কথা হল শেষ কথা। বিবেকানন্দের এই শেষ সিদ্ধান্ত আদর্শবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের ঠিক বিপরীত। রাষ্ট্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা নয় (not an end in itself)। রাষ্ট্রের লক্ষ্য প্রজার স্বার্থসাধন।

এ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করেছি তা থেকে একটি কথা সুস্পষ্ট। সেটি হল এই যে, রাজনীতি-শাস্ত্রে বিবেকানন্দের প্রগাঢ় অধিকার ছিল। রাষ্ট্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গঠন, উৎপত্তি ও বিকাশ—এ সবকিছু সম্বন্ধে তিনি নিজস্ব মতামত রেখেছেন। তা শুধু নয়, তাঁর সমন্বয়ী প্রতিভা এখানে যা ঘটিয়েছে তা সত্যই আশ্চর্য। তদানীন্তন বিভিন্ন বিপরীত মতের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি রাষ্ট্রের প্রকৃতি, লক্ষ্য ও কার্য সম্বন্ধে যে-সকল সত্যের উদ্‌ঘাটন করেছেন তা রাজনীতি-শাস্ত্রে অতি মূল্যবান অবদান।

তা-ও শুধু নয়, রাষ্ট্রের ধারণার ক্ষেত্রে আদর্শ ও বাস্তবে যে পার্থক্য ঘটে গিয়েছিল—যার ফলে (হ্যারল্ড ল্যাস্কি বর্ণিত)[৩২] রাষ্ট্রতত্ত্বে এক মহাসঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল—তা দূরীভূত হয়েছে বিবেকানন্দের চিন্তায়।

হেগেল ও মার্কসের রাষ্ট্রতত্ত্ব আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলে প্রতীয়মান। কিন্তু বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে দেখা যায় যে, উভয়ের চিন্তার ভিত্তিতে একই আদর্শ—রাষ্ট্রের বল্গাহীন ক্ষমতার সমর্থক উভয়েই। উভয়েরই মতের তাৎপর্য রাষ্ট্রযন্ত্রের নিকট ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিসর্জন, রাষ্ট্রনির্দিষ্ট কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ—উভয়ের প্রতিপাদ্য। মার্কস কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকার ধনিকশ্রেণীর কবল থেকে উদ্ধার করে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন—কিন্তু উভয়েরই দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হল সার্বিক ক্ষমতাসম্পন্ন (totalitarian)। মার্কস অবশ্য বলেছেন যে, শোষণহীন সমাজে

৩০। তদেব, পৃঃ ২৩৮ ৩১। তদেব, পৃঃ ২৩৫

৩২। A Grammar of Politics—Harold J. Laski, George Allen & Unwin Ltd., London, Fourth Edition (1951), See : Introductory Chapter

রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না, কারণ রাষ্ট্র হল শোষণের যন্ত্র, শোষণ যখন নেই, তখন রাষ্ট্রও শূন্যে মিলিয়ে যাবে ('The state shall simply wither away')। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আজ সমাজতান্ত্রিক দেশেও রাষ্ট্রের ক্ষমতা ক্রমবর্ধমান। বিবেকানন্দও ইতিহাস অনুশীলন করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, ভবিষ্যৎ সমাজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে শ্রমিকশ্রেণী। কিন্তু তাঁর মতে শ্রমিক-সমাজেও সাম্য-অসাম্যের দ্বন্দ্ব কখনও একেবারে দূরীভূত হবে না, কারণ মায়িক জগতে এ দ্বন্দ্ব চিরদিনের, বেদান্তবাদের প্রতিপাদ্য তা-ই। সুতরাং পূর্ণ শ্রেণীহীন সমাজ, যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র থাকবে না—সে শুধু একটি আকাশকুসুম বা ইউটোপীয়া (utopia)। সুতরাং রাষ্ট্রযন্ত্র চিরদিনই থাকবে, তার প্রয়োজন কোনদিনই শেষ হবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রতত্ত্বে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সঙ্কটের কথা ল্যাস্কি উল্লেখ করেছেন তার অবসান ঘটিয়েছেন বিবেকানন্দ তাঁর ইতিহাস-আশ্রয়ী ও বেদান্তভিত্তিক চিন্তা সহায়ে।

বিবেকানন্দের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার একটি প্রশংসনীয় দিক উপরে উদ্ঘাটিত। সেটি হল এই যে, তাঁর চিন্তায় কোন অবাস্তব আদর্শবাদ স্থান পায়নি, স্থান পায়নি কোন ইউটোপীয়া (utopia)। বস্তুত এ-বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত বাস্তব ও ইতিহাস-আশ্রয়ী। তার অপর একটি দৃষ্টান্ত ঃ রাষ্ট্র ও সমাজকে তিনি জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন তাদের বিকাশধর্ম বোঝাবার জন্য, কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্সারের মতো তিনি কখনও এ দাবি করেননি যে, রাষ্ট্র একটি স্বতন্ত্র জীবদেহ, তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, তার মস্তিষ্ক হল সরকার।[৩৩] জীবন্ত মানুষদের সংগঠন রাষ্ট্র ও সমাজ জীবদেহের মতো আভ্যন্তরীণ কারণে বিকাশ-নিয়মের অধীন, কিন্তু তা বলে রাষ্ট্র বা সমাজ স্বতন্ত্র জীবদেহ নয়। পুনরায়, রাষ্ট্র শোষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে শ্রেণীসমাজে, তা বলে রাষ্ট্র কেবলমাত্র একটি শোষণ-যন্ত্র নয়। বিবেকানন্দের আশ্চর্য বাস্তবদৃষ্টি ভারসাম্যহীনতা ঘটায়নি কোন ধারণার ক্ষেত্রেই।

শুধু রাষ্ট্রের আদর্শ, উদ্দেশ্য, গঠন, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধেই বিবেকানন্দের রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান-ধারণা সীমাবদ্ধ নয়। রাজনীতি-শাস্ত্রের অন্যান্য আরও কয়েকটি ধারণার ক্ষেত্রেও তিনি নিজস্ব মৌলিক অভিমত রেখেছেন। সেগুলি এবারে আমরা আলোচনা করতে প্রয়াস পাব।

শ্রেণীরাষ্ট্রের বিকাশধারা ঃ

ইতিহাস বিশ্লেষণ সহায়ে বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্র বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর হাতে এসেছে। পুরোহিত ও ক্ষত্রিয় অধিকারের যুগ শেষে বর্তমানে বৈশ্য অধিকারের যুগ চলছে, ভবিষ্যতে রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকারে আসবে শূদ্র শ্রেণী। তাঁর মতে প্রত্যেকটি শ্রেণীরাষ্ট্রেরই দোষগুণ বর্তমান। তাঁর ভাষায় ঃ 'পুরোহিত-শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সঙ্কীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকার রক্ষার

৩৩। Political Science and Government, pp. 198-200

জন্য চারদিকে বেড়া দেওয়া থাকে,—তাঁরা ছাড়া বিদ্যা শিখবার অধিকার কারও নেই...। এযুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ-সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন।

'ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদার নন। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক কৃষ্টির (culture) চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।

'তারপর বৈশ্যশাসন-যুগ। এর ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্ত-শোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ! এযুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়!

''সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এযুগের সুবিধা হবে এই যে, এ-সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সংস্কৃতির অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।'[৩৪]

দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দ প্রতিটি শ্রেণীশাসনের কালের যা কিছু গুণ আছে তা স্পষ্ট নির্দেশ করেছেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শাসন, বৈশ্যশাসন—সমাজকে কোন না কোন দিকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু সে সমৃদ্ধি সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছায়নি, তা শূদ্র বা শ্রমিক শ্রেণীর নিকট লভ্য হয়নি। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা, বিবেকানন্দ শ্রমিকশাসনের কালকেও আদর্শ বলেননি। শ্রমিকশাসিত সমাজেও কিছু ত্রুটি থাকছে, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আদর্শ রাষ্ট্র ঃ

বিবেকানন্দের আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা নিম্নোক্তরূপ ঃ 'যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।'[৩৫] এ ধারণা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দ নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন ঃ 'কিন্তু এ কি সম্ভব?' বাস্তব জগতে এ যে সম্ভব নয় তার কারণ নির্দেশ করে বলেছেন ঃ 'জগতে ভালমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে...।'[৩৬] এখানে নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দ এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে, আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা অবাস্তব (utopia)। এ সিদ্ধান্তের জন্য বিবেকানন্দ রাজনীতি-শাস্ত্রে একটি স্মরণীয় অবদান রেখেছেন, অবাস্তব আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা হতে এ শাস্ত্রকে তিনি মুক্ত করেছেন।

৩৪। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯ ৩৫। তদেব, পৃঃ ৩৪৯-৫০
৩৬। তদেব, পৃঃ ৩৫০

বিভিন্ন ধরনের শাসনযন্ত্র ঃ

বিভিন্ন আলোচনায় বিবেকানন্দ মুখ্য দুটি শাসনব্যবস্থা আলোচনা করেছেন। এ দুটি হল—রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র। কিন্তু তিনি ভারত-ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, রাজতন্ত্রের উপর বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাধান্য ঘটেছে। ভারতের ইতিহাসের প্রথম যুগে রাজন্যবর্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ঃ '...কখন বিভীষিকাসঙ্কুল আদেশ, কখন সহৃদয় মন্ত্রণা, কখন কৌশলময় নীতিজাল-বিস্তার রাজশক্তিকে অনেক সময়েই পুরোহিতকুলের নির্দেশবর্তী করিয়াছে।'[৩৭] এ ব্যবস্থা কার্যত অভিজাততন্ত্র (Aristocracy), যদিও নামে রাজতন্ত্র। এ ব্যবস্থায় শাসনবিধি প্রণয়ন করেন পুরোহিত। এ শাসনব্যবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ '...নিয়ম আছে, প্রণালী আছে, নির্ধারিত অংশ আছে, কর-সংগ্রহ ও সৈন্যচালনা বা বিচার-সম্পাদন বা দণ্ড-পুরস্কার সকল বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম আছে, কিন্তু তাহার মূলে ঋষির আদেশ, দৈবশক্তি, ঈশ্বরাবেশ। তাহার স্থিতিস্থাপকত্ব একেবারেই নাই বলিলেই হয় এবং তাহাতে প্রজাবর্গের সাধারণ মঙ্গলকর কার্য-সাধনোদ্দেশে সহমতি হইবার বা সমবেত বুদ্ধিযোগে রাজগৃহীত প্রজার ধনে সাধারণ স্বত্ববুদ্ধি ও তাহার আয়-ব্যয়-নিয়মনের শক্তিলাভেচ্ছার কোন শিক্ষার সম্ভাবনা নাই।'[৩৮] এ অবস্থার যে পরিণতি প্রজাশোষণে ও প্রজার স্বার্থহানিতে সেটি উদ্ঘাটিত করে বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'রাজ্য-রক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের পুষ্টি ও সর্বাপেক্ষা পুরোহিতকুলের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন। বৈশ্যেরা রাজার খাদ্য, তাঁহার দুগ্ধবতী গাভী।'[৩৯] রাজতন্ত্রের উপর এই পুরোহিত আধিপত্যের কালে বৈশ্যেরা রাজার অধীন, ও রাজন্যবর্গের দ্বারা শোষিত। আমরা একটু পরেই দেখব পরবর্তীকালে রাজশক্তি বৈশ্যের অধীন হয়। ভারতে বৈশ্য অভ্যুদয় অবশ্য বিলম্বে ঘটে, ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের কালে। আমরা সে আলোচনা কিছু পরে করব।

দেখা যাচ্ছে যে, এই শ্রেণীশাসনের বিশ্লেষণে বিবেকানন্দ গভীর বাস্তবতা বোধের পরিচয় রেখেছেন। তথাকথিত ঋষিশাসিত সমাজ সম্বন্ধে তাঁর কোন মোহ ছিল না, এ যে স্বৈরতন্ত্র তা তিনি সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করে বলেছেন ঃ 'কর-গ্রহণে, রাজ্য-রক্ষায় প্রজাবর্গের মতামতের বিশেষ অপেক্ষা নাই...।'[৪০] রাম-রাজ্য সম্পর্কেও তিনি অনুরূপ মোহমুক্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ঃ 'একজন রামচন্দ্র শত শত অগ্নিবর্ণের পরে জন্মগ্রহণ করেন! চণ্ডাশোকত্ব অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান, ধর্মাশোকত্ব—অতি অল্পসংখ্যক।'[৪১] অত্যাচারী অধর্মাচারী রাজাদের সংখ্যা যে মুষ্টিমেয় প্রজানুরঞ্জক রাম বা ধর্মাশোকদের চেয়ে অনেক বেশী, ইতিহাস তার সাক্ষী। সুতরাং রাজতন্ত্রে প্রজাগণ যে শোষিত ও অধিকার-বঞ্চিত সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। বিবেকানন্দের যুক্তি এখানে স্পষ্টতই অকাট্য।

৩৭। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২২২ ৩৮। তদেব, পৃঃ ২২৩ ৩৯। তদেব, পৃঃ ২২২
৪০। তদেব ৪১। তদেব, পৃঃ ২২৩

বিবেকানন্দের দৃঢ় অভিমত যে জনগণের পক্ষে স্ব-শাসনের চেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না, ন্যায়পরায়ণ রাজ-শাসন তার কোন বিকল্প নয়। তাঁর সুস্পষ্ট উক্তি ঃ 'হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ পায়। ...দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখন স্বায়ত্তশাসন শিখে না; রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্বীর্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়। ঐ "পালিত" "রক্ষিত"ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল।'[৪২] John Stuart Mill তাঁর 'Representative government' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ঠিক এইকথাই বলেছেন ঃ উত্তম শাসন স্ব-শাসনের কোন পরিবর্ত নয় (A good government is no substitute for self-government)। বিবেকানন্দও এখানে ঠিক সেইকথাই বলেছেন। বিবেকানন্দ বিষয়টির উপর আরও আলোকপাত করেছেন নিম্নলিখিত মন্তব্যে ঃ '...ঐসকল নির্দেশ (ঋষিগণ প্রদত্ত)—পুস্তকে। পুস্তকারদ্ধ নিয়ম ও তাহার কার্য-পরিণতি, এ দুয়ের মধ্যে দূর—অনেক। ...মহাপুরুষদিগের অলৌকিক প্রাতিভ-জ্ঞানোৎপন্ন শাস্ত্রশাসিত সমাজের শাসন রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, মূর্খ, বিদ্বান—সকলের উপর অব্যাহত হওয়া অন্ততঃ বিচারসিদ্ধ, কিন্তু কার্যে কতদূর হইয়াছে বা হয়, পূর্বেই বলা হইয়াছে।'[৪৩] ঋষিশাসিত সমাজে মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও বিচার শক্তির উপর যে অবিচার ঘটে বিবেকানন্দ তারও প্রতিবাদ করেছিলেন।[৪৪]

বিবেকানন্দ ইতিহাস বিশ্লেষণ সহায়ে দেখিয়েছেন বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ্যশক্তি ক্ষমতা হারায়, রাজশক্তি প্রাধান্য লাভ করে। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসনের সময়ে রাজশক্তির উপর ভারতে বৈশ্যকুলের প্রাধান্য ঘটে। এ-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলছেন ঃ 'অধ্যাত্মবলে মন্ত্রবলে শাস্ত্রবলে বলীয়ান, শাপাস্ত্র, সংসারস্পৃহা-শূন্য তপস্বীর ভ্রূকুটি-সম্মুখে দুর্ধর্ষ রাজশক্তিকে কম্পান্বিত হইতে ভারতবাসী চিরকালই দেখিয়া আসিতেছে। সৈন্যসহায়, মহাবীর, শস্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল—সিংহের সম্মুখে অজাযূথের ন্যায়, নিঃশব্দে আজ্ঞাবহন করে, তাহাও দেখিয়াছে; কিন্তু যে বৈশ্যকুল—রাজগণের কথা দূরে থাকুক, রাজকুটুম্বগণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী হইয়াও সর্বদা বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত—মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্য একত্রিত হইয়া ব্যাপার-অনুরোধে নদী সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চিরপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান রাজগণকে আপনাদের ক্রীড়া-পুত্তলিকা করিয়া ফেলিবে, শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্যগণকেও অর্থবলে আপনাদের ভৃত্যত্ব স্বীকার করাইয়া তাঁহাদের শৌর্যবীর্য ও বিদ্যাবলকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে...(ইহা) ভারতবাসী কখনও দেখে নাই!!'[৪৫] এখানে বিবেকানন্দ সুস্পষ্ট বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলমান রাজগণ'কে এই বিদেশী বৈশ্যশক্তি 'ক্রীড়াপুত্তলিকা'য় পরিণত করেছে। বিবেকানন্দ তাঁর বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, ভারতে বৈশ্যশক্তির আধিপত্য বিলম্বে ঘটে এবং এদের আধিপত্য প্রথম ঘটে ইংলণ্ড প্রমুখ পাশ্চাত্য জাতিগণের মধ্যে। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে,

---

৪২। তদেব, পৃঃ ২২৩-২৪ ৪৩। তদেব
৪৪। তদেব, পৃঃ ২২৩ ৪৫। তদেব, পৃঃ ২২৮-২৯

সাধারণ নিয়মে রাজশক্তির পরে বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয়—অন্ততপক্ষে ইতিহাসের সাক্ষ্য তা-ই। বিবেকানন্দের সমীক্ষানুসারেঃ 'যে প্রকার প্রাচীন যুগে রাজশক্তির পরাক্রমে ব্রাহ্মণ্যশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পরাজিত হইয়াছিল, সেই প্রকার এই যুগে নবোদিত বৈশ্যশক্তির প্রবলাঘাতে কত রাজমুকুট ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল, কত রাজদণ্ড চিরদিনের মতো ভগ্ন হইল। যে কয়েকটি সিংহাসন সুসভ্য দেশে কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠিত রহিল, তাহাও তৈল, লবণ, শর্করা বা সুরাব্যবসায়ীদের পণ্যলব্ধ প্রভূত ধনরাশির প্রভাবে, আমির ওমরা সাজিয়া নিজ নিজ গৌরববিস্তারের আস্পদ বলিয়া।'[৪৬] বৈশ্যশক্তির কবলিত রাজতন্ত্রের স্বরূপ এখানে অতি সুন্দররূপে উদ্‌ঘাটিত।

গণতন্ত্র ঃ

বিবেকানন্দ যে দ্বিতীয় প্রকার শাসনপদ্ধতির কথা আলোচনা করেছেন—তা হল গণতন্ত্র। তাঁর মতে গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। ঋষিগণ-শাসিত ব্যবস্থাও তাঁর সমর্থন পায়নি—একথা আমরা পূর্বেই দেখেছি। ঋষি-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা কল্পনামাত্র, বাস্তবে তা কার্যকর হয় না—এ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, ইতিহাসে দেখা গেছে কিছু সময় অতীত হলে ক্রমেই আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষয় হতে থাকে এবং পুরোহিতগণ আধ্যাত্মিক আদর্শ ভ্রষ্ট হয়ে বিশেষ সুবিধার দাবি করতে থাকেন। বিবেকানন্দের ভাষায়ঃ 'উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্বকালে তাহাই আবার কেবলমাত্র ভোগ্যসংগ্রহে বা আধিপত্য-বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত।'[৪৭] সেজন্য বিবেকানন্দের মতে গণতন্ত্রই সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা। বিবেকানন্দ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ 'শাসিতগণের শাসনকার্যে অনুমতি—যাহা আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং যাহার শেষ বাণী আমেরিকার শাসনপদ্ধতি-পত্রে অতি উচ্চরবে ঘোষিত হইয়াছে, "এ দেশে প্রজাদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে...।"'[৪৮]

ধনতন্ত্র-গণতন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদ ঃ

কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র যে মিথ্যায় পর্যবসিত হতে পারে এ-বিষয়ে বিবেকানন্দের আশ্চর্য সচেতনতা ও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিটি এ-বিষয়ে প্রভূত আলোকপাত করেঃ 'ও তোমার "পার্লেমেণ্ট" দেখলুম, "সেনেট" দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষরা যেদিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।'[৪৯]

৪৬। তদেব, পৃঃ ২৩০ ৪৭। তদেব, পৃঃ ২৩৩
৪৮। তদেব, পৃঃ ২২৪ ৪৯। তদেব, পৃঃ ১৬১

ধনতন্ত্র-ভিত্তিক গণতন্ত্র যে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়ে তার মূল উদ্দেশ্য—প্রজাদের কল্যাণসাধন—হারিয়ে ফেলে বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে তা-ও ধরা পড়েছিল। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' তিনি এ-সম্পর্কে অতি প্রাঞ্জলভাবে বলেছেন ঃ 'যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিত হলে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো তো সেইখানেই মারা গেল...।'[৫০] মনে রাখতে হবে একথা তিনি বলেছেন যখন লেনিনের Imperialism নামক গ্রন্থখানি লেখা হয়নি এবং যখন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সাধারণের চেতনা আজকের মতো জাগ্রত হয়নি।

সমাজতন্ত্রবাদ ঃ

আজকের দিনে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক আদর্শ হল সমাজতন্ত্রবাদ। এই আদর্শের সঙ্গে আজ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কসের নাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ আদর্শের ধারণা গঠনে বহু লেখক, পণ্ডিত, দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীর অবদান রয়েছে। সমাজতন্ত্রবাদ কথাটির ইংরেজি নাম সোস্যালিজম (Socialism); কথাটি উদ্ভূত হয় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন রবার্ট ওয়েন 'Association of All Classes in All Nations' নামক একটি সংস্থা স্থাপন করেন। সেই হিসাবে রবার্ট ওয়েনকে সমাজতন্ত্রবাদের আদিপুরুষ হিসাবে বলা যেতে পারে। মার্কসের অবদান সমাজতন্ত্রবাদের ধারণাকে পুষ্ট ও সক্রিয় করে তোলে। তাঁর ধারণার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক জড়বাদ। তাঁর মতে শোষকশ্রেণীর হাতে শোষণের দুটি হাতিয়ার—ধর্ম ও রাষ্ট্র; শোষণহীন সমাজে এ দুটিই লুপ্ত হবে। তাঁর মতে ধর্ম আদিম মানুষের অজ্ঞানতা ও ভীতিসঞ্জাত বস্তু। ধনতন্ত্রের আসন্ন অবসান এবং বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর মূল প্রতিপাদ্য। তাঁর মতে শ্রমিকশাসনের কালে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমগ্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হবে, আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকবে না। শ্রমিক একনায়কতন্ত্রের অবসানে আসবে সোস্যালিজম—এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা যা শ্রমিক একনায়কতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্র (Communism)-এর মধ্যবর্তী। যখন সমস্ত শ্রেণীবিভেদ লুপ্ত হবে, শোষকশ্রেণী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণীহীন সমাজ বা সাম্যতন্ত্র বা Communism—এই সাম্যতন্ত্র যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সেই শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্র আপনা থেকেই বিলীন হয়ে যাবে। শ্রেণীহীন সমাজ হবে রাষ্ট্রহীন এবং ধর্মহীন সমাজ।

সমাজতান্ত্রিক ধারণার একটি নূতন দিগন্ত বিবেকানন্দের চিন্তার মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম কথা, এদেশে অন্যান্য সমাজ-সংস্কারকদের দৃষ্টি যখন সমাজের উপরের তলার মানুষদের উপর নিবদ্ধ ছিল তখন একমাত্র স্বামীজীর মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত হয়। তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, জাতি বাস করে কুটিরে

৫০। তদেব, পৃঃ ১৬২

এবং বিধবা-বিবাহ নয়, ধর্মসংস্কার নয়, ভারতের জাতীয় সমস্যা হল জনগণের যে সমস্যা সেই সমস্যা—অর্থাৎ দারিদ্র ও অশিক্ষা। এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়ে তিনি বলেনঃ 'তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগন আচ্ছন্ন করিয়াছে?'[৫১] 'বর্তমান ভারত' পুস্তকে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন একথা যে, শূদ্র বা শ্রমিক অভ্যুত্থান আসন্ন ('তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে')।[৫২] সেখানে তিনি আরও ঘোষণা করেন 'সোস্যালিজম, এনার্কিজম, নাইহিলিজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা'। সমকালীন পাশ্চাত্যের সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন চিন্তাধারা সম্পর্কে তিনি যে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন তা এই উক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা, কোথায় এই শূদ্র অভ্যুত্থান সর্বপ্রথম ঘটবে সে-সম্পর্কে এই অভ্রান্ত ঘোষণা করেছিলেনঃ এই অভ্যুত্থান ঘটবে সর্বপ্রথম হয় রুশ না হয়তো চীন দেশে—ঠিক বলতে পারছি না কোথায়, তবে হয় এটা রাশিয়া অথবা চীনে।[৫৩] এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দেই এদেশের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রবাদের অভ্যুদয়কে স্বাগত জানিয়ে তিনি সুস্পষ্ট বলেছেনঃ আমি একজন সমাজতন্ত্রী... (I am a socialist)।[৫৪]

কিন্তু তিনি যে শুধু পাশ্চাত্যের সমাজবাদী চিন্তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন তা-ই নয়, সে চিন্তার ত্রুটি কোথায় সে-সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন। এ-সম্পর্কে তাঁর বিচার নিম্নোক্তরূপঃ 'আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী (socialist), তার কারণ এ নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল "নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল"—এই হিসাবে।[৫৫] তাঁর মতে শূদ্রশাসনকালে জ্ঞান-বিদ্যার মান নীচু হয়ে যাবে—এ আমরা পূর্বেই দেখেছি। তৎসত্ত্বেও একে তাঁর সমর্থন জানাবার কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন নিম্নোক্তরূপেঃ 'অপর কয়টি প্রথাই (অর্থাৎ পুরোহিত, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শাসন) জগতে চলেছে, পরিশেষে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। অন্তত আর কিছুর জন্য না হলেও অভিনবত্বের দিক থেকে এটিরও একবার পরীক্ষা করা যাক। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখদুঃখটা যাতে পর্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হতে পারে, সেইটাই ভাল।'[৫৬] সমাজতন্ত্রও যে কেন আদর্শ অবস্থা হতে পারে না সে-সম্পর্কে তিনি আরও বলেনঃ 'জগতে ভালমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে, তবে নতুন নতুন প্রণালীতে এই জোয়ালটি (yoke) এক কাঁধ থেকে তুলে আর এক কাঁধে স্থাপিত হবে, এই পর্যন্ত।'[৫৭] এ কয়টি কথা বেদান্তবাদীর কথা। মায়ার

৫১। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১১৬ ৫২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪১

৫৩। Reminiscences of Swami Vivekananda—His Eastern and Western Admirers, Advaita Ashrama, Calcutta, 1961, p. 203 ৫৪। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০

৫৫। তদেব ৫৬। তদেব ৫৭। তদেব

জগতের সৃষ্টি ভালমন্দের সংমিশ্রণে, সেজন্য এখানে কোন ব্যবস্থাই ত্রুটিহীন হতে পারে না।

কিন্তু তা বলে চিরদিন একই শ্রেণী অর্থাৎ শূদ্রশ্রেণী বঞ্চিত হবে তা তিনি কোনমতেই সমর্থন করেননি। মার্কসের মতো বিবেকানন্দেরও এই মত যে, সমাজে মূল শ্রেণী হল শূদ্রশ্রেণী—যারা উৎপাদন করে; এদেরই পরিশ্রমের ফলে মানুষের উন্নতি ও সভ্যতার বিস্তার। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে তিনি ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষককুলের প্রশস্তি করে বলেছেন ঃ 'ঐ যারা...বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্চে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্চে না!...

'হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকজেন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভেনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য।'[৫৮]

শ্রেণীসংগ্রাম ঃ

ইতিহাস যে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে এ তত্ত্বও তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর নিজস্ব ভারত-ইতিহাস অনুশীলনের মাধ্যমে।[৫৯] ভারতের ইতিহাসের প্রথমযুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে সঙ্ঘর্ষ ঘটে, পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ জুটির সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর; বর্তমানে বৈশ্যশ্রেণীর আধিপত্য অন্তে শূদ্র-অভ্যুত্থান অনিবার্য—এ মত তিনি প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন 'বর্তমান ভারত' পুস্তকে ও 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' নামক নিবন্ধে। শূদ্রগণের সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে কিন্তু কী ভয়ানক সংক্ষোভ, কী ভীষণ আলোড়নের মধ্য দিয়ে তা সংগঠিত হবে!—বিবেকানন্দ একথা একদিন নিবেদিতাকে বলেছিলেন এমনভাবে যে, তিনি ভবিষ্যতের গভীরে কি নিহিত আছে তা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।[৬০]

তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তাধারার সাদৃশ্য এই পর্যন্তই। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমাজতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে মার্কসের চিন্তাধারার পার্থক্য একেবারে মূলে। মার্কসীয় মতবাদের ভিত্তিতে আছে জড়বাদ—আমরা একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর বিবেকানন্দের ধারণার ভিত্তিতে আছে তাঁর দর্শনমত, তাঁর বেদান্তের জীবব্রহ্মবাদ। 'প্রতি মানুষে একই দেবত্বশক্তি নিহিত'—বেদান্তের এই মূল সূত্রটির ফলশ্রুতি কোন ব্যক্তির বা শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের অস্বীকার এবং সকল মানুষের সমান অধিকারের অঙ্গীকার—এ আমরা পূর্বেই দেখেছি। বস্তুত এই বেদান্তদর্শন আমাদের ধর্মদর্শনের উত্তুঙ্গ শিখর। সুতরাং এখানে প্রমাণ মিলছে যে, প্রকৃত ধর্ম শোষণের সহায় নয়।

৫৮। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০৬

৫৯। তদেব, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড; দ্রষ্টব্য ঃ 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' ও 'বর্তমান ভারত'

৬০। The Master as I saw him, p. 249

বরঞ্চ বিপরীত, প্রকৃত ধর্ম শোষণের মূলে আঘাত করছে বিশেষ অধিকারকে অস্বীকার করে।

পৌরোহিত্য ও ধর্ম ঃ

কিন্তু বিবেকানন্দের মতে পুরোহিত-চক্র শোষণের সহায়। 'বেদান্ত ও অধিকার' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি পৌরোহিত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বলছেন ঃ 'পৌরোহিত্য-প্রথা স্বভাবতই নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণ। সেইজন্যই যেখানে পৌরোহিত্য-প্রথার উদ্ভব হয়, সেখানে ধর্মের পতন বা গ্লানি হয়। বেদান্ত বলেন, আমাদিগকে অধিকারের ভাব ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহা ছাড়িলেই ধর্ম আসিবে। তৎপূর্বে কোন ধর্ম আসে না।'[৬১] এখানে দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দ বোঝাতে চেয়েছেন এই কথা যে, পৌরোহিত্য ধর্ম নয়, ধর্মের নামে বিশেষ সুবিধাতন্ত্র ; দ্বিতীয়ত বোঝাতে চেয়েছেন একথা যে, প্রকৃত ধর্মে বিশেষ সুবিধার কোন স্থান নেই। সুতরাং তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত পৌরোহিত্য হল ধর্মের অভাব। মার্কস প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদীরা এখানেই ভুল করেছেন—তাঁরা পৌরোহিত্য ও ধর্মকে এক ও অভিন্ন মনে করেছেন। সেজন্য তাঁরা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ধর্ম হল শোষণের হাতিয়ার। বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত ঃ পৌরোহিত্য শোষণের হাতিয়ার, আর ধর্ম হল বিশেষ-সুবিধা-তন্ত্রের উপর আঘাত হানবার হাতিয়ার।

ভারত-ইতিহাস থেকে বিবেকানন্দ এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে প্রমাণ দেখিয়েছেন ঃ তিনি দেখিয়েছেন, যথার্থ ধর্মনেতারা বিশেষ অধিকারের উপর আঘাত হেনেছেন। বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য, দাদু, কবীর, রামানুজ প্রত্যেকে এঁরা একাজ করেছেন এবং এজন্য দেখা যায় এঁদের পুরোহিত-চক্রের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে, এঁরা জনগণকে তাদের ন্যায্য মানবিক অধিকার দিতে প্রয়াস পেয়েছেন।[৬২]

ধর্ম ও সমাজতন্ত্র ঃ

দেখা যাচ্ছে যে, বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এই তত্ত্ব যে, ধর্ম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক বিরোধিতা কিছু নেই, বরঞ্চ ধর্ম—সমাজতন্ত্রের যেটি মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষ সুবিধা চূর্ণ করা—সেই উদ্দেশ্যের পূরক। প্রকৃত ধর্মের প্রতিপাদ্য ঃ কেউ হীন নয়, ছোট নয়, তুচ্ছ নয়, সকলেরই বড় হবার এবং মহৎ হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে। বিবেকানন্দ এই তত্ত্বের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে জনগণকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন ঃ 'অজ্ঞ অশক্ত নরনারী সকলেই শোন, সকলেই সেই অজর অমর অনন্ত শাশ্বত আত্মা, সকলেরই বড় হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে। অতএব ওঠ, দৌর্বল্যের এ জড়তা হতে জাগো...তোমার মধ্যে যে

৬১। বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ৩৪৪

৬২। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১০৮

ভগবান আছেন তাঁকে অস্বীকার কোরো না।'[৬৩] বিবেকানন্দ এ তত্ত্বের ভিত্তিতেই ভারতে গণমুক্তির পরিকল্পনা করেছেন। এবং এজন্যই তিনি ঘোষণা করেন ঃ 'ভারতকে সামাজিক বা রাজনীতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর।'[৬৪]

রাজনীতি-শাস্ত্রের দিক থেকে বিবেকানন্দের চিন্তার তাৎপর্য হল এই যে, ধর্ম ও সমাজতন্ত্রের ধারণার মধ্যে সকল বিরোধ ঘুচিয়ে সমাজতন্ত্রের ধারণাটিকে তিনি মস্ত বড় ত্রুটিমুক্ত করেছেন এবং ধারণাটিকে আরও গ্রহণযোগ্য করেছেন। বিবেকানন্দের এ অবদানের মূল্য অপরিসীম।

সর্বার্থসাধক রাষ্ট্র (Totalitarian State) ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ঃ

সমাজতন্ত্রের যে-ধারণা মার্কস দিয়েছেন তার একটি বড় ত্রুটি এই যে, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে আছে একটি সর্বার্থসাধক ও সর্বাত্মক ক্ষমতাযুক্ত রাষ্ট্রের ধারণা, যে রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। বিবেকানন্দ এরূপে সমাজের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তির বলিদান কোনমতেই সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেননি। ব্যক্তি-স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ হতে সমাজতন্ত্রবাদের একটি মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলছেন ঃ 'ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কি না এবং কত পরিমাণে হওয়া উচিত সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির একেবারে সম্পূর্ণ আত্মেচ্ছা, আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত কি না—এই প্রশ্নই সমাজে অনাদিকালের বিচার্য।'[৬৫] আধুনিক পাশ্চাত্যে এ প্রশ্ন যে আলোড়ন এনেছে তারই প্রকাশ ঘটেছে দুই প্রান্তের দুই মতবাদের মধ্যে যার একটির নাম সমাজতন্ত্র (Socialism), অপরটির নাম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)। বিবেকানন্দের ভাষায় ঃ 'যে মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার ইংরেজি নাম সোস্যালিজম, ব্যক্তিত্বসমর্থক মতের নাম ইন্ডিভিজুয়ালিজম।'[৬৬] কিন্তু ভারতবর্ষও এ বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে। সেখানে ব্যক্তির সমগ্র জীবন কিরূপ কঠোর সমাজ-নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল তা তুলে ধরে বিবেকানন্দ বলছেন ঃ 'এদেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়; ভোজন-পানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেইপ্রকার; এমনকি, মরিবার সময়ও সেই-সকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ করে।'[৬৭] এরূপ ব্যবস্থায় জোর করে ব্যক্তিকে যে আত্ম-ইচ্ছা ও আত্মসুখ বিসর্জন দিতে বাধ্য করা হয় এবং এ অবস্থায় যে নিয়মের প্রতি চিরদাসত্বের শিক্ষা দেওয়া হয় বিবেকানন্দ তা দেখিয়েছেন। এ চিরদাসত্বের শিক্ষার পরিণাম সম্পর্কে তিনি বলছেন ঃ 'এই কঠোর শিক্ষার একটি মহৎ গুণ আছে, আর সকলই দোষ। গুণটি এই যে, দুটি-একটি কার্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অল্পায়াসে সুন্দর রকমে লোকে করিতে পারে।'[৬৮] কিন্তু এর বিষময় পরিণাম হল এই যে, '...এই সমস্তগুলিই

৬৩। তদেব, পৃঃ ৮২ ৬৪। তদেব, পৃঃ ১১১

৬৫। তদেব, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৭০

৬৬। তদেব ৬৭। তদেব, পৃঃ ১৭১ ৬৮। তদেব

মনুষ্য প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে করে ; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই...উদ্ভাবনী-শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই...।'[৬৯] অর্থাৎ বিবেকানন্দের মতেঃ এ অবস্থায় মানুষ সৃজনী শক্তি ও সৃজনের ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় সকল প্রকার অগ্রগতি ব্যাহত হয়, এরূপ অচলায়তন সমাজের অবনতি ঘটতে বাধ্য। বিবেকানন্দের তীক্ষ্ণ ভাষায়ঃ 'চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা—চৈতন্য-শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর। আর এই মৃৎপিণ্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মতো উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্যসমষ্টির দ্বারা যে সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ? তাহার কল্যাণ কোথায়?'[৭০] বিবেকানন্দের দৃঢ় অভিমত স্বাধীন ইচ্ছার বিকাশেই কল্যাণ নিহিত ; একটি সামান্য কীটও স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগে নিজের প্রাণরক্ষা করতে সমর্থ হয় এই যুক্তিতে।[৭১] তিনি সর্বাবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছেন এবং বলেছেনঃ 'স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত।'[৭২] ব্যক্তির জন্যই সমাজ ও রাষ্ট্র ; সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যই ব্যক্তি নয়—এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছেনঃ ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত।[৭৩] এজন্য সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যক্তিকে জোর করে আত্মত্যাগ করানোর তিনি সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছেন। প্রাচীন ভারতে যেরূপ কঠোর বিধিনিয়মের মাধ্যমে এরূপ জোর করে ত্যাগ করানোর ব্যবস্থা ছিল তার তীব্র নিন্দা করে তিনি আরও বলেছেনঃ 'বহুর জন্য একের সুখ—একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে?...কিন্তু আমাদের ভাষায় বলে, "ঘষেমেজে রূপ কি হয়? ধরে-বেঁধে প্রীত কি হয়?" ...বলপূর্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? ...আমি বলি, বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পারো বন্ধন খোল। ...সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন তো তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, সে ঢের দূর!'[৭৪] অর্থাৎ সমষ্টির জন্য ব্যষ্টিকে বলপূর্বক আত্মোৎসর্গ করানোর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই ; যখন ত্যাগ হয় স্বতঃস্ফূর্ত, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তখনই তা পরম কল্যাণকর। এখানে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিবেকানন্দ তুলে ধরেছেন এই পরম সত্য যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেয় যে সমাজতন্ত্র তা ত্রুটিপূর্ণ এবং তা কল্যাণকর নয়, উন্নতির সহায়ক নয়।

ব্যক্তি-স্বাধীনতাভিত্তিক সমাজতন্ত্রঃ

বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, আবার ব্যক্তি-স্বাধীনতাকেও অতি উচ্চস্থান দিয়েছেন। এ কি তাঁর চিন্তাধারায় অসঙ্গতির প্রমাণ? না, তা নয়। রাজনীতি-শাস্ত্রের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার C. D. Burns তাঁর 'Political Ideals' শীর্ষক গ্রন্থে সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে আলোচনার শেষে মন্তব্য করেছেনঃ যদি আমরা এমন

৬৯। তদেব ৭০। তদেব, পৃঃ ১৭২

৭১। তদেব, পৃঃ ১৭১-৭২ ৭২। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৪০

৭৩। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৩ ৭৪। তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৭২

কোন আদর্শ পেতাম যা একাধারে সমাজতান্ত্রিক এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী তাহলে জগতের মনস্বিকুলের কাছে তা গ্রহণীয় হত। ...কারণ ব্যক্তির বৈচিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী যেমন ঠিকই করেছেন, ঠিক সেইরকম সমাজতন্ত্রবাদীও ব্যক্তির যৌথ স্বার্থের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঠিক কাজই করেছেন, কারণ সমষ্টি-জীবনে নিজ কর্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন করবার মধ্যেই ব্যক্তির বিকাশের সম্ভাবনা।[৭৫] এ কথাগুলি বিবেকানন্দের অভিমতের প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। এখানে সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে যে বাঞ্ছিত সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে বিবেকানন্দ তা-ই ঘটিয়েছেন নিজ চিন্তায়। এ সমন্বয়ের ভিত্তিভূমি এই সূত্রটি—'বৈচিত্রে একত্ব।' সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য বৈচিত্রের অবসান ঘটানো নয়, এর মূল লক্ষ্য বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটানো। পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদীদের ভ্রান্তি এখানে যে, তাঁরা বৈষম্য বা বৈচিত্রের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। একমাত্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দর্শনতত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মিলন সম্ভব। বিবেকানন্দ প্রাঞ্জল করে বলছেনঃ 'ছোট বা বড় সমস্ত প্রাণীই সমভাবে ঈশ্বরের রূপ ; পার্থক্য কেবল উহার প্রকাশের মধ্যে। ...সুতরাং অদ্বৈতের কাজ হইল এইসকল অধিকার ভাঙিয়া দেওয়া।'[৭৬] সুতরাং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অবসান ঘটিয়ে সাম্য আনা নয়, ব্যক্তির বিকাশের জন্য সকলপ্রকার বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটিয়ে সাম্য আনা—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথ। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বের মনস্বিকুল যার অপেক্ষায় আছেন সেই পূর্ণায়ত আদর্শের রূপায়ণ ঘটেছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তায়। ভারতে আজ গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের যে রূপায়ণ-প্রয়াস চলেছে তা বিবেকানন্দেরই প্রদর্শিত পথ।

আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য ঃ

আইন ঃ রাজনীতি-শাস্ত্রের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—'আইন', 'স্বাধীনতা', 'অধিকার' ও 'সাম্য'। আইন সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেছেন খুবই সামান্য, কিন্তু যেটুকু বলেছেন তা তাঁর গভীর মননশীলতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে তিনি বলছেনঃ 'আইন করলেন আমিরেরা, দেশ-দেশান্তরের বাণিজ্য লুটপাট করবার জন্য ; রাজস্ব ভোগ করবেন তাঁরা, আর গরীবদের খালি রক্তপাত, শরীরপাত, যা চিরকাল এ পৃথিবীতে হয়ে আসছে!!'[৭৭] অর্থাৎ শ্রেণীরাষ্ট্রে আইন শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণে নিযুক্ত হয়—এ সত্য স্পষ্ট তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। প্রখ্যাত রাজনীতি-শাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপক ল্যাস্কি (Laski) বলেছেনঃ যে-কোন নির্দিষ্ট সমাজের আইন সে সমাজের বিভিন্ন শক্তিসমূহের চাপের ফল ; সেই শক্তিসমূহকে বাদ দিয়ে আইনগুলির মূল লক্ষ্য ও তাৎপর্য আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না।[৭৮] ল্যাস্কির এই উক্তি বিবেকানন্দের মতকে সমর্থন করছে। বিবেকানন্দের

৭৫। Political Ideals—C. D. Burns, Sixth Edition, p. 275

৭৬। বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯ ৭৭। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭২

৭৮। A Grammar of Politics, Introductory Chapter, p. vi

আরও অভিমতঃ আইন শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত হলে, '...রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয়...।'[৭৯] শাসকশ্রেণীর প্রণীত আইন পালিত হবার কারণ নির্দেশ করে বিবেকানন্দ বলছেন, 'যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, নীরবে সহ্য করে...'[৮০] ; ল্যাস্কি একই বিষয়ে বলছেন, আইনগুলি মেনে নেওয়া হয় সাধারণত এই কারণে যে, যাঁরা এগুলি অস্বীকার করতে চান তাঁদের আইনের পশ্চাতে যে ক্ষমতা আছে তার মুখোমুখি হবার অবস্থা নেই।[৮১] দুজনের কথার নিহিতার্থ একই। আইনের স্বরূপ সম্পর্কে বিবেকানন্দ যা বলেছেন তার সমর্থন পাওয়া যায় ল্যাস্কির গ্রন্থে যা বিশ শতকের ত্রিশ দশকে লিখিত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, বিবেকানন্দ তাঁর মত লিখেছেন উনিশ শতকের নব্বই দশকে। বিবেকানন্দের চিন্তায় যে অনেক আগামী যুগের চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে—এখানে তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

স্বাধীনতা ঃ সমাজতন্ত্রের আলোচনাকালে আমরা দেখেছি বিবেকানন্দ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু মিল, বেন্থাম প্রভৃতি উনিশ শতকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের সঙ্গে তাঁর স্বাধীনতার ধারণা সম্পর্কে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মিল প্রভৃতির মতে স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের অভাব বোঝায় ('Liberty is the absence of restraint')। হার্বার্ট স্পেন্সার[৮২] আবার আরও এগিয়েছেন, তাঁর মতে বল্গাহীন প্রতিযোগিতাই স্বাধীনতার লক্ষণ, এবং তাতে যারা শক্তিমান, তারাই টিকে থাকবে ('survival of the fittest' তত্ত্ব)। কিন্তু বিবেকানন্দের স্বাধীনতার ধারণা এরূপ নেতিবাচক নয়। তাঁর স্বাধীনতার ধারণা সম্পূর্ণ ইতিবাচক। তাঁর ভাষায়ঃ 'আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোনও বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকার ইচ্ছা সে প্রকার ব্যবহার করিতে পারিব, ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার; এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের—সকল সামাজিক ব্যক্তির সমান সুবিধা যাহাতে থাকে, তাহাও হওয়া উচিত।'[৮৩] হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে একমাত্র শক্তিমানেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে[৮৪]—এ মতের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেছেনঃ '...যাঁহারা বলেন, অজ্ঞ বা গরীবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাহাদের সন্তানদের ধনী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায় জ্ঞানার্জনের এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাঁহারা কি একথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? ...মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে

৭৯। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৯ ৮০। তদেব

৮১। A Grammar of Politics, Introductory Chapter, p. vii

৮২। Introduction to Modern Political Theory, p. 30

৮৩। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২৩

৮৪। 'এ তত্ত্বের ভাষ্য রচিত হয়েছিল এইরূপঃ দরিদ্র ও দুর্বলের উন্নতি করবার প্রচেষ্টা বৃথা, বাঁচার জন্য প্রতিযোগিতায় তাদের বেঁচে থাকবার শক্তি নাই। সেজন্য স্পেন্সার দরিদ্রদের কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় সাহায্য দেওয়ার বিরোধী ছিলেন।' [Introduction to Modern Political Theory, p. 30]

ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে !!!

'সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশ জন বড় জাত !!!'[৮৫] বিবেকানন্দের এ ধারণা সমাজতান্ত্রিক, তখনকার দিনে স্বাধীনতা সম্পর্কে এরূপ ইতিবাচক ধারণা অনেকেরই ছিল না।

বেদান্তবাদী হিসাবে বিবেকানন্দ স্বাধীনতাকে অত্যন্ত উচ্চস্থান দিয়েছেন, সামাজিক নিয়মবন্ধনের বাড়াবাড়ি তিনি অন্যায় মনে করেছেন। তাঁর কথাঃ '...বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পারো বন্ধন খোল।'[৮৬] অত্যন্ত জোরের সঙ্গে আবার বলছেনঃ 'সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ।...যে-সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে-সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।'[৮৭] সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রকে তিনি সীমিত রাখার পক্ষপাতী, ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ তিনি চাননি। সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে ব্যক্তির বিকাশের পথে সব বাধা দূর করে দেওয়া এবং বাস্তব সেইসকল সুযোগ ও সুবিধাগুলি তাদের দেওয়া যা হবে বিকাশের সহায়ক। সুতরাং স্বাধীনতা বলতে তিনি কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণহীনতা মনে করেননি, কতকগুলি বাস্তব অধিকারের (positive rights) সমষ্টি মনে করেছেন।

অধিকারঃ 'অধিকার' রাজনীতি-শাস্ত্রে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিবেকানন্দ এই অধিকারের মধ্যে উল্লেখ করেছেন শিক্ষা, ধনার্জন, কর্মের সুযোগ প্রভৃতির অধিকার। তাঁর অধিকারবাদের ভিত্তি বেদান্ত। এই বেদান্তের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেছেনঃ 'এই দরিদ্রগণকে—ভারতের এই পদদলিত জনসাধারণকে তাহাদের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবলতা-দুর্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে, প্রত্যেক বালকবালিকাকে শুনাও শিখাও—সবল-দুর্বল, উচ্চ-নীচনির্বিশেষে সকলেরই ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন; সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে। সকলেরই সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলো... উঠ, জাগো—যতদিন না চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না।'[৮৮] জন্মগত অধিকার বলতে সর্বপ্রকার মানবিক অধিকার অবশ্যই বোঝাচ্ছে। এইসকল অধিকার যথা—'বেঁচে থাকার অধিকার', 'শিক্ষার অধিকার', 'কর্মের অধিকার' না থাকলে স্বাধীনতা কখনই সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ এ-সম্বন্ধে বলছেনঃ 'যাহাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে-বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেইদিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ।'[৮৯]

সাম্যঃ রাজনীতি-শাস্ত্রে যে ধারণাটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সেটি হল সাম্যের ধারণা। বিবেকানন্দ এই ধারণার উপর প্রভূত আলোকপাত করেছেন। বস্তুত তাঁর দ্বারা এটির

৮৫। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২৪ ৮৬। তদেব, পৃঃ ১৭২ ৮৭। তদেব, পৃঃ ২৪
৮৮। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৮২ ৮৯। তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২৪

নিগূঢ় অর্থসকল উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং এটি অধিকতর বাস্তব হয়ে উঠেছে। বিবেকানন্দের বক্তব্য হল ঃ 'আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, সকল মানুষ একরূপ হউক—ইহা কখনই সম্ভব হইবে না। মানুষ পরস্পর পৃথক হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কেহ কেহ অন্য লোকের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী, কেহ কেহ স্বভাবতই ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে, আবার কেহ কেহ এইরূপ হইবে না। কেহ কেহ সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে, কেহ কেহ হইবে না। আমরা কখনও এই পার্থক্য বন্ধ করিতে পারি না।'[৯০] একথা এত সত্য যে প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আমরা সকলেই একথা জানি। সৃষ্টির মূলকথা হল বৈচিত্রের উদ্ভব। সেজন্য বিবেকানন্দ বলছেন ঃ '...যতদিন পর্যন্ত সৃষ্টিতে প্রাণের ক্রিয়া চলিবে, ততদিন সর্বপ্রকার ভেদ ও পার্থক্যের বিলয়...অসম্ভব।'[৯১] তাহলে সাম্যের অর্থ কি? সাম্য কি অর্থহীন কবিকল্পনা? বিবেকানন্দ বলছেন তা নয়, ঐক্যও আছে, ঐক্য না থাকলে বৈচিত্র উপলব্ধি সম্ভব নয়। ঐক্য কিরূপ? স্বরূপের ঐক্য। বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করে বলছেন ঃ 'একই শক্তি তো সকলের মধ্যেই বিদ্যমান; কোথাও সেই শক্তির অধিক প্রকাশ, কোথাও বা কিছু অল্প প্রকাশ।'[৯২] তা যদি হয় তো তাহলে শক্তি বিকাশের জন্য একই সুযোগ সকলকে দিতে হবে, কারণ সম্ভাবনা বা সুপ্ত শক্তি সকলেরই এক, তারতম্য শুধু বিকাশের ক্ষেত্রে। বিবেকানন্দের এ ধারণার ভিত্তি বেদান্ত, বেদান্তের জীবব্রহ্মবাদ, যার সারকথা ঃ 'অতি ক্ষুদ্র জীবকোষেও সেই অনন্ত পূর্ণব্রহ্মই অন্তর্নিহিত।'[৯৩] সুতরাং 'একই শক্তি সুপ্তাকারে প্রত্যেকের মধ্যেই রহিয়াছে।'[৯৪] অতএব কেউ ছোট নয়, হীন নয়, তুচ্ছ নয়, সকলেরই বড় হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে। সেজন্য বেদান্ত কোন বিশেষ অধিকার স্বীকার করে না, সকলকে সমান অধিকার, সমান সুযোগ দেওয়া হোক—বেদান্ত যা বলে তার নিহিতার্থ তা-ই। বেদান্তের এই ভিত্তি থেকে দেখা যায়, বৈচিত্র ও বিভিন্নতা দূর করা যায় না কিন্তু অধিকারের তারতম্য বা বিশেষ অধিকার দূর করা যায়। সুতরাং সাম্য বলতে বোঝায় এই বিশেষ অধিকার বিলোপ, অধিকারের কোন তারতম্য থাকবে না। বিবেকানন্দ বলছেন ঃ 'বৈচিত্রকে নষ্ট না করিয়া সাম্য ও ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র কাজ।'[৯৫] এ-বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ঃ 'এই-সকল বৈচিত্র পার্থক্য অনন্তকাল বিরাজ করুক। এই বৈচিত্র জীবনের অপরিহার্য সারবস্তু। এভাবেই আমরা অনন্তকাল খেলা করিব। তুমি হইবে ধনী এবং আমি হইব দরিদ্র; তুমি হইবে বলবান এবং আমি হইব দুর্বল; তুমি হইবে বিদ্বান এবং আমি হইব মূর্খ; তুমি হইবে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন, আমি হইব অল্প আধ্যাত্মিক। তাহাতে কি আসে যায়? আমাদিগকে এরূপই থাকিতে দাও, কিন্তু তুমি আমা অপেক্ষা শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে অধিকতর বলবান বলিয়া আমা অপেক্ষা বেশী অধিকার ভোগ করিবে, ইহা হইতে পারে না; আমা অপেক্ষা তোমার ধনৈশ্বর্য বেশী আছে বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় বিবেচিত হইবে, ইহাও হইতে পারে না,

---

৯০। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৫০-৫১ ৯১। তদেব, পৃঃ ৩৪৯-৫০
৯২। তদেব, পৃঃ ৩৩৮ ৯৩। তদেব, পৃঃ ৩৩৪
৯৪। তদেব, পৃঃ ৩৩৮ ৯৫। তদেব, পৃঃ ৩৫২

কারণ অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের ভিতরে সেই একই সমতা বিদ্যমান।'[৯৬] এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান—প্রকৃত সাম্য বলতে কি বোঝায় এবং কিভাবে সেটা বাস্তব হতে পারে। বিশেষ অধিকার ভেঙে দেওয়া, সকলকে সমান মানবিক অধিকার দেওয়া—সাম্যের এই হল প্রকৃত তাৎপর্য এবং এই অর্থেই সাম্য আমাদের সমাজজীবনে বাস্তব হতে পারে। সকলকে একরকমের করা যাবে না, কিন্তু সকলকে সমান মর্যাদা, সমান সুযোগ নিশ্চয়ই দেওয়া যায়। সাম্য সম্বন্ধে বর্তমানে এই ধারণাই গৃহীত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই অর্থেই সাম্যের রূপমণ্ডন প্রয়াস চলেছে।

আমূল রূপান্তর ও বিপ্লব ঃ

সাম্প্রতিককালের রাজনীতি-শাস্ত্রে 'বিপ্লব' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। তার কারণ রাজনীতি-শাস্ত্র গড়ে ওঠে বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে। বর্তমান শতাব্দীতে সঙ্ঘটিত রুশ বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঘটনা, সেজন্য বর্তমানকালের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ধারা এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—একথা হেগেল বা কান্ট কল্পনায়ও আনতে পারেননি, অথচ মার্কস শ্রেণীরাষ্ট্রে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী বলেছেন। সমসাময়িক কালে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধূমায়িত তীব্র শ্রমিক অসন্তোষ বিবেকানন্দকে প্রভাবিত করেছিল। বাস্তব রুশ বিপ্লব হ্যারল্ড ল্যাস্কি প্রভৃতিকে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রভাবিত করেছে যে, অবস্থা বিশেষে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার জনগণের আছে। বিবেকানন্দ রুশ বিপ্লবের পূর্বেই একথা লিখেছেন, এবং সেই বিপ্লবের পূর্ববর্তী ইউরোপের অগ্নিগর্ভ অবস্থা গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সহায়ে লক্ষ্য করেছিলেন। তাছাড়া বিপ্লবপন্থী ক্রোপটকিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটেছিল এবং অসম্ভব নয় আরও কিছু বিপ্লবপন্থীদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। তাঁর দু-একটি উক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন এক জায়গায় বলছেন ঃ 'সব সমাজ-সংস্কারকেরা, অন্তত তাঁদের নেতারা, এখন তাঁদের সাম্যবাদ প্রভৃতির একটা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি বার করবার চেষ্টা করছেন—আর সেই ভিত্তি কেবল বেদান্তেই পাওয়া যায়। অনেক নেতা যাঁরা আমার বক্তৃতা শুনতে আসতেন, আমায় বলেছেন, নূতন ভাবে সমাজ গঠন করতে হলে বেদান্তকে ভিত্তিস্বরূপ নেওয়া দরকার।'[৯৭] এঁদের সংস্পর্শে এসে স্পষ্টতই তিনি তদানীন্তন বিপ্লব-চিন্তা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। সেজন্য 'বিপ্লব' সম্বন্ধে তিনি একটি নিজস্ব সুস্পষ্ট বিচার দিয়েছেন। যে রক্তাক্ত সঙ্ঘাতের ফলে রাষ্ট্রক্ষমতা একশ্রেণীর হাত থেকে আর একশ্রেণীর হাতে যায় পাশ্চাত্য চিন্তাবিদেরা তাকেই বিপ্লব বলেছেন। বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় এ-ধরনের বিপ্লবও স্থান পেয়েছে। এক জায়গায় রাজতন্ত্রের ক্ষমতাচ্যুতি সম্পর্কে তিনি বলছেন ঃ 'পালনের স্থানে কাজেই পীড়ন আসিয়া পড়ে—রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ। ...যেথায় সমাজশরীর বলবান, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি দূরে বিক্ষিপ্ত

৯৬। তদেব ৯৭। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩

ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।'[৯৮] এই বিপ্লবের কারণ নির্দেশ করে তিনি আরও বলেছেনঃ 'সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।...পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া, প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।'[৯৯]

কিন্তু বিবেকানন্দের নিকট 'বিপ্লব'-এর অর্থ কেবলমাত্র শ্রেণীসংগ্রাম বা ক্ষমতা হস্তান্তর বা তজ্জন্য রক্তপাত নয়—রক্তপাত বিনাই যে-ঘটনা ঘটতে পারে এমন একটি ব্যাপার। 'বিপ্লব' বলতে তিনি বুঝেছেন সমাজের 'আমূল রূপান্তর'। ভারত-ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারতে সমাজ-রূপান্তর ঘটেছে বার বার বিনা রক্তপাতে ধর্মপ্লাবনের মধ্য দিয়ে। তাঁর বিশ্লেষণের সারাংশ হলঃ 'ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এদেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এদেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।'[১০০] ধর্মনেতারা যখন ধর্মীয় উপলব্ধির মাধ্যমে জগৎ ও সমগ্র জীবকুলের ঐক্য অনুভব করেন এবং সেই উপলব্ধির ভিত্তিতে সকলকে সর্ববিষয়ে সমানাধিকার দিতে অগ্রসর হন, তখন তাঁদের সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগী পুরোহিত-তন্ত্রের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা জয়ী হন এবং পুরোহিতদের বিশেষ সুবিধাসমূহ ভেঙে ফেলতে সমর্থ হন। তাতে জনগণের মানবিক অধিকার লাভ ঘটে। এই পরিণতি যখন ঘটে তখন মূল্যবোধেও এক বিপুল পরিবর্তন ঘটে। সকলের সমান অধিকারকে যখন সকলেই মূল্যমানে স্থান দেয়, তখনই ঠিক ঠিক 'বিপ্লব' সাধিত হয়। বিবেকানন্দ এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে দেখিয়েছেন জনগণের সমানাধিকারের স্বীকৃতি ঘটার নামই বিপ্লব, তা রক্তপাতের মাধ্যমেও ঘটতে পারে, আবার বিনা রক্তপাতে ধর্মপ্লাবনের মধ্য দিয়েও ঘটতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্লাবনের মধ্য দিয়ে ঘটলেও সমাজে বিশেষ সুবিধা যারা ভোগ করছিল তারা সহজে তা ছাড়তে চায় না বলে সঙ্ঘর্ষ কিছু কিছু অনিবার্য হয়ে ওঠে অনেক সময়। কিন্তু রক্তপাতই বিপ্লব নয়, বিপ্লব হল মূল্যবোধে

৯৮। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৯ ৯৯। তদেব, পৃঃ ২৪২-৪৩
১০০। তদেব, পৃঃ ২৩৭

আমূল রূপান্তর এবং তার মধ্য দিয়ে জনগণের অধিকার লাভ। বৌদ্ধযুগে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণে যে বিষম সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল বিবেকানন্দ তাকে 'বিপ্লব' আখ্যা দেননি, বিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন ভগবান বুদ্ধের পুরোহিতকুলের বিশেষ সুবিধাকে ভেঙে দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে। বিষয়টি ব্যাখ্যাকল্পে তিনি বলছেন : 'পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্মকাণ্ডের প্রাণ-নিষ্পীড়ক ভার হইতে সমাজকে সদাচার ও জ্ঞানমাত্রাশ্রয় জৈন এবং অধিকৃত জাতিদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে নিম্নস্তরস্থ মনুষ্যকুলকে বৌদ্ধবিপ্লব ভিন্ন কে উদ্ধার করিত ?'[১০১] এখানে 'বৌদ্ধবিপ্লব' কথাটি বিশেষ লক্ষণীয়। ধর্মের এই বৈপ্লবিক ভূমিকা ইতিপূর্বে আর কোনও সমাজবিজ্ঞানী উদ্ঘাটিত করেননি। এটি বিবেকানন্দের সমাজবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

এ-বিষয়ে বিবেকানন্দের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ উদ্ঘাটন হল এই যে, শুধু ধর্মের নয় বিপ্লবসাধনে জড়বাদেরও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এ তথ্য বিবেকানন্দ তাঁর ইতিহাস বিশ্লেষণ সহায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পৌরোহিত্যের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য জনসাধারণ জড়বাদ বরণ করেছে। বিবেকানন্দের ভাষায় : 'আরও একদল ছিল, পুরোহিতকুল ও রাজকুল—উভয় হইতে যাহারা উদ্ভূত, তাহারা পুরোহিত এবং দার্শনিক দুই শ্রেণীকেই বিদ্রূপ করিত, অধ্যাত্মবাদকে ধাপ্পাবাজি ও বুজরুকি বলিয়া অভিহিত করিত এবং জাগতিক সম্ভোগকেই জীবনের সর্বোত্তম কাম্যবস্তু বলিয়া ঘোষণা করিত। ইহারাই জড়বাদী।

'সাধারণ মানুষ তখন ধর্মের প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে ক্লান্ত এবং দার্শনিক ব্যাখ্যার জটিলতায় বিভ্রান্ত ; কাজেই তাহারা দলে দলে এই জড়বাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল।'[১০২]

বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায় দেখা যায় এরূপ ঘটে বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে, দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপুল ধর্মপ্লাবন ঘটে।

কিন্তু কোন বিপ্লবই সমাজ থেকে অসাম্যকে চিরতরে দূর করতে পারেনি। ভারতবর্ষে 'ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলছেন : 'সকলের সামাজিক সাম্যের জন্য বৌদ্ধ বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিপুল সংগ্রাম সত্ত্বেও সেই অমীমাংসিত সমস্যা আমাদের কাল পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে।'[১০৩] কেবলমাত্র অতীত ইতিহাসেই নয়, ভবিষ্যতেও এ সমস্যার যে কোনদিন চিরকালের জন্য সমাধান হবে সে সম্ভাবনা কম। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে : 'দুইটি শক্তি যেন নিয়ত ক্রিয়া করিতেছে; একটি বর্ণ ও জাতিভেদ সৃষ্টি করিতেছে এবং অপরটি উহা ভাঙিতেছে। ...আর যতই ব্যক্তিগত সুবিধা ভাঙিয়া যায়, ততই সে সমাজে জ্ঞানের দীপ্তি ও প্রগতি আসিতে থাকে।'[১০৪] এই উক্তিটি বিবেকানন্দের অসামান্য বাস্তবদৃষ্টির প্রমাণ। একেবারে অসাম্য যদি দূর হয়, পূর্ণ সাম্য চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে চলমান জগতের চলাই বন্ধ হয়ে যায়। সমাজ তো চিরপরিবর্তনশীল, তার বিবর্তন তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। সুতরাং কোন বিপ্লবই সমাজে পূর্ণ সাম্য চিরদিনের জন্য আনতে পারে না।

১০১। তদেব ১০২। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৭-৮৮
১০৩। তদেব, পৃঃ ৩৮৮ ১০৪। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭

যাই হোক, ধর্মের বৈপ্লবিক ভূমিকা নির্দেশ করে বিবেকানন্দ সমাজবিজ্ঞানে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেন যার অপরিসীম মূল্য রয়েছে মানবকল্যাণের দিক থেকে।

পারস্পরিক সাহায্য (Mutual Aid) ও বিপ্লবের ধারণা ঃ

এ-বিষয়ে লক্ষণীয় এই যে, বিবেকানন্দের রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান-ধারণায় আশ্চর্য রকমে বিপরীত আদর্শ সকল সমন্বিত হয়েছে। সমাজতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম ও সমাজতন্ত্র, 'ধর্ম' ও বিপ্লব ইত্যাদি আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি। বিবেকানন্দের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক প্রিন্স ক্রোপটকিনের 'Mutual Aid' বা পারস্পরিক সাহায্যের ধারণার অনুরূপ—'পরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের "বৃত্তি"।' নিবেদিতা লিখেছেন যে, নরমাংস-খাদক কোন জাতির কথা কোন একজন পাশ্চাত্যদেশীয়ের নিকট হতে শুনে বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ সমাজবদ্ধ জীবের ব্যবহার এরূপ হয় না, কারণ এরূপ আচরণ সমাজবদ্ধ জীবনের মূলে আঘাত করে।[১০৫] নিবেদিতা এর উপর মন্তব্য করেন ঃ যখন এ কথাগুলি বলা হয়েছিল তখন ক্রোপটকিনের 'Mutual Aid' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মানবপ্রেম ও তাঁর একটি সহজাত ধারণা যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বড়, তাঁকে এরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন করেছিল।[১০৬] বিবেকানন্দের মতে, ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তির জন্য পরিবেশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের মাধ্যমে টিকে থাকতে হয়। ডারউইনের (Darwin) মতবাদ এ-পর্যন্ত সত্য। কিন্তু, মানুষ একমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত নয়, মানুষ পরিচালিত 'যুক্তি'র দ্বারা। মানুষের ক্ষেত্রে 'যুক্তি' ও 'বুদ্ধি'র বিকাশেই বিকাশ, মানুষ সেজন্য অপরকে ধ্বংস করে টিকে থাকার তাগিদ অনুভব করে না, মানুষের মধ্যে বরঞ্চ দেখা যায় অপরের জন্য সর্বস্ব এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে। এই মানুষের জন্য ত্যাগের প্রবৃত্তিই মানুষকে ইতর জীবজন্তুর থেকে পৃথক করেছে।

বস্তুত ডারউইনের জীবন-সংগ্রাম তত্ত্বই মার্কসকে প্রভূত প্রভাবিত করেছিল তাঁর বিপ্লবের ধারণা গঠনে। সেজন্য তিনি রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা বলেছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ তা বলেননি। তিনি বলেছেন দৃঢ়কণ্ঠে একথা ঃ 'হাজার পাপীর প্রাণসংহার করে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দ্বারা জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়। কিন্তু উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলে জগতে আর পাপ থাকে না।'[১০৭] তাছাড়া তিনি বার বারই বলছেন ঃ 'আমি বিকাশে বিশ্বাসী।' একটি বীজই কালে মহামহীরুহ হয়ে ওঠে। তিনি সেজন্য চেয়েছেন জনগণকে শিক্ষা দিতে, তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে। তারপর তাদের ভাগ্য তারাই নির্ধারণ করবে, সেটাই তাদের পক্ষে সবচেয়ে মঙ্গলজনক—এ-ই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

১০৫। The Master as I saw him, p. 146

১০৬। Ibid. ১০৭। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১২০

শূদ্র বিপ্লব ঃ

সমাসন্ন যে বিপ্লব সম্পর্কে মার্কস অনেক কিছু বলেছেন সে-সম্পর্কে বিবেকানন্দ কি কিছু বলেছেন? অর্থাৎ সমাজে বৈশ্যশাসন হতে শূদ্রশাসন কিভাবে আসবে? এ-সম্পর্কে স্বামীজী যা-কিছু বলেছেন তার সারমর্ম আমাদের খুবই প্রাঞ্জল উপহার দিয়েছেন অধ্যাপক হরউইচ (Horrwitch) নিজস্ব কয়েকটি মন্তব্য সহ ঃ নববেদান্তবাদীরা রামকৃষ্ণ যে উদার দায় রেখে গেছেন তার যোগ্য হবেন। সাংস্কৃতিক উপায়ে শ্রেণীহীন সমাজ আনতে রামকৃষ্ণের অনুসরণকারীরা দায়বদ্ধ। ...বিবেকানন্দ বুর্জোয়াশ্রেণীকে ঘৃণা করতেন এবং শ্রমিকশ্রেণীকে ভালবাসতেন। পূর্বোক্ত শ্রেণী অর্থলিপ্সু ও ভোগপরায়ণ এবং অত্যন্ত স্বার্থপর, সেজন্য তারা উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। কৃষক, মুচি, ঝাড়ুদার প্রভৃতি শ্রমজীবীরা অনেক স্বনির্ভর এবং তাদের কর্মদক্ষতা যাঁরা শিক্ষিত বলে গর্ব করে থাকেন সেই ঘৃণ্য মধ্যবিত্তশ্রেণীর চেয়ে অনেক বেশী। দীর্ঘকাল ধরে শ্রমজীবীরা নীরবে কাজ করে এসেছে এবং বিশ্বের সমস্ত ধন-সম্পত্তি উৎপন্ন করেছে, তাদের যারা দাসের মতো খাটিয়েছে তাদের নিকট কোন প্রতিবাদ জানায়নি। আধুনিক শিক্ষা এই পশ্চাৎপদ শ্রেণীকে সম্মুখে এনেছে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর যে হীনম্মন্যতা তা উদ্‌ঘাটিত করেছে। অর্থ আজ মৃত মূলধন, একটি জাতির জীবন্ত সম্পদ তার কঠিন শ্রমসম্পদ...। নববেদান্ত গীতার ন্যায় শ্রমের বাণী প্রচার করে। অনতিদূরকালে যারা কর্মদক্ষ শ্রমদক্ষ শ্রমিকশ্রেণী তারা জড়বুদ্ধি সমাজের পরগাছা মধ্যবিত্তশ্রেণী অপেক্ষা প্রাধান্য অর্জন করবে। মূলধন অবিলম্বে যোগকুশল শ্রমিকের হাতে চলে যাবে, 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'। সেই শ্রমিকশ্রেণীই হল বীর, সাহসী পুরুষ, মনুষ্যকুলে সিংহের ন্যায়। সেজন্য ধন-সম্পদ তারই আয়ত্তাধীন হবে...।[১০৮] বিবেকানন্দের নিজের ভাষায় ঃ 'এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্দাফরাস—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে! Capital (মূলধন) তাদের হাতে গিয়ে পড়ছে—তোদের মতো তাদের অভাবের জন্য তাড়না নেই। ...তোরা এইসব সহিষ্ণু নীচজাতদের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস, এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে। ...তোদের মতো তারা কতকগুলো বই-ই না-হয় না পড়েছে। ...কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড—সব দেশে। এই ইতরশ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্নবস্ত্র কোথায় পাবি? ...জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একইভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐরকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐকথা বুঝতে পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্যগণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকায়

১০৮। Prabuddha Bharata, Sri Ramakrishna Birth Centenary Number, February, 1936, pp. 127-28

ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই ঐকথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা ছোটজাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতর-জাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতদের কল্যাণ।...তোরা চিরকাল যা করে আসছিস—ঘরাঘরি লাঠালাঠি করে সব ধ্বংস হয়ে যাবি! এই Mass (জনসাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাদের উপর তোদের (ভদ্রলোকদের) অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর civilization (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে।'[১০৯]

বিবেকানন্দের মূলকথা শ্রমিকশ্রেণী সভ্যতার স্রষ্টা তাদের সমুদয় সৃষ্টির ক্ষমতার জন্য। আর শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণী এদের শোষণ করে বেঁচে আছে, শিক্ষা পেলে এই অগণিত শ্রমিকশ্রেণী যারা কর্মদক্ষতায় শ্রমদক্ষতায় অনেক যোগ্য তারা আধিপত্য বিস্তার করবে এবং ভদ্রশ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হবে। মার্কসও বলেছেন 'যাদের নেই' (Have-nots) তারা 'যাদের আছে' (Haves) তাদের চেয়ে সংখ্যায় এত বেশী হয়ে যাবে যে, তারা সহজেই মুষ্টিমেয় বিত্তবানদের ক্ষমতাচ্যুত করবে। বিবেকানন্দের মতে সেজন্য ভদ্র শিক্ষিতদের কর্তব্য হল এদের শিক্ষিত করে এদের মধ্যে আপন অধিকার সম্বন্ধে চেতনা এনে দেওয়া। তাতে কাজটি সহজ হবে। তার পরে তিনি যা বলেছেন তা মনে হয় শ্রমিকদের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘণ্টাধ্বনি, কথাগুলি পড়লে মনে হয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যারা চিরবঞ্চিত তারা দলে দলে এগিয়ে আসছে স্বাধিকার অর্জন করতে। কথাগুলি হল: '...ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূত কাল ...তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। ...অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।'[১১০]

বিবেকানন্দ সেজন্য চেয়েছেন জনগণকে শিক্ষা দিতে, তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে। তারপর তাদের ভাগ্য তারাই নির্ধারণ করবে, সেটাই তাদের পক্ষে সবচেয়ে মঙ্গলজনক—এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা:

রাজনীতি-শাস্ত্রের এই দুটি ধারণার উপরও বিবেকানন্দের অসাধারণ মননের আলোক পড়েছে এবং তাদের পুষ্টি ঘটিয়েছে।

১০৯। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১০৭-০৯

১১০। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮১-২

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ঃ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য ঃ তাঁর স্বদেশপ্রেমের কথা সর্বজনবিদিত। নিবেদিতা বলেছেন ঃ তাঁর আরাধ্যা দেবী ছিলেন তাঁর মাতৃভূমি।[১১১] নিবেদিতা আরও লিখেছেন ঃ ভারতের সীমানায় উত্থিত এমন একটিও দুঃখবেদনা ছিল না যা তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে বাজেনি।[১১২] ভারতকে তিনি দিয়েছিলেন একটি মন্ত্রবাণী যা 'স্বদেশমন্ত্র' নামে খ্যাত। সেই সর্বজনবিদিত 'স্বদেশমন্ত্রে' তিনি প্রথমে বলেছেন ঃ 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?'[১১৩] এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একথা যে, জাতীয়তা উপলব্ধির মূল উপজীব্য জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে চেতনা যা পরানুকরণ করলে কখনও জাগ্রত হয় না। একমাত্র জাতীয় ঐতিহ্যে গৌরববোধই সেই স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি এনে দিতে পারে। সেজন্য তিনি 'স্বদেশমন্ত্রে' সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন সে ঐতিহ্য ঃ '...ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর...।'[১১৪] ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য পবিত্রতা ও ত্যাগের আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যুগ-যুগান্তর ধরে। ভারতের ধর্ম, ভাষা, আচার-আচরণ প্রভৃতিতে অনন্ত বৈচিত্র, কিন্তু ঐক্য এই দুটি আদর্শে। এই আদর্শগত ঐক্যবোধই জাতীয়তাবোধের মূলভিত্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ, রীতি-প্রথা—সবকিছু বিষয়ে অনন্ত বৈচিত্র সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। জাতীয়তার ধারণায় 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য'—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তা ঃ একই সঙ্গে বিবেকানন্দ তাঁর 'স্বদেশমন্ত্রে' বলছেন ঃ '...ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!'[১১৫] বিবেকানন্দ এখানে জাতীয় ঐক্যের ধারণার একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। জাতি বা নেশন (Nation) যে সমাজের উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীকে নিয়ে, সকল মানুষকে নিয়ে গঠিত তা তাঁর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে কোন যুগে জাতীয়তাবাদের কোন প্রচারক কখনও বলেননি। এখানে বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদকে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে স্থাপিত করেছেন। বিপরীত আদর্শের মধ্যে এমন আশ্চর্য ঐক্যের কথা আর কোনও মনীষী ভাবতে পারেননি। সমাজতন্ত্রবাদীরা যাঁরা সমাজের শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্যলাভের কথা বলেন তাঁরা জাতীয়তাবাদকে সঙ্কীর্ণতাবাচক বলে বর্জন করে থাকেন। কিন্তু বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি সমাজতান্ত্রিক।

আন্তর্জাতিকতায় পরিণত জাতীয়তা ঃ বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদের অপর বৈশিষ্ট্য হল এতে সঙ্কীর্ণতার স্থান নেই। একটি আলোচনায় তিনি বলছেন ঃ 'বর্তমানকালে ইওরোপখণ্ডে জাতীয়তার এক মহাতরঙ্গের প্রাদুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতির সমস্ত লোকের একত্র সমাবেশ। যেথায় ঐ প্রকার একত্র সমাবেশ সুসিদ্ধ হচ্চে, সেথায়ই

১১১। The Master as I saw him, p. 41 ১১২। Ibid.
১১৩। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯ ১১৪। তদেব ১১৫। তদেব

মহাবলের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে ; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই নাশ। বর্তমান অস্ট্রীয় সম্রাটের মৃত্যুর পর অবশ্যই জার্মান অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের জার্মানভাষী অংশটুকু উদরসাৎ করবার চেষ্টা করবে, রুশ প্রভৃতি অবশ্যই বাধা দেবে ; মহা আহবের সম্ভাবনা...।'[১১৬] সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ভাষা ধর্ম প্রভৃতির ঐক্য এবং তার ফলশ্রুতি ঐ ঐক্যের ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র গঠনের দাবি, তার পরিণাম যে যুদ্ধ ও এক রাষ্ট্রের দ্বারা অপর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ, বিবেকানন্দ তা এখানে স্পষ্ট তুলে ধরেছেন।

'বৈচিত্রে একত্ব' তত্ত্বে বিশ্বাসী বিবেকানন্দ সকল জাতির বৈশিষ্ট্য ও মহিমাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। রোমাঁ রোলাঁ বলছেন ঃ 'ঐগুলি হইতে সুস্পষ্টভাবে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা হইল তাঁহার "সর্বজনীন" ভাব। গণতান্ত্রিক আমেরিকা সম্পর্কে তাঁহার আশা ছিল ; ম্যাট্‌সিনির মহাজন্মদাত্রী ইতালীর শিল্প, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তিনি চীনদেশকে বিশ্বের ধনভাণ্ডার আখ্যা দেন। পারস্যের বেবিস্ট শহীদদের প্রতি তাঁর ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল। তিনি হিন্দুদের ভারতবর্ষকে, বৌদ্ধদের ভারতবর্ষকে এবং মুসলমানদের ভারতবর্ষকে সমান চোখেই দেখিতেন। মোগল সাম্রাজ্য তাঁহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত। তিনি যখন আকবরের কথা বলিতেন, তখন তাঁহার চোখে জল আসিত।'[১১৭] নিবেদিতাও এ-সম্পর্কে প্রচুর আলোকপাত করে বলছেন ঃ স্বামীজীর দৃষ্টিতে প্রত্যেক জাতি মানবতা সম্পর্কে নিজস্ব ধারণার অভিব্যক্তি, সেজন্য প্রতিটি জাতি তাঁর কাছে ধর্মমন্দিরের মতো পবিত্রতামণ্ডিত।[১১৮] বিবেকানন্দ প্রতিটি জাতির মধ্যে একই অখণ্ড মানবতার বিচিত্র প্রকাশ দেখে মানবের মহিমায় অপরিসীম গৌরব বোধ করেছেন। দেখা যাচ্ছে জাতীয়তাবাদ আপনা থেকেই বিবেকানন্দের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার উদার আদর্শে উন্নীত। এজন্যই জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ ঋষি বিবেকানন্দ বলতে পেরেছিলেন, 'সত্যই আমার ঈশ্বর—সমগ্র জগৎ আমার দেশ।'[১১৯]

আমরা জানি শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের মহান বাণী—'যত মত তত পথ' সমগ্র মানবকুলকে একত্রিত করেছে, জন্ম দিয়েছে এক মহামানবতার, জাতিগত বৈচিত্রসত্ত্বেও সমগ্র মানবজাতি এক এবং অখণ্ড। বিবেকানন্দ তারই উপর ভিত্তি করে রোমাঁ রোলাঁর ভাষায় 'গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন এক মানবতার মহানগরী'। বিবেকানন্দের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদের সেই মহান স্বপ্নটিই বাস্তব রূপ পেতে চেয়েছে, যে স্বপ্নের কথা রাজনীতি-শাস্ত্রে রূপ পেয়েছে নিম্নোক্ত বাক্যে ঃ 'Parliament of man and federation of the world.'

কোনদিন সব মানুষ সব দেশ একত্রিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গড়বে এ হয়তো স্বপ্নই। কিন্তু সব জাতীয় রাষ্ট্র যে নিজ নিজ পৃথক বৈচিত্রময় অস্তিত্ব রক্ষা করেও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং পরস্পরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে—এ স্বপ্ন অবাস্তব বা অসম্ভব নয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৈচিত্রের মধ্যেই ঐক্য স্থাপিত হতে পারে। বিবেকানন্দ সেই স্বপ্নই দেখেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, ভারতকে পাশ্চাত্যদেশ

১১৬। তদেব, পৃঃ ১৩২ ১১৭। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, পৃঃ ১৪২ পাদটীকা
১১৮। The Master as I saw him, p. 195 ১১৯। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৯৩

দেবে প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের জ্ঞান, বিনিময়ে ভারত পাশ্চাত্যদেশকে দেবে অধ্যাত্মবিদ্যা। এইভাবে পরা অপরা বিদ্যার সম্মিলনে সমগ্র পৃথিবী এক হয়ে যাবে।

॥ ২ ॥

অর্থনৈতিক চিন্তা

পটভূমিকা ঃ ভারতে অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ ঃ

আধুনিককালের ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে তিনজন ব্যক্তি আদি প্রবর্তক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এঁরা হলেন দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছেন জি. ভি. যোশীও। এঁরা সকলেই এঁদের চিন্তা রেখেছেন উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করলেই দেখা যায় যে, এঁদের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতে অর্থনৈতিক চিন্তার স্ফুরণ ঘটেছে এবং নবজাগরণের প্রথম নায়ক রামমোহনের মধ্যে এবং নবজাগরণের অপর স্রষ্টাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র এবং নবজাগরণ যাঁর মধ্যে পূর্ণায়ত হয়েছিল সেই বিরাট পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে এ চিন্তার আরও পরিণত বিকাশ ঘটেছে। সুতরাং ভারতে অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশের ইতিহাসে নবজাগরণের এই তিন বিরাট স্রষ্টাপুরুষকে স্বীকৃতি দেওয়া ঐতিহাসিকের অবশ্য-কর্তব্য। দুঃখের বিষয় ভারতে এ পর্যন্ত অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ সম্বন্ধে প্রায় কোন গবেষণা হয়নি। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে এ-বিষয়ে প্রকাশিত হয় একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, রচয়িতা আধুনিক ভারতের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ্ ডক্টর ভবতোষ দত্ত।[১২০] অপর একটি তুলনায় বৃহত্তর গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, রচয়িতা অপর ভারতীয় প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডক্টর বি. এন. গাঙ্গুলী।[১২১] প্রথমোক্ত পুস্তিকায় ডক্টর দত্ত রামমোহনকে স্বীকৃতি প্রদান অন্তে মন্তব্য করেছেন ঃ 'অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে রামমোহন যে নেতৃত্ব দিলেন শতাব্দীর মধ্যভাগে আর কেউ এগিয়ে এলেন না এই ক্ষেত্রে নিজের চিন্তা রাখতে। নবজাগ্রত ভারতের মনীষা জন স্টুয়ার্ট মিল ও বেন্থাম প্রভৃতির চিন্তার দ্বারা পুষ্ট হলেও ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য চিন্তাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়নি। সেজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে একেবারে শেষভাগে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আসতে হয় অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তার স্ফুরণ দেখবার জন্য। এই সময়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে। অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে

১২০। The Evolution of Economic Thinking in India—Bhabatosh Datta, Federation Hall Society, Calcutta, 1962

১২১। Indian Economic Thought : Nineteenth Century Perspectives—B. N. Ganguli, Tata McGraw-Hill Publishing Co. Ltd., New Delhi, 1977

আগ্রহ রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই সময়ে সময়োপযোগী আর্থিক আদর্শগুলিকে রূপ দিলেন নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত ও রাণাডে।'[১২২] ডক্টর দত্তের এ মন্তব্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের প্রতি ঘোর অবিচার করা হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। কারণ, অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে অবিচ্ছেদ্য ধারায় শেষার্ধ অবধি অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। এবং এই অবিচ্ছিন্ন ধারার একপ্রান্তে আছেন রামমোহন, মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং শেষ প্রান্তে বিবেকানন্দ। ডক্টর গাঙ্গুলী তাঁর গ্রন্থে রামমোহনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছুটা স্বীকৃতি দিয়েছেন,[১২৩] কিন্তু বিবেকানন্দ স্বীকৃতি পাননি। তার কারণ বোধহয় এই যে বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন, সেজন্য ধরে নেওয়া হয়েছে যে তাঁর কোন অর্থনৈতিক চিন্তা থাকতে পারে না। কিন্তু বিবেকানন্দ রচনাবলীর সঙ্গে যাঁর সত্য পরিচয় আছে তিনি জানেন যে, বিবেকানন্দ প্রচুর অর্থনৈতিক চিন্তা রেখে গিয়েছেন। এটি একটি ঘটনা, একে অস্বীকার করবার উপায় নেই। একথা যে আমরা নিছক বীরপূজার মনোভাব থেকে বলছি না, তা আমরা তথ্যপ্রমাণ ও যুক্তি সহ এখানে আলোচনা করে দেখাব।

উনিশ শতকের শেষভাগে নবজাগ্রত ভারতে যে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, তা মুখ্যত বিবেকানন্দের সৃষ্টি—একথা আজ মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। রাজনৈতিক চেতনা ও অর্থনৈতিক চেতনা একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে—ইতিহাস তা-ই বলে। রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বাস্তবায়িত করবার জন্য প্রয়োজন হয় অর্থনৈতিক উপায়সমূহ। বিবেকানন্দ রাজনৈতিক চেতনা সম্পাদন করলেন, অথচ কোনরূপ অর্থনৈতিক চেতনা তাঁর নিজেরই ছিল না—একথা আমাদের যুক্তিকে কোনমতেই সন্তুষ্ট করতে পারে না। তাছাড়া, ইতিহাস-চর্চাই রাজনৈতিক চেতনা ও অর্থনৈতিক চিন্তার জন্ম দেয়। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইতিহাসে বিবেকানন্দের সুগভীর পাণ্ডিত্য ছিল—একথা অনেকেরই জানা আছে। এই ইতিহাসের একান্ত অনুরাগী ছাত্র নিকটবর্তীকালের অর্থনৈতিক-ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছিলেন বা তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেননি তা তো সম্ভব নয়। সমকালীন জীবনের সকল দিকই তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল এবং একালের সকল সমস্যারই মূলে যে তিনি প্রবেশ করতে পেরেছিলেন—একথা তাঁর সম্বন্ধে যাঁর কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তিনিই জানেন। বস্তুত, একালের ঘোর অর্থনৈতিক সঙ্কট ও সমস্যাদি তাঁর চিন্তায় সবসময় স্থান পেয়েছে, তাঁর মনোযোগের একাংশ তা-ই নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যাপৃত থেকেছে। তা শুধু নয়, একালের ভারতে তিনিই একমাত্র চিন্তাবিদ্ যিনি বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। এ-বিষয়ে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এই প্রবন্ধে[১২৪] যেসকল তথ্য প্রমাণ যুক্তি বিশ্লেষণ যা কিছু

১২২। The Evolution of Economic Thinking in India, p. 5

১২৩। Indian Economic Thought, p. 65

১২৪। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—সম্পাদনাঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, নচিকেতা ভরদ্বাজ ও স্বামী

দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী সময়ে রচিত ডক্টর সুব্রত গুপ্তের গ্রন্থ 'বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা'য়[১২৫] সে সমস্তই সম্পূর্ণ সন্নিবেশিত হয়েছে। বস্তুত, ডক্টর গুপ্ত এ প্রবন্ধের সমস্ত বক্তব্যই তাঁর গ্রন্থমধ্যে হুবহু সন্নিবেশিত করেছেন। এর দ্বারা এইটি প্রমাণিত যে, বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার উপর যে গুরুত্ব বর্তমান প্রবন্ধকার দিয়েছেন তা অনস্বীকার্য।

রামমোহন ও বিবেকানন্দের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালের অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাস ঃ

একথা একটু আগেই বলা হয়েছে যে, বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চেতনার মূলে আছে তাঁর অসামান্য ইতিহাস-জ্ঞান। তাঁর নিকটবর্তীকালের অর্থনৈতিক ইতিহাস কি? এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ প্রয়োজন, কারণ এই ইতিহাস তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল ও প্রভাবিত করেছিল যার প্রমাণ তাঁর বিভিন্ন উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়।

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজ শাসকেরা যে ভূমিরাজস্ব নীতি অনুসরণ করতে থাকে তারই প্রতিবাদে দেশের নানা স্থানে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঘটে—তাঁতী মালঙ্গীদের বিদ্রোহ, বাঁকুড়ার চাষীবিদ্রোহ, মেদিনীপুরের চুয়ার-বিদ্রোহ, দেবীসিংহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে কৃষক-বিদ্রোহ ও উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ। ১৮৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঘটে বিখ্যাত নীলবিদ্রোহ। এই বিদ্রোহগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে কৃষকদের অবস্থা ও কৃষিনীতি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে।[১২৬] ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্বার সনদ দেওয়া হবে কি না এই প্রশ্নে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কৃষকদের উপর গুরু করভারের প্রতিবাদ জানান। এই কালে বিভিন্ন সংবাদপত্রের জন্ম হয়। বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই সংবাদপত্রগুলি গ্রহণ করে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামমোহনের 'সংবাদ কৌমুদী', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর', 'Bengal Spectator' (ইয়ংবেঙ্গলের), 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' এবং শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ভূমিকা। একমাত্র 'সংবাদ প্রভাকর'ই ৯ এপ্রিল ১৮৪৭ থেকে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৬০টি অর্থনৈতিক বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এগুলির মধ্যে কয়েকটির শিরোনামা ঃ 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের লোন ও ডিসকাউন্ট বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি', 'শিল্পকর্ম ও বাণিজ্য', 'সুদ', 'কৃষকদের সমস্যা',

---

সোমেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ (১৩৮৫), পৃঃ ২৮০-৩০৮। বর্তমান সংস্করণে প্রবন্ধটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপে উপস্থাপিত।

১২৫। বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা—সুব্রত গুপ্ত, মডার্ন কলাম, কলিকাতা, ১৯৮৪

১২৬। 'এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমের "সাম্য" প্রবন্ধ রচনার মূলে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পাবনা সিরাজগঞ্জের প্রজাবিদ্রোহ এবং রমেশচন্দ্র দত্তের রচিত বাংলার ভূমিসংস্কার বিষয়ক প্রবন্ধ যা লালবিহারী দে-র "বেঙ্গল ম্যাগাজিনে" প্রকাশিত হয়েছিল তারও মূলে এই বিদ্রোহের প্রভাব। আনন্দমঠের পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিম সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে ভূমিকাটি লেখেন সেটিও এখানে উল্লেখযোগ্য।' [বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৯০, যোগেশ বাগলের ভূমিকা, পৃঃ ৭৮,২৯]

'লবণ বাণিজ্য', 'স্বর্ণমুদ্রা', 'নীলকরদের অত্যাচার', 'বঙ্গের কৃষকদের অবস্থা', 'বাজেট', 'বঙ্গীয় বাণিজ্য'। অন্যান্য পত্রিকায়ও অনুরূপ প্রবন্ধ লেখা হত। যথা ১৮৮১ থেকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গবাসী পত্রিকা' যে-সমস্ত মত প্রকাশ করেছে সেগুলি হলঃ ইংলণ্ডের শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দিয়ে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে ধ্বংস আনা হয়েছে, অতিরিক্ত উচ্চ কর বসিয়ে কারুশিল্পীদের শোষণ করা হয়েছে, পরিণামে এসেছে ভয়াবহ দারিদ্র। এছাড়াও ভূমিরাজস্বের উচ্চ হার, ইউরোপীয় কর্মচারীদের উচ্চ বেতন। বস্ত্রশিল্পের উপর আমদানী-কর বর্জনের অযৌক্তিকতা, শ্রম-আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়।[১২৭] ১৮৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের শোচনীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারাবাহিক লেখেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। পাটকল শ্রমিকদের মধ্যে এসময় কল্যাণমূলক কাজ করছিলেন শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ভারতের প্রথম শ্রমিকদের মুখপত্র 'ভারতে শ্রমজীবী' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। নীল-চাষীদের আন্দোলনের সময় এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে তীব্র ভাষায় প্রবন্ধ লেখা হয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'Hindu Patriot' ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Bengalee' পত্রিকায়। বোম্বাইয়ে নারায়ণ মেঘজী লোখাণ্ডে 'দীনবন্ধু' নামক শ্রমজীবীদের জন্য অপর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকা ছাড়াও কৃষক-শ্রমিকদের পরিস্থিতি এবং সাধারণভাবে অর্থনৈতিক নানা সমস্যা নিয়ে যেমন খাজনা ও কর, শিল্প-বাণিজ্য নীতি প্রভৃতি নিয়ে নিয়মিত আলোচনা ও মত প্রকাশ করত বিভিন্ন সংস্থা। যথা—'জমিদার সভা', 'British Indian Association (1837)', 'Indian Association (1875)', 'শিল্প-বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫৪)', 'বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা (১৮৬৬)'। ১৮৬৭-৮০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলায় ভারতের হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী হত, মূল লক্ষ্য ছিল উক্ত শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়—'National Society'। এই সংস্থার মুখপত্র ছিল দৈনিক 'National' পত্রিকা। এ পত্রিকা নবগোপাল মিত্রের পরিচালনায় বহুবিধ অর্থনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করে হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন নিয়ে নিরলস আলোচনা করেছে। হিন্দুমেলা সংগঠনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় নাম রাজনারায়ণ বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। বিবেকানন্দ শৈশবে এই পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে ওঠেন এবং এইসকল চিন্তার সংস্পর্শ লাভ করেন।

উপরে রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালের অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।[১২৮] এই ইতিহাস গড়ে উঠেছে বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহকে কেন্দ্র করে। ভারতের দারিদ্র, ইংরেজ শাসকদের শোষণ,

---

১২৭। National Awakening and the Bangabasi—Shyamananda Banerjee, Amitava-kalyan Publishers, Calcutta, 1968, p. 11

১২৮। এই ইতিহাস সংকলনে নিম্নলিখিত গ্রন্থাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছেঃ

(ক) সাময়িক পত্রে বাংলা সমাজ-চিত্র—বিনয় ঘোষ (প্রথম সংস্করণ)

(খ) The Peasant Revolution in Bengal—J. C. Bagal (1953)

(গ) The Indian Awakening and Bengal—Dr. N. S. Basu (1969)

কৃষকদের উপর গুরু করভার, শ্রমিকদের অমানুষিক অবস্থা, শিল্পের অবক্ষয়, উন্নতি পরিপন্থী শুল্কনীতি প্রভৃতি বাস্তব সমস্যার উপর সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সংস্থাদির মাধ্যমে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ আলোকপাত করেন। এ-সমস্তই বিবেকানন্দের চিন্তার পটভূমিকা রচনা করেছে।

উনিশ শতকের অর্থনৈতিক চিন্তার মুখ্য নায়কগণঃ

উনিশ শতকের অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির অবদান রয়েছে এ আমরা উপরে দেখলাম। এঁদের মধ্যে মুখ্য অবদান যাঁদের, অর্থাৎ যাঁরা এ চিন্তায় মৌলিকত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং অন্যদের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা হলেন রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ—নবজাগরণের তিন মহানায়ক, আর দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত ও মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। এঁদের মধ্যে বঙ্কিম ও রামমোহন অল্পবিস্তর স্বীকৃতি পেয়েছেন, বিবেকানন্দ কোন স্বীকৃতি পাননি, স্বীকৃতি পেয়েছেন নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত ও রাণাডে।

উনিশ শতকের অর্থনীতি বিষয়ে ভারতীয় চিন্তাবিদ্দের সকলেরই চিন্তা তদানীন্তন কালের ভারতের মুখ্য সমস্যাদির মধ্যে কেন্দ্রীভূত। অধিকাংশই কৃষি-অর্থনীতি বা কৃষকদের সমস্যা নিয়েই কেবল আলোচনা করেছেন। রামমোহন তৎকালীন কৃষি-অর্থনীতির সমস্যার মধ্যেই দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রাণাডে কিছু কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। দাদাভাই নওরোজী ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপের প্রথম চেষ্টা করে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন। এছাড়া তিনি ভারতে ব্রিটিশ শোষণের বার্ষিক অর্থমূল্যও পরিমাপ করবার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'Drain Theory'-র মাধ্যমে। কিন্তু এছাড়া তিনি আর কোন তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে যাননি। রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যেসকল ত্রুটি লক্ষ্য করেছিলেন, তা অনেক পরবর্তী লেখক রমেশচন্দ্রের নিকট ধরা পড়েনি। রামমোহনের পক্ষে সেকালে বিলাসদ্রব্যের উপর কর ধার্যের প্রস্তাব সত্যই অগ্রগামী চিন্তার পরিচায়ক। রমেশচন্দ্রের মুখ্য অবদান ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাস রচনার ভিত্তি স্থাপন। রাণাডে অর্থনীতি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেও ভারতের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাঁর পরিচয় গভীর ছিল না, সেজন্য জনসংখ্যাবহুলতা ও বিপুল বেকারত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি পাশ্চাত্যের মতো ভারতে বড় বহরের জোতে চাষ করবার কথা বলেছেন।

উল্লিখিত চিন্তাবিদ্গণ ও স্বামী বিবেকানন্দঃ

উনিশ শতকের শেষ পাদে বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তাঁর চিন্তার দুটি বৈশিষ্ট্য

(ঘ) History of Political Thought from Rammohun to Dayananda—B. B. Mazumdar (1934)

(ঙ) Modern Indian Political Thought—V. P. Varma (1974)

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম, তিনি ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার মূলদেশ অবধি যেভাবে পৌঁছেছিলেন, তা অপর কেউই পারেননি। ভারতের দারিদ্রের মূলে যে ব্রিটিশ শোষণ ও ভারতের অভিজাত শ্রেণীর শোষণ—এইটি বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার মূল কেন্দ্র। আজও এই সমস্যাই ভারতের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্দের যথা অমর্ত্য সেন, দণ্ডেকার ও রথ, প্রণব বর্ধন প্রভৃতির মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিশ্ব অর্থনীতির মূল সমস্যা যে ধনতান্ত্রিক শোষণ তা-ও বিবেকানন্দ সুস্পষ্ট লক্ষ্য করেছেন। অর্থাৎ তিনি শুধু ভারতের নয়, পাশ্চাত্য তথা সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। সেজন্য তাঁর চিন্তার যে গভীরতা ও প্রসারতা দেখি তা অন্যদের মধ্যে অনুপস্থিত। সর্বোপরি অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তার যে বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়ে তা এ ক্ষেত্রেও লক্ষিত হয়। সেটি হল এই যে, তিনি দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে গিয়েছেন, আগামীকালের চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে এবং রূপ পেয়েছে তাঁর ভাষণে ও রচনায়। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর অবদানের মূল্য সবচেয়ে বেশী এবং তিনি অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন।

একথাও স্মরণযোগ্য যে, তখনকার অনেক অর্থনীতিবিদ্ যে রাজনৈতিক সচেতনতায় জাগ্রত হয়ে কালোপযোগী অর্থনৈতিক নীতিসকল প্রণয়ন করেছিলেন, সেই সচেতনতা আনয়নে বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী—যেকথা আজ ঐতিহাসিকেরা কম-বেশী স্বীকার করেন। কিন্তু কেবল রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিতেই নয়, কালোপযোগী অর্থনৈতিক নীতি রূপায়ণেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। আজ আরও ব্যাপক গবেষণা ব্যতীত একথা জানা সম্ভব নয় যে, বিবেকানন্দের সমসাময়িক চিন্তাবিদ্গণ অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে যে হয়েছিলেন তা মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। এঁরা চিন্তার বিস্তার করেছিলেন, বিবেকানন্দ সে চিন্তার বীজ ছড়িয়েছিলেন। যাই হোক, ব্যাপক গবেষণা ব্যতীত আমাদের জোর করে কিছুই বলা সাজে না। তবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, চিন্তার যে-শিখরে তাঁর অগ্রগামী চিন্তানায়কেরা পৌঁছেছিলেন, যেখানে তাঁর সমসাময়িক চিন্তাবিদেরা এগিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি সে সকলকেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

উপরোক্ত কথাগুলি অতিশয়োক্তি বলে মনে হতেই পারে, কারণ বিবেকানন্দকে আমরা ধর্মাচার্য বলেই জানি এবং মুখ্যত তিনি তা-ই। তাঁর যে অর্থনৈতিক চিন্তা থাকতে পারে এ আমাদের নিকট একেবারে অকল্পনীয়। কিন্তু তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল কালকে এগিয়ে নেবার জন্য, সেজন্য পৃথিবীর কোনও সমস্যা—এমনকি অর্থনৈতিক সমস্যাও তাঁর চিন্তা-পরিধির বহির্ভূত থাকতে পারেনি। তাছাড়া আক্ষরিক অর্থে তিনি সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, আমরা একটু পরেই দেখব যে অর্থনীতিতেও তাঁর রীতিমতো অধিকার ছিল। সর্বোপরি ইতিহাসে তাঁর জ্ঞান ছিল অসামান্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে তাঁর পূর্ণ দখল ছিল। উপরন্তু, বাস্তব জীবন থেকে তিনি অর্থনীতির পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ভারত ও বিশ্ব পরিক্রমাকালে। সেজন্য তিনি সেকালের ভারতের অন্যান্য চিন্তাবিদ্দের অতিক্রম করে আরও বহুদূর অগ্রসর হয়ে যেতে

পেরেছিলেন, অবশ্য তাত্ত্বিক আলোচনার খুঁটিনাটি ব্যাপারে নয়, তিনি তা নিয়ে ব্যাপৃত হননি।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমাদের আজকের ধারণা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। তাঁর চিন্তার গভীরে প্রবেশ করেছেন এরকম লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। সেজন্য অর্থনীতিতে তাঁর কতখানি অধিকার ছিল সে-বিষয়ে আমাদের কোনও ধারণাই নেই। এইজন্য অর্থনৈতিক চিন্তার আলোচনায় তাঁকে যে বিবেচনা করবার প্রয়োজন আছে একথা আমরা ভাবতেই পারি না। সেজন্য ডক্টর ভবতোষ দত্তের মতো মহাপণ্ডিত ব্যক্তিরও এ বিভ্রান্তি ঘটেছে যে, রামমোহনের পর নবজাগরণের অপর কোন চিন্তানায়ক অর্থনীতি বিষয়ে কোন চিন্তা রাখেননি; তাঁদের চিন্তা সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস চর্চাতেই সীমাবদ্ধ।

বিবেকানন্দের অর্থনীতি-শাস্ত্রে জ্ঞান ঃ

বিবেকানন্দের জীবনী থেকে জানা যায় যে, তিনি মিল, বেন্থাম প্রভৃতি পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্‌দের লিখিত গ্রন্থাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করেছিলেন। তাঁর মতো পাঠক যে Adam Smith ও Mill প্রভৃতির অর্থনীতি বিষয়ক রচনাদিও পাঠ করেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর জীবনীকারেরা এ-বিষয়ে খুব একটা আলোকপাত করতে পারেননি। কিন্তু এ-বিষয়ে আমরা তথ্যাদি পাই অন্যত্র।

অর্থশাস্ত্রে তাঁর তাত্ত্বিক জ্ঞান কতখানি সুগভীর ছিল তা পাশ্চাত্যদেশীয় এরিক হ্যামণ্ড (Eric Hammond)-এর স্মৃতিচারণায় আমরা পাই। বিবেকানন্দের অনন্য ভাষণ প্রথম শোনার সময় তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে-বিষয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি লিখছেন ঃ '...Swamiji soon showed that he was equally versed in history and political economy. He stood among these people on their own ground.'[১২৯]

অর্থশাস্ত্রে বিবেকানন্দের তাত্ত্বিক জ্ঞান কত গভীর ছিল তার অপর একটি প্রমাণ আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন সংস্থা American Social Science Association-এর বার্ষিক সম্মেলনে ধর্মমহাসভায় খ্যাতি অর্জনের পূর্বেই তাঁর প্রদত্ত ভাষণটি। ধর্মমহাসভার অধিবেশন শুরু হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর, আর এটি দেওয়া হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে এবং এর বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার'। সেদিন আলোচনার মূল বিষয় ছিল 'অর্থের মান হিসাবে দ্বিধাতু (Bimetallism)'। এ-বিষয়ে মারি লুইস বার্ক যে সকল তথ্য আমাদের দিয়েছেন[১৩০] তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, সেদিনের মুখ্য বক্তা Col. Jacob. L. Greene 'দ্বিধাতুতত্ত্ব' বিষয়ে (Bimetallism), Dr C. B. Spahr 'রৌপ্যের মর্যাদা'

১২৯। Reminiscences of Swami Vivekananda, p. 298

১৩০। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Part One, Third Edition (1983), pp. 56-7

(The Status of Silver) বিষয়ে, E. Benjamin Andrews 'ভারতে অর্থের মান সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা' বিষয়ে (The Monetary experiment in India) গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন।*

দেখা যাচ্ছে সেদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল অর্থনীতির একটি দুরূহতম বিষয়—অর্থবিষয়ক তত্ত্ব (Monetary Economics)। আর সেই বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ মহলে ভাষণ দিয়ে সেদিন সংবাদপত্র-সমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন বিবেকানন্দ। 'Money was the Subject' শিরোনামায় Daily Saratogian নামক দৈনিক পত্রিকা মন্তব্য করেন ঃ 'At the conclusion of the reading (of papers) Vive Kananda, the Hindoo monk addressed the audience in an intelligent and interesting manner, taking for his subject the use of silver in India.'[১৩১] একথা নিশ্চিত যে, অর্থতত্ত্বে রীতিমতো দখল না থাকলে বিবেকানন্দ উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সম্মুখে ঐ বিষয়ে আলোচনা করতে কখনই পারতেন না। তিনি যে শুধু তাঁদের সামনে বলেছেন তা নয়, বলে সংবাদপত্রের প্রশংসা অর্জন করেছেন। অর্থশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান কত গভীর ছিল এখানে নিঃসংশয়ে তা প্রমাণিত।

বাস্তব জীবন থেকে অর্থনৈতিক পাঠ গ্রহণ ঃ

বিবেকানন্দ তাঁর অর্থনীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান কেবলমাত্র গ্রন্থ থেকে আহরণ করেননি, বাস্তব জীবন থেকেও তিনি এ-বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। ভারত তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তিনি জনজীবনের বাস্তব অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন জনজীবনের গভীরে প্রবেশ করে। তাঁর ভারত পরিক্রমা সম্পর্কে বলতে গিয়ে রোমাঁ রোলাঁ এ-বিষয়ে মন্তব্য করে লিখেছেন ঃ 'তাঁহার জীবনে আর এমন একটি মুহূর্তও রহিল না, যখন তিনি গ্রামে ও নগরে, কি ধনী, কি দরিদ্র জীবিত নরনারীর দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অন্যায়-অবিচার, উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য হইতে দূরে থাকিতে পারিলেন। ...জীবনের মহাগ্রন্থ তাঁহার সম্মুখে বর্তমানের বেদনাক্লিষ্ট সকরুণ মুখখানি উন্মোচিত করিয়া ধরিল। ...বিদ্বজ্জনের বিদ্যার সহিত

---

*তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Bimetallism নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। স্বর্ণের সঙ্গে রৌপ্যও মুদ্রার ভিত্তি হিসাবে চলতে পারে কিনা—এ নিয়ে অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক চলছিল। ভারতবর্ষেও এর পরীক্ষা চলছিল। এ-সম্পর্কে Gather and Beri-র Indian Economics (1957) p. 279-এ বলা হয়েছে ঃ 'From 1874 there was persistent public agitation for a gold standard and a gold currency. The Government of India was, however, hoping that the attempts which were being made on an international scale in favour of international bimetallism would be crowned with success.' ১৮৯৩-এ American Social Science Association-এ আলোচিত প্রত্যেকটি লিখিত ভাষণের শিরোনামা দেখলে বোঝা যায় যে মূল বিতর্ক হয়েছিল Bimetallism চলতে পারে কিনা, এবং স্বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে রৌপ্যের ব্যবহার কতদূর চলতে পারে।—লেখিকা

১৩১। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Part One, p. 58

যেমন ছিল তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, জনসাধারণের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে যে গ্রাম্য ও নাগরিক অর্থনীতি, তাহার সম্পর্কেও তাঁহার ছিল তেমনি পরিপূর্ণ চেতনা।[১৩২] এ-বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতাও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। উত্তর ভারতে স্বামীজীর সঙ্গে পরিভ্রমণকালে যখন লক্ষ্ণৌতে উপনীত হয়েছেন তখন স্বামীজী তাঁদের লক্ষ্ণৌ শহরের শিল্প ও বিলাস দ্রব্য উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দেন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলের গ্রাম্য কৃষিব্যবস্থার পর্যালোচনা করেন। নিবেদিতা বলছেন ঃ ' লক্ষ্ণৌ শহরে প্রস্তুত শিল্প ও বিলাস দ্রব্যগুলির নাম ও গুণ বর্ণনা অনেকক্ষণ ধরে চলল। ...আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত ক্ষেত-খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করবার সময় তাঁর প্রেম যেমন উথলে উঠত...এমন আর বোধহয় কোথাও হয়নি। এখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে অখণ্ডভাবে চিন্তা করতে পারতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বোঝাবার চেষ্টা করতেন, কিভাবে ভাগে জমি চাষ করা হয় ; অথবা প্রত্যেক খুঁটিনাটিসহ কৃষক-গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবন বর্ণনা করতেন...। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এইসব কথা আমাদের কাছে বর্ণনা করার সময়ে তাঁর চোখ যে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, অথবা গলা যে আবেগভরে কাঁপত, তা নিশ্চয়ই তাঁর পরিব্রাজক জীবনের স্মৃতিবশত।[১৩৩] তাঁর বর্ণনা শুনে নিবেদিতার মনে হয়েছে যে, তিনি তাঁর পরিব্রাজক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সমূহই বর্ণনা করছেন।

বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমাকালে ভারতের আর্থিক অবস্থা ঃ

বিবেকানন্দ যেসময় ভারত পরিক্রমা করেছিলেন, তখন ছিল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক মহাসঙ্কটকাল। ইংরেজ শাসকেরা ভূমিস্বত্ব ও খাজনা সংক্রান্ত যে নীতি অনুসরণ করছিল প্রধানত তারই ফলে ভারতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (বাংলা ১১৭৬, ইংরেজি ১৭৭০) পর থেকে ইংরেজি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি শতাধিক বর্ষব্যাপী একটানা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ইতিহাস-গ্রন্থে[১৩৪] বর্ণিত হয়েছে। একালে প্রায় প্রতি বৎসর বিশাল ভারতভূমির কোন না কোন অঞ্চল, অধিকাংশ সময় বিস্তীর্ণ অঞ্চল, দুর্ভিক্ষ-কবলিত হয়েছে। যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, লক্ষ লক্ষ কৃষক ভূমিহীন মজুর অথবা ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। বিবেকানন্দের ভারত-ভ্রমণকাল ১৮৮৮-৯৩। এসময়ে যেসকল দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৮৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ এবং ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দের আজমীড়-মাড়ওয়ারের ও মাদ্রাজের মধ্যাঞ্চলের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যাতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্গতির অন্ত ছিল না। গুরুভার খাজনা, শিল্পগুলির অবক্ষয়ের ফলে জমির উপর জনচাপ বৃদ্ধি, সেচ-ব্যবস্থার

১৩২। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, পৃঃ ১৯-২০

১৩৩। The Master as I saw him, p. 73

১৩৪। The Economic History of India, Vol. I—Romesh Dutt, The Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Delhi, 1960 ; The Economic History of India, Vol. II, 1963

অভাব, মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচার লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছিল এবং যারা মৃত্যুর কবলে পড়েনি তারা রোগজীর্ণ অনাহারে শীর্ণ নিঃসম্বল ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছিল। সারা ভারতে এদের সংখ্যা ছিল বেশ কয়েক কোটি।

দেখা যায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস থেকে এপ্রিল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিবেকানন্দ আজমীড়-মাড়ওয়ারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করতে করতে অবশেষে গুজরাটে এসে উপনীত হন, এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি বেলগাঁওয়ে পৌঁছান।[১৩৫] এই দীর্ঘ ভ্রমণপথে বলা যায় যে তিনি জনজীবনের গভীরে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। করাল দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট, দারিদ্রের শেষসীমায় উপনীত লক্ষ লক্ষ উপায়হীন নরনারীর অশেষ দুর্গতি প্রত্যক্ষ করতে করতে, তাদের অনাহারের ভাগ্যে অংশ গ্রহণ করতে করতে তিনি এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তিনি মাদ্রাজে এসে পৌঁছালেন,[১৩৬] তখন সেখানেও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে করাল দুর্ভিক্ষের ছায়া বিরাজ করছিল। এই অবর্ণনীয় দুঃখ-দারিদ্র ও অবিচার তাঁর হৃদয়কে অগ্নিময় করে তুলেছিল। রোমাঁ রোলাঁ লিখছেনঃ 'এই সময়ে, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতময় তিনি যে দুঃখ-দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমগ্র মন ব্যাপ্ত করিয়া রহিল, সেখানে আর কোন চিন্তার বিন্দুমাত্র স্থান রহিল না। ভারতের উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত ইহা তাঁহার অনুসরণ করিল, যেমন করিয়া ব্যাঘ্র তাহার শিকারের অনুসরণ করে। নিদ্রাহীন রজনীতে ইহা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিল। কুমারিকা অন্তরীপে ইহা তাঁহাকে প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিল। ...দীর্ঘ দুই বৎসর কাল তিনি যেন উত্তপ্ত কটাহের মধ্যে বাস করিতেছিলেন, উত্তাপে দগ্ধ হইতেছিলেন, "জ্বলন্ত আত্মাকে" বহন করিতেছিলেন।'[১৩৭]

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে বিবেকানন্দ বোম্বাই শহরে আসেন।[১৩৮] ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকাল ভারতে বস্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণের কাল। কিন্তু তখন এখানকার শ্রমিকদের অবস্থা অবর্ণনীয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রমিক আইন (Factory Act) পাস হয়, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শ্রমিক আইন। কিন্তু শ্রমিকদের তা সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন শিল্প-শ্রমিকদের দ্বারা কর্মবিরতি ঘটতে থাকে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রমিকসংস্থা 'Bombay Millhands' Association' গঠিত হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লোখাণ্ডে (Lokhande) প্রকাশ করেন 'দীনবন্ধু' নামে শ্রমিকদের নিজস্ব সংবাদপত্র।[১৩৯] বিবেকানন্দের মতো তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি এসকল ঘটনাকে উপেক্ষা করতে পারেনি। পরবর্তীকালে এক কথোপকথনকালে

১৩৫। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩২৪-৬৭

১৩৬। তদেব, পৃঃ ৩৭৮-৮০ ১৩৭। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, পৃঃ ২৪-৫

১৩৮। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ—প্রমথ নাথ বসু, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬২), পৃঃ ২৮৪

১৩৯। A Concise History of the Indian Economy—Dhires Bhattacharyya, Progressive Publishers, Calcutta, 1972 and Economic History of India : 1857-1956—Edited by V. B. Singh, Allied Publishers Private Limited, New Delhi, 1975

তিনি এই সময়ের শ্রমিক ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৪০] মারি লুইস বার্ক লিখেছেন ঃ আমেরিকার মধ্যাঞ্চল পরিভ্রমণের সময় তিনি শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের অবস্থা জানতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এ প্রচেষ্টা নিশ্চিতই তিনি নিজের দেশেও করেছিলেন।[১৪১]

দেখা যাচ্ছে, জীবনের মহাগ্রন্থ থেকে বিবেকানন্দ অর্থনীতির যে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, তা গ্রহণ করবার সুযোগ ছিল না সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের বা উচ্চশ্রেণীর সমাজসেবী, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক কর্মী দাদাভাই নওরোজীর, উচ্চবর্ণের উচ্চপদস্থ রাণাডের বা যোশীর বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের। রমেশ দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চাকরি সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেটুকু জনজীবনের সংস্পর্শে এসেছিলেন তা ভ্রাম্যমান পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতার তুলনায় নেহাতই নগণ্য। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের বাস্তব জ্ঞানের তুলনায় তাঁদের জ্ঞান নেহাতই সীমাবদ্ধ।

বিবেকানন্দের দেশীয় রাজ্যসমূহে ভ্রমণ ও কৃষি-শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রচেষ্টা ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিবেকানন্দের হৃদয় জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখ-দারিদ্রের সংস্পর্শে এসে অগ্নিময় হয়ে উঠেছিল। রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন ঃ 'তিনি দুঃস্থ মানবের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন। ...অক্টোবরের (১৮৯২) শেষে তিনি বাঙ্গালোরের মহারাজার নিকট সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, ভারতের অর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য তিনি পাশ্চাত্য দেশগুলিকে অনুরোধ করিবেন এবং উহার বিনিময়ে তিনি ভারতের বেদান্তের বাণী পশ্চিম দেশগুলিতে পৌঁছাইয়া দিবেন।[১৪২] তিনি দেশীয় রাজাদের এ-বিষয়ে অবহিত করে উন্নয়নমূলক কাজে প্রেরণা দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর জনৈক জীবনীকার এ-বিষয়ে আলোকপাত করে লিখেছেন ঃ 'জুনাগড়ের দেওয়ানের ন্যায়, এই (ভুজের) দেওয়ানের সহিতও স্বামীজী রাজ্যের কৃষি, শিল্প ও আর্থিক সমস্যা সকলের এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বহু সুদীর্ঘ আলোচনা করেন।'[১৪৩] সংবাদটি এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এবং সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার ব্যাপারটির উপর প্রভূত আলোকপাত করছে। দীর্ঘ পথ পদব্রজে ভ্রমণকালে জনজীবনের অর্থনৈতিক সমস্যাদি সম্বন্ধে তিনি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যথা হস্তশিল্পের অবক্ষয়, ভূমির উপর জনচাপ বৃদ্ধি, ভূমিস্বত্ব ও রাজস্বক্ষেত্রে ইংরেজদের শোষণমূলক নীতি ও তার পরিণাম প্রভৃতি, তারই ভিত্তিতে ভারতের আর্থিক উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি নিজস্ব

১৪০। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১০৮

১৪১। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Part One, p. 197

১৪২। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, পৃঃ ২৪-৫

১৪৩। স্বামী বিবেকানন্দ—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ২৫৩

পরিকল্পনা গড়ে তুলেছিলেন। সেটি তিনি দেশীয় রাজাদের বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন।

অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশীয় রাজাগণ বা অভিজাত শ্রেণী জনসাধারণের আর্থিক উন্নয়ন ব্যাপারে কিছু করতে আগ্রহী নন। এ-বিষয়ে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি ব্যক্ত করেছেন একটি চিঠিতে ঃ 'কোথায় ইতিহাসের কোন্ যুগে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত ও ধর্মধ্বজিগণ দীনদুঃখীর জন্য চিন্তা করিয়াছে?—তাহাদের ক্ষমতার জীবনীশক্তি ইহাদের নিষ্পেষণ হইতেই উদ্ভূত।'[১৪৪] চিঠিখানি তিনি লিখেছেন জনৈক দেশীয় রাজার দেওয়ানকে। দরিদ্র জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য অতঃপর তিনি যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার প্রয়াস করেন। এ-বিষয়ে অপর একটি চিঠিতে তিনি লিখলেন ঃ '...আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ...ইহারা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে, এবং যাহারা সর্বাপেক্ষা দীন হীন ও পদদলিত—তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত, ইহা আমি সাধন করিব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করিব।'[১৪৫] দেখা যাচ্ছে, এসময়ে ভারতের জনগণের আর্থিক তথা সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ও তপস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি সমস্যা সম্পর্কে তিনি যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা তিনি কোন গ্রন্থরচনার কাজে লাগাতে প্রবৃত্ত হননি। তিনি সৈনিক, সেজন্য কর্মপ্রয়াসেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছেন। তিনি গ্রন্থরচনা না করলেও তাঁর কর্মপ্রয়াস থেকেই আমরা তাঁর অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। অবশ্য তাঁর বিভিন্ন উক্তি থেকেও আমরা এ ধারণা পাই।

পাশ্চাত্যের জনজীবন থেকে বিবেকানন্দের অর্থনীতির পাঠ গ্রহণ ঃ

কিন্তু কেবলমাত্র ভারতেই নয়, পাশ্চাত্যেও বিবেকানন্দ জনজীবন থেকে বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এ-সম্পর্কে মারি লুইস বার্ক যে আলোকপাত করেছেন প্রসঙ্গক্রমে তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মারি লুইস বার্ক বলছেন ঃ 'As was said of him, he acquired "the greatest familiarity with the institutions of this country, religious, political and social". Nor was this familiarity acquired through contact with intellectuals alone ; rather, as he said, he spoke during the course of his midwestern tour also with labourers and farmers ; his finger was, as it were, on the pulse of the nation.'[১৪৬] এটিই তাঁর সম্পর্কে বড় কথা—যেখানেই তিনি গেছেন, তাঁর অঙ্গুলি স্থাপন করেছেন জাতীয় জীবনের নাড়ীতে, অর্থাৎ প্রবেশ করেছেন জনজীবনের গভীরে,

---

১৪৪। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৫ ১৪৫। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪
১৪৬। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Part Two, p. 368

সেখানে হাত দিয়ে অনুভব করেছেন সেই নাড়ী-স্পন্দন। ফলে বাস্তব জনজীবন থেকে অর্থনৈতিক সমস্যাদি সম্বন্ধেও জ্ঞান অর্জন করেছেন।

বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার ব্যাপকতা ঃ

সেজন্যই দেখা যায়, উনিশ শতকের অন্যান্য ভারতীয় মনীষীদের তুলনায় বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার ব্যাপকতা অনেক বেশী, গভীরতাও অনেক বেশী। তিনি শুধু ভারতের আর্থিক সমস্যা সমাধানের কথা ভাবেননি, ভেবেছেন পাশ্চাত্যের তথা সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কথা। যেমন আমরা কিছু পরেই দেখব আর্থিক উন্নয়ন সম্পর্কে অনেক আগামীকালের চিন্তার প্রতিফলন তাঁর মধ্যে ঘটেছে। বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে তাঁর নিবিড় ও ব্যাপক পরিচয় থাকায় তাঁর চিন্তায় একটি অনন্য স্বকীয়তা বা মৌলিকত্ব দেখতে পাওয়া যায় যা আজকের দিনের ভারতেও বিরল। বিদেশী চিন্তার চর্বিতচর্বণই আমাদের অধিকাংশের অর্থনীতিচর্চার মূল বৈশিষ্ট্য ও গৌরব। অনেকেই বিচার না করেই সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতিতে যা উপযোগী তা ভারতের জন্য সুপারিশ করেছেন, এমনকি রাণাডেও তা করছেন আমরা উপরে দেখেছি। কিন্তু বিবেকানন্দ তা করেননি, বাস্তব সমস্যার রূপ অনুযায়ী তিনি সমাধান দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, যেকথা এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে—তাঁর চিন্তা কালের সীমা অতিক্রম করে ভাবীকালকে সমৃদ্ধ করেছে। সেদিক থেকে উনিশ শতকের অন্যান্য চিন্তাবিদ্‌দের তুলনায় তাঁর চিন্তা অনেক সুগঠিত, সুপরিণত ও আধুনিক কালোপযোগী। তবে তিনি যা বলেছেন তা অতি সংক্ষেপে, সূত্রাকারে বলেছেন, তাঁর স্বল্পকালের জীবনে প্রধানত গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর পক্ষে বিস্তার করে বলবার বা তা নিয়ে গ্রন্থাদি রচনার সময় বা সুযোগ ছিল না। তিনি শুধু তত্ত্বপ্রণেতা বা তত্ত্বব্যাখ্যাতা নন, তিনি ভাবীকালের রূপকার। সেজন্য অতি সংক্ষেপে তিনি যা বলেছেন তা ভাষ্যকারের অপেক্ষা রাখে। এও একটা কারণ, যার জন্য তাঁর চিন্তা ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে; ইতস্তত ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তার মতো সেই চিন্তাগুলি একত্রে গ্রথিত করে নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

শ্রম ও শ্রমজীবী ঃ বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার মূলকেন্দ্র ঃ

বাস্তব জীবন হতে অর্থনীতির পাঠ গ্রহণ করায় আজকের যুগে যে সমস্যাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত, সেটিই বিবেকানন্দের চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে, সকল সময় তাঁর চেতনায় জাগ্রত থেকেছে—সেটি হল ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর বা শূদ্রশ্রেণীর সমস্যা। বিবেকানন্দ শ্রমকে উৎপাদনের মুখ্য উপাদান বলে মনে করতেন এবং শ্রমজীবীদের সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী বলে মনে করতেন। শ্রমিকদের কোন সমস্যাই বোধহয় তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। যেমন, বড়বহরের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে শ্রমবিভাগ ঘটে, তার ফলে শ্রমিকদের জীবনে যে সমস্যা দেখা দেয়, সে-সম্বন্ধে তিনি

এক জায়গায় বলছেন ঃ ' মেলা কলকব্জা মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপাপত্তি করে জড়পিণ্ড তৈয়ার করে। কারখানায় লোকগুলো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, সেই একঘেয়ে কাজই কচ্চে—এক এক দলে এক একটা জিনিসের এক এক টুকরোই গড়ছে। পিনের মাথাই গড়ছে, সুতোর জোড়াই দিচ্চে, তাঁতের সঙ্গে এগু-পেছুই কচ্চে—আজন্ম। ফল, ঐ কাজটিও খোয়ানো, আর তার মরণ—খেতেই পায় না। জড়ের মতো একঘেয়ে কাজ করতে করতে জড়বৎ হয়ে যায়।'[১৪৭] বিবেকানন্দ এখানে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার দুটি মূল ত্রুটি উদ্ঘাটিত করেছেন, দুটিই শ্রমিকের পক্ষে ক্ষতিকর। একটি হল, উৎপাদনের একটি অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশ সম্পন্ন করায় শ্রমিকের বর্তমান কাজটি চলে গেলে পরিণাম বেকারত্ব, কারণ সে শুধু ঐ ভগ্নাংশটুকু তৈরী করতেই সক্ষম, তার পক্ষে অন্য কাজ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়, এইরূপ একটি আংশিক কাজ যন্ত্রের মতো সম্পন্ন করতে হয় বলে শ্রমিকের সৃজনীশক্তি লোপ পায়, বুদ্ধি জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়। তার কুশলতা লোপ পায়, সে যান্ত্রিক হয়ে যায়।

উৎপাদন ব্যবস্থার মূলে যে অগণিত সাধারণ মানুষের অবদান রয়েছে সেই বিষয়টি সুন্দররূপে তুলে ধরে তিনি বলছেন ঃ 'এ জাহাজ করলে কে? কেউ করেনি; অর্থাৎ মানুষের প্রধান সহায়স্বরূপ যে-সকল...কলকারখানার সৃষ্টি, তাদের ন্যায়—সকলে মিলে করেছে। যেমন চাকা; চাকা নইলে কি কোন কাজ চলে? হ্যাকচ হোঁকচ গরুর গাড়ি থেকে "জয় জগন্নাথে"র রথ পর্যন্ত, সুতো-কাটা চরকা থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানার কল পর্যন্ত কিছু চলে? এ চাকা প্রথম করলে কে? কেউ করেনি, অর্থাৎ সকলে মিলে করেছে। প্রাথমিক মানুষ কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছে, বড় বড় গুঁড়ি ঢালু জায়গায় গড়িয়ে আনছে, ক্রমে তাকে কেটে নিরেট চাকা তৈরী হল ...। কত লাখ বৎসর লেগেছিল কে জানে?'[১৪৮]

স্বামীজীর বাস্তব দৃষ্টি ঃ

বিবেকানন্দের কোন বিষয়ের আলোচনাই নিছক তাত্ত্বিক পর্যায়ে আবদ্ধ থাকেনি, তার বাস্তব দিক বা সমস্যার দিকে তিনি সকল সময়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। সেজন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে ভারতীয় শ্রমিকদের অবদান ও তাদের সমস্যার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করেছেন। তিনি বলছেন ঃ 'ঐ যারা চাষাভুষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্চে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্চে না! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্চে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য ওলটপালট হয়ে যাচ্চে।'[১৪৯] শ্রমিকের অবদান যে অন্য সকল শ্রেণীর অবদানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ সেকথা উদ্ঘাটিত করে তিনি আরও বলেছেন ঃ 'হে ভারতের শ্রমজীবি!

১৪৭। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭৪
১৪৮। তদেব, পৃঃ ৬৯ ১৪৯। তদেব, পৃঃ ১০৬

তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকজেন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগ্‌দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি ?— কে ভাবে একথা! স্বামীজী! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে ?'[১৫০]

শ্রমিকের মজুরি ঃ

এখানে বিবেকানন্দের দৃষ্টি যে শুধু বাস্তবাশ্রয়ী তা নয়, ইতিহাসাশ্রয়ীও বটে। একদিকে যেমন তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন এ তত্ত্ব যে, শ্রমিকের মজুরি তার পরিশ্রমের ফলের সমান নয়, সমাজের অন্যান্য শ্রেণী—অনুৎপাদক শ্রেণী তাদের তা থেকে বঞ্চিত করেছে, অপরদিকে তুলে ধরেছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য যে, ভারতের শ্রমিকদের উৎপাদিত সম্পদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে। তাঁর মধ্যে বাস্তব পরিস্থিতির ও ইতিহাসের জ্ঞানের সমন্বয় ঘটায় তিনি শ্রমিক-শোষণের স্বরূপ যুগ যুগ ধরে যা চলেছে এদেশে ও অন্যত্র, যা আজও চলেছে—তা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এদিকে আরও আলোকপাত করে তিনি বলেছেন ঃ 'ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য, রাজস্ব—সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড় জাত।...একথা ইউরোপীয়েরা স্বীকার করতে চায় না; ভারত—নেটিভপূর্ণ, ভারত যে তাদের ধন, সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সেকথা মানতে চায় না, বুঝতেও চায় না।'[১৫১]

ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন ঃ

ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যে শ্রমিক-শোষণের উপরে এবং অধিকৃত দেশগুলির সমস্ত সম্পদ হরণ করে—বিবেকানন্দ তা সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। রামমোহন, বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, রাণাডে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন, কিন্তু সাধারণভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজগঠনের মূলভিত্তি সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতো তাঁদের স্পষ্ট ধারণা দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে মার্কসীয় চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

ভবিষ্যৎ সমাজে শ্রমিক-শোষণের অবসান ও শ্রমিকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ঃ

বিবেকানন্দ ধনতন্ত্রের স্বরূপ এভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি অভ্রান্ত দূরদৃষ্টি সহায়ে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত এ-সত্যও দেখতে পেয়েছিলেন যে,

১৫০। তদেব ১৫১। তদেব

অনতিবিলম্বে এই বঞ্চিত শ্রমিক বা তাঁর ভাষায় শূদ্রশ্রেণীর আধিপত্য ঘটবে। আগামী যুগ এদেরই যুগ, সমগ্র পৃথিবীতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটবে। এ-বিষয়ে তাঁর সুনিশ্চিত মত ব্যক্ত করে তিনি বলছেন ঃ 'কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্চে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য ওলটপালট হয়ে যাচ্চে।'[১৫২] ভারতেও এ পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই ঘটবে, এ ভবিষ্যৎ-বাণীও তিনি সেযুগে শুনিয়েছেন, বলেছেন ঃ '...তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ?...তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।'[১৫৩]

উনিশ শতকের ভারতের চেতনায় সমাজতন্ত্র ঃ

স্পষ্টতই এখানে বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা সমাজতন্ত্রবাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট উপলব্ধি লক্ষ্য করি যা উনিশ শতকের অন্যান্য চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে দেখি না। এখানেই তিনি ভারতের তদানীন্তন অর্থনীতিবিদ্‌দের অতিক্রম করে অগ্রগামী চিন্তা রেখেছেন। রামমোহনের চিন্তায় কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি আছে, কিন্তু কৃষক-শ্রমিকদের সমাজে আধিপত্যলাভ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট চেতনা দেখা যায় না। ব্রিটিশ শোষণ সম্পর্কে কিছুটা চেতনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের মঙ্গলের দিকটাই তিনি বড় করে দেখেছেন। আর অভিজাত শ্রেণীর শোষণ সম্পর্কে তাঁর কোন চেতনাই পরিলক্ষিত হয় না। বঙ্কিম অর্থনৈতিক সাম্যের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, Robert Owen, St. Simon প্রভৃতি ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রভাব তাঁর উপর সুস্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব সম্পর্কে বা সমাজতন্ত্রের আর্থিক বুনিয়াদ সম্পর্কে তাঁর চেতনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রমাণস্বরূপ বঙ্কিমের নিম্নলিখিত উক্তিটি দাখিল করা যেতে পারে। 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ তিনি বলছেন ঃ 'এ দেশীয় কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আর নাই। জমিদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। ...অনেক স্থলে এখন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, জমিদার দুর্বল।'[১৫৪] ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের 'প্রজাস্বত্ব আইনে' কৃষকদের একটি নগণ্য অংশকে সামান্য কিছু অধিকার দেওয়া হয়। তারপর বহু আইন পাস করতে হয়েছে এ-পর্যন্ত এ-বিষয়ে। একথা মনে রাখা দরকার স্বল্পসংখ্যক অনুৎপাদক শ্রেণী কর্তৃক বহু সংখ্যক উৎপাদক শ্রেণীর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চনার সুযোগ যে ব্যবস্থায় নিহিত, তাতে সামান্য সংশোধনে মূল ত্রুটি দূর হয় না। বঙ্কিমের ধারণায় এ সত্য প্রতিভাত নয়। তাঁর মধ্যে শ্রমিক বা শূদ্র শ্রেণীর সমাজে প্রাধান্যলাভ সম্পর্কেও কোন সুস্পষ্ট ধারণা দেখা যায় না।

১৫২। তদেব ১৫৩। তদেব, পৃঃ ৮১-২

১৫৪। বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৯০, পৃঃ ২৮৭

দাদাভাই নওরোজী ও রমেশ দত্তের মধ্যেও আমরা এ-বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা দেখতে পাই না। রমেশচন্দ্র দত্তের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে উচ্চ ধারণা থেকে বোঝা যায়, তাঁর দৃষ্টি কত সীমিত ছিল। বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ত্রুটি তাঁর কাছে ধরা পড়েনি, ধরা পড়েনি আগামী দিনের প্রবণতা। দাদাভাই ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, কিন্তু অভিজাত ও বুদ্ধিজীবীদের প্রভুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না।

এ-বিষয়ে রাণাডের চিন্তা আরও অপরিণত। ডক্টর ভবতোষ দত্তের সিদ্ধান্ত: তিনি ভারত-ইংলণ্ড সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, অথচ ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকারের ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা আদৌ ভাবেননি।[১৫৫] দেখা যায় যে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার 'প্রজাস্বত্ব আইনে'র তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন, তাঁর মতে এটি একটি কমিউনিস্ট প্রস্তাব। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকেরা কমিউনিজমের অনুকূল আইন পাস করতে পারে, তাঁর এ ধারণা সত্যই হাস্যকর। এই আইনে বারো বৎসর যাঁরা একাদিক্রমে একই জমি চাষ করেছেন, তাঁদের তাতে দখলীস্বত্ব দেবার কথা বলা হয়েছে। রাণাডের মত: চাষীদের যদি দখলীস্বত্ব পেতে হয়, তাহলে তাদের ন্যায্য মূল্যে পাওয়া উচিত। দীন দরিদ্র চাষীদের ক্রয়ক্ষমতা কোথা থেকে আসবে সেকথা রাণাডে চিন্তা করে দেখেননি। এ ক্রয়ক্ষমতা যদি তাদের থাকত তাহলে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের মুখ্য সমস্যা—দারিদ্র থাকতই না। রাণাডের ভারতের বাস্তব আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে ধারণার অভাবই এখানে লক্ষিত হয়।

তুলনায় বিবেকানন্দের চেতনা কত স্পষ্ট। তাঁর ধারণা কত পরিণত, তাঁর মন এ-বিষয়ে কত জাগ্রত, তা নিবেদিতার ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। নিবেদিতা লিখছেন: আগামী যুগ শূদ্র বা শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের যুগ—এই ছিল তাঁর অভিমত। প্রথমবার পাশ্চাত্যদেশে গিয়ে তিনি আপাতদৃষ্টিতে তার আর্থিক উন্নতি ও বাহ্য গণতন্ত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ধনিকদের লালসা, অর্থগৃধ্নুতা, তাদের স্বার্থ, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল সঙ্ঘবদ্ধতা ও হিংস্র যুদ্ধলিপ্সা দেখে বলেছিলেন—পশ্চিমের জীবনযাত্রা এখন তাঁর কাছে নরকতুল্য বোধ হয়।[১৫৬] এ-বিষয়ে রোমাঁ রোলাঁর মন্তব্যও প্রভূত আলোকপ্রদ। তিনি বলছেন: 'পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের অবগুণ্ঠন মোচন করিবার ফলে যে হিংস্র মুখমণ্ডল প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল। তিনি সাম্রাজ্যবাদের চোখে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের চোখে হিংস্র লুব্ধ ঘৃণা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।'[১৫৭] সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপই শুধু নয়, তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সমাজের ভবিষ্যৎ রূপটিও। নিবেদিতা এ-বিষয়ে আলোকপাত করে লিখছেন: তিনি একদিন বলেছিলেন, 'শূদ্রদের সমস্যার সমাধান হবে, কি প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্য দিয়ে, কি তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে'। যেন তিনি

১৫৫। The Evolution of Economic Thinking in India, p. 16

১৫৬। The Master as I saw him, p. 249

১৫৭। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, পৃঃ ১৪৩

ভবিষ্যতের গভীরে সোজা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পাচ্ছিলেন কি রয়েছে সেখানে লুকিয়ে, তাঁর কণ্ঠস্বরে ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যঞ্জনাই সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল।[১৫৮]

বিবেকানন্দ অভিজাত, উচ্চবর্ণ সম্বন্ধে অতি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছেন—এ আমরা পূর্বেই দেখেছি। তাদের তিনি এমনকি 'চলমান শ্মশান', 'ভূত কাল' বলে অভিহিত করেছেন।[১৫৯] তিনি স্পষ্টই দেখেছিলেন উচ্চবর্ণের দিন নিঃশেষ। এ-প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনি বলেছেন ঃ 'জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একইভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐ রকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐকথা বুঝতে পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট হচ্ছে,[১৬০] ওতেই ঐকথা বোঝা যাচ্ছে। ...এখন ইতরজাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতদের কল্যাণ। ...তা না হলে কিন্তু তোদের (উচ্চবর্ণের) কল্যাণ নেই। ...এই mass (জনসাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাদের উপর তোদের (উচ্চবর্ণের) অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর civilization (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে।'[১৬১] এখানে কোনও অস্পষ্টতা নেই, বিবেকানন্দই সুস্পষ্ট ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ, উচ্চবর্ণের আধিপত্যের অবসান ও শোষিত শ্রেণীর সমাজে আধিপত্য লাভ—এসকল বিষয়ে অনেক পরবর্তীকালের সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে প্রতিফলিত করেছেন।

বিবেকানন্দ ও মার্কস ঃ

এখানে এ-প্রশ্ন উঠতে পারে বিবেকানন্দ কি কার্ল মার্কসের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন? বিবেকানন্দের রচনাবলীতে বার বার হেগেল, কান্ট, স্পেন্সার-এর নাম আমরা পাচ্ছি, পাচ্ছি অন্যান্য অনেকের নাম। মার্কস-এর নাম কোথাও ঘুণাক্ষরেও উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু বিবেকানন্দ যে মার্কসের চিন্তাধারা সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন তা মনে হয় না, কারণ Prince Kropotkin-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তাছাড়া তাঁর ভাষণে 'communistic' চিন্তাধারার যাঁরা অনুগামী তাঁদের উল্লেখ আছে। তবু তিনি কোথাও মার্কসের নামোল্লেখ করেননি দেখে মনে হয় বিবেকানন্দ তাঁর দ্বারা

১৫৮। The Master as I saw him, p. 249 ১৫৯। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮১

১৬০। ভারতে প্রথম শ্রমিক সংস্থা 'Bombay Millhands Association' গঠিত হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। বোম্বাই সূতাকলে প্রথম ধর্মঘট হয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এবং বজবজ পাটকলে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। দ্রষ্টব্য ঃ A Concise Economic History of India, p. 187

১৬১। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১০৮-০৯

বিশেষ প্রভাবিত হননি। বিবেকানন্দ যেসকল কথা বলেছেন সেগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, সেগুলি নিজস্ব অনুশীলন হতে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত। ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তসমূহে পৌঁছেছেন এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দের চিন্তার গভীরে যাঁরা প্রবেশ করেছেন তাঁরা তা জানেন। তাছাড়া মার্কসীয় চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর চিন্তার মূল দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে, যদিও কিছু কিছু সাদৃশ্যও দেখা যায়। সাদৃশ্যের কারণ, বাস্তব সত্য যা তা তো একটাই। বিবেকানন্দ ও মার্কস দুজনে সম্পূর্ণ পৃথক ধারায় চিন্তা করতে করতে একই সত্যে উপনীত হয়েছেন। বিবেকানন্দের চিন্তার ধারা অনুসরণ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে, বাস্তব আর্থিক অবস্থা ও ইতিহাস বিশ্লেষণ সহায়ে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ লাভ করেছিলেন।

প্রথম দর্শনে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে ধারণা ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিবেকানন্দ শুধু ভারতে নয়, পাশ্চাত্যেও বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অর্থনীতির পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি আমেরিকায় প্রথম উপনীত হয়েছেন, তখন সেখানে শিল্পবিপ্লব পূর্ণ গতিবেগ প্রাপ্ত হয়েছে। সেজন্য সেখানে উপনীত হয়ে তিনি শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত নগরজীবনে প্রতিষ্ঠিত এক ধনবান সমাজকে প্রত্যক্ষ করলেন। ওদেশের অর্থনৈতিক জীবনের যে দুটি দিক দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তা হল ঃ প্রথমত, ওদেশ দারিদ্রের অভিশাপ হতে মুক্ত ; দ্বিতীয়ত, শ্রমিকের উচ্চ মজুরি ও উন্নত অবস্থা। এ-সম্পর্কে বেলগাঁওয়ের হরিপদ মিত্রকে তিনি লিখছেন ঃ 'এ দেশের ধনের কথা কি বলিব ? পৃথিবীতে এদের মতো ধনী জাতি আর নাই। ইংরেজরা ধনী বটে, কিন্তু অনেক দরিদ্র আছে। এদেশে দরিদ্র নাই বলিলেই হয়। একটা চাকর রাখতে গেলে রোজ ৬ টাকা—খাওয়া-পরা বাদ—দিতে হয়। ইংলণ্ডে এক টাকা রোজ। একটা কুলি ৬ টাকা রোজের কম খাটে না।'[১৬২] ঐ অভূতপূর্ব আর্থিক উন্নতি দেখে তিনি ভারতবর্ষের জন্য অনুরূপ উন্নতি কামনা করলেন। ঐ চিঠিতেই তিনি লেখেন ঃ 'গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ২ টাকা। ...আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখতে।'[১৬৩]

অতীত ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধি ঃ

বিবেকানন্দ অতীতদিনের ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ইতিহাস-চর্চার মাধ্যমে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। সে-সম্পর্কে একটি সমীক্ষায় তিনি বলেছেন ঃ 'মানব-জাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীনকাল থেকে কাজ

১৬২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৮ ১৬৩। তদেব, পৃঃ ৩৮৯

করছে, তার মধ্যে বোধহয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদি কাল হতে, উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মতো দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মোতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশমিনা কিংখাব ইত্যাদি এদেশের মতো কোথাও হতো না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান—ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই যে দেশ যখন সভ্য হত, তখন ঐসকল জিনিসের জন্য ভারতের উপর নির্ভর।'[১৬৪] প্রসঙ্গত এখানে বলা যেতে পারে যে, অতীত ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের নির্ভরযোগ্য একটি তালিকা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। এটি তাঁর এ-বিষয়ে গভীর অনুশীলনের পরিচায়ক। যাই হোক, তিনি অনুভব করেছিলেন যে, অতুল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের অধিকারী ও কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ ভারত অতীতে যা পেয়েছিল—যা ব্রিটিশ শাসনের কালে শাসকদের অনুসৃত নীতির ফলে অবক্ষয়ের মুখে পড়েছে, তা পুনর্বার ভারত লাভ করতে পারে। সেজন্য তিনি এ-বিষয়ে ভারতকে অবহিত করতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন ঃ 'ভারতে কত জিনিস জন্মায়। বিদেশী লোক সেই raw material (কাঁচামাল) দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মতো তাদের মাল টেনে মরছিস। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তা-ই নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিস তৈয়ের করে বড় হয়ে গেল ; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে "হা অন্ন, হা অন্ন" করে বেড়াচ্ছিস।'[১৬৫]

সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও ঔপনিবেশিক দেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ঃ

উপরোক্ত উক্তিটি সাধারণ একটি খেদোক্তি মাত্র নয়, আলোচ্য বিষয়ে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে বিবেকানন্দ উদ্ঘাটিত করেছেন ইংলণ্ড-আমেরিকার মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর স্বরূপ। বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন প্রথমোক্ত দেশগুলি তাদের অধীনস্থ উপনিবেশগুলি হতে কাঁচামাল সংগ্রহ করে সেগুলি নিজেদের দেশে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করে, তারপর আবার সেগুলি উপনিবেশগুলিতে পাঠায়। উপনিবেশগুলি তাদের কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ, আবার তাদের শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার। ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যই এই—অধীনস্থ দেশগুলি কাঁচামাল রপ্তানি করে, শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। সাম্রাজ্যবাদী শাসক দেশগুলি শিল্পসমৃদ্ধ দেশ, তারা তাদের অধীন দেশগুলি থেকে কাঁচামাল আমদানি করে এবং নিজেরা তাদের নিকট রপ্তানী করে শিল্পজাত দ্রব্য। উপনিবেশগুলি সেজন্য আর্থিক দিক দিয়ে অনুন্নত থেকেই যায়। সেখানে শিল্পোন্নয়ন ঘটতে দেওয়া হয় না, কারণ তা ঘটতে দিলে তারা আর শাসক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাঁচামাল সরবরাহকারী ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার—এইরূপ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না।

১৬৪। তদেব, পৃঃ ১০৫ ১৬৫। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১০৫

ধনতান্ত্রিক কাঠামো ও অসম আর্থিক উন্নতি :

ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় অসম আর্থিক উন্নতির শোচনীয় পরিণামও এখানে উদ্ঘাটিত। কতগুলি দেশ উন্নত হয়েছে, অপর কতগুলি দেশকে তার মূল্য দিতে হয়েছে—তারা অনুন্নতই থেকেছে। এই অসম উন্নতি—উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে এইরূপ বৈষম্য—ধনতান্ত্রিক উন্নতির (capitalist development) অন্যতম স্বরূপ। অনেক পরবর্তীকালে অর্থনীতিজ্ঞদের বিশ্লেষণে উদ্ঘাটিত এই তত্ত্ব বিবেকানন্দের চিন্তায় তখনই সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে। তখন কার্ল মার্কস ঐ ধারায় চিন্তা করে গেছেন, কিন্তু অর্থনীতির রূপকারদের নিকট তখনও এর পূর্ণ তাৎপর্য ধরা দেয়নি। অর্থনীতির উন্নতিতত্ত্ব (Growth Economics) অনেক পরে গড়ে উঠেছে। অর্থনীতি তখনও ভারসাম্যতত্ত্ব-কেন্দ্রিক। সুতরাং এখানে প্রমাণিত যে, বিবেকানন্দের চিন্তায় অনেক পরবর্তীকালের অর্থনৈতিক চিন্তা অতি সুন্দররূপে প্রতিফলিত হয়েছে যা তখনকার অন্য চিন্তাবিদ্‌দের ক্ষেত্রে হয়নি।

ভারতে আর্থিক উন্নতির উপায়—বৈদেশিক সাহায্য :

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, পাশ্চাত্যদেশ থেকে মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপারে সাহায্য নিয়ে ভারতকে শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, আজকের ভারত এবং বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ ঠিক এই পন্থাই গ্রহণ করেছে। তিনি এই সাহায্যলাভের পথকে প্রশস্ত করতেই পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা করেছিলেন। এ-বিষয়ে আলোকপাত করে মারি লুইস বার্ক বলেছেন : ধর্মমহাসভার পূর্ববর্তী ছ-সপ্তাহে আমেরিকার অধিবাসীদের তিনি তাঁর সেদেশে আসার কারণ বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাদের বলেন যে, ভারতে ধর্মের অভাব নেই। প্রচুর ধর্ম আছে, যার থেকে অন্যকেও দেওয়া যেতে পারে। তাদের অভাব খাদ্যের, অভাব প্রযুক্তিবিদ্যার।[১৬৬] আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে উৎপাদন প্রথার প্রবর্তনই অর্থাৎ আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাসহায়ে শিল্পায়নই ভারতের সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র দূরীকরণের মুখ্য উপায়—একথা তখনই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সেদিক দিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের (Economic Modernization) তিনি একালের একজন মুখ্য প্রবক্তা। তিনি চেয়েছিলেন আমেরিকা থেকে অর্থসংগ্রহ করে একটি প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত করতে, যেখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ত্যাগী কর্মিগণ গ্রামে গ্রামে লোকেদের আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা শেখাবেন।[১৬৭]

তিনি এজন্য এসময়ে পাশ্চাত্যের সঙ্গে একটি আদানপ্রদান ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। সেটি হল ভারতকে পাশ্চাত্যদেশ দেবে প্রযুক্তিবিদ্যা, ভারতে যার অভাব,

---

১৬৬। Swami Vivekananda—His Second Visit to the West : New Discoveries—Marie Louise Burke, Advaita Ashrama, Calcutta, Second Edition (1982), p. 586

১৬৭। ibid.

আর পাশ্চাত্যকে ভারত দেবে আধ্যাত্মিকতা, পাশ্চাত্যে যার অভাব। একটি চিঠিতে তিনি বলছেনঃ 'তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার করব, করে দেশে যাব...আমাদের দেশে social virtue-র (সমাজ-হিতকর গুণের) অভাব, তেমনি এদেশে spirituality (আধ্যাত্মিকতা) নাই, এদের spirituality দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে। ...হিন্দুস্থানের কারও উপর depend (নির্ভর) করি না। নিজে প্রাণপণ করে রোজগার করে নিজের plans carry out (উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত) করব or die in the attempt (কিংবা ঐ চেষ্টায় মরব)।'[১৬৮]

বিবেকানন্দ কখনও তাত্ত্বিক আলোচনা করে বা পরিকল্পনা দিয়েই সন্তুষ্ট হতেন না। সেটি কর্মে পরিণত করবার জন্য নিজে আপ্রাণ প্রয়াস করতেন। এ-ব্যাপারেও নিজেই পথপ্রদর্শকের কাজটি করতে চেয়েছেন। এ-সম্পর্কে আমেরিকার একটি সংবাদপত্র কিছু আলোকপাত করেছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের Pasadena Star সংবাদ পরিবেশন করছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ ৬ তারিখে Throop Polytechnic Institute পরিদর্শন করে খুব খুশি হয়েছেন এবং তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অনুরূপ শিক্ষাদির প্রবর্তন শীঘ্রই করবেন। মারি লুইস বার্কের গ্রন্থে পরিবেশিত এই সংবাদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিবেকানন্দের ভারতের দারিদ্র-মোচনের উপায় সম্বন্ধে ধারণাকে স্পষ্ট করছে। মারি লুইস বার্কের সমীক্ষায় এ-সম্বন্ধে আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, স্বামীজীর অন্যতম স্বপ্ন ছিল, যেকথা তিনি প্রায়ই বলতেন, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে আদর্শ ও কৃতিত্বের আদানপ্রদানের স্বপ্ন দেখতেন। মিঃ অ্যালান তাঁর ভারত সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতায় উদ্ধৃত করেছেন এই কথাটি ঃ আমাদের যন্ত্রবিদ্ প্রেরণ করুন, যাতে আমরা আমাদের হাতের ব্যবহার করতে শিক্ষা পাই। আমরা আপনাদের আধ্যাত্মিকতা শিক্ষার জন্য প্রচারক পাঠাবো।[১৬৯] এর উপর মারি লুইস বার্ক নিজে মন্তব্য করেছেনঃ এ স্বপ্ন শুধু যে সুদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ছিল, তা নয়। এ স্বপ্ন ভবিষ্যতের একটি বাস্তব ঘটনার বীজ বপন করেছিল।[১৭০] মারি লুইস বার্ক ঠিকই বলেছেন, সেদিন সেই স্বপ্ন অনুযায়ী কাজ শুরু হয়েছে, তাঁর আমল থেকেই, এ আজকের দিনে স্পষ্ট বোঝা যায়।

পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নতি ও ধনতন্ত্র ঃ বিবেকানন্দের পরবর্তী ধারণা ঃ

তখনকার দিনে ভারতে শিল্পায়ন সম্পর্কে অনেকেই উৎসাহিত ছিলেন—রামমোহন থেকে রাণাডে পর্যন্ত অনেক চিন্তাবিদ্। তাঁরা সকলেই পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। বিবেকানন্দের যেটি বিশেষত্ব সেটি হল এই যে, তখনকার দিনে তাঁর দৃষ্টিতে শিল্পায়নের সুফলই শুধু ধরা পড়েনি, ধরা

১৬৮। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১৩

১৬৯। Swami Vivekananda—His Second Visit to the West : New Discoveries, p. 333

১৭০। ibid.

পড়েছে তার ভিত্তিমূলে যে বিরাট একটি ত্রুটি রয়েছে সেটিও, যেটি তখনকার ভারতীয়দের চিন্তায় একেবারেই অনুপস্থিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। একমাত্র ব্যতিক্রম বিবেকানন্দ। আশ্চর্য হতে হয় এইজন্য যে, আক্ষরিক অর্থে অর্থনীতিজ্ঞ না হলেও শিল্পবিপ্লব ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশ আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনি বিশ্লেষণ ও বিচার করেছেন বিশেষজ্ঞের মতোই। আমেরিকার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুটি বিষময় পরিণাম—শিল্পে মন্দা ও একচেটিয়া ক্ষমতার সম্প্রসারণ তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আমেরিকায় প্রথম পদার্পণের মাত্র তিন বৎসর পূর্বে আমেরিকা একচেটিয়া ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করবার উদ্দেশ্যে পাস করেছে প্রখ্যাত Sherman's Anti-Trust Act। ১৮৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় এক প্রচণ্ড ব্যবসায়িক মন্দা দেখা গিয়েছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুন হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত চিঠিতে তিনি এই মন্দার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ '...এবার আমেরিকায় বড় দুর্বৎসর চলিতেছে, হাজার হাজার গরীব বেকার।'[১৭১] তদানীন্তন বিখ্যাত কবি ও সাংবাদিক এলা হুইলার উইলকক্স (Ela Wheeler Wilcox)-এর স্মৃতিচারণায়ও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখছেন ঃ 'এ হল অর্থনৈতিক দুর্দৈবের,, ভয়াবহ শীতকালের কথা, যখন ব্যাঙ্ক ফেল করছে, স্টক ফুটো বেলুনের মতো চুপসে যাচ্ছে, নৈরাশ্যের অন্ধ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পথ হাঁটছে ব্যবসায়ীরা, সারা জগতে যেন ওলটপালট।'[১৭২]

এই মন্দা প্রভৃতির কুফল দেখে বিবেকানন্দ শিল্প-সমৃদ্ধ ধনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের ত্রুটি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর নিজের বর্ণনানুসারে ত্রুটিটি হল নিম্নোক্তরূপ ঃ '...যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম-নির্মাণ দ্বারা অসাধারণ শক্তি সঞ্চিত হইতেছে এবং এমন সব অধিকার দাবি করা হইতেছে, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কখনও করা হয় নাই।'[১৭৩] যন্ত্র দ্বারা উৎপাদন ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, তার ফলে মূলধন সরবরাহকারী অল্পসংখ্যক ধনিকদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। এর ফলে তারা সীমাহীন সুবিধা কুক্ষিগত করে, ফলে সাধারণে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের শোষণ করা হচ্ছে।—যতদূর সম্ভব বিবেকানন্দ এ সমস্তই দেখিয়েছেন।

বিবেকানন্দ আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে, উক্ত ধনিক একচেটিয়া ব্যবসায়ী শ্রেণী যে কেবলমাত্র নিজ দেশের মধ্যে সকলকে বঞ্চিত করে সব সুবিধা নিজেদের করতলগত করেছে তা নয়, পণ্যের বাজার হস্তগত করবার জন্য অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছে, তাদের সব সম্পদ লুঠ করেছে। এ-সম্বন্ধে তাঁর তীব্র মন্তব্য (যা আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি) থেকে একথা জানা যায়। মন্তব্যটি হল ঃ 'যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিত হলে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো তো সেইখানেই মারা গেল...।'[১৭৪]

১৭১। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৮ ১৭২। বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৬৩
১৭৩। বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪০ ১৭৪। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬২

ধনতান্ত্রিক আর্থিক উন্নতির স্বরূপ ঃ

এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ধনতান্ত্রিক আর্থিক উন্নতির স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পরিপূর্ণরূপে, জেনেছিলেন স্পষ্ট যে, এ উন্নতির ফলভোগে সাধারণ প্রজার কোন অংশ নেই, সে বঞ্চিত। শুধু তা-ই নয়, অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণ করবার জন্য তাকে মরতে পাঠাতে হচ্ছে। গৌরবহীন যুদ্ধে ততোধিক গৌরবহীন মৃত্যুই হল তার ভাগ্য। বিবেকানন্দের বর্ণনানুসারে ঃ 'তাহারা ভাবে—সমগ্র জগৎকে শাসন করিবার, ঈশ্বরের পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার, তাহাদের যাহা ইচ্ছা করিবার, পৃথিবীকে ওলটপালট করিবার আদেশপত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেন তাহাদিগকে দিয়াছেন ; হত্যা ও লুণ্ঠন করিবার ছাড়পত্র তাহারা পাইয়াছে।'[১৭৫] এখানে বিবেকানন্দ আশ্চর্যরকমভাবে লেনিনের লেখা 'Imperialism' গ্রন্থের মূল বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন, অথচ 'Imperialism' গ্রন্থ ও তার লেখক Lenin তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। উনিশ শতকের ভারতের অন্য কোন চিন্তাবিদ্ এ-বিষয়ে ধারণা করতে পারেননি। বিবেকানন্দ এখানে তাঁদের সকলকে অতিক্রম করেছেন।

শিল্পায়ন ও বিবেকানন্দ ঃ

দারিদ্র দূরীকরণের জন্য বিবেকানন্দ ভারতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়ে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রসার করতে চেয়েছিলেন। এ-বিষয়ে একটি মন্তব্যে তিনি বলেন ঃ '...জাপানীরা বর্তমানকালের কি প্রয়োজন, তা বুঝেছে; এদের দেশলাই-এর কারখানা একটা দেখবার জিনিস। এদের যে-কোন জিনিসের অভাব, তা-ই নিজের দেশে করবার চেষ্টা করছে। ...আর তোমরা...পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ!'[১৭৬] ভারতে অনুরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জামসেদজী টাটাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এ-বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি লিখেছেন যে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রাপথে জাহাজে শিল্পপতি জামসেদজী টাটার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। স্বামীজী এ-প্রসঙ্গে একটি পত্রে লেখেন যে তিনি টাটাকে বলেছিলেন ঃ 'জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেশে বিক্রয় করে জাপানকে টাকা দিচ্ছ কেন? তুমি তো সামান্য কিছু দস্তুরী পাও মাত্র। এর চেয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে তোমারও লাভ হবে, দশটা লোকেরও প্রতিপালন হবে, এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে।'[১৭৭] মহেন্দ্রনাথ-উল্লেখিত এ পত্রটি কিন্তু স্বামীজীর 'পত্রাবলী'তে নেই। কিন্তু জামসেদজী টাটার স্বামীজীকে লিখিত একটি চিঠিতে জানা যায় যে, টাটা ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের উদ্যোগ করার কালে স্বামীজীর চিন্তা ও ভাবরাশিকে স্মরণ করছেন। অর্থাৎ এরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার

১৭৫। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৪ ১৭৬। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭-৫৮
১৭৭। উদ্ধৃত ঃ বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৪৩

স্থাপনের চিন্তা স্বামীজীরও ছিল এবং এ-প্রসঙ্গে টাটার সঙ্গে তাঁর ভাববিনিময় হয়েছিল জাহাজে একত্র ভ্রমণকালে। এ পত্রে টাটা বলছেন ঃ 'আমার বিবেচনায়, যদি ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ মানুষেরা আশ্রম-জাতীয় আবাসিক স্থানে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে মানবিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করে, তাহলে তার অপেক্ষা ত্যাগ ও ধর্মাদর্শের উৎকৃষ্টতর প্রয়োগ আর কিছু হতে পারে না।'[১৭৮] প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চার উপর স্বামীজী যে কত গুরুত্ব দিতেন, তা এখানে সুস্পষ্ট। টাটার এ উক্তি স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পূর্বে আলোচিত পরিকল্পনার কথাই উদ্ঘাটিত করছে। আশ্রমে যাঁরা ধর্মভাবনা নিয়ে থাকবেন তাঁরাও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আলোচনা করবেন এবং তাঁরা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষা দেবেন—স্বামীজীর এ পরিকল্পনার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। টাটার চিঠিতে সেই পরিকল্পনাটিই বিবৃত হয়েছে।

শিল্পায়ন ও বিজ্ঞানচর্চা ঃ

বিবেকানন্দ ভারতে বিজ্ঞানচর্চা ও শিল্পায়ন সম্পর্কে কতখানি আগ্রহশীল ছিলেন তা আমরা তাঁর আর একটি উক্তির মধ্যে আরও সুস্পষ্ট পাই। জনৈক শিষ্যকে বলছেন ঃ 'পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর—চাকরি গুখুরি করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে।'[১৭৯] 'পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার'—এটি তাঁর একটি মূল লক্ষ্য ছিল। সর্বস্তরের মানুষদের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হোক এ অভিপ্রায় তিনি প্রায়ই প্রকাশ করতেন এবং তারজন্য নানা পরিকল্পনা দিয়েছেন, নানা কার্যকরী প্রকল্প প্রবর্তন করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ-সম্পর্কে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলছেন ঃ 'তাই তো বলি, তোরা এই mass (জনসাধারণ)-এর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। ...আধুনিক বিজ্ঞানসহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা।'[১৮০] এ-বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনা ব্যক্ত করে একটি চিঠিতে লিখছেন ঃ 'মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কোন্ কাজ করে?—তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী—গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা।'[১৮১] এইভাবে বিজ্ঞান-শিক্ষা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করা, সর্বসাধারণের বিজ্ঞান-মানসিকতা গড়ে তোলা যাতে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে, আধুনিক কলাকুশলতা প্রয়োগে আমরা আধুনিক শিল্পসমূহ গড়ে তুলতে পারি—তারজন্য আপ্রাণ প্রয়াস করেছেন বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে। যে-সভায় এই প্রতিষ্ঠা-কার্য করা হয় সেখানে মিশন

১৭৮। তদেব, পৃঃ ১৪৪ ১৭৯। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪

১৮০। তদেব, পৃঃ ১০৮ ১৮১। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১২

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বিবৃত করে যেসকল প্রস্তাব বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় গৃহীত হয় তার মধ্যে চতুর্থ প্রস্তাবটিতে বলা হয়ঃ 'ইহার কর্মরীতি হইবেঃ (১) জনসাধারণের দৈহিক ও মানসিক মঙ্গলের অনুকূলে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার পক্ষে লোককে উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদিগকে তৈয়ারি করা; (২) শিল্প ও চারুকলার উন্নতি করা ও সে-বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া; (৩) সাধারণ বৈদান্তিক ও অন্যান্য ধর্মীয় ভাবগুলি রামকৃষ্ণের জীবনে যেরূপ অর্থ লাভ করিয়াছিল, সেই অর্থে সেগুলির প্রবর্তন ও প্রচার করা।'[১৮২] দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানশিক্ষা ও 'শিল্প ও চারুকলার উন্নতি করা'র উপর বিবেকানন্দ অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে এগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন।

ছোট বহরের শিল্পের উন্নয়নঃ

বড় বহরের উৎপাদনে অল্পসংখ্যক লোকের হাতে ক্ষমতা ও সম্পদের কেন্দ্রীকরণ ঘটে। ধনতান্ত্রিক দেশে এই ক্ষমতা ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয় ধনিকদের হাতে, আর সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রের হাতে। বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমেরিকায়, তিনি দেখেছিলেন সেখানে কিভাবে এই কেন্দ্রীকরণ জনসাধারণের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে তাদের শোষণ ও বঞ্চনা করে। তিনি বলেছিলেনঃ যন্ত্র-উৎপাদন মাধ্যমে প্রচণ্ড ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং তার ফলে আজ যেরকম বিশেষ সুবিধা দাবি করা হচ্ছে, তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও মেলে না। বড় বহরে উৎপাদনের এই বিষময় ফল লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ সবসময় ছোট বহরের শিল্পসংস্থার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। নিবেদিতা এ-বিষয়ে প্রভূত আলোকপাত করে লিখেছেনঃ ব্যবসাতে অধিক মূলধন নিয়োগে অধিক লাভের সম্ভাবনা, এরূপ মতাবলম্বীদের বিপক্ষে তিনি যারা অল্প জমিতে চাষ করে, অথবা স্বল্প পুঁজি নিয়ে কৃষিজাত দ্রব্যের কারবার করে, সর্বদা তাদের সমর্থন করতেন।[১৮৩] নিবেদিতা আরও বলেছেনঃ তিনি সর্বক্ষেত্রেই, সরবরাহের ক্ষেত্রেও—ক্ষুদ্র সংস্থা, ছোট ব্যবসায়ীর বিলোপসাধন করতে পারে এরূপ যুক্তিকে সন্দেহের চোখে দেখতেন...বড় সংগঠনের সংহতিকে তিনি প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু প্রশ্ন হল একদল নেকড়ের সংহতির মধ্যে কোন সৌন্দর্য আছে কি?[১৮৪] এখানে তাঁর বাস্তব দৃষ্টিরও পরিচয় রেখেছেন তিনি। একথা বিবেকানন্দ সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতের মতো দেশে যেখানে লক্ষ লক্ষ বেকার সেখানে দ্রুত কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন ছোট বহরের কুটিরশিল্প, যাতে বহুসংখ্যক লোক কর্ম পাবে। এ ব্যাপারে তিনি স্বনিযুক্তির উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। বলেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়ঃ 'চাকরিতে গোলামিতে এত দুঃখ দেখেও তোদের চেতনা হচ্ছে না, কাজেই দুঃখও দূর হচ্ছে না! ...ওদেশে দেখলুম, যারা চাকরি করে,

---

১৮২। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, পৃঃ ১১৬ ১৮৩। The Master as I saw him, p. 249
১৮৪। ibid., p. 189

Parliament-এ (জাতীয় সমিতিতে) তাদের স্থান পেছনে নির্দিষ্ট।'[১৮৫] আরও বলছেন : 'টাকা না জোটে তো জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দিশী কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা-ইউরোপে পথে পথে ফেরি করগে।'[১৮৬]

ভারতে যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারে কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা :

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তিনি ক্ষুদ্র জোতের অবস্থানের জন্য বড় বহরে যন্ত্রসহায়ে চাষ সমর্থন করেননি। তিনি যখন প্রথম আমেরিকায় পদার্পণ করেন, তখন ওখানকার কৃষি-ব্যবস্থা দেখে মনে করেছিলেন ভারতেও অনুরূপভাবে যন্ত্র ব্যবহার সহায়ে চাষ করলে কৃষির উন্নতি ঘটবে। পরে তিনি অনুভব করেন যে, বড় জোতের অধিকারী আমেরিকার চাষীদের পক্ষে যন্ত্রের ব্যবহার উপযোগী। ছোট জোতের অধিকারী ভারতীয় চাষীদের পক্ষে তা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এ-বিষয়ে আলোকপাত করে নিবেদিতা বলছেন : অপর সকলের মতো তিনিও চিন্তা না করে ধরে নিয়েছিলেন যে, যন্ত্রপাতির দ্বারা কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি হবে, কিন্তু এখন দেখলেন যে, যন্ত্রের দ্বারা আমেরিকার কৃষকের সুবিধা হতে পারে, কারণ তাকে বহু বর্গমাইল চাষ করতে হয়, কিন্তু ভারতীয় চাষীদের ছোট ছোট জমির পক্ষে এতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশী। ভারত ও আমেরিকার সমস্যা সম্পূর্ণ পৃথক।[১৮৭] এ-বিষয়েও বিবেকানন্দের চিন্তা বাস্তবানুগ। কতখানি বাস্তবানুগ ও অগ্রগামী তা এখানে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। এই বিষয়টি বুঝতে আমাদের স্বাধীন ভারতে দীর্ঘসময় ও বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধান প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যন্ত্রদ্বারা চাষ করতে হলে বড় জোত প্রয়োজন হয় এবং বর্তমান ছোট জোতের স্থানে বড় জোত গঠন করে যন্ত্রদ্বারা চাষ প্রবর্তন করলে বহু লোক বেকার হয়ে পড়বে—বিবেকানন্দ তা দেখাতে চেয়েছেন। আজকের অর্থনীতিবিদ্‌দেরও এটাই মত। এ-বিষয়ে বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ Gunnar Myrdal-এর অভিমত : '...most important, reason why modern Western techniques cannot simply be appropriated for use in South Asia is the very different factor proportions. Almost from the beginning, agricultural technology in the advanced countries was geared to a situation where the agricultural labour force was declining rapidly...the situation in the South Asian countries is radically different. Their huge, even now largely underutilized, agricultural labour force will be increasing rapidly for decades to come.'[১৮৮] দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলিতে উৎপাদনের উপাদানগুলি

১৮৫। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১০৬ ১৮৬। তদেব, পৃঃ ১০৫

১৮৭। The Master as I saw him, p. 189

১৮৮। Asian Drama, Vol. II—Gunnar Myrdal, Penguin Books Ltd., Great Britain, 1968, p. 1254

যেভাবে লভ্য তা পাশ্চাত্য দেশগুলি হতে সম্পূর্ণ অন্যরকম। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রথম থেকেই অন্যান্য উপাদানের অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা কম, সেজন্য পাশ্চাত্য দেশগুলি যন্ত্রের ব্যবহারের উপযোগী। কিন্তু দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলিতে আজও প্রচুর অব্যবহৃত শ্রমিক-সম্পদ বর্তমান এবং তা আরও দীর্ঘকাল ধরে বৃদ্ধি পাবে। এমতাবস্থায় Myrdalও অধিক যন্ত্র ব্যবহার সমর্থন করেননি। Myrdal আরও অভিমত দিয়েছেন যে, ছোট বহরে চাষ যে যন্ত্র-দ্বারা চাষের চেয়ে দক্ষতার মানদণ্ডে নিম্নমানের তা সবসময় ঠিক নয়। তিনি এ-বিষয়ে যে-সকল সমীক্ষা করেছেন তাতে দেখেছেন যে, একর-প্রতি উৎপাদনের যে-হার তা জমির পরিমাণের বিপরীত ('...yields per acre are inversely related to farm size.')।[১৮৯] জাপানে ধান-উৎপাদন পদ্ধতি সমীক্ষা করে তিনি এ-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হন। তাছাড়া তিনি এ-সকল সমীক্ষা থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ছোট বহরে চাষ করলেই যে আধুনিক কলাকুশলতা প্রয়োগ করা যাবে না তা নয়, তবে সে কলাকুশলতা হয়তো শ্রমিক-বাঁচানো কলাকুশলতা হবে না, অধিক শ্রমিক-নিয়োগ-সক্ষম কলাকুশলতাই হবে। 'Any modern technological practices introduced will probably not be "labour-saving" but will instead call for a bigger labour input....'[১৯০] বিবেকানন্দ ঠিক একই কথা বলেছেন। আধুনিক কলাকুশলতা প্রয়োগের কথা তিনি বার বার বলেছেন কিন্তু তা ছোট জোতের চাষের উপযোগী হতে হবে, ভারতের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী হতে হবে।

তখন আমাদের দেশে এ উপলব্ধি খুব কমই ছিল। যেমন রাণাডের কথাই ধরা যাক। রাণাডে চেয়েছিলেন বড় জোতের প্রবর্তন। ডক্টর ভবতোষ দত্ত এ-বিষয়ে বলছেন ঃ শিল্পসংরক্ষণ ব্যতীত অন্যভাবেও রাণাডে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ চেয়েছেন— যেমন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ছোট বহরে চাষের পরিবর্তে বড় বহরের কৃষিজোত চেয়েছেন তিনি—এটা তাঁর বাস্তববুদ্ধির পরিচয়।[১৯১] কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ চাওয়ার মধ্যে যদি বাস্তববুদ্ধির পরিচয় থেকেও থাকে, ভারতবর্ষের মতো জনবহুল দেশে, যেখানে বিপুল সংখ্যক লোক বেকার, কৃষির উপর জনচাপ অত্যধিক, শিল্প অত্যন্ত অনুন্নত, সেখানে বড় বহরের জোতের পরিণাম বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি—এটি না বুঝে বড় বহরের জোত চাওয়ার মধ্যে বাস্তববুদ্ধির পরিচয় কি করে থাকতে পারে? কিন্তু বিবেকানন্দ বাস্তব পরিস্থিতি উত্তমরূপে জানতেন, এদেশে কৃষিজোতের পরিমাণ স্বচক্ষে দেখেছেন, সেজন্য বড় জোত বা ব্যাপক যন্ত্রপ্রয়োগে চাষ—এর কোনটাই যে ভারতে খুব প্রযোজ্য নয়, তা তিনি বুঝতেন। এ-বিষয়ে রাণাডের যে পরিকল্পনা, যা তিনি তাঁর 'Netherlands, India and the Culture System' নামক প্রবন্ধে উপস্থাপিত করেছেন, তা হল সংক্ষেপে এই ঃ যবদ্বীপে ডাচ্ সরকার যে প্রথা প্রবর্তন করেছেন যা 'culture system' নামে অভিহিত হয়েছিল সে প্রথার প্রবর্তন। তার সারকথা হল চাল উৎপাদনের জন্য যে জমি প্রয়োজন তা বাদ দিয়ে সমস্ত সরকারী জমিতে

১৮৯। ibid. ১৯০। ibid., p. 1255

১৯১। The Evolution of Economic Thinking in India, p. 16

এমন সব শস্য উৎপাদন করা হবে যার ইউরোপে চাহিদা আছে এবং এজন্য সাহায্য দেওয়া হবে চুক্তিবদ্ধভাবে যাঁরা কাজ করেন এরূপ কতিপয় contractorদের। তাঁরা উৎপন্ন শস্য সরকারের নিকট নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় করবেন, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে সরকার যা অনুদান দিয়েছেন তা শোধ করে দেবেন। কৃষকেরা যাঁরা এসকল ফসল ফলাবেন তাঁরা রাণাডের মতে ভাল মজুরি পাবেন। এর ফল হবে সরকার এবং contractorগণ উত্তম মুনাফা পাবেন। এক্ষেত্রে উৎপাদনই যে শুধু বড় বহরে হবে তা-ই নয়, যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন হবে এবং সরকার এই সকল যন্ত্র বিদেশ থেকে বিনা শুল্কে আমদানি করবেন।[১৯২] এই যে ব্যবস্থা শস্য উৎপাদনের এটিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও উদ্যোগ থাকলেও এটি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, মুনাফা এর লক্ষ্য এবং এতে কৃষকেরা পরিণত হচ্ছেন শ্রমিকে। যবদ্বীপে বিদেশী শাসকেরা এটি প্রবর্তন করেছিল যাকে সেদেশের অর্থনীতিকে শোষণের একটি নূতন সাম্রাজ্যবাদী উপায় বলা যেতে পারে। এরকম কোন পদ্ধতি, যাতে কৃষকেরা কেবলমাত্র শ্রমিকে পরিণত হবে এবং যা তারা উৎপাদন করবে তা হতে মুনাফা নেবে বিদেশী সরকার ও একদল চুক্তিবদ্ধ মধ্যবর্তী ব্যক্তি অর্থাৎ contractorগণ, তা বিবেকানন্দ কখনও সমর্থনযোগ্য বলে মনে করতেন না। পূর্বেই আমরা দেখেছি, নিবেদিতা বলেছেন ঃ তিনি সবক্ষেত্রেই, সরবরাহের ক্ষেত্রেও—ছোট সংস্থা, ছোট ব্যবসায়ীর বিলোপসাধন করতে পারে এরকম যুক্তিকে সন্দেহের চোখে দেখতেন।

ভারতের মূল অর্থনৈতিক সমস্যা ঃ

ভারতের যেটি মূল অর্থনৈতিক সমস্যা—ভয়াবহ দারিদ্র—প্রত্যক্ষ দেখে বিবেকানন্দ তার পরিচয় লাভ করেছিলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যখন তিনি বিশাল ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পরিক্রমা করছিলেন তখন তিনি এ পরিচয় লাভ করেছিলেন। খুবই আশ্চর্য হতে হয় দেখে যে, বিবেকানন্দ ভারতের দারিদ্রের পরিমাণ ভারতে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে করতে প্রয়াস পেয়েছেন। বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ্ যাঁরা তাঁরাই এইরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দারিদ্রের পরিমাপ করার প্রয়াস পেয়ে থাকেন। আক্ষরিক অর্থে অর্থনীতিবিদ্ না হয়েও বিবেকানন্দ এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছেন। দাদাভাই নওরোজীর প্রথম হিসাব অনুযায়ী ভারতে মোট জাতীয় আয় (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ) হল ৩০০ কোটি টাকা ও মাথাপিছু বাৎসরিক গড় আয় ২০ টাকা।[১৯৩] বিবেকানন্দ দিয়েছেন মাসিক গড়। বিবেকানন্দ লিখছেন ঃ 'গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ২ টাকা।'[১৯৪] বিবেকানন্দ দাদাভাইয়ের

১৯২। Indian Economic Thought : Nineteenth Century Perspectives, p. 175

১৯৩। Poverty and Un-British Rule in India—Dadabhai Naoroji, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Delhi, 1962

১৯৪। **বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৯**

কাছাকাছি হিসাব দিয়েছেন। সম্ভবত বিবেকানন্দ এ-বিষয়ে দাদাভাইয়ের প্রাথমিক প্রয়াসের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন।

ভারতে দারিদ্র যে কী ভয়াবহ তা বোঝাবার জন্য তিনি বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিজ্ঞের মতো (মাসিক) গড় আয়ের উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি আরও যা বলেছেন নিঃসন্দেহে তার ভিত্তি তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ঃ ভারতের কোন কোন অঞ্চলের মানুষ মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, মহুয়া ফুল সেদ্ধ করে খেয়ে জীবনধারণ করে। কোথাও কোথাও পরিবারের জোয়ান পুরুষেরাই কেবল ভাত খায়, নারী ও শিশুরা ফেন খেয়ে থাকে। ভারতের অধিকাংশ লোক সম্বন্ধে বলা যায়—মোটামুটি অনাহারই তাদের সাধারণ অবস্থা। আয়ের একটু হেরফের হলেই লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু।[১৯৫] অপর একটি প্রতিবেদনে বলেছেন, শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ১২ পেন্স মাত্র।[১৯৬] ভারতে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান যে অতিশয় নীচুমানের সে-সম্পর্কে এর দ্বারা স্পষ্ট একটি ধারণা দিতে চেয়েছেন।

ভারতে দারিদ্রের কারণ ঃ

বিবেকানন্দের মতে ভারতে এই ভয়াবহ দারিদ্রের মূল কারণ দুটি ঃ (১) প্রথমটি অর্থনৈতিক তথা ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ, (২) দ্বিতীয়টি সামাজিক তথা অভিজাত, জমিদার ও পুরোহিতদের অকথ্য শোষণ ও অত্যাচার।

ভারতের দারিদ্রের অর্থনৈতিক কারণ ঃ আর্থিক শোষণ (Economic Drain)

ভারতে ইংরেজ শাসনের ফল আলোচনা করতে গিয়েই তিনি ভারতের দারিদ্রের অর্থনৈতিক কারণগুলি নির্দেশ করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যা স্বরূপ ঠিক তা-ই। বিবেকানন্দ ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন ঃ 'ইংরেজ-বিজয়ের কালে কয়েক শতাব্দী ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছিল, ব্রিটিশ শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এবং তার চেয়েও ভয়ানক যে-সকল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, তা লক্ষ লক্ষ লোককে গ্রাস করেছে। ...বর্তমান জনসংখ্যার অন্তত পাঁচগুণ লোককে সহজেই ভরণপোষণ করার মতো জীবিকা ও উৎপাদনের সংস্থান ভারতে আছে—যদি সবকিছু তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া না হয়।'[১৯৭]

উপরোক্ত বিবৃতির মধ্যে দেখা যায় বিবেকানন্দ ভারতের দারিদ্রের দুটি অর্থনৈতিক কারণ নির্দেশ করেছেন ঃ

১। ইংরেজের অনুসৃত নীতির ফলে সঙ্ঘটিত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।

১৯৫। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Part One, pp. 46-7

১৯৬। ibid., p. 380 ১৯৭। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৭১

২। ইংরেজগণ কর্তৃক ভারতের জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন।

এই দ্বিতীয় প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ একজায়গায় বলছেন ঃ তারা (ইংরেজরা) আমাদের ঘাড়ে তাদের পা রেখে আমাদের দলন করেছে, আমাদের শেষ বিন্দু রক্ত নিজেদের আমোদপ্রমোদের জন্য শুষে নিয়েছে; তারা আমাদের কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছে, আর আমাদের লোকেরা গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অনাহারে রয়েছে।[১৯৮]

যে দুটি কারণ বিবেকানন্দ এখানে নির্দেশ করেছেন, ভারতের তদানীন্তন অন্যান্য অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণও এ দুটিকেই ভারতের দারিদ্রের মূল কারণ হিসাবে নির্দেশ করেছেন। রমেশচন্দ্র প্রথম কারণটির উপর জোর দিয়েছেন, দাদাভাই নওরোজী তাঁর সুপ্রসিদ্ধ Drain theory[১৯৯] (শোষণতত্ত্ব) মাধ্যমে তাঁর 'Poverty and Un-British Rule in India' গ্রন্থে দ্বিতীয়টির উপর জোর দিয়েছেন।

ভারতের দারিদ্রের সামাজিক কারণ ঃ

কিন্তু বিবেকানন্দ ভারতের দারিদ্রের মূলে একটি সামাজিক কারণকেও মুখ্যত দায়ী করেছেন। এটি হল অভিজাত, জমিদার ও পুরোহিত শ্রেণীর শোষণ ও নির্মম নিষ্পেষণ। পৌরোহিত্য-চক্রের নির্মম শোষণের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে তিনি বলেছেন ঃ 'যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক!'[২০০] জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর নিদারুণ শোষণ ও নিষ্পেষণ সম্পর্কে বলছেন ঃ '...তারা ধনদৌলত বাড়াবার জন্য দরিদ্রকে নিষ্পেষণ করেছে, তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেছে। দুর্গতজনের কান্না তাদের কানে পৌঁছায়নি। তারা যখন অন্নের জন্য হাহাকার করছে, তখন ধনীরা তাদের সোনা-রূপার থালায় অন্নগ্রহণ করেছে। তারপরই ঈশ্বরের প্রতিশোধরূপে এল মুসলমানরা, এদের কেটে কুচি-কুচি করলে। তরবারির জোরে তারা তাদের উপর জয়ী হল। তারপর বহু কাল ও বহু বছর ধরে ভারত বার বার বিজিত হয়েছে এবং সর্বশেষে এসেছে ইংরেজ।'[২০১]

দারিদ্রই ভারতের জাতীয় সমস্যা ঃ

সেযুগে আমাদের দেশের সংস্কারকদের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল উচ্চবর্ণের মানুষদের প্রতি। তাঁরা সেজন্য সমাজ-সংস্কার বলতে বুঝেছিলেন সমাজের উপরতলার মানুষদের সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানের সংস্কার—যেমন বিধবাবিবাহ, পর্দাপ্রথা বর্জন ইত্যাদি।

১৯৮। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Part One, p. 33

১৯৯। Dadabhai Naoroji and The Drain Theory—B. N. Ganguli, Asia Publishing House, Bombay, 1965 ২০০। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১১

২০১। তদেব, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৩৮

সেগুলির যে প্রয়োজন ছিল না তা নয়, কিন্তু সেগুলিই ভারতের জাতীয় সমস্যার সমাধান নয়। সে সমস্যাকেই জাতীয় সমস্যা বলে অভিহিত করা চলে, যা হল দেশের অগণিত জনসাধারণের সমস্যা, মুষ্টিমেয়ের সমস্যা নয়। বিবেকানন্দ একমাত্র ব্যক্তি সেযুগে যিনি এইরূপ জাতীয় সমস্যার মূলে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। তিনি এ-সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা করেনঃ '...দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করে নাই। আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবাবিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য সকল সংস্কারকার্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না; উহা নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর।'[২০২] দেখা যাচ্ছে তদানীন্তন সমাজ-সংস্কারকদের মূল ত্রুটি হল তাঁদের অর্থনৈতিক চেতনার অভাব, তাই তাঁরা সমাজ-সংস্কারের উপর যত জোর দিয়েছেন তত জোর দেননি দারিদ্র-সমস্যার উপর। উচ্চশ্রেণীর দ্বারা জনগণের শোষণকে দারিদ্রের কারণ হিসাবে সেযুগে নির্দেশ করেছেন একমাত্র বিবেকানন্দ। তাঁর এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট চেতনা ছিল বললে কম বলা হয়, এ-বিষয়ে তাঁর চেতনা ছিল সদাজাগ্রত। তিনি অভিজাতশ্রেণীকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বলেছেনঃ 'যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যেসব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্চে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি।'[২০৩]

ভারতের দারিদ্রের অবসানের উপায়সমূহঃ

ভারতের এই ভয়াবহ দারিদ্র অবসানের জন্য বিবেকানন্দ কয়েকটি উপায় নির্দেশ করেছেনঃ

প্রথমত বলেছেন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কথা। আধ্যাত্মিক আদর্শ সামনে রাখতে গিয়ে ভারত ঐহিক বা আর্থিক উন্নতিকে অবহেলা করেছে। এটা তাঁর মতে যুক্তিসঙ্গত নয়। আর্থিক উন্নতিকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। এ-প্রসঙ্গে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেনঃ 'আমরা নির্বোধের মতো জড় সভ্যতার বিরুদ্ধে চিৎকার করিতেছি। ...ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং না খাইয়া মরিতে হইবে? একজন লোকও কেন না খাইয়া মরিবে? ...বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে

২০২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২ ২০৩। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৮৯

গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।'[২০৪] কথাগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং গভীর বাস্তবদৃষ্টির পরিচায়ক। সাধারণ মানুষের স্বার্থকে এখানে বিবেকানন্দ সবকিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। কেবল আধ্যাত্মিক লক্ষ্যকে অনুসরণ করলে চলবে না কারণ আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুযায়ী উপযুক্ত লোকের সংখ্যা খুবই মুষ্টিমেয়। বিপুল জনসাধারণের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলাই জাতির অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেজন্য শুধু যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু উৎপাদন করলে কর্মপ্রবাহের প্রয়োজনীয় উন্নত স্তরে পৌছানো যাবে না। সকলের জন্য কাজ চাই, তারজন্যই চাই উৎপাদন-বৃদ্ধির নিরন্তর প্রয়াস, এবং নিরন্তর উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য চাই ক্রমবর্ধমান চাহিদা। সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ-ব্যবহার চাই। এমনকি বিলাসিতারও প্রয়োজন আছে বলেছেন বিবেকানন্দ। মুষ্টিমেয়ের মোক্ষলাভের পথকে প্রশস্ত করবার জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারীকে আজীবন অনাহার ও দারিদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত করবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। সেজন্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত ভারতের দারিদ্রমোচনের জন্য বিবেকানন্দ পৌরোহিত্যের অবসান ও উচ্চশ্রেণীর বিশেষ অধিকারের অবসান চেয়েছেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন: 'আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, ফলে আমরা এই অপূর্ব ধর্ম পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি কঠিন শৃঙ্খল পরাইলেন। এককথায়... আমাদের সমাজ ভয়াবহ, পৈশাচিক। ...স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। ... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্যরূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে।'[২০৫] এখানে সর্বপ্রকার সামাজিক শৃঙ্খল-মুক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন বিবেকানন্দ। জনসাধারণের স্বাধীন বিকাশের পরিপন্থী যা-কিছু অর্থাৎ জাতিভেদ, পৌরোহিত্য-চক্রের সৃষ্ট অধিকারীভেদ—এ সকলের অবসান চেয়েছেন এখানে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভিমত দিয়েছেন: 'যে-সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত।'[২০৬] অভিজাত ও জমিদার শ্রেণী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন: 'যাহারা দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়াছে, উহাদের অর্জিত অর্থে নিজেরা শিক্ষালাভ করিয়াছে, এমনকি, যাহাদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তির সৌধ দরিদ্রের দুঃখদৈন্যের উপরই নির্মিত...।'[২০৭] তিনি এই সকল বিশেষ সুবিধাভোগীদের উপর নির্মম কশাঘাত করে বলেছেন: 'তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি...তোমরা শূন্যে বিলীন হও...।'[২০৮] তিনি চেয়েছেন সম্পূর্ণ এক নূতন সমাজ যেখানে সকলের একই অধিকার থাকবে। একটি চিঠিতে লিখছেন অত্যন্ত জোরালো ভাষায়: 'আমি আমূল পরিবর্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরব, পরিবর্তনবিরোধী থসথসে জেলি মাছের মতো ঐ বিরাট পিণ্ডটার কিছু করতে পারি কি না দেখতে। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতন করে আরম্ভ করব—একেবারে

২০৪। তদেব, পৃঃ ৪০-১ ২০৫। তদেব ২০৬। তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২৪
২০৭। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৫ ২০৮। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮১-২

সম্পূর্ণ নূতন, সরল অথচ সবল—সদ্যোজাত শিশুর মতো নবীন ও সতেজ।'[২০৯] হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি লেখেনঃ 'দুষ্ট ও চতুর পুরুতরা যত সব অর্থহীন আচার ও ভাঁড়ামিগুলোকেই বেদের ও হিন্দুধর্মের সার বলে তাদের শেখায় (কিন্তু মনে রাখবেন যে, এসব দুষ্ট পুরুতগুলো বা তাদের পিতৃ-পিতামহগণ গত চারশ-পুরুষ ধরে একখণ্ড বেদও দেখেনি।); সাধারণ লোকেরা সেগুলি মেনে চলে আর নিজেদের হীন করে ফেলে। কলির ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসদের কাছ থেকে ভগবান তাঁদের বাঁচান!'[২১০] এই পুরোহিত, অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর শোষণের ফলে দরিদ্রগণ আরও দরিদ্র হয়েছে। সেজন্য বিবেকানন্দ চেয়েছেন এই সকল শ্রেণীর কবলমুক্ত সমাজ।

তৃতীয়ত ভারতে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য শিক্ষার প্রসারের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেছেনঃ 'জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবনগঠনের পন্থা।...সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। ...প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইবার জন্যই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে। ...দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে (অর্থাৎ নিজেরা শিক্ষালাভে তৎপর না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যাইতে হইবে।'[২১১]

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিবিধান ও শিক্ষাবিস্তার ছাড়া তিনি ভারতের দারিদ্র দূরীকরণের জন্য আরও যে যে উপায়ের কথা বলেছেন সেগুলি হলঃ

১। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা সহায়ে শিল্প-সম্প্রসারণ। এ-বিষয়ে বিবেকানন্দের পরিকল্পনা একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

২। ছোট বহরের শিল্পের সম্প্রসারণ। এ-বিষয়টিও পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

৩। ছোট জোতে মোটামুটিভাবে কৃষিকর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখা যাতে বহু লোক নিযুক্ত থাকতে পারে। এ-বিষয়টিও পূর্বে আলোচিত।

৪। বাণিজ্যের বিশেষ করে বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। এ-বিষয়ে তাঁর নিজস্ব একটি পরিকল্পনা ছিল যেটি ব্যক্ত করে তিনি বলেছেনঃ 'ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে (তাঁর পরিকল্পিত কর্মকেন্দ্র) কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখানো যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে। ঐ কর্মশালার মাল বিক্রয় যাহাতে ইউরোপে ও আমেরিকায় হয়, তজ্জন্য উক্ত দেশসমূহেও সভা স্থাপনা হইয়াছে ও হইবে।'[২১২] ছোট ছোট উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বহু লোকের দ্রুত কর্মসংস্থান হবে এবং উৎপাদিত দ্রব্যগুলি রপ্তানি করে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হবে—এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা।

২০৯। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩ ২১০। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৪০
২১১। তদেব, পৃঃ ৪৩৫-৩৬ ২১২। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৬

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিণাম—দারিদ্র ঃ

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সমাজে মুষ্টিমেয়ের আধিপত্যের ভয়াবহ পরিণামও উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন, বলেছেন ঃ 'দেশের সব ধন, সব ক্ষমতা অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের হাতে ; তাহারা নিজেরা কোন কাজ করে না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারী দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার ক্ষমতা রাখে। এই ক্ষমতাবলে তাহারা সমগ্র পৃথিবী রক্তস্রোতে প্লাবিত করিতে পারে। ধর্ম ও অন্যান্য যাহা কিছু, সবই তাহাদের পদতলে। তাহারাই সর্বেসর্বা শাসনকর্তা। পাশ্চাত্যজগৎ মুষ্টিমেয় "শাইলকে"র শাসনে পরিচালিত হইতেছে। আপনারা যে প্রণালীবদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পার্লামেন্ট-মহাসভা প্রভৃতির কথা শোনেন—সেগুলি বাজে কথামাত্র। পাশ্চাত্যদেশ শাইলকগণের অত্যাচারে আর্তনাদ করিতেছে...।'[২১৩] এ উক্তিটির তাৎপর্য ঃ এর মধ্যে দারিদ্রের একটি কারণ উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং সে কারণটি হল বর্তমান ধনিক সভ্যতায় মুষ্টিমেয়ের বিশেষ সুবিধাভোগের সুযোগ যার ফলে দরিদ্ররা বঞ্চিত হয়, পুনরায় যার ফলে তারা দরিদ্রতর হয়। এখানে তাঁর চিন্তার সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 'দরিদ্ররা দরিদ্রতর হবে'—এ কথাটি মার্কসও ব্যবহার করেছেন একই প্রসঙ্গে। বিবেকানন্দ বেদান্তের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে এই বিশেষ সুবিধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন, বলেছেন ঃ 'একই শক্তি তো সকলের মধ্যেই বিদ্যমান ; কোথাও সেই শক্তির অধিক প্রকাশ, কোথাও বা কিছু অল্প প্রকাশ। একই শক্তি সুপ্তাকারে প্রত্যেকের মধ্যেই রহিয়াছে। অধিকারের দাবি তবে কোথায় ?'[২১৪] আরও বলছেন তিনি ঃ ' ...যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম-নির্মাণ দ্বারা অসাধারণ শক্তি সঞ্চিত হইতেছে এবং এমন সব অধিকার দাবি করা হইতেছে, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কখনও করা হয় নাই। এই কারণেই বেদান্ত এই অধিকারবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে চায়, মানবাত্মার উপর এই উৎপীড়ন চূর্ণবিচূর্ণ করিতে চায়।'[২১৫]

উন্নয়নের অর্থনীতি ও স্বামী বিবেকানন্দ ঃ

আজকের অর্থনীতি-শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা আলোচিত শাখা হল 'উন্নয়নের অর্থনীতি'। এই শাখাটি গড়ে উঠেছে একেবারে হাল আমলে। তবুও আমরা দ্রুত এরই মধ্যে এর ধারণাসমূহকে বেশ পালটাতে দেখেছি। প্রথমদিকে উন্নয়নের মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হত একমাত্র মাথাপিছু জাতীয় আয়বৃদ্ধির পরিমাণ (Per capita GNP growth)। ক্রমে সত্তরের দশকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দারিদ্রের পরিমাণ কমানো, বেকারত্ব হ্রাস করা, আর বণ্টনে বৈষম্য যথাসম্ভব কমিয়ে আনা প্রভৃতি। অতি সম্প্রতি একথাও স্বীকৃত হয়েছে যে, উন্নয়ন বলতে একমাত্র আর্থিক উন্নয়ন বোঝায় না এবং আর্থিক উন্নতিও একমাত্র অর্থনৈতিক শক্তিগুলির উপর নির্ভর করে না। উন্নয়ন একটি সামগ্রিক

২১৩। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫০-১ ২১৪। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮
২১৫। তদেব, পৃঃ ৩৪০

ব্যাপার। আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নানা দিকে, প্রথা-প্রতিষ্ঠানসমূহে, মূল্যবোধে, দৃষ্টিভঙ্গিতে একই সঙ্গে একই সময়ে যে সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটে তাকেই আজকের দিনে 'উন্নয়ন' বলে অভিহিত করা হয়। এ-প্রসঙ্গে Michael Todaro-র নিম্নলিখিত উক্তিটি বিশেষ আলোকপ্রদ ঃ 'Development must...be conceived of as a multi-dimensional process, involving changes in structures, attitudes and institutions as well as the acceleration of economic growth, the reduction of inequality and eradication of absolute poverty.'[২১৬] Denis Goulet এবং Todaro উভয়েই বলেছেন যে, ব্যক্তি ও সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজনসিদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এক অপূর্ণ অক্ষম ব্যবস্থা থেকে অধিকতর 'উত্তম' বা 'সন্তোষজনক' ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়ার নামই 'উন্নয়ন'।

উন্নয়নের সংজ্ঞা ঃ

এখানে প্রশ্ন তুলেছেন Todaro 'উত্তম' ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় ? এ প্রশ্ন চিরন্তন। তিনি সঙ্গতভাবেই বলেছেন যে, 'উত্তম' বা 'ভাল'র ধারণা যুগে যুগে বদলায়। এক যুগের 'ভাল' অপর যুগে 'ভাল' বলে না-ও বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু Goulet অতি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাসহায়ে এ-ও দেখিয়েছেন যে, 'উত্তম' বা 'ভাল'র ধারণা যতই পরিবর্তিত হোক না কেন, তিনটি মূল বস্তু আছে যা সর্বকালে ও সর্বদেশে 'ভাল'র সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।[২১৭]এই তিনটি মূল্যবোধ হল 'জীবন-রক্ষা' (Life-sustenance), 'আত্ম-মর্যাদা' (Self-esteem) ও 'স্বাধীনতা' (Freedom)। এই তিনটির একটিকেও বাদ দিলে কোনকালেই মানুষের 'ভাল' বা কল্যাণ হতে পারে না। এই তিনটির কোন একটির অভাব ঘটলে 'উন্নয়ন' সম্পন্ন হয় না।

১। জীবন-রক্ষা ঃ

প্রথমত যে-কোন সমাজব্যবস্থাকে 'উত্তম' বলে বিবেচিত হতে হলে প্রথমেই তাকে জীবন-রক্ষার উপযোগী খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা সমাজের সকলের জন্যই করতে হবে। সমাজে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রয়োজন হয় এই কারণেই। এগুলি করায়ত্ত না হলে মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিগুলির বিকাশ হতে পারে না। সেজন্য Todaro বলেছেন ঃ 'Without sustained and continuous economic progress at the individual as well as societal level, the realization of the human potential would not be possible.'[২১৮] মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি, দারিদ্র

২১৬। Economics for a Developing World—Michael P. Todaro, Longman Group Limited, London, 1979, p. 96

২১৭। ibid. ২১৮। ibid., p. 97

দূরীকরণ, কর্মে নিয়োগ বৃদ্ধি, আয়-বৈষম্য কমানো এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ঘটাতে হবে এবং তারজন্য চাই নিরন্তর অর্থনৈতিক প্রয়াস। কিন্তু এগুলিই উন্নয়নের একমাত্র মানদণ্ড নয়। এগুলি হচ্ছে উন্নয়নের প্রথম ধাপ।

২। আত্ম-মর্যাদা ঃ

প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করলেই যে প্রশ্নটি ওঠে সেটি হল ব্যক্তির মর্যাদার। সেজন্য Goulet ও Todaro বলেছেন, 'মানুষ' হিসাবে মানুষের মর্যাদালাভ (self-esteem) 'উত্তম' ব্যবস্থা বা উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সত্যই প্রত্যেক মানুষের যেমন বাঁচার জন্য খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, কর্ম ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা চাই, ঠিক তেমনিই চাই প্রতিটি মানুষের এই মর্যাদাবোধে জাগ্রত হওয়া যে, 'আমারও একটি স্বতন্ত্র মূল্য' আছে। এ বোধে যখন মানুষ জাগ্রত হয় তখনই সে নিজেকে নিজে সম্মান করতে পারে, তখনই তার পক্ষে বেঁচে থাকাটা অর্থবহ হয়ে ওঠে। যার কোন সম্মান নেই, নিজের কাছে ও অপরের কাছে, তার পক্ষে বেঁচে থাকা নিরর্থক; সে থাকে জীবন্মৃত হয়ে।

একথা শুধু ব্যক্তির পক্ষেই সত্য নয়, গোষ্ঠী ও সমাজের পক্ষেও একান্ত সত্য। প্রতিটি গোষ্ঠীর ও সমাজের কালক্রমে কিছু নিজস্ব মূল্য গড়ে ওঠে, এর জন্য সব সমাজে সচেতন বা অচেতনভাবে নিরন্তর প্রয়াস চলে, চলে বহু সাধনা, বহু ব্যক্তিগত ও যৌথ ত্যাগস্বীকার। এই যে নিজস্ব সম্পদ, সে-সম্বন্ধে সচেতনতা, গৌরববোধ, তার জন্য কঠিন সাধনা ও ত্যাগস্বীকার—এর মধ্য দিয়েই তার স্বীকৃতি, তার পরিচয়। এর জন্যই তারা স্বতন্ত্র ও শ্রদ্ধার্হ। এই যে তাদের অস্তিত্বের সারথি এই বস্তুটি, এর অপর নাম 'সংস্কৃতি'। এ সংস্কৃতি-সম্পদের বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রূপ, কিন্তু প্রত্যেকের নিকটই এর মূল্য অপরিসীম। তার স্বীকৃতি, তার পরিচয়, তার মূল্য, তার মর্যাদা—সব এরই উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু আজকের তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলি অর্থনৈতিক সম্পদসৃষ্টির দক্ষতায় ও কলাকুশলতার জ্ঞানে উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির সংস্পর্শে এসে এক মহাবিভ্রান্তির কবলে পড়েছে। এই আর্থিক দিক থেকে উন্নত দেশগুলির প্রভাবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি-সম্পদের মূল্য সম্পর্কে গৌরববোধ হারিয়ে যাচ্ছে। তারা সঙ্গে সঙ্গে হারাচ্ছে আত্ম-মর্যাদাবোধ (self-esteem), যা তাদের অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। এ বিভ্রান্তির কারণ ঃ আজকের উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির ইন্দ্রিয়ানুগ (sensate) সভ্যতার মানদণ্ডে আর্থিক সমৃদ্ধিই মর্যাদার একমাত্র উৎস। যতদিন পর্যন্ত বিশ্বে ঐহিক সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েরও যথেষ্ট মর্যাদা ছিল, ততদিন পর্যন্ত এই সকল দেশের দারিদ্র সত্ত্বেও নিজেদের হীন মনে করবার কোন কারণ ছিল না। আজ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি নিজেদের বিচার করছে পাশ্চাত্যের দৃষ্টি দিয়ে, ঐহিক সম্পদের মূল্যমানে। ফলে তারা নিজেদের হীন মনে করছে। যে-দেশে দারিদ্র আছে তার কোন সম্মান আজকের বিশ্বে নেই। থাক না তার উন্নত দর্শন-ধর্ম-কাব্য-শিল্পকলা। সে সভ্যতা যদি

বুদ্ধ বা কনফুসিয়াসকেও সৃষ্টি করে থাকে তাতেই বা কি? এ দেশগুলি নিজেরাও 'বুদ্ধ' বা 'শঙ্করে'র দেশ বলে, কিংবা অনন্য জীবনসাধনা, ধর্ম-দর্শন-চিন্তা, শিল্পকলার অসামান্য দক্ষতা সত্ত্বেও নিজেদের শ্রদ্ধা করতে পারছে না। কারণ, তাদের প্রতি পূর্বোক্ত 'উন্নত' পাশ্চাত্য দেশগুলি নাসিকা কুঞ্চিত করেই দৃষ্টিপাত করে থাকে। সেজন্যই, অর্থাৎ এই উন্নত দেশগুলির চোখে মর্যাদা লাভের জন্যই আজ স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে আর্থিক উন্নতির জন্য আপ্রাণ প্রয়াস চলেছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, যদি আর্থিক উন্নতি লাভ করতে গিয়ে কোন জাতি তার সংস্কৃতি-সম্পদ হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে তার নিজস্ব মূল্য, তার গৌরব করার মতো কোন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যদি আর নাই থাকে, বিশ্বের নিকট সম্মান সে পাবে কি?

৩। স্বাধীনতা ঃ

তৃতীয় ও শেষ বস্তুটি যা Goulet এবং Todaro-র মতে সর্বকালে সর্বদেশে সব 'ভাল' ব্যবস্থার ভিত্তিমূল বলে বিবেচিত, তা হল 'স্বাধীনতা'। 'স্বাধীনতা' বলতে এঁরা কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বোঝেননি। এঁদের মতে এ স্বাধীনতা বলতে বোঝায় সর্বপ্রকার দাসত্ব হতে মুক্তি—মানুষের নিকট মানুষের দাসত্ব, মানুষের সমাজের নিকট দাসত্ব, অজ্ঞানতার দাসত্ব, এমনকি প্রকৃতির নিকট দাসত্ব হতে যে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, তাকেই এঁরা 'স্বাধীনতা' বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। Todaro-র ভাষায় ঃ 'Freedom here is not to be understood in the political orideological sense, but in the more fundamental sense of freedom or emancipation from alienating material conditions of life and freedom from the social servitudes of men to nature, ignorance, other men, misery, institutions and dogmatic beliefs.'[২১৯]

দেখা যাচ্ছে যে, এঁদের চিন্তায় 'স্বাধীনতা' এক ব্যাপক ও মৌলিক অর্থে ধরা দিয়েছে—সর্বপ্রকার দাসত্ব হতে মুক্তি যার মূলকথা। এ স্বাধীনতার ফল কি? এর ফলে মানুষের স্বেচ্ছা-নির্বাচনের পরিধি বেড়ে যায়। দারিদ্র দূর হলে এ স্বাধীনতা অনেকাংশে লভ্য হয়। সম্পদ মানুষকে অধিক অবসরের সুযোগ করে দেয়, যার ফলে সে বেছে নিতে পারে জীবনের পছন্দমতো নিজস্ব পথ—ঐহিক ভোগের পথ কিংবা ভোগ পরিহার করে আধ্যাত্মিক চিন্তামগ্নতার জীবন। আর্থিক উন্নয়ন ও স্বাধীনতার মধ্যে এই যে সম্পর্ক এর উপর জোর দিয়ে Arthur Lewis বলেছেন ঃ 'The advantage of economic growth is not that wealth increases happiness, but that it increases the range of human choice.'[২২০]

২১৯। ibid.

২২০। The Theory of Economic Growth—W. Arthur Lewis, George Allen & Unwin Ltd., London, 1955, p. 420

অর্থাৎ সম্পদসৃষ্টিই যে সুখ বৃদ্ধি করে তা নয়, কিন্তু সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মানুষের নির্বাচনের পরিধি বেড়ে যায়, সেটি মানুষের মুক্তি বা স্বাধীনতার পথকে প্রশস্ত করে। আর্থিক উন্নতির মূল্যই এইখানে যে, সম্পদসৃষ্টির মাধ্যমে তা মানুষের নির্বাচনের পরিধিকে বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু তার নির্বাচন বাড়াবার অধিকারেরও স্বীকৃতি চাই, নতুবা সবই বৃথা। এজন্য চাই সমাজের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উন্নয়নের তিনটি মূল লক্ষ্য ঃ

১। মানুষের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা (self-sustenance)।

২। প্রতিটি মানুষ ও গোষ্ঠীর আত্মমর্যাদা লাভ (self-esteem)।

৩। প্রতিটি মানুষের সর্বপ্রকার দাসত্ব হতে মুক্তি (Freedom from servitude)।

উন্নয়নের পূর্ণ তাৎপর্য ঃ

মানুষ যেন অভাবমুক্ত হয়ে স্বকীয় মূল্য অনুভব করে স্ব-নির্বাচিত পথে নিজ সুপ্ত শক্তিসমূহের বিকাশ সাধন করতে পারে। সে যেন কোনমতেই অপরের ইচ্ছার বাহক না হয় বা অপরের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত বা শোষিত না হয়। এই হল উন্নয়নের পূর্ণ তাৎপর্য।

মনে রাখতে হবে 'ভাল'র এই তিনটি উপাদানই সমান গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যেকটিরই সমান প্রয়োজন যদি কোন সমাজব্যবস্থাকে সত্যসত্যই 'উত্তম' সমাজব্যবস্থায় পরিণত হতে হয়। কারণ বাঁচতে হলে মানুষের যতখানি প্রয়োজন আহার, আশ্রয়, কর্ম ও নিরাপত্তার, ঠিক ততখানিই প্রয়োজন তার স্বতন্ত্র মর্যাদার ও স্বাধীনতার। প্রথমটি পাওয়ার জন্য যদি বিনিময়ে মানুষকে স্বতন্ত্র মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে হয় তাহলে মানুষের 'ভাল' হয় না, মানুষ সে অবস্থায় সুখী হয় না, তাকে সে কাম্য মনে করে না।

অধ্যাপক Dudley Seers বলেছিলেন, কোন দেশের উন্নয়ন ঘটেছে কিনা বুঝতে হলে দেখা দরকার তিনটি প্রশ্নের উত্তর সঠিক মিলেছে কিনা। প্রশ্ন তিনটি হল ঃ

১। দারিদ্র কমেছে কিনা ?

২। বেকারত্ব ঘুচেছে কিনা ?

৩। বৈষম্য কমেছে কিনা ?

মাথাপিছু আয় বাড়লেও এ তিনটির একটিরও যদি উত্তর নঞর্থক (negative) হয়, তাহলে Seers-এর মতে উন্নয়ন হয়নি বুঝতে হবে।[২২১]

Todaro বলছেন Seers যে প্রশ্ন তৈরী করেছেন তাকে নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করা প্রয়োজন কোন দেশ উন্নতি লাভ করেছে কিনা দেখতে হলে ঃ

১। মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মিটেছে কিনা সেদেশে ?

২২১। Economics for a Developing World, p. 95

২। তার যথোচিত মর্যাদালাভ ঘটেছে কিনা, তার স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি অন্য দেশের কাছে ও নিজের কাছে লভ্য হয়েছে কিনা?

৩। সেদেশের মানুষের সর্বপ্রকার দাসত্ব হতে মুক্তি আর্থিক উন্নতি এনে দিতে পেরেছে কিনা?

যদি কোন দেশে প্রথম প্রশ্নটির উত্তর ইতিবাচক হয়, বাকি দুটির উত্তর নেতিবাচক হয়, তাহলে সেদেশ আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত হলেও সেদেশ যথার্থ উন্নত দেশ নয়। Todaro-র মতে আজকের তথাকথিত অনেকগুলি উন্নত দেশের এদিক দিয়ে 'অনুন্নত' বলেই বিবেচিত হওয়া উচিত। এই অভিমত প্রকাশ করে Todaro বলছেন : 'In this sense, it is more proper to refer to the rich nations of the world as "economically developed" and reserve judgement as to whether they are actually developed to a more thorough-going social, political and cultural analysis.... if people feel less self-esteem, respect or dignity and if their freedom to choose has been constrained, then even if the provision of life-sustaining goods and improvements in levels of living are occuring, it would be misleading to call the result "development" '[২২২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের তিনটি শর্ত :

১। আর্থিক নিরাপত্তা

২। জাতীয় মর্যাদা

৩। পূর্ণ স্বাধীনতা

এই তিনটি যেদেশের করায়ত্ত একমাত্র সেদেশেই 'উন্নয়ন' ঘটেছে। শুধু আর্থিক সম্পদ সৃষ্টিতে দক্ষ দেশ যথার্থ উন্নত দেশ নয়। এ মত আজকের 'উন্নয়ন' বিশেষজ্ঞদের।

'উন্নয়ন' সম্পর্কে বিবেকানন্দের ধারণা :

আশ্চর্যের বিষয় উনিশ শতকের শেষে স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দারিদ্র-অধ্যুষিত দেশগুলির উন্নয়ন সম্পর্কে যে চিন্তা রেখে গিয়েছেন তা অনেকাংশে Todaro, Goulet ও Seers-এর চিন্তার অনুরূপ। অনেকেই হয়তো একথা মানতে চাইবেন না। কারণ 'উন্নয়নের অর্থনীতি' শীর্ষক অর্থনীতি-শাস্ত্রের শাখাটি তখনও গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, উন্নয়নের অর্থনীতির জন্মসূত্র মার্কসীয় চিন্তার মধ্যে পাওয়া যায়। যদি মার্কসের মধ্যে এ-বিষয়ে আগাম চিন্তা পাওয়া যায়, বিবেকানন্দের মধ্যেই বা তা পাওয়া যাবে না কেন? আর সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি—বিবেকানন্দ নামক অনন্য প্রতিভার কাছে কিছুই অসম্ভব ছিল না কারণ ইতিহাস ও অর্থনীতি-শাস্ত্রেও

২২২। ibid., p. 98

বিবেকানন্দের প্রজ্ঞা বিস্তৃত ছিল। বিবেকানন্দের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ-বিষয়েও তিনি অগ্রগামী চিন্তা রেখে গিয়েছেন।

ভারতভ্রমণকালে বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেন যে, ভারতের জনগণের ভয়াবহ দারিদ্র দূরীকরণ ব্যতীত তাদের কোনপ্রকার উন্নতি সম্ভব নয়। এসময় তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেন ঃ 'আমি সমস্ত ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি।...কিন্তু, ভাই, সর্বত্রই আমি জনসাধারণের ভয়াবহ দুঃখ-দারিদ্র স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিয়া আকুল হইয়াছি, চোখের জল বাধা মানে নাই! আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, প্রথমে ইহাদের দুঃখ-দারিদ্র দূর না করিয়াই ইহাদিগকে ধর্মের কথা শোনাইয়া কোন লাভ হইবে না। এই কারণেই—জনসাধারণের মুক্তির অন্যতর উপায়ের সন্ধানেই—আমি এখন আমেরিকা চলিয়াছি।'[২২৩]

তাঁর বিভিন্ন রচনায় বিবেকানন্দ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমান উন্নয়ন চেয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান চেয়েছেন, দারিদ্র দূরীকরণের উপর জোর দিয়েছেন এবং এজন্য উন্নত দেশগুলির দায়ের কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আমরা দেখেছি ভারতের দারিদ্র দূরীকরণের জন্য আরও চেয়েছেন অভিজাত ও পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্যের অবসান। অপরদিকে চেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞান ও উন্নত কলাকুশলতার প্রয়োগে ব্যাপক শিল্পোদ্যোগ আর তার জন্য চেয়েছেন প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রসার। এ জনবহুল দেশে যেখানে বেকার ও অর্ধ বেকারের সংখ্যা অগণিত সেখানে ছোট বহরের শিল্পের প্রসার ও ছোট জোতের চাষের উন্নয়নের উপর তিনি জোর দিয়েছেন দ্রুত কর্মপ্রবাহ সৃষ্টির জন্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উন্নয়নের যে প্রথম শর্ত অর্থাৎ আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা সে-সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। উনিশ শতকের ভারতে এ-বিষয়ে এমন গভীর চিন্তা আর কোনও চিন্তাবিদের নেই।

কিন্তু বিবেকানন্দ কেবলমাত্র দারিদ্র দূরীকরণ ও নিছক আর্থিক নিরাপত্তা সৃষ্টির কথাই বলেননি। স্বল্পোন্নত দেশগুলি যেগুলি আজ তৃতীয় বিশ্বের দেশ নামে খ্যাত সে দেশগুলির সাংস্কৃতিক মর্যাদা সংরক্ষণের উপরও প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছেন, অর্থাৎ যেটি আমরা দেখলাম উন্নয়নের দ্বিতীয় শর্ত তার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির সংস্পর্শে এসে বিভ্রান্ত ভারতকে তিরস্কার করে তিনি বলেছিলেন ঃ 'হে ভারত, এই পরানুবাদ,...পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?' এখানে সুস্পষ্ট তাঁর এ ইঙ্গিত যে, অগ্রগতির অন্যতম শর্ত নিজস্ব সংস্কৃতি-সম্পদে গৌরব বোধ করা। তাঁর মত ঃ প্রত্যেক জাতিরই কিছু নিজস্ব মূল্য আছে, তা উপলব্ধি করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলে সে আরও অগ্রসর হতে পারবে। ভারতের ক্ষেত্রে তিনি মনে করতেন ভারতের স্বাতন্ত্র্য, ভারতের মহিমা ও গৌরব ভারতের অধ্যাত্মভিত্তিক সম্পদে। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত দেশগুলির নিকট মাথা নত করে নয়, মাথা বেশ উঁচু করেই ভারত তাদের কাছ থেকে প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে,

২২৩। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, পৃঃ ২৭

কারণ বিনিময়ে তারও কিছু দেবার আছে—তার অধ্যাত্মবিদ্যার জ্ঞান। সুতরাং বিনিময় হবে সমানে সমানে। ফলে উভয় ভূখণ্ডই সমৃদ্ধ হবে, অধিকতর উন্নত হবে—এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। তিনি পাশ্চাত্যের উদ্দেশে এ পরিকল্পনা ব্যক্ত করে বলেছিলেন: আমাদের আপনারা যন্ত্রবিদ্ প্রেরণ করুন, যাতে আমরা আমাদের হাতের ব্যবহার করতে পারি। আমরা আপনাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য প্রচারক পাঠাবো।

কিন্তু শুধু ভারতেরই নয়, পৃথিবীর সকল উন্নত ও অনুন্নত জাতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাদের প্রত্যেকটির যে স্বতন্ত্র মূল্য ও মর্যাদা আছে তা উচ্চকণ্ঠে সর্বদা ঘোষণা করতেন। নিবেদিতা বলেছেন: এইভাবে, স্বামীজীর দৃষ্টিতে প্রত্যেক জাতির জাতীয়ত্ব বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ন্যায় পবিত্রতাস্বরূপ বলে গণ্য হত। তাঁর মতে, প্রত্যেকেই যেন আদর্শ মানবত্ব সম্পর্কে নিজের ধারণা প্রকাশ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।[২২৪] নিবেদিতা আরও দেখিয়েছেন যে, বিবেকানন্দ বিভিন্ন জাতিকে দেখতেন যেন ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের মতো, কোন অধ্যায়কে বাদ দিয়ে ইতিহাসকে বোঝা যায় না। প্রতিটি জাতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন তিনি, যথাযথ মূল্যও দিয়েছেন তাকে। তাঁর মতে: স্বদেশপ্রেমের জন্য জাপানী, পবিত্রতার জন্য হিন্দু আর বীরত্বের জন্য ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ। ইংরেজদের অপেক্ষা মানবের মহিমা অন্য কোন জাতি এত অনুভব করেনি।[২২৫] 'আর্য ও তামিল' শীর্ষক রচনায় বিবেকানন্দ বিষয়টি আরও প্রাঞ্জল করে দেখিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন: '...আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি; এ পর্যন্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্য আমরা গর্বিত, এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল পূর্বপুরুষগণের জন্য আমরা গর্বিত, মানবজাতির যে আদিপুরুষেরা প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ফিরিতেন, তাঁহাদের জন্য আমরা গর্বিত...।'[২২৬]

যেমন প্রতিটি মানবগোষ্ঠী—ছোট-বড়, আর্য-অনার্য, আদিম, উন্নত-অনুন্নত প্রত্যেকে—স্বতন্ত্র মূল্যভূষিত বলে মনে করতেন বিবেকানন্দ, তেমনি প্রতিটি মানুষের অপরিসীম মহিমা সম্পর্কে তিনি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। তাঁর কথা: 'মনুষ্যত্ব-স্বভাবের মহত্ত্ব কখনও ভুলো না। ঈশ্বর অতীতে যা হয়েছেন, ভবিষ্যতে যা হবেন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আমরাই। "আমি"ই সেই অনন্ত মহাসমুদ্র—খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ তারই উপরে তরঙ্গ-মাত্র।'[২২৭] তাঁর মতে সকলেই এই দিব্যসত্তাসম্পন্ন, কারও মধ্যে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, কারও মধ্যে তা সুপ্ত আছে। সেজন্য কোন মানুষ অপরের দ্বারা শোষিত হবে বা চালিত হবে, অপরের দাসত্ব করবে—এ তাঁর পক্ষে অসহ্য ছিল। সেজন্য মানুষের তৈরী প্রতিটি শৃঙ্খল তিনি ভেঙে চুরমার করে দিতে চেয়েছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন: 'মানুষের দুঃখ-বেদনাকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার সকল গর্ব, উচ্চাশা, প্রেম,

---

২২৪। The Master as I saw him, p. 195 ২২৫। ibid., p. 196

২২৬। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩

২২৭। তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ২৯১

বিশ্বাস, বিজ্ঞান, কর্ম, তাঁহার সকল শক্তি ও সকল কামনা মানুষের সেবায় একই সঙ্গে নিয়োজিত হইল এবং সেগুলি একটিমাত্র অগ্নিশিখায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ঃ "আমি এমন একটি ধর্ম চাই, যাহা আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগাইবার, দরিদ্র জনসাধারণকে অন্ন ও শিক্ষা দিবার, আমাদের চতুষ্পার্শ্বের সকল দুঃখ-বেদনাকে দূর করিবার শক্তি আনিয়া দিবে"।'[২২৮]

শুধু ভারতের নয় বিশ্বের সর্বত্র শোষিত নরনারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার জন্য তাঁর হৃদয় অগ্নিময় হয়ে উঠেছিল। সাম্প্রতিক এক গ্রন্থে চীনের হূয়াং জিন চুয়ান এ-বিষয়ে লিখেছেন ঃ বর্তমান চীনে বিবেকানন্দ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও সমাজসেবী রূপে পরিচিত। তাঁর দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা এবং বীর্যদীপ্ত দেশপ্রেম কেবল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেই উদ্বুদ্ধ করেনি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল।... সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের পেষণে নিপীড়িত চীনদেশের জনসাধারণের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ছিল অসীম সহানুভূতি। তিনি তাদের সম্পর্কে বিরাট আশা পোষণ করেছেন।[২২৯] রুশদেশের ই. পি. চেলিশেভও অনুরূপ প্রতিবেদনে বলেছেন ঃ ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে রুশদেশের অধিবাসীগণ যারা এখন রুশদেশে প্রকাশিত বিবেকানন্দের রচনাবলীর সঙ্গে অধিক পরিচিত, তারা ভারতের এই সুমহান দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী, গণতন্ত্রের পূজারী ও তাঁর দেশের মানুষদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, সমগ্র মানবসমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যিনি নিরন্তর আপোষহীন সংগ্রাম করেছিলেন তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে।[২৩০] সমগ্র শোষিত মানুষদের উদ্দেশে স্বামীজীর অগ্নিময় আহ্বান নিম্নোক্তরূপ ঃ 'হ্যাঁ, জাতি-জন্মনির্বিশেষে, অজ্ঞ, অশক্ত, নরনারী শিশু সকলেই শুনুক ও শিখুক যে, কি শক্তিমান, কি দুর্বল, কি উচ্চ, কি নীচ, প্রত্যেকের মধ্যেই অসীম আত্মা রহিয়াছেন। সুতরাং মহান ও মহৎ হইবার অসীম সম্ভাবনা ও অসীম শক্তি সকলেরই আছে। ...উঠ, দাঁড়াও, নিজেকে জোরের সঙ্গে প্রকাশ কর, তোমাদের মধ্যে যে ভগবান আছেন, তাঁহাকে...অস্বীকার করিও না।'[২৩১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের যে ধারণা বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন সেখানে গোষ্ঠী ও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, মূল্য ও মর্যাদা স্বীকৃতির একটি বড় স্থান আছে। দারিদ্র দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন ক্ষুদ্র বৃহৎ দেশ প্রত্যেকের সংস্কৃতির মূল্য ও ব্যক্তির মর্যাদার স্বীকৃতি। এখানে বিবেকানন্দ Goulet, Seers ও Todaro প্রভৃতি আজকের উন্নয়নের অর্থনীতি-বিশারদদের পূর্বসূরী। বিবেকানন্দ আরও প্রাঞ্জল করে বুঝিয়েছেন যে, গোষ্ঠী

২২৮। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, পৃঃ ৮

২২৯। World Thinkers on Ramakrishna-Vivekananda—Edited by Swami Lokeswarananda, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, Second Edition (1983), pp. 55-6

২৩০। Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume, Swami Vivekananda Centenary Committee, Calcutta, 1963, p. 518

২৩১। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, পৃঃ ১০৭

ও ব্যক্তির মর্যাদাবৃদ্ধি উত্তম সমাজের ও উন্নয়নের অপরিহার্য অঙ্গ।

অনুরূপভাবে বিবেকানন্দ উন্নয়নের তৃতীয় মূল ভিত্তি 'স্বাধীনতা'র উপরও অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষের কোন কল্যাণ সম্ভব নয়। কোনপ্রকার বিকাশ সম্ভব নয়—এই তাঁর সুদৃঢ় মত। এ-বিষয়ে Goulet, Seers ও Todaro প্রভৃতি যা বলেছেন বিবেকানন্দ তা বহু পূর্বেই বলেছেন। চিন্তায় যে তিনি কতখানি অগ্রগামী এ তারই প্রমাণ। স্বাধীনতা বলতে তিনি যে সর্ববন্ধন হতে মুক্তির কথা বলেছেন তা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি হতে বোঝা যায়ঃ 'সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে-বিষয়ে সহায়তা করা...পরম পুরুষার্থ। যে-সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে-সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।'[২৩২] স্বাধীনতা ব্যতীত উদ্ভাবনী বা সৃজনী শক্তির স্ফুরণ সম্ভব নয়। সুতরাং স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষের কোন বিকাশই সম্ভব নয়। সেজন্য অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেনঃ '...বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পার বন্ধন খোল।'[২৩৩] স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা বিবেকানন্দ দিয়েছেন তাতে তিনি স্পষ্ট বলেছেনঃ '...আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে-প্রকার ইচ্ছা সে-প্রকার ব্যবহার করিতে পারিব, ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার; এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের—সকল সামাজিক ব্যক্তির সমান সুবিধা যাহাতে থাকে, তাহাও হওয়া উচিত।'[২৩৪] এই সংজ্ঞা Goulet প্রভৃতি যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার সঙ্গে একেবারে সমার্থক। অথচ বিবেকানন্দ লিখেছেন অনেক বছর আগে।

বিবেকানন্দের দৃঢ় মতঃ 'চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন... চৈতন্যশক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও...কল্যাণকর।'[২৩৫] যে সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই সেখানে ব্যক্তির বিকাশ যে অবরুদ্ধ তার একটি চিত্র তুলে ধরে তিনি বলছেনঃ '...মনোবৃত্তির স্ফূর্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই...উদ্ভাবনী-শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, ...আর এই মৃৎপিণ্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মতো উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্যসমষ্টির দ্বারা যে-সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ? তাহার কল্যাণ কোথায়?'[২৩৬] এদিক দিয়ে প্রাচীন হিন্দুসমাজ ও আধুনিক সর্বাত্মক রাষ্ট্র (Totalitarian State) সমগোত্রীয়, যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত।

উন্নয়ন সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনান্তে আমরা দেখছি যে, উনিশ শতকের শেষভাগে আমাদের দেশে বিবেকানন্দ যে চিন্তা রেখে গিয়েছেন মানবসমাজের উন্নয়ন সম্পর্কে তারই বহুলাংশে প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে আজকের 'উন্নয়ন-শাস্ত্রবিদ্'দের চিন্তায়।

২৩২। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২৪ ২৩৩। তদেব, পৃঃ ১৭২
২৩৪। তদেব, পৃঃ ২৩ ২৩৫। তদেব, পৃঃ ১৭২ ২৩৬। তদেব, পৃঃ ১৭১-৭২

বিবেকানন্দকে যাঁরা আজ সঠিক মূল্যায়ন করতে চান, তাঁদের এদিকে দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য।

আধ্যাত্মিক ও আর্থিক কল্যাণের মধ্যে সম্বন্ধ ঃ

বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার আলোচনার শেষে একটি কথা এখানে বিশেষ উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি মনে করতেন না যে, কেবলমাত্র আর্থিক কল্যাণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করতে পারে। অধ্যাত্ম-আদর্শ-চ্যুত জাগতিক জ্ঞান মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় এবং তখন এসকল সম্পদ তার কাছে মূল্যহীন। এ-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ঃ 'নানা কল-কারখানা করে ঐহিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে পারলেই যে জাতিবিশেষ সভ্য হয়েছে, তা বলা চলে না। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি করে দিচ্ছে...।'[২৩৭] তাঁর মতে অধ্যাত্ম-আদর্শ হতে চ্যুত যে জ্ঞান তা মানুষকে শয়তান করে ঃ '...পবিত্রতা না থাকিলে জ্ঞান ও শক্তির আধিক্য মানুষকে শয়তানে পরিণত করে।'[২৩৮] ঠিক একই কথা বলেছেন আজকের প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী P. A. Sorokin ঃ ইন্দ্রিয়ানুগ (ঐহিক) সভ্যতার মুখ্য ফল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা। কিন্তু এ-সভ্যতা মানুষের অবনতি ঘটায়। লোভ ও মোহের দাস আত্মসংযমহীন মানুষের হাত বিজ্ঞানকে আজ বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছে। আধ্যাত্মিক সভ্যতা মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়, তার দিব্যস্বরূপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সে সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে। আজ সেইজন্য একান্ত প্রয়োজন সেই অধ্যাত্মভিত্তিক সভ্যতার।[২৩৯]

বিবেকানন্দের অবদান ঃ

বিবেকানন্দ মোটের উপর ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে যে কল্পিত ব্যবধান তা ঘুচিয়েছেন। মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য দুটিই প্রয়োজন। তিনি তাঁর গুরুর এই কথাটিতে বার বার আস্থা প্রকাশ করেছেন যে, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'। সেজন্য তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যেও জোর দিয়েছেন ঐহিক উন্নতির সহায়তাকল্পে বিভিন্ন কার্যসূচীর উপর। এই উদ্দেশ্যাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে 'মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহ-বর্ধন...।'[২৪০] তাঁর মতে মানুষের আর্থিক কল্যাণকে রূপ দিতে পারে না এরকম অবাস্তব ধর্মমত মানুষের জীবনে স্থান পেতে পারে না। তাঁর ভাষায় ঃ 'প্রত্যেক ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়া একটা অর্থনৈতিক

২৩৭। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ২০ ২৩৮। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪০

২৩৯। Social and Cultural Dynamics—Pitirim Sorokin, Peter Owen Limited, London, 1957, p. 628 ২৪০। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৫৬

দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। মানুষ নামক জীবের উপর ধর্মের কিছু প্রভাব আছে বটে, কিন্তু অর্থনীতির দ্বারাই সে পরিচালিত হয়।'[২৪১] সুস্পষ্ট বলেছেন আরওঃ 'যখনই কোন ধর্মমত সফল হয়, তখন (বুঝিতে হইবে) অবশ্যই তাহার আর্থিক মূল্য আছে। একই ধরনের সহস্র সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করিলেও যে-সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যা সমাধান করিতে পারে, তাহাই প্রাধান্য লাভ করিবে। পেটের চিন্তা—অন্নের চিন্তা মানুষের প্রথম।'[২৪২]

এ-প্রসঙ্গে ইতি টানবার আগে আরও একটি কথা এখানে না বলে পারা যাচ্ছে না। সেটি হল আজকের দিনের গবেষকদের সঙ্গত ক্ষোভের কথা। বিবেকানন্দের টুকরো টুকরো কথাগুলি জুড়ে অনুভব করা যায় তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা কত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ বেশ বোঝা যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা হারিয়ে গিয়েছে। যাঁরা তাঁর কথা বা বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেছেন, মনে হয় তাঁরা স্বামীজীর অর্থনৈতিক চিন্তার উপর ততটা গুরুত্ব দেননি, যতটা দেওয়া উচিত ছিল। ফলে এ-বিষয়ে গবেষকদের কাজ অত্যন্ত কঠিন হয়েছে এবং তাঁদের দায়িত্বও বেড়ে গিয়েছে। এ দায়িত্বের কথা তাঁদের সবসময় মনে রাখা উচিত। তবে যেসকল কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে তারও মূল্য অপরিসীম। সেগুলি থেকে আমাদের একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিবেকানন্দ উনিশ শতকের ভারতে সবচেয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আধুনিক মনোভাবাপন্ন এবং সমাজ-সচেতন অর্থনীতি-চিন্তাবিদ্। তিনিই একমাত্র ভারতীয় চিন্তাবিদ্ যিনি তখনকার পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল ত্রুটি প্রদর্শন করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই উনিশ শতকে বিশ্বের পটভূমিকায় তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাকে উপস্থাপিত করেছেন।

উপসংহার

নির্যাতিত মানুষ ও বিবেকানন্দঃ

বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে আলোচনার শেষে আমরা ঠিক সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে-সিদ্ধান্তে একদা নিবেদিতা পৌঁছেছিলেন তাঁর বিবেকানন্দ সমীক্ষা-অন্তে। সেটি হল এই যে, বিবেকানন্দের সমগ্র চেতনাকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল 'মানুষ'—বিশেষ করে দুর্বল অসহায় মানুষ। শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর সর্বত্র নির্যাতিত দুর্বল অসহায় মানুষদের মনুষ্যোচিত অধিকার পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ—এই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, তারই জন্য তাঁর সকল চিন্তা, সকল আয়াস, সকল সংগ্রাম। এ লক্ষ্য থেকে মুহূর্তের জন্যও কখনও তিনি চ্যুত হননি। কখনও তাঁর মধ্যে এ লক্ষ্যাভিমুখী প্রয়াস স্তিমিত হয়নি। বারংবার এ

২৪১। তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৪০৭
২৪২। তদেব, পৃঃ ৪০৮

চিন্তার উচ্চ থেকে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করতে তিনি কখনও অক্ষম হননি।[২৪৩]

আজকের যুগের মানুষের সংগ্রাম দুর্বল অসহায় নির্যাতিত মানুষদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির জন্য। বিবেকানন্দের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনায় আমরা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখেছি, এই লক্ষ্যটিকে সম্মুখে রেখেই তিনি ঐগুলিকে রূপ দিয়েছেন। আজ যাঁরাই মানুষের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই এগুলি মহামূল্য রত্নস্বরূপ। এ ধারণাগুলিই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কর্মে পরিণত হচ্ছে। একটু বিচার করলেই তা ধরা পড়ে।

শুধু আজই বা কেন, পৃথিবীতে অনাগত কালেও যখনই মানুষ মানবিক অধিকার উদ্ধারের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হবে তখনই বিবেকানন্দের বাণী ও তাঁর ধ্যানধারণার কাছে মানুষকে আসতে হবে প্রেরণার জন্য, পথ-নির্দেশের জন্য। এগুলির আবেদন বা প্রয়োজন মানুষের কাছে কোনদিনই নিঃশেষ হবে না। এগুলি মানুষের কাছে চিরকালের অমূল্য সম্পদ। এই হল এগুলির মূল্য সম্বন্ধে আমাদের সমীক্ষান্ত শেষ সিদ্ধান্ত।

২৪৩। '...and above all the vindication of Humanity, never abandoned, never weakened, always rising to new heights of defence of the undefended, of chivalry for the weak.' [The Master as I saw him, p. 145]

ইতিহাস ও বিজ্ঞান

স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা

॥ ১ ॥

আক্ষরিক অর্থে স্বামী বিবেকানন্দ হয়তো ঐতিহাসিক নন। ভারততত্ত্ববিদ্ (ইন্ডোলজিস্ট) বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি, সে পর্যায়েও স্বামীজীর আসন নিরূপণ করতে গিয়ে আমাদের দ্বিধা হতে পারে। প্রথমত ও প্রধানত তিনি অধ্যাত্মসাধনার পথে বলিষ্ঠ পথিক। সর্বোপরি তাঁর ছিল অপূর্ব ভারতপ্রেম, তাঁর সমগ্র সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে। আধ্যাত্মিক চিত্রপটে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর জন্মভূমি ও কর্মভূমি ভারতবর্ষকে। সমকালীন বাস্তব ভারতের সকল গ্লানি ও কুশ্রীতাকে প্রত্যক্ষ করে তাঁর যে-ভূমিতে অনন্য উত্তরণ ঘটেছিল, সে ভূমিতেই তিনি অবলোকন করেছিলেন শাশ্বত ভারতকে। আমাদের এই বিশাল দেশের পথে ঘাটে, পাহাড়ে জঙ্গলে, সাগরে মরুভূমিতে, আকাশে বাতাসে এবং নদনদীর নিত্য প্রবহমান ধারায় মহাকালের পদচিহ্নে রচিত ইতিহাসের খোলাপাতায় তিনি তাঁর পাঠ গ্রহণ করেছেন। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ অধ্যয়নের ব্যাপকতা ও গভীরতা এবং অসামান্য মননশীলতা তাঁর অধ্যাত্মচৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করেছে ইতিহাস-সাগরের গভীরে রত্নসন্ধানে।

এখানেই তিনি অভিনব ভারতপথিক। এখানে তাঁর ইতিহাসচেতনার জন্ম। অসামান্য দরদী প্রাণ নিয়ে তিনি পরিব্রাজকের বেশে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পরিক্রমা করেছিলেন, শোষিত-দরিদ্র-পীড়িত দেশবাসীর মর্মন্তুদ বেদনা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। এই প্রাণময় অভিজ্ঞতা স্বামীজীকে একাধারে করে তুলেছে মরমী দেশপ্রেমিক এবং অভিনব ভারততত্ত্ববিদ্। ভারতের পুঞ্জীভূত ক্লেদ ও শত দুর্ভাগ্য তাই তাঁর কাছে মনে হয়েছিল সাময়িক। এবং তার নিরসনকল্পে তিনি এদেশের ইতিহাসের মূলতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও বিন্যাস করেছেন তাঁর রচনাসম্ভারে। ভারতের মহামানবের সাগরতীরে উত্তীর্ণ হয়ে ধ্যাননেত্র উন্মীলন করে তিনি উদ্ঘাটন করেছেন মাতৃভূমির অঙ্কে থরে থরে সাজানো রত্নরাজি, ইতিহাসচেতনার কষ্টিপাথরে যাচাই করে তিনি তাদের বর্তমান ভারতের পক্ষে অবশ্য-গ্রহণীয় বলে চিহ্নিত করেছেন।

অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে আমরা ইতিহাস পাঠ করি। বর্তমান জীবনে অতীত কতটা গ্রহণীয়? তার সঙ্গে উন্নত পশ্চিমের কতটা গ্রহণ করে সমন্বিত করতে পারি? প্রগতির পথে চলার উপাদানসমূহ কোথায় সংগ্রহ করব? এসব প্রশ্নের উত্তর দেয় ইতিহাস। বস্তুত, ইতিহাসপাঠের সার্থকতাই এখানে। স্বামীজীর রচনাবলী অধ্যয়ন করলে, বিশেষ করে ইংরেজিতে লেখা তাঁর মাত্র সাড়ে দশ পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ— 'Historical Evolution of India' (ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ) অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করলে ভারত-ইতিহাসের তথ্যসন্ধানী গবেষকেরাও কিছু নির্দেশিকা লাভ করবেন, সাধারণ পাঠকেরা অবাক হবেন এই ভেবে যে, এত অল্প পরিসরে তিনি এত

কথা বললেন কেমন করে। স্বামীজীর ইংরেজি রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে এই নিবন্ধটি মুদ্রিত রয়েছে।

উক্ত নিবন্ধটিই বর্তমান রচনার অবতরণিকা। স্বামীজীর ইতিহাসচেতনার সামগ্রিক ছবি তুলে ধরার প্রয়াস এ রচনার কৃত্য নয়। স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারত-ইতিহাসের ধারাটিই শুধু স্বল্প পরিসরে বর্তমান লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়। শুধু 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' নামক নিবন্ধে নয়, স্বামীজীর দেশে বিদেশে প্রদত্ত অজস্র (মুদ্রিত) ভাষণের মধ্যে, তাঁর ক্লান্তিহীন লেখনীপ্রসূত পত্র, গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির মধ্যে তাঁর সামগ্রিক ইতিহাসচেতনা বিধৃত হয়ে আছে। এসবের সংকলন ও বিশ্লেষণ সুযোগ্য সম্পাদনায় গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় আমরা প্রতীক্ষারত।

॥ ২ ॥

এদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ঘন তমিস্রার বুকে নিঃশঙ্ক পথ কেটে চলার প্রাথমিক কৃতিত্বের অধিকারী ইউরোপীয় মনীষিগণ। কিন্তু তাঁরা ইতিহাসের রাজনৈতিক দিকটার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করেই আমরা ইতিহাস শিখি, পরীক্ষায় কৃতকার্য হই এবং ইতিহাসবিদ্ বলে গর্ব অনুভব করি। একথা সত্য যে, ভারতের গৌরবময় ঐতিহাসিক অতীত আমাদের জ্ঞাতসারে নিয়ে এসেছেন তাঁরাই। উপকথার ভারে বহুকাল নিমজ্জিত প্রাচীন ইতিকথা তাঁদেরই অধ্যবসায় ও বিশ্লেষণের আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁদের কাছে আমাদের ঋণের অবধি নেই। মোটের উপর এ ধারাতেই চলেছে আজ আমাদের বিরামহীন গবেষণা, তথ্যাদির বিশ্লেষণ, আরও প্রমাণাদির অন্বেষণ এবং বিচারসিদ্ধ মতামতের প্রকাশন। এভাবে আমাদের ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমশ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অবশ্য এসব বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার ব্যাপকতায় ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের খুঁটিনাটিও দ্রুত প্রাধান্য লাভ করছে। আমাদের ইতিহাস আজ আর রাজা উজীর সেনাপতি—এককথায় রাজদরবারের সামগ্রিক কাহিনীতে পর্যবসিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী' হয়তো নয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের এই সামগ্রিকতার দিকে প্রথম গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ঐ দুই মহামনীষী 'নিশীথকালের দুঃস্বপ্নের' পরিবেশেই। এবং রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের্ ধারা' প্রবন্ধটির পূর্বে স্বামীজী রচনা করেছিলেন, 'Historical Evolution of India' নিবন্ধটি। ইতিহাসের তথ্য বিচারে বা ঘটনা বিশ্লেষণে তাঁরা কিন্তু রিসার্চের (ঐতিহাসিক গবেষণার) বাঁধানো রাস্তায় চলেননি। অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তত্ত্বের ব্যঞ্জনায় তাঁরা ভাষা দিয়েছেন ইতিহাসচেতনাকে—কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে করেছেন তত্ত্বের সম্প্রসারণ।

ভারত-ইতিহাসের নানা বিপরীত তরঙ্গে আবর্তিত ঘটনাবলীকে একটি অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম সূত্র বেঁধে রেখেছে। সেই সূত্রটির সন্ধান না পেলে আমাদের ঐতিহাসিক মননরাজ্যে নৈরাজ্য এসে অধিষ্ঠান করবে। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের অনৈক্য, শক্তিহীনতা, শতসহস্র

কলুষ ও ব্যভিচার তখন বিরাট হয়ে দেখা দেবে, ভারত হবে তখন খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ছোট বড় কতকগুলি দেশের সমষ্টিমাত্র, একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞামাত্র। এদেশের অতীতকাল ও মধ্যযুগ মরুভূমির মতো ধু-ধু করবে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, হর্ষবর্ধন, শেরশাহ্, আকবর প্রমুখ পাঁচ-সাতজন শক্তিধর পুরুষ মরুভূমিতে ওয়েসিসের মতো বিরাজ করবেন। যা কিছু আলো, যা কিছু ভাল তা-ই এসেছে সাগর পেরিয়ে ইংরেজ-শাসিত ভারতে, সংহতি ঐক্য ও জাতীয়তাবাদ বিদেশী শাসকদের দান—মনে হবে, আধুনিক ভারত-ইতিহাসের এটাই মূলধন।

কিন্তু এ তো সত্য নয়, যেমন সত্য নয় অন্ধ গোঁড়ামির মতবাদ যে, বাইরে থেকে ভারতের কিছুই নেবার নেই। সত্য রয়েছে এই দুয়ের মাঝখানে। সে সত্যকে জানতে হলে ভারত যে ধারাবাহিকতার সূত্রকে অবলম্বন করে তার সুদীর্ঘ সুপ্রাচীন সভ্যতাকে আজও অব্যাহত রেখেছে, সেই সূত্রটির স্বরূপ সন্ধান করতে হবে। জানতে হবে, ভারতের ভাবগত, আদর্শগত এবং ধর্মগত ঐক্য যুগে যুগে কেমন করে আবর্তিত হয়েছে—রাজনৈতিক অনৈক্যের শত জটিলতাকেও উপেক্ষা করে।

ভারত-ইতিহাসের এই মূলতত্ত্বটি, এই সূক্ষ্ম সূত্রটি স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় প্রতিভাত হয়েছে। তার বিশ্লেষণ-সৌকর্যমানসে তিনটি ছক বা ফর্মুলার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে—ধর্ম, মন্ত্র বা দর্শন এবং সমন্বয় (Religion, Philosophy, and Synthesis)। এ তিনটি অবশ্য একই সূত্রে গ্রথিত—যদিও বাস্তবে তারা প্রয়োজনমতো বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্র বেছে নিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্বামীজী প্রাচীন ভারতকে একটি 'নেশন' বা জাতি বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ 'প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযুগেই মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়।...মুনি-ঋষি এবং আচার্যগণ যে-সকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় জীবন উচ্ছ্বসিত হইত।'[১]

স্বামীজীর উপরোক্ত মন্তব্য ইতিহাসের ছোট বড় কয়েকটি ঘটনার বা অধ্যায়ের পটভূমিতে যাচাই করা যেতে পারে।

মৌর্যযুগের গৌরব তখন লুপ্ত। বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী ও অহিংসা অশোকের পরবর্তী মৌর্যসম্রাটদের কাপুরুষতার ও ক্লীবতার আবরণে পর্যবসিত। আফগানিস্তান থেকে কামরূপ, হিমালয় থেকে প্রায় কন্যাকুমারী পর্যন্ত একদা বিস্তৃত অপূর্ব ও অনন্য মৌর্যসাম্রাজ্য কালক্রমে ভেঙে খান খান হয়ে গেল। উত্তরের সিংহদ্বার ভেঙে একে একে প্রবেশ করে ছোট বড় রাজ্য গড়ে ভারতে বসতি স্থাপন করল বহ্লিক জাতীয় গ্রীক, শক, পহ্লব, কুশাণ প্রভৃতি নানা জাতি। ভিতরে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে সুঙ্গ, কান্ব, চেত, অন্ধ্র বা সাতবাহন এবং তারপর নাগ, বাকাটক প্রভৃতি বংশের মধ্যে। রাজনীতির ক্ষেত্রে চরম অনৈক্য, চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা এবং গভীর অনিশ্চয়তা এ যুগটিকে (আনুমানিক ২৩২ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ গুপ্তবংশের উত্থান পর্যন্ত) অন্ধকারময় করে রেখেছে। জটিল রাজনীতির আবর্তে পড়ে ভারতের ঐক্য যেন

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩৮৯

হাবুডুবু খাচ্ছে। তার ধারাবাহিক ইতিহাসে যেন ঘটেছে এক দীর্ঘকালস্থায়ী বিরতি।

কিন্তু ঐ সাড়ে-পাঁচশ বছরের ইতিহাসে এই কি একমাত্র কথা? ইতিহাসের সাধারণ পাঠকেরাও জানেন যে, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে এই ৫৫০ বৎসর কত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত তখন জাগ্রত ও জীবন্ত। নব্যহিন্দুর বা পৌরাণিক সভ্যতার যে পূর্ণবিকাশ গুপ্তযুগকে অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করে রেখেছে, তার প্রস্তুতিকাল তো পূর্ববর্তী এই যুগে। এযুগের তথাকথিত সুদীর্ঘ রাত্রির তমিস্রাগর্ভেই গুপ্তযুগের সর্বময় সমৃদ্ধি ও গৌরবের পটভূমিকা রয়েছে। ঐ রাত্রির তপস্যায় উদিত হয়েছিল গুপ্তযুগের প্রদীপ্ত ভাস্কর।

আরও আছে। ঐযুগের ভারত তার প্রাণধর্মের বলিষ্ঠতার দ্বারা বলদর্পী বিজয়ী বিদেশীদের আপন করে নিয়ে বৃহৎ হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের অঙ্গীভূত করে নিল। অস্ত্রবলে বিজিত ভারত জয় করল বিজয়ীকে তার সমন্বয়ভিত্তিক সভ্যতার দ্বারা, অসাম্প্রদায়িক মানবধর্মের দ্বারা, বলিষ্ঠ দর্শনের দ্বারা। শক্তিমান গ্রীকরাজ মিনাণ্ডার বিনয়াবনত 'মিলিন্দ' হয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সার কথা জেনে নিলেন। 'মিলিন্দপহ্‌ন' গ্রন্থটি তার প্রমাণ বহন করছে। বিদিশাস্থিত গরুড়স্তম্ভটি আজও সাক্ষী রয়েছে 'পরম ভাগবত হেলিওডোরসের' কাহিনীর। কনিষ্ক প্রমুখ কুশাণরাজদের এবং রুদ্রদমন প্রমুখ শক ক্ষত্রপদের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধকে কেন্দ্র করে একলক্ষ শ্লোক সংবলিত যে 'মহাভারত' গ্রন্থটি আমাদের প্রাচীন ভারতের ধর্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং রাজনীতির সামগ্রিক সুসমঞ্জস বিকাশের পরাকাষ্ঠা ঘটিয়েছে, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তা রচনা করতে লেগেছিল প্রায় আটশত বৎসর—আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। 'একটা সমগ্র জাতির স্বলিখিত ইতিহাস'-স্বরূপ এই মহাগ্রন্থটির রচনাকালের বৃহদংশ জুড়ে আছে ঐ তথাকথিত অন্ধকারময় যুগ। ধর্মরাজ্যের মন্ত্রদ্রষ্টা ও প্রধান স্থপতি শ্রীকৃষ্ণ ঠিক কোন্ সময় জন্মেছিলেন, তার বিচার অপ্রাসঙ্গিক। ভাবের দিক দিয়ে, কর্মক্ষেত্রেও স্বর্ণময় গুপ্তসভ্যতার মূল রয়েছে ঐ সাড়ে পাঁচশ বছরের ইতিহাসে—এটুকুই শুধু স্মর্তব্য। এবং এভাবেই রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় জাতির বলিষ্ঠ অব্যাহত সত্তা বজায় থেকেছে।

অবশ্য ইউরোপীয় ন্যাশনালিজমের সকল উপাদান ও জাতিতে পাওয়া যাবে না। জাতীয় সংহতির ও ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র হস্তিনাপুর, পাটলিপুত্র, কান্যকুব্জ এবং দিল্লী প্রভৃতি রাজধানীতে নয়। তা ছিল নৈমিষারণ্য, কাশী, মিথিলা, তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশিলা এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক পীঠস্থানে। এই প্রাণকেন্দ্রগুলির অপরিসীম গুরুত্ব স্বামীজীর ইতিহাসচেতনাকে বিধৃত করে রেখেছে।

ভারতীয় জাতির আর একটি বৈশিষ্ট্যকে স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'Lectures from Colombo to Almora' গ্রন্থে। একটি বিরাট প্রহেলিকা এই ভূখণ্ডের 'বিনম্র হিন্দু জাতি'। ইতিহাসের অরুণোদয়ে যেমন সে ছিল, আজও সে মূলত তা-ই আছে। এই বিনম্র হিন্দু ('mild Hindu') তার সহনশীলতা ও তিতিক্ষার জন্য ঐতিহাসিক বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে কৃপার পাত্র। এ কারণেই নাকি

তার জাতীয় জীবনে, ব্যক্তিগত জীবনেও বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় এসেছে, বাইরে থেকে এসেছে আঘাতের পর আঘাত। স্বার্থমগ্ন, ক্ষমতালোভীদের উচ্চাশা ও জিঘাংসার বলি হয়েছে 'বিনম্র হিন্দু'।

প্রশ্ন তুলেছেন স্বামীজী—হিন্দুর এই বিনম্রতা তবে কি কাপুরুষতার নামান্তর? তবে আবহমানকাল সে টিকে রইল কোন্ যাদুবলে? প্রাণিজগতের অব্যর্থ নিয়মে শক্তের কাছে দুর্বল হার মেনে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু শত শত বৎসর ধরে ইসলামের প্রচণ্ড আঘাত সয়েও, আধুনিক জড়বিজ্ঞানের দৌলতে পশ্চিমের খ্রীষ্টানের সর্বগ্রাসী প্রভাব সত্ত্বেও ভারত আজও সেই 'মাইল্ড হিন্দু'কে কোলে নিয়ে ভারতই রয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, কালক্রমে মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে 'মাইল্ড হিন্দু' সমমর্যাদার আসনে বসিয়ে ভারতীয় করে নিয়েছে। রকমভেদে একদা প্রাচীনকালে যেমন সে করেছিল।

তুলনামূলক আলোচনায় স্বামীজী এ রহস্যের তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। বহু বলদৃপ্ত জাতির আশ্চর্য কর্মচাঞ্চল্যের কাছে মানবসভ্যতা ঋণী। এক একটা শক্তিমান জাতি নিজেকে প্রসারিত করবার বলিষ্ঠ প্রচেষ্টায় যুগে যুগে যুদ্ধোন্মাদনায় মেতেছে। শক্তির কাছে পরাজিত দুর্বলতা সর্বস্বান্ত রিক্ততায় অবনত চিত্তে হাত পেতে দান গ্রহণ করেছে। এভাবে আদানপ্রদানের এবং বহু প্রাচীন সভ্যতার বিলুপ্তির সংখ্যাতীত কাহিনী ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত আছে। বর্তমান যুগে যখন জড়বিজ্ঞানের আশ্চর্য প্রসার ঘটে চলেছে, কূটনীতি ও যুদ্ধবিদ্যা যার দৌলতে হয়ে উঠেছে সর্বগ্রাসী, বিরাট এই পৃথিবীর দূরত্ব যখন দূরীভূত, বিভিন্ন দেশ যখন পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে—তখন এই আদানপ্রদানের গতি হয়েছে আরও দ্রুত, প্রকৃতি হয়েছে আরও সূক্ষ্ম ও নির্মম।

যুদ্ধের দামামা ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানির মাধ্যমেই আধুনিক সভ্যতার এই বিস্তারলাভ। স্বামীজীর ভাষায় এই আদানপ্রদান রক্তের নিরন্তর ধারায় রঞ্জিত, অগণিত শোষণক্লিষ্ট মানুষের হাহাকারে অভিশপ্ত, লক্ষ শিশুর ক্রন্দনে সিক্ত, বহু নারীর মর্মন্তুদ অকাল বৈধব্যে মসীলিপ্ত। কিন্তু দাতার মদগর্বী ভূমিকায় একদা যারা জীবন্ত অভিনয় করেছিল, তারা আজ কোথায়? প্রাচীনকালের মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম—আজ তাদের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পঠিত হবার অধিকারটুকু মাত্র বজায় রেখেছে। মানবসভ্যতার প্রথম দিনের সূর্য যে নীলনদের তীরে উদিত হয়েছিল, সেই নীলনদ আজও বয়ে চলেছে মিশর দেশের বুক কেটে। কিন্তু সেই নদীতীরের অধিবাসীরা আজ আরবীয় ইসলামের বলিষ্ঠ উত্তরসাধক, অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আসিরিয়া, ব্যাবিলন আজ শুধু তাদের গোত্র নয়, নাম পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। আধুনিক গ্রীস ইউরোপের বর্তমান মানচিত্রে একটি ক্ষুদ্র দেশমাত্র, এথেন্স আজও তার রাজধানী। কিন্তু কোথায় সেই হেলেনীয় জাতিগুলির অপূর্ব শিক্ষানিকেতনটি—School of Hellas? থুকিডিডিস, এ্যাস্কাইলাস, সফোক্লিশ, ইউরিপিডিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল—এই মহামনীষিবৃন্দ সমগ্র মানবসভ্যতার গর্ব। বর্তমান এথেন্সে বসে তাঁদের খ্রীষ্টান সন্তানসন্ততি প্রত্যক্ষ সে উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলেছে। মহাপ্রাজ্ঞ সক্রেটিস যদি আজ তাঁর যুগযুগান্তের ব্যবধানকে ঘুচিয়ে ফেলে সমাধি থেকে উঠে এসে এথেন্সের

পথে পথে সেই পুরাতন সুরে কথা বলতে থাকেন, তবে তা শোনবার মতো একটি লোকও খুঁজে পাবেন না। হারিয়ে গেছে তাঁর স্বদেশ, হারিয়ে গেছে তারাও, যারা হেমলক প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করেছিল।

আর রোম? একদা খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা এই তিনটি মহাদেশ জুড়ে যে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠে স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘকাল, রোমই ছিল তার রাজধানী, তার প্রাণস্বরূপ। যে মহাশক্তিধর সীজার বিশ্বজোড়া ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চে একচ্ছত্র নায়কের ভূমিকা অবলীলাক্রমে গ্রহণ করেছিলেন, আজ তাঁর সকল পরাক্রমের প্রতীক বা উৎস ঐ ক্যাপিটোল পাহাড় ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়ে দর্শকের কৌতূহল উদ্রেক করছে, ঊর্ণনাভ আজ সেখানে নিরন্তর জাল বুনে চলেছে। আজকের রোমানগণ আর 'Romans among men' নয়, আজ তারা রোমানই নয়, তারা ইটালীয়। অতীতের রোমের কোন পরিচয়ই আর পাওয়া যাবে না বর্তমান ইটালীর রাজধানী রোমকে দেখে। জলের উপর বুদ্বুদের মতো প্রাচীন রোম মিলিয়ে গেছে, চিহ্নটুকু পর্যন্ত তার নেই উত্তরকালের বুকে।[২]

স্বামীজী তাই বলেছেন, ঐসব দেশ আর তাদের ধারাবাহিকতা বহন করছে না। তাদের বর্তমান ইতিহাস আলাদা খাতে প্রবাহিত এবং তাদের গৌরবের দাবিও আলাদা প্রকৃতির। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা অনাহত, অব্যাহত। এবং তার কারণ ঐ 'মাইল্ড হিন্দু'। মানবধর্মশাস্ত্র রচয়িতা মহর্ষি মনু ভারতের প্রাচীনকালের মূর্ত প্রতীক হয়ে যদি বর্তমান ভারতে এসে উপস্থিত হন, তবে তিনি দেখতে পাবেন যে, কালের অমোঘ বিধানে তাঁর বংশধরেরা চেহারায় পোশাকে ও আচারবিচারে বাইরের দিক দিয়ে অনেক বদলেছে কিন্তু অন্তরে ও মৌল সত্তায় ভারতীয়ই রয়ে গেছে, কথা কইছে তাঁরই সুরে যদিও ভাষা আলাদা, উদ্বুদ্ধ হচ্ছে চিরন্তন ভাবধারায়, ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজজীবনে মোটের উপর একই আদর্শ সামনে ধরে রেখেছে।[৩]

সমগ্র মানবসভ্যতায় প্রাচীন ভারতও দান করেছে কম নয়। কিন্তু তার দেবার পদ্ধতি আলাদা। ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ অস্ত্র উঁচিয়ে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'সভ্য' করার অজুহাতে কিংবা কিছু দেবার বিনিময়ে অন্য কোন দেশের আধিপত্য দাবি করেনি। খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার কিংবা ইসলামের দিগ্বিজয়ের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের তুলনা করা যেতে পারে। ভারতের বৌদ্ধধর্ম আজ সমগ্র বিশ্বে একটি প্রধান ধর্ম। এই ধর্ম প্রচার করেছেন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ শ্রেষ্ঠ মৌর্যসম্রাট অশোকের প্রদর্শিত পথে 'ধর্মবিজয়ের' আদর্শে। ভারতের কোন বৌদ্ধ রাজা এক হাতে অস্ত্র এবং আর হাতে ত্রিপিটক নিয়ে বিরাট সমরাভিযানের মাধ্যমে অন্য কোন দেশ অধিকার করেছেন—ইতিহাস এমন কোন কাহিনীর ইঙ্গিতমাত্র দান করে না। কিংবা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অচেনা দেশে মৈত্রী, করুণা ও অহিংসার বাণী প্রচার করতে গিয়ে বিপদে পড়েছেন, এবং তাঁদের রক্ষা করতে বা সে অজুহাতে এদেশের কোন নরপতি সৈন্য পাঠিয়ে সেদেশ করতলগত করেছেন—এমন কথাও কোন ইতিহাসে লেখা নেই। এ

২। তদেব, পৃঃ ৪-৫ ৩। তদেব, পৃঃ ৫

প্রসঙ্গে স্মরণীয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠার কথা। সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, বলিদ্বীপ, সেলিবিস, মালয়, কাম্বোডিয়া, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশসমূহ ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। অতীতের হিন্দু ও বৌদ্ধ উপনিবেশবাদ ছিল শান্তির পথে ঐশ্বর্যের প্রসার, সম্প্রীতির মাধ্যমে সভ্যতার আদানপ্রদান। 'বিনম্র' হিন্দু বা বৌদ্ধ সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশের এটাই ধারা ছিল।

॥ ৩ ॥

আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের ধারাও আলাদা নয়। যুগে যুগে ভারত নিষ্ঠুর বহিরাক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছে, বিমূঢ় বিভ্রান্ত হয়েছে, তার জীবন-ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এসেছে প্রচণ্ড আঘাত। তারপর ভারত মেনে নিয়েছে নতুনকে, প্রসারিত করেছে সমন্বয়ের সুদৃঢ় হাতখানি, বিপর্যয়ের নিষ্ঠুরতাকে প্রশান্ত কল্যাণে পরিণত করেছে। ইসলাম এসেছে মধ্যযুগে মুফ্তি-মৌলবীদের ধর্মোন্মাদনায় এদেশকে ইসলামীদেশে পরিণত করতে, অপরাজেয় রণদক্ষতায় এবং বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অসামান্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন মুসলিম সেনাপতিবৃন্দ। হিন্দু বিজিত, ইসলাম বিজয়ী। বিজিত বিজয়ীর অত্যাচারে জর্জরিত। 'বিনম্র হিন্দু' অকল্যাণের বেড়াজালে বেষ্টিত হয়ে কত দীর্ঘকাল কর্মযোগের সাধনা করেছে, কোন দুঃখকেই দুঃখ বলে মানল না, কোন বিচ্ছেদকেই বড় করে দেখল না, কোন বঞ্চনাতেই হতাশ হল না। তারপর প্রকৃতির অনিবার্য বিধানে হিন্দু মুসলিম—এই দুটি সমাজ আলাদা থেকেও পরস্পরকে মেনে নিল, পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে শিখল। ভারতীয় জীবনধারায় সাময়িক বিচ্ছিন্নতাকে জুড়ে দিতে সমন্বয়, প্রেম ও একেশ্বরবাদ মূর্ত হল কত সাধু ও সন্তের জীবনচর্যায়। রামানন্দ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, নামদেব, সুরদাস, মৈনুদ্দিন চিস্তি, নিজামুদ্দিন আউলিয়া প্রমুখ সাধুসন্তগণ মধ্যযুগের ইতিহাসে নতুন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় রচনা করলেন। ভারতের জাতীয় জীবন সাধুর ও ঋষির আশ্রমে আবার নিজেকে আবিষ্কার করল। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা আবার ফিরে এল। স্বামীজী ভারত-ইতিহাসে 'নেশন' (nation) সংজ্ঞার এই বিকাশকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। এই 'নেশনের' প্রতিষ্ঠা ও গৌরব রাষ্ট্রনীতিতে ভাষা পেল মুঘল সম্রাট মহামতি আকবরের অসামান্য দূরদর্শিতায়। ভারতের হিন্দু ও মুসলিম হল একবৃন্তে দুটি ফুল।

ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাস পালাক্রমে ভাঙাগড়ার ইতিহাস। কিভাবে গড়েছে তার কথা শুধু নয়, কেন ভাঙল তা-ও জানতে হবে। নইলে ইতিহাসপাঠ অসম্পূর্ণ থাকবে। ভাঙাগড়ার গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী আমরা সাধারণ পাঠ্যপুস্তকেও কার্যকারণ-সম্পর্ক নির্ণয় করে সযত্নে অধ্যয়ন করি, বাইরে প্রকটিত ঘটনাবলীর উপর যথারীতি গুরুত্ব দান করি। কিন্তু স্বামীজী প্রবেশ করেছেন ঘটনাবলীর গভীরে এবং তত্ত্বগতভাবে উপরোক্ত তিনটি ফর্মুলার পটভূমিতে তাদের বিচার করেছেন।

ভারতীয় ধর্ম ও ইতিহাস—এ দুয়ের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের উপর স্বামীজী অত্যধিক জোর দিয়েছেন। ধর্মকে বলেছেন ইতিহাসের নিয়তিস্বরূপ ; ইতিহাসের নিয়ন্তা অন্তর্নিহিত

পরিকল্পনা ও প্রেরণাস্বরূপ। এই ধর্ম কিন্তু বিশেষ উপায়ে বিশেষ এক দেবতার পূজায় পর্যবসিত নয়। এই ধর্ম বেদান্তভিত্তিক মানুষের ধর্ম। আর্য ঋষিদের প্রজ্ঞা, সাধনা ও দার্শনিক বিন্যাসে এই মানুষের ধর্ম বিকশিত হয়েছিল। কোন বিশেষ অবতার বা পয়গম্বরের শিক্ষায় বা প্রচারে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই একে বলা হয় সনাতন ধর্ম। অবশ্য যুগে যুগে অবতারকল্প মহামানববৃন্দ ধর্মকে রক্ষা করতে কিংবা সংস্কারসাধন করতে আবির্ভূত হয়েছেন এই পুণ্যভূমিতে। স্বামীজী এই ধর্মকেই বলেছেন ঃ '...one great Force is manifesting itself...as the desire for Mukti or spiritual independence with the Hindu.'[৪] ধর্ম হচ্ছে সেই মহান শক্তি যা হিন্দুর জীবনে মুক্তি বা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে বিকশিত হয়। এই ধর্মের ভিত্তি ঔদার্য ও অসাম্প্রদায়িকতা। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত শিকাগো বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমত-সহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।'[৫] কলম্বো বক্তৃতায় স্বামীজী অনেক কথা বলেছেন ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে ঃ '...ভারতের ও সমগ্র জগতের সৌভাগ্যক্রমে...অশান্তি-কোলাহলের মধ্য হইতে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"... এই মহাবাণী উত্থিত হইয়াছিল। ...নাম বিভিন্ন, কিন্তু বস্তু এক। ...সমগ্র ভারতের বিস্তারিত ইতিহাস ওজস্বী ভাষায় সেই এক মূল তত্ত্বের পুনরুক্তিমাত্র। ...এইরূপে এই ভারতভূমি পরধর্ম-সহিষ্ণুতার এক অপূর্ব লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই শক্তিবলেই আমরা আমাদের এই প্রাচীন মাতৃভূমিতে সকল ধর্মকে—সকল সম্প্রদায়কে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবার অধিকার লাভ করিয়াছি।'[৬]

প্রচলিত কথায় যাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলি, বহু দেবদেবীর পূজাবিশিষ্ট যে ধর্ম আমরা পালন করি, আধ্যাত্মিক ভূমি থেকে তা স্খলিত হলেই পৌত্তলিকতায় পর্যবসিত হয়। তখন আচারবিচার ও সংস্কার প্রবল হয়ে পড়ে, জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা সমাজকে গ্রাস করে। ধর্মের নামে তখন আমরা অধর্ম পালন করে কূপমণ্ডুক হয়ে পড়ি। তখনই আসে আমাদের অবনতি ও পতন। ধর্ম ধর্ম করে নয়, ধর্মের নামে অধর্মকে প্রশ্রয় দিয়েই ভারত তার দুর্গতিকে যুগে যুগে টেনে এনেছে। স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় এই তত্ত্বটি বার বার প্রতিফলিত হয়েছে।

ইতিহাসসম্মতভাবে 'হিন্দু' শব্দটির তাৎপর্যও সম্যক উপলব্ধি করা দরকার। হিন্দু জাতিবাচক শব্দ, ধর্মবাচক নয়। স্বামীজীর কথায় ঃ 'বেদে সিন্ধুনদের "সিন্ধু" "ইন্দু" দুই নামই পাওয়া যায় ; ইরানীরা তাকে "হিন্দু", গ্রীকরা "ইন্ডুস" করে তুললে ; তাই থেকে ইণ্ডিয়া—ইণ্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্মের অভ্যুদয়ে "হিন্দু" দাঁড়ালো—কালা (খারাপ), যেমন এখন "নেটিভ"।'[৭] জাফনা বক্তৃতায় তিনি কথাটি আরও খুলে বলেছেন ঃ 'যে

৪। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition (1964), p. 460

৫। বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৯

৬। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১১-২ ৭। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১০৫

"হিন্দু" নামে পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার কিন্তু আর কোন সার্থকতা নাই; কারণ ঐ শব্দের অর্থ—"যাহারা সিন্ধুনদের পারে বাস করিত"। প্রাচীন পারসীকদের বিকৃত উচ্চারণে "সিন্ধু"-শব্দই "হিন্দু"রূপে পরিণত হয়; তাঁহারা সিন্ধুনদের অপরতীর-বাসী সকলকেই "হিন্দু" বলিতেন। এইরূপে "হিন্দু"-শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে; মুসলমান-শাসনকাল হইতে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ...বর্তমানকালে সিন্ধুনদের এইদিকে সকলে আর প্রাচীনকালের মতো এক ধর্ম মানেন না। সুতরাং ঐ শব্দে শুধু খাঁটি হিন্দু বুঝায় না; উহাতে মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন এবং ভারতের অন্যান্য অধিবাসিগণকেও বুঝাইয়া থাকে।'[৮]

উক্ত পরম সত্যটিকে বলিষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে স্বামীজী এই হিন্দুর ধর্মকেই বলেছেন ভারত-ইতিহাসের বিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার, তার পতন-অভ্যুদয়ের নিয়ন্তা। স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে আরও বহু উদ্ধৃতি দিয়ে ভারতীয় বা হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যায়। ঔদার্য ও বলিষ্ঠতা এই দুটি স্তম্ভের উপর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার বাঁধনে যে মহাসেতু নির্মিত, সে সেতুপথ বেয়েই চলে ভারতের ধর্মজীবন ও জাতীয় সমৃদ্ধির অঙ্গাঙ্গি জয়যাত্রা। কলম্বো বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেন: 'অন্যান্য জাতির পক্ষে ধর্ম—সংসারের অন্যান্য কাজের মতো একটা কাজ মাত্র। রাজনীতি-চর্চা আছে, সামাজিকতা আছে, ধন ও প্রভুত্বের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহা আছে...এখানে—এই ভারতে কিন্তু মানুষের সমগ্র চেষ্টা ধর্মের জন্য...।'[৯] কুম্ভকোণম্ বক্তৃতায় আরও স্পষ্ট করে বললেন: 'জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম হওয়া উচিত, না রাজনীতি—এ-বিষয়ে এখন আমি বিচার করিতে চাই না; তবে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি স্থাপিত। ...ভালই হউক আর মন্দই হউক—সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে...তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার নূতন খাতে প্রবাহিত করিতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য—ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি বা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।'[১০]

সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসদর্শনের অখণ্ডতা ও মৌল অভিন্নতাকে স্বীকার করেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক চৌহদ্দির মধ্যে ঐতিহ্যগত বিভিন্নতায় এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এক দেশের ইতিহাসের ধারা অপর দেশ থেকে আলাদা খাতে প্রবাহিত হয়ে একই বিশ্ব-ইতিহাসসাগরে মিশেছে। প্রত্যেক জাতি বা দেশের একটা 'নিজস্বতা' (genius) আছে, সেই নিজস্বতা তার ইতিহাসকে প্রতি স্তরে অনুরঞ্জিত, নিয়ন্ত্রিত করে। স্বামীজীর ইতিহাসচেতনা এই 'নিজস্বতার' পরিপ্রেক্ষিতে অপূর্ব বিশ্লেষণের ভাষা পেয়েছে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে তিনি বলেছেন: '...প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয়

৮। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৫-৬ ৯। তদেব, পৃঃ ৬

১০। তদেব, পৃঃ ৬৭

উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতি-নীতি সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে। ...তিনটি বর্তমান জাতির তুলনা কর, যাদের ইতিহাস তোমরা অল্পবিস্তর জানো—ফরাসী, ইংরেজ, হিন্দু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড। প্রজারা সব অত্যাচার অবাধে সয়, করভারে পিষে দাও, কথা নেই; দেশসুদ্ধকে টেনে নিয়ে জোর করে সেপাই কর, আপত্তি নেই; কিন্তু যেই সে স্বাধীনতার উপর হাত কেউ দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে। কেউ কারুর উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পাবে না, এইটিই ফরাসী চরিত্রের মূলমন্ত্র। ...ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ—ইংরেজের আসল কথা। রাজা, কুলীনজাতি-অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করে; কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার করতে হয় তো তার হিসাব চাইবে। রাজা আছে, বেশ কথা—মান্য করি, কিন্তু টাকাটি যদি তুমি চাও তো তার কার্য-কারণ, হিসাবপত্রে আমি দু-কথা বলব, বুঝব, তবে দেব। রাজা জোর করে টাকা আদায় করতে গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন; রাজাকে মেরে ফেললে।'[১১]

ফ্রান্সের ও ইংলণ্ডের ইতিহাস যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা অল্প কথায় চলিত ভাষায় লেখা উপরোক্ত মন্তব্যকে ইতিহাসসম্মত বলতে দ্বিধা করবেন না। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, এবং ঐ জাতির পরবর্তী ইতিহাসের ভাঙাগড়ার পশ্চাৎপটে ছিল ঐ মন্ত্র। ঐ তিনটির মধ্যে তৃতীয়টি অর্থাৎ 'স্বাধীনতা' ফরাসী ইতিহাসের মূল নিয়ন্ত্রক।

ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে স্বামীজীর ভাষ্য কত সমীচীন। স্বামীজী সে ঘটনার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর গৃহযুদ্ধ বা রাজায়-প্রজায় যুদ্ধের নানা কার্যকারণ আমরা জানি। কারণগুলির মধ্যে প্রধান ছিল জনগণের প্রতিনিধি-সভার (পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্সের) এই দাবি যে তার সম্মতি ছাড়া রাজা প্রথম চার্লস প্রজাদের উপর কোন কর ধার্য করতে পারবেন না। এগারো বৎসর কাল (১৬২৯-৪০) রাজা পার্লামেন্ট না ডেকেই তাঁর বিশেষ রাজকীয় অধিকার (প্রেরোগেটিভস) বলে স্বৈরশাসন চালালেন, বেপরোয়া কর ধার্য করলেন ঐ অধিকারেই। 'জাহাজ কর' দিতে অস্বীকার করলেন হ্যামডেন, বিচারে অধিকাংশ বিচারকের মতানুসারে তাঁর শাস্তি হল। প্রজার অসন্তোষ তীব্রতর হল। এত করেও কিন্তু রাজকোষে রাজস্ব আদায় দ্রুত বর্ধমান খরচের পরিধির বহু পশ্চাতে রয়ে গেল। তারপর স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে রাজার যুদ্ধের ফলে বিপর্যয় ঘটল এবং স্কচ সৈন্যবাহিনীর টাকার চাহিদা চুক্তি অনুসারে মেটাতে গিয়ে বর্ধিত রাজস্বের প্রয়োজনে প্রথম চার্লস পার্লামেন্ট ডাকতে বাধ্য হলেন। চার্লস স্কটল্যাণ্ডেরও রাজা ছিলেন। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘ (লঙ্) পার্লামেন্ট বসল। তারই দু-বছর পরে (১৬৪২) অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে প্রজার অন্যান্য অধিকার দাবিযুক্ত হয়ে ডেকে আনল গৃহযুদ্ধ। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ করালেন

১১। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৮-৫৯

তৎকালীন ইংলণ্ডের বিজয়ী সামরিক শাসক অলিভার ক্রমওয়েল।

ইংলণ্ডের আধুনিক ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ একমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই গৃহযুদ্ধ ঘটেছিল এই সিদ্ধান্ত গবেষণার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস করেছেন। স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় এই সিদ্ধান্ত প্রতিবিম্বিত হয়েছিল তারও অনেক আগে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে উপরোক্ত অনুচ্ছেদে স্বামীজী ভারতের 'নিজস্বতা'র বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেনঃ 'হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা—বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা—"মুক্তি"। ...ঐখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্বনাশ; তা ছাড়া যা কর, চুপ করে আছি। লাথি মারো, "কালো" বলো, সর্বস্ব কেড়ে লও—বড় এসে যাচ্ছে না; কিন্তু ঐ দোরটা ছেড়ে রাখ।'[১২]

ভারত-ইতিহাসের মূলসূত্রের এই ভাষ্য বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক বা মার্কসীয় ব্যাখ্যার বিপরীত। সেই ব্যাখ্যায় তাই স্বামীজী revivalist বা traditionalist। মার্কসীয় ব্যাখ্যার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও বলব যে, তাঁর তথাকথিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি একদেশদর্শিতার বিভ্রাট ঘটিয়েছে। এও একরকম গোঁড়ামি যা সামগ্রিকতাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। একই বাঁধা ছকে ফেলে আর যাই হোক, বিপুল বিচিত্র এই পৃথিবীর বিভিন্ন মনুষ্যসমাজের কার্যকারণ বিচার করা যায় না। তাছাড়া স্বামীজী তো কোন ধর্মমতকে ইতিহাসের নিয়ন্তা বলেননি, তিনি মানুষের যে ধর্ম, যার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছিল বেদান্ত-উপনিষদে, তাকেই বলেছেন ভারত-ইতিহাসের নিয়ন্তা। স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' পাঠ করলে, সর্বোপরি তাঁর কর্মধারা ও জীবনচর্যার পরিচয় পেলে সংস্কারমুক্ত নিরপেক্ষ সবারই মনে হবে যে, পশ্চাতে তাকিয়ে থেকে নয়, সম্মুখে প্রসারিত দৃষ্টিনিক্ষেপে ভারতের প্রগতিসাধনের রাজপথই ছিল তাঁর পথনির্দেশ। অতীতের ইতিহাস অনুধ্যানেই আমরা দাঁড়াবার শক্ত মাটি খুঁজে পাব। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনায় স্বামীজী বাণী দিলেনঃ '...ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান। ...চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।...ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে...সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?...অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে...ধীরে ধীরে, অতি যত্নে রক্ষিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে...যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই আচারগুলিই অনাচার ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়।'[১৩]

ধর্মাধর্ম কেমন করে ভারত-ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত করেছে ধারাবাহিক তার বর্ণনার খানিকটা দু-এক কথায় আলোচনা করা হচ্ছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈদিক ধর্মে

১২। তদেব, পৃঃ ১৫৯ ১৩। তদেব, পৃঃ ৩১-৪

বহু গলদ প্রবেশ করেছিল। অসাম্য, অস্পৃশ্যতা ও সঙ্কীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধ সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাঁর প্রাধান্য বজায় রাখতে আধ্যাত্মিকতার বদলে ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি ও সাড়ম্বর যাগযজ্ঞকেই বড় করে তুললেন, বৈদিক সূক্তের করলেন অপব্যাখ্যা। অথচ এই যুগই দর্শনের যুগ, ঋষিপ্রতিম মনীষীরা বুঝি দূরে অরণ্যের গভীরে গিয়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় মগ্ন। উপনিষদের তাই আর এক নাম আরণ্যক। এলেন ক্ষত্রিয় রাজকুমার গৌতম বা সিদ্ধার্থ। বেদকে অস্বীকার করে নয়, তার কর্মকাণ্ডের জটিল প্রাণহীন আচার-ব্যবহারকে অস্বীকার করে আরণ্যক উপনিষদের অমৃতকথা জাতি ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতেই এই রাজকুমার জীর্ণকন্থা পরে পরিব্রাজক বুদ্ধ হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ধীরে ধীরে মোড় ঘুরল। ইতিহাস হল প্রধানত বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস, স্থায়ী হল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এর শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটল সর্বযুগের সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ মৌর্যসম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টপূর্ব ২৭১-২৩২)। দ্বাদশ শিলালিপিতে অশোক ধর্মনিষ্ঠার এক আশ্চর্য সংজ্ঞা দান করলেনঃ স্বধর্মে তীব্র অনুরাগ বশে যদি কেউ পরধর্মকে বা ভিন্ন সম্প্রদায়কে হেয় জ্ঞান করে, কিংবা অপরের ধর্মকে নিন্দা করে স্বধর্মের গুণগান কল্পে, তবে সে প্রকৃতপক্ষে স্বধর্মেরই সমূহ ক্ষতি সাধন করে থাকে।[১৪] এই অশোকই ভারতের একটি আঞ্চলিক ধর্মমত বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ধর্মবিজয়ের মাধ্যমে। আবার এই অশোকই তৎকালীন ভারতের সকল ধর্মমতকে, এমনকি অধুনা লুপ্ত গুহাবাসীর ধর্মাবলম্বী মুষ্টিমেয় আজীবিকদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়ে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সুরক্ষার বন্দোবস্ত করেছিলেন।

কালক্রমে বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতিতে দুর্নীতি ও অহিংসার নামে কাপুরুষতা প্রবেশ করল, রাজধর্মের আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হল। ধীরে ধীরে মাথা তুলতে লাগল হিন্দুধর্ম, নতুন করে পৌরাণিক সংস্কৃতির আলোতে উদ্ভাসিত হল। এ ধারারই পূর্ণ বিকাশ ঘটল গুপ্তযুগে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে। বেদভিত্তিক পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সবলে ধ্বংস করে নয়, তাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়ে, তাকে আপন করে নিয়ে, তাকে নিজের অঙ্গীভূত করে নিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম তার জন্মভূমি থেকে মুছে গেল। কিন্তু সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করে দেখতে পাব যে, ভারতীয় হিন্দুসত্তায় বৌদ্ধধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে রয়েছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই ভারততীর্থে এসেছিলেন জিজ্ঞাসু বৌদ্ধ পরিব্রাজক প্রখ্যাত চৈনিক মনীষী হুয়েন সাঙ্। তখন কনৌজকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে ছিলেন স্বনামখ্যাত সম্রাট হর্ষবর্ধন, যিনি একাধারে আদিত্য-উপাসক এবং শৈবধর্মাবলম্বী। আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধ না হলেও হর্ষ ছিলেন ভগবান তথাগতের ধর্মের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। প্রাচীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান বিহার রাজ্যের অন্তর্গত নালন্দায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রধানত তা বৌদ্ধসংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। হর্ষবর্ধনের

১৪। Asoka—D. R. Bhandarkar, Calcutta University Press, Calcutta, 1932, p. 327

পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা দশ হাজার আবাসিক শিক্ষার্থী ও শত শত অধ্যাপক নিয়ে গুণগত বিচারে শীর্ষস্থানে উঠেছিল। হুয়েন সাঙ্ কয়েক বৎসর এখানে শিক্ষালাভ করেন। হুয়েন সাঙ্ তাঁর বৃহদায়তন ভ্রমণবৃত্তান্তে বৌদ্ধভারতের জয়গান গেয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস পাঠে আমরা জানি যে, বৌদ্ধধর্ম তখন ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে হিন্দুধর্মের সঙ্গে একীভূত বা সমঞ্জসীভূত হয়ে যাচ্ছে। শুধু পূর্ব ভারতে বাংলার পালরাজগণের আমলে মহাযান বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে রইল। এযুগেই তন্ত্রকে ভিত্তি করে বাংলার ধর্ম ও সমাজজীবন দানা বাঁধল। এই তন্ত্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম, বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের যে বৈশিষ্ট্য তার মূলভিত্তি এখানেই।

ধর্মাশ্রয়ী ভারত-ইতিহাসের এই তো ধারা। যখন এই ধর্মকে ভারতবাসী কুসংস্কার, কদাচার ও সঙ্কীর্ণতার পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত করল, তখনই এল ভারতের পতন। অবিশ্বাস্য আত্মপ্রসাদ হিন্দুকে কূপমণ্ডুকে পরিণত করল, অন্ধ রক্ষণশীলতা তার সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের সিংহদ্বার রুদ্ধ করে দিল, রাজনীতি ও সমরনীতিতে পড়ল সামাজিক দুর্নীতির গভীর ছাপ, রাষ্ট্রে এল চরম অনৈক্য, বৈষম্য ও আদর্শচ্যুতি। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অপরাজেয় তুর্কী সমরনায়ক সুলতান মামুদের বার বার ভারত-অভিযানকালে তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন আরব মনীষী আলবেরুনী। তিনি এসেছিলেন অতীতকালের মেগাস্থেনিস, ফা হিয়েন, হুয়েন সাঙের মতো জিজ্ঞাসু মন নিয়ে, এসেছিলেন আদি মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির জনয়িত্রী ভারতকে দেখতে, জানতে ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। বিখ্যাত গ্রন্থ 'তরখ-ই হিন্দ্' পাঠে জানা যায় যে, আলবেরুনী বেদ-উপনিষদের ভারতকে—তাঁর স্বপ্নের ভারতকে ঐসময় আর বাস্তবে খুঁজে না পেয়ে বেদনাবিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেনঃ হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে তাদের দেশ ছাড়া আর কোন দেশ নেই, তাদের মতো কোন জাতি নেই, নেই তাদের রাজার মতো আর কোন রাজা। ধর্ম ও বিজ্ঞানে তাদের অধিকার তো একচেটিয়া। জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নয়, তাকে কৃপণের ধনের মতো সযত্নে অপরের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতেই হিন্দুর আপ্রাণ প্রয়াস ও আনন্দ। বিদেশীরা তো ঘৃণ্য ম্লেচ্ছ। নিজের সমাজের মধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণীর দুর্লঙ্ঘ বেড়া তুলেছে হিন্দু। হিন্দুর ঔদ্ধত্য এবং অন্ধতা আজ এত চরমে উঠেছে যে, তার জ্ঞানভাণ্ডারকে যে বিদেশের কোন রত্ন একদা সমৃদ্ধ করেছিল কিংবা কদাপি করতে পারে একথা সে ভাবতেই পারে না। অথচ তার পূর্বপুরুষ কখনও এমন ছিলেন না। সর্বদাই আদানপ্রদানের মাধ্যমে তাঁরা ভারতের সভ্যতাকে মার্জিত, উন্নত ও জীবন্ত রেখেছেন, ভারতের বাইরে যে পৃথিবী তাকে সমৃদ্ধ করেছেন, কাছে টেনে নিয়েছেন।[১৫]

স্বামীজীর সংজ্ঞানুসারে উপরোক্ত অবস্থাই চরম ধর্মহীনতার নামান্তর। যে জাতিটা বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতির অবনতির দিন অতি নিকট। ভারতের অগ্রগণ্য

১৫। Alberuni's India, Vol. I—Edward C. Sachau, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., London, 1914, pp. 22-3

ঐতিহাসিক আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, মুসলিমদের ভারতবিজয় এবং হিন্দুভারতের পতনের মূল কারণ এই ধর্মহীনতা বা অধর্মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যুগে যুগে ভারত-ইতিহাস পালা করে ধর্ম ও অধর্মকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে, এমনি করেই ঘটেছে তার উত্থান ও পতন।

তুর্কী ও মোঙ্গলদের অমানুষিক শৌর্যবীর্যের ও কর্মদক্ষতার উত্তরাধিকারী হয়েও মহামতি মুঘল সম্রাট আকবর ছিলেন একজন অভিনব ভারতপথিক। মৌর্য অশোকের, গুপ্ত চন্দ্রগুপ্তের, পুষ্যভূতি হর্ষের এবং মধ্যযুগের সাধুসন্তদের ঔদার্য ও সমন্বয়ভিত্তিক ধর্মকে রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি, মুঘলশাসনকে স্থায়ী করেছিলেন শতাধিক বর্ষকাল। সেই সাম্রাজ্যের পতন সূচিত হল যখন আওরঙ্গজেব তাঁর সকল শক্তি নিয়োজিত করে আকবরের নীতিকে পালটে ফেললেন এবং ভারতকে একমাত্র ইসলামের দেশে পরিণত করতে গেলেন। স্বামীজীর সংজ্ঞানুসারে স্বধর্মনিষ্ঠ কিন্তু পরধর্ম-অসহিষ্ণু আওরঙ্গজেব ইতিহাস-নিয়ন্তার ধর্মপথ থেকে স্খলিত হলেন। মুঘলের পতন ঘটল তাঁর মৃত্যুর (১৭০৭) সঙ্গে সঙ্গে। '...মোগল রাজা কেমন সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হল। কেন? না—মোগলরা ঐ জায়গাটায় (হিন্দুর ধর্মে) ঘা দেয়নি। হিঁদুরাই তো মোগলের সিংহাসনের ভিত্তি, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, দারাসেকো—এদের সকলের মা যে হিঁদু। আর দেখ, যেই পোড়া আরঙ্গজেব আবার ঐখানটায় ঘা দিলে, অমনি এত বড় মোগল রাজ্য স্বপ্নের ন্যায় উড়ে গেল।'[১৬]

মুঘলের উত্থানপতনের ইতিহাস ধর্মাধর্মের ভিত্তিতে স্বামীজী দুকথায় বলে দিলেন। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত অধর্মের পঙ্ককুণ্ডে ডুবে গেল। সেই সুযোগে বিদেশী ইংরেজ বণিক তার মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করল, ভারত রইল প্রায় দুশ বৎসর পরাধীন।

॥ ৪ ॥

ভারতের ইতিহাস রচনায় দ্বিতীয় ফর্মুলাটি অর্থাৎ মন্ত্র বা দর্শনের (of philosophy) ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচ্য। প্রারম্ভেই মনে রাখা দরকার যে, এতক্ষণ যে ধর্মাশ্রয়ী ইতিহাস আলোচিত হল, সেই ধর্মেরই একটি কার্যকর অনুষঙ্গ বা corollary এই মন্ত্র বা দর্শন। বস্তুত মন্ত্র বা দর্শন ধর্মেরই দ্যোতনা, এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারতে জাতিগঠনের প্রেরণা। পশ্চিমের ইতিহাসবিদ্‌গণ ইতিহাসের দার্শনিক দিকটাকে ফুটিয়ে তুলতে বলেন—'Renaissance precedes Revolution'—সংস্কৃতির পুনর্জন্ম বিপ্লবের পূর্বগামী। অর্থাৎ কোন রাজনৈতিক বিপ্লবই সার্থক বা তৎপর্যময় হয় না, যদি না সেদেশে দার্শনিক এবং সাহিত্যিকগণ তাঁদের উদ্দীপনাময় এবং বিশ্লেষণাত্মক রচনাবলী দ্বারা তার পূর্বে ভাবরাজ্যে প্লাবন আনতে পারেন, অত্যাচারিত শোষিত মূক জনগণের মুখে ভাষা দিতে পারেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের পটভূমি রচয়িতা রুশো,

১৬। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬০

ভল্টেয়ার, মন্টেস্কু ও ডিডেরট এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের পশ্চাতে কার্ল মার্কসের সাম্যবাদী দর্শন, এঙ্গেলসের ভাষ্য এবং মহানায়ক লেনিন কর্তৃক তার কার্যকর রূপদানের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখলেই কথাটির সত্যতা যাচাই হয়ে যাবে।

কিন্তু পশ্চিমের ভাববিপ্লবের মন্ত্র প্রধানত রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির কাঠামোতে রচিত, ধর্মের স্থান সেখানে গৌণ। ভারতের কথা আলাদা। স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় ধর্মই রয়েছে রাজসিংহাসনে, আর সব ভাবধারা তার পাত্রমিত্র মাত্র। ভারত-ইতিহাসে মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন ঋষিকল্প মহামানবগণ, তপস্যা ও ত্যাগের গৈরিক রঙে যাঁরা অনুরঞ্জিত।

ইতিহাস থেকে দু-একটি উদাহরণ নিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে গৌতম বুদ্ধ প্রাচীন ভারতে সবচেয়ে বড় ইতিহাসস্রষ্টা। তাঁর দেওয়া মন্ত্রের কার্যকর রূপ প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রগঠন ও সংস্কৃতির বিকাশক্ষেত্রে চির-উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। মহাভারতের আদি রচয়িতা বেদব্যাস এবং তাঁর উত্তরসূরিগণ (ব্যাস পদবী ভূষিত), রামায়ণের আদি কবি বাল্মীকি এবং পুরাণকারগণ (তাঁরাও ব্যাস) যে-মন্ত্রগুলি গল্পাকারে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা-ই তো প্রাচীন ভারতের শুধু সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নয়, রাজনৈতিক ইতিহাসেও বিপুল ভাবসমৃদ্ধি এনেছে। এঁদেরই প্রভাবে ও আদর্শে গুপ্তযুগ হয়েছিল সর্বোচ্চ গৌরবে অধিষ্ঠিত স্বর্ণযুগ, এঁদেরই আদর্শে এসেছিলেন সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রমুখ পরম শক্তিমান বিচক্ষণ ধর্মনিষ্ঠ নরপতিবৃন্দ।

তুর্কীবিজয়ের প্রাক্কালে হিন্দুভারতে এমন কোন সন্ত বা ঋষির আবির্ভাব ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেনি, এমন কোন 'আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান' ঘটেনি যা বিশ্ববিজয়ী, বলদৃপ্ত, যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম মুসলিমদের সার্থকভাবে বাধা দেবার প্রেরণা যোগাতে পারত। আলবেরুনীর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত পূর্বোক্ত মন্তব্য তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুসংস্কার-কদাচার-বিশিষ্ট পৌত্তলিক ধর্মের খোসাটা আঁকড়ে ধরে তৎকালীন ভারতবাসী ক্ষীণস্বরে বলছিল যে, সে 'ধার্মিক' আর মুসলমান 'ম্লেচ্ছ'। 'ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে, যে-কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের পরে, তাহারই অনুবর্তিভাবে একটি রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে...।'[১৭] স্বামীজী মন্ত্র বা দর্শনকেই বলেছেন 'আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান'। এই অভ্যুত্থান তখন ঘটেনি, তাই শাহীবংশের আনন্দপাল কিংবা চৌহান পৃথ্বীরাজের মতো শৌর্যবান রাজন্যবর্গ তুর্কী অভিযানকে জীবন দিয়েও রোধ করতে পারেননি।

কিন্তু তুর্কী-পাঠান রাজত্বকালেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে এক অভিনব আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য, নানক প্রমুখ সন্তগণ এই অভ্যুত্থানের নায়ক এবং মধ্যযুগের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের স্রষ্টা। তাঁদের দেওয়া মন্ত্র অভিনব সুরে ষোড়শ শতাব্দীতে কথা কয়ে উঠল শেরশাহ্ ও আকবরের পরম বিচক্ষণ ও উদার বলিষ্ঠ কর্মধারার মধ্যে।—একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

কিন্তু তা ছিল পরোক্ষ ফল। প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুর 'রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যবোধ' মধ্যযুগে

১৭। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪

কেন সন্তদের মন্ত্রের প্রেরণায় জাগ্রত হল না, তার কারণ স্বামীজী বর্ণনা করেছেন উক্ত 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধেঃ 'রামানন্দ, কবীর, দাদু, শ্রীচৈতন্য বা নানক এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্তগণ দার্শনিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও মানুষের সম-অধিকার-প্রচারে সকলে একমত ছিলেন। সাধারণের মধ্যে ইসলামের অতি দ্রুত অনুপ্রবেশ রোধ করিতেই ইঁহাদের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে; কাজেই নূতন আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শের উদ্ভাবন তখন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ...কোনপ্রকারে শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকার লাভ করিবার জন্যই তাঁহারা প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছিলেন।'[১৮] মধ্যযুগে উত্তর ভারতে হিন্দু কেন রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের সাধক হতে পারেনি, তার কারণ স্বামীজীর ইতিহাসচেতনার গভীরে এমনি করেই রেখাপাত করেছে।

উত্তর ভারতে যা সম্ভব হল না দক্ষিণ ভারত তাকেই সার্থক করল। এর কারণ শঙ্কর, রামানুজ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে আরও অনেক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির অভ্যুদয়। '...দক্ষিণাঞ্চলে শঙ্কর ও রামানুজের অভ্যুদয়ের পরই এদেশের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে একতাবদ্ধ জাতি ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল।'[১৯] সাক্ষাৎ শঙ্করস্বরূপ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব-তারিখ ইতিহাস হারিয়ে ফেলেছে, রামানুজ একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য। এই প্রসঙ্গে শৈব নায়ানার এবং বৈষ্ণব আলওয়ারদের কথা স্মরণীয়। সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই সাধকবৃন্দ। তাঁদের গাথা-নিচয় তামিল সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। ভারতের গৌরবগাথা এবং ভগবৎ-আরাধনার স্তোত্র এঁদের উপজীব্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চারণবৃন্দ এই সঙ্গীত দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, সমগ্র দক্ষিণ ভারত মুখরিত করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন জনগণকে, শক্তিদান করেছেন রাজা, মন্ত্রী ও সেনাপতিদের। তখন দক্ষিণ ভারতে পহ্লবদের আধিপত্য। শৈব শঙ্কর ও বৈষ্ণব রামানুজ যথাক্রমে এই পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে তাঁদের অভ্যুদয় আকস্মিক ঘটনা নয়। আকস্মিক নয় চোল ও পরে পাণ্ড্যদের অপূর্ব সাম্রাজ্যস্থাপনের কাহিনী। শিল্পে ও স্থাপত্যে, সঙ্গীতে ও সুরে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে, পরাক্রমে ও সমৃদ্ধিতে, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে সাগরজোড়া চোল সাম্রাজ্য অনন্য ইতিহাস রচনা করল। পাণ্ড্যগণ তারই জের টেনেছিলেন পরবর্তীকালে। তখন উত্তর ভারতের হিন্দু বদ্ধ জলাশয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তুর্কী অভিযানে বিপর্যস্ত হচ্ছে। 'দক্ষিণভারতকে পদানত করিবার জন্য মুসলমানগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে অঞ্চলের কোথাও একটি শক্ত ঘাঁটিও স্থাপন করিতে পারে নাই।'[২০] '...দক্ষিণভারতই তখন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল...।'[২১]

স্বামীজীর উক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত স্থায়ী বিজয়নগর সাম্রাজ্যের তাৎপর্য অনুধাবন

১৮। তদেব, পৃঃ ৩৯৩-৯৪ ১৯। তদেব, পৃঃ ৩৯৩
২০। তদেব ২১। তদেব

করতে পারব। কৃষ্ণানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত মুসলমান বাহমনি সাম্রাজ্যের সাথে পুরুষানুক্রমে বিজয়নগরের সংখ্যাতীত সঙ্ঘর্ষ চলেছে। বাহমনি চায় ইসলামের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা। উত্তর ভারতে তুর্কী-পাঠান যা করেছে তা-ই করবে বাহমনি দক্ষিণ ভারতে। বাহমনির সুলতানদের অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও বীরত্বে ও রণকৌশলে তাঁরা কারও নীচে ছিলেন না। কিন্তু যুদ্ধের পর যুদ্ধে বিজয়নগরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেও তাঁরা পারেননি বিজয়নগরকে নতি স্বীকার করাতে। সর্বজয়ী ইসলামের গ্রাস থেকে দক্ষিণ ভারতকে মুক্ত রাখার প্রতিশ্রুতি নিয়েই বুঝি বিজয়নগরের জন্ম হয়েছিল। কত ত্যাগস্বীকার, কত অবমাননা, কত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চলেছে। ঘরবাড়ি শ্মশান হয়েছে, রাজধানী লুণ্ঠিত হয়েছে। আবার উঠেছে বিজয়নগর, আবার বাহমনির সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। শেষ পর্যন্ত বাহমনি রাজ্য ভেঙে গিয়ে পাঁচটি বিবদমান স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের উত্থান ঘটাল। আর বিজয়নগরে এলেন তার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-৩০)। বিজয়নগর গৌরবের শীর্ষস্থানে পৌঁছাল।

কেমন করে কোন্ মন্ত্রগুপ্তিতে বিজয়নগর এত শক্তির ও তিতিক্ষার অধিকারী হল—সেই দেশের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা সিউয়েল সাহেব তার ততটা ব্যাখ্যা করেননি তাঁর বিখ্যাত 'A Forgotten Empire' গ্রন্থে। স্বামীজী তার সূত্রদান করেছেন। বিজয়নগরকে তিনি বিদ্যানগর বলে উল্লেখ করেছেন। বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা মাধব বিদ্যারণ্যের নামেই বুঝি বিদ্যানগর নাম। যেখানে নিকলো কন্টি, আব্দুল রেজ্জাক, নুনিজ ও পায়েস প্রমুখ বিদেশী পর্যটকগণ বিভিন্ন সময়ে পরিভ্রমণ করেছেন, যার বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁদের কেউ কেউ লিখেছেন যে, সমগ্র বিশ্বে বিজয়নগর আর দ্বিতীয়টি নেই, যা কর্ণ কখনও শ্রবণ করেনি, চক্ষু কখনও দর্শন করেনি—ওটি ঠিক সেরকম একটি কল্পনার রাজ্যঃ সেই বিদ্যানগর বা বিজয়নগর নামের মধ্যেই তার তাৎপর্য স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় প্রতিবিম্বিত করেছে।

'এই দক্ষিণদেশেই—যখন উত্তর ভারতবাসী "আল্লা হু আকবর, দীন্ দীন্" শব্দের সামনে ভয়ে ধনরত্ন ঠাকুর-দেবতা স্ত্রী-পুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল, (তখন) রাজচক্রবর্তী বিদ্যানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দক্ষিণদেশেই সেই অদ্ভুত সায়নের জন্ম—যাঁর যবনবিজয়ী বাহুবলে বুক্করাজের সিংহাসন, মন্ত্রণায় বিদ্যানগর সাম্রাজ্য...।'[২২]

উক্ত উদ্ধৃতিতে সায়নাচার্যের ভ্রাতা মাধব বিদ্যারণ্যের নাম নেই, বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠাতা বুক্কের মন্ত্রদাতা ও পথপ্রদর্শক তিনিই ছিলেন। দীক্ষিত বুক্ক ও ভ্রাতা হরিহর ঐ দুই ঋষির শিষ্য হয়ে সনাতন ধর্মে ফিরে এসে ধর্মরাজ্য স্থাপনের মন্ত্রে উদ্বোধিত হলেন। মাধব বিদ্যারণ্য এবং ভ্রাতা সায়নাচার্য যিনি মধ্যযুগে লুপ্তপ্রায় মহাগ্রন্থ বেদকে উদ্ধার করেছিলেন, উত্তরকালকে দিয়ে গিয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠ ভাষ্য—এই মহামনীষী সন্ন্যাসিদ্বয় ছিলেন বিজয়নগর প্রতিষ্ঠার দার্শনিক। মাধব বিদ্যারণ্য ও সায়নাচার্যের নেতৃত্বে যে 'আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান' ঘটেছিল, তাতেই নিহিত রয়েছে বিজয়নগরের শক্তি

২২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮৪

ও তিতিক্ষার উৎস। এই আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান সহনশীলতা ও সমন্বয়কে দোসর করে যতদিন কার্যকর ছিল ততদিনই ছিল বিজয়নগরের সামগ্রিক সমৃদ্ধি। কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিবের রাজত্বকালে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল প্রধান অমাত্য বলদর্পী উচ্চাভিলাষী রামরাজার হাতে। তখন বিদ্যারণ্য ও সায়নাচার্যের মন্ত্র রাজকার্যকে আর নিয়ন্ত্রিত করত না, কূটনীতি আর যুদ্ধনৈপুণ্য এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রধান হয়ে পড়ল। একদা মুসলিম রাজ্য আহমদনগরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে বিজয়নগরের হিন্দুবাহিনী তাণ্ডব নৃত্য শুরু করল, মসজিদ ধ্বংস করল, কোরান অপবিত্র করল। ইসলামের এই অবমাননায় দক্ষিণ ভারতের তিনটি সদ্যবিবদমান মুসলিম রাজ্য (আহমদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর—পূর্বে এই তিনটিকেই জড়িয়ে ছিল বাহমনি সাম্রাজ্য) একত্রিত হয়ে পালটা প্রতিশোধ নিলে, তেলিকোটার প্রান্তরে (১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) বিজয়নগরের সমাধি রচনা করল, বিজয়নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

ঋষির মন্ত্রের প্রভাব এবং তার অভাবে নিছক রাজনীতি ও কূটনীতি এভাবেই ভারত-ইতিহাসে রাজ্য গড়েছে ও ভেঙেছে। এ তত্ত্ব মারাঠাজাতির ইতিহাসে আরও বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। স্বামীজী 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ'-এ উক্ত জাতির প্রতিষ্ঠার মূল কথা যথারীতি দু-চারটি পঙ্‌ক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন: '...সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্যের দক্ষিণবিজয় যখন প্রায় সমাপ্তির মুখে, ঠিক তখনই সেই ভূখণ্ডের পার্বত্যপ্রদেশ হইতে, মালভূমির নানাপ্রান্ত হইতে কৃষকগণ অশ্বারোহী যোদ্ধবেশে দলে দলে কাতারে কাতারে রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। রামদাস-প্রচারিত, তুকারাম-সমুদ্গীত ধর্মের জন্য তাহারা প্রাণ বিসর্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য নামমাত্রে পর্যবসিত হইল।'[২৩]

ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই মুঘল-পতনের প্রধান কারণ স্বামীজী যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার সঙ্গে একমত হবেন। গোঁড়া একদেশদর্শী আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির শেষ পর্যন্ত চরম ব্যর্থতা, শিবাজী-প্রতিষ্ঠিত উদ্দীপিত মারাঠাজাতির বৎসরের পর বৎসর ধরে নেতৃবিহীন জনযুদ্ধ, ভগ্নমনোরথ আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে আহমদনগরে প্রাণত্যাগ (১৭০৭), এবং তারপর দ্রুতগতিতে ভারতজোড়া মুঘলসাম্রাজ্যের পতন ও সমগ্র দেশের শোচনীয় দুর্গতি—এসব তৎকালের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুঘল-ইতিহাসের সর্বাগ্রগণ্য ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারের মন্তব্য অনুসরণ করে বলা যায়—তাঁর (আওরঙ্গজেবের) অসামান্য কৃতিত্বের (পিতা শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে প্রধানত সুবেদার রূপে) লীলাভূমি দাক্ষিণাত্য, তাঁর সমাধিভূমিও ঐ দাক্ষিণাত্য। মারাঠাকে আওরঙ্গজেব ঘৃণাভরে বলতেন 'পার্বত্য মূষিক'। এই 'পার্বত্য মূষিকে'র দলই মুঘল-সাম্রাজ্যের ভিতকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল।[২৪]

শিবাজী এক অনন্য দুর্ধর্ষ মারাঠাজাতি গড়েছিলেন, কৃষক মাওলি সম্প্রদায়কে

২৩। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৩

২৪। History of Aurangzib, Vol. V—Sir Jadunath Sarkar, M. C. Sarkar & Sons, Calcutta, 1924

যুদ্ধবিদ্যায় অসামান্য পারদর্শী করে তুলেছিলেন, অপূর্ব ঔদার্যের ভিত্তিতে এক আশ্চর্য শাসনপদ্ধতি রচনা করেছিলেন। সমগ্র জীবন তিনি যুদ্ধ করেছেন আদর্শ 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠাকল্পে, ক্ষুদ্র এক জায়গীরদারের পুত্র হয়েও তিনি 'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা' আওরঙ্গজেবকে পর্যুদস্ত করে তাঁর কাছ থেকে স্বাধীন মারাঠা 'ছত্রপতি'র স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন। মাত্র ছ-বৎসরকাল ধরে (১৬৭৪-৮০) এক নবোত্থিত জাতির নায়ক হয়ে তিনি যে-ইতিহাস রচনা করেছিলেন, যে-ভাবধারা তিনি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সমগ্র মারাঠাজাতির অন্তরে গেঁথে দিয়েছিলেন, তারই প্রত্যক্ষ প্রভাবে তাঁর মৃত্যুর পরেও মারাঠাজাতি এমন করে আওরঙ্গজেবের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ঠেকাতে পেরেছিল, চরম দুর্গতি ও অনিশ্চয়তাকে করেছিল অঙ্গের ভূষণ, প্রতি গৃহকে পরিণত করেছিল দুর্গে। একমাত্র সঙ্কল্প ছিল মৃত্যু কিংবা স্বাধীনতা। এরকম জনযুদ্ধের কাহিনী ইতিহাসে কমই পাওয়া যাবে।

কি সে মন্ত্র যা শিবাজীর মৃত্যুর পরেও শতাধিক বর্ষকাল এত বড় ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল? বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের বৃহদংশের মালিক ছিল পেশোয়াশাহীর অধিনায়কত্বে শক্তিমান মারাঠারা। প্রায় ভারতজোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ওয়েলেসলি পর্যন্ত এদেশে গভর্নর জেনারেল হয়ে প্রথমে ভেবেছিলেন যে, ভারতবর্ষের বিভাজন হবে শেষ পর্যন্ত দুটি শক্তির মধ্যে—ইংরেজ ও মারাঠা। অবশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ওয়েলেসলির ভুল ভেঙেছিল। মারাঠাশক্তি তখন চরম অনৈক্যে প্রপীড়িত, আদর্শচ্যুত ও তথাকথিত কূটনৈতিক গ্লানিময় রাজনীতির কলুষে আপ্লুত। গোঁড়ামি, অবিশ্বাস ও পরস্পর হানাহানিতে মারাঠা তখন শিবাজীদত্ত মন্ত্রকে ধূলিসাৎ করেছে। তার চৈতন্যশক্তি তখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আদর্শচ্যুত আত্মবিলুপ্ত মারাঠাজাতি আকারে বৃহৎ তার ভূখণ্ডকে ইংরেজের কাছে যেন বিলিয়ে দিল। তিনটি ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (যথাক্রমে ওয়ারেন হেস্টিংস, ওয়েলেসলি ও লর্ড হেস্টিংসের আমলে) মারাঠা চরিত্রের শোচনীয় পরিণতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এই মন্ত্রই তুকারাম, রামদাসের সাধনালব্ধ সম্পদ। রামদাস তা শিবাজীকে দান করেন। রামদাস ছিলেন শিবাজীর প্রত্যক্ষ গুরু ও দার্শনিক, তিনিই শিবাজীর হাতে তুলে দেন জাতীয় পতাকা—গৈরিক পতাকা। গুরুর অনন্য শিষ্য শিবাজী ঐ গৈরিক পতাকার তাৎপর্য শুধু নিজের অসামান্য কার্যাবলীতেই প্রকাশ করেননি, জাতীয় ঐতিহ্যরূপে তাকে দিয়েছিলেন উত্তরকালের মারাঠাদের। শিবাজীর বিশুদ্ধতা ও মন্ত্রানুরাগের প্রশংসাপত্র অপ্রত্যাশিত স্থান হতেও এসেছে। হিন্দুবিদ্বেষী আওরঙ্গজেবের সুহৃদ্ দরবারী ঐতিহাসিক কাফি খাঁ শিবাজীকে নরকের কীট বলে বর্ণনা করেছেন ব্যর্থ আক্রোশে, তবুও অবাক বিস্ময়ে একথা না লিখে পারেননি যে, এই ঘৃণ্য কাফের ইসলামকে কত শ্রদ্ধা করে, মসজিদ নির্মাণে মন্দির নির্মাণের মতোই অর্থ সাহায্য করে, মুসলমান ফকিরকে গুরুর শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে, মুসলিমদের মতোই কোরানকে পবিত্র মনে করে। মারাঠাজাতির পতন ও অবলুপ্তির প্রধান কারণ পেশোয়াদের আমলে আর কোন 'আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান' ঘটল না। দারুণভাবে পরাজিত হয়েছিল মারাঠারা ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথ প্রান্তরের তৃতীয় যুদ্ধে। তার প্রধান কারণ পেশোয়া বালাজী

বাজিরাও-এর ধর্মহীন কূটনীতি এবং মারাঠাজাতির জীয়নকাঠি শিবাজীদত্ত মন্ত্রের অপব্যবহার বা অপব্যাখ্যা। মারাঠা আবার জেগেছিল পেশোয়া মাধব রাও, নানা ফড়নবীশ, মহাদাজী সিন্ধিয়া, অহল্যাবাঈ প্রমুখ নেতৃবর্গের প্রয়াসে। কিন্তু তা ছিল সাময়িক।

চরম দুর্গত অষ্টাদশ শতাব্দীর গাঢ় তমিস্রা ভেদ করে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে যে সূর্যোদয় হয়েছিল তার কিরণ ইউরোপীয় (ইংরেজ) বণিক সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য থেকে ধার করা। তখন কেমন করে 'ভারত' হারিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে ব্যাপক হানাহানিতে বৃহদাকার ভারত দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে গেল, স্থানাভাবে সে কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করা যাচ্ছে না। ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই তা জানেন। স্বামীজীর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ 'শত্রু ও মিত্র, মোগলশক্তি ও তাহার ধ্বংসকারীরা এবং তৎকাল পর্যন্ত শান্তিপ্রিয় ফরাসী, ইংরেজ-প্রমুখ বিদেশী বণিকদল এক ব্যাপক হানাহানিতে লিপ্ত হইয়াছিল। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল যুদ্ধ লুণ্ঠন ও ধ্বংস ছাড়া দেশে আর কিছুই ছিল না। পরে সে তাণ্ডবের ধূমধূলি যখন অপসারিত হইল, তখন দেখা গেল সকলের উপর জয়লাভ করিয়া সদম্ভ পদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে —ইংরেজশক্তি।'[২৫] এ যে কত ইতিহাসসম্মত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গুরু গোবিন্দ সিংহের মন্ত্রে উদ্দীপিত শিখজাতি শুধু মাতৃভূমি পাঞ্জাবে তার বলিষ্ঠ পতাকা উড্ডীন রেখেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

শিখজাতির উত্থান-পতনের কথা যাঁরা জানেন তাঁরাই উপলব্ধি করবেন স্বামীজীর নিম্নোক্ত মন্তব্যের সারবত্তা। এই সময়ে (অষ্টাদশ শতাব্দীতে) '...একজন শক্তিমান দিব্য পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। সৃজনী-প্রতিভাসম্পন্ন শেষ শিখগুরু—গুরু গোবিন্দসিংহের আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর ফলেই শিখসম্প্রদায়ের সর্বজনবিদিত রাজনীতিক সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল।'[২৬] এবং সে কার্যাবলী বা মন্ত্রের অভাবেই শিখজাতি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্বস্ব হারাল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই শুরু হল বাংলার তথা ভারতের পুনর্জাগরণ বা রেনেসাঁস। ঐ পুনর্জাগরণের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা। অপর দিকে ইংরেজ জাতির পরম গর্বের ধন ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীও ঐ কলকাতা। ভারতের আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের সূত্র ধরে আমাদের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলন। কলকাতা এদিক দিয়ে অনন্য। কারণ এ শুধু ইংরেজের রাজনৈতিক প্রাধান্যের কেন্দ্রভূমি নয়, এ সেই প্রজ্ঞাবান ঋষিপ্রতিম দেশপ্রেমিক মনীষীদেরও বিদ্যানিকেতন—প্রাচীন তক্ষশিলা বা কাশীর মতো—যেখানে আধুনিক জাতীয় জীবন বিকশিত হয়ে সমগ্র ভারতের বুকে ছড়িয়ে গেছে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ থেকে স্বয়ং বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ—এঁরাই তো আধুনিক ভারতীয় জাতির মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, এঁদেরই কর্মভূমি এবং রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের বেলায় জন্মভূমিও এই কলকাতা। স্বামীজীর দেওয়া জাতিগঠনের সূত্রগুলি অবলম্বন করে আমাদের

২৫। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪ ২৬। তদেব

স্বাধীনতা-আন্দোলনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ধরতে পারা কঠিন কাজ নয়। বর্তমান লেখক স্থানাভাবের দরুন সে কাজে বিরত হলেন।

॥ ৫ ॥

এবার সমন্বয়ের (synthesis-এর) কথা। বিদেশী ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন যে, ভারতীয় সভ্যতা একক বিশিষ্টতাপূর্ণ কোন সভ্যতা নয়। এখানে মিলেছে 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা', বহু বিদেশী ভাবধারার মিলন ঘটেছে ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতায়। বস্তুত ভারতের প্রগতি ও সমৃদ্ধির উৎসমুখই এই সমন্বয়। যে ধর্মকে স্বামীজী ইতিহাসের নিয়তি বলেছেন, সেই ধর্মবোধই এই সমন্বয়কে যুগে যুগে সম্ভব করেছে। স্বামীজীর বিখ্যাত শিকাগো বক্তৃতা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যার কয়েকটি পঙ্ক্তি পূর্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে এই সমন্বয় রূপ ধরেছেঃ

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হূন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।[২৭]

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সমৃদ্ধ সমন্বয়ীকৃত রূপ ইতিহাসের ধারায় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে দীর্ঘস্থায়ী আর্য-অনার্য সঙ্ঘর্ষ, বহিরাগত জাতিসমূহের সঙ্গে ভারতীয় রাজবংশের অবিরাম সংগ্রাম এবং ফলাফল—এসবই প্রধান হয়ে আছে। কিন্তু সঙ্ঘর্ষের পরিসমাপ্তিতে সুদূরপ্রসারী সংহত সুসমঞ্জস ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ-বিশ্লেষণ ততটা প্রাধান্য পায়নি। স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় এটাই প্রধান হয়ে আছে।

আর্য-অনার্য সঙ্ঘর্ষের কথাই ধরা যাক। আমাদের ধারণা আর্য বিজয়ী, এবং ভারতের প্রাক্-আর্য বা অনার্য বিজিত ও আর্যের দাসে পরিণত। আমরা মনে করি যে, আমরা শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায় আর্যদের উত্তরাধিকারী। আর তথাকথিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনার্য রক্ত ও সংস্কৃতি প্রবহমান। আপাতদৃষ্টিতে এ ধারণা হয়তো অনৈতিহাসিক নয়।

কিন্তু বাইরের এই ইতিহাসের পশ্চাতে যে একটি নীরব বিপ্লব ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে যুগ যুগ ধরে চলেছিল, তার বলিষ্ঠ ইঙ্গিত আমরা আর্য ঋষি ও মনীষীদের দ্বারা রচিত বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও নানা স্থানে ছড়ানো দেখতে পাব। মহাভারত ও রামায়ণের রচনার সঠিক তারিখ নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও এটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায়, সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অব্যাহত ধারা—তার বলিষ্ঠ বিকাশ ঐ দুটি মহাগ্রন্থকে বিধৃত করে রেখেছে। রামায়ণের রামচন্দ্র অনার্য সৈন্যের সাহায্য নিয়েই রাবণ বধ করে ধর্ম রক্ষা করেছিলেন, অনার্য ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাবীর হনুমানের জীবনচর্যায় আর্যধর্মের মহত্তম দিক প্রস্ফুটিত। মহাভারতের প্রধান ঘটনা যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ—তা তো প্রধানত ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে যুদ্ধ। মন্ত্রদ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ

২৭। সঞ্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ৫০৭

ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন পাণ্ডবদের হাতিয়ার করে, এবং এই ধর্মরাজ্যে তথাকথিত আর্য ও অনার্যের তুল্য মর্যাদা সমন্বয়ের ভিত্তিতে স্বীকৃত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও আমরা দেখতে পাব যে, পাণ্ডবপক্ষে যোদ্ধারা ছিলেন প্রধানত মহাবীর ঘটোৎকচ প্রমুখ অনার্য বীরবৃন্দ আর কৌরবপক্ষে ছিলেন আর্যাভিমানী সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া আর্য রাজন্যবর্গ। এই সঙ্কীর্ণ, গ্রহণবিমুখ, সমন্বয়বিরোধী, শ্রেণীচেতন ভাবধারা দুর্যোধনের মধ্যে মূর্ত হয়েছে। তাই তাঁর মহীয়সী জননী গান্ধারীও আশীর্বাদকালে তাঁকে বার বার বলেছিলেন—'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'। কৌরবপক্ষে অলাযুধের মতো অনার্য বীর ছিলেন বটে, কিন্তু সেটা ছিল ব্যক্তিগত আক্রোশজনিত। আর কর্ণ যে সূতপুত্র নন, পরম অভিজাত বংশের (সূর্য ও কুন্তী নন্দন), তা তো তিনি যুদ্ধের আগে থেকেই জানতেন। ব্যক্তিগত আক্রোশেই মহাবীর কর্ণ তাঁর সহোদর ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরাদির বিপক্ষে গিয়েছিলেন, এবং যোগ্যতার দাবিতে দুর্যোধনের প্রধান সুহৃদ্ হয়েছিলেন।

গ্রীক, শক, পহ্লব ও কুশাণদের ভারতে রাজ্যবিজয় ও শাসন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে এদেশেরই গৌরবান্বিত অধিবাসী হওয়া, তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ঐ বহিরাগত জাতির কাছেও কম ঋণী নয়। বস্তুত সামঞ্জস্য হয় দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে। গ্রীকদের কাছে ভারত তার শিল্পকলায় অনেক কিছু পেয়েছে। কুশাণসম্রাট কনিষ্কের মহাযান বৌদ্ধধর্মের বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা তো ভারতের বৌদ্ধসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ।

বর্বর হূনরা এদেশে আসতে শুরু করে গুপ্তযুগে। দীর্ঘকাল লেগেছিল ভারতীয় রাজন্যবর্গের তাদের পর্যুদস্ত করতে। গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্ত, পুরগুপ্ত ও ভানুগুপ্ত, মালবরাজ যশোধর্মন, থানেশ্বর-রাজ প্রভাকর বর্ধন (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী) এঁদের একে একে কতই না সঙ্ঘর্ষ হয়েছিল দুর্ধর্ষ, অমানুষিক নিষ্ঠুর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হূনদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত হূনেরা পরাভব মেনে রয়ে গেল মধ্য ও পশ্চিম ভারতে, মিশে গেল হিন্দুর সমাজে। ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেব বলেনঃ রাজপুত জাতিবর্গ—যারা অভিমানী ক্ষত্রিয় বলে গর্ব করে মধ্যযুগে মুসলিম সুলতান বা সম্রাটদের কাছে শত পরাজয়েও মনুষ্যত্বের দার্ঢ্যে ও তিতিক্ষার গৌরবে অনন্য ইতিহাস রচনা করেছে, তাদের ধমনীতে হূনরক্ত বহমান। ভারতীয় গুণাবলীর উত্তরাধিকারের সঙ্গে তারা তাই যুক্ত করেছিল হূনসুলভ অসামান্য সহনশক্তি ও অস্বাভাবিক দুর্ধর্ষতা।

সমন্বয়ভিত্তিক আদানপ্রদানের ধারা রুদ্ধ হল একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে যার ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি আলবেরুনীর পূর্বোক্ত মন্তব্যের উদ্ধৃতিতে। তাই এসেছিল হিন্দুভারতের অবনতি ও পতন। তুর্কী, পাঠান ও মুঘলকে মধ্যযুগের অনুদার হিন্দুসমাজ সহজে আপন করে নিতে পারেনি, তার কারণ অবশ্য বিজয়ী মুসলিমদের মনোবৃত্তি ও কার্যকলাপে নিহিত রয়েছে। দুটি সমাজ (হিন্দু-মুসলিম) পাশাপাশি থেকেও পরস্পর থেকে বহুদূরে, সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ততাপূর্ণ, হিন্দু তখন নিজের সংস্কৃতি ও ধর্মকে বাঁচাতে অত্যন্ত রক্ষণশীল, মুসলিম তখন ব্যাপৃত কাফের নিধনে বা অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাতে আর হিন্দুকে মুসলমান করার কার্যে। কিন্তু এ অস্বাভাবিক অবস্থা চিরদিন চলতে পারে না, মুসলিম তো এদেশকেই স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছে, যদিও

এদেশের অধিবাসী তার কাছে ঘৃণ্য জিম্মিমাত্র, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকমাত্র। নীরবে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রীতিভাজন না হলেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। এলেন সাধুসন্তরা সমন্বয়ের বাণী নিয়ে, একই ঈশ্বরের সন্তানের দাবিতে ঐক্যের বাণী নিয়ে। প্রধানত এঁরা ছিলেন হিন্দু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত, ইসলামের ভাবধারাতেও শ্রদ্ধান্বিত। স্বামীজী বলেছেনঃ মূলত হিন্দুসমাজকে রক্ষা করতেই ছিল এঁদের প্রয়াস এবং তা রক্ষণশীলতার ভিত্তিতে নয়, ঔদার্যের ভিত্তিতে। কিন্তু তাঁরা নতুন মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা উত্তর ভারতে কোন সমন্বয়ভিত্তিক রাজ্য গঠনের সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করার সুযোগ পেলেন না। কথাটা ঐতিহাসিক সত্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুর্গত ভারতের আত্মবিলুপ্তি, বিচ্ছিন্নতা, সঙ্কীর্ণতা এবং ব্যভিচারের সুযোগ নিয়েই বিদেশী ইংরেজ বণিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, ইংলণ্ডের স্বার্থে চলেছিল তাদের ভারত শাসন ও শোষণ। আমাদের উপস্থিত কর্তব্য নিরূপণ করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেনঃ '...পরদেশ-বিজয় মাত্রেই মন্দ, বৈদেশিক শাসন নিশ্চয়ই অশুভ। তবে অশুভের মধ্য দিয়াও কখন কখন শুভ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। ...ইউরোপের বিজ্ঞান শিল্প—সর্বত্র গ্রীসের ছায়া। আজ ভারতক্ষেত্রে সেই প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু একত্র মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের ফলে ধীরে ও নিঃশব্দে একটা পরিবর্তন আসিতেছে, আমরা চতুর্দিকে যে উদার জীবনপ্রদ পুনরুত্থানের আন্দোলন দেখিতেছি, তাহা এইসব বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের ফল। মানবজীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রশস্ততর হইতেছে।'[২৮]

কত গভীরে প্রবেশ করে স্বামীজী ঊনবিংশ শতাব্দীর পুনর্জাগরণের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন, উপরোক্ত উদ্ধৃতি তার কিছু ইঙ্গিত দান করছে। এই সম্ভাবনার ভিত্তি সমন্বয়—পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন। এবং তার প্রথম পুরোহিত রামমোহন। স্বামীজীর কথাতেই বলিঃ 'আমাদের পতনের অন্যতম কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করি নাই...। যেদিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে-একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে।'[২৯] নবজাগরণের প্রথম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি রামমোহন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকে সাদরে বরণ করে এবং তাকে ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত করে ভারতের আধুনিক প্রগতিশীল পথের নির্মাণকার্যে তাঁর সমগ্র কর্মজীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রচণ্ড বাধা এসেছিল রক্ষণশীল দেশবাসীর কাছ থেকে, কিন্তু রামমোহন তাঁর আদর্শে অবিচল ছিলেন।

ঐতিহাসিক কারণে রামমোহনের কর্মধারা ও বাণীনির্ঝরকে কেন্দ্র করে কালক্রমে আলাদা ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ গড়ে উঠল। বৃহত্তর রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে ব্রাহ্মসমাজও হয়ে উঠল রক্ষণশীল, পরস্পরের ব্যবধান প্রশস্ততর হতে লাগল, অনৈক্য ও সঙ্কীর্ণতার পঙ্ককুণ্ডে সমন্বয় ও প্রগতি নানা বিপরীত দোলায় দুলতে লাগল।

২৮। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৬৫ ২৯। তদেব, পৃঃ ২১৪

এই পটভূমিতে এলেন সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ। মাদ্রাজে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় স্বামীজী তাঁর আচার্যদেবের আবির্ভাবকে বর্ণনা করেছেন এইভাবেঃ '...এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল...যিনি একাধারে শঙ্করের মহতী মেধা ও চৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন...যাঁহার হৃদয় ভারতে বা ভারতের বাহিরে দরিদ্র দুর্বল পতিত—সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করিবে...এবং এইরূপ বিস্ময়কর সমন্বয়ের দ্বারা হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সার্বভৌম ধর্ম প্রকাশ করিবে।...অদ্ভুত ব্যাপার এই, তাঁহার সমগ্র জীবনের কার্য এমন এক শহরের নিকট অনুষ্ঠিত হয়, যে-শহর পাশ্চাত্যভাবে উন্মত্ত হইয়াছিল...। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁহার কিছুই ছিল না...কিন্তু প্রত্যেকে—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারী ব্যক্তিগণ পর্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া একজন মহামনীষী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ...ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণপ্রকাশস্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের...উপদেশ আধুনিক যুগে আমাদের নিকট বিশেষ কল্যাণপ্রদ।'[৩০]

রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে বলেছিলেন ঃ

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।[৩১]

বস্তুত, সমন্বয়প্রাণ ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। রামমোহনে যে জাগরণের শুরু, তার পরিপূর্ণতা বিকশিত হল শ্রীরামকৃষ্ণে। স্বামীজী গুরুর জীবনরূপী সূত্রকে নিজের কর্মজীবনে ভাষ্যের ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যময় করে রেখেছেন।

হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের সুরে বৈদান্তিক মহামনীষী রামমোহন তৎকালীন হিন্দুর আচারসর্বস্ব বহু দেবতার পূজা এবং ধর্মের নামে বহুবিধ অমানুষিক ও অনৈক্যসূচক সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের কোলাহল থেকে একেশ্বরবাদ উদ্ধার করলেন। সেই ভিত্তিতে ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে কালক্রমে পৌত্তলিক জ্ঞানে বৃহৎ হিন্দুসমাজ থেকে আলাদা হয়ে মুষ্টিমেয় আলোকপ্রাপ্ত শহরবাসীর মধ্যে আবদ্ধ রইল। অনৈক্য ও ব্যবধানের মাত্রা গেল বেড়ে। পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রখর আলোকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বৃহদংশের চোখও ধাঁধিয়ে গেল। একটা হীনম্মন্যতাবোধ ভারতীয় সমাজকে গ্রাস করল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনন্য সাধনার বলে হিন্দুর লৌকিক ধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন ব্রহ্মকে, আধ্যাত্মিকতার হারানো সুর ফিরিয়ে আনলেন হিন্দুর সাকার পূজার মধ্যে, সহজ সরল কিন্তু গভীর ব্যঞ্জনায় মিলনের গান গাইলেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের ধর্মমতে একই ব্রহ্মের সার্থক উপাসনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ অমূল্য বাণী দান করলেনঃ 'যত মত তত পথ'। শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরসাধক বিবেকানন্দ পশ্চিমকে সাদরে গ্রহণ করে গৌরবান্বিত ভারতীয় হয়ে থাকার সূত্র সমগ্র কর্মজীবনে বলিষ্ঠ হাতে তুলে ধরলেন। ধর্মাশ্রয়ী পুনর্জাগরণ সমন্বয়ের সোপান বেয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে

৩০। তদেব, পৃঃ ১৬১-৬২

৩১। রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ (১৩৬৮), পৃঃ ৯৭১

উঠল। ভারত তার হীনম্মন্যতা কাটিয়ে উঠে বলিষ্ঠ নব-ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হল।

'মদীয় আচার্যদেব' (My Master) গ্রন্থে স্বামীজী বলেছেন: 'অন্যান্য আচার্যেরা বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, সেইগুলি তাঁহাদের নিজ নিজ নামে পরিচিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহান আচার্য নিজের জন্য কিছুই দাবি করেন নাই। তিনি কোন ধর্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই, কারণ তিনি সত্যসত্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ঐ ধর্মগুলি এক সনাতন ধর্মেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।'[৩২]

ভারতীয় জাগরণের পূর্ণরূপ, ভারতের জাতীয়তার সার্থক মূর্তি এইভাবেই সমন্বয়ের পথ বেয়ে অগ্রসর হল। এই জাগরণের পটভূমিতে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ, ধর্মের বাঁধনে দৃঢ়বদ্ধ, সমন্বয়ের সূত্রে একতাবদ্ধ হল এই জাতি। আদর্শনিষ্ঠ তরুণ সমাজ এক অপূর্ব উন্মাদনায় আপসহীন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহাশক্তিধর ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে, স্বাধিকার স্থাপনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল।

হিন্দু-মুসলিম সমস্যা,. যা আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকে কলুষিত করেছে—তার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক দেশপ্রেমিকবৃন্দ ধর্মাশ্রয়ী সমন্বয়ের পথ থেকে স্খলিত হয়ে রাজনীতিক জোড়াতালি বা 'প্যাক্ট'-এর মাধ্যমে আসন-ভাগাভাগির নীতি গ্রহণ করেছিলেন বা পরিস্থিতির চাপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলিমের ভুল-বোঝাবুঝি তাতে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। তাকে আর এক মাত্রা বাড়িয়ে দিল সাম্রাজ্য রক্ষায় যত্নবান ইংরেজ শাসকদের ভেদনীতি ও পক্ষপাতিত্বের চাতুর্য। নিষ্ঠুর রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভারতের জাতীয়তাবাদ কলঙ্কিত হল। স্বাধীনতা-যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে স্বামীজীর উত্তরসাধক নেতাজী হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান নির্বিশেষে অপূর্ব ত্যাগের ভিত্তিতে যে গৌরবান্বিত ভারতীয় বোধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 'আজাদ হিন্দ' বাহিনী গড়েছিলেন, ঐক্যের সেই মহান আদর্শ আমরা বজায় রাখতে পারিনি।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী সরফরাজ হোসেন নামে এক বন্ধুকে এক লিপি প্রেরণ করে বলেছিলেন: 'আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই...একমাত্র আশা।'[৩৩] '...বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। ...আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।'[৩৪]

'যুগে যুগে ভারত একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে—মুক্তি কোন্ পথে?' এই উক্তি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের, যিনি ছিলেন সমন্বয়প্রাণ ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্তিস্বরূপ।

৩২। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৯৩

৩৩। তদেব, পৃঃ ৩৯ ৩৪। তদেব

এ-মুক্তির ব্যঞ্জনা ধর্মে, দর্শনে ও সমন্বয়ে। এই মুক্তির প্রকৃত অর্থ দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সব রকম স্বাধীনতা। বর্তমানে স্বাধীন ভারতেও আমরা রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপরই স্বভাবত জোর দিয়ে থাকি এই বলে যে, এটাই ভারতের যুগধর্ম বা আপদ্ধর্ম। এদিকে রাষ্ট্রশাসন-নীতির নিশ্চয়ই প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত। কিন্তু তারও আগে যাদের জন্য এসবের প্রয়োজন তাদের অর্থাৎ ভারতীয়গণের ঐতিহ্যগত নিজস্বতাকে ইতিহাসের গভীর জটিল অরণ্য থেকে খুঁজে পেতে হবে এবং সেভাবে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সকলের অন্তরে গেঁথে দিতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঋষি ও মনীষীদের এবং ভারতপ্রেমিকদের কর্মে ও মননে সমন্বয়ধর্মী চিরন্তন ভারত যেকথা কয়ে উঠেছিল, তার উপযোগিতা ও প্রয়োজন আজ বোধহয় আরও জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। সেকুলার ডিমক্রেসির অর্থ করা হয় ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র। ধর্মনিরপেক্ষ নয়, ধর্মমতনিরপেক্ষ এবং সকল ধর্মে সমান শ্রদ্ধা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির অত্যাজ্য আনুষঙ্গিক। এবং স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় ভারত-ইতিহাসের এই ঐতিহ্যই এই জাতির শক্তি ও প্রগতির মূল উপাদানরূপে গৃহীত হয়েছে।

॥ ৬ ॥

স্বামীজী ভারতের অতীতকে জ্ঞান ও উপলব্ধির দ্বারা বর্তমানের পটভূমিকায় জীবন্ত করে তুলেছেন ; এবং বিচার করে ও যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণের দ্বারাই তা করেছেন। শাশ্বত ভারতের মূর্তির ছকে ভারত-ইতিহাসের শত উত্থান-পতনের কার্যকারণ-সম্পর্ক তিনি নির্ণয় করেছেন। ভবিষ্যৎ ভারতের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তার সমর্থনে তিনি অতীত ও মধ্যযুগের বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তারই কিয়দংশ আলোচনার কিঞ্চিৎ প্রয়াস বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য।

একদা মাদুরা-অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেনঃ '...কোন সেনাপতি বা রাজা কোনকালে আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না, ঋষিগণই চিরকাল আমাদের সমাজের নেতা।'[৩৫] তারও পূর্বে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী মাদ্রাজবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে আমেরিকার বোস্টন শহর থেকে প্রেরিত দীর্ঘ এক লিপিতে নানা কথাচ্ছলে লিখেছিলেনঃ 'ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে ; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ-সহায়ে...।'[৩৬]

স্বামীজীর ইতিহাসচেতনার এই মর্মবাণী ভারতের বর্তমান অবস্থাতে প্রযোজ্য কিনা তা বিচারের ভার ইতিহাসবিদ্ দেশপ্রেমিকদের উপর। ইতিহাসশিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্তমান স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে এই চেতনা বা চৈতন্যের আলোকে পরিবর্তন করা সম্ভব কিনা তাও সুধীজনের বিচার্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'গোরা' উপন্যাসে গোরার মুখে একটি মূল্যবান কথা বসিয়েছেনঃ 'ভারতবর্ষের পরিবর্তন ভারতবর্ষের পথেই

৩৫। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৬৪ ৩৬। তদেব, পৃঃ ৪৬৫

হওয়া চাই, হঠাৎ ইংরাজি ইতিহাসের পথ ধরলে আগাগোড়া সমস্ত পণ্ড ও নিরর্থক হয়ে যাবে।'[৩৭] আর স্বামীজী বললেন: 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?'[৩৮] এই দুয়ের মর্মার্থ সমপর্যায়ের।

ইতিহাসের যে বিন্যাস বিবেকানন্দের চেতনায় সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠেছে, তাতে নিছক যুক্তিবাদী অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী কারও কারও মনে হতে পারে যে, এটি বাস্তব সম্পর্কশূন্য আদর্শবাদ মাত্র। কিন্তু যিনি বীরহৃদয় যুবকবৃন্দকে সম্বোধন করে একদা বলেছিলেন: 'তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। ...অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে।'[৩৯]—তিনি যে পশ্চাদ্‌গামী ঐতিহ্যবাদী মোটেই নন, একজন পরম বিপ্লবী প্রগতিশীল চিন্তানায়ক—এইটুকু বুঝতে কারও কোন অসুবিধে হবে না। স্বামীজী 'প্রভু'র আসনে এখানে ভারত-ইতিহাসের মূলতত্ত্বকে বসিয়েছেন—বর্তমান লেখকের তা-ই বিশ্বাস। এবং সেই মূলতত্ত্ব ধর্ম, মন্ত্র ও সমন্বয়কে ঘিরে নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে।

৩৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৪৯১

৩৮। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯

৩৯। তদেব, পৃঃ ৩৬৭

স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞানচেতনা

॥ ১ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ এক যুগন্ধর পুরুষ, এক লোকোত্তর প্রতিভা। একাধারে ধী, মেধা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এবংবিধ সমন্বয় সচরাচর সঙ্ঘটিত হতে দেখা যায় না। ঊনবিংশ শতকে বাঙালীর জীবনে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন এসেছিল, বাঙালীর মানসসমুদ্র মন্থন করে যে অমৃতসম ফলরাজি উৎসৃষ্ট হয়েছিল, স্বামীজী তার বলিষ্ঠ প্রতিভূ। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ও প্রতিভা-সমুজ্জ্বল ইতিহাসে তাঁর তুলনীয় প্রতিভাবান সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রায় সহস্র বছর পিছিয়ে গেলে তবেই পাওয়া যাবে ভগবান শঙ্করাচার্যকে, একমাত্র যাঁকে পণ্ডিতগণ স্বামীজীর সঙ্গে তুলনীয় মনে করে থাকেন। এমনকি, প্রতিভার বহুমুখিতার মানদণ্ডে বিচার করে অনেকে স্বামীজীকে শ্রেষ্ঠতর আসন দিতেও কুণ্ঠিত হন না। এহেন সর্বগ্রাসী মনীষায় 'বিজ্ঞান' যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

বলা যেতে পারে, স্বামীজীর মনটি ছিল আতশীকাচের (Prism) মতো। তাঁর মনের বিম্বে প্রতিফলিত হয়ে জ্বলে উঠেছিল একটা যুগের বিচ্ছিন্ন এমনকি আপাত-বিরোধী যাবতীয় ভাবধারা। সেই বীর সন্ন্যাসীর মধ্যে সংহত হয়েছিল একাধারে যুক্তিবাদ, মৈত্রীভাবনা, মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, স্বাদেশিকতা, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিচারপ্রসূত শ্রদ্ধা, ইতিহাসচেতনা এবং বিজ্ঞানচেতনা অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট প্রবণতাগুলি।

এইরূপ বহুমুখী মানসচেতনা উনিশ শতকের আর একটি মহাদ্রুম বিদ্যাসাগর চরিত্রেরও বৈশিষ্ট্য ছিল। বিশেষ করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি বিদ্যাসাগরের গভীর অনুরাগ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন ঃ 'ষোড়শ শতাব্দী থেকেই পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে নব-নব আলোকপাত করছিলেন। প্রতীচ্যের এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের প্রতি বিদ্যাসাগর যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন।'[১] এবং ঐসব নবাবিষ্কৃত তথ্যাদি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন মনে করা অসঙ্গত হবে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাগ্রসর মানসিক রূপকল্প অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছিল উত্তরপাড়ার প্রখ্যাত জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যে। উত্তরপাড়া কলেজে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্তনকালে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ঐযুগের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্তনকালে জয়কৃষ্ণের ভাষণ যেন খেতড়ির রাজাবাহাদুর কর্তৃক বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন কল্পে স্বামীজীর উপদেশেরই প্রতিধ্বনি।

১। জয়শ্রী, ৩৯ বর্ষ, পৃঃ ২১৬

॥ ২ ॥

বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন রকম আলোচনার সূত্রপাত করার আগে 'বিজ্ঞান' বলতে আমরা কি বুঝি, তার আধার এবং আধেয় কি সে-সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ও যুক্তিসহ ধারণা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং প্রথমেই 'বিজ্ঞান' শব্দটির অভিধা নিয়ে আলোচনা করা অসঙ্গত হবে না।

বিজ্ঞান পরিভাষাটি অতি নিগূঢ় অর্থবাহী, এর ব্যঞ্জনা বহুপ্রসারী এবং বহুমুখী এর দ্যোতনা। এর বর্ণালীর এক প্রান্তে রয়েছে মোক্ষ-অববোধ, এবং অপর প্রান্তে আছে 'কণাণু' (Quark) জিজ্ঞাসা। এই দুই প্রান্তসীমার মধ্যে বিধৃত আছে ইন্দ্রিয়ার্থ এবং অতীন্দ্রিয় বিশ্বচরাচরের যাবতীয় বিষয় সকল। সুতরাং বিজ্ঞান কথাটি সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অবশ্য-প্রয়োজন। ঐতিহাসিক আলোকে এই শব্দটির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক যুগেই চিন্তাবিদ্‌গণ বহুলার্থে এই শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। শ্রুতি থেকে আরম্ভ করে উপনিষদ্ দর্শনাদিতে এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে সর্বত্রই এর উদাহরণ পাওয়া যায়। অমরকোষ অনুযায়ী বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হচ্ছেঃ

মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।

স্বর্গত মনীষী নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব, তাঁর চিরবরেণ্য গ্রন্থ 'বিশ্বকোষে' ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা করেছেনঃ 'বিশেষ এবং সামান্য এই উভয় পদার্থেরই যে অববোধ (উপলব্ধি), তাহাই বিজ্ঞান ও জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। মোক্ষ (মুক্তি), শিল্প (চিত্রাদি), শাস্ত্র (ব্যাকরণাদি), এই সকল বিশেষ (সূক্ষ্ম) পদার্থের উপলব্ধি এবং সাধারণ ঘটপটাদি যাবতীয় পদার্থের উপলব্ধিকেই জ্ঞান ও বিজ্ঞান বলা হইয়াছে।'[২] অর্থাৎ একদিকে যেমন মোক্ষজ্ঞান তেমনই অপরদিকে ঘটপটাদি সাধারণ পদার্থেরও সম্যক উপলব্ধি সূচিত হয় 'বিজ্ঞান' শব্দটির দ্বারা, আবার বেদান্তমতে বিজ্ঞানকে বলা হয়েছে মায়াবৃত্তি বিশেষ অথবা অবিদ্যাবৃত্তি বিশেষ, বৌদ্ধগণ কিন্তু বিজ্ঞানকেই বলেছেন আত্মরূপজ্ঞান।

এদিকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেনঃ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥

পণ্ডিতপ্রবর বসু মহাশয় এর অর্থ করেছেনঃ 'এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে এস্থলে জ্ঞান অর্থ ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান এবং বিজ্ঞান অর্থ—বিবিক্তাকারবিষয়জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত চিৎ ও অচিৎ বস্তুর জ্ঞানই বিজ্ঞান।'[৩] পরমার্থ জ্ঞানও যেমন বিজ্ঞান শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হয়, তেমনি ইংরেজিতে যাকে 'Science' বলে সেই আধুনিক বিদ্যার সুষ্ঠু প্রকাশও ঐ বিজ্ঞান শব্দ দ্বারাই সম্ভব। Science শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে বিজ্ঞান শব্দটি অতিশয় সুপ্রযুক্ত।

২। বিশ্বকোষ, অষ্টাদশ ভাগ—সংকলনঃ নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩১৪, পৃঃ ৫৩৪ ৩। তদেব, পৃঃ ৫৩৬

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে, চিৎ-প্রকৃতি (cosmopsychical) এবং অচিৎ-প্রকৃতি (cosmophysical) উভয়ের জ্ঞানই বিজ্ঞানের আওতায় আসছে। চিৎস্বরূপের উপলব্ধিও যেমন বিজ্ঞান, পরীক্ষা প্রমাণ যুক্তি ইত্যাদি দ্বারা নির্ণীত জ্ঞানও সমভাবে বৈজ্ঞানিক। এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্বামীজীর বিজ্ঞানচেতনার অনুধাবন-প্রচেষ্টা সঙ্গত হবে।

আধুনিক তথা পশ্চিমী বিজ্ঞানের কারবার শুধু বাহ্য প্রকৃতি নিয়ে। অন্তঃপ্রকৃতি আপাতদৃষ্টিতে তার এখতিয়ারের বাইরে। স্বামীজী কিন্তু বাহ্য ও অন্তঃ, অচিৎ ও চিৎ উভয় প্রকার প্রকৃতিরই কারবারী ছিলেন, স্বামীজীর বিজ্ঞানচেতনার অনুধাবনে এই দুই বিশিষ্ট ধারার আলোচনা করাই সঙ্গত।

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন যথার্থই বলেছেন যে, ধর্মচেতনা ছাড়া বিজ্ঞান যেমন খঞ্জ, বিজ্ঞানচেতনা ছাড়া ধর্ম তেমনি অন্ধ। স্বামীজী আইনস্টাইনের এই বাণীর মূর্ত বিগ্রহ সন্দেহ নেই।

এখানে অচিৎ-প্রকৃতি বিজ্ঞান বা আধুনিক বিজ্ঞানের বর্তমান স্বরূপ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক। আধুনিক বিজ্ঞান যুক্তিনির্ভর এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষ। উপলব্ধি বা অনুমানের স্থান এখানে গৌণ, যদিও প্রকল্পের (hypothesis) সংস্থান অবশ্যই আছে। কিন্তু যতক্ষণ না পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রকল্পটি প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তা বৈজ্ঞানিক তথ্য তথা সত্য হিসাবে গ্রাহ্য হবে না। এটাই ছিল এতদিন আধুনিক বিজ্ঞানের ঐতিহ্যবাহী (classical) মানদণ্ড। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই কট্টর মানদণ্ড বুঝি বা আর রাখা চলবে না। বিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্র যতক্ষণ পরমাণুতে আবদ্ধ ছিল ততদিনও কোন প্রশ্ন ওঠেনি। অসুবিধা দেখা দিল 'কণা' আবিষ্কার এবং ইলেকট্রন কণার আপাত অহেতুকী ব্যবহারে। তারপর যত দিন যেতে লাগল ততই নতুন নতুন গুণাধিকারী কণাসমূহ আবিষ্কারের সঙ্গে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে লাগল। আর classical বিজ্ঞানকে পিছে ফেলে 'কণাণু' বিজ্ঞানের নবযাত্রা শুরু হল। এদিকে বিশ্রুত পদার্থবিদ্ Dirac বলে বসলেন যে, মহাশূন্য শূন্য নয়, '...but filled by a bottomless sea of electrons with *negative mass* (and consequently *negative energy*)'।[৪] এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বললেন যে, '...if anything can be said of a particle of this kind it is that if you try to push it forward, it will move backward, and if you blow at it, it will be sucked into your lungs.'[৫]

এ যেন সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল'। কিন্তু এই আবোল-তাবোল থেকেই উৎপত্তি হল 'Anti-electron' বা 'প্রতিকণা' তত্ত্বের। এই পথেই আবিষ্কৃত হল নবতম কণা পজিট্রন (Positron)। কিন্তু আবিষ্কারের সঙ্গেই মহা গোলযোগ বাধিয়ে দিল নবজাতক। মানুষের এতদিনের ধ্যানধারণা সব উলটে-পালটে দিতে চাইল এই নবতম কণা। কারণ এই কণার কার্যকলাপ ব্যাখ্যাকল্পে প্রায় বিশ্বাস-অযোগ্য এক তত্ত্ব উত্থাপিত

৪। Impact of Science on Society, Vol. XXIV, p. 275 ৫। ibid.

হয়েছে যার বক্তব্য হচ্ছে যে, '...the positron is nothing but an electron which, for a while, is moving backwards in time...'।[৬] একেবারে মহাকালের দরবারে হানা। এতদিন জানা ছিল যে, 'কালের' মোকাবিলা করতে হলে তার কপালের ঝুঁটি (fore-lock) চেপে ধরতে হবে। এখন মহাকাল নিজেই যদি দিকপরিবর্তন করতে চান, তাহলে পুরনো ধারণা টিকে থাকে কি করে? সে যাই হোক, উদ্ভূত হল 'দ্বি-মাত্রিক কালতত্ত্ব' (two time dimensions)। প্রথমে বিশ্বজগৎ ছিল 'ত্রি-মাত্রিক' (three dimensional); কালক্রমে তাতে সংযুক্ত হল এক নবমাত্রা 'কাল', এবং বিশ্ব হল চতুর্মাত্রিক (four dimensional)। এখন দেখা যাচ্ছে 'কাল' নিজেই দ্বি-মাত্রিক। সুতরাং এইভাবেই উৎপন্ন হল পঞ্চমাত্রিক অর্থাৎ five dimensional মহাবিশ্বের ধারণা, যার তিনটি স্থান-সংক্রান্ত (spatial) এবং দুটি কাল-সংক্রান্ত (temporal)। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। বিজ্ঞানীদের জন্য অপেক্ষা করছিল আরও বিস্ময়কর পরিস্থিতি। তাঁরা দেখলেন যে, মহাবিশ্বে বিপুল বেগে ধাবমান দুটি কণা পরস্পরকে যখন প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করে তখন কণা দুটি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। কিন্তু পরমাশ্চর্যের কথা হল, এই বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলি সর্বতোভাবে আদিম বা প্রারম্ভিক কণাদের সঙ্গে সর্ববিষয়ে সমতুল্য।

বিস্ময়ে বিমূঢ় বিজ্ঞানীর দল! প্রশ্ন করলেন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাইজেনবার্গঃ আমরা কি তবে উপনিষদের সেই পরম সত্যের মুখোমুখি হয়েছি? এই কি সেই পূর্ণ, পূর্ণ থেকেই কি পূর্ণ জন্মগ্রহণ করছে? পূর্ণ থেকে পূর্ণকে বিযুক্ত করলে পূর্ণই কি অবশেষ থাকছে? এই কি সেই 'এক'?

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥[৭]

বিজ্ঞানীরা আরও দেখলেন শক্তি ও বস্তুর অভিন্ন রূপ, দেখলেন শক্তির বস্তুতে রূপায়ণ এবং পক্ষান্তরে বস্তুর শক্তিতে প্রতিরূপায়ণ। আধুনিক বিজ্ঞানের নৈষ্ঠিক পূজারীরা কি অবশেষে শক্তি ও বস্তুর অভিন্ন সত্তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন? অচিৎ-প্রকৃতি (cosmophysical) কি শেষ পর্যন্ত চিৎ-প্রকৃতিতে (cosmopsychical) বিলীন হয়ে গেল, নুনের পুতুল সাগরজলে আপন সত্তা খুঁজে পেল?

॥ ৩ ॥

এসব সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক বিজ্ঞানীরা তাঁদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করেননি, পরন্তু দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরে আছেন। সেই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যুক্তিবাদী, এবং প্রমাণভিত্তিক যুক্তিবাদের উপরেই আধুনিক বিজ্ঞানের অবস্থান এবং প্রমাণের দ্বারাই তার প্রতিষ্ঠা। আধুনিক বিজ্ঞানের এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে কোন আলোচনাকালে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রতি পদে

৬। ibid., p. 276 	৭। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৫।১।১

তাঁর মৌলিক স্বরূপ স্মরণে রেখে অগ্রসর হতে হবে। মনে রাখতে হবে মূলত তিনি অধ্যাত্মবাদী পরম যোগীশ্বর। এ-বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার মূল্যায়নটি সমধিক প্রাসঙ্গিক। নিবেদিতা লিখেছেন ঃ 'He (Naren) lived in a world of ideals, where history and philosophy, poetry and all the sciences, are recognized as phases of Reality. He possessed a prophetic vision of learning, wherein thought was seen as subservient to the real purpose of life, ideas and ideals being the fuel which the soul burned in its supreme effort to go beyond intellect, beyond thought.'[৮]

কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই পরমের উপলব্ধিক্ষণেই তাঁর মধ্যে বিশ্ববিজ্ঞানের চরম স্ফূর্তি যেন দেখতে পাই যখন তিনি গেয়ে ওঠেন ঃ

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙমনসোগোচরম্', বোঝে—প্রাণ বোঝে যার ॥[৯]

এ যেন মহাশূন্যে ইলেকট্রন-নিউট্রিনোদের (nutrino) নৃত্যদৃশ্য, পজিট্রনদের (positron) জন্মকথা। এ যেন cosmic beginning এবং cosmic ending-এর প্রতিভাস। প্রশ্ন জাগে মনে, আধুনিক বিজ্ঞান কি এই ভাবরূপ-কল্পের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে না?

এখানেই কিন্তু বলে রাখা আবশ্যক যে, বিজ্ঞানের বাস্তব সন্ধান এবং ধর্মের অলৌকিক ইঙ্গিত যে পরস্পরবিরোধী নয় পরন্তু একটি সত্য ও সূক্ষ্ম সূত্রে তারা গ্রথিত, এই পরম বোধ বিবেকানন্দ তাঁর সংস্কারমুক্ত চিত্তে অনুভব করেছিলেন এবং এই সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাঁর মানসরসে পাচিত হয়ে যে মহৎ বস্তুতে পরিণত হয়েছিল তার নাম জীবপ্রেম। তাই তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছেন ঃ 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'[১০]

'অবাঙ্মনসোগোচরম্' সত্যস্বরূপেই বিবেকানন্দ নিবিষ্ট ছিলেন এবং বিশ্বচরাচরকে এই সত্যেরই বিভিন্ন প্রকাশরূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এই পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেই তিনি বাস্তবকে বিচার করেছেন। এ জগৎ কিন্তু তাঁর কাছে মিথ্যা বা অনর্থক ছিল না। এবং এই বাস্তবের বিচারকালেই তাঁর বৈজ্ঞানিক মানস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃষ্ট প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

৮। The Life of Swami Vivekananda, Vol. I—His Eastern and Western Disciples, Advaita Ashrama, Calcutta, Fifth Edition (1979), p. 105

৯। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ২৬৭

১০। তদেব, পৃঃ ২৬৯

॥ ৪ ॥

সত্যানুসন্ধানই বৈজ্ঞানিকের ধর্ম। যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে বিজ্ঞানী সত্যানুসন্ধানে তৎপর হন। সর্ববিষয়ে গভীর কৌতূহল, মনের সচেতনতা এবং একান্ত সত্যনিষ্ঠা বৈজ্ঞানিক মনমেজাজের ভিত্তি। স্বামীজী ছিলেন এইরূপ মনমেজাজের অধিকারী। ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার লিখেছেন ঃ 'কৌতূহলবৃত্তি তাঁর জন্মগত। যুক্তি ছাড়া কোন কিছুকেই মেনে নিতেন না। যেখানে দেখেছেন কুসংস্কার মানুষের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে সেখানেই তিনি তার মূলোচ্ছেদে প্রয়াসী হয়েছেন, চিরন্তন কৌতূহলস্পৃহা তাঁকে প্রবৃত্ত করেছে সত্যানুসন্ধানে।'[১১]

তদুপরি স্বামীজী ছিলেন আশৈশব প্রবল যুক্তিবাদী। সত্যাসত্য যাচাই না করে তিনি কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন ঃ 'স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দকে বলিতেন, "কোন কথা পুস্তকে লেখা আছে, অথবা কেহ বলিয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস করিও না। নিজে সত্য আবিষ্কার কর, উহাই সাক্ষাৎকার"।'[১২] এই যাচাই করে নেবার অদম্য স্পৃহা নরেন্দ্রনাথকে শৈশবকালেই নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত করেছে। এ-সম্বন্ধে নানা কৌতূহলোদ্দীপক হাস্যরসাত্মক কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন, বিভিন্ন জাতের জন্য আলাদা হুঁকো দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, সত্যিই অন্য জাতের জন্য সংরক্ষিত হুঁকো খেলে তাঁর জাত যাবে কিনা ; এবং তিনি বিভিন্ন জাতের জন্য রক্ষিত হুঁকো থেকে সবেগে ধূমোদ্গিরণ করেও দেখলেন যে, তিনি মরেও গেলেন না অথবা আকাশ তাঁর ঘাড়ে ভেঙে পড়ল না। ঐসময়ে হঠাৎ উপস্থিত পিতার প্রশ্নের উত্তরে তিনি অম্লানবদনে বললেন ঃ 'দেখছি জাত না মানলে কি হয়।' পিতা হেসে উঠলেন। পিতার এরূপ সস্নেহ প্রশ্রয় নরেন্দ্রনাথের মানসগঠনে প্রভূত সাহায্য করে এবং সত্যানুসন্ধানে তথা সত্য যাচাই স্পৃহাকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করে সন্দেহ নেই। এই যাচাই করে নেবার ইচ্ছা দিনে দিনে এমন বর্ধিত হয়েছিল যে, স্বীয় গুরুকেও তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। একসময় নিবেদিতাকে বলেছিলেন যে, প্রমাণ না পেয়ে কিছুই বিশ্বাস কোরো না। 'আমিও আমার গুরুকে যাচাই করে নিয়েছি।' কতখানি দৃঢ়চরিত্র, সত্যনিষ্ঠ ও সত্যসন্ধানী হলে একথা বলা যায় তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকেও একটি চিত্র এখানে উদাহরণস্বরূপ উপস্থিত করা যেতে পারে। স্বামীজী তখন বাইশ বছরের যুবক। তারিখ ঃ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মে। স্থান ঃ কলকাতার বলরাম বসুর বাড়ি।—

'নরেন্দ্র—Proof (প্রমাণ) না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন।

১১। বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা—অমিয়কুমার মজুমদার, রূপা এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ (১৩৭৪), পৃঃ ৩

১২। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১০

গিরিশ—বিশ্বাসই sufficient proof (যথেষ্ট প্রমাণ)। এই জিনিসটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।...

দেবতারা অমর এই কথা পড়িল।

নরেন্দ্র—তার প্রমাণ কই?

গিরিশ—তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না!

নরেন্দ্র—অমর, past-ages-তে ছিল, প্রুফ চাই।'[১৩]

প্রমাণ চাই, তা না হলে কোনও কিছু বিশ্বাস করব না—এই হচ্ছে বিজ্ঞানীর মৌলিক চরিত্র। এই মৌল ধর্ম স্বামীজীর সহজাত। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে এই ধর্ম শৈশব থেকেই বিকাশলাভ করতে থাকে। এই অনুসন্ধিৎসা, সকল কিছুর গূঢ় রহস্য আয়ত্ত করার এই ইচ্ছাই তাঁকে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং দেখা যায় পরবর্তীকালে যে-কোন বিষয়ের ব্যাখ্যাকল্পে তিনি বিনা দ্বিধায় আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য নিতেন। এমনকি ধর্মবিষয়ের মীমাংসাকল্পেও আধুনিক প্রতীচ্য-বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত নিতে পশ্চাৎপদ হননি। বস্তুত তাঁর ধারণায় বিজ্ঞান ও ধর্মের লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। এইরূপ প্রতীতি তৎকালে কেন, বর্তমানেও অতিশয় বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না। আধুনিক বিজ্ঞানকে তিনি তাঁর কর্মসাধনা এবং মর্মসাধনার সহায়ক বলেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি অগাধ প্রত্যয়ের সঙ্গে বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে বলতে পেরেছিলেনঃ 'আমাদের চাই কি জানিস?—স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি আর science (বিজ্ঞান) পড়ানো; চাই technical education (কারিগরী শিক্ষা), চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।'[১৪] তিনি আরও বলেনঃ 'এখন তোদের করতে হবে কি জানিস? প্রতি গ্রামে প্রতি শহরে মঠ খুলতে হবে। পারিস কিছু করতে? কিছু কর্। কলকাতায় একটা বড় করে মঠ কর্। একটা করে সুশিক্ষিত সাধু থাকবে সেখানে, তার তাঁবে practical science (ব্যবহারিক বিজ্ঞান) ও সব রকম art (কলাকৌশল) শেখাবার জন্য প্রত্যেক branch-এ (বিভাগে) specialist (বিশেষজ্ঞ) সন্ন্যাসী থাকবে।'[১৫] এটিকে এককথায় মনে করা যেতে পারে স্বামীজীর ভবিষ্যৎ মানুষ গঠনের কল্পনার রেখাচিত্র। বিশেষ লক্ষণীয় যে, তাঁর এই পরিকল্পনায় (blue print) দুটি জিনিস প্রাধান্য পেয়েছে। তার একটি হল practical science and technology-র উপর গুরুত্বদান এবং দ্বিতীয়টি হল, এসকল বিভাগের শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে specialist সন্ন্যাসীদের হাতে। মানুষ গঠনে তিনি ঐহিক এবং পারত্রিক শক্তির সংযোগ চেয়েছিলেন।

॥ ৫ ॥

নরেন্দ্রনাথের শৈশবের কথা মনে করলে স্বতই তাঁর পরমশ্রদ্ধেয় পিতৃদেবের কথা মনে আসে। জন্মসূত্রে নরেন্দ্রনাথ লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কাছে

১৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ—শ্রীম-কথিত, শ্রীম-এর ঠাকুরবাটী, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃঃ ১৬৩

১৪। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪০৩ ১৫। তদেব, পৃঃ ৪০৫

একদিকে যেমন পেয়েছিলেন তীক্ষ্ণ বিচারবোধ, অন্যদিকে তেমনি পেয়েছিলেন তাঁর স্পর্শকাতর তীব্র সংবেদনশীল চিত্ত ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ। মাতার ব্যক্তিত্ব ও ধর্মপ্রাণতার প্রভাবও তাঁর চরিত্রগঠনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিশোর নরেন্দ্রনাথকে বিশ্বনাথ একদিন বলেছিলেনঃ 'কখনও কোন বিষয়ে অবাক হবি না।'[১৬] প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর 'পরিব্রাজক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, বিশ্বনাথের এই উপদেশটি স্বামীজীর অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন যে, ঐসময়ে 'পুত্রের সহিত বিশ্বনাথ নানা বিষয় লইয়া গভীর আলোচনা করিতেন। ফলে নরেন্দ্রের বুদ্ধিবৃত্তি প্রখরতা লাভ করে, এবং সর্ববিষয়ে প্রবল অনুসন্ধিৎসা জাগে। প্রত্যেক বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা তিনি পিতার নিকটেই লাভ করেন।'[১৭] স্বামী গম্ভীরানন্দের কাছ থেকেও উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেনঃ 'পুত্রের বুদ্ধি স্ফুরণের জন্য পিতা বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করিতেন। এমনকি পুত্রের সহিত তর্ক জুড়িয়া দিতেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে হার মানিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। অধিকন্তু তখন বিশ্বনাথবাবুর বাসায় অনেক বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের সমাগম হইত এবং বিবিধ সাংস্কৃতিক বিষয়ে আলোচনা চলিত। নরেন্দ্রনাথ নিবিষ্টমনে তাহা শুনিতেন ও সুযোগ বুঝিয়া স্থলবিশেষে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিতেন।'[১৮] এখানেই নরেন্দ্রনাথের তথা উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞানচেতনার মূল উৎস, একথা ভাবা অসমীচীন হবে না।

নরেন্দ্রনাথের আর একটি সহজাত ক্ষমতা ছিল। সেটি হল—'প্রবল কল্পনাসহায়ে ধ্যানের রাজ্যে আরূঢ় হইয়া এককালে তন্ময় হইয়া যাওয়া...।'[১৯] এই প্রবল কল্পনাশক্তি, এই অন্তরের গভীরে তন্ময় হয়ে যাওয়া তাঁর বিপুল জ্ঞানার্জনের অনুকূল হয়েছিল অবশ্য মনে করা যেতে পারে। তাঁর অপর একটি প্রতীতি ছিল কোন কিছুতেই পশ্চাৎপদ না হওয়া। তিনি পরবর্তীকালে একটি বক্তৃতায় বলেছেনঃ '...যাহা কিছু ভয়ানক, তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে, সাহসের সহিত উহা রুখিতে হইবে। জীবনের দুঃখকষ্টের ভয়ে না পলাইয়া সম্মুখীন হইলেই...সেগুলি হটিয়া যায়। যদি আমাদিগকে কখন মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়, তবে প্রকৃতিকে জয় করিয়াই উহা লাভ করিব, প্রকৃতি হইতে পলায়ন করিয়া নয়। কাপুরুষেরা কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। যদি আমরা চাই—ভয় কষ্ট ও অজ্ঞান আমাদের সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাক, তাহা হইলে আমাদিগকে ঐগুলির সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে।'[২০]

স্বামীজী কিন্তু কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করেননি। শৈশবে কিছুদিন পাঠশালায় কাটাবার পর গৃহশিক্ষকের কাছে তাঁর পাঠাভ্যাস চলতে থাকে।

১৬। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৩ ১৭। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৬

১৮। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৫

১৯। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ—স্বামী সারদানন্দ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃঃ ৮২

২০। বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ১১২

অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, রামায়ণ এবং মহাভারতের বহু অংশ মুখস্থ করে ফেলতে সমর্থ হন। বালক যে-তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বৎসরান্তে নরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন স্কুলে ভর্তি হলেন। কলকাতায় তখন সবে গ্যাসের আলো এবং সোডা-লেমনেডের আমদানি হয়েছে। নরেন্দ্র তাঁর খেলাঘরে ঐ দুটি বস্তু ও রেলগাড়ি তৈরী করেছিলেন।[২১] এই ঘটনাগুলি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি সেই বাল্যকালেই বৈজ্ঞানিক প্রবণতার পরিচয় বহন করে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নরেন্দ্রনাথ প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজের 'সাধারণ বিভাগে' ভর্তি হয়ে পরে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ) যোগ দেন এবং প্রথমে এফ. এ. এবং দর্শনে অনার্সসহ বি. এ. পরীক্ষা পাস করেন। অতঃপর আইন পড়তে শুরু করেন, কিন্তু নানা কারণে আইন পরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি। কলেজে তিনি প্রথমে লজিক (পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র) এবং পরে পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু কলেজে বা স্কুলে সরাসরি বৈজ্ঞানিক কোন বিষয় সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও দেখা গেল যে, কৈশোরের অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তীব্র অনীহা যৌবনে কলেজে শিক্ষাকালে প্রবল অনুরাগে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। প্রমথনাথ বসু মহাশয় লিখেছেন ঃ 'কলেজে অধ্যয়নকালে নরেন্দ্রনাথ যে-সকল বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে গণিত ও গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) অন্যতম। জ্যোতিষে তাঁহার সবিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় তিনি "Godfrey's Astronomy" নামক পুস্তকখানি সমগ্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং উচ্চাঙ্গের গণিত (Higher Mathematics) অভ্যাসে সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন।'[২২] তদুপরি তিনি নিজে থেকে কলেজীয় জীবনেই প্যাথলজি (Pathology) এবং জুলজি (Zoology) প্রভৃতি জৈববিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি সাগ্রহে অধ্যয়ন করেছেন, তারও নজির রয়েছে। এইভাবেই জৈব এবং অজৈব বিজ্ঞানের উপর তাঁর অধিকার জন্মেছিল বলে মনে হয়। বেলগাঁও-এর ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্রের রচনাতে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত মিত্র লিখেছেন ঃ 'আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার (স্বামীজীর) বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই-চারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন। আবার ধর্মবিষয়ক মীমাংসাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ও দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের যে একই লক্ষ্য—একই দিকে গতি, তাহা দেখাইতে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা আর কাহারও দেখি নাই।'[২৩] সত্যই এ এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার! আনুষ্ঠানিকভাবে

২১। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ—প্রমথনাথ বসু, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৯২), পৃঃ ১৯ ২২। তদেব, পৃঃ ৫০-১ ২৩। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩-৭৪

বিজ্ঞানশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ না করে কেবল নিজের মেধা ও মনীষা বলে বিজ্ঞান বিষয়ে এরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। একবার দুবার নয়, তিনি বার বার এরকম জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

॥ ৬ ॥

মনে হয় নিজের অধ্যয়ন ছাড়াও বহু বিজ্ঞানী ও মনীষীর সঙ্গে আলোচনায় তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথের যৌবনকালে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের উপর 'তত্ত্ববোধিনীসভা'র সবিশেষ প্রভাব ছিল। ঐ সভার সভ্যগণ ছিলেন মুক্তিমার্গী এবং বিজ্ঞাননিষ্ঠ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন একজন বিদগ্ধ চিন্তাবিদ্ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে মননমূলক প্রবন্ধের বিকাশ এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাসসম্মত আলোচনার পথ প্রদর্শনে তিনি প্রগতিশীল নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ঐ সভার সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং ঐ সভা এবং সভার সদস্যগণের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন, একথা মনে করা অসঙ্গত হবে না।

কলেজে সমসাময়িকদের মধ্যে ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। শীলমহাশয় মূলত দার্শনিকোত্তম হলেও বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসকে অতিশয় গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। তাঁর 'The Positive Sciences of the Ancient Hindu' গ্রন্থে বেদ-বেদান্তের যুগের বিজ্ঞানচিন্তার একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। এই উভয় দিক্‌পাল যে পরস্পরের খুবই কাছে এসেছিলেন তার অনেক প্রমাণ আছে। ঐ সময়কার আর একটি বিশিষ্ট চরিত্র ছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। পরবর্তীকালে 'Indian Association for the Cultivation of Science' প্রতিষ্ঠা করে তিনি ভারতীয়গণের পক্ষে উচ্চস্তরের বিজ্ঞানচর্চার পথ খুলে দিয়েছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ ডাক্তার সরকারের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ নানা আলোচনায় সময় অতিবাহিত করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর আর এক দিক্‌পাল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক অবদানে বিজ্ঞানের নবদিগন্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই দুই মহামানবের সাক্ষাৎকার হয়েছিল কিনা তা সুস্পষ্টরূপে জানা যায়নি। কিন্তু উভয়েই যে পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং উভয়েই যে পরস্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ দুজনের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। এই মহীয়সী নারী একদিকে যেমন ছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতপ্রাণ, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন জগদীশচন্দ্রের উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস। ডক্টর অমিয় মজুমদার লিখেছেনঃ 'বলা যেতে পারে জগদীশচন্দ্রের প্রচণ্ড হোমসাধনায় হবি সংগ্রহকারী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। জগদীশচন্দ্র যদি হন এক বিরাট ল্যাবরেটরী, তাহলে নিবেদিতা সেই গবেষণাগারের বিদ্যুৎ-শক্তি—যে শক্তিবলে কর্মে উদ্দীপনা আসে, যে শক্তি আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে গবেষককে দেয় নতুন উৎসাহের আলো, যে শক্তির প্রভা হতাশার

নিঃসীম অন্ধকারে বিজলীর চমক দেখিয়ে বিজ্ঞানীকে নতুন পথের সন্ধানে ঠেলে দেয়।'[২৪] ডক্টর মজুমদারের এই ধারণা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়। এমনকি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাণ্ডুলিপি রচনাতেও তিনি নিজে লিখে জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করেছেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল স্বামীজীর উৎসাহে। নিবেদিতার মাধ্যমেই আচার্যের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়েছিল স্বামীজীর কাছে, এবং তিনি তাঁর সর্বগ্রাসী প্রতিভার দ্বারা তা আকণ্ঠ পান করেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এক চিঠিতে যাতে তিনি লিখেছেন : 'এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। ...দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন...সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্বেগে পাশ্চাত্য-মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিক-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর!'[২৫] এই চিঠিটি একাধারে তাঁর বিজ্ঞানে অসীম অনুরাগ এবং দেশপ্রেমের উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

বিদেশে তাঁর পরিচিত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন কামানের আবিষ্কর্তা হিরাম ম্যাক্সিম (Hiram Stevens Maxim), তড়িৎ-বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা (Nikola Tesla), বিশ্ববিখ্যাত তড়িৎ-বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম টমসন (afterwards Lord Kelvin), অধ্যাপক হেলমহোলৎস (Prof. Helmholtz) প্রভৃতি। শিকাগোর ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ভাষণ শুনে ম্যাক্সিম এতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি লিখে গেছেন : 'His first speech was no less than a revelation...'[২৬] বিজ্ঞানী টেসলার সঙ্গেও তাঁর চিন্তার আদানপ্রদান হত। এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিখ্যাত অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড এবং নিকোলা টেসলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজী নিজেই লিখে গেছেন : '...মিঃ টেসলা বৈদান্তিক প্রাণ ও আকাশ এবং কল্পের তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কেবল এই তত্ত্বগুলিই গ্রহণীয়। আকাশ ও প্রাণ আবার জগদ্ব্যাপী মহৎ, সমষ্টি-মন বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। মিঃ টেসলা মনে করেন, তিনি গণিতের সাহায্যে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। আগামী সপ্তাহে এই নূতন পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেখবার জন্য তাঁর কাছে আমার যাবার কথা আছে।

'তা যদি প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে। আমি এক্ষণে বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি স্পষ্টই

২৪। বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা, পৃঃ ১৬১-৬২ ২৫। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১২৪

২৬। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, প্রথম খণ্ড—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃঃ ২০৯ পাদটীকা

আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের ঐ তত্ত্বগুলির সম্পূর্ণ ঐক্য দেখছি; তাদের একটা পরিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।'[২৭] এই চিঠি স্বামীজীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তথা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সমর্থনে এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল। স্বামীজীর কাছে আধুনিক বিজ্ঞান কেবলমাত্র পার্থিব ঘটপটাদির ব্যাপারেই ব্যাপৃত ছিল না, পরন্তু বৈদান্তিক সৃষ্টিবিজ্ঞান ব্যাখ্যাকল্পেও একান্ত আবশ্যক ছিল। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব দেখেননি তিনি, বিজ্ঞান ও ধর্ম ছিল তাঁর মতে পরস্পরের পরিপূরক মাত্র।

এই সমস্ত আলোচনায় যে-তথ্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই যে, স্বামীজী স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন করে, নিজ অধ্যবসায়গুণে তৎকালে প্রচলিত আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন মনীষিবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতে, এঁদের সঙ্গে আলোচনা-বিচার-বিতর্কে স্বামীজীর জ্ঞানভাণ্ডার অবশ্যই সমৃদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি তিনি আপন প্রচেষ্টাতেই স্থাপিত করেছিলেন। ভারতের প্রান্ত-উপান্তে পরিব্রজ্যাকালে তিনি তার বহু প্রমাণ রেখে গেছেন। এই সমস্ত তথ্যাদি বিবেচনা করলে অপর একটি সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে হয় যে, স্বামীজীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগধর্মেরই প্রতিফলন।

॥ ৭ ॥

ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অধ্যাত্মবিষয়ক জ্ঞানের বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা, মনে হয় স্বামীজীই প্রথম করেছেন। তিনি ধর্মের জটিল তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিচার করে তথাকথিত জড়বাদিগণের কাছেও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হন। প্রতীচ্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের সাহায্যে তিনি ভারতীয় ধর্মদর্শনকে ব্যাখ্যা করে সহজবোধ্য এবং মনে হয়, সহজগ্রাহ্যও করেছেন। এ এক অভিনব ও বিস্ময়কর প্রচেষ্টা। জড়বিজ্ঞানের প্রচণ্ড আঘাতে যখন তাঁর দেশবাসীর ধর্মবিশ্বাস টলটলায়মান, সেই সময়ে ঐ জড়বিজ্ঞানের মাধ্যমেই সেই আঘাতকে প্রতিহত করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানকে তিনি কেবল একটা সুবিধাজনক হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করেননি, পরন্তু তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক এবং যুক্তিবাদী।

অধ্যাত্মবিষয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সুবিখ্যাত 'রাজযোগ' গ্রন্থে। ঐ গ্রন্থের ভূমিকার গোড়াতেই তিনি লিখেছেনঃ 'ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে মনুষ্যসমাজে বহুবিধ অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানকালেও যে-সকল সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ণালোকে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সাক্ষ্যপ্রদানকারী মানুষের অভাব নাই। এইরূপ প্রমাণের অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ যে ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এই-সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাদের অনেকেই অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রতারক। অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত অলৌকিক ঘটনাগুলি

২৭। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৬৭

অনুকরণমাত্র। কিন্তু ঐগুলি কিসের অনুকরণ? যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়া কোন কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া অকপট বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় নয়। যাহারা ভাসাভাসা বৈজ্ঞানিক, তাহারা মনোরাজ্যের নানাপ্রকার অলৌকিক ব্যাপার-পরম্পরা ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়া সেগুলির অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে। অতএব যে-সকল ব্যক্তির বিশ্বাস—মেঘলোকের ঊর্ধ্বে কোন পুরুষবিশেষ অথবা দেবতাগণ তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন অথবা তাহাদের প্রার্থনায় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তাহাদের অপেক্ষা পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ অধিকতর দোষী।'[২৮]

ঐ ভূমিকাতেই তিনি 'রাজযোগ' সম্বন্ধে বলেছেনঃ '...রাজযোগ...ধীরভাবে অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণকে বলে যে অলৌকিক ঘটনা, প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি—এগুলি যদিও সত্য, কিন্তু মেঘের ওপারে অবস্থিত কোন দেবতা দ্বারা এ-সকল ব্যাপার সংসাধিত হয়—এইরূপ কুসংস্কারপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ ঘটনাগুলি বুঝা যায় না। রাজযোগ সমগ্র মানবজাতিকে এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই এক একটি ক্ষুদ্র প্রণালী মাত্র। ইহা আরও শিক্ষা দেয়, সমস্ত অভাব ও বাসনা যেমন মানুষের অন্তরেই রহিয়াছে, তেমনি মানুষের ভিতরেই ঐ অভাব মোচন করিবার শক্তিও রহিয়াছে; যখন যেখানে কোন বাসনা, অভাব বা প্রার্থনা পূর্ণ হয়, তখনই বুঝিতে হইবে এই অনন্ত শক্তি-ভাণ্ডার হইতেই এই সব প্রার্থনা পূর্ণ হইতেছে, কোন অলৌকিক পুরুষের দ্বারা নয়।'[২৯] এর চেয়ে প্রাঞ্জল তথা বলিষ্ঠ ঘোষণা আর কি হতে পারে, আর কে-ই বা করেছে? তিনি আরও বলেছেনঃ 'অতিপ্রাকৃত বলিয়া কিছু নাই, তবে প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম বিবিধ প্রকাশ বা রূপ আছে বটে। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল কার্য। স্থূলকে সহজেই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, সূক্ষ্মকে সেরূপ করা যায় না।'[৩০] আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে স্বামীজীর এই বক্তব্যকে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার আর উপায় নেই। প্রাগ্রসর পদার্থবিদ্যার ক্রমবিকাশে আজ ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যা (classical physics) এবং কণাবাদী পদার্থবিদ্যা (micro physics) প্রায় দুটি আলাদা স্তরের বিদ্যা, একটি স্থূল সম্পর্কিত অন্যটি সূক্ষ্ম সম্পর্কিত, একটি সহজে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অপরটি ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের বাইরে, প্রায় ভাবকল্পনাজগতের।

স্বামীজী পুনরায় বলেছেনঃ 'আমাদের সকল জ্ঞানই অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত আনুমানিক জ্ঞান, যেখানে সামান্য (general) হইতে সামান্যতর বা সামান্য হইতে বিশেষ (particular) জ্ঞানে উপনীত হই, তাহারও ভিত্তি—অভিজ্ঞতা। ...যোগবিদ্যার আচার্যগণ তাই বলেন, "ধর্ম কেবল পূর্বকালীন অনুভূতির উপর স্থাপিত নয়, পরন্তু স্বয়ং এই-সকল অনুভূতিসম্পন্ন না হইলে কেহই ধার্মিক হইতে পারে না। যে বিজ্ঞানের দ্বারা এই-সকল অনুভূতি হয়, তাহার নাম 'যোগ'।" ...আত্মা অনুভূতি না করিয়া, আত্মা অথবা ঈশ্বর দর্শন না করিয়া "ঈশ্বর আছেন" বলিবার কী অধিকার মানুষের আছে?

২৮। তদেব, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২০৭

২৯। তদেব, পৃঃ ২০৭-০৮ ৩০। তদেব, পৃঃ ২০৮

যদি ঈশ্বর থাকেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে; যদি আত্মা বলিয়া কিছু থাকে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। নতুবা বিশ্বাস না করাই ভাল।'[৩১] এ যেন নিশ্চিত-বিজ্ঞানের (exact science) প্রথম প্রস্তাব (first postulate)। নিশ্চিত-বিজ্ঞানী নিজে কতকগুলি জিনিস প্রত্যক্ষ অনুভব করে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তখন সেই সিদ্ধান্তগুলিকে সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করেন। জনসাধারণও তাঁদের নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে তা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হন। স্বামীজী বলেন যে, অধ্যাত্মজ্ঞানেও সেই একই কথা। নিজে আগে অনুভব কর, তবেই অন্যকে সেই জ্ঞান দানের অধিকার পাবে। তিনি বলেছেনঃ 'রাজযোগ-বিজ্ঞানের লক্ষ্য—এই সত্য লাভ করিবার প্রকৃত কার্যকর ও সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানব-সমক্ষে স্থাপন করা। প্রথমতঃ প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব পর্যবেক্ষণ-প্রণালী আছে। তুমি যদি জ্যোতির্বিৎ হইতে ইচ্ছা কর, আর বসিয়া বসিয়া কেবল "জ্যোতিষ, জ্যোতিষ" বলিয়া চিৎকার কর, কখনই তুমি জ্যোতিষশাস্ত্রে অধিকারী হইবে না। রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ। এখানেও একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে; পরীক্ষাগারে (laboratory) গিয়া বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইতে হইবে, ঐগুলি মিশাইয়া যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে হইবে, পরে ঐগুলি লইয়া পরীক্ষা করিলে তবে তুমি রসায়নবিৎ হইতে পারিবে। যদি তুমি জ্যোতির্বিৎ হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে মানমন্দিরে গিয়া দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, তবে তুমি জ্যোতির্বিৎ হইতে পারিবে। প্রত্যেক বিদ্যারই এক একটি নির্দিষ্ট প্রণালী থাকা উচিত। আমি তোমাদিগকে শত সহস্র উপদেশ দিতে পারি, কিন্তু তোমরা যদি সাধনা না কর, তোমরা কখনই ধার্মিক হইতে পারিবে না; সকল যুগে সকল দেশেই নিষ্কাম শুদ্ধস্বভাব জ্ঞানিগণ এই সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ... তাঁহারা আমাদিগকে একটি নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী লইয়া আন্তরিক সাধন করিতে বলেন। এইভাবে সাধনা করিয়া যদি আমরা এই উচ্চতর সত্য লাভ না করি, তখন আমরা বলিতে পারি, এই উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহা যথার্থ নয়।'[৩২]

কী দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে উঠেছে এই উদ্ধৃতির শেষ পংক্তি কটিতে! সত্যসন্ধ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন কারও পক্ষে এরকম উক্তি করা সম্ভবপর নয়। উদ্ধৃতি অবশ্যই দীর্ঘ হয়েছে, কিন্তু অকারণে নয়। এই উদ্ধৃতি স্বামীজীর স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুদৃঢ় যুক্তিবাদী মনের এক অবিসংবাদী পরিচয়লিপি। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় স্বামীজীর কতটা অধিকার ছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা অথবা তিনি বিজ্ঞানের পাদপীঠে একজন আইনস্টাইন বা ডিরাক (Dirac) ছিলেন, এ তথ্য প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হল, স্বামীজী যে বৈজ্ঞানিক মানসের অধিকারী ছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাঁর সর্ব কার্যকলাপ যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, যেমন অধ্যাত্মজগতে তেমনই দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের আলোতেই যে তিনি পথ চলতেন, সরলভাবে তা-ই তুলে ধরা। স্বামীজীর আপন রচনাবলী থেকে তুলে ধরা উদ্ধৃতিগুলি (অনুবাদ) তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করবে আশা করা যায়।

৩১। তদেব, পৃঃ ২১১, ২১৩ ৩২। তদেব, পৃঃ ২১৪-১৫

বিজ্ঞান ও ধর্ম (spiritual বা আত্মিক অর্থে) একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; সে ভিত্তি হল জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তি, তাই ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য থাকতে পারে না। স্বামীজীর মতে তাই জড়বিজ্ঞানকেও শেষ পর্যন্ত 'জড়' ছেড়ে 'অজড়ে' বা 'চৈতন্যে' পৌঁছাতে হবে। তিনি বলেছেন ঃ '...জড়-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে-কোন একটির, যথা—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত-জ্যোতিষ বা প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার কথা ধরুন, উহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করুন, ঐ তত্ত্বানুসন্ধান ক্রমশঃ অগ্রসর হউক, দেখিবেন স্থূল ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থে লয় পাইতেছে, শেষে ঐগুলি এমন স্থানে আসিবে, যেখানে এই সমুদয় জড়বস্তু ছাড়িয়া একেবারে অজড়ে বা চৈতন্যে যাইতেই হইবে। জ্ঞানের সকল বিভাগেই স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্মে মিলাইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা দর্শনে পর্যবসিত হয়।'[৩৩]

স্বামীজীর কাছে 'Science is nothing but finding of unity' ; বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য 'এককের অন্বেষণ মাত্র'। ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েই সেই 'এককের' সন্ধানে এগিয়ে চলেছে, এবং সেই 'একেই' উভয়েই বিলীন হবে। 'পদার্থবিদ্যা যদি এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করিতে পারে, অন্যান্য শক্তি যাহার রূপান্তর মাত্র, তাহা হইলে ঐ বিজ্ঞানের কার্য শেষ হইল।...যিনি এই মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবনস্বরূপ, যিনি নিত্যপরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র অচল অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্র পরমাত্মা—অন্যান্য আত্মা যাঁহার ভ্রমাত্মক প্রকাশ। এইরূপে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়া শেষে অদ্বৈতবাদে উপনীত হইলে ধর্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই সর্বপ্রকার জ্ঞান বা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।'[৩৪]

এই ভবিষ্যদ্বাণী পাঠে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। আজকের নবকণাদগণ (microphysicists) যখন শক্তি ও কণার পারস্পরিক নিয়ত রূপান্তর দেখে স্তব্ধ বিস্ময়ে ভারতীয় মুনিঋষিগণের পদতলে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী, সেইকালে এই অবিশ্বাস্য পরম পরিণতির কথা স্বামীজী কি তাঁর ঋষিকল্প দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন?

স্বামীজীর কথায় মনে হয়, বেদান্ত ও বিজ্ঞানের একই লক্ষ্য। তিনি বলেছেন ঃ '...আমি একটিমাত্র সত্তায় বিশ্বাস করি। আধুনিক জড়বাদীও এইরূপ বিশ্বাস করিতে বলেন, তবে তিনি শুধু উহাকে "জড়" আখ্যা দেন, আর আমি উহাকে "ব্রহ্ম" বলি। জড়বাদী বলেন—এই জড় হইতেই মানুষের আশা ভরসা ধর্ম সবই আসিয়াছে। আমি বলি—ব্রহ্ম হইতে সমুদয় হইয়াছে।'[৩৫] আনন্দের কথা, আজকের বিজ্ঞানীরা আর ঐ ঊনবিংশ শতাব্দীর 'জড়ের' ধারণা পোষণ করেন না ; বলা যায় ঐরূপ অর্থে 'জড়ের' অস্তিত্বই লুপ্ত হয়েছে।

'চেতন অচেতন, স্থূল সূক্ষ্ম—সবই একত্বের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান।'[৩৬] তাঁর এই কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেন ঃ 'প্রথমে মানুষ যতরকম জিনিস দেখিতে

৩৩। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯ ৩৪। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২

৩৫। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১০২- ০৩

৩৬। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪

লাগিল, তাহাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন জিনিস মনে করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম দিল। পরে বিচার করিয়া ঐ-সমস্ত জিনিস ৯৩টা মূল দ্রব্য (elements) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থির করিল।'[৩৭] তৎকালে ৯৩টি মৌল পদার্থই জানা ছিল, স্বামীজী কিন্তু সেগুলির সবকটির মৌলত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারেননি, পরন্তু তিনি বলেছেন যে, 'ঐ মূলদ্রব্যগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি মিশ্রদ্রব্য (compound) বলিয়া এখন অনেকের সন্দেহ হইতেছে। আর যখন রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) শেষ মীমাংসায় পৌঁছিবে, তখন সকল জিনিসই এক জিনিসেরই অবস্থাভেদমাত্র—বোঝা যাইবে।'[৩৮] উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন : 'প্রথমে তাপ, আলো ও তড়িৎ (heat, light and electricity) বিভিন্ন শক্তি বলিয়া সকলে জানিত। এখন প্রমাণ হইয়াছে, ঐগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। লোকে প্রথমে সমস্ত পদার্থ চেতন ও অচেতন এবং উদ্ভিদ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিল। তারপর দেখিল—উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অন্য সকল চেতন প্রাণীর ন্যায় গমনশক্তি নাই মাত্র। তখন খালি দুইটি শ্রেণী রহিল—চেতন ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাইবে, আমরা যাহাকে অচেতন বলি, তাহাদেরও অল্পবিস্তর চৈতন্য আছে।'[৩৯] এইরূপ বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা দ্বারা তিনি বারে বারেই এক অদ্বৈত সত্যেরই সন্ধান পেয়েছেন, এবং বলেছেন যে, 'এইরূপ যাহা সত্য, তাহা এক। মায়া দ্বারা আমরা পৃথক পৃথক দেখি মাত্র।'[৪০] এইভাবে স্বামীজীর মানসে বৈজ্ঞানিক সত্য এবং বৈদান্তিক সত্য আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ক্রমে একে অপরের মধ্যে বিলীন হয়ে 'একক সত্যে' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

॥ ৮ ॥

পূর্বোক্ত আলোচনাগুলি থেকে এরকম ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে, স্বামীজী শুধু অধ্যাত্মবস্তুর ব্যাখ্যাকল্পেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু ঐরূপ অনুমান একান্তই ভ্রান্তিমূলক। স্বামীজী আধুনিক বস্তুবিজ্ঞান সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং তার প্রভূত প্রমাণ তাঁর সুবিশাল রচনাসম্ভারের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। বস্তুত, এসকল ক্ষেত্রেও তাঁর পারদর্শিতা বিস্ময়কর বললে অত্যুক্তি হবে না।

শরীরতত্ত্ব, বিশেষ করে স্নায়ুতন্ত্র (স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র সমেত) সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় 'রাজযোগ' ব্যাখ্যানে, যার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় বহুজনেরই আছে। তার বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন মনে করি। নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল এবং জীবের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন নিয়ে তিনি গভীর চিন্তাভাবনা করেছেন। মনোবিজ্ঞান তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল এবং মনোবিদ্যাকে তিনি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলতেও কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু এসবের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের নেই। তাই সামান্য কিছু নিদর্শন উল্লেখ করেই আলোচনার সমাপ্তি টানতে হবে।

৩৭। তদেব, ৩৮। তদেব,
৩৯। তদেব, ৪০। তদেব, পৃঃ ৩৮৫

স্বামীজী ডারউইন সাহেবের ক্রমবিবর্তনবাদ গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। ডারউইনের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (Survival of the fittest) এবং 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (natural selection) তত্ত্বদ্বয় তখন সারা দুনিয়ায় প্রবল আলোড়ন তুলেছে, এবং প্রবল বাধা অতিক্রম করে বিদ্বজ্জনসমাজে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। স্বামীজী ডারউইন-প্রোক্ত তত্ত্বগুলিকে জ্ঞানের আলোকে বিচার করলেন, যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করলেন, কেবলমাত্র ধর্ম বা ঐতিহ্যের স্মরণ নিলেন না। সুগভীর পর্যালোচনার পর তিনি যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তাঁর নিজের কথাতেই তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। তিনি লিখেছেন ঃ 'Animal kingdom-এ (নিম্ন প্রাণিজগতে) আমরা সত্যসত্যই struggle for existence, survival of the fittest (জীবনসংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন) প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই ডারউইনের theory (তত্ত্ব) কতকটা সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু human kingdom (মনুষ্যজগৎ)-এ, যেখানে rationality (জ্ঞানবুদ্ধি)-র বিকাশ, সেখানে এ নিয়মের উলটোই দেখা যায়। ...যাঁদের আমরা really great men (বাস্তবিক মহাপুরুষ) বা ideal (আদর্শ) বলে জানি, তাঁদের বাহ্য struggle (সংগ্রাম) একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। Animal kingdom (প্রাণিজগৎ)-এর মতো rational human kingdom (বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্যজগৎ)-এ কিন্তু যত উন্নত হয়, ততই তাতে rationality (বিচারবুদ্ধি)-র বিকাশ। এজন্য animal kingdom (প্রাণিজগৎ)-এর মতো rational human kingdom (বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্যজগৎ)-এ পরের ধ্বংস সাধন করে progress (উন্নতি) হতে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ evolution (পূর্ণবিকাশ) একমাত্র sacrifice (ত্যাগ) দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান জানোয়ার হয়। সুতরাং Struggle Theory (জীবনসংগ্রাম-তত্ত্ব) এ উভয় রাজ্যে equally applicable (সমানভাবে উপযোগী) হতে পারে না। মানুষের struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdom (মানবেতর প্রাণিজগৎ)-এ স্থূলদেহের সংরক্ষণে যে struggle (সংগ্রাম) পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence (মানবজীবন)-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের জন্য বা সত্ত্ব (গুণ) বৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle (সংগ্রাম) চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার মতো মনুষ্যেতর প্রাণীতে ও মনুষ্যজগতে struggle (সংগ্রাম) বিপরীত দেখা যায়।'[৪১] এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কথা মনে আসে। তাঁরও অভিমত হল যে, মানুষের পরবর্তী বিবর্তন হবে মনোজগতে। অরবিন্দ এই জীবনকেই চেয়েছিলেন দিব্যজীবনে পরিণত করতে, মনের ঊর্ধ্বায়নে—মনের সাধারণ স্তর থেকে ক্রমে ঊর্ধ্বতর মানসে (higher mind), ভাস্বর মানসে (illumined mind), অধিমানসে (over mind) এবং শেষ পরিণতি অতিমানসে (super mind)। এই 'জীবনের পূর্ণ পরিণাম'ই শ্রীঅরবিন্দেরও লক্ষ্য ছিল।

৪১। তদেব, পৃঃ ১২১-২২

এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার সম্যক্ পর্যালোচনা করলে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ডারউইন-পন্থীদের চিন্তাধারার সঙ্গে স্বামীজীর মননের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। সেটি হল স্বামীজীর 'আত্মার' অস্তিত্বে অখণ্ড আস্থা। যে-কোন জীব, তা সে হোক না ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তারও মধ্যে বিকশিত হচ্ছে সেই একই আত্মা, এবং তা-ই যদি হয়, তবে তো ক্রমবিকাশের ধাপে ধাপে আত্মা নিজেরই বিকাশ সাধন করে চলেছে। এবং এই চিন্তাধারার সঙ্গে involution theory বা ক্রমসঙ্কোচবাদ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। স্বামীজী বলেন ঃ '...যে ক্ষুদ্র জীবাণুটি পরে মহাপুরুষ হইল, প্রকৃতপক্ষে তাহা সেই মহাপুরুষেরই ক্রমসঙ্কুচিত ভাব, উহাই পরে মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকশিত হয়।'[৪২] যেমন গাছটি আসে বীজ থেকে, কিন্তু ঐ গাছই আবার বীজ উৎপন্ন করে। শূন্য থেকে তো আর কোন গাছ জন্মাতে পারে না। বীজ ঐ গাছেরই সূক্ষ্মরূপ। একটা প্রকাণ্ড গাছ ক্রমসঙ্কুচিত হয়ে বীজরূপ নিয়েছে। বীজের মধ্যে গাছের সূক্ষ্মরূপ, আর স্থূলরূপী স্বয়ং বৃক্ষটি। ঠিক একইভাবে মানুষ বিধৃত রয়েছে একটি জীবাণুর মধ্যে। আবার ঐ জীবাণুই ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হয় মানুষরূপে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাতৃগর্ভে একটি ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধিকালে ঐরকম বিভিন্ন জান্তবস্তরের একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়।

স্বামীজীর নিজের কথায় তাঁর নিজস্ব মতবাদটি স্পষ্টতর হবে। তিনি বলেছেন ঃ 'এই সমুদয় "ক্রমবিকাশশীল" জীব-প্রবাহের—যাহার এক প্রান্ত জীবাণু অপর প্রান্ত পূর্ণমানব—এই-সবকে একটি জীবন বলিয়া ধর। এই শ্রেণীর অন্তে আমরা পূর্ণমানবকে দেখিতেছি, সুতরাং আদিতেও যে তিনি অবস্থিত, ইহা নিশ্চিত। অতএব ঐ জীবাণু অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্যের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। তোমরা ইহা স্পষ্টরূপে না দেখিতে পারো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ক্রমসঙ্কুচিত চৈতন্য নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছে, আর এইরূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া চলিবে, যতদিন না উহা পূর্ণতম মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়।'[৪৩] শুধু মানবে এই অভিব্যক্তির শেষ নয়, 'পূর্ণতম মানবে', supramental মানবে তার গতির যতি। আত্মায় বিশ্বাসী পক্ষে এর চাইতে প্রকৃষ্টতর বিবর্তনবাদ আর কিছু হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়।

॥ ৯ ॥

নৃতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের একটি নব সংযোজন। স্বামীজী এই নবীনতম জ্ঞানশিখাকেও আয়ত্ত করেছিলেন, এবং ভারতের নৃতত্ত্ব তথা জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে নিজস্ব মতবাদ পোষণ করতেন। ঐ মতবাদ কিন্তু তৎকালে প্রচলিত বিদেশীদের দ্বারা রচিত মতবাদের অনুসরণমাত্র ছিল না, পরন্তু বহুক্ষেত্রেই ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ্‌রা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেসব প্রায়-মনগড়া মতবাদ প্রচার করেছেন, স্বামীজী তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'Swami Vivekananda : Patriot-Prophet'

৪২। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৪ ৪৩। তদেব, পৃঃ ১১৬

পুস্তকে এ-বিষয়ে বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ 'Swami Vivekananda was the first Indian to raise his voice against this false foreign propaganda.'[৪৪] স্বামীজীর এই বিরোধিতা পরবর্তীকালে ভারতীয় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই।

স্বামীজী ভারতীয় জাতি সম্পর্কে প্রচলিত মৌলিক ধারণাকে আঘাত করেছেন। যেমন, শূদ্ররা যে অনার্য এবং তারা যে আর্যদের দাস তা তিনি স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন ঃ 'শূদ্রজাতি যে সকলেই অনার্য এবং তাহারা যে বহুসংখ্যক ছিল, এসব কথাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ...জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে ঃ সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ-সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।'[৪৫] তাছাড়া শূদ্র যে অনার্য-সম্ভূত এর কোন নির্ভুল প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। 'মনু বলেছেন তারা আর্য।' তদুপরি ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথের মতে ঃ 'Nobody has as yet been able to give a clear exposition of the cause of the origin of skin-color, contour of the head, nose etc., amongst different races of mankind.'[৪৬] সুতরাং এইরূপ প্রায়-কল্পিত সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মোটেই সমীচীন মনে হয় না। স্বামীজীও তাই এগুলিকে গ্রাহ্য করেননি। তাঁর বিচারে ভারতবর্ষ একটি প্রকাণ্ড 'নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা'। তাঁর অনবদ্য ভাষায় রচিত 'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে তুলে দেওয়া হল। তিনি লিখেছেন ঃ 'সত্যই, এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়তো সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডলমেনেরও অভাব নাই। চকমকি-পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়িলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। হ্রদ-অধিবাসিগণ, অন্ততঃ নদীতীরবাসিগণ—নিশ্চয়ই কোন কালে সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। গুহাবাসী এবং বৃক্ষপত্রপরিহিত মানুষ এখনও বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্রও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশসম্ভূত ও ভাষাতাত্ত্বিকগণের তথাকথিত আর্যদের নানা প্রশাখা-উপশাখা আসিয়া মিলিত হয়। পারসীক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হূন, চীন, সীথিয়ান—এমন অসংখ্য জাতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; ইহুদি, পারসীক, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্কাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি—যাহারা এখনও একাত্ম হইয়া যায় নাই—এই-সব বিভিন্ন

৪৪। Swami Vivekananda : Patriot-Prophet—Bhupendranath Datta, Nababharat Publishers, Calcutta, 1954, p. 349

৪৫। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১৯০

৪৬। Patriot-Prophet, p. 349

জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আবার শান্ত হইতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।'[৪৭]

কী অপূর্ব ভাষা, কী গভীর ব্যঞ্জনা! বিজ্ঞান ও শ্রীজ্ঞানের কী অপূর্ব মিলন! এর সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ'। সাহিত্যিকগুণের কথা বাদ দিলেও উদ্ধৃতিটি যে সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিপূর্ণ এ-বিষয়ে দ্বিমত হবার অবকাশ নেই। এখানে পরিবেশিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী আজকের দিনেও মোটামুটি গ্রাহ্য, বস্তুত আজ পর্যন্তও এগুলির কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে বলা যায় না। স্বামীজীর মতে এই বিরাট সংমিশ্রণ ও সংশ্লেষণের ফলশ্রুতিই ভারতীয় আর্য জাতি ; সমগ্র ভারত আর্যময়।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে সমাজের ক্রমবিকাশ, দেবতা ও অসুর, দুই জাতির সঙ্ঘাত প্রভৃতি প্রবন্ধনিচয়ে স্বামীজীর নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানের পর্যাপ্ত সাক্ষ্যাবলী ছড়িয়ে আছে। বর্তমান প্রবন্ধে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

॥ ১০ ॥

স্বামীজীর সর্বগ্রাহী জ্ঞানান্বেষণে মনোবিদ্যা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। যাবতীয় বিজ্ঞানের মধ্যে মনোবিজ্ঞানকে তিনি কৌলীন্যের আসনে বসিয়েছেন। এই আপাত পক্ষপাতিত্বের অবশ্যই কারণ ছিল। কারণটি হল মানুষের 'মন'। অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গের মধ্যে মনই একমাত্র যোগসূত্র। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখী। বাইরের বার্তা ইন্দ্রিয়মাধ্যমে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছাবার পর মনই ইচ্ছামতো সেগুলিকে গ্রহণ বা বর্জন করে। গ্রাহ্য বার্তাগুলিকে মন তখন বুদ্ধির দুয়ারে পৌঁছে দেয়। বুদ্ধির প্রসাদে তখন আত্মার সঙ্গে সংযোগ হয়। মনের যেন দুটি আনন। একটির দৃষ্টি অন্তরাত্মার দিকে নিবদ্ধ, অপরটির ক্রিয়াকলাপ রিপুনিচয় এবং বহিরিন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে। দৈনন্দিন জীবনে মনের এই দ্বিতীয় অর্থাৎ বহির্মুখী আননটির পরিচয়ই সাধারণত পাওয়া যায়। এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইন্দ্রিয়গণই যেন মনের প্রভু হয়ে বসেছে, মন হয়েছে ইন্দ্রিয়ের দাস। মনের এই নিম্নগতিকে কেমন করে দমন করা যায়, কি করে তাকে ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তে আনা যায়, কিভাবে অবশেষে মনকে অন্তর্মুখী করা যায়, মনোবিজ্ঞান তারই শিক্ষা দেয়। ইন্দ্রিয়ের প্রভাবমুক্ত অন্তর্মুখী মনই পরিশেষে আত্মার সঙ্গে যুক্ত হবার যোগ্যতা লাভ করে। এই কারণেই তিনি মনোবিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, স্বামীজীর জীবিতকালে মনোবিদ্যা তৎকালীন বিজ্ঞানী সমাজে প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি মনোবিদ্যাকে এতটুকু অবজ্ঞা না করে তার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মনোবিদ্যা নিঃসন্দেহে অতীব জটিল বিদ্যা। স্বামীজীর আপন বক্তব্য থেকেই এটি পরিস্ফুট হবে। স্বামীজী বলেছেন ঃ 'পৃথিবীর সর্বত্র পদার্থবিদ্‌গণ একই ফললাভ করিয়া

৪৭। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭-৭৮

থাকেন। তাঁহারা সাধারণ সত্যসমূহ এবং সেগুলি হইতে প্রাপ্ত ফল সম্বন্ধে একই মত পোষণ করেন। তাহার কারণ, পদার্থবিজ্ঞানের উপাত্তগুলি (data) সর্বজনলভ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য। এবং সিদ্ধান্তগুলিও ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রের মতোই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু মনোজগতের ব্যাপার অন্যরূপ। এখানে এমন কোন তথ্য নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ব্যাপার নাই, এমন কোন সর্বজনগ্রাহ্য উপাদান এখানে নাই, যাহা হইতে মনোবিজ্ঞানীরা একই প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া একটি পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে পারেন।'[৪৮] এই কঠিনতর বিদ্যানুশীলনে ভারতীয়গণ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ক্রমে তাঁরা এই বিশেষ বিদ্যার চর্চায় এমন গভীরভাবে নিবিষ্ট হলেন যে, জড়বিজ্ঞানচর্চায় ভাটা পড়ল।

মনোবিদ্যার অনুশীলনে স্বামীজী কপিল-দর্শনের উপর নির্ভর করেছেন এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করেছেন ঃ 'প্রথমতঃ বাহিরের বস্তু হইতে ঘাত বা ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়-সমূহের শারীরিক দ্বারগুলি উত্তেজিত করে। যেমন প্রথমে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহ্য বিষয়ের আঘাত লাগিল, চক্ষুরাদি দ্বার বা যন্ত্র হইতে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে (স্নায়ুকেন্দ্রে), ইন্দ্রিয়-সমূহ হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি হইতে এমন এক পদার্থে গিয়া লাগিল, যাহা এক তত্ত্বস্বরূপ—উহাকে তাঁহারা "আত্মা" বলেন। আধুনিক শারীরবিজ্ঞান আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, সর্বপ্রকার বিষয়ানুভূতির জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র আছে, ইহা তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথমতঃ নিম্নশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, দ্বিতীয়তঃ উচ্চশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, আর এই দুইটির সঙ্গে মন ও বুদ্ধির কার্যের সহিত ঠিক মিলে, কিন্তু তাঁহারা এমন কোন কেন্দ্র পান নাই, যাহা অপর সব কেন্দ্রকে নিয়মিত করিতেছে, সুতরাং কে এই কেন্দ্রগুলির একত্ব বিধান করিতেছে, শারীর-বিজ্ঞান তাহার উত্তর দিতে অক্ষম। কোথায় এবং কিরূপে এই কেন্দ্রগুলি মিলিত হয়? মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহ পৃথক পৃথক, আর এমন কোন একটি কেন্দ্র নাই, যাহা অপর কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত করিতেছে। অতএব এ পর্যন্ত এ-বিষয়ে সাংখ্যমনোবিজ্ঞানে প্রতিবাদী কেহ নাই।'[৪৯] প্রায় এক শতাব্দী ধরে আধুনিক বিজ্ঞানীরা স্বামীজীর উপরোল্লিখিত প্রশ্নের জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছেন; সাফল্য যে একেবারে কিছুই হয়নি তা নয়, তবে সাফল্য এখন পর্যন্ত আংশিক মাত্র। সেগুলির আলোচনা বর্তমান বিষয়-বহির্ভূত। তাই স্বামীজীর সাংখ্যপ্রোক্ত উপপাদ্যের উপর আস্থা তৎকালে নিশ্চয়ই অযৌক্তিক ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনের স্বরূপ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারেননি। মন কি একটা বস্তু না ভাব মাত্র, না একাধারে উভয়ই! বিজ্ঞানীরা সন্দেহাকুল। স্বামীজীর কাছে এ-নিয়ে কিন্তু কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। তাঁর কাছে মন এবং বস্তু বা Matter-এ কোন পার্থক্য ছিল না। অবলীলাক্রমে একটি অপরটিতে রূপান্তরিত হয়। একই সত্তার দুই রূপ। প্রায় একশ বছর লেগেছে জড়বিজ্ঞানীদের এই সত্যটি উপলব্ধি করতে। সে যা হোক, উপরের উদ্ধৃতিটি পাঠ করলে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, তৎকালে প্রচলিত শারীরবিজ্ঞানে স্বামীজীর বিশেষ অধিকার ছিল, এবং

৪৮। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪০০ ৪৯। তদেব, পৃঃ ৯২-৩

তাঁর মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন প্রাচীন ও আধুনিক উভয় বিদ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মনে রাখতে হবে, স্বামীজীর সকল চিন্তা, সকল কর্মের প্রেরণা ছিল মানবের 'পূর্ণতা' লাভ। স্বামীজী বুঝেছিলেন যে, মনোবিদ্যার অনুশীলনের দ্বারা এই পূর্ণত্বপ্রাপ্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। তিনি বলেছেনঃ 'তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্রবক্ষে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় বাহ্যপ্রকৃতির ক্রীড়াপুত্তলিকারূপে যুগ যুগ ধরিয়া মানুষকে অপেক্ষা করিতে না দিয়া তাহার পূর্ণত্বকে প্রকট করিয়া দেওয়াই এই বিজ্ঞানের উপযোগিতা। এই বিজ্ঞান চায় তুমি সবল হও, প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া না দিয়া কাজটি তুমি নিজের হাতে তুলিয়া লও এবং এই ক্ষুদ্র জীবনের ঊর্ধ্বে চলিয়া যাও। ইহাই তাহার মহান উদ্দেশ্য।'[৫০]

এগুলি ছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যান্য ধারাগুলিও স্বামীজী সযত্নে অনুশীলন করেছেন। তার মধ্যে বিশেষ করে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং কারিগরি বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। কিন্তু যেহেতু উদ্দেশ্য কেবলমাত্র স্বামীজীর বিজ্ঞান-সচেতনতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া, তিনি বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ শাখায় পারঙ্গম ছিলেন তার বিস্তারিত প্রমাণ দাখিল করা নয়, তাই এই সীমাবদ্ধ আলোচনাতেই বর্তমান অধ্যায়ের ইতি করা সমীচীন হবে মনে হয়।

॥ ১১ ॥

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রয়োগের মধ্যে স্বামীজীর বিজ্ঞান-চেতনার সহজ ও সাবলীল প্রকাশ দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক রসায়নে জড়িত মানসের অধিকারী না হলে এরকম দৃষ্টিভঙ্গি সহজ নয়। অশনে-বসনে, আহারে-বিহারে, শৌচ-আচমন-অবগাহনে, প্রতিদিনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞানচেতনার নিয়ন্ত্রণের বহু নিদর্শন তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর দরিদ্র, প্রায়-নিরক্ষর দেশবাসীকে বৈজ্ঞানিকদৃষ্টি-সচেতন করে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর দেশবাসীর চরিত্রের গোড়ার গলদটি সঠিক নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই মৌলিক গলদটি হল সর্বনাশা সার্বিক কুসংস্কার। তাঁর পূর্বোল্লিখিত পুস্তকের আরম্ভেই তিনি অলঙ্কার-ঝঙ্কৃত ভাষায় তাঁর স্বদেশবাসিগণের সম্বন্ধে 'ইওরোপীয় পর্যটক'দের ধারণা এবং ইংরেজ রাজপুরুষদের চোখে আমাদের যে-চিত্র এঁকেছেন তা সত্যই অনবদ্য এবং অতুলনীয়। সমস্ত অংশটি তুলে দিতে পারলেই ভাল হত, কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হবার আশঙ্কায় তা থেকে নিবৃত্ত হতে হল। আবার ভারতবাসীর চোখে 'ওঁরা' হলেন 'দেহপোষণৈক জীবন' পাশ্চাত্য অসুর মাত্র। কিন্তু একথাও সত্য যে, '...দুঃখ দারিদ্র তো বাস্তবিক ভারতবর্ষের মতো পৃথিবীর আর কোথাও নাই।'[৫১] স্বামীজী তাঁর দেশবাসীকে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক ও সজাগ করে তাদের দুর্দশা দূর-কল্পে সচেষ্ট হলেন। তিনি কুশলী শল্য-চিকিৎসকের মতো আমাদের ব্যাধিগ্রস্ত

৫০। তদেব, পৃঃ ৪১৩ ৫১। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫০

সামাজিক এবং ব্যক্তিগত অনাচারের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে সেগুলি নির্মূল করতে তৎপর হয়েছিলেন।

তিনি প্রথমেই শারীরিক পরিচ্ছন্নতার প্রসঙ্গ তুলে বলেছেনঃ 'দেখ, শরীর নিয়ে প্রথম। বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি হচ্ছে—পবিত্রতা। ...দুনিয়ায় এমন জাত কোথাও নেই যাদের শরীর হিঁদুদের মতো সাফ। হিঁদু ছাড়া আর কোন জাত জলশৌচাদি করে না।'[৫২] একটু পরেই প্রশ্ন তুলেছেনঃ 'আমরা স্নান করি কেন?' এবং নিজেই জবাব দিয়েছেনঃ 'অধর্মের ভয়ে; পাশ্চাত্যেরা হাত-মুখ ধোয়—পরিষ্কার হবে বলে। আমাদের জল ঢাললেই হল, তা তেলই বেড়-বেড় করুক আর ময়লাই লেগে থাকুক।'[৫৩] এই একই ধারায় তিনি বলেছেনঃ 'ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে আমরা ময়লা হয়ে থাকি অনেক সময়। ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে ছুঁলে নাইতে হয়; সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দোরের পাশে পচতে দিই। না ছুঁলেই হল! এদিকে যে নরককুণ্ডে বাস হচ্ছে, তার কি? একটা অনাচারের ভয়ে আর একটা মহাঘোর অনাচার। একটা পাপ এড়াতে গিয়ে, আর একটা গুরুতর পাপ করছি। যার বাড়িতে ময়লা সে পাপী, তাতে আর সন্দেহ কি? তার সাজাও তাকে মরে পেতে হবে না, অপেক্ষাও বড় বেশী করতে হবে না।'[৫৪]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে স্বামীজীর ব্যবহারিক জীবনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমে তিনি আমাদের তথাকথিত পরিচ্ছন্নতা যে কত ঠুনকো তা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন এবং তার মূল্যপ্রদান যে পরলোকের জন্য অপেক্ষা না করে দুরন্ত ব্যাধির মধ্য দিয়ে এ-জীবনেই দিতে হয় তা-ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ ঘরে বাইরে, নিজদেহে এবং দেহাবরণে, রন্ধন ও রন্ধনশালায়, সর্বত্র পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে। শুধু দেহ পরিষ্কার রাখব আর নোংরা কাপড়চোপড় পরব—এ চলবে না। তাঁরই কথায়ঃ '"আচারঃ প্রথমো ধর্মঃ"। আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া—সব রকমে পরিষ্কার হওয়া। আচার-ভ্রষ্টের কখন ধর্ম হবে? অনাচারীর দুঃখ দেখছ না, দেখেও শিখছ না? এত ওলাউঠা, এত মহামারী, ম্যালেরিয়া—কার দোষ? আমাদের দোষ। আমরা মহা অনাচারী!!!'[৫৫]

এই যে আচারের বিচার, এই যে ব্যাধি-মহামারীর মূলে প্রবেশের চেষ্টা, এখানে আধ্যাত্মিকতা ছেড়ে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী মনই প্রবল। এর প্রতিকারকল্পে তিনি কোন ঠাকুর-দেবতার স্মরণ নিতে বিধান দেননি। এখানে তাঁর উপদেশ নব্য বিজ্ঞানভিত্তিক। এবং এইরূপ বস্তুবিজ্ঞান-ভিত্তিক মনোভাবের পরিচয় তিনি ব্যবহারিক ব্যাপারে বরাবর দিয়ে গেছেন।

'আহার ও পানীয়' সম্বন্ধীয় আলোচনায় তাঁর এইরূপ মনোভাব স্পষ্টতর হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে রামানুজাচার্যের মতামত এবং তদ্বিষয়ে স্বামীজীর বিচার অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপকঃ 'রামানুজাচার্য ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তিনটি দোষ বাঁচাতে

৫২। তদেব, পৃঃ ১৬৮ ৫৩। তদেব, পৃঃ ১৬৯
৫৪। তদেব, পৃঃ ১৭০ ৫৫। তদেব, পৃঃ ১৭২

বলছেন। জাতিদোষ অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্যদ্রব্যের জাতিগত; যেমন প্যাঁজ লশুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে মনে অস্থিরতা আসে অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। আশ্রয়দোষ অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শ হতে আসে; দুষ্ট লোকের অন্ন খেলেই দুষ্টবুদ্ধি আসবেই, সতের অন্নে সদ্‌বুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্তদোষ অর্থাৎ ময়লা কদর্য কীট-কেশাদি-দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে। এর মধ্যে জাতিদোষ এবং নিমিত্তদোষ থেকে বাঁচবার চেষ্টা সকলেই করতে পারে, আশ্রয়দোষ হতে বাঁচা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই আশ্রয়দোষ থেকে বাঁচবার জন্যই আমাদের দেশে ছুঁৎমার্গ—"ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না"...একটা কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়।'[৫৬] খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ছুঁৎমার্গের উৎপত্তি এবং তার অশুভকর পরিণতির এইরূপ ঐতিহাসিক এবং যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা স্বামীজীর আগে আর কেউ দিয়েছেন বলে জানা নেই। ঐ অপসংস্কারের বোঝা আজও আমাদের সমাজের কাঁধে চেপে বসে আছে সিন্ধবাদ নাবিকের কাঁধের বৃদ্ধটির মতো।

নিরামিষ ও আমিষ আহার নিয়ে স্বামীজীও বিস্তারিত আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, জাতি-কর্ম ভেদে আহারাদি পৃথক হতে পারে। 'যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ; আর যাকে খেটেখুটে এই সংসারের দিবারাত্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বইকি।'[৫৭] আমিষ-নিরামিষের কোঁদল থামিয়ে, শরীরকে শুধু ধারণকল্পে নয়, সুস্থ ও কর্মক্ষম করে তুলবার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে: '...পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয়, এমন খাওয়া খাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। যে খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে; যদি হজমেই সমস্ত শক্তিটুকু গেল, বাকি আর কি কাজ করবার শক্তি রইল?'[৫৮] এই সিদ্ধান্ত ও মন্তব্যগুলিকে আজকের ভাষায় বলা যায় প্র্যাগম্যাটিক (Pragmatic) সিদ্ধান্ত এবং এগুলি একান্তভাবে আধুনিক-বিজ্ঞানসম্মত। খাদ্যাদি সম্বন্ধে স্বামীজীর কয়েকটি সূত্রাকৃতি মন্তব্যের উল্লেখ করেই খাদ্যাখাদ্য প্রসঙ্গের ইতি করা যাক। 'ঘি তেল গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ।'[৫৯] 'ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই দুষ্পাচ্য।'[৬০] 'যদি একান্ত পাঁউরুটি খেতে হয় তো তাকে পুনর্বার খুব আগুনে সেঁকে খেও।'[৬১] এবং খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তাঁর মোক্ষম উক্তি—'গরীবরা খাবার জোটে না বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে'[৬২]—সেদিনের মতো আজও সত্য। অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

'দুধ' সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত আমাদের প্রচলিত ধারণাকে প্রবলভাবে পরিবর্তন করবে সন্দেহ নেই। মাতৃস্তন্য পানেই মানুষ-সমেত সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবদের জীবনযাত্রার শুরু। স্তন্যদাতৃ গাভী তাই ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজে মাতৃজ্ঞানে পূজিতা। স্বামীজী কিন্তু দুগ্ধ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাকুল নন। তিনি বলেছেন: 'দুধ—পেটে অম্লাধিক্য হলে একেবারে

৫৬। তদেব, পৃঃ ১৭২-৭৩ ৫৭। তদেব, পৃঃ ১৭৫
৫৮। তদেব, পৃঃ ১৭৬ ৫৯। তদেব ৬০। তদেব, পৃঃ ১৭৭
৬১। তদেব, পৃঃ ১৭৮ ৬২। তদেব, পৃঃ ১৭৬

দুষ্পাচ্য, এমনকি একদমে এক গ্লাস দুধ খেয়ে কখন কখন সদ্য মৃত্যু ঘটেছে। দুধ—যেমন শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে, তেমনি ঢোকে ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুবা অনেক দেরি লাগে। দুধ একটা গুরুপাক জিনিস, 'মাংসের সঙ্গে হজম আরও গুরুপাক, কাজেই এ নিষেধ য়াহুদীদের মধ্যে। মূর্খ মাতা কচি ছেলেকে জোর করে ঢক ঢক করে দুধ খাওয়ায়, আর দু-ছ মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে!! এখানকার ডাক্তারেরা পূর্ণবয়স্কদের জন্যও এক পোয়া দুধ আস্তে আস্তে আধ ঘণ্টায় খাওয়ার বিধি দেন; কচি ছেলেদের জন্য "ফিডিং বট্‌ল্‌" ছাড়া উপায়ান্তর নেই।'[৬৩]

দুধ সম্বন্ধে স্বামীজীর উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি সর্বজনগ্রাহ্য হবে না। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রও তা মানবে বলে মনে হয় না। যেমন অন্ত্র-ক্ষত (Peptic Ulcer) রোগের চিকিৎসায় দুগ্ধের একটা প্রধান ভূমিকা রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পরবিরোধী। একটু বিচার করলে কিন্তু এ-দুয়ের মধ্যে কিছু কিছু মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না। আধুনিক চিকিৎসকেরাও অন্ত্র-ক্ষত চিকিৎসায় অল্প পরিমাণে বারে বারে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা দেন এবং অম্লাধিক্য থাকলে দুধের সঙ্গে অম্লনাশক ঔষধাদি যোগ করে দেন। বর্তমানে দুগ্ধের এ্যালার্জিক (Allergic) দোষ সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা সজাগ হয়ে উঠেছেন। ছ-মাসের কম বয়স্ক এক শিশু দুগ্ধ-এ্যালার্জির জন্য মৃত্যুমুখী হয়েছিল—এ অভিজ্ঞতা বর্তমান নিবন্ধকারেরই আছে। অতি কষ্টে শিশুটির প্রাণরক্ষা হয়। দুধের এ্যালার্জি-দোষ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদীরা কিন্তু সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। 'তরুণ' সর্দিজ্বর অথবা অতিসারে তাঁদের মতে দুগ্ধ-পথ্য নিষিদ্ধ ছিল।

খাদ্যাদির পরে আসে বেশভূষা। খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারেও যেমন, পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও ঠিক তেমনই তিনি দেশবিদেশের বিভিন্ন আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তদ্দেশীয়দের জীবনযাত্রা-প্রণালীর সম্যক পর্যালোচনা করে পরিবেশের উপরে বেশভূষার প্রয়োজনীয়তা ও বিবর্তনের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। এতৎসত্ত্বেও তিনি পোশাক-আশাকের সামাজিক দিকটা অবহেলা করেননি। তিনি নিজেই বলেছেনঃ 'সকল দেশেই কাপড়ে চোপড়ে কিছু না কিছু ভদ্রতা লেগে থাকে।'[৬৪] আবার কিছুটা রাজনৈতিক চাপও যে পোশাকের বিবর্তনে অংশগ্রহণ করে তা-ও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি লিখেছেনঃ 'সিকন্দর শা ইরান জয় করে, ধুতি-চাদর ফেলে ইজার পরতে লাগলেন। তাতে তাঁর স্বদেশী সৈন্যরা এমন চটে গেল যে বিদ্রোহ হবার মতো হয়েছিল। মোদ্দা সিকন্দর নাছাড় পুরুষ—ইজার-জামা চালিয়ে দিলেন।'[৬৫]

এগুলি সবই পোশাকের বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বেশভূষার ক্ষেত্রে আসল ভূমিকা হল প্রাকৃতিক পরিবেশের। তাই তিনি লিখেছেনঃ 'গরমদেশে কাপড়ের দরকার হয় না। কৌপীনমাত্রেই লজ্জানিবারণ, বাকি কেবল অলঙ্কার। ঠাণ্ডা দেশে শীতের চোটে অস্থির, অসভ্য অবস্থায় জানোয়ারের ছাল টেনে পরে, ক্রমে কম্বল পরে, ক্রমে জামা-পাজামা ইত্যাদি নানানখানা হয়।'[৬৬]

৬৩। তদেব, পৃঃ ১৮৪ ৬৪। তদেব, পৃঃ ১৮৫
৬৫। তদেব, পৃঃ ১৮৬ ৬৬। তদেব, পৃঃ ১৮৭

এইভাবে স্বামীজী তাঁর স্বদেশীয়দের এবং বিদেশীদের আচার-ব্যবহার ইত্যাদি যাবতীয় দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বিশেষ লক্ষণীয় হচ্ছে, তাঁর এই বিচারের মূলে রয়েছে এক অতি স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। কোন সংস্কার বা কুসংস্কারই তাঁর যুক্তিবাদী মনকে আচ্ছন্ন করেনি এবং এসব ক্ষেত্রে তিনি কখনই ঈশ্বরের দোহাই পাড়েননি। 'Art, science, and religion are but three different ways of expressing a single truth.'[৬৭] (কলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সত্যকে প্রকাশ করবার তিনটি উপায়)—স্বামীজীর এই গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্তিটি তাঁর মহান জীবনে, তাঁর নিজের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে।

মোক্ষ-উপলব্ধি থেকে ঘটপটাদি যাবতীয় সূক্ষ্ম ও স্থূল বস্তুর উপলব্ধি, এসকলই বিজ্ঞানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এই সংজ্ঞার মধ্যে শিল্প (চিত্রাদি) এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। নন্দনতত্ত্ব বিজ্ঞানেরই এক তত্ত্ব। বিজ্ঞানের এই শাখায়ও স্বামীজীর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। অধ্যাত্মসাধনা তাঁকে শিল্পবিমুখ করেনি, বরং তাঁর সৌন্দর্যচেতনাকে শাণিত করে এক নতুন স্তরে উন্নমিত করেছে। শৈশবকাল থেকেই স্বামীজী সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং সঙ্গীতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতাও লাভ করেছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই ক্ষমতা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিলাভ করে। বস্তুত এই সঙ্গীতের মাধ্যমেই তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর অপর একটি নান্দনিক প্রতিভার কথা কিন্তু ততটা প্রচারিত হয়নি। সেটি হল তাঁর চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। এগুলিতেও তাঁর অধিকার ছিল অতি উচ্চমানের। বস্তুত স্বামীজী ছিলেন ভারতীয় শিল্পকলার প্রকৃত বোদ্ধা।

'অধ্যাত্মসাধনা বিবেকানন্দকে শিল্পবিমুখ করে তোলেনি। বরং তাঁর সৌন্দর্যচেতনাকে নতুন রূপ দিয়েছে। ...স্বামীজীর মতে, ভক্ত এবং শিল্পী আসলে সমগোত্রীয় ; শিল্পী যেমন সৌন্দর্যের মধ্যে খুঁজে পান আকাঙ্ক্ষিত পরমসুন্দরকে, আর সেই সঙ্গে নিজেকেও, ভক্তও তেমনি তাঁর সাধনার সিদ্ধি হিসাবে প্রত্যক্ষ করেন চিরসুন্দরের মোহন-মূর্তি। সেই দর্শন আত্মদর্শনও বটে...।'[৬৮] নন্দনতাত্ত্বিক বোধ ও তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যচেতনা এনে দিতে পারে ইতিমূলক উদার প্রসন্ন বৈরাগ্য। তখন সাধকের মতো শিল্পীরও ঘটে ব্রহ্মসাক্ষাৎ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শিল্পীর সাধনা এবং ভক্তের সাধনা স্বামীজীর কাছে ছিল সমগোত্রীয়। ঈশ্বরসাধনার মতো এই সৌন্দর্যসাধনাও বাসনামুক্ত হওয়া চাই। তাঁর কাছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একটি চিত্রস্বরূপ। মানুষ যখন সম্পূর্ণ বাসনামুক্ত হবে, 'তখনই মানুষ জগৎকে উপভোগ করিবে, তখন আর এই কেনাবেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক অধিকারবোধ থাকিবে না। তখন ঋণদাতা নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতাও নাই, জগৎ তখন একখানি চিত্রের মতো'। এইভাবে মহৎ শিল্পসাধনা ঈশ্বরসাধনারই নামান্তর, সৌন্দর্যের মধ্যেই

৬৭। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I, Advaita Ashrama, Calcutta, Eleventh Edition (1962), p. xvi. (Introduction) ৬৮। জয়শ্রী, ৩৯ বর্ষ, পৃঃ ২১৮

ঈশ্বর প্রতিফলিত হন। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার স্বামীজী সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন: 'একবার ইটালীতে সূর্যাস্তের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ নিবেদিতাকে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, "বহির্জগতে সৌন্দর্যের যে বিকাশ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, তাহা যে আমাদের মনের মধ্যেই বর্তমান বাহিরে উহার কোন অস্তিত্ব নাই..."।'[৬৯] তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অধ্যাত্মচেতনাই স্বামীজীকে সৌন্দর্যসাগরে ডুব দিতে প্ররোচিত করেছে।

॥ ১২ ॥

ইউরোপীয় রেনেসাঁস-পরবর্তী মানবসমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষারূঢ় হয়ে অচিন্তনীয় বেগে ছুটে চলেছে 'মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা...' পিছে ফেলে। তার এই দুর্মদ যাত্রাপথে সে বিশাল ব্যাপ্ত মহাপ্রকৃতিকে জয় করতে চায়, উদ্ঘাটন করতে চায় প্রকৃতির গূঢ় গোপন সত্যকে। এই প্রচেষ্টায় তার করায়ত্ত হয়েছে এক অকল্পনীয় অভূতপূর্ব শক্তির আধার। মানব আজ মহাশক্তিধর। কি করবে সে এই শক্তি নিয়ে? দেবাদিদেব মহাদেবের বরে বলীয়ান, শক্তিমদে মত্ত দৈত্যের মতো সে কি দেবাদিদেবের উপরই তা পরখ করে দেখতে চেষ্টা করবে, অথবা মোহভ্রষ্ট হয়ে আপন ধ্বংসসাধনে নিয়োজিত হবে? অথবা আধ্যাত্মিকবলে বলীয়ান হয়ে মহাবিশ্বের মহদোপকার সাধনে ব্রতী হবে—জগদ্ধিতায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হবে? বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে মনুর পুত্রগণ এই কূট প্রশ্নের সম্মুখীন। বিজ্ঞানের প্রসাদে মানুষ আজ তার স্থান-কাল-পাত্রের সীমার সীমানা সম্বন্ধে সংশয়িত। এতদিন তার কাছে একটা অলঙ্ঘ্য সীমা ছিল 'আলোকের গতি' যার চাইতে দ্রুততর কিছু সে কল্পনাও করতে পারেনি। আজ ভারতীয় বিজ্ঞানী ডক্টর সুদর্শন প্রস্তাবিত 'টাইকিয়ন কণা' (Tychyon) আলোকের 'ফোটন কণা' (Photon)-কে পিছে ফেলে দ্রুততর বেগে ছুটে চলেছে। এতে যদি মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়ে, যদি বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে আপন সর্বনাশ ডেকে আনতে উন্মুখ হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কি থাকতে পারে? এই মহাবিপদ থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র আধ্যাত্মিক চেতনা। অচিৎ-বিজ্ঞান যদি চিৎ-বিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবেই সেটা সম্ভব, অন্য কোন পথেই তা সম্ভব নয়। পরমাশ্চর্যের কথা যে, এখন থেকে প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে বাংলার অমিততেজ মহাবীর্যবান বীর সন্ন্যাসীর ঋষিকল্প দৃষ্টিতে মানুষের এই জীবনমরণ সমস্যাটি ধরা পড়েছিল। তাই তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন সতর্কবাণী। আবার সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছিলেন পরম আশ্বাস। বলেছিলেন মানুষকে তার আপন স্বরূপ চিনে নিতে। বলেছিলেন মানুষের আধিভৌতিক স্বরূপের মধ্যেই নিহিত আছে তার অধ্যাত্মস্বরূপ। এই দুয়ে মিলেই তার অখণ্ড স্বরূপ। এ যেন একই মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ, এদের আলাদা করা যায় না, আলাদা করা সম্ভব নয়, আলাদা করতে গেলেই ইষ্ট নষ্ট। তবু মানুষ ভুল করে। ভুল করেছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানের

৬৯। বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ (১৩৫৩), পৃঃ ২৭৬

পুরোধাগণ। তাঁরা দেখলেন বস্তুবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞানকে আলাদা করে। আধ্যাত্মিক চেতনাহীন বস্তুবিজ্ঞান অন্ধবেগে ছুটে চলল অজানা তিমির গহ্বরের দিকে। আবার এদিকে অধ্যাত্মবাদীরা বস্তুবিজ্ঞানকে তুচ্ছ করলেন, তাকে পরমার্থবিরোধী ভাবলেন। দুয়ের মধ্যে সৃষ্টি হল বৈরী ভাব। কত বরেণ্য, বর্তমানে প্রাতঃস্মরণীয় বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী প্রাণ দিলেন তাঁদের জ্ঞানচিকীর্ষার মূল্য হিসাবে। আপাতদৃষ্টিতে দুই ভিন্নপথে এগিয়ে চললেন জিজ্ঞাসুর দল। সেই সময়েই স্বামীজী আনলেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি দেখালেন যে, মানুষের পক্ষে পার্থিব চিন্তা এবং পরমার্থচিন্তা, উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে চলতেই হবে ধুলোমাটির পথে। সেটাই মানবজীবনের অতি বিশিষ্ট অঙ্গ। কিন্তু সেই চলার পথ আলোকিত করতে হবে অধ্যাত্ম-আলোকে। পৃথিবীতে চলার পথ বস্তুবিজ্ঞানের পথ। তাই বিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া মানুষের চলার উপায় নেই। কিন্তু সেই বিজ্ঞানকেও হতে হবে অধ্যাত্মচেতনা-ভিত্তিক। স্বামীজী বস্তুবিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব দেখতে পাননি। পরন্তু দুয়ের মধ্যে একাত্মতা দেখেছেন। পরমাশ্চর্যের কথা, সেই যুগেই তিনি বিজ্ঞানের উপমা দিয়ে পরম চৈতন্যের ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা করেছেন। আবার আধ্যাত্মিক উপমা দিয়ে বস্তুবিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে যে, আজ প্রাগ্রসর বিজ্ঞান যেন অধ্যাত্ম-চৈতন্যের মধ্যে নিজস্ব বিশিষ্ট স্বরূপ হারিয়ে ফেলে 'পূর্ণত্ব' লাভ করতে চলেছে। আর এই পরম বিস্ময়কর সত্যের প্রথম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁরই মহান চেতনায় এই সত্য প্রথম ধরা পড়েছিল যে, বিজ্ঞানের পথ ধরে আরও নিদিধ্যাসনার ফলশ্রুতিতে মানুষ একদিন জড়বিজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে ভূমার গভীরে চলে যেতে সমর্থ হবে। বিজ্ঞানের অল্পজ্ঞানই আমাদের অধ্যাত্মজগৎ থেকে দূরে নিয়ে যায়, কিন্তু গভীরতর বিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণা শেষ পর্যন্ত মানুষকে মহত্তম আধ্যাত্মিকতায় বোধিস্মান করে—আজকের বিজ্ঞান এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর স্বামীজী অনেক আগেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এইখানেই তাঁর যথার্থ ঋষিত্ব। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের মানসিক গঠনে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল একথা সহজেই মেনে নেওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধর্ম ও বিজ্ঞান*

আধুনিক মানুষের কাছে বিজ্ঞান আর ধর্ম ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই দুটি পথ যদি সম্মিলিত ও সমন্বিত হয়ে ওঠে তবে তা মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্পাদন করে মানবপ্রতিভার সর্বাত্মক আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত কয়েক শতাব্দী ধরে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর ছিল না। বিংশ শতাব্দীতে অবশ্য এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদয় হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রবক্তারা ক্রমশই এই দুয়ের মধ্যে একটি ঐক্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন যে, নিজ বিশ্বাসে স্থির থেকেও উভয়ের মিলন ঘটতে পারে এবং মানুষের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করতে পারে। মানুষ আজ বুঝতে পারছে যে বিজ্ঞানের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ধর্মীয় বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে পারে এবং ধর্মের মধ্যে এমন কিছু আছে যা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকে আরও গভীর ও শক্তিশালী করতে পারে। এই পারস্পরিক মিলনসূত্র এবং উভয়ের পরীক্ষাপ্রণালী ও লক্ষ্য আমরা আলোচনা করে দেখব; দেখব স্বামী বিবেকানন্দের মননালোকে—মানবজ্ঞানের ঐক্য ও সামগ্রিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে। স্বামীজীর অপূর্ব আধ্যাত্মিকতা এবং বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে মিলনসূত্র রচনা করেছে তা আজ আমাদের কাছে বিস্ময়কর। এ সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন ঃ 'ভারসাম্য ও সমন্বয়, এই দুইটি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের সংগঠন-প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সম্পূর্ণ চারিটি যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক হইতে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক সকল কর্ম—এই সমস্ত মানস পথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ...তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রকাশ।'[১]

বৈজ্ঞানিক পথ

মানবমনের যে বৈশিষ্ট্য আজকের সভ্যতার জন্ম দিয়েছে তাকে বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারার অনুসরণে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা বৈজ্ঞানিক পথের দুটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। প্রথমত, তাত্ত্বিক বিজ্ঞান—যা কোন গোঁড়ামি না রেখে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করে দেখে। দ্বিতীয়ত, ব্যবহারিক বিজ্ঞান—তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যাদি যেখানে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো হয়। এই দুটি সবসময় হাত ধরাধরি করে চলে। জ্ঞানের ফল শক্তি, আবার

---

*Swami Vivekananda's Synthesis of Science and Religion-এর অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ।

১। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী—রোমাঁ রোলাঁ (অনুবাদ ঃ ঋষি দাস), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃঃ ২৬৮

শক্তির ফলে প্রাকৃতিক বস্তুগুলির উপরে অধিকার জন্মায়, মানুষ সেগুলিকে নিজের জীবন ও চিন্তাধারা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের প্রতিটি নতুন আবিষ্কারই কোন না কোন ভাবে ব্যবহারিক করে তোলা হয়, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে জয় করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। এইভাবে দেখা গেছে সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী এক যান্ত্রিক সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। মানবমন যেভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির গোপন রহস্যময় শক্তিগুলিকে একে একে নিজের আয়ত্তে এনে কাজে লাগাচ্ছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। এরই পরিণামে আজ আমরা পারমাণবিক বিজ্ঞান আর মহাকাশজয়ের যুগে প্রবেশ করেছি।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

কিন্তু আমরা যদি আরও একটু গভীরে গিয়ে লক্ষ্য করি, তাহলে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। বিজ্ঞানের দুটি শাখার কথাই ধরা যাক—পদার্থবিজ্ঞান (জ্যোতির্বিজ্ঞানকে ধরে) এবং জীববিজ্ঞান। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবরহস্য সম্বন্ধে এই দুটি আমাদের গভীর জ্ঞান এনে দিয়েছে। গত শতাব্দী পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞান নির্দেশ্যবাদকেই[২] (determinism) তুলে ধরছিল, জড়বাদ ও যান্ত্রিকতার ব্যাপকতায় সে বিশ্বাসী ছিল এবং তখনকার সমস্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণায় একটা স্থির প্রত্যয় পরিলক্ষিত হত। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে এসে পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে এক ধরনের নমনীয়তা দেখা যেতে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বস্তুর বাহ্যিক রূপকেই বিজ্ঞানীরা বড় করে দেখছিলেন। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা এবং পরমাণুবিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে, বস্তুজগতের রহস্য জানার পথে একটি বিরাট বাধা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা আজ স্বীকার করছেন যে, বিজ্ঞান মূলত বস্তুর প্রকাশশীল গুণগুলিকে যত সহজে ধরতে পারে তার স্বরূপ সম্বন্ধে ততটা নয়। কয়েকজন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আজ একথা বলতে কুণ্ঠিত নন যে, বিজ্ঞান বস্তুজগতের বাহ্যিক রূপটি নিয়েই বেশী মাথা ঘামাচ্ছে। এই দৃশ্যজগতের পিছনে রয়েছে এক অদৃশ্যজগৎ।

২। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নিউটনের 'ফিলসফিয়া ন্যাচুরালিস প্রিনসিপিয়া ম্যাথামেটিকা' বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যার যুগ শুরু হয়, বলা যায়। এই বইয়ে নিউটন প্রথম ক্ল্যাসিকাল বিদ্যার তিনটি প্রাথমিক নিয়ম উপস্থাপিত করেছিলেন যা পরে 'নিউটনের গতিবিদ্যার তিনটি সূত্র' হিসাবে বিখ্যাত হয়। এর পরে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান আরও এগিয়ে যায়, যার মূল বক্তব্য ছিলঃ মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তুর গতিবিধি ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট কতগুলি নিয়মে আবদ্ধ। আকস্মিক ঘটনা বলে কিছু নেই, সবকিছুই কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। একেই বলা হত 'যান্ত্রিক নির্দেশ্যবাদ'। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যেসব নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছিল, দেখা গেল সেগুলিকে আর প্রচলিত বিজ্ঞানের কাঠামোর মধ্যে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। আলোর গতিবেগের নিত্যতা, তপ্ত বস্তুর তাপীয় বিকিরণ, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদির আবিষ্কার এই নির্দেশ্যবাদের উপর চরম আঘাত হানল। পরবর্তী যুগে কোয়ানটাম বলবিদ্যা দিয়ে এসবের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হল। কিন্তু আবার আঘাত হানলেন হাইজেনবার্গ যিনি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর অনির্দেশ্যবাদ আইনস্টাইনকে পর্যন্ত চিন্তিত করে তুলেছিল।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এইভাবে ক্রমশ ধরা পড়ছে। বস্তুজগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে বা ইন্দ্রিয়সহায়ক যন্ত্রের কাছে যেভাবে প্রতিভাত হচ্ছে, বিজ্ঞান তা নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়চেতনা এতই সীমাবদ্ধ যে, এগুলির মাধ্যমে আমরা যে জগৎকে, যে ইন্দ্রিয়জগৎকে জানছি তার গভীরে আর এক জগৎ থেকে যাচ্ছে, যা এগুলির উৎসমুখ। বিজ্ঞান কিন্তু বস্তুজগতের এই দৃশ্য অংশটুকু নিয়েই চর্চা করে এবং এই দৃষ্ট জগতের শক্তিগুলিকে মানবকল্যাণে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।

জীববিজ্ঞানেও এই জিনিসটি দেখা যায়। গত শতাব্দী পর্যন্ত নির্দেশ্যবাদের সমর্থক ছিল এই শাখাটি। জীবনের বিভিন্ন স্তর ও গতি সম্পর্কে আলোচনা করে ক্রমবিকাশের বিখ্যাত তত্ত্বে সে উপনীত হয়েছিল—যে তত্ত্ব মানুষ ও পশুকে প্রায় একই স্তরে নামিয়ে এনে উভয়কেই 'যন্ত্র' বলে বর্ণনা করতে উদ্যত হচ্ছিল। কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা স্পষ্টই বলছেন যে, ডারউইনের অনেক তত্ত্বের সঙ্গে তাঁরা আর একমত হতে পারছেন না। স্যার জুলিয়ান হাক্সলী তো ডারউইনের 'The Origin of Species' আর 'The Descent of Man' বই দুটির সম্বন্ধে মন্তব্যই করে বসলেন যে, এগুলির নাম হওয়া উচিত ছিল যথাক্রমে 'The Evolution of Organisms' এবং 'The Ascent of Man'।[৩] ডারউইনের সময়ে বিজ্ঞান এবং চার্চের মধ্যে যে সঙ্ঘর্ষ চলছিল তা-ই হয়তো ডারউইনকে ঐ নাম দুটি রাখতে উৎসাহিত করেছিল।

পদার্থবিজ্ঞানের সর্বাত্মক জড়বাদ ও যান্ত্রিক নির্দেশ্যবাদ এবং জীববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশতত্ত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম ও আত্মিক মূল্যবোধের প্রতি মানুষের বিশ্বাস শিথিল করে দিচ্ছিল।

সঙ্কীর্ণ ধর্মমতের সীমাবদ্ধতা

সেইসঙ্গে যুক্ত হল বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ ও বিপ্লবী কার্ল মার্কসের চিন্তাধারা এবং ধর্মপ্রসঙ্গে তাঁর তীব্র আক্রমণ। সেসময় শিল্পবিপ্লবের যুগ চলছে। এই ভাববাদীরা প্রশ্ন তুললেনঃ ভগবান যদি সত্যই সু-উচ্চ স্বর্গে থাকেন তবে এই পৃথিবীতে এত দুঃখকষ্ট কেন? কেন লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধার্ত অবস্থায় জীবন কাটায়? কেনই বা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি হাজার হাজার শিশুকে ক্রীতদাসের মতো কারখানায় খাটতে বাধ্য করে? কেন এই বৈষম্য? মানুষের উপর মানুষের কেন এই অত্যাচার?—এ আমরা বুঝতেও পারি না, সহ্য করতেও পারি না। মার্কস তাই ধর্মকে 'soul of soulless conditions, the heart of heartless world, the opium of the people' বলে অভিহিত করলেন।

ফলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির প্রাক্কালেই ধর্ম, ঈশ্বর ও শাশ্বত মূল্যবোধের উপরে আস্থাহীনতাই আধুনিক সভ্যজগৎকে প্লাবিত করল। মানুষের কর্ম ও চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করার শক্তি ধর্ম হারিয়ে ফেলল। মানুষ ভালমন্দের বিচার ছাড়ল। মানুষের চিত্ত থেকে ধর্মভীরুতা, অপরাধবোধ ও শয়তানের ভয় বিলুপ্ত হল। বিজ্ঞানও এই

৩। Evolution after Darwin, Vol. I—Sir Julian Huxley, The University of Chicago Press, p. 17

অবস্থায় ইন্ধন যোগাল। শিক্ষিত মানুষের কাছে এগুলি কুসংস্কার বলেই পরিগণিত হল। আধুনিক বিজ্ঞান প্রথমে ধর্মকে মনে করল বিপজ্জনক ভ্রান্তি এবং পরিশেষে নিরীহ অলীক কল্পনারূপে চিহ্নিত করে এক পাশে সরিয়ে রাখল। কিন্তু দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি এবং বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত একের পর এক অন্যান্য নানা দুরূহ সঙ্ঘাত পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদের মধ্যে নতুন করে আত্মিক জিজ্ঞাসা তুলে ধরল। বিশেষ করে বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতেই প্রথম এটি দেখা দিল। সমাজতত্ত্ববিদেরা মানবকল্যাণের ব্যাপারে ধরাবাঁধা রাস্তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। এমনকি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা পর্যন্ত উপলব্ধি করতে লাগলেন যে, তাঁদের সাধনালব্ধ বিজ্ঞান এ-বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারছে না। আইনস্টাইন বললেন যে, বিজ্ঞান প্লুটোনিয়ামকে বিভাজন করতে পারে কিন্তু মানুষের হৃদয় থেকে অপরাধপ্রবণতা ও অকল্যাণকর দোষগুলিকে দূর করতে পারে না। অবশ্য বিজ্ঞানের এটি কাজও নয়। প্রায় সব বৈজ্ঞানিকই আজ স্বীকার করছেন যে, বিজ্ঞান মানুষকে যথার্থ শান্তি এনে দিতে পারে না, বিজ্ঞান কেবল সুখের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে—বিজ্ঞান কিন্তু আশ্বাস দিতে পারছে না যে, এই পথে বা সেই উপায়ে গেলে মানুষ সুখী হবেই, মানুষ মানসিক সচ্ছলতায় আন্তরিকভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবেই। পদার্থবিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানের মতো 'পজিটিভ সায়েন্স' মানুষকে এই শান্তি দিতে পারে না এবং এটি তাদের কৃত্য নয়। এটি দিতে পারে অন্যতর কোন উপায়, এজন্য ফিরে যেতে হবে অন্য কোন তপশ্চর্যার জগতে। মানুষের স্বরূপজিজ্ঞাসার কোন অন্তর্মুখী বিজ্ঞানই সন্ধান দিতে পারে মানুষের এই মহৎ মুক্তির এবং ভারতীয় দর্শনে এটাই হচ্ছে ধর্মের যথার্থ সংজ্ঞা।

বৈদান্তিক মননালোকে ধর্ম ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যাকে বর্তমান যুগে অত্যন্ত বেশী গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে, অতীত যুগে যেমন এগুলিকে অত্যন্ত হেয় করা হয়েছিল। বিজ্ঞানকে আজ যথার্থ দৃষ্টিতে—মানবিক কল্যাণ ও সর্বাঙ্গীণ প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে—মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে; এবং আধুনিক চিন্তাজগতে স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম মূল্যবান অবদান হচ্ছে এই প্রয়াসই। ধর্মে প্রাচ্য-অবদান এবং বিজ্ঞানে পাশ্চাত্য-অবদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি 'My Master' বক্তৃতায় বলেছেন: 'যে মনের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, সে-ই কেবল সুখী হইতে পারে, অপরে নহে। আর এই যন্ত্রের শক্তিই বা কি? যে ব্যক্তি তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতে পারে, তাহাকে খুব মহৎ ও বুদ্ধিমান বলিব কেন? প্রকৃতি কি প্রতি মুহূর্তে ইহা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতেছে না? তবে প্রকৃতির পদতলে নত হইয়া তাহারই উপাসনা কর না কেন?'[৪]

৪। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৫৯-৬০

আধুনিক বিজ্ঞানে আত্মিক জিজ্ঞাসা

প্রাচীন যুগে মানুষের কাছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল রহস্যময়। বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষের কাছেও এ রহস্যময়ই রয়ে গেছে। তাই প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জেমস জীনসকে দেখি তাঁর বইয়ের নাম দিতে 'The Mysterious Universe'। বিজ্ঞানের শত-সহস্র চমকপ্রদ আবিষ্কারের পরও বিজ্ঞানীরা আজও প্রকৃতিকে নিবিড় রহস্যময় বলেই মনে করেন। অপরিসীম জ্ঞান নিয়েও বৈজ্ঞানিকেরা বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, তাঁরা কেবল প্রকৃতির বাইরের রূপটা নিয়েই ব্যস্ত থেকে গেছেন, বিশ্বরহস্যের মূল এখনও রয়ে গেছে দূরে। 'The New Background of Science' বইয়ে জেমস জীনস বলেছেন ঃ 'Physical science set out to study a world of matter and radiation, and finds that it cannot describe or picture the nature of either, even to itself. Photons, electrons and protons have become about as meaningless to the physicist as x, y, z are to a child on its first day of learning algebra. The most we hope for at the moment is to discover ways of manipulating x, y, z without knowing what they are, with the result that the advance of knowledge is at present reduced to what Einstein has described as extracting one incomprehensible from another incomprehensible.'[৫]

বিশ্বরহস্য বিজ্ঞানীদের যতটা না মুগ্ধ করেছে, মানবরহস্য করেছে তার চেয়েও বেশী। প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটনের ভাষায় ঃ 'All through the physical world runs that unknown content, which must surely be the stuff of our consciousness. Here is a hint of aspects deep within the world of physics, and yet unattainable by the methods of physics. And, moreover, we have found that where science has progressed the farthest, the mind has but regained from nature that which the mind has put into nature.'[৬]

চিন্তাশীল মানুষ, দ্রষ্টা মানুষ, প্রকৃত মানুষ নিজের পদচিহ্ন রেখে গেছে অজানা জগতের কূলে উপকূলে ; মহাবিশ্বের অনাত্মা-প্রদেশের তীরে তীরে। বিজ্ঞান আজ চেষ্টা করছে মানুষের এই আশ্চর্য অজানা রহস্যকে জানতে। পরমাণুর অভ্যন্তর, কিংবা সুদূর মহাকাশের চেয়েও গভীরতর রহস্যময় এই মানুষ। আজ এর রহস্যকে ভেদ করতে চাইছে বিজ্ঞান। অন্য সমস্ত রহস্যই এর কাছে ম্লান হয়ে যায়—এই রহস্যই সব রহস্যের চাবিকাঠি।

৫। The New Background of Science—Sir James Jeans, Cambridge University Press, London, 1933, p. 65

৬। Space, Time and Gravitation—A. S. Eddington, Cambridge University Press, London, 1959, pp. 200-01

'আমরাই সেই, যে প্রশ্ন করে'—মানুষ মূলত বিষয়ী (subject), তাকে কখনও বিষয়ভূত করা যায় না। সে দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, ভোক্তা; বেদান্তের ভাষায় 'দৃক্' বা 'সাক্ষী' বা 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। এখানে এডিংটন তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন যা পদার্থবিজ্ঞান-জগতের গভীরে অবস্থিত অথচ পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রে জ্ঞাতব্য বা দ্রষ্টব্য নয়। বিশ্বজগৎ ও মানবরহস্য সম্পর্কিত জ্ঞানলাভের জন্য যে দার্শনিক সম্ভাব্যতা প্রয়োজন তা বস্তুবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ পরিসরে ধরা পড়ছে না।

'কোয়ান্টাম থিওরি' ও 'ওয়েভ মেকানিক্স' তত্ত্বদ্বয়ে পণ্ডিত বলে খ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রিন্স লুই দ্য ব্রগলি কয়েক বছর আগে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন মাসিক পত্রিকা 'Mirror'-এ 'The Poetry of Science' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি তাতে পাস্‌কালের একটি বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন ঃ In space, the universe engulfs me and reduces me to a pin-point; through thought I understand the universe. ব্রগলি প্রবন্ধটির শেষে লিখেছেন ঃ In that sublime pun lies the beauty, the poetry of pure science, and its high intellectual worth.

আমি কি বস্তু? জাগতিকভাবে বস্তুবিচারে দেখতে গেলে এই বিশাল মহাবিশ্বে আমি পরমাণুসদৃশ একটি সামান্য কণামাত্র। কিন্তু চিন্তার সাহায্যে আমি এই মহাবিশ্বের ধারণা করতে পারি। প্রকৃতির অসংখ্য বিচিত্র সব ঘটনাবলী একজন বৈজ্ঞানিক তাঁর চিন্তায় সমন্বিত বুদ্ধিদীপ্ত সামান্য সূত্রের মাধ্যমে ধরতে পারেন। এটাই বিরাটতম রহস্য যে, একদিকে বিশাল মহাবিশ্বে মানুষ সামান্যতম একটি কণামাত্র, আবার অন্যদিকে এই বিশালতাকে সে সামান্য কয়েকটি সূত্রের সাহায্যে গ্রন্থিবদ্ধ করেছে। মানুষের চিন্তার শক্তি ও রহস্যভেদের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাই এই সূত্রগুলিকে আবিষ্কার করেছে।

মানবরহস্য

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, মানুষকে শুধু জাগতিক বা জড়সত্তায় গণ্ডিবদ্ধ করা যায় না। এটি তার 'অনাত্ম' দিক যা বিশাল মহাবিশ্বে সামান্য একটি কণা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে আবার এমন কিছু বিশালতা রয়েছে যাকে ছোট করে দেখা মোটেই সম্ভব নয়। মূলত সে আত্মা। এটিই তার মূল স্বরূপগত পরিচয়। বিজ্ঞানকে যদি এগিয়ে যেতে হয়, তবে মানুষের এই পরিচয়টিকেই তুলে ধরতে হবে। বাহ্যিক জগতের চেয়েও নজর দিতে হবে অন্তর্জগতের উপরে। এটি একটি বিরাট ক্ষেত্র—মানুষের বোধের, মানুষের চেতনার রাজ্য। এটিই তার 'আমি' বোধের উৎস। এখানে সে দ্রষ্টা (subject), দৃশ্য (object) নয়। বহির্জগতের চেয়ে বৃহত্তর, বহুগুণে রহস্যময় এবং আকর্ষক এই অন্তর্জগৎ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা ইতিমধ্যেই এই অন্তর্জগতের দিকে নজর দিতে শুরু করেছেন। আলেক্সি ক্যারেলের 'Man the Unknown' এ-বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বই।

যে মানুষ বিজ্ঞান-বহুমুখী কারিগরিবিদ্যা-সভ্যতা-সংস্কৃতির স্রষ্টা, সে মানুষই আজ

সভ্যতাকে ধ্বংস করতে উদ্যত। তার প্রতিটি কার্যকলাপই বিস্ময়কর। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগতে আইনস্টাইনের অবদান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিঙ্কন বার্নেট লিখেছেন ঃ 'For man is enchained by the very condition of his being, his finiteness and involvement in nature. The further he extends his horizons, the more vividly he recognizes the fact that, as the physicist Niels Bohr puts it, "we are both spectators and actors in the great drama of existence." Man is thus his own greatest mystery.'[৭]

ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

ভারতীয় চিন্তাধারায় এখানেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলনসূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে। বৈদান্তিক মননালোকে ধর্ম বাস্তব জগতের রহস্যসন্ধানে সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করে বিজ্ঞান যেখানে তার যাত্রাপথ আপাতত শেষ করেছে। এই 'অজানা মানুষকে' বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করাই ধর্মের কাজ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ঃ 'ঋষিগণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত ভূমিতে নির্ভীকভাবে আত্মানুসন্ধান করিয়াছেন। চেতনা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগতের সত্য লাভ করিতে হইলে মানুষকে ইন্দ্রিয়ের বাহিরে যাইতেই হইবে। আর এখনও এমন সব লোক আছেন, যাঁহারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাহিরে যাইতে সমর্থ। ইঁহাদিগকেই ঋষি বলে; কারণ ইঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন।'[৮]

সত্যানুসন্ধানে ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই যৌক্তিকতা ভারতীয় চিন্তাধারায় স্বীকৃত হয়েছে। এডিংটন যে ভাষায় বিজ্ঞান ও ধর্মের আত্মিক যোগসূত্র খুঁজতে চেয়েছেন তা ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অনুগামী। এডিংটন বলেছেন ঃ 'You will understand the true spirit neither of science nor of religion unless seeking is placed in the forefront.'[৯]

ভারতীয় ঋষিরা এই দুয়ের মধ্যে কোন ভিন্নতা দেখেননি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও ধর্মতাত্ত্বিকেরা এই জিনিসটি ধরতে পারেননি। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা বোধ হয়। এটি দূর করার জন্য আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাবিদেরা অবশ্য চেষ্টা করছেন। বিজ্ঞান বলতে ঠিক ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কথা ছেড়েই দিলাম, বিজ্ঞানের বহু ছাত্রেরই সঠিক ধারণা নেই। ধর্ম সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা যায়। সাধারণ লোকের কাছে বিজ্ঞানের অর্থ কেবলমাত্র রেডিও, টেলিভিসন কিংবা যান্ত্রিক কোন কারিগরিবিদ্যা যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে এনে দিয়েছে কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য। বিজ্ঞানের ছাত্রেরা এগুলিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ইত্যাদি

৭। The Universe and Dr. Einstein—Lincoln Barnett, Victor Gollancz Ltd., London, 1950, p. 103 ৮। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১৪৬

৯। Science and the Unseen World—A.S. Eddington, George Allen & Unwin Ltd., London, 1929, p. 54

কতকগুলি বিষয়ে ভাগ করে মাত্র, যা তারা স্কুল-কলেজে পড়ে এসেছে। কিন্তু বিজ্ঞান বলতে সঠিক কি বোঝায় তা জানতে গেলে আমাদের উচিত বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের দিকে তাকানো। তাঁদের কাছ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিজ্ঞান হচ্ছে সত্যের সন্ধান; প্রকৃতির মধ্যে যে রহস্য লুকানো রয়েছে, যা সূত্রাকারে প্রতিফলিত হয় ইন্দ্রিয়চেতনার মাধ্যমে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতায় সেই রহস্যের, সেই সত্যের অনুসন্ধান। বিজ্ঞান হল অভিজ্ঞতার আন্তরিক, নির্ভীক ও বিবিক্ত বিশ্লেষণ যার সাহায্যে বিক্ষিপ্ত সংবেদনগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নিয়মিত সূত্রে বাঁধা যায় এবং শেষ পর্যন্ত স্বীয় নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। কার্ল পিয়ারসনের ভাষায়ঃ '*The classification of facts, the recognition of their sequence and relative significance is the function of science,* and the habit of forming a judgement upon these facts unbiased by personal feeling is characteristic of what may be termed the scientific frame of mind.'[১০] এইভাবে বিজ্ঞানকে বুঝলে এটি কেবল কতকগুলি ঘটনাসমষ্টি হয়ে দাঁড়ায় না।

পর্যবেক্ষণ ও যথাযথ বিশ্লেষণ—এই দুটিকে চিন্তায় ও বাক্যে উপস্থাপিত করাই বিজ্ঞানপদ্ধতির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে-কোন বিষয়ের নিদিধ্যাসনায় যদি এই দুটি উপস্থিত থাকে তবেই তা বিজ্ঞান বলে পরিগণিত হবে, তা সে বিষয়টি যাই হোক না কেন। তাহলে বিজ্ঞান বলতে কতকগুলি বিশেষ তথ্যসমষ্টিই বোঝায় না। যদিও পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা কিংবা সমাজবিদ্যা কতকগুলি বিশেষ তথ্যাবলীর সঙ্গে জড়িত। এই বিভাগগুলির পরিসর সীমিত হলেও সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের পরিসর অসীম। আরও দেখা যাচ্ছে, এই বিভিন্ন বিভাগগুলি যত দিন এগুচ্ছে—ক্রমশই নিজেদের পরিসর ছাড়িয়ে অন্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। বিভিন্ন বিষয়গুলি একত্রে বিজ্ঞানের সামগ্রিক অনুসন্ধান-চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছে। এই ব্যাপ্ত পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক ধর্মের যে তাৎপর্য ফুটে ওঠে এবং মানুষের অন্তর্জগতের ঘটনাপ্রবাহের যে বিজ্ঞান, যা প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় তুলে ধরা হয়েছিল এবং আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়ে দিলেন—তার তাৎপর্য খুবই ব্যাপক এবং বহুদূর প্রসারিত।

সর্বজনীন ধর্মবিজ্ঞান সম্পর্কে ভারতীয় উপলব্ধি

উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং তথ্যবিচারে পাশ্চাত্যে ধর্মকে মানবিক যুক্তি ও বিশ্লেষণী চিন্তার বিরোধী ও পরিপন্থী বলে মনে করা হত। ধর্মকে 'finished' এবং 'readymade' একটি তত্ত্ব বলে ধরা, একটি dogma বলে মনে করা, কতকগুলি ভাববাদী চিন্তা বলে ধরা, এই ছিল ধর্ম সম্বন্ধে তাদের চিন্তাধারা—এ যেন এমন একটা তত্ত্ব যা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে। এজন্যই পাশ্চাত্যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যত

১০। The Grammar of Science—Karl Pearson, J.M. Dent & Sons Ltd., London, 1951, p. 11

বাড়ল, ততই ধর্মের সঙ্গে তার সঙ্ঘর্ষ বাধল। কারণ বিজ্ঞানের স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে এ খাপ খাওয়াতে পারছিল না। ভারতবর্ষে কিন্তু ধর্মকে সব সময়েই একটি প্রগতি বলে ধরা হয়েছে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো ধর্মেও পর্যবেক্ষণ, মনন, অনুসন্ধানকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের উপনিষদেই হোক আর আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীতেই হোক, এ সত্যের সাক্ষ্য মিলবে অনায়াসে।

পাশ্চাত্যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের নিরন্তর পারস্পরিক দ্বন্দ্বে উদার দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দেখে স্বামীজী মন্তব্য করেছিলেনঃ 'ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্ ও বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ কি, তাহা আমরা জানি; আর ইহাও জানি যে, উহা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববাদিগণের কিরূপ ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে; যেমন যেমন এক-একটি নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে, অমনি যেন তাঁহাদের গৃহে একটি করিয়া বোমা পড়িতেছে, আর সেইজন্যই তাঁহারা সকল যুগেই এই-সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।'[১১] ধর্ম যদি বিজ্ঞানের যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে তবে তা নিজেকেই দুর্বল করবে। এ সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেনঃ '...(ধর্মের) ভিত্তিগুলি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আর আধুনিক মানুষ প্রকাশ্যে যাহাই বলুক না কেন, তাহার অন্তরের গোপন প্রদেশে এ-বোধ জাগ্রত যে, সে আর "বিশ্বাস" করিতে পারে না। আধুনিক যুগের মানুষ জানে যে, পুরোহিত-সম্প্রদায় তাহাকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছে বলিয়াই, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে বলিয়াই, কিংবা তাহার স্বজনেরা চাহিতেছে বলিয়াই কিছু বিশ্বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য এমন কিছু লোক আছে, যাহাদিগকে তথাকথিত জনপ্রিয় বিশ্বাসকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একথাও আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করে না। তাহাদের বিশ্বাসের ভাবটিকে "চিন্তাহীন অনবধানতা" আখ্যা দেওয়া চলে।'[১২]

ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তির প্রয়োগ দরকার। স্বামীজীর ভাষায়ঃ 'অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির প্রত্যেকটিই যুক্তির যেসকল আবিষ্কারের সহায়তায় নিজেদের সমর্থন করিতেছে, ধর্মকেও কি আত্ম-সমর্থনের জন্য সেগুলির সাহায্য লইতে হইবে? বহির্জগতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তত্ত্বানুসন্ধানের যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বিত হয়, ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি সেই একই পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে? আমার মতে তাহাই হওয়া উচিত। ...পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের সিদ্ধান্তগুলি যতখানি বিজ্ঞানসম্মত, ধর্ম যে অন্ততঃ ততখানি বিজ্ঞানসম্মত হইবে শুধু তা-ই নয়, বরং আরও বেশী জোরালো হইবে; কারণ জড়বিজ্ঞানের সত্যগুলির পক্ষে সাক্ষ্য দিবার মতো আভ্যন্তরীণ আদেশ বা নির্দেশ কিছু নাই, কিন্তু ধর্মের তাহা আছে।'[১৩]

উপনিষদ্ পড়লে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মকে পর্যবেক্ষণশীল ও বিবিক্ত বিশ্লেষণী দৃষ্টিতেই গ্রহণ করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল সত্যকে অনুসন্ধান করা, সত্যে

১১। বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ১৪
১২। তদেব, পৃঃ ১৩২ ১৩। তদেব

প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আদিম অন্ধ কুসংস্কার ও অলীক কল্পনা আঁকড়ে ধরে থাকা ধর্ম নয়।

বিভিন্ন বক্তৃতা ও আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় ঐতিহ্যের এই দিকটিই তুলে ধরেছেন। বৈজ্ঞানিক পন্থায় ধর্মকে বিশ্লেষণ করায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী। এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেনঃ 'জ্ঞানের একমাত্র উৎস অভিজ্ঞতা। জগতে ধর্মই একমাত্র বিজ্ঞান যাহাতে নিশ্চয়তা নাই, কেন-না অভিজ্ঞতামূলক সত্য হিসাবে ইহা শিখানো হয় না। এইরূপ উচিত নয়। ...ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ধর্মশিক্ষা দেন, এমন কিছু লোক সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগকে অতীন্দ্রিয়বাদী বা মরমী (mystic) বলা হইয়া থাকে, এবং প্রতি ধর্মেই এই মরমীগণ একই ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন এবং একই সত্য প্রচার করেন। ইহাই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান। ...রসায়নশাস্ত্র ও অপরাপর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ যেমন জড়জগতের সত্য অন্বেষণ করে, ধর্মের লক্ষ্য সেরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের সত্য। রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে প্রকৃতি-রাজ্যের গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিতে হয়। অপরপক্ষে ধর্ম-শিক্ষার গ্রন্থ হইল স্বীয় মন ও হৃদয়। ঋষিগণ প্রায়শঃ জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ, কেন-না তাঁহারা যে-গ্রন্থ পাঠ করেন অর্থাৎ অন্তর-গ্রন্থ, তাহাতে উহার খবর নাই। বৈজ্ঞানিকও সেরূপ ধর্মবিজ্ঞানে প্রায়শঃ অনভিজ্ঞ, কেন-না তিনিও ধর্মবিজ্ঞান-সম্পর্কিত জ্ঞানদানে সম্পূর্ণ অসমর্থ কেবল বাহিরের পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।'[১৪]

তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের প্রজ্ঞাবান মনস্বী ঋষিরা দুটি জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। সমগ্র জগতের দুটি দিক এই দুটি। এর মধ্যে কেবলমাত্র একটির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলে সে জ্ঞান হবে সীমিত, খণ্ড। আবার একটির দৃষ্টিতে অন্যটিকে বিচার করলেও তা ভুল হবে। কারণ এই জ্ঞান সামান্য আলোকপাত করে। স্বামীজীর ভাষায়ঃ 'দুইটি শব্দ রহিয়াছে—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড ; অন্তঃ ও বহিঃ। আমরা অনুভূতি দ্বারা এই উভয় হইতেই সত্য লাভ করিয়া থাকি—আভ্যন্তর অনুভূতি ও বাহ্য অনুভূতি। আভ্যন্তর অনুভূতি দ্বারা সংগৃহীত সত্যসমূহ—মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম নামে পরিচিত ; আর বাহ্য অনুভূতি হইতে জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এখন কথা এই, যাহা পূর্ণ সত্য, তাহার সহিত এই উভয় জগতের অনুভূতিরই সামঞ্জস্য থাকিবে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সত্যতাবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবে, সেরূপ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। বহির্জগতের সত্যের অবিকল প্রতিকৃতি অন্তর্জগতে থাকা চাই, আবার অন্তর্জগতের সত্যের প্রমাণও বহির্জগতে পাওয়া চাই।'[১৫]

প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা তাই বলেছিলেনঃ মানুষের নিজস্ব একটি জগৎ যেমন আছে, তেমনি আছে এই বিশ্বজগৎ। দুটিকেই বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখা দরকার। মানুষের সত্তা সম্বন্ধে জানতে হলে আরও গভীরে যাওয়া দরকার, তার মনে ও মানস লোকে, তার অস্তির অন্তরালে, তার মানসিক ভাবমণ্ডলে, তার অস্মিতায়, আত্মচৈতন্যের মধ্যে না গেলে মানুষের স্বরূপ বোঝা যাবে না। এটি একটি বিরাট বিষয় এবং এ নিয়ে

১৪। তদেব, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৪১ ১৫। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩

প্রভৃত পর্যালোচনা অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণ হওয়া দরকার। এ পথে সামান্য অগ্রগতিও বহির্জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করে যথার্থ সত্যসন্ধানে মানুষের জয়যাত্রা ও তার জ্ঞানে অগ্রগতি ঘটাবে। এডিংটন যথার্থই বলেছেন ঃ 'We have discovered that *it is actually an aid in the search for knowledge to understand the nature of the knowledge which we seek.*'[১৬]

সাধারণ ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেসব পরীক্ষানিরীক্ষার পদ্ধতির পথ ধরে মানুষ এগোয়, ধর্মের ক্ষেত্রেও তা-ই ঃ ঘটনাসংগ্রহ, তার বিশ্লেষণ, এ-সম্বন্ধে গভীর বিবিক্ত পর্যবেক্ষণ, যাতে করে সম্ভব হয় কতকগুলি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার, এবং সেসব সূত্রের সাহায্যে শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং শেষ পর্যন্ত মানবজীবনের দুর্দশার অবসান করে কল্যাণকর পথে তাকে নিয়োগ এবং পরিণামে মানবজীবনের জন্য প্রতিশ্রুত প্রাচুর্যের ও ঐশ্বর্যের সমারোহ। এইরকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধর্ম-গবেষণা করে মানুষের স্বরূপ সন্ধান করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় মুনিঋষিরা। এর ফলে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে যে-সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন পরবর্তী মুনিঋষিরা তার উপরে আবার গবেষণা করে সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলেন। এভাবে ধর্মক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির ব্যাপকতা দেখা গেল। এবং তারই ফলে ধর্মের ক্ষেত্রেও একটি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অমূল্য উত্তরাধিকার তাঁরা রেখে গেলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। ভিত্তি এভাবে দৃঢ় হয়েছিল বলেই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা আজও তার শক্তি বজায় রাখতে পেরেছে। ভারতীয় ধর্ম যে তাই শুধু বিজ্ঞানের প্রতি আতিথেয়তার হাতই বাড়িয়ে দেয় তা-ই নয়, আধুনিক পাশ্চাত্যের বিস্ময়কর উন্নতিকেও স্বাগত জানায়। রোমাঁ রোলাঁর ভাষায় ঃ 'সত্যকার বৈদান্তিক মনোভাব কোনরূপ চিন্তিতপূর্ব ধারণা লইয়া অগ্রসর হয় না। উহাতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। বিভিন্ন তথ্যের পর্যবেক্ষণ ব্যাপারে এবং বিভিন্ন রূপ প্রতিপাদ্যের মধ্যে সঙ্গতি বিধানের প্রয়াসে বেদান্ত যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছে, অন্য কোনও ধর্মে তাহার তুলনা মিলে না। পুরোহিততন্ত্রের বাধা না থাকায়, প্রত্যেক মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই দৃশ্যমান বিশ্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অন্বেষণে ইচ্ছামতো অগ্রসর হইয়াছেন।'[১৭]

মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে ঔপনিষদিক ঋষিরা একটি মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। মানুষ স্বরূপত দৈবী প্রকৃতির, সসীম মানুষের অন্তরালে রয়েছে সেই আত্মা, চিরমুক্ত নিত্যশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক আত্মা, দেহ-মন-অহঙ্কার হচ্ছে মানুষের আপাত রূপ, মানুষ মূলত কিন্তু অবিনশ্বর ও দৈবী প্রকৃতির। ঋষিরা আরও বুঝতে পারলেন যে সেই একই দৈবী প্রকৃতি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও মূলে রয়েছে। একে তাঁরা নাম দিলেন 'ব্রহ্ম' ; যাকে তাঁরা অভিহিত করলেন 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্' বলে। আমরা দেখি জিজ্ঞাসু শিষ্য তাঁর মহান গুরুকে প্রশ্ন করছেন ঃ 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি'[১৮]—হে গুরু সত্য কি? কাকে জানলে বিশ্বের সব জানা যায়?

১৬। The Philosophy of Physical Science—A.S. Eddington, Cambridge University Press, London, 1939, p. 5 ১৭। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, পৃঃ ১৭০

১৮। মুণ্ডকোপনিষদ্, ১।১।৩

এমন কি কিছু অদ্বয় 'অস্তি' আছে যার জ্ঞান লাভ করলে এই অন্তঃপ্রকৃতি আর বহিঃপ্রকৃতির সকল রহস্য জানা যায়? এই বহুত্বের আড়ালে কোন একত্ব রয়েছে কি? কোন কিছু 'এক'-এর অস্তিত্ব রয়েছে কি এইসব বিচিত্র বহু কিছুর মূলে? গুরু এই প্রশ্নের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর দিলেন। তিনি বললেনঃ 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ।'[১৯] —দুই ধরনের জ্ঞান রয়েছেঃ একটি পরাবিদ্যা—শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান; অন্যটি অপরাবিদ্যা—জাগতিক জ্ঞান। ব্রহ্মবিদেরা বলেন যে, এই দুই রকম জ্ঞানই মানুষ লাভ করতে পারে।

মানুষকে এই দুই রকম জ্ঞানই লাভ করতে হবে। জাগতিক জ্ঞান কি? উপনিষদের মতেঃ বেদ, স্বরবিজ্ঞান, যাগযজ্ঞপ্রকরণ, শব্দশাস্ত্র, ছন্দোবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি। আসলে সমস্ত শাস্ত্র, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান সবকিছুই এর অন্তর্ভূত।

এখানে আমরা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখতে পাই যা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, বিষয়গত এবং উদার। সত্য, একমাত্র সত্যই এর লক্ষ্য। কারও মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা নয়। কোন সুবিধাবাদী মতবাদের অক্ষম আত্মপ্রচার নয়। গুরুর মতে, এমনকি বেদ ও শাস্ত্রও নিম্নতর জ্ঞানের অন্তর্ভূত। কেউ যদি নিরপেক্ষ না হন, সাহসী না হন, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অধিকারী না হন, তবে তিনি কি করে বলবেন যে, তাঁর শাস্ত্রও নিম্নতর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত? ঔপনিষদিক ঋষিরা সত্যকে গোপন করতে চাইতেন না, বিশেষ কোন মতবাদকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হতেন না, কোন সংস্কারকে আড়াল করতে চাইতেন না, তাঁরা জানতে চাইতেন সত্যকে এবং এই সত্যকে জানার জন্য তাঁরা কোনও ত্যাগ-স্বীকারেই কুণ্ঠিত হতেন না। বেদান্ত ছাড়া আর কোন্ ধর্মে এই সাহসিকতা, এই দুঃসাহসিক বিবিক্তি দেখা যায়? অন্য কোন ধর্মীয় সাধককে যদি প্রশ্ন করা হয়, নিম্নতর সত্য কি?—তাঁরা বলবেন, আমার শাস্ত্র বাদে অন্য সমস্ত শাস্ত্রই নিম্নতর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উপনিষদের ঋষিরা ছিলেন সাহসী ও নিরপেক্ষ। তাই তাঁরা নিজেদের পরম প্রিয় পবিত্র শাস্ত্র সম্বন্ধেও এই কথা বলতে সাহসী হয়েছিলেন। তাঁদের মতে, সকল শাস্ত্র, সকল ভৌতবিজ্ঞান, সকল শিল্প নিম্নতর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত—অপরাবিদ্যা।

তাহলে পরাবিদ্যা বা শ্রেষ্ঠবিদ্যা কি? গুরু বলেছেনঃ 'অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'[২০] —সেই বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ যার দ্বারা সেই শাশ্বত অদ্বয় আত্মাকে জানা যায়। এবং তার অর্থাৎ সেই পরাবিদ্যার পরিধিও বিশাল এবং পরিব্যাপ্ত।

বিজ্ঞান তথা সমস্ত বিষয়ই নিত্য-পরিবর্তমান মৃত্যু-পরিণামী অনিত্য বস্তুসমূহকে নিয়ে মাথা ঘামায়। এডিংটন তাই বলেছেন যে, বিজ্ঞান আমাদের কেবলমাত্র knowledge of structural form দেয়, knowledge of content দিতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি বলেছেনঃ শাস্ত্র কেবলমাত্র ঈশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য জানায় কিন্তু ঈশ্বরকে দিতে পারে না। এডিংটনের ভাষায়ঃ এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে রয়ে গেছে অজানা সেই মূলতত্ত্ব। এই মূলতত্ত্বটি কি? কিভাবেই বা আমরা

১৯। তদেব, ১।১।৪ ২০। তদেব, ১।১।৫

একে জানতে পারি? বিজ্ঞান যদি তার সন্ধান না দিতে পারে তবে অন্য কোন উপায়ে অন্য কোন পথে আমাদের সেই অনুসন্ধান চালাতে হবে। শাস্ত্র যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্যই জানায় তবে এমন কোন পথ নিশ্চয়ই আছে যার দ্বারা আমরা সেই মূলতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারি। উপনিষদে সেই পথের কথাই বলা হয়েছে। তাই সাহিত্য হিসাবেও উপনিষদাবলী বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অমর। এবং সেই আত্ম-অনুসন্ধানকার্যের রূপ ও সীমা সম্বন্ধে ঔপনিষদিক বাণী সত্যই বিস্ময়কর। কোন সংস্কারকেই, তা সে যতই মনোরম হোক না কেন, যতই প্রিয় হোক, উপনিষদ্ আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় না। কোন মতবাদকেই সে চূড়ান্ত বলে মনে করে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চায় না। যাত্রাপথে কোনরকম ক্লান্তি বা আলস্যকে সে প্রশ্রয় দিতে চায় না। সত্য, একমাত্র সত্যই তার লক্ষ্য। সত্যের জয় ঘোষণা করছে সে মুক্তকণ্ঠে :

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।[২১]

—একমাত্র সত্যই জয়লাভ করে, মিথ্যা নয়; চরম অনুভূতির পথে যেতে হলে সত্যকে ধরে রাখা চাই।

চরম অনুভূতির পথে ছড়িয়ে আছে নানা পরিত্যক্ত মতবাদের আবর্জনা, মনোরম নানা অন্ধ বিশ্বাস এবং অনেক আপাতপ্রকল্প। এইগুলি নিয়ে মজে থাকলে চলবে না। এই পথে যেতে হলে চাই বিচারমূলক বৈরাগ্য, সদাসতর্ক বিশ্লেষণ আর আন্তরিক একান্ত নিরপেক্ষতা এবং সর্বোপরি—সত্যানুসন্ধানের জন্য একাগ্র, তন্ময় একটি নিষ্ঠা ও আর্তি। কোন একজন পণ্ডিত নিজের সিদ্ধান্ত উপস্থিত করলেন, অন্যজনে আবার তার মধ্যে যুক্তির ন্যূনতা দেখতে পেলেন। আবার এগিয়ে গেলেন তাঁরা, গেলেন গভীরে আরও গভীরে। এইভাবে নানা প্রতিভাদীপ্ত মনন ও মানসিকতার এবং চিন্তার শোভন সঙ্ঘাতের ও সমন্বয়ের পথ ধরে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে। কোন জাতীয় সংস্কার বা পুরোহিতের অনুশাসনে এই অনুসন্ধানবৃত্তি কখনও থেমে থাকেনি। এইভাবে মানবরহস্যের গভীরে গিয়ে সেই শাশ্বত আত্মার সন্ধান মিলেছে, বহুত্বের পিছনে সেই চিরন্তন একত্বকে খুঁজে পাওয়া গেছে। সমস্ত পথটাই ছিল আবিষ্কারের আনন্দময় অভিযাত্রা। আবিষ্কারের পর পিছনে ফিরে তাঁরা দেখলেন, কোন মতবাদই নিরর্থক নয়; মানুষ মিথ্যা থেকে সত্যে নয়, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও মানবরহস্য

বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানবরহস্যের গভীরে বিজ্ঞানকে প্রবেশ করতেই হবে। বিখ্যাত প্রত্নজীববিজ্ঞানী পিয়ের তেইয়ার দ্য শারদ্যাঁ বলেছেন : 'The time has come to realize that an interpretation of the universe—even a positivist one—remains unsatisfying unless it covers the interior as

২১। তদেব, ৩।১।৬

well as the exterior of things ; mind as well as matter. The true physics is that which will, one day, achieve the inclusion of man in his wholeness in a coherent picture of the world.'[২২]

উপনিষদের ঋষিরা সুদূর অতীত যুগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষের বাইরের রূপটার অন্তরালে রয়েছে অসীম শাশ্বত আত্মা। মানুষ যতক্ষণ নিজেকে সসীম বলে ভাবে ততক্ষণ এই সসীম জগতেই তার স্থিতি। সে তখন বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এককণা ধুলোর মতোই, পাস্কাল যেমন বলেছেনঃ 'The universe engulfs me and reduces me to a pin-point.' কিন্তু সে যখন নিজের অসীমত্ব উপলব্ধি করে, নিজেকে শাশ্বত আত্মা বলে বুঝতে পারে, তখনই সে এই বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পারে। এই যে মানুষের অন্তর-পরিচয় এবং বিশ্বের রহস্য, আধুনিক বিজ্ঞানীদের মনে তা ক্রমশই আলোড়ন তুলছে। শারদাঁ বলেছেনঃ 'Up to now has science ever troubled to look at the world other than from without ?' তিনি আরও বলেছেনঃ 'It is impossible to deny that, deep within ourselves, an "interior" appears at the heart of beings, as it were seen through a rent. This is enough to ensure that, in one degree or another, this "interior" should obtrude itself as existing everywhere in nature from all time. Since the stuff of the universe has an inner aspect at one point of itself, there is necessarily a *double aspect to its structure,* that is to say in every region of space and time—in the same way, for instance, as it is granular : *coextensive with their Without, there is a Within to things.*'[২৩]

অনুরূপ কথা বলেছেন বিখ্যাত শারীর তত্ত্ব ও স্নায়ুতত্ত্ববিদ্ স্যার চার্লস শেরিংটনঃ 'Today Nature looms larger than ever and includes more fully than ever ourselves. It is, if you will, a machine, but it is a partly mentalized machine, and in virtue of including ourselves it is a machine with human qualities of mind. It is a running stream of energy—mental and physical—and unlike man-made machines it is actuated by emotions, fears and hopes, dislikes and love.'[২৪]

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Evolution after Darwin' শীর্ষক যে আলোচনা-সভা হয়েছিল তার শেষ দিনে বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ স্যার জুলিয়ান হাক্সলী তাঁর বক্তৃতায় (The Evolutionary Vision) ক্রমবিকাশের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেনঃ 'Man's evolution is not biological but psychosocial ; it

---

২২। The Phenomenon of Man—Teilhard de Chardin, Harper & Brothers Publishers, New York, 1959, pp. 35-6   ২৩। ibid., p. 56

২৪। Man on his Nature—Sir Charles Sherrington, 1953, p. 30

operates by the mechanism of cultural tradition, which involves the cumulative self-reproduction and self-variation of mental activities and their products. Accordingly, major steps in the human phase of evolution are achieved by break-throughs to new dominant patterns of mental organization of knowledge, ideas, and beliefs—ideological instead of physiological or biological organization....'[২৫]

গুণগত উৎকর্ষের দিকেই বিবর্তনের প্রবণতা প্রসঙ্গে গুণ (quality) সম্বন্ধে হাক্সলী আরও বলেছিলেনঃ 'It (evolutionary vision) shows us mind *enthroned* above matter, quantity subordinate to quality.'[২৬]

বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক

স্বামীজী আমাদের দেখিয়েছেন ভাবের দিক থেকে উদ্দেশ্য চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণী দৃষ্টির ব্যাপারে বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান পরস্পর নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ। দুটিই জ্ঞানলাভের পথ এবং অধ্যাত্মমার্গ। এমনকি বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাপারেও এই দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদান্ত ও বিজ্ঞানের মূল চরিত্র দেখাতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন যে, আত্মপ্রকাশ-উন্মুখ আদিকারণ (cause) নিজেকে ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে প্রকাশিত করছে। এই পূর্ব সিদ্ধান্ত উভয়েই স্বীকার করেছে। বেদান্ত একেই ব্রহ্ম বলে অভিহিত করে যা সমগ্র বিশ্বের মূলে রয়েছে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ যেকথা বলেছে তা সকল বিজ্ঞানীকেই আকৃষ্ট করবেঃ

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি।[২৭]

—যাঁর থেকে সবকিছুরই সৃষ্টি, যাঁর মধ্যে সবকিছুর অস্তিত্ব, প্রলয়ে যাঁর মধ্যে সবকিছু বিলীন হয়, তুমি তাঁকে জান; তিনিই ব্রহ্ম।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে এই মূলতত্ত্ব একটি বাস্তব সত্তা, অন্তরালে লুকানো একটি পটভূমি, যেকথা ফ্রেড হয়েল বলেছেন। বেদান্ত ও বিজ্ঞান উভয়েই বিশ্বসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টির ব্যাপারে ক্রমবিকাশবাদকে স্বীকার করে।

প্রাচীন বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে এই আত্মিক সংযোগ দেখিয়ে স্বামীজী বলেছেনঃ 'আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ "সৃষ্টি" না বলিয়া "বিকাশ" শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। হিন্দু যুগ যুগ ধরিয়া যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নূতনতর আলোকে আরও জোরালো ভাষায় প্রচারিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে।'[২৮]

২৫। Evolution after Darwin, Vol. III, pp. 251-52
২৬। ibid., Vol. I, p. 21 ২৭। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ৩।১
২৮। বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২২-৩

যদিও বিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক আদর্শের কোন সামান্য অস্তিত্ব এখনও সরাসরি প্রাধান্য লাভ করেনি, তবুও বিংশ শতাব্দীর বহু বিজ্ঞানীই বিজ্ঞানের এই বস্তুসর্বস্ব অনমনীয় মনোভাবের বদলে বিজ্ঞানের জগতে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। শারদ্যঁ ও হাক্সলী তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এমনকি, গত শতাব্দীতেও ডারউইনের সহকর্মী টমাস হাক্সলী বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়বাদকে মেলাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জড়বাদকে 'অনুপ্রবেশকারী'[২৯] বলে উল্লেখ করেছিলেন। বর্তমান শতাব্দীতেও অনুরূপ প্রতিবাদ করেছেন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীরা। স্যার জেমস জীনস স্পষ্টতই দেখিয়েছেন যে, বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যে উন্মোচিত মহাবিশ্বের মৌল চিত্রে 'জড়' ক্রমশই নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে এবং 'মন'ই একমাত্র প্রধান হয়ে উঠছে।[৩০] জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর এ. মিলিক্যান জড়বাদকে 'নির্বোধের দর্শন'[৩১] বলে অভিহিত করেছেন।

আজকের বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞান জড়বাদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে, এবং জীববিজ্ঞান তার নিজস্ব পথ ধরে এ-বিষয়ে এগিয়ে গেছে আরও কয়েক ধাপ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে মন ও চেতনার অভিমুখে, এবং এর ফলে নতুন পরিস্থিতির যে উদ্ভব হয়েছে তাকে জেমস জীনস বলেছেন, 'A New Background of Science'। জুলিয়ান হাক্সলী ও শারদ্যঁ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আত্মিক সত্তার খোঁজ পেয়েছেন ক্রমবিকাশের পথে। শারদ্যঁর মতে জীববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশবাদে প্রকৃতির একটি আভ্যন্তরীণ দিক উন্মোচিত হচ্ছে যা পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে উন্মোচিত এতদিনের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব প্রকৃতির বাহ্যরূপ থেকে ভিন্ন। প্রকৃতির এই আভ্যন্তরীণ দিককে বেদান্ত বলেছে 'প্রত্যক্ রূপ' আর বাহ্যরূপকে 'পরাক্ রূপ'।

বিজ্ঞান যখন প্রকৃতির এই আভ্যন্তরীণ দিকটি সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে স্বীকৃতি জানাবে তখনই সে খুঁজে পাবে আত্মিক সম্পর্কের প্রকৃত পরিচয় এবং এগিয়ে যাবে বেদান্তের ব্রহ্মের দিকে। এই আন্তর ও বাহ্য রূপদ্বয়ের সমন্বয়ে যে জ্ঞান, বহুযুগ আগে ভারতবর্ষ তার বেদান্তে সম্যক জ্ঞান রূপে লাভ করেছিল। এই সম্যক জ্ঞানেরই অন্য নাম পূর্ণ প্রজ্ঞা বা পূর্ণতার দর্শন। প্রকৃত সত্যে আন্তর বা বাহ্য রূপের কোন ভেদ নেই। এই রূপদ্বয় মানুষেরই কল্পনা এবং নিদিধ্যাসনা, পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য।

ভৌতবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন একই সত্যে পৌঁছানোর বিভিন্ন প্রয়াসমাত্র এবং সব শাখাই পরিণতিতে বিশ্বের সার্বিক মহাবিজ্ঞানে পৌঁছায়, বিশ্বপ্রকৃতির বাহ্যরূপের সর্বাঙ্গীণ চরিত্রে পর্যবসিত হয়, তেমনি আন্তর ও বাহ্য বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যায় পৌঁছায়, যে ব্রহ্মজ্ঞানে সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। বস্তু এবং বস্তুর অতীত এই দুই

২৯। Methods and Results—T. H. Huxley, Macmillan and Co. Limited, London, 1904, p. 161 ৩০। The New Background of Science, pp. 282-90

৩১। An Autobiography—R.S. Millikan, See : Last Chapter

নিয়ে সামগ্রিক অনাদি 'অস্তি', বেদান্তে ব্রহ্মবিদ্যা বলতে সেই সমগ্রতাকেই বোঝানো হয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদে (১।১।১) ব্রহ্মবিদ্যাকে সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা বলা হয়েছে, সর্ববিদ্যা—সমস্ত জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম'[৩২]—'ক্ষেত্র' (জড়প্রকৃতির বাহ্যরূপ) এবং 'ক্ষেত্রজ্ঞ' (জীব, প্রকৃতির অন্তররূপ) এই দুয়ের জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান।

বেদান্তচিন্তার এই সর্বগ্রাহিতাকে স্বামীজী যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সে-সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন ঃ 'মুক্ত ধর্ম বলিতে বিবেকানন্দ যাহা বুঝিতেন, তাহাকে বিজ্ঞান গ্রহণ করুক বা না করুক, যিনি নিজেকে অধিকতর শক্তিশালী মনে করিতেন সেই বিবেকানন্দের প্রশান্ত দম্ভকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই; কারণ, তাঁহার ধর্ম বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম এমন বিশাল যে, সত্যের সকল বিশ্বস্ত সন্ধানীকেই সে তাহার সহিত একাসনে স্থান দিতে পারে।'[৩৩]

ব্রহ্ম ও জগৎ (The Absolute and Manifestation) শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে, তাহা কি আপনারা বুঝিতেছেন না ? হিন্দুজাতি মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে দর্শনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইওরোপীয় জাতি বাহ্য প্রকৃতির আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এখন উভয়ে এক স্থানে পৌঁছিতেছেন। মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা সেই এক অনন্ত সার্বভৌম সত্তায় পৌঁছিতেছি—যিনি সকল বস্তুর অন্তরাত্মা, যিনি সকলের সার ও সকল বস্তুর সত্যস্বরূপ...। জড়বিজ্ঞানের দ্বারাও আমরা সেই একই তত্ত্বে পৌঁছিতেছি।'[৩৪]

বিজ্ঞান ও বেদান্তের পরিপূরক চরিত্রের কথা ভাগবতের একটি জ্ঞানগর্ভ ঘোষণায় রয়েছে ঃ

> প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
> সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ ৷৷
>
> আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
> যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে ৷৷
>
> পুরুষত্বেচ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ।
> আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্ ৷৷[৩৫]

—এই জগতে যেসব মানুষ নিসর্গের সত্যানুসন্ধানে পারঙ্গম, সাধারণত তাঁরা নিজেরাই নিজেদের সমস্ত অশুভের উৎস থেকে মুক্ত করে বৃহতের দিকে উন্নীত করেন। বিশেষ করে মানুষের কাছে তার নিজের মৌলসত্তাই তার গুরু, কারণ সে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা এবং তা থেকে জ্ঞাত অনুমান থেকেই শ্রেয় লাভ করে। জ্ঞানিগণ, যাঁরা অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে

৩২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৩।৩   ৩৩। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, পৃঃ ২৫০
৩৪। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১০৫
৩৫। শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।৭।১৫-৭

সম্যক আয়ত্ত করেছেন এবং নিজেদের জীবনে অধ্যাত্মকলাকে চর্যায় বিনিয়োগ করেছেন, তাঁরা এই মানবজীবনেই আমাকে লাভ করেন—সর্বশক্তিসমন্বিত এবং পরিপূর্ণ-প্রকাশিত এই আমাকে প্রাপ্ত হন।

ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বৈদান্তিক মত

সমগ্র বিবর্তনের ধারাকে বেদান্ত অবয়ব অঙ্গসংস্থান এবং বহিরঙ্গ রূপের দিক থেকেও প্রগতিশীল ক্রমবিকাশ বলে মনে করে। বস্তুত ক্রমবিকাশের সমগ্র যাত্রাপথই, বেদান্তের দৃষ্টিতে শাশ্বত অসীম আত্মার পূর্ণ থেকে পূর্ণতর রূপে প্রকাশ। এটি জড়ের বিকাশ এবং আত্মার প্রকাশ। বিংশ শতাব্দীর জীববিজ্ঞান স্বীকার করেছে যে, আদি প্রাণী ছিল চৈতন্যবান, স্বীয় আত্মিক সত্তায় সত্তাবান। এই আত্মিক সত্তা ক্রমশ বেড়ে চলল ক্রমবিবর্তনের পথে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর রূপে, বিভিন্ন বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে। স্নায়ুতন্ত্রের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে এই চেতনা ব্যাপ্তিতে ও গভীরতায় আরও পরিস্ফুট হল এবং পরিণামে পরিবেশ ও প্রকৃতির উপরে প্রাণীর বিজয়াভিযান অধিকতর দ্রুত প্রসারিত হল।

ক্রম-উন্মেষিত এই চেতনায় নবদিগন্ত দেখা গেল যখন ক্রমবিকাশের পথে মানুষের আবির্ভাব ঘটল। এর আগে পর্যন্ত যেসব প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল তারা মুখ্যত বাহ্যিক পরিবেশ সম্বন্ধেই সচেতন ছিল। মানুষের মধ্যে দেখা দিল অন্তর-পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা। প্রকৃতির বাহ্য ও আন্তর দুটি রূপ সম্বন্ধেই মানুষের চেতনা জাগ্রত।

বেদান্ত এবং বিংশ শতাব্দীর জীববিজ্ঞানে এই অন্তর-পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতাই মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আত্মচেতনা—প্রকৃতির ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষে পরিণতি লাভ করেছে। এটি চেতনার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত উন্মোচিত করে নিয়ে এল যা একদিকে মানুষের যাত্রাপথে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসায়, অন্যদিকে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে গভীর প্রভাব বিস্তার করল।

বেদান্তের দৃষ্টিতে ক্রমবিকাশের পথে মানুষের এই বৈশিষ্ট্যের জাগরণ সম্পর্কে ভাগবতে সুন্দর একটি কথা বলা হয়েছেঃ

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষাণ্ সরীসৃপপশূন্ খগ-দন্দ শূকান্।

তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥[৩৬]

ভারতীয় বৈশিষ্ট্যঃ শুধু চিন্তা নয়, উপলব্ধি

ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে আমরা যে জ্ঞানলাভ করলাম তাতে বোঝা গেল মানুষের মধ্যে সত্তার যে রহস্য তা-ই হচ্ছে আত্মার রহস্য। আত্মার এই রহস্যের সমাধান না হলে বিশ্বের কোন রহস্যই উন্মোচিত হবে না। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ন্যায়তত্ত্ব, কোন

৩৬। তদেব, ১১।৯।২৮

কিছুই আমাদের এই বিশ্বজগতের রহস্য পুরোপুরি সমাধান করতে পারবে না ; এগুলি শুধুমাত্র অনুমান-প্রমাণের গোলকধাঁধায়ই ঘুরতে থাকবে। চরম সত্যের মতো একটি বিষয়ে কেবলমাত্র অনুমান করেই ভারতীয় মন তৃপ্ত থাকতে পারেনি। ভারতীয় ঋষিরা সাহসিকতার সঙ্গে অন্তর-জগতের মধ্যে প্রবেশ করলেন, চেতনা ও অহংবোধের সূত্র ধরে তাঁরা প্রবেশ করলেন গভীরে, অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করে তাঁরা নশ্বরের পিছনে অবিনশ্বরকে খুঁজে পেলেন, সসীমের গভীরে পেলেন অসীমকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই যাত্রাপথের কথা বলা হয়েছে; তার তাৎপর্য বোঝানো হয়েছেঃ '...যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরস্তং...।'[৩৭] ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষায় সেই মহাবাক্যই ধ্বনিত হয়েছেঃ তুমি সেই (তত্ত্বমসি)।[৩৮] উপনিষদে বার বার এই সত্যের কথাই বলা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবেই মানুষের চিন্তার মধ্যে যখন এমন শক্তি রয়েছে যার সাহায্যে সে একটি সামান্য সূত্র দিয়ে বিশাল বিশ্বজগৎকে ব্যাখ্যা করতে পারে তাহলে আত্মার ক্ষেত্রে, নিত্য অসীম আত্মার বিষয়েও কি তার অনন্ত শক্তির প্রকাশ সম্ভব নয় ? বিশ্বজগতের রহস্য শেষ পর্যন্ত সমাধান করা হল মানুষের স্বীয় অন্তর-রহস্যের সমাধান করে। উপনিষদের ঋষিরা উপলব্ধি করলেন, বিশ্বরহস্যের কেন্দ্র মানুষের মাঝেই লুকিয়ে রয়েছে এবং এই কেন্দ্রকে খুঁজে পেলেই মানুষ তার শাশ্বত সত্তাকে অনুভব করতে পারে। আর এভাবেই সমগ্র বিশ্বজগৎ আত্মার আলোকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই সত্যের উপলব্ধিতেই মানবজীবনের পূর্ণতা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষায়ঃ

> যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
> দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
> অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
> জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥[৩৯]

এ ছিল এক আশ্চর্য আবিষ্কার, আনন্দের পরিপূর্ণতায় উজ্জ্বল আবিষ্কার। উপনিষদের ছত্রে ছত্রে এরই অনুরণন। চরম সত্য আত্মায় উপলব্ধি করে ঋষিরা জ্ঞানের চরমে পৌঁছালেন, উপনীত হলেন চেতনা, শান্তি ও আনন্দের পরিপূর্ণতায়। খুঁজে পেলেন সত্য, জ্ঞান আর আনন্দের চিরপ্রস্রবণকে, পেলেন সৎ-চিৎ-আনন্দকে। এই সত্যানুসন্ধানের তপস্যার পথে জীবনের যে পরিপূর্ণতা আসে—তারই আলোকে তাঁরা এই মহাজাগতিক এবং জৈবিক বিবর্তনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেলেন।

প্রতিটি জীবনই পরিপূর্ণতাকে খুঁজে পেতে চায়। আধুনিক জীববিজ্ঞানের মতে এটিই জীবজগতের সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য। উপনিষদে আমরা পাই মুক্তি আর পূর্ণতার বিষয়ে সুন্দর ধারণা। বদ্ধ আমরা মুক্ত হতে চাই, অখণ্ড অনন্ত হতে চাই, পেতে চাই পূর্ণতাকে। যীশুখ্রীষ্ট একেই বলেছেন, 'Perfection' (পরিপূর্ণতা)। 'Be ye therefore perfect,

---

৩৭। বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ৩।৪।১

৩৮। ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৬।৮।৭

৩৯। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, ২।১৫

even as your Father which is in heaven is perfect.'[৪০] তোমরা শুদ্ধ হও, পরিপূর্ণ হও, এমনকি স্বর্গে তোমাদের পিতার মতো শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও। মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করা, স্বীয় চেতনার সীমাকে বিস্তৃত করা, বোধিকে প্রাপ্ত হওয়া, পরিপূর্ণভাবে প্রজ্ঞাবান হওয়া—এই-ই হচ্ছে মানবজীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য। শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সবকিছুই মানুষের চেতনাকে বিস্তৃত করার পথ ও পদ্ধতি মাত্র, পূর্ণতার গভীরে এগিয়ে যাবার প্রয়াস। এই পথ ও প্রয়াস শুধু বাহ্যিক প্রকৃতির উপর আধিপত্যবিস্তারেই শেষ নয়, পরন্তু অন্তঃপ্রকৃতি, মানুষের নিজের অন্তঃকরণের উপর আধিপত্যের প্রয়াসও। 'জ্ঞানই শক্তি'—একথা শুধু ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সত্য। এখানে মানুষের শক্তি পরিমাণগত ভাবেই নয়, গুণগত দিক দিয়েও বেড়ে যায়।

সেন্ট হেলেনায় নির্বাসিত নেপোলিয়ন যথার্থই বলেছিলেন ঃ এই জগতে দুটি শক্তি রয়েছে—তরবারির শক্তি আর আত্মিক শক্তি। আধ্যাত্মিক শক্তি সব সময়েই তরবারির শক্তিকে নিশ্চেষ্ট করেছে। আলেকজাণ্ডার, সীজার, শার্লামেন আর আমি বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের প্রতিভা কিসের উপর দাঁড়িয়েছিল? তরবারির শক্তির উপর। যীশু তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রেমকে ভিত্তি করে। আর তাই আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর জন্য প্রাণ দিতে পারে।

মানবীয় পূর্ণতার বিজ্ঞান এবং বিবেকানন্দ

ভারত ধর্মকে একটি বিজ্ঞান হিসাবেই বিকশিত করেছিল; 'ধর্মের বিজ্ঞান' কথাটিকে জুলিয়ান হাক্সলী বলেছেন ঃ 'মানবীয় পূর্ণতার বিজ্ঞান।' এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি উক্তির উল্লেখ করলে ব্যাপারটি বোঝা সহজ হবে। এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ঃ '...আমরা কৃত্রিম উপায়ে বস্তুর বৃদ্ধির গতি দ্রুততর করিয়া তুলিতেছি। মানুষের উন্নতিই বা দ্রুততর করিতে পারিব না কেন? জাতি হিসাবে আমরা তাহা করিতে পারি। অপর দেশে প্রচারক পাঠানো হয় কেন? কারণ এই উপায়ে অপর জাতিগুলিকে তাড়াতাড়ি উন্নত করিতে পারা যায়। তাহা হইলে ব্যক্তির উন্নতিও কি আমরা দ্রুততর করিতে পারি না? পারি বইকি। এই উন্নতির দ্রুততার কোন সীমা কি নির্দেশ করা যায়? এক জীবনে মানুষ কতদূর উন্নত হইবে, কেহ তাহা বলিতে পারে না। কোন মানুষ এইটুকুমাত্র উন্নত হইতে পারে, তাহার বেশী নয়, এ-কথা বলার পিছনে কোনই যুক্তি নাই। পরিবেশ অদ্ভুতভাবে তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিতে পারে। কাজেই পূর্ণতালাভের পূর্ব পর্যন্ত কোন সীমা টানা যায় কি?...সম্প্রতি—এই সেদিনকার কথা—এরূপ একজন মানব (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) আসিয়াছিলেন, যিনি এই জন্মেই সমগ্র মানবজাতির জীবনের সবটুকু পথ অতিক্রম করিয়া চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন। উন্নতির গতি ত্বরান্বিত করার এই

৪০। The Holy Bible, New Testament, Saint Matthew, Authorized or King James Version, Universal Book and Bible House, Philadelphia, U.S.A., 1948, 5/48

কার্যটিকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বনে পরিচালিত করিতে হইবে। এই নিয়মগুলি আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, এগুলির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি এবং নিজ প্রয়োজনে এগুলিকে লাগাইতে পারি। এরূপ করিতে পারা মানেই উন্নত হওয়া। এই উন্নতির বেগ দ্রুততর করিয়া, ক্ষিপ্রগতিতে নিজেকে বিকশিত করিয়া এই জীবনেই আমরা পূর্ণতা লাভ করিতে পারি। ইহাই আমাদের জীবনের উচ্চতর দিক ; এবং যে বিজ্ঞানসহায়ে মন ও তাহার শক্তির অনুশীলন করা হয়, তাহার যথার্থ লক্ষ্য এই পূর্ণতালাভ।... এই বিজ্ঞান চায় তুমি সবল হও, প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া না দিয়া কাজটি তুমি নিজের হাতে তুলিয়া লও এবং এই ক্ষুদ্র জীবনের ঊর্ধ্বে চলিয়া যাও। ইহাই তাহার মহান উদ্দেশ্য।'[৪১]

বেদান্তের চিরন্তন বাণী ঃ অভীঃ ও শক্তি

আত্মিক জ্ঞান মানুষকে অসীম শক্তি আর সাহসিকতা এনে দেয়। সত্য ও প্রয়োজনের দিক থেকে এটাই বেদান্তের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'আমার মনে সুদূর অতীতের সেই পাশ্চাত্যদেশীয় সম্রাট আলেকজাণ্ডারের চিত্র উদিত হইতেছে। আমি যেন দেখিতেছি—সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট সিন্ধুনদের তীরে দাঁড়াইয়া অরণ্যবাসী, শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, স্থবির আমাদেরই জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিতেছেন ; সম্রাট সন্ন্যাসীর অপূর্ব জ্ঞানে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অর্থ-মানের প্রলোভন দেখাইয়া গ্রীসদেশে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। সন্ন্যাসী অর্থ-মানাদি প্রলোভনের কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া গ্রীসে যাইতে অস্বীকার করিলেন ; তখন সম্রাট নিজ রাজপ্রতাপ প্রকাশ করিয়া বলেন, "যদি আপনি না আসেন, আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব।" তখন সন্ন্যাসী উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি এখন যেরূপ কথা বলিলে, জীবনে এরূপ মিথ্যা কথা আর কখনও বলো নাই। আমাকে কে বধ করিতে পারে? ঐহিকজগতের সম্রাট, তুমি আমায় মারিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না! আমি চৈতন্যস্বরূপ, অজ ও অব্যয়। আমি কখনও জন্মাই নাই, কখনও মরিবও না! আমি অনন্ত, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ! তুমি শিশু, তুমি আমায় মারিবে?"—ইহাই প্রকৃত তেজ, ইহাই প্রকৃত বীর্য।'[৪২]

আত্মিক শক্তি বলতে কি বোঝায় সে-সম্বন্ধে স্বামীজী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন। তখন এক ভারতীয় সন্ন্যাসীকে এক সৈনিক ছুরি দিয়ে মারায় সেই সাধু মরণাপন্ন হন। অন্য সৈনিকেরা যখন সেই ঘাতককে বন্দী করে নিয়ে সাধুর কাছে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করল, এই সৈনিকই তাঁর ঘাতক কিনা, তখনই সেই সাধু তাঁর পনেরো বছরের মৌনতা ভেঙে আপ্লুত ভালবাসার কণ্ঠস্বরে বললেন ঃ 'তুমিও সেই ব্রহ্মই।' সেই সাধু সমগ্র জীবজগতের সঙ্গে নিজের একত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ঘাতকের মধ্যেও সেই এক আত্মাকেই দেখতে পেলেন।

৪১। বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪১২-১৩

৪২। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১২৯

মৃত্যুর মুখে সক্রেটিস যে শক্তি ও সাহসের নিদর্শন দেখিয়েছিলেন তা-ও ঐ একই আত্মিক শক্তির অর্জিত উৎসের থেকেই তিনি লাভ করেছিলেন। ক্রিটো যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সক্রেটিস, তোমার শবদেহ কিভাবে আমরা সৎকার করব?' সক্রেটিস উত্তর দিয়েছিলেনঃ 'তা তুমি যেভাবে ইচ্ছে করতে পার, কিন্তু যথার্থই আমার এই আমিকে তুমি ধরার চেষ্টা কর। আনন্দ কর ক্রিটো, জেন, তুমি কেবল আমার দেহটিকেই সমাধিস্থ করছ এবং তোমার যেভাবে ভাল মনে হয়, সেভাবেই তুমি তা করতে পার।'[৪৩]

মানুষকে যদি যথার্থ জীবন লাভ করতে হয়, জীবনের যথার্থ পূর্ণতা সে যদি পেতে চায়, তাহলে তাকে নিজের মধ্যে সেই অবিনশ্বর আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, জয় করতে হবে তার নিম্নতর সত্তাকে, তার সসীম অপরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র জীবত্বকে। এইটি লাভ করার একটি বিশেষ উপায় আছে, এবং জগতের বিভিন্ন ধর্মগুলি সেই উপায়টিকেই নানাভাবে ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করছে। কিন্তু একমাত্র ভারতেই এই উপায়টিকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যৌক্তিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা হয়েছে। একটি উদার সার্বিক ফলশ্রুতিতে এই ধ্যানধারণা পূর্ণবিকশিত এবং পরিণামী হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞান ও বেদান্ত পরিপূরক

এইভাবে ব্যাখ্যাত ধর্ম, আমাদের বেদান্তধর্ম সমগ্র মানবজাতির কাছে এক বিশেষ বাণী বহন করে আনে। বিজ্ঞান তার কারিগরিবিদ্যার সাহায্যে চমৎকার বাড়ি বানাতে পারে। রেডিও, টেলিভিসন ইত্যাদি সবরকম আধুনিক সাজসরঞ্জাম দিয়ে বাড়িটিকে সাজাতে পারে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা মানুষকে সুখী সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সমস্ত বস্তুবৈভবই দিতে পারে; এমনকি রাষ্ট্রীয় ধর্মসভার মাধ্যমে হয়তো তাকে স্বর্গের আশ্বাসও দেওয়া যেতে পারে, এবং মানুষ নিজেও তার বাড়িকে 'শান্তি কুঞ্জ' (Happy Villa) ইত্যাদি নামে ভূষিত করতে পারে। কিন্তু এর কোনটিই মানুষকে সুখী ও শান্তিময় জীবনের চূড়ান্ত আশ্বাস দিতে পারে না। কারণ এটি অনেক পরিমাণে শক্তি ও পরিপুষ্টির অপর এক গোমুখী-উৎসের উপরে এবং মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উপরে নির্ভরশীল। তারজন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতা-সঞ্জাত এক বিশেষ জ্ঞান ও শুদ্ধ সংযমের উপরে প্রতিষ্ঠিত দিব্য জ্ঞান ও মহাশক্তি। মানুষ যদি ভৌতবিজ্ঞানের সাহায্যে সুস্থ সজীব বহির্জীবন-পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে এবং তার সঙ্গে ধর্মের সাহায্যে যদি মানুষ অন্তঃপ্রকৃতিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে তাহলেই সে জীবনের পরিপূর্ণতা খুঁজে পেতে পারে; অন্যভাবে নয়। এই-ই হচ্ছে উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গি।

কিন্তু আধুনিক সভ্যতা আমাদের এই পূর্ণতার পরিবেশ দিতে পারছে না। যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ আজ অর্থ-ক্ষমতা-বিলাসিতার মধ্যে থেকে ক্রমশই অন্তরের দিক থেকে

৪৩। Dialogues of Plato, Vol. I, Jowett's Edition (1953), p. 474

হয়ে উঠছে শূন্য, রিক্ত। আজ সর্বক্ষণই সে রয়েছে উত্তেজনা ও দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে, সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তার মাঝখানে। তারুণ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রমত্ত পানাসক্তি, আত্মহত্যা ইত্যাদি আরও বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এই দুঃখ-যন্ত্রণার পরিধি দিন দিন বেড়েই চলেছে। কেন ? কারণ মানুষ অন্তরের তৃপ্তিকে হারিয়েছে, ক্ষমতা ও একঘেয়ে জীবনের দংশনে ইন্দ্রিয়সীমায় আবদ্ধ হয়ে মানুষ আজ ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত, অস্থির। আধুনিক মানুষের এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা, এই বিপন্ন অসহায়তা সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিরা বহুযুগ আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রয়েছে ঃ

যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি।[৪৪]

একশ বছর আগে শোপেনহাওয়ার বলেছিলেন ঃ '...all men who are secure from want and care, now that at last they have thrown off all other burdens, become a burden to themselves....'[৪৫]

মানুষ আজ নিজেই নিজের কাছে এক বিরাট সমস্যা, এক বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা, সম্পদের ঐশ্বর্যের প্রভূত প্রাচুর্য, সমাজনীতি-রাজনীতির যথার্থ সম্প্রয়োগের আরও নানা অবদান, কোন কিছু দিয়েই মানুষ এই বিপন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। এ সম্ভব কেবলমাত্র ধর্মবিজ্ঞানের সাহায্যে, ধর্মকে উপলব্ধি ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। স্বামীজীর ভাষায় ঃ 'আপনারা মনে রাখিবেন, শুধু কথা বলায় ধর্ম নাই, ধর্ম—মতামতে নাই বা গ্রন্থের মধ্যেও নাই; ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। ধর্ম কোনরূপ বিদ্যা অর্জন করা নয়, ধর্ম আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়া।'[৪৬]

ভারত এই বিশেষ অর্থেই ধর্মকে উপলব্ধি করেছে এবং এই কথাটিই স্বামীজী সমগ্র বিশ্বে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে শুনিয়ে গেছেন। ধর্মের পরিণাম ও উদ্দেশ্য এই উপলব্ধি, প্রাচীন ঋষিদের ভাষায় ঃ ঈশ্বরকে অনুভব করা, আত্মিক চেতনার দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলা। এটাই ধর্মের প্রধান লক্ষণ। ইটের পর ইট সাজিয়ে যেমন বাড়ি তৈরী হয়, আত্মিক চেতনার স্তরেও তেমনি মানুষ নিজেকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলে। যখন আমরা ধর্মসাধনা শুরু করি, তখন অসীম শক্তি জেগে ওঠে, চেতনার সীমা বিস্তৃত হয়, সহানুভূতির ঐশ্বর্যে হৃদয় আরও বড় হয়। আমরা অনুভব করতে পারি যে আমরা ক্রমশই পূর্ণতার অভিমুখে এগিয়ে চলেছি। এই অন্তর-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শক্তি আসে, যা মানুষকে আরও উন্নত করে। এবং তখনই আমরা বিজ্ঞান-প্রগতির উৎস-জাত তেজ ও শক্তিকে বৃহত্তর কর্মসমন্বয়ে জীবনের অঙ্গীভূত করে নিতে পারি। তখনই মানুষ জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণে এনে শক্তি ও জ্ঞানে পরিণত করে, আনন্দ ও কল্যাণের উৎস হয়ে ওঠে। সমাজ থেকে ধর্মকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তবে তো

৪৪। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৬।২০

৪৫। The World As Will And Idea—Arthur Schopenhauer, Trubner & Co., London, 1883, p. 404

৪৬। বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ১২৭

বর্বরতাই অবশিষ্ট থাকে। মানবসংস্কৃতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কশূন্য এই বর্বরতাই বহু প্রাচীন সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আধুনিক সভ্যতাও যদি এই পথেই যায় তবে তা নিজের মধ্যেই লালিত বর্বর শক্তির দ্বারা নিজেই ধ্বংস হবে। আমাদের রক্ষা করতে পারে কেবলমাত্র আমাদের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত 'আত্মিক প্রেম'[৪৭] এবং যা আমাদের সকলকে বেঁধে রাখবে একটি উদার সৌভ্রাত্রবন্ধনে—যেকথা বলে গেছেন বারট্রাণ্ড রাসেল। মানবহৃদয়ে এই পরার্থবাদের প্রসারণা সম্পর্কে বলেছেন পিতিরিম সোরোকিনও।[৪৮] এই আত্মিক প্রেম আসে ধর্মের মধ্য দিয়ে একথা বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং পৃথিবীর অন্যান্য আচার্য ও মহৎ জ্যেষ্ঠরাও। স্বামীজীর ভাষায়ঃ 'ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।'[৪৯] তিনি আরও বলেছেন ঃ 'তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়, তা না হলে সে দুরাত্মা।'[৫০]

তাহলে এখন প্রশ্ন উঠবে—ধর্ম কি সত্যি আমাদের কিছু দিতে পারে? স্বামী বিবেকানন্দ এর উত্তরে বলে গেছেন ঃ 'পারে। ...ইহা মানুষকে অনন্ত মহাজীবন আনিয়া দেয়। ইহা মানুষকে মানুষ করিয়াছে, এবং এই পশুমানবকে দেবত্বে উন্নীত করিবে। ইহাই হইল ধর্মের ফল। মানব-সমাজ হইতে ধর্মকে বাদ দিন, কি থাকিবে? বর্বরে পরিপূর্ণ একটি অরণ্যানী ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। ...ইন্দ্রিয়সুখকে মানবজীবনের লক্ষ্য মনে করা অসম্ভব... জ্ঞানই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। ...আমরা দেখিতে পাই, পশুগণের ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা মানুষ নিজ বুদ্ধিমত্তা হইতে অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে এবং ইহাও দেখি যে, মানুষ তাহার বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষাও আধ্যাত্মিক স্বরূপ হইতে অধিকতর আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। অতএব এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই অনুভূতির সহিত আনন্দলাভও হইবে।'[৫১]

উপসংহার

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দেখলাম, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরাট কোন ব্যবধান নেই। দুটি শাখাই মানুষকে আত্মিক উন্নতির পথে পরিচালিত করতে চায়, নতুন সমাজব্যবস্থা আনতে চায় যেখানে এ জীবনেই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে মানুষ। একক বিচ্ছিন্নভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং অসহায়। তাই ধর্ম ও বিজ্ঞানের কেবলমাত্র একটিকে নিলেই হবে না। এই ব্যর্থ চেষ্টা আগেও হয়েছে। প্রাচীন পৃথিবী

৪৭। The Impact of Science on Society—Bertrand Russell, George Allen & Unwin Ltd., London, 1952, p. 114

৪৮। The Reconstruction of Humanity—Pitirim A. Sorokin, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1960, See : Especially Part-V

৪৯। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৪০০

৫০। তদেব, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৮৯

৫১। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৪৭-৪৯

কেবলমাত্র ধর্মকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইত, এবং আধুনিক পৃথিবী শুধু বিজ্ঞানকেই ভিত্তি করতে চায়। ফলে দুয়ের মধ্যেই দেখা গেছে ব্যর্থতা। এই দুয়ের সম্মিলনেই গড়ে উঠবে নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ। জগৎ আজ এই সমন্বিত মহান মানবসভ্যতার জন্যই প্রতীক্ষমাণ। মানুষের চিন্তার জগতে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে এটাই হচ্ছে স্বামীজীর বিশিষ্ট অবদান। বেদান্তের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে একথাই তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন ঃ

'আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—ইহাদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।

ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।'[৫২]

শুধু ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় নয়, হৃদয় ও বুদ্ধির, ধ্রুব ও কল্পনার সমন্বয়ও করতে হবে—স্বামীজীর বেদান্ত এই জিনিসটিই তুলে ধরেছে। এ পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিকী বিদ্যা এবং বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। স্বামীজীর এই উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করলেই বোঝা যাবে তা কত ব্যর্থ এবং এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান আসলে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

রোমাঁ রোলাঁ বলেছিলেন ঃ স্বামীজী হলেন মানুষের সবরকম শক্তির মূর্ত রূপ। মানুষের সকল মৌলিকতা, সকল অবদান, সকল শক্তিকে স্বামীজী নতুন ভঙ্গিতে চালিত করতে চেয়েছেন, কারণ মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, শক্তি-সাহস, সাধনা ও কর্মপ্রয়াসের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন একটি সুগভীর সাম্যের অবস্থিতি, একটি সমন্বয়ী মানবপ্রজ্ঞার প্রসারিত রূপ। আগামী যুগের মানবধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ 'বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি মহৎ সর্বজনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষ্ণুতা; তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য উহাকে যুক্তির প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এখন চাই এই প্রখর জ্ঞানের সহিত বুদ্ধদেবের এই হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও করুণা সম্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, উহা যুক্তিমূলক হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, গভীর প্রেম ও করুণার যোগ থাকে। তবেই মনিকাঞ্চনযোগ হইবে, তবেই বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরকে কোলাকুলি করিবে। ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম হইবে, আর যদি আমরা উহা ঠিক ঠিক গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, উহা সর্বকাল ও সর্বাবস্থার উপযোগী হইবে।'[৫৩]

৫২। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০৪ ৫৩। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৪

শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা

উপক্রমণিকা

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার বিশ্লেষণে তাঁর সামাজিক ধ্যানধারণার কিছুটা অবতারণা অপরিহার্য বললেও চলে। আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, স্বামীজীর সামাজিক ধ্যানধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার পর্যালোচনা করতে হয়।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা—যাকে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থাই বলা চলে—বেশী দিনের পুরনো নয়। এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় যোল শতকের ধর্মসংস্কারেরও (Reformation) পরে। ইউরোপে তার আগে শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রত্যেককে তার উপলব্ধি ও আত্মবিকাশের ক্ষমতা অনুযায়ীই শিক্ষা দেওয়া হত। অর্থাৎ ঠিক সামাজিক প্রয়োজনে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা হত না এবং ঢালাও শিক্ষাপ্রসারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষকের কাজ ছিল প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা ও সামর্থ্য নির্ধারণ করে তাকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে তোলা। তবুও ভল্টেয়ার (Voltaire) একে 'বিচারবিহীন নবশব্দ প্রয়োগবিদ্যা' (presumptuous neologism) বলে অভিহিত করেছিলেন।

একই ব্যবস্থাভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সকলের একই ধরনের বোধোদয়ের প্রচেষ্টার সূত্রপাত মধ্যযুগের শেষভাগে কিমিয়াশাস্ত্রের (alchemy) মধ্যেই নিহিত। এবং এই ব্যবস্থার পথিকৃৎ হিসাবে সতেরো শতকের মারইভিয়ার বিশপ জন অ্যামোস কামেনিয়াসেরই (John Amos Comenius) নামোল্লেখ করতে হয়। তিনিই প্রথম সাত কিংবা বারো পর্যায়ের আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। তিনি তাঁর Magna Didactica-য় বিদ্যালয় সমূহকে 'প্রত্যেকের জন্য সবকিছু শেখাবার কলাকৌশল' (devices to teach everybody everything) বলে বর্ণনা করে বহুল পরিমাণে জ্ঞানোৎপাদনের এক খসড়া তৈরী করেন। সে খসড়া অনুসারে উৎকর্ষমূলক শিক্ষা শুধু যে সুলভই হবে তা-ই নয়, ব্যক্তিমানবের পূর্ণ বিকাশও সম্ভব করবে। কিন্তু কামেনিয়াস মূলত ছিলেন একজন অপরসায়নবিদ্—নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করাই ছিল তাঁর ব্রত। মানুষের ক্ষেত্রে তিনি চেয়েছিলেন তার সত্তার উদগতির (sublimation) মাধ্যমে তাকে উন্নত করতে। কামেনিয়াস তাঁর লক্ষ্যসাধনে সমর্থ না হলেও শিল্পবিপ্লব এক অদৃশ্য নতুন পণ্যের উৎপাদন সম্ভব করে। এরই নাম জনশিক্ষা—mass education। এর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রজাল দ্বারা পরিবেশের উপযোগী নবমানবগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

কিন্তু জনশিক্ষার জন্য বরাদ্দের পরিমাণ দিন দিন যতই বৃদ্ধি করা হোক না কেন, দেখা গেল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রই উচ্চতর শিক্ষার পক্ষে অনুপযুক্ত এবং ফলে নবসৃষ্ট পরিবেশের অনুপযোগী বলেই ছাত্রসংখ্যা ছাঁটাই করা চলতে লাগল।

শিক্ষার এই নতুন ধারণা 'বিদ্যালয়কে' শুধু অপরিহার্য করেই তুলল না, বিদ্যালয়ের ছাপ যোগাড় করতে অপারগ ব্যক্তিদের দারিদ্রকেও যৌগিক প্রক্রিয়ায় বাড়িয়ে তুলল।

পাস-ফেলের বিচারে যারা বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে আসতে বাধ্য হল তারা নিজেদের হেয় জ্ঞান করতেই শিখল। সমাজের মূল্যবোধ যান্ত্রিকপ্রক্রিয়া-কবলিত হয়ে মানুষকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করল। জীবনবেদের প্রয়োজনীয় সংস্কার দ্বারাই এই শৃঙ্খল ছিন্ন করা সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা এই উদ্দেশ্যের অভিমুখেই প্রসারিত। এই শিক্ষাচিন্তা বা শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে তাঁর সামাজিক ধ্যানধারণা।

পশ্চাৎপট ঃ এই সামাজিক ধ্যানধারণার মধ্যে তাঁর বর্ণচক্রতত্ত্বই (cycle of castes) সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। স্বামীজী ছিলেন হিন্দু কল্পতত্ত্বে (Theory of Cycles) বিশ্বাসী। এই তত্ত্বানুসারে ঃ '...এই জগৎ তরঙ্গায়িত চক্রাকারে চলিতেছে। তরঙ্গ একবার উঠিল, সর্বোচ্চ শিখরে পোঁছিল, তারপর পড়িল, কিছুকালের জন্য যেন গহ্বরে পড়িয়া রহিল, আবার প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উঠিবে। এইরূপে তরঙ্গের উত্থানের পর উত্থান ও পতনের পর পতন চলিতে থাকিবে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে বা সমষ্টি-সম্বন্ধে যাহা সত্য, উহার প্রত্যেক অংশ বা ব্যষ্টি-সম্বন্ধেও তাহা সত্য। মনুষ্যসমাজের সকল ব্যাপার এইরূপে তরঙ্গগতিতেই চলিতে থাকে, বিভিন্ন জাতির ইতিহাসও এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিয়া থাকে।'[১]

মানবজীবনে এই চিরন্তন চক্র চার অঙ্কের এক নাটক সৃষ্টি করে, চমৎকারিতার দিক দিয়ে যাকে অতুলনীয় বলা চলে। এই নাটকের শেষ অঙ্ক কিন্তু এখনও মঞ্চস্থ হয়নি। চার অঙ্কে বর্ণচতুষ্টয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—পর্যায়ক্রমে মূল ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে ত্যাগ ও সংস্কৃতির প্রতীক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ আদর্শচ্যুত হওয়ার পর, প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষত্রিয়ের শাসন। আবার ক্ষাত্রধর্মচ্যুত ক্ষত্রিয়দের অপসারণ করে তাদের স্থানাধিকার করে বৈশ্যগণ। বৈশ্যশাসন শোষণেরই নামান্তর। সুতরাং একদিন এরও ঘটে অবসান। তবেই সমগ্র সমাজে প্রবর্তিত হয় শূদ্রবর্ণের আধিপত্য।[২] এই সমাজবিবর্তন-নাটকের শেষ অঙ্ক এখনও অবশ্য অভিনীত হয়নি। তবে স্বামী বিবেকানন্দ এর এমন চিত্রবৎ বর্ণনা করেছেন যেন তিনি এর চূড়ান্ত মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানেন সমাজবিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কি।

কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্সারের মতো এই বিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়ে ক্ষয় ও অবলুপ্তির সুস্পষ্ট সূচক স্বামীজীর কাছে প্রতীয়মান হয়নি। বরং তিনি এর মধ্যে দেখেছেন সমাজবিবর্তনের ধারা—যে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ বিকশিত হয়ে ওঠে। বর্ণশাসন বিকৃত হয়ে উঠলে তা অপসারিত হবেই। সুতরাং বিকাশ ও অগ্রগতি কি একই কথা নয়? মানবজীবনযাত্রা ভ্রান্তি থেকে সত্যে নয়, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে। স্বামীজী কিন্তু ব্যক্তির জন্য নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নির্দেশ করেননি। করলে যে নয়া বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়কেই অস্বীকার করা হত। তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা হল পরমকারণমূলক পদ্ধতিকে (teleological process) ত্বরান্বিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৭০

২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ২২২-৪৯

সমাজকে নবযুগ প্রসবের বেদনা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করা।

এই মুক্তিমন্ত্রের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন সমাজের সৌভ্রাত্রমূলক কাঠামোয়, যে কাঠামো বৈদান্তিক শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমেই গড়ে তোলা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের কথা। তাঁরাও শিক্ষার মধ্যে সন্ধান পেয়েছিলেন বিপ্লবের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার।

সমাজসংস্কার ও শিক্ষা ঃ সমাজের সৌভ্রাত্রমূলক কাঠামো গড়ে তোলা অর্থাৎ সমাজের মধ্যে প্রকৃত অর্থে মৈত্রীবন্ধন সৃষ্টিকে সমাজসংস্কার বলে অভিহিত করা যেতে পারে। 'সংস্কার' বলতে স্বামীজী অন্তরাগত সম্প্রসারণের (growth from within) পথে সকল প্রতিবন্ধকের অপসারণই বুঝেছিলেন, উপরিতলগত কিছু কিছু রদবদল নয়। এই দিক দিয়ে সংস্কার স্থান-কালের আপেক্ষিক হতে বাধ্য। তবুও কিন্তু মূলত সংস্কার হল জেহাদেরই নামান্তর—বৈষম্য, অন্যায়, ভেদাভেদজ্ঞান, আত্মকেন্দ্রিকতা, বিশেষাধিকার (privileges) প্রতিষ্ঠার প্রবণতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে জেহাদ।

সামগ্রিকভাবে এই সংস্কারকার্য শিক্ষাব্যবস্থার উপরই নির্ভরশীল। এবং যেহেতু শিক্ষাব্যবস্থা মূলত সমাজকেন্দ্রিক সেই হেতু এই শিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। স্বামীজী শিক্ষার এবং ধর্মের বর্ণনা দিয়েছেন ঃ 'শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ। ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।'[৩] এখন অল্‌ডাস হাক্সলীর (Aldous Huxley) অনুসরণে ঐশীশক্তিকে যদি 'সেই পূর্ণাঙ্গতা, সেই শিবময়তা' (the Perfection itself, the Goodness itself) বলে মেনে নেওয়া যায়, তবে শিক্ষা ও ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ একাত্মবোধক—অন্তত একই বিকাশধারার দুটি পৃথক দিক। উভয়েরই উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বিকাশ সম্ভব করা।

কিন্তু স্বামীজী সুস্পষ্টভাবেই বুঝেছিলেন যে, শিক্ষার এই অতি-ধারণা (super-concept) জনসাধারণ ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না। উপরন্তু ধারণাটির বহুল প্রচারের ফলে ব্যক্তিমন অন্তরাভিমুখী হয়ে ব্যক্তির সামাজিক দিকটার বিনাশ ঘটাবে, এমন সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণে তিনি শিক্ষার একটি সংজ্ঞাই নির্দেশ করেছেন ঃ যে অনুশীলন দ্বারা ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ ও অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে ও ফলপ্রসূ হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা।[৪]

সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলির সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

প্রথমত, শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত ইচ্ছাশক্তির (will power) উদ্বোধন করে তার প্রবাহ সঙ্ঘটিত করতে হবে। ব্যক্তি কোন স্বয়ংচল যন্ত্র নয় ; শুধু প্রতিবন্ধকাধীন বলে সে যন্ত্রবৎ আচরণ করে। অতএব শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষ গড়া ; ধর্মের উদ্দেশ্যও একই।

৩। তদেব, পৃঃ ৪০০

৪। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition (1962), p. 490

দ্বিতীয়ত, ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ ও অভিব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কি উদ্দেশ্যে? নিশ্চয়ই সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে। কারণ সমাজবহির্ভূত ব্যক্তির অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না।

তৃতীয়ত, শিক্ষা হল অনুশীলন যার দ্বারা মানুষের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী—উভয় প্রকৃতিরই সমন্বয়সাধন সম্ভব। সুতরাং শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ—উভয়েরই উন্নয়নমার্গ।

ধারণাটির সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায় স্বামীজীরই একটি উক্তিতে। প্রশ্নাকারে উক্তিটি হলঃ 'যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা?'[৫]

কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এই চূড়ান্ত সমন্বয়সাধন স্বামীজীর কাছে পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়নি। বোধহয় তাঁর সন্দেহ ছিল যে, কালক্রমে সমাজের স্থলে ব্যক্তি-প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার ফলে ভারতের 'বিজাতিবিজিত, স্বজাতিনিন্দিত' জনসাধারণ অবহেলিত হতে বাধ্য। সুতরাং তিনি 'জনশিক্ষা'কেই অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন, এবং এর সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন যে, জাতি ও সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই শিক্ষা অপরিহার্য। একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেনঃ যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।[৬]

অতএব স্বামী বিবেকানন্দ-কল্পিত সামাজিক শিক্ষা মৌল প্রকৃতিতে জনশিক্ষারই নামান্তর। কিন্তু আবার প্রকৃতিগত দিক থেকেই এই জনশিক্ষা কামেনিয়াস-কল্পিত জনশিক্ষা থেকে—ইউরোপে ধর্মসংস্কারের পর প্রবর্তিত জনশিক্ষা থেকে—বহুলাংশে পৃথক। বস্তুত, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়াই কঠিন। এখন স্বামীজীর এই শিক্ষাচিন্তারই বর্ণনা করা যাক।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিঃ আমরা দেখেছি যে, স্বামীজীর মতে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষ গড়া। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা কখনই তথ্যাধিক্য ভিত্তিক হতে পারে না। কারণ এ ধরনের শিক্ষা তোতাপাখিরই সৃষ্টি করে—ক্রমে তাদের যন্ত্রবৎ করে তোলে। এ শিক্ষা কেরানিকুল সৃষ্টিকার্যে সার্থক হতে পারে, কিন্তু কোন কিছু মহৎ বা কল্যাণকর সৃষ্টি করতে সমর্থ নয়। অতএব যে শিক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় তা মানুষ-গঠনকারী, চরিত্র-গঠনকারী ধ্যানধারণার সমন্বয় না হয়ে পারে না।[৭] পরিপূর্ণ অবস্থায় দেহ, মন ও আত্মার পূর্ণ সঙ্গতিসাধনে সমর্থ না হলে শিক্ষাব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ আখ্যা দেওয়া যায় না। গ্রীকদের আদর্শ ছিল 'সুন্দর দেহাভ্যন্তরে একটি সুন্দর মন'।

৫। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১০৭

৬। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV, p. 482

৭। ibid., Vol. III, Ninth Edition (1964), p. 302

স্বামী বিবেকানন্দ এর সঙ্গে একটি তৃতীয় উপাদান—মানুষের আত্মা—যোগ করেছেন, এবং তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় তাকেই আদ্যতা (primacy) প্রদান করেছেন। এরই ফলে অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক সম্প্রসারণই স্বামীজী-কল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য।

বলহীনের পক্ষে যখন আত্মার উপলব্ধি সম্ভবপর নয় তখন বস্তুগত উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে বৈকি। তাছাড়া বুভুক্ষু জনগণকে ধর্মদর্শন শিক্ষা দেওয়া তাদের অপমান করারই সামিল। অতএব স্বামীজীকে যে চিন্তাটি বিশেষভাবে বিব্রত করেছিল তা হল কি করে জনগণের মধ্যে অন্নসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণ করা যায়।[৮]

এই বাস্তবধর্মী জ্ঞান বা শিক্ষার মধ্যে থাকবে মনের বলিষ্ঠতা গঠন ও আত্মার উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। এই শিক্ষাই হল মানুষ গড়ার শিক্ষা—man-making education। মানুষ এইভাবে গড়ে উঠলে তার মধ্যে সমাজচেতনা দানা বাঁধতে বাধ্য।

শিক্ষাপদ্ধতি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম মৌলিক ধারণা বা thesis হল—কেউ কাউকে কিছু শেখাতে পারে না। যিনি এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাইছেন তাঁর পক্ষে এই রকম ধারণা পোষণ অসঙ্গত মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা স্বামীজীর জীবনে বেদবেদান্তপ্রসূত। বেদান্ত অনুসারে জ্ঞান মানুষের অন্তর্নিহিত। সুতরাং শিক্ষা উপলব্ধি বা জাগরণ ছাড়া আর কিছু নয়। গাছের চারা যেমন সৃষ্টি করা যায় না, তেমনি কাউকে কিছু শেখানোও যায় না। যা করা যায় তা হল উপলব্ধির পথে সহায়তা করা।

এই উপলব্ধি বা মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমান দিনের 'হিউরিসটিক পদ্ধতি'র (heuristic method) বিশেষ সঙ্গতি আছে। শেষোক্ত পদ্ধতিতে ছাত্রকে স্বয়ং জ্ঞানাহরণ করতে হয়, শিক্ষক তত্ত্বাবধান করেন মাত্র। শিক্ষা ব্যাপারে প্রাচীন গ্রীকদেরও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ অনুরূপ। অতএব ডিকিনসনের প্রতিপাদ্য বিষয় যে, প্রাচীনরাও আধুনিক,[৯] তা স্বামীজীর শিক্ষাতত্ত্বে পরিস্ফুটিত হয়ে তাঁর দর্শনের অন্যতম শাশ্বত উপাদান হয়ে রয়েছে।

শিক্ষাপদ্ধতি অবশ্যই জনগণের সহজাত গ্রহণশক্তির আপেক্ষিক হবে। জাতীয় চরিত্রবিরোধী কোন শিক্ষাই কার্যকর হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতের ক্ষেত্রে রুজিরোজগার-সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ধর্মের মাধ্যমেই করা সম্ভব। অন্য কোন পদ্ধতি জনমনকে প্রভাবিত করতে পারবে না। ভারতের ক্ষেত্রে যাকে জাতীয় পদ্ধতি বলে অভিহিত করা যেতে পারে তার সন্ধান স্বামীজী পেয়েছিলেন গুরুকুল-পদ্ধতিতে (যে পদ্ধতি প্রাচীন গ্রীসে প্রবর্তিত ছিল)।

গুরুকুল-পদ্ধতির মূল কথা হল গুরুর সঙ্গে একত্র বাস। পদ্ধতিটির উৎকর্ষ ব্যাখ্যা

৮। The Master as I saw him—Sister Nivedita, Udbodhan Office, Calcutta, Twelfth Edition (1977), p. 245

৯। The Greek View of Life—G. L. Dickinson, Methuen & Co. Ltd., London, 1957

করে তিনি বলেছেন : শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নয়।... বিশ্বাস, নম্রতা এবং শ্রদ্ধা ছাড়া আমাদের মধ্যে কোন রকম সম্প্রসারণই কল্পনা করা যায় না। যেসব দেশ ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে ও বজায় রাখতে সমর্থ হয়নি সেখানে শিক্ষক কথকেরই (lecturer) ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এবং সেখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয় শিক্ষকের ভাষণ মস্তিষ্কে ভরে নিয়ে যেতে। তারপর অবশ্য আর কিছু করা হয় না।[১০]

মানুষ গড়ার পক্ষে বিশেষ কার্যকর বলে স্বামীজী বিশ্বজনীনভাবে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন।

ধর্মীয় ভিত্তি : ঐ একই উদ্দেশ্য তাঁকে সকল সমাজের ক্ষেত্রেই শিক্ষার ধর্মীয় ভিত্তি নির্দেশ করতে প্রণোদিত করেছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, অন্তত কার্যকারিতার দিক দিয়ে স্বামীজীর দৃষ্টিতে শিক্ষা ও ধর্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন—উভয়েরই লক্ষ্য মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উপলব্ধি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ভগিনী নিবেদিতার উক্তি : স্বামীজীর কাছে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন এমন কোন কিছুই ছিল না।[১১]

প্রশ্ন উঠতে পারে, ধর্ম কি অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে? আপাতদৃষ্টিতে তা অবশ্য পারে না, কিন্তু মানুষকে নির্ভয় করে তুলে অমৃত জীবনের সন্ধান দিতে পারে। এর ফলেই আসে ত্যাগ ও সেবার প্রেরণা। ভয়শূন্যতার ফলে বিবেক জাগ্রত হয়, বিমুক্ত ব্যক্তি তখন অযৌক্তিক সামাজিক বিধিনিষেধের অপসারণে অগ্রসর হয়। এই বিমুক্তকরণ-কার্যকে শিক্ষার প্রাথমিক অবদান বলে গণ্য করতে হবে। অতএব স্বামীজী ধর্মকে কেন শিক্ষার ভিত্তিস্থল প্রদান করেছেন তা অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। অন্য একদিক দিয়ে দেখলে তাঁর মতে ধর্ম হচ্ছে শিক্ষার মৌল উপাদান।

শিক্ষাব্যবস্থার অন্যান্য উপাদান : শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যাপক ও ফলপ্রদায়ী (fruit-bearing) করে তোলবার জন্য মৌল উপাদানের পরিপূরক হিসাবে অন্যান্য উপকরণও অবশ্য প্রয়োজন। এ হল অন্যতম আপেক্ষিকতার সমস্যা (a problem of relativity)। ভারতের পক্ষে যা প্রয়োজন তা হল বেদান্ত ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয়, মূল প্রেরণার জন্য ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস।[১২] এ ছাড়াও অপার অভিনিবেশ (concentration), ভোগবাসনাশূন্যতা (detachment) এবং প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন (communion with Nature)।

স্বামীজী ছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান। কারণ তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এর মাধ্যমেই সমাজের পরিভৌত ভিত্তি (material base) শক্ত করে গেঁথে 'অভাব থেকে মুক্তি'র (freedom from want) ব্যবস্থা করা সম্ভব। সুতরাং চিন্তাপর্যায়-বিচারে স্বামীজী-নির্দেশিত শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান ধর্মেরও উর্ধ্বে। কারণ উদরপূর্তি

১০। Swami Vivekananda on India and Her Problems—Compiled by Swami Nirvedananda, Advaita Ashrama, Calcutta, 1976, pp. 45-6

১১। Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda—Sister Nivedita, Udbodhan Office, Calcutta, Fifth Edition (1967), p. 7

১২। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, Eighth Edition (1964), p. 366

হলে তবেই ধর্মসাধনের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। কিন্তু উদরপূর্তির পরই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা—শিক্ষা তখন ভোগবাসনাতেই ইন্ধন যোগাতে পারে। এইজন্যই তিনি আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান ও ধর্ম স্বামীজী-কল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার যৌথ ভিত্তি।

ব্রহ্মচর্যের অর্থ হল ব্রহ্ম-সাহচর্যের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা বিশুদ্ধতার রূপই গ্রহণ করে। সর্বক্ষেত্রে চিন্তা, বাক্য ও কার্যে বিশুদ্ধ হতে হবে। সহজ সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায়, ব্রহ্মচর্য হল বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য আত্মসংযম অনুশীলন।

ব্রহ্মচর্যের ফলে প্রবল সক্রিয়তা ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি উৎপন্ন হয়। অকল্পনীয় বলিষ্ঠতা ও নৈতিক চেতনারও উদ্ভব ঘটে। আবার মনোনিবেশ এবং ভোগবাসনাশূন্যতা ব্রহ্মচর্যেরই বৈশিষ্ট্য বা উপাদান। এই দুই উপাদানের আবির্ভাবের ফলে দেহ ও মন পরস্পরের সঙ্গে ভারসাম্যে উপনীত হয়। ফলে, মানুষের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের নির্গমনের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। জ্ঞানের মধ্যেই মেলে পরম সুখের সন্ধান; অজ্ঞতা দুর্দশারই সামিল। জীবনের জ্ঞানালোকে মৃত্যুভয় দূর হয়।

যে পদ্ধতি দ্বারা ব্যক্তি এই জ্ঞানালোকে অবস্থান করতে পারে তাকেই বলা হয় অভিনিবেশ। রসায়নবিদ্ গবেষণাগারে বসে তাঁর সমগ্র মানসিক শক্তি প্রয়োগ করেন পরীক্ষাধীন উপাদানসমূহের উপর, যাতে তাদের সুপ্ত প্রকৃতি—সকল রহস্য—প্রকাশিত হয়ে পড়ে। জ্যোতির্বিদ্ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে মনঃসংযোগ করেন সূর্যতারকা-নভোমণ্ডলের উপর তাদের রহস্য সন্ধানের জন্য। অনুরূপভাবে বিশ্বের সকল রহস্যদ্বারই ছাত্রের কাছে খুলে যাবে যদি তার জানা থাকে কিভাবে আঘাত করতে হয়। আঘাতের শক্তির প্রাবল্য একমাত্র মনোনিবেশ থেকেই আসতে পারে।[১৩]

কিন্তু মনোনিবেশের সঙ্গে থাকা চাই বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা। কোন বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজনমতো পরমুহূর্তে মন সরিয়ে নিয়ে অন্য বিষয়ের উপর উপস্থাপিত করার ক্ষমতাও থাকা চাই। নচেৎ মনোনিবেশ শিক্ষার্থীর জন্য নতুন শৃঙ্খল রচনা করতে পারে।

পরিশেষে, শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দেশ হলঃ প্রকৃতি থেকেই শিক্ষা লাভ কর ('Let nature be thy teacher')। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ফলে এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে চিরন্তন সত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। স্বামীজীর মতে, এই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।[১৪] সুতরাং তিনি বিদ্যায়তনসমূহের পারিপার্শ্বিক কাঠামো গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পাঠক্রম ও শিক্ষার বাহনঃ এই মানুষ-গড়া শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রম বিশেষ ব্যাপক—দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত উন্নয়নের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ যা অপরিহার্য বলে নির্বাচন করেছেন তা হল শরীরচর্চা, ধর্ম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, কান্তিবিদ্যা (aesthetics), যুগোত্তীর্ণ প্রাচীন

১৩। ibid., Vol. I, Eleventh Edition (1962), p. 130

১৪। ibid., Vol. V, p. 369

সাহিত্য (classics) এবং ভাষা। এদের মধ্যে অনুপাত অবশ্যই বিশেষ সমাজের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে।

শরীরচর্চার উদ্দেশ্য হল একদিকে শরীর এবং অপরদিকে মন-প্রাণের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন। ভগিনী নিবেদিতার অনুসরণে বলা যায়ঃ যে প্রাণশক্তিকে এতদিন দেহপীড়নে ব্যয় করা হয়েছে, তাকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে পেশীর অনুশীলনেই নিয়োগ করা উচিত বলে স্বামীজীর ছিল ধারণা।[১৫]

আগেই বলা হয়েছে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান হবে এইসব শিক্ষাব্যবস্থার যুগল ভিত্তি। বিজ্ঞানশিক্ষার পরিপূরক হবে প্রযুক্তিবিদ্যা। প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে আমাদের মতো দেশের ক্ষেত্রে স্বামীজী দেখেছিলেন স্বয়ংনিয়োগ বা আত্মনির্ভরশীলতার প্রশস্ত মার্গ। এর দ্বারা শিল্পপ্রসারের মাধ্যমে বহু লোককে চাকরির উমেদারি থেকে বাঁচানো যেতে পারে।[১৬]

কান্তিবিদ্যা হল চারুকলা ও উপযোগের সমন্বয়, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নয়ন-পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ছন্দ সৃষ্টি করা সম্ভব। জাপান এই সৃজনকার্য অতি সত্বর সম্পাদন করতে সমর্থ হয়েছে। তাই ঐদেশের পক্ষে দ্রুত অগ্রগতিও সম্ভব হয়েছে।

কালোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্য পাঠ লোককে জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করে। জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে জনগণের অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ জ্ঞান সংস্কৃতিভিত্তিশীল হচ্ছে ততক্ষণ জনগণ যে উন্নীত অবস্থাতেই থাকবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

মাতৃভাষাই হবে জনশিক্ষার বাহন, তবে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জন্য একাধিক ভাষা আয়ত্ত থাকা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা ছাড়া ধর্ম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং কালোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্যের চর্চা কি করে করা সম্ভব? দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সার্থক অনুশীলন কোন পাশ্চাত্য ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। এই কারণেই স্বামীজী ভারতে ইংরেজি ভাষা চর্চার সুপারিশ করেছিলেন। আবার যদিও তাঁর অভিমত ছিল যে, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থভুক্ত মহান ধ্যানধারণা সমূহকে জনগণের ভাষাতেই জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা উচিত, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃত শিক্ষারও নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ সংস্কৃত শব্দের ঝঙ্কারই জাতিকে মর্যাদা ও শক্তিসামর্থ্য প্রদান করবে।[১৭] বুদ্ধ, কবীর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য এবং অন্যান্যেরা তাঁদের বাণী তৎকালীন প্রচলিত ভাষাতেই প্রচার করেছিলেন। ফল কিন্তু স্থায়ী হয়নি—মহান শিক্ষকগণের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিক্ষারও অবলুপ্তি ঘটেছিল।

উপরন্তু, জনগণ সংস্কৃতের মতো প্রাচীন ভাষার চর্চা উপেক্ষা করলে ফল দাঁড়ায় কতিপয়ের বিশেষাধিকার। এর দরুন সৃষ্ট হয় এক নতুন ও কৃত্রিম জাতিভেদপ্রথা। অতএব কার্যত স্বামীজী তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় 'ত্রি-ভাষা ফর্মুলা' নির্দেশ করেছেন দেখা যায়।

১৫। The Master as I saw him, p. 37

১৬। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, pp. 368-69

১৭। ibid., Vol. III, p. 290

স্ত্রীশিক্ষা ঃ স্বামীজী-নির্দেশিত স্ত্রীশিক্ষাব্যবস্থা পুরুষদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেশ কিছুটা পৃথক। কারণ দ্বিবিধ ঃ প্রথমত, নারীকুলের সমস্যা অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির। দ্বিতীয়ত, গৃহস্থালির উৎকর্ষ বহু পরিমাণে স্ত্রীলোকদের উপর নির্ভরশীল।

সমাজভেদে নারীদের বিশেষ সমস্যারও প্রকারভেদ ঘটে থাকে। আমাদের মতো দেশে সমস্যা হল অবরোধপ্রথার, পরাধীনতার এবং পরনির্ভরশীলতার। বিদ্যাসাগর নারীসমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন আইন-প্রণয়নের মাধ্যমে, স্বামীজী কিন্তু সমাধানের সূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন 'স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহায়তা'র (self help and mutual aid) মধ্যে। এর জন্য নারীর পক্ষে যা প্রয়োজন তা হল নারীকে নারী করে গড়ার শিক্ষা, যে শিক্ষা তাদের মধ্যে নির্ভীকতা এবং স্বাবলম্বনের ভাব গড়ে তুলবে। অতএব স্বামীজীর মতে, স্ত্রীশিক্ষার পাঠক্রমে থাকবে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং কিছু ইংরেজি।

সুশৃঙ্খলিত গৃহস্থালির পক্ষে এর উপরে আরও কিছু প্রয়োজন। সুতরাং তিনি শিক্ষাসূচীর তালিকায় যোগ করেছেন রন্ধনবিদ্যা, সূচীশিল্প, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি।[১৮] এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর এই সকল নির্দেশ প্রায় এক শতাব্দী আগে ঘোষিত হয়েছিল, যখন গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বা সন্তানসন্ততির পরিচর্যা স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পাঠক্রমভুক্ত হয়নি।

মূল্যায়ন ঃ স্বামী বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত শিক্ষার ব্যাপকতা স্মরণ করিয়ে দেয় মিলটনের Treatise on Education (১৬৪৪)-এর কথা। জন স্টুয়ার্ট মিলের জন্য তাঁর পিতা জেমস মিল যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তা-ও মনে না পড়ে পারে না। আবার শরীরচর্চা, কান্তিবিদ্যা ও কালোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্যের পাঠক্রমভুক্তি শিক্ষা ব্যবস্থায় জিমন্যাসটিক্স, সঙ্গীত এবং কাব্যের উপর প্লেটো-প্রদত্ত গুরুত্বের সঙ্গে তুলনীয়। এদের প্রয়োজন হল ব্যক্তিমানবের মধ্যে বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য এবং প্রয়োজনীয় ছন্দ সৃষ্টির। তবে স্বামীজী-পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা অনেক বেশী মাধুর্যময় এবং পরিধিতে ব্যাপকতর। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হল বেদান্তের ধারণানুসারে মানুষ গড়া অর্থাৎ সমাজক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গতা বা পরম মঙ্গলের উপলব্ধি সম্ভব করা। স্বামীজীর বিশ্বাস ছিল যে, সকলেই এই পরিপূর্ণতায় উপনীত হতে পারে।

কেউ কেউ হয়তো তাঁর এই শিক্ষা-পরিকল্পনার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। আবার কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, বর্তমান দিনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী-নির্দেশিত প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, গুরুগৃহে বাস সংক্রান্ত নির্দেশের উল্লেখ করা যেতে পারে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী যখন এতই গরীব যে, তাদের পক্ষে খেতখামারের কাজ ফেলে বিদ্যালয়ে যোগদানই সম্ভব নয়, তখন কি করে আশা করা যায় যে, সে গুরুগৃহে বাস করবে, অথবা বর্তমান অবস্থায় আবাসিক বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করবে? পাঠক্রম সম্পর্কেও বলা যায়, এ অতি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা। উপরন্তু এতে শিক্ষার্থীর সমস্ত সময় ব্যয়িত

১৮। ibid., Vol. VI, Seventh Edition (1963), p. 493

হবে। আদর্শ সমাজের পক্ষেই এ ব্যবস্থা করা সম্ভব। অন্যথায়, এ শিক্ষা মাত্র কতিপয়ের জন্য নির্দিষ্ট অভিজাত শিক্ষা হতে বাধ্য।

আসলে কিন্তু স্বামীজী তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা শুরু থেকে বিশ্বজনীনভাবে প্রবর্তনের সুপারিশ করেননি। তাঁর কাছে সংখ্যা বা পরিমাণের বিশেষ গুরুত্ব কখনও ছিল না। তিনি যা চেয়েছিলেন তা হল আগে পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক সৃষ্টি করতে, যে শিক্ষক-সম্প্রদায় সম্প্রসারণ-সেবার (extension service) মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সামাজিক শিক্ষার প্রসার সম্ভব করবেন। সুতরাং ভগিনী ক্রিস্টিন যথার্থই উক্তি করেছেন যে, স্বামীজী-পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা হল, নতুন সমাজের জন্য নতুন শিক্ষকগোষ্ঠী সৃষ্টির প্রচেষ্টা মাত্র।[১৯]

মাত্র পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থার পক্ষেই উন্নয়নযাত্রা সম্ভব, এবং এই পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার নির্দিষ্ট স্থান থাকতে বাধ্য। শিক্ষাপদ্ধতিকে যদি কাম্য রূপদান করা যায়, তবে তীর্থযাত্রাপথে সকল প্রতিবন্ধক অপসারিত হতে বাধ্য। স্বামীজীর আশা ছিল, একবার আন্দোলনের সূচনা করা সম্ভব হলে তার পরবর্তী পর্যায়সমূহের কাজ আপনা থেকেই সম্পাদিত হবে। এ হল আদর্শের উদ্ভবে বিশ্বাস। সুতরাং একে অন্যতম উদ্ভবতত্ত্ব (emergent theory) বলেও আখ্যা দেওয়া যায়। এর মধ্যে যদি কিছু ইচ্ছাপূরণ বা অলীকতার উপাদান থেকে থাকে, তবে প্লেটো থেকে মার্কস—সকল আদর্শবাদীর মধ্যেই এই 'ত্রুটি' লক্ষ্য করা যাবে।

১৯। Reminiscences of Swami Vivekananda—His Eastern and Western Admirers, Advaita Ashrama, Calcutta, 1961, p. 223

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য

॥ ১ ॥

১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শনে' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন ঃ 'রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন ; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।'[১]

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যে রচিত করাঙ্গুলি-গণনীয় পাঁচখানি পুস্তিকা ('বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক', 'পত্রাবলী'র কিছু চিঠি) সম্বন্ধেও সক্ষোভে অনুরূপ মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। স্বামীজী বিশ্ববাসীর কাছে অতন্দ্র কর্মযোগী বলে পরিচিত। বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্মৈষণাকে জড়জীবনের প্রত্যক্ষীভূত প্রত্যয়ে প্রয়োগ করে তিনি আধুনিক বিশ্বের মানবজীবন সম্বন্ধীয় সমস্যাকে বলিষ্ঠ ভৌম সার্থকতার দিকে প্রেরণ করেছেন। আধিমানসিক ও আধিভৌতিক জগৎকে তমোগুণের প্রভাবে পৃথক ভাবে দেখা যায়, আবার রজোগুণের স্পর্শে উভয়ের মধ্যে সৌষম্য ও মৈত্রীযোগ স্থাপন করা যায়। মর্তধরিত্রীর বুকে মানুষের মতো বেঁচে থাকাও যে একপ্রকার জীবনসাধনা, কোটি কোটি নরকঙ্কালের পঞ্জরাস্থির মধ্যেও যে অমৃত-নিঃস্যন্দী প্রাণধারা বহমান—এসব কথা তিনি উনিশ শতকের শেষভাগে ভারতবাসীর কানে কানে বলেছিলেন—কখনও মৃদু আত্মগতভাবে, কখনও-বা বজ্রনির্ঘোষে। তাঁকে অজস্র বক্তৃতা দিতে হয়েছিল প্রধানত ইংরেজি ভাষায়, রচনা করতে হয়েছিল ইংরেজিতে। নিয়মিতভাবে বাংলা অনুশীলনের তাঁর সময় ছিল না ; শুধু প্রয়োজনের জন্য শিষ্য-গুরুভ্রাতাদের প্রতি উপদেশ-নির্দেশ, চিঠিপত্রাদি, বিদেশী সভ্যতা সম্পর্কে কিছু আলাপ-আলোচনা, অল্প-স্বল্প ডায়েরী রক্ষা—ইত্যাদি কর্মে তিনি যৎসামান্য বাংলা ভাষার সাহায্য নিয়েছেন। বাঙালী বিবেকানন্দের যে বাংলা গ্রন্থগুলি থেকে জীবনের শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পায়, নতুন আলোক লাভ করে, তার অধিকাংশই ইংরেজি রচনা বা ইংরেজিতে প্রদত্ত বক্তৃতার নির্যাস-অনুবাদ—অবশ্য সে অনুবাদ বহুস্থলে মূলের মতো অর্থবহ এবং মূলের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার সূত্রে সম্পৃক্ত। তবে স্বামীজীর বাংলা রচনা পরিমাণে স্বল্প হলেও গুণগত উৎকর্ষে তা ঋজু, কঠিন ও সংযত এবং প্রসন্ন মনের সহাস্য রসোত্তীর্ণতায় বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি বিস্ময়।

যাঁরা ধর্মজগতের অধিবাসী এবং কর্মযোগে নিষণ্ণ, তাঁদের মূর্ত ও অমূর্ত চেতনা নিজ নিজ ধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করেই রূপকল্প নির্মাণ করে। অর্থাৎ শিল্প, সৌন্দর্য, জ্ঞানভূয়িষ্ঠ মনন, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ—সবকিছুই তাঁদের কাছে একটা

১। বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৩৮৭, পৃঃ ৩৩১

বিশেষ অবধারণার সহায়ক; ইন্দ্রিয়াতীত পরাচেতনাই তাঁদের ইন্দ্রিয়জ অপরাচেতনার নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। এঁরা সঙ্গীতবিদ্যায় উত্তরস্নাতক হতে পারেন, শিল্প ও রূপবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ হতে পারেন, ভাষা ও সাহিত্যেও পারঙ্গমত্ব অর্জন করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের ভৌম চেতনালব্ধ শিল্প-প্রত্যয়গুলি যুধিষ্ঠিরের রথের মতো ভূমিচারিতার একটু ঊর্ধ্বলোক দিয়ে গতায়াত করে। কিন্তু বিবেকানন্দের বাংলা রচনা কর্ণের রথের মতো মন ও প্রাণের মাটি বিদীর্ণ করে অগ্রসর হয়েছে।

বাংলাদেশ একাধারে নব্যন্যায়ের দেশ, চৈতন্যপ্রবর্তিত উজ্জ্বল রসসাধনা ও শাক্ত পদকারদের বাৎসল্য রসসাধনার দেশ। আবেগের নির্বাধ উৎসার এবং মননের তীক্ষ্ণ তির্যকতা এদেশেই সম্ভব হয়েছে। তবে একথা স্বীকার্য যে, মধ্যযুগে আবেগধর্ম ও গণধর্মে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। আবেগের মধ্যেই এলোমেলো জনারণ্যের শাখাবিস্তার লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু আন্বীক্ষিকীবিদ্যা পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের মেলবন্ধনে বদ্ধ বলে একটা বিশেষ শ্রেণীর স্বল্পসংখ্যক মস্তিষ্কজীবী মহলেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিককালে পাশ্চাত্য জীবন, সাধনা ও ইতিহাসের প্রভাবে যেমন একদিকে সমাজ, রাজনীতি ও মানবধর্মী উপযোগবাদের প্রতি শিক্ষিত জন আকৃষ্ট হয়েছেন, আবেগোন্মত্ত কণ্ঠে নব-মেসায়ার (Messiah) পথ চেয়ে ভাবী 'সাহস্রিকী'র নান্দীপাঠ করেছেন—তেমনি পাশ্চাত্য ন্যায় ও যুক্তিবাদের নিরিখে মননের নতুন স্বরূপ নির্ধারণেও তাঁরা প্রস্তুত হয়েছেন। উনিশ শতকী ইউরোপের কাছ থেকে পাওয়া বুদ্ধিবাদ আমাদের পূর্বসংস্কারকেই যেন খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দিল। রামমোহন থেকে অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম থেকে বিবেকানন্দ—এঁদের হাতে বাংলা গদ্য নিশিত অসিধারে পরিণত হল। গদ্য ভাষা যে কী প্রচণ্ড শক্তি ধরে, জাতির মনের আকার আয়তন বিলকুল পালটে দিতে পারে, তা উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত বাংলা প্রবন্ধ-নিবন্ধের পরিচয় নিলেই মোটামুটি বোধগম্য হবে। যাকে শিল্পলক্ষণ বলে, তখনও হয়তো বাংলা গদ্যে তার যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়েনি, কিন্তু সমাজ ও জীবনের সঙ্গেই যে বাঙ্ময় সত্তার নাড়ীর যোগ, এবং সে বাক্‌পুঞ্জ মূলত গদ্যাশ্রয়ী ও মননধর্মী—উনিশ শতকের শেষ ভাগে সে-সম্বন্ধে আর কারও সন্দেহ রইল না। বস্তুত বাংলা গদ্য অন্ধই হোক, আর খঞ্জই হোক—গত শতকের শেষের দিকে এরই সাহায্যে বাঙালীর চিন্তা ও কর্মপ্রেরণা গতিবেগ লাভ করেছে, মূর্ত হয়েছে।

বিবেকানন্দ উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে কিছু কিছু চিঠিপত্র ও দু-চারটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। অবশ্য তখন বাংলা গদ্যের ব্যবহারিক ও শিল্পরূপ গড়ে উঠেছে, অনেকেই গদ্যে সপ্রশংস শিল্পকর্ম নির্বাহ করতে উৎসুক হয়েছিলেন। কিন্তু সাহিত্যরচনা, শিল্পসৃষ্টি বা নিজের মনোমুকুরতলে প্রতিফলিত নিজেরই মুখচ্ছবির সহস্র প্রতিরূপ দেখবার কোন বাসনাই স্বামীজীর ছিল না। নিষ্কিঞ্চন পরিব্রাজক, সুকঠোর কর্মযোগী, ভাবোন্মাদ আদর্শবাদী, অকৃপণ মানবপ্রেমী বিবেকানন্দ মৃত্তিকার মানুষকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভালবেসেছিলেন। পুঁথিবন্দী আপ্তবাক্য নয়, জীবন্ত মানুষের কথা এত গভীরভাবে কজন মানবপ্রেমী ভেবেছেন জানি না। বিবেকানন্দের গদ্য রচনার সবটুকু এই নরদেবতাকে উৎসর্গীকৃত। এদেশে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর কাম্য। তাঁর

বাংলা রচনায় তাই নানা জ্ঞানবিজ্ঞান ইতিহাসের ভূরি সমারোহ যেমন আছে, তেমনি আছে এদেশের মানুষের প্রতি অমেয় ভালবাসা, জীবনের প্রতি একটা সরস নিঃস্পৃহ কৌতূহল। তাঁর রচনারীতি বিশ্লেষণ করলে এই দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

॥ ২ ॥

বাংলা গদ্যরীতি আলোচনা প্রসঙ্গে একথা স্বতঃই মনে জাগে যে, এ রীতি মিশনারী সম্প্রদায়ের দানে গড়ে ওঠেনি, টুলোপণ্ডিতের অনুস্বর-বিসর্গ-বর্জিত দেবভাষার ছত্রছায়াতলে এ গদ্য বিবর্ধিত হয়নি। প্রাচীন ও মধ্য যুগে বাংলা সাহিত্য প্রধানত পয়ার-ত্রিপদী বাহনে অগ্রচারী হয়েছে, এই পয়ারজাতীয় ছন্দকেই স্বচ্ছন্দে সাধু গদ্যরীতিতে পরিবর্তিত করা যায়; তাই পয়ারের দ্বারাই মধ্যযুগের যে-কোন মননকর্ম নির্বাহ হত। পয়ারের মধ্যে একটা বিপুল শোষকশক্তি আছে, যে-কোন অর্থবহ মনন-প্রবাহকে চৌদ্দমাত্রার পয়ার-পঙ্ক্তির মধ্যে পরিস্থাপনা করা যায়—তা সে মঙ্গলকাব্যের গদ্যাত্মক বিবৃতিই হোক, আর কবিরাজ গোস্বামীর দার্শনিক রচনাই হোক। অবশ্য দৈনন্দিন প্রয়োজনে গদ্যরীতির ব্যবহার সেযুগে যে দুষ্প্রাপ্য ছিল তা নয়। তবে বৃহৎ সাহিত্যকর্মে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতি বড় একটা ব্যবহার করা হত না; কারণ পয়ারের দ্বারাই গদ্যাত্মক কাজ অক্লেশে নির্বাহ হত। উনিশ শতকের বাঙালী বাংলা গদ্যের মধ্যে নিজেকেই আবিষ্কার করেছে; আবিষ্কার করেছে যে, চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজের ভাষাকেই সহজে ও সার্থকভাবে আবেগ ও মননের ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়। এ আবিষ্কার মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর আবিষ্কারের চেয়েও বিপ্লবী। বস্তুত গোটা উনিশ শতকের বাঙালী-মানস যে আধুনিক হয়েছে, জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পেরেছে, এর মূল দায়িত্ব বাংলা গদ্যের।

আকণ্ঠ কর্মমগ্ন স্বামী বিবেকানন্দকেও বাংলা গদ্যে কিছু কিছু রচনা করতে হয়েছিল প্রয়োজনের তাড়নায়। সাহিত্যসৃষ্টি এ রচনার উদ্দেশ্য নয়, শুধু নিজের মনের কথা ও চিন্তাকে শিষ্য ও গুরুভাইদের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি মাত্র চারখানি বাংলা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন—'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। এছাড়াও 'পত্রাবলী'তে তাঁর কিছু কিছু বাংলা চিঠি ছাপা হয়েছে। বাংলা চলিতরীতিকে তিনি যে একটা বিপুল বেগ ও বিস্ময়কর প্রাণশক্তি দান করেছিলেন, তা বিশেষজ্ঞগণ জানেন। কিন্তু সাধুরীতিকেও তিনি যে ধ্বনিগম্ভীর চিন্তাঋদ্ধ ক্লাসিকধর্মী রূপ দিয়েছেন, তা তাঁর 'বর্তমান ভারত'-এর ভাষারীতি আলোচনা করলেই দেখা যাবে।

'বর্তমান ভারত'-এ স্বামীজী ভারতীয় সমাজ ও ঐতিহ্য-জীবনের পূর্বাপর ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বৃহৎ মানবচেতনার জড়ত্বের কারণ এবং তামসিক অনীহার গূঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাচীন ভারতের পুরোহিত-রাজন্য-বৈশ্য শাসিত সমাজের মূক জনারণ্যে মানসপরিক্রমা করেছেন, এবং অধীতবিদ্য সমাজতাত্ত্বিকের নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের মধ্যে সেতু আবিষ্কার করেছেন। ফলে তাঁকে পুনঃ পুনঃ অতীত ভারতের জীবনের অন্তস্তলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এই প্রাচীন জাতির

উত্থান পতন, উদ্গতি ও অধোগতির কারণ বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বিশুদ্ধ সাধুভাষার সাহায্য নিয়েছেন। তিনি যে ক্লাসিক গদ্যরীতি চমৎকার আয়ত্ত করেছিলেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা থেকেই তা বোঝা যাবে।

এর ভাষারীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এতে দু-ধরনের বাক্‌রীতি অনুসরণ করেছেন। একটি—তৎসম শব্দবহুল, সমাসসন্ধিসমাকীর্ণ, দীর্ঘ বিলম্বিত ছাঁদের বাক্যপরম্পরা ; আর একটি—খণ্ড খণ্ড উপবাক্যের সমন্বয়ে গঠিত সহজ হাল্কা বাক্‌রীতি। দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক ঃ

'সৈন্যসহায়, মহাবীর, শস্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল—সিংহের সম্মুখে অজাযূথের ন্যায়, নিঃশব্দে আজ্ঞা বহন করে, তাহাও দেখিয়াছে ; কিন্তু যে বৈশ্যকুল—রাজগণের কথা দূরে থাকুক, রাজকুটুম্বগণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী হইয়াও সর্বদা বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত—মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্য একত্রিত হইয়া ব্যাপার-অনুরোধে নদী সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চিরপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান রাজগণকে আপনাদের ক্রীড়া-পুত্তলিকা করিয়া ফেলিবে, শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্যগণকেও অর্থবলে আপনাদের ভৃত্যত্ব স্বীকার করাইয়া তাঁহাদের শৌর্যবীর্য ও বিদ্যাবলকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে...।'[২]

'স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব।'[৩]

'বর্তমান ভারত'-এর এ দুটি দৃষ্টান্তই সাধুরীতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু একটির সঙ্গে অপরটির রীতিগত পার্থক্য সহজেই চোখে পড়বে। প্রথমটিতে দীর্ঘবিস্তারী বাক্‌রীতি, গুরুভার শব্দসংযোজনা এবং অনেকগুলি উপবাক্যের সন্নিবেশে এ রচনাটি হয়েছে মন্থর। অপরদিকে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের বাক্যসজ্জা লঘু, উপবাক্যের সংখ্যা ন্যূনতম। এর কারণ—প্রথমটিতে বিরাট ইতিহাসের পটভূমিকায় সমাজবিবর্তনের চিত্র স্থান পেয়েছে। ফলে স্থান-কালের বিশালতা বাক্যগঠনকেও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও জটিল করে তুলেছে। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে বুদ্ধিগ্রাহ্য মন্তব্যগুলি ছোট ছোট বাক্যে এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে, চিন্তার মধ্যে সহজ চলমানতা লক্ষ্য করা যাবে। প্রথমটিতে বাক্যধারা যেন অবারিত বেগে এবং দ্বিতীয়টিতে উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে মৃদু উল্লম্ফনে বয়ে চলেছে। প্রথমটিতে স্বামী বিবেকানন্দের বাগ্মিতার প্রকাশ—সম্মুখে সহস্র মানুষের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি। দ্বিতীয়টিতে শিষ্য ও গুরুভাইদের সামনে নরেন্দ্রনাথের মৃদু ভাষণ, যার মূল লক্ষ্য শ্রোতার বুদ্ধিকে দীপিত করা।

কখনও কখনও বীর সন্ন্যাসী প্রচণ্ড আবেগে আবিষ্ট হয়ে মত্ত সিংহগর্জনে বলে উঠেছেন ঃ 'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই! বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল

২। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ২২৮-২৯ ৩। তদেব, পৃঃ ২৪৩

ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" '[৪]

এই অগ্নিস্রাবী বাক্‌পুঞ্জ কখনও প্রচণ্ড বিস্ফোরণে স্তনিত হয়, কখনও ঋক্‌মন্ত্রের মতো কানে বাজতে থাকে, কখনও ফরাসী বিপ্লবের 'Egalite liberte fraternite'-এর অশনিনির্ঘোষ প্রতি ছত্রে ধ্বনিত হয়। ভাষা বাঙ্ময় হলেও আসলে তা হৃৎস্পন্দন ছাড়া কিছু নয়, তা স্পষ্ট হয় এটুকু অনুধাবন করলে। এ রচনা একটা দিব্য মুহূর্তের সৃষ্টি, আবিষ্ট মনের আত্মপ্রকাশ, সর্বতন্ময়ীভূত সম্বিতের বিদ্যুৎপ্রবাহ—যা শ্রোতার অন্তরকে শুধু স্পর্শ করে না, সমগ্র মনঃপ্রকৃতিকেই পরম আশ্বাসে ভরে তোলে। চেতনার আবরণভঙ্গ এর ফলশ্রুতি।

স্বামীজীর সাধুভাষা প্রয়োগ প্রসঙ্গে এ মন্তব্য অযৌক্তিক নয় যে, যে-ক্লাসিক গদ্যরীতি, বাক্যগঠন, শব্দসংযোজন প্রভৃতি বাক্‌পদ্ধতি মননধর্মী রচনাকে বহু মনের চিন্তার বাহন করে তুলতে পারে, তার অনেক দৃষ্টান্ত 'বর্তমান ভারত' ও 'ভাববার কথা'য় পাওয়া যাবে। অতিশয় গুরুগম্ভীর সমাস-সংবদ্ধ অথচ পরিচ্ছন্ন চিন্তার বাহন, তাঁর সাধুভাষায় প্রায়শই এই লক্ষণটি ফুটে উঠেছে। বস্তুত তাঁর সাধুভাষার অনেক জায়গায় চলিতরীতি-ইডিয়মেরও প্রভাব দেখা যায়। কোন কোন সময় তাঁর আবিষ্ট মুহূর্তের রচনায় একটা দুর্লভ ভাবগত মহিমা ফুটে ওঠেঃ 'কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; আমরা কেবল বলি—হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান কর!'[৫]

এই কয় ছত্র যেন আরণ্যক যুগের আর্যবাণী, কোন্ অলক্ষ্য থেকে আমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে।

॥ ৩ ॥

স্বামীজী-অবলম্বিত যে রীতিটি বিস্মিত প্রশংসা আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে চলিতভাষা। এই চলিতভাষাতেই তাঁর অদ্ভুত দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', কিছু চিঠি এবং 'ভাববার কথা'য় সংকলিত দু-একটা বিচ্ছিন্ন নিবন্ধ—এই কয়টি মাত্র তাঁর চলিত গদ্যরীতির রচনা। কিন্তু সামান্য রচনাতেই তাঁর যথার্থ পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বাংলা গদ্যের চলিতরীতি আসলে নাগরিক জীবনের বাণীবাহক। সাধুরীতিটি অধিকতর পুরাতন, তা স্বীকার করতে হবে। তিন-চারশ বছর আগেকার চিঠিপত্র

৪। তদেব, পৃঃ ২৪৯ ৫। তদেব, পৃঃ ৩৪

দলিল-দস্তাবেজে সাধুরীতিই ব্যবহৃত হত ; অবশ্য কাব্য ও গীতিকায় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবও দুর্লক্ষ্য ছিল না। যাঁরা মনে করেন যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুনশীর দল আর সপারিষদ্ কেরী সাহেব বাংলা সাধুভাষা সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা ঠিক কথা বলেন না। সাধুভাষা কৃত্রিম ভাষা নয়, ভূঁইফোড়ও নয়। বাঙালীর আঞ্চলিক ভাষাভেদ সত্ত্বেও সাধুভাষাই দীর্ঘকাল ধরে সমগ্র বাঙালী-মানসকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটা নাগরিক বৈশ্যসভ্যতার পত্তন হল, বিভিন্ন অঞ্চলের বিদগ্ধ ও উচ্চাশীমণ্ডলী—যাঁরা কলকাতা বা তার চারপাশে ঘোরাফেরা করতেন নানা স্বার্থসন্ধানে, তাঁদের দ্বারা কলকাতার ভদ্রজনের কথিত ভাষা আভিজাত্যকামী গ্রামীণ সম্পন্ন পরিবারে অল্পবিস্তর প্রবেশ করেছিল ; যাই হোক, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সাহিত্যে সঙ্কুচিতভাবে কলকাতার চলিতভাষার সাধ্বস প্রবেশ ঘটল। রঙ্গরস, সাময়িক পত্রে 'আর্যাতর্জা', ঠন্ঠনের 'হঠাৎ অবতার'গণের* মর্কটলীলা প্রভৃতি বর্ণিত হতে লাগল কলকাতার কক্নি ভাষায়। নাটকে ভদ্রেতর ব্যক্তির সংলাপেও কলকাতার বৈঠকী ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছিল, উপন্যাস-রমন্যাসেও কলকাতার ভদ্রসমাজের চলিতভাষার অনুপ্রবেশ ঘটল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' প্রকাশ করলেন পুরোপুরি উত্তর কলকাতার কক্নি বুলিতে—মায় ক্রিয়াপদ সর্বনামগুলিও চলিতরীতির বিকৃত উচ্চারণের মতো ছাপা হল। প্যারীচাঁদ মিত্র হাল্কা চালের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, আঞ্চলিক ভাষার সাহায্য নিয়েছিলেন, কলকাতায় ব্যবহৃত সর্বনাম ক্রিয়াপদও ব্যবহার করেছিলেন—কিন্তু পুরোপুরি চলিতভাষায় তিনি কোন গ্রন্থ লেখেননি, তাঁর রচনার বহু স্থলেই সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের গোলমাল থেকে গেছে। ভাষার এ-ব্যাধিটি উনিশ শতক ধরেই বর্তমান ছিল, রবীন্দ্রনাথের আগে অপরিহার্য বলে সকলেই মেনে নিয়েছিলেন—অনেকটা দুধ ও জলের সংমিশ্রণের মতো। মধুসূদন প্যারীচাঁদের ভাষাকে মেছুনীদের ভাষা বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। এর কারণ প্যারীচাঁদ উপন্যাস ও কাহিনীর প্রত্যেক উক্তিতে সাধারণ লোকের মুখের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি চলিতভাষার সাহায্য নেননি। হুতোম (কালীপ্রসন্ন) রঙ্গব্যঙ্গের জন্যই কলকাতা কক্নির সাহায্য নিয়েছিলেন ; খুব গভীরতা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন হুতোমি জ্যাঠামি ছেড়ে ক্লাসিক সাধুরীতির শরণ নিয়েছিলেন। তাঁর ভাষার মধ্যে কলকাতার পথচারীদের অমসৃণ উক্তি, এমনকি বিকৃত রুচির অশ্লীল শব্দও স্থান পেয়েছে। এ ভাষায় প্রাক্-যৌবনের চাঞ্চল্যই বেশী ; কিন্তু সর্বকর্মে চলিতভাষা প্রয়োগ করতে হবে, একথা বিবেকানন্দের পূর্বে কোন বাঙালী সাহিত্যিক বলেননি। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি 'Calcutta Review' পত্রে বিশুদ্ধ চলিতভাষার পক্ষ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন ; সাধুভাষা, বিশেষত তৎসম শব্দের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতামত উগ্র ছিল বলে সরল ভাষার পক্ষপাতী বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর তৎসম শব্দের প্রতি অযৌক্তিক বীতরাগ সমর্থন করেননি। অবশ্য

*'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' দ্রষ্টব্য।

শ্যামাচরণ বৈয়াকরণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই সর্বকর্মে তদ্ভব বা দেশজ শব্দের ব্যবহার অনুমোদন করেছিলেন। 'সবুজপত্র'-এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথও সর্বকর্মে চলিতভাষা প্রয়োগে উদারহস্ত হতে পারেননি। প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র'-এর মারফতে চলিতভাষার পক্ষ অবলম্বন করেন এবং নিজেও কলকাতার চলিতভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেন। ইদানীং কেউ কেউ তাঁকে চলিতভাষা ব্যবহারের একমাত্র পুরোযায়ী বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে চলিতভাষা ব্যবহারের গৌরব সর্বাগ্রে বিবেকানন্দের প্রাপ্য।

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় চলিতভাষার বৈয়াকরণ ও ব্যবহারিক যৌক্তিকতা আলোচনা করেছিলেন, হুতোম ব্যঙ্গবিদ্রূপে রসান চড়াবার জন্য কলকাতার বুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু যে-কোন চিন্তার ব্যাপার, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, তত্ত্বালোচনা—সমস্তই চলিতভাষায় চলবে—একথা স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, এবং নিজেও চলিতভাষা ব্যবহারে যেমন অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমনি নিজস্ব একটা ভাষারীতিও গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর চলিতভাষার অনেকস্থলে তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হলেও, যে ভাষায় আমরা কথা বলি, আলাপ-আলোচনা করি—সেই ভাষাই মনের ধাত্রী, এরকম একটা স্পষ্ট ধারণা তাঁর ছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর একটি লেখায় তাঁর মনের ভাব চমৎকার ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন ঃ 'চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও-একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর?...স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না...।'[৬]

তাই তিনি প্রস্তাব করলেন ঃ 'যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।'[৭] একথাটাই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন আরও এক দশক পরে।

স্বামীজী বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের হুবহু অনুকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখালেন ঃ '...যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধূম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে—"রাজা আসীৎ" !!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও সব মড়ার লক্ষণ! যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এইসব চিহ্ন উদয় হল।...দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই।'[৮]

বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'তে বিশুদ্ধ মুখের বুলি ব্যবহার করেছেন, এমনকি সংলাপের ধরনধারণ, রীতিনীতি ও মুদ্রাদোষগুলিও তিনি পরিত্যাগ

৬। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫ ৭। তদেব, পৃঃ ৩৬ ৮। তদেব, পৃঃ ৩৬-৭

করেননি। তাঁর চলিতরীতি অত্যন্ত জীবন্ত ; প্রাণবান জীবনরসিক নিঃস্পৃহ বৈরাগীর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে বলে তাঁর ভাষা অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব লাভ করেছে। হুতোমের স্ল্যাং বাক্‌রীতি বা পৌগণ্ডোচিত ধৃষ্টতা স্বামীজীর চলিতরীতিতে নেই, অথচ খোলামেলা বৈঠকী রসিকতার প্রাচুর্য তাঁর গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চলের অন্তরালে অবস্থিত সদাহাস্যময় মনটাকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে। বীরবলের বুদ্ধির মারপ্যাঁচ ও কৃত্রিম কলাকৌশলও তাঁর ভাষায় স্থান পায়নি—যদিও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'পরিব্রাজক'-এ দর্শন-ইতিহাস-সমাজ সম্বন্ধে বহু মননশীল আলোচনা আছে। যথার্থ বলতে গেলে হুতোম বা বীরবল—কারও ভাষাই প্রকৃত সাহিত্যিক চলিতভাষা নয়। হুতোমের ভাষা এতটা চলিত, ঘরোয়া ও বেআবরু যে, তাঁর ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রসন্ন মন্তব্য খানিকটা স্বীকার করে নিতে হয়। হুতোমের ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য ঃ 'হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই ; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই ; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য।'[৯] প্রমথ চৌধুরীর ভাষা কৃত্রিম ও ড্রয়িংরুমবিলাসী এবং ইচ্ছাকৃত বৈদগ্ধপূর্ণ। হুতোমের ভাষা একেবারে পথের ভাষা, বীরবলের ভাষা বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্রম্ভালাপের বাঙ্ময় পায়চারি। এর কোনটাই যথার্থ চলিতভাষা নয়, স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-এর গদ্যই চলিতভাষার আদর্শ। 'পরিব্রাজক'-এর ভাষাও চলিত, চিত্তাকর্ষী ; তবে চিঠির ভাষা বলে এতে ব্যক্তিগত ঘরোয়া ঢঙটা বেশী ফুটেছে।

বিবেকানন্দের চলিত গদ্যরীতি যে বিচিত্রমুখী—অনেকটা সহস্রমুখী বজ্রমাণিকের মতো, তা বোঝা যাবে তাঁর উল্লিখিত দুখানি পুস্তিকা থেকে। যে ভাষায় আমরা আলাপ করি, চিন্তা করি, সিদ্ধান্তে পৌঁছাই—সেই সহজ প্রত্যক্ষ সর্বজনবোধ্য চলিত গদ্যরীতির পক্ষ সমর্থন করে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, নিজেও পত্র ও অন্যান্য রচনায় সাধ্যমতো এই রীতি ব্যবহার করেছেন। এই রীতিটির বৈশিষ্ট্য—শব্দযোজনায় তৎসম শব্দের স্বল্প ব্যবহার, বাক্যগঠন হ্রস্ব, ঢঙটা সংলাপের মতো। যেমন ঃ 'আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১,০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে ? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে তো ইদিক উদিক ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এইমাত্র। সে নদী যেমন করে হোক সমুদ্রে যাবেই দু-দিন আগে বা পরে, দুটো ভালো জায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় দু-একবার আঁস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশ-হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই তো নয়।'[১০]

এখানে লক্ষ্য করতে হবে, এর ভাষাভঙ্গিমা বাধাহীন স্বচ্ছ, অনাবশ্যক তৎসম শব্দের প্রয়োগ নেই, লেখক চলিতভাষার মুদ্রাদোষগুলিও ('ইদিক উদিক') নিয়েছেন ; তাই বলে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তিনি তৎসম শব্দের প্রতি অকারণে খড়্গহস্ত হননি। এর সঙ্গে বীরবলের রচনার যে-কোন অংশ মিলিয়ে পড়লেই 'কৃষ্ণনাগরিক' প্রমথ চৌধুরীর বৈঠকীভাষার কৃত্রিমতা সহজেই ধরা পড়বে। যখন প্রমথ চৌধুরী বলেন,

---

৯। বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩ ১০। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬০-৬১

'প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিংবা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম। পুরুষের মন প্রকৃতি-নর্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়!'[১১]—তখন এ ভাষার চাকচিক্যে মুগ্ধ হলেও বার বার মনে হয় যে, এ দরবারী ভাষা এবং তা খাস-দরবারের অন্তর্ভুক্ত। 'যাঁর চোখ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্যের দর্শনলাভের জন্য শিবনেত্র হন; এবং যাঁর মন নেই, তিনিই মনস্বিতালাভের জন্য অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন।'[১২]—বীরবলের এ-সমস্ত উইটের ফুলঝুরি মার্জিত রুচির তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম—কিন্তু এ ভাষা মোজেয়িকের মতো চিত্রবিচিত্র, ঝরনার মতো ঝরঝরে নয়! স্বামীজীর ভাষা মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের জন্য নয়, বারোয়ারীতলায় ইতরভদ্রের জন্যই তাঁর ভাষাপ্রবাহে রয়েছে স্নানপানের উদার আহ্বান।

অতঃপর স্বামীজীর বিবৃতিমূলক পরিচ্ছন্ন গদ্যরীতির আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে: 'এবার ভূমধ্যসাগর। ভারতবর্ষের বাহিরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নেই—এসিয়া, আফ্রিকা—প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। একজাতীয় রীতিনীতি খাওয়া-দাওয়া শেষ হল, আর একপ্রকার আকৃতি-প্রকৃতি, আহার-বিহার, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার আরম্ভ হল—ইউরোপ এল। শুধু তাই নয়—নানা বর্ণ, জাতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও আচারের বহু শতাব্দীব্যাপী যে মহা-সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এইখানে।'[১৩]

এখানে লেখক দুই সভ্যতার মিলনতীর্থকে নিঃস্পৃহ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাই এতে ঘটনাবিবৃতি ছাড়া আর কোন সাহিত্যিক কৌশল নেই। কিন্তু সাদাসিধে বর্ণনাই বিচিত্র রূপময় হয়ে ওঠে যখন আবেগের ছোঁয়া লাগে, তখন সন্ন্যাসী পরিব্রাজকের কণ্ঠে কল্পনার খেলা শুরু হয়ে যায়: 'জাহাজ একবার সাদা জলের, একবার কালো জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশেপাশে খালি নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে ছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহা গর্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে!'[১৪]

এ বর্ণনায় তৎসম শব্দঝঙ্কারের প্রয়োজন ছিল। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রোল্লাসের রূপধ্বনিময় চিত্রাঙ্কন শুধু তদ্ভব বা দেশজ শব্দেই সার্থক হতে পারে না; তাই তিনি চলিতভাষার পক্ষপাতী হয়েও প্রয়োজনস্থলে অনেক আভাঙা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেননি। যেমন ধরা যাক এই দৃষ্টান্তটি: 'সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষি-মনঃসঙ্ঘর্ষ-সমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখত!—তারও শেষ।'[১৫] এখানে শুধু একটি-দুটি অসমাপিকা আর একটি সমাপিকা ক্রিয়া ভিন্ন আর সমস্ত শব্দই তৎসম,

---

১১। প্রবন্ধসংগ্রহ—প্রমথ চৌধুরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ২১

১২। তদেব, পৃঃ ২৪ ১৩। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০৭-০৮

১৪। তদেব, পৃঃ ৬৫ ১৫। তদেব, পৃঃ ১২৫

কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষণ ও বিশেষ্য মণিকাঞ্চনের মতো দৃঢ়নিষণ্ণ, এবং বিশিষ্ট ভাবপ্রকাশের সম্পূর্ণ সহায়ক; আবার তিনি যখন স্নিগ্ধ মধুর বর্ণনায় লেখনী চালনা করেন, তখন আর এক প্রকার কোমল পেলব পরিচিত ও প্রসন্ন তদ্ভব দেশী শব্দের সাহায্য গ্রহণ করেন। যেমনঃ 'জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময় মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্চে, রাশি রাশি তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ—এতে কি রূপ নাই?...সে নীল-নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশানো—ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আঁব-নিচু-জাম-কাঁঠাল—পাতাই পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে, দুলছে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দি ইরানী তুর্কিস্থানি গালচে-দুলচে কোথাও হার মেনে যায়! সেই ঘাস, যত দূর চাও—সেই শ্যাম-শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক করে রেখেছে...।'[১৬]

এর মধ্যে বাংলাদেশের শ্যামায়মান অরণ্যানী, পীত রৌদ্রস্নাত ধানক্ষেত আর নীলাম্বরী আকাশ যেন রঙের বাটিটি উপুড় করে দিয়েছে। স্বভাবোক্তির সঙ্গে উৎপ্রেক্ষার, চোখে দেখা রূপের সঙ্গে মনের কথার আশ্চর্য সমন্বয় বাংলাদেশের কোন্ গদ্যশিল্পীর রচনায় এর চেয়ে সার্থক, প্রাণবন্ত, বর্ণধ্বনিময় হতে পেরেছে? অথচ এ বর্ণনায় স্বামীজী কৃত্রিম কাব্যকলার মায়াঞ্জন একেবারেই ব্যবহার করেননি। চিঠিতে সমুদ্রের বর্ণনা দেবার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে, কাব্যরসসিক্ত বর্ণনা তাঁর ধাতে সয় না—'ফলকথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে এখন খপ করে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথা পাই বল।'[১৭] কিন্তু বর্ণনধর্মী রচনায় স্বভাবোক্তি অনুসরণ করেও তিনি যে নিপুণ শিল্পসৃষ্টি করতে পেরেছেন, তার প্রমাণ এই ছত্র কয়টি—যদিও বাক্‌রীতি বিলম্বিত, উপবাক্যের সমন্বয়ে একটু দীর্ঘ, তবু এর ভঙ্গিমায় শব্দের টঙ্কার ও ঝঙ্কার মিশে গেছে প্রতিদিনের পরিচিত বিবর্ণদৃশ্য বর্ণনার সঙ্গে, এবং সেটা বেমানান হয়নি, কারণ এতে প্রচ্ছন্নভাবে কৌতুকের সুর মেশানো আছে।

'কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গ-তরঙ্গভঙ্গ-কল্লোলশালী কত বারিনিধি দেখলুম, শুনলুম, ডিঙুলুম, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রামঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে—কিংবা পানের পিক-বিচিত্রিত দ্যালে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে—আঁব-কাঠের তক্তায় বসে, খেলো হুঁকো টানতে টানতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে—হুবহু ছবিগুলি—চিত্রিত করে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, সেদিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা।'[১৮]

১৬। তদেব, পৃঃ ৬৩-৪ ১৭। তদেব, পৃঃ ৬০ ১৮। তদেব

স্বামীজীর বিবৃতিধর্মী চলিত গদ্যে কখনও লক্ষ্য করা যাবে তাত্ত্বিক ও তথ্যগত বিবৃতি (যেমন 'পরিব্রাজক'-এর ভ্রমণ বর্ণনা ও ধর্ম-দর্শন আলোচনা), কখনও চলিতভাষার মধ্যেই তৎসম শব্দের নির্ঘোষ, কখনও তৎসম-তদ্ভব-দেশজ-বিদেশী শব্দের একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে মিলে মিশে থাকার আশ্চর্য দক্ষতা। একই বর্ণনায় তিনি লিখেছেন ঃ 'সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোনা যায়'[১৯]—আবার তারই সঙ্গে, 'কর্দমাবিলা, হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলকাতার গঙ্গার'[২০] বর্ণনা অবিরোধে স্থান পেয়েছে। কখনও তিনি রূপরঙ্গের নেশায় 'গঙ্গামায়ের শোভা' দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কখনও বা কল্পনা করে শিউরে উঠেছেন—'... পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মতো অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি !!!'[২১]

বিবেকানন্দ বিবৃতি ও বর্ণনাধর্মী চলিত গদ্যরীতির মধ্যে বহুস্থলে সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন, চলিতভাষাতে এরকম গাঢ় বাক্‌পদ্ধতি সৃষ্টি তাঁর একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। ঘনপিনদ্ধ বা সমাসবদ্ধ দৃঢ়গাঁথুনির বাক্‌পুঞ্জের প্রতি তাঁর কোন অকারণ বিরাগ ছিল না, তিনি চলিতভাষার অন্বয়ের মধ্যে তৎসম শব্দঝঙ্কারকে এমন চমৎকার মিশিয়ে দিতে পারতেন যে, ইদানীন্তন কালের কোন দুঃসাহসী লেখকও অতটা অগ্রসর হতে সঙ্কুচিত হবেন। যেমন স্বামীজীর এই বর্ণনা ঃ 'ত্রিংশকোটি মানবপ্রায় জীব—বহুশতাব্দী যাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্মীর পদভরে নিষ্পীড়িত-প্রাণ, দাসসুলভ-পরিশ্রম-সহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীতহীন, ভবিষ্যৎবিহীন, "যেন তেন প্রকারেণ" বর্তমান প্রাণধারণমাত্র-প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচ-চাতুরী-প্রতারণা-সহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন, আশাহীনের সমুচিত কদর্য-বিভীষণ-কুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক-মেরুদণ্ডহীন, পূতিগন্ধপূর্ণ-মাংসখণ্ডব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারতশরীরে পরিব্যাপ্ত— ইংরেজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি।'[২২]

একটিমাত্র বাক্য, সমাসবদ্ধ শব্দের শিকল—যা অনিপুণ কারিগরের হাতে পড়লে জড়ীভূত রোমন্থনে পরিণত হতে পারত, এখানে স্বামীজীর বিচিত্র বয়নকৌশলে সেই ভাষায় ভারতীয়দের বর্তমান জাড্যের প্রতি বলদর্পিত পাশ্চাত্যের ঘৃণাধিক্কার চমৎকার ফুটেছে। এখানে এর চেয়ে হালকা ছাঁদের শব্দ ব্যবহার করলে যথেষ্ট তীব্র হত না; তাই চলিতভাষার মধ্যে তিনি অবলীলাক্রমে দেবভাষার সাহায্য নিয়েছেন; আবার পাশ্চাত্যের প্রতি আমাদের অজ্ঞ মনোভাব কৌতুকঘৃণামিশ্রিত ভাষায় চমৎকার ফুটেছে ঃ 'আমরা দেখি—শৌচ করে না, আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছবিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ—এ-জাতের মধ্যে কি ভালরে বাপু!'[২৩]

আমাদের বক্তব্য হল, চলিতরীতিতে তিনি শুধু তদ্ভব ও দেশী শব্দ ব্যবহার করেননি,

---

১৯। তদেব, পৃঃ ৬১ ২০। তদেব, পৃঃ ৬১-২ ২১। তদেব, পৃঃ ৬৪
২২। তদেব, পৃঃ ১৪৯ ২৩। তদেব, পৃঃ ১৫০

বহুস্থলে প্রায় মুখের কথার প্রচলিত ঢঙটাকেও নিয়েছিলেন। হুতোম টানা গদ্যরচনায় এই নাটকীয় রীতিটি গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতার চড়ক পার্বণ উপলক্ষে হুতোমের রঙ্গরসপূর্ণ তীক্ষ্ণ উক্তিতে নাটকীয়তা বেশ কৌতুকপূর্ণ হয়েছেঃ 'আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেচেন—আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসি উচ্ছুগ্গু করবেন। ...আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদভাঙা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুজতে পারবেন না—আড্ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পাবেন না...।'[২৪] উত্তর কলকাতার পুরানো বাসিন্দাদের ভাষারীতি, যা হুতোম কলমবন্দী করেছিলেন ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচা দেবার জন্য, বিবেকানন্দ সেই মুখের ভাষাকেই বিবৃতিমূলক বর্ণনায় ব্যবহার করেছেন; অবশ্য কোন কোন স্থানে কৌতুকরসের জন্যই তিনি এই মৌখিক সংলাপের ঢঙটা নিয়েছেন। যেমনঃ 'খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর শত কাঁটার ঠকঠকানি দেখে শুনে তুভায়ার তো আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙ্গাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘাঁচ করে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা। বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সি-সিক্‌নেস হয়েছিল কিনা, সে-বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো-পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি-আল্মীকি কত জান; আমাদের "গোঁসাইজী" তো কিছুই বলছেন না।'[২৫] এ ভাষার কৌতুকরসটাকে একেবারে আটপৌরেভাবে পরিবেশন করেছেন, এ ভাষা এখনও ভদ্রাভদ্র সকলেই ব্যবহার করে থাকি। স্বামীজী প্রতিদিনের প্রচলিত মুখের কথাকে কোনও দিন অসম্মান করেননি, চলিত বাংলার নাগরিক ইডিয়ম তাঁর রচনার যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। দু-চারটির দৃষ্টান্তঃ

খ্যাঁদা-বোঁচা ভাইবোন; হ্যাঁকচ-হোঁকচ গরুর গাড়ি; দ্যাল (দেয়াল); বে (বিয়ে); ফুঁ-ফাঁ দিয়ে আগুন দিতে হয়; কায়েত-ফায়েতের বাপ-দাদা করেছে; লাথি-ঝাঁটা; হাত চুবড়ে সপাসপ দাল-ভাত খাই; সোঁদোরবন; যাত্রীরা মাথা ধরে ন্যাকার করে অস্থির; আদুড় গা; জাতের দফা ঘোলা হচ্ছে; ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন হোঁসেন' করেন; মাগ; আদাড়ে; মাগী; বিবি পর্যন্ত বে করা চলে; এঁড়ে-লাগা ছেলে; গো-বেড়েন দিলে; ছুঁৎছাঁতের ন্যাটা (ল্যাঠা); শোরের মাংস; চক্কর; পা ফেটে খালি চৌ-চাকলা; হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে; ভুঁড়ি নাবা বদহজমের প্রথম চিহ্ন; কলের জলের দুশো বাপান্ত করে।*

এখানে খুব বেছে বেছে উদাহরণ তোলা হয়নি, যেমন চোখে পড়েছে তেমনি তাদের সংগ্রহ করা হয়েছে। এ শব্দগুলি অধিকাংশই আমরা ঘরে ব্যবহার করি, বাইরে হয়তো একটু পোশাকী পালিশের সাহায্য নিই। স্বামীজী 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'তে লঘু-রসের কথায় এরূপ শব্দ প্রচুর ব্যবহার করেছেন—এমনকি গম্ভীর

২৪। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা—কালীপ্রসন্ন সিংহ, নতুন সাহিত্য ভবন, কলিকাতা, ১৩৬২, পৃঃ ২২
২৫। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬০ *দ্রষ্টব্যঃ বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬৩-১৭৮

আলোচনাতেও কলমের ডগায় নেমে-আসা প্রাকৃত শব্দকে সরিয়ে দেননি। জীবনে তিনি ছুঁৎমার্গের ঘোরতর শত্রু ছিলেন, ভাষাতেও ছুঁই-ছুঁই বাতিক তাঁর একেবারেই ছিল না। প্রমথ চৌধুরী এরকম খিড়কিদরজার শব্দকে তখনও সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ঢুকতে দিতেন না। ফরাসী বৈদগ্ধে আযৌবনলালিত বীরবল চলতিভাষা ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু তাকে 'মে-ফ্লাওয়ারে'র শাসনে সুভব্য করে তুলেছেন।

॥ ৪ ॥

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ চলিত বাংলা রীতিকে যেরকম চমৎকার রসিকতা ও রঙ্গব্যঙ্গে ব্যবহার করেছেন, সদাগম্ভীর বাঙালী উচ্চ সমাজে তার জুড়ি মেলা ভার। রসিকতা প্রসন্ন মনের ধর্ম, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ক্ষুব্ধ মনের ধর্ম। মাঝে মাঝে স্বামীজী রসিকতা করতে করতে তীব্র বিদ্রূপের ঝাঁঝালো শব্দ নিক্ষেপ করেছেন বটে, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন জীবনরসিক—যে বৈশিষ্ট্যটি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে ছিল। খুব উদার হিউমার অনেক সময় সাধুভাষাতেই যেন বেশী জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বিবেকানন্দের বাংলা রচনার যত্রতত্র চলিতভাষার আশ্চর্য পরিহাস ও তির্যক ব্যঙ্গের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যাবে। 'পরিব্রাজক'-এ সুয়েজখালের হাঙর শিকারের বর্ণনায় হাঙরের প্রতি সম্ভ্রমবাচক সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে সহজ রসিকতাকে তিনি মজলিসী করে তুলেছেন: 'মনে হল, বুঝি উনি হাঙরের বাচ্চা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম—তা নয়, ওঁর নাম বনিটো। পূর্বে ওঁর বিষয় পড়া গেছলো বটে...ওঁর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও শোনা আছে। এখন ওঁর তেজ আর বেগ দেখে খুশি হওয়া গেল।'[২৬]

হাঙর ধরা দেখবার জন্য তাঁরা জাহাজের ডেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন: '...আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে, পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারান্দায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙরের জন্য "সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং" হয়ে রইলাম; এবং যার জন্যে মানুষ ঐ প্রকার ধড়ফড় করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগল—অর্থাৎ "সখি শ্যাম না এলো"।'[২৭]

তারপর কিভাবে হাঙর টোপ গিলে কোনও প্রকারে টোপের বঁড়শি খুলে পালাল, অন্য একটা 'বাঘা' হাঙরের আবির্ভাব হল, শুয়োরের মাংসসমেত বঁড়শি গলাধঃকরণ করল, তারপর 'দে টান, দে টান' করে তাকে জাহাজের ডেকে তোলা হল, স্বামীজী তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। 'সাদা, লাল, জরদা' রঙের বঁড়শিবিদ্ধ শুয়োরের মাংসের রঙিন উপমাটিও grotesque রসের আশ্চর্য উদাহরণ: 'আসল ইংরেজি শুয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রঙ-বেরঙের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে!'[২৮] একেই যথার্থ মজলিসী রসিকতা বলে। তারপর টোপে গাঁথা বিরাট হাঙর ধরা, জাহাজে টেনে তোলা, ফৌজিম্যানের মুমূর্ষু হাঙরের ওপর দুমদুম্ করে কড়িকাঠ প্রহার করে বীরত্ব প্রকাশ করা এবং সর্বোপরি

২৬। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০০ ২৭। তদেব, পৃঃ ১০২ ২৮। তদেব, পৃঃ ১০৩

করুণহৃদয় মহিলাদের শোকার্ত বিলাপ বর্ণনা ('...আর মেয়েরা—"আহা কি নিষ্ঠুর! মেরো না" ইত্যাদি চিৎকার করতে লাগল—অথচ দেখতেও ছাড়বে না।'[২৯]) অনাবিল রসিকতার সার্থক দৃষ্টান্ত। বস্তুত এই জাতীয় রসিকতা এমন একটি প্রসন্ন অথচ নিঃস্পৃহ মনের ধর্ম, যা বৈরাগ্যব্রতীদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু স্বামীজী তো গিরিদরীবাসী মুমুক্ষু সাধকমাত্র ছিলেন না, জগৎ ও জীবনের অন্তস্তলেই তিনি তাঁর আসন পেতেছিলেন; তাই প্রতিদিনের জীবনের অসঙ্গতি, হাস্যপরিহাস তাঁর বিশাল হৃদয়কে সুধারসে সিক্ত করেছিল। তাঁর এই ব্যঙ্গরঙ্গ ও পরিহাস কিরকম অর্থবহ হয়েছে, তা এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবেঃ 'ওহে বাপু, যীশুও আসেননি, জিহোবাও আসেননি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এ-দেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ...ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এদেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? তোমাদের দু-চার জনের জন্য দেশসুদ্ধ লোককে হাড়-জ্বালাতন হতে হবে বুঝি?'[৩০]

এখানে পরিহাস তীব্র ব্যঙ্গের রূপ ধরেছে। আর্যামির অভিমান আর সমাজের নিম্নবর্ণের প্রতি ঘৃণা, স্বামীজীকে রুদ্ররোষে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে বার বার। উচ্চবর্ণের প্রতি তাঁর ধিক্কারবাণী এখনও অর্ধশতাব্দীর ওপার থেকে ভেসে আসছেঃ 'আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর; আর যতই কেন তোমরা "ডম্‌ম্‌ম্‌"* বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!!'[৩১] এই অতীতজীবী আভিজাত্যকে বিদ্রূপ করে তিনি ধারালো কণ্ঠে বলেছেনঃ 'এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূত কাল—লুঙ্‌ লঙ্‌ লিট্‌ সব একসঙ্গে। বর্তমানকালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন!'[৩২] বলতে বলতে তিনি ভারতের হীন অন্ত্যজ মানুষের দিকে চেয়ে দেখলেন—দেখলেন ভারতের মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 'ওয়াহ্‌ গুরু কি ফতে' বলে নতুন ভারত বেরিয়ে আসবে। সেই ভাবী ভারতের নবজাগরণ লক্ষ্য করে স্বামীজী যেন দিব্যদৃষ্টির দ্বারা আগামী কালকে প্রত্যক্ষ করলেনঃ 'তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।'[৩৩] এ যেন স্তোত্র—'প্রাণায় স্বাহা' বলে পূষণের কাছে হবি দানের দিব্যমুহূর্তে উচ্চারিত উজ্জীবনমন্ত্র।

২৯। তদেব, পৃঃ ১০৪ ৩০। তদেব, পৃঃ ১৫১

*আর্যামির নিন্দা করে তিনি 'পরিব্রাজক'-এর এক জায়গায় এই 'ডম্‌ম্‌ম্‌'-এর উল্লেখ করে বলেছেনঃ 'একটা ডোম বলত, "আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌ম্‌!"' [বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭৭] ৩১। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮১

৩২। তদেব ৩৩। তদেব, পৃঃ ৮২

বিবেকানন্দের গদ্যরীতি সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা করা হয়নি ; বাংলা গদ্য গঠনে তিনি যে অভূতপূর্ব প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন, তৎসম-তদ্ভব-দেশজ শব্দ, বাইরের ভব্য ভাষা এবং ঘরের আটপৌরে ভাষার আশ্চর্য মিল ঘটিয়েছেন, তার স্বরূপ-লক্ষণ নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ আছে। চলিতভাষাকে তথাকথিত বিদগ্ধ ভব্যরূপ না দিয়ে তাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি এনে, তাতে ওজঃ ও রস সঞ্চার করে তিনি চলিত গদ্যকে যে আকার দিতে চেয়েছিলেন, নানা কারণে তার দিকে সেযুগের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি ততটা আকৃষ্ট হয়নি। 'সবুজ পত্র' প্রকাশের পর থেকে প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা চলিত গদ্যরীতি যখন যথার্থ সাহিত্যের দরবারের আসনটিকে জবরদখল করে নিলে, তখনও বড় কেউ ভেবে দেখেননি যে, তারও পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ চলিত বাংলা গদ্যের যথার্থ রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং এর সাহায্যে বাক্‌রীতির নানা বৈচিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সর্বনাম আর ক্রিয়াপদের লঘুকরণই যে চলিতরীতির প্রধান লক্ষণ নয়, তা স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পড়লেই বোঝা যাবে। চলিতরীতির বড় কথা—চলিত জীবনের ইডিয়ম, বাগ্‌বৈশিষ্ট্য, বাক্যগঠনের নূতন রীতি, শব্দবিন্যাসের রূপান্তর। সাধুভাষার ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম ছোট করে ছেঁটে দিলেই কিছু চলিতভাষা হয় না। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন ঃ 'বাঁদরের লেজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয় ?'[৩৪] এই উক্তিকে একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, সাধুভাষার ক্রিয়াপদ-সর্বনামকে ছোট করলেই কি চলিতভাষা হয় ? সেকথা বিবেকানন্দ বিশেষভাবে বুঝতেন, এবং বুঝতেন বলেই তাঁর ভাষা যথার্থ মুখের ভাষার সাহিত্যিক রূপ লাভ করেছে, বিদগ্ধ ইষ্টগোষ্ঠীর রসচর্বণায় পর্যবসিত হয়নি।

৩৪। প্রবন্ধসংগ্রহ, পৃঃ ২৫৮

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ কবিমনীষী

কবিতা মানবহৃদয়ের গভীরতম বাণী। তবু বাণীর অতীতকে কতখানি আভাসিত করে, সেই তার সার্থকতার মাপকাঠি। উপনিষদ্ যাঁর সম্বন্ধে বলেছেন— 'অবাঙ্-মনসোগোচরম্', যে উপলব্ধি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেছেন, 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'— চিরকাল কবিরাই তার সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছেন।

আবার কবিমাত্রেই দেশে-কালে বিচরণকারী। তাই সমকালীন জীবনধারা তাঁদের কাব্যে অল্পবিস্তর স্পর্শ রেখে যায়। এরই মধ্যে কোন কোন মহাপ্রাণ-হৃদয়ে দেশকাল ও সমসাময়িকতার উর্ধ্বে মানবজীবনের চিরন্তন সত্যোপলব্ধির প্রেরণাই বড় হয়ে দেখা দেয়। তাঁদের কবিতা বিশেষ যুগে রচিত হলেও, তাঁদের বাণী অনাদি অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যতে প্রসারিত।

আচার্য শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ—এঁরা এই মানব-উপলব্ধির প্রান্তিক সীমার কবি। তাই দেশ-কালের বিশেষ চিহ্ন এঁদের কবিতায় অনুপস্থিত। অথচ যুগে যুগান্তে মানবমন এই কবিমনীষীদের মন্ত্রবাণী অবলম্বন করে আপন উপলব্ধির শিখাটি জ্বালিয়ে তোলে।

নিজের ইংরেজি রচনাবলী সম্বন্ধে প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'To put the Hindu ideas into English and then make out of dry philosophy and intricate mythology and queer startling psychology, a religion which shall be easy, simple, popular, and at the same time meet the requirements of the highest minds—is a task only those can understand who have attempted it.'[১]

শুধু ইংরেজিতে রূপান্তরিত করাই নয়, অদ্বৈতবেদান্তকে প্রতিদিনের ব্যবহারের উপযোগী এবং কবিত্বময় করে তোলাও তাঁর লক্ষ্য ঃ 'The abstract Advaita must become living—poetic—in everyday life ; out of hopelessly intricate mythology must come concrete moral forms ; and out of bewildering Yogi-ism must come the most scientific and practical psychology—and all this must be put in a form so that a child may grasp it. That is my life's work.'[২]

অদ্বৈতানুভূতির কাব্যরূপায়ণের আদর্শ তিনি পেয়েছিলেন উপনিষদ্ থেকে। শুধু মননের মহিমায় নয়, বাণীর ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের অপরূপ সম্মেলনের উদাহরণরূপে স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় ও কথোপকথনে বারংবার উপনিষদের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করেছেন ঃ

১। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition (1964), p. 104   ২। ibid.

'উপনিষদ্‌গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ...যেন আমাদের সম্মুখে ভূমার ভাব ও চিত্র উপস্থিত করা। তথাপি এই অদ্ভুত ভাবগাম্ভীর্যের পশ্চাতে মধ্যে মধ্যে আমরা কবিত্বেরও আভাস পাই ; যথা—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

—সেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারকাও নহে, এইসব বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না, অগ্নির তো কথাই নাই।

'এই অপূর্ব পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের হৃদয়স্পর্শী কবিত্ব শুনিতে শুনিতে আমরা যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে, এমনকি মনোরাজ্য হইতে দূরে অতি দূরে নীত হই—এমন এক জগতে নীত হই, যাহা কোন কালে বুঝিবার উপায় নাই ; অথচ তাহা সর্বদা আমাদের নিকটেই রহিয়াছে।'[৩]

'...জগতে ইহার (উপনিষদের) ন্যায় অপূর্ব কাব্য আর নাই। বেদের সংহিতাভাগ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহাতেও স্থানে স্থানে অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ঋগ্বেদ-সংহিতার "নাসদীয় সূক্তে"র বিষয় আলোচনা কর। উহার মধ্যে প্রলয়াবস্থা-বর্ণনার সেই শ্লোক আছে ঃ তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে ইত্যাদি। "যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল"—এটি পড়িলে এই উপলব্ধি হয় যে, ইহাতে কবিত্বের অপূর্ব গাম্ভীর্য নিহিত রহিয়াছে।'[৪]

'প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি অতি উচ্চ স্তরের কবিত্বে পূর্ণ। এই সকল উপনিষদ্‌বক্তা ঋষিগণ মহাকবি ছিলেন। প্লেটো বলিয়াছেন—কবিত্বের ভিতর দিয়া জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। কবিত্বের মধ্য দিয়া উচ্চতম সত্যসকল জগৎকে দিবার জন্য বিধাতা যেন উপনিষদের ঋষিগণকে সাধারণ মানব হইতে বহু ঊর্ধ্বে কবিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।'[৫]

উপনিষদের কবিত্ব প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ উপনিষদের ভাষা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করেছেন। সাধারণভাবে কবিতার ভাষা সম্বন্ধেও তাঁর এই মন্তব্য স্মরণীয়।

মানবমনের অনন্তানুভবকে ভাষায় রূপায়িত করার যে-প্রয়াস উপনিষদে আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যেও এ-ধরনের উদাহরণ দুর্লভ নয়। ...কিন্তু প্রায় সর্বত্রই দেখিবে, তাহারা বাহ্য প্রকৃতির মহান ভাবকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ মিলটন, দান্তে, হোমর বা অন্য যে-কোন পাশ্চাত্য কবির কাব্য আলোচনা করা যাউক, তাঁহাদের কাব্যে স্থানে স্থানে মহত্ত্বব্যঞ্জক অপূর্ব শ্লোকাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে সর্বত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা—বহিঃপ্রকৃতির বিশাল ভাব, দেশ-কালের অনন্ত ভাবের বর্ণনা।'[৬]

এ-প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের সৃষ্টিসূক্তের উদাহরণ দিয়েও স্বামীজী দেখিয়েছেন দেশকালের

৩। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ২৮৮

৪। তদেব, পৃঃ ২২৬ ৫। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১০৪

৬। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১২৫

বিশাল বিপুলতার অনুভবেই এ-জাতীয় কবিত্বের সীমা। কিন্তু ভারতবর্ষের ঋষিকবিরা বুঝেছিলেনঃ '...এ উপায়ে অনন্ত-স্বরূপকে ধরিতে পারা যায় না...।'[৭] তখনই উপনিষদের সৃষ্টি।

'উপনিষদের ভাষা একরূপ নাস্তিভাবদ্যোতক, স্থানে স্থানে অস্ফুট, উহা যেন তোমাকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু অর্ধ পথে গিয়াই ক্ষান্ত হইয়া তোমাকে কেবল এক ধারণাতীত অতীন্দ্রিয় বস্তুর আভাস দেখাইয়া দেয়, তথাপি সেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার কোন সন্দেহ থাকে না।'[৮]

কবিত্বের এই মহত্তম আদর্শের উদাহরণরূপে স্বামীজী 'ন তত্র সূর্যো ভাতি', 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া', প্রভৃতি কয়েকটি অমর শ্লোকের উদাহরণ দিয়েছেন। স্বামীজীর মতে, জড়ের ভাষায় আত্মাকে কখনও ফুটিয়ে তোলা যায় না। সেকথাই উপনিষদের কবিরা অনুভব করেছিলেন—'যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।' অথবা 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি'। কিন্তু 'বাক্যমনাতীত' বলে উপনিষদের কবিরা চেষ্টা ছাড়লেন না, বরং আপন গভীরে সমাহিত হয়ে পরম সত্যকে প্রকাশের নতুন বাণী আহরণ করে আনলেন। 'জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে চিত্রিত করিবার চেষ্টা আর রহিল না ...আত্মতত্ত্ব এমন ভাষায় বর্ণিত হইতে লাগিল যে, উপনিষদের সেই শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রই যেন এক সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অগ্রসর করাইয়া দেয়।'[৯]

জন্ম-মরণের অতীত সত্যকে মানুষ একদা ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধির প্রকাশোপযোগী ভাষায় ধ্বনিত করেছিল। উপনিষদ্ সেই অতুলনীয় ভাষাসৃষ্টির উদাহরণ। বিবেকানন্দের কবিতার ভাব ও ভাষা—এ দুই-ই উপনিষদের প্রেরণাপুষ্ট।

স্বামীজীর একটি গানে উপনিষদের ভাব ও ভাষার আদর্শ সবচেয়ে সংহত গভীরতায় মূর্তঃ

> নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
> ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
> অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
> ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর॥
> ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
> বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥
> সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
> 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্', বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥[১০]

নাম-রূপের জগৎ থেকে আপনাকে সংহরণ করে শুদ্ধমন কেমন করে অহং-চৈতন্যের পারে ব্রহ্মস্বরূপে লীন হয়, তার আভাসটুকু এই সঙ্গীতের বাগেশ্রী-গম্ভীর ধ্বনিতরঙ্গে শ্রোতার হৃদয়ে ধ্যানস্পর্শ সঞ্চার করে।

আবার জ্ঞানসূর্যের বিকাশে ঐ সৃষ্টিবিকল্প কেমন করে লীন হয়ে যায়, তার এক অপূর্ব চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে স্বামীজীর 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটিতে।

৭। তদেব ৮। তদেব, পৃঃ ১২৫-২৬ ৯। তদেব, পৃঃ ২২৮
১০। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ২৬৭

তুহিনমেরুর অগণিত তুষারপর্বতের উপর সূর্যোদয়ের উপমায় বিধৃত সে অধ্যাত্ম অনুভব ঃ

মেরুতটে হিমানীপর্বত,
যোজন যোজন সে বিস্তার ;
অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে
শত উঠে চূড়া তার।
ঝকমকি জ্বলে হিমশিলা
শত শত বিজলি-প্রকাশ!
উত্তর অয়নে বিবস্বান্,
একীভূত সহস্রকিরণ,
কোটি বজ্রসম করধারা
ঢালে যবে তাহার উপর,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্ছিত ভাস্কর,
গলে চূড়া শিখর গহ্বর,
বিকট নিনাদে খসে পড়ে গিরিবর,
স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে।[১১]

অনুভবের সে দিব্যমুহূর্তে কবিহৃদয়ে অনাহত বাণী ধ্বনিত। এ বাণী নিখিল মানবাত্মার উদ্দেশে ভারতবর্ষের অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ।

উপনিষদ্-সাহিত্যের একটি মাত্র শব্দে বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন-দর্শন বিধৃত—'অভীঃ'। নবজাগ্রত ভারতবাসীর হৃদয়ে এই অভীঃমন্ত্র সঞ্চারই ছিল তাঁর কর্মসাধনার মূল প্রেরণা। উপনিষদের ভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজীর আর একটি মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ '...উপনিষদের ভাষা ভাব—সবকিছুরই ভিতর কোন জটিলতা নাই, উহার প্রত্যেকটি কথাই তরবারি-ফলকের মতো, হাতুড়ির ঘায়ের মতো সাক্ষাৎভাবে হৃদয়ে আঘাত করে। উহাদের অর্থ বুঝিতে কিছুমাত্র ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই—সেই সঙ্গীতের প্রত্যেকটি সুরের একটা শক্তি আছে, প্রত্যেকটি তাহার সম্পূর্ণ ভাব হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেয়। ...যদি ইহা মানবপ্রণীত হয়, তবে ইহা এমন এক জাতির সাহিত্য, যে-জাতি তখনও তাহার জাতীয় তেজবীর্য এতটুকু হারায় নাই।'[১২]

উপনিষদ্ থেকে বিবেকানন্দ একাধারে ধ্যান ও সংগ্রামের বাণী আহরণ করেছেন। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক প্রশান্তির ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সকল কর্মপ্রচেষ্টায় অন্তরের সুপ্ত শক্তির মহাজাগরণের ক্ষেত্রেও স্বামীজী উপনিষদ্ থেকেই বাণী আহরণ করেছিলেন। এদিক থেকে বিশেষভাবে কঠোপনিষদের নচিকেতা ছিল তাঁর আদর্শঃ 'সেই অপূর্ব কঠোপনিষদের কথা ধর। এই কাব্যটি কি অপূর্ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর! ...ইহার আরম্ভই অপূর্ব! সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব, তাহার যমপুরীতে যাইবার ইচ্ছা, আর সেই "আশ্চর্য" তত্ত্ববক্তা স্বয়ং যম তাহাকে জন্ম-মৃত্যুরহস্যের উপদেশ দিতেছেন! আর বালক তাঁহার নিকট কি জানিতে চাহিতেছে?—মৃত্যুরহস্য।'[১৩]

১১। তদেব, পৃঃ ২৭৪-৭৫

১২। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১২৮-২৯ ১৩। তদেব, পৃঃ ২২৮-২৯

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কথা আত্মবিশ্বাস ও নির্ভীক জীবনসংগ্রামের প্রেরণা।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥[১৪]

এই এক শ্লোকে গীতার সমগ্র বাণী বিধৃত—এই ছিল তাঁর ধারণা। মানবাত্মার অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাসী বিবেকানন্দ কোন দুর্বলহৃদয় আপোষের কথা শুনতে পারতেন না।

এমনকি নেতিবাচক শব্দের প্রতি তাঁর অনীহার ফলে 'বেলুড় মঠের নিয়মাবলী প্রণয়নে কোন নেতিবাচক শব্দের স্থান দেওয়া হয়নি।—বারংবার তিনি বলেছেন ও লিখেছেনঃ 'যে বলে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত হবে। যে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীন হীন ভাব আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা। ...যে সদা আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে কোনও কালে বলবান হবে না; যে আপনাকে সিংহ জানে, সে "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী"।'[১৫]

এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক প্রেরণায় উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি—'মেঘনাদবধ' শ্রেষ্ঠ কাব্য। 'ঐ একটা অদ্ভুত genius (প্রতিভা) তোদের দেশে জন্মেছিল। "মেঘনাদবধে"র মতো দ্বিতীয় কাব্য বাংলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।'[১৬] মাইকেলই বাংলাদেশে একটা বিশেষ কবি জন্মেছিল। —এ-ধরনের মন্তব্য তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত।

'মেঘনাদবধকাব্যে'র সপ্তম সর্গে শত্রুহননে স্থিরসঙ্কল্প রাবণ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র। কারণ, '"যা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য আমি ভুলব না, এতে দুনিয়া থাক, আর যাক"—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য।'[১৭]

উনিশ শতকের বাংলা কাব্যধারায় মধুসূদনের মহাকাব্যের যথার্থ মর্যাদাদানের মধ্যে স্বামীজীর সমুন্নত সাহিত্যরুচির যে পরিচয় পাই, তা কেবল বীররসের মহিমাকীর্তনে মগ্ন ছিল না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে জয়দেব ও ভারতচন্দ্রের শব্দঝঙ্কার ও আদিরসাধিক্য ততটা সমর্থন না করলেও এঁদের কাব্যগুণের তিনি সমাদর করতেন। মুকুন্দরাম তাঁর মতে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি।

ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি ছিলেন মিলটন; তরুণ বয়সে 'প্যারাডাইস লস্টে'র শয়তান চরিত্র তাঁকে মুগ্ধ করত। গম্ভীর তরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে তাঁর মিলটন-আবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন অনুজ মহেন্দ্রনাথ। সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলীর তিনি অভিনিবিষ্ট পাঠক। বায়রন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী—এঁরাও তাঁর প্রিয় কবি। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর রচনাবলী তিনি বিশেষভাবে পড়েছেন, ছোটবেলায় দীনবন্ধুকে তিনি দেখেছেন। মধুসূদন ছাড়া আর একজন সমকালীন কবির তিনি অনুরাগী ছিলেন—তিনি সুরেন্দ্রনাথ

১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ২।৩

১৫। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৬৬

১৬। তদেব, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২১১ ১৭। তদেব, পৃঃ ২১২

মজুমদার। সুরেন্দ্রনাথের মননধর্মী রচনা ও গম্ভীর ছন্দ তাঁর আকর্ষণের কারণ। গিরিশচন্দ্রের তিনি অনুরাগী বন্ধু ও পাঠক।

কিন্তু সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি-অগ্রজ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বাণী ও রচনায় কোন উল্লেখ নেই। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে, বিশেষত দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি চিনতেন নিশ্চয়। ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর আরও পরিচয় ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে তিনি যেসব গান গাইতেন, তার মধ্যে 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটি যে রবীন্দ্রনাথের, এ-ও তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। এছাড়া 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ', 'আমরা যে শিশু অতি' প্রভৃতি রবীন্দ্রসঙ্গীত তিনি গাইতেন, এমন সাক্ষ্য একাধিক।

বাংলা সাহিত্যের আলোচনা ক্ষেত্রে আমরা এ দুই মনীষীর সাধর্ম্য ও স্বাতন্ত্র্যের কথা পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য না করে পারি না। বিবেকানন্দের দেহাবসানের কিছুকাল পর থেকেই এ আলোচনার সূত্রপাত। ১৩১৪ সালের নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় 'কবিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা' প্রবন্ধে কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব-নির্ণয়-প্রসঙ্গে 'যে কবিতায় পাঠক মানবজীবনের প্রসার যত অধিক অনুভব করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ'—এই মন্তব্যের মানদণ্ডে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার যে তুলনামূলক আলোচনা করেন—আজকের দিনের পাঠকের কাছে সে আলোচনাটি শুধু কৌতূহলজনক নয়, শ্রদ্ধার্হ ঃ '"জীবনের প্রসার" শব্দে চৈতন্যের বহুব্যাপিত্ব এবং সেইহেতু কর্মক্ষেত্রের বিস্তার সূচিত হইয়াছে, মনে করি। এইজন্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মহাসত্যগুলিকে যিনি যত অধিক দিক হইতে উপলব্ধি করিয়া মানবমনের সম্মুখে ধরিয়াছেন তিনি তত শ্রেষ্ঠ। এই সূত্র ধরিয়া আলোচনা করিলে বোধহয় আমরা দেখিতে পাই যে, রবীন্দ্রনাথ সুখের দিক হইতে, সৌন্দর্যসম্ভোগ-জনিত সুখের অনুভূতিদ্বারা বিশ্বের সনাতন সত্যের পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতি মোহিনীও বটেন, ভীষণাও বটেন। রবীন্দ্রনাথ এই মোহিনী প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন—ভীষণাকে বড় একটা দেখেন নাই।'

বিবেকানন্দের রচনায় যে 'positive pain' বা 'সদ্বস্তু বেদনা'র সন্ধান লেখক পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনায় তা পাননি। প্রবন্ধটির শেষ প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের জীবন-দর্শনের পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

'রবীন্দ্রনাথের শেষ উপলব্ধি—যাঁহার আনন্দধারা বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া আসিয়া উপাসকের হৃদয়ে ভক্তিরূপে ফুটিয়া উঠে;—বিবেকানন্দের উপলব্ধি—যাঁহার আনন্দধারা বিশ্বের অনন্ত শোণিতরাঙা সত্যবেদনার ভিতর দিয়া আসিয়া যুধ্যমান বীরের আপনাতে আপনি পূর্ণ বিরাট হৃদয়ে যন্ত্রণাপীড়িত জীবের প্রতি প্রেমরূপে ফুটিয়া উঠে।'

১৩১৪ সাল অবধি রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যের বিপক্ষে একাধিক উদাহরণ স্থাপন করা গেলেও মোটামুটিভাবে এ দুই কবির দৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্য অক্ষয়বাবুর রচনায় সুবিশ্লেষিত। কিন্তু তারপর বহু বিস্তৃত রবীন্দ্রসাহিত্যে বেদনা ও মৃত্যুর বাস্তব

সংস্পর্শে অনেক পরিবর্তিত। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ এক না হলেও দুঃখের পরম মূল্য সম্বন্ধে তাঁদের মতপার্থক্য খুব বেশী নয়। তবে বিবেকানন্দের অনুভবে দুঃখ-বেদনা-মৃত্যুর মহৎ উপলব্ধির সঙ্গে বেদান্তের সর্বত্যাগী নির্মোহ জীবনাদর্শ সংযুক্ত হওয়ার ফলে জীবনসংগ্রামের সর্বস্তরে তাঁর প্রেরণা আরও গভীর ও ব্যাপক।

বিবেকানন্দের কবিতায় সংগ্রামী চেতনারই আর একটি রূপ তাঁর দুঃখবরণের সাধনা। এ দুঃখচেতনা দুঃখবাদ থেকে সৃষ্টি হয়নি। মহৎ হৃদয়ের ধর্মই জগতের সব বেদনাকে আপন অন্তরের মধ্যে অনুভব করা।

'পত্রাবলী'র বিবেকানন্দের মধ্যে এই অনুভূতির ঘাত-সঙ্ঘাতময় ব্যক্তিসত্তাটির অপূর্ব প্রকাশ পাঠকদের মুগ্ধ করে। সেইসঙ্গে তাঁর সন্ন্যাসও যে আদর্শ-রূপায়ণের সংগ্রাম—এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে আমরা ভারতীয় জীবন-দর্শনের একটি মূল সত্যকে উপলব্ধি করি। মানবজীবনের ক্রমবিকাশের স্তর-পরম্পরায় চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস সর্ববন্ধন-বিমুক্ত আত্মোপলব্ধির চরম প্রকাশ। ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্কীর্ণ সীমা থেকে বিরাট বিশ্বে উত্তরণের সে-সাধনা আমরা রবীন্দ্রকাব্যের পরিণতির ইতিহাসে 'শেষ লেখা' কাব্যের প্রথম গানটিতে রূপায়িত দেখি:

> হয় যেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়,
> বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
> পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
> মহা অজানার ॥

অথচ রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্বে সবচেয়ে বড় ঘোষণা কি এই নয়?—

> মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
> মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

নৈবেদ্যের যুগেও এই আকাঙ্ক্ষাই আরও অন্তরতম স্বরে উচ্চারিত:

> বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয় ॥
> অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।...

কিন্তু বন্ধনের অভীপ্সা কখন পরমসত্তার আহ্বানে মুক্তির মহাকাশে বিলীন হয়ে গেছে, শান্তি-পারাবারের কর্ণধারের কাছে তাই চিরযাত্রার অভয়প্রার্থনা রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্বে নতুন করে ধ্বনিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে উপনিষদের শান্তি ও ধ্যানতন্ময়তার দীক্ষা তো মহাকবি শৈশবেই পেয়েছিলেন।

কিন্তু বিবেকানন্দ-প্রচারিত বেদান্তদর্শনের এবং বেদান্তের কাব্যরূপায়ণের মূল প্রেরণা শঙ্করের প্রজ্ঞা। অদ্বৈতসিদ্ধান্ত-মূলক জ্ঞানযোগের সঙ্গে সাহিত্য-প্রতিভার সম্মেলন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ উদাহরণ। অদ্বৈতসিদ্ধান্তকে আচার্য শঙ্কর তাঁর 'বিবেকচূড়ামণি', 'নির্বাণষট্‌কম্', 'মোহমুদ্গর', 'কৌপীনপঞ্চকম্' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে ভাবগম্ভীর ভাষারূপ দিয়েছেন, তা আত্মজ্ঞানের অন্বেষণকারীদের চিরকালের সম্পদ। বিবেকানন্দের 'The Song of the Free' এবং 'The Song of the Sannyasin' এই দুটি কবিতায় কবিমনীষী শঙ্করাচার্যের প্রেরণা সবচেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ।

জীবনমুক্ত সাধকের নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তি এ কবিতাটিতে যে বলিষ্ঠতা সঞ্চার করেছে, বিবেকানন্দের বাণীভঙ্গির সেই অনন্য শক্তি ও সৌন্দর্য তাঁর ইংরেজি ও বাংলা রচনাবলীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ঃ

Have thou no home. What home can hold thee, friend ?
The sky thy roof, the grass thy bed; and food
What chance may bring, well cooked or ill, judge not.
No food or drink can taint that noble Self
Which knows Itself. Like rolling river free
Thou ever be, Sannyasin bold ! Say—
'Om Tat Sat, Om !'[১৮]

সংসারসুখস্বপ্ন-বিমুখ মুক্ত আত্মার অভয়বাণীতে চিরজাগ্রত এই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে মনে রাখলেই আমরা তাঁর সংগ্রামী সত্তার আর একটি দিককে উপলব্ধি করতে পারব। মানবজীবনকে স্বামীজী পরম বেদনার আলোকে এক অনন্ত প্রেমের বিকাশরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জীবনের সব ক্ষয়ক্ষতি, লাঞ্ছনা, অসম্মান, ধ্বংস ও মৃত্যু সে মহাপ্রেমের অন্তরালে পরমা শক্তির প্রকাশ। তিনিই মৃত্যুরূপা মহাকালী।

বাংলা সাহিত্যের শক্তি-সাধকেরা—বিশেষত রামপ্রসাদ—বীর ভক্তের সংগ্রাম-সাধনার উদাহরণ। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন ঃ

আমি কি দুঃখেরে ডরাই ?

অথবা

ভূতলে আনিয়ে মাগো, করলি আমায় লোহা পেটা,
আমি তবু কালী বলে ডাকি,
শাবাশ আমার বুকের পাটা।

বাংলার শাক্ত কবিদের পদাবলীতে মহামায়ার চরণতলে রক্তজবার মতো জীবন-যুদ্ধের আরক্ত যন্ত্রণাগুলি গান হয়ে ফুটে উঠেছে।

আবার এই করালীমূর্তির মধ্য দিয়েই শাক্ত সাধকেরা শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছিলেন ঃ

ওরে শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকারা।

দ্বৈত থেকে অদ্বৈতে উত্তরণের এই সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ও ধ্যানে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণাই বিবেকানন্দের হৃদয়ে একদিন মহাকালীর ধ্যান জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু এই বীরভক্তের দিব্য কল্পনায় ভবতারিণীর অভয়া বরদা মূর্তির চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশিনী প্রলয়ঙ্করী রূপ।

প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফিরে অমরনাথে তীর্থযাত্রার পরেই জগৎকারণের মাতৃমূর্তিধ্যান বিবেকানন্দ-হৃদয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। 'The Master as I saw him' গ্রন্থের ক্ষীরভবানী-অধ্যায়ে ভগিনী নিবেদিতা পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন, আজীবন

১৮। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV, Eighth Edition (1962), p. 395

সুখ-দুঃখের অতীতলোকে উত্তরণের আদর্শ প্রচার করলেও এই সময় দুঃখ-মৃত্যু-ভয়ঙ্করের মিলিত চেতনাই স্বামীজীর হৃদয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

এমনি সময়ে একদিন দিব্য প্রেরণামুহূর্তে তাঁর লেখনী থেকে 'Kali the Mother' কবিতার সৃষ্টি। রচনা সমাপ্তির পর সুতীব্র আবেগের অবসানে স্বামীজীর অবসন্ন দেহ মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। রৌদ্র ও ভয়ানক রসের সম্মেলনে এমন পরিপূর্ণ বীররসের কবিতা সাহিত্যজগতে বিরল। 'মৃত্যুরূপা মাতা' নামে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত কবিতার অনুবাদটিও বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

কবিতাটির সূচনায় বিবেকানন্দের চিরপ্রিয় অন্ধকার-বর্ণনা ঃ

The stars are blotted out,
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant.[১৯]

প্রলয় ঝড়ের এ-অন্ধকার ঋগ্বেদের 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে' ও তন্ত্রের 'মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং'—এ দুটি অংশ মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু সমগ্র প্রকৃতির উন্মত্ত পটভূমিতে তাণ্ডব-বর্ণনার মহাকালীর মরণনৃত্যের ব্যঞ্জনা এ কবিতায় ব্যাপ্ততর ঃ

In the roaring, whirling wind
Are the souls of a million lunatics
Just loose from the prison-house.
Wrenching trees by the roots,
Sweeping all from the path.
The sea has joined the fray,
And swirls up mountain-waves,
To reach the pitchy sky,
The flash of lurid light
Reveals on every side
A thousand, thousand shades
Of Death begrimed and black—
Scattering plagues and sorrows,
Dancing mad with joy,
Come, Mother, come ![২০]

প্রলয় ঝড়ের বর্ণনার মধ্য দিয়ে মৃত্যুরূপা মহামায়ার আবির্ভাবকে কী অপূর্ব কাব্যকৌশলে ধ্বনিত করা হয়েছে, অথচ এ কবিতা রচনার ইতিহাসে সচেতন শিল্পপ্রয়াস কিছুই ছিল না। অনুভূতির এমন অখণ্ড রূপায়ণের দৃষ্টান্ত হিসাবেও কবিতার জগতে এ এক বিস্ময়!

১৯। ibid., p. 384 ২০। ibid.

মৃত্যুর আহ্বানমন্ত্রে করালরূপিণীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বীরভক্ত মায়ের বন্দনামন্ত্র উচ্চারণ করলেন :

For Terror is Thy name,
Death is in Thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for e'er.
Thou 'Time', the All-Destroyer!
Come, O Mother, come!
Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance,
To him the Mother comes.[২১]

'নাচুক তাহাতে শ্যামা' যেন এ কবিতাটিরই বিস্তৃত কবিতাভাষ্য। বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব ও শাক্ত কাব্যধারার দুটি প্রতীক 'সুখবনমালী' ও 'মৃত্যুরূপা কালী'-র মধ্যে এই সংগ্রামী সন্ন্যাসীর কাছে মৃত্যুরূপাকেই সত্যস্বরূপা মনে হয়েছে। যে দুর্বল আর্তহৃদয় 'মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী', সে কাপুরুষতার ভক্তিকে ধিকৃত করে বিবেকানন্দ আহ্বান করেছেন ধ্বংসে মৃত্যুতে পরাজয়ে চির-অবিচল সংগ্রামের পতাকাধারী সৈনিকদের :

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥[২২]

মধুসূদনের পর বাংলা সাহিত্যে যথার্থ বীররসের মেঘমন্দ্রস্বর আবার আমরা বিবেকানন্দের কণ্ঠেই শুনতে পেলাম।

'Kali the Mother' কবিতাটি লিখবার পর ক্ষীরভবানী দর্শন করতে গিয়ে বিবেকানন্দের মানস-জীবনে এক আমূল ভাবান্তর ঘটে। বিধর্মীর আক্রমণে বিধ্বস্ত মন্দিরের দুর্দশা দেখে বুঝি ভক্তহৃদয় চঞ্চল হয়ে প্রতিকার-চিন্তা করেছিল, ভেবেছিল, যদি আমি তখন উপস্থিত থাকতাম, তাহলে প্রাণ পণ করেও এ-মন্দির রক্ষা করতাম! সেই মুহূর্তে মহামায়ার অনন্ত ইচ্ছা-সমুদ্রের একটি তরঙ্গ বিবেকানন্দ-হৃদয়ে বাণীরূপে উদ্বেল হয়ে উঠল : 'যদিই বা ম্লেচ্ছরা আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, আমার প্রতিমা অপবিত্র করে, তোর তাতে কী ? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি ?'[২৩]

এই উপলব্ধির পর থেকে কিছুকালের জন্য বিবেকানন্দের হৃদয় থেকে সংগ্রামের

২১। ibid. ২২। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৭১

২৩। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ), উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১০৬

প্রেরণার ঊর্ধ্বে মহামায়ার অপার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের ভাবটিই বড় হয়ে উঠেছিল। 'আর "হরিঃ ওঁ" নয়, এবার "মা", "মা" !' 'আমার সব স্বদেশপ্রেম ভেসে গেছে। আমার সব গেছে। এখন কেবল "মা, মা" !'[২৪]

অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়ার ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান, দৃষ্টিমাত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় —সেই অনন্ত শক্তির কণামাত্র বিকাশে মানবের দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত অপার জ্ঞানসমুদ্র।

Who knows, what soul, and when,
The Mother makes Her throne ?
What law would freedom bind ?
What merit guide Her will,
Whose freak is greatest order,
Whose will resistless law ?[২৫]

বিবেকানন্দের অন্তরতম ইতিহাসে একদিকে এই সর্বসমর্পণকারী আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা, আর একদিকে সদাসমুদ্যত নির্ভীক জীবনসংগ্রামের প্রেরণা। আপাত-বিপরীত এ দুই প্রান্ত মাঝে মাঝে এসে একটি সুরধ্বনিতে মিলিত। ভ্রাম্যমাণ জীবনচক্রের সেই মধ্যবিন্দুটিই পরম শান্তি, সে শান্তি সুপ্তি নয়, জাগরণ নয়, মৃত্যু নয়, জীবনও নয়, সে অন্ধকারের অন্তরতম আলো, আলোর অন্তর্নিহিত অন্ধকার ঃ

It is not joy nor sorrow,
But that which is between,
It is not night nor morrow,
But that which joins them in.
... ...
It is beauty never seen,
And love that stands alone,
It is song that lives un-sung,
And knowledge never known.[২৬]

নিবেদিতার আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচারিণী-বেশ ধারণের সঙ্কল্প উপলক্ষে লেখা এই কবিতায় সংগ্রামের অন্তর্লীন মহাশান্তির স্তব্ধতা রূপায়িত। তাইতো নিবেদিতার সাধনাও সংগ্রাম হয়ে উঠেছিল। স্বামীজী-ব্যাখ্যাত উপনিষদের কাব্যাদর্শের আর একটি সুন্দর নিদর্শন এই 'Peace' কবিতাটি।

বিবেকানন্দের কবিতায় শান্তি ও সংগ্রামের ছায়ারৌদ্রলীলা পাঠকচিত্তকে একই সঙ্গে স্তব্ধ ও সচকিত করে। মুহূর্তে ধ্যানের তন্ময়তা সংগ্রামের একাগ্রতায় পরিণত হয়। তাঁর একাধিক কবিতায় দুঃখ ও সংগ্রামের প্রতীকরূপে অন্ধকার, মৃত্যু, মহাকালীর মিলিত সমাবেশ আগেই উল্লেখিত হয়েছে। এদিক থেকে 'To an Early Violet', 'The Cup', 'Hold on yet a while, Brave Heart' কবিতা তিনটিও উল্লেখযোগ্য।

২৪। তদেব ২৫। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, p. 439
২৬। ibid., Vol. IV, p. 396

নির্মম শীতে বসন্তপুষ্প ভায়োলেটের অকাল-জাগরণের চিত্রকল্পে বিবেকানন্দ সাধনা ও সংগ্রামের যে ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন, কবিতা হিসাবে তার নিজস্ব সার্থকতা স্বীকার করেও সংগ্রামী চেতনার প্রতীক হিসাবে আমরা 'The Cup' কবিতাটিকেই তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতার সম্মান দেব।

খ্রীষ্টজীবনের শেষ রজনীতে শেষ ভোজনের পরিসমাপ্তিতে ঃ '...he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it; for this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.'[২৭]

যীশুর পানপাত্রটি ছিল মানবাত্মার সমস্ত কলুষগ্লানি মোচনের বেদনারক্তে পরিপূর্ণ। চিরকালের সাধকদের উদ্দেশে এই জীবনমথিত বিষপাত্র তিনি উপহার রেখে গিয়েছিলেন। সে মহাদায়িত্ব বহনের উপযোগী কজন সাধক পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে? বহুদিন পরে সেকথা স্মরণ করে 'The Imitation of Christ'-এর অমর লেখক টমাস আ কেম্পিস বলেছিলেন ঃ 'Many follow Jesus to the breaking of bread, but few to the drinking the chalice of His Passion.'[২৮]

বিবেকানন্দ সেই অঙ্গুলিমেয় বেদনা-সাধকদের অন্যতম। তাঁর জীবনদেবতা যে তাঁর জন্য সহজ সাধনার রাজপথটি খুলে রাখেননি, আনন্দের অমৃতলাভ যে তাঁর জন্যে নয়—এ কথাটি জীবনের ঘাটে ঘাটে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন। কলকাতার পথে পথে চাকরি সন্ধানে উপবাসী নরেন্দ্রনাথের জীবনে দুঃখবেদনার চরম অভিঘাত-মুহূর্তে একদিন সহসা অর্ন্তদৃষ্টি উন্মোচিত হয়েছিল; শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বেদনাহত হৃদয়ের ধ্বনিস্পন্দনটি নিখিল বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে এক বিপুল গভীর নব ভৈরবরাগ সৃষ্টি করেছিলেন।

কবিহৃদয়ে মন্দ্রিত তাঁর জীবনদেবতার বাণী ঃ

This is your cup—the cup assigned to you from the beginning.

... ...

This is your road—a painful road and drear.
I made the stones that never give you rest.
I set your friend in pleasant ways and clear,
And he shall come like you, unto My breast.
But you, My child, must travel here.[২৯]

২৭। The Holy Bible, New Testament, Saint Matthew, Authorized or King James Version, Universal Book and Bible House, Philadelphia, U.S.A., 1948, 26/27-8

২৮। The Imitation of Christ—Thomas A Kempis, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 1967, p. 68

২৯। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VI, Seventh Edition (1963), p. 177

'The Imitation of Christ'-এর ভক্ত-ভগবানের একান্ত সংলাপের কথা মনে থাকলে এ কবিতায় ভক্তের প্রতি ভগবানের বাণীর তাৎপর্য অনেকটা সহজবোধ্য হয়। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও দাস্যভক্তির জ্বলন্ত উদাহরণ এই মহাগ্রন্থের একটি বাণী উদ্ধৃত হয়েছে স্বামীজীর পত্রাবলীতে। বিবেকানন্দের জীবনসাধনার আদর্শ উপলব্ধির পক্ষে সহায়করূপে সে বাণী স্মরণ করিঃ 'We have taken up the Cross, Thou hast laid it upon us and grant us strength that we bear it unto death. Amen !'[৩০]

যীশুর ঐ ক্রুশকাষ্ঠ যুগযুগান্তের মহামানবদের বেদনাবহনের প্রতীক। স্বামীজীর ভাষায়ঃ 'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।'[৩১]

কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষ, তারা এই দুঃখের তাৎপর্য বুঝতে চাই, জীবনের ভাল-মন্দ, আলো-অন্ধকারের অর্থ খুঁজে বেড়ানো আমাদের স্বভাব। বিবেকানন্দের জীবনদেবতা এ প্রশ্নের কোন উত্তরই দেননি, শুধু বলেছেনঃ

I do not bid you understand.
I bid you close your eyes to see My face.[৩২]

জীবনে দুঃখের সাধনাকে স্বীকার করার অর্থই সত্যের মুখোমুখি হওয়া। সৃষ্টি-রহস্যের এর চেয়ে বড় উত্তর প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য আজ অবধি দিতে পারেনি।

বিবেকানন্দের জীবনে পরম সত্যের আবির্ভাব হয়েছিল পরিপূর্ণ ত্যাগ, তপস্যা, প্রেম ও ভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। স্বদেশে ও বিদেশে তাঁর অসংখ্য বক্তৃতাবলীর মধ্যে অতি অল্প ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর গুরুর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু যখনই করেছেন, তখনই কী অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তিনি এই মহামানবকে আপন হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘটি নিবেদন করেছিলেন সেকথা আমরাও অনুভব করি। তাঁর মতেঃ সমগ্র হিন্দুজাতি যুগ যুগ ধরে যে চিন্তা করে এসেছে, তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এক জীবনেই সেইসব ভাব উপলব্ধি করেছেন। তাঁর জীবন সকল জাতির শাস্ত্রসমূহের জীবন্ত ভাষ্য।[৩৩]

জ্ঞান ও ভক্তির যে সুসমঞ্জস রূপায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তার ফলে গুরু ও ইষ্ট তাঁর হৃদয়ে অভেদসত্তায় মিলিত। তাই বিবেকানন্দের লেখনীতে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি ত্রিভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের কবিতামূর্তি গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে বিশুদ্ধ বন্দনামূলক রচনা 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন', 'ওঁ হ্রীং ঋতং', 'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো' প্রভৃতির ভক্তিরস উল্লেখযোগ্য হলেও কবিতার বিচারে 'O'r hill and dale' শীর্ষক ইংরেজি ও 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' শীর্ষক বাংলা কবিতাযুগলই শ্রেষ্ঠ। শিকাগো বক্তৃতার মাত্র এক সপ্তাহ আগে লেখা 'O'r hill and dale' কবিতাটি বিবেকানন্দ-হৃদয়ের এক ব্যাকুল অনুসন্ধান-মুহূর্তের অপূর্ব কাব্যরূপ।

বেদে-বাইবেলে-কোরানে, মন্দিরে-মসজিদে-গির্জায়, অরণ্যে-পর্বতে-উপত্যকায়, তৃষার্ত জিজ্ঞাসায় বিবেকানন্দ পরম সত্যকে খুঁজে ফিরেছেন। বেদনাদীর্ণ চেতনা

৩০। ibid., p. 207 ৩১। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬৭
৩২। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VI, p. 177
৩৩। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১০৯

বৎসরের পর বৎসর প্রতীক্ষা করেছে, প্রশ্ন করেছে ঃ

Where art Thou gone, my God, my love ?[৩৪]

প্রতিটি নিমেষকে মনে হয়েছে যুগ, জীবন অন্তহীন অশ্রুধারা। এমনি পরম বিরহের মধ্য দিয়ে একদা সেই শুভ মুহূর্ত দেখা দিল ঃ

Till one day midst my cries and groans
Some one seemed calling me.

A gentle soft and soothing voice
That said 'My son', 'my son'[৩৫]

সেইদিন থেকে পরম প্রিয়তমের আনন্দোদ্ভাসিত মুখশ্রী দ্যুলোকে ভূলোকে সব সৌন্দর্য পবিত্রতার মধুময় প্রকাশে দীপ্ত হয়ে দেখা দিল।

From that day forth, where ere I roam,
I feel Him standing by
O'er hill and dale, high mount and vale,
Far far away and high.
... ...
Thou speakest in the mother's lay
That shuts the babies eye ;
When innocent children laugh and play
I see Thee standing by.[৩৬]

সন্ধান ও উপলব্ধির এই মরমী অভিব্যক্তির সঙ্গে স্বামীজীর আর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্তরগত মিল লক্ষণীয়—সম্ভবত এ কবিতাটি কাছাকাছি সময়েই লেখা—স্বামীজীর 'সখার প্রতি'। 'O'r hill and dale' কবিতায় ব্যক্তিহৃদয়ের জীবনদেবতা ও 'সখার প্রতি'র নিখিল মানবহৃদয়ের 'প্রেম' মূলত একই সত্যের দুটি দিক।

'প্রেমে'র ঐ ধ্রুব প্রত্যয়ে উপনীত হওয়ার পিছনে আছে বাস্তব সংসারের উপলসঙ্ঘাতে ক্ষতবিক্ষত পদযাত্রার ইতিহাস। মানবচরিত্র সম্বন্ধে কী মর্মান্তিক তিক্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে এ কবিতার সূচনা ঃ

হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান ;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্মর-মূরতি তা কি সয়?
হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।[৩৭]

সব পেলব শোভনতার অন্তরালে মানুষের এই স্বার্থগৃধ্নু পরিচয় যে অন্যতম সত্য, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ এক হিসাবে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থমগ্ন

৩৪। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VII, Sixth Edition (1964), p. 448

৩৫। ibid., p. 449 ৩৬। ibid., pp. 449-50

৩৭। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬৭

মানবমনেরও মূল আশ্রয় কোন না কোন রূপে প্রেমেরই ধ্রুবসত্য। 'রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম' থেকে হত্যাজীবী দস্যু অবধি কোন না কোন ভালবাসার কাছে উৎসর্গিত প্রাণ। আবার সেই প্রেমেরই পরম বিকাশে সাধকহৃদয়ে প্রতিভাত ব্রহ্মবিজ্ঞান—'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়'। 'সখার প্রতি'র শেষ চার পঙ্‌ক্তি বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত উদ্ধৃতিগুলির অন্যতম। এই চার পঙ্‌ক্তির মধ্যে বিবেকানন্দের মূল জীবনদর্শন বিধৃত হলেও সমগ্র কবিতাটির পরিসমাপ্তি হিসাবেই এরা গ্রহণীয়।

মানবজীবনের নির্মোহ বাস্তব পরিচয় উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে প্রেমের নিখিল সত্যে উত্তরণের উদাহরণরূপে এ কবিতা বাংলা কবিতার জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী।

বিবেকানন্দ সাহিত্য ও জীবনের সখা ও সারথি শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কেউ কেউ মনে করেন, 'সখার প্রতি'র উদ্দিষ্ট সখা বুঝি স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব। 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।' তবু 'সখার প্রতি'র 'সখা'র সঙ্গে এই সখা সম্বোধনের পার্থক্য আছে। একজন বিবেকানন্দের সখা ও ইষ্ট, আর একজন সখা ও অন্তরঙ্গ। 'সখার প্রতি'র সখা গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দ (রাখাল) বা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও (শশী) হতে পারেন, কিন্তু কোনমতেই শ্রীরামকৃষ্ণ নন।

বিবেকানন্দের কবিতাজগতে 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' বিশেষভাবে স্মরণীয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ—এ দুই অতুলনীয় গুরুশিষ্যের হৃদয়সম্বন্ধ কোন্ পরম সত্যের অনাহত বাণীর আলোকে অদ্বৈতসত্তায় উপনীত হয়েছিল, এ কবিতায় তার অর্ধস্ফুট রূপায়ণ। এক হিসাবে এ কবিতা বিবেকানন্দের ব্যক্তিজীবনের অন্তরতম কাহিনী, অন্য দিক থেকে এ কবিতা 'সৃষ্টি' ও 'প্রলয়' কবিতা দুটির সগোত্র।

পরিব্রাজক জীবনের সূচনায় স্বামীজী একবার গাজীপুরের বিখ্যাত সাধক পওহারীবাবার সান্নিধ্যে এসে যোগসাধনার জন্য আগ্রহ বোধ করেন এবং পওহারীবাবার কাছে দীক্ষাগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু দীক্ষাগ্রহণে যাত্রার আগে তাঁর অন্তরপটে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিখানি বারংবার ভেসে উঠতে থাকে। দিনের পর দিন অন্তর্দ্বন্দ্বে সমাচ্ছন্ন বিবেকানন্দের চিন্তাজগতে অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণই অনন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পওহারীবাবার প্রতি বিবেকানন্দের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় আছে তাঁর উত্তরজীবনের বক্তৃতামালায়। কিন্তু এই চিন্তাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীত হন, তাঁর পরবর্তী জীবন সেই এক সিদ্ধান্তে অবিচলিত ছিল ঃ '...রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই।'[৩৮]

বহুকাল পরে আমেরিকা থেকে জনৈক গুরুভ্রাতাকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটির 'একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ' অংশটি লিখে পাঠিয়েছিলেন। একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের যে ইতিহাস তিনি এ কবিতায়

৩৮। তদেব, পৃঃ ৩২০

লিপিবদ্ধ করেছেন, গুরুভ্রাতাদের পক্ষে সেকথা হৃদয়ঙ্গম করা যত সহজ ছিল, আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তবু, এ দুই গুরুশিষ্যের ভাবজগতে একবার মাত্র যে বিচ্ছেদের আভাস দেখা দিয়েছিল তার সকরুণ আভাস মেলে একটি চরণে ঃ

ছেলেখেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা' পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে,
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্বাক আনন, ছল ছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।
অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগলভতা ?[৩৯]

এই মানবমনই আপনার অজ্ঞাতে প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে আত্মদান করে চলেছে। চরম দুঃখের তপস্যায় বিবেকানন্দ এই মহাসত্যটি 'উপার্জন' করেছিলেন—এই প্রেমেরই স্বার্থমুক্ত রূপে মানুষ দেবতা, স্বার্থমগ্ন রূপে দানব। জীবনের সুখে দুঃখে, কল্যাণে অকল্যাণে এই প্রেমই 'মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন'।

তাই পলায়ন নয়, আসক্তিও নয়, সর্বজীবে সেই পরম সত্যকে উপলব্ধির বাণীই বিবেকানন্দের বাণী। সংসার থেকে যারা দূরে গিয়ে নিরাপদ হতে চায় তাদের উদ্দেশে কবি বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ

যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার।[৪০]

আর ভিক্ষুক হৃদয়ের অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার উদ্দেশে প্রেমিক বিবেকানন্দের বাণী ঃ

অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
'দাও, দাও'—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।[৪১]

অতীত স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে কখন গুরু-শিষ্য অখণ্ডের উপলব্ধি-সীমায় উপনীত হন, বিবেকানন্দের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় ঃ

প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।[৪২]

বিবেকানন্দ-জীবনের সব প্রেরণা ও বাণীর উৎসস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ তখন আর ব্যক্তিমানব নন, বিশ্বচৈতন্যের ধ্বনিমন্ত্র অনাহত বাণী।

৩৯। তদেব, পৃঃ ২৭৩

৪০। তদেব, পৃঃ ২৬৮-৬৯ ৪১। তদেব, পৃঃ ২৬৯ ৪২। তদেব, পৃঃ ২৭৩

কবিতার জগতে কালানুক্রমিক বিচারের ইতিহাস-মূল্য স্বীকার করেও একথা বলা যায় যে, কবির দৃষ্টি সময়সীমাকে অতিক্রম করেই চলে। বিবেকানন্দের কবিতায় 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার' ঘোষিত হবার অনেক আগেই 'My Play is Done' কবিতার সৃষ্টি। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত ঋতুতে লেখা এই কবিতাটির সঙ্গে স্বামীজীর দেহাবসানের মাত্র দু-বছর আগের বসন্ত ঋতুতে লেখা সেই অতুলনীয় পত্রটির ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গিতে কী আশ্চর্য মিল! ঐ বিদায়বেলার রাগিণী তাঁর কর্মজীবনের প্রখর মধ্যাহ্নেই ধ্বনিত হয়েছিল ঃ

...Ah ! open the gates !
to me they open must.
Open the gates of light, O Mother, to me Thy tired son.
I long, oh, long to return home !
Mother, my play is done.[৪৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দেখার দিনটিতে নরেন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন ঃ

মন, চল নিজ নিকেতনে!

সেই নিজ-নিকেতনের আহ্বান জীবনের সমগ্র কর্মকলরোলের মধ্যে মাঝে মাঝেই বিবেকানন্দের নিভৃতবাসী ধ্যানীসত্তাকে স্পর্শ করে গেছে।

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে যাবার দিন যত আসন্ন হয়েছে, শান্তির পিপাসাও তত তীব্রতর হয়ে উঠেছে। জীবনের সমস্ত বেদনা ও সংগ্রামের অন্তরালে স্থিরজাগ্রত আত্মার অভয় আলোক তিনি আপন প্রাণে প্রত্যক্ষ করেছেন ঃ

I look behind and after
And find that all is right.
In my deepest sorrows
There is a soul of light.[৪৪]

জীবনরুদ্রের ঝঞ্ঝাতাণ্ডব ধীরে ধীরে নিমীলিত ধ্যানের নিষ্কম্প দীপশিখায় পরিণত হতে চলেছে, ঋজুকুটিল নানা পথের অবসানে নদী এখন মহাসমুদ্রে মিলনোন্মুখ।

ঐ মহাশান্তির আলোক-উদ্ভাসিত বিবেকানন্দের ধ্যানস্তিমিত মূর্তির সামনে পাঠকচিত্ত স্তব্ধ, তন্ময়, সমাহিত। পরম শ্রদ্ধায় সে বিবেকানন্দকে আমরা পূজার আসনে আদর্শের সুদূর মহিমায় জ্যোতির্ময় সত্তারূপে কল্পনা করি।

কিন্তু আত্মীয় মনে করি সেই বিবেকানন্দকে যিনি মানুষের নারায়ণকে দুঃখদৈন্য বেদনা অপমানের অন্তরাল থেকে অসীম আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে চিরসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন, স্বাধীনতার অধিকারকে মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ জেনে স্বদেশ ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বন্ধন মোচনের মহাবাণী উচ্চারণ করে গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দুটি পত্রিকার নামের মধ্যেও জাগরণের আহ্বান—'উদ্বোধন'

৪৩। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VI, p. 176
৪৪। ibid., p. 441

এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত', ঐ নির্ভীক বেদান্তকেশরী একটি সমগ্র জাতির সুপ্তিভঙ্গের নিশ্চিত প্রতীক।

আমেরিকার স্বাধীনতাদিবস-স্মরণে রচিত 'To the Fourth of July' অথবা নবজাগ্রত ভারতাত্মার উদ্দেশে আহ্বান 'To the Awakened India' এই দুটি কবিতার মধ্যেই চিরস্বাধীন মানবাত্মার জয়গান। প্রথম কবিতাটিতে সূর্যোদয় ও সূর্যের আকাশ-পরিক্রমার রূপকে যুগ-যুগান্তের স্বাধীনতা-পূজারীদের আশা ও আনন্দের অভিব্যক্তি। দ্বিতীয় কবিতাটিতে বহু শতাব্দীর সুপ্তিভঙ্গের পর জাতীয় জাগরণের মহামুহূর্তে ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শের জয়গান।

স্বাধীনতা-সূর্যের উদ্দেশে সংগ্রামী সন্ন্যাসীর বন্দনা ঃ

Move on, O Lord, in thy resistless path !
Till thy high noon o'erspreads the world,
Till every land reflects thy light,
Till men and women, with uplifted head,
Behold their shackles broken, and
Know, in springing joy, their life renewed ![৪৫]

বিবেকানন্দের কবিতালোকে মনন ও আবেগের যে মহিমান্বিত মিলন ঘটেছে, তার সামান্য পরিচয় পাঠকদের কাছে নিবেদনের এই প্রয়াস স্বভাবতই দ্বিধান্বিত। যে দীপ্তি ও গভীরতায় এই চিন্তা ও অনুভূতিরাশি কাব্যরূপ লাভ করেছে, তার সামগ্রিক তাৎপর্য-উপলব্ধি শুধু মনন নয়, সাধন সাপেক্ষ। তবু যে তাঁর কবিতা আলোচনায় সাহসী হয়েছি, তার কারণ, পৃথিবীর সব কবিদের মতো বিবেকানন্দও 'স্বপ্নে' বিশ্বাস করতেন। এই 'স্বপ্ন' বা দিব্য কল্পনার বন্দনা-স্তোত্রটি কবিমনীষী বিবেকানন্দের যথার্থ পরিচায়ক ঃ

Thou dream, O blessed dream !
Spread near and far thy veil of haze,
Tone down the lines so sharp,
Make smooth what roughness seems.
No magic but in thee !
Thy touch makes deserts bloom to life,
Harsh thunder blessed song,
Fell death the sweet release.[৪৬]

৪৫। ibid., Vol. V, p. 440   ৪৬। ibid., Vol. VIII, Third Edition (1959), p. 168

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতভাবনা

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতভাবনার বিকাশে কতকগুলি পর্যায় বা স্তর লক্ষণীয়। এই স্তরগুলির সঙ্গে বিবেকানন্দের সঙ্গীতরুচি, শিক্ষা ও সাধনা ইত্যাদি সম্পর্কিত। ঐ প্রতিটি স্তরের মধ্যেই দেখি চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে জীবনের সঙ্ঘাত, ক্রমপরিণতি ও পূর্ণতার স্থিতি। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার ত্রিমুখী শক্তিধারা ও গতি সকল মানুষের জীবনছন্দকেই করে সংহত ও নিয়মিত, উন্নত এবং কুসুমায়িত। তাই বিবেকানন্দের সঙ্গীতভাবনায়ও দেখি ঐ তিনটি শক্তিরই খেলা ও বিস্তৃতি এবং ঐ ত্রিশক্তির পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়েই বিবেকানন্দের সঙ্গীতভাবনা ও সঙ্গীতজীবন পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল।

পূর্বাভাস

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১২ জানুয়ারি। তাঁর অভ্যুদয়ের প্রায় ৮৭ বছর পূর্বে রাজা রামমোহন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতের ও বাংলার ইতিহাসে দেখি ঊনবিংশ শতক ছিল এক জীবনজাগৃতির যুগ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল এক নবযুগের সূচনা।

ভারতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগও ছিল এক বিবর্তনের যুগ। সম্রাট বাহাদুর শাহ্ বা শাহ্ আলম ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে সমর্পণ করেন। তিনি ছিলেন দিল্লীর মসনদে আসীন ভারতের প্রায় শেষ মোগল সম্রাট। তাঁর দুর্বলতা ও শাসনকার্যে অক্ষমতার জন্য বহু বিদগ্ধ হিন্দু-মুসলমান সঙ্গীতশিল্পী তাঁর রাজদরবার পরিত্যাগ করে ভারতের সর্বত্র ও বিশেষ করে বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন।

স্মরণযোগ্য যে, মোগল সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ্জাহানের সময়ে (১৫৫৬-১৬৫৭) আগ্রা, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন ও দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজ্যের দরবারগুলিতে সঙ্গীতের যেরকম বহুল অনুশীলন ছিল, সম্রাট আওরঙ্গজেব বা আলমগীরের (১৬৫৮-১৭০৭) ও তাঁর পরবর্তী সময়ে হিন্দু রাজাদের ও মুসলমান নবাবদের দরবারে সঙ্গীতের অনুশীলন সে তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে ম্লান হয়েছিল। বিশেষ করে সম্রাট শাহ্ আলমের রাজত্বকালে দিল্লীতে ও দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে একদিকে সঙ্গীত-সরস্বতীর যে অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল, অন্যদিকে বাংলাদেশের ভাগ্যে তা-ই আশীর্বাদরূপে গণ্য হয়েছিল, কেননা দিল্লীর মসনদ থেকে আগত বহু বিদগ্ধ সঙ্গীতশিল্পী কলকাতা, হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, মুর্শিদাবার্দ, গোবরডাঙ্গা, বেতিয়া, ময়মনসিংহ-গৌরীপুর, আসাম-গৌরীপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে, রাজদরবারে ও জমিদারবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে, বাংলাদেশে অভিজাত সঙ্গীতানুশীলনের ক্ষেত্র প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল।

বিবেকানন্দের সঙ্গীতশিক্ষার পরিবেশ

কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ও শিমুলিয়ার* দত্তবাড়ি তখন কলাবতী বা ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের সাধনকেন্দ্র ও পীঠস্থানরূপে পরিচিত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীতসমারোহ ও সঙ্গীতপরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে বিশেষভাবেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা বিকাশের প্রসঙ্গে নানাভাবে, কিন্তু শিমুলিয়ার দত্তবাড়ির সঙ্গীতপরিবেশ ও সঙ্গীতসাধনা নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি আজ পর্যন্ত। ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরির বেশ প্রচলন ছিল তদানীন্তনকালে। তাছাড়া ঊনবিংশ শতকের পূর্ব থেকেই কৃষ্ণকীর্তন, পদাবলীকীর্তন, ঢপকীর্তন, সহজিয়াগান, হাফ্‌আখড়াই, কথকতা, রামায়ণগান, চণ্ডীর গান, শ্যামাসঙ্গীত, কালীকীর্তন প্রভৃতি গীতরীতির প্রচলন ছিলই। সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, দাশরথি রায়, গোবিন্দ অধিকারী, দেওয়ান রঘুনাথ, নিধুবাবু প্রভৃতি সঙ্গীতরচয়িতাদের গান বাংলার সঙ্গীতসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া বৈঠকী গান হিসাবে টপ্পাচালের বাংলা খেয়ালসঙ্গীত বাংলার দুর্গামণ্ডপ ও চণ্ডীমণ্ডপগুলিকে মুখরিত করে রেখেছিল।

রবীন্দ্রনাথ যেমন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সমবেত হিন্দু ও মুসলমান কলাবিদ্ তথা ওস্তাদদের উচ্চাঙ্গের ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন এবং অনেক সময় তাঁদের গান শুনে শুনে অনুকরণ ও অভ্যাস করতেন প্রথমের দিকে, তেমনি শিমুলিয়ার দত্তবাড়িতেও প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও রবিবারে দুদিন কলাবতী সঙ্গীতের আসর বসত, তা নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দ সুকুমার বয়স থেকেই শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং কিছু কিছু গানের নকলও করতেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য গৃহপতিরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষ সমঝদার ও উৎসাহদাতা ছিলেন, তেমনি শিমুলিয়ার দত্তবাড়িতেও নরেন্দ্রনাথের পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ দত্ত, পিতা বিশ্বনাথ দত্ত প্রভৃতিরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসগ্রাহী ও সমর্থক ছিলেন। শোনা যায়, 'পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ দত্তের কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল এবং বেশ গাহিতে পারিতেন...।'[১] পিতা বিশ্বনাথ দত্ত বিশেষভাবে সঙ্গীতজ্ঞানী ছিলেন। শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ 'পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্ত জীবনের এক সময়ে ওস্তাদ রাখিয়া কিছু সঙ্গীতও অভ্যাস করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে অবস্থানকালে তিনি আপনার মনে মাঝে মাঝে বেশ সুস্বরে গাহিতেন।'[২]

বিবেকানন্দের সঙ্গীতশিক্ষা

আইন ব্যবসায়ীরূপে বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলেন। মাঝে মাঝে কর্মোপলক্ষে লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর,

---

* শিমুলিয়া শব্দ থেকে স্থানটির চলিত 'শিমলা' নামের উদ্ভব হয়েছে।

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃঃ ৫৪ ২। তদেব

রাজপুতানা, ইন্দোর, রায়পুর, বিলাসপুর প্রভৃতি অঞ্চলে থাকার জন্য তিনি সেই সেই স্থানে খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, গজল প্রভৃতি গান শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই বিবেকানন্দ সঙ্গীত-সংস্কারের অধিকারী হয়েছিলেন প্রধানত তাঁর পিতার কাছ থেকেই। তাছাড়া অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু), সুরেন্দ্রনাথ দত্ত (তমুবাবু), বেণী ওস্তাদ, ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ প্রভৃতি বিবেকানন্দের সঙ্গীতরুচি ও সঙ্গীতানুশীলনকে সচল ও প্রাণবান করেছিলেন।

বিবেকানন্দের সঙ্গীতশিক্ষার বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ থাকলেও সংস্কৃতিবান পিতা যে তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা অমৃতলাল (হাবুবাবু) ও সুরেন্দ্রনাথের (তমুবাবু) মতো বিবেকানন্দেরও সঙ্গীতশিক্ষার জন্য সকল রকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তখন কলকাতার ও কলকাতার আশেপাশের অভিজাত সমাজে ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ গানের বিশেষ প্রচলন ও সমাদর ছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্ যখন কলকাতায় মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে এসে বসবাস করেন তখন থেকে বাংলাদেশে ঠুংরিগানের বেশ প্রচলন হয়। ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ, রামপুর-দরবারের উজির খাঁ, গয়ার কানাইলাল চেঢ়ী, ওস্তাদ আহম্মদ খাঁর শিষ্য বেণী ওস্তাদ (বেণী গুপ্ত) প্রভৃতির কাছে বিবেকানন্দ সঙ্গীতের প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন বিশেষভাবে ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ ও বেণী গুপ্তের কাছে। আহম্মদ খাঁ বেশ কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন এবং শোনা যায় আন্দুলের রাজবাড়িতে কিছুদিন সঙ্গীতশিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কাছে তিনি খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা প্রভৃতি শিক্ষা করেছিলেন ছেলেবেলায়। তাছাড়া এসরাজ, পাখোয়াজ, তবলাও তিনি শিক্ষা করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের গীতিকার ও সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন।

সুতরাং বাংলা ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ, ধামার এবং ব্রহ্মসঙ্গীতে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। তাছাড়া কীর্তনগান, বৈঠকী বাংলা টপ্‌খেয়াল, শ্যামাসঙ্গীত, কবীর ও সুরদাস প্রভৃতি সাধকদের হিন্দী ভজন গান তিনি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন।

বিবেকানন্দের বয়স যখন আঠারো-উনিশ বছর, অর্থাৎ ১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি ধ্রুপদ-গায়করূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'The Life of Swami Vivekananda' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ 'Though Naren learnt to play with mastery on Pakhawaj, Tabla, Esraj and Sitar, his forte was vocal music in which he even excelled the masters who taught him singing. He was taught and trained until he became widely known as an accomplished singer of high calibre.'[৩] ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'Swami Vivekananda : Patriot-Prophet' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'Narendra was an expert singer in classical music. He inherited that taste from his father who practised

৩। The Life of Swami Vivekananda, Vol. I—His Eastern and Western Disciples, Advaita Ashrama, Calcutta, Fifth Edition (1979), p. 43

it for sometime in his youth. Narendranath learned music from an *Ostad* (teacher) named "Beni". The writer has heard from his mother that Kasi Ghosal was also one of his (Narendranath's) *ostads.* It is said that Kasi Ghosal used to play *pakhwaj,* etc., at the Adi Brahmo Samaj. Perhaps he learnt to play on the same instrument and along with it on *Bauya* and *Tabla* from him.'[৪] কিন্তু প্রকৃত কথা কি, আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতরচয়িতা, গায়ক ও বাদক (মৃদঙ্গবাদক) কাশী ঘোষালের কাছে বিবেকানন্দ পাখোয়াজ ও তবলা শিক্ষা করেছিলেন কিনা তার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে পাখোয়াজ ও তবলার সঙ্গে সঙ্গে এসরাজ শিক্ষা করেছিলেন একথা ঠিক।

স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর ছিল উদাত্ত ও সতেজ, সুমিষ্ট ও গম্ভীর। শিশুকাল থেকেই পিতা বিশ্বনাথ দত্তের সযত্ন শিক্ষায় ও তত্ত্বাবধানে বিবেকানন্দ উচ্চাঙ্গ ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ করেন—সেকথা বলেছি। শিশুকালের সঙ্গীতপ্রবণতা ও সঙ্গীতসংস্কার তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনকাল থেকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরিব্রাজক জীবন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গীতানুশীলনের জীবন ছিল সবল।

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল রচিত "নববৃন্দাবন" নাটকে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে (বিবেকানন্দ) অভিনয়ও করেছিলেন।'[৫] শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ-পরিচালিত মাসিক 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় স্বামী প্রভানন্দ নিয়মিতভাবে 'নববৃন্দাবন' নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ '("নববৃন্দাবন" নাটকে) যোগিবর অভেদানন্দজীর* ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তদানীন্তন ব্রাহমসমাজের সদস্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত, আমাদের প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ।'[৬] স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন ঃ '...গায়কের অভাব মিটাইবার জন্য সুগায়ক নরেন্দ্রনাথ নববিধানের অনুরোধে ঐ যোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।'[৭] 'শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন দর্শকরূপে উপস্থিত সেদিন অন্তত নরেন্দ্রনাথ যোগিবরের অভিনয় করেছিলেন।'[৮] যোগিবর অভেদানন্দের ভূমিকায় নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দ নাকি একটি বাউল সুরের, একটি কীর্তন সুরের ও তিনটি ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত গেয়েছিলেন—যদিও এ সম্বন্ধে কিছু মতান্তর আছে। মোট কথা, এ থেকে বোঝা যায় যে, বিশেষ সঙ্গীতখ্যাতির জন্যই নববিধানের কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে বিবেকানন্দ 'নববৃন্দাবন' নাটকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৪। Swami Vivekananda : Patriot-Prophet—Bhupendranath Datta, Nababharat Publishers, Calcutta, 1954, p. 155

৫। সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ৩১

* এই 'অভেদানন্দ' নাম কল্পিত, এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ কালীপ্রসাদ চন্দ্রের সন্ন্যাসনাম 'অভেদানন্দ' (স্বামী অভেদানন্দ) নয়।

৬। বিশ্ববাণী, ৩৬ বর্ষ, পৃঃ ৪২২

৭। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৬৬

৮। বিশ্ববাণী, ৩৬ বর্ষ, পৃঃ ৪২২

বিবেকানন্দের সঙ্গীতজীবন

স্বামী বিবেকানন্দের ছিল সর্বতোমুখী প্রতিভা। কর্মচঞ্চল অথচ সংযত ও জ্ঞানানুসন্ধানী ছিল তাঁর জীবন। ইতিহাস, গণিত, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে ক্রীড়াকৌতুক, নাটকানুষ্ঠান ও অভিনয়, রন্ধনবিদ্যা, দাবাখেলা, নৌকাচালনা, অসিচালনা, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়েও বিবেকানন্দ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মোট কথা, আবাল্য তিনি ছিলেন মেধাবী, তেজস্বী, প্রত্যুৎপন্নমতি, সহৃদয় ও সাহসী এবং তারই জন্য সকল কিছু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মতো সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মধ্যে সর্বতোমুখী প্রতিভা লক্ষ্য করেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার বলেছিলেন ঃ নরেনের মধ্যে আঠারোটি শক্তি খেলা করছে। 'নরেন্দ্র খুব ভাল, একাধারে কত গুণ—গাইতে, বাজাতে, লিখতে, পড়তে।'

ছাত্রাবস্থায়ই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিবেকানন্দের মিলন হয়। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে প্রথমে মিলিত হন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের* নভেম্বর মাসে কলকাতায় শিমুলিয়া পল্লীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে। তারপর তখনকার জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের (এখন যার নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) অধ্যাপক হেস্টি সাহেবের প্রেরণায় ঈশ্বরপাগল শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি দেখতে যান দক্ষিণেশ্বরে। তাছাড়া বহুবার দক্ষিণেশ্বরে ও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভক্তের বাড়িতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিবেকানন্দের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে কিন্তু সঙ্গীত ; অর্থাৎ বিবেকানন্দের সুমধুর গানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আকৃষ্ট হন বিবেকানন্দের প্রতি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রথমে গান করেন বিবেকানন্দ দুটি ঃ (১) 'মন চল নিজ নিকেতনে...' (ব্রাহ্মসমাজের অযোধ্যানাথ পাকড়াশী রচিত) ও (২) 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে...' (বেচারাম চট্টোপাধ্যায় রচিত)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গান শুনেই বুঝেছিলেন নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দ তাঁর 'আপন লোক'। তারপর কত গান হয়েছে গাওয়া—ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, কীর্তন, বাংলা ও হিন্দী ভজন প্রভৃতি, নিবিড় থেকে নিবিড়তম হয়েছে তাঁর জীবনের সম্পর্ক দক্ষিণেশ্বরতীর্থপতি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ রচিত কয়েকটি গানও বিবেকানন্দ গেয়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে। যেমন, (১) ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে যে গানটি রবীন্দ্রনাথ লিখে নিজেই সুর যোজনা করেছিলেন ও গীতরীতি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দকে সে গানটি ঃ

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি
বল দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়...।

শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কুড়ি এবং বিবেকানন্দের আঠারো বছরের কিছু বেশী। (২) 'দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন...।' (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) (৩) 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা...।' (বাগবাজারে বলরাম বসুর

---

* কোন মতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে।

বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে গাওয়া) (৪) 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ...।' তাছাড়া বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) প্রখ্যাত ধ্রুপদগায়ক যদুভট্ট কর্তৃক হিন্দী 'আজ বহত সুমন্দ পবন...' এবং 'কৌন রূপ বনি হো রাজাধিরাজ...' গান দুটির বাংলায় রূপান্তর 'আজ বহিছে বসন্ত পবন, সুমন্দ তোমার সুগন্ধ হে...' এবং 'মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ...' গান দুটি; রবীন্দ্রনাথ রচিত 'তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন...' (বড়োহংস-সারঙ্গ—চৌতাল) প্রভৃতি গান বিবেকানন্দ গাইতেন। এবং একথা সকলেরই বিদিত যে ঐ বড়োহংস-সারঙ্গ—চৌতাল গানটির ছাঁচে তিনি তাঁর সৃষ্টি বিষয়ক—'একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাল-হীন...' প্রভৃতি গানটি রচনা করেন। এই গানটির ভাবতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন...' প্রভৃতি, গুরু নানক রচিত 'গগনময় থাল রবি, চন্দ্র দীপক বনে...'[৯] এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত বাংলা গান 'গগনের থালে রবি-চন্দ্র-দীপক জ্বলে...' প্রভৃতি গানের ভাবতত্ত্বের একান্ত মিল পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ ভাবের সাধক ছিলেন, তাই গানের কথা বা সাহিত্য ও সুরের মিশ্রণে যে অপার্থিব রস ও ভাব সৃষ্টি হয় তারই তিনি মরমী বোদ্ধা ও অনুভাবক ছিলেন।

ধ্রুপদের পথচারীরূপে বিবেকানন্দ হরিদাস স্বামী, বৈজু বাওরা, নায়ক গোপাল, মিঞা তানসেন প্রভৃতি বিদগ্ধ শিল্পী ও সুরসাধকদের গানই গাইতেন। তাছাড়া তিনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রচিত 'মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়...' এবং ব্রাহ্মসমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গীতরচয়িতাদের এবং সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত কীর্তনাদি গান করতেন সেকথা বলেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দের গানে কখনও সমাধিস্থ হতেন, কখনও বা প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতেন।

বিবেকানন্দের ভাবসমৃদ্ধ গান কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রাণকে আলোড়িত ও সমাহিত করত তার দু-একটি নিদর্শন যেমনঃ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ জুলাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে। বহু ভক্ত সমাগত। বিবেকানন্দ গান করলেন একটির পর একটিঃ

(১) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা...।
(২) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি...।
(৩) কতদিনে হবে সে প্রেম-সঞ্চার...।
(৪) এস মা এস মা, ও হৃদয়-রমা, পরাণ-পুতলী গো...।
(৫) আমার মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা...।
(৬) কখন কি রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী...।
(৭) কভু কমলে কমলে থাকো মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী...।

জীবনে ঘুম-পাড়ানো, আবার ঘুম-ভাঙানো সেই গান। গানের সুরতরঙ্গে গৃহের পরিবেশ

৯। ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন গ্রন্থের ত্রয়োদশ সংস্করণের ষড়বিংশ অধ্যায়ে হিন্দী-সঙ্গীতের পর্যায়ে এ-গানটির রচনাশৈলী একটু পৃথক।

ও আকাশবাতাস সমাচ্ছন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কখনও সমাধিস্থ, কখনও আনন্দে পুলকিত, কখনও অশ্রুসিক্ত। গায়ক বিবেকানন্দও আত্মসমাহিত, যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

স্বামী অভেদানন্দ লিখিত 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থেও বিবেকানন্দের একটি সঙ্গীতপ্রসঙ্গ আছে। স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেনঃ 'একবার রামবাবুর বাড়িতে নরেন্দ্রনাথের ধ্রুপদগানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। রামবাবু প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী গোপাল মল্লিককে* নরেন্দ্রনাথের গানের সহিত বাজাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।... নরেন্দ্রনাথ গান আরম্ভ করিল এবং গোপাল মল্লিক মহাশয় অপূর্ব ছন্দে পাখোয়াজ বাজাইতে লাগিলেন। ...সেইদিন নরেন্দ্রনাথের গান কী যে অনবদ্য হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বলরাম বসুর বাড়িতেও নরেন্দ্রনাথের ধ্রুপদগানের ব্যবস্থা হইত।'[১০]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গোপাল মল্লিক মহাশয় তদানীন্তন বাংলার সমাজে একজন শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজী নামে সমাদৃত ছিলেন, সুতরাং তাঁর পাখোয়াজ সঙ্গতের সঙ্গে গান করতে হলে গায়কের যথেষ্ট পরিমাণে সুর, তাল ও লয়জ্ঞানের পরিপক্কতা থাকা উচিত।

বিবেকানন্দের সঙ্গীতরচনা

প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দ গান রচনা করেছিলেন মাত্র পাঁচটি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক গান রচনা করেছিলেন একটি, যাদের ভাষা, সাহিত্যসৌন্দর্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধি ছিল ভাবগম্ভীর ও অতুলনীয়। তিনি রচনা করেছিলেনঃ

(১) একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ,
অতীত-আগামী-কাল-হীন...(বড়োহংস-সারঙ্গ—চৌতাল),
(২) নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ,
নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, ...(বাগীশ্বরী—আড়াঠেকা),
(৩) তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,
বম্ বব বাজে গাল,...(কর্ণাটি—একতাল),
(৪) হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি...(সাহানা-কানাড়া—সুর-ফাঁকতাল),
(৫) মুঝে বারি বনোয়ারী সৈঁইয়া,
যানেকো দে...(ধানীমিশ্র—কাওয়ালী),
(৬) শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক-গান
খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময় ॥

---

* স্বামী অভেদানন্দও কিছুদিন গোপাল মল্লিকের নিকট পাখোয়াজ শিক্ষা করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে বিবেকানন্দের ধ্রুপদগানের সঙ্গে তিনি পাখোয়াজ বাজাতেন।

১০। আমার জীবনকথা—স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ (১৯৭৩), পৃঃ ১৪৪

উপরোক্ত আরাত্রিক গানটি পরে তিনি সামান্য পরিবর্তন করেন। গানগুলির রচনাকাল নিয়ে কিছুটা মতদ্বৈধ আছে। আমরা 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্বামীজীর গানের খাতা'[১১] শীর্ষক প্রবন্ধটি এবং স্বামী অভেদানন্দ রচিত 'আমার জীবনকথা' ও শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থ দুটির উল্লেখ করব গানগুলির রচনার কাল বা সময় সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে। স্বর্গত প্রমথনাথ বসু লিখিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' ও স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখিত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থেও ঐ গানগুলি রচনার কাল সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ লিখিত 'স্বামীজীর গানের খাতা' স্বর্গত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের দৌহিত্রের স্ত্রীর নিকট থেকে সংগৃহীত। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পর (প্রথমবার আমেরিকা যাবার পূর্বে) ঐ প্রয়োজনীয় খাতাখানি স্বামী বিবেকানন্দ মন্মথবাবুর কন্যাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। 'স্বামীজী মন্মথবাবুর কন্যার জন্য নিজের হাতে যে কয়টি গান এই খাতায় লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রথমটি হইল "প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো"।'[১২] এ গানটি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে খেতড়ির রাজার গৃহে (জয়পুরের বাড়িতে) শুনেছিলেন—একথা সকলেই জানেন। ঐ গানের খাতায় পেনসিলে লেখা 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ' গানটিও আছে, এবং গানটি স্বামীজী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নির্বিকল্প সমাধি লাভের পরেই রচনা করেন, এবং এর সমর্থনও পাওয়া যায় স্বামী অভেদানন্দ লিখিত 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিতে। স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেনঃ 'এই উপলব্ধির (নির্বিকল্প সমাধির) পর নরেন দুটি গান রচনা করেন। "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ" ইত্যাদি এবং "একরূপ অরূপ নাম বরণ, অতীত আগামী কাল হীন। দেশহীন সর্বহীন নেতি নেতি বিরাম যথায়" ইত্যাদি। এই দুটি গান গাহিয়া আমাদিগকে শুনাইতে লাগিলেন।'[১৩]

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 'উদ্বোধনে' লিখেছেনঃ 'তাঁহার (স্বামী বিবেকানন্দের) রচিত গানগুলির মধ্যে তিনটি গান এই খাতায় পাওয়া গিয়াছে, যেগুলি নিঃসন্দেহে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭-র মধ্যেই রচিত। কারণ এই তিনটি গানের মধ্যে যেটি এই খাতায় শেষে লেখা হইয়াছে, সেই "তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা" গানটি মাস্টারমশায় ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭ শিবরাত্রির দিন সকালবেলা স্বামী শিবানন্দের কণ্ঠে গীত হইতে শুনিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, "এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন"।'[১৪] এর সমর্থনে স্বামী অভেদানন্দ রচিত 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে বলিঃ 'শিবরাত্রির সময় নরেন্দ্রনাথ শিব-বিষয়ক একটি গান রচনা করিয়া গাহিতে লাগিল,

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বব বম বাজে গাল।
ডিমি ডিন ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল-মাল ॥
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে।
ধক ধক ধক মৌলিবন্ধ, জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল ॥

১১। উদ্বোধন, ৭৭ বর্ষ, পৃঃ ৪৪৯-৫৮ ১২। তদেব, পৃঃ ৪৫০
১৩। আমার জীবনকথা গ্রন্থের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য।
১৪। উদ্বোধন, ৭৭ বর্ষ, পৃঃ ৪৫১-৫২

নরেন্দ্রনাথ শিবের আবেশে তন্ময় হইয়া গানটি রচনা করিয়াছিল এবং এমনই ভাবে বিভোর হইয়া গান করিয়াছিল যেন ভোলানাথ শিব নিজেই নিজের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সে এক সুন্দর পরিবেশ! নরেন্দ্রনাথের কিন্নরকণ্ঠে ভাবগম্ভীর সেই গানের স্মৃতি আজিও আমার মনে জাগরূক আছে।'[১৫]

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ লিখিত 'স্বামীজীর গানের খাতা' নিবন্ধের ৪৫৫ পৃষ্ঠায় 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ' গানটির এবং ৪৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় 'একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ' গানটির স্বরলিপি বা স্বরলিখন এবং ৪৫৬ পৃষ্ঠার পর এর একটি আলোকচিত্রও দেওয়া আছে। স্বরলিপিতে গানের কথার পাশে স্বরবর্ণ এ, আ, ই প্রভৃতি সঙ্কেত আছে—যেগুলিকে সঙ্গীতশাস্ত্রে 'রসকলাত্মক উচ্চারণকলা' বলে; অর্থাৎ সঙ্গীতের কথায় বা সাহিত্যে স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় বর্ণেরই সমাবেশ থাকে এবং সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে এ দুটি বর্ণকে শক্তি ও শিব বলে কল্পনা করা হয়েছে। স্বরবর্ণ শক্তি, তাই কথায়, সাহিত্যে ও রচনায় অর্থের সঙ্গে সঙ্গে রস ও ভাবের স্পন্দন সৃষ্টি করে। এই স্পন্দনই কথা বা সাহিত্যের প্রাণ। ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি গীতরীতির কথায় রস ও ভাব সৃষ্টি করতে হলে অ, আ, ই, উ প্রভৃতি রসকলাত্মক স্বরবর্ণের ব্যবহার করতে হয়। বিবেকানন্দ সঙ্গীতের বিজ্ঞান ও দর্শনচিন্তায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই স্বরলিখনে এই স্বরবর্ণের ব্যবহার করেছেন গানগুলিকে স্বরের ও সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য।

বিবেকানন্দ পরে 'একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ' গানটির কথায় (সাহিত্যে) বা রচনায় কিছু কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। ঐ গানটির স্বরলিপির সঙ্গে উল্লেখ করা আছে 'বড়-সারঙ্গ' (অর্থাৎ বড়োহংস-সারঙ্গ)। সারঙ্গকে চলিত কথায় 'সারেঙ' নামেও ব্যবহার করা হয়।[১৬]

'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা'—শিব-বিষয়ক গানটির কথায়ও কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়; যেমন, 'তাথেইয়া' বা 'তাথইয়া' শব্দের স্থানে 'তাত্থীয় তাত্থীয়' সংশোধন বা ব্যবহার করেছেন।* এই খাতায় গানগুলি প্রায় সমস্তই পেনসিলে লেখা। বর্তমান প্রবন্ধে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রকাশিত 'স্বামীজীর গানের খাতা'র কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম্ প্রাসঙ্গিক আলোচনারূপে। গানের খাতাটির ঐতিহাসিক মূল্য যে যথেষ্ট সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপানি' গানটির রচনাকাল ঠিক জানা যায়নি, তবে গানটি যে শ্মশানচারী ভোলানাথ শিবের মহিমা বর্ণনায় মুখরিত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর 'মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া যানেকো দে' গানটি কোন প্রসিদ্ধ হিন্দীগানের অনুকরণে রচিত এবং এতে পরম নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নায়িকা কোন সখীর আকুল মিনতির সঙ্গে আত্মনিবেদনের ভাব সুস্পষ্ট। আর আরাত্রিকের বাংলা গান বা ভজনটি বলিষ্ঠ শব্দবিন্যাস ও অনুপ্রাসসজ্জা নিয়ে ভক্তি সরসতার সঙ্গে এক অপার্থিব আনন্দ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

১৫। আমার জীবনকথা, পৃঃ ১০৭-০৮

১৬। উদ্বোধন, ৭৭ বর্ষ, পৃঃ ৪৫৬ (গানের কথায় পরিবর্তন দ্রষ্টব্য)

* পরিবর্তিত শব্দগুলি উদ্বোধন, ৭৭ বর্ষ, ৪৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিবেকানন্দের সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা

সঙ্গীতের ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও ঔপপত্তিক বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিবেকানন্দের জ্ঞান ছিল গভীর এবং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থ তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে। বরানগর মঠ স্থাপিত হবার পূর্বেই গীতরচনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া কাশীপুর বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সন্নিধানে থাকাকালেই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিবেকানন্দ 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থের রচনা ও সংকলন কার্য আরম্ভ করেন। শোনা যায়, তারও পূর্বে এবং সন্ন্যাস গ্রহণেরও পূর্বে 'সঙ্গীত' বিষয়ক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ নাকি তিনি রচনা ও প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোন সন্ধান আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিংবা প্রমথনাথ বসু যে তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগে উল্লেখ করেছেন—'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' নামক একটি বৃহৎ মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন—সেটি ঐ 'সঙ্গীত' বিষয়ক প্রবন্ধ থেকে অভিন্ন কিনা তা-ও ঠিক জানা যায় না। তাছাড়া 'সঙ্গীত কল্পতরু' সঙ্গীতগ্রন্থে প্রকাশিত 'ভূমিকা' ও ঐ 'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' প্রবন্ধটি এক কিনা তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে অনুমান হয় যে, 'সঙ্গীত কল্পতরু'র ভূমিকা ও 'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' একই নিবন্ধ।

'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থ যখন ১১৮ নং আপার চিৎপুর রোডে অবস্থিত আর্য-পুস্তকালয় থেকে 'শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ. ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক' কর্তৃক সম্পাদিত ও ১ নং উমেশ দত্ত লেন থেকে 'জ্ঞান যন্ত্রে' শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় তখন বিবেকানন্দের বয়স মাত্র তেইশ বৎসর। বিবেকানন্দ 'গীতগোবিন্দ' পদগানেরও একটি অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু পাখোয়াজ ও তবলা বিষয়ক কোন বাদ্যযন্ত্রের গ্রন্থ তিনি রচনা করে প্রকাশ করেছিলেন কিনা তার সঠিক কোন প্রমাণ বা নিদর্শন পাওয়া যায় না—যদিও ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সেকথা উল্লেখ করেছেন তাঁর ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর জীবনীতে।

'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থের নাম ও বিষয়বস্তুর অনেক অংশ পরে পরিবর্তিত হয়ে বটতলা থেকে 'সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত' নামে প্রকাশিত হয় (নূতন প্রথম সংস্করণরূপে ১২৯৯ সালের বৈশাখ মাসে) এবং তা থেকে বিবেকানন্দ-লিখিত ভূমিকাটি বহু অংশে পরিবর্তিত ও বর্জিত হয়। ১২৯৪ সালের ভাদ্র মাসে বৈষ্ণবচরণ বসাক মহাশয় তাঁর নূতন সংস্করণের মুখবন্ধে এইকথা বলেন ঃ 'প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, ইহার সংকলন-কার্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ. মহাশয়ই প্রথমত ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমিই ইহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।'[১৭]

১৭। উদ্ধৃত ঃ সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু, পৃঃ ১৩৮

সঙ্গীততত্ত্ব-ভাবনায় বিবেকানন্দ

সঙ্গীতভাবনা সঙ্গীততত্ত্ব-ভাবনা ছাড়া প্রাণহীন ও মূল্যহীন। সঙ্গীতভাবনার পরিধি বিস্তৃত হলেও তার প্রাথমিক উপকরণ সার্থক বহিরাবরণকে নিয়ে, কিন্তু তাছাড়াও আছে আন্তরিকতত্ত্ব বা ভাবতত্ত্ব যা সার্থক করে সঙ্গীতের জীবনছন্দকে বা প্রাণস্পন্দনকে। শ্রুতি, স্বর, রাগরাগিণী, মূর্ছনা, আরোহী প্রভৃতি বর্ণ, অলঙ্কার, তাল, লয় ও বিচিত্র গীতরীতি প্রভৃতির প্রয়োজন সঙ্গীতের বাইরের রূপকে সাজানোর জন্য, অন্তররূপ হল রসতত্ত্ব, ভাবতত্ত্ব ও রাগরাগিণীদের মাধুর্যময় মূর্তিতত্ত্ব এবং এখানেই প্রয়োজন অধ্যাত্মদৃষ্টি ও জীবনের অনুভূতি। বিবেকানন্দের সঙ্গীতভাবনায় এই উভয় দিকেরই ছিল বিকাশ। তিনি ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পূর্ণ চেতনা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থের কলেবর সাজিয়েছেন ঔপপত্তিক আলোচনা দিয়ে এবং সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে দর্শনের দৃষ্টি ও অধ্যাত্মসাধনার অনুভূতি নিয়ে অপরূপভাবে প্রকাশিত করেছেন সঙ্গীতের প্র্যাক্টিক্যাল বা ব্যবহারিক অংশ। তাই তাঁর সঙ্গীতভাবনায় ও সঙ্গীতের তত্ত্বভাবনায় দেখি দুয়েরই সমন্বয়—ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক সঙ্গীতভাবনার পূর্ণ পরিণতি।

'সঙ্গীত কল্পতরু' রচনা ও সংকলনের প্রায় একই সময়ে (১৮৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) বিবেকানন্দ রচনা করেন 'একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ' প্রভৃতি পাঁচখানি গান—যেগুলি সাহিত্য, ছন্দ ও রস সম্পদে এবং তত্ত্বসৌন্দর্যে পূর্ণ। তিনি 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থে ঔপপত্তিক ও বৈজ্ঞানিক অংশের আলোচনারূপে প্রথমেই পরিচয় দিয়েছেন সঙ্গীত ও বাদ্যের, কেননা সঙ্গীত ও সঙ্গীতের সঙ্গতি রক্ষা করে বাদ্য, তাই দুটির সার্থকতা সঙ্গীতে সমধিক। তিনি সাঙ্গীতিক শব্দ ও শব্দকম্পনের কারণের পরিচয় দিয়েছেন বিজ্ঞানদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন শব্দকে বা শব্দতরঙ্গকে তিনি তুলনা করেছেন বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার সঙ্গে। তারপর পরিচয় দিয়েছেন সঙ্গীতের পরিমাপক সুর (টিউন) সম্বন্ধে—যা স্বর বা টোনেরই ফলশ্রুতি বলা যায়। যদিও সুর ও স্বর (টিউন বা টোন) ঠিক এক কথা নয়, তাহলেও সুরের (টিউনের) রূপ ও প্রকাশকে সার্থক করে স্বর বা টোন। তারপর আলোচনা করেছেন 'সঙ্গীত কল্পতরু'র ঔপপত্তিক অংশে স্বরগ্রামের রহস্যকথা। স রি গ ম প ধ নি—এই সাত স্বরকে নিয়ে গঠিত হয় স্বরগ্রাম এবং এই স্বরগ্রামের ষড়জ, ঋষভাদি স্বরনামগুলির পরিচয় দিয়েছেন তিনি অভিনবভাবে। বিবেকানন্দ সকল সময়েই সকল মতবাদ ও ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, মুনি ভরত (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক—খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) বীণার (চলবীণা ও অচলবীণার কথা) উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন বীণার তারকে অঙ্গুলির দ্বারা ঘর্ষণ করে ক্রমোচ্চ-বিকাশের মাধ্যমে ষড়জাদি সাতস্বরের স্বরস্থান নির্ণয় করতে।* বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রাচীন সমাজবাসী মানুষ কিভাবে প্রকৃতির তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে শব্দতরঙ্গ বা শব্দের কম্পন থেকে

---

* মুনি ভরত সাত-তার (তন্ত্রী)-যুক্ত চিত্রা ও ন-তার-যুক্ত বিপঞ্চী বীণার উল্লেখ করেছেন। এই চিত্রা-ই (চিত্রাবীণা-ই) বর্তমান সেতারের পূর্বরূপ।

সাঙ্গীতিক স্বরগুলির রূপ ও স্থান নির্ণয় করেছিল তা লক্ষ্যের বিষয়। তিনি বলেছেনঃ 'যে হৃদয় প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি হইতে বর্ষার ভেকের ঘর্ঘর রবে নাচিয়া উঠিত...ক্রমে আমরা দেখিব যে, তাঁহারা এই অতি দুরূহ বিজ্ঞানকে মধুময়ী কল্পনা সাহায্যে কি প্রকারে সর্বজন-মনোরম করিয়াছেন।'[১৮] বিবেকানন্দের বর্ণনা এখানে রসপূর্ণ ও প্রাণময়ী, তিনি ছন্দ ও শব্দ চয়নে বর্ণনার মধ্যে এক অপূর্ব সাহিত্যসম্পদ সৃষ্টি করেছেন। শব্দঝঙ্কার ও অলঙ্কারশোভায় বিবেকানন্দের সঙ্গীতবর্ণনার ভাষা এখানে সচেতন ও সতেজ।

তিনি সাতস্বরের উচ্চারণ বা প্রকাশ সম্বন্ধেও বলেছেনঃ সঙ্গীতের কথা বা সাহিত্য* উচ্চনীচ ও কোমলকঠিন স্বরব্যঞ্জনার মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া উচিত। তাছাড়া সকল স্বরই উচ্চনীচ কম্পনসংখ্যার সাহায্যে সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিজ্ঞানও অনুরূপ সিদ্ধান্তই করে। সঙ্গীতের কোমল ও তীব্র স্বরগুলিও শব্দকম্পনেরই উচ্চনীচ প্রকাশ।

তিনি বাদ্যযন্ত্রগুলিকে স্বরে ও সুরে বাঁধার কথাও বলেছেন, কারণ স্বরসঙ্গতি ও সুরসাম্য ছাড়া সঙ্গীতের প্রাণবস্তু কোনদিনই সবল হতে পারে না। ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, কীর্তন প্রভৃতি গীতরীতির গঠন ও প্রকাশভঙ্গির কথা নিয়েও তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ 'বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশে কেবল ধ্রুপদেরই পরিচালনা ছিল। মুসলমানদের রাজত্বের পর খেয়াল টপ্পা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।'[১৯]

তিনি রাগ ও রাগিণীর বিভাগের সার্থকতা স্বীকার করেছেন। এবং রাগরাগিণী যে নৈসর্গিক শব্দসৌন্দর্যেরই বিচিত্র ও সুসঙ্গত রূপ ও বিকাশ ঐ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বিভিন্ন ভাষার গঠন ও গতিপ্রকৃতির কথা স্বীকার করেছেন ও বলেছেন যে, বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গের গান রচনা ও তাদের প্রকাশ করা সম্ভব। জাতীয় ভাষায় গান রচনা করলে গানের অর্থ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই বাংলা ভাষায় গান রচনা করার সার্থকতা যথেষ্ট। বিবেকানন্দের এই মন্তব্য বলিষ্ঠ ও অর্থপূর্ণ।

বিবেকানন্দ ভারতীয় সঙ্গীতকে উপলক্ষ করে জাতীয় জীবনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছেনঃ 'আমাদের দেশে সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তার স্রোত যে প্রকারে বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সঙ্গীতেও তাহা লক্ষিত হয়।

'যাহা হইয়া গিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক আর কিছুই হইতে পারে না, এই বিশ্বাস জাতীয় জীবনে দৃঢ় প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার অভাবই এইরূপ বিশ্বাসের মূল কারণ। প্রাচীনেরা কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া ঐ-সকল রাগরাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, লোকে সে-বিষয়ের কোনও অনুসন্ধান করে না। কেবল তাঁহারা যেগুলি করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করাই যথেষ্ট বিবেচনা করে।...গায়কমণ্ডলীর বিশ্বাস এই যে, হিন্দী ভাষায় না হইলে তাহা গীত হইল না।...ইঁহারা সঙ্গীতের মূল সূত্রসকল কিছুই

১৮। সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু, পৃঃ ১৫২

* সংস্কৃতে 'পাঠ্য'। 'পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরম্...'

১৯। সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু, পৃঃ ১৬৫; বর্তমান ঐতিহাসিকদের অভিমত যে, সম্রাট আকবরের কালে (ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে) খেয়াল-গীতিরীতির প্রকাশ ছিল—যদিও তা সম্পূর্ণ আকবরের ছিল না।

বুঝেন নাই, কেবল শর্করাবাহী গর্দভের ন্যায় এবং গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় মূর্খ কুসংস্কারপূর্ণ ওস্তাদ-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন।...কিন্তু এই কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকা-মালা ভেদ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কেন বাংলা খেয়াল হইবে না? ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে-সকল বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হইয়াছে, তাহা কি কোন অংশে হিন্দী ভাষায় রচিত ধ্রুপদ অপেক্ষা মন্দ? আবার এদেশে যদি সঙ্গীতের চর্চা সমধিক হয়, যদি বাংলা ভাষায় নূতন নূতন রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়া গীত হয়, তাহা হইলে হিন্দী গানও বাংলা ভাষায় না গাহিলে চলিবে না।'[২০]

বিবেকানন্দের এই নির্ভীক ও দৃপ্ত ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত সর্বকালের জন্য, তাছাড়া তিনি যেন এ-সকল কথা অতি-আধুনিক বর্তমান সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখেই বলেছেন। অচলায়তনের পারে যাবার কথাই—শুধু সঙ্গীতে নয়, সাহিত্য, কাব্য, নাটক, সমাজব্যবস্থা ও জীবনচিন্তা এই সকল কিছুর ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার কথাই বিবেকানন্দ সকলকে বলেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিবেকানন্দ 'সঙ্গীত কল্পতরু'র সকল সংস্করণেই কিছু কিছু সংশোধন ও সংযোজন করেছেন। আমরা 'সঙ্গীত কল্পতরু'র একটি সংস্করণে দেখেছি তিনি মুদ্রিত গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠার এদিকে সেদিকে বহু কিছু নূতন বিষয় ও বক্তব্য লিখে রেখেছেন—যেগুলি আজও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

২০। সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু, পৃঃ ১৬৭

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে নন্দনতত্ত্ব

॥ ১ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী, রচনা, কর্মের যে-কোন রকম আলোচনা করার প্রারম্ভেই আলোচক একটি গভীর বিস্ময় অনুভব করেন, এই বিস্ময়ের প্রকটন পাওয়া যায় 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' শীর্ষক জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে প্রকাশকের নিবেদনে বিধৃত একটি উক্তিতেঃ 'মাত্র ঊনচল্লিশ বৎসর কাল স্বামীজী এই মর্তলোকে অবস্থান করেন, প্রকাশ্যভাবে তাঁহার ব্যাপক ও গভীর কর্মজীবন মাত্র নয় বৎসর কাল।...এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, বিস্ময়-বিমুগ্ধ জগৎ বহু দিন তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিবে। বক্তৃতা এবং রচনার মাধ্যমে স্বামীজীর বাণী প্রচারের কাল মাত্র সাত বৎসর (১৮৯৩-১৯০০), অবশ্য পত্ররচনার কাল ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী (১৮৮৮-১৯০২)।'[১] আমাদের বিস্ময় দুই কারণে। প্রথমত, মানবজীবনের, বিশেষত ভারতীয় জীবনের, এমন কোন দিকই নেই যে-বিষয়ে স্বামীজী কোন না কোন মহার্ঘ উক্তি করেননি। দ্বিতীয়ত, এইসব চিন্তা ও উক্তি উচ্ছ্রিত হওয়ার কালসীমা সাত বৎসর, মাত্র সাত বৎসর। এইসঙ্গে একটি তৃতীয় কারণও জুড়তে পারি। এই গ্রন্থাবলীর প্রকাশক বলছেনঃ 'অত্যন্ত দুঃখের বিষয় স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর অধিকাংশই আশানুরূপভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই।'[২] পাঠকচিত্তে এমন সংশয় জাগ্রত হওয়া অন্যায় নয় যে, সম্পাদক-প্রকাশকের অপরিসীম প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু পত্রাদি তো বটেই, হয়তো কিছু প্রবন্ধও, আজ পর্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেছে, অতএব আজও গবেষণাকর্মের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রকাশিত উক্তিগুলির বৈচিত্র, গভীরতা, মহার্ঘতার আভাস পেয়ে আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, সে বিস্ময় নিবিড়তর হয় যখন ভাবি, আরও তো উক্তি ছিল, আরও তো উক্তি আছে যার হদিস আমরা পাইনি। তবুও যা পেয়েছি তার সমীক্ষা তো কেবল একজন ব্যক্তির সাধ্য নয়। স্বামীজীর চিন্তা, উক্তি, কর্ম তো মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক উদ্ভাসিত করেছে, যে উদ্ভাসের প্রতিফলনে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে পারিঃ

> তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
> তার অণু পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ![৩]

সেই অন্তহীন আনন্দ আমরা পাই স্বামীজীর সর্বধাত্রী চিন্তার অণু-পরমাণু থেকেও। সেইজন্যই বর্তমান প্রবন্ধসংগ্রহে স্বামীজীর সর্বব্যাপী চিন্তার এক একটি অংশ এক এক জনের আলোচনার বিষয় হয়েছে। তাঁর সাহিত্যিক ও নান্দনিক চিন্তার কথা মনে করুন।

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ⁄৹-৷৹

২। তদেব, পৃঃ ৷৹

৩। সঞ্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ৫২০

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এই চিন্তার চেয়ে বহুগুণ মূল্যবান চিন্তা তো আরও কতই আছে স্বামীজীর রচনাসংগ্রহে—ঈশ্বরতত্ত্ব, স্রষ্টা-সৃষ্টি সম্পর্ক, একস্বার্থকেন্দ্রিকতা ও ভূমাচেতনা, দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, দেশপ্রেম প্রভৃতি কত না বিষয়ে চিন্তা। এসবের তুলনায় সাহিত্য-নন্দনতত্ত্ব স্বতন্ত্ররূপে আলোচিত হয়নি এই রচনাবলীতে, তবুও (আমরা যেন কোনমতেই ভুলে না যাই) যতটুকু প্রক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন সাহিত্য-নন্দনবিষয়ক উক্তি আমরা পাই সেটুকু নিঃসংশয়েই স্বামীজীর মূল জীবনচিন্তার ও জীবনতত্ত্বেরই অচ্ছেদ্য অংশ। এইসব উক্তি প্রণিধান করে আমরা স্বামীজীর মূল ভাবনায় পৌঁছাতে পারি, কেননা তাঁর প্রতিটি কর্ম প্রতিটি চিন্তা প্রতিটি উচ্চারণ একই অখণ্ড নির্বিশেষ ভাবনা থেকে উৎসারিত। ফরাসী লেখক লা ফঁতেন বলেছিলেনঃ All roads lead to Rome—যে-কোনও রাস্তা বেয়ে চলেই রোম মহানগরীতে পৌঁছানো যায়। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সদ্‌ব্রহ্মকে নানা জনে নানা নামে ডাকে। আমরা স্বামীজীর অন্য চিন্তায় যদি এগুতে না পারি, শুধু যদি তাঁর সাহিত্য-নন্দনচিন্তায় নিমগ্ন হই তাহলেও সদ্‌ব্রহ্মকে পাব, তাঁর মৌল ভাবনায় পৌঁছাতে পারব। এই রচনাবলীর ভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে নিবেদিতার যে-প্রবন্ধ তার অমূল্য বাক্যটি স্মরণ করিঃ 'এক সময় তিনি (স্বামীজী) বলিয়াছিলেন, "চারুকলা বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়..." ।'[৪] স্বামীজীর এই চারুকলা-চিন্তা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

॥ ২ ॥

চারুকলার কোন্ কোন্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ চিন্তা করেছেন, মত প্রকাশ করেছেন?

এ-বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায় প্রমথনাথ বসু কর্তৃক লিখিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক জীবনীগ্রন্থে। নরেন্দ্র বাল্যজীবনে নিজেদের বাড়িতে একটি নাট্যগৃহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এই নাট্যগৃহে প্রবেশমূল্য ছিল এক আনা। জীবনীকার বলছেনঃ 'তিনি আশৈশব সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন... ।'[৫] এবং পাদটীকায় লিখেছেন যে, স্বামীজীর সুকণ্ঠ পিতা নিধুবাবুর টপ্পা গাইতে পারতেন, তাঁর মাতাও বৈষ্ণব ভিক্ষুকদের গান একবার শুনেই সুর-তাল-লয়-সহকারে আয়ত্ত করতে পারতেন।[৬] জীবনীকার বলছেন যে, নরেন্দ্র 'পঠদ্দশায় কবিতার অতিশয় ভক্ত ছিলেন'।[৭] ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থকে 'কাব্যগগনের ধ্রুবতারা' মনে করতেন। এরপরে জীবনীকার আরও বলছেনঃ 'তাঁহার ধারণা ছিল প্রকৃত কাব্য বহুবর্ণাঙ্কিত চিত্রপটের ন্যায় একখানি মনোরম শব্দময় চিত্রবিশেষ। ইহা

৪। বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৭

৫। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ—প্রমথনাথ বসু, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬২), পৃঃ ৫৭ ৬। তদেব, পৃঃ ৫৭ পাদটীকা

৭। তদেব, পৃঃ ৬৮

যেন আদর্শকে লোকলোচনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার শ্রেষ্ঠতম শিল্প...।'[৮] আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটি মূল্যবান কথা, কিন্তু দুঃখের বিষয়, জীবনীকার এই উক্তির অথবা অনুরূপ কোন উক্তির উৎস নির্দেশ করেননি। সৌভাগ্যবশত স্বামীজীর নিজ পত্রাদিতে, গ্রন্থে, ভাষণে তাঁর সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে অতীব মূল্যবান, নির্ভরযোগ্য সর্বোজ্জ্বলকারী যেসব বাণী পাওয়া যায় সেসবের নির্দেশ ও প্রয়োগ এই প্রবন্ধে ক্রমে করা হবে এবং প্রয়োগকালে আমরা দেখতে পাব চারুকলা সম্বন্ধে স্বামীজীর আদর্শ বস্তুত কোন্ ধরনের ছিল। তরুণ নরেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় সঙ্গীতানুরাগ সম্বন্ধে এই জীবনীকার আরও বলছেন ঃ 'তিনি বাজাইতেও বেশ শিখিয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্গীতেই তাঁহার বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল।'[৯] বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় পুত্রের সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন বেণী গুপ্ত নামক একজন ওস্তাদ।[১০] এই ওস্তাদের কাছে তিনি অনেক হিন্দী, উর্দু এবং ফারসী গান শিখেছিলেন। কোন দরিদ্র সঙ্গীতপুস্তক-প্রকাশকের সাহায্যার্থে তরুণ নরেন্দ্রনাথ একবার 'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন।[১১] জীবনীকার আমাদের স্মরণ করিয়েছেন ঃ খেতড়ি রাজসভাতে স্বামীজী দরবারী, কানাড়া, ইমনকল্যাণ ও বাগেশ্রী গেয়েছিলেন, মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলেন।[১২] এই জীবনী থেকে জানতে পাই যে, নরেন্দ্রনাথ '...যেমন গাহিতে পারিতেন তেমনি সুন্দর নাচিতেও পারিতেন'।[১৩] আরও জানতে পাই যে, এই সঙ্গীত-নৃত্য-পটু তরুণ সখের থিয়েটার করতে ভালবাসতেন।[১৪]

যখন সন্ন্যাসী হয়ে দেশে দেশে ঘুরেছিলেন তখনও এই প্রদীপ্তানন তরুণের সহজাত চারুকলাস্পৃহা সদাজাগ্রত ছিল। আলোয়ারে রাজস্থানী ভক্তদের কাছে বাংলা কীর্তন গাইতেন, একদা গেয়েছিলেন ঃ '(আমি) গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিয়ে শঙ্খের কুণ্ডল পরি।'[১৫] গাইতে গাইতে তাঁর অবিরল অশ্রুপাত হত। 'মধ্যে মধ্যে নৃত্যও হইত।'[১৬] মহীশূর রাজসভায় একদা জনৈক অস্ট্রিয়ান সঙ্গীতবিশারদের সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেন।[১৭]

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমুদয় গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যের এক সমাবেশে বিবেকানন্দ প্রস্তাব করেছিলেন যে, গুরুর নামে এক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হবে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরে নিম্নলিখিত কার্যপ্রণালী স্থিরীকৃত হয় ঃ

(ক) যাহাতে সাধারণ লোকের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয় এরূপ জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকপ্রণয়ন।

(খ) শিল্পকলাদির বিবর্ধন ও উৎসাহদান।

(গ) বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।[১৮]

৮। তদেব, পৃঃ ৬৯ ৯। তদেব, পৃঃ ৭৩ ১০। তদেব ১১। তদেব
১২। তদেব, পৃঃ ৭৪ ১৩। তদেব, পৃঃ ৭৫ ১৪। তদেব, পৃঃ ৭৬ ১৫। তদেব, পৃঃ ২২৮
১৬। তদেব, পৃঃ ২২৭ ১৭। তদেব, পৃঃ ৩১৫
১৮। তদেব, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৩), পৃঃ ৬৫১-৫২

দেখা যাচ্ছে, শিল্পকলা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহ নিছক ব্যক্তিগত ছিল না, শিল্পকলাকে তিনি এবং তাঁর সহকর্মিগণ সমাজের, দেশের, মানবজাতির পক্ষেই অমূল্য সম্পদ বলে জ্ঞান করতেন।

॥ ৩ ॥

চারুকলা সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তা যে কত ব্যাপক, কত সর্বগ্রাহী, কত মৌলিক এবং কত গভীর ছিল সেকথা বুঝতে পারা যায় তাঁর জীবনীকার প্রমথনাথ বসুর অসম্যক আলোচনা থেকে নয়, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' থেকে।[১৯] বস্তুত এই গ্রন্থাবলীর খণ্ডে খণ্ডে যে কত উক্তি, কত অভিজ্ঞতার কাহিনী ছড়িয়ে আছে তার সম্পূর্ণ শুমারি করা আধুনিক গবেষণার পরিশ্রমী বিশদ প্রণালীতেই সম্ভব হলেও তার কিছু তালিকা এই প্রবন্ধের অন্ত্যটীকায় সন্নিবেশিত হল। বিবেকানন্দ এইসব চারুকলা সম্বন্ধে কোন না কোন সময় উক্তি করেছেন ঃ সঙ্গীত (সেইসঙ্গে নৃত্য ও বাদ্য), চিত্রকলা, স্থাপত্যশিল্প, ভাস্কর্যশিল্প, সাহিত্য (কাব্য, নাটক, ভাব প্রকাশের ভাষা)। চারুকলার এইসব বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে চিন্তায় এবং স্বতন্ত্রভাবে অধ্যাত্মচিন্তায়ও বিধৃত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের নন্দনতত্ত্ব। তিনি কেবল সঙ্গীত বা ভাস্কর্য বা কাব্য সম্বন্ধে চিন্তা করেননি, যাবতীয় চারুকলার অন্তস্তলে যে অব্যয় অক্ষয় শিল্পতত্ত্ব তিনি অনুভব করেছিলেন সে শিল্পতত্ত্ব কোন স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ স্বতন্ত্রতত্ত্ব নয়, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সত্যের ও তত্ত্বের সঙ্গে সমার্থ।

বিবিধ চারুকলার মধ্যে চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তি নিতান্ত বিরল না হলেও অপ্রচুর। স্বামীজীর অনেক চিন্তা যে সচরাচর চিত্রধর্মী ছিল তার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায় সানফ্রানসিস্কো শহরে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ মার্চ তারিখে প্রদত্ত এক ভাষণে; সেখানে তিনি বলছেন গুরু ও শিষ্যের কথা, গুরুর গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় না বয়োবার্ধক্য দ্বারা, এবং একথা বলার সময় 'দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র' স্মরণ করছেন ঃ

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ ॥[২০]

গুরু ও শিষ্যের সম্পর্কটি স্বামীজীর মানসপটে চিত্ররূপে প্রতিভাত হল। এই চিত্রধর্মী কল্পনাশক্তির বলে তিনি ভারতীয় চিত্রকর্মের ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যের ও সমসাময়িক দৈন্যের উল্লেখ করেছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের শেষ স্তবক কয়টির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

'ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায়নি। বিশেষ দুর্দশা হয়েছে শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোর আলপনা দিত, দেয়ালে চিত্রবিচিত্র করত। ...নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরানোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে না

১৯। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৯৮-৪০০

২০। স্তবকুসুমাঞ্জলি—সম্পাদনা ঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, নবম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ১৪৯

কি ? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি !! ...আমাদের এখন ওদের মতো শিল্প-সংগ্রহে কাজ নেই, কিন্তু যেগুলো উৎসন্ন যাচ্ছে, সেগুলোকে একটু যত্ন করতে হবে, না—না ? ওদের মতো চিত্র বা ভাস্কর্য-বিদ্যা হতে আমাদের এখনও ঢের দেরি ! ও দুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু। ...বড্ড জোর ওদের (ইউরোপীদের) নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায় !! তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পোটো ভাল—তাদের কাজে তবু ঝক্‌ঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় !! বরং জয়পুরে সোনালী চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।'[২১] শিল্প ও স্থাপত্য দেখতে গিয়ে স্বামীজী সব সময়ই কল্পনার চোখে দেখতে চাইতেন শিল্পী ও স্থপতিকে, বুঝতে চাইতেন শিল্পীমনের মূল ভাবটিকে। রবিবর্মার পাশ্চাত্য ঢঙে আঁকা ছবি তাই তাঁকে মুগ্ধ করেনি, কিন্তু প্যারি শিল্পপ্রদর্শনীর 'Art unveiling nature' ভাস্কর্যটির প্রশংসা করেছেন। মহৎ শিল্পের অনুকরণ নয়, তিনি চাইতেন মানুষ মৌলিকতার পরিচয় দিয়ে নিজে মহৎ সৃষ্টি করুক। ইন্দ্রিয়ের সীমা ছাড়িয়ে প্রকৃতির মৌন বাণী যখন শিল্পী বুঝতে পারছেন স্বামীজীর চোখে তখন সেই শিল্প 'সুন্দর' হয়ে দেখা গিয়েছে।

সুন্দরের অভিব্যক্তিতে স্বামীজী চেয়েছেন লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন। স্বতোৎসারিত শিল্পে মানবজীবনের সহজ হাসিকান্না, তার দৈনন্দিন আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ফুটে ওঠে। আর লোকশিল্প (folk-art) দেখিয়ে দেয় সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ কিভাবে প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। স্বামীজীর চোখে তাই লোকশিল্পের ভূমিকা গভীর ও ব্যাপক। এর মধ্যেই পাওয়া যায় মানবমিছিলের বৈচিত্র ও ধারাবাহিকতা। যে গভীর মানবপ্রেম তাঁকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেয়নি, সেই মানবপ্রেমই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল লোকশিল্পের প্রতি। যাদের কথা কেউ ভাবে না, কেউ বলে না, সেই সহজ সরল মানুষগুলির প্রাণের অভিব্যক্তি, হৃদয়ের ভাষা স্বামীজী জানতে চেয়েছিলেন। আর লোকশিল্পই তো তার মাধ্যম। লোকশিল্প তাই তাঁর কাছে 'সুন্দর'। এই গভীর মানবপ্রেমেই তিনি চেয়েছিলেন কথ্যভাষা হোক সাহিত্যের বাহন। বুদ্ধ, রামানুজ, শ্রীরামকৃষ্ণের কথ্যভাষায় ধর্মোপদেশ তাই তাঁর কাছে 'সুন্দর'। এই বলিষ্ঠ উক্তি থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি ঃ স্বামীজী জাতির শৈল্পিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে চান কিন্তু তাই বলে নতুনকে অগ্রাহ্য করছেন না। শিল্পের একটা ঘরোয়া রূপ আছে, সে রূপ ঘরোয়া এবং সেজন্য সর্বজনের রূপচেতনার অভিব্যক্তি। এই সর্বজনচেতনার চিন্তা স্বামীজীর বাণীতে অসংখ্যবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। আরও একটি সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার। স্বামীজী বলিষ্ঠ বর্ণপ্রয়োগ পছন্দ করতেন—চালচিত্রের ঝক্‌ঝকে রঙ, জয়পুরী সোনালী রঙ। তিনি বলেননি বটে কিন্তু তাঁর এই বর্ণপ্রীতি থেকে অনুমান করতে পারি যে, তাঁর সমসাময়িক ইমপ্রেসানিস্ট চিত্র (বিশেষত ফরাসী দেশে ক্লোদ মোনে, কামিল্লে পিসারো, পোল সেজাঁ, এডগার দেগা, অগুস্ত রেনোয়া—যাঁদের নিয়ে চিত্রজগতে খুব হৈ চৈ হচ্ছিল ১৮৯০ দশকে ও তার পরে, যেকালে বিবেকানন্দ ফ্রান্সে গিয়েছিলেন,

২১। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ২১৪-১৫

কিছুকাল প্যারি নগরীতে বাসও করেছিলেন।) তাঁর মনঃপূত ছিল না, কেননা ইমপ্রেসানিস্ট চিত্রাঙ্কনের মূল রীতি ছিল বর্ণে বর্ণে ধূসর আত্মবিলোপ। অপরপক্ষে দেখতে পাই, তিনি ইউরোপীয় রিয়্যালিজম (বাস্তববাদ) পছন্দ করেননি। ভিয়েনা শহরের চিত্রশালিকায় গিয়েছিলেন। সে-সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ 'চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকরদের চিত্রই অধিক। ওলন্দাজি সম্প্রদায়ে রূপ বার করবার চেষ্টা বড়ই কম ; জীবপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণেই এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। একজন শিল্পী বছর কতক ধরে এক ঝুড়ি মাছ এঁকেছে, না হয় এক থান মাংস, না হয় এক গ্লাস জল... ।'[২২] আমার অনুমান যে, স্বামীজী যেসব ওলন্দাজ শিল্পীর চিত্র দেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে সম্ভবত ষোল-সতেরো শতকী শিল্পী ছিলেন ডেভিড দ্য হীম (ফলের ছবি আঁকতেন), জেরার্ড ড্যু (মাংসওয়ালার দোকানের ছবি) অথবা মহত্তর শিল্পী, যথা ফ্রানজ হালস, রেমব্রান্ট। ন্যাচারালিজম নামক শিল্পতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা হয়েছিল হল্যাণ্ডে, কিন্তু অবশ্যই সে তত্ত্বে ও সে চিত্রে উদ্বুদ্ধ হওয়া স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ছিল। এবং মূলত এই কারণেই স্বামীজী গ্রীক কলারও অনুরাগী হতে পারেননি। তিনি গ্রীক কলার তিন পর্যায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন 'পরিব্রাজক' পুস্তকে ; সেখানে বলেছেন যে, যেকাল অবধি (অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দ অবধি মিসেনি শিল্পের কাল ও তারপরে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৬ অব্দ পর্যন্ত হেলেনিক শিল্পের কাল) গ্রীক শিল্প এশীয় শিল্পের অনুগামী ছিল, সেকালে গ্রীকের কলাকৃতি মহৎ হয়েছিল। পক্ষান্তরে যেকালে (আর্কেইক যুগে, ক্লাসিক যুগে) এশীয় শিল্প থেকে এই শিল্প দূরে সরে গেল, কলাকৃতির অধোগতিও শুরু হল। এই অধোগতির একটি বড় লক্ষণ ছিল আড়ম্বরপ্রিয়তা, অতি-অলঙ্কার-বিলাস, শিল্পের অন্তরতম সত্তাকে অবহেলা করে তার বহিরঙ্গ নিয়ে বিলাস। স্বামী বিবেকানন্দ বারংবার এই অলঙ্কারপ্রিয়তার তুচ্ছতা নির্দেশ করেছেন, শুধু চিত্রকলায় নয়, যাবতীয় চারুকলায়।

নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির দার্শনিক ও সামাজিক ভূমিকাটিই স্বামীজীর চোখে বড় ; প্রয়োজনের তাগিদে শিল্পের স্থূলতা তিনি পছন্দ করেননি। শিল্প ও প্রচার এক কথা নয়। শিল্প-সাহিত্য মানুষকে বড় হওয়ার তাগিদ দেবে, তাকে মহান করে তুলবে, কিন্তু নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকার করে নয়। স্বামীজী বলেছেন যুধিষ্ঠিরের গল্প ঃ রাজ্য হারিয়ে পাণ্ডবেরা যখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দ্রৌপদী সরোষে একদিন যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন—তুমি এত 'ধর্ম ধর্ম' কর, কিন্তু ধর্ম তোমায় কি দিয়েছে? স্মিত হাসিতে যুধিষ্ঠির হিমালয়ের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন—দ্রৌপদী, ঐ বিরাট পাহাড়ও তো আমায় কিছুই দেয়নি! তবু হিমালয়কে আমি ভালবাসি, কারণ সে বৃহৎ, সে মহৎ। স্বামীজী তাই প্রয়োজনকে একমাত্র মাপকাঠি ধরেননি নান্দনিক বিচারে। কুরুক্ষেত্রের গীতা-প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের ছবি কেমন হবে তা নিজে অভিনয় করে দেখিয়ে দিলেন। প্রয়োজনকেও শৈল্পিক সুষমায় সুন্দর করে তুলতে হবে—স্বামীজীর এই মত।

২২। তদেব, পৃঃ ১৩২

॥ ৪ ॥

চিত্রকলার বিচারে স্বামীজীর যে পারদর্শিতা লক্ষ্য করি স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধেও তেমনি সুদক্ষ মূল্যজ্ঞান লক্ষ্য করি। এই দক্ষতা আমার বিবেচনায় একান্তই অসাধারণ কেননা সম্ভবত স্বামীজী যেমন অজন্তা ইলোরার অথবা পাহাড়ী চিত্রবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তেমনি তাঁর নিয়ত কর্মভারাক্রান্ত চল্লিশন্যূন জীবৎকালের মধ্যে স্বদেশীয় স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের কিছু মূল্যবান নিদর্শন প্রত্যক্ষ করারও সুযোগ হয়নি। তিনি পুরী-ভুবনেশ্বর-সাঁচি দেখেননি, চোল রাজবংশের বা খাজুরাহোর অনবদ্য স্থাপত্যের পরিচিতি পাননি, মাণ্ডু-নালন্দা-পাহাড়পুর-গৌড়াবশেষ-বিষ্ণুপুর দেখেননি, যবদ্বীপ-বোরোবুদুর এবং সুমাত্রা ও বর্তমান তাইল্যাণ্ডের অজস্র হিন্দু স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের বিষয় তাঁর কালে প্রায় অনুদ্ঘাটিত ছিল, তথাপি ভারতীয় শৈল্পিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের একটিও তাত্ত্বিক উক্তি, একটিও সাধারণীকৃতি (generalization) ত্রুটিদুষ্ট নয়।* কেন ত্রুটিদুষ্ট হয়নি ? তার কারণ তাঁর মৌল চিন্তার পূর্ণ বিশুদ্ধতা। এই বিশুদ্ধতার দরুন চারুকলা সংক্রান্ত যে প্রাথমিক কাঠামো তিনি তৈরী করেছিলেন, সেই কাঠামোটিই পূর্ণ শুদ্ধ, অতএব এই কাঠামো থেকে যেসব শাখাপ্রশাখা নির্গত হয়েছে সেসবও পূর্ণ শুদ্ধ। দুটি চারটি পাঁচটি দশটি খুঁটিনাটি, কয়েকটি বিষয়-প্রত্যঙ্গ, যদি তাঁর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার আবেষ্টনীতে না-ও এসে থাকে, তাহলেও তাঁর মৌলতত্ত্ব বিশুদ্ধ থেকেই যাচ্ছে।

জগতের ইতিহাসে যা দেখা গেছে ভারতীয় ইতিহাসে সেকথা সর্বৈব সত্য—প্রাচীনকালে যাবতীয় সভ্য সমাজে দেবপূজার সঙ্গে স্থাপত্যশিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রাচীন সমাজে মানুষ নিজেদের বাসস্থান যে-ধারণায় যে-প্রয়োজনে নির্মাণ করত, দেবস্থান নির্মাণ করত তা থেকে অনেক ভিন্ন ধারণায় ও প্রয়োজনে। স্বামীজী বলছেন ঃ 'হিন্দুদের মতে নিজের জন্য বাড়ি তৈরী করা স্বার্থপরতার কাজ; কেবল দেবতা ও অতিথিদের জন্য বাড়ি তৈরী করা যেতে পারে। সেইজন্য লোকে ভগবানের নিবাস-রূপে মন্দিরাদি নির্মাণ করে থাকে।'[২৩]

---

* স্বামীজী ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মূল্যবান নিদর্শন দেখেছিলেনও যথেষ্ট এবং দেখেছিলেন অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে। ২৮ মে, ১৮৯৬ ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে স্বামীজীর যে কথোপকথন হয়, সেই আলোচনার অন্যতম বিষয় ঃ প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। এই আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা পাই প্রিয়নাথ সিংহের একটি প্রবন্ধে ('প্রবুদ্ধ ভারত', নভেম্বর, ১৯০৬)। আলোচ্য বিষয়ে স্বামীজীর জোরালো মতামত ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে তাঁর অন্তরঙ্গ এবং গভীর পরিচয়েরই সাক্ষ্য বহন করে। রাজস্থানী এবং মুঘল স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কথা সুবিদিত। রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে তিনি বলেছিলেন ঃ 'পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্প-সৌন্দর্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদশাদের সময়েও ঐ বিদ্যার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই বিদ্যার কীর্তিস্তম্ভরূপে আজও তাজমহল, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।' [বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৮৬-৮৭]

২৩। বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ২২২

অতএব দেবগৃহ সুন্দর হত, এমন মালমশলা দিয়ে, এমন দক্ষতা-সহকারে নির্মিত হত যাতে এই গৃহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারত, শতাব্দীর পর শতাব্দী উচ্চশির হয়ে থাকতে পারত। দেবগৃহ কিন্তু যে-কোন স্থানে নির্মিত হতে পারত না। স্বামীজী বলছেন ঃ 'ভগবানকে উপাসনা করিবার জন্য মন্দির নির্মাণের কি প্রয়োজন ছিল? যেখানে সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা কর না কেন? কারণ না জানিলেও মানুষ বুঝিয়াছিল যে, যেখানে লোকে ঈশ্বরের উপাসনা করে, সে স্থান পবিত্র তন্মাত্রায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সকলে প্রত্যহ সেখানে যায়, সেখানে যতই বেশী যাতায়াত করে, ততই মানুষ পবিত্র হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে স্থানটিও পবিত্রতর হইতে থাকে। যে ব্যক্তির অন্তরে বেশী সত্ত্বগুণ নাই, সে যদি সেখানে যায়, তাহারও সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইবে। অতএব মন্দির ও তীর্থাদি কেন পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়, তাহার কারণ বুঝা গেল। কিন্তু এটি সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধু লোকের সমাগমের উপরেই সেই স্থানের পবিত্রতা নির্ভর করে। ...যদি সে স্থানে সর্বদা অসাধু লোকই যাতায়াত করে, তাহা হইলে সেই স্থান অন্যান্য স্থানের মতোই অপবিত্র হইয়া যাইবে।'[২৪] বাড়িঘরের গুণে নয়, লোকের গুণেই মন্দির পবিত্র বলে গণ্য হয়। মন্দির প্রসঙ্গে স্বামীজীর অন্য একটি কথাও চিন্তা-উদ্দীপক। নিবেদিতার 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন যে, একদা তাঁরা (কাশ্মীর ভ্রমণকালে স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গিগণ) তখৎ-ই-সুলেমান নামক 'এক ক্ষুদ্র মন্দির' দেখেছিলেন (ওটি আসলে ছিল জনৈক মুসলিম পীর সাহেবের মাজার, সমাধিক্ষেত্র, নিবেদিতা মনে করেছিলেন হিন্দুমন্দির)। এই সুন্দর 'মন্দির' দর্শন উপলক্ষে স্বামীজী '...একটির পর একটি করিয়া ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তসহকারে দেখাইয়া দিলেন যে, ভারতবাসিগণ চিরকাল অতি সুন্দর এবং প্রধান প্রধান স্থানগুলি পূজামন্দির নির্মাণপূর্বক পবিত্রতা-মণ্ডিত করিয়া তুলিতেন।'[২৫] একথা স্বামীজী অনেক পূর্বেই তাঁর প্রথম আমেরিকা ভ্রমণকালেই বলেছিলেন, যেকালে সেদেশের পত্রিকাগুলি তাঁকে বলত ভি. ভি. কানন্দ।[২৬]

হিন্দুসংস্কৃতিতে স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। মন্দির মানে কোন দেবদেবীর মূর্তিসমৃদ্ধ গৃহ। হিন্দুদের মূর্তিপূজা (যে প্রথা পৌত্তলিকতা নামে বহু অ-হিন্দু কর্তৃক ধিকৃত হয়েছে, এখনও হয়) সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা দিয়েছেন অজস্রবার, তাঁর অনুপম ভাষায়, কখনও নিশ্ছিদ্র যুক্তিবহুল, কখনও আবেগমণ্ডিত, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই তাঁর সুগভীর জ্ঞানসমুখ এই চিন্তা নস্যাৎ করার শক্তি বা ভাষা কারও হয়নি। এই জটিল বিষয় বর্তমান প্রবন্ধে মাত্র উত্থাপিত করছি এই কারণে যে, দেবদেবীর বিগ্রহ নির্মাণে ভারতীয় নান্দনিক প্রতিভার মহত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

প্রতিমাপূজা করি কেন? মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে ঃ

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাঽধমাধমা ॥[২৭]

২৪। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫-৫৬ ২৫। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৯৮

২৬। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, Advaita Ashrama, Calcutta, Ninth Edition (1964), p. 490 ২৭। মহানির্বাণতন্ত্র, ১৪।১২১

শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসম্মেলনের নবম দিবসের অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম বিষয়ে যে দীর্ঘ অমূল্য ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তন্ত্রের উপরোক্ত শ্লোক স্মরণে রেখে বলেছিলেনঃ বাহ্যপূজা—মূর্তিপূজা প্রথমাবস্থা ; কিঞ্চিৎ উন্নত হলে মানসিক প্রার্থনা পরবর্তী স্তর ; কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষাৎকারই উচ্চতম অবস্থা। তথাপি অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই তো বাহ্যপূজা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রাকৃত মানুষ কজন সেই ঊর্ধ্বমূল অবাক্শাখ সনাতন অশ্বত্থের ধারণা করতে পারে? কজনের কল্পনা ও বুদ্ধি পৌঁছায় সেই অতীন্দ্রিয় জগতে—'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ'[২৮], কজনের উপলব্ধিতে আসে সেই আশ্চর্য চেতনা 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'?[২৯] অতএব স্বামীজী নিষ্কম্প বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছেনঃ 'যে একাগ্র সাধক জানু পাতিয়া দেববিগ্রহের সম্মুখে পূজা করেন...তিনি কাহারও দেববিগ্রহকে গালি দেন না বা প্রতিমাপূজাকে পাপ বলেন না।'[৩০] তিনি ইহাকে জীবনের এক প্রয়োজনীয় অবস্থা বলিয়া স্বীকার করেন।

এই ব্যাখ্যার অব্যবহিত পরেই স্বামীজী প্রগাঢ় জ্ঞানমণ্ডিত উক্তি করেছেনঃ 'হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছেনঃ আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরম তত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব ; এবং প্রতিমা ক্রুশ বা চন্দ্রকলা প্রতীকমাত্র, আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিবার অবলম্বনস্বরূপ।'[৩১]

এই মনোভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-উপাসনায় প্রতিমাস্থাপন সর্বতোভাবে স্বাভাবিক। হিন্দুভাস্কর্য এই কারণেই মূলত দেবদেবীর প্রতিমা নির্মাণে ব্যাপৃত। স্বামীজী এই কারণেই নিবেদিতা প্রমুখের সন্নিধানে গান্ধার ভাস্কর্যের কথা বলতে গিয়ে ইউরোপীয় সমালোচকদের অন্যায় দাবির ('কলাবিদ্যা-সম্বন্ধে ভারতবর্ষ চিরকাল যবনগণের শিষ্যত্ব করিয়াছে') নিরাকরণ করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন[৩২] এবং অন্য এক সময় চিঠিতে লিখেছিলেনঃ 'মিস লককে বলো আমি যে তাকে বলেছিলাম "মানবমূর্তির ভাস্কর্য গ্রীসে যতটা উন্নত হয়েছিল, ভারতে ততটা হয়নি"—এ মত আমার ভুল।'[৩৩]

মনে হয় যাবতীয় চারুকলার মধ্যে সঙ্গীতের দিকেই স্বামী বিবেকানন্দের চিত্ত সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হত। তিনি বলছেনঃ 'সুমধুর সঙ্গীতশ্রবণে কাহারও কাহারও মন শান্ত হইয়া যায়...।'[৩৪] 'সুললিত সঙ্গীত-শ্রবণকালে আমাদের মন সেই সঙ্গীতেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইতে আমরা মন সরাইয়া লইতে পারি না।'[৩৫] অতএব সঙ্গীত উপাসনার একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। স্বামীজী নিজে যে কত গান গেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই, এমনকি প্রাণের আবেগে অবাঙালীদের সাহচর্যেও বাংলা গান গাইতেন, যেমন গেয়েছিলেন আলোয়ারে রাজস্থানী ভক্তদের সামনে এবং কাশ্মীরে নিবেদিতা, মিস ম্যাকলাউড, মিসেস বুল-এর সামনে। সঙ্গীত যে কত পবিত্র এবং পূত ভাবসঞ্চারী সে-বিষয়ে স্বামীজীর এক অমূল্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল খেতড়ির এক বাইজীর কাছে।

২৮। কঠোপনিষদ্, ২।২।১৫ ২৯। তদেব, ২।৩।১৭ ৩০। বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৪-৫

৩১। তদেব, পৃঃ ২৫ ৩২। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৮৮

৩৩। তদেব, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৬৩

৩৪। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ৪২৬ ৩৫। তদেব, পৃঃ ৪৩৫

খেতড়িরাজ স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করেন সেই বাইজীর গান শোনার জন্য। গোড়ায় সে আহ্বানে স্বামীজী ঘৃণা বোধ করেন। বাইজী যখন গান ধরেন, 'হমারে প্রভু অবগুণ চিত ন ধরো, সমদরশী হ্যায় নাম তিহারো'[৩৬]—সুরদাসের প্রসিদ্ধ গান, অপরূপ ব্যঞ্জনামণ্ডিত গান, স্বামীজী বলছেন এই গান শুনে যেন তাঁর চোখের সম্মুখ থেকে একটি পর্দা উঠে গেল। বিদেশে গিয়ে তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও আনন্দ পেতেন। হাঙ্গেরীয় সঙ্গীতের প্রশংসা করেছেন বহুবার, প্যারী নগরীতে মাদাম কালভের গানে আকৃষ্ট হয়েছেন, মাদাম মেলবা, মাদাম এমা এমস, ম্যঁসিয় জাঁ দ্য রেসকি, ম্যঁসিয় প্লাসঁ প্রভৃতির গাম শুনে আনন্দিত হয়েছেন। নিজে অর্কেস্ট্রার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জানেন না বলে স্বীকার করেছেন[৩৭] কিন্তু মিস অ্যালবার্টা স্টার্জেসের কাছে স্বরগ্রাম শেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।[৩৮] দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের স্বধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন। সর্বোপরি, নিছক দেশপ্রেম থেকে নয়, জ্ঞান থেকেই বলছেনঃ 'সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়াছে প্রধান সাতটি স্বর এবং সুরের তিনটি গ্রাম সহ স্বরলিপি-প্রণালী। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দেও আমরা এইরূপ প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত উপভোগ করিয়াছি।'[৩৯] সঙ্গীতের চিন্তায়ও স্বামীজীর মনস্বিতার দুটি মুখ্য দিক উজ্জ্বল হয়েছেঃ প্রথমত, তাঁর জ্ঞানসমৃদ্ধ দেশপ্রেম; দ্বিতীয়ত, সঙ্গীতের সাহায্যে আত্মার ঊর্ধ্বায়নের সম্ভাবনা। আমরা দেখতে পাব এই যাবতীয় চিন্তায় ও ধারণায় স্বামীজীর মানসে একটি সুদৃঢ় নন্দনতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল।

॥ ৫ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ নিজে গায়ক ছিলেন, সঙ্গীত সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন, তেমনি কাব্যপাঠক ছিলেন, স্বয়ং কবিতা রচনা করেছিলেন বাংলায়, ইংরেজিতে, সংস্কৃতে। সঙ্গীতে যেমন (বস্তুত অন্য চারুকলাগুলি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য) কাব্যেও তিনি অনুরূপভাবে স্বদেশীয় সংস্কৃতিতে গৌরবান্বিত বোধ করতেন। তিনি বলছেনঃ 'সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য, কাব্য ও নাটক অপর যে-কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমতুল্য। জার্মানীর শ্রেষ্ঠ কবি আমাদের শকুন্তলা-নাটক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলিয়াছেন, উহাতে "স্বর্গ ও পৃথিবী সম্মিলিত"। "ঈসপ্‌স্ ফেব্‌ল্‌স্" নামক প্রসিদ্ধ গল্পমালা ভারতেরই দান...।'[৪০]

কাব্যের বাইরে অন্য সাহিত্যে তাঁর কোনও উৎসাহের প্রমাণ পাই না. 'পচা নভেল-নাটক' সম্বন্ধে অবজ্ঞাই ছিল। তিনি নিজে যেসব কবিতা—বাংলায় ও ইংরেজিতে—রচনা করেছিলেন, এবং একদা একটি ছোটগল্প রচনা শুরু করেছিলেন,[৪১] যেসব পূর্বতন সাহিত্যকথা (রামায়ণ মহাভারত হোক অথবা বিল্বমঙ্গলের কাহিনী হোক) তাঁর বিদেশীয় ভক্ত ও শ্রোতাদের মঙ্গলার্থে প্রাঞ্জল করে বলেছিলেন, সেসবের সাহিত্যিক মূল্যচিন্তার স্থান বর্তমান প্রবন্ধে নেই, তবুও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে,

---

৩৬। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪১৯ ৩৭। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৬২

৩৮। তদেব, পৃঃ ১৮০ ৩৯। তদেব, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১০৯

৪০। তদেব ৪১। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫৩

বিবেকানন্দকে বাদ দিয়ে বঙ্কিমোত্তর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা অসার্থক, যদিও তেমন অসম্যক রচনা আমাদের ইতিহাসকারদের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর স্বকীয় ঐতিহ্যের সাহিত্যের মধ্যে তিনি কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন কিছু রচনার ও গ্রন্থের : অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ উল্লিখিত হয়েছে একাধিকবার, স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর ইংরেজি অনুবাদের পরে কালিদাসের এই অনবদ্য নাটকটি শ্লেগেল, গ্যেটে প্রমুখ মহৎ লেখকদের কাছে কী সোৎসাহ সংবর্ধনা পেয়েছিল ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের কথা বলেছেন ; সূফী কবিতার উল্লেখ করেছেন ; চৈতন্যচরিতামৃতের অপরূপ ছত্রটির উল্লেখ করেছেন, 'না সো রমণ না হাম রমণী' ;[৪২] তুলসীদাস, মীরাবাঈ, ভক্তমাল থেকে আবৃত্তি করেছেন, বিশেষত ভক্তমালের বিল্বমঙ্গল কাহিনীটি [আমরা বুঝতে পারি কেন এই কাহিনী নিয়ে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ নাটক লিখেছিলেন]। রামপ্রসাদ তাঁর প্রিয় ছিল, কমলাকান্ত থেকে গান ধরেছেন, গিরিশ ঘোষের দরুন দীনবন্ধু মিত্রের উল্লেখ করেছেন। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে স্বামীজী 'নানা ঠাট্টাতামাসা' করেছিলেন এবং বলেছিলেন : 'ছেলেদের হাতে এসব বই যাতে না পড়ে, তা-ই করা উচিত।'[৪৩] এর পরেই তিনি মাইকেল সম্বন্ধে বলতে থাকেন : 'ঐ একটা অদ্ভুত genius (প্রতিভা) তোদের দেশে জন্মেছিল। "মেঘনাদবধে"র মতো দ্বিতীয় কাব্য বাংলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।

'শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শব্দাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

'স্বামীজী। তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস।...এই "মেঘনাদবধকাব্য"—যা তোদের বাংলা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কিনা "ছুঁচোবধকাব্য" লেখা হল! তা যত পারিস লেখ্ না, তাতে কি? সেই "মেঘনাদবধকাব্য" এখনও হিমাচলের মতো অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে।...মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে-কাব্য লিখে গেছেন, তা সাধারণে কি বুঝবে?'[৪৪]

'মেঘনাদবধকাব্য' তাই স্বামীজীর চোখে সুন্দর। বীর ভ্রাতা, ইন্দ্রজয়ী পুত্র হারিয়েও রাবণ মাথা নীচু করতে রাজী নয়, অবধারিত মৃত্যু জেনেও সে সংগ্রামে পিছপা নয়। মাইকেলের রাবণ-চরিত্রের এই দুর্দমনীয় ভাব স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছে। রাবণের যত দোষই থাকুক, সীমিত সামর্থ্য নিয়েও সে বৃহৎকে পেতে চেয়েছে। একদিকে সে হৃদয়ের দুঃখকে সরিয়ে কর্তব্যের আহ্বানে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে বহিঃপ্রকৃতির কাছে পরাজয় স্বীকারে রাজী নয়। রাবণের 'বীরত্ব' তাই স্বামীজীর চোখে 'সুন্দর'। এ কারণেই 'প্যারাডাইস লস্টে'র 'What though the field be lost ?/All is not lost; the unconquerable will'[৪৫] কথাগুলি তাঁর চোখে সুন্দর। শত দুঃখবিঘ্নের মধ্যেও

৪২। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ (সম্পাদনা : সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৯২, পৃঃ ১৮৩

৪৩। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ২১১ ৪৪। তদেব

৪৫। Paradise Lost—John Milton, Longman Group Limited, 1984, Book-1, Lines—105-06

মানবাত্মার জয় ঘোষিত হচ্ছে, শত প্রতিরোধ সত্ত্বেও মানুষ তার অব্যক্ত ব্রহ্মের অনন্ত শক্তিবলে নতুন প্রেরণা পাচ্ছে— স্বামীজী একেই বলেছেন 'সুন্দর'। 'মৃত্যুরূপা কালী' স্বামীজীর তাই এত প্রিয়। উপনিষদের শ্লোক আর মীরার ভজন তাঁর কাছে স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর, কারণ অসীমের সঙ্গে মিলনের আকৃতি এমন করে কোথায় আর প্রকাশ পেয়েছে? বিল্বমঙ্গল, গীতগোবিন্দ তাঁর চোখে সুন্দর, কারণ মানবপ্রেম এখানে ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে পাত্র-পাত্রীদের উত্তরণ ঘটিয়েছে। দেহবাদী প্রেম দেহের সীমা ছাড়িয়ে আত্মায় ঊর্ধ্বায়িত হয়েছে। তাজমহল এজন্যই তাঁর চোখে সুন্দর। বিপরীতদিকে সমসাময়িক সাধারণ বাঙালী কবিদের বিদ্রূপ করে লিখেছেনঃ 'ঐ যে একদল দেশে উঠছে, মেয়েমানুষের মতো বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে-বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় "হাঁসেন হোঁসেন" করেন—ওরা কেন যাক না বাপু...।'[৪৬] কাপুরুষের প্রেম, দেহবাদী প্রেম স্বামীজীর চোখে 'পিরীত' মাত্র, তা অসুন্দরেরই প্রতীক।

এই কথোপকথন সমাপ্ত হয় স্বামীজীর 'মেঘনাদবধকাব্য' থেকে পাঠে। তিনি 'এই কাব্যের সর্বোৎকৃষ্ট' বলে পড়ে শোনালেন কাব্যটির সপ্তম সর্গ থেকে, বিশেষত ৩২৯ ছত্র থেকে ৩৮৯ ছত্র, যেখানে মন্দোদরী রাবণকে রণক্ষেত্রে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছেন এবং মহাবলী কর্তব্যপরায়ণ রাবণ বলছেনঃ

> বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
> আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
> এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
> মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
> রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
> বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব![৪৭]

স্বামীজীর মাইকেল-প্রীতি থেকে একটি মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। আমরা অচিরেই দেখতে পাব যে, স্বামীজী সারাজীবন বাগাড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন। মাইকেলের বাগাড়ম্বর নিঃসন্দেহ। বাগাড়ম্বর বিষয়ে তাঁর গুরু মিলটন সম্বন্ধে টি. এস. এলিয়ট বলেছেনঃ 'Milton writes English like a dead language',[৪৮] এবং মাইকেলের ভাষা বিদ্রূপ করে শুধু যে তাঁর কোন সমসাময়িক 'ছুছুন্দরীবধকাব্য' রচনা করেছিলেন তা-ই নয়, খ্যাতনামা বাঙালী লেখক-সমালোচকও এই ভাষা নিয়ে আপত্তি প্রকাশ করেছেন। তাহলে স্বামীজী কেন মাইকেলের ভাষার প্রশংসা করলেন? আমরা ভাবতে পারি যে, স্বামীজীর সাহিত্যচেতনা শুধু ভাষানির্ভর ছিল না, সেই চেতনায় বিষয়বস্তুই প্রধান ছিল। বীর্যের প্রতিমূর্তি বিবেকানন্দের সমর্থন লঙ্কাধীশ রাবণের প্রতি, যিনি

৪৬। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮৮

৪৭। মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত (সম্পাদনাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৪৮, সপ্তম সর্গ, ছত্র ৩৩৯-৪৪

৪৮। Milton : Two Studies—T. S. Eliot, Faber and Faber, London, 1968, p. 14

জানেন শোকের, বিলাপের সময় প্রচুর মিলবে আগামীতে কিন্তু এই মুহূর্তটি হচ্ছে প্রতিশোধের, সংগ্রামের মুহূর্ত, অতএব শোককে চিত্তের এক কোণে সরিয়ে রেখে নামতে হবে কর্মক্ষেত্রে, অর্থাৎ সমরাঙ্গনে। এমনই হচ্ছে সংযত-আবেগ, বীরধর্মী, কর্মৈষণা-প্রণোদিত স্বামী বিবেকানন্দের স্বরূপ। এইজন্যই তিনি মাইকেল-বিরোধিতার বিরোধী ছিলেন, এইজন্যই মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' মহাকাব্য থেকে মহাবীর সেটানের বহুবিশ্রুত বাণী আবৃত্তি করেছিলেন :

> What though the field be lost ?
> All is not lost ; the unconquerable will,
> And study of revenge, immortal hate,
> And courage never to submit or yield :
> And what is else not to be overcome ?[৪৯]
>
> Fallen cherub, to be weak is miserable
> Doing or suffering :[৫০]

স্বামীজী ইউরোপীয় সাহিত্য যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর রচনাবলীতে উল্লেখ পাই ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে 'সং অব সলোমনে'র, হোমারের, দান্তের 'ইনফার্নো'র, সেক্সপীয়রের (উদ্ধৃতি পাই 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' এবং 'মিড সামার নাইটস ড্রীমে'র), ভিক্টর হিউগো-লামার্টিন-জুল ভার্নের, কার্লাইল-ব্রাউনিং-এডুইন আর্নল্ডের। এছাড়া এতাবৎ অনির্দিষ্ট বহু উল্লেখ আরও আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু দুখানা কাব্য সম্বন্ধে স্বামীজীর আগ্রহ ও প্রশস্তি পুনরাবৃত্ত। প্রথম কাব্যটি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। স্বামীজী বলছেন : 'এই মহৎ কাব্যগ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যরত্নরাজির চূড়ামণিরূপে পরিগণিত।...(ইহাতে) অতি উচ্চাঙ্গের কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ...শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অতি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন। এই সকল উপদেশই গীতাকে পরম আশ্চর্য কাব্যগ্রন্থে পরিণত করিয়াছে।'[৫১] উপনিষদের কবিত্বমূল্য সম্বন্ধে স্বামীজী 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' শীর্ষক ভাষণে বিশদ আলোচনা করেছেন। এখানে তারই কিছু অংশ উল্লেখ করছি : '...ঔপনিষদিক সাহিত্যে মহান ভাবের যেমন অতি অপূর্ব চিত্র আছে, জগতে আর কোথাও তেমন নাই।...যে-কোন পাশ্চাত্য কবির কাব্য আলোচনা করা যাউক, তাঁহাদের কাব্যে স্থানে স্থানে মহত্ত্বব্যঞ্জক অপূর্ব শ্লোকাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে সর্বত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা—বহিঃপ্রকৃতির বিশাল ভাব, দেশকালের অনন্ত ভাবের বর্ণনা। আমরা বেদের সংহিতাভাগেও এই চেষ্টা দেখিতে পাই। সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণনাত্মক কতকগুলি অপূর্ব ঋঙ্‌মন্ত্রে বাহ্যপ্রকৃতির মহান ভাব, দেশকালের অনন্তত্ব অতি গম্ভীর ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা যেন শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, এ উপায়ে অনন্তস্বরূপকে

৪৯। Paradise Lost, Book-1, Lines—105-09 ৫০। ibid., Lines—157-58

৫১। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪০৭

ধরিতে পারা যায় না; বুঝিলেন, তাঁহাদের মনের যেসকল ভাব তাঁহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অনন্ত দেশ—অনন্ত বিস্তার—অনন্ত বাহ্যপ্রকৃতিও সেগুলি প্রকাশ করিতে অক্ষম। তখন তাঁহারা জগৎ-সমস্যা ব্যাখ্যা করিবার জন্য অন্য পথ ধরিলেন।'[৫২] সেই অন্য পথ রূপকের পথ, বাক্‌প্রতিমার পথ, প্রতীকের পথ। স্বামীজী উদ্ধৃত করেছেন কঠোপনিষদ্ থেকে 'ন তত্র সূর্যো ভাতি' এবং মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর থেকে সেই অবিস্মরণীয় ছত্রগুলি, যে ছত্র রচনা একমাত্র প্রাচীন ভারতেই সম্ভব ছিল ঃ

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্ অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥[৫৩]

স্বামীজীর বাণীতে ও রচনায় বহুবার এই অতুলনীয় রূপকটির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, পঞ্চম খণ্ডেই উপরোক্ত উদ্ধৃতির পরে ব্যাখ্যা আছে। এবার একটি স্তবকের উদ্ধৃতি করছি যেটি দীর্ঘ হলেও স্বামী বিবেকানন্দের মনোভঙ্গির উজ্জ্বল সাক্ষ্য ঃ '...উপনিষদের ভাষা ভাব—সবকিছুরই ভিতর কোন জটিলতা নাই, উহার প্রত্যেকটি কথাই তরবারি-ফলকের মতো, হাতুড়ির ঘায়ের মতো সাক্ষাৎভাবে হৃদয়ে আঘাত করে। উহাদের অর্থ বুঝিতে কিছুমাত্র ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই...কোন ঘোরফের নাই, একটিও অসম্বদ্ধ প্রলাপ নাই, একটিও জটিল বাক্য নাই যাহাতে মাথা গুলাইয়া যায়। উহাতে অবনতির চিহ্নমাত্র নাই, বেশী রূপক-বর্ণনার চেষ্টা নাই। বিশেষণের পর বিশেষণ দিয়া ভাবটিকে ক্রমাগত জটিলতর করা হইল, প্রকৃত বিষয়টি একেবারে চাপা পড়িল, মাথা গুলাইয়া গেল, তখন সেই শাস্ত্ররূপ গোলকধাঁধার বাহিরে যাইবার আর উপায় রহিল না—উপনিষদে এ-ধরনের চেষ্টার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।'[৫৪] এই পরম স্বচ্ছ, স্পষ্ট উক্তির ব্যাখ্যা করতে গেলে স্বামীজী-নিন্দিত জটিলতার প্রলাপ সৃষ্টি হবে।

উপরের উদ্ধৃতি থেকে আমরা পৌঁছাই স্বামীজীর অন্য এক চিন্তায়। স্বামী বিবেকানন্দ বারংবার একটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন—ভাষাপ্রয়োগ সম্বন্ধে। সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁর যেসব শিষ্য ভাষণদানে, প্রচারকর্মে, শিক্ষণকর্মে, পত্রিকাচালনায় নিরত ছিলেন, তাঁদের পক্ষে কোন্ ধরনের ভাষাপ্রয়োগ সঙ্গত? এই প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে তাঁর বাণীতে ও রচনায় অগণিতবার। একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের অলঙ্কারপ্রিয়তা তিনি সহ্য করেছেন, এমনকি তার প্রশংসাও করেছেন, কারণ এই ত্রুটির বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্থিতপ্রজ্ঞের বীর্য। কিন্তু অন্যদিকে দেখি তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করছেন যে, অধুনা ভারতীয় চারুকলায় মৌলিকতার দৈন্যে অলঙ্কারপ্রিয়তার আধিক্য ঘটেছে, অলঙ্কারবাহুল্য কোন কালেই কোনও সাহিত্যে সঙ্গত নয়।[৫৫] শঙ্করাচার্যের বিবেকচূড়ামণি

৫২। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১২৫ ৫৩। মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।১।১-৩
৫৪। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১২৮ ৫৫। তদেব, পৃঃ ১৬৪

থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটির উল্লেখ পাই রচনাবলীতে বহুবার ঃ

বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥[৫৬]

শব্দঝরী বাগ্‌বিস্তার তো বস্তুতই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের এক খেলা, তাঁদের খেলা তাঁরা করুন কিন্তু মুক্তিকামী কি করবেন এসব দিয়ে? স্বামীজীর লেখা একটি পত্র-প্রবন্ধ বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অমূল্য রচনা কিন্তু, কী আশ্চর্য, এই প্রবন্ধটির মর্যাদা দেখতে পাই না বাংলা শিক্ষার জগতে, যদিও পক্ষান্তরে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কিছুটা অনুরূপ উক্তি (তিনি বলেছিলেন কবিতার ভাষা হবে কথ্য ভাষা, চাষীর ভাষা) নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে তো রীতিমতো একটি অনবশেষ তাত্ত্বিক তর্ক চলেছে। স্বামীজীর এই পত্রপ্রবন্ধটি (আদিতে পত্র হিসাবে লিখিত হয়েছিল) 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশের কাল থেকে আর ব্যক্তিগত উপদেশ বা পরামর্শ বা আদেশ নেই, এটি এখন সর্বজনের চিন্তার উৎস, একটি চিরন্তন তত্ত্বের আধার হয়েছে। প্রবন্ধটির কিছু বাক্য উদ্ধৃত করছি ঃ 'বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা "লোকহিতায়" এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। ...চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও-একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? ...স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ একচাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়—লক্ষণ।

'...বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যেদিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়।...যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।'[৫৭] লোকহিতকারী কর্মের ভাষা চলিতভাষা, শিল্পনৈপুণ্যের ভাষাও চলিতভাষা। স্বামীজী-সমর্থিত 'কলকেতার ভাষা' আজ বাংলা ভাষায় চলেছে, প্রবলভাবেই চলেছে, সাহিত্যিক রচনায়, তথ্যভিত্তিক, জ্ঞানভিত্তিক, তর্কভিত্তিক আলোচনায়ও চলেছে এবং এই চলিতভাষার প্রয়োগে শিল্পনৈপুণ্যের কিছুমাত্র ঘাটতি

৫৬। বিবেকচূড়ামণি, ৬০ ৫৭। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫-৬

হয়নি। স্বামীজীর মূল যুক্তির প্রবাহে ('যে ভাষায় ঘরে কথা কও') আজ বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে 'কলকেতার ভাষা' ছাড়া বঙ্গদেশীয় অপরাপর আঞ্চলিক ভাষা (dialect) অবধি কখনও প্রবেশ করছে, করছে নিঃসঙ্কোচে, গ্রাহ্য হচ্ছেও নিঃসঙ্কোচে। ভাষাপ্রয়োগের এই অব্যর্থ শক্তিমান যুক্তি পেশ করে স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম দৃঢ় ও অবিস্মরণীয় শিলাস্তম্ভ হয়ে রইলেন।

॥ ৬ ॥

শিল্পের নানা রকম দিক নিয়ে যে মহামনীষী চিন্তা করেছিলেন, তাঁর সমগ্র মানসে কি নানা-শিল্প-সমন্বয়ী কোন সার্বিক নন্দনতত্ত্ব বিরাজ করত? ইস্থেটিক্স-শাস্ত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান কতখানি?

স্বামী বিবেকানন্দকে যদি মাত্র একটি আখ্যায় গুণান্বিত করা অনুমোদিত হয়, তাহলে তাঁকে সমন্বয়ী প্রতিভা বলা সম্ভবত অসঙ্গত হবে না। সমন্বয় তখনই সম্ভব, তখনই ধ্রুব, যখন যাবতীয় বস্তুতে, অভিজ্ঞতায়, চিন্তায় একই সূক্ষ্ম কারণ ক্রিয়াশীল। বিবেকানন্দ জেনেছিলেন—তাঁর গুরুর শিক্ষায়, নিজ কর্মজীবনে ও সাধনায়, ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য থেকে—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই সর্বমূলাধার অদ্বয় শক্তি থেকে সমুত্থ। যেহেতু জীবনের সবকিছুই এই মৌল ভাবকেন্দ্র থেকে উৎসারিত, যাবতীয় চারুকলার মূলস্থ নন্দনতত্ত্বও এই ভাবকেন্দ্রের অন্যতম শাখা।

ইস্থেটিক্স-শাস্ত্রের, নন্দনতত্ত্বের গোড়ার কথা হচ্ছে সৌন্দর্যের ধারণা। সৌন্দর্য কি, কাকে বলি ও কেন বলি সুন্দর, সৌন্দর্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক কি এবং কোথায়? অবশ্যই এ-বিষয়ে বিবেকানন্দের আলোচনা তেমন বিস্তৃত নয় যেমনটি আমরা পেতে পারি হেগেল বা ক্রোচের গ্রন্থ থেকে। তবুও তাঁর রচনাবলী থেকে ইতস্তত অনেক অমূল্য তাত্ত্বিক উক্তি খুঁজে পাওয়া আদৌ কঠিন নয়। তাঁর সৌন্দর্যের ধারণা প্রকাশিত হয়েছে ভক্তিযোগের আলোচনায়ঃ 'সমাজের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ—সবই প্রেমপ্রসূত; আবার কুৎসিত এবং পৈশাচিক ব্যাপারগুলিও সেই একই প্রেমশক্তির বিকার মাত্র। ..."তুমি সুন্দর, আহা! অতি সুন্দর, তুমি স্বয়ং সৌন্দর্যস্বরূপ!"—হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ভক্তেরা চিরকাল এইরূপ বলেন। ভক্তিযোগে আমাদের শুধু এইটুকু করিতে হইবে—সুন্দরের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা ভগবানের দিকে চালিত করিতে হইবে। ...মানুষের মুখে, আকাশে, তারায় অথবা চন্দ্রে যে সৌন্দর্যের বিকাশ দেখা যায়, তাহা কোথা হইতে আসিল? উহা সেই ভগবানের সর্বব্যাপী সৌন্দর্যের আংশিক প্রকাশমাত্র।'[৫৮]

সৌন্দর্য তাহলে ঐশ্বরিক শক্তি। সৃষ্ট জীবের ও বস্তুর সৌন্দর্য পরমস্রষ্টার সৌন্দর্য থেকেই পাওয়া এবং সেই সৌন্দর্যেরই ক্ষণিক আভাস। বিবেকানন্দের এই প্রত্যয়ে আমাদের সৌন্দর্যচিন্তা নিমেষে বিনাশশীল জড়জগতের বহু ঊর্ধ্বে অক্ষয়, অব্যয় স্তরে

৫৮। তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৫২-৩

উন্নীত হয়। আমরা দেখি যে, এমনকি প্লেটো তাঁর 'সিম্পোসিয়াম' নামক গ্রন্থে ডিওটিমার জবানীতে যে সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন তার তুলনায় স্বামীজীর চিন্তা কত বেশী গ্রাহ্য, কত বেশী মহৎ! স্বামীজী আরও বলেছেন যে, সৌন্দর্য ও আনন্দ অভিন্ন। তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ স্মরণে রেখে বলছেন ঃ 'যেখানেই একটু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে সেই অনন্ত আনন্দস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের অংশ রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে।'[৫৯] সৌন্দর্যের ও আনন্দের সম্মিলিত সত্তায় আরও একটি উত্তুঙ্গ গুণের কথা বলেছেন স্বামীজী, জ্ঞানের কথা ঃ 'অপরে যে মুখ অতি সুন্দর বলিবে, তাহাতে জ্ঞানের কোন চিহ্ন না থাকিলে যোগীর নিকট তাহা পশুর মুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।'[৬০]

মানবচিত্তে যখন সৌন্দর্যের বোধ জন্মাল, তখন প্রশ্ন জাগল, শিল্প কাকে বলে? প্রশ্নটি জাগল কেননা সৌন্দর্য তো অনায়াস স্বভাবজ গুণ হতে পারে, হয়ও ঃ আকাশের তারা, গাছের ফল, শিশুর আনন। কিন্তু শিল্প বলতে বুঝি মানুষ যখন তার অন্তরস্থ সৌন্দর্যাদর্শ রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে স্বভাবজ অনায়াস মূর্তির পরিবর্তন করে, তখন এই স্বেচ্ছাবৃত কর্মটিই শিল্পকর্ম। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন হংসবলাকার অভিগমন উত্তর থেকে দক্ষিণে, সেই দর্শন রূপায়িত হল 'বলাকা' কবিতায়। হুইসলার তাঁর বৃদ্ধা মাতার চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু চিত্রটি হয়ে গেছে প্রাকৃতোত্তর শিল্পকর্ম। শাহ্‌জাহান তাঁর প্রেয়সীর সমাধিস্থলে যে হর্ম্য নির্মাণ করলেন সে হর্ম্য সাধারণ কবরস্থানের পর্যায় ছাড়িয়ে চলে গেল কোন্ ঊর্ধ্বলোকে। তাহলে আমরা দেখছি যে, শিল্পকর্মের ভিত্তি যদিও স্বভাবজ প্রাকৃত রূপে, তবুও মানুষের কল্পনার ও সৃজনীশক্তির প্রভাবে কর্মটি প্রাকৃতোত্তর রূপ পরিগ্রহ করে। শিল্পকর্মটি মানুষী, শিল্পী মানুষ; প্রকৃতি ঐশী, প্রকৃতির গণনাতীত রূপ ঈশ্বরের গণনাতীত রূপসৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক। এই যে প্রভেদ এ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে নন্দনতত্ত্বের অনবশেষ তর্কবিতর্ক। প্লেটো নিজেই কবি ছিলেন, কিন্তু বলেছিলেন যে, শিল্পীর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাকৃত জগৎকে রূপায়িত করা, শিল্পীর উচিত মধ্যবর্তী প্রাকৃত জগৎকে বাদ দিয়ে সরাসরি ঈশ্বরচিন্তায় আত্মনিয়োজন করা। প্লেটোর যুক্তিতে আত্মার মুক্তির ঊর্ধ্বযাত্রায় 'নেচার'-চিন্তা অনাবশ্যক। প্লেটোর এই সুবিখ্যাত যুক্তি ছাড়া (এই যুক্তি আজও যাবতীয় নান্দনিক চিন্তায় প্রভাবশীল) অন্য একটি আপত্তিও শিল্পের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়েছে। অনেক ধর্মচিন্তায় বলা হয়েছে যে, শিল্পকর্ম দ্বারা শুধু শিল্পোৎসাহীর চিত্তে কামজ ভোগবাসনার উদ্রেক করা হয়, অতএব শিল্পকর্ম অপবিত্র। বৌদ্ধ পণ্ডিত বুদ্ধঘোষ তাঁর 'বিশুদ্ধিমগ্গ' গ্রন্থে নিন্দা করেছেন চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পীদের, কেননা এঁদের শিল্পকর্মের উপভোগে কামনাবাসনাদি নীচ প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়।

এই তর্কের পরিপ্রেক্ষিতে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে স্বামীজীর মহামূল্যবান একটি দীর্ঘ উক্তির কয়েক পঙ্‌ক্তি তুলে ধরছি ঃ

'যে জাতটা বড় materialistic (জড়বাদী), তারা nature (প্রকৃতি)-টাকেই ideal (আদর্শ) বলে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের expression (বিকাশ) শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাবপ্রাপ্তিকেই ideal (আদর্শ) বলে

৫৯। তদেব, পৃঃ ৫৩ ৬০। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৮

ধরে, সেটা ঐ ভাবই nature-এর (প্রকৃতিগত) শক্তিসহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে।'[৬১]

এর পরে স্বামীজী যেকথা বললেন তাকে বলতে পারি গভীরতম প্রজ্ঞার নির্যাস : 'প্রথম শ্রেণীর জাতের nature (প্রকৃতি)-ই হচ্ছে primary basis of art (শিল্পের মূল ভিত্তি); আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর Ideality (প্রকৃতির অতীত একটা ভাব) হচ্ছে শিল্প বিকাশের মূল কারণ।'[৬২]

স্বামীজীর স্মরণ আছে যে, প্যারী শিল্পপ্রদর্শনীতে একটি মূর্তির নীচে লেখা ছিল : Art unveiling nature। অন্যত্র স্বামীজী বলছেন : 'Truth represent (প্রতীকে সত্যকে প্রকাশ) করা চাই, নইলে কিছুই হয় না...।'[৬৩] এই বলতে স্বামীজী যা বুঝিয়েছেন, সেকথা স্পষ্ট হয়েছে তাঁর একটি ভঙ্গিতে। কুরুক্ষেত্রে যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতা বলছেন, '...তখন তার central idea (মুখ্যভাব)-টি তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে। এই বলিয়া স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে আঁকা কর্তব্য, সেইমতো নিজে অবস্থিত হইয়া দেখাইলেন আর বলিলেন...।'[৬৪] স্বামীজী যেন নিজেই শ্রীকৃষ্ণ হয়ে গেলেন (মনে রাখতে হবে যে তিনি অভিনয়কুশল ছিলেন), হয়ে তাঁর বন্ধুকে বললেন : 'সমস্ত শরীরে intense action (তীব্র ক্রিয়াশীলতা), আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত! এই হল গীতার central idea (মুখ্যভাব); দেহ, জীবন আর প্রাণ-মন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর।'[৬৫]

স্বামীজীর চিন্তায় শিল্পের মূল ভিত্তি (primary basis of art) দু-রকমের হতে পারে : Nature এবং Ideality—নিসর্গ এবং কল্পাদর্শ। অন্যান্য নান্দনিক হয় এক ভিত্তি ধরেছেন নতুবা অন্য ভিত্তি ধরেছেন এবং এহেন ভিত্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলে শিল্প হয়ে গেছে কোথাও প্রধানত প্রকৃতি-পরবশ, বাস্তববাদী (যার ফলে বৌদ্ধগণনিন্দিত তাৎক্ষণিক মরজগৎ মানবজাতির পক্ষে প্রলোভনের আগার হয়ে ওঠে) অথবা প্রকৃতি-পরাঙ্মুখ, অবাস্তব (যার ফলে দুর্বল শিল্পী কল্পাদর্শ-সত্তাকে বিকৃত করে ফেলেন)। কোন্ পর্যায়ে আইডিয়াল ভাব, কল্পাদর্শ-সত্তা মহত্তম প্রকাশ পেতে পারে তার তিনটি দৃষ্টান্ত আমরা পাই 'বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' গ্রন্থে। প্রথমত, গীতানিষ্যন্দী শ্রীকৃষ্ণের দেহভঙ্গি (যার উল্লেখ উপরে করেছি); দ্বিতীয়ত, স্বামীজীর 'Kali the Mother' কবিতা-পাঠ; তৃতীয়ত, রামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহরের চিত্র-পরিকল্পনার ব্যাখ্যা।

'Kali the Mother' কবিতাটি যখন স্বামীজী পাঠ করলেন, তখন '...শিষ্যের মনে হইতে লাগিল, যেন মহাপ্রলয়ের সংহারমূর্তি তাহার কল্পনাসমক্ষে নৃত্য করিতেছে।'[৬৬] মহৎ কবিতা তো শব্দঝরী বাক্চাতুরী নয়, কবিতার ভাষার মাধ্যম দিয়ে, কবিতার প্রতীকী বহিরঙ্গ ভেদ করে আমরা পৌঁছাতে পারি সেই নিভৃততম বোধিতে যেখানে

৬১। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৮৮ ৬২। তদেব, পৃঃ ১৮৮-৮৯

৬৩। তদেব, পৃঃ ৪১৪ ৬৪। তদেব

৬৫। তদেব, পৃঃ ৪১৪-১৫ ৬৬। তদেব, পৃঃ ১৯০

'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্'। এই কবিতায় শিল্পের মহত্তম রূপ প্রকাশ পেয়েছে, যে রূপ জড়পদার্থের অগম্য ঊর্ধ্বে—শুদ্ধচৈতন্যের প্রতীকী ভাবনা। স্বামীজীর এই অতুলনীয় শিল্পতত্ত্ব আরও প্রকাশ পেয়েছে যখন তিনি 'রামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহরের জন্য বিকশিত কমলদলযুক্ত হ্রদমধ্যে হংসবিরাজিত সর্পবেষ্টিত' চিত্রের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেছিলেনঃ 'চিত্রস্থ, তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান—যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়, চিত্রের ইহাই অর্থ।'[৬৭]

আমরা এখন স্বামীজীর চিন্তাধৃত শিল্পের মূলতত্ত্বে পৌঁছেছি। শিল্পকর্ম চরম বিচারে, একটি পথ মাত্র, একটি সরণি যার অন্তে বিদ্যমান সেই প্রগাঢ় পরম লক্ষ্যস্থল যার জন্য জীবাত্মার চিরন্তন ব্যাকুল অভিসার। তাহলে শিল্পের জন্য শিল্প, art for art's sake, সে এক অন্তঃসারহীন অলীক উক্তি, কেননা শিল্প তো পরম লক্ষ্য হতেই পারে না, শিল্প শুধু মাধ্যম। জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনের স্বচ্ছন্দ প্রগতির জন্য শিল্প। তার মানে, শিল্পের সর্বোচ্চ গুণ তার প্রতীকী অভিধা, যেমন অভিধা সীলমোহরের চিত্রের ব্যাখ্যায় আভাসিত হয়েছে। সেজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীক সম্বন্ধে উক্তি করেছেন[৬৮] বারংবার, কেবল প্রতিমা পূজার সমর্থনের জন্যই নয়, বরং একথা বলার জন্য যে, 'জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ প্রতীক বা বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক রূপের মাধ্যমে সূক্ষ্মকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।'[৬৯]

নিবেদিতা বলেছেনঃ 'সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান—যে-কোন তত্ত্বের বিচারেই তিনি প্রবৃত্ত হউন না কেন, সেটি যে সেই চরম অনুভূতিরই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র, তাহা তিনি সদাই আমাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতেন। তাঁহার চক্ষে কোন জিনিসই ধর্মের এলাকার বহির্ভূত ছিল না।'[৭০] স্বামী বিবেকানন্দের নন্দনতত্ত্ব তাঁর সর্বধাত্রী জীবনতত্ত্বেরই অঙ্গাঙ্গি অংশ মাত্র।

৬৭। তদেব

৬৮। প্রতীক সম্বন্ধে উক্তি বিবেকানন্দের রচনায় অগণিত স্থানে পাওয়া যায়, কখনও সরাসরি ভাষায়, কখনও তির্যক প্রাসঙ্গিকতায়। তবে বিশেষ করে 'বাণী ও রচনা'র চতুর্থ খণ্ডে প্রতীকচিন্তা প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান। আমি পাঠকের লক্ষ্য বিশেষত আকর্ষণ করছি চতুর্থ খণ্ডের কিছু অংশের প্রতিঃ 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থের 'প্রতীক ও প্রতিমা-উপাসনা' প্রবন্ধটি; 'ভক্তিরহস্য' গ্রন্থের তিনটি প্রবন্ধ—'প্রতীকের ও বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা', 'প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত', 'গৌণী ও পরাভক্তি'; ঐ খণ্ডের 'ভক্তিপ্রসঙ্গে' গ্রন্থের 'বাহ্যপূজা' প্রবন্ধটি।

৬৯। বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬১

৭০। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৬৬

স্বামী বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতায় ও চিন্তায় শিল্প ও স্থাপত্য

ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব

স্বামী বিবেকানন্দের নানামুখী চিন্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয়নি। জাতীয় অভ্যুত্থানের কেন্দ্রীয় পুরুষ হিসাবে তাঁর শক্তিশালী চরিত্র এবং প্রেরণাপূর্ণ বাণীর দিকেই স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট ছিল, ফলে ভারত ও পৃথিবীর প্রগতির জন্য তিনি যে অসামান্য চিন্তাসম্পদ রেখে গেছেন, তা অপেক্ষাকৃত অলক্ষিত থেকে গেছে। বর্তমানে সেই সকল দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন—প্রয়োজন ইতিহাসের, যেহেতু তিনি ভারতীয় ইতিহাসের একালের এক প্রধান পুরুষ ; প্রয়োজন জীবনের, যেহেতু সেই চিন্তাস্রোত থেকে পানীয় তুলে এখনও পান করতে পারি এবং ভবিষ্যতেও পারব।

বিবেকানন্দের মনীষার অবহেলিত একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এখানে—তাঁর শিল্পচিন্তা। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা যথেষ্ট স্বীকৃত নয়, দুঃখের বিষয়। অথচ একটু মনোযোগ দিলেই দেখতে পাব,—পরবর্তী বাংলাদেশের কলাশিল্প-আন্দোলন তাঁর চিন্তাসূত্র ধরেই অগ্রসর হয়েছে—এবং যেখানে তাঁর চিন্তাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, সেইখানেই তা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কলাশিল্প সম্বন্ধে মন্তব্যের অধিকারে প্রশ্ন উঠতে পারে। তিনি বিরাট পণ্ডিত ছিলেন, বহু বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন, তার মধ্যে শিল্পও ছিল, সুতরাং কিছু পুঁথিপড়া মন্তব্য করেছেন—এইটুকু ? না, তা ঠিক নয়। অবশ্যই তিনি শিল্প-ইতিহাসে এবং শিল্পশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে—শিল্পের 'পাগল প্রেমিক' ছিলেন, এবং ভারতবর্ষ ও সারা পৃথিবীর শিল্পনিদর্শন এমনভাবে খুঁটিয়ে দেখেছেন যে, তাঁর সমকালে কোন ভারতবাসী ঐভাবে তা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন (কিংবা দেখতে চেয়েছেন) কিনা সন্দেহ। এ-বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে আছে। তারই পটভূমিকায় স্বামীজীর শিল্পচিন্তাকে উপস্থিত করলে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝা যাবে।

তার আগে বলে নেওয়া যেতে পারে, ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের ইতিহাসে বিবেকানন্দের বিশেষ উল্লেখ না থাকার কারণও আছে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন বড় শিল্পীকে হাতে ধরে কাজ শেখাননি। শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজী যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রিয়নাথ সিংহ বড় শিল্পী নন। জুবিলী আর্ট অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে স্বামীজীর একদিনের শিল্পালোচনার বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু একদিনের আলোচনায় রণদাপ্রসাদ কতখানি পরিবর্তিত হয়েছিলেন, বলতে পারব না। 'রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ সুপণ্ডিত ও স্বামীজীর গুণগ্রাহী'— একথা আমরা জেনেছি ; স্বামীজীর কথায় তিনি 'হৃদয়ে মহা উৎসাহ' পেয়েছিলেন, সেকথাও ; স্বামীজীর প্রেরণাতেই তিনি স্বামীজীর 'কালী দি মাদার' কবিতার ভাবকে চিত্ররূপায়িত করতে

সচেষ্ট হয়েছিলেন ; এবং স্বামীজীর শিল্পচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হবার পরে বলেছিলেন ঃ 'আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে পারত। ...আপনি ঐ বিষয়ে আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। শিল্প সম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনও শুনিনি। আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যেসকল ভাব পেলাম, তা যেন কাজে পরিণত করতে পারি।'[১] রণদাপ্রসাদের এসকল কথার অবশ্যই দাম ছিল, কারণ, শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি নগণ্য ব্যক্তি নন ; হ্যাভেল সাহেব আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য শিল্পরীতি বর্জনের সিদ্ধান্ত করলে যেসব ছাত্র বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছিলেন, রণদাপ্রসাদ তাঁদের নেতা ছিলেন ; তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বৌবাজারের আর্ট অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠা করেন ও দুই দশক সাফল্যের সঙ্গে বিদ্যালয়টি চালিয়েছিলেন।[২]

রণদাপ্রসাদের নিজস্ব শিল্পবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পাঁচ বছর পরে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পূর্বোক্ত আলোচনা হয়েছিল। রণদাপ্রসাদ সুস্পষ্টভাবে পাশ্চাত্য শিল্পরীতির পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামীজী পাশ্চাত্যের বর্জন চাইতেন না, কিন্তু পুরো বিদেশী পদ্ধতিতে দেশীয় প্রাণ মন আত্মার শিল্পগত অভিব্যক্তি সম্ভব, নিশ্চয় একথাও বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে, স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার পর রণদাপ্রসাদ নূতন পথ বা মিশ্র পথ ধরেছিলেন, ততক্ষণ ঐ ক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রভাব প্রমাণিত হবে না। রণদাপ্রসাদের শিল্পরীতিতে যদি স্বামীজীর প্রভাব প্রমাণিত হয়ও, যেহেতু তিনি শিল্প-আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত বিরাট কোন ভূমিকা নিতে পারেননি, তাই স্বামীজীর প্রভাবের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত হবে না। আমরা জানি, হ্যাভেল-নিবেদিতার চেষ্টায় এবং অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের প্রতিভায় শিল্প-আন্দোলন প্রাচ্য ধারাতেই চলেছিল কয়েক দশক ধরে। তাছাড়া আরও বলতে হবে, স্বামীজী স্বয়ং শিল্পী নন ; সেজন্য তাঁর আঁকা ছবি দেখে কারও পক্ষে প্রেরণা পাওয়াও সম্ভব নয়, যেমন পাওয়া সম্ভব ছিল, ধরা যাক, তাঁর গদ্যরচনা থেকে, যেখানে ব্যক্তিগতভাবে তিনি উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা। শিল্পের

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৯০-৯২

২। যোগেশচন্দ্র বাগল বিদ্রোহী রণদাপ্রসাদের ভূমিকা সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ 'The ceceders under the leadership of Ranada Prosad Gupta, a student of the third year class, started in 1897 a new school of art at Bowbazar, Calcutta. 1897 being the Diamond Jubilee Year of the Queen Victoria the School was named the Jubilee Art Academy. A real lover of art, Ranada Prosad, though a student, conducted the school with a great zeal and courage rarely to be found in young men of little or no experience. A section of the elite of the city came to its support from the very beginning and we find the Municipality of Calcutta granting pecuniary aid to the institution from time to time. The school continued to exist for more than two decades and the personal contribution of Ranada Prosad Gupta cannot be over estimated.' [Government College of Art and Craft, Calcutta, 1966, p. 22] যোগেশচন্দ্রের রচনা থেকে রণদাপ্রসাদের সাহসিক ভূমিকার কথা যেমন জানা যায়, তেমনি বোঝা যায়, শিল্পের জাতীয়করণ করতে গিয়ে হ্যাভেল 'পরানুকরণপ্রিয়' ভারতীয়দের কতখানি চঞ্চল করেছিলেন।

ক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রভাব বিস্তৃত হতে পারে অন্যের মাধ্যমে—শিল্পতত্ত্বে যাঁদের তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদের দ্বারা, কিংবা তাঁর স্বল্প পরিমাণ শিল্পবিষয়ক রচনা থেকে, যা আকারে ক্ষুদ্র হলেও তেজে জ্বলন্ত।

সব জড়িয়ে আমাদের বলতে হবে, স্বামীজীর প্রভাব অবশ্যই পরোক্ষ, কিন্তু তা, অধিকন্তু বলছি, মোটেই সামান্য নয়—ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিবেদিতা প্রচণ্ড এক প্রেরণা—সেই নিবেদিতার ভারত-শিল্পবোধ স্বামীজীই দান করেছেন, এবং ভারত-শিল্পের দ্বিতীয় প্রধান শিল্পী নন্দলাল বসু প্রথমে নিবেদিতার মধ্য দিয়ে, পরে সাক্ষাৎভাবে, স্বামীজীর জীবনাদর্শ ও রচনা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, তিনি স্বামীজীর দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত।

এইসঙ্গে আরও জানানো যায়, ভারতের শিল্প-আন্দোলনে যাঁর বিশেষ প্রভাব, সেই ওকাকুরার বিখ্যাত 'আইডিয়ালস অব দি ইস্ট' গ্রন্থের অংশবিশেষে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রভাবই আছে। এবং পরবর্তীকালে ভারত-শিল্প ও প্রাচ্যশিল্পের সর্বোচ্চ ব্যাখ্যাতা আনন্দ কুমারস্বামী অবশ্যই স্বামীজীর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আনন্দ কুমারস্বামীর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথাও আমাদের জানা আছে। হ্যাভেল, উডরফ প্রভৃতিও স্বামীজীর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। দুঃখের বিষয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঙ্গে সেইকালে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিরা এইসব সংবাদ উপযুক্তভাবে সংগ্রহ করে রাখেননি, তাই আজ আর সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

তথাপি শিল্প-আন্দোলনে স্বামীজীর ভাবনেতৃত্ব সম্বন্ধে স্বীকৃতি একেবারে নেই তা নয়। এই পর্বের প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী' গ্রন্থের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন ঃ 'আমার ধারণা, স্বামী বিবেকানন্দ হইতেই এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি সকলের আগে প্রেরণা পাইয়াছিল।' 'উদ্বোধনে'র সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় (১৩৫৬) ডক্টর কালিদাস নাগের একটি প্রবন্ধের নামই হল—'ভারতীয় শিল্প-জাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায়'। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-ও তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে শিল্পসমালোচকরূপে স্বামীজীর ভূমিকার গুরুত্বের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ঐসকল রচনা মূল্যবান—কিন্তু স্বামীজীর ভূমিকার মূল্যের তুলনায় অপ্রচুর। আরও সন্ধান করে আমরা কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ যোগাড় করতে পেরেছি। সমস্ত মিলিয়ে আমাদের এই অপরিহার্য সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে—বিবেকানন্দ ভারতের শিল্পজাগরণের ব্রাহ্ম মুহূর্তের ঋষি। সেই সকল তথ্যপ্রমাণ আমরা ক্রমে উপস্থিত করব, তার আগে বলে নিতে চাই, বিবেকানন্দ যদি প্রত্যক্ষভাবে শিল্পবিষয়ক কোন বক্তব্য উপস্থিত না-ও করতেন, তবু এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ভাবপুরুষ তিনিই হতেন, কারণ, একালে সামগ্রিক ভারতচেতনা প্রথম তিনিই এনেছেন, ভারতশিল্পে যা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে আলিঙ্গন করে উত্থিত হয়েছিলেন, আর ভারত-শিল্পেও দেখি অজন্তা, মুঘল, রাজপুত, কাংড়া রীতি মিলিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের ভাস্কর্য এবং মুঘল স্থাপত্যের

অলঙ্করণ। ভারত-শিল্পের মূল ধারার পাশে লোকশিল্প অবলম্বন করে যে স্বতন্ত্র একটি ধারা গড়ে উঠেছে, তা-ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সহমর্মিতা করে। 'স্বামী বিবেকানন্দ'—ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন ঃ এই মহাদেশের আত্মার প্রতিভূ। তিনি এর আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও তার পূর্ণতার প্রতীক। সেই আত্মিক শক্তিই ভক্তের সঙ্গীতে, ঋষিদের দর্শনে, সাধারণ মানুষের প্রার্থনায় অভিব্যক্ত। ভারতের এই চিরন্তন সত্তাকে তিনি মূর্তি দিয়েছেন, বাণী দিয়েছেন।[৩]

স্বামীজীর ব্যক্তিগত শিল্পপ্রয়াস

শিল্প বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্যের আলোচনায় আসার আগে একটি চিত্তাকর্ষক গবেষণা সেরে নেওয়া যায়—শিল্পের সঙ্গে স্বামীজীর ব্যক্তিগত যোগ কতখানি ছিল, এবং ভারত ও পৃথিবীর শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে তিনি কতখানি পরিচিত ছিলেন? শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে কিছু উদ্ধত সিদ্ধান্ত অগ্রিম জানিয়ে দেওয়া যায়—স্বামীজী সম্ভবত তাঁর কালের 'বিখ্যাত' ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে ভারত ও পৃথিবীর শিল্পসৃষ্টি স্বচক্ষে দেখেছিলেন।* স্বামীজী কি পরিমাণে শিল্পকীর্তি দেখেছেন, সেকথায় আসার আগে বলে নেওয়া ভাল, তিনি শিল্পী না হলেও রঙ-তুলি নিজের হাতে নিয়েছেন বাল্যকাল থেকেই। মহেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রদত্ত তথ্য থেকে জানতে পারি, এগারো-বারো বছর বয়সে তিনি পারিবারিক অভিনয়ের মঞ্চে রঙীন দৃশ্যপট আঁকতেন। পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে যে খাতবদল হল তাতে রঙ-তুলির সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কথা নয়, কিন্তু তাঁর কলাকুতূহল যে যায়নি, তার প্রমাণ পেয়েছি নিবেদিতার চিঠি থেকে। ১৮ অক্টোবর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের এক চিঠিতে নিবেদিতা আমেরিকা থাকাকালে স্বামীজীর পোরট্রেট-আঁকায় মহা উৎসাহের কথা জানিয়েছেন। উৎসাহ অবশ্য যতখানি. নৈপুণ্য সম্ভবত ততখানি নয়, ব্যাপারটা সাময়িক খেয়ালেরই, এবং এই খেয়ালের শিকার যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁরা ঐ উৎসাহী শিল্পীর হাতে স্বমুখের বিচিত্র রূপান্তর দেখে আনন্দে আঁতকে উঠেছিলেন। অন্তত নিবেদিতা—মিস ম্যাকলাউডকে লেখা তাঁর ১৮ অক্টোবর ১৮৯৯-এর চিঠি থেকে তাই দেখতে পাচ্ছি ঃ 'আমরা মধ্যাহ্নভোজনের অবসরে মজা করে স্বামীজীকে খোঁচাতে লাগলাম—ধর্মাচার্যের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর উদাসীনতা এবং পোরট্রেট আঁকার ব্যাপারে তাঁর বিপুল গর্ব নিয়ে। তিনি আমার তিন-চারটি

৩। President Radhakrishnan's Speeches and Writings (May 1962-May 1964), Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1965, p. 188

* সমকালে যথেষ্ট পরিমাণে ইউরোপীয় শিল্পনিদর্শন দেখেছেন, এমন আর একজন ভারতীয়ের নাম এখানে করতে হয়—তিনি শশিকুমার হেশ। তাঁর আগে রোহিণীকুমার নাগও ইউরোপে গিয়েছিলেন শিল্পশিক্ষা করতে—সেখানে অকালে মারা যান। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ ভ্রমণকালে দ্বারকানাথ ঠাকুর সেখানকার অনেক শিল্পনিদর্শন দেখেছেন। [দ্বারকানাথ ঠাকুর—কিশোরীচাঁদ মিত্র (অনুবাদ ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ; সম্পাদনা ঃ কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত), সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬২ দ্রষ্টব্য]

পোরট্রেট এঁকে ফেলেছেন। সেগুলি অন্য সকলে বলছে যে, এমনকি আমার চেহারার পক্ষেও মানহানিকর! কিন্তু তাঁর তো স্ফূর্তির সীমা নেই!'

এক্ষেত্রে স্বামীজীর শিল্পগুরু কিন্তু নিবেদিতার মতো কঠোর হতে পারেননি। চিত্রশিল্পী শ্রীমতী মড স্টামের কাছেই ঐকালে স্বামীজী শিল্পদীক্ষা নিয়েছিলেন। এবং তিনি স্বামীজীকে যোগ্য ছাত্ররূপেই দেখেছিলেন। অবশ্য মড স্টামের কাছে বিবেকানন্দ শেষ পর্যন্ত চিত্রের স্রষ্টা অপেক্ষা চিত্রের উপাদানরূপেই অধিক বরণীয়। তিনি তাঁর বিবেকানন্দ-স্মৃতিপ্রসঙ্গে বলেছেন: 'অপূর্ব তাঁর কথা, অপূর্ব তাঁর ধর্মভাষণ। আর যখন তিনি রিজলির লনে তাঁর অগ্নিবর্ণ পোশাক পরে পাদচারণ করতেন—তখন সে কী আকারমহিমা! কবিরা যে পদক্ষেপের কথা বলেছেন—"প্রতি পদক্ষেপে অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যাত হয় পৃথিবী"—স্বামীজীর পদপাত সেই কল্পনারই নিকট প্রকাশ—যাকে এ জীবনে আর কখনও দেখব বলে আশা করি না। ...আর অগ্নিশিখার মতো রেশমী পোশাকে আবৃত দেহ—কী অসাধারণ আকার—মন-প্রাণ-হৃদয়-কল্পনাকে একেবারে ক্রীতদাস করে রাখে। হলঘরে আগুনের পাশে যখন তিনি বসে থাকতেন—তাঁর দৃষ্টি ক্রমান্বয়ে একের পর অন্যের উপর দিয়ে সরে যেত—সঘন কৃষ্ণ আর্দ্র গভীর নয়ন—প্রাচ্য উপমার ভ্রমররাজির মতো।'[৪]

শ্রীমতী মড স্টাম তাঁর প্রফেট-শিষ্যের শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নের বিবরণ দিয়েছেন: 'একদিন স্বামীজী আমাকে বললেন, তিনি এমন কিছু কাজ চান যা তাঁকে ব্যস্ত রাখবে এবং ঐকালে যে চিন্তা তাঁকে উত্যক্ত করছিল, তাকে দূর করবে। আমি কি তাঁকে অঙ্কনশিক্ষা দিতে পারি না? তদনুযায়ী আঁকার সরঞ্জামাদি এল, একেবারে নির্ধারিত সময়ে তিনি হাজির হলেন। খুবই বিনীত কুণ্ঠিতভাবে তিনি একটি মস্ত লাল আপেল আমার হাতে দিয়ে নত হয়ে সসম্ভ্রমে নমস্কার করলেন। এই ফল দানের তাৎপর্য কি, আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন—"শিক্ষা যাতে ফলপ্রদ হয় তার প্রণামী।" কী অদ্ভুত ছাত্র তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন! শুধু একবার একটা কিছু বললেই হয়ে যেত। অসাধারণ তাঁর স্মরণশক্তি ও মনঃসংযোগের ক্ষমতা—নবশিক্ষার্থীর পক্ষে তাঁর ড্রইং অদ্ভুতভাবে বুদ্ধিযুক্ত ও নিখুঁত। চতুর্থ পাঠ নেবার কালেই তিনি পোরট্রেট আঁকার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছেন বলে অনুভব করলেন। সুতরাং...তুরীয়ানন্দ মডেল হয়ে বসলেন—ব্রোঞ্জমূর্তির মতো—তাঁর ছবিও আঁকা হল উৎকৃষ্টভাবে। মিঃ লেগেটের পাঠগৃহই স্টুডিও হয়ে দাঁড়াল। ...পরবর্তী বৎসরগুলিতে ঐ ঘরে অনেক বৃহৎ মানুষ হয়তো আসবেন, আসবেনই, কিন্তু সেই শিশুর মতো মানুষটিকে ওখানে আর পাওয়া যাবে না—ক্রেয়ন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছেন, এমন মন-প্রাণ তাতে ঢেলে দিয়েছেন, মনে হয় যে, ঐ বুঝি তাঁর বৃত্তি। ছবি আঁকা থেকে তিনি কত আনন্দ পেয়েছেন, শিখতে পেরে তাঁর কত গভীর উল্লাস—সেসবের জন্য তিনি যে কতবার আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন!'[৫]

৪। Reminiscences of Swami Vivekananda—His Eastern and Western Admirers, Advaita Ashrama, Calcutta, Third Edition (1983), pp. 264-68

৫। ibid., p. 265

শিল্পসৃষ্টির আনন্দে মগ্ন থাকার মতো যথেষ্ট অবসর স্বামীজী তাঁর জীবনে খুঁজে পাননি, যদিও রামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রয়োজনে এক্ষেত্রে কিছু সক্রিয় তাঁকে হতে হয়েছিলই। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর প্রেরণায় যখন মাদ্রাজ থেকে 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা বেরোয়, তখন স্বামীজী পত্রিকাটির শ্রীহীন প্রচ্ছদের বিষয়ে আপত্তি করেছিলেন। তারপর মাদ্রাজ থেকেই, একই গোষ্ঠীর চেষ্টায় পরের বছরে স্বামীজীর প্রেরণাতে আবার অন্য একটি পত্রিকা, 'প্রবুদ্ধ ভারত' বেরুল—তার পরিচালকেরা স্বামীজীকে তুষ্ট করবার জন্য পত্রিকার প্রচ্ছদে চিত্রশিল্পের পরাকাষ্ঠা ঘটালেন। প্রচ্ছদে দেখা গেল, অঙ্কিত আছেঃ ভারতের অরণ্যভূমে শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনী ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেয়েছেন প্রাণদায়িনী নদীতটে বৃদ্ধ বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রাচীন ঋষি উপবিষ্ট, তাঁর মুখ থেকে উৎসারিত হচ্ছে প্রাচীনতর, স্নিগ্ধতর, প্রাণরসপূর্ণ দর্শনধারা, সাহেব-মেম তাতে একেবারে বিমোহিত। —এহেন বিরাট বিষয় নিয়ে আঁকা একটি জটিল ছবি পরিবেশন করতে পেরে স্বামীজীর মাদ্রাজী ভক্তগণ বিশেষ পুলকিত হয়েছিলেন, পুলকিত হয়েছিলেন শিক্ষিত ভারতীয়গণ, কারণ, ভারতীয় চিত্রশিল্পের তৎকালীন মান অনুযায়ী ছবিটি দর্শনীয় ছিল। তাই পুনার বিখ্যাত 'মারাঠা' কাগজ লিখেছিলঃ 'The front page is almost picturesque'—কিন্তু বিদেশে বসে সেই ছবি দেখে স্বামীজীর লজ্জার সীমা ছিল না। ১৪ জুলাই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর ননজুণ্ডা রাওকে এ-সম্বন্ধে লিখে পাঠিয়েছিলেনঃ একটা বিষয়ে মন্তব্য করতেই হচ্ছে, প্রচ্ছদটা একেবারে বর্বর, বীভৎস, কদর্য। সম্ভব হয় তো বদলে ফেলুন। ওটাকে সহজ করুন—ওতে প্রতীক-ভাব দিন। মানুষের চেহারা একদম নয়। বটবৃক্ষ জাগরণের চিহ্ন নয়, পাহাড়ও তা নয়, ঋষিও নয়, ইউরোপীয় দম্পতিও নয়। পদ্মই হল জাগরণের প্রতীক। চারুশিল্পে আমরা দুঃখজনকভাবে পেছিয়ে আছি, বিশেষত চিত্রশিল্পে।[৬]

স্বামীজীর কড়া সমালোচনা থেকে তাঁর ভক্তগণ অবিলম্বে কতখানি শিল্প শিখেছিলেন বলা শক্ত, কিন্তু খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তা বোঝা যায়। স্বামীজী তাঁদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের শিল্পবুদ্ধিতে আস্থা রাখতে না পেরে লিখে পাঠিয়েছিলেন—'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জন্য লোহার ব্লকসমেত নক্সা তিনি পাশ্চাত্যদেশ থেকে পাঠিয়ে দেবেন।

স্বামীজী 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জন্য ঐ জিনিসগুলি পাঠিয়েছিলেন কিনা জানি না, সম্ভবত সময়ের অভাবে ওগুলি পাঠিয়ে উঠতে পারেননি, কিন্তু তাঁর রচিত একটি নক্সা আমরা পেয়েছি, ভারত ও পৃথিবীর নানা স্থানে এখন যা পরিচিত—রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীকচিহ্নটি। এই নক্সার ভাবতাৎপর্য স্বামীজী একাধিকবার ব্যাখ্যা করেছেন দেখতে পাই।[৭]

৬। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition (1964), p. 108

৭। শিল্পী রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে মিশনের সীলমোহর নিয়ে স্বামীজীর কথাবার্তার বিবরণ দিয়েছেন, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এ। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে ঐ আলোচনা হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুলাই তারিখে নিউইয়র্ক থেকে লেখা এক চিঠিতে স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডের কাছে প্রতীকটি

চিত্রশিল্প অপেক্ষা স্থাপত্য বা ভাস্কর্য সম্বন্ধে স্বামীজীর আগ্রহ কম ছিল না, বরং মনে হয়, আপেক্ষিকভাবে কিছু বেশী ছিল। ভারতবর্ষে তখন চিত্রশিল্প অপেক্ষা স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নমুনা বেশী প্রাপ্তব্য ছিল। এবং স্বামীজী, শিল্পের ক্ষেত্রে একালের ভারতবর্ষের সর্বোত্তম একটি সৃষ্টির কারণ হয়েছিলেন, যা তাঁর কল্পনাকে কিছু অংশে গ্রহণ করে তাঁর দেহান্তের পরে আকার ধারণ করেছিল। বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নিঃসংশয়ে আধুনিক ভারতবর্ষে গঠনমহিমার দিক দিয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠতম?) সৃষ্টি। মন্দিরটির ছন্দ এবং সামঞ্জস্য অনবদ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পরিকল্পনায় স্বামীজী সর্বদা আনন্দলাভ করতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যরীতির মিশ্রণ কিভাবে এই মন্দিরে ঘটবে, তা বহুভাবে বলেছেন, এবং তিনি স্থাপত্যবিদ্যায় পারদর্শী স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সাহায্যে এই মন্দিরের নক্সা তৈরী করিয়েছিলেন। স্বামীজীর কল্পনাকে সম্পূর্ণ মান্য করে অবশ্য মন্দিরটি তৈরী করা যায়নি, আর্থিক ও অন্যান্য অসুবিধা তার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল, স্বামীজীর কল্পনা বড় বেশী কল্পনা বলে হয়তো মনে হয়েছিল, কিন্তু তা যে অসম্ভব কোন কল্পনা নয়, তা আধুনিক রূপকল্পনাময় পাশ্চাত্য স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে। এবং স্বামীজী এই মন্দির কল্পনা করবার সময়ে কেবল ভারতীয় আদর্শের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন না। রণদাবাবুকে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের নক্সা দেখাবার পরে বলেছিলেনঃ 'এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার। পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্পসম্বন্ধে যত সব idea (ভাব) নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দিরনির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করব।'[৮] কিভাবে 'বহুসংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর' স্থাপিত প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে, যার 'দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে', 'মন্দিরের মধ্যে একটি রাজহংসের উপরে ঠাকুরের মূর্তি' রাখা হবে, এবং প্রবেশদ্বারের কাছে সিংহ ও মেষের সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে মহাশক্তি ও মহানম্রতার

ব্যাখ্যা করেছিলেন। মনে হয়, ঐসময়েই স্বামীজী প্রতীকটি প্রথম তৈরী করেছিলেন এবং তার ব্লক করিয়েছিলেন নিউইয়র্ক থেকেই। যাই হোক, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর রচনায় প্রতীক-প্রসঙ্গ এই প্রকারঃ

'...স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহরের জন্য বিকশিত-কমলদলযুক্ত হ্রদমধ্যে হংসবিরাজিত সর্পবেষ্টিত যে ক্ষুদ্র ছবিটি করিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। রণদাবাবু প্রথমে উহার মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া স্বামীজীকেই উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেনঃ "চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্প-পরিবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান—যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়, চিত্রের ইহাই অর্থ"।' [বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৯০]

রণদাপ্রসাদ স্বামীজীর ব্যাখ্যা শুনে চমৎকৃত হয়ে বলেছিলেনঃ 'আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে পারত।' [বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৯০]

রণদাপ্রসাদের এই কথা থেকে বুঝতে পারা যায়, ভারতীয় শিল্পকলার প্রতীকী ভাষা সম্বন্ধে ঐকালে ভারতীয় শিল্পশিক্ষকেরা কতদূর অজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং ধরে নিতে হবে, হ্যাভেলের বিরুদ্ধে রণদাপ্রসাদের পূর্বকথিত বিদ্রোহের পিছনে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না।

৮। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৯১

মিলন দেখানো হবে—তা তিনি ব্যাখ্যা করে বলে দিলেন। মন্দিরের বহিরবয়ব সম্বন্ধেই তিনি তাঁর দুঃসাহসী কল্পনায় সবচেয়ে আনন্দবোধ করেছিলেন ঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমনভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখলে ঠিক ওঁকার বলে মনে হবে।'[৯]

স্বামীজীর প্রত্যক্ষ শিল্পদর্শনের অভিজ্ঞতা

(ক) ভারতীয় শিল্প বিষয়ে স্বামীজীর অভিজ্ঞতা ঃ যে গবেষণাটি স্থগিত আছে তা সেরে নেওয়া যাক। ভারত ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনগুলির এক শ্রেষ্ঠ দর্শক স্বামীজী—কোন্ সংবাদের উপর নির্ভর করে ঐ দাবি আমরা করছি?

প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দেব, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হিসাবে বিবেকানন্দ বছরের পর বছর পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষ দেখেছেন—অতীতের ভারতবর্ষকে স্মৃতি-চিহ্নের মধ্যে এবং বর্তমানের ভারতবর্ষকে সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে। স্বামীজীর দুই বিশাল চোখ ছিল (এবং তৃতীয় নয়ন), তাদের যখন ধ্যানে ঢাকতেন না তখন তারা উন্মোচিত থাকত, এবং ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সুন্দর শিল্পকীর্তিগুলিকেও দেখত, দেখতই, কারণ তাঁর মতে, আর্ট ধর্মের অঙ্গ। ভারত-শিল্প কেবল অতীত নিদর্শনের মধ্যে নয়, বর্তমানেও কিভাবে লোকজীবনের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বর্তমান রয়েছে, তা-ও ছিল তাঁর সানন্দ দর্শনের বস্তু।

৯। শিল্প বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনায় স্বামীজী ভরপুর থাকতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল ঃ '...ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে।' [বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৯১] শিল্প একটি প্রধান বিদ্যা। স্বামীজী চাইতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠকে কেন্দ্র করে ভারতশিল্পের নবজাগরণ ঘটুক। ১৩ মার্চ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সেই উপলক্ষে লিখিত একটি চিঠিতে স্বামী অখণ্ডানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির সম্বন্ধে স্বামীজীর ভাবকল্পনার কিছু বিবরণ দিয়েছিলেন। মঠ তখনও বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে; বর্তমান মঠের জমি সবে কেনা হয়েছে; স্বামীজীর আদেশে বিজ্ঞানানন্দ স্বামী প্রস্তাবিত মন্দিরের নক্সা প্রস্তুত করেন অনেক দিনের চেষ্টায়; ঐ নক্সা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হচ্ছে; এমনি এক সময়ে স্বামীজী সদ্য-কেনা মঠের জমিতে অখণ্ডানন্দের সঙ্গে পায়চারি করছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে অখণ্ডানন্দ লিখেছিলেন ঃ '...আমি তাঁহার কাছে ভাবী মঠের "নক্সা"র কথা পাড়িলাম। তাহা শুনিয়া, স্বামীজী...কোথায় তাঁহার সেই "অর্ধচন্দ্রাকার" মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং মন্দিরের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে বড় বড় কুলঙ্গিতে যেরূপে যত দেবদেবী ও পৃথিবীর যাবতীয় মহাপুরুষ ও মহাজনগণের বিগ্রহ স্থাপিত হইবে এবং যেরূপে মন্দিরের মধ্যস্থলে, শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদীর উপরে হীরা, চুনী, পান্না খচিত সদাসমুজ্জ্বল একটি ওঁকার থাকিবে তাহাই তিনি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়াছিলেন।'

হীরা-চুনী-পান্নার কথা শুনেই গরীবের বন্ধু অখণ্ডানন্দ আপত্তি তুলেছিলেন। গরীবের আরও বড় বন্ধু বিবেকানন্দ ব্যাপারটির অন্য রূপ উন্মোচন করেন। স্বামীজীর কল্পনায় এই মন্দির ভারতবর্ষে শিল্পের নবজন্মের গর্ভগৃহ। '...উত্তরে, তিনি (স্বামীজী) সেই সময়ে যে-পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথায় এই নবযুগের ক্রমাভিব্যক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি কথাই আমার বেশ মনে আছে। প্রথমেই বলিলেন, "এই Renaissance-এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অতীত কালে যেমন পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে Art-এর (শিল্পের) বিকাশ হয়েছিল, তেমনি এই নবযুগেরও উপযোগী শিল্প প্রভৃতি সভ্যতার সকল অঙ্গেরই বিকাশ অবশ্যম্ভাবী।"' [উদ্বোধন, ৩১ বর্ষ, পৃঃ ২৬৬-৬৭]

ভারত-শিল্পের কোন্ কোন্ নিদর্শনের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন, এখন তা ঠিকভাবে বলা শক্ত। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি অভাবের কথা জানাতে পারি—তিনি উড়িষ্যা যাননি, অথচ উড়িষ্যা হিন্দুস্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নমুনায় পূর্ণ এবং উড়িষ্যার প্রত্নকীর্তি নিয়ে আলোচনা পূর্বেই শুরু হয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বেরিয়েছিল ভারত সরকারের আনুকূল্যে ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'দি অ্যান্টিকুইটিস অব উড়িষ্যা' (The Antiquities of Orissa)—প্রায় একশ বছর পরেও সে গ্রন্থের পৃষ্ঠা উলটে মুদ্রিত ছবিগুলি দেখে চমকে উঠেছি। ধরে নিতে পারি, স্বামীজী মিউজিয়ামে গিয়ে উড়িষ্যার শিল্পনিদর্শন দেখেছিলেন, এবং আমরা জানি, তিনি রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ সাগ্রহ পরিচয়ের বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দু ও মুঘল স্থাপত্যকীর্তির প্রভূত প্রশস্তি তিনি করেছেন, যথা, আলোয়ারের বা দিল্লী-আগ্রার স্থাপত্যের। মুঘল স্থাপত্যের প্রশংসা তিনি করেছেন একথা বললে যথেষ্ট বলা হয় না—কার্যত তিনি তাদের বন্দনা করেছেন।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, রাজপুত চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, এবং সমসাময়িক রবিবর্মার ছবি তিনি মনোযোগের সঙ্গে দেখেছিলেন।

চারুকলার বিভিন্ন জিনিস সম্বন্ধে স্বামীজীর সুগভীর আকর্ষণের একটি মজার কাহিনী আছে। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে স্বামীজী মহীশূরে উপস্থিত হলে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পরে মহারাজা বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং জনৈক রাজকর্মচারীকে দিয়ে স্বামীজীকে বাজারে পাঠিয়ে দেন গাড়ি করে—যাতে তিনি তাঁর পছন্দসই যে কোন জিনিস কিনে নিতে পারেন। মহীশূরের বহু দোকানে স্বামীজী উক্ত কর্মচারীর সঙ্গে ঘুরেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চার পয়সা দামের একটি চুরুটের বেশী কেনবার যোগ্য বস্তু তিনি দেখতে পাননি। ফলে রাজকর্মচারীটি মনঃক্ষুণ্ণ হন—স্বামীজীর কেনার সূত্রে তাঁর অর্থপ্রাপ্তি ঘটেনি বলে। আসল ব্যাপার ছিল—স্বামীজী কিছু কেনার জন্য দোকানে দোকানে ঘোরেননি—তিনি মহীশূরের সর্বপ্রকার শিল্পদ্রব্য দেখতে চাইছিলেন।[১০]

স্বামীজীর পার্শ্ববর্তী মানুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলাশিল্প সম্বন্ধে উৎসুক ছিলেন না, অন্তত তাঁর ভারতীয় সঙ্গী বা ভক্তগণের সম্বন্ধে একথা সত্য। সুতরাং তাঁরা যে-সমস্ত স্মৃতিকথা বা বিবরণ রেখে গেছেন তার মধ্যে স্বামীজীর জীবনের এই দিকটি অবজ্ঞাত। তাহলেও, সকল ঔদাসীন্যের মধ্য থেকেও, কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত সংবাদ এসে পৌঁছেছে—ঐ সমস্ত বিবরণ থেকেই। ১৮৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর সংকলনগ্রন্থ 'ভারতে বিবেকানন্দে'র মধ্যে পাই, ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে স্বামীজী প্রথম সিংহলে পদার্পণ করেন (সিংহল তখন ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত) ও তার অভ্যন্তরে অনেক স্থান পরিদর্শন করেন। সেই কালে তিনি প্রত্নকীর্তির নানা নিদর্শন দেখেছিলেন, বিশেষভাবে অনুরাধাপুরে। 'অনুরাধাপুর এক অতি প্রাচীন শহর। এখানে অনেক প্রাচীন ভগ্নাবশেষ

১০। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড—মহেন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদনা: বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়), মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৬), পৃঃ ২১৬-১৮

বর্তমান। সেই সকল দেখিয়া মনে হয়, এক সময়ে প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্বে ইহা পৃথিবীর এক বৃহত্তম শহর ছিল। এখানে বৌদ্ধগণের অনেক প্রাচীন কীর্তি এখনও বর্তমান আছে। যথা—বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বৃক্ষের একটি শাখা হইতে উৎপন্ন এক প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ, সেই সুপ্রাচীন যুগের স্থাপত্যবিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এক প্রাচীন সরোবর, "দাগোবা" নামে বিখ্যাত প্রাচীন স্তূপসমূহ।'[১১]

ভারতের মূল ভূখণ্ডে এসে স্বামীজী তাঁর পূর্বে-দেখা মন্দিরাদি পুনশ্চ নতুন আগ্রহে দেখেছিলেন। '(রামেশ্বর) মন্দিরে উপস্থিত হইবার পর স্বামীজী ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে মন্দিরের মণিমাণিক্য হীরা জহরত প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। স্বামীজী সমস্ত মন্দিরটি বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাকে মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্যসকল প্রদর্শিত হইতে লাগিল। সহস্রস্তম্ভোপরি স্থাপিত চাঁদনীটিও স্বামীজী দেখিলেন।'[১২] 'মাদুরায় অবস্থিতিকালে স্বামীজী একদিন তথাকার সুবিখ্যাত মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন—ঐ মন্দির ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট মন্দিরসমূহের অন্যতম।'[১৩]

১৮৯৭-এর শেষভাগে স্বামীজী উত্তর ভারত সফর করেন। নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে স্বামীজী লাহোরে মিউজিয়াম দর্শন করেছিলেন, যার সুদূরপ্রসারী ফল হয়েছিল (কি, তা পরে লক্ষ্য করব)—অথচ তার বিষয়ে সামান্য উল্লেখের বেশী ('স্বামীজী সঙ্গিগণসহ লাহোরের মিউজিয়াম বেড়াইয়া গেলেন') পাই না।

স্বামীজীর পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অবস্থানকালের অন্যতম সঙ্গী আর্যসমাজের ভূতপূর্ব প্রচারক স্বামী অচ্যুতানন্দ যে সংক্ষিপ্ত ডায়েরী রেখেছিলেন, যার কিয়দংশ মাত্র 'ভারতে বিবেকানন্দে'র মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে দেখতে পাই, ১০ সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে স্বামীজীকে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং 'ছবি ও পুস্তক' দেখিয়েছিলেন। '২২শে সেপ্টেম্বর—নৌকাযোগে অনন্তনাগ গমন। বিজবেরার মন্দির দেখা। অনন্তনাগ দর্শন।...

'২৩শে সেপ্টেম্বর—অনন্তনাগে ভোজনাদি সমাপন করিয়া পদব্রজে মার্তণ্ডে গেলেন।...

'২৪শে সেপ্টেম্বর—মার্তণ্ড ধর্মশালা...হইতে অক্ষয়বল (আচ্ছাবল) যাত্রা। রাস্তায় লোকেরা একটি মন্দিরকে পাণ্ডবের মন্দির বলিয়া দেখাইল। মন্দির দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, ২০০০ বৎসরেরও পূর্বে ইহা নির্মিত, আর এমন উত্তম মন্দিরও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মন্দির পর্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া স্বামীজী ঘোড়ায় চলিলেন। এখানে নানাবিধ চর্চা হইল।'[১৪]

এই পর্যায়ে স্বামীজী দিল্লীতে শিল্পকীর্তিগুলি পুনশ্চ দেখেছিলেন—সেসম্বন্ধে উৎসাহিতভাবে উক্ত গ্রন্থে যে তিনটি পূর্ণ বাক্য ব্যয় করা হয়েছে, তা কিন্তু আমাদের অতৃপ্তির বেশী কিছু দিতে পারেনি। '...দিল্লীর কেল্লা, কুতুবমিনার, প্রাচীন দিল্লী প্রভৃতি সমুদয় দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করা হইল। স্বামীজী সঙ্গিগণকে এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া

১১। ভারতে বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, অষ্টম সংস্করণ (১৩৪৩), পৃঃ ২৭

১২। তদেব, পৃঃ ৬৫ ১৩। তদেব, পৃঃ ১২০ ১৪। তদেব, পৃঃ ৪৫০-৫১

কত প্রাচীন শিল্পের কথা, কত ইতিহাসের কথা গল্পের মতো বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই সকল কথার কিয়দংশও রক্ষা করিতে পারিলে এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারিত।'[১৫]

তা যে সত্যই পারত, ঠিক পরবৎসর স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণের পরে নিবেদিতা যে ডায়েরী রেখেছিলেন, তার প্রকাশিত রূপ থেকেই দেখতে পাই। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে দীক্ষা নিবেদিতা যে স্বামীজীর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন, তা নিবেদিতার স্বীকারোক্তি থেকেই পাই। এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, ভারতীয় প্রত্নকীর্তির আলোচনার সময়ে নিবেদিতা আঙ্গিকের বিচারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সৃষ্টিতে ওতপ্রোত ভাবের সত্যকে যেভাবে উন্মোচন করেছেন, তা অংশবিশেষে এখনও অনতিক্রান্ত হয়ে আছে।

পরের বছরই (১৮৯৮) স্বামীজী আবার উত্তর ভারত ও কাশ্মীর ভ্রমণে যান। পূর্ববর্তী ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল বক্তৃতা, এবারে উদ্দেশ্য নিবেদিতাদিকে, বিশেষত নিবেদিতাকে, ভারত দেখানো, অর্থাৎ তাঁকে প্রস্তুত করে তোলা, যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির উপযুক্ত ব্যাখ্যাতা তিনি হতে পারেন। নিবেদিতা যে তা হবেন—স্বামীজী ধরেই নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নিবেদিতার কীর্তির দিকে তাকিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে মন্তব্য করা হয়েছে—এই পর্বে নিবেদিতার গঠন ভিন্ন স্বামীজী যদি আর কিছু না-ও করতেন, তাহলেও বলা যেত না, অকৃতার্থ হয়েছে তাঁর কাজ।

নিবেদিতা 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে স্বামীজী কিভাবে তাঁদের ভারতীয় শিল্পকীর্তি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলি বুঝিয়েছিলেন, তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন। পাটলীপুত্র বা পাটনা থেকেই স্বামীজীর শিক্ষাদান আরম্ভ হয়েছিল, 'জগতের দর্শনীয় স্থানগুলির অন্যতম' কাশীর গঙ্গার ঘাটের 'সাগ্রহ প্রশংসা' স্বামীজী যথেষ্ট করেছিলেন, এবং 'লক্ষ্ণৌ-এ যেসব শিল্পদ্রব্য ও বিলাস-উপকরণ প্রস্তুত হয়, তাদের নাম ও গুণবর্ণনা' তাঁর মুখে অনেকক্ষণ ধরে নিবেদিতারা শুনেছিলেন। স্বামীজীর 'অসাধারণ ঐতিহাসিক মূল্যবোধ' লক্ষ্য করে নিবেদিতা অভিভূত হয়েছিলেন। নিবেদিতা এইসঙ্গে জানিয়েছেন, স্বামীজী যে কেবল 'যে-সকল মহানগরীর সৌন্দর্য সর্বস্বীকৃত ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ' তাদের বিষয়েই বলেছিলেন তা নয়, আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত খেত, খামার এবং গ্রামবহুল সমতল প্রদেশের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সৌন্দর্যরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণেও ব্যগ্র ও উন্মুখ ছিলেন। এরই ফলে আমরা দেখতে পাব, নিবেদিতা পরবর্তীকালে কেবল অজন্তা, ইলোরা, বিহার, কাশীর প্রাচীন শিল্পসৌন্দর্যের ব্যাখ্যাতা হননি—ভারতীয় জীবনের অব্যাহত ছন্দের মহান কাব্যস্রষ্টা হতে পেরেছিলেন—তাঁর 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' এবং 'স্টাডিস ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম' গ্রন্থের মধ্যে।

উত্তর ভারত পেরিয়ে কাশ্মীরের পথে গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে স্বামীজী যখন সদলবলে চলেছিলেন, তখনও পথিমধ্যে মন্দির দেখে নিতে ভোলেননি। নিবেদিতা 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'পরদিন (২০ জুন ১৮৯৮) গিরিসঙ্কটের সবচেয়ে

১৫। তদেব, পৃঃ ৬০৪

সুন্দর অংশটির মধ্য দিয়া চলিয়া এবং গির্জার আকারবিশিষ্ট পাহাড়গুলি ও একটি প্রাচীন সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আমরা বারামুল্লায় পৌঁছিলাম।'[১৬]

শ্রীনগরে পৌঁছাবার পরে মন্দিরসম্বন্ধীয় স্বামীজীর একটি বিশেষ ধারণার সমর্থক-প্রমাণ নিবেদিতা কিভাবে পেয়েছিলেন, সে-বিষয়ে লিখেছেন ঃ আর একদিন (২৯ জুন) আমরা নিজেরা বিনা আড়ম্বরে দুই-তিন সহস্র ফুট উচ্চ একটি ক্ষুদ্র পর্বতের শিখরদেশে খুব ভারি ভারি উপকরণে গঠিত তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান নামক এক ক্ষুদ্র মন্দির দর্শন করিলাম। তথায় শান্তি ও সৌন্দর্য বিরাজ করিতেছিল এবং বিখ্যাত ভাসমান উদ্যানগুলি নিম্নে চারিপাশে বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। মন্দির ও অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তির জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের মধ্যে হিন্দুদের প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় আছে—এই কথার সমর্থনে স্বামীজীর যুক্তিতর্কের পক্ষে বিরাট দৃষ্টান্তের মতো ছিল এই মন্দিরটি। যেমন, লণ্ডনে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, ঋষিরা নিসর্গসৌন্দর্য উপভোগ করিবার জন্য পর্বতশীর্ষে বাস করেন; আর এখন একের পর এক দৃষ্টান্তযোগে তিনি দেখাইয়া দিলেন, ভারতবাসীরা চিরকাল বিশেষ সৌন্দর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পূজামন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাকে পবিত্রতামণ্ডিত করিয়া তোলে। সমগ্র উপত্যকাটি যে স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, এমন একটি গিরিশীর্ষের সুমহিম অবস্থানে নির্মিত ক্ষুদ্র তখ্‌ৎ-মন্দিরটি স্বামীজীর বক্তব্যের পক্ষে অন্যতম সাক্ষ্যরূপে বর্তমান ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।[১৭]

স্বামীজী কিভাবে নিবেদিতাকে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে দীক্ষা দিয়েছিলেন, তার কিছু বিবরণ নিবেদিতার রচনা থেকে উদ্ধার করা যাক ঃ

১৯ জুলাই। প্রথমে অপরাহ্ণে আমরা ঝিলাম নদীতীরে এক জঙ্গলের মধ্যে বহু আকাঙ্ক্ষিত পাণ্ড্রেনথান (পাণ্ড্রেস্থান—বা পাণ্ডবদের স্থান?) মন্দির খুঁজিয়া পাইলাম।

ক্ষুদ্র মন্দিরটি গাঢ় ফেনায় পূর্ণ একটি সরোবরের মধ্য হইতে উঠিয়াছে—ভারি ধূসর চুনা পাথরে নির্মিত, ভিতরে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ—চারিদিকে চারিটি দ্বার। বাহির হইতে দেখিতে, ইহা চৌতারায় বসানো চারিপার্শ্বে ফোকরবিশিষ্ট একটি মাথাকাটা পিরামিডের মতো সরু হইয়া উঠিয়াছে—মাথায় ঝোপ জন্মিয়াছে। ইহার স্থাপত্যকৌশলে দেখা গেল—অদ্ভুতভাবে ত্রিপত্র ও ত্রিভুজাকার খিলান পরস্পর মেলানো হইয়াছিল, সেইসঙ্গে যুক্ত ছিল সরল রেখাকার সরদাল (লিনটেল)। অসাধারণ দৃঢ়ভাবে মন্দিরটি নির্মিত এবং বিভিন্ন নির্মাণপদ্ধতির জন্য যে পার্থক্যটুকুর চিহ্ন অবশ্যম্ভাবী তা ভারি ভারি কারুকার্যের দ্বারা ঢাকা পড়িয়াছিল।

বনমধ্যে সরোবরের ধারে পৌঁছিয়া দেখিলাম ক্ষুদ্র মন্দিরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আভ্যন্তরীণ কারুকার্যগুলি পরীক্ষা করা যাইবে না (যাইবার অসুবিধার জন্য), তাহাতে

১৬। স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ (১৩৬৩), পৃঃ ৬৬

১৭। Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda—Sister Nivedita, Udbodhan Office, Calcutta, Third Edition (1948), pp. 80-1

আমরা খুবই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। গাইড-বইয়ে মন্দিরটি সম্বন্ধে 'যথার্থই ক্ল্যাসিকাল' অর্থাৎ আদ্যন্ত আকারে ও কারিগরিতে গ্রীক ও রোমান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল।[১৮]

নিবেদিতাদের বিষাদ অবশ্য আনন্দে রূপান্তরিত হয়েছিল যখন হাজি অর্থাৎ মাঝিরা একটি নৌকা যোগাড় করে অনেক কষ্টে তাঁদের মন্দিরের মধ্যে তুলে দিয়েছিল। তারপর ঃ

স্বামীজী ছাড়া আমাদের সকলের পক্ষে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে এই সবে হাতেখড়ি। সুতরাং নিজের দেখা শেষ করিয়া তিনি আমাদের শিখাইয়া দিলেন কিভাবে ভিতরটি দেখিতে হইবে।

ভিতর-ছাতের মধ্যস্থলে সমচতুষ্কোণের মধ্যে এক বৃহৎ সূর্যমূর্তিবিশিষ্ট চক্র বসানো রহিয়াছে। তাহার চারিটি কোণ পূর্ব পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ দিকে। ইহাতে ছাতটির চারিকোণে চারিটি সমান ত্রিভুজ রহিয়া গিয়াছে। সেগুলি সর্পবেষ্টনাবদ্ধ নারী-পুরুষের অল্প-খোদাই-করা অতি সুন্দর কারুকার্যে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালগুলিতে যেসকল খালি জায়গা পড়িয়া আছে, সেই সকল স্থানে একসারি স্তূপ ছিল মনে হয়।

বাহিরেও খোদাইয়ের কাজ সমভাবে বিন্যস্ত। ত্রিপত্র খিলানগুলির একটিতে—সম্ভবত পূর্ব দরজার উপরে যে খিলানটি তাহাতেই—বুদ্ধ দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার একটি হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত—এই সুন্দর মূর্তিটি রহিয়াছে। এই থাম দুইটির শিরোদেশ ব্যাপিয়া বর্তমান একটি বৃক্ষতলে এক রমণী আসীনা—এইরূপ খোদিত রহিয়াছে। মূর্তিটি অনেকটা মুছিয়া গিয়াছে। ইহা বুদ্ধজননী মায়াদেবীর মূর্তি ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। অপর তিনটি দরজার খিলানে কোন নক্সা ছিল না; কিন্তু পুকুরপাড়ে যে চাবড়াখানি পড়িয়াছিল, সেটি ইহাদেরই কোন স্থান হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল মনে হইল। ইহাতে বাজেভাবে তৈরী একটি রাজার মূর্তি আছে। স্থানীয় লোকেরা উহাকে সূর্যের মূর্তি বলে। ক্ষুদ্র মন্দিরটির গাঁথুনি অনবদ্য। সম্ভবত সেই কারণেই উহা এতদিন টিকিয়া আছে। পাথরের চাঙ্গড়গুলি এমনভাবে কাটা হইয়াছে যে, সেগুলি দেওয়ালের ইটের মতো না হইয়া স্থপতির পরিকল্পনার অংশস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল পাথরের কোণ ঘুরিয়া গিয়া দুইটি বা কোথাও তিনটি দেওয়ালের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারটি হইতে মন্দিরটি অতি প্রাচীন, এমনকি মার্তণ্ড-মন্দির হইতেও প্রাচীনতর মনে হইল। কারিগরের কাজের ধরন গৃহস্থাপত্য-নির্মাণপদ্ধতি অপেক্ষা সূত্রধরের কাজের রীতির সঙ্গে অধিক ঐক্যযুক্ত ছিল। মন্দিরপ্রাঙ্গণের জলরাশি সম্ভবত কোন কুণ্ড ছাপাইয়া সৃষ্টি হইয়াছে—সেই কুণ্ডের স্মারক হিসাবেই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে—স্বামীজী তাহাই ধারণা করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর চোখে স্থানটি ইতিহাসের আনন্দপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিল। ইহা বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ স্মারকভূমি। কাশ্মীরের ইতিহাসে যে-চারিটি ধর্মযুগ রহিয়াছে তাহার একটির পরিচয় মন্দিরটিতে রহিয়াছে। (১) কাশ্মীরে বৃক্ষ ও সর্পপূজার যুগ, যাহা হইতে কুণ্ডগুলির নাগশব্দান্ত নামকরণ হইয়াছে, যথা ভেরিনাগ ইত্যাদি; (২) বৌদ্ধধর্মের যুগ, (৩) হিন্দুধর্মের যুগ, যাহা সূর্য-উপাসনার আকারে বর্তমান ছিল, (৪) মুসলমানধর্মের

১৮। ibid., p. 93

যুগ। স্বামীজী বলিলেন, ভাস্কর্যই বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্ট শিল্প; সূর্যচিহ্নিত চক্র বা পদ্ম ঐযুগের অতি প্রচলিত অলঙ্করণ। সর্পযুক্ত মূর্তিগুলি প্রাক্-বৌদ্ধযুগের স্মারক। সূর্য-উপাসনার (হিন্দু) যুগে ভাস্কর্যের বিশেষ অবনতি হইয়াছিল, সেই কারণে পূর্বোক্ত সূর্যমূর্তির ঐ স্থূল আকার।[১৯]

পাণ্ড্রেস্থানের মন্দিরটিকে সেইকালে নিবেদিতারা যত প্রাচীন মনে করেছিলেন (১৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত), ততখানি প্রাচীন কিনা সে-বিষয়ে পরে সন্দেহবোধ করেন। সে যাই হোক, ঐকালে তাঁদের চোখের সামনে সুদূর অতীতের দৃশ্যাবলী জেগে উঠেছিল, ভাববার চেষ্টা করেছিলেন, আঠারোশ বছর আগে পৃথিবী যখন বিরাট বিরাট ঘটনার মুখে দাঁড়িয়ে, তখন এই মন্দিরের গর্ভগৃহে কোন্ দেবতাকে মানুষ পূজা করত! ভিতরে কোনও দেবতার মূর্তি না পেলেও বাহির দ্বারে শিক্ষাদানরত বুদ্ধের যে মূর্তি দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁর পাদমূলেই প্রণত হবার সৌভাগ্যে তাঁরা আনন্দিত হয়েছিলেন, এবং—'আমরা একটি চিত্র মানসনেত্রে ফোটাইতে পারিয়াছিলাম—বিশাল একটি দারুময় নগরী—কেন্দ্রস্থলে ছিল এই মন্দিরটি—বহু দিন পরে কোন অগ্নিকাণ্ডে নগর ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং তাহা সরিয়া যায় প্রায় পাঁচ মাইল দূরে।'[২০] এই স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা করে, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে তরুরাজির মধ্য দিয়ে যখন তাঁরা নদীতীরে ফিরে এসেছিলেন—তখন যে অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলেন, তা স্বামীজীকে পুনশ্চ সেই ভাবকল্পনার জগতে নিয়ে গিয়েছিল, যা সকল চারুকলার কেন্দ্রীয় ভাবজগৎ।

'তখন সূর্যাস্তের সময়—অপরূপ! পশ্চিমের পর্বতগুলি রক্তরঙে ঝলসিত। আরও উত্তরে মেঘে ও তুষারে সেগুলি নীলাভ। আকাশ সবুজে হলুদে মাখা, তাহার উপর লালের ছোপ—নীল এবং "ওপ্যাল" পটভূমিকার উপরে ড্যাফোডিল ফুলের তুল্য হরিদ্রাবর্ণ এবং অগ্নিশিখার উজ্জ্বল বর্ণ। আমরা দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। তারপরে আচার্যদেবের দৃষ্টি গিয়া পড়িল "সুলেমানের সিংহাসনে"র উপর (ইতিমধ্যেই যাহা আমাদের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে)—তিনি আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "মন্দিরের স্থান নির্বাচনে হিন্দুর প্রতিভার কী পরিচয়! সব সময়েই সে মহান নিসর্গসৌন্দর্যের স্থানটি বাছিয়া লয়। দেখ, তথ্‌ৎ হইতে সমস্ত কাশ্মীরটি দেখা যায়। নীল জলরাশির ভিতর হইতে লোহিতাভ হরিপর্বত উঠিয়াছে—যেন মুকুট পরিয়া একটি সিংহ অর্ধশায়িতভাবে অবস্থান করিতেছে। আর মার্তণ্ডের মন্দিরের পাদমূলে রহিয়াছে উপত্যকাটি"!'[২১]

স্বামীজীর সঙ্গে মার্তণ্ড-মন্দির দর্শনের বিবরণও নিবেদিতা দিয়েছেন। 'মন্দিরটির অদ্ভুত প্রাচীন সৌধ'; তাতে মন্দির অপেক্ষা মঠের লক্ষণই অধিক; 'বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়ে অগ্রসর ঐ মন্দির-মঠে বিভিন্ন যুগের নির্মাণপদ্ধতির চিহ্ন'—এই সকল বিষয়ের উল্লেখের পরে নিবেদিতা বিস্তৃতভাবে মন্দিরটির গঠনভঙ্গি বিশ্লেষণ করেছিলেন। তারপর মন্তব্য করেছেন ঃ প্রত্যেক সৌধ এত সর্বাঙ্গসুন্দর এবং তাহাদের মধ্যে দুই নির্মাণ-যুগের উদ্দেশ্য এত স্পষ্ট ছিল যে, মন্দিরটির অঙ্গসংস্থান দেখিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ হইল।[২২]

১৯। ibid., pp. 94-6 ২০। ibid., p. 96
২১। ibid., p. 97 ২২। ibid., p. 112

নিবেদিতা অবিলম্বে মন্দিরটির বহিরবয়বের স্কেচ করে ফেলেছিলেন। মন্দিরটির স্থাপত্যরীতির বর্ণনায় স্বামীজীর উৎসাহ সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন ঃ ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়াই স্বামীজী অবেক্ষণ ও উদ্দেশ্য নিরূপণে যার পর নাই ব্যস্ত হইলেন এবং দেখাইয়া দিলেন যে, মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশের মার্গ হইতে উহার মধ্যাংশের ভিতর দিয়া পশ্চিম দিকে যে কার্নিশ চলিয়া গিয়াছে, তাহার উপরিভাগে পূর্বোক্ত খিলান দুইটির উচ্চ ত্রিপত্র আবার একটি friezeও বর্তমান। সেইসঙ্গে দেবশিশুমূর্তিবিশিষ্ট প্যানেল-গুলিও আমাদের দেখাইয়া দিলেন।[২৩]

(খ) স্বামীজীর বহির্ভারতে শিল্পদর্শনের অভিজ্ঞতা ঃ রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্পসৌন্দর্য দেখে এলুম...।'[২৪] এই সাক্ষাৎদর্শন এবং শিল্পবিষয়ক পড়াশোনার ফলে স্বামীজীর ইচ্ছা হয়েছিল, 'ইউরোপীয় ভাস্কর্য চিত্র প্রভৃতির কথা' বলবেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের একেবারে শেষভাগে প্রকাশিত তাঁর সেই অভিপ্রায়, পরম দুঃখের বিষয়, তিনি সিদ্ধ করে যেতে পারেননি।

ভারত ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিল্পের সঙ্গে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বিষয়ে কিছু সংবাদ এবার দেওয়া যাক ঃ

(১) অপরিচিত সন্ন্যাসিরূপে আমেরিকা যাওয়ার পথে চীনের ক্যানটন শহরে তিনি একটি মন্দির দেখে আসেন, যার কাঠের মূর্তিগুলি 'সুন্দররূপে খোদিত'। একই পথে জাপানের যেটুকু দেখেছিলেন তাতেই প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানবিক রূপচর্চার দিক দিয়ে জাপানকে 'সৌন্দর্যভূমি' বলে মনে হয়েছিল। সেইসঙ্গে জাপানের উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য দেখে তিনি এমনই মোহিত হন যে, খেতড়ির রাজাকে জানিয়েছিলেন, টাকাকড়ি যদি ব্যাঙ্কের মারফত আগেই আমেরিকা চলে না যেত, তাহলে তিনি হয়তো জাপানের শিল্পদ্রব্য কিনে দেশে ফিরে আসতেন—আমেরিকা যাওয়া আর হত না।[২৫] সত্যই তা করতেন কিনা জানি না—কিন্তু ঐ কথাগুলির মধ্য থেকে শিল্প সম্বন্ধে তাঁর প্যাশনের চেহারা দেখা যায়। জাপানের শিল্পানুরাগের কথা তিনি অক্লান্তভাবে বলে যেতেন।

(২) আমেরিকায় থাকাকালে স্বামীজীর মতো শিল্পতৃষ্ণ মানুষ মিউজিয়ামে ঘুরে শিল্পসংগ্রহ দেখবেন সহজেই বোঝা যায়। আমেরিকার নিজস্ব শিল্পসৃষ্টি বড় কিছু না হতে পারে, কিন্তু অপরিমিত তার অর্থ ও তদনুরূপ তার সংগ্রহবাসনা। ইংলণ্ডের সম্বন্ধে মোটামুটি একই কথা বলা যায়।

মারি লুইস বার্কের বিখ্যাত গ্রন্থ 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন আমেরিকা ঃ নিউ ডিসকভারিজ'-এর মধ্যে শিল্পবিষয়ে স্বামীজীর আগ্রহের ও বক্তব্যের বিক্ষিপ্ত কিছু উল্লেখ পাই। ডেট্রয়েটে বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী চার্লস এল ফ্রিয়ার সামাজিক আকর্ষণের লক্ষ্যবস্তু স্বামী বিবেকানন্দের ['The social lion of the day is Swami (brother) Vivekananda'] সম্মানে বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। চার্লস ফ্রিয়ার ধনী ব্যবসায়ী হলেও ব্যতিক্রম-মানুষ ছিলেন—'তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবস্তু ছিল প্রাচ্যশিল্প।

২৩। ibid. ২৪। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৮৬

২৫। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ১-৩

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, বেলুড় মঠ
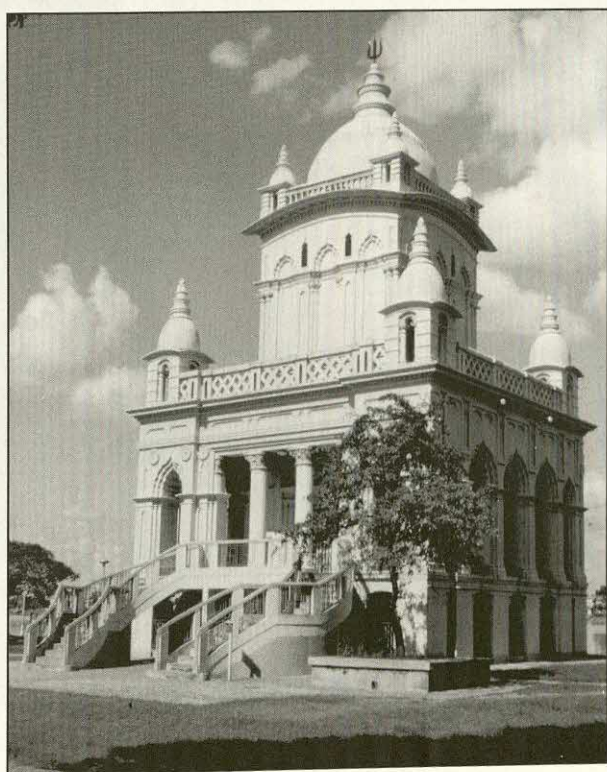
স্বামী বিবেকানন্দ মন্দির, বেলুড় মঠ

কিয়েল শহরে বিখ্যাত ভারততাত্ত্বিক পল ডয়সনের সঙ্গে যখন কাটিয়েছিলেন, তখন উক্ত অধ্যাপকের অনুরোধে সেখানে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী দেখতে যান, যাতে কলাশিল্পের যথেষ্ট নমুনা সংগৃহীত ছিল।

স্বামীজীর এই কন্টিনেন্ট-ভ্রমণের কোনও ভাল বিবরণ নেই। তাঁর ইংরেজি জীবনী থেকে সামান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণের উল্লেখ উপরে করেছি, কিন্তু ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী লণ্ডন ত্যাগ করে কন্টিনেন্টের মধ্য দিয়ে বেড়িয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন—তার কিয়দংশের অর্থাৎ রোম-দর্শনের কিছু বিস্তারিত সংবাদ আমরা অন্যতম সঙ্গিনী মিসেস সেভিয়ারের একটি রচনা থেকে পাই।[২৮] সে বিবরণ উপস্থিত করার আগে ইংরেজি জীবনীতে রোমদর্শনের পূর্বে এই পর্বে স্বামীজী যেসব শিল্পনিদর্শন দেখেছিলেন, তার বিষয়ে লেখা আছেঃ তিনি মিলানে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির 'লাস্ট সাপার' ছবি দেখে বিশেষ মুগ্ধ হন। মিলান শহরেই স্বামীজীর সঙ্গে ইতালীর প্রথম পরিচয়। মিলান শহর থেকে তিনি সদলবলে পিসা গিয়ে সুবিখ্যাত হেলানো টাওয়ার দেখেন, সেইসঙ্গে 'ক্যাম্পো ম্যান্টো' নামক ক্যাথিড্রলটিও। মিলান ও পিসায় শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরের অপূর্ব ব্যবহারের সবিশেষ প্রশংসা তিনি করেছিলেন। অতঃপর সুন্দরী ফ্লোরেন্স নগরীতে গিয়ে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের সঙ্গে আর্ট গ্যালারিগুলিও দেখেছিলেন। ফ্লোরেন্স ইউরোপের প্রধান শিল্পকেন্দ্র, এবং এখানকার সংগ্রহশালায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অনেক সৃষ্টিই আছে।

'চিরনগরী রোম'—সেখানে সকল আগ্রহেরই খাদ্য রয়েছে—মিসেস সেভিয়ার লিখেছেনঃ বস্তুতপক্ষে রোম শহরটিই একটি মিউজিয়াম; যদি কেউ ছবি চায়, তার সেরা নমুনা এখানে পাবে; যদি স্থাপত্যের ভক্ত হয়, তাহলে ল্যাটিন মনোধর্মের রহস্য তার কাছে উন্মোচন করে দেবে গির্জার সৌন্দর্যমহিমা; যাঁরা প্রত্নতত্ত্বে আগ্রহী, যাঁরা অতীতের শুষ্ক পঞ্জরের মধ্যে সন্ধান করে ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়ের কোন কোন পৃষ্ঠাকে আবিষ্কার করতে উৎসুক—তাঁদের প্রীতিপূর্ণ আগ্রহের কাছে রোম বিপুল উপাদানস্তূপ; এই রোমে স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের ভ্রমণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবিমিশ্র আনন্দের কারণ হয়েছিল।[২৯] মিসেস সেভিয়ার আরও লিখেছেনঃ অতীব উদাসীন অলস ভ্রমণকারীও এই চিরনগরীতে প্রথম প্রবেশকালে নূতন ভাবোন্মাদনা বোধ করবেন; সেখানে আমাদের সঙ্গী অন্য কেউ নন স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর ছিল সদাজাগ্রত দৃষ্টিশক্তি এবং ইতিহাসের রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করার সুগভীর সহজাত ক্ষমতা।[৩০]

রোমের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভ্রমণের ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়ে প্রথমে তাঁরা গিয়েছিলেন সীজারের প্রাসাদে, তারপর ফোরাম-এ। যাবার পথে তাঁরা 'পিয়াজা ডি সপাগ্না'র ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, অতি সুন্দর সিঁড়িগুলি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—যা গিয়ে পৌঁছেছিল 'সেন্ট ট্রিনিটা ডি মন্টি' নামক গির্জায়। ঐ গির্জাটি 'ক্রুশ থেকে অবতরণ'

২৮। সেভিয়ারের 'Round about Rome with Swami Vivekananda' শীর্ষক প্রবন্ধ, Prabuddha Bharata, July and August (1910)

২৯। ibid. ৩০। ibid.

নামক চিত্রের জন্য বিখ্যাত। সীজারদের অপূর্ব প্রাসাদগুলি তাঁরা দেখেছিলেন, ক্রমান্বয়ে বিরাজিত সেগুলি। তার নির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন অগস্টাস সীজার—পরবর্তী সীজারগণ ক্রমেই সংখ্যা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে গেছেন। নীরো তৈরী করেছিলেন দুটি প্রাসাদ, যার প্রথমটিতে যখন আগুন লেগেছিল তখন তিনি তাঁর ইতিহাসবিখ্যাত বীণাবাদন করেছিলেন। দ্বিতীয় প্রাসাদটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি—যেটুকু পেরেছিলেন তাতেই তাকে মণিরত্নে, স্বর্ণরৌপ্যে, মূর্তিতে, চিত্রে এমনই অলঙ্কৃত করেছিলেন যে, 'স্বর্ণভবন' নামে তা পরিচিত হয়েছে। প্রাচীন প্রাসাদের পাশে খননকাজ চালিয়ে প্রাচীন ভিত্তিচিত্রের নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে।

বিশাল স্থাপত্যসমূহে গৌরবান্বিত ফোরাম-এ গিয়ে স্বামীজী রোমের সুন্দরতম স্তম্ভ ট্রাজান পিলার খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। ১১৭ ফুট উঁচু, বাসরিলিফে অলঙ্কৃত, ট্রাজানদের কীর্তিস্মারক এই স্তম্ভটিতে দু-হাজারের বেশী মনুষ্যমূর্তি রয়েছে। জেরুজালেম অধিকারের স্মারক, ৮১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত টিটাস বিজয়তোরণ এখনও সুন্দরভাবে বর্তমান। 'স্বামীজী গোড়ার দিকে নীরব ছিলেন; কিন্তু ক্রমেই বোঝা যাচ্ছিল, তাঁর আপাত শান্তভাবের ভিতরে তিনি কতখানি উৎসুক উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রাচীন রোমের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, যে রোম তার বৃহৎ আকাঙ্ক্ষাকে মহাবিস্ময়কর আকার ও সৌন্দর্যের স্থাপত্যকর্মে রূপায়িত করেছে। স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার পথে তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন; ইতিহাস এবং স্থাপত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন অজস্র খুঁটিনাটি তথ্য, যা ঐ প্রাচীন কীর্তিগুলিকে যেন আবৃত করে দিল ইন্দ্রজালে।'[৩১]

অতি পুরাতন এবং অত্যন্ত পূজার্হ, রোমের গৃহদেবী ভেস্ট্যার মন্দির তাঁরা দেখেছিলেন, যার মধ্যে ছিল পবিত্র বর্ম ও পবিত্র অগ্নি। তাঁরা দেখেছিলেন সুমহান স্থাপত্যসৌন্দর্যপূর্ণ রোমের সাধারণ স্নানাগারগুলিকে, যেখানে কেবল স্নানব্যবস্থাই নয়, অধিকন্তু ছিল ক্রীড়াঙ্গন, ব্যায়ামাগার, সভাগৃহ, গ্রন্থাগার। টাইটান ও ক্যারাকালার স্নানাগারগুলি তো বিস্ময়ের মহাসৃষ্টি।

দর্শনীয় রোমেও দর্শনীয় স্থান কলোসিয়াম—রোমের বিশাল শক্তি ঐ সুন্দরতম অ্যাম্ফিথিয়েটারটির সৃষ্টি করেছিল। বারো হাজার ইহুদী ও খ্রীষ্টানের ক্রীতদাসবাধ্য পরিশ্রমে এক বছরের মধ্যে নির্মিত, লক্ষাধিক দর্শকের উপবেশনের উপযোগী সেই রঙ্গস্থলটির অবশ্য অল্পই অবশিষ্ট আছে। তাঁরা চলে গিয়েছিলেন কনস্টানটাইনের অতিখ্যাত বিজয়তোরণ দেখতে, তারপর আবার ফিরে এসেছিলেন নির্মল সুন্দর চন্দ্রালোকে কলোসিয়াম দেখতে। 'সেই বিশাল রঙ্গস্থলের উপরে ছড়িয়ে ছিল ঘননীল আকাশ, সেখানে জ্বলছিল নক্ষত্র ও তারকাপুঞ্জ, আমাদের চতুর্দিকে মৃত্যুর মতই স্তব্ধ নীরবতা—অপূর্ব, অপূর্ব সেই মহিমা।'

কনস্টানটাইন-নির্মিত 'সেন্ট জন ল্যাটেরন' চার্চই রোমের প্রধান গির্জা। এর প্রাচীনত্ব ও স্থাপত্যসৌন্দর্য একে অবশ্য-দর্শনীয় করে রেখেছে। যে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে গিয়ে

৩১। The Life of Swami Vivekananda, Vol. II, p. 155

যীশুখ্রীষ্ট তাঁর শেষ বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা রয়েছে এখানে, এর প্রতিটি অংশ খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে পূর্ণ—এর মধ্য দিয়েও তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন।

রোমের গির্জাগুলি কেবল ধর্মের নয়, শিল্পেরও আগার। যাঁরা ভাস্কর্যে আগ্রহী তাঁরা কেউ ভিঙ্কোলোয় 'সেন্ট পিয়েত্রো' চার্চ দেখতে ভোলেন না, কারণ সেখানে রয়েছে মোজেস-এর মূর্তি—এঁরাও সে ভুল করেননি। মোজেসমূর্তি মাইকেল এঞ্জেলোর মহত্তম সৃষ্টির একটি—মানবিক শক্তিমহিমার অপূর্ব আদর্শায়িত রূপ। চিত্তাকর্ষক ছিল সঙ্গীতের ঋষি-গুরু সেন্ট সিসিলিয়ার মর্মরমূর্তি দর্শন—তাঁর নামাঙ্কিত গির্জার অভ্যন্তরে। এবং সেইসঙ্গে রোমের সবচেয়ে জমকালো সমাধিস্থল—হাড্রিয়ান সমাধিভূমি—যা পূর্বে ভূষিত ছিল বহু অলঙ্কারে।

ক্রুশের আকারে নির্মিত সর্ববৃহৎ গির্জা 'সেন্ট পিটারস' চার্চ তাঁরা দেখেছিলেন। গির্জার দৈর্ঘ্য ৬১৩ ফুট—সর্বোচ্চ শিখর ৪৪৮ ফুট—ভিতরে ঐশ্বর্যের বিপুল সমারোহ। বড়দিনের সময়ে বিপুল জাঁকজমকের যে রূপ তাঁরা দেখেছিলেন, তাতে তাঁদের চক্ষু অভিভূত হলেও আত্মা ছিল অতৃপ্ত। স্বামীজী চাপা স্বরে শুধিয়েছিলেনঃ 'এই যে গির্জায় অনুষ্ঠানের এমন বাহুল্য, ঐশ্বর্যের ব্যাপক আড়ম্বর—এখানকার কর্মকর্তারা কি সেই আনত খ্রীষ্টের অনুগামী, যিনি তাঁর মাথাটি রাখবার ঠাঁইটুকু খুঁজে পাননি?' স্বামীজী আরও বলেছিলেনঃ 'বাইরের অনুষ্ঠানের সেইটুকুই মূল্য যেখানে সে অন্তরের পবিত্রতা বিকাশে সহায়তা করে। যদি জীবনের বিকাশে তা সমর্থ না হয়, তাহলে মায়া না রেখে তাকে চূর্ণ করে ফেলো।'

খ্রীষ্টের প্রতিনিধি পোপের বাসস্থান—এগারো হাজার কক্ষসমন্বিত ভ্যাটিকান প্রাসাদের অন্যান্য বিতৃষ্ণাকর ঐশ্বর্যের সঙ্গে কিন্তু আকর্ষক ঐশ্বর্যও ছিল—শিল্পের ঐশ্বর্য। সিস্টিন চ্যাপেলের সিলিংয়ে মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্রাবলী; বেদীপার্শ্বের দেওয়ালে একই শিল্পীর আঁকা 'শেষ বিচারের' চিত্র। সেইসঙ্গে রয়েছে বটিচেল্লী, পেরুগিনো, সিনরেল্লীর চিত্রাবলী। আরও আছে—র‍্যাফেল ও অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পীর খিলানে আঁকা ছবি।

ভাস্কর্য গ্যালারিতে মেলে বিশাল সর্পের সঙ্গে যুদ্ধরত লাওকুনের অসাধারণ ভাস্কর্য—শিল্পরসিকেরা যার তুলনা খুঁজে পান না; এবং আরও বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সিঁড়ির পাশে দুই মিশরীয় সিংহের মূর্তি, ক্যাস্টর ও পল্যুক্সের দুই বিশাল প্রতিমূর্তি, মার্কস অরেলিয়াসের অশ্বারূঢ় ব্রোঞ্জমূর্তি। শেষোক্ত মূর্তিটিতে মাইকেল এঞ্জেলো-সুলভ জীবনাবেগ এতই বেশী যে, দেখলে মনে হয়, এখনই ছুটতে শুরু করবে। মার্কস অরেলিয়াসের মধ্যে দুর্ধর্ষ জীবনগতির সঙ্গে যুক্ত ছিল সুগভীর ধ্যানলীনতা—মূর্তিতে তা-ও প্রকাশিত। ক্যাপিটল প্রাসাদের মিউজিয়ামে মুমূর্ষু গ্ল্যাডিয়েটর-এর মূর্তি বিখ্যাত। এবং চিত্ররসিকেরা বারবেরিনি প্রাসাদের মধ্যে গুইদো রেনী-কৃত বিয়েট্রিস সেনসির পোরট্রেট স্বতই দেখে থাকেন, সেইসঙ্গে রেসপিগলিওসি প্রাসাদের দেওয়ালের সুন্দর চিত্রগুলিও। এই সকলের মধ্যে যথার্থ চিত্রসৃষ্টিরূপে এঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ভ্যাটিকানে র‍্যাফেল-অঙ্কিত যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিক রূপান্তরের ছবি এবং ডিমনিচিনো-অঙ্কিত সেন্ট জেরোমের চিত্র।

কাশ্মীর ১৮৯৭
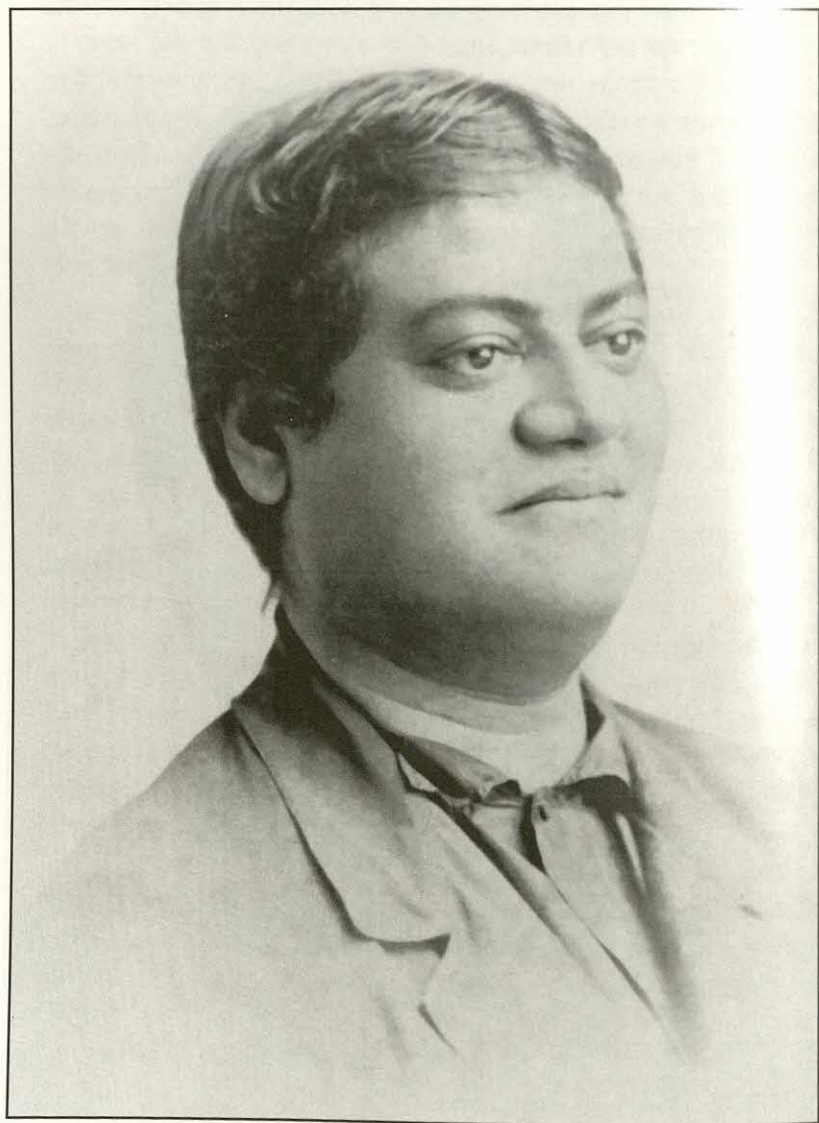
লণ্ডন মে ১৮৯৬

গির্জা ও মিউজিয়ামের, অভ্যন্তর থেকে মুক্ত হয়ে স্বামীজী সদলবলে চলে গিয়েছিলেন রোমের বিখ্যাত সমাধিভূমে, সেখানেও দেখেছিলেন মৃত্যুকে গরিমাময় ঐশ্বর্যে ভূষিত করবার রোমীয় প্রয়াস। তাঁরা সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন অস্তগামী সূর্যকে পিছনে রেখে—সামনে পিছনে উপরে নীচে বিস্তৃত বিশাল শান্তি। তাঁরা অনুভব করেছিলেন—সৃষ্টির আনন্দের মতোই বা ততোধিক গভীর বস্তু হল—সৃষ্টিসমাপনের মৌন প্রত্যাহার।

রোম থেকে নেপলস। সেখান থেকে পম্পেই নগরীর ধ্বংসাবশেষ দর্শন। 'স্বামীজী বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন খননের ফলে সদ্য-আবিষ্কৃত একটি গৃহের বিষয়ে, যার মধ্যে পূর্বের মতোই বর্তমান আছে ফ্রেস্কো, প্রতিমূর্তি এবং ফোয়ারা।' পম্পেই স্বামীজীর মন লুটে নিয়েছিল।

(৫) ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি সময়ে স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রা করেন। ১৯০০, আগস্টের গোড়া থেকে প্রায় তিনমাস তিনি ফ্রান্সে ছিলেন—যার অনেকটা সময় প্যারিসে কেটেছিল। এবারও তিনি মিঃ ও মিসেস লেগেটের অতিথি। স্বামীজী প্যারিসে গিয়েছিলেন 'ধর্মেতিহাস সভা'য় যোগ দিতে। 'এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম।'[৩২]—স্বামীজী লিখেছেন তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে। লেগেট-ভবনে, যেখানে স্বামীজী ছিলেন, সেখানে মিঃ লেগেটের আমন্ত্রণে সমবেত হতেন ফ্রান্সের ও অন্যান্য স্থানের বহু বিদগ্ধজন। '...মিঃ লেগেট প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর প্যারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদিব্যপদেশে নিত্য নানা যশস্বী ও যশস্বিনী নর-নারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন...। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর বাদক—প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ-সমাবেশ মিস্টার লেগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষী-মনঃসঙ্ঘর্ষ-সমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ...।'[৩৩] —এহেন মণ্ডলীতেও স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কেন্দ্রপুরুষ। এই সমাবেশে স্বামীজীকে কিছুকাল দর্শন করে, তারপর অন্যত্র গিয়ে নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে এক চিঠিতে ঐ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন (তারিখ অনির্ণীত)ঃ 'By this time I suppose the Swami has all Paris at his feet.

স্বামীজীর সঙ্গে এইকালে কতসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎ ও ভাববিনিময় হয়েছিল, তার ঠিক সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়। স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ (পূর্বে তিনি সাংবাদিক-লেখক জন ইয়েল) 'ফ্রান্সে বিবেকানন্দ' নামে 'প্রবুদ্ধ ভারতে' মার্চ, ১৯৬৭ সংখ্যায় এক প্রবন্ধে যেসব বিশিষ্ট নাম সংগ্রহ করে দিয়েছেন, তাঁরা হলেন, উইলিয়াম জেমস, প্যাট্রিক গেডেস, জুল বোয়া, হিয়াসান্থ লয়সন, সারা বার্নহার্ড, এমা কালভে, প্রিন্সেস ডেমিডফ, ডিউক অব রিশ্লু, জিরাল্ড নোবেল, অগুস্ত রদ্যাঁ, প্রিন্সেস ডোরিয়া, ডিউক অব নিউক্যাসল, লেডি অ্যাংলেসী, স্যার হিরাম ম্যাক্সিম, ডক্টর জগদীশচন্দ্র বসু।

৩২। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১২৪ ৩৩। তদেব, পৃঃ ১২৫

এঁদের মধ্যে আমাদের প্রয়োজন রদ্যাঁর কথায়। 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর' বলে কথিত রদ্যাঁর সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হয়েছিল—এটা একটা চিত্তাকর্ষক সংবাদ, কিন্তু হায়, সে আলাপের বিষয়বস্তু আমরা জানতে পারিনি। স্বামীজী কি রদ্যাঁর শিল্পশালায় গিয়েছিলেন? নিবেদিতার চিঠি থেকে এইটুকু পেয়েছি—ম্যাকলাউড ও নিবেদিতা রদ্যাঁর প্রদর্শনীতে পরমানন্দে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

মিস ম্যাকলাউডকে ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯০০ তারিখে লেখা, অ্যালবার্টার চিঠি থেকে বিবেকানন্দ-রদ্যাঁ সাক্ষাতের সংবাদ পাইঃ 'Swami was in a splendid mood last night and our little dinner was consequently a great success.... He enjoyed seeing Paris was meeting all artists and thinkers, Rodin etc.'

একই চিঠিতে জনৈক নামকরা ফরাসী চিত্রশিল্পীর কাছে স্বামীজীর গমনের সংবাদ পাই, যদিও দুঃখের বিষয়, উক্ত শিল্পীর নাম অ্যালবার্টা চিঠিতে জানাননিঃ 'Swami will go to Brittany next Monday, as Thursday he goes to visit a French painter of note in the country.'

স্বামীজী প্যারিসে থাকাকালে প্রায় প্রতিদিন সকালে প্যাট্রিক গেডেস ও মিঃ লেগেটের সঙ্গে প্যারিস-প্রদর্শনীতে গিয়েছেন। এই প্রদর্শনীতে পৃথিবীর বহু বিচিত্র বস্তুর সমাবেশ হয়েছিল—প্যারিসবাসীর চোখে তা বহু স্থূল বর্বর বস্তুর সমাবেশ—কিন্তু প্যারিসবাসীর কিছু আকর্ষণ-বস্তুও প্রদর্শনীতে ছিল, যার কথা ফরাসী লেখক আঁদ্রে হ্যালীস তাঁর একটি গ্রন্থে লিখেছেন—সে জিনিসগুলি নানাদেশের উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য ছাড়া আর কিছু নয়। স্বামীজী ঐ শিল্পদ্রব্যগুলি সযত্নে দেখেছিলেন।

স্বামীজীর অনুরাগীরা তাঁকে শিল্পের পটভূমিকায় দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্যারিসের শিক্ষাকেন্দ্র সরবোন প্রাসাদে স্বামীজী বক্তৃতা করেছিলেন, ধর্মেতিহাসসভায়। সরবোনের বিরাট অ্যাম্ফিথিয়েটারের সভাগৃহে ৭৫ ফুট দীর্ঘ এক বিখ্যাত ম্যুরাল আছে, তার শিল্পী ফরাসী, নাম পুভি-দ্য-শ্যাভাঁনে; চিত্রের নাম 'পবিত্র অরণ্য'; বিষয়—সরবোনের অধিষ্ঠাত্রী বসে আছেন বন মধ্যে সিংহাসনের উপরে—এবং পরিবৃত হয়ে আছেন সাহিত্য, বাগ্মিতা, ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যামিতি প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রীদের দ্বারা। এহেন পটভূমিকার উপরে স্থাপিত স্বামী বিবেকানন্দ—সুমহান দৃশ্য !! উচ্ছ্বসিত কল্পনায় মিসেস লেগেট লিখে পাঠিয়েছিলেন মিস ম্যাকলাউডকেঃ 'Swami at the Sorbonne ! enfin. What would I give for a photograph of him with the Puvis de Chavannes background !'[৩৪]

এইবারও স্বামীজী প্যারিসের লুভারে গিয়েছেন, এবং সেখানে গ্রীকশিল্পের নিদর্শন খুঁটিয়ে দেখেন।

প্যারিস থেকে স্বামীজী নরম্যাণ্ডিতে সমুদ্রমধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর নির্মিত মঠ 'মন্ট সেন্ট মাইকেল' দেখতে গিয়েছিলেন। আর্ক-এঞ্জেল মাইকেলের স্মরণে নির্মিত এই মধ্যযুগীয় মঠটিতে স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বর্তমান ছিল। সর্বোচ্চ স্থানটিতে

৩৪। Prabuddha Bharata, Vol. 74, 1969, p. 114

নির্মিত হয়েছিল একটি উচ্চাঙ্গের গথিক রীতির গির্জা—তার চূড়ায় পাখা-মেলে-দেওয়া আর্ক-এঞ্জেলের মূর্তি। গির্জার পার্শ্বস্থ খিলানপথটির দুইপাশে ছিল একশ কুড়িটি অলঙ্কৃত স্তম্ভ। এই খিলানপথটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে স্বীকৃত। ঐতিহাসিক পরিবেশে, স্থাপত্যসৌন্দর্যে এবং স্থান মহিমায় মুগ্ধ বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ 'ধ্যানের পক্ষে কী অপূর্ব এই স্থান!'

(৬) কেবল লুভারে বা অন্য কোন মিউজিয়ামে নয়, গ্রীকশিল্পের নিদর্শন গ্রীসের বাস্তব পটভূমিকায় দেখার সুযোগও এইবারই কিছুদিনের মধ্যে ঘটে যায়। স্বামীজীর জীবনীতে পাই—প্যারিস থেকে বেরিয়ে স্বামীজী বিখ্যাত অপেরাগায়িকা মাদাম কালভের অতিথি হিসাবে কিছুকাল বেড়িয়েছিলেন। ঐ ভ্রমণদলে আরও ছিলেন মঁসিয়ে জুল বোয়া, পিয়ের হিয়াসান্থ ও তাঁর পত্নী এবং জোসেফিন ম্যাকলাউড। এইবারই স্বামীজী ভিয়েনা যান, সেখানে তিনদিন থেকে দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখেন, তার অন্যতম সানবোর্ন প্রাসাদ, যার প্রতিটি কক্ষ বিভিন্ন শিল্পরীতিতে ও শিল্পদ্রব্যে সজ্জিত ছিল। ভারতীয় ও চীনাসজ্জায় ভূষিত কক্ষ দেখে স্বামীজী খুশি হন। ভারতীয় অলঙ্করণ তিনি খুবই পছন্দ করেছিলেন। মিউজিয়াম দেখেছিলেন—এবং সেখানে রক্ষিত ডাচশিল্পীদের বিখ্যাত চিত্রাবলী।

তারপর গিয়েছিলেন কনস্টানটিনোপল। গ্রীক সম্রাটদের প্রাচীন অন্দরমহলে স্থাপিত মিউজিয়াম দেখেছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল শবদেহ রক্ষার প্রস্তরনির্মিত 'অপূর্ব' আধারগুলি (sarcophagi)।

গ্রীস তারপর—শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী এথেন্স। এথেন্সে স্বামীজী চারদিন কাটিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর এই শিল্পপরিব্রজ্যাকে ভাষারূপ দেবার চেষ্টা কেউ পরবর্তীকালে করেননি, যদিও এই ভ্রমণের অপূর্বত্বের কথা সঙ্গীরা বলেছেন। অগত্যা আমরা স্বামীজীর ইংরেজি জীবনী থেকে যথাসম্ভব সংবাদ সংগ্রহ করে দিচ্ছিঃ

'কনস্টানটিনোপলে কয়েকদিন কাটিয়ে স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা এথেন্সের স্টীমার ধরলেন। পথিমধ্যে তাঁরা "গোল্ডেন হর্ন" এবং মারমোরা দ্বীপ দেখলেন। শেষোক্ত স্থানে একটি গ্রীক মঠ দেখে তাঁর বিশেষ ভাল লাগে। ...ঐতিহাসিক এথেন্স নগরী ও আশেপাশের সকল ধ্বংসাবশেষ স্বামীজী দর্শন করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বিজয়দেবীর মন্দির, পার্থেনন...অলিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, ডায়েনিসিস থিয়েটার...ইলিউসিস। এই শেষোক্ত স্থানটি প্রাচীন ইলিউসীয় রহস্যের কেন্দ্রস্থল, এবং এটি স্বামীজীকে বিশেষ আগ্রহান্বিত করেছিল। এথেন্স ত্যাগের আগে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭৬-৪৮৬ কালের বিখ্যাত ভাস্কর অ্যাগিলাডাস-এর ভাস্কর্য দেখতে গিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে প্রাচীন শিল্পাচার্যের তিন মহান শিষ্য—ফিডিয়াস, মাইরন ও পলিক্লিটাসের শিল্পকর্মও দেখেছিলেন।'

আর এক পুরাতন পৃথিবী—মিশরে—অতঃপর তাঁরা গিয়েছিলেন। কায়রো মিউজিয়াম যে তাঁরা সযত্নে দেখেছিলেন, সেকথা না বললেও চলে; সেইসঙ্গে ফিঙ্কস ও পিরামিড। এই প্রসঙ্গে মাদাম কালভে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেনঃ

'স্বামীজীর কয়েকজন শিষ্য ও বন্ধু সহকারে তাঁহাকে লইয়া আমরা তুরস্ক, গ্রীস ও

মিশরদেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। ...কী সুন্দর এই তীর্থযাত্রা! বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসের মধ্যে যেন স্বামীজীর অজ্ঞাত কিছুই নাই। ...খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস লইয়া তর্কের সময়ে স্বামীজী একখানি প্রাচীন দলিল অবিকল মুখস্থ বলিলেন, এবং একটি চার্চ-কাউন্সিলের তারিখ জানাইলেন, যাহার কথা ফাদার লয়সনও (খ্রীষ্টান শাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত ও বাগ্মী যিনি) নির্দিষ্টভাবে বলিতে পারিলেন না।

'আমরা গ্রীসে ইলিউসিস দর্শন করিলাম। স্বামীজী ইহার রহস্য ব্যাখ্যা করিলেন। আমাদিগকে বেদী ও মন্দিরগুলি দেখাইলেন; কোন্‌খানে কি হইত বুঝাইয়া দিলেন; পুরোহিতগণের উপাসনা ও পূজার বিশেষ প্রণালী ব্যাখ্যা করিলেন এবং প্রাচীন মন্ত্র ও গাথা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন।

'আবার একদিন মিশর দেশে—এক চিরস্মরণীয় রজনীতে তিনি আমাদিগকে সুদূর অতীতে লইয়া গেলেন—ফিঙ্কসের ছায়ায় বসিয়া রহস্যময় ভাষায় কত ইতিবৃত্ত বলিতে লাগিলেন।'

স্বামীজীর জীবনী ও অন্যান্য সূত্র থেকে শিল্পকীর্তির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তাই উপস্থিত করলাম। এই অসম্পূর্ণ রেখাচিত্রও পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে—শিল্পবিষয়ে স্বামীজীর তুল্য বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতীয় তৎকালীন ভারতবর্ষে অল্পই ছিলেন, কিংবা কেউ ছিলেন না।

শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যের সংকলন

স্বামীজীর শিল্পবক্তব্য কোন্ কোন্ সূত্র থেকে সংগৃহীত

স্বামীজী যে পরিমাণে শিল্পনিদর্শন দেখেছেন ও ঘরোয়াভাবে সেসব বিষয়ে বলেছেন, সেই পরিমাণে কিন্তু প্রকাশ্য বক্তৃতায় বা লেখায় শিল্পপ্রসঙ্গ করেননি। সেই কারণেই এতদিন স্বামীজীর মনোজীবন ও ভাবজীবনের এই দিকটির উপরে উপযুক্তভাবে আলোকসম্পাত করা হয়নি। তবু নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর শিল্পধারণার একটা মোটামুটি পরিচয় আমরা লাভ করেছি। স্বামীজী ধর্মবেত্তা ও ধর্মপ্রচারক; তাই ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত বিষয়েই তিনি প্রধানত কথা বলতেন বা বক্তৃতা করতেন। তা হলেও ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় যখন দিতে গেছেন তখন ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞানের কথা না বলে পারেননি। যেমন ধরা যাক, আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের মেমফিস শহরে 'ভারতের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে গিয়ে ভারতের স্থাপত্যশিল্পের গৌরবের কথা তিনি বলেছিলেন। 'অ্যাপীল অ্যাভালেঞ্চ' পত্রিকার ২১ জানুয়ারির (১৮৯৪) বিবরণের মধ্যে ছিলঃ 'His (Swamiji's) description of the ancient mausoleums and temples were beautiful beyond comparison, and goes to show that the ancients possessed scientific knowledge far superior to the most expert artisans of the present day.'[৩৫]

৩৫। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Part One, p. 259

খুবই দুঃখের বিষয়, প্রাচীন মন্দিরাদি সম্বন্ধে স্বামীজীর ঐ 'অতুলনীয় সুন্দর বর্ণনা'র কোন অংশই উক্ত সংবাদপত্রের বিবরণে নেই।

ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে রমাবাঈ-গোষ্ঠীর ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের কুৎসার বিরুদ্ধে স্বামীজী যখন আমেরিকায় একা প্রাণপণ লড়াই করছেন, তখন অনেক সময়েই তাঁকে পৃথিবীর সভ্যতায় ভারতের দানের বিষয়ে বলতে হয়েছে। ঐ ধরনের একটি বক্তৃতার রিপোর্ট বেরিয়েছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫-এর 'ব্রুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন' পত্রিকায়। বক্তৃতার মধ্যে বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, এমনকি খেলাতে পর্যন্ত ভারতের দানের কথা তিনি বলেছিলেন—শিল্পদ্রব্যের কথাও অবশ্যই বলেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেবল উল্লেখের অধিক কিছুই পাই না সংবাদপত্রের বিবরণে।[৩৬]

সানফ্রানসিস্কোয় স্বামীজী, 'ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞান'—এই নামেই একটি বক্তৃতা করেছিলেন, কিন্তু অতি সামান্য কয়েক লাইন রিপোর্টের অতিরিক্ত কিছু আমাদের ভাগ্যে এক্ষেত্রেও জোটেনি। যেটুকু পাচ্ছি তার মধ্যে আছে, স্বামীজী পৃথিবীর সভ্যতার অগ্রগতি কিভাবে হয়েছে সে-সম্বন্ধে আলোচনার পর বলেছিলেন—এলিজাবেথের স্বর্ণযুগও সমকালীন ভারতের তুলনায় অন্ধকার যুগ, এবং ভারত একদিন সঙ্গীত, নাটক ও ভাস্কর্যে পৃথিবীতে নেতৃত্ব করেছিল। বর্তমানে কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয় ভারতবাসীকে, তার জন্য তাদের শিল্প ও সাহিত্য নিছক অনুকরণের বেশী কিছু নয়।[৩৭]

স্বামীজীর শিল্পবিষয়ের বক্তব্য প্রধানত পাই শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর ডায়েরী, প্রিয়নাথ সিংহ, সিস্টার ক্রিস্টিন ও ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিকথা, স্বামীজীর কয়েকটি চিঠি এবং 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য থেকে। শিল্প সম্বন্ধে যখনই সুযোগ ঘটেছে তখনই স্বামীজী আলোচনা করেছেন। জীবনের শেষ পর্বেও স্বামীজী কতখানি উৎসাহের সঙ্গে শিল্পালোচনায় যোগ দিতেন, তা 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ' (লেখক: মহেন্দ্রনাথ দত্ত) গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায়।[৩৮]

ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক : শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পবোধ

স্বামীজীর শিল্পবক্তব্য আলোচনার আগে এক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য করবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা চলে, অন্তত সে প্রশ্ন কেউ কেউ করেছেন। শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহকে জনৈক ইউরোপীয়ান পরিষ্কার বলেছিলেন : স্বামীজীকে তিনি ছবি সম্বন্ধে কখনও সঠিক বিচার করতে দেখেননি, কারণ ছবি ইন্দ্রিয়জগতের ব্যাপার, আর স্বামীজী অতীন্দ্রিয়

৩৬। ibid., Part Two, Third Edition (1984), p. 290

৩৭। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV, Eighth Edition (1962), pp. 196-97

৩৮। জীবনের একেবারে শেষ পর্বে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজী কাশীতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে হরিনাথ ওদেদার (স্বামী সদাশিবানন্দ) তাঁকে যেভাবে দেখেছিলেন, তার বহু কথা মহেন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছিলেন। তার মধ্যে স্বামীজীর শিল্পানুরাগের বিষয়ও ছিল। কালিদাস মিত্র নামক এক শিল্পকলাবেত্তা

জগতের মানুষ। উক্ত ইউরোপীয়ান অবশ্য স্বীকার করেছিলেন, স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত খুব ভাল বুঝতেন। প্রিয়নাথ সিংহ 'প্রবুদ্ধ ভারতে' এক প্রবন্ধে[৩৯] উক্ত ইউরোপীয়ানের মতের প্রতিবাদ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন—স্বামীজী শিল্পে কতখানি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু প্রিয়নাথ সিংহ একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলেননি—বিবেকানন্দের চিত্রবিচার সাধারণভাবে ইউরোপীয়দের মনঃপূত হতে পারে না, যেহেতু তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত পার্থক্য বর্তমান। উক্ত ইউরোপীয়ের বক্তব্যের আর একটি অসম্পূর্ণতার কথাও প্রিয়নাথ সিংহ বলেননি। সন্ন্যাসীর সঙ্গে শিল্পের যতখানি বিরোধের কথা উক্ত ইউরোপীয় বলেছেন ততখানি বিরোধ সত্যই ছিল না; তার প্রমাণ বৌদ্ধ মঠের ও সঙ্ঘারামের শিল্পনিদর্শন। ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে শিল্পের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আর সেকথা ইউরোপের ক্ষেত্রেও কি বহুলাংশে সত্য নয়? গির্জাগুলির শিল্পনিদর্শন কোন্ সাক্ষ্য দেয়?

ধর্মের সঙ্গে শিল্পের যোগ বুঝতে বিবেকানন্দের পক্ষে ইতিহাসের মধ্যে পিছুহটার প্রয়োজন ছিল না। যাঁকে দেখে স্বামীজী সর্বোচ্চ ধর্ম কি, তা শিখেছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ কি সুগভীর শিল্পানুভূতিতে সর্বদা স্পন্দিত হতেন না?

স্বামীজী বলেছেনঃ 'ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ।...ঠাকুর নিজে একজন কত বড় artist ছিলেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ যে সত্যই আর্টিস্ট ছিলেন, সে-বিষয়ে 'শিল্পদীপঙ্কর' নন্দলাল বসুর উক্তি অবশ্যই উদ্ধৃতিযোগ্যঃ

'ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) নিজে একজন শিল্পী ছিলেন। ছবি ও মূর্তি তৈয়ারী করতেন। শুধু idealist নয়, রসিক শিল্পী ও কারিগরও ছিলেন। তিনি আঙ্গিকের (technique) বিষয়ও বেশ জানতেন। আর ছবি বা মূর্তি দেখে ভাব ও গড়ন (form) ভুল হলে তা ঠিক করে দিতে পারতেন। মথুরবাবু একবার তাঁর করা শিবমূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কালী মন্দিরে পরে মাকে সাজাবার ভার নিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের পাথরের গোবিন্দজীর পা ভেঙ্গে গেলে তাহা তিনি অতি নিপুণতার সহিত জুড়ে দিয়েছিলেন।

'দক্ষিণেশ্বরে যে ঘরে থাকতেন তার বারদিকের উত্তর দেয়ালে দরজার দুপাশে কাঠকয়লার রেখায় আঁকা দুটি ছবি ছিল। ৪′ × ৫′ আন্দাজ বড়। আমি ও প্রিয়নাথ সিংহ (স্বামীজীর সহপাঠী) উহা দেখেছি। ঢুকতে বাঁদিকে একটি জাহাজ, ডানদিকে

স্বামীজীর সাক্ষাতে এসেছিলেন। তিনি আসা মাত্র স্বামীজী তাঁর সঙ্গে উদ্‌গ্রীব হয়ে শিল্পতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করে দিয়েছিলেনঃ '...তিনি চিত্র, আলেখ্য প্রাকৃতিক চিত্রের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে লাগিলেন...। (মনে হইল) চিত্রকর যেন শিল্প-সভায় গিয়া চিত্রের বিষয় লেকচার দিতেছেন, এবং চিত্রই যেন তাঁহার একমাত্র জ্ঞেয় ও ধ্যেয় বস্তু এবং তিনি যেন সমস্ত জীবনব্যাপী চিত্র লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বর্ণসংযোগ, বর্ণের তারতম্য, সৌষ্ঠব, অধিষ্ঠান, নেত্রাদির বহুপ্রকার দৃষ্টি, কটিদেশ ও বক্ষঃস্থল এবং বক্রভাবে বা অন্যভাবে দাঁড়াইলে যে নানারকম ভাবব্যঞ্জক হয় তদ্বিষয়ে তিনি বহুপ্রকার কহিতে লাগিলেন। ...তাহার পর তিনি ইটালি, ফ্রান্স, চীন, জাপান ও ভারতের ...নানা সময়ের ...চিত্রের সমালোচনা করিতে লাগিলেন।' [কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬০), পৃঃ ৭১]

৩৯। 'Swami Vivekananda and Art' শীর্ষক প্রবন্ধ, Prabuddha Bharata, November (1906)

একটি আতাগাছ আর তাতে টিয়া পাখি সব বসে। ঐ ছবি দুটি কাচ দিয়ে দেয়ালে ফ্রেম করে দেবার জন্য রামলালদাকে কিছু টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম। পরে গিয়ে দেখি, উহার উপর চুনকাম করে ঢেকে ফেলা হয়েছে।[৪০] তাঁহার ছেলেবেলায় কামারপুকুর থাকার সময় ঐরূপ বহু ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৪১] দুর্গাপ্রতিমা গড়ার সময় পোটোদের সব সময় guide (চালনা) করতেন। তিনি প্রতিমার উপরের চালচিত্র আঁকার ভারও কখন কখন নিতেন। প্রতিমার চক্ষুদানের সময় তাঁহার ডাক পড়ত, চোখের তারা ঠিক জায়গায় দেওয়া বড় কঠিন বলে। চোখের ঠিক দেবভাব না হলে সংশোধন করে দিতেন। তিনি একজন সহজশিল্পী ও শিল্পের সমঝদার ছিলেন। ছবি দেখতে বড় ভালবাসতেন, কাহারও ভাল ছবির সংগ্রহ থাকলে দেখবার জন্য ব্যগ্র হতেন।

'আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা হল, তাঁহার প্রথম সমাধি হয়েছিল বর্ষায় কাজল-কালো মেঘের কোলে সাদা বকের পাঁতি দেখে। তিনি ভাল অভিনেতাও ছিলেন। অপরের ভাবভঙ্গি হুবহু নকল করতে পারতেন। একজন শিল্পীর শিল্পবিষয়ে যা জানা ও থাকা দরকার তিনি সবই জানতেন। আমার মনে হয়, স্বামীজী তাঁহার নিকট প্রথমে শিল্পের গূঢ় রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, যদিও তাঁহার প্রতিভার অন্ত

৪০। ছবি দুটিকে স্মৃতি থেকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা নন্দলাল করেছেন। শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর 'শিল্পজিজ্ঞাসায় শিল্পদীপঙ্কর নন্দলাল' গ্রন্থে নন্দলাল-কৃত উক্ত প্রতিলিপি দুটি রয়েছে। [ভারতবাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৬৮, পৃঃ ৪১]

শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রাঙ্কন-প্রতিভা সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন স্বামী প্রভানন্দ উদ্বোধন, ফাল্গুন ১৩৮১ সংখ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাচর্চা' প্রবন্ধে। তার মধ্যে তিনি বালক গদাধর কর্তৃক অনুলিখিত কয়েকটি পুঁথির উপরে আলোচনা করেছেন এবং যে কয়েক পৃষ্ঠার ছবি ছেপেছেন তাতে 'শ্রীগদাধরের হস্তাক্ষরের মুনশিয়ানার উজ্জ্বল প্রমাণ' আছে। শুধু তাই নয়, ঐসব পুঁথির পৃষ্ঠায় শ্রীগদাধর যেসব 'ছোটখাট নক্সা' এবং ছবি এঁকেছিলেন, তা আমাদের চমকে দেয়। প্রভানন্দের প্রবন্ধের মধ্যে এইরকম ছবির যে-নমুনা আমরা পেয়েছি, তা বালক শিল্পীর পক্ষে সত্যই বিস্ময়কর রচনা—তার রেখার জোর আমাদের চমৎকৃত করে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শেষ রোগশয্যায় শুয়ে থাকার সময়ে যখন 'নরেন শিক্ষে দিবে' ইত্যাদি কাগজে লিখে দিয়েছেন, তখনও তার উপরে ছবি এঁকে দিয়েছিলেন, স্বামী প্রভানন্দ তা মাস্টারমশায়ের ডায়েরীতে দেখেছেন।

৪১। শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পপ্রতিভার সংবাদ স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর মধ্যে পাওয়া যায়। 'পূর্বকথা ও বাল্যজীবন' খণ্ডেই এ-সম্বন্ধে বেশী সংবাদ আছে। 'বালকের অনুকরণ ও উদ্ভাবনী শক্তি' প্রসঙ্গে পাই, গদাধর গ্রামের কুমোরদের কাছ থেকে মূর্তিগড়া শিখে তাকে নিজের অন্যতম ক্রীড়াবস্তু করেছিলেন। তারপর 'পটব্যবসায়িগণের সহিত মিলিত হইয়া সে ঐরূপে চিত্র অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিল।' [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ—স্বামী সারদানন্দ, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃঃ ৯৩-৪] বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিগড়া তাঁর অধিকতর প্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং এ ব্যাপারে তাঁর পারদর্শিতা স্বীকৃতও হয়েছিল। সঙ্কীর্তন ও যাত্রাভিনয়ে ঝোঁক বেড়ে যাওয়ায় অবশ্য গদাধর চিত্রবিদ্যা নিয়ে অগ্রসর হতে পারেননি, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক চিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা হ্রাস পায়নি; তার দৃষ্টান্ত স্বামী সারদানন্দ দিয়েছেন : '...গৌরহাটি গ্রামে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সর্বমঙ্গলাকে বালক এই সময়ে একদিন দেখিতে গিয়াছিল এবং বাটীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইয়াছিল, তাহার ভগিনী প্রসন্নমুখে তাহার স্বামীর সেবা করিতেছে। উহা দেখিয়া সে অল্পদিন পরে তাহার ভগিনী ও তৎস্বামীর ঐ ভাবের একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। ...পরিবারস্থ সকলে উহাতে চিত্রগত প্রতিমূর্তিদ্বয়ের সহিত শ্রীমতী সর্বমঙ্গলা ও তৎস্বামীর নিকট-সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।' [লীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, পৃঃ ১৪২]

ছিল না। ঠাকুর প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ (observe) করতেন। একবার স্বামীজীর observationএ চাতক পাখি ও চামচিকের মধ্যে তফাৎ সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তিনি রূপপতি ছিলেন। ইচ্ছামাত্র তাঁহার হৃদয়ের সব ভাবই রূপে পরিণত হত। ...স্বামীজী প্রথমে ঠাকুরের নিকট শিল্প বিষয়ে অনেক জেনেছেন। ...আর সিস্টার (নিবেদিতা) পরে স্বামীজীর কাছ থেকে সৌন্দর্যবোধ (aesthetics), রুচি বিজ্ঞানও শিখেছেন।'[৪২]

বিবেকানন্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পদৃষ্টির চমৎকার তুলনাও নন্দলাল করেছেন: 'শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর ideal শিল্পের backbone-এর মতো, যার অভাবে শিল্প নিস্তেজ ও প্রাণহীন হয়। স্বামীজীর ছিল জ্ঞানের পথে চলে aesthetics পথের সাধন ও পূর্ণতা। আর ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের) ছিল aesthetics পথে চলে জ্ঞানের পূর্ণ (অনুভবের) বিকাশ। দুজনারই ছিল aesthetics (অনুভবের) ও জ্ঞানের পূর্ণতা। কেবল পথ চলার process ভিন্ন রকম। আমার মনে হয়, ঠাকুরেরই অনুভবের পথ শিল্পীদের বেশী উপযোগী। শিল্পীরা সব সময়েই ঐ পথে চলেন। রূপের উপাসক সাকারবাদী; জ্ঞানের উপাসক নিরাকারবাদী। (শিল্পীদের মায়া নিয়েই কারবার।) তবে অনুভবের পথে চলে, জ্ঞান না থাকলে, শিল্পীর পতন হবার সম্ভাবনা। আবার জ্ঞানীর পক্ষে অনুভব ও রসের সন্ধান পাওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তবে prophet-দের আলাদা কথা। তাঁদের সবই দুর্জ্ঞেয়।'[৪৩]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর কিছু মন্তব্য

শিল্পালোচনায় স্বামীজীর মূল কয়েকটি সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে আসার আগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পনিদর্শন সম্বন্ধে তাঁর কিছু বিক্ষিপ্ত মন্তব্যের উল্লেখ করতে পারি।

'লীলাপ্রসঙ্গ' থেকে জেনেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পপ্রতিভা তাঁর জীবনে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্মিত শিবমূর্তির শিল্পসৌন্দর্যে মোহিত হয়ে মথুরবাবু তাঁকে মন্দিরের পূজায় নিয়োগ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের গোবিন্দের মূর্তির পা ভেঙে গেলে নিজে জুড়ে দিয়েছিলেন। ভক্তিভাবের দিক থেকে ঘটনাটির মূল্য যেমন, শিল্পের দিক থেকেও তা কম নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে নানা ছবি টাঙানো থাকত। ছবিগুলি অবশ্যই ভক্তিমূলক। বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে হিন্দু ধর্মাচার্য শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ছবি সেখানে ছিল, যীশুর ছবিও ছিল। ম্যাডোনা মূর্তি তিনি ভালবাসতেন। ছবি দেখবার জন্য তিনি বাগবাজারে নন্দ বসুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর পঞ্চম খণ্ডে পাই, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুর বাড়িতে গিয়ে আগ্রহের সঙ্গে বিভিন্ন পৌরাণিক ছবি দেখেছিলেন। এবং সেইসঙ্গে তিনি 'ইংরেজি ছবি' না রেখে ঐসব ছবি রাখার জন্য গৃহস্বামীর প্রশংসাও করেছিলেন। ঘরের দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত সুরেশ মিত্র যে নববিধানের ছবি করিয়েছিলেন; তা টাঙানো ছিল। ছবির বিষয়বস্তু: 'পরমহংসদেব কেশবকে দেখাইয়া দিতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া সব ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে যাইতেছেন।'

৪২। শিল্পজিজ্ঞাসায় শিল্পদীপঙ্কর নন্দলাল, পৃঃ ৪০-৩

৪৩। শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগী 'শিল্পজিজ্ঞাসায় শিল্পদীপঙ্কর নন্দলাল' নামে একটি ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান বই লিখেছেন। তার মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিল্পভাবনা সম্বন্ধে নন্দলালের অনেক বক্তব্য রয়েছে। সেখান থেকেই নন্দলালের কথাগুলি সংকলিত। [পৃঃ ২৮]

ইউরোপীয় শিল্পকলার ব্যাপারে স্বামীজী স্বভাবতই প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিল্পসৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ করেছেন। পরবর্তীকালের ক্ষেত্রে তিনি ফরাসী সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন, কিন্তু ডাচশিল্প তাঁকে খুশি করতে পারেনি। শেষোক্ত বিষয়ে যথেষ্ট অবহেলার সঙ্গে একবার মন্তব্য করেছিলেনঃ 'ভিয়েনা শহরে...চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকরদের চিত্রই অধিক। ওলন্দাজি সম্প্রদায়ে রূপ বার করবার চেষ্টা বড়ই কম; জীবপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণেই এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। একজন শিল্পী বছর কতক ধরে এক ঝুড়ি মাছ এঁকেছে, না হয় এক থান মাংস, না হয় এক গ্লাস জল—সে মাছ, মাংস, গ্লাসে জল চমৎকারজনক! কিন্তু ওলন্দাজ সম্প্রদায়ের মেয়ে-চেহারা সব যেন কুস্তিগির পালোয়ান!!'[৪৪]

সুবিখ্যাত ডাচশিল্প এবং তার অধিকতর খ্যাতনাম্নী মাংসল মহিলাগণ সম্বন্ধে স্বামীজীর সাপট মন্তব্য অনেককেই ব্যস্ত করবে।

ইউরোপের শিল্পসংস্কৃতির ব্যাপারে স্বামীজী, এককথায়, ফ্রান্সের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। কোন নির্দিষ্ট শিল্পসৃষ্টি নয়—সর্বাঙ্গীণ ফরাসী শিল্পসংস্কৃতির অত্যুচ্চ প্রশংসাই তিনি করেছেন। উলটোপক্ষে জার্মানী বা ইংলণ্ড এই ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চহাস্য-বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছে। ফ্রান্স ও জার্মানীর তুলনা এইভাবে করেছেনঃ 'কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস; আর একদিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙ্‌নাগ জার্মানীর স্থূলহস্তাবলেপ। প্যারিসের পর পাশ্চাত্যজগতে আর নগরী নাই; সব সেই প্যারিসের নকল—অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে সে শিল্পসুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য; জার্মানে, ইংরেজে, আমেরিকে সে অনুকরণ, স্থূল। ফরাসীর বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ; জার্মানীর রূপবিকাশচেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর; জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসী সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মতো—কস্তুরীর মতো এক মুহূর্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয়; জার্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মতো—পারার মতো ভারি, যেখানে পড়ে আছে তো পড়েই আছে।...জার্মান ফরাসীর নকলে বড় বড় বাড়ি অট্টালিকা বানাচ্ছেন, বৃহৎ বৃহৎ মূর্তি—অশ্বারোহী, রথী—সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন করছেন, কিন্তু জার্মানের দোতলা বাড়ি দেখলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, এ বাড়ি কি মানুষের বাসের জন্য, না হাতী-উটের "তবেলা" ? আর ফরাসীর পাঁচতলা হাতী-ঘোড়া রাখবার বাড়ি দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়িতে বুঝি পরীতে বাস করবে!'[৪৫]

ফ্রান্সের সঙ্গে অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের ভোগবিলাসের তুলনা করে সালঙ্কার তীব্র পরিহাসের সঙ্গে স্বামীজী একবার যা বলেছিলেন, তা শিল্পসংস্কৃতির প্রসঙ্গেও প্রযোজ্যঃ '...অন্য দেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ, প্যারিসের—সভ্য পারির ময়লা সোনার পাতমোড়া; বুনো শোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ূরের পেখমধরা নাচে যে তফাৎ অন্যান্য শহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ প্যারিস-বিলাসের সেই তফাৎ।'[৪৬]

৪৪। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৩২ ৪৫। তদেব, পৃঃ ১২৬

৪৬। তদেব, পৃঃ ১৯৪

এই যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি—তাঁর কাছে ইংরেজি শিল্প, যা সমস্ত ইউরোপের উপহাসের বস্তু—কোন্ চোখে ধরা পড়বে, তা না বললেও চলে। বিলেতী কলাশিল্প সম্বন্ধে অতীব অশ্রদ্ধার মন্তব্য তিনি করেছেন। ইংরেজ জীবজন্তু আর ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকে এঁকেই গেল—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তাদের জীবনে যেটুকু সৌন্দর্যবোধ, তা এসেছে প্রাচ্যের সংস্রবে। ইংরেজ-জীবনের মূল কথা ইউটিলিটি, আর ভারতের আর্ট—স্বামীজী বলতে চেয়েছেন।

ভারতের শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তার মধ্যে মধ্যযুগের মুঘলশিল্পের প্রতি তাঁর সবিশেষ অনুরাগ দেখা গেছে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কুড়ি বছর যিনি কার্যত ভারতসম্রাজ্ঞী ছিলেন, সেই 'জগতের আলো' নূরজাহানের অপূর্ব আকর্ষক বর্ণনা দেবার সময়ে স্বামীজী তাঁর শিল্পপ্রীতির কথা জানাতে ভোলেননি। 'নূরজাহানের রূপকে ধারণ করে সোনার মূল্য গেছে বেড়ে'—নূরজাহানের মুখাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার উপরে জাহাঙ্গীর কথাগুলি লেখার ব্যবস্থা করেছিলেন—সেই নূরজাহানের ও জাহাঙ্গীরের শিল্পভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ নূরজাহানের আধিপত্যকালের মধ্যেই স্থাপত্যের নব্যরীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। আকবরের লালপাথরের পুরুষোচিত বলিষ্ঠ সৌধের স্থান গ্রহণ করল রমণীয় স্থাপত্যরীতি—এল শুভ্রমর্মর, তাতে খচিত হল নানা মূল্যের প্রস্তর; অমসৃণ রক্ত প্রস্তরের স্থানে বহুমূল্য মাণিক্য অলঙ্কৃত দেওয়াল; মধ্য এশিয়ায় মালভূমির বলবীর্যের পরিবর্তে পারস্যের সুচারুকোমল লাবণ্য। পরবর্তীকালের জন্য এই রীতির দান—তাজমহল এবং আগ্রা দিল্লী ও লাহোরের মর্মর প্রাসাদগুলি। যমুনার অপর পারে ইতমদউদ্দৌলা নামে যে চমৎকার সমাধিসৌধটি রয়েছে, তা নূরজাহান তাঁর পিতার স্মৃতিতে নির্মাণ করেছিলেন। এটি নূতন স্থাপত্যরীতির প্রথম সৃষ্টিগুলির একটি। শোনা যায়, এর গায়ে পাথরগুলি বসিয়েছিল নূরজাহানের ক্রীতদাসেরা। এই প্রাথমিক অসম্পূর্ণ চেষ্টার সঙ্গে পরবর্তী তাজমহলের পূর্ণ নিখুঁতরূপের তুলনার ব্যাপারটি চিত্তাকর্ষক হবে। তাজমহলে একটি গোলাপের পাপড়ির চারু বর্ণরূপ ফোটাতে চুয়াল্লিশটি বিভিন্ন ধরনের লালপাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। নৈপুণ্যের বিস্ময়কর অগ্রগতি।

আগ্রা প্রাসাদে সমনবুর্গ নামে নূরজাহানের নিজ মহলটি তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে সজ্জিত করা হয়েছিল। শিল্পকলার তিনি যথার্থ পৃষ্ঠপোষিকা ছিলেন।[৪৭]

স্বামীজী স্বভাবতই মুঘলযুগে শিল্পপোষ্টারূপে অনতিক্রান্ত ভূমিকা যাঁর, সেই শাহ্জাহানের মুগ্ধ অনুরাগী ছিলেন। মুঘল রাজাদের শিল্পপ্রীতির সম্বন্ধে স্বামীজীর আবেগপূর্ণ প্রশংসার কিছু বিবরণ নিবেদিতা দিয়েছেন ঃ তিনি উল্লাসপূর্বক ভারতবর্ষের বা মুঘলবংশের ইতিহাসের সারসংকলন করিয়া দিতেন। মুঘলগণের গরিমা স্বামীজী শতমুখে বর্ণনা করিতেন। সমস্ত গ্রীষ্ম ঋতুটিতে তিনি থাকিয়া থাকিয়া দিল্লী ও আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একবার তিনি তাজমহলকে 'একটি ক্ষীণালোক স্থান—তারপর একটি সমাধি'—এইরূপে বর্ণনা করেন। আর একবার তিনি শাহ্জাহানের কথা বলিতে

৪৭। Reminiscences of Swami Vivekananda, pp. 191-92

বলিতে সহসা উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, আহা তিনিই মুঘলকুলের গৌরবস্বরূপ ছিলেন। অমন সৌন্দর্যানুরাগ ও সৌন্দর্যচেতনা ইতিহাসে আর দেখা যায় না। তিনি নিজেও আবার শিল্পী। আমি নিজে তাঁহার স্বহস্তচিত্রিত একটি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি—সেটি ভারতের অন্যতম শিল্পসম্পদ। কী প্রতিভা![৪৮]

তাজমহলের ভাবসত্যের কথা স্বামীজী অন্যত্রও বলেছেন, আমরা পরে উদ্ধৃত করব। আলোয়ারের স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধেও তাঁর সমাদরের পরিচয় পরে দেব।

হিন্দু ও গ্রীক শিল্প সম্বন্ধে বিবেকানন্দ

হিন্দুশিল্প ও গ্রীকশিল্পের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রেই আমরা স্বামীজীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পাই। এক্ষেত্রেই স্বামীজী অংশত পথিকৃতের মর্যাদা পাবার যোগ্য। স্বামীজীর নিজের চিন্তার মধ্যে কিছু বিবর্তনও ঘটেছিল। সাবধানে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

গোড়ায় হিন্দু ও গ্রীক—এই দুই শিল্পের প্রাণধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজী কি বলেছেন দেখে নেওয়া উচিত। তারও আগে জানাতে পারি, স্বামীজী নানা প্রসঙ্গে বহু বার হিন্দু ও গ্রীক, এই দুই সভ্যতার তুলনা করেছেন। তাঁর কাছে এই দুই সভ্যতা দুটি ভাবের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্তর্মুখ অধ্যাত্মভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হিন্দুসভ্যতায়, বহির্মুখ ঐহিক ভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ গ্রীকসভ্যতায়। মাদ্রাজে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য' নামক বক্তৃতার সূচনায় হিন্দু ও গ্রীক সভ্যতার বিশেষ চরিত্রের পিছনে কোন্ নৈসর্গিক প্রভাব ছিল, তা তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন, এবং সেইসঙ্গে কি ধরনের সৃষ্টি উভয় ভূমিতে ঘটেছিল তা-ও বলেছিলেনঃ

পৃথিবীতে আশ্চর্য দুই জাতি দেখা গিয়েছে; তারা একই উৎস থেকে উত্থিত হয়ে ও ভিন্ন পরিবেশে স্থাপিত হয়ে, ভিন্ন ঘটনাচক্রে নিজেদের জীবন-সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে নিজস্ব পন্থায়। আমি এখানে প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক জাতির কথাই বলছি। উত্তরে তুষারশীর্ষ হিমালয়ের দ্বারা আবদ্ধ, প্রবহমান তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মতো স্বচ্ছসলিল নদীধারার দ্বারা সমতলভূমিতে পরিবেষ্টিত, চারিদিকে অনন্ত অরণ্য, যেন পৃথিবীপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত—এই পরিবেশে অবস্থিত থেকে ভারতীয় আর্যগণের মন অন্তর্মুখ হয়েছে; তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং অতি সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক এই সুমহান প্রাকৃতিক পরিবেশের অঙ্কভুক্ত হয়ে স্বতই আত্মানুসন্ধানপ্রিয় হয়েছিল। নিজ মনের বিশ্লেষণই ছিল ভারতীয় আর্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অপরপক্ষে গ্রীকরা পৃথিবীর যে অংশে উপনীত হয়েছিল, সে স্থানের নিসর্গপ্রকৃতি যতখানি না সুমহান, সুগম্ভীর, ততোধিক সুন্দর—দ্বীপপুঞ্জের মনোরম ভূখণ্ডগুলির সহজ অথচ বদান্যরূপ—সেই পরিবেশে স্বভাবতই বহির্মুখ হয়েছিল তাদের মন। তারা বাহ্যজগতের বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিল বিশেষভাবে।[৪৯]

৪৮। Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda, p. 25

৪৯। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, Ninth Edition (1964), pp. 269-70

হিন্দুর অন্তর্মুখ মনঃস্বভাবকে তার সর্ববিধ সাংস্কৃতিক প্রকাশের মধ্যে দেখা যায় এবং সমগ্র প্রাচ্যভূমে তার প্রভাব রয়েছে। অপরদিকে গ্রীসের প্রভাব সমগ্র ইউরোপে। পূর্বোক্ত বক্তৃতাতেই স্বামীজী বলেছেন ঃ ইংলণ্ড, শুধু ইংলণ্ড কেন সমগ্র ইউরোপ তার সভ্যতার জন্য গ্রীসের কাছে ঋণী। ইউরোপের সবকিছুর মধ্যেই গ্রীসের কণ্ঠস্বর। প্রতিটি সৌধ, তার আসবাবপত্র, সরঞ্জাম—সর্বত্রই গ্রীসের ছাপ। ইউরোপের কলাশিল্প ও বিজ্ঞান—সবই গ্রীসের ছায়ায় সৃষ্ট।[৫০]

গ্রীকশিল্প ও ভারতীয় শিল্পের তুলনা স্বামীজী নিম্নোক্ত প্রকারে করেছেন ঃ 'গ্রীক আর্টের মূল কথা প্রকৃতির হুবহু অনুসরণ, অপরপক্ষে ভারতীয় আর্টের মূল উদ্দেশ্য আদর্শকে প্রতিফলিত করা। গ্রীকশিল্পের শক্তি ব্যয়িত হয়, ধরা যাক, একখণ্ড মাংসের যথাযথ চিত্রণে ; সেকাজে তার এমনই সাফল্য যে, একটি কুকুর পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে সেটিকে আসল মাংস বলে মনে করে এবং কামড়াতে যায়। কিন্তু প্রকৃতির এই নিছক অনুকরণে গৌরব কোথায়! কুকুরের সামনে একখণ্ড আসল মাংসই ছবির বদলে ফেলে দাও না কেন!

'অপরদিকে আদর্শকে—অতীন্দ্রিয়কে—পরিস্ফুটন ভারতের অভিপ্রায়। তার পরিণতি বিকট সব মূর্তি রচনায়। খাঁটি শিল্পকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যা মাটি থেকে ওঠে, সেখান থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে, মাটির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সম্পৃক্ত থাকে, তবুও তার পাপড়ি খুলে ছড়িয়ে থাকে উপরের দিকে। সুতরাং শিল্পকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হবে। যেখানে সেই সংযোগ হারিয়েছে সেখানে শিল্পের পতন হয়েছে। তবু, প্রকৃতিকে অতিক্রম করতেও হবে শিল্পকে।'[৫১]

শিল্পের ক্ষেত্রে স্বামীজী বস্তুবাদী নন, আবার বিশুদ্ধ রসবাদী বা কলা-কৈবল্যবাদীও নন—তিনি ভাববাদী। জীবনে থাকবে মহৎ উদ্দেশ্য ; জীবনের অন্যতম প্রকাশক্ষেত্র শিল্পেরও থাকবে তা-ই—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। সুতরাং তাঁর মতে ঃ 'স্থাপত্য ও বাড়ির মধ্যে তফাৎ হল প্রথমটি একটি ভাবকে প্রকাশ করে, পরেরটি নিছক একটি কাঠামো, প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তৈরী। কি পরিমাণে ভাবকে প্রকাশ করতে পেরেছে, তার উপরে কোন জিনিসের মূল্য নির্ভর করে।'[৫২]

স্বামীজী গ্রীকশিল্পের সমঝদার ছিলেন আমরা জানি, এবং গ্রীকস্থাপত্য যে ক্ষেত্রবিশেষে ভাবপ্রকাশক, এ-ও তিনি নিশ্চয় স্বীকার করতেন, কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল, ভারতীয় স্থাপত্যে ঐ ভাবপ্রকাশের চেষ্টা ও সাফল্য অধিকতর।[৫৩]

৫০। ibid., p. 271 ৫১। ibid., Vol. V, p. 258

৫২। ibid., p. 259

৫৩। পাশ্চাত্যশিল্প ভাবপ্রকাশক নয়, এই ছিল স্বামীজীর বক্তব্য—এমন যেন কেউ মনে না করেন। নানাপ্রকার ভাব ও কল্পনা নিশ্চয়ই পাশ্চাত্যশিল্প প্রকাশ করেছে, এবং স্বামীজী তার কিছু কিছু নমুনার সঙ্গে পরিচিতও ছিলেন, তবে তিনি সর্বোচ্চভাব অর্থাৎ সুগভীর আধ্যাত্মিকতাকে পাশ্চাত্যশিল্প যথেষ্টভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে, এমন মনে করতেন না। স্বামীজী এল. গ্রেকোর ছবির সঙ্গে কতখানি পরিচিত ছিলেন জানি না। যদি থাকেনও, এল. গ্রেকোর লৌকিক ছন্দোভাঙা আধ্যাত্মিক ছাঁদকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক শিল্প বলতে পারতেন না নিশ্চয়, কারণ, সেখানে মিস্টিক রহস্যময়তা থাকলেও স্পিরিচুয়্যাল প্রশান্তি-লাবণ্য ছিল না।

ভারতীয় শিল্প এবং গ্রীকশিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল না। ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে সর্বব্যাপক পরিচয়ের অভাবে গোড়ার দিকে তাঁর ধারণা ছিল—মূর্তিশিল্পের দিকে ভারতের চেয়ে গ্রীস অগ্রসর। আগেই বলেছি, তিনি ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের পীঠস্থান উড়িষ্যায় যাননি। প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবজাত পূর্বোক্ত ধারণাকে তিনি পরে সংশোধন করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে ভারত ও ইউরোপের প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজী কিছু মন্তব্য করেছিলেন, তার অংশবিশেষ আমাদের আলোচনার পক্ষে খুবই দরকারী : 'পাশ্চাত্যের অন্য সবকিছুর মধ্যে আমি রোমকে সর্বাধিক উপভোগ করেছি। পম্পেই দেখার পরে আমি তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার বিষয়ে শ্রদ্ধা একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। বাষ্পশক্তি ও বিদ্যুৎ-শক্তি বাদ দিলে বাকি সবকিছুই তাদের ছিল—আর আধুনিকদের চেয়ে অনন্ত গুণ বেশী তাদের শিল্পবোধ এবং তাকে রূপায়িত করার ক্ষমতা।

'মিস লককে বল, আমি যে তাঁকে বলেছিলাম—"মানবমূর্তির ভাস্কর্যসৃষ্টির ক্ষমতা গ্রীকদের তুল্য ভারতীয়দের মধ্যে বিকশিত হয়নি"—আমার সে ধারণা ভ্রান্ত। ফার্গুসন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের যেসব গ্রন্থ এখন পড়ছি তাতে দেখছি, উড়িষ্যায় (যেখানে আমার যাওয়া হয়নি) ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এমন মানবমূর্তি রয়েছে, সৌন্দর্যে এবং অবয়বসংস্থানের নৈপুণ্যে সেগুলি যে-কোনও গ্রীকমূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। মৃত্যুর একটি বিশাল মূর্তি সেখানে আছে—লোলচর্ম প্রকাণ্ড নারীকঙ্কাল—যার অবয়বসংস্থানের নিদারুণ বাস্তবতা ভয়ঙ্কর ও পীড়াদায়ক। উক্ত গ্রন্থকার বলেছেন অলিন্দের একটি নারীমূর্তি একেবারে ভেনাস ডি মেডিচির মতো। এইরকম আরও। অবশ্যই মনে রেখ, মূর্তিদ্বেষী মুসলমানেরা প্রায় সবকিছু ধ্বংস করে ফেলেছে। তবু যা আছে তা সমগ্র

পাশ্চাত্য-ভাস্কর্যের কল্পনামুখিতার তারিফ স্বামীজী কিভাবে করতেন তার একটি দৃষ্টান্ত প্রিয়নাথ সিংহের 'Swami Vivekananda and Art' (Prabuddha Bharata, November 1906) নামক রচনার মধ্যে পেয়েছি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিস প্রদর্শনীতে বহু চিত্র ও ভাস্কর্যের সমাবেশ হয়েছিল, একথা আগেই বলেছি। প্রদর্শনীর সচিত্র রিপোর্টে মুদ্রিত একটি ভাস্কর্যের ছবি দেখিয়ে তার বিশেষ প্রশংসা স্বামীজী করেছিলেন। দুটি মূর্তি ছিল ঐ ভাস্কর্যে—একটি নারীর, অন্যটি পুরুষের। পুরুষটি হল শিল্পীর প্রতিভূ, তার ডান হাতে শিল্পযন্ত্র, সে হাতটি রমণীমূর্তির হাঁটুর উপরে আলতোভাবে পড়ে আছে—অন্য হাতে সে রমণীর অবগুণ্ঠন মোচন করছে—তা করার কালে যেটুকু দেখতে পেয়েছে, তাতেই মুগ্ধ হয়ে গেছে। ভাস্কর্যের তলায় নাম দেওয়া হয়েছে 'শিল্প এবং প্রকৃতি' ('Art et Nature')। 'স্বামীজী মন্তব্য করলেন : ওখানে লেখা উচিত ছিল—"আর্ট উন্মোচন করছে প্রকৃতিকে"। শিল্পী অদীক্ষিত দর্শকের চোখের সামনে প্রকৃতির সৌন্দর্য খুলে ধরে। মুখ একই—কিন্তু অন্তরের বিভিন্ন অনুভূতি যেমন তাতে বিভিন্ন আলোকসম্পাত করে, তেমনি একই নিসর্গপ্রকৃতি শিল্পীর কাছে নানা ভাবের আকর হয়, নানা রূপে বিকশিত হয়। প্রকৃতি তার প্রিয় উপাসক-শিল্পীর কাছে অনন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার খুলে দেয়। প্রকৃতির লজ্জাবগুণ্ঠিত সৌন্দর্যের দু-একটি ঝলক শিল্পীর চোখে ধরা পড়ে—তাকেই স্থায়ী রূপ দেয় সে। এই হল শিল্পীর আসল কাজ। ঐ ভাস্কর্যটির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে শিল্পীর নয়নের আরাধনা-দৃষ্টি ; তার শরীরের আনতভঙ্গি, মাথার হেলানো ছন্দ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশিষ্ট অবস্থানের রূপ—সবকিছুই শিল্পী ও তার দেবীর পবিত্র সম্পর্ককে প্রকাশ করছে। শিল্প ও প্রকৃতির সম্পর্কের পূর্ণরূপের ধারণা করবার পরেই ভাস্কর এই মাস্টারপিস্ সৃষ্টি করেছেন।'

রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা বলার সময়েও প্যারিস প্রদর্শনীর ঐ ভাস্কর্যটির কথা স্বামীজী বলেছিলেন।

ইউরোপের ধ্বংসস্তূপ জুড়লে যা হয়, তারও চেয়ে বেশী। আমি আট বছর ভারতে ঘুরেছি, তবু অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিই দেখা হয়নি।

'ভগিনী লককে বল, ভারতের অরণ্যের মধ্যে একটি বিধ্বস্ত মন্দির আছে, ফার্গুসন সেটিকে এবং গ্রীসের পার্থেননকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্থাপত্যশিল্পের চরম শিখর মনে করেন—একটি ভাবকল্পনার চরম প্রকাশ, অন্যটি ঐ কল্পনার সঙ্গে জড়িত খুঁটিনাটি রূপের প্রকাশক। পরবর্তী মুঘল সৌধাবলী ইত্যাদি, ভারত-সারাসেন স্থাপত্য-নিদর্শনগুলি প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে কোনভাবেই তুলনায় দাঁড়াতে পারে না।'[৫৪]

এখানে সময়ের একটু হিসাব নেওয়া দরকার। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারিতে স্বামীজী যখন ঐ চিঠি লিখছেন, তখন তিনি প্রথমবার পাশ্চাত্যভ্রমণ শেষ করে ভারতের পথে ; এখনও দেশে পৌঁছাননি। সুতরাং নতুন করে এদেশের শিল্পনিদর্শনগুলি পরীক্ষা করার সুযোগ তাঁর হয়নি। তবু ভারতীয় ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাঁর মত বদলাল কি করে—কি করে সেগুলিকে তিনি গ্রীকমূর্তির সমতুল মনে করলেন? তা কি ফার্গুসনের গ্রন্থের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয়ের ফলে? ফার্গুসনের বই কি তিনি আগে পড়েননি? ঐ চিঠিতে অন্য বিশেষজ্ঞদের কথাও তিনি বলেছেন—তাঁদের মধ্যে কি 'Antiquities of Orissa' গ্রন্থের ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ছিলেন? উড়িষ্যার শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে ঐ বিখ্যাত গ্রন্থও কি তিনি পড়েননি? স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকথায় কিন্তু দেখেছি, তিনি যুবক নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়ে রাজেন্দ্রলালের 'বুদ্ধগয়া' গ্রন্থ পড়তে দেখেছিলেন। আমাদের কি ধরে নিতে হবে—বিদেশের মিউজিয়ামে বিদেশীয় নিদর্শনের পাশাপাশি এদেশীয় শিল্পনিদর্শন দেখে (এবং তার বিষয়ে আরও অবহিত হয়ে) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছিল? স্পষ্ট উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ।[৫৫]

এইবার একটি প্রশ্ন করা চলে—ভারতীয় শিল্পে গ্রীকপ্রভাবের অতিরঞ্জিত ইউরোপীয় থিওরির বিরুদ্ধে স্বামীজীর অধুনাখ্যাত মনোভাব কখন গঠিত হয়েছিল? ভারতীয়

৫৪। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VIII, Third Edition (1959), pp. 395-96

৫৫। খুব বিস্ময়ের কথা, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্বামীজী শিল্পবিষয়ে আলোচনাকালে শিল্পভাস্কর্যে পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারতবর্ষের ন্যূনতার কথা বলেছিলেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' উদ্বোধনে ১৮৯৯-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বেরিয়েছিল। কিন্তু বইটি কখন লেখা হয়? বইটির রচনাভঙ্গি দেখে মনে হয়, ধারাবাহিকভাবে বইয়ের সব অংশ লেখা হয়নি। যতদূর ধারণা, স্বামীজী এটি ১৮৯৭-৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখেছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে স্বামীজীর নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্যের কালগত সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না, যখন আমরা জানি, স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে ভারতীয় ভাস্কর্যের তুলনায় গ্রীক ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁর পূর্বধারণা প্রত্যাহার করেছিলেন।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-এর পরিশিষ্টে স্বামীজী লিখেছেন ঃ 'ওদের মতো চিত্র বা ভাস্কর্যবিদ্যা হতে আমাদের এখনও ঢের দেরি! ও দুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু। আমাদের ঠাকুর দেবতা সব দেখ না, জগন্নাথেই মালুম!!' [বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১৪]

স্বামীজীর রচনার এই অংশ কি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে লেখা? সম্ভবত তা-ই। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে পাশ্চাত্যদেশে থাকাকালেই মনে হয় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনা বিচারের ঐ লেখাটি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

ভাস্কর্য গ্রীক ভাস্কর্যের চেয়ে ন্যূন নয়, এই ধারণার উদ্ভবের কালেই কি তা জেগেছিল—যখন তিনি এ-সম্পর্কে বিশেষ অনুশীলন করেছিলেন? এই প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন আছে, কারণ আমরা দেখব, পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনের তত্ত্বভিত্তি যাঁরা নির্মাণ করতে চেয়েছেন, তাঁরা সকলেই স্বামীজীর মতের অনুবর্তী হয়েছিলেন।

নিজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে গৌরববুদ্ধি থেকে জাতীয়তার বৃদ্ধি ঘটে—পরাধীন ভারতীয়দের ক্ষেত্রে সেই জাতীয় চেতনাকে সাম্রাজ্যবাদীরা পছন্দ করবেন, এমন আশা করা যায় না। তাই ভারতীয় পুরাকীর্তির পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে জানানোর প্রয়োজন হয়েছিল—এইসব সৃষ্টির মূলে রয়েছে পাশ্চাত্যেরই দীর্ঘ বিস্তারিত হস্ত, অর্থাৎ—ভারতশিল্পে গ্রীকপ্রভাব। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিছু মিশ্র শিল্প, যার নাম গান্ধার শিল্প, এক্ষেত্রে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সুবিধা করে দিয়েছিল। ভারতশিল্পে গ্রীকপ্রভাব খণ্ডনের চেষ্টাও ভারতীয়দের মধ্যে আরম্ভ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ নাম—অসাধারণ এক মনস্বীর নাম—ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র।[৫৬] রাজেন্দ্রলালই বোধহয় সর্বপ্রথম ভারতশিল্পের উপরে গ্রীকপ্রভাব খণ্ডনের চেষ্টা করেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ নন (যেমন অনেকের ধারণা), এবং সেকাজ তিনি করেছিলেন—স্বামীজী যখন নিতান্তই বালক।

স্বামীজী এইক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের রচনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। আগেই দেখেছি, স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন, তিনি কুড়ি-একুশ বছরের নরেন্দ্রনাথকে রাজেন্দ্রলালের 'বুদ্ধগয়া' বইটি পড়তে দেখেছিলেন। এই বইয়ের মধ্যেও রাজেন্দ্রলাল তাঁর পূর্ববর্তী কয়েকটি বইয়ের মতোই গ্রীকপ্রভাবতত্ত্ব খণ্ডনের চেষ্টা করেছিলেন।

রাজেন্দ্রলালের বক্তব্যকে চোখের সামনে রেখেই স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে আমরা সক্ষম হব। প্রথম কারণ, গ্রীকপ্রভাবতত্ত্ব খণ্ডন করতে গিয়ে স্বামীজী যেসব যুক্তি এনেছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাই না; রাজেন্দ্রলালের বক্তব্য সেই শূন্য পূরণের কাজে আমাদের সাহায্য করবে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, স্বামীজী রাজেন্দ্রলালের বক্তব্যকে প্রাথমিকভাবে নিশ্চয়ই উপস্থিত করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, আমরা এ-ও দেখব, স্বামীজী রাজেন্দ্রলালের বক্তব্যকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। কোথায় তা করেছিলেন, তা-ও জানা দরকার।

উপরের কথাগুলি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের আগেকার। তার পক্ষে প্রমাণ পেয়েছি। '১৮৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে গৃহীত স্মারকলিপি হইতে'-এর মধ্যে আছেঃ 'আদর্শবাদী হিন্দুদের মধ্যে...বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল...। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের কথাই ধর। হিন্দুর চিত্রকলায় কি দেখিতে পাও? সর্বপ্রকার কিম্ভূতকিমাকার ও অস্বাভাবিক মূর্তি। হিন্দু মন্দিরে কি নজরে পড়ে? "চতুর্ভঙ্গ" নারায়ণ বা ঐজাতীয় কোন মূর্তি। কিন্তু কোন ইতালীয় পট অথবা গ্রীসদেশীয় মূর্তি সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ, ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের কী অপূর্ব প্রকাশ! প্রদীপ হস্তে একটি নারীর চিত্র অঙ্কনের জন্য হয়ত একজন বিশ বৎসর ধরিয়া নিজ হাতে প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়াছিল।' [বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২১১-১২]

৫৬। পরে দেখেছি, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন প্রিয়নাথ সিংহ।

স্বামীজী কর্তৃক হিন্দুশিল্প ও গ্রীকশিল্পের তুলনামূলক আলোচনা

রাজেন্দ্রলাল যেখানে ভূমি ছেড়ে দিলেন, স্বামীজী সেখানেই এসে দাঁড়ালেন। হিন্দুস্থাপত্যের উদ্ভবে গ্রীকপ্রভাবতত্ত্বকে সাফল্যের সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল দূর করেছিলেন (এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'সুবর্ণলেখা' গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনা করেছি) এবং সেই সিদ্ধান্তকে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গ্রীকভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে ইউরোপীয় ধারণাকে তিনি শেষ পর্যন্ত মান্য করায় তাঁর পক্ষে শেষোক্ত ক্ষেত্রে বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা দেখতে পাই, ভারতীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে গ্রীসের আদি প্রভাবের কথা তখন বহু কণ্ঠে কথিত হচ্ছিলই। সেইসঙ্গে এ-ও জানতে হবে, রাজেন্দ্রলালের ঐ বীরত্বপূর্ণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংগ্রাম তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে প্রায় কোন মূল্যই পায়নি, কারণ প্রথমত, দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে এইসব বিষয়ের চর্চা প্রায় ছিল না, দ্বিতীয়ত, চর্চা যেখানে ছিল সেখানে শ্বেত পণ্ডিতমহাশয়দের প্রতি ভক্তিও অটুট ছিল।[৫৭] এই পরিস্থিতিতেই স্বামীজী ভারতীয় ভাস্কর্যে গ্রীকপ্রভাবতত্ত্বের খণ্ডনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর সেকাজ আদি কাজ না হলেও এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে অতীব প্রয়োজনীয় কাজ হয়েছিল, এবং আরও বড় কথা, ঐ ধারণাটি তিনি এমন একজন মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়ে দিতে পেরেছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের সময়ে উক্ত ধারণার পক্ষসমর্থনে নেত্রীত্ব করবেন। আমি ভগিনী নিবেদিতার কথাই বলছি।

এবং স্বামীজী আরও এগিয়েছিলেন। তিনি একেবারে উলটোপ্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। প্রথমত, তিনি গ্রীকশিল্পে প্রাচ্যপ্রভাব পর্যন্ত কল্পনা করেছিলেন, দ্বিতীয়ত, হিন্দুভাস্কর্যকে গ্রীকভাস্কর্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বলেছিলেন। এটা চাকার একেবারে উলটোপাক, এবং যথেষ্ট বৈপ্লবিক বক্তব্য। প্রথমোক্ত বক্তব্যটি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা বলতে পারব না, কিন্তু দ্বিতীয় বক্তব্যের আংশিক স্বীকৃতি ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। স্বামীজী যে দৃষ্টিভঙ্গিতে

৫৭। যথা, রমেশ দত্তের মনে ভারতীয় শিল্পের তুলনায় গ্রীকশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্দেহই ছিল না। 'নানাপ্রকার গৃহ মন্দির ও গুহানির্মাণে যে প্রাচীন আর্যদিগের বিশেষ দক্ষতা ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। বৌদ্ধযুগেই ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিশেষ উন্নতি হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্করগণ নিজ নিজ নৈপুণ্যের অনেক স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এবিষয়ে কখনও গ্রীকদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। গ্রীক ভাস্করেরা মানুষ ও দেবদেবীর মূর্তিতে সৌন্দর্যের যে-আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পীগণ তাহার নিকটে যাইতে পারেন না। ...মন্দিরাদি গঠনপ্রণালী এবং তাহাদের গাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি সম্বন্ধেও এই সকল কথা খাটে। ইহা ফার্গুসন প্রভৃতি ইউরোপীয় শিল্পসমালোচকগণের মত। [শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তও এই মতে সায় দিয়াছেন] তিনি বলেন, কপিল ও কালিদাসের দেশে প্রতিভার অভাব ছিল না। কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকেরা ক্রমে ব্যবসায়ে বিমুখ হইয়া পড়ায়, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ললিতকলাগুলি নিম্নশ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে? বার্ডবুড় সাহেব আরও একটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দুদের পৌরাণিক অনেক দেবদেবী এবং তাঁহাদের অবতারগণের মূর্তি অস্বাভাবিক। হিন্দুশিল্পীগণ ধর্মভাবের প্রেরণায় তাঁহাদের ভাস্কর্য ও চিত্রে অন্ধভাবে পুরাণোক্ত বর্ণনার অনুসরণ করিয়াছেন, সৌন্দর্য-সৃষ্টির চিন্তা তাঁহাদের মনে আসে নাই।' ['ভারতবর্ষের শিল্প' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, প্রবাসী, শ্রাবণ (১৩০৮)]

ভারতীয় ভাস্কর্যকে শ্রেষ্ঠতর বলেছেন, তাকে এখন অনেকেই মেনে নিচ্ছেন।

স্বামীজী তাঁর শেষোক্ত ধারণাগঠনের সময়ে অনেককেই ত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রলালও ছিলেন। গ্রীকপ্রভাবতত্ত্ব খণ্ডনযুদ্ধে ভারতপক্ষে মহারথ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কি ভাবতে পেরেছিলেন—উলটো দাবি করাও সম্ভবপর—ভারতের কাছেই গ্রীস ঋণী? ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কৃপাপূর্ণ প্রশংসাজীবিত ভারতীয় ভাস্কর্য গ্রীকভাস্কর্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আসন দাবি করবে, এ-ও কি তাঁর কল্পনায় এসেছিল? রাজেন্দ্রলাল নিজে অন্তত শেষোক্ত দাবির পক্ষে ছিলেন না, এবং আমাদের অনুমান, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বামী বিবেকানন্দের উপরে কিছুদিনের জন্য ক্ষতিকর প্রভাবরূপে বর্তমান ছিল। আমরা আগে দেখেছি, গ্রীকভাস্কর্যের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা স্বামীজীর মনে বহুদিন বজায় ছিল, যেকথা তিনি দুঃখের সঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত ৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭ তারিখে মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে স্বীকার করেছিলেন।

স্বামীজীর সর্বশেষ ধারণার প্রথম প্রকাশ কবে দেখা যায়? এ পর্যন্ত যা পেয়েছি তদনুযায়ী ১৮৯৬-এর ২৮মে তারিখে ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে লণ্ডনে আলোচনাকালেই স্বামীজীকে তাঁর ঐ ধারণার কথা প্রথম বলতে দেখা গেছে। স্বামীজী তাঁর শিল্পিবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে এ-বিষয়ে যা বলেছিলেন, তার বিবরণ দিয়েছেন। তারই কিছু অংশঃ ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে তাঁর (স্বামীজীর) কথোপকথনকালে ভারতীয় স্থাপত্য অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়েছিল। অধ্যাপকের মত ছিল, বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে গ্রীকসৃষ্টির কিছু ঐক্য আছে, এবং গ্রীকদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল—তাই বলা যায়, হয়তো ভারতবর্ষ গ্রীকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। স্বামীজী তীক্ষ্ণ উত্তর দেন—'যদি গ্রীকদের ভারতে নিছক উপস্থিতিই ভারতীয় স্থাপত্যের উপর তাদের প্রভাবের একমাত্র প্রমাণ হয়, তাহলে সেই একই যুক্তি ফিরিয়ে দিয়ে বলা যায়, গ্রীকশিল্প ভারতের কাছে ঋণী। বৌদ্ধযুগের শিল্পের সঙ্গে গ্রীকশিল্পের কোন সাদৃশ্য নেই। গ্রীকরা বহির্বস্তুর রূপায়ণে চরম পারদর্শী, আর ভারতীয় ভাস্কর্য অন্তঃপ্রকৃতির উদ্ঘাটনে ইচ্ছুক—তার জন্য বাস্তবতাকে বলি দিতেও প্রস্তুত। শারীর সংস্থানের খুঁটিনাটির রূপায়ণে গ্রীকরা অত্যন্ত সাবধান ও সচেতন; অপরপক্ষে ভারতীয়রা তাকে প্রায় কোন মূল্য না দিয়ে মানসিক অবস্থাকে উন্মোচন করতে ব্রতী। ভারতে প্রাচীনকালে প্রতি ভাস্করই নিপুণ মিস্ত্রী; গয়া জেলায় তার সাক্ষ্য এখনও মিলবে। গয়ার কিছু মন্দির নির্মাণের সময়ে অযোধ্যা থেকে ব্রাহ্মণজাতির ভাস্কর-মিস্ত্রী আনা হয়েছিল, যাদের বংশধরেরা এখনও সেই জেলার গ্রামে বাস করে এবং একই বৃত্তিধারী হয়ে আছে। যদি গ্রীকরা আমাদের স্থাপত্য শিখিয়ে থাকে, তাহলে তারা আমাদের ভাস্কর্যের দোষগুলি সংশোধন করল না কেন, যখন দেখলে ভারতীয় স্থাপত্য ঢাকা পড়ে আছে মূর্তিতে? গ্রীকরা আসলে ভারতে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই, শিল্প বা বিজ্ঞান শেখাতে নয়। ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প গ্রীসের চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের কারণ ভারতীয় সৃষ্টি সব সময়েই একটা ভাবকে প্রকাশ করতে ব্রতী, গ্রীকস্থাপত্য যা করেনি।'[৫৮]

৫৮। Prabuddha Bharata, November (1906)

ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প কিভাবে ভাবপ্রকাশ করে থাকে, সে-বিষয়ে স্বামীজী ঐ সঙ্গে আরও যা বলেছিলেন প্রিয়নাথ সিংহের বিবরণে তার রূপ ঃ ভারতে স্থপতি, মুসলমান স্থপতিও, কোন একটি ভাবপ্রকাশে বিরত নয় কখনও। রাজপুতানায় ভ্রমণকালে স্বামীজী আলোয়ারের একটি মিনারের ভাবপ্রকাশক অনবদ্য সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছিলেন। তাজমহল দেখে বলেছিলেন, এই মর্মরের যে-কোন অংশ পেষণ করলেই রাজহৃদয়ের প্রেম ও যাতনা বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়বে। লোকে বলে, কলকাতা নাকি প্রাসাদনগরী। রাম কহো! বাড়িগুলো বাক্সের মতো—একের পর এক সাজানো—ভাব বলে একটুও কিছু নেই। রাজপুতানায় এখনও খাঁটি হিন্দুস্থাপত্যের স্বাক্ষর মেলে। কোন ধর্মশালার দিকে তাকালে মনে হবে, তা যেন হাত বাড়িয়ে ডাক দিচ্ছে তার উদার আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য; মন্দিরের দিকে তাকালে মনে হবে, তার ভিতর-বাহিরে দেবভাবে পূর্ণ। গ্রামের কুটির তার সর্বাঙ্গ দিয়ে একটা বক্তব্য প্রকাশ করছে—গৃহস্বামীর মনটিকে সে যেন খুলে ধরেছে। এই ধরনের ভাবব্যঞ্জক স্থাপত্য আর মাত্র দেখেছি ইতালীতে।[৫৯]

প্রিয়নাথ সিংহ লিখেছেন ঃ ইতালীয় শিল্পের প্রতি স্বামীজীর গভীর অনুরাগ ছিল।[৬০]

প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে স্বামীজীর এই আলোচনা কবে হয়েছিল? স্বামীজীর স্বদেশে প্রথম প্রত্যাবর্তনের পরে অর্থাৎ ১৮৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কিংবা দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনের পরে অর্থাৎ ১৯০১-০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে? আলোচনাকালের উল্লেখ প্রিয়নাথ করেননি। কিন্তু প্রথম পর্বেও হতে পারে, যদিও দ্বিতীয় পর্বেই হওয়া সম্ভব, কারণ দ্বিতীয়বার বিদেশভ্রমণের সময়েই তিনি গ্রীকস্থাপত্য-ভাস্কর্যকে কেবল মিউজিয়ামে নয়, একেবারে গ্রীসের ভূমিতে দাঁড়িয়েই দেখেছিলেন। কিন্তু তার আগেই যে শিল্পসম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বদলাতে আরম্ভ করেছে, তা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে আলোচনায়, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারির গোড়ায় মেরী হেলকে লেখা চিঠি থেকে দেখতে পাই।

ভারতশিল্প ও গ্রীকশিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কিভাবে সর্বশেষ পরিণতি পেয়েছিল, তার কিছু পরিচয় ভগিনী নিবেদিতার রচনায় পাওয়া যায়। স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর লাহোরে পৌঁছে দশ-বারো দিন ছিলেন। এই কালের মধ্যে তিনি লাহোর মিউজিয়াম দেখেন—সেখানে গান্ধারশিল্প-নমুনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, এবং তার ফলেই স্বামীজী তাঁর সিদ্ধান্ত করে ফেলেন—ভারতের আধুনিক শিল্প-আন্দোলনের পক্ষে যে সিদ্ধান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ। নিবেদিতা ১৪ জুন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ডায়েরীতে পূর্ববৎসরে স্বামীজী পূর্বোক্ত বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সে-বিষয়ে লিখেছেন ঃ স্বামীজী আমাদের নিকট গান্ধার ভাস্কর্যের বর্ণনা করিলেন। সেগুলিকে তিনি নিশ্চয়ই পূর্ববৎসর লাহোরের মিউজিয়ামে দেখিয়াছিলেন। শিল্পবিষয়ে শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষ কোনদিন গ্রীসের চরণতলে বসিয়াছিল এই ইউরোপীয় থিওরি খণ্ডন করিতে তিনি ঘৃণাপূর্ণ উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া উঠিলেন।[৬১]

৫৯। ibid. ৬০। ibid.

৬১। Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda, p. 59

স্বামীজীর মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট কালনির্দেশ উপরে পেলাম। এর সওয়া দু-বছর পরে স্বামীজী প্রকাশ্যে পণ্ডিতদের সভায় তাঁর মনোভাব প্রকাশ করবেন। তা করেছিলেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় 'প্যারিস ধর্মেতিহাস সভা'য়।

প্যারিস ধর্মেতিহাস সভায় স্বামীজী কোন রচনা পাঠ করেননি, মৌখিক বক্তৃতা করেছিলেন। এই বক্তৃতার যে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তিনি স্বয়ং লিখে পাঠিয়েছিলেন, তা-ই এতদিন আমাদের অবলম্বন ছিল। সম্প্রতি স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ 'প্যারিসে বিবেকানন্দ' পর্যায়ে কিছু গবেষণা করেছেন, এবং ধর্মেতিহাস সভার মুদ্রিত বিবরণী থেকে স্বামীজীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত কিছু উল্লেখ উদ্ধৃতও করেছেন, কিন্তু শিল্পপ্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্যের ক্ষেত্রে সেখান থেকেও নতুন কিছু পাই না। অথচ শিল্পবিষয়ে উক্ত সভায় কথিত স্বামীজীর বক্তব্য আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। এক্ষেত্রে উপায়ান্তরহীন হয়ে স্বামীজীর পাঠানো বিবরণীর প্রাসঙ্গিক অংশের উল্লেখ করতে হচ্ছে। স্বামীজী উক্ত সভায় কেবল শিল্পের উপরে নয়, ভারতীয় সকল বিদ্যার উপরেই গ্রীকপ্রভাব আছে, এই তত্ত্বের নিরাকরণ করতে চেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, অনেক ভারততাত্ত্বিক ইউরোপীয় ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং স্বামীজী কার্যত চ্যালেঞ্জের সুরে কথা বলেছিলেন। স্বামীজীর তীব্র মনোভাবের কারণ—তিনি ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের মধ্যে কোন সংযমের লক্ষণ তো দেখেননি, উপরন্তু নতুন বিসদৃশ দাবি উপস্থিত করার প্রগল্‌ভতা দেখেছিলেন। যেমন, পূর্ববর্তী একটি সভায় ওপার্ট নামক জনৈক জার্মান পণ্ডিত শালগ্রাম সম্বন্ধে 'অশ্রুতপূর্ব ও অপ্রাসঙ্গিক' যৌনব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন, যার খণ্ডনও স্বামীজী করতে চেষ্টা করেছিলেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কিভাবে ভারতের ঘাড়ে নির্বিচারে গ্রীসকে চাপাতে ব্যস্ত সে-সম্বন্ধে স্বামীজী উক্ত 'পারি প্রদর্শনী' নামক রচনায় লিখেছিলেনঃ '...কতকগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতীয় জ্যোতিষের কয়েকটি সংজ্ঞা গ্রীক জ্যোতিষের সংজ্ঞার সদৃশ দেখিয়া এবং গ্রীকরা ভারতপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল অবগত হইয়া, ভারতের যাবতীয় বিদ্যায়—সাহিত্যে, জ্যোতিষে, গণিতে—গ্রীক সহায়তা দেখিতে পান। শুধু তাহাই নহে, একজন অতি সাহসিক লিখিয়াছেন যে, ভারতের যাবতীয় বিদ্যা গ্রীকদের বিদ্যার ছায়া!!'[৬২]

যেসব যুক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতীয় বিদ্যার উপরে গ্রীকপ্রভাব কল্পনা করেন, সেইসব যুক্তির ফাঁকি দেখিয়ে দেবার পরে স্বামীজী লিখেছেনঃ 'ঐ প্রকার কালিদাসাদিকবি-প্রণীত নাটকে "যবনিকা" শব্দের উল্লেখ দেখিয়া যদি ঐ সময়ের যাবতীয় কাব্যনাটকের উপর যবনাধিপত্য আপত্তি (আপতিত?) হয়, তাহা হইলে প্রথমে বিবেচ্য যে, আর্যনাটক গ্রীকনাটকের সদৃশ কি না। যাঁহারা উভয় ভাষায় নাটকরচনা-প্রণালী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ঐ সৌসাদৃশ্য কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনাজগতে, বাস্তবিক জগতে তাহার কস্মিনকালেও বর্তমানত্ব নাই। সে গ্রীক কোরস্ কোথায়? সে গ্রীক যবনিকা নাট্যমঞ্চের একদিকে,

৬২। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫০

আর্যনাটকে তাহার ঠিক বিপরীতে। সে রচনা-প্রণালী এক, আর্যনাটকের আর এক।

'আর্যনাটকের সাদৃশ্য গ্রীক নাটকে আদৌ তো নাই, বরং সেক্সপীয়র-প্রণীত নাটকের সহিত ভূরি ভূরি সৌসাদৃশ্য আছে।

'অতএব এমনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, সেক্সপীয়র সর্ববিষয়ে কালিদাসাদির নিকট ঋণী এবং সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য ভারতের সাহিত্যের ছায়া।

'শেষ—পণ্ডিত ম্যাক্সমূলরের আপত্তি তাঁহারই উপর প্রয়োগ করিয়া ইহাও বলা যায় যে, যতক্ষণ ইহা না প্রমাণিত হয় যে, কোন হিন্দু কোনও কালে গ্রীক ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, ততক্ষণ ঐ গ্রীক প্রভাবের কথা মুখে আনাও উচিত নয়।

'তদ্বৎ আর্যভাস্কর্যে গ্রীক প্রাদুর্ভাব-দর্শনও ভ্রম মাত্র।'[৬৩]

শিল্পপ্রসঙ্গে স্বামীজীর রিপোর্ট মাত্র একলাইন থাকলেও স্বামীজী নিশ্চয় ব্যাপারটি নিয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন—কি বলেছিলেন তা অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই, এবং অনুমানের ভিত্তি ইতিমধ্যেই আমরা রচনা করে এসেছি—রাজেন্দ্রলালের যুক্তি ও স্বামীজীর অন্যত্র-প্রকাশিত মনোভাবের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে।

স্বামীজী যখন প্যারিসের ধর্মেতিহাস সভায় উপরিকথিত বিষয়ে বলছিলেন, ঠিব তারই কাছাকাছি সময়ে পুনশ্চ লুভারে গিয়ে গ্রীকশিল্পকলার নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করছিলেন। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের পরিশিষ্টে এ-সম্বন্ধে তাঁর সংক্ষিপ্ত ডায়েরী-নোট দেওয়া আছে—খুবই দুঃখের বিষয়, ঐ নোটকে পূর্ণাঙ্গ রচনার আকার তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। এই ডায়েরী-নোটের মধ্যেই দেখা যায়, স্বামীজী গ্রীকশিল্পের একেবারে প্রথম পর্যায়ে প্রাচ্যপ্রভাব অনুমান করেছেন।

স্বামীজী উক্ত নোটে লিখেছেন ঃ '(লুভার) মিউজিয়ম দেখে গ্রীক কলার তিন অবস্থা বুঝতে পারলুম।'[৬৪] এই তিন অবস্থার প্রথম অবস্থার সময় হল প্রাচীন অজ্ঞাতকাল থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ পর্যন্ত; দ্বিতীয় পর্ব ৭৭৬ খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকে ১৪৬ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত; তৃতীয় পর্ব ১৪৬ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে পরবর্তীকাল।

প্রথম পর্ব অর্থাৎ ৭৭৬ খ্রীষ্টপূর্বকাল পর্যন্ত সময়ের গ্রীকশিল্পকে 'মিসেনি' শিল্পের কাল বলা হয়। স্বামীজী বলতে চান—এই প্রথম পর্ব অর্থাৎ মিসেনি পর্বে গ্রীকশিল্প প্রাচ্যপ্রভাবে গড়ে উঠেছিল। গ্রীসের 'আচেনি রাজ্য (Achaean) সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে অধিকার বিস্তার করেছিল, আর সেইসঙ্গে ঐসকল দ্বীপে প্রচলিত, এশিয়া হতে গৃহীত সমস্ত কলাবিদ্যারও অধিকারী হয়েছিল। এইরূপেই প্রথমে গ্রীসে কলাবিদ্যার আবির্ভাব।' স্বামীজী বলতে চেয়েছেন, 'প্রধানতঃ এশিয়াশিল্পের অনুকরণেই ব্যাপৃত' ঐকালীন মিসেনিশিল্প খাঁটি গ্রীকশিল্প নয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬-১৪৬ পর্যন্ত সময়ের দ্বিতীয় পর্বকে স্বামীজী খাঁটি গ্রীকশিল্পের কাল বলেছেন। তা বলার কারণ, এই কালে গ্রীকশিল্প 'এশিয়া-শিল্পের ভাব ত্যাগ করে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ-চেষ্টা' আরম্ভ করেছিল। এশিয়া-শিল্প বাস্তবের অনুকরণ

৬৩। তদেব, পৃঃ ৫০-১ ৬৪। তদেব, পৃঃ ১৪২

চেষ্টা করে না, আর গ্রীকশিল্পের লক্ষণ—'প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যাথাতথ্য জীবন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণনা'।

এই দ্বিতীয় অর্থাৎ হেলেনিক পর্ব আবার তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম, 'আর্কেইক গ্রীকশিল্প'; সময় ৭৭৬-৪৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই পর্বের শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য: 'এখনও মূর্তিগুলি শক্ত (stiff), জীবন্ত নয়। ঠোঁট অল্প খোলা, যেন সদাই হাসছে। এ-বিষয়ে ঐগুলি ইজিপ্তের শিল্পী-গঠিত মূর্তির ন্যায়। সব মূর্তিগুলি দু-পা সোজা করে, খাড়া (কাঠ) হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চুল দাড়ি সমস্ত সরলরেখাকারে (regular lines) খোদিত; বস্ত্র সমস্ত মূর্তির গায়ের সঙ্গে জড়ানো, তালপাকানো—পতনশীল বস্ত্রের মতো নয়।'[৬৫]

দ্বিতীয় ভাগের নাম, 'ক্লাসিক গ্রীকশিল্প'; সময় ৪৭৫-৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ অর্থাৎ 'এথেন্সের প্রভুত্বকাল হতে আরব্ধ হয়ে সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুকাল পর্যন্ত'। গ্রীকশিল্পের এইটাই গৌরবযুগ। এই গৌরবের স্বরূপ বোঝাতে স্বামীজী জনৈক ফরাসী শিল্পবেত্তার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: '(ক্লাসিক) গ্রীকশিল্প চরম উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কোন দেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ মূর্তিসমূহ যে-কালে নির্মিত হইয়াছিল, কলাবিদ্যায় সমুজ্জ্বল সেই খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধিনিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীকশিল্প সজীব হইয়া উঠে।'[৬৬]

এই ক্লাসিক গ্রীকশিল্প গ্রীসের দুই রাজ্যে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম, আটিকা রাজ্যের সম্প্রদায় (এথেন্স যার প্রধান শহর), দ্বিতীয় পিলোপনেশিয়ান রাজ্যের সম্প্রদায়।

আটিক সম্প্রদায়ের আবার দুই ভাব। একটি ভাব সৃষ্টি করেছিলেন 'মহাশিল্পী ফিডিয়াস', যাঁর বিষয়ে স্বামীজী জনৈক ফরাসী পণ্ডিতের অভিমত উদ্ধার করেছেন: 'অপূর্ব সৌন্দর্যমহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব, যাহা কোনকালে মানব-মনে আপন অধিকার হারাইবে না...।' দ্বিতীয় ভাবের প্রধান শিক্ষক স্কোপাস ও প্র্যাক্সিটেলেস। 'এই সম্প্রদায়ের কার্য শিল্পকে ধর্মের সঙ্গ হতে একেবারে বিচ্যুত করে কেবলমাত্র মানুষের জীবন-বিবরণে নিযুক্ত রাখা।'[৬৭]

ক্লাসিক গ্রীকশিল্পের দ্বিতীয় সম্প্রদায়—পিলোপনেশিয়ান সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষক দুজন, পলিক্লিটাস (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) এবং লিসিপাস (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী)। 'এঁদের প্রধান লক্ষ্য—মানবশরীরে গড়ন পরিমাণের আন্দাজ (proportion) শিল্পে যথাযথ রাখবার নিয়ম প্রবর্তিত করা।'[৬৮]

স্বামীজী বলেছেন, খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩-১৪৬ পর্যন্ত সময় ক্লাসিক গ্রীকশিল্পের অবনতিকাল। এর আরম্ভে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু, শেষে রোমানদের দ্বারা আটিকা বিজয়। 'জাঁকজমকের বেশী চেষ্টা এবং মূর্তিসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড করবার চেষ্টা এই সময়ে গ্রীকশিল্পে দেখতে পাওয়া যায়।'[৬৯]

৬৫। তদেব, পৃঃ ১৪৩ ৬৬। তদেব ৬৭। তদেব, পৃঃ ১৪৪
৬৮। তদেব ৬৯। তদেব

গ্রীকশিল্পের তৃতীয় পর্যায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৬ থেকে পরবর্তীকাল। এই একেবারে পতনকাল সম্বন্ধে স্বামীজী অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন: '...রোমানদের গ্রীস অধিকার-সময়ে গ্রীকশিল্প তদ্দেশীয় পূর্ব পূর্ব শিল্পীদের কার্যের নকল মাত্র করেই সন্তুষ্ট। আর নূতনের মধ্যে হুবহু কোন লোকের মুখ নকল করা।'[৭০]

গ্রীকশিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস যেভাবে স্বামীজীর ডায়েরী-নোটে পাচ্ছি, সন্দেহ নেই তা করা হয়েছিল বিশেষজ্ঞরচিত শিল্পের ইতিহাসগ্রন্থেরই অনুসরণে। ঐ নোটের উপর নির্ভর করে স্বামীজী যদি প্রবন্ধ রচনা করতেন তাহলে বলাই বাহুল্য তাঁর ব্যক্তিগত মতামত যথেষ্ট পেতাম। তাহলেও, ঐ সংক্ষিপ্ত ডায়েরী-নোটের ভিতর থেকেই স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির চেহারা পাই। গ্রীকশিল্পের আদিতে তিনি প্রাচ্যপ্রভাবের কথা বলেছেন বটে কিন্তু কদাপি তাকে গ্রীকশিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের কারণরূপে দাঁড় করাননি, বরং বলেছেন, ঐ প্রভাব ত্যাগ করার ফলেই গ্রীকশিল্প নিজ মহিমা লাভ করেছিল। স্বামীজী সব সময়েই স্বাধীন আত্মপ্রকাশের পক্ষে; বাইরের প্রভাব গ্রহণের বিরোধী তিনি নন, কিন্তু সে প্রভাব যাতে জাতীয় প্রবণতাকে উৎপাটিত না করে সেবিষয়ে সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন। সুতরাং তিনি গ্রীকশিল্পের শ্রেষ্ঠ মহিমা তখনই দেখলেন যখন তা প্রাচ্যপ্রভাবমুক্ত। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীকশিল্প, 'বিধিনিষেধের বহির্ভূত' হয়ে সগৌরবে বিকশিত হয়েছিল। এই কালের শিল্পের মধ্যেই তিনি ভাব-বিকাশের চেষ্টা ও তার সাফল্য দেখেছিলেন (যেমন ফিডিয়াসের রচনার মধ্যে)। অপরদিকে যেসব গ্রীকশিল্পী-সম্প্রদায় নিছক প্রকৃতির অনুকরণ করাকেই লক্ষ্য বলে ধরেছিল, তাদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অধিক সংক্ষিপ্ত এবং সম্পূর্ণ অনুরাগহীন।

গ্রীকশিল্পের সামগ্রিক শক্তি ও সৌন্দর্যমহিমা স্বীকার করার পরেও আমরা দেখব, শেষ পর্যন্ত স্বামীজীর শিল্পদৃষ্টি ঐ শিল্পকে সর্বোচ্চ নমস্কার জানাতে পারেনি। তাঁর কাছে সেই ছিল শ্রেষ্ঠ শিল্প, যা স্বাভাবিকতা বজায় রেখেও সর্বাধিক ভাবপ্রকাশ করতে সমর্থ এবং যেহেতু আধ্যাত্মিকতাই তাঁর কাছে ভাবের শিখর, তাই—আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশে সমর্থ শিল্পই সর্বোচ্চ শিল্প। সুতরাং রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি বলতে পেরেছিলেন: 'পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্প-সৌন্দর্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদশাদের সময়েও ঐ বিদ্যার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই বিদ্যার কীর্তিস্তম্ভরূপে আজও তাজমহল, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'মানুষ যে জিনিসটি তৈরী করে, তাতে কোন একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। যাতে idea-র expression (ভাবের প্রকাশ) নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art (শিল্প) বলা যায় না।... যে জাতটা বড় materialistic (জড়বাদী), তারা nature (প্রকৃতি)-টাকেই ideal (আদর্শ) বলে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের expression (বিকাশ) শিল্পে দিতে চেষ্টা

৭০। তদেব

করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাবপ্রাপ্তিকেই ideal (আদর্শ) বলে ধরে, সেটা ঐ ভাবই nature-এর (প্রকৃতিগত) শক্তিসহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতের nature (প্রকৃতি)-ই হচ্ছে primary basis of art (শিল্পের মূল ভিত্তি); আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর Ideality (প্রকৃতির অতীত একটা ভাব) হচ্ছে শিল্পবিকাশের মূল কারণ। ঐরূপে দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধরে শিল্পচর্চায় অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দাঁড়িয়েছে, উভয়েই নিজ নিজ ভাবে শিল্পোন্নতি করছে। ও-সব দেশের এক একটা ছবি দেখে আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য-বিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক-একটি মূর্তি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে।'[৭১]

পাশ্চাত্যের তুলনায় আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশে ভারতীয় শিল্পের সাফল্য সম্বন্ধে স্বামীজী প্রিয়নাথ সিংহকে বলেছিলেন: 'গ্রীকরা কখনই যীশুর অন্তর্জীবনের রহস্য অনুধাবন করেনি। তা যদি করত তাহলে কখনই তাঁকে অমন পেশীযুক্ত করে দেখাতে পারত না। উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন মানুষের শরীর কখনই পেশল হয় না। এক্ষেত্রে বুদ্ধমূর্তির বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। কোন জাতির শিল্প পরীক্ষা করলেই তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীকজাতি যে কখন উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উঠেছিল শিল্পে তার সামান্য পরিচয়ও নেই। অপর পক্ষে, ভারতীয় শিল্প শুধু আধ্যাত্মিক ভাবের অনুসরণ করে বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে ক্রমে অধঃপতিত হয়েছে।'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পসংস্কৃতির পার্থক্যবিচারে স্বামীজীর প্রতিভার ঝলক বারে বারে দেখা গেছে। নিবেদিতার স্মৃতিকথা থেকে তেমনি একটি প্রদীপ্ত অথচ সুগভীর বিবরণ উদ্ধৃত করা যায়। নিবেদিতা লিখেছেন: আমাদের অর্থাৎ খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত 'যন্ত্রণাপূজা'র সম্বন্ধে স্বামীজীর ঘৃণাপূর্ণ মনোভাবের ভিতর থেকে ফুটে বেরিয়েছে ভারতীয়দের স্বচ্ছ চিন্তার রূপ। পাশ্চাত্যে অনেকে তাঁকে বলেছিলেন, বুদ্ধের মহিমার আবেদন অনেক বেশী হত যদি তিনি ক্রুশবিদ্ধ হতেন। এটাকে 'রোমক পাশবিকতা' বলে চিহ্নিত করতে তাঁর কোন দ্বিধাই ছিল না। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, চমকপ্রদ ঘটনার বা কর্মচাঞ্চল্যের প্রতি ঐ হল সর্বনিম্নস্তরের অতিজান্তব পক্ষপাত। ঐজন্যই পৃথিবীর মানুষ এপিক কাব্যকে সর্বদা অত ভালবাসে। ভারতের সৌভাগ্য, সে 'খাড়া গভীর অন্ধ গহ্বরে হেঁটমুণ্ডে নিক্ষিপ্ত'-বিষয়ের কবি মিলটনকে কদাপি সৃষ্টি করেনি। ঐ গোটা কাব্যটার বদলে ব্রাউনিং-এর কয়েকটি লাইনও যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ। স্বামীজীর মতে, খ্রীষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ারূপ ঘটনার এপিক উগ্রশক্তিই রোমকদের মনকে নাড়া দিয়েছিল—রোমান জগতে খ্রীষ্টধর্মকে ঐ ঘটনাই বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। 'ঠিক! ঠিক!' তিনি যোগ করে দিলেন, 'পাশ্চাত্যের লোক, তোমরা চাও অ্যাকশন্—তোমরা জীবনের প্রতিটি সাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে যে কবিত্ব রয়েছে, তাকে বুঝতে চাও না! তরুণী-মাতা তাঁর মৃত সন্তানকে নিয়ে বুদ্ধের কাছে এসেছিলেন, সেই ঘটনার থেকে বেশী সৌন্দর্য

৭১। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৮৬-৮৯

আর কোন্ ঘটনায় সম্ভব? কিংবা বুদ্ধ-কর্তৃক ছাগশিশুর জীবনরক্ষার ঘটনাটি। দেখ, বুদ্ধের সংসারত্যাগের বিরাট ঘটনাটি ভারতের কাছে কিছু অভিনব নয়। গৌতম ছোট একটি রাজ্যের রাজার ছেলে—অমন সম্পদ আগে অনেকবার অনেকে ত্যাগ করে গেছেন। কিন্তু নির্বাণের পর? —কী কবিত্ব তখন—

বর্ষণমুখর রাত্রি; এক গোপের কুটিরে এসে ছাঁচের নীচে দেওয়ালের গা ঘেঁষে তিনি (বুদ্ধ) দাঁড়িয়েছিলেন; অবিরল জল পড়ছে, ক্রমেই প্রবল হচ্ছে বায়ু।

'ভিতর থেকে গোপ জানালা দিয়ে চকিতে একটি মুখ দেখতে পেল; মনে মনে বলল: হাঃ হাঃ গেরুয়াধারী! বটে! ওখানেই থাক তাহলে, তোমার পক্ষে ওটাই যথেষ্ট ভাল ঠাঁই। তারপর সেই গোপ গাইতে লাগল: আমার গোরুবাছুর ঘরে উঠেছে, এখানে আগুন জ্বলছে ভালভাবে, আমার পত্নী নিরাপদ, সুখে ঘুমোচ্ছে বাচ্চারা। সুতরাং হে মেঘগণ, আজ রাত্রে স্বচ্ছন্দে তোমরা বর্ষণ করতে পার।

'বুদ্ধ বাইরে থেকে উত্তর দিলেন: মন আমার সংযত, ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যাহৃত, হৃদয় আমার দৃঢ়, সুতরাং হে মেঘগণ, আজ রাত্রে স্বচ্ছন্দে তোমরা বর্ষণ করতে পার।

'গোপ আবার গাইল: ক্ষেতের ফসল কাটা হয়েছে, খড়গুলি খামারে ভালভাবে রাখা আছে, নদীতে ভরা জল, পথগুলি বেশ শক্ত। সুতরাং হে মেঘগণ, আজ রাত্রে স্বচ্ছন্দে তোমরা বর্ষণ করতে পার।

'এইভাবে চলতে লাগল। অবশেষে গোপ বিস্ময়ে ও অনুতাপে উঠে পড়ে তাঁর কাছে গিয়ে শিষ্যত্ব নিল।'[৭২]

স্বামীজীর সমকালে ও কিছু পূর্বকালে কলকাতার শিল্পপ্রয়াস: বিভিন্ন আর্ট স্কুল

আধুনিক ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনকে স্বামীজী তার আত্মমর্যাদার ভিত্তি দিলেন, দেখতে পেলাম। তারও বড় কথা, এই শিল্পের প্রাণসত্য উদ্ঘাটিত করলেন—সেইসঙ্গে নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, সকল শিল্পের প্রাণসত্যকেই। অতঃপর আমরা দেখব, স্বামীজীর খুলে-দেওয়া পথ দিয়েই নিবেদিতা, ওকাকুরা, হ্যাভেল, কুমারস্বামী, অরবিন্দ, উডরফ প্রভৃতি সকলেই চলেছেন। এঁরা যদি স্বামীজীর দ্বারা প্রত্যক্ষে চালিত নাও হন ক্ষতি নেই, আমাদের পক্ষে এটুকু সংবাদই প্রয়োজনীয়, স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত পথে এঁরা এগিয়েছিলেন।

ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের পক্ষে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ স্বামীজী করলেন তা হল—তিনি ভ্রান্ত আদর্শ নিবারণ করলেন; ভারতীয় শিল্পচেষ্টা তখন যে-পথে চলেছিল, কঠোরভাবে তার সমালোচনা করলেন। সেই সমালোচনা তৎকালীন পরিবেশে আকস্মিক, বিস্ময়কর এবং বোধহয় বিরক্তিকর ঠেকেছিল।

আমি স্বামীজী কর্তৃক রবিবর্মার সমালোচনার কথাই বলতে চাইছি।

৭২। The Master as I saw him—Sister Nivedita, Udbodhan Office, Calcutta, Twelfth Edition (1977), pp. 219-20

কলকাতায় শিল্পচেষ্টা এই কালে ও কিছু পূর্বকালে কোন্ পথে চলেছিল, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া যায়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ইতিহাস প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তার মধ্যে প্রয়োজনীয় বহু সংবাদ রয়েছে।[৭৩] ২৯ জুন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার আগেই কলকাতায় শিল্পচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। প্রধানত ইউরেশিয়ান তরুণদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'দি মেকানিক্স ইনস্টিটিউট', যেখানে 'মেকানিক্যাল'-শিল্পশিক্ষা দেওয়া হত। এই প্রতিষ্ঠান বেশীদিন বাঁচেনি। কিন্তু তারপর 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'-এর উন্নতির জন্য ইউরোপীয় ও দেশীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রবর্তিত 'দি স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' নামক যে প্রতিষ্ঠান ১৬ আগস্ট ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রারম্ভ করেছিল—সে প্রতিষ্ঠান নামান্তর গ্রহণ করে আজও জীবিত আছে। গরাণহাটার এই বেসরকারী ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্কুলটিতে স্বভাবতই ক্লে-মডেলিং এবং এনগ্রেভিং-এর উপর বেশী জোর দেওয়া হত। এখানকার ছাত্ররা এইসব কাজে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর এই বিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক সভায় সভাপতিরূপে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার আর্থার ডব্লিউ বুলার সবিশেষ প্রশংসা করে যেকথা বলেছিলেন, তার মধ্যেই ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তৎকালীন বিদেশীয় সহানুভূতিশীলদের দৃষ্টিভঙ্গির ও ধারণার সঙ্কীর্ণতা ধরা পড়ে। তিনি এই আশা প্রকাশ করেছিলেন: 'কিছু সুযোগ পেলেই এই স্কুলের ছাত্ররা শীঘ্রই চারু ও কারুশিল্প সম্বন্ধে তাদের স্বাভাবিক রুচি ও প্রীতির যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারবে এবং কুতুবমিনার, তাজমহল ও মসলিনের দেশের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে।'

এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটি ২৯ জুন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং মিঃ এইচ. এইচ. লক এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। লকের প্রেরণাপূর্ণ নেতৃত্ব এবং কর্মক্ষমতা বিদ্যালয়টির বিশেষ উন্নতি ঘটিয়েছিল। বাঙালী শিল্পীরা 'উত্তম নকলকারী' ছাড়া আর কিছু নয়—তৎকালীন ইউরোপীয় মহলে বলবৎ এই ধারণার বিপরীত ধারণা মিঃ লকের ছিল বলেই তিনি বহু ভাবে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে পেরেছিলেন। স্কুলের ছাত্ররা নানা প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার পেয়েছিল। তারা সরকারী ও বেসরকারী প্রয়োজনে নানা শিল্পকাজ করেছিল, যেমন এশিয়াটিক সোসাইটির কাজ, সরকারী ভবনের বা গির্জার অভ্যন্তরভাগ অলঙ্করণের কাজ, উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের চিত্রাঙ্কনের কাজ। এরা সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থ চিত্রিতকরণের কাজও করেছিল।

ঐকালের শিল্পীদের মধ্যে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। প্রিন্সিপ্যাল লক অন্নদাপ্রসাদের প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ ছিলেন। অন্যরাও করেছেন।*

৭৩। 'History of the Govt. College of Art and Craft' শীর্ষক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল 'Government College of Art and Craft, Calcutta' নামক স্মারক গ্রন্থে এই তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

* শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অন্নদা বাগচীর সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল। বাগচী ২৭ অক্টোবর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামপুকুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন: 'বেলা দুইটা...শিকদারপাড়ার প্রসিদ্ধ চিত্রকর বাগচী আসিয়াছেন।

এই সমস্ত শিল্পসৃষ্টিতে কিন্তু ভারতীয়তা বা মৌলিকতার পরিচয় একেবারেই ছিল না। গোটা ব্যাপারটাই ছিল নকলনবিশি—হয় বিষয়ের, নয় রীতির। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যে শিল্পচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল তা ঐ প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে এবং পরাধীনের হীনম্মন্যতাকে কাটিয়ে সৃষ্টিশীলতার পথে অগ্রসর হতে পারেনি। আর্ট গ্যালারির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। উদ্দেশ্য ছিল—ঐ গ্যালারিতে অতীত ও বর্তমানের ইউরোপের মানুষ ও বস্তুর ছবি ভারতীয়দের চোখের সামনে তুলে ধরা হবে, যাতে তারা ইউরোপীয় নকলপদ্ধতি শিখে নিয়ে নিজেদের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, মনুষ্যজীবন ও স্থাপত্যকীর্তিগুলিকে এঁকে তুলতে পারে। আসলে কিন্তু ভারতীয় কোন কিছু এই শিল্পশিক্ষার কাছাকাছি ছিল না। এবং পরে যখন ভারতীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়, তখন শিক্ষার্থীরা পাশ্চাত্য মোহাচ্ছন্নতার কারণে কিংবা আর্থিক ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কায়, ভারতীয় পদ্ধতির প্রতি নিতান্ত বিতৃষ্ণা দেখিয়েছিল। ১৮৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঠ্যসূচীর মধ্যে খাঁটি ভারতীয় আলঙ্কারিক পদ্ধতিতে ফ্রেস্কো আঁকা শেখানোর ব্যবস্থা করা হলে, ছাত্রদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গিলার্ডি তাঁর ১৮৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে বলেছেন ঃ 'The late Mr. Schaumburg pointed out to me the necessity of reinstating Indian decorative art in its original brilliancy, but both he and myself were fully aware that we should have been undertaking a task beyond our power for this reason that we should have found in the native students themselves the chief and the strongest opposition to our efforts. It is for this reason that our newly established fresco-painting class numbers only eight students.'

ভারতীয় ছাত্রদের ভারতীয় পদ্ধতি শেখানো যখন গিলার্ডি ও স্কামবার্গ অসম্ভব কাজ মনে করেছিলেন, তখন তাকে 'সম্ভব' করতে অবশ্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও দুর্ধর্ষ সাহসের প্রয়োজন ছিল—তা দেখিয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পশিক্ষা-ইতিহাসের ঐতিহাসিক পুরুষ ই.বি. হ্যাভেল। হ্যাভেলের ছিল সহজাত শিল্পবোধ; সন্ধান ও চর্চার ফলে তিনি লাভ করেছিলেন ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বাসনাময় ভালবাসা; আর উলটোদিকে দেখেছিলেন, কলকাতার আর্ট স্কুলে অনুসৃত হচ্ছে 'ইংরেজদের প্রাদেশিক শিল্পের চল্লিশ বছরের পুরানো, জঘন্য এক ঐতিহ্যরীতি'। পরাধীন দেশের মানুষকে আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দিতে এবং শিল্প যে জাতীয় সৌন্দর্যবোধের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, এই স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু অস্বীকৃত সত্যটিকে শেখাতে হ্যাভেলকে কঠিন হতে হয়েছিল—নির্মম হাতে পরিষ্কার করতে হয়েছিল ভ্রান্ত রীতি ও ভ্রান্ত নমুনার আবর্জনাকে—যে-ধরনের বৈদ্যুতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেই হয় রোগীর মতিচ্ছন্নতার সময়ে।

কয়েকখানি চিত্র ঠাকুরকে উপহার দিলেন। ঠাকুর আনন্দের সহিত পট দেখিতেছেন। ষড়ভুজ মূর্তি দর্শন করিয়া ভক্তদের বলিতেছেন—"দ্যাখো, দ্যাখো, কেমন হয়েছে!" ভক্তদের আবার দেখাইবার জন্য "অহল্যা পাষাণীর পট" আনিতে বলিলেন। পটে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বাগচীর মেয়েদের মতো লম্বা চুল।' [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ—শ্রীম-কথিত, শ্রীম-এর ঠাকুরবাটী, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃঃ ২৭৩]

হ্যাভেলের সংস্কারচেষ্টার বেশ কিছু বছর আগেই কিন্তু ভারতীয় শিল্পজগতে নতুন তরঙ্গের উদয় হয়েছিল এবং তা এসেছিল ভারতীয় জাতীয়তার ছদ্মবেশ নিয়েই; ভারতবর্ষের চতুর্দিকে ধন্য ধন্য রব উঠেছিল সেই পৌরাণিক নাটকের একালীন চিত্রাভিনয় দেখে; রবিবর্মা অচিরে স্বীকৃত হয়েছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী বলে। হাঁ, রবিবর্মাই নতুন আন্দোলন এনেছিলেন।

বিবেকানন্দ কর্তৃক রবিবর্মার সমালোচনা

যেকালের কথা আমরা বলছি, সেসময়ে স্বামী বিবেকানন্দ ভিন্ন রবিবর্মার ছবির স্থূলতার কথা আর কেউ ভেবেছিলেন বা বলেছিলেন কিনা আমরা এখনও জানি না। রবিবর্মা সম্বন্ধে স্বামীজীর অশ্রদ্ধাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বিখ্যাত একটি উক্তি আছে—যার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে দশ বছরের মধ্যে বাংলা বা ভারতের শিল্পালোচনা পূর্ণ হয়ে যাবে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে স্বামীজী রবিবর্মা সম্বন্ধে সেকালের হিসাবে যে দুঃসাহসিক উক্তি করেছিলেন, তা এই : '...ওদের (ইউরোপীদের) নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়!! তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পোটো ভাল—তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়!! বরং জয়পুরে সোনালী চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।'[১৪]

নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক উক্তি। তৎকালীন শিল্পধারণার একেবারে বিপরীত প্রান্তে স্বামীজী দাঁড়িয়ে আছেন। পটচিত্র ও রাজপুতচিত্র তাঁর কাছে রবিবর্মার নকলনবিশির চেয়ে অনেক ভাল বলে মনে হয়েছিল এবং দেশীয় ছবির বর্ণরাগের প্রশংসা পর্যন্ত তিনি করেছেন। বাংলার শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রে জানেন—স্বামীজীর ধারণাকে কিছু পরিমাণে অঙ্গীকার করেই নতুন ধারার যাত্রা শুরু হয়েছিল।

স্বামীজী রবিবর্মার মূল ছবির সঙ্গে সাক্ষাতে পরিচিত ছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি নিশ্চয়ই বিভিন্ন দেশীয় রাজাদের সভায়, যেমন ত্রিবাঙ্কুরে বা মহীশূরে রবিবর্মার ছবি দেখেছিলেন, অন্তত বরোদায় রবিবর্মার বিখ্যাত রামায়ণ-মহাভারত সিরিজ দেখেছিলেন, তা জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসকে বরোদা থেকে লেখা ২৬ এপ্রিল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের চিঠিতে দেখা যায় : আমি লাইব্রেরী ও রবিবর্মার ছবি দেখেছি; এখানে দেখবার মতো এ-ই তো আছে।'[১৫]

রবিবর্মার ছবি 'দেখবার মতো' এই কথার অর্থ নয় যে, তা সমর্থনের যোগ্য। এরই মধ্যে যে তিনি রবিবর্মার ছবির কঠোর সমালোচক হয়ে উঠেছেন, সে-বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ডক্টর দত্ত, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের কাছ থেকে স্বয়ং শুনেছেন, মহারাষ্ট্রে পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী যখন স্থানীয় এক ব্যারিস্টারের বাড়িতে ছিলেন তখন তিনি রবিবর্মার ছবির ত্রুটির রূপ আলোচনা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

১৪। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১৫

১৫। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VIII, p. 286

যাঁর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল, তিনি অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর এই ধরনের কথা শুনে অবাক। ভারতবিখ্যাত শিল্পীর সমালোচনা করছেন এক অপরিচিত সন্ন্যাসী! গৃহস্বামী অবশ্য উক্ত ব্যক্তিকে সমঝে জানিয়েছিলেন—সন্ন্যাসী শিল্পতত্ত্বে কতখানি পারঙ্গম।

স্বামীজী কর্তৃক সমকালীন ভারতীয় শিল্পে পরানুকরণের সমালোচনা

শিল্পের ক্ষেত্রে 'পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষার' কঠোর সমালোচনা স্বামীজী বহুভাবে করেছেন। বিশেষ করে যখন তিনি দেখেছিলেন, শিল্পশিক্ষার্থী ভারতীয়রা সেই দেশের ছবির নকল করতে চাইছে, যেদেশ ইউরোপের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শিল্পের দেশ বলে অবজ্ঞাত। স্বামীজীর শিল্পিবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ যখন বলেছিলেন, সাহেবদের (ইংরেজদের) তো art বেশ, তখন স্বামীজী ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেনঃ দূর মূর্খ; আর তোরেই বা গাল দিই কেন? দেশের দশাই এমনি হয়েছে। দেশসুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ্, আর পরের রাঙ্টাকে সোনা দেখছে। স্বামীজীর মতে, ইংরেজদের জীবনের মূল কথা ইউটিলিটি। তাদের বাড়িঘর, পোশাক, সব রূপহীন। তিনি বলেছিলেনঃ সাহেবদের ইউটিলিটি আর আমাদের আর্ট। ইংরেজদের স্থাপত্যের এবং পোশাকের উল্লেখ করে প্রশ্ন করেছিলেনঃ ওদের জল খাবার গ্লাস আর আমাদের ঘটি—কোনটায় আর্ট আছে? কিন্তু যেহেতু এযুগে ইউটিলিটিকে বর্জন করা সম্ভব নয়, তাই বলেছিলেনঃ এখন চাই আর্ট এবং ইউটিলিটির সংযোগ, যেটা জাপান চট করে করতে পেরেছে এবং সেজন্যই দ্রুত উন্নতিলাভ করেছে।[৭৬]

জীবজন্তু আর ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকে এঁকেই গেল যে ইংরেজ, তার শিল্পবোধ সম্বন্ধে রীতিমতো কঠিন ভাষাতেই স্বামীজী কথা বলেছেন, যদিও তাদের কাব্য নাটক সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিলঃ 'The Anglo-Saxon people have always been badly fitted for art. They have good poetry—for instance, how wonderful is the blank verse of Shakespeare.'[৭৭]

ভারতীয় গণজীবনের শিল্প সম্বন্ধে এবং প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য

শিল্পবিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্যের আর একটি মূল্যবান অংশের উল্লেখ এখানে করে নিতে হয়, যার কথা ইংরেজ ও ভারতীয়ের শিল্পবোধের তুলনাপ্রসঙ্গে এসে গিয়েছিল। শিল্পকে স্বামীজী যেহেতু কেবল কতকগুলি মানুষের ব্যক্তিগত আকৃতির প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখতে চাননি, সমগ্র জাতীয় জীবনের সঙ্গে ঐ শিল্পবোধের সম্পর্ক দেখতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি ভারতবাসীর সাধারণ জীবনযাত্রার রূপচ্ছন্দের দিকে তাকিয়ে যথার্থ গৌরবের কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন। ভারতীয় বা এশিয়াবাসীর সভ্যতার এক

৭৬। ibid., Vol. V, p. 374 ৭৭। ibid., Vol. IV, p. 196

বিশেষ মহিমা—শিল্প তাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি। জাপানের প্রশংসা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন ঃ 'ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে Asiatic (এশিয়াবাসী)। আমাদের দেখছিস না সব গেছে, তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। কোন বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে, আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। যে-মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিজে একজন কত বড় Artist (শিল্পী) ছিলেন!'[৭৮]

গণশিল্পের প্রতি স্বামীজীর আকর্ষণের পিছনে রয়েছে তাঁর এই মৌলপ্রত্যয়—জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-শিল্প, অর্থসম্পদ কোন কিছুই বিশেষ গোষ্ঠীর ভোগের বস্তু হওয়া উচিত নয়। কোন সভ্যতার মহিমা কিছুসংখ্যক সর্বোচ্চশ্রেণীর মানুষকে সৃষ্টি করার উপরে নির্ভর করে না, বহুসংখ্যক উন্নত মানুষ সৃষ্টি করার উপরই তা নির্ভরশীল। শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের সর্বপর্যায়ে না পারুক, শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজের বৃহত্তর অংশকে স্পর্শ করতে ভারতবর্ষ পেরেছিল। ইংরেজ-আমলে স্বামীজী তথাকথিত গণতন্ত্রের আড়ম্বরের মধ্যে কিন্তু গোষ্ঠী-অধিকার কায়েম করার চেষ্টাই দেখেছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে অনুস্যূত জাতীয় শিল্পচেতনার পরিবর্তে পাশ্চাত্যশিক্ষা যে-ধরনের স্থূল ভোগের স্বার্থপরতা এনেছিল, স্বামীজী তা দেখে শিউরে উঠেছিলেন। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ 'বিশেষ দুর্দশা হয়েছে (বাংলাদেশের) শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোর আলপনা দিত, দেয়ালে চিত্রবিচিত্র করত। বাহার করে কলাপাতা কাটত, খাওয়া-দাওয়া নানাপ্রকার শিল্প-চাতুরীতে সাজাত, সে সব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র!! নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরানোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে না কি? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি!! কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনও দূর পাড়াগাঁয়ে পুরানো কাঠের কাজ, ইটের কাজ দেখে এসোগে। কলকেতার ছুতোর এক জোড়া দোর পর্যন্ত গড়তে পারে না! দোর কি আগড় বোঝবার জো নেই!!! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতী যন্ত্র কেনা!!'[৭৯]

মিসেস ওলি বুলকে স্বামীজী ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের এক চিঠিতে গ্রামবাংলার একটি শিল্পসৌন্দর্যময় খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ দেখে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। গ্রামটি নিঃসন্দেহে আঁটপুর, যা ইদানীন্তনকালে শিল্পরসিক বাঙালীর কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। স্বামীজী বলেছিলেন ঃ আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলাচালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্যের নিদর্শন। হায়! আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো ঘরগুলোরও নাম 'বাংলো'।[৮০]

'প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তি যখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তার সঙ্গে অতিথি-আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরী করতেন। সে শিল্প লুপ্ত হতে চলেছে। নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাঁচে তৈরী করে দিতে পারতাম! তবে এখনও

৭৮। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪০৬ ৭৯। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১৪

৮০। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, p. 173

যেকটি অবশিষ্ট আছে, তা-ই দেখে রাখা ভাল, অন্তত একটিও।'[৮১]

পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে স্বামীজীর যে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল সে-বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই প্রসঙ্গে অবশ্যই তুলে ধরা যায়। মিস ম্যাকলাউডের বন্ধু জাপানী শিল্পশাস্ত্রী ওকাকুরা স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্য ভারতে এসেছিলেন এবং গোড়ায় বেলুড় মঠে স্বামীজীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ছিলেন। চীন, জাপান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিল্পবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ওকাকুরা ঐসকলের উৎসভূমি ভারতের শিল্প সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে চেয়েছিলেন এবং সৌভাগ্যের বিষয়, একেবারে সূচনায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল উজ্জ্বল দৃষ্টির আলোক লাভ করেছিলেন। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্কের বিষয়ে যথেষ্ট সংবাদ আছে। স্বামীজীর গুরুভাই নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গে ওকাকুরা প্রথম ভারতের শিল্পতীর্থগুলি ঘুরে দেখেছিলেন। স্বামীজীর কাছ থেকে ওকাকুরা অবশ্যই ভারতীয় শিল্পের প্রাণ-ধর্মের কথা জেনেছিলেন, উলটোপক্ষে স্বামীজীও নিশ্চয় ওকাকুরার মতো বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জাপানের ও প্রাচ্যদেশের শিল্প কতখানি ভারতীয়, তা শুনে পুলকিত হয়েছিলেন। তার দ্বারা স্বামীজীর পুরাতন ধারণাই সমর্থিত হয়েছিল। শিল্পে এশিয়া এক—এই বক্তব্য যতখানি ওকাকুরার,

৮১। ibid. ; আঁটপুর স্বামী প্রেমানন্দের গ্রাম। স্বামীজী বহুবার এখানে এসেছেন, এবং রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রে জানেন, এই গ্রামটির কতখানি ঐতিহাসিক মূল্য। এখানেই ১৮৮৬ ডিসেম্বর, বড়দিনের রাত্রে নরেন্দ্রনাথ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্য আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস নেবার সিদ্ধান্ত করেন।

আঁটপুরের আটচালা এবং মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'দেখা হয় নাই' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। আঁটপুর নিয়ে আলোচনা আগে অনেকবার হলেও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিশেষ মূল্য এইখানে—পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্য-ভাস্কর্য সম্বন্ধে এতখানি প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা খুব কম মানুষেরই আছে। 'সরেজমিনে পশ্চিমবাংলার কয়েক হাজার মন্দির-মসজিদ ও অন্যান্য পুরাকীর্তি পর্যবেক্ষণ করার দুর্লভ সৌভাগ্য' তাঁর হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন, আঁটপুরের 'বিখ্যাত টেরাকোটা মন্দির ও বাঁশ-কাঠ-খড়ের চণ্ডীমণ্ডপটি...পোড়ামাটির অলঙ্করণ ও কাঠখোদায়ের উৎকর্ষের দিক দিয়ে...পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি তাতে সন্দেহমাত্র নেই'। মন্দিরের পোড়ামাটির কাজের বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তঃ 'টেরাকোটা ভাস্কর্যের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের এ-জাতীয় দেবালয়ের মধ্যে (এটি) সর্বোচ্চ।' চণ্ডীমণ্ডপটি সম্বন্ধে বক্তব্যঃ 'চণ্ডীমণ্ডপটির কাঠের কারুকার্যও এত অপরূপ যে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। কাঠ-খড় দিয়ে দেবগৃহ নির্মাণের এই বিশিষ্ট রীতিটির নিদর্শন এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে বলে আঁটপুর এ-বিষয়েও প্রায় অনন্য।' চণ্ডীমণ্ডপটির গঠনশৈলী আলোচনা-মধ্যে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেনঃ 'চালের ভারবাহী গোটা কাঠামোকে জোরদার করবার জন্য প্রধান জোড়গুলি অপরূপ কারুকার্যে মণ্ডিত। বরগা ও খুঁটিগুলির সর্বাঙ্গে ফুলকারি বা অনুরূপ নকাশি কাজ। এই উচ্চস্তরের কারুকৃতি যে অসংখ্য সুদক্ষ দারুশিল্পীর দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল, সেকথা বলাই বাহুল্য।... চণ্ডীমণ্ডপের দৃষ্টিকটু খড়ের চাল নীচ থেকে যাতে না দেখা যায়, সেজন্য ছাদের ভিতরের দিক ময়ূর-পালকের শাদা ডাঁটি অথবা রঙে ছাপানো শরকাটি বা বেতের চিলতে দিয়ে একেবারে ঢেকে দেওয়াই সাবেক রীতি ছিল। রঙিন কাঠির টানাপোড়েনে নানারকম জ্যামিতিক বা ফুলকারি নক্সার সৃষ্টি করা হত, যার নাম ছিল "রূপসী কাজ"। এ-জাতীয় চারুশিল্পের অক্ষত নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও আছে কিনা জানি না।' শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেনঃ 'বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেকালের "সূত্রধর" পদবীর শিল্পীরা...একাধারে কাঠখোদাই ও টেরাকোটা অলঙ্করণের কাজ করতেন।' আলোচ্য চণ্ডীমণ্ডপটির ইতিহাস আলোচনা করে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—চণ্ডীমণ্ডপটি ২৮৮ বৎসরের পুরাতন।

ঠিক ততখানি বা ততোধিক পরিমাণে বিবেকানন্দের সেইসঙ্গে নিবেদিতার। ওকাকুরার 'আইডিয়ালস অব দি ইস্ট' গ্রন্থের ভাষাতেই কেবল নয়, বক্তব্যেও যে নিবেদিতার প্রচুর হস্তক্ষেপ রয়েছে, তার পক্ষে বহু প্রমাণ আছে।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, ওকাকুরা বাংলার শিল্প-আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, একথা সংশ্লিষ্ট সকলেই স্বীকার করেন।

ভারতশিল্প সম্বন্ধে ওকাকুরাকে স্বামীজী কতখানি অবহিত করেছিলেন, তার অতি সামান্য সংবাদ এখন আমরা পেতে পারি। মিসেস বুলকে লেখা স্বামীজীর পূর্বে-উল্লিখিত ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের চিঠি দেখিয়ে দেয়—স্বামীজীর শিল্পশিক্ষা কতখানি ব্যাপক ছিল ঃ ছোটখাট একটু ভ্রমণে মিঃ ওকাকুরা বেরিয়ে পড়েছেন—আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা, ইলোরা, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর এবং দিল্লী দেখার অভিপ্রায় নিয়ে।

বারাণসীর এক সুশিক্ষিত ধনী যুবা—যার পিতার সঙ্গে আমার দীর্ঘ বন্ধুত্ব ছিল—গতকাল এই শহরে এসেছে। কলাশিল্প সম্বন্ধে সে বিশেষ আগ্রহী। লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার বিশেষ উদ্দেশ্যে সে অকাতরে অর্থব্যয় করছে। মিঃ ওকাকুরা চলে যাওয়ার মাত্র কয়েকঘণ্টা পরে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এই যুবকই ওকাকুরাকে শিল্পভারত (যতটুকু অবশিষ্ট আছে) দেখাবার একেবারে ঠিক লোক। আর আমার বিশ্বাস সে ওকাকুরার কথা শুনে খুবই উপকৃত হবে। ওকাকুরা সদ্য এখানে ভৃত্যরা ব্যবহার করে, এমন একটি পোড়ামাটির জলপাত্র দেখেছেন। সেটির আকার এবং তার উপরে খোদাই কাজ দেখে তিনি একেবারে চমৎকৃত। কিন্তু এটি সাধারণ মৃৎপাত্র—পথের ধকল সহ্য করে টিকে থাকতে পারবে না। ওকাকুরা তাই এর একটি পিতলের নকল তৈরী করিয়ে দেবার অনুরোধ করে গেছেন। কি করি ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না। তার কয়েকঘণ্টা পরে যুবক-বন্ধুটি এসে হাজির। এই কাজের ভার নিতে সে যে কেবল রাজি তা-ই নয়, সেইসঙ্গে বলেছে, ওকাকুরার পছন্দের ঐ পোড়ামাটির কাজের চেয়ে হাজারগুণ ভাল কারুকার্য করা শত শত পোড়ামাটির পাত্র সে দেখাতে পারে।

সেই পুরাতন অপূর্ব শৈলীতে আঁকা পুরাতন চিত্রাবলীও সে দেখাবে বলেছে। পুরনো শৈলীতে এখনও আঁকতে পারে, এমন একটিমাত্র পরিবার বারাণসীতে টিকে আছে। ঐ পরিবারের একজন একটি মটরদানার উপরে গোটা মৃগয়ার দৃশ্য এঁকেছে—খুঁটিনাটি বিবরণ আর অ্যাকশনের নিখুঁত ছবি।

আশা করি ওকাকুরা ভ্রমণ শেষ করে শহরে ফিরে এই ভদ্রলোকের অতিথি হবেন এবং অবশিষ্ট শিল্পনিদর্শনগুলির কিছু নমুনা দেখে নেবেন।

নিরঞ্জন মিঃ ওকাকুরার সঙ্গে গিয়েছে। ওকাকুরা জাপানী বলে তাঁর কোন মন্দিরে ঢোকায় আপত্তি করা হয়নি। মনে হয়, তিব্বতী ও অন্য উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণ বরাবরই শিবপূজার উদ্দেশ্যে এখানে আসছেন। মন্দিরে ওকাকুরাকে শিবপ্রতীক স্পর্শ করতে ও পূজা করতে পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।[৮২]

৮২। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, pp. 173-74

স্বামীজীর এই চিঠিটি কয়েকটি কারণে মূল্যবান। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীর শিল্পবিষয়ে বিনিময়ের সংবাদ তো এর মধ্যে আছেই, অধিকন্তু আছে, মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলা সম্বন্ধে স্বামীজীর মুগ্ধ মনোভাবের পরিচয়। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর যেসব বক্তব্য ইতিমধ্যে উপস্থিত করেছি, তার মধ্যে পাঠক লক্ষ্য করেছেন, চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বক্তব্য প্রায় নেই—সবই প্রায় স্থাপত্য-ভাস্কর্য নিয়ে। বিস্ময়ের কথা, অজন্তা-চিত্রাবলী সম্বন্ধে স্বামীজীর কোন কথা পাই না। তা কি অপরিচয়ের জন্য, তিনি কি গ্রিফিথের বই দেখেননি (লেডি হ্যারিংহামের বই অবশ্য আরও প্রায় দশ বছর পরে জন্ম নেবে), তিনি কি অজন্তার ছবি দেখে খুশি হননি (তা কি সম্ভব), কিংবা অপরপক্ষে অজন্তা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছিলেন, লিখিত হয়নি বলেই তার কথা আমরা জানি না? শেষোক্ত ধারণাই ঠিক বলে মনে হয়। আলোচ্য চিঠিতে কিন্তু মুঘল-রাজপুত চিত্রাবলী সম্বন্ধে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত অথচ সমুচ্চ প্রশংসাবাণী পাচ্ছি।

ভারতশিল্পের পতন সম্বন্ধে বিবেকানন্দ : রিয়ালিজম ও আইডিয়ালিজমের সমন্বয়ের প্রশ্ন : শিল্পের প্রাণধর্ম সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ বক্তব্য

শিল্পবিষয়ে স্বামীজীর যেসকল বক্তব্য তুলে ধরেছি এবং পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনে তাঁর পরোক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে যা বলেছি, তার থেকে কেউ যেন একথা ধরে না নেন—বাংলাদেশের পরবর্তী শিল্পসৃষ্টির সবটুকু স্বামীজীর পছন্দের আকার ধরে গড়ে উঠেছিল। শিল্পে ভাবের প্রকাশ হোক স্বামীজী চাইতেন, কিন্তু কিম্ভূতকিমাকার ভাব নিশ্চয় নয়। ভারতীয় শিল্প তার ভাবপ্রকাশের চেষ্টা ও সাফল্যের জন্য পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ, একথা তিনি বলেছেন দেখে এসেছি, কিন্তু ঐ প্রয়াসের অনভিপ্রেত পরিণতির রূপও নির্মমভাবে জানাতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। শিল্পের ক্ষেত্রে ভাব কখনও অশরীরী হতে পারে না, অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনরূপকে একেবারে অগ্রাহ্য করে সে বড় হয়ে উঠতে পারে না। স্বামীজী সবকিছুকে সহ্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন, যদি মূল প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। ভারতীয় শিল্পের প্রাণহীন আলঙ্কারিকতার বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর সমালোচনার কিছু অংশ এখানে উপস্থিত করতে চাইছি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় মাদ্রাজে 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য' নামক বক্তৃতায় হিন্দু ও গ্রীক শিল্পসংস্কৃতির তুলনা করার পরে তিনি বলেছিলেন, কোন জিনিসকে বহির্মুখভাবে দেখার জন্য গ্রীসের 'শ্রেণী বিভাগাত্মক বিজ্ঞান সমূহের (Sciences of Generalization) এবং অন্তর্মুখভাবে দেখার জন্য ভারতে বিশ্লেষণাত্মক বিজ্ঞান সমূহের (Analytical Sciences)' উদ্ভব হয়েছে। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির বাড়াবাড়িতে কি ফল হয়, তা স্বামীজী অতঃপর বলেছেন : 'তারপর যখন জাতীয় প্রাণশক্তি অবলুপ্ত হল—মুসলমানদের ভারতবিজয়ের দু-এক শতাব্দী আগেই সম্ভবত তা হয়েছিল—তখন ভারতের ঐ জাতিগত প্রবণতার এমন বাড়াবাড়ি প্রকাশ হতে লাগল যে, অবনতির সর্বশেষ লক্ষণ দেখা গেল। ভারতের শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সবকিছুতেই তার চিহ্ন দেখতে পাই। শিল্পের মধ্যে আর সেই ভাবের বিশালতা, কল্পনার উদারতা রইল না, রচনাশৈলীর সামঞ্জস্যপূর্ণ ছন্দও হারিয়ে

গেল—তার বদলে নিদারুণ আলঙ্কারিক বর্ণবহুল এক রীতির উদ্ভব হল। জাতির মৌলিকতা যেন অন্তর্ধান করল। গানের ক্ষেত্রে অবলুপ্ত হয়ে গেল প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতের হৃদয়োন্মাদী ভাব। আগে একটি সুর স্বতন্ত্রভাবে নিজের বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হত অথচ একই সঙ্গে অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করত—এখন কিন্তু সুরগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর বজায় রইল না। আমাদের সমগ্র আধুনিক সঙ্গীত নানাবিধ সুরের জগাখিচুড়ির মতো—মিশ্রসুরের বিশৃঙ্খল সমষ্টিমাত্র। সঙ্গীতের এই হল অধঃপতন। অন্যান্য ভাবধারণার ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সর্বত্র একই প্রকার আলঙ্কারিকতা এবং মৌলিকতার হানি। ভারতের নিজস্ব ক্ষেত্র ধর্ম—সেখানেও দেখা গেল অধঃপতনের চিহ্ন।'[৮৩]

এই বক্তব্যই অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তিনি 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধে কিছুদিনের মধ্যে লিখলেন। উপযুক্ত ভাবহীন অলঙ্কৃতি, তাঁর নিষ্ঠুর উপমায়—'হীরেমোতির সাজপরানো-ঘোড়ার উপরে বাঁদর-বসানো'র মতো কাণ্ড। দেশ উৎসন্নে গেলেই সমাস, শ্লেষ ও বিশেষণের বাড়াবাড়ি হয়। স্বামীজীর কথায় ওসব মড়ার লক্ষণ। 'যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।'[৮৪] স্বামীজী আরও বলেছেন ঃ 'ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়িটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি ; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা-পাতা চিত্র-বিচিত্রর কী ধুম !!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না ; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কী ধুম! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল—ছত্রিশ নাড়ির টান তায় রে বাপ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব!'[৮৫]

সুতরাং জীবনের বলিষ্ঠ প্রকাশ চাই-ই, যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক। স্বামীজীর একটি মৌখিক চিত্র-সমালোচনার বিবরণ দিয়েছেন প্রিয়নাথ সিংহ। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পাশ্চাত্য যাত্রার ঠিক আগে স্বামীজী একদিন কলকাতায় এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, তাঁর বন্ধু 'কৃষ্ণার্জুন সংবাদ'—এই বিষয়ের একটি ছবি আঁকিয়েছেন। ছবিতে কৃষ্ণ রথের ঘোড়ার লাগামহাতে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে গীতা বলছেন। ছবির মালিক ছবির সম্বন্ধে স্বামীজীর মত জানতে চাইলে তিনি গোড়ায় এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উক্ত বন্ধু 'দোষগুণ বিচার করে' বলতে জিদ করলে স্বামীজীকে অগত্যা বলতে হয়েছিল, 'কিছুই হয়নি'। কেন কিছু হয়নি, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি প্রথমত বলেছিলেন, কৃষ্ণের রথ আজকালকার 'প্যাগোডা রথ' ছিল না। প্রিয়নাথ সিংহ 'প্যাগোডা রথে'র ধারণায় বাস করতেন। সুতরাং তিনি স্বামীজীকে প্রশ্ন করলেন সবিস্ময়ে—প্যাগোডা রথ নয় কেন? উত্তরে স্বামীজীকে বলতে হল ঃ 'ওরে দেশে যে

৮৩। ibid., Vol. III, p. 270

৮৪। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৬ ৮৫। তদেব

বুদ্ধদেবের পর থেকে সব খিচুড়ি হয়ে গেছে। প্যাগোডা রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ করত না! রাজপুতানায় আজও রথ আছে, অনেকটা সেই সেকেলে রথের মতো। Grecian mythology-র ছবিতে যেসব রথ আঁকা আছে, দেখেছিস? দু-চাকার, পিছন দিয়ে ওঠা-নাবা যায়—সেই রথ আমাদের ছিল। একটা ছবি আঁকলেই কি হল? সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়েই সেই সময়ের জিনিসগুলো দিলে তবে ছবি দাঁড়ায়। Truth represent করা চাই, নইলে কিছুই হয় না, যত মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে—যাদের স্কুলে লেখাপড়া হল না, আমাদের দেশে তারাই যায় painting শিখতে। তাদের দ্বারা কি আর কোন ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করানো আর একখানা perfect drama লেখা, একই কথা।'[৮৬]

স্বামীজী, বলা বাহুল্য, ছবিকে ড্রামাটিক শিল্প করবার কথা বলেননি, তিনি নাটকের সর্বাঙ্গীণ ভাববিকাশ চেষ্টার দিকে লক্ষ্য করেই ঐকথা বলেছিলেন। প্রিয়নাথ সিংহ প্রশ্ন করেন, কৃষ্ণকে কিভাবে আঁকা উচিত? —তাতে স্বামীজী বলেনঃ 'শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস?—সমস্ত গীতাটা personified (মূর্তিমান)! যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলেছেন, তখন তার central idea (মুখ্যভাব)-টি

৮৬। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪১৩-১৪; শিল্পে বাস্তবতাই যখন অভিপ্রেত, তখন সে-সম্বন্ধে স্বামীজী কতখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থের মধ্যে তার একটি পরিচয় পাই। স্বামী সদাশিবানন্দ কথাসূত্রে জেনেছিলেনঃ 'স্বামীজী একবার ফ্রান্সের এক প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দর্শন করিতে যান। রঙ্গালয়ের পটগুলি বিশিষ্ট শিল্পীদ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। প্যারিস নগরীতে এই ফরাসী রঙ্গালয় ও এই চিত্রশিল্পী তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। স্বামীজী ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি অভিনয় বেশ বুঝিতেছিলেন। সহসা তাঁহার যবনিকার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ হওয়ায় তত্রস্থ আলেখ্যের কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি আছে ইহা হঠাৎ তাঁহার নেত্রে ঠেকিল। অভিনয় সমাপ্তে তিনি কার্যাধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন। শিল্পীও তথায় স্বয়ং উপস্থিত থাকায় তাঁহার নিকটে আসিলেন। কারণ স্বামীজী কোন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তির অভ্যাগত হইয়া অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্যারিস নগরীতে স্বামীজীকে বহুলোকে সম্মান করিত।...যবনিকাতে অঙ্কিত আলেখ্যের যে অংশটি স্বামীজী অপরিস্ফুট বলিয়া নির্দেশ করিলেন তাঁহারা তখন দেখিলেন যে, সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে প্রকৃতই দোষ আছে এবং স্বামীজী যে প্রকার উল্লেখ করিতেছেন তাহাই সত্য।' [কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৭১-২]

উল্লিখিত ঘটনার সন তারিখ দেওয়া না থাকলেও ধরে নিতে পারি, স্বামীজী যখন 'প্যারিস কংগ্রেস' উপলক্ষে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে গিয়েছিলেন, তখনই ঐ ব্যাপারটি ঘটেছিল। স্বামীজীকে রঙ্গালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে ধনাঢ্য ব্যক্তি, তিনি মিঃ লেগেট ছাড়া আর কেউ নন। এখানে আমাদের অনুমান করতে ইচ্ছা হয়, ঘটনাটি ঘটেছিল স্বামীজী যখন সারা বার্নহার্ড অভিনীত 'ইৎসীল' দেখতে গিয়েছিলেন তখনই। 'ইৎসীল' বুদ্ধজীবনী অবলম্বনে রচিত; নিউইয়র্কে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী এটি প্রথম দেখেন এবং তখনই সারা বার্নহার্ডের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসেও সম্ভবত একই অভিনয় দেখতে স্বামীজী গিয়েছিলেন। স্বামীজী 'পরিব্রাজক'-এ লিখেছেনঃ 'বার্নহার্ডের অনুরাগ—বিশেষ ভারতবর্ষের উপর, আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ "ত্রেজাঁসিএন, ত্রেসিভিলিজে" (trés ancien trés civilisé)—অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা—বিলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন, "আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোশাক, রাস্তা, ঘাট পরিচয় করেছি"। বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—"সে মঁ র‍্যাভ (C'est mon rave) সে মঁ র‍্যাভ"—সে আমার জীবনস্বপ্ন।' [বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১১৯]

তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।' শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্বামীজী এইসঙ্গে ভঙ্গি করে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন ঃ '[শ্রীকৃষ্ণ] এমনি করে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা-দুটো হাঁটুগাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে—ঘোড়াগুলো হাঁ করে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় action (ক্রিয়া) খেলছে। তাঁর সখা ত্রিভুবন বিখ্যাত বীর ; দু-পক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতো রথের উপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই-রকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই অমানুষী প্রেমকরুণামাখা বালকের মতো মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন।...সমস্ত শরীরে intense action (তীব্র ক্রিয়াশীলতা), আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত!'[৮৭]

ছবি সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির অনেকখানি রূপই উপরের বিবরণের মধ্যে পেলাম। পৌরাণিক ছবির ক্ষেত্রে তিনি কল্পনার স্বাধীনতার নামে অযথা তথ্যবিচ্যুতি সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। অথচ ভাব যদি তথ্যকে ছাপিয়ে উঠতে না পারে, কোন শিল্পই যে হয় না, সে-বিষয়ে দ্বিধাহীন তাঁর বক্তব্য। স্বামীজী রণদাপ্রসাদকে নিজের অপরোক্ষ দর্শনজাত 'কালী দি মাদার' কবিতার বিষয়বস্তুকে চিত্রায়িত করতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি একই সঙ্গে জানতেন কত কঠিন ঐ চেষ্টা। ভাববিষয়কে, বিশেষত অধ্যাত্মবিষয়কে শিল্পায়িত করতে গিয়ে ভারতীয় শিল্প কিভাবে অতি-প্রতীকী উদ্ভট রূপ নিয়েছে, সে-বিষয়ে নিবেদিতাকে তিনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই নিউইয়র্কে যেকথা বলেছিলেন, সেগুলি খুবই মূল্যবান। ঐ সম্বন্ধে নিবেদিতার সদ্য-রিপোর্ট ঃ 'And he (Swamiji) suggested that Hindu painting and sculpture had been rendered grotesque by the national tendency to infuse psychic into physical conceptions. He said that he himself knew of his own experience that most physical or material things had psychic symbols, which were often to the material eye grotesquely unlike their physical counterparts.'[৮৮]

স্বামীজীর কথাগুলির বিশেষ গুরুত্ব এইখানে—তিনি একেবারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বলেছেন যে, বহির্গত বস্তু অধিমানসলোকে যখন প্রতীকরূপ ধারণ করে, তখন প্রায়শ তা তার বাইরের রূপের তুলনায় উদ্ভটভাবে পৃথক হয়। আক্ষেপের বিষয়, কিভাবে তা হয়, তা দৃষ্টান্তযোগে নিবেদিতার বিবরণে ব্যাখ্যাত পাইনি। তবে স্বামীজী জড়বস্তুর মধ্যে কিভাবে অন্তর্নিহিত ছন্দ অনুভব করতেন তার উল্লেখ তাঁর জীবনীতে ভূরি ভূরি মেলে। গঙ্গাজলে স্বামীজী হর্ হর্ ধ্বনি শুনতেন, তা তাঁর লেখাতেই পাই। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে পরিব্রাজক অবস্থায় একদিন তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে বলেছিলেন, আজ গঙ্গা কেদার-রাগিণী গাইছে শুনেছি। পাখির কাকলি তিনি অনুধাবন করতেন

৮৭। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪১৪-১৫

৮৮। Reminiscences of Swami Vivekananda, p. 288

এবং তাদের ঠিক সুরটি গেয়ে দেখাতেন। ঝরনার গান শুনেও তার সুর বলতেন। নিবেদিতাকে বলেছিলেন, দেবপ্রতিমা মিথ্যে নয়, সাধকের দৃষ্টবস্তু তাঁরা। এক্ষেত্রে স্বামীজীর চরম কথাটি আমরা স্মরণ করতে পারি, 'নিবেদিতার প্রশ্নের উত্তরে যা তিনি বলেছিলেন—যার থেকে গম্ভীর মহান প্রকাশ অল্পই সম্ভব। কাশ্মীরে হিমালয়কে সামনে রেখে, স্বামীজী একদিন দাঁড়িয়ে আছেন, সেই সময় একজন ইউরোপীয় মহিলা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রতিমার সামনে ভক্তরা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে কেন? '...এই প্রশ্নে তিনি হস্তস্থিত ক্ষুদ্র নীল ফুলটি ফেলিয়া দিলেন, পরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া প্রশান্ত গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই পর্বতমালার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া আর সেই প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া কি একই কথা নয়?" '[৮৯]

প্রতীকের ক্ষুদ্র আকার কোন্ বিরাট ভাবের প্রতিনিধিত্ব করে, তার অসাধারণ অভিব্যক্তি এখানে পাচ্ছি।

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য স্বামীজী দেহ-মন-প্রাণের অখণ্ড একাগ্রতা একান্ত আবশ্যক মনে করতেন, যার দ্বারা অতিমানস চেতনায় উন্নীত হওয়া সম্ভব। একজন কুস্তিগীরও ভারতবর্ষে তার সাধনার ক্ষেত্রে ঐ একাগ্রতা অর্জনের প্রয়াসী। ঐ জিনিস, স্বামীজীর মতে, কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রেও অবশ্য প্রয়োজনীয়। 'যে মানুষ স্বার্থসিদ্ধিতে বা মন্দকাজে নিজেকে ক্ষয় করেছে, সে কখনও কোন মহান ম্যাডোনামূর্তি আঁকতে পারবে না, বা মাধ্যাকর্ষণ-নীতি আবিষ্কার করতে পারবে না।' নিবেদিতা স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গে আরও বলেছেনঃ 'যে অল্পপ্রাণ সাহিত্য বা হীনদশাপ্রাপ্ত ললিতকলা মানুষকে প্রধানত ভোগাধিকারযোগ্য শরীর বলে মনে করে এবং গৌণভাবে মাত্র তাকে সংযম ও স্বাধীনতার নিত্য লীলাভূমি-রূপ মন ও আত্মা বিবেচনা করে—স্বামীজীর সমাদর ঐ ধরনের সাহিত্য বা ললিতকলার ধারেকাছে কখনও এগোত না। আমাদের পাশ্চাত্য আইডিয়ালিজমের সবটা না হলেও অনেকটাই তাঁর কাছে ঐ শরীরভাবের দ্বারা গভীররূপে মণ্ডিত মনে হত এবং তাকে তিনি "ফুলে ঢাকা মৃতদেহের" সঙ্গে তুলনা করতেন।'[৯০]

একদিকে স্থূল শারীরিকতা, অন্যদিকে জীবনীশক্তিহীন আধ্যাত্মিকতার অভিনয়—স্বামীজীর শিল্পাদর্শ এই দুই অতিরেককে অগ্রাহ্য করে সুস্থ সামঞ্জস্যের পথে চলেছিল। সবশেষে তাঁর উদ্দীপ্ত কথাগুলি স্মরণ করতে পারিঃ '...যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ি ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।'[৯১]

৮৯। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪

৯০। The Master as I saw him, pp. 270-71

৯১। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৭

অপূর্ব কথা—প্রাণের আগুনে জ্বলছে। শিল্পাচার্য নন্দলাল, স্বামীজীর ভাবাদর্শের একালীন প্রধান শিল্পী যিনি, তিনি পরিষ্কার বলেছেন ঃ '...বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতির মতো চলতি বলার ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ায় যেমন তৎকালীন সাহিত্য সাধারণের সহজবোধ্য ও জোরালো হয়েছিল, স্বামীজীও ঐ পথে বাংলা ভাষাকে চালিত করেছিলেন। ...(তিনি) শিল্পে বহুদিনের জটিল mannerismকে কঠোর ভাষায় আঘাত করেছেন। আগতকালের শিল্প তাঁর বাণী অনুসরণ করে আবার সহজ, প্রাণবান ও দৃঢ় হবে। শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর ideal শিল্পের backbone-এর মতো...।'[৯২]

স্বামীজীর আদর্শ অন্তত নন্দলালের শিল্পের 'মেরুদণ্ড' হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং একথাও সত্য, নন্দলাল ভিন্ন স্বামীজীর সরল মহান অথচ বলিষ্ঠ ভাবাদর্শ গ্রহণ করবার মতো সামর্থ্য আর কোন আধুনিক চিত্রশিল্পীর নেই। প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজী বলেছিলেন কিভাবে গীতার কৃষ্ণকে আঁকতে হবে—সেই আদর্শে নন্দলাল অনেকগুলি 'পার্থসারথি' ছবি এঁকেছেন এবং বহুলাংশে সফল হয়েছেন। আলমোড়ায় একদিন ঊষাকালে দাঁড়িয়ে স্বামীজী হিমালয়ের চিরতুষারের উপরে অরুণোদয় দেখছিলেন ; তারপর অরুণরঞ্জিত পর্বতশিখরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলেছিলেন ঃ 'ঐ যে ঊর্ধ্বে শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি—ঐ হল শিব আর তাঁর উপরে যে-আলোকসম্পাত হয়েছে, তা-ই হল জগতের জননী।'

অরূপের সত্য কিভাবে রূপের সত্য হয়ে ওঠে, স্বামীজী মহান ভাষায় তারই কথা বলেছিলেন এবং মহান শিল্পীরা চিরদিন এই তত্ত্বেরই রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন। নন্দলাল তেমন একজন সার্থক রূপকার।

৯২। শিল্পজিজ্ঞাসায় শিল্পদীপঙ্কর নন্দলাল, পৃঃ ২৭-৮

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতবর্ষের লোকজীবন

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কলকাতার মানুষ। জব চার্নকের প্রতিষ্ঠিত কলকাতা, যে কলকাতা একদিন ছিল গ্রাম, পরবর্তীযুগে এক বিরাট শিল্পনগরী। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতা, সুতানটী, গোবিন্দপুর তিনখানা গ্রামকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে যে নগরীর সূচনা, বিবেকানন্দের জন্মের সময়ই সেই নগরী ধীরে ধীরে মহানগরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুতরাং সেই অর্থে বিবেকানন্দের জন্ম ও যৌবনপ্রাপ্তি মহানগরী কলকাতায়, শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কটিশ চার্চ কলেজে। তিনিই কিন্তু মিসেস ওলি বুলকে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এক চিঠিতে গ্রাম-বাংলার একটি শিল্প-সৌন্দর্যময় খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ দেখে আসতে অনুরোধ করেছেন। চিঠিতে লিখেছেন ঃ 'আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলার চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। হায়! আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো ঘরগুলোরও "বাংলো" নাম দেওয়া হয়।'[১]

তিনি আরও বললেন ঃ 'প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তি যখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তার সঙ্গে অতিথি-আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরী করতেন। সেই শিল্প লুপ্ত হতে চলেছে। নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাঁচে তৈরী করে দিতে পারতাম! তবে এখনও যে-কটি অবশিষ্ট আছে, তা-ই দেখে রাখা ভাল, অন্ততঃ একটিও।'[২]

প্রশ্ন জাগে যে, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যাধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, উত্তর কলকাতার বনেদি অঞ্চলের মানুষ, যাঁর অধীত বিষয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস ও দর্শন, তাঁর মধ্যে এই লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি, গ্রাম-বাংলার লোকশিল্পের প্রতি, সামগ্রিকভাবে দেশজ ও গ্রামীণ শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি এত আকর্ষণ ও অনুরাগ কি করে সম্ভব হল। আসলে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ স্বরূপ। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের চিরায়ত বাণীগুলিকে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির ধ্যানধারণা ও বিচিত্র উপাদানের মধ্য দিয়ে তিনি সরল কথায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তাই স্বাভাবিক কারণেই লোকায়ত গ্রামবাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দও লোকসংস্কৃতির এই সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি নিজেকে, বরঞ্চ বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁর জন্ম যদিও কলকাতায়, তবু একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁদের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার দত্ত ডেরিয়াটোনা গ্রামে। এই গ্রামের উন্নত সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারের যোগসূত্রটি বজায় ছিল বরাবরই। স্বামীজী বর্ধমানের পালসিট গ্রামে প্রাচীন বৈষ্ণব মন্দির এবং

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২০০

২। তদেব

লোকজীবনের স্বরূপ দর্শন করতেও গিয়েছিলেন। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর পরিব্রাজকরূপে তিনি যখন ভারত-পরিক্রমা করে চলেছিলেন তখন ভারতীয় লোকজীবনের প্রত্যক্ষ রূপটিকেও যেভাবে দর্শন ও অনুভব করেছিলেন, সেভাবে আর কেউ কখনও করেছেন বলে জানা নেই। একটানা ছয় বছরের সেই ভারতজুড়ে জীবনে জীবন যোগ করার ফসল স্বামীজীর চিন্তাক্ষেত্রে খুলে দিয়েছিল নতুন দিগন্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরই স্বামীজী ও তাঁর আটজন গুরুভাই স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি আঁটপুর গ্রামে গিয়েছিলেন। এই আঁটপুর গ্রামে কিছুদিন অবস্থান করার পর স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইরা ঐ গ্রামেই ধুনি জ্বালিয়ে সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এটা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বরের ঘটনা। আঁটপুর গ্রাম বাংলার অপরূপ লোকসংস্কৃতির বৈভবে সমৃদ্ধ। এ গ্রামের রাধাগোবিন্দের বিশাল মন্দিরের টেরাকোটা শিল্প যেমন বিস্ময়কর, তেমনি চণ্ডীমণ্ডপের কারুকার্য অপূর্ব। কাজেই, ভারতবর্ষের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে স্বামীজীর যে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল তা নিঃসন্দেহ।

স্বামী বিবেকানন্দের মানবপ্রেম, স্বদেশানুরাগ, ঐতিহ্যপ্রীতি, দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতা, ক্ষুধার্তকে অন্নদানের স্পৃহা, শিক্ষাদ্বারা সর্বসাধারণের উন্নতি-প্রচেষ্টা এ সমস্ত কিছুর মূলে আছে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণেরই লোকায়ত শিক্ষারীতির প্রভাব, যা তাঁকে অসাধারণভাবে মানব-সুহৃদ্ করে তুলেছিল। ক্ষুধা, দারিদ্র, অশিক্ষা, জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ ইত্যাদি অন্ধকারে ভরা ভারতবর্ষের সমস্ত কিছুকে তিনি প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছিলেন। আর এইভাবেই তিনি লোকায়ত ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর ভারত-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে।

'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর গবেষণা-প্রসূত নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—ভারতবর্ষের লোকায়ত ঐতিহ্যটি সামগ্রিকভাবে স্বামীজীর চোখে ধরা পড়েছে। ভারতবর্ষ কি ব্যাপক বিশাল বিচিত্র ও গভীর স্বামীজীর কথায়ঃ 'সত্যই, এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়তো সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডলমেনেরও অভাব নাই। চকমকি-পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়িলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। হ্রদ-অধিবাসিগণ, অন্ততঃ নদীতীরবাসিগণ—নিশ্চয়ই কোন কালে সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। গুহাবাসী এবং বৃক্ষপত্র-পরিহিত মানুষ এখনও বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড়, এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্রও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশ-সম্ভূত ও ভাষাতাত্ত্বিকগণের তথাকথিত আর্যদের নানা প্রশাখা-উপশাখা আসিয়া মিলিত হয়। পারসীক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হূন, চীন, সীথিয়ান—এমন অসংখ্য জাতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; ইহুদি, পারসীক, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্কাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি—যাহারা এখনও একাত্ম হইয়া যায় নাই—এইসব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর

পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আবার শান্ত হইতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।'[৩]

বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এই ভারতবর্ষের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। এদেশ এক মিশ্র সংস্কৃতির দেশ। ভারতবর্ষের ইতিহাস সহজাত অন্তর্দৃষ্টিতে অনুশীলন করে এবং সমগ্র ভারত পর্যটন করে ভারতবর্ষের মিশ্র সংস্কৃতির মর্মমূলটিকে স্বামীজী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই ভারতের পূর্ণাঙ্গ রূপটি তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট ছিল। ভগিনী ক্রিস্টিন লিখেছেনঃ আমি মনে করি, আমাদের 'ভারত'-প্রেমের জন্ম হয়েছিল যখন স্বামীজীকে 'India' শব্দটি তাঁর সেই অপূর্ব স্বরে উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম। একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় যখন ভাবি—পাঁচ অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র শব্দে অতকিছু ধরিয়ে দেওয়া যায়। তাতে ছিল—ভালবাসা, জ্বালাময় বাসনা, গর্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূজা, গভীর বিষাদ, উদ্দীপ্ত শৌর্য, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা—এবং পুনশ্চ ভালবাসা। কোন সমগ্র গ্রন্থও এইভাবে অপরের মধ্যে অপরূপ অনুভূতি সঞ্চারে সমর্থ নয়। যে-ই তা শুনত, তার কাছে ভারত হয়ে উঠত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। তখন ভারতের সবকিছুই তার আগ্রহের বস্তু; তার জনগণ, ইতিহাস, শিল্প-স্থাপত্য, আচার-ব্যবহার, নদী-পর্বত-উপত্যকা-সমভূমি, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-ধারণা, শাস্ত্রাদি—সবকিছু জীবন্ত।[৪]

ভগিনী নিবেদিতার গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য আমরা এখানে স্মরণ করতে পারিঃ 'দু-পয়সার ডাকটিকিট, সস্তায় রেলভ্রমণ, কাজ চলার জন্য একটা সাধারণ ভাষা—এদের দ্বারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে—এমন কথা তাঁর পরিণত বুদ্ধির কাছে অগভীর ও হাস্যকর ঠেকেছিল। ভারতের কোন মৌল ঐক্য থাকলেই তবে ঐ জিনিসগুলি তার প্রকাশে সাহায্য করবে। সে ঐক্য কি সত্যই আছে? তারই সন্ধানে আট বছর তিনি দেশের সর্বক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ালেন, প্রতি গ্রামে ভিন্ন নামে গেলেন, শিখলেন প্রতিটি মানুষের কাছে—তার ফলে যে ভারতের দর্শন পেলেন, তা একই সঙ্গে অব্যর্থ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ, গভীর ও ব্যাপক।'

স্বামী বিবেকানন্দের এই লোকপ্রীতি ও লোকসাধারণ সম্পর্কে আগ্রহ, লোকশিক্ষার দ্বারা জ্ঞান অর্জন, লোকাচারের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতালাভ—এ সমস্ত কিছুর পেছনে তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল ছিল ভগিনী নিবেদিতার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে তা সার্থকভাবে ধরা পড়েছে।

কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবনচর্যার রূপটি স্বামীজী ভারত-পর্যটনকালে কিভাবে অবলোকন করেছিলেন তার সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় নিবেদিতার অন্য একটি রচনার মধ্যে। গ্রামীণ ভারতবর্ষের কৃষি, কৃষকের জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং ধর্মের সঙ্গে কৃষকদের দৈনন্দিন জীবন কিভাবে যুক্ত তা স্বামীজী কী গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা-ও নিবেদিতার ভাষায় সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত, ভারতীয়

৩। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩৭৭-৭৮

৪। Reminiscences of Swami Vivekananda—His Eastern and Western Admirers, Advaita Ashrama, Calcutta, 1961, pp. 157-58

লোকজীবন সম্বন্ধে নিবেদিতার অন্তর্দৃষ্টি স্বামীজীর সূত্রেই প্রাপ্ত।

'আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত খেত-খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার প্রেম যেরূপ উথলিয়া উঠিত, অথবা তাঁহার তন্ময়ভাব যেরূপ প্রগাঢ় হইত, এমন আর বোধহয় কোথাও হয় নাই। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে অখণ্ডভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিরূপে ভাগে জমি চাষ করা হয় ; অথবা প্রত্যেক খুঁটিনাটি-সহ কৃষক-গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবন বর্ণনা করিতেন ; যেমন, সকালের জলখাবারের জন্য যে খিচুড়ি রাত্রি হইতে উনানে চাপানো থাকিত, তাহার কথাও উল্লেখ করিতেন। এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, এইসব কথা আমাদের নিকট বর্ণনাকালে তাঁহার নয়ন যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, অথবা কণ্ঠ যে আবেগভরে কম্পিত হইত, তাহা নিশ্চিত তাঁহার পরিব্রাজক জীবনের স্মৃতিবশতঃ। কারণ, সাধুদের নিকট শুনিয়াছি, ভারতের আর কোথাও দরিদ্র কৃষক কুটিরের ন্যায় অতিথি-সৎকার হয় না। সত্য বটে, তৃণশয্যা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর শয্যা, এবং মাটির চালাঘর ব্যতীত কোন ভাল আশ্রয় গৃহস্বামিনী অতিথিকে দিতে পারেন না ; কিন্তু তিনিই আবার বাটীর অপর সকলে যখন নিদ্রিত, নিজে শেষ মুহূর্তে শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে একটি দাঁতন ও একবাটি দুধ এমন জায়গায় রাখিয়া দেন, যাহাতে অতিথি নিদ্রাভঙ্গে সকালবেলা উহা দেখিতে পান, এবং অন্যত্র যাত্রা করিবার পূর্বে যথাযথ ঐগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন।'[৫]

নিবেদিতার দৃষ্টিতে প্রতিভাত স্বামীজীর এই সকল বিশ্লেষণ আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় যে, স্বামীজীর দেখা ভারতবর্ষ কেবল স্বপ্ন ও স্মৃতির ভারতবর্ষ নয়—সে ভারতবর্ষ গ্রাম-ভারতের জমির আলের ওপর দিয়ে, কৃষকের কুটিরের পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে পথ চলার অবকাশে, চাষবাসের কাজ দেখতে দেখতে, কৃষক রমণীর কুটিরে গৃহস্থালির কাহিনী শুনতে শুনতে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা ভারতবর্ষ। প্রকৃত দরিদ্র ভারতবর্ষ কি, চণ্ডাল ভারতবর্ষ কি, মূর্খ ভারতবর্ষ কি, ভারতবর্ষের অভিশাপ কোথায় লুকিয়ে আছে, কোথায়ই বা রয়েছে তার গৌরবময় দিক—দারিদ্রে অস্পৃশ্যতায় অজ্ঞান-অন্ধকারে এবং গ্রামীণ মানুষের সহজসরল বিশ্বাস-ভালবাসায় আতিথেয়তায় তিনি তার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন চিঠিতে লিখেছেন অচ্ছুৎদের সম্বন্ধে ; তাদের প্রতি অত্যাচারের নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন। তদানীন্তন ভারতবাসীর কুসংস্কার, ব্যভিচার সমস্ত কিছুই স্বামীজীর কাছে স্পষ্ট ছিল। তাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের চিঠিতে তিনি ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে বলছেনঃ 'মহা দঁক সামনে সাবধান! ঐ দঁকে সকলে পড়ে মারা যায়—ঐ দঁক হচ্ছে যে, হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়—ছুঁৎমার্গে ; আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, বস্।'[৬]

৫। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা (অনুবাদঃ স্বামী মাধবানন্দ), উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৭৩-৪

৬। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১০৯

পদব্রজে ভারত পর্যটনের কালে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবনের গভীর স্তরে প্রবেশ করে তার মূল আত্মাটিকে, তার স্বরূপটিকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই ভারতবর্ষের অধোগতির যে কারণ স্বামীজী বিশ্লেষণ করেছেন একান্তভাবেই তা বাস্তব গবেষণা-প্রসূত। ধর্মের নামে ভণ্ডামি, সাধারণ মানুষকে ক্ষমতাশীলদের সুচতুর শোষণ ও অত্যাচার, নারীজাতিকে হেয় জ্ঞান—এগুলিই, তাঁর মতে, ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল কারণ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বলেই তৎকালীন সমাজের যে চিত্র তিনি এঁকেছিলেন তা এত মর্মস্পর্শী এবং বাস্তব। রোষদৃপ্ত কিন্তু বেদনামথিত ভাষায় যখন তিনি বলেন, 'যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য!'[৭]—তখন লোকায়ত ভারতবর্ষের অধঃপতিত ও অন্তঃসারশূন্য রূপটি আমাদের কাছে অত্যন্ত নির্মম সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। কোন্ আদর্শ অবলম্বন করে ভারতবর্ষ নবজীবনে জীবিত হয়ে উঠবে, তা-ও পরিষ্কার ছিল তাঁর কাছে—'সর্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম, সেখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা, সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধান। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত; যিনি স্বার্থপর, তিনি মরণোন্মুখ। অতএব ভালবাসার জন্য ভালবাসো, কারণ প্রেমই জীবনের একমাত্র নীতি, বাঁচিয়া থাকার জন্য যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।'[৮]

তাঁর এই আদর্শের বাস্তব রূপ যাঁর মধ্যে দেখেছিলেন তিনি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে অবলম্বন করেই এই ভারত আবার জাগ্রত হবে, এই ছিল স্বামীজীর বিশ্বাস ও স্বপ্ন—'ভারত দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণা সয়েছে, সনাতন ধর্মের ওপর বহুকাল ধরে অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু প্রভু দয়াময়, তিনি আবার তাঁর সন্তানগণের পরিত্রাণের জন্য এসেছেন। পতিত ভারতকে আবার জাগরিত হবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে।'[৯] তাই স্বামীজীর আহ্বানবাণীঃ 'যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India (বর্তমান ভারত)—সত্যযুগের আবির্ভাব! আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।'[১০]

কিভাবে নতুন ভারতবর্ষ তৈরী হবে, কিভাবে দারিদ্র এবং অজ্ঞতা দূর হবে, অস্পৃশ্যতা অন্ধতা দেশ থেকে মুছে যাবে কি করে তার উপায়ও স্বামীজী আবিষ্কার করেছিলেন। শিকাগো থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী তাঁর ভারত-উন্নয়নের স্বপ্নকে কিভাবে বাস্তবায়িত করা যায় সে-সম্পর্কে লিখেছেনঃ 'দাদা, এইসব দেখে—বিশেষ দারিদ্র আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে,...এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন)

৭। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৪১১ ৮। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১০৯
৯। তদেব, পৃঃ ৪৮-৯ ১০। তদেব, পৃঃ ১০৭-০৮

শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। "খালি পেটে ধর্ম হয় না"— গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজী বেটারা চারযুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।'[১১]

লোকসাধারণের জন্য এই সহানুভূতি, দরিদ্র নিপীড়িত গ্রামীণ মানুষের প্রতি এই যে সুগভীর আকর্ষণ—এইটির মূলে রয়েছে ভারতীয় লোকসংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ। সেই একই উৎস থেকে জন্মলাভ করেছিল ভারতবর্ষের জীবনচর্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর সত্যদৃষ্টি। সেই দৃষ্টির রূপ কি ছিল তা প্রকাশ পেয়েছে নিবেদিতার লেখনীতেঃ 'বিধবার নিরাভরণ শ্বেত অবগুণ্ঠন ছিল তাঁহার নিকট শোক এবং সেইসঙ্গে পবিত্রতার চিহ্ন। সন্ন্যাসীর কৌপীন-বহির্বাস, মেঝের উপরে মাদুরের শয্যা, থালার পরিবর্তে কলাপাতায় ভোজন, হাত দিয়া আহার এবং জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান—এ সবই তাঁহার নিকট যথার্থ মহাপবিত্র বলিয়া বোধ হইত।'[১২]

ভারতবর্ষের বিভিন্ন লোকাচার সম্পর্কে স্বামীজীর একটি নিজস্ব বিচারপদ্ধতি ছিল। তিনি মনে করতেন বেশ কিছু দেশাচার প্রাচীন কাল থেকেই অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। প্রচলিত আচার-বিচার, প্রথা-পদ্ধতি এবং কৃষি-ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবনযাত্রা-প্রণালীকে একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যেসকল লোকাচারকে আপাতদৃষ্টিতে বর্তমানে কুসংস্কার বলে মনে হয় সেগুলির পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বামীজীর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যায়ঃ 'হিন্দুসমাজের মধ্যে নূতন ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধ, মাখন প্রভৃতির সরবরাহ, পশুগণের জন্য চারণভূমির ব্যবস্থা ও তাহাদের পরিচর্যা বিধান ইত্যাদি ভাব যে পূর্ব হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান ছিল, প্রাচীনকালে ভক্তিভরে গোসেবা তাহারই পরিচয় প্রদান করে।'[১৩]

এ থেকে বেশ বোঝা যায় ভারতবর্ষের লোকাচার ও জীবনাচরণের গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁর কত বেশী ছিল। নিবেদিতা এ-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি (স্বামীজী) অনুভব করতেন যে যদি কোন ইউরোপীয় লোক ভারতের জন্য কার্য করেন তবে তাঁকে 'ভারতীয় প্রণালী'তেই করতে হবে। এই 'ভারতীয় প্রণালী' বলতে স্বামীজী কি বুঝতেন তা-ও জানা যায় নিবেদিতার রচনাবলী থেকেঃ '...অপরদিকে সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারও তিনি কম গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেন না। যেসব খাদ্য শাস্ত্র-সম্মত, কেবল তাহাই আহার এবং উহা আবার হাত দিয়া খাওয়া, মেঝের উপর উপবেশন ও শয়ন, হিন্দুর সকল আচার-অনুষ্ঠান পালন, এবং হিন্দুর দৃষ্টিতে যাহা শিষ্টাচার বলিয়া গণ্য, তাহার যথাযথ পালন ও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ—এই সকলের প্রত্যেকটি তাঁহার মতে ভারতীয় চেতনা আয়ত্ত করিবার উপায়স্বরূপ।'[১৪] কেবল লোকসাধারণের আচার-আচরণগুলি বর্ণনা করেই স্বামীজী ক্ষান্ত হতেন না। সেইসব আচরণের অন্তর্নিহিত সত্যটিকেও আবিষ্কার করে চোখের সামনে তুলে ধরতেন। নিবেদিতা বলেছেনঃ 'কোন

১১। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১২ ১২। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ১২৬

১৩। তদেব, পৃঃ ২৪০ ১৪। তদেব, পৃঃ ২৪৯-৫০

একটি প্রথা শিক্ষা দিবার সঙ্গে তাহার অন্তর্নিহিত আদর্শ দেখাইয়া দিবার অসাধারণ ক্ষমতা স্বামীজীর ছিল। আজ পর্যন্ত ফুঁ দিয়া আলো নেবানো মহা অপবিত্র ও অসভ্য-জনোচিত কার্য ভাবিয়া আমরা শিহরিয়া উঠি; আবার শাড়ি পরা ও অবগুণ্ঠন দ্বারা মস্তক আবৃত করার অর্থ অভিমান ও হামবড়াভাবের পরিবর্তে সর্বদা নম্র-মধুরভাবে সকলকে মানিয়া চলা—এসকল বাহ্য ব্যাপার কত পরিমাণে এক একটি আদর্শের অভিব্যক্তি বলিয়া ভারতের সর্বসাধারণের পরিচিত, পাশ্চাত্যবাসী আমরা হয়তো যথার্থভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি না।'[১৫] স্বামীজী সর্বদাই বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন যে, 'ভারতীয় চেতনা ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনের সহস্র খুঁটিনাটি ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত।'[১৬] স্বামীজী কেবল বক্তব্য হিসাবে এই বিষয়টি গ্রহণ করতেন না, তিনি তাঁর প্রাজ্ঞ দৃষ্টিতে ভারতীয় লোকসংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করে ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের সনাতন জীবনযাত্রার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তাকে আবিষ্কার করে সকলের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করতেন। ভারতের সংহতির কথা বলতে গিয়ে ডেট্রয়েটে একটি বক্তৃতায় তিনি যা বলেছেন, তার একটি বিবরণী ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার 'ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস' পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয়েছিল। বিশপ নিণ্ডেকে তিনি বলেছিলেন যে, ভারতের নৈতিকতার মান পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচুতে, তার কারণ উত্তর ভারতে চারটে ভাষা এবং দক্ষিণ ভারতে চারটে ভাষা হলেও ধর্ম দুই ভারতেরই এক এবং ভারতের পাঁচভাগের চারভাগই হচ্ছে হিন্দু। এবং এই হিন্দু জাতটা কিছুটা অদ্ভুত। ধর্মীয় রীতি অনুসারে হিন্দু সব কাজ করে, ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে সে খায়, ধর্মের নির্দেশে সে ভাল কাজ করে এবং খুব খারাপ কাজও করে। ঐ কাগজটি তার রিপোর্টিং-এ বলেছে যে, এই সময়েই বক্তা তাঁর বক্তৃতায় শ্রেষ্ঠ নৈতিক সারকথাটি বলেছিলেন। সেটি হচ্ছে এইঃ 'তাঁর স্বদেশবাসীদের বিশ্বাস—সকল স্বার্থশূন্য কাজই সৎ এবং সকল স্বার্থপরতাই অসৎ। অতএব হিন্দুর মতে নিজের জন্য গৃহনির্মাণ স্বার্থপরতা; হিন্দু গৃহনির্মাণ করে ঈশ্বরোপাসনা এবং অতিথিসেবার জন্য। নিজের জন্য আহার্য রন্ধন স্বার্থপরতা; তাই সে রন্ধন করে দরিদ্রসেবার জন্য; যদি কোন ক্ষুধার্ত আগন্তুক প্রার্থী আসে, তবে আগে তার সেবা করে অবশেষে সে নিজে আহার্য গ্রহণ করে—এই ভাবটি দেশের সর্বত্র বিরাজ করছে। যে-কেউ খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রার্থী হোক না কেন, সব দরজাই তার জন্য খোলা থাকবে।'[১৭] সনাতন ভারতবর্ষের লোকায়ত সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে প্রবেশ করে জাতির জীবনাচরণের মূল সত্যটি স্বামীজী আবিষ্কার করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভবপর হয়েছিল যে, সবচেয়ে উন্নত সভ্যতা সেই ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যেই বর্তমান, যে-ব্যক্তি নিজেকে জয় করবার শিক্ষা পেয়েছে। পৃথিবীর যে-কোন দেশের চেয়ে এই পরিবেশ ভারতে কেন আছে তা বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেনঃ ভারতে 'বস্তুগত পরিবেশ আধ্যাত্মিক পরিবেশের অধীন। এবং প্রত্যেকেই সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মার প্রকাশ দেখতে সচেষ্ট এবং প্রকৃতিকেও একইভাবে

১৫। তদেব, পৃঃ ২৫০ ১৬। তদেব, পৃঃ ২৫১
১৭। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪০৫

দেখে।'[১৮] এর ফলস্বরূপ ভারতের সহস্রবর্ষের লোকায়ত জীবনযাত্রায় কি প্রতিফলন দেখা গেছে সেকথা বলতে গিয়ে ঐ বক্তৃতাতেই তিনি বলেছিলেন ঃ 'ভারতের ধর্ম মানুষকে ধীর, মধুর, বিবেচক এবং মনুষ্য-পশু-নির্বিশেষে ভগবানের সৃষ্ট সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন করে তোলে।'[১৯]

লোকসংস্কৃতির বিশেষজ্ঞেরা সবসময়েই লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, লোকসংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীর ঐতিহ্যগত ধারা যার মধ্যে দিয়ে একটি জাতির বা কোন সভ্যতার মূল সত্যটিকে উপলব্ধি করা যায়। স্বামীজী ভারতবর্ষের জাতিতত্ত্বের মূলে গিয়ে যেমন উপলব্ধি করেছিলেন যে এই দেশ সত্যিই এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা, ঠিক তেমনি তিনি একথাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতের জনগণ, তার ইতিহাস, শিল্পস্থাপত্য, আচার-ব্যবহার—নদী-পর্বত-উপত্যকা-সমভূমি, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্ম-ধারণা-স্বাস্থ্যাদি সবকিছু জীবন্ত। সেজন্যেই তিনি প্রবেশ করতে পেরেছিলেন এদেশের লোকায়ত সংস্কৃতির অন্তঃপুরে যেখানে জাতির প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে। তাঁর দেখা কেবল নিছক দর্শন হয়নি, আত্মোপলব্ধির সত্যরূপপ্রকাশে মহান হয়ে উঠেছে। তিনি ঐ বক্তৃতাতেই বলেছেন, ভারতবর্ষের গৃহস্থদের উপাসনার অঙ্গ পাঁচটা। তার মধ্যে একটা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আর একটা হল বোবা প্রাণীর সেবা। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি প্রচলিত কিংবদন্তীমূলক গল্পের উদাহরণ দিয়েছিলেন। এক সময় ভীষণ দুর্ভিক্ষের জন্য এক ব্রাহ্মণকে তাঁর স্ত্রী-পুত্র এবং পুত্রবধূসহ কিছুদিন না খেয়ে থাকতে হয়। গৃহস্বামী খাবারের খোঁজে বাইরে গিয়ে অল্প ছাতু যোগাড় করে আনেন। বাড়িতে এসে তিনি তা চার ভাগে ভাগ করলেন এবং সবাই মিলে খেতে বসলেন। এমন সময় দরজায় শব্দ শোনা গেল। আগন্তুক একজন ক্ষুধার্ত অতিথি। ভাগগুলো তখন অতিথির সামনে দেওয়া হল এবং সে খিদে মিটিয়ে চলে গেল। এদিকে অতিথি-সেবাপরায়ণ সেই পরিবারের চারজনই সেদিন মারা গেল।[২০] এই গল্পটি থেকে বোঝা যায়, আতিথেয়তার আদর্শ ভারতে কোন্ সু-উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করা—অতিথিকে পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া, এটি ভারতীয় লোকাচারের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজে ভিক্টোরিয়া হলের বক্তৃতা 'আমার সমরনীতি'র মধ্যে মনুর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এই কলিযুগে মানুষের একটিমাত্রই কাজ আছে, তা হচ্ছে দান। কারণ আজকাল আর যজ্ঞ ও কঠিন তপস্যায় কোন ফল হয় না। দানের মধ্যে যদিও ধর্মদান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, তথাপি আরও তিনটি দান আছে—বিদ্যাদান, প্রাণদান, অন্নদান। স্বামীজী বলছেন ঃ 'এই অপূর্ব দানশীল হিন্দুজাতির দিকে দৃষ্টিপাত কর। এই দরিদ্র—অতি দরিদ্র দেশে লোকে কি পরিমাণ দান করে, লক্ষ্য কর। এখানে লোকে এমন অতিথিপরায়ণ যে, যে-কোন ব্যক্তি বিনা-সম্বলে ভারতের উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন। লোকে পরমাত্মীয়কে যেমন যত্নের সহিত নানা উপচারের দ্বারা সেবা করে, সেইরূপ তিনি

১৮। তদেব, পৃঃ ৪০৬ ১৯। তদেব, পৃঃ ৪০৭ ২০। তদেব, পৃঃ ৪০৭-০৮

যেখানেই যাইবেন, লোকে সেই স্থানের সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুসমূহের দ্বারা তাঁহার সেবা করিবে। এখানে কোথাও যতক্ষণ পর্যন্ত একটুকরা রুটি থাকে, ততক্ষণ কোন ভিক্ষুককেই না খাইয়া মরিতে হয় না।'[২১] মনে রাখতে হবে যে, স্বামীজী অনেক সময় ভারতীয় বলতে হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করেছেন আর জীবনধর্ম অর্থেই ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেটি মনু সূত্রাকারে বলেছেন, স্বামীজী সেই বিষয়টিকে গবেষকের দৃষ্টি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করেছেন। দেখিয়েছেন যে, মনু-প্রথিত দানধর্ম ভারতীয় লোকসাধারণের জীবনে ঐতিহ্যগতভাবে মিশে রয়েছে। ভারতীয় লোকজীবনের গভীরে যে সত্যটি নিহিত আছে, বার বার স্বামীজী তাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র এক জায়গায় বলছেন যে, 'ছেলেবেলায় গল্প শুনেছ যে, রাক্ষসীর প্রাণ একটা পাখীর মধ্যে ছিল। সে পাখীটার নাশ না হলে রাক্ষসীর কিছুতেই নাশ হয় না...। এখন বুঝতে পারছ তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি কোথায়?—ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাত এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে।'[২২] স্বামীজী মনে করতেন যে, প্রতিটি জাতির আচার-আচরণের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, আছে একটি স্বতন্ত্র জীবনলক্ষ্য। স্বামীজী তাকে বলেছেন, 'স্বধর্ম বা জাতিধর্ম'। ইংরেজের ক্ষেত্রে সেটি ব্যবসাবুদ্ধি, ফরাসীদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর ভারতীয়দের হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা বা মুক্তি। স্বামীজীর মতে এইটিই হচ্ছে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য। বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত যা কিছু বলা হোক না কেন সবকিছু ঐখানে একমত। ঐখানটায় হাত দিলে সর্বনাশ। তাঁর ভাষায়ঃ 'লাথি মারো, কালো বলো, সর্বস্ব কেড়ে লও—বড় এসে যাচ্ছে না; কিন্তু ঐ দোরটা ছেড়ে রাখ।'[২৩] ঐ দোরটা অর্থাৎ ধর্মের দরজা খোলা রাখার কথা স্বামীজী বার বার বলেছেন। কারণ তিনি জানতেন, ভারতবর্ষের জাতীয় উদ্দেশ্য ধর্ম। 'প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে' ভারতীয় জাতির সামাজিক রীতিনীতি ঐ উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছে। কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যতে ঘা পড়ে তখন ভারতবর্ষের সবকিছুই বিনষ্ট হয়ে যাবে। বস্তুত, কোন জাতির লোকাচারগুলি সেই জাতির জীবন-প্রবাহের গতিপথে মূল জীবন-উদ্দেশ্যের পরিপূরকরূপে স্বাভাবিক নিয়মেই গড়ে ওঠে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে স্বামীজী ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবনচর্যার প্রত্যেকটি বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

শরীর ও জাতিতত্ত্বঃ স্বামীজীর নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল, এই প্রবন্ধের প্রথমদিকে স্বামী বিবেকানন্দের 'আর্য ও তামিল' রচনার একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তা উপস্থাপনা করা হয়েছে। স্বামীজী দেখিয়েছেন, ভারতবাসী একটি মিশ্র জাতি, শক-নেগ্রিটো-কোল-দ্রাবিড়-মঙ্গোল ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গঠিত। স্বামীজী আরও গভীরে গিয়ে 'ফিজিক্যাল এ্যানথ্রপলজি' তথ্যে উপনীত হয়েছেন। ভারতবাসীর

২১। তদেব, পৃঃ ১১১-১২ ২২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৯-৬০ ২৩। তদেব, পৃঃ ১৫৯

শরীরে বিভিন্ন ভেদ। নাক মুখের গড়ন, রঙ, চুল, উচ্চতা প্রভৃতি সবরকমের বিভিন্নতাকেই স্বামীজী একটি বৈজ্ঞানিক নৃতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। এ-সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক বক্তব্য এই যে, 'আধুনিক পণ্ডিতদের মতে আর্যদের লালচে সাদা রঙ, কালো বা লাল চুল, সোজা নাক চোখ ইত্যাদি; এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ ভেদে একটু তফাৎ। যেখানে রঙ কালো, সেখানে অন্যান্য কালো জাতের সঙ্গে মিশে এইটি দাঁড়িয়েছে। এঁদের মতে হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দু-চার জাতি এখনও পুরো আর্য আছে, বাকি সমস্ত খিচুড়িজাত (সঙ্কর-জাতি), নইলে কালো কেন হল? কিন্তু ইউরোপী পণ্ডিতদের এখনও ভাবা উচিত যে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক শিশুর লাল চুল জন্মায়, কিন্তু দু-চার বৎসরেই চুল ফের কালো হয়ে যায় এবং হিমালয়ে অনেক লাল চুল, নীল বা কটা চোখ।'[২৪] ভারতীয়দের চেহারা, তাদের চোখ-নাক- মাথার গড়ন, চুলের রঙ ইত্যাদির মধ্যে যে একটা মিশ্রণের ব্যাপার আছে এবং সেটি যে ফিজিক্যাল এ্যানথ্রপলজির ক্ষেত্র স্বামীজী খুব ভাল করেই জানতেন এবং সেজন্যেই বোধহয় তিনি একেবারে জাতির মর্মমূল থেকে তার বৈশিষ্ট্যগুলি বার করবার চেষ্টা করেছেন। গবেষণা করে দেখিয়েছেন—আমরা নিরামিষাশী বলে আমাদের পেটের রোগ বেশী আর পাশ্চাত্যের লোকেরা মাংসাশী, তাই তাদের বুকের রোগ বেশী; দেখিয়েছেন আমাদের দেশে দাঁতের রোগ চুলের রোগ কম, কিন্তু পাশ্চাত্যে অল্প লোকেরই নিজের স্বাভাবিক দাঁত আছে আর টাকের ছড়াছড়ি সর্বত্রই। স্বামীজী এইভাবে লোকজীবনের গভীরে গিয়ে অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছেন। পোশাক ফ্যাশান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খাদ্যদ্রব্য পানীয় সবকিছুকেই তিনি একটি বৈজ্ঞানিক লোকসংস্কৃতির দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেছেন।

পোশাক ফ্যাশান বেশভূষা ঃ পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারটা লোকসংস্কৃতির একেবারে গোড়ার কথা। একটা দেশ বা জাতিকে বোঝা যায় তার পোশাক-আশাক বেশভূষা থেকে। এগুলিকে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'মেটিরিয়াল ফোকলোর'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পোশাক ও বেশভূষার ব্যাপারটা শুধুমাত্র একটা দেশের আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, সেই দেশ ও জাতির নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যেরও পরিচায়ক। দেশে-বিদেশে পরিভ্রমণ করে স্বামীজী এটা খুব ভাল করেই বুঝেছিলেন। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পোশাক-বেশভূষার তুলনামূলক আলোচনা-কালে দেশজ ভাবধারার গভীরে পৌঁছে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ 'গরমদেশে কাপড়ের দরকার হয় না। কৌপীনমাত্রেই লজ্জানিবারণ, বাকি কেবল অলঙ্কার। ঠাণ্ডা দেশে শীতের চোটে অস্থির, অসভ্য অবস্থায় জানোয়ারের ছাল টেনে পরে, ক্রমে কম্বল পরে, ক্রমে জামা-পাজামা ইত্যাদি নানানখানা হয়। তারপর আদুড় গায়ে গয়না পরতে গেলেই তো ঠাণ্ডায় মৃত্যু, কাজেই অলঙ্কার-প্রিয়তাটা ঐ কাপড়ের উপর গিয়ে পড়ে। যেমন আমাদের দেশে গয়নার ফ্যাশান বদলায়, এদের তেমনি ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে কাপড়ের ফ্যাশান।'[২৫] আরও অধিক বিশ্লেষণে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, 'আমাদের দেশে মুখ দেখানো বড়ই লজ্জা;

২৪। তদেব, পৃঃ ১৬৪-৬৫ ২৫। তদেব, পৃঃ ১৮৭

কিন্তু সে ঘোমটা টানার চোটে শাড়ি কোমরে ওঠেন উঠুন, তায় দোষ নেই।'[২৬] আসলে পোশাকের সঙ্গে যে একটা দেশের কালচারের ব্যাপারটা যুক্ত হয়ে আছে সেটা স্বামীজী বিলক্ষণ বুঝেছেন। তাই তিনি আমাদের বুঝিয়ে দেন যে, 'আমাদের মেয়েদের শাড়ি আর পুরুষদের চোগা-চাপকান-পাগড়ীর সৌন্দর্যের এ পৃথিবীতে তুলনা নেই।'[২৭] তাই স্বামীজীর গবেষণা-প্রসূত উক্তিঃ 'ভাঁজ ভাঁজ পোশাকে যত রূপ, তত আঁটাসাঁটায় হয় না। আমাদের পোশাক সমস্তই ভাঁজ ভাঁজ, কিন্তু আমাদের কাজকর্মের পোশাক নেই; কাজ করতে গেলেই কাপড়-চোপড় বিসর্জন যায়। এদের ফ্যাশান কাপড়ে, আমাদের ফ্যাশান গয়নায়।'[২৮] ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে, একটা জাতিকে অন্তরতর প্রদেশ থেকে দেখার কী অসাধারণ তাঁর ক্ষমতা! তা না হলে তিনি কি করেই বা বলতে পারেন 'আমরা নাক ফুঁড়ছি, কান ফুঁড়ছি গহনা পরবার জন্য। এরা এখন ভদ্রলোকে বড় নাক ফোঁড়ে না; কিন্তু কোমর বেঁধে বেঁধে, শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে, পিলে যকৃৎকে স্থানভ্রষ্ট করে শরীরটাকে বিশ্রী করে বসে। "গড়ন গড়ন" করে এরা মরে, তায় ঐ বস্তাবন্দী কাপড়ের উপর গড়ন রাখতে হবে।'[২৯] আবার দেখি, ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বলছেন যে, 'প্রাচীন আর্যজাতিরা ধুতি চাদর পরত; ক্ষত্রিয়দের ইজার ও লম্বা জামা—লড়ায়ের সময়। অন্য সময় সকলেরই ধুতি চাদর। কিন্তু পাগড়ীটা ছিল। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মেয়ে-মদ্দে পাগড়ী পরত। এখন যেমন বাংলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কপনি-মাত্র থাকলেই শরীর ঢাকার কাজ হল, কিন্তু পাগড়ীটা চাই; প্রাচীনকালেও তাই ছিল—মেয়ে-মদ্দে। ...ধর্মাশোক ধুতি পরে, চাদর গলায় ফেলে, আদুড় গায়ে একটা ডমরু-আকার আসনে বসে নাচ দেখছেন! নর্তকীরা দিব্যি উলঙ্গ; কোমর থেকে কতকগুলো ন্যাকড়ার ফালি ঝুলছে। মোদ্দা পাগড়ী আছে। নেবু টেবু সব ঐ পাগড়ীতে। তবে রাজ সামন্তরা ইজার ও লম্বা জামা পরা—চোস্ত ইজার ও চোগা। সারথি নলরাজ এমন রথ চালালেন যে, রাজা ঋতুপর্ণের চাদর কোথায় পড়ে রইল; রাজা ঋতুপর্ণ আদুড় গায়ে বে করতে চললেন। ধুতি-চাদর আর্যদের চিরন্তন পোশাক, এইজন্যই ক্রিয়াকর্মের বেলায় ধুতি-চাদর পরতেই হয়।'[৩০] স্বামীজী বোঝাতে চেয়েছেন, পোশাক-পরিচ্ছদটা আকস্মিক কোন বস্তু নয়। সময়ের স্বাভাবিক গতিপথে দেশের মানুষের বেশভূষা গড়ে ওঠে। জাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে পোশাক-পরিচ্ছদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দেশ ও জাতির লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রকাশক মানুষের বেশভূষা ও ফ্যাশান।

খাদ্য—আহার ও পানীয়ঃ প্রত্যেক জাতির দৈনন্দিন জীবনাচরণের মধ্যেই লোকসংস্কৃতির প্রধান লক্ষণগুলো নিহিত থাকে। খাদ্যাভ্যাস তার মধ্যে একটা অন্যতম বিষয়। সব দেশের মতোই ভারতেরও খাদ্যরীতির ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের মূল আবিষ্কার করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেনঃ 'সকল জাতিরই আদিম পুরুষ নাকি প্রথম অবস্থায় যা পেত তা-ই খেত। একটা জানোয়ার মারলে, সেটাকে একমাস ধরে খেত; পচে উঠলেও তাকে ছাড়ত না। ক্রমে সভ্য হয়ে উঠল, চাষবাস শিখলে; আরণ্য

২৬। তদেব ২৭। তদেব, পৃঃ ১৬৬ ২৮। তদেব
২৯। তদেব ৩০। তদেব, পৃঃ ১৮৫-৮৬

পশুকুলের মতো একদিন বেদম খাওয়া, আর দু-পাঁচ দিন অনশন—ঘুচল; আহার নিত্য জুটতে লাগল; কিন্তু পচা জিনিস খাবার চাল একটা দাঁড়িয়ে গেল। পচা দুর্গন্ধ একটা যা হয় কিছু, আবশ্যক ভোজ্য হতে নৈমিত্তিক আদরের চাটনি হয়ে দাঁড়াল।'[৩১]

স্বামীজীর মতে খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে দিয়ে একটি জাতির লোকায়ত রীতিনীতির পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয়। আমাদের পূর্বপুরুষ আদিম মানুষের বাধ্য হয়ে পচা জিনিস খাওয়ার রীতিটি পরবর্তীযুগে পৃথিবীর সবদেশেই চালু হয়ে থাকলো। তিনি দেখেছেন, 'ইউরোপীরা এখনও বন্য পশুপক্ষীর মাংস না পচলে খায় না।...কলকেতায় পচা হরিণের মাংস পড়তে পায় না; রসা ভেটকির উপাদেয়তা প্রসিদ্ধ। ইংরেজদের পনীর যত পচবে, যত পোকা কিলবিল করবে, ততই উপাদেয়।'[৩২] ভারতবর্ষেরও লোকায়ত জীবনধারা বিশ্লেষণ করে তার খাদ্যরীতি পর্যালোচনা করে দেখেছেন। এককালে ব্রাহ্মণদের 'প্যাঁজ লশুন' না হলে চলতো না। পরে শাস্ত্রকারেরা যখন বললেন, 'প্যাজ, লশুন, গেঁয়ো শোর, গেঁয়ো মুরগী'[৩৩] খাওয়া জাতিনাশেরই সামিল তখন তারা ভয় পেয়ে 'প্যাঁজ-লশুনের' জায়গায় আরও দুর্গন্ধ হিং খেতে আরম্ভ করল।

একজন প্রকৃত সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে জাতির লৌকিক জীবনাচরণের বিষয়গুলিকে দেখেছিলেন বলেই স্বামীজীর আলোচনায় সব জায়গায় একটি যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠেছে। যেমন, বিভিন্ন ধর্মের বিধিনিষেধ বা ট্যাবু সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ 'জৈন-বৌদ্ধয় মাছ মাংস খাবেই না। জৈন আবার যা মাটির নীচে জন্মায়, আলু মুলো প্রভৃতি—তাও খাবে না; খুঁড়তে গেলে পোকা মরবে। রাত্রে খাবে না—অন্ধকারে পাছে পোকা খায়। য়াহুদীরা যে মাছে আঁশ নেই তা খাবে না, শোর খাবে না, যে জানোয়ার দ্বিশফ নয় এবং জাবর কাটে না, তাকেও খাবে না। ...আবার হিঁদুর মতো য়াহুদীরা বৃথা-মাংস খায় না। যেমন বাংলাদেশে ও পাঞ্জাবে মাংসের নাম "মহাপ্রসাদ"। য়াহুদীরা সেইপ্রকার "মহাপ্রসাদ" অর্থাৎ যথানিয়মে বলিদান না হলে মাংস খায় না।...মুসলমানরা য়াহুদীদের অনেক নিয়ম মানে, তবে অত বাড়াবাড়ি করে না; দুধ, মাছ, মাংস একসঙ্গে খায় না এই মাত্র।'[৩৪]—স্বামীজীর মতে ধর্ম যেমন ভারতীয় জাতির মূল নিয়ামক, তেমনি বিধিনিষেধগুলিও এই জাতির চরিত্রকে চিত্রিত করে রেখেছে।

ভৌগোলিক পরিবেশ বা আবহাওয়ার সঙ্গে একটি জাতির খাদ্যাভ্যাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়াও আর্থিক অবস্থা এবং জাতিগত শ্রেণীবিন্যাসের ওপরেও মানুষের খাওয়া-দাওয়ার প্রকৃতি নির্ভর করে। তাই, গরম দেশের লোকেরা ভাত অথবা রুটি যা-ই পছন্দ করুক না কেন শস্যদানার খাদ্য, শাক-তরকারি সেখানকার প্রধান খাদ্য হয়ে ওঠে। তবে ভাতই ভারতের সাধারণ মানুষের খাদ্য। যদিও গম, বাজরা, ভুট্টার রুটিও বহু অঞ্চলের সাধারণ খাদ্য। তবে সব দেশেই গরীবদের ক্ষেত্রে ভাত, রুটি, আলু, শাকসজি প্রধান। মাছ মাংস যা খাওয়া হয় তা চাটনী বিশেষ। এ-সম্পর্কে

৩১। তদেব, পৃঃ ১৮২
৩২। তদেব
৩৩। তদেব
৩৪। তদেব, পৃঃ ১৮৩

তাঁর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—'শাক, তরকারি, ডাল, মাছ, মাংস সমস্তেরই—সমগ্র ভারতবর্ষে ঐ রুটি বা ভাতকে সুস্বাদ করবার জন্যে ব্যবহার, তাই ওদের নাম ব্যঞ্জন। এমনকি পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্য দেশে অবস্থাপন্ন আমিষাশী লোকেরা—এমন কি রাজারাও—যদিও নিত্য নানাপ্রকার মাংস ভোজন করেন, তথাপি রুটি বা ভাতই প্রধান খাদ্য। যে ব্যক্তি আধসের মাংস নিত্য খায়, সে একসের রুটি তার সঙ্গে নিশ্চিত খায়।'[৩৫] স্বামীজী মনে করতেন যে, জাতির প্রকৃতির মধ্যেই খাদ্যগ্রহণের বৈশিষ্ট্যগুলি নিহিত আছে। তাকে অতিক্রম করা কখনই উচিত নয়। তার কারণ তাতে জাতীয় স্বাস্থ্য এবং চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায়। স্বামীজী এক্ষেত্রে বলেছেন ঃ 'সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এককথায় দশক্রোশ হেঁটে দিত, দু-কুড়ি কই মাছ কাঁটাসুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, একশ বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলেগুলো কলকেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ি চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে।'[৩৬] স্বামীজী একটি নস্টালজিক্ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলাদেশের প্রচলিত লৌকিক খাওয়া-দাওয়ার চিত্র এঁকেছেন।

'তবে আমাদের ভাত-ডাল ঝোল-চচ্চড়ি শুক্তো মোচার ঘন্টের জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না। দাঁত থাকতে তোমরা যে দাঁতের মর্যাদা বুঝছ না, এই আপসোস।...এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙালী খাওয়া, উপাদেয় পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ববাংলায়, ওদের নকল কর যত পার। যত পশ্চিমের দিকে ঝুঁকবে, ততই খারাপ; শেষ কলাইয়ের ডাল আর মাছের টক মাত্র—আধা-সাঁওতালী বীরভূম বাঁকড়োয় দাঁড়াবে!!... ময়রার দোকানরূপ সর্বনেশে ফাঁদ খুলে বসেছে, ওর মোহিনীতে বীরভূম বাঁকড়ো ধামাপ্রমাণ মুড়ি দামোদরে ফেলে দিয়েছে, কলায়ের ডাল গেছেন খানায়, আর পোস্তবাটা দেয়ালে লেপ দিয়েছে, ঢাকা বিক্রমপুরও টাঁইমাছ কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে "সইভ্য" হচ্ছে!!'[৩৭]

স্বামীজীর নিজস্ব ভাব-ভঙ্গিমায় ও লোকায়ত গদ্যরীতিতে প্রকাশিত উপরোক্ত উদ্ধৃতি তিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম উদ্ধৃতিটিতে তিনি বাংলাদেশের প্রকৃত খাওয়া-দাওয়ার উপাদানগুলি কি, তার কথা বলেছেন। দ্বিতীয়টিতে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পূর্ববাংলায় রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া যে পুষ্টিকর ও সস্তা তার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু পশ্চিমের রাঢ় অঞ্চলে গেলে বাঙালীর ঐ খাদ্যদ্রব্যগুলি আবার কলায়ের ডাল আর মাছের টকে পর্যবসিত হয় তার ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। আর তৃতীয়টিতে তিনি দেখিয়েছেন ময়রার দোকান ও ভাজাভুজির সর্বনেশে ফাঁদে বাঙালীর খাদ্যরীতির কিভাবে পরিবর্তন ঘটেছে এবং তার লোকায়ত বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। সেখানে তিনি লৌকিক ভাষার সংযত নিপুণ আঁচড়ে 'বাঁকড়োর' ধামাপ্রমাণ মুড়ি, কলায়ের ডাল, পোস্তবাটা, টাঁইমাছ প্রভৃতির জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে বেদনায় মুহ্যমান হয়েছেন।

কেবল খাদ্যদ্রব্যই নয়, কিভাবে খাওয়ার ভঙ্গি দেশে দেশে পরিবর্তিত হয় তারও

৩৫। তদেব, পৃঃ ১৮০ ৩৬। তদেব, পৃঃ ১৭৯ ৩৭। তদেব

একটি লৌকিক রেখাচিত্র স্বামীজী সুন্দরভাবে অঙ্কন করেছেন। বক্তব্যটি উপস্থিত করতে গিয়ে স্বামীজী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু করে, ভারতবর্ষের বাইরের ইতিহাসও সংগ্রহ করেছেন। স্বামীজীর বিশ্লেষণ সেখানে জাতীয় ক্ষেত্র থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পৌঁছে গেছে। এবং স্বামীজী দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন জাতির এক একটি নিজস্ব ধারা ও বৈশিষ্ট্য থাকে ও মানুষের লৌকিক জীবনাচরণের ভিতর দিয়েই প্রতিটি জাতির অভ্যাস ও রীতিনীতিগুলি গড়ে ওঠে। স্বামীজীর মতে, 'আর্যরা একটা পীঠে বসত, একটা পীঠে ঠেসান দিত এবং জলচৌকির উপর থালা রেখে এক থালাতেই সকল খাওয়া খেত। ঐ চাল এখনও পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র ও গুর্জর দেশে বর্তমান। বাঙালী, উড়ে, তেলেঙ্গি, মালাবারি প্রভৃতি মাটিতেই "সাপড়ান"। মহীশূরের মহারাজও মাটিতে আঙট পাতে ভাত ডাল খান। মুসলমানেরা চাদর পেতে খায়। বর্মি, জাপানী প্রভৃতি উপু হয়ে বসে মাটিতে থাল রেখে খায়। চীনেরা টেবিলে খায়; চেয়ারে বসে, কাটি ও চামচ-যোগে খায়। রোমান ও গ্রীকরা কোচে শুয়ে টেবিলের ওপর থেকে হাত দিয়ে খেত। ইউরোপীরা টেবিলের ওপর হতে কেদারায় বসে—হাত দিয়ে পূর্বে খেত, এখন নানাপ্রকার কাঁটাচামচ। চীনের খাওয়াটা কসরত বটে—যেমন আমাদের পানওয়ালীরা দুখানা সম্পূর্ণ আলাদা লোহার পাতকে হাতের কায়দায় কাঁচির কাজ করায়, চীনেরা তেমনি দুটো কাটিকে ডান হাতের দুটো আঙুল আর মুঠোর কায়দায় চিমটের মতো করে শাকাদি মুখে তোলে। আবার দুটোকে একত্র করে একবাটি ভাত মুখের কাছে এনে, ঐ কাটিদ্বয়নির্মিত খোন্তাযোগে ঠেলে ঠেলে মুখে পোরে।'[৩৮] এখানে স্বামীজীর নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিটি যেমন প্রেক্ষাপটের কাজ করেছে, তেমনি সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্বের উপর তাঁর বিষয়গত অধিকারটিও সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশ ও জাতির খাদ্যগ্রহণের পদ্ধতিগুলি কেন এত বিভিন্ন ও বিচিত্র, স্বামীজী তাকেই আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। আর্যরা এককালে একসঙ্গে একথালায় বসে খেত এবং সেই রীতি যে এখনও পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র, গুর্জরদেশে বর্তমান তা-ও তিনি লক্ষ্য করেছেন। বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পৃথক পাতে খাওয়ার যে রীতি, এই রীতি প্রাচীনকালে ছিল না।

ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরে আমিষ ও নিরামিষ এই দু-ধরনের খাদ্যধারা প্রচলিত আছে। এই দু-প্রকারের আহারের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়, এই বহুবিতর্কিত প্রশ্নটির উত্তর স্বামীজী দিয়েছেন সম্পূর্ণ প্র্যাগম্যাটিক দৃষ্টিকোণ থেকেঃ 'সকল পক্ষ দেখেশুনে আমার তো বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে যে, হিঁদুরাই ঠিক, অর্থাৎ হিঁদুদের ঐ যে ব্যবস্থা যে জন্ম-কর্ম-ভেদে আহারাদি সমস্তই পৃথক, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষ-ভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ; আর যাকে খেটেখুটে এই সংসারের দিবারাত্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বইকি। যতদিন মনুষ্য-সমাজে এই ভাব থাকবে—"বলবানের জয়", ততদিন মাংস খেতে হবে বা অন্য কোনও রকম

৩৮। তদেব, পৃঃ ১৮১-৮২

মাংসের ন্যায় উপযোগী আহার আবিষ্কার করতে হবে। নইলে বলবানের পদতলে দুর্বল পেষা যাবেন! রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বললে চলে না—জাতি জাতির তুলনা করে দেখ।'[৩৯] স্বামীজীর মতে, আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত, 'পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয়, এমন খাওয়া খাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই।'[৪০] প্রাচীন শাস্ত্রকার রামানুজাচার্যের উদ্ধৃতি উপস্থিত করে তিনি ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তিনটি দোষ বাঁচাতে বলেছেন। জাতি দোষ অর্থাৎ যে-দোষ ভোজ্যদ্রব্যের গুণগত। যেমন, পেঁয়াজ-রসুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য গ্রহণ করলে মনে অস্থিরতা আসে। দ্বিতীয়ত, আশ্রয় দোষ অর্থাৎ 'যে দোষ ব্যক্তি-বিশেষের স্পর্শ হতে আসে'।[৪১] যে মানুষটির কাছ থেকে আহার্য গ্রহণ করছি, সেই মানুষটির চরিত্র আহার্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। দুষ্ট লোকের অন্ন খেলে দুষ্ট বুদ্ধি আসবে আর সৎ লোকের অন্ন খেলে সৎ বুদ্ধি আসবে। তৃতীয়ত নিমিত্ত দোষ অর্থাৎ ময়লা কদর্য-কীট-কেশাদি দুষ্ট অন্ন। এইরকম অন্নে শরীর অসুস্থ হয়, মনও অপবিত্র হয়। স্বামীজী বলেছেন যে, এই তিনরকম দোষের মধ্যে 'জাতি দোষ' এবং 'নিমিত্ত দোষ' থেকে বাঁচবার চেষ্টা সকলেই করতে পারে। কিন্তু 'আশ্রয় দোষ' থেকে বাঁচা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই 'আশ্রয় দোষ' সম্পর্কে অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতার জন্যেই আমাদের দেশে ছুঁৎমার্গ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি কুসংস্কার দেখা দিয়েছে। স্বামীজীর মত হচ্ছে সাধারণভাবে ভারতবর্ষের মানুষের মতো পবিত্র আহার আর কোন দেশে নেই। তবে নিমিত্ত দোষে বর্তমানে আমরা অত্যন্ত দুষ্ট হয়ে আছি, তার প্রধান উদাহরণ ঐ ময়রার দোকান।

এছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন যে, আমাদের দেশে অনেকেই আছেন যাঁরা এমনিতে মাংস খান না কিন্তু দেবীর কাছে বলি হলে তা মহাপ্রসাদ রূপে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করেন। দেখিয়েছেন যে, কুমায়ুন থেকে আরম্ভ করে কাশ্মীর পর্যন্ত সর্বত্রই প্রচলিত মনু-নির্দিষ্ট আহারবিধি—'বাঙালী, বেহারী, প্রয়াগী ও নেপালীর চেয়েও মনুর আইনের বিশেষ প্রচার'[৪২]—যেমন অনেক বাঙালী মুরগী বা মুরগীর ডিম খায় না কিন্তু হাঁসের ডিম খায়, নেপালীও তাই। 'কিন্তু কুমায়ুন হতে তাও চলে না। কাশ্মীরীরা বুনো হাঁসের ডিম পেলে সুখে খায়, গ্রাম্য নয়। এলাহাবাদের পর হতে, হিমালয় ছাড়া, ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত দেশে—যে ছাগল খায়, সে মুরগীও খায়।'[৪৩] এইভাবে বিবেকানন্দ সমস্ত ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবনচর্যার গভীরে খাদ্যগ্রহণের যেসব রীতিনীতি প্রচলিত আছে সেগুলিকে পর্যালোচনা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রতিক্ষেত্রেই একটি বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি একান্তভাবে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টিভঙ্গি।

৩৯। তদেব, পৃঃ ১৭৫
৪০। তদেব, পৃঃ ১৭৬
৪১। তদেব, পৃঃ ১৭২
৪২। তদেব, পৃঃ ১৮৪
৪৩। তদেব

আচারবিচার-রীতিনীতি ঃ

আচারবিচার প্রসঙ্গে প্রথমেই যেটি সর্বাধিক আলোচিত হয় সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে, সেটি হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে স্বামীজী এ-প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'দেখ, শরীর নিয়ে প্রথম। বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি হচ্ছে—পবিত্রতা। মাটি জল প্রভৃতির দ্বারা শরীর শুদ্ধ হয়—উত্তম। দুনিয়ায় এমন জাত কোথাও নেই যাদের শরীর হিঁদুদের মতো সাফ। হিঁদু ছাড়া আর কোন জাত জলশৌচাদি করে না। তবু পাশ্চাত্যদের—চীনেরা কাগজ ব্যবহার করাতে শিখিয়েছে, কিছু বাঁচোয়া। স্নানও নেই বললেই হয়। এখন ইংরেজরা ভারতে এসে স্নান ঢুকিয়েছে দেশে।'[৪৪] বাহ্যিক শৌচ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুটি জাতির দৃষ্টিভঙ্গি কি সুন্দরভাবেই না তুলে ধরেছেন স্বামীজী। আমরা ভারতীয়রা কেন স্নান করি একথাও স্বামীজী আবিষ্কার করেছেন ঃ 'আমরা স্নান করি...অধর্মের ভয়ে ; পাশ্চাত্যেরা হাত-মুখ ধোয়—পরিষ্কার হবে বলে। আমাদের জল ঢাললেই হল, তা তেলই বেড়-বেড় করুক আর ময়লাই লেগে থাকুক।'[৪৫] স্বামীজীর মতে, দেশভেদে আবহাওয়ার ভেদ হয় এবং আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে বেশ কিছু অনিবার্য রীতিনীতি গড়ে ওঠে, যেগুলি হয়তো একটি জাতির কাছে স্বাভাবিক হলেও অন্য জাতির পক্ষে গর্হিত। উদাহরণ দিয়ে বলেছেন ঃ আমাদের গরমদেশে লোক খেতে বসে যখন আড়াই ঘড়া জল খেয়ে নেয় তখন ঢেঁকুর না তুলেই বা যায় কোথায়। কিন্তু এটাই আবার পাশ্চাত্যদেশে খুবই নিন্দনীয়। আবার ওদের দেশে খেতে খেতে রুমাল বার করে নাক ঝাড়াটা ততো দোষের নয়—কারণ ঐ ঠাণ্ডাদেশে সর্দির প্রকোপে নাক না ঝেড়ে উপায় থাকে না—কিন্তু আমাদের দেশে সেটা অত্যন্ত ঘেন্নার কথা। একই আচার একদেশে স্বাভাবিক, অন্য দেশে নিন্দনীয়—এর মূলে উভয় দেশের প্রাকৃতিক পার্থক্য।

একটি জাতির লোকাচার ও জীবনধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এইসব রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার। বহু দিনের আচরিত ক্রিয়া-পদ্ধতি পরবর্তীযুগে একটা জাতির অভ্যাসে পরিণত হয় এবং কালক্রমে তা জাতীয় রীতিনীতিতে পর্যবসিত হয়। স্বামীজী যখন বলেন—'হিঁদুর শরীর পরিষ্কার হলেই হল, কাপড় যা তা হোক! বিলাতির কাপড় সাফ থাকলেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিঁদুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরককুণ্ডু থাকুক না কেন! বিলাতির মেজে কারপেটে মোড়া ঝকঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাকলেই হল!!'[৪৬]—তখন ভারতীয় তথা হিন্দুর এবং পাশ্চাত্যের লোকাচার ও লৌকিক রীতিনীতি সম্পর্কে তাঁর গভীর দৃষ্টি লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিত হই। আসলে স্বামীজীর মধ্যে ঘটেছিল সমাজতত্ত্ববিদ্ এবং নৃতত্ত্ববিদের যুগ্ম সমাহার। কখনও তারও সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনস্তাত্ত্বিকের সুগভীর বিশ্লেষণ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই ছিল নিরপেক্ষ, নিরাসক্ত এবং বাস্তব। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আচার-ব্যবহার রীতিনীতির শুভ দিকগুলির সঙ্গে সঙ্গে সেইসব অসঙ্গতিগুলিও তিনি তুলে ধরতে পেরেছেন যা সচরাচর

৪৪। তদেব, পৃঃ ১৬৮ ৪৫। তদেব, পৃঃ ১৬৯ ৪৬। তদেব, পৃঃ ১৭১

আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তাই তিনি বলেছেন যে, বহিরাচার অর্থাৎ পরিষ্কার থাকাটা অনেক সময় অত্যাচার বা অনাচার হয়ে পড়ে। ইউরোপীয়দের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, তারা মনে করে শরীর সম্বন্ধীয় সমস্ত কাজ অতি গোপনে করা উচিত। শৌচাদি তো দূরের কথা থুথু ফেলা, খেয়ে আঁচানো সকলের সামনে মহা অভদ্রতা। ফলে শরীরে ময়লা জমে দুর্গন্ধ হয়, চর্মরোগ হয়, দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। আর আমরা কি করি? দুনিয়ার লোকের সামনে রাস্তায় বসে বমির নকল করতে করতে মুখ ধুই আঁচাই, দাঁত মাজি—যে কাজগুলি স্বাস্থ্যের দিক থেকে অবশ্যই করা উচিত, কিন্তু গোপনে করা উচিত। ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে আমরা অনেক সময় ময়লা হয়ে থাকি। ময়লা ছুঁলে পাপ, তাই রাশীকৃত ময়লা ঘরের সামনে পচতে দিই। আর পাশ্চাত্যের লোকেরা ঘরের ময়লাকে সুদৃশ্য কার্পেটের আবরণে লুকিয়ে রেখে দেয়। উভয় দেশের দৈনন্দিন আচার-অভ্যাসের এই অসঙ্গতিগুলি তিনি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন কয়েকটি কথায়—'হিঁদুর পয়োনালী রাস্তার উপর—দুর্গন্ধে বড় এসে যায় না। বিলাতির পয়োনালী রাস্তার নীচে—টাইফয়েড ফিভারের বাসা !! হিঁদু করছেন ভেতর সাফ। বিলাতি করছেন বাইরে সাফ।'[৪৭] আবার সেই অসঙ্গতি দূর করবার উপায়-নির্দেশও করেছেন স্পষ্ট ভাষায়। বলেছেনঃ 'চাই কি?—পরিষ্কার শরীরে পরিষ্কার কাপড় পরা। মুখ ধোয়া দাঁত মাজা—সব চাই, কিন্তু গোপনে। ঘর পরিষ্কার চাই। রাস্তাঘাটও পরিষ্কার চাই।'[৪৮] অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ অর্থে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করাই কাম্য। তিনি যে অভিমত দিয়েছেন তা এককথায় অসাধারণ বলা চলে।

বিবাহঃ সমাজ ও পরিবার জীবনঃ

বিবাহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। একটি দেশের ঐতিহ্যগত লোকাচারের স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় যে-কোন সামাজিক বিবাহ-অনুষ্ঠানে। বিবাহের সঙ্গে সর্বদাই নানারকম বহিরঙ্গ ক্রিয়াকলাপ আচার-অনুষ্ঠান যুক্ত থাকে। কিন্তু দেশের লোকসংস্কৃতির অন্তঃসলিলা স্বরূপের ওপরই বিবাহ ব্যাপারটির মূল তাৎপর্য নির্ভর করে। যেখান থেকে একটি নিয়ম বা একটি রীতির ভাল-মন্দ নির্ধারিত হয়। স্বামীজী ভারতীয় বিবাহ-রীতির সেই অন্তঃসলিলা স্বরূপটি স্বয়ং উদ্ঘাটিত করে তার স্বর্ণদীপ্তি আমাদেরও দৃষ্টির সীমানায় নিয়ে এসেছেনঃ 'বহু-আলোচিত বিবাহ-ব্যাপারে হিন্দুরা সমাজতান্ত্রিক; সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা না করে যুবক-যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা তারা মোটেই ভাল বলে মনে করে না, কারণ যে-কোন দুটি মানুষের কল্যাণের চেয়ে সমাজের মঙ্গল অবশ্যই বড়।'[৪৯] পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতীয় বিবাহ-রীতির এই মূল পার্থক্যটি বোঝাতে গিয়ে নিবেদিতাকে তিনি বলেছিলেনঃ 'দেখছ, এ-বিষয়ে ভারত ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে! পাশ্চাত্যে বিবাহ বলতে বোঝায়, আইন-বন্ধনের বাইরে যা-কিছু, কিন্তু ভারতবর্ষে

৪৭। তদেব   ৪৮। তদেব, পৃঃ ১৭২   ৪৯। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪০৩

বিবাহ বলতে বোঝায় যে, সমাজ দুটি প্রাণীকে অনন্তকালের জন্য একটা বন্ধনে আবদ্ধ করে দিল। এই দুটি প্রাণীকে তাদের ইচ্ছা থাকুক, বা না থাকুক, জন্মে জন্মে পরস্পরকে বিবাহ করতেই হবে। এই উভয়ের প্রত্যেকেই অপরের কৃত ভালমন্দের অর্ধেকের ভাগী হয়। আর যদি একজন এ জীবনে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়ে বলে বোধ হয়, তাহলে অপরকে অপেক্ষা করতে হবে, যতদিন না সে আবার তার নাগাল পায়।'[৫০]

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন হিন্দু জননীর ছেলের বৌ আসে তার মেয়ের মতো হয়ে। বিয়ে হলে মেয়ে পরের বাড়িতে চলে যায়, বিয়ে করে ছেলে আর একটি মেয়ে ঘরে আনে এবং ছেলের বৌ মেয়ের শূন্য স্থান পূর্ণ করে তোলে। এই হচ্ছে ভারতের পারিবারিক জীবনে বিবাহ-সম্পর্কিত আচার ও সামাজিকতার স্বরূপ। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেনঃ কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষের পারিবারিক জীবনের মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে মাতৃভাবের ওপর। ভারতে জননীই আদর্শ নারী। ভারতে ঈশ্বরকে মা বলে ডাকা হয়। ভারতীয় লোকসংস্কৃতির ভিত্তিমূলে রয়েছে এই মাতৃত্বের আদর্শ। এই আদর্শই হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর উপলব্ধি ও গবেষণাজাত বক্তব্যঃ 'ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্বে—সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্য ক্ষমাশীলা জননী। জায়া জননীর পশ্চাতে থাকেন—ছায়ার মতো। স্ত্রীকে মায়ের জীবন অনুকরণ করিতে হইবে। ইহাই তাহার কর্তব্য। জননীই প্রেমের আদর্শ, তিনিই পরিবারকে শাসন করেন, সমগ্র পরিবারটির উপর তাঁহার অধিকার। ভারতে সন্তান যখন কোন অন্যায় কাজ করে, পিতা তখন তাহাকে প্রহার করেন এবং মাতা সর্বদা পিতা ও সন্তানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়ান।'[৫১]

কৃষিভিত্তিক লোকায়ত সমাজজীবনে মায়ের স্থান সবার আগে। তার কারণ প্রতিটি ভারতীয় পরিবারে মা-ই সংসারের মূল বন্ধনস্বরূপ। কৃষিকর্মে কৃষকের অধিকাংশ সময়ই কাটে মাঠে ময়দানে। গৃহ ও গৃহস্থালি রক্ষা, অতিথিসেবা, পরিবার-পরিজনের লালনপালন প্রভৃতি সমস্ত কিছুতে নিয়োজিত থেকে বাড়ির স্ত্রীলোকেরাই গৃহ ও পরিবার জীবনকে একটি শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে রাখে। তাই স্বামীজী এই উপলব্ধিতে উপনীত হন যে, 'মাতৃ-ভাব এবং মাতৃ-শব্দ হিন্দুমনে চিরদিন অনন্ত প্রেমের সহিত জড়িত। আমাদের এই মরজগতে মায়ের ভালবাসাই ঈশ্বর-প্রেমের নিকটতম। মহাসাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেনঃ করুণা কর, জননী, আমি দুষ্ট ; কিন্তু "কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়।" '[৫২]

স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতীয় নারীর মাতৃরূপটিকে অবলম্বন করেই ভারতের পারিবারিক জীবনটি কয়েক হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁর মতে মাতৃত্বই নারীত্বকে পূর্ণ করে আর এই মাতৃত্বই হচ্ছে নারীর নারীত্ব। তাই তিনি বলেছেনঃ 'হিন্দুর নিকট মাতৃত্বই নারী-জীবনের চরম লক্ষ্য।...আমার জন্মের জন্য আমার পিতামাতা বৎসরের পর বৎসর কত পূজা ও উপবাস করিয়াছিলেন! প্রত্যেক সন্তানের জন্মের

৫০। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ২৭১-৭২

৫১। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪৩১-৩২ ৫২। তদেব, পৃঃ ৪৩২

পূর্বে মাতাপিতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। আমাদের মহান স্মৃতিকার মনু আর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "প্রার্থনার ফলে যাহার জন্ম, সে-ই আর্য"। প্রার্থনা ব্যতীত যে-শিশুর জন্ম হয়, মনুর মতে সে অবৈধ সন্তান। সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতে হয়।'[৫৩] স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের লোকায়ত সমাজজীবনের ভিত্তিমূলকে। ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য যদি প্রার্থনা না থাকে তাহলে সবই বৃথা। স্বামীজী মনে করেন, মাতৃত্বের মহিমাকে নারী নিজে যদি শ্রদ্ধা করতে না শেখে, সেই মহিমাপ্রাপ্তির জন্য শুদ্ধ-পবিত্র হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে নারী যদি উপলব্ধি করতে না শেখে, তাহলে বিবাহ মিথ্যে, ঐ নারীত্ব মিথ্যে আর সেই নারীর শিক্ষা সে-ও মিথ্যে। আমাদের দেশে জননীকে পূজা করা হয়, কারণ তিনি পবিত্র। গর্ভবাসকালীন প্রভাবের দ্বারাই ভবিষ্যৎ শিশুর বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপিত হয়। এজন্যই হিন্দুদের লোকাচারে নারীর গর্ভাধান, গর্ভকালীন অবস্থা, সন্তান প্রসব ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে নানা আচার-আচরণের ও নিয়মকানুনের ব্যবস্থা আছে। স্বামীজী মনে করেন, পুরুষ যখন নারীর দেহের কাছাকাছি আসে তখন নারী কত না প্রার্থনা ও ব্রত দিয়ে ঐ মিলন-পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে। কারণ যেপথে শিশুর আবির্ভাব হয় তা যে স্বয়ং ঈশ্বরের সবচেয়ে পবিত্র চিহ্ন। তাই তিনি বলছেনঃ 'ইহা স্বামী-স্ত্রীর মিলিত শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা, যে-প্রার্থনা প্রচণ্ড ভাল অথবা মন্দ শক্তির সম্ভাবনাযুক্ত আর একটি জীবকে এই জগতে লইয়া আসিতেছে। ইহা কি একটা হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার ? ইহা কি শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি ? ইহা কি দেহের পাশবিক সুখসম্ভোগ ? হিন্দু বলে, "না, না, সহস্রবার না।" '[৫৪] সুতরাং এই মাতৃত্বের ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের পারিবারিক জীবন এবং পারিবারিক সম্পর্কের রীতিনীতিগুলি। বিবেকানন্দ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, হিন্দুর সমাজব্যবস্থায় মায়ের আসন সবার উপরে; তারপরে স্ত্রী, তারপরে মেয়ে। এই বিষয়টি বিদেশের মানুষ সাধারণত বুঝতে পারে না। কারণ, আমাদের মাতৃত্বের পরিবর্তে সেখানে জায়াভাবের কদর। স্ত্রী-ই সেখানে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারিণী। ভারতবর্ষে আমরা পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের ক্ষেত্রে যে-কোন বয়সের নারী—সে যদি শিশুও হয়, তবুও তাকে মা বলে ডাকি। আমরা স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী সবাইকে মায়েরই এক একটি রূপ বলে মনে করি। এই প্রসঙ্গে আমাদের পারিবারিক জীবনের কয়েকটি লোকাচার (যা স্বামীজীর সময় প্রচলিত ছিল এবং এখনও পর্যন্ত গ্রামীণ ভারতবর্ষে যা বহুলাংশে বর্তমান) স্বামীজীর নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করছিঃ 'ভারতীয় নারী-পুরুষের সমাজ-জীবনে এবং সম্পর্কের তারতম্যে জটিলতম জাল বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশে গুরুজনদের সম্মুখে কেহ স্ত্রীর সহিত কথা বলে না। একাকী যখন অপর কেহ থাকে না বা শুধু ছোটরা থাকে, তখনই স্ত্রীর সহিত কথাবার্তা বলা যায়। যদি আমি বিবাহ করিতাম, তাহা হইলে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রীর সামনে স্ত্রীর সহিত কথা বলিতাম, কিন্তু বড় বোন বা পিতামাতার সম্মুখে বলিতাম না। ভগিনীদের নিকট তাহাদের স্বামী সম্বন্ধে কোন কথা আমি বলিতে পারি না। ভাবটি এই যে, আমরা

৫৩। তদেব, পৃঃ ৪৩২-৩৩ ৫৪। তদেব, পৃঃ ৪৩৪

সন্ন্যাস-কেন্দ্রিক জাতি। এই একটি ভাবের উপর সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে।...

'শিশু বা সম্পর্কে ছোট না হইলে কোন পুরুষের সম্মুখে আমাদের মেয়েরা কখনও আহার করে না। মেয়েরা বলে, "মরিয়া যাইব, তবু স্বামীর সম্মুখে কিছু চিবাইতে পারিব না।" মাঝে মাঝে ভাই ও বোনেরা একত্র খাইতে বসিতে পারে। ধরুন আমি ও আমার ভগিনী একসঙ্গে খাইতেছি, এমন সময় ভগিনীর স্বামী দরজার গোড়ায় আসিয়া পড়িল—তখনই ভগিনী খাওয়া বন্ধ করিয়া দিবে, আর স্বামী-বেচারা সরিয়া পড়িবে।'[৫৫] উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুটি থেকে বোঝা যায় ভারতীয় পারিবারিক জীবন ও তার লোকাচার সম্পর্কে স্বামীজীর ধারণা কত স্বচ্ছ ছিল।

নিবেদিতা স্বামীজীকে ভারতবর্ষের পুরাতন ও নতুন ভাবধারার সংযোগপুরুষরূপে চিহ্নিত করেছেন। তিনি একদিকে যেমন হিন্দুদের আচার-আচরণের প্রাচীন ধারাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তার উপযোগিতা দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে লোকজীবন থেকে কুসংস্কারগুলিকে বাদ দিয়ে নবীন ভারতকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ হতে বলেছেন। নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থে বলেছেন যে, স্বামীজী হিন্দুর জীবনে প্রচলিত বিধিগুলিকে সবসময়েই নতুনভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এটাই দেখাতে চাইতেন যে, আধুনিক যুগের দেশ ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কিভাবে সেগুলিকে ব্যবহার-উপযোগী করে তোলা যায়। তিনি চাইতেন প্রাচীন শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের বিষয়গুলি দেশীয় লোকাচারের সঙ্গে যুক্ত হোক। আর লৌকিক আচার-আচরণ-রীতিনীতিগুলিও শাস্ত্রীয় ধারার সঙ্গে ক্রমশ সংযুক্ত হোক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র পৃথিবীর সর্বকালের সমস্ত কল্যাণপ্রদ জিনিসগুলি আত্মস্থ করেও ভারতবর্ষের সন্তানসন্ততিরা যেন একান্তভাবে ভারতীয় লোকসংস্কৃতির মানসিকতাতেই বর্ধিত হয়।

৫৫। তদেব, পৃঃ ৪৪০-৪১

তুলনামূলক আলোচনা

মানবতাবাদ ঃ বুদ্ধদেব ও বিবেকানন্দ

॥ ১ ॥

গুণদোষ-নির্বিচারে দেশজাতি-নির্বিশেষে মানবের প্রতি প্রেম-সহানুভূতি এবং মানবের দুঃখমোচনে ব্রতী হওয়ার ভাব মানবতাবাদের মূল কথা। পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ (হিউম্যানিজম), স্বামী বিবেকানন্দের মানবতাবাদ এবং বুদ্ধদেবের মানবতাবাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে বিভিন্নতা যথেষ্ট থাকলেও এই মানবপ্রেম, এই মানবসেবা যে সর্বপ্রকার মানবতাবাদের প্রাণস্বরূপ, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

বুদ্ধদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে স্থূলভাবেও পরিচিত পাঠক সহজে স্বীকার করবেন—মানবপ্রেম ও মানবসেবার ভূমিতে তাঁরা উভয়েই মহামানব। প্রেমের গভীরতায়, সেবার ব্যাপকতায় উভয়ে মানব-ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের ব্যবধানে আবির্ভূত হলেও তাঁদের উভয়কে সমপ্রকৃতি, সমমর্মী বলে চিহ্নিত করতে কষ্ট হয় না। স্বামীজীকে অনেক সময় যে বুদ্ধহৃদয় বিবেকানন্দ অথবা বুদ্ধাবতার বিবেকানন্দ অভিধায় নির্দেশ করা হয়, তা কোন মতেই অযথার্থ নয়। উভয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য কতখানি ছিল আমরা জানি না, তবে উভয়ের হৃদয়-আকর্ষণকারী ধ্যানমূর্তির সৌসাদৃশ্য দর্শককে মুগ্ধ করে।

॥ ২ ॥

উভয়ের জীবনের মূল সুর—মানবপ্রেম। উভয়ের সমস্ত চেষ্টা ও সাধনার একমাত্র লক্ষ্য—মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন, যাতে তার অধ্যাত্মচেতনার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। বাল্য থেকে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত বুদ্ধ ও বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন সুগভীর জীবপ্রেমের অমৃতধারায় রসময় হয়ে আছে। উভয়ের জীবনে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার পরিচয় আছে, বয়স ও পরিবেশোচিত কর্মে, যুগোপযোগী কর্তব্যসম্পাদনায় দক্ষতার প্রমাণ আছে, কিন্তু ঐ সবকিছুর মধ্যে 'সূত্রে মণিগণা ইব' অনুস্যূত রয়েছে একটি পরদুঃখকাতর হৃদয়ের স্নেহপেলব স্পর্শ যা জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিচারে মানুষের—শুধু মানুষের বলি কেন, ইতর প্রাণীর পর্যন্ত—অন্তর স্পর্শ করে। আর সে স্পর্শ ধীরে অথচ অব্যর্থভাবে তার দিব্যজীবনে উত্তরণ ঘটায়। উভয়ের জীবন এরূপ অজস্র ঘটনার সমাবেশে সমুজ্জ্বল। বাল্যে সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদসন্নিহিত উপবনে, উদাস অন্তর্মুখী মনে বসে রয়েছেন। সহসা দেবদত্ত-শরাঘাতে আহত একটি হংস সন্নিকটে নিপতিত হল। জননীসুলভ যত্নে সিদ্ধার্থ হংসটিকে সবে বাঁচিয়ে তুলেছেন, এমন সময় সদম্ভ পদক্ষেপে সাক্ষাৎ যমদূতের মতো তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন দেবদত্ত; দাবি করলেন তাঁর শিকারের হংস। শান্তকণ্ঠে সিদ্ধার্থ বললেন ঃ 'প্রাণীটি কার হবে? যে তাকে মারে, তার? না যে তাকে প্রাণ দেয়, তার?' কিন্তু কে শোনে সে যুক্তি! সিদ্ধার্থ শেষ পর্যন্ত

বললেন ঃ 'বরং শাক্যরাজ্য ছেড়ে দেব তোমায়, কিন্তু আহত এ হংস আমি দেব না।'

আরও পরের কথা। নৃপতি বিম্বিসারের কাছে বুদ্ধদেব নিজের প্রাণের বিনিময়ে ছাগশিশুর প্রাণভিক্ষা চাইলেন। বললেন ঃ যদি আপনি মনে করেন যে, বলিদান বিনা দেবারাধনা সম্পূর্ণ হবে না, তবে ছাগশিশু বলি দিয়ে আপনার যা পুণ্য হবে, আমায় বলি দিলে আরও বেশী পুণ্য হবে। আমায় বলি দিয়ে ছাগশিশুগুলিকে দয়া করে ছেড়ে দিন।

দ্বাদশ বৎসর করেছি কঠোর তপ—
যদি তাহে হয়ে থাকে ধর্ম-উপার্জন,
করি রাজা তোমারে অর্পণ—
সুপুত্র হউক তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ—
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ,—
বধ, রাজা, আমার জীবন—
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান।

আশৈশব নরেন্দ্রনাথের পরদুঃখকাতরতার পরিচয় পাই। আর্তের আর্তি দেখলে যেন আর রক্ষা নেই। বাড়ির যা কিছু পান, তাদের দিয়ে ফেলেন। এরূপ ছেলেকে নিয়ে সংসার করা দায়। মা বিরক্ত হয়ে ছেলেকে দোতলায় গৃহবন্দী করেছিলেন। তার ফলে জানালার ফাঁক দিয়ে ছেলে বাড়ির মূল্যবান বস্ত্র গরীবদুঃখীদের দিতে শুরু করেছিলেন। রাস্তায় কচি এক বালক গাড়িচাপায় মৃত্যুর মুখোমুখি। নিজের প্রাণ বিপন্ন করে নরেন্দ্র তার জীবন রক্ষা করলেন। খেলার মাঠে দোলনার কাঠ ওঠাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটল। সাহায্যকারী বিদেশী নাবিক আহত হল। সঙ্গীরা অধিকাংশ পালাল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ অন্তরঙ্গ দু-চারজনকে নিয়ে নাবিকের সেবাশুশ্রূষায় রত হলেন। পরীক্ষার 'ফি'-র অভাবে সহপাঠীর দুর্ভাবনা নরেন্দ্রনাথ নিজের বুকে টেনে নিলেন। তার বেতন মকুব করার স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব বহু কষ্টে কৌশলে পালন করেছিলেন।

আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির পথ আবিষ্কারের দুর্লভ দুর্জয় সঙ্কল্প সিদ্ধার্থকে রাজপ্রাসাদ-ছাড়া করে সন্ন্যাসের ধূলিধূসরিত পথে নামিয়েছিল, আমরা জানি। কিন্তু তাঁর ঐ সঙ্কল্প কখনও ব্যক্তিগত দুঃখের অবসানস্পৃহা অথবা নির্বাণপিপাসাপ্রসূত ছিল না। সন্ন্যাস-অবলম্বন ও সাধনার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, কারণ বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর দুঃখময় ক্রন্দন তাঁর কর্ণে প্রবেশ করেছিল এবং তাঁর করুণার্দ্র হৃদয় জগতের ব্যথাদ্বারা কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

This will I do because the woeful cry
Of life and all flesh living cometh up
Into my ears, and all my soul is full
Of pity for the sickness of this world.[১]

১। The Light of Asia—Sir Edwin Arnold, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., London, 1908, p. 62

বস্তুত, তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির, সমাধি ও কর্মের একটিমাত্র লক্ষ্য ছিল—মানুষের দুঃখ দূর করা। দ্বিতীয় কোনও উদ্দেশ্য সেখানে ছিল না। এমনকি দৃশ্যমান জীবজগতের অন্তরালস্থিত পরমার্থসত্যের অন্বেষণস্পৃহাও তাঁর সাধনার হেতুভূত কারণ নয়। সত্যান্বেষণ যা তিনি করেছেন, তা মানুষের দুঃখমোচনের জন্যই। সত্যের জন্যই সত্যান্বেষণ তাঁর ঈপ্সিত ছিল না—স্পষ্টই মনে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দেরও জীবনে ছিল ঐ একটিমাত্র সুর—সীমাহীন নিঃস্বার্থপরতা, যার অপর নাম বিশুদ্ধ মানবপ্রেম। ব্যক্তিগত জাগতিক সুখ তো নয়ই, ব্যক্তিগত সমাধিসুখও তাঁর কাম্য ছিল না। শৈশব থেকেই তাঁর যেন মজ্জাগত ধারণা যে তিনি ব্যক্তিসুখলাভের জন্য জন্মগ্রহণ করেননি। ঈশ্বরদর্শনের জন্য, জগৎবৈচিত্রের অন্তরালে অবস্থিত পরমসত্য লাভের জন্য যখন তিনি অশান্ত উদ্বেল প্রাণে সাধক থেকে সাধকান্তরের কাছে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন, অথবা যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হবার প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন, তখন মানুষের ব্যথাদরদী তাঁর হৃদয়খানি অন্তর্লীন হয়ে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় ছিল, বেশ অনুমান করা যায়। যে পরমসত্য-অমৃত তিনি জগদ্বাসীকে বিলাবেন, তা তো আগে অর্জন করা চাই! মনে হয়, সাধনকালে তাঁর ঈশ্বরদর্শন বা সমাধিনিমজ্জনস্পৃহা যে অন্য সবকিছুকে এমনকি লোকহিত-কামনাকেও ছাপিয়ে উঠেছিল, সেও ঐ মানবপ্রেমকে সার্থক বিকাশের পথ দেখাবার জন্যই। নিজ প্রার্থনামতো নির্বিকল্প সমাধিতে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের তিনি সাক্ষাৎকার করলেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আজীবন-বিস্মৃত-হবেন-না—এমন তিরস্কারও লাভ করলেন ঃ 'ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস!'[২] বিবেকানন্দ যে নিজের মুক্তিতে তৃপ্ত থাকেননি—সর্বমুক্তি যে তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়েছিল, সেকথা তাঁর উত্তরজীবন সন্দেহাতীতভাবে সপ্রমাণ করছে। এই বিবেকানন্দই এক সময় ভারতের নিপীড়িত মানুষের ব্যথায় করুণাশ্রু-ছলছল হয়ে বলছেন গিরিশচন্দ্রকে ঃ 'দেখ, গিরিশবাবু, মনে হয় এই জাতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে।'[৩] অথবা ভারতের পথে লণ্ডন থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে প্রাণস্পর্শী ভাষায় ঃ 'আমার হয়তো এমনও মনে হইতে পারে যে, এই দেহ হইতে মুক্ত হওয়া—পরিত্যক্ত বস্ত্রের ন্যায় ইহাকে ছুঁড়িয়া ফেলাই সমীচীন। কিন্তু যতদিন মানবজাতির সকলে সর্বোত্তম সত্যকে জানিতে না পারিবে, ততদিন আমি কখনও প্রচারকার্য বা সাহায্যবিতরণ হইতে বিরত হইব না।'[৪] সম্বোধিলাভের পর মানুষকে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির পথ দেখাতে,

২। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৮২

৩। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৫), পৃঃ ৪২১

৪। তদেব, পৃঃ ৩২৯

তাকে সেবাযত্ন, আশাতরসা,' উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা সেপথে এগিয়ে নিয়ে যেতে বুদ্ধদেব কিভাবে জীবনের অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ বছর[৫] তিল তিল করে ক্ষয় করেছেন, ইতিহাসের পাতায় মনে হয়, তার একটা আবছা চিত্র মাত্র অঙ্কিত রয়েছে। অল্প যেসব ঘটনা আমরা জানি, তা যখন আমরা অনুধ্যান করি, তখন মানবতার এই একনিষ্ঠ পূজারীর একটা মাতৃহৃদয় আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। চোখের সামনে জেগে ওঠে নরঘাতক দস্যু অঙ্গুলিমালের শ্রমণ অঙ্গুলিমালে রূপান্তরের দিব্য কাহিনী। জেগে ওঠে সেই চিত্র যেখানে তিনি দরদভরা প্রাণে পুত্রশোকাতুরা জননীকে দ্বারে দ্বারে পাঠাচ্ছেন এমন বাড়ি থেকে একমুষ্টি সর্ষপ সংগ্রহণের জন্য, যে বাড়িতে কেউ কখনও মরেনি। মনে পড়ে দৃশ্য যেখানে তিনি রাজপুরুষের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে সমাজের ঘৃণা-অবহেলিত গণিকা আম্রপালীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে তাকে কৃতার্থ করছেন, অথবা নারীজাতির প্রতি করুণাপরবশ হয়ে তাঁদের সন্ন্যাসিসঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছেন। আর মনে পড়ে সেই অন্তিম দৃশ্যটি যখন মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে দরিদ্র ভক্ত চুন্দ প্রদত্ত গুরুপাক আহার গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করছেন, আর মহাপরিনির্বাণ-প্রাক্কালে চুন্দের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য রেখে যাচ্ছেন স্নেহমধুর কয়েকটি কথা: 'চুন্দ যেন দুঃখ না করে যে তার প্রদত্ত আহার্য গ্রহণে বুদ্ধ দেহত্যাগ করলেন বরং যেন আনন্দিত হয় এই ভেবে যে, যেমন সুজাতার পায়সান্ন ভক্ষণের পর বুদ্ধ নির্বাণ পদবী লাভ করেছিলেন, তেমনি তিনি চুন্দ-নিবেদিত আহার্য গ্রহণান্তে মহাপরিনির্বাণলাভ করবেন।' বুদ্ধদেব কঠোর জীবনচর্যায় প্রত্যহ আট-দশ মাইল পথ পরিব্রাজন করে দ্বারে দ্বারে—নির্বাণে উচ্চনীচ, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলের অবারিত অধিকার, নৈতিক জীবনযাপনে সকলের প্রয়োজন—এই নববার্তা পৌঁছে দিয়েই ক্ষান্ত হননি। সৃষ্টি করলেন এক নবীন উদার শ্রমণ (সন্ন্যাসী)-সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গণ্যমান্যরা সে সম্প্রদায়ে যেমন স্থান পেল, তেমনিভাবে স্থান পেল ক্ষৌরকার তনয় উপালীর মতো তৎকালীন সমাজের অবহেলিত মানুষ।[৬] সেবার মহান ব্রতে বুদ্ধদের ভিক্ষুদের উদ্বুদ্ধ করলেন: 'যাও ভিক্ষুগণ, দিকে দিকে পরিভ্রমণ কর—বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় এই মহদ্ধর্মের প্রচারব্রত গ্রহণ কর।'[৭] দিকে দিকে অন্ন, বস্ত্র, ওষুধ, পথ্য, শিক্ষা ও ধর্ম সর্ববিধ উপায়ে মানবসেবার দ্বার উন্মোচিত হল। শুধু হাসপাতাল আর পিঞ্জরাপোল নয়, নালন্দা-তক্ষশিলার মতো ধর্মশিক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষায়তন, সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম-জীবন-শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে অজস্র বৌদ্ধবিহার। সেবা, প্রেম ও মৈত্রীভাবনার একটা প্লাবনে দেশ ভরে গেল। সে প্লাবনের পলিমাটিতে দেশের সমাজব্যবস্থা, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, রীতিনীতি, আচারবিচার, উৎসব-অনুষ্ঠান নতুন স্বাস্থ্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর গিরিগুহায় তপশ্চরণের ব্রত নিয়ে নরেন্দ্রনাথ বেশীদিন ডুবে থাকতে পারলেন না। যে মানবপ্রেমের বাহুডোরে বাঁধা পড়ে সপ্তর্ষিলোক থেকে তাঁর অন্তরাত্মা ধরণীর ধূলিতে নেমে এসেছিল, সে তাঁকে স্থির থাকতে দেবে কেন?

৫। ভারতের সাধক, চতুর্থ খণ্ড—শঙ্করনাথ রায়, প্রাচী পাবলিকেশনস, ১৩৬৫, পৃঃ ৩০

৬। তদেব, পৃঃ ২৮ ৭। গৌতম-বুদ্ধ—রমণচন্দ্র ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৩৩৮, পৃঃ ৬৫

আজ রাজপ্রাসাদ, কাল তরুমূলে বাস, আজ গণ্যমান্যের সাহচর্যে, কাল সমাজের অন্ত্যজ পদদলিতের পর্ণকুটিরে, এইভাবে আসমুদ্রহিমাচল ভারতপরিক্রমা করে ভারতের লক্ষকোটি নরনারায়ণের অধ্যাত্মজীবনের গতিপ্রকৃতি শুধু নয়, লৌকিক, প্রাত্যহিক, জাগতিক জীবনের সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, আশা-নিরাশার সঙ্গে সহানুভূতিতে এক হয়ে গেলেন বিবেকানন্দ। হৃদয়টা এত বড় হয়ে গিয়েছিল যে, যেন ছটফট করছিলেন—দুর্গত মানুষের সেবার জন্য কিছু করতে। আমেরিকা রওনা হবার প্রাক্কালে আবু রোডে হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ)-কে, 'মুখে একটা গভীর বিষাদের ছায়া নিয়ে এবং ভাবাতিশয্যে কম্পিতকলেবরে' বলেছিলেন ঃ '"হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না। ...কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে!" তাঁর কণ্ঠ ভাবাবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি আর বলতেই পারছিলেন না—চোখের জল পড়তে লাগল।'[৮] স্মৃতিচারণ-প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলতে বলতে স্বামী তুরীয়ানন্দও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ অশ্রুসিক্তনয়নে নীরবে বসে রইলেন। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলেছিলেন ঃ 'স্বামীজী যখন্ ঐ কথাগুলি বলছিলেন, তখন...আমি ভাবছিলাম ঃ "বুদ্ধও কি ঠিক এমনি অনুভব করেননি, আর এমনি কথা বলেননি?" ...আমি যেন ঠিক দেখছিলাম যে, জগতের দুঃখে স্বামীজীর হৃদয় তোলপাড় হচ্ছে—তাঁর হৃদয়টা যেন তখন একটা প্রকাণ্ড কড়াই, যাতে জগতের সমস্ত দুঃখকে রেঁধে একটা প্রতিষেধক মলম তৈরী করা হচ্ছিল।'[৯] পরবর্তীকালের অনুরূপ একটি ঘটনা—স্থান কলিকাতাস্থ বলরাম বসুর বাসভবন। প্রত্যক্ষদ্রষ্টা স্বামী তুরীয়ানন্দ বলছেন ঃ 'স্বামীজীকে দেখতে এসে দেখি, তিনি এত গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে বারাণ্ডায় পায়চারি করছেন যে, আমার আগমন টেরই পেলেন না। পাছে তাঁর চিন্তায় বাধা পড়ে এই ভয়ে আমি চুপ করে রইলাম। একটু পরে স্বামীজী চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মীরাবাই-এর একটি বিখ্যাত গান গুন্‌গুন্ করে গাইতে লাগলেন। পরে নিজের হাত দুখানিতে মুখ লুকিয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে বিষাদভরে গাইলেন, "দরদ না জানে কোই!...ঘায়ল কী খত ঘায়ল জানে, আওর না জানে কোই"—এই বিষাদময় গানে যেন সমস্ত আকাশ-বাতাস স্পন্দিত হচ্ছিল। ...একটু পরেই বুঝতে পারলাম—জগতের দুঃখিত নিপীড়িতদের দুঃখের প্রতি এক অপার সহানুভূতিতেই তাঁর এই ব্যথা!'[১০] বিবেকানন্দকে কেন বুদ্ধহৃদয় বলা হয় তার ব্যাখ্যা এরপর নিষ্প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দার্জিলিঙে রয়েছেন (এপ্রিল ১৮৯৮)। সংবাদ পেলেন কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং তা করালমূর্তি ধারণ করার সম্ভাবনা। বিশ্রামসুখ স্বামীজীর বিস্বাদ লাগল। পাহাড় থেকে নেমে শিষ্য ও গুরুভ্রাতাদের সহযোগিতায় সেবাকার্যের বড় পরিকল্পনায়, ব্যবস্থাপনায় রত হলেন। যখন প্রশ্ন করা হল, 'টাকা আসবে কোথা থেকে?' স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন ঃ 'কেন,

৮। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪২১ ৯। তদেব ১০। তদেব, পৃঃ ৪২১-২২

দরকার হলে নূতন মঠের (বেলুড় মঠ স্থাপনের জন্য নূতন ক্রীত জমি) জমি-জায়গা বিক্রি করে দেব।' কার্যত বেলুড় মঠ বিক্রি করতে হয়নি সত্য। কিন্তু কতবড় মহাপ্রাণ ছিলেন স্বামীজী! যে মঠস্থাপনের স্বপ্ন সুদীর্ঘ বারো বছরের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে রূপ দিতে যাচ্ছেন, তা এত সহজে অম্লানবদনে আর্তসেবার জন্য বিক্রি করার প্রস্তাব বিবেকানন্দের মতো মানবপ্রেমিকই পারেন।

দরিদ্র পদদলিত নিপীড়িত ভারতবাসীর কথা চিন্তা করে তিনি যে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, কত উষ্ণ অশ্রু মোক্ষণ করেছেন, কে তার ইয়ত্তা করে! আমেরিকা থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট তারিখে লিখছেনঃ 'আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অতি অদ্ভুত জিনিস। কারাবাসিগণের সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তাহারা ফিরিয়া গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়! কী অদ্ভুত, কী সুন্দর!...ইহা দেখিয়া তারপর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই, পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না—কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ...দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে। ...আমি এইদেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু হে মান্দ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা—দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।...সমস্যাটির অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া দেখ! এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। কিন্তু আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের জয় হউক—আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। ...কেবল বিশ্বাসী হও। ...বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি।'[১১] বেলুড় মঠে কায়িককর্মে রত সাঁওতাল স্ত্রীপুরুষদের নিজে পরিতোষপূর্বক খাইয়ে স্বামীজী বলছেনঃ 'এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরল চিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা আর দেখিনি! ...এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? ...ইচ্ছা হয়—মঠফট সব বিক্রি করে দিই, এইসব গরীব-দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না! আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? ...আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদ্দাফরাশ

১১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩৬৩-৬৭

একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে,—হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে!...আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি—"ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে"। দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাথি!...তোরা সব বুদ্ধিমান ছেলে, হেথায় এতদিন আসছিস। কি করলি বল্ দিকি? পরার্থে একটা জন্ম দিতে পারলিনি? ...এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা, তবে জানবো—আমার কাছে আসা সার্থক হয়েছে।'[১২]

বস্তুত, স্বামীজী যে অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতির কথা বলেছেন, তিনি নিজে ছিলেন সেই বিশ্বাস, সহানুভূতি ও প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ।

বুদ্ধের মানবপ্রেম যেমন নিছক একটা হৃদয়বৃত্তিরূপে তাঁর মানসলোকে সীমাবদ্ধ থাকেনি, মানবসেবার বিচিত্র ক্ষেত্রে আপনাকে প্রকাশ করেছিল, বিবেকানন্দের মানবপ্রেমও মানবসেবার কর্মভূমিতে বহু উপায়ে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে। শরীরের ক্ষুধা, বুদ্ধির ক্ষুধা এবং বোধির ক্ষুধা দূর করবার, অন্ন, বিদ্যা ও ধর্ম দিয়ে তাঁর বহুমুখী সেবাযজ্ঞের কথা সর্বজনবিদিত। দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সাধারণ শিক্ষা, কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান-কারিগরি শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা সেবাযজ্ঞের নানা অঙ্গমাত্র।

॥ ৩ ॥

বিবেকানন্দের ভারতপ্রেম ও ভারতসেবা তাঁর মানবপ্রেম ও মানবসেবারই একটি দিক; কিন্তু তা সত্ত্বেও কারও কারও মনে সন্দেহ জাগে বুঝিবা স্বামী বিবেকানন্দের প্রেম নির্বিশেষ মানবপ্রেম নয়—গণ্ডিবদ্ধ স্বদেশপ্রেম; তাঁর মানবতাবাদ আসলে হয়তো বা শুধু স্বদেশপ্রেম। স্বামীজীর জীবনের কেবলমাত্র একজাতীয় ঘটনা ও উক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচারের ফলে এরূপ ভ্রান্তধারণার সৃষ্টি হতে পারে। তাঁর অন্যরূপ উক্তি এবং অন্য তাৎপর্যব্যঞ্জক ঘটনাগুলি জানলে তাঁর মানবতাবাদ যে শুধু ভারতবাসীকে কেন্দ্র করে নেই—দেশ-জাতি-কুল-নির্বিশেষে মানুষকেই আশ্রয় করে রয়েছে, তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। ভারতবর্ষের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, কাজেই তাঁর প্রেম সহানুভূতি সেবাপ্রবৃত্তি ভারতবাসীর দিকে স্বভাবতই প্রথমে ধাবিত হয়েছে, যেমন বুদ্ধদেবের ধর্মোপদেশনা ও পরিব্রাজনের প্রথম ফলভাগী হয়েছে তাঁর জন্মস্থানের, পূর্বভারতের অধিবাসিবৃন্দ। কিন্তু প্রথম ফলভাগী তারা হলেও বুদ্ধের জীবন ও বাণী যেমন সার্বজনীন মানুষের উদ্দেশ্যে আচরিত ও কথিত, এক্ষেত্রে স্বামীজীর জীবন ও বাণী তেমনিভাবে সর্বদেশের মানুষের কল্যাণকামনায় উদ্‌যাপিত ও কথিত। তবুও স্বামীজীর নিবিড় স্বদেশপ্রেম তাঁর মানবতাবাদকে সংশয়ের বিষয় করে তোলে অগভীর পাঠকের কাছে। স্বামীজী বলছেন ঃ 'যতদিন এদেশের একটা

১২। তদেব, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৩৫-৩৬

কুকুরও অভুক্ত থাকবে ততদিন আমার ধর্ম হবে সে কুকুরকে খাওয়ান।'[১৩] বিদেশে যে ধর্ম প্রচার করতে গেছেন—সেখানেও তার আদিকারণ বলেছেন—ভারতের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ করা, অন্তত ভারতের কাজের জন্য একটা বিহিত করা যায় কিনা তার চেষ্টা করা। অর্থাৎ প্রতীচ্যে বেদান্তপ্রচার যেন শুধু ভারতকে সাহায্য করার জন্য—প্রতীচ্যের স্বার্থে নয়। ২০ জুন ১৮৯৪ তারিখে শ্রীহরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে স্বামীজী লিখছেনঃ 'আমার এখানে আসিবার মুখ্য উদ্দেশ্য—নিজের একটি বিশেষ কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।' পত্রমধ্যে ব্যাখ্যা করে বলেছেনঃ বিশেষ কাজটি হল ভারতের জনসাধারণের উন্নয়নকর্ম তাঁর পরিকল্পনামতো শুরু করা।[১৪] ২০ আগস্ট ১৮৯৩ তারিখে আলাসিঙ্গাকে লিখছেনঃ 'দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। ...হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি।'[১৫] স্বামীজীর মনোভাব উপরি-উক্ত দুটি উদ্ধৃতিতে সুব্যক্ত। স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে সাধারণ শ্রোতা ও বিশিষ্ট অনুরাগিবৃন্দ-প্রদত্ত কিছু অর্থ এনেছিলেন যার দ্বারা বেলুড় মঠের পত্তন সম্ভব হয়েছিল—এটা সত্য। কিন্তু তাই বলে স্বামীজীর জীবনোদ্দেশ্য কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মানুষগুলিকে লক্ষ্য করে আবর্তিত হয়েছে মনে করলে মহা ভুল হবে। ভারতের ক্ষুধাপীড়িত, অশিক্ষামজ্জিত আর্ত মানুষের আর্তিহরণের জন্য আমেরিকায় গিয়ে স্বামীজী আর এক ধরনের আর্ত পীড়িত মানুষের সাক্ষাৎ পরিচয় পেলেন। দেখলেনঃ সে মানুষ দারিদ্রবশত নয়, ঐহিক আতিশয্যবশত বড় দুঃখী, বড় অসহায়। বড় বড় প্রাসাদ, সুন্দর সুন্দর গাড়ি, বর্ণাঢ্য হ্যাট-কোট-প্যান্টলুনের আড়ালে, অজস্র আরাম-বিলাস-বিভবের অন্তরালে সে মানুষের অন্তরে যে একটা করুণ আর্তনাদ, একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস রয়েছে, বিবেকানন্দের মর্মে তা সাড়া দিয়েছিল। তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে চিনেছিলেন দেবলোকের—সপ্ত-ঋষির অন্যতম বলে, মানুষের দুঃখে দুঃখী হয়ে—শুধু ভারতবাসীর দুঃখে দুঃখী হয়ে নয়—ধরাধামে অবতীর্ণ ঋষিরূপে। সে স্বরূপ তাঁর যাবে কোথা? আর তাঁর গুরু ছিলেন মানবপ্রেমে আপনহারা পাগলপারা—স্বার্থ সম্বন্ধে কোনও বুদ্ধি নেই, বিতরণের ক্ষেত্রে কোনও হিসাব নেই। বেহিসাবী গুরুর বেহিসাবী চেলা বিবেকানন্দেরও বিদেশে গিয়ে সব হিসাব যেন গোল হয়ে গেল। দেনাপাওনার কথা ভুলে গিয়ে অধ্যাত্মক্ষুধাতুর, ঈশ্বরাদর্শহীন মানুষের ব্যথা দূর করার জন্য, তাদের জীবনকে, দৃষ্টিভঙ্গিকে আধ্যাত্মিকতার পবিত্র আলোকে সমুজ্জ্বল করার জন্য তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটা বৎসর অকাতরে বিলিয়ে দিলেন। ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় ধর্ম ভারতেই রয়েছে। তাকে শুধু বিশোধিত করে কাজে লাগাতে হবে আর বাইরে থেকে বিজ্ঞান ও জাগতিক বিদ্যা এনে ভারতের মানুষগুলির সেবা

১৩। The Life of Swami Vivekananda, Vol. 2—His Eastern and Western Disciples, Advaita Ashrama, Calcutta, Fifth Edition (1981), p. 440

১৪। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৪ ১৫। তদেব, পৃঃ ৩৬৬

করতে হবে।—এই হল সংক্ষেপে ভারতের সম্বন্ধে স্বামীজীর প্ল্যান। তেমনিভাবে পাশ্চাত্যের বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসার্হ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে তাদের জীবনে অন্তর্মুখিতা, আধ্যাত্মিকতার আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে—এ হল প্রতীচ্যের সম্বন্ধে স্বামীজীর প্ল্যান। কাজেই পাশ্চাত্যে গিয়ে পাশ্চাত্যের কল্যাণের জন্যই সার্বজনীন ধর্মপ্রচারে স্বামীজী তিলে তিলে নিজেকে প্রায় ক্ষয় করলেন। এই বিশ্বজনীন ব্রত স্বামীজীর কাছে সর্বদা দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিল। শ্রীযুক্ত ই. টি. স্টার্ডিকে তিনি লিখছেন ঃ 'ভারতকে আমি সত্য সত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশতঃ লোকে যাহাদিগকে "মানুষ" বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই "নারায়ণের"ই সেবক।'[১৬] বস্তুত, 'যদিও তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর, এবং তাঁহার উপর ভারতবর্ষ একা কোন বিশেষ দাবি করিতে পারে না। নরনারীকে তাহাদের দিব্যভাব সম্বন্ধে সচেতন করা—মানবজাতির ঐক্য সম্বন্ধে সকলকে জাগ্রত করাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাঁহার প্রচারের উদ্দেশ্য।'[১৭] স্বামীজী যখন প্রতীচ্যে অধ্যাত্মসাধনার প্রচার ও শিক্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বাস্তবিকই তাঁকে সেদেশের অধিবাসিবৃন্দ একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, পরমপ্রেমময় আচার্য বলে অন্তর থেকে অনুভব করতেন। অবশ্য ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালবাসার অন্যতর কারণও ছিল। সে কারণটি হল ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ এবং তার মানবসভ্যতাকে অধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত রাখার ক্ষমতা। প্রত্যক্ষভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন এবং জগতের ইতিহাসপাঠ-জনিত জ্ঞানদ্বারা স্বামীজী নিশ্চিতরূপে বুঝেছিলেন যে, ভারত তার অধ্যাত্মসম্পদের দ্বারা মানবসভ্যতার অধ্যাত্মসাধনারূপ অঙ্গটি বাঁচিয়ে রেখেছে। ভারতবাসীর বিপর্যয়ে ভারতীয় অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির বিলোপ। ভারতের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতি-উৎসাদনে বিশ্বসভ্যতা-সংস্কৃতির সমূহ সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী। 'ভারত কি মরে যাবে? তা যদি হয় সারা পৃথিবী থেকে সমস্ত আধ্যাত্মিকতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; সর্বপ্রকারের নৈতিক পূর্ণতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে...। এরূপ কখনও হতে পারে না।'[১৮] যাতে এরূপ না হয়, সেজন্য স্বামীজী ভারতবর্ষকে, ভারতবাসীকে বিশেষভাবে ভালবেসেছেন। জগতের মানুষকে সমভাবে ভালবাসেন বলেই ভারতকে বিশেষভাবে ভালবাসা। ভারতের ভাল হবার উপর পৃথিবীর ভাল হওয়া, পৃথিবীর আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার নির্ভর করছে। কিন্তু স্বামীজী সুস্পষ্ট ঘোষণা করছেন ঃ 'আমি যেমন ভারতের তেমন বিশ্বের।'[১৯] সত্যই, গভীরতর স্বদেশপ্রেমের সহিত উদারতম বিশ্বপ্রেমের দুর্লভ মিলন স্বামীজীর জীবনে সঙ্ঘটিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, স্বামীজীর ভাষণ ও রচনাদি পড়লে কোনও সন্দেহ থাকে না যে ভারতের কল্যাণপ্রচেষ্টায় তিনি বেশীরকম ব্যাপৃত থাকলেও তাঁর লক্ষ্য মানবজাতির কল্যাণ, তাঁর ব্রত মানুষকে দেবতা করার ব্রত।

১৬। তদেব, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৯১ ১৭। উদ্বোধন, ৬৫ বর্ষ, পৃঃ ২

১৮। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition (1962), p. 348 ১৯। ibid., Vol. V, Eighth Edition (1964), p. 95

মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব পরিস্ফুট হতে সাহায্য করা ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। তাঁর অন্য কাজ, অন্য প্রেম (অর্থাৎ ভারতপ্রেম) ঐ মানবপ্রেম-পারাবারে তরঙ্গ বিশেষ। 'স্বামীজী...প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূখণ্ডের কল্যাণচিন্তায় ও মঙ্গলসাধনে ব্রতী—সব দেশই তাঁহার আপনার দেশ, সব মানুষই তাঁহার আপনার জন।'[২০] তিনি তাঁর যে জীবনাদর্শ বিবৃত করেছেন ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত ৭ জুন ১৮৯৬ তারিখের চিঠিতে, তাতে কোন দেশকালের গণ্ডিবদ্ধ মানুষের ধারণাই নেই। তিনি লিখছেনঃ 'আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এইঃ মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।'[২১] 'আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত' হবার জন্য, 'ভোগবাদজাত দানবনাশে'র জন্য দেশ-কাল-নির্বিশেষে তিনি মানুষকেই আহ্বান করেছেন, শুধু ভারতবাসীকে নয়। 'হে মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্তর কোন্ কাজ আছে?'[২২] বস্তুত, স্বামীজী আজীবন এই মহত্তম কাজটি—মানুষের দেবত্বকে উদ্বোধিত করার কাজটিই শুধু করেছেন। মানবতার পূজারী হিসাবে তাঁকে বিচার করার সময় এই সত্যটুকু সর্বদা মনে রাখতে হবে। তিনি মানুষ হিসাবে মানুষের প্রতি কিরূপ দয়ার্দ্র ব্যবহার করতেন তার বহু বিবরণ তাঁর জীবনীতে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। এইসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, লাঞ্ছনা দেখলেই স্বামীজী নিশ্চিতভাবে দুর্গতদের পক্ষ নিতেন, নিজের ভারতবাসী-বোধ পর্যন্ত যেন মুছে যেত। ভারতের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ করা তাঁর আমেরিকা যাওয়ার অন্তত প্রারম্ভিক উদ্দেশ্য ছিল, আমরা জানি। কিন্তু সেখানে যে অর্থ বক্তৃতাদ্বারা পাচ্ছিলেন—ভাবতে অবাক লাগে—'এই স্বোপার্জিত অর্থও আবার অনেক ক্ষেত্রেই আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করিতেন।'[২৩] তাঁর গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে আমেরিকায় তাঁর কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছিলেন—আদর্শ জীবনযাপন করে, নিখিলবিশ্বকে আপনার দেশ মনে করে পাশ্চাত্যের লোকের মনে অধ্যাত্মভাব জাগ্রত করতে আর ভারতবর্ষকে ভুলে যেতে, অর্থাৎ স্বাদেশিকতার ঊর্ধ্বে ঈশ্বরীয় ভাবপূর্ণ মানবিকতার ভূমিতে বাস করতে। 'হরি ভাই, জীবন দেখাও, আর ভারতকে ভুলে যাও।'[২৪] এই ছিল তাঁর মুখোচ্চারিত কথা, তুরীয়ানন্দের প্রতি। আমেরিকায় অবস্থানকালে এক সময় এক হোটেলওয়ালা তাঁকে নিগ্রো মনে করে হোটেলে প্রবেশ করতে দিল না বরং অভদ্রভাবে তাড়িয়ে দিল।

২০। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২০

২১। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৯৮

২২। তদেব, পৃঃ ২৯৯ ২৩। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৬

২৪। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, প্রথম ভাগ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪৭৮

তবুও তিনি বললেন না যে, তিনি ভারতীয় হিন্দু, নিগ্রো নন। কারণ এরূপ বলে তিনি হোটেলে সহজে স্থান পেলেও তার দ্বারা এটা বোঝাত যে, মানুষ হিসাবে নিগ্রোরা ছোট এটা যেন তিনি মেনে নিলেন। অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে স্বামীজী পরে সেই শহরে সুন্দর বক্তৃতা দিলেন ; হোটেলওয়ালা নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে তাঁর কাছে এসে ক্ষমা চাইল। এক নাপিতের দোকান থেকেও একবার এভাবে তাঁকে অপমানিত হয়ে সরে যেতে হয়েছে। সেখানেও স্বামীজী 'আমি নিগ্রো নই—আমি ভারতীয়' এভাবে আত্মপরিচয় দিয়ে নিজের সুবিধা খুঁজে নেননি। 'কেন তিনি এসব স্থলে আত্মপরিচয় দিলেন না'—জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্যের এ প্রশ্নের উত্তরে পরে বলেছিলেন ঃ 'কি, অপরকে ছোট করে আমি বড় হব ? আমি তো পৃথিবীতে সেজন্য আসিনি !'[২৫] মানবতার প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম ; মানবতাকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত এমন কি জাতিগত লাভালাভের প্রশ্ন ছিল তাঁর কাছে গৌণ।

পাশ্চাত্য থেকে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনের কালে কায়রোর পথে একটি ঘটনা। সঙ্গীদের সাথে স্বামীজী পথ হারিয়ে শহরের একটি কুখ্যাত গণিকাবেষ্টিত অঞ্চলে এসে পড়েছেন। সঙ্গিগণ অপ্রস্তুত ! পথের ধারে বিচিত্রভূষণে ভূষিত রমণীরা দ্বারপ্রান্তে বসে আছে। তাদের কেউ কেউ স্বামীজী ও সঙ্গীদের আহ্বান করাতে সকলের চমক ভাঙল। বন্ধুগণ দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাবার জন্য ব্যগ্র হলেন। করুণাবিগলিত হৃদয় স্বামীজী কিন্তু ধীরে ধীরে সঙ্গীদের কাছ থেকে সরে গিয়ে বেঞ্চিতে উপবিষ্টা রমণীদের দিকে এগিয়ে চললেন। বলতে লাগলেন ঃ 'আহা বাছারা ! আহা অভাগিনীরা ! ওরা তাদের সৌন্দর্যের পায়ে নিজেদের দেবীত্বকে বলি দিয়েছে ! এখন দেখ দিকি তাদের অবস্থা !' স্বামীজী অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন। নারীগুলি নীরব, লজ্জিত, অভিভূত হল। কেউবা নতজানু হয়ে স্বামীজীর বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করে স্পেনিশ ভাষায় মৃদুস্বরে বলতে লাগল ঃ ' "ইনি ঈশ্বরজানিত মানুষ", "ইনি ঈশ্বরজানিত মানুষ", "ইনি ভগবানের লোক" !'[২৬]

স্বামীজীর জীবনদর্শন, জীবনব্রত আলোচনা করলে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, তিনি যখন যেদেশে, যে জাতির মধ্যে থেকে কর্মে ব্যাপৃত থাকুন না কেন, সর্বদাই তিনি মহামানবের—মানবরূপ নারায়ণেরই—সেবা করেছেন। তিনি চাইতেন, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ, প্রত্যেকটি সমাজ এমনভাবে গঠিত হোক যেখানে মানুষ তার শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সর্বপ্রকার সুযোগ পাবে। ভারতবর্ষে অধ্যাত্মজীবন গঠনের জন্য সাধারণ মানুষ পর্যন্ত কত সুযোগসুবিধা পায়, অথচ সেই মানুষ যদি একটু বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করতে চায়, তবে তার পথে অসংখ্য বাধা। তেমনিভাবে পাশ্চাত্যে টাকাপয়সা ভোগসুখ অর্জনের জন্য সাধারণ মানুষের পর্যন্ত সব দরজা খোলা, অথচ সে যদি ধ্যানপরায়ণ জীবন কাটাতে যায়, সমাজ ও সামাজিক পরিবেশ তাকে আদৌ সাহায্য করে না ; বরং প্রতিকূলতা করে। ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের

২৫। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৩

২৬। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৬), পৃঃ ৩৫৫-৫৬

২৭ জানুয়ারি তারিখে 'আমার জীবন ও ব্রত' বক্তৃতায় স্বামীজী বলছেন ঃ 'আমার মতে দুই দেশের ধারণাই ভুল। আমি বুঝতে পারি না এদেশে (আমেরিকায়) যদি কোনও লোক চায় সে কেন স্থির হয়ে বসে ধ্যানের সুযোগ পাবে না। ...ঠিক তেমনিভাবে এটাও আমি বুঝতে পারি না ভারতবর্ষে কোনও লোক যদি ইহজীবনের একটু সুখস্বাচ্ছন্দ্যভোগ, একটু অর্থ-উপার্জন করতে চায় সে কেন প্রয়োজনীয় সুযোগ পাবে না।'[২৭] আলমোড়া থেকে মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুন তারিখে লিখেছিলেন ঃ 'আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই ; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে।'[২৮] স্বামীজীর মতে আদর্শ সমাজ হবে সেইটি, যেখানে জগতের মহত্তম সত্যগুলি (মানবাত্মার দেবত্ব, অমরত্ব, ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি) রূপায়িত করা যায়। এবং সমাজ যদি সে সত্য অনুশীলনের যোগ্য ক্ষেত্র না হয়ে থাকে তবে তাকে যত শীঘ্র সম্ভব সেরূপ ক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে। *'That society is the greatest, where the highest truths become practical.* That is my opinion ; and if society is not fit for the highest truths, make it so ; and the sooner, the better.'[২৯]

পূর্বেই দেখেছি মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশসাধন স্বামীজীর জীবনব্রত। তিনি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যে সমাজের জন্য যে কাজই করুন না কেন, যে কর্তব্যসূচীর প্রস্তাবই দেন না কেন, তা তাঁর ঐ ব্রতেরই—মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর আনয়নরূপ উদ্দেশ্যেরই—পরিপোষক। বৈষয়িক ভোগতৃপ্ত পাশ্চাত্যে অধ্যাত্ম-ভাবধারামাত্রের প্রচার ও অনুশীলন প্রয়োজন। তাই সেদেশে তিনি ঐ ধরনের কর্মধারা পত্তন করেছেন আবার ভারতবর্ষে ইহজীবনের কিঞ্চিৎ সুখস্বাচ্ছন্দ্য, জাগতিক শিক্ষাদীক্ষা বিধানপূর্বক তার নিজস্ব সভ্যতানিহিত ধর্মভাব জাগ্রত করা দরকার। সে কারণে ভারতে তাঁর অবলম্বিত কর্মসূচী পাশ্চাত্যের কর্মসূচী থেকে কিছু পৃথক হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য একই—যে জাতির যে অভাব, সে অভাবপূরণ দ্বারা তাকে তার পূর্ণমহিমায় এবং ক্রমে তার আধ্যাত্মিক স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা।

॥ ৪ ॥

এ পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করলাম বুদ্ধদেব ও বিবেকানন্দ, উভয়ের মানবপ্রেমের গভীরতা সমভাবেই অপরিমেয় ; উভয়েই শুধু দৈহিক প্রয়োজন মিটিয়ে মানুষকে সেবা করতে বলছেন না—তাকে সেবা করতে বলছেন আরও দুই উপায়ে—বিদ্যাবিতরণ ও আধ্যাত্মিকতা-বিতরণের দ্বারাও। এর কারণ, উভয়েই এ-বিষয়ে একমত যে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা—তাকে আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা বা মোক্ষ বা নির্বাণ যে নামেই নির্দেশ করা হোক

২৭। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VIII, Third Edition (1959), p. 76

২৮। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৯

২৯। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. II, Tenth Edition (1963); p. 85

না কেন—ব্যতীত মানুষের দুঃখ দূর করা যাবে না। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধদেব বা বিবেকানন্দ কেউই দেহের ক্ষুধা ও বুদ্ধির ক্ষুধাকে কিংবা এই দুই ক্ষুধার অগ্রাধিকারকে অস্বীকার করেননি। দেহের ক্ষুধা, বুদ্ধির ক্ষুধা না মিটলে আধ্যাত্মিক জীবনলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে না—মনে হয়, উভয়েই এ-বিষয়ে সমভাবে সচেতন ছিলেন। 'মনে হয়' বলার কারণ বুদ্ধদেবের ঐ মর্মের উক্তি আমাদের চোখে পড়েনি। তবে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর শিষ্যদের সর্বপ্রকার সেবাকর্মে নিযুক্ত হতে দেখে এ ধারণা সঙ্গতভাবেই জন্মে। এ-বিষয়ে অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা সুস্পষ্ট। তিনি তাঁর গুরুদেবের নিকট থেকেই শুনেছিলেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না', এবং বুভুক্ষাপীড়িত জনসাধারণের সঙ্গে পরিব্রাজনকালে সুনিবিড় পরিচয়ের ফলে সে সত্য নির্মমভাবে যাচাই করেও নিয়েছিলেন। তাই তাঁর মানবসেবার সূচীতে অন্নবিতরণ (অর্থাৎ বৈষয়িক অভ্যুদয়ার্থ সেবা), বিদ্যাবিতরণ ও ধর্মবিতরণের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তাই কৃষি-শিল্পের সম্প্রসারণ, দুর্ভিক্ষে অন্নবস্ত্র-বাসস্থান-ওষুধপত্রের বিতরণ, ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান-কারিগরি শিক্ষার প্রবর্তন এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের পঠনপাঠন, কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগের শিক্ষণ—তাঁর কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বুদ্ধদেবের মানবতা এবং বিবেকানন্দের মানবতা সেবার ক্ষেত্রে প্রায় একরূপ হলেও দুটি দুই প্রকার আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের, দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির উপর বিধৃত। দুটি দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য এই যে, দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। সেদিক দিয়ে বিচার করে বলা চলে, এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই পাশ্চাত্য দৃষ্টবাদ (Positivism)-সমর্থিত ফরাসী মনীষী কোঁতের (Comte) মানবতাবাদ অথবা আধুনিক অস্তিত্ববাদ (Existentialism)-সমর্থিত মানবতাবাদ থেকে বিলক্ষণ পৃথক।

কিন্তু ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক হওয়া সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের 'মানবতা'র লক্ষ্য আত্মিক স্বাধীনতা বা মুক্তি বা সর্ব-আত্মভাবের উপলব্ধি এবং তার প্রতিষ্ঠা আত্মতত্ত্বে। বুদ্ধদেবের মানবতার লক্ষ্য নির্বাণ এবং তার প্রতিষ্ঠা 'নিরাত্মা'-তত্ত্বে। উভয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কি এবং সে পার্থক্য যে যুগপ্রয়োজন মিটাবার জন্য হয়েছিল, আমরা তা এখন বুঝবার চেষ্টা করব। স্বামী বিবেকানন্দের মানবসেবা ও মানবপ্রেমের মূলীভূত দর্শন নিম্নের কবিতাংশে সুন্দররূপে অভিব্যক্ত ঃ

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

'যত্র জীব তত্র শিব', 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কথাগুলির মধ্যেও স্বামীজীর সেবাব্রতের দর্শনটি সূত্রাকারে বিধৃত দেখি। স্বামীজীর আর একটি উক্তি ঃ 'আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। —"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"।'[৩০]

৩০। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭

স্বামীজীর সমজাতীয় উক্তিগুলির তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের একমাত্র সত্য, কিন্তু তিনি জীবজগতের ঊর্ধ্বে কোন সুদূর স্বর্গে বসে নেই। তিনি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে, সমস্ত প্রাণীর দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন ব্যাপ্ত করে একটি অজর, অমর, জ্ঞানময়, প্রেমময় চৈতন্যসত্তারূপে, আত্মারূপে বিরাজ করছেন। বস্তুত, জীবের আসল স্বরূপ হল এই আত্মা। অদ্বৈতবেদান্তমতে এই আত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'[৩১] (আমিই ব্রহ্ম), 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'[৩২] (এই আত্মাই ব্রহ্ম), 'তত্ত্বমসি'[৩৩] (তুমিই সেই ব্রহ্ম) প্রভৃতি মহাবাক্যের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বেদান্তের অন্য শাখামতে, যেমন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমতে, জীবের আত্মা এই ব্রহ্মের অংশ বা অঙ্গ। কাজেই, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত শক্তির আধার জগৎকারণ ব্রহ্ম যে প্রত্যেক জীবের মধ্যে পূর্ণত বা অংশত বিরাজ করছেন, তাতে অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত কোনও মতেরই সংশয় নেই। জীবের মধ্যেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, শিবের অধিষ্ঠান। অতএব জীবের সেবাই শিবের সেবা, ঈশ্বরের সেবা। স্বার্থশূন্যভাবে জীবসেবার দ্বারা, সর্বভূতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান-চিন্তাদ্বারা মানুষের মন সর্ব প্রকার ভোগবাসনা (বা তৃষ্ণা)-নির্মুক্ত হয়, পরিশুদ্ধ হয়, আর তখনই আমরা আমাদের যথার্থ স্বরূপের, আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করতে পারি। নিজেকে যখনই আমরা অজর, অমর, আত্মা বলে জানতে পারি, তখনই আমরা সর্ব প্রকার দুঃখেরও অতীত হই, কেননা দেহমনের পরিবর্তনে তখন আমরা কোনমতেই বিচলিত হই না। চরম দুঃখ-নিবৃত্তির এটাই পথ। বেদান্ত তাই বলেন ঃ 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ'[৩৪]—আত্মবিদ্ সর্ব প্রকার দুঃখশোক অতিক্রম করেন। আবার আত্মার এই স্বরূপ-অনুভূতি দ্বারা শুধু যে দুঃখ-অতিক্রমণ হল তা নয়, পরমসত্যকেও পাওয়া গেল। আত্মলাভে হৃদয়ের আনন্দস্পৃহাই শুধু তৃপ্ত হল না, বুদ্ধির জ্ঞানস্পৃহাও তার লক্ষ্যে পৌঁছাল। কেননা আত্মা বা ব্রহ্ম একটা কাল্পনিক বস্তু নয়, পরিবর্তনশীল জীবজগতের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্যও বটে। এই সত্যকে স্বামী বিবেকানন্দ শুধু যুক্তি-তর্ক-অনুমানদ্বারা সিদ্ধ করেননি, শুধু তুলনামূলক ধর্ম-দর্শন অধ্যয়নদ্বারা লাভ করেননি, নিজের প্রত্যক্ষ অনুভবের মধ্যে দেখেছিলেন, জেনেছিলেন। অনুভব ও যুক্তি—উভয়ের দ্বারাই আত্মতত্ত্বকে বিবেকানন্দ যাচাই করে নিয়েছিলেন। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারপ্রবণতার যুগে তিনি জগৎসমক্ষে এই আত্মতত্ত্বের বার্তা সগৌরবে ঘোষণা করেছেন।

আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বের উপর (আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, কেননা আত্মা কখনও ব্রহ্ম থেকে আলাদা নয়) বিবেকানন্দের মানবপ্রেম ও মানবসেবা-দর্শন এইভাবেই স্থাপিত ঃ যদি সত্যকে লাভ করতে চাই, এবং সর্ব প্রকার দুঃখকে অতিক্রম করতে চাই তবে ব্রহ্মকে অনুভব করতে হবে, কেননা ব্রহ্মই সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মকে অনুভব করা, ধারণা করা, উপাসনা করা, সেবা করা মানেই হল সর্বজীবদেহবাসী ব্রহ্মের ধারণা করা, উপাসনা করা, সেবা করা। স্বামীজী তাই বলেন ঃ 'তোমরা কি

৩১। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ১।৪।১০ ৩২। তদেব, ২।৫।১৯
৩৩। ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৬।৮।৭ ৩৪। তদেব, ৭।১।৩

মানুষকে ভালবাস ? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয় ? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন ?'[৩৫] জাতি-বর্ণ-নির্বিচারে মানুষকে এইরূপ ঈশ্বরবুদ্ধিতে অথবা ঈশ্বরের অংশ বা ঈশ্বরের সন্তানবুদ্ধিতে সেবা করার আরও কয়েকটা বিশেষ দিক আছে। প্রথমত, মানুষের মহত্ত্ববোধ। যে মানুষকে সেবা করব, সে মানুষের প্রতি থাকবে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম। কারণ সে মানুষ জড়বাদসমর্থিত রক্তমাংসের পিণ্ডমাত্র নয়, অথবা কোন কোন মনস্তাত্ত্বিক-অনুমিত ভাবনা-চিন্তা-আবেগ-আকৃতির একটা জটিল সমষ্টিও নয়, সে মানুষ 'অণোরণীয়ান্' 'মহতো মহীয়ান্' আত্মা, সে মানুষ স্বরূপত বিশ্বপিতার অংশ, বিশ্বপিতার সন্তান বা বিশ্বপিতা স্বয়ং। শুধু তা-ই নয়, সেব্য মানুষের প্রতি থাকবে সেবক মানুষেরই কৃতজ্ঞতাবোধ। কেননা যিনি সেবা করছেন, তিনি সেবাচর্চার দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করে ঈশ্বরোপলব্ধির, আত্মোপলব্ধির অপূর্ব সুযোগসহায়তা লাভ করছেন। কাজেই যে দুর্গত মানুষকে, যে দুর্গত নররূপী নারায়ণকে সেবা করা হবে, তাঁর প্রতি অনুকম্পার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, মানবসেবার ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। মানুষকে যখন ঈশ্বর, ঈশ্বরের অংশ বা ঈশ্বরের সন্তান বলে জানা গেল, তখন মানুষরূপী সেই ঈশ্বরের সেবার পরিধি অনেক বেড়ে গেল। মানুষকে 'দেহ'মাত্র বলে জানলে তাকে অন্নবস্ত্র দিয়ে বিদায় করা যায়; দেহমনের সমষ্টিমাত্র বলে জানলে অন্ন, বস্ত্র ও বুদ্ধির উৎকর্ষ আনে এমন বিদ্যা-উপচারেই তার সেবা সাঙ্গ করা যায়। কিন্তু যখন তাকে দেহমন-বিশিষ্ট আত্মা বলে জানলাম তখন তার আত্মিক ক্ষুধা না মিটানো পর্যন্ত তার সেবার শেষ হবে না। নররূপী নারায়ণকে শেষ পর্যন্ত তার 'নারায়ণত্ব' বিকশিত করার সব রকম সুযোগ, সব রকম সেবা-উপচার দিতেই হবে। বিবেকানন্দের 'জীবশিব'-দৃষ্টিভঙ্গিপূত মানবসেবায় সেবাক্ষেত্র তাই বহুবিস্তৃত। ব্যষ্টিমানবের জৈবক্ষুধা নিবারণে যেমন এই সেবার পর্যবসান নয়, তেমনি সমষ্টিমানবের অর্থাৎ সমাজের এবং সর্বশেষে মানবজাতির জৈবক্ষুধা নিবারণে—শরীরমনের বিকাশসাধনে—সে সেবার পরিসমাপ্তি হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ যে 'মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তরের' কথা বলেছেন, সে আধ্যাত্মিক রূপান্তর না হওয়া পর্যন্ত, জগতের প্রত্যেকটি মানুষের দেবত্ব-উপলব্ধি পর্যন্ত এ সেবার ক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকবে। অন্যভাবে বলতে হয়, এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাঁরা মানবের সেবা করবেন, তাঁদের পরিকল্পনার আওতায় মানবের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সর্ববিধ কল্যাণ-প্রকল্পের স্থান পাওয়া চাই-ই।

তৃতীয়ত, মানবের আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন। জীবশিববাদী মানবতায় সেবক মানব ও সেবিত মানব উভয়েই বিশ্বাস করবে সে অজর, অমর আত্মা। যদিও আজ মলিন দেহমনের খাঁচায় থাকার দরুন তার সব গুণ, সব মহিমা প্রকাশ করতে পারছে না, তবুও সে আত্মা, গুণগুলি তার অবশ্য রয়েছে, সুপ্তভাবে। জগতে এমন কোনও শক্তি নেই যে তার দেবত্বকে চিরকালের জন্য চেপে রাখতে পারে। শিবজ্ঞানে জীবসেবার

৩৫। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৮

দ্বারা মানুষের আত্মভাব, দেবভাব ক্রমে ক্রমে বিকশিত হবেই হবে। স্বামীজী বলছেন বেদান্তেরই কথাঃ '...সমুদয় জ্ঞান, সমুদয় পবিত্রতা প্রথম হইতেই আত্মায় অবস্থিত, কোথাও হয়তো উহার বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ।'[৩৬] 'কি জানিস, জ্ঞান শক্তি ভক্তি—সকলই সর্বজীবে পূর্ণভাবে আছে। এদের বিকাশের তারতম্যটাই কেবল আমরা দেখি এবং একে বড়, ওকে ছোট বলে মনে করি। জীবের মনের ভেতর একটা পর্দা যেন মাঝখানে পড়ে পূর্ণ বিকাশটাকে আড়াল করে রয়েছে। সেটা সরে গেলেই বস্, সব হয়ে গেল! তখন যা চাইবি, যা ইচ্ছে করবি, তাই হবে।'[৩৭]

'Ye are the Children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings...you are souls immortal, spirits free, blest and eternal ; ye are not matters, ye are not bodies ; matter is your servant, not you the servant of matter.'[৩৮]

'Faith, faith, faith in ourselves, faith, faith in God—this is the secret of greatness.'[৩৯] 'That faith calls out the divinity within.'[৪০]

স্বামী বিবেকানন্দের জীবশিব-সত্যাশ্রয়ী মানবতাবাদের এই তাৎপর্যগুলি বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। কেননা, কোন না কোন রূপে মানবতার ভাব—মানুষ ছোট নয়, উপেক্ষা-অবহেলার পাত্র নয়, ত্রুটিবিচ্যুতি-ভুলভ্রান্তি-শতদোষ সত্ত্বেও তাকে ভালবাসতে হবে, তার সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং তার সব রকমের হিতসাধনচেষ্টাকেই জীবনের সর্বোত্তম কর্তব্যরূপে গ্রহণ করতে হবে, এই ভাব—নানা আকারে অন্তত গত দুই শতাব্দী ধরে সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হচ্ছে; সমস্ত দেশের মানুষকে, তার চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করছে। সচরাচর প্রচলিত সেই মানবতায় বিবেকানন্দ-প্রচারিত (কিন্তু বিবেকানন্দ-উদ্ভাবিত নয়) মানবের দেবত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রসঙ্গই নেই। যেমন, ঊনবিংশ শতকের 'পজিটিভিজম' (Positivism) 'ধর্মীয় দৃষ্টিকোণকে পুরোপুরি বরবাদ না করলেও একে কোণঠাসা করে শুধু আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, বিশেষত প্রত্যভিজ্ঞামূলক প্রতীতির ওপর অধিকতর নির্ভর'[৪১] করেছে। 'কোঁৎ (Comte) তো ধর্ম ও দর্শনকে পজিটিভিজম-এর তুলনায় নীচুতে ঠাঁই করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, মানবসভ্যতা ত্রিধারায় অগ্রসর হয়েছে। প্রথম ধারা—ধর্মের যুগ। ...তখন সে জড়বস্তু ও প্রকৃতিতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করে একধরনের fetichism-কেই (ফেটিসিজিম) জীবনচেতনায় গ্রহণ করেছিল।'[৪২] পরের পর্বের নাম 'দর্শনের যুগ'। 'কিন্তু এই যুগেও মানবমনের চরম উন্নতি হয়নি; সে উন্নতি এল আধুনিক কালে, উনিশ শতকে—যখন "পজিটিভ" দর্শনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল। ...অধুনা মানুষ বস্তুহীন বৃথা দার্শনিক চিন্তায় সময় কাটায় না, বা প্রকৃতির ব্যাপারে

৩৬। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৯৪

৩৭। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১২৮

৩৮। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I, Eleventh Edition (1962), p. 11

৩৯। ibid., Vol. III, Ninth Edition (1964), p. 190 ৪০। ibid., Vol. VIII, p. 228

৪১। উনিশ বিশ—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭৪, পৃঃ ১৭৪ ৪২। তদেব

কোনো ঐশ্বরিক শক্তিকেও টেনে আনে না। এখন মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝে নিয়েছে যে, বিশ্বের প্রাণবিন্দু হচ্ছে এই মানুষ; জ্ঞানবিজ্ঞান-লব্ধ আত্মপ্রত্যয় হল তার একমাত্র নিয়ন্তা—ঈশ্বরও নয়, দর্শনও নয়। মোটামুটি কোঁৎ-পরিকল্পিত "পজিটিভ" দর্শন বা ধ্রুববাদ এই পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে।'[৪৩] কোঁতের মানবতাবাদে যেমন, অস্তিত্ববাদ (Existentialism) দর্শনে তেমন— মানুষের দেবত্বের কোনও ধারণা, মানুষের দেবত্বে কোনও আস্থা সেখানে নেই। 'এমনকি মানুষ মানবীয়গুণে একসময় পূর্ণতা অর্জন করবে'—এ আশাটুকু পর্যন্ত অস্তিত্ববাদ-সমর্থিত মানবতাবাদে নেই। 'With its emphasis on individuality, existentialism is undoubtedly a predominantly liberal philosophy, but it is a liberalism with no belief in a natural social harmony and no hope in man's perfectibility.'[৪৪] বস্তুত, 'পাশ্চাত্য মানবতাবাদে (Humanism) মানবের প্রতি প্রীতি আছে, কিন্তু বিশ্বাস নেই। মানব দুর্বল ও নিঃসহায়, পতিত ও পাপপূর্ণ, অশুদ্ধ ও অপূর্ণ; সেজন্য তাকে আমরা যেন সাহায্যের জন্য হস্ত প্রসারণ করি; তাকে আমরা যেন অসত্য থেকে সত্যে, পাপ থেকে পুণ্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাই—এইটিই হল সাধারণ মানবতাবাদের মর্মের কথা।'[৪৫]

এযুগের এই প্রকার মানবিকতাচিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এই মানবিকতাকে সচরাচর ইউরোপীয় মানবিকতা বলা হয়—যদিও কথাটা একেবারে নির্ভুল নয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে এইজাতীয় (অর্থাৎ দেবত্বতত্ত্ববর্জিত, মুক্তিভাবনারহিত) মানবিকতার পূর্ণমাত্রায় বিকাশ হয়েছিল, কিন্তু তাঁর মধ্যে 'এই নবভাবের প্রেরণা নিশ্চয়ই ইংরাজী শিক্ষার ফলে জাগে নাই, দেশীয় শিক্ষা বা ধর্মসংস্কারও ইহার অনুকূল নয়।' তাই স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদার বোধহয় সঙ্গতভাবেই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মানবের মহত্ত্ববোধ, আর মানবের হিতসাধন—এটা একালের যুগপ্রবৃত্তি। '...এ যেন ওই যুগেরই প্রবৃত্তি—কালধর্মের অনিবার্য তাড়নাই আমাদের সমাজের সহৃদয় ও শক্তিমান ব্যক্তিগণকে কোন-না-কোন আকারে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। ...ইংরেজী-শিক্ষা সেই আবির্ভাবের পক্ষে বড়ই অনুকূল ও উপযোগী হইয়াছিল।'[৪৬] যাই হোক, উৎপত্তি যেখানেই হোক, স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা এ যুগপ্রবৃত্তিকে মানুষের আধ্যাত্মিক রূপান্তরের যন্ত্র হিসাবে রূপান্তরিত করেছে।

এই যুগপ্রবৃত্তি বা 'য়ুরোপীয় মানবিকতা' মানবের মহত্ত্বে বিশ্বাসী। স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক মানুষের এই বিশ্বাসকে আঘাত করেননি। কিন্তু তিনি দেখাচ্ছেন যে, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের বিস্ময়কর কৃতিত্ব মানুষের মহিমা অল্পই প্রকাশিত করেছে; আরও বেশী মহিমা, দিব্যমহিমা, সদ্‌গুণ বিকাশের আরও অজস্র সম্ভাবনা তার মধ্যে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। মানুষের মধ্যে 'দেবত্ব' আছে—যা তার শ্রেষ্ঠ মহিমা। সে

৪৩। তদেব ৪৪। Encyclopaedia Britannica, Vol. 8, 1969, p. 965

৪৫। উদ্বোধন, ৬৫ বর্ষ, পৃঃ ৮২

৪৬। বাংলার নবযুগ—মোহিতলাল মজুমদার, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৮৭৯ শকাব্দ, পৃঃ ৪

দেবত্বের বিকাশে ব্যক্তিগতভাবে সে ধন্য হবে ; সমাজ এক দিব্যসমাজে রূপান্তরিত হবে।

ইউরোপীয় মানবিকতা মানুষের 'হিতসাধন'-প্রচেষ্টাকে মানুষের স্বাভাবিক প্রেরণাবশে কর্তব্য বলে গ্রহণ করে। স্বামীজীর ভাবধারায়—এই হিতসাধনপ্রচেষ্টা অহমিকার বশবর্তী হয়ে নয়, অনুকম্পার দৃষ্টিতে নয়, বিনয়নম্র শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে সম্পন্ন করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, যেহেতু মানুষ শুধু 'দেহধর্মী জীব' নয়, কিন্তু 'জীবরূপী ব্রহ্ম', সেহেতু মানবের হিতসাধন মানে 'মানুষের একমাত্র জৈবসত্তার উৎকর্ষ ও বিকাশ' নয় ; হিতসাধন মানে মানুষের জৈবসত্তার সাথে সাথে তার দৈবসত্তার বিকাশ ঘটানো। অর্থাৎ নরকে 'নরোত্তম' করে ক্ষান্ত হওয়া নয়, নরকে নারায়ণে পরিণত করা বিবেকানন্দের মানবিকতার লক্ষ্য।[৪৭] আজকের সাধারণ মানুষ মানুষের জৈবসত্তায় বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস করে যে, মানুষমাত্রেই একটা দেহ আর একটা বুদ্ধির সমষ্টি। তাই তার সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি এমনভাবে সে গড়ে তুলতে সচেষ্ট যাতে তার দেহ শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যলাভ করে, তার বুদ্ধি সর্বোৎকৃষ্টরূপে মার্জিত হয়। সে মানুষ বিশ্বাস করে না যে, মানুষমাত্রেই দেহমন্দিরস্থ একটা আত্মা, একটা দেবসত্তা। তাই যাতে এই দেবসত্তার স্ফুরণ হয়, এমনভাবে সে তার সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, দর্শন, সমাজ-সংস্কৃতিকে গড়তে উদ্যোগী নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে—যতই মানুষ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্বামী বিবেকানন্দের জীবশিব-সত্যাশ্রয়ী মানবিকতাকে গ্রহণ করছে, ততই তার কর্মসূচীও পালটে যাচ্ছে; আত্মিক ক্ষুধা মিটানোর প্রয়াস, দৈবসত্তা-বিকাশ-উপযোগী সুযোগ-সুবিধা-পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস সে কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আজ মানবসভ্যতার একটা সঙ্কটকাল। এই কালে ভৌগোলিক দূরত্ব নষ্ট হয়ে গেছে ; চরম মারণাস্ত্র, জটিলতম মানবশোষণাস্ত্রও মানুষের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। এ অবস্থায় মানুষের জৈবপ্রবৃত্তির উপর যদি তার দৈবপ্রবৃত্তি জয়ী না হয়, তবে মানবসমাজের কী অন্ধকারময় ভবিষ্যৎই না নেমে আসবে! স্বামী বিবেকানন্দের মানবদেবত্ব-সত্যাশ্রয়ী মানবিকতা সে কৃষ্ণ-ভবিষ্যতেরই প্রতিষেধক। কিন্তু লক্ষণীয় এই, স্বামীজীর মানবিকতা সে সর্বনাশা পরিণাম প্রতিরোধ করতে গিয়ে যুগপ্রবৃত্তিকে, যুগের হৃদয়াকৃতিকে অস্বীকার করছে না, খর্ব করছে না, বরং তাকে পরিপূর্ণ করছে, দিব্যায়িত করছে। সে মানবিকতা যেমন তার মানবমহিমাবোধকে মানবদেবত্ববোধে উন্নীত করেছে, তেমনি মানুষের আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ়, আরও মহৎ করে তুলছে। এযুগের মানুষ বিশ্বাস করে দেহ ও বুদ্ধির সঙ্ঘাতে। তাই দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধির শক্তি বিকাশেই তার চেষ্টা ক্ষান্ত। বিবেকানন্দের মানবিকতায় বিশ্বাসী হয়ে সে যেমন নিজের দেবত্বে বিশ্বাসী হচ্ছে, তেমনি তার মধ্যে নিঃস্বার্থ প্রেম, সেবা, সততা প্রভৃতি দৈবগুণেরও বিকাশ হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অনবদ্য ভাষায় আরও অফুরন্ত দৈবশক্তি বিকাশের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী হতে আমাদের বলছেনঃ 'Do you know how much energy, how many powers, how many forces are still lurking behind that frame of yours ? What scientist has known all that is in man ? Millions of years

৪৭। উনিশ বিশ, পৃঃ ১৭৫

have passed since man first came here, and yet but one infinitesimal part of his powers has been manifested. Therefore, you must not say that you are weak. How do you know what possibilities lie behind that degradation on the surface ? You know but little of that which is within you. For behind you is the ocean of infinite power and blessedness.'[৪৮] এই প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, স্বামী বিবেকানন্দের মানবিকতা যেমন বেদান্তের আত্মতত্ত্বভিত্তিক, তেমনভাবে অন্যান্য ধর্মের উপরও প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের মতে তাঁর প্রচারিত মানবের দেবত্ব শুধু বেদান্তের ঘোষণা নয়। জগতের অন্য প্রধান প্রধান ধর্মগুলিও কোথাও স্বচ্ছ সরল ভাষায়, কোথাও গল্প বা রূপকের ভাষায় এই মানবের দেবত্বই ঘোষণা করছে, হিন্দুধর্মের সব শাখা তো বটেই। যেমন, 'হিব্রুদের নিউ টেস্টামেন্ট স্বীকার করে যে, মানুষ প্রথমে পূর্ণস্বভাব ছিল এবং নিজকৃত কর্মের দ্বারা সে নিজেকে অপবিত্র করেছে। কিন্তু তাকে তার সনাতন পবিত্র স্বভাব ফিরে পেতে হবে। কেউ কেউ এই কথাগুলি গল্প, রূপক বা প্রতীকচিহ্ন দিয়ে বলে, কিন্তু এই সব বাক্য বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, এই বাক্যগুলি শুধু এইটাই শিক্ষা দিচ্ছে ঃ মানুষ স্বভাবতই পূর্ণস্বভাব এবং এই পূর্ণস্বভাবকেই তার ফিরে পেতে হবে।'[৪৯] স্বামীজী আরও বলছেন ঃ 'দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শৈব-সিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত, এমনকি বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি যে-কোন সম্প্রদায় এ ভারতে উঠিয়াছে, সকলেই এইখানে একবাক্য যে, এই "জীবাত্মা"তেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপীলিকা হতে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে সেই "আত্মা", তফাৎ কেবল প্রকাশের তারতম্যে...।'[৫০] উদ্ধৃতিগুলি এইটাই প্রতিপন্ন করছে যে, বিবেকানন্দ-মানবতার জীবদেবত্বতত্ত্ব শুধু তাঁর বা তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূত সত্য নয়, সর্বধর্মস্বীকৃত সত্যও বটে।

বুদ্ধদেবের মানবিকতায় বাহ্যত আত্মতত্ত্বের স্থান নেই কিন্তু কার্যত আছে। একটা স্থায়ী অজর, অমর, আত্মা বুদ্ধদেব স্বীকার করেননি—কিন্তু চৈতন্যের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের সত্যতা স্বীকার করেছেন। যেমন, একক্ষণের প্রদীপশিখা পরক্ষণের শিখার জন্ম দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; বুদ্ধদেবের মতে ঃ একক্ষণের বিজ্ঞান বা চৈতন্য পরক্ষণে একটি বিজ্ঞান বা চৈতন্য সৃষ্টি করে নিজে ধ্বংস হয়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে মানুষের স্বরূপ হল এই 'বিজ্ঞান'-ধারা বা চৈতন্যপ্রবাহ।[৫১] সেখানে চিরস্থায়ী আত্মার স্বীকৃতি নেই। আত্মার স্বীকৃতি নেই বলে আত্মমুক্তির প্রসঙ্গও নেই। আত্মা যখন নেই, তখন আবার আত্মার মুক্তি কি ? যার মাথা নেই তার মাথাব্যথা ? কিন্তু লক্ষণীয় এই ঃ বেদান্তোক্ত আত্মতত্ত্বের অভাব সত্ত্বেও বুদ্ধদেব নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জাগরণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা তাঁর মহৎ মানবিকতা ধর্মে সুরক্ষিত রেখেছেন। আত্মা নেই বলে ইউরোপীয় মানবিকতার

৪৮। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. II, pp. 301-02

৪৯। ibid., Vol. I, p. 319   ৫০। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৬

৫১। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন—সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩, পৃঃ ৫৬-৭

মতো তাঁর মানবিকতা শুধু জৈবস্তরের সেবাধর্মে মানুষকে নিয়োজিত করেনি; ক্ষমা-প্রেম-পবিত্রতা-সংযম, সর্বোপরি নিঃস্বার্থ সেবা প্রভৃতি সর্বপ্রকার দৈবগুণের চর্চায় মানুষকে লিপ্ত করেছে। স্বার্থচিন্তার পরিবর্তে সর্বজীবের মৈত্রীভাবনায় মানুষকে নিয়োজিত করেছে।

বুদ্ধদেবের মানবিকতার—মানবপ্রেম ও মানবসেবার দর্শন—সংক্ষেপে এইরূপ। বুদ্ধদেব বলছেনঃ জটিল দার্শনিক প্রশ্নের চুলচেরা বিচারে সময় ও শক্তির অপচয় কোর না। কতকাংশে যেন দৃষ্টবাদী বা পজিটিভিস্টদের মতো বুদ্ধদেব বলছেনঃ দৃষ্ট জগতের সত্য এই যে, জীবনে দুঃখ আছে। জগতের কোন কিছুই কারণ ছাড়া হয় না। অতএব মানুষের এই দুঃখেরও কারণ আছে। এই কারণ—দ্বাদশ নিদান, যার মধ্যে প্রধান হল তৃষ্ণা (তন্‌হা) বা বাসনা। কারণনাশে কার্যের নাশ হয়। অতএব তৃষ্ণার নাশে দুঃখের নাশ। বাসনা কামনা বা তৃষ্ণার নাশই নির্বাণ। নির্বাণে সকলের অধিকার সমান। তৃষ্ণার আগুন নির্বাপণের জন্য পুরোহিত বা শাস্ত্রের দ্বারস্থ হতে হবে না। এজন্য নিজেকে উদ্যোগী হয়ে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক কর্ম, সম্যক ধ্যান প্রভৃতি অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসরণ করতে হবে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রধান কথাগুলি হলঃ সর্বভূতে মৈত্রী, অহিংসা এবং নিঃস্বার্থভাবে অপরের সেবা। আমরা পূর্বেই দেখেছি এই সেবার পরিধি সুদূরবিস্তৃত। জৈবজীবনের অভাব মিটিয়ে দৈবজীবনের আস্বাদ পাওয়ানো, নির্বাণের দ্বারপ্রান্তে মানুষকে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সে সেবাব্রতের কর্মসূচী। কাজেই বিবেকানন্দের মতো বুদ্ধদেবও মানবজীবনের দিব্যায়নের (spiritualization of human life) ব্রতধারী। দিব্যায়ন ছাড়া দুঃখকে অশেষরূপে এড়াবার অন্য কোনও প্রতিষেধক তিনি দেননি।

শিষ্যদের বুদ্ধদেব বলেছেনঃ বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় কর্ম করতে, সেবা করতে, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হতে।

'কুকর্ম না করাই শ্রেয়; উহা পরিশেষে অনুশোচনার কারণ হয়। সুকর্ম করাই শ্রেয়; উহা করিলে অনুতপ্ত হইতে হয় না।'[৫২]

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥[৫৩]

'বিদ্বেষের দ্বারা কখনই বিদ্বেষ প্রশমিত হয় না; বিদ্বেষহীনতার দ্বারা বিদ্বেষ প্রশমিত হয়।'

শুধু সৎকর্ম নয়, সর্বজীবের প্রতি 'মৈত্রীভাবনা' করতে বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়েছেন। 'দৃষ্ট কি অদৃষ্ট, দূরবাসী কি নিকটবাসী, বর্তমানে রয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে—এমন সমস্ত প্রাণীই সুখী হোক।' 'মাতা যেমন নিজের প্রাণ দিয়েও নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইভাবে সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমিত দয়াভাব দেখাবে।'

কিন্তু সর্বপ্রাণীর সেবা ও সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাবনা কেন করব এ প্রশ্নের বুদ্ধমতে উত্তরঃ কারণ এর দ্বারা তোমার স্বার্থবাসনা দূর হবে, বাসনা বা তৃষ্ণা (তন্‌হা) গেলে

৫২। ধম্মপদ—সম্পাদনাঃ ভিক্ষু শীলভদ্র, পৃঃ ৭৬
৫৩। ধম্মপদ—সম্পাদনাঃ চারুচন্দ্র বসু, কলিকাতা, ১৯০৪, পৃঃ ৩

দুঃখনিবৃত্তি হবে, নির্বাণলাভ হবে। 'আত্মা বলে কিছু নেই।' 'দেহ অনুক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে—মন এবং বুদ্ধিও পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং "অহং" নিছক ভ্রান্তি। যত স্বার্থপরতা, তা এই "অহং"—মিথ্যা "অহং"কে নিয়েই। যদি জানি যে "আমি" বলে কিছু নেই, তা হলেই আমরা নিজেরা শান্তিতে থাকব এবং অপরকেও সুখী করতে পারব।'[৫৪] পরের সেবা ও মৈত্রীভাবনা 'অহং'-এর জন্য নয়, কেননা 'অহং' যে ভ্রান্তি!

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন ঃ বুদ্ধের এই আত্মত্যাগের শিক্ষাকে বেদান্তের ব্রহ্ম ও আত্মাতত্ত্বের দৃষ্টিতে বিচার করলে আরও ভাল করে বুঝতে পারা যাবে। 'আত্মা আর পরব্রহ্ম অভিন্ন। যা-কিছু সবই আত্মা—একমাত্র আত্মাই সৎ-বস্তু। ...সেই এক আত্মাই নানারূপে প্রতিভাত হয়। মানুষ মানুষের ভাই, কারণ সব মানুষই এক। বেদ বলেন ঃ মানুষ শুধু আমার ভাই নয়, সে আমার স্বরূপ। বিশ্বের কোন অংশকে আঘাত করে আমি নিজেকেই আঘাত করি।'[৫৫]

স্বামী বিবেকানন্দের মতো বুদ্ধদেবও মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হতে বলেছেন। নির্বাণ-অর্জনে জাতি-বর্ণ-দেশ-কাল-নির্বিশেষে সকলের অধিকার আছে, যোগ্যতাও আছে। যে কেউ চেষ্টা করবে, সে পরার্থকর্ম ও শুভচিন্তার দ্বারা—একজন্ম অথবা জন্মজন্মব্যাপী চেষ্টার দ্বারা—এই নির্বাণ লাভ করবে। এর পিছনে বুদ্ধদেবের যুক্তি হল ঃ জগতে সবকিছুই কার্যকারণশৃঙ্খলে বাঁধা। আমরা নিজেদের স্বার্থশূন্য বা স্বার্থপূর্ণ কর্ম ও চিন্তার দ্বারা ভাল বা মন্দ হই। জগতের অন্য কোন শক্তি আমাদের ভাল বা মন্দ করতে পারে না। কাজেই, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা, মর্যাদা, ব্যক্তিমানুষের মহিমাবোধ বিবেকানন্দের মানবিকতাবাদের মতো বুদ্ধদেবের মানবিকতাবাদকে অপরিমেয় শক্তির উৎসে পরিণত করেছে। কিন্তু লক্ষণীয় এই ঃ আত্মশক্তির ও আত্মপ্রত্যয়ের সপক্ষে বিবেকানন্দের যুক্তি আরও জোরালো। কর্মবাদকে তিনি গ্রহণ করে বলেন ঃ মানুষই তার ভাগ্যের নির্মাতা।[৫৬] তবে তিনি আরও বলেন ঃ এর কারণ, মানুষের আত্মা যে স্বরূপত ঈশ্বরের অংশ বা ঈশ্বরই। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে সে বিশ্বাস করবে না কেন? নিশ্চয়ই করবে। তবে এই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তো আকাশে বসে নেই। তিনি তোমার অন্তরাত্মা। তোমার বুদ্ধিতে তাঁরই জ্যোতি, তোমার বাহুতে তাঁরই শক্তি। মানুষকে তিনি বলেন ঃ উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত—ওঠ, জাগো, আত্মার অনন্ত শক্তিমত্তায় বিশ্বাসী হও; সে শক্তি তাহলে জাগ্রত হবেই হবে।

আসলে বুদ্ধদেব যে ঈশ্বর ও আত্মাতত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন, সে শুধু ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ও আত্মাসম্বন্ধীয় প্রচলিত ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণাকে অস্বীকার করা। বস্তুতপক্ষে মানুষের দুঃখে তাঁর প্রাণ এমন কেঁদেছিল যে, তিনি জটিল দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় প্রবেশ করতে চাইতেন না—নির্বাক থাকতেন। তিনি বলতেন ঃ যদি কারও ঘরে আগুন লাগে তবে তার কাজ হবে জল দিয়ে আগুন নিবানো; অগ্নিতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করা নয়। স্বার্থদুষ্ট বাসনার অগ্নিতে জীব যখন দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তখন পরার্থসেবা ও

৫৪। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৩০৮ ৫৫। তদেব, পৃঃ ৩১১

৫৬। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VIII, p. 183

মৈত্রীভাবনাদি দ্বারা সে অগ্নি নির্বাপণই তার একমাত্র কাজ। এর মানে এই নয় যে, বুদ্ধদেব ব্রহ্ম আত্মা প্রভৃতির তত্ত্ব জানতেন না বা মানতেন না। তিনি একসময় ভিক্ষুদের বলেছিলেনঃ "আমি তোমাদের যা কিছু বলি তার চাইতে আমার জানা কিন্তু না-বলা তত্ত্ব অনেক বেশী রয়েছে। সবকিছু তত্ত্ব তোমাদের না বলবার কারণ, এতে তোমাদের প্রকৃত বাসনা-মুক্তি ঘটবে না, বোধি লাভও হবে না। কিন্তু তোমাদের কাছে আমি তোমাদের দুঃখের স্বরূপ, তার উৎপত্তির কারণ, তার নিরোধের পথ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলতে ত্রুটি করিনি।'[৫৭] এসব গভীর তত্ত্ব না বলার আরও কারণ ছিল। তিনি মানুষকে পুরোহিততন্ত্রের অত্যাচার ও ক্রিয়াকাণ্ডের বাহুল্য থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সময় বহু দার্শনিকসম্প্রদায়ে দেশ ভরা ছিল এবং তারা অতি সূক্ষ্ম তর্কে জনসাধারণের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করত। আবার বৈদিক সংস্কৃতির বাইরে যে বিরাট জনসমুদ্র ছিল, বিশুদ্ধ বৈদিক সংস্কৃতি গ্রহণ করার পথে তাদের সামাজিক বাধা ছিল যথেষ্ট। তাদের এবং বিশ্বের সমস্ত সাধারণ মানুষকে জটিল দার্শনিক-তত্ত্ব-বর্জিত সাম্যবাদ-আশ্রয়ী ধর্ম দেবার জন্য, তাঁর মানবপ্রেমই তাঁকে প্রণোদিত করেছিল ঈশ্বর-আত্মাদি সম্পর্কে উদাসীন থেকে প্রেম ও সেবার ধর্ম প্রচার করতে। তাছাড়া, বুদ্ধদেব বিবেকানন্দের মতোই বিশ্বাস করতেন—ধর্ম অনুভবের জিনিস, কেবল যুক্তি-তর্ক-অনুমানের বিষয় নয়। উত্তরকালে অনুধাবন করে মনীষীরা ও দার্শনিকরা বলেছেনঃ বুদ্ধদেব-প্রচারিত নির্বাণ আসলে অদ্বৈতবেদান্তোক্ত আত্মমুক্তি, আত্মস্বাধীনতা। তিনি ব্যবহারিক আত্মাকে অস্বীকার করলেও শাশ্বত অপরিবর্তনীয় আত্মাকে অস্বীকার করেননি। তাছাড়াও বড় কথা এই যে, বেদান্তের তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে নির্বাক থেকেও সে তত্ত্বকে তিনি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নামিয়ে এনেছিলেন। বেদান্তের আত্মতত্ত্বকে সমাজে প্রয়োগ করা হলে আত্মপ্রত্যয়, সর্বজীবের প্রতি প্রেম, মৈত্রীভাব এবং সর্বজীবসেবা—এগুলি আসতে বাধ্য। বুদ্ধদেব এগুলির প্রচার করে পরোক্ষে বেদান্তই প্রচার করেছিলেন। যুগের প্রয়োজনে, পৃথিবীর তৎকালীন ও অনাগত কালের অগণন সাধারণ মানুষের প্রতি করুণাবশত বেদান্তের তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে তাঁকে নীরব থাকতে হয়েছিল। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ যথার্থই মন্তব্য করেছেনঃ 'To develop his theory Buddha had only to...set aside the transcendental aspect as being indemonstrable to thought and unnecessary to morals, and emphasize the ethical universalism of the Upanishads. Early Buddhism, we venture to hazard a conjecture, is only a restatement of the thought of the Upanishads from a new standpoint.'[৫৮] অর্থাৎ 'তাঁর (নবীন) মতবাদকে গড়ে তুলবার জন্য বুদ্ধদেবকে উপনিষদের জগদতীত তত্ত্বাংশটিকে সরিয়ে রাখতে হয়েছিল, কেননা ঐ তত্ত্বাংশকে যুক্তিচিন্তার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না বলে এবং নৈতিক

৫৭। ভারতের সাধক, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২

৫৮। Indian Philosophy, Vol. I—Radhakrishnan, George Allen & Unwin Ltd., London, 1971, pp. 360-61

জীবনযাপনের জন্য নিষ্প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে করতেন। তিনি উপনিষদের সর্বজনীন নৈতিক জীবনাদর্শের উপর জোর দিয়েছিলেন। আমাদের অনুমান গোড়ার দিকের বৌদ্ধধর্ম উপনিষদের চিন্তাকে অন্য আকারে প্রকাশ করেছিল মাত্র।' স্বামী বিবেকানন্দ এর বহু পূর্বেই সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন ঃ 'যে ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙ্গিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি ? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে)।'[৫৯]

বর্তমান যুগ যুক্তিবিচারের যুগ। বুদ্ধদেবের মানবপ্রেম ও মানবসেবা আজ যেমন প্রয়োজন, তেমনিভাবে প্রয়োজন সে প্রেম ও সেবার তাত্ত্বিক দিকও যুক্তি-গর্বিত মানুষের কাছে পরিষ্কার করে বলা। প্রাচীন বেদান্ত মানবপ্রেম ও সেবার তাত্ত্বিক দিক অকাট্য যুক্তিবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল, কিন্তু সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাকে নামাতে পারেনি। বুদ্ধদেব তাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নামিয়েছিলেন, কিন্তু তাত্ত্বিক দিকটি তখনকার যুগপ্রয়োজনে অনুচ্চ রেখে। স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন যে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচারের যুগে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক দিয়ে বেদান্তের মানবপ্রেম ও মানবসেবার আদর্শ প্রচারিত ও অনুশীলিত হোক ; বেদান্তের মতবাদ ও বুদ্ধের হৃদয়বত্তার সমন্বয় হোক। তাঁর নিজের মধ্যে এই 'মণিকাঞ্চন-যোগ' ঘটেছিল। যেন যুগপ্রয়োজনে শঙ্করাচার্য ও বুদ্ধদেব তাঁর মধ্যে অভিন্নাত্মা হয়ে মানবতার নতুন অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

৫৯। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১৪

বেদান্তঃ শঙ্করাচার্য ও বিবেকানন্দ

বেদের যা সারভাগ বা তাৎপর্য তাকেই বেদান্ত বলা হয়। এ-বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই। কেউ কেউ বলেন, 'অন্ত' অর্থ শেষভাগ বোঝাতে পারে। কেননা, বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ যে উপনিষদ্-সমূহ তা বেদের শেষ অংশে—আরণ্যকেই অবস্থিত। কিন্তু একথা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। ঈশ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি কয়েকখানি প্রসিদ্ধ উপনিষদ্ বেদের প্রথম অংশে অর্থাৎ মন্ত্রভাগেই অবস্থিত। তাই তাদের মন্ত্রোপনিষদ্ বলা হয়। পক্ষান্তরে, 'অন্ত'-শব্দের তাৎপর্য, বা সিদ্ধান্ত, বা সার অর্থ প্রসিদ্ধ আছে। অপিচ, উপনিষদ্-সমূহে পরতত্ত্ব ও চিরন্তন সত্যসকল উপদিষ্ট হওয়াতে উপনিষদ্‌কে বেদের তাৎপর্যাংশ বা সারভাগ বলতে কেবলমাত্র কর্মকাণ্ডী পূর্বমীমাংসক[১] ব্যতীত আর কোনও আস্তিক দার্শনিকের আপত্তি হয়নি। সকল দার্শনিক সম্প্রদায় নিজ নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থনে উপনিষদের বাক্যই উদ্ধৃত করেছেন। অপিচ, উপনিষদ্‌কে 'শ্রুতি-শিরঃ' (বেদের মস্তিষ্ক) বলে অভিহিত করা হয়।

আচার্য শঙ্করের অনুগামী বেদান্তিগণ সকলেই শঙ্করের অভিপ্রায় অনুসরণ করে বেদের তাৎপর্য বা সার অর্থেই 'বেদান্ত' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। সদানন্দযতি 'বেদান্তসার' নামক গ্রন্থে বলেছেনঃ 'বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্।' উপনিষদ্‌রূপ যে প্রমাণ—তত্ত্বজ্ঞানের উপায় (করণ)—তা-ই বেদান্ত। সুতরাং উপনিষদ্-সমূহই যে বেদান্ত—এতে কোনও বিবাদ নেই।

অথর্ববেদীয় কৈবল্যোপনিষদে 'বেদান্ত' শব্দটির প্রয়োগ করে বলা হয়েছে, 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ'[২] ইত্যাদি—অর্থাৎ বেদান্তের বিজ্ঞানের দ্বারা যাঁরা তার অর্থ যে ব্রহ্মাত্মৈক্য তা সুনিশ্চিত করেছেন, এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করে শুদ্ধসত্ত্ব যতি হয়েছেন—ইত্যাদি।

আচার্য বিবেকানন্দও বেদের সারভাগই বেদান্ত এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ 'বেদের যাহা চরম লক্ষ্য, বেদের যাহা সার তাহাই বেদান্ত।' 'চরম লক্ষ্য' কথার দ্বারা তিনি তাৎপর্যের বিষয়কেই বোঝাতে চেয়েছেন। বেদান্ত সম্পর্কে—ভারতের ধর্মে ও দার্শনিক সম্প্রদায়ে বেদান্তের গুরুত্ব ও মহিমা সম্পর্কে বলেছেনঃ 'যদি ভারতের কোন সম্প্রদায় উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার না করে, তবে সেই সম্প্রদায়কে "সনাতন"-মতাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।...জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্ত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের একমাত্র উৎস।'[৩]

১। ইঁহারা উপনিষদের যে স্বার্থ—ব্রহ্ম বা ঈশ্বর তাহাও স্বীকার করেন না। মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতাও ইঁহারা মানেন না।

২। কৈবল্যোপনিষদ্, ১।৫

৩। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ২২০

বেদ সম্পর্কে শঙ্কর বলেন ঃ 'বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যম্, রবেরিব রূপবিষয়ে'[৪]—অর্থাৎ রূপ বিষয়ে সূর্যের ন্যায় নিজের অর্থে বেদের প্রামাণ্য নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। বিবেকানন্দও বেদের বিষয়ে বলেছেন ঃ 'বেদ-নামক শব্দরাশি কোন পুরুষের উক্তি নহে।...হিন্দুরা কিন্তু বলেন, বেদের অন্য কোন প্রমাণ নাই, বেদ স্বতঃপ্রমাণ...।'[৫]

দার্শনিকদের প্রধান করণীয়—অদৃশ্য পরতত্ত্বের (ultimate reality-র) নিরূপণ, ও সে পটভূমিতে দৃশ্যমান জীব ও জগতের স্থান নিরূপণ। পরতত্ত্ব প্রসঙ্গে শঙ্কর একস্থানে বলেছেন ঃ 'একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ।'[৬] অর্থাৎ যে অর্থ বা বস্তু একরূপে থাকে তা-ই পরমার্থ বা পরতত্ত্ব। পরতত্ত্বের এই লক্ষণ অনুসারে যদি পরতত্ত্ব নিরূপিত হয়, তবে শাঙ্কর সিদ্ধান্তে 'অথাত আদেশো নেতি নেতি'[৭]—এই শ্রুতির প্রতিপাদ্য নির্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র পরতত্ত্ব। কারণ, তারই মাত্র কোন পরিবর্তন, বৈচিত্র, পরিণাম নেই। ব্রহ্মসূত্র, গীতা, বা উপনিষদে যে জগৎকারণ ব্রহ্ম বা মায়াশক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বরের নিরূপণ রয়েছে তাকেও পরতত্ত্ব বলা চলে না, কারণ, জগৎকারণ ঈশ্বরে বৈচিত্র আছে; কখনও তিনি স্রষ্টা, কখনও প্রলয়কর্তা। মায়াশক্তিযোগে বা মায়া দ্বারা তাঁর পরিণামও হয়।

সুতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব। বস্তুত সে তত্ত্বটি অদ্বিতীয় তত্ত্ব বলে সেটি ভাষা বা বুদ্ধির বিষয় হতে পারে না। তাই তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হয়েছে ঃ 'যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।'[৮] তথাপি যদি পরতত্ত্বকে ভাষা ও বুদ্ধির গম্য (বোধ্য) করতে হয়, তবে বলতে হয় সেই পরতত্ত্ব ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ (সৎ+চিৎ+আনন্দ) স্বরূপ। বাক্যসুধাতে আচার্য শঙ্কর বলেছেন ঃ

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্ ॥[৯]

অর্থাৎ—লোকব্যবহারের বিষয় সকল পদার্থে পাঁচটি অংশ বিদ্যমান—অস্তি (সত্তা), ভাতি (প্রকাশ), প্রিয় (আনন্দ), নাম ও রূপ। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি ব্রহ্মের রূপ (স্বরূপ); অপর দুইটি জগতের রূপ। ব্যবহারগম্য ঘটপটাদি সকল পদার্থেই এই পাঁচটি অংশ আছে; যথা, ঘটোঽস্তি (ঘট আছে), ঘটো ভাতি (ঘট প্রকাশ পাচ্ছে); ঘটঃ প্রিয়ঃ (ঘট আমার আনন্দদায়ক)—এই যে তিন অংশ—সত্তা, প্রকাশ ও আনন্দ—এরা ব্রহ্মেরই রূপ বা স্বরূপ (ব্রহ্মে আরোপিত) ঘটে ফুটে উঠেছে, যেমন রজ্জুর বক্রতা প্রভৃতি আরোপিত সর্পে দেখা যায়। আর, 'ঘট' এই নাম, এবং ঘটের যে রূপ (আকার) তা হল জগতের রূপ। জগৎ নামরূপাত্মক, ব্রহ্মসত্তা থেকে অতিরিক্ত তার কোন সত্তা নেই। ব্রহ্মের প্রকাশই ঘটের প্রকাশ। ব্রহ্মের আনন্দ বা প্রিয়তাই ঘটের প্রিয়তা। নামরূপ ঘটের নিজস্ব রূপ। তা পরিবর্তনশীল, বিনাশী, সুতরাং পারমার্থিক সত্য

৪। ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১—শাঙ্কর ভাষ্য ৫। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৬
৬। ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১১—শাঙ্কর ভাষ্য ৭। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।৩।৬
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।৯ ৯। বাক্যসুধা, ২০—শঙ্করাচার্য

নয়—মিথ্যা, অর্থাৎ সৎ-রূপে বা অ-সৎ-রূপে নির্বচনের অযোগ্য (অনির্বচনীয়)। সুতরাং সচ্চিদানন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ।

বিবেকানন্দও বলেছেন ঃ 'বৈদান্তিক বলেন...আমি সচ্চিদানন্দ, আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম।'[১০] 'জীব ও ব্রহ্ম যে এক, সকল বেদ অহরহ এই কথা ঘোষণা করিতেছেন;... আমাদের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা, এক পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ... ।'[১১] আবার অন্যত্র বলছেন ঃ 'আমরা সচ্চিদানন্দ। সৎ বা অস্তিভাব জগতের শেষ (চরম) বস্তুনির্দেশক ব্যাপার (শব্দ)। তাহাই আমাদের অস্তিত্ব, তাহাই আমাদের জ্ঞান। আর অস্তিত্বের (অস্তিত্বজ্ঞানের) অবিমিশ্র স্বাভাবিক ফল—আনন্দ।'[১২] আত্মা বিষয়ে আচার্য শঙ্করও বলেছেন ঃ 'স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরাদ্যতিরিক্ত পঞ্চ কোশাতীতঃ সন্নবস্থায়ে সাক্ষী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সন্ যস্তিষ্ঠতি স আত্মা'—অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, ও কারণ শরীর হতে অতিরিক্ত পঞ্চ কোশের অতীত হয়ে জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—তা-ই আত্মা। বিবেকানন্দও আত্মার কথা প্রসঙ্গে যে বলেছেন—'...প্রত্যেক মানুষেরই তিনটি অংশ আছে—দেহ, অন্তঃকরণ বা মন, এবং মনের পশ্চাতে আত্মা। দেহ আত্মার বাহিরের এবং মন আত্মার ভিতরের আবরণ।'[১৩]—এখানে আবরণ শব্দটির দ্বারা বিবেকানন্দ কোশের কথাই বলেছেন। তবে বিদেশীদের কাছে খুব সংক্ষেপে ও সরলভাবে বলেছেন। আবার এই সচ্চিদানন্দ-রূপ লক্ষণও যে চরম লক্ষণ নয়, তা-ও বিবেকানন্দ বলতে ভোলেননি। বলেছেন ঃ '...কিন্তু উপনিষৎসমূহে ঋষিগণ আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন "নেতি, নেতি" অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে।'[১৪] অন্যত্র লিখেছেন ঃ '"সচ্চিদানন্দ" সংজ্ঞায় তাঁহাকে আংশিকভাবেই প্রকাশ করা হয় মাত্র, "নেতি নেতি" সংজ্ঞাই তাঁহার স্বরূপ যথাযথ বর্ণনা করে।'[১৫] বিবেকানন্দের এই উক্তিতে 'আংশিকভাবে' কথাটির দ্বারা তিনি লক্ষণারই ইঙ্গিত করেছেন। বিদেশীদের সরলভাবে বোঝাবার জন্য 'আংশিকভাবে'— বলেছেন। শঙ্করের পরবর্তী শঙ্করানুগামী বেদান্তিগণ উপনিষদে প্রসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ-রূপ ব্রহ্মের লক্ষণকে স্বরূপলক্ষণ-রূপে স্থাপিত করবার জন্য, এবং 'নেতি' 'নেতি'—এই লক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য 'লক্ষণা' নামক শব্দের গৌণী বৃত্তির সাহায্যে সৎ অর্থ—মিথ্যা ব্যাবৃত্ত (মিথ্যা নয়), চিৎ অর্থ—জড় ব্যাবৃত্ত (জড় নয়), এবং আনন্দ অর্থ—দুঃখ ব্যাবৃত্ত (দুঃখাত্মক নয়)—এরূপ নেতি ভাবের—নিষেধাত্মক বা অভাবাত্মক অর্থ করে থাকেন। সুতরাং পরতত্ত্ব ব্রহ্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দ যা কিছু বলেছেন সবই শঙ্করানুগত ভাবেই বলেছেন। আত্মার স্বপ্রকাশ-চৈতন্যরূপতা বোঝাতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ '...স্বপ্রকাশ জ্ঞান বা চৈতন্য কখন জড়ের ধর্ম হইতে পারে না।...চৈতন্যই সমুদয় জড়কে প্রকাশ করে।...এই শরীর স্বপ্রকাশ নহে।...মন বা আধ্যাত্মিক শরীরও (সূক্ষ্ম শরীরও) স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, উহা চৈতন্যস্বরূপ নহে। যাহা স্বপ্রকাশ, তাহার কখনও ক্ষয় হয় না।...অতএব মনের মধ্য দিয়া যে আলোক

১০। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৮০ ১১। তদেব, পৃঃ ৪০৩
১২। তদেব, পৃঃ ৪১০ ১৩। তদেব, পৃঃ ৩০৯
১৪। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩ ১৫। তদেব, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৩৫

আসিতেছে, তাহা মনের নিজের নহে।...উহা অবশ্যই এমন কাহারও যাহার পক্ষে উহা নিজ স্বরূপ, যাহা অপর আলোকের প্রতিফলন নহে, কিন্তু যাহা স্বয়ং আলোকস্বরূপ; অতএব সেই আলোক বা জ্ঞান সেই পুরুষের স্বরূপ বলিয়া তাহার কখনও নাশ বা ক্ষয় হয় না,...উহা স্বপ্রকাশ—উহা আলোকস্বরূপ।'[১৬] আচার্য শঙ্কর তাঁর সকল প্রকরণ গ্রন্থেও স্বপ্রকাশ আত্মার তত্ত্ব প্রকাশ করে বলেছেন ঃ 'এই আত্মতত্ত্ব ইদং নহে (ইদংরূপে জ্ঞানের বিষয় নহে), অবাচ্যতত্ত্ব (বাক্যের অগোচর), স্বপ্রকাশ বলে বেদ্য হয় না।...প্রমাণকে বোধিত করে (সিদ্ধ করে) এমন বোধের প্রমাণ যেজন জানিতে ইচ্ছা করে, সে ইন্ধন দ্বারা অগ্নিকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করে। এই আত্মা (চৈতন্যাত্মা) বিশ্বকে অনুভব করে, তাই এই বোধাত্মা অনুভূত হয় না; আত্মা বিশ্বকে প্রকাশিত করে, তাই নিজে প্রকাশিত হয় না।'[১৭]

এই যে পরতত্ত্ব ব্রহ্ম তিনিই মায়াশক্তি যোগে জগৎ সৃষ্টি করে জগতের ভিতর জীবরূপে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ বলেছেন ঃ 'তিনি কামনা করলেন—বহু হব, প্রজাত হব। তিনি তপস্যা করে এই যা কিছু সব সৃষ্টি করলেন। তা সৃষ্টি করে তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হলেন।'[১৮] ব্রহ্মই জগতে প্রবিষ্ট হয়ে জীব হয়ে—প্রত্যগাত্মা (অন্তঃপ্রবিষ্ট আত্মা) হয়ে বসে আছেন। অন্তঃকরণ (মন), প্রাণ প্রভৃতি উপাধিযোগে তিনি জীব বা জীবাত্মা বলে অভিহিত হলেও স্বরূপত জীব ব্রহ্মই। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।'[১৯] আচার্য শঙ্কর তাঁর সব প্রকরণ গ্রন্থে, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এবং উপনিষদ্‌ভাষ্য-সমূহে এই জীবব্রহ্মৈক্যই স্থাপনে তৎপর ঃ

অহমাত্মা ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥[২০]

—আমি আত্মা, অন্য কিছুই নই, আমি ব্রহ্ম—শোকভাজন নই। আমি সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ—আমি নিত্যমুক্ত স্বভাব। এরূপ শত শত শ্লোক, শত শত দার্শনিক যুক্তি ও শ্রুতির সাহায্যে শঙ্কর জীব-ব্রহ্মের ঐক্য স্থাপন করেছেন। এটাই বেদান্তের মূল কথা—মূল সুর।

বিবেকানন্দ যদিও অধিকারী ভেদে, রুচিভেদে ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির সোপানরূপে কথঞ্চিৎ উপযোগিতা স্বীকার করেছেন, তথাপি অদ্বৈতই যে চরম সিদ্ধান্ত, সকল সোপানের চরম গন্তব্য সে-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ। তাই এক ভাষণে বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'তাঁহারা (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা) বলেন, বিশ্বে তিনটি সত্তা আছে—ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি। প্রকৃতি ও জীব যেন ঈশ্বরের দেহ; এই অর্থেই বলা চলে যে ঈশ্বর ও সমগ্র বিশ্ব এক। কিন্তু চিরকাল ধরিয়া প্রকৃতি ও বিভিন্ন জীব পরস্পর স্বতন্ত্রই থাকিয়া যায়।...অদ্বৈতবেদান্তবাদীরা জীব বা আত্মা সম্বন্ধে এই মতবাদ অগ্রাহ্য করেন; এবং উপনিষদের প্রায় সমগ্র অংশ স্বপক্ষে পাইয়া তাহারই

১৬। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৩-২৪ ১৭। তত্ত্বোপদেশ, ১৭, ১৪, ১৫—শঙ্করাচার্য
১৮। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।৬ ১৯। মাণ্ডূক্যোপনিষদ্, ২
২০। ব্রহ্মানুচিন্তন, ৭—শঙ্করাচার্য

উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিজেদের মত গড়িয়া তুলেন।[২১] ...শঙ্করপন্থী খাঁটি অদ্বৈতবাদীর মতে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে বিকশিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। ব্রহ্ম বিশ্বের উপাদান-কারণ, কিন্তু সত্যই তাহা নন, ঐরূপ প্রতীত হন মাত্র। এ-বিষয়ে রজ্জুতে সর্পভ্রমের উদাহরণ প্রসিদ্ধ।'[২২] আবার বলেছেনঃ '...একটিমাত্র বস্তুই আছে—তাহাই নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছে। তাহাকে আত্মাই বলো আর বস্তুই বলো বা অন্য কিছুই বলো, জগতে কেবল একমাত্র তাহারই অস্তিত্ব আছে। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নাম-রূপ-উপাধিবশতঃ "বহু" প্রতীত হইতেছে।'[২৩]

সুতরাং বিবেকানন্দ বিদেশীদের বোঝাবার জন্য অনেক কথা সরল ও তরল করে বললেও তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত উপনিষদ্ ও শঙ্করের অনুগামী।

নির্বিশেষ নির্গুণ সৎ-চিৎ-আনন্দই পরতত্ত্ব এ-বিষয় বলবার পরে উপনিষদ্, শঙ্কর ও বিবেকানন্দ যে তত্ত্বটি খুব বেশী করে উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন সেটি হল ঈশ্বরতত্ত্ব। ঈশ্বরতত্ত্ব বলতে গেলেই মায়ার কথা এসে পড়ে; কেননা এই মায়া-উপাধিযোগেই শুদ্ধ ব্রহ্মবস্তু ঈশ্বর হয়ে বসে আছেন—জীব ও জগতের। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলছেনঃ 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।'[২৪] প্রকৃতিকে মায়া বলে জানবে, আর মায়ার মালিককে মহেশ্বর বলে জানবে। আচার্য শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে জগৎকারণ—জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ (কর্তা) ঈশ্বরের কথাই সর্বত্র বলেছেন।[২৫] শ্বেতাশ্বতর সেই প্রভু পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপটি অবশ্য বলতে ত্রুটি করেননিঃ 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।'[২৬]—তিনি অংশরহিত, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্দোষ, মায়াদিমালিন্যবর্জিত।

এই মায়া-বিষয়ে শঙ্কর বাক্যসুধায় বলেছেনঃ 'বিক্ষেপ ও আবৃতিরূপিণী মায়া ব্রহ্মে অবস্থিতা হইয়া ব্রহ্মের অখণ্ডতা (পূর্ণতা) আবৃত করিয়া তাহাতে জগৎ ও জীবের কল্পনা করিয়া থাকে।'[২৭] আরও বলেছেনঃ 'বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব, এবং ভূত ও ভূতের কার্যসমূহ জগৎ; এই দুটিই অনাদি কাল হতে মোক্ষের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী হয়।'[২৮]

অদ্বিতীয় অখণ্ড ব্রহ্ম হতে মায়া দ্বারা, মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা জীবজগৎ হয়—শঙ্কর তা বললেন। এবং এই মায়ার অধীশ্বর বা মায়ী হচ্ছেন ঈশ্বর—যিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।

ঈশ্বর প্রসঙ্গে বিবেকানন্দও বলেছেনঃ '...এই সগুণ ঈশ্বর মায়ার মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নন। মায়া বা প্রকৃতির অধীন হইলে সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে "জীবাত্মা" বলে এবং মায়াধীশ বা প্রকৃতির নিয়ন্তারূপে সেই নির্গুণ ব্রহ্মই

২১। বিবেকানন্দের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, উপনিষদ্‌সমূহের প্রধান প্রতিপাদ্য অদ্বৈতবাদ। ২২। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৫-৪৬

২৩। তদেব, পৃঃ ৫১ ২৪। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৪।১০

২৫।ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২৩—শাঙ্কর ভাষ্য ২৬। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৬।১৯

২৭। বাক্যসুধা, ৩৫ . ২৮। তদেব, ৩৬

"ঈশ্বর" বা সগুণ ব্রহ্ম।'[২৯] আবার অতি সুন্দরভাবে বলেছেন ঃ 'আমাদের অস্তিত্ব যতটুকু সত্য, সগুণ ঈশ্বরও ততটুকু সত্য, তদপেক্ষা অধিক সত্য নয়। ...যতদিন আমরা মানুষ রহিয়াছি, ততদিন আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন ; আমরা যখন নিজেরা ব্রহ্মস্বরূপ হইব, তখন আর আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকিবে না।'[৩০] আবার বলেছেন ঃ 'সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক, ভক্তের উপাস্য সগুণ ঈশ্বর, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক নহেন। সবই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। তবে ব্রহ্মের এই নির্গুণস্বরূপ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রেম বা উপাসনার যোগ্য নহে। এই কারণে ভক্ত ব্রহ্মের সগুণভাব অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা ঈশ্বরকেই উপাস্যরূপে স্থির করেন।'[৩১] অন্যত্র বলেছেন ঃ '"সগুণ" অর্থে গুণযুক্ত। শাস্ত্রে এই সগুণ ঈশ্বরের বর্ণনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই জগতের শাস্তা, সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তারূপ সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদীরা এই সগুণ ঈশ্বরের উপর আরও কিছু অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ...অদ্বৈতবাদী তাঁহার প্রতি "সৎ-চিৎ-আনন্দ" ব্যতীত অন্য কোন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নন। আচার্য শঙ্কর ঈশ্বরকে "সচ্চিদানন্দ"-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন ; কিন্তু উপনিষদ্‌সমূহে ঋষিগণ আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, "নেতি, নেতি" অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে। যাহাই হউক, সকল সম্প্রদায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে একমত।'[৩২] আবার বলেছেন ঃ '...জীবাত্মাই চিরতরে নিম্নগামী হইতে পারে না ; এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহাকে ঊর্ধ্বগামী হইতেই হইবে। কাহারও বিনাশ নাই। আমরা সকলেই একটি সাধারণ কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়াছি—উহাই ঈশ্বর।...সকলেই সর্ব জীবনের জনক (উৎস) ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া আসিবে।'[৩৩] পরে যে উপনিষদ্‌বাক্য থেকে এই তথ্য আহরণ করেছেন সেই বাক্যের সারাংশ উদ্ধৃত করে বলছেন, 'যাঁহা হইতে সমুদয় বস্তু জন্মায়, যাঁহাতে অবস্থান করে এবং যাঁহাতে প্রলয়কালে প্রবেশ করে, তিনি ব্রহ্ম।'[৩৪] আবার অন্যত্র বলেছেন, যে ব্যক্তি বলে জগৎ রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর নেই, সে নির্বোধ ; কারণ, যদি জগৎ থাকে, তবে জগতের একটা কারণও থাকবে, আর সেই কারণের নামই ঈশ্বর। ঈশ্বর প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ আরও বলেছেন ঃ '...ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ, তিনি প্রত্যেকের যথার্থ স্বরূপ, প্রত্যেকের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব তিনিই।'[৩৫] বিবেকানন্দের এই উক্তি ছান্দোগ্যোপনিষদের উক্তির সম্পূর্ণ অনুগামী। ছান্দোগ্যে আমরা পাই যে, সৎ-শব্দবাচ্য ঈশ্বরই জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নামরূপ করলেন।[৩৬] সুতরাং জীবের যে ব্যক্তিত্ব, তা ঈশ্বরেরই ব্যক্তিত্ব ; কারণ আরও গভীরে জীবের যে ব্রহ্মস্বরূপ তা তো নির্গুণ নির্ব্যক্তিক চৈতন্যস্বরূপ। ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব জীব ঈশ্বরের সদৃশই জ্ঞানশক্তি,

---

২৯। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৩

৩০। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৯২), পৃঃ ১১৪-১৫ ৩১। তদেব, পৃঃ ১১২

৩২। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৩২-৩৩ ৩৩। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৫-৯৬

৩৪। তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ১৪ ; দ্রষ্টব্য ঃ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ৩।১

৩৫। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১১১ ৩৬। ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৬।৩।৩

ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট। তবে ঈশ্বরে ঐগুলি পরা (পূর্ণ), ও স্বাভাবিক (নিত্য), জীবে অল্প, সীমাবদ্ধ।

আচার্য শঙ্করও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে ঈশ্বর প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'ঈশ্বরও অবিদ্যাকৃতনাম-রূপোপাধির অনুগামী হন, যেমন আকাশ ঘট, করোয়া প্রভৃতি উপাধির অনুগামী (অনুরূপ) হয়। এবং ঈশ্বর নিজের আত্মভূত ঘটাকাশাদিস্থানীয় জীবগণের প্রভুত্ব (ঈশ্বরত্ব) করেন। ...সুতরাং ঈশ্বরের যে ঈশ্বরত্ব সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্ব—এসবই অবিদ্যাত্মক উপাধির পরিচ্ছেদ বা ধর্মকে অপেক্ষা করে, পরমার্থতঃ নয় ; বিদ্যাদ্বারা সকল উপাধির ধর্ম দূরীভূত হলে সেই অদ্বিতীয় আত্মাতে ঈশিতৃ (প্রভু) ঈশিতব্য (অধীন) প্রভৃতি ব্যবহার থাকে না। পরমার্থ স্বরূপে সকল ব্যবহারের অভাবই বেদান্ত ঘোষণা করে।'[৩৭] অন্যত্র বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে বলেছেন ঃ 'অনন্তর অর্থাৎ সত্যস্বরূপের নির্দেশের অনন্তর যাহা সত্যের সত্য তাহাই অবশিষ্ট থাকায় সেই সত্যের সত্যের স্বরূপ নির্দেশ করিব। "আদেশ" অর্থ ব্রহ্মের নির্দেশ। সেই নির্দেশ কি, তা-ই বলা হচ্ছে, "নেতি" "নেতি" সেই এই প্রকারই নির্দেশ। আচ্ছা, নেতি নেতি—এই দুইটি শব্দের দ্বারা সত্যের সত্য (ব্রহ্ম) কিরূপে নির্দিষ্ট হতে পারে ? সর্বপ্রকার উপাধিকৃত বিশেষের (ধর্মের) নিরাকরণের দ্বারা হতে পারে। ...অধ্যারোপিত নাম রূপ ধর্মের দ্বারাই ব্রহ্ম—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "বিজ্ঞান ঘন এব ব্রহ্মাত্মা"—ইত্যাদি শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। যখন তার সমস্ত উপাধিকৃত বিশেষবর্জিত স্বরূপই নির্দেশ করিতে ইচ্ছা করা হয়, তখন অন্য কোন বাক্য বা শব্দের দ্বারা নির্দেশ করিতে পারা যায় না, তখন সকল নির্দেশের নিষেধের দ্বারা "নেতি" "নেতি"—ইহাই মাত্র নির্দেশ।'[৩৮] বিবেকানন্দও পুনঃ বলেছেন ঃ '"সচ্চিদানন্দ" সংজ্ঞায় তাঁহাকে আংশিকভাবেই প্রকাশ করা হয় মাত্র, "নেতি নেতি" সংজ্ঞাই তাঁহার স্বরূপ যথাযথ বর্ণনা করে।'[৩৯] সুতরাং দেখা গেল শঙ্করাচার্যও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের চরম সংজ্ঞা বলেননি, নেতি নেতি এটাই চরম সংজ্ঞা।

এ-পর্যন্ত বিবেকানন্দের কথায় শাঙ্কর বেদান্ত থেকে বিলক্ষণ কিছু পাওয়া যায়নি। তবে ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে ঈশ্বরতত্ত্বে অবতীর্ণ হতে যে প্রসঙ্গ অপরিহার্যরূপে এসে গেছে, সেই মায়ার প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ কয়েকটি কথা বলেছেন যা নিয়ে একদা দার্শনিক মহলে অকারণ কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। যথাস্থানে সে আলোচনা করে দেখানো হবে যে, বিবেকানন্দের সেসব কথা শঙ্করেরই অনুগামী।

এই মায়াশক্তি সম্পর্কে পূর্বেই উপনিষদ্ ও শঙ্কর মতে বলা হয়েছে যে, যাকে প্রকৃতি বলা হয় তা-ই মায়া। এই মায়ার প্রসঙ্গে শঙ্কর অন্যত্র বলেছেন ঃ 'সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের আত্মভূতের (অভিন্নের) ন্যায় অবিদ্যাকল্পিত যে নামরূপ—যাহা বস্তুতঃ ঈশ্বর হতে অভিন্ন বা অন্য বলে নির্বচনের অযোগ্য (তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্বচনীয়ে)—এবং যা সংসার প্রপঞ্চের বীজভূত—তা-ই সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তি বা প্রকৃতি বলে শ্রুতি-স্মৃতিতে কথিত হয়।'[৪০] শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও মায়াকে 'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্'[৪১]—

৩৭। ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৪—শাঙ্কর ভাষ্য

৩৮। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।৩।৬—শাঙ্কর ভাষ্য ৩৯। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৩৫

৪০। ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৪—শাঙ্কর ভাষ্য ৪১। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ১।৩

পরমদেবতার আত্মভূত (অনন্যভূত) নিজ গুণত্রয়ের দ্বারা প্রচ্ছন্ন শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মায়া যে অনির্বচনীয়—অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বা ভিন্ন রূপে নির্বচনের অযোগ্য, তা-ও বলা হয়েছে। সৎ-বস্তু ব্রহ্মের সহিত ভিন্নাভিন্নরূপে অনির্বচনীয় বলে সৎ-রূপে বা অসৎ-রূপেও নির্বচনের অযোগ্য। তাই শঙ্করপন্থী পরবর্তী বেদান্তী মায়াকে 'সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি, ভাবরূপং (অভাববিলক্ষণং) যৎকিঞ্চিৎ'[৪২] বলে লক্ষিত করেছেন। আচার্য শঙ্করও 'তত্ত্ববোধে' বলেছেন ঃ 'ব্রহ্মাশ্রয়া সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা মায়া অস্তি'[৪৩]—অর্থাৎ ব্রহ্মে আশ্রিতা সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা মায়া বলে একটি পদার্থ আছে। সে মায়াই 'ঘটয়তি জগদীশজীবভেদং ত্বঘটিতঘটনা-পটীয়সী মায়া।'[৪৪] অঘটন-ঘটনপটীয়সী সেই মায়া (অখণ্ড চিৎস্বরূপে) জগৎ, ঈশ্বর ও জীবের ভেদ ঘটিয়ে থাকে। আবার বলেছেন, এই মায়ার দুটি শক্তি আছে—বিক্ষেপ ও আবৃতি। তন্মধ্যে বিক্ষেপ শক্তি বুদ্ধি (সূক্ষ্মশরীর) থেকে আরম্ভ করে সকল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে।[৪৫] এই অজ্ঞান বিষয়ে শঙ্কর অন্যত্র বলেছেন ঃ '(এই অজ্ঞান) সৎ নহে, অসৎ-ও নহে, সদসৎ-ও নহে; ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নহে অভিন্নও নহে, ভিন্নাভিন্নও নহে, সাবয়ব নহে, নিরবয়ব নহে, উভয়াত্মকও নহে। কিন্তু কেবলমাত্র ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।'[৪৬]

বিবেকানন্দ ভারতীয় দর্শন ও শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাশ্চাত্যবাসীদের বোঝাবার জন্য প্রধানত উপনিষদ্ ও গীতার সাহায্যেই 'অজ্ঞান' 'মায়া' প্রভৃতি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। উপনিষদ্ বা গীতাতে যেমন অজ্ঞান বা মায়ার কার্যের দ্বারাই মায়াকে বা অজ্ঞানকে বোঝাবার চেষ্টা রয়েছে, বিবেকানন্দও সেইরূপ অজ্ঞানের কার্য যে ভেদবুদ্ধি, দুঃখ-শোক, বিভ্রান্তি—তা দিয়েই বেশীর ভাগ অজ্ঞানকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাই বলেছেন ঃ 'অবিদ্যাই সকল দুঃখের প্রসূতি এবং মূল অজ্ঞান এই যে...সেই অনন্তস্বরূপ যিনি, তিনি আপনাকে সান্ত মনে করিয়া কাঁদিতেছেন; সমস্ত অজ্ঞানের মূল ভিত্তি এই যে, অবিনাশী নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আত্মা হইয়াও আমরা ভাবি, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহমাত্র; ইহাই সমুদয় স্বার্থপরতার (অনর্থের) মূল।'[৪৭] এখানে বিবেকানন্দ অজ্ঞানের আবরণ-শক্তি, যার ফলে আত্মাতে বা ব্রহ্মে জীবত্বসম্ভাবনা হয়, যার ফলে তার দেহাত্মবুদ্ধি, বা ইন্দ্রিয়াত্মবুদ্ধি উৎপন্ন হয়ে আত্মা স্বরূপত অসীম হয়েও ক্ষুদ্র হয়ে যায়, তারই কথা বললেন। বিবেকানন্দ আবার বলেছেন ঃ 'অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমায় পৌঁছুলেন, বললেন যে সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম (spiritual) ও অধিভূত (material) জগৎ এক, তার নাম "ব্রহ্ম" ; আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে, ওটা ভুল, ওর নাম দিলেন "মায়া", "অবিদ্যা", অর্থাৎ অজ্ঞান।'[৪৮] বিবেকানন্দের এসব কথা উপনিষদের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম',[৪৯] 'নেহ নানাঽস্তি

৪২। বেদান্তসার, ৩৪—শঙ্করাচার্য ৪৩। তত্ত্ববোধ, ২৬—শঙ্করাচার্য
৪৪। মায়াপঞ্চক, ১—শঙ্করাচার্য ৪৫। বাক্যসুধা, ১৩
৪৬। দ্রষ্টব্য ঃ পঞ্চীকরণ—শঙ্করাচার্য ৪৭। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬
৪৮। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ২০০ ৪৯। ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩।১৪।১

কিঞ্চন',[৫০]—এসব বাণীকে স্মরণ করায়। গীতায় অজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয়েছেঃ 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।'[৫১]—অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকাতে মানুষেরা মোহ প্রাপ্ত হয় (বিভ্রান্ত হয়)। বেদমন্ত্রেও যে আছে —'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে'[৫২]—পরমেশ্বর মায়াদ্বারা (ইন্দ্রজাল দ্বারা) বহুরূপ ধারণ করেন, সেখানেও মায়ার কার্যের দ্বারাই মায়ার পরিচয় দেওয়া হয়েছে—মায়ার স্বরূপ বলা হয়নি।

বেদান্তদর্শন তথা আচার্য শঙ্করকে অনুসরণ করেই বিবেকানন্দ বলছেনঃ 'এই মায়া মহাশূন্য বা অভাবমাত্র নহে। সৎ-ও নয়, অসৎ-ও নয়—ইহাই হইল মায়ার সংজ্ঞা; অর্থাৎ মায়া আছে—এ-কথাও বলা চলে না, আবার নাই—এ-কথাও বলা যায় না। একমাত্র চরম সত্যকে "সৎ" বলা যাইতে পারে;...মায়া অসৎ (নাই)—এ-কথা বলা যায় না; কারণ তাহা যদি হইত, তবে ইহা কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সৃষ্টি করিতে পারিত না। কাজেই ইহা এমন একটা কিছু, যাহা সৎ বা অসৎ কোনটিই নয়; এজন্য বেদান্তদর্শনে ইহাকে "অনির্বচনীয়" অর্থাৎ বাক্যদ্বারা অপ্রকাশ্য বলা হইয়াছে।'[৫৩] সম্ভবত, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রোতৃবর্গ কিঞ্চিৎ দর্শনাভিজ্ঞ বিবেচনায় বিবেকানন্দ প্রায় বেদান্তদর্শনের ভাষাতেই মায়া বা অজ্ঞানের কথা বলতে ভরসা পেয়েছেন।

অন্যত্র (থাউজেণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে) শাঙ্কর ভাষ্যেরই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ '...জগৎকে দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—অস্মদ্ (আমি) ও যুস্মদ্ (তুমি)। আর আলো ও অন্ধকার যেমন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বস্তু, ঐ দুটিও সেরূপ; সুতরাং...এ দুয়ের কোনটি থেকে অপরটি উৎপন্ন হতে পারে না। এই আমি বা বিষয়ীর (subject) উপর তুমি বা বিষয়ের (object) অধ্যাস হয়েছে। বিষয়ীই একমাত্র সত্য বস্তু, অপরটি অর্থাৎ বিষয় আপাতপ্রতীয়মান সত্তামাত্র। ...আমাদের অনুভূত এই জগৎ সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণে উৎপন্ন। ...এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ও সত্য; কিন্তু আমরা জগৎকে সেভাবে (ব্রহ্মরূপে) দেখছি না; যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রম হয়, তেমনি আমাদেরও ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হয়েছে। একেই বলে "অধ্যাস"।... সুতরাং অধ্যাস মানে "অ-তস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ" —যে বস্তু যা নয়, তাতে সেই বুদ্ধি করা।'[৫৪]

বিবেকানন্দ এখানে খুব সোজা ও সরল করে শঙ্করের অধ্যাস-ভাষ্যের ব্যাখ্যা করে অধ্যাস বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাসের জটিল লক্ষণটির* উল্লেখও না করে সরল লক্ষণটিই বলেছেন। এর পরে বিবেকানন্দ অধ্যাস বোঝাবার জন্য কয়েকটি কথা বলেছেন যা ভাষ্যের বাইরে তাঁর নিজস্ব কথা বলে মনে হয়। বস্তুত ঐ কথাগুলি পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্বের ভাষায় শঙ্করভাষ্যের 'অধ্যাসকে'ই বোঝাবার প্রচেষ্টা মাত্র। কথাগুলি এইঃ 'তুমি নিজেকে বাইরে বিষয়রূপে প্রক্ষেপ না করে কখনও নিজেকে জানতে পার না।... এইরূপে (নিজেকে বাইরে প্রক্ষেপ [অর্থাৎ অধ্যাস] করে) আমরা বিষয়কে (object) [দেহাদিকে] বিষয়ী (subject) [আত্মা] বলে ভুল করে থাকি। আত্মা

৫০। কঠোপনিষদ, ২।১।১১ ৫১। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ৫।১৫

৫২। ঋগ্বেদ, ৬।৪৭।১৮ ৫৩। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৭

৫৪। তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩৩-৩৪ * স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ।

কিন্তু কখন বিষয় (object) হন না।... বিষয়ীতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বহিঃপ্রক্ষেপশক্তি (objectifying power) আছে—তার দ্বারাই তিনি জানতে পারেন, "আমি আছি"।'[৫৫]

বিবেকানন্দের এসকল উক্তি আপাতত শঙ্করের অধ্যাসভাষ্যের বহির্ভূত মনে হলেও বস্তুত তা নয়। 'বহিঃপ্রক্ষেপশক্তি' কথার দ্বারা তিনি আত্মাশ্রিত আত্মবিষয়ক যে অজ্ঞান, তার শক্তিতে যে বিক্ষেপসম্ভাবনা বা অধ্যাসশক্তি আছে তার কথাই বলেছেন। সে অধ্যাসের দ্বারা আত্মাকে অহঙ্কারে (অন্তঃকরণে) অধ্যাস করেই 'আমি আছি'—এইরূপ আত্মপ্রতীতি হতে পারে। শঙ্করও অধ্যাসভাষ্যেই বলেছেন—যদিও আত্মা অবিষয় বলে নিজেকে জানতে পারে না তথাপি—'ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ, অস্মৎপ্রত্যয়-বিষয়ত্বাৎ'[৫৬]—এই আত্মা একান্তই অবিষয় নয়, যেহেতু (অধ্যাসের দ্বারা কথঞ্চিৎ) অস্মৎ প্রত্যয়ের—'আমি' প্রত্যয়ের—বিষয় হয়ে থাকে। শঙ্করের একথাই বিবেকানন্দ একটু আধুনিক ভাষায় (পাশ্চাত্যদর্শনের ভাষায়) বলতে চেষ্টা করেছেন। বিবেকানন্দ যে অধ্যাসের কথা এখানে বলেছেন, তা তাঁর উক্ত কথার পরের কথার থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি পরেই বলেছেন ঃ 'তবে আমরা একটা ভাবকে (idea) আর একটা ভাবের উপর অধ্যাস করতে পারি—যেমন আমরা যখন বলি, "আকাশ নীল"... আমরা নীলত্ব ভাবটা আকাশের উপর আরোপ বা অধ্যাস করে থাকি।'[৫৭] সুতরাং শঙ্করভাষ্যানুসারেই বিবেকানন্দ এখানে স্পষ্টরূপে বলেছেন—আমি আছি—এই জ্ঞানে যে আত্মার বিষয়ত্ব প্রতীতি হয় তা অধ্যাসের ফলেই হয়। এই অধ্যাসকেই তিনি 'বহিঃপ্রক্ষেপশক্তি' বলে অভিহিত করেছেন।

আর একটি ভাষণে মায়াকে বোঝাবার জন্য বলেছেন ঃ 'নাম ও রূপ আসে এবং যায়, কিন্তু সত্ব (সত্তা) চিরদিন একই থাকে। সত্ব, নাম ও রূপ এই জলপাত্রটিকে গড়ে। ভাঙিয়া গেলে ইহাকে আর "পাত্র" নামে অভিহিত কর না, অথবা ইহার পাত্র-রূপ দেখ না। ইহার নাম ও রূপ থাকে না, কিন্তু ইহার সত্ব (সত্তা) থাকে। নাম ও রূপের দ্বারা বস্তুর যাবতীয় পার্থক্য হয়। এগুলি যথার্থ (সত্য) নয়, কারণ ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না। আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলি, তাহা অবিনাশী ও বিকারহীন সত্ব নয়। দেশ কাল ও নিমিত্তই প্রকৃতি।... প্রকৃতিই মায়া। যে নাম ও রূপে প্রত্যেক বস্তুকে ঢালা হয়, তাহাকে "মায়া" বলে। মায়া সত্য নয়, মিথ্যা*। মায়া সত্য হইলে ইহাকে আমরা বিনাশ অথবা পরিবর্তন করিতে পারিতাম না।'[৫৮]

অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপই যে মায়া শঙ্কর তা বহু স্থানেই উল্লেখ করেছেন।[৫৯]

কিন্তু লণ্ডনের এক ভাষণে বিবেকানন্দ মায়া বিষয়ে বলতে কতকগুলি কথা বলেছেন যা নিয়ে কিছু বিতর্ক, কিছু ভুল বোঝা হতে পারে এবং হয়েছেও। তিনি সে ভাষণে বলেছেন—মায়া ইলিউসন নয়। একথাটি নিয়ে আমাদের দেশেই কোন কোন দার্শনিক

৫৫। বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩৪ ৫৬। ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১—শঙ্করাচার্যের অধ্যাসভাষ্য

৫৭। বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩৪-৩৫

* স্মরণ রাখতে হবে যে, বিবেকানন্দ মায়াকে 'মিথ্যা' বললেন।

৫৮। বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩১২

৫৯। ৪০ নং পাদটীকার মূল দ্রষ্টব্য।

আপত্তি তুলেছিলেন, এবং কিছু বাদানুবাদ হয়েছিল। সাধারণত দার্শনিকেরা মিথ্যাপ্রতীতি বা ভ্রমকেই 'ইলিউসন' (illusion) বলে থাকেন। কিন্তু, বিবেকানন্দও বহু স্থানেই শুক্তিতে রজত-ভ্রমের ন্যায় মায়াদ্বারা ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়, মায়া মিথ্যা, ভ্রম—এসব কথা বলে মায়া ইলিউসন (illusion) নয় একথা কেমন করে বলতে পারেন? যেহেতু 'ইলিউসন' শব্দটি ভ্রম, বা মিথ্যাপ্রতীতিকেই বোঝায়, এবং মায়াও মিথ্যা, ভ্রমস্বরূপ, সুতরাং মায়া তো 'ইলিউসন'ই! তবে কেন বিবেকানন্দ এমন কথা বললেন যে মায়া ইলিউসন নয়।

কিন্তু যাঁরা* এ আপত্তি করেছিলেন, বা করেন তাঁরা বিবেকানন্দের ঐ উক্তির আগে-পরে সাবধানে পাঠ করলেই এই প্রশ্নের বা সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। বিবেকানন্দ 'ইলিউসন' শব্দটি ঐ স্থলে বৌদ্ধদের কৃত 'মায়া'র অর্থকে লক্ষ্য করেই ব্যবহার করেছেন। তার ইঙ্গিত তিনি তাঁর ভাষণেই দিয়েছেন। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মতে বহির্জগৎ নেই—অন্তরে (ভিতরে) যে বিজ্ঞান রয়েছে তারই নানা আকার ভ্রমে বাইরে আছে বলে মনে হয় (যদন্তর্জ্ঞেয়ং রূপং তৎ বহির্বদবভাসতে)[৬০]। বিজ্ঞানবাদীরা এই অর্থেই বহির্জগৎকে 'মায়া' বা 'ইলিউসন' বলে।

শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের মতে জগৎ নিরধিষ্ঠান ভ্রম মাত্র। কেশোণ্ডুকের** ন্যায় জগৎ শূন্যে মিথ্যা প্রতীয়মান ভ্রম মাত্র। ইহার কোন সত্য অধিষ্ঠান, বা সত্যাংশ নেই। সুতরাং জগৎ মায়া (সংস্কৃতি) বা ইলিউসন। এই উভয়মতেই প্রতীয়মান বহির্জগৎ অলীক বা শূন্য—এই অর্থই মায়া বা ইলিউসন। বৌদ্ধগণ 'illusion' শব্দের যেরূপ 'অলীক' বা 'শূন্য' বা 'নিরধিষ্ঠান ভ্রম' অর্থ করেন, অদ্বৈতবেদান্তী অর্থাৎ শঙ্করের মায়া সেরূপ ইলিউসন নয়—এটাই বিবেকানন্দের বক্তব্য ছিল। মায়া মিথ্যা, মায়া ভ্রম,† মায়াদ্বারাই শুক্তিতে রজত-ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হয়—একথা বিবেকানন্দ পুনঃ পুনঃ বলেছেন। মায়া ইলিউস্যন নয়—এর অর্থ যে মায়া বৌদ্ধগণের অভিমত নিরধিষ্ঠান ভ্রম নয়—অলীক নয়—এরূপ অর্থেই যে বিবেকানন্দ বলেছিলেন তা তাঁর সে ভাষণের পূর্বাংশ ও পরের অংশ মনোযোগের সাথে পাঠ করলেই বোঝা যায়। তিনি বলেছেন: 'আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাঠ করি, "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"—মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। মহাত্মা শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ এই মায়া-শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বোধহয়,†† মায়া-শব্দ বা মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের দ্বারাও কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের হস্তে ইহা অনেকটা বিজ্ঞানবাদে (idealism-এ) পরিণত হইয়াছিল এবং "মায়া" কথাটি

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের একদা প্রধান ডক্টর অধর দাস এই আপত্তি তুলে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকের সঙ্গে বহু বিতর্ক করেছিলেন।

৬০। ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৮—শাঙ্কর ভাষ্য

** চোখ রগড়ালে চোখের সামনে শূন্যেই কালো রঙ যে জালের মতো প্রতীয়মান হয়, তা-ই কেশোণ্ডুক। শূন্যবাদী বৌদ্ধমতে তার কোন সত্য অধিষ্ঠান বা সত্যাংশ নেই—তা নিরধিষ্ঠান ভ্রম।

† 'মায়া দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র'। [বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ২৯২]

†† বিবেকানন্দ যেকথা 'বোধহয়' বলে অনুমানে বলেছিলেন, তা-ই নিশ্চিত কথা। বিজ্ঞানবাদী ও বৌদ্ধমতে জগৎ মায়া অর্থ—জগৎ বাইরে নেই—মানসিক বিজ্ঞানের আকার মাত্র; শূন্যবাদী মতেও জগৎ অলীক, অসৎ—নিরধিষ্ঠান ভ্রম।

এইরূপ (অলীক) অর্থেই এখন সাধারণতঃ (সাধারণ লোকের দ্বারা) ব্যবহৃত হইতেছে। ...কিন্তু বেদান্তোক্ত মায়ার শেষ পরিপূর্ণরূপ বিজ্ঞানবাদ (idealism), বাস্তববাদ (realism) বা কোন মতবাদ নহে।'[৬১]

'মতবাদ নহে'—কথাটির দ্বারা বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে প্রচলিত জগৎ সম্পর্কীয় মতবাদগুলিরই—idealism, realism প্রভৃতি মতবাদেরই—নিষেধ করেছেন। মায়া 'কোন মতবাদ নহে' বলে তার পরেই বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'আমরা কি এবং সর্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ-সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার ইহা সহজ বর্ণনামাত্র (statement of fact)।'[৬২] এসকল কথা আপাতত অভিনব বা বেদান্তের বহির্ভূত বলে মনে হলেও বস্তুত নয়। অদ্বৈতবেদান্তের রহস্য নতুন ভাবে ভাষায় প্রকাশ করেছেন মাত্র।

আচার্য শঙ্করও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে বলেছেন ঃ 'ব্যবহারে তু—যত্র যথা দৃষ্টস্তপ্যতাপকভাবস্তত্র তথৈব সঃ'[৬৩]—অর্থাৎ ব্রহ্ম একমাত্র পারমার্থিক সত্য এবং জগৎ মিথ্যা হলেও ব্যবহারে (দেশ-কাল-নিমিত্তের জগতে) যেটি যেমন দেখা যায়—অর্থাৎ যা প্রমাণসিদ্ধ তা সেরূপই মানতে হবে। যা দেশ-কাল-নিমিত্তের অধীন, যা প্রমাণসিদ্ধ তা-ই তো আমাদের বাস্তব জগৎ—তা-ই তো fact ; সুতরাং মায়াবাদ যে বাস্তব জগৎ সম্পর্কেই বাদ (কথা)—statement of fact—তা তো নিশ্চিত। সুতরাং বিবেকানন্দের ঐসকল উক্তি বেদান্তবহির্ভূত নয়—সম্পূর্ণরূপে বেদান্ত-সিদ্ধান্তেরই অভিনব ভঙ্গিতে উক্তি। পাশ্চাত্যবাসীদের মায়া বোঝাতে বিবেকানন্দ আবেগপূর্ণ মর্মস্পর্শী নানা বাস্তব ঘটনার দ্বারা মায়ার বাস্তবরূপতা, অঘটন-ঘটন-পটুতা, মায়ার দৃষ্ট নষ্টরূপতা উপস্থাপিত করেছেন। মায়ার কার্যের দ্বারাই মায়াকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, যেমন বেদে, উপনিষদে এবং গীতায়ও করা হয়েছে।

আবার যাকে 'প্রকৃতি' বলা হয় তাকেই উপনিষদ্ এবং শঙ্কর মায়া বলেছেন। প্রকৃতিই আমাদের বাস্তব জগৎ (fact), সুতরাং fact-ই মায়া, এবং statement of fact-ই মায়াবাদ।

আবার উপনিষদে তথা শাঙ্কর ভাষ্যেও আছে ঃ 'তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেযামেষ সত্যম্।'[৬৪]—অর্থাৎ তাঁর (ব্রহ্মের) রহস্য নাম—সত্যের সত্য ; প্রাণ প্রভৃতিও সত্য, তিনি সত্যের সত্য। অদ্বৈতবেদান্তে যে দ্বিবিধ সত্তার কথা বলা হয়, তাহার মূল সূচনা এখানে পাওয়া যায়। প্রাণাদি প্রাকৃত পদার্থও সত্য, তবে আত্মা বা ব্রহ্ম সত্যের সত্য—পারমার্থিক সত্য। আর সব তার তুলনায়—সেই দৃষ্টিতে—শুধু সত্য—অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্য।

বিবেকানন্দও যে একটি কথা বলেছেন—মানুষ মিথ্যা থেকে সত্যে যায় না, '...মানুষ সত্য হইতে সত্যে, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে যায়'[৬৫]—সেকথার মূলও উপনিষদের এ বাক্যেই রয়েছে। অবশ্য বিবেকানন্দের ঐ উক্তির তাৎপর্য শুধু তত্ত্বাংশে নয়, বেদান্তের সাধন অংশেও ভালরূপে প্রযোজ্য। অন্যান্য দেশে বা ধর্মে একটা

৬১। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪ ৬২। তদেব ৬৩। ব্রহ্মসূত্র, ২।২।১০—শাঙ্কর ভাষ্য
৬৪। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।১।২০ ৬৫। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫৮

উচ্চতর সত্যে বা সাধনায় যখনই মানুষ পৌঁছেছে, পূর্বের নিম্নতর সত্য বা সাধনকে মিথ্যা বলে বর্জন করেছে, বিনষ্ট করেছে। কিন্তু বেদান্তে বা হিন্দুধর্মে তা করা হয়নি। নিম্নাধিকারীর জন্য বা ভিন্নরুচি মানুষের জন্য নিম্নতর সাধন বা সত্যকে বর্জন না করে ধরে রাখা হয়েছে। তাই গীতা ও তার শাঙ্কর ভাষ্যের সুরে সুর মিলিয়ে বিবেকানন্দও বলেছেন ঃ 'জ্ঞানীরা অজ্ঞ ও কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না, বিদ্বান ব্যক্তি নিজে যুক্ত থাকিয়া তাহাদিগকে সকল প্রকার কর্মে নিযুক্ত করিবেন। অদ্বৈতবাদ ইহাই বলে—কাহারও মতি বিচলিত করিও না, কিন্তু সকলকেই উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতে সাহায্য কর।'[৬৬] আরও বলেছেন ঃ '...বেদান্ত বলেন—অন্যান্য প্রকারের উপাসনা ভুল নয়।* ...যাহারা নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা ভগবানের উপাসনা করে...তাহারা বাস্তবিক ভ্রান্ত নয়। কারণ মানুষ সত্য হইতে সত্যে, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে।'[৬৭] বিবেকানন্দের এসব কথাও বেদান্তের স্মৃতি-প্রস্থান গীতা ও তার শাঙ্কর ভাষ্যের অনুগামী।

অদ্বৈতবেদান্তে প্রসিদ্ধ বিবর্তবাদ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলছেন ঃ '...যাহা চরম সত্য, তাহার তো পরিবর্তন নাই। এ-বিষয়ে অদ্বৈতবাদীদের বিবর্তবাদ বা আপাত- অভিব্যক্তি-বাদ বলিয়া একটি মত আছে। দ্বৈতবাদী ও সাংখ্যবাদীদের মতে এই বিশ্বের সবকিছুই মূল প্রকৃতির ক্রমিক বিকাশ (পরিণাম)। একদল (প্রাচীন) অদ্বৈতবাদী ও একদল দ্বৈতবাদীর মতে সমগ্র বিশ্বই ঈশ্বর হইতে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছে। শঙ্করপন্থী খাঁটি অদ্বৈতবাদীদের মতে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে বিকশিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। ব্রহ্ম বিশ্বের উপাদান-কারণ, কিন্তু সত্যই তাহা নন, ঐরূপ প্রতীত হন মাত্র। এ-বিষয়ে রজ্জুতে সর্পভ্রমের উদাহরণ প্রসিদ্ধ। রজ্জু সর্প বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, বস্তুতঃ সর্প হয় নাই...।'[৬৮]

পরবর্তী অদ্বৈতবাদীরা এই বিবর্তবাদের উল্লেখ ও অনেক আলোচনা করলেও শঙ্করের ভাষ্যে বিবর্ত শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিবর্ত শব্দটির ব্যবহার না থাকলেও ঐ তত্ত্বটির স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। অধ্যাসভাষ্যে অধ্যাসের লক্ষণ সমাপ্ত করে, অধ্যাসকেই পণ্ডিতেরা 'অবিদ্যা' মনে করেন—এইকথা বলে বলেছেন ঃ 'এরূপ হলে যেখানে যার অধ্যাস হয় তৎকৃত অণুমাত্রও গুণ বা দোষের দ্বারা সেটি (অধিষ্ঠানটি) সম্বদ্ধ হয় না।'[৬৯] অধ্যাস বা আরোপের আধার বা অধিষ্ঠানের অধ্যস্ত পদার্থের কোন গুণদোষ প্রাপ্ত না হওয়া অর্থই এই যে, অধ্যস্ত পদার্থটি আপাত প্রতীয়মান মাত্র, তদ্দ্বারা অধিষ্ঠানটির কোন পরিবর্তন বা পরিণাম হয়নি। এই আপাত প্রতীয়মান পরিণামই

৬৬। তদেব, পৃঃ ১০৫

* 'যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥' [শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ৯।২৩]

৬৭। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫৮

৬৮। তদেব, পৃঃ ৪৪৬

৬৯। 'তত্রৈবং সতি, যত্র যদধ্যাসঃ, তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অনুমাত্রেণাপি স ন সংবধ্যতে।' [ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১—শঙ্করাচার্যের অধ্যাসভাষ্য]

বিবর্ত।[৭০] বিবেকানন্দ বহু স্থানে এই বিবর্তবাদ বা আপাত প্রতীয়মান পরিণামের কথা বলেছেন।

জীবাত্মা সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'প্রতিটি মন এবং প্রতিটি দেহের অন্তরালে (অভ্যন্তরে) যে-আত্মা, তাহাকেই বলে প্রত্যগাত্মা—জীবাত্মা...।'[৭১] আবার বলেছেন ঃ 'সকল জীবাত্মা অনাদি অনন্ত, স্বরূপতঃ অবিনাশী।'[৭২] অন্যত্র বলেছেন ঃ 'সৎস্বরূপ আত্মাই জীবাত্মারূপে আমাদের শরীর-মনের মধ্য দিয়া চলাফেরা করে...। জীবাত্মার শক্তি (উপাধি), মন-বুদ্ধি ও প্রাণই জড়ের দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হইতেছে।'[৭৩]

জীবাত্মা বিষয়ে আরও বলেছেন ঃ 'যদিও সূর্য লক্ষ লক্ষ জলবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হয়, প্রতি জলবিন্দুতে সূর্যের সম্পূর্ণ আকৃতি বা ছায়া পড়ে, কিন্তু সেগুলি শুধু ছায়া বা আকৃতি, প্রকৃত সূর্য মাত্র একটি। অতএব আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে আপাত-প্রতীয়মান আত্মা আছেন, তিনি ঈশ্বরের ছায়া বা আকৃতি মাত্র, ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পশ্চাতে যিনি প্রকৃত সত্তা আছেন, তিনি সেই এক ঈশ্বর। আমরা সকলেই সেখানে এক।'[৭৪]

আচার্য শঙ্করও 'অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ'[৭৫]—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে 'একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ', 'যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্' ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধৃত করে নানা উপাধিতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্বরূপ জীব নানা, এবং ঐরূপে অংশের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, কিন্তু স্বরূপত ঈশ্বর-রূপে (বা ব্রহ্মরূপে) এক—ঐকথাই বলেছেন। শঙ্কর অন্যত্র বলেছেন ঃ 'অবিদ্যার দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত দেহেন্দ্রিয়াদি-উপাধিনিমিত্ত এই যে জীবেশ্বর ভেদ—ইহা পারমার্থিক নহে। প্রত্যগাত্মা একটিই আছে, দুইটি নাই। একই আত্মার ভেদ ব্যবহার উপাধিকৃত—যথা ঘটাকাশ, মহাকাশ ইত্যাদি।'[৭৬] 'বেদান্তকেশরী'তে শঙ্কর বলেছেন ঃ 'পরমেশ্বর মায়াবশতঃ অনন্তরূপ হয়েছেন। অতএব ব্যাপক ব্রহ্মই অতি স্বচ্ছ বুদ্ধিরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হয়ে অকস্মাৎ জীবত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।'[৭৭] জীবাত্মা ও মায়া প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ আর একটি দার্শনিক কথা সরল ভাষায় বলেছেন ঃ 'আমরা নির্বোধ, আমাদের পথও নির্বোধের পথ। এইসব মায়ার ভিতর দিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।'[৭৮] এসব কথাও শঙ্করের কথারই প্রতিধ্বনি। শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যেই বলেছেন ঃ 'সেই অবিদ্যানামক আত্মা ও অনাত্মার অধ্যাসকে অবলম্বন করেই আমাদের সকল প্রমাণ প্রমেয়ের ব্যবহার, লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহার চলে থাকে; বিধি, নিষেধশাস্ত্র (কর্মশাস্ত্র) এবং মোক্ষশাস্ত্রও এই অধ্যাস অবলম্বন করেই প্রবৃত্ত।'[৭৯] সুতরাং

৭০। 'অতত্ত্বতোঽন্যপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥' [বেদান্তসার, ১০৯]

৭১। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪২ ৭২। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২২

৭৩। তদেব, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪২৪

৭৪। তদেব, দশম খণ্ড, পৃঃ ৩০৬; 'যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদঃ।' [ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৮—শাঙ্কর ভাষ্য]

৭৫। ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৮—শাঙ্কর ভাষ্য ৭৬। তদেব, ১।২।২০

৭৭। বেদান্তকেশরী, ৫০—শঙ্করাচার্য ৭৮। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৪২৯

৭৯। ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১—শঙ্করাচার্যের অধ্যাসভাষ্য

এই অবিদ্যা বা মায়ার ভিতর দিয়েই—ভেদজ্ঞানকে অবলম্বন করেই আমাদের সবকিছু ব্যবহার ও সাধনা। মায়াকে অবলম্বন করেই মায়ার পারে যাওয়ার পথ।

জীবের প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ও তার শাঙ্কর ভাষ্যানুসারে এবং ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যানুসারেই বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'এইরূপে আমরা যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, যে-কোন কার্য করিয়াছি, সবই মনের মধ্যে রহিয়াছে। সবগুলিই সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে এবং মানুষ মরিলেও এই সংস্কারগুলি তাহার মনে বর্তমান থাকে—উহারা আবার সূক্ষ্মশরীরের উপর কার্য করিয়া থাকে। আত্মা (জীব) এই-সকল সংস্কার এবং সূক্ষ্মশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান এবং এই বিভিন্ন সংস্কাররূপ বিভিন্ন শক্তির সমবেত ফলই আত্মার (জীবের) গতি নিয়মিত করে। ...আত্মার (জীবাত্মার) ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে।'[৮০] তদনন্তর বিবেকানন্দ সরলভাবে ও সংক্ষেপে দেবযান বা উত্তরায়ণ মার্গের কথা বলেছেন ঃ 'যাঁহারা অত্যন্ত ধার্মিক (তপস্বী ও উপাসক), তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা সূর্যরশ্মির অনুসরণ করেন ; সূর্যরশ্মি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সূর্যলোকে উপনীত হন, তথা হইতে চন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হন ; তথায় তাঁহাদের সহিত আর একজন মুক্তাত্মার (অমানব পুরুষের) সাক্ষাৎ হয় ; তিনি ঐ জীবাত্মাগণকে সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এই স্থানে তাঁহারা সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা লাভ করেন ; তাঁহাদের শক্তি ও জ্ঞান প্রায় ঈশ্বরের তুল্য হয় ; আর দ্বৈতবাদীদের মতে—তাঁহারা তথায় অনন্তকাল বাস করেন, অথবা অদ্বৈতবাদীদের মতে—কল্পাবসানে ব্রহ্মের সহিত একত্বলাভ করেন। যাঁহারা সকামভাবে সৎকার্য করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করেন। ...তাঁহারা এখানে সূক্ষ্মশরীর—দেবশরীর লাভ করেন। তাঁহারা দেবতা হইয়া এখানে বাস করেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। এই ভোগের অবসানে আবার তাঁহাদের পুরাতন (অবশিষ্ট) কর্ম বলবান হয়, সুতরাং পুনরায় তাঁহাদের মর্তলোকে জন্ম হয়। তাঁহারা বায়ুলোক, মেঘলোক প্রভৃতি লোকের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে বৃষ্টিধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত হন। বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়া তাঁহারা কোন শস্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তৎপরে সেই শস্য কোন ব্যক্তি ভোজন করিলে তাহার ঔরসে সেই জীবাত্মা পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করে।'[৮১] বিবেকানন্দ এইরূপে শাস্ত্রোক্ত এবং শঙ্করভাষ্যোক্ত দেবযান ও পিতৃযান মার্গের কথা সংক্ষিপ্ত ও সরলভাবে বিদেশীদের কাছে বলেছেন। স্মরণ রাখতে হবে যে, তিনি এসব অলিখিত ভাষণ প্রদান করেছেন ; তাই শাস্ত্রের উক্তি থেকে একটু আধটু গরমিল থাকলেও সেটা ধরবার নয়। বিদেশী ভিন্নধর্মাবলম্বীদের কাছে বলবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে একটু তরল করেও বলেছেন—যাতে ওরা ধরতে ও বুঝতে পারে।

উক্ত ভাষণে বিবেকানন্দ বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত তৃতীয়গতির কথা না বলে আর এক প্রকার গতির কথা বলেছেন যা স্মৃতি, পুরাণাদিতে যার প্রসিদ্ধি আছে। বৌদ্ধশাস্ত্র 'মহাবস্তু অবদানে' এই প্রেতলোকের বিশদ বর্ণনা বিদ্যমান। বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ

৮০। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৬ ৮১। তদেব, পৃঃ ৪৬-৭

'যাহারা অতিশয় দুর্বৃত্ত, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহারা ভূত বা দানব হয় এবং চন্দ্রলোক ও পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনুষ্যগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে, কেহ কেহ আবার মনুষ্যগণের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়। তাহারা কিছুকাল ঐস্থানে থাকিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া পশুজন্ম গ্রহণ করে। কিছুদিন পশুদেহে বাস করিয়া [মৃত্যুর পর] তাহারা আবার মানুষ হয়—আর একবার মুক্তিলাভ করিবার উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ...এই পৃথিবীকে "কর্মভূমি" বলে। ভাল-মন্দ কর্ম সবই এখানে করিতে হয়। স্বর্গকাম হইয়া সৎকার্য করিলে মানুষ স্বর্গে গিয়া দেবতা হন। এই অবস্থায় তিনি আর নূতন কর্ম করেন না, কেবল পৃথিবীতে কৃত তাঁহার সৎকর্মের ফলভোগ করেন। ...এইরূপে যাহারা ভূতপ্রেত হয়, তাহারা সেই অবস্থায় কোনরূপ নূতন কর্ম না করিয়াই কেবল অতীত কর্মের ফলভোগ করে, তাহার পর পশুজন্ম গ্রহণ করিয়া সেখানেও কোন নূতন কর্ম করে না, তারপর তাহারা আবার মানুষ হয়। ...অতএব বেদান্তদর্শনের মতে মানুষই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী আর এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এখানেই মুক্ত হইবার সম্ভাবনা। ...এই মানবজন্মেই মুক্তির সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা।'[৮২]

কিন্তু উপনিষদ্ ও শাঙ্কর ভাষ্যোক্ত যে তৃতীয়া গতি—তা-ও বিবেকানন্দ অপর একটি ভাষণে বলেছেন ঃ 'আবার যে-সকল প্রাণী দেবযান ও পিতৃযান নামক এই দুই পথের কোন পথে গমন করিতে পারে না, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।'[৮৩] একেই 'জায়ত্ব' 'ম্রিয়স্ব' (জন্মাও এবং মর) রূপ তৃতীয়া গতি বলা হয়।

জীবাত্মার প্রসঙ্গে মৃত্যুর পরে জীবাত্মার গতি সম্পর্কে বেদান্তের তথা বিবেকানন্দের বাণী উপস্থাপিত হল। বিবেকানন্দ আরও বলেছেন ঃ 'জীব হচ্ছে ব্যষ্টি, আর সকল জীবের সমষ্টি হচ্ছেন ঈশ্বর। জীবের অবিদ্যা প্রবল; ঈশ্বর বিদ্যা ও অবিদ্যার সমষ্টি মায়াকে বশীভূত করে রয়েছেন এবং স্বাধীনভাবে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎটা নিজের ভেতর থেকে project (বাহির) করেছেন। ব্রহ্ম কিন্তু ঐ ব্যষ্টি-সমষ্টির অথবা জীব ও ঈশ্বরের পারে বর্তমান।'[৮৪] জীবের সমষ্টি যে ঈশ্বর তা মাণ্ডূক্যোপনিষদে ও তার শঙ্করভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে মূল জীব যে প্রাজ্ঞ অর্থাৎ কারণশরীরাভিমানী সুষুপ্তাবস্থ যে ব্যষ্টি জীব তা-ই সমষ্টিরূপে ঈশ্বর—'এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যামী'[৮৫] ইত্যাদি। অর্থাৎ এই যে ব্যষ্টি জীব সে (অংশরূপে) সমষ্টি ঈশ্বর—যিনি সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী—তাঁর সঙ্গে অভিন্ন। শুধু কারণের স্তরেই এই ব্যষ্টি-সমষ্টি ভাব তা নয়, সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীব যে 'তৈজস'জীব সেও সূক্ষ্মাভিমানী সমষ্টি ঈশ্বর 'হিরণ্যগর্ভে'র সঙ্গে, এবং স্থূলশরীরাভিমানী জীব যে 'বিশ্ব' সেও সমষ্টি-স্থূলাভিমানী ঈশ্বর যে 'বিরাট' তাঁর সঙ্গে অংশাংশিভাবে অভিন্ন। এ-সকল তত্ত্ব বিবেকানন্দ বহু ভাষণে বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। সকল জীবদেহের সেবা, সকলের প্রাণ ও মনের

৮২। তদেব, পৃঃ ৪৭-৮ ৮৩। তদেব, পৃঃ ২৪৪

৮৪। তদেব, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৭৮ ৮৫। মাণ্ডূক্যোপনিষদ্, ৬

সেবার কথা, বিরাটের উপাসনার কথা বহু স্থানে নানাভাবে বিবেকানন্দ বলেছেন—মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ও শঙ্করভাষ্যকে অনুসরণ করেই।

ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া, জীবাত্মা প্রভৃতি বেদান্তপ্রসিদ্ধ তত্ত্ব বা পদার্থ নিরূপণ করে, বিবেকানন্দ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি নিম্নতর বাহিরের পদার্থেরও নিরূপণ বেদান্ত তথা শঙ্কর অনুসারেই করেছেন। বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'আকাশ ও প্রাণ যে এক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, তিনি সেই সর্বব্যাপী সত্তা (পুরুষ), যাঁহার পৌরাণিক নাম ব্রহ্মা—চতুর্মুখ ব্রহ্মা বলিয়া পরিচিত এবং মনোবিজ্ঞানে (উপনিষদে) যাঁহাকে "মহৎ" বলা যায়। ...দার্শনিক ভাষায় যাহা "মন" বলিয়া কথিত হয়, তাহা মস্তিষ্করূপ ফাঁদে আবদ্ধ সেই "মহৎ"-এর কিয়দংশ। মস্তিষ্কের জালে আবদ্ধ ব্যষ্টি-মনের যোগফলকে "সমষ্টিমন" বলা যায়।'[৮৬] ভিন্ন সংস্কারযুক্ত বিদেশীদের কাছে তিনি বেদান্তের ততটাই বলেছেন যতটা তারা বুঝতে পারবে। অনেক স্থলে উপনিষদের তথা শঙ্করের সিদ্ধান্ত তাদের বোধগম্য করবার জন্য বিজ্ঞানের ভাষায় বা মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলবার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি বলছেন ঃ 'আধুনিক বিজ্ঞান এই সেদিন আবিষ্কার করিয়াছে যে, বিভিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে একত্ব রহিয়াছে। বিজ্ঞান সবেমাত্র আবিষ্কার করিয়াছে যে, উত্তাপ তড়িৎ চৌম্বক-শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত সমুদয় শক্তিকেই একটি শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে ;...অতি প্রাচীন হইলেও সংহিতাতেও (বেদমন্ত্রে) সেই শক্তির এরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। মাধ্যাকর্ষণই বলো, উত্তাপই বলো, তড়িৎই বলো, চৌম্বক-শক্তিই বলো অথবা অন্তঃকরণের চিন্তাশক্তিই বলো—সবই এক শক্তির প্রকাশমাত্র এবং সেই এক শক্তির নাম "প্রাণ"।'[৮৭] সমষ্টি-প্রাণ ও সমষ্টি-বুদ্ধি স্বরূপ মহৎ বা হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) থেকে যে সকল জড়শক্তি ও চিন্তাশক্তিরই উদ্ভব, এই তত্ত্ব যে তিনি বেদমন্ত্র ও উপনিষদ্ থেকেই পেয়েছেন, তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। সে-সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা তিনি কতকটা যুক্তিযুক্ত (rational) ও যতটা সম্ভব আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে মিল রেখে করতে চেষ্টা করেছেন। উপনিষদেও প্রথম প্রাণ সৃষ্টি ও পরে মন সৃষ্টির ইঙ্গিত রয়েছে। বস্তুত প্রাণ ও মন—এই দুইটিই মহৎ বা হিরণ্যগর্ভের শরীরস্থানীয়, যেমন অব্যক্ত বা প্রকৃতি ঈশ্বরের শরীরস্থানীয়।

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শঙ্কর বলেছেন ঃ 'প্রলীয়মানমপি চেদং জগচ্ছক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে ; শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি'[৮৮]—অর্থাৎ এই জগৎ প্রলীন হবার সময় শক্তি বা বীজ অবশিষ্ট রেখেই প্রলীন হয়, আবার সেই শক্তি হতেই উৎপন্ন হয়। বিবেকানন্দও বলছেন ঃ 'যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড লীন হইয়া যায়, তখন এই অনন্ত (অসংখ্য) শক্তিসমূহ কোথায় যায় ? এগুলির কি লোপ হয়, মনে কর ? কখনই নহে। যদি বলো, শক্তিরাশির একেবারে ধ্বংস হয়, তবে কোন্ বীজ হইতে আবার আগামী জগৎ-তরঙ্গ উদ্ভূত হইবে ? কারণ, এই গতি তো চিরকাল ধরিয়া তরঙ্গাকারে চলিয়াছে—একবার উঠিতেছে, আর একবার পড়িতেছে ; আবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। এমনিভাবে অনন্তকাল ধরিয়া

৮৬। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩০৫
৮৭। তদেব, পৃঃ ৩০৩ ৮৮। ব্রহ্মসূত্র, ১।৩।৩০—শাঙ্কর ভাষ্য

চলিয়াছে। এই জগৎ-প্রপঞ্চের বিকাশকে আমাদের শাস্ত্রে "সৃষ্টি" বলে।'[৮৯]

এতদ্ব্যতীত জীবন্মুক্তি, জ্ঞানীর প্রারব্ধভোগ, ক্রমমুক্তি, সদ্যোমুক্তি প্রভৃতি বেদান্তসিদ্ধান্ত বিবেকানন্দ সম্পূর্ণরূপে শঙ্করকে (বিবেকচূড়ামণি, উপনিষদ্‌ভায্যকে) অনুসরণ করেই করেছেন।

অদ্বৈততত্ত্ব বা অদ্বৈতবেদান্তই সকল নীতিধর্মের মূল—এ সত্যটি বিবেকানন্দ দেশে বিদেশে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন। সকলের মধ্যে এক আত্মার বা আমার আত্মার অস্তিত্বই সকল নীতিধর্মের—অহিংসা, প্রেম, সেবা, সহানুভূতি প্রভৃতি ধর্মের মূলভিত্তি—এ তত্ত্বের বীজ বা স্পষ্ট ইঙ্গিত উপনিষদ্‌ ও ভগবদ্‌গীতায় থাকলেও এত দৃঢ়ভাবে একথা বিবেকানন্দের পূর্বে আর কেউ ঘোষণা করেনি। বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'এই অদ্বৈততত্ত্ব হইতেই আমরা নীতির মূলভিত্তি পাই; আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি, আর কোন মত হইতে আমরা কোনরূপ নীতিতত্ত্ব পাই না।'[৯০] এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন যে, সকল ধর্মেই অবশ্য নীতিধর্মের শাস্ত্রীয় আদেশ আছে; কিন্তু তা সর্বজনীন নয়, কেননা, অপর ধর্মাবলম্বীরা সে আদেশের—সে শাস্ত্রের প্রামাণ্য মানে না। আবার পাশ্চাত্য নীতিদর্শনে (ethics-এ) নীতিধর্মের ভিত্তি ও লক্ষণ নিরূপণের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সর্ববাদিসম্মত কোন ভিত্তি বা লক্ষণ নির্ণীত হয়নি। কিন্তু অদ্বৈততত্ত্ব নীতিধর্মের সর্বজনীন যুক্তিযুক্ত ভিত্তি রচনা করতে সমর্থ। অপরকে আঘাত বা হিংসা করবে না, কারণ সে তোমা হতে অভিন্ন। অপরের ক্ষতি করলে তা দ্বারা তুমি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিবেকানন্দ অন্যত্রও বলেছেন ঃ 'যুক্তিবাদী পাশ্চাত্যজাতি নিজেদের সমুদয় দর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মূলভিত্তি অনুসন্ধান করিতেছে। ...অনাদি অনন্ত আত্মতত্ত্বব্যতীত নীতিবিজ্ঞানের সনাতন ভিত্তি আর কি হইতে পারে? আত্মার অনন্ত (অখণ্ড) একত্বই সর্বপ্রকার নীতির মূলভিত্তি;...প্রকৃতপক্ষে তুমি আমি এক—ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। সর্বপ্রকার নীতি ও ধর্মবিজ্ঞানের মূলভিত্তি এই একত্ব।'[৯১] অদ্বৈতই নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি এই ঘোষণাটি বিবেকানন্দের একটি বেদান্তভিত্তিক মৌলিক চিন্তা বলা যেতে পারে।

অবশ্য এর বীজ বা ইঙ্গিত তিনি উপনিষদ্‌ ও গীতা থেকেই পেয়েছেন। সেসব মন্ত্র ও শ্লোক তিনি তাঁর কোন কোন ভাষণে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই চিন্তার সমর্থন শাস্ত্রের মধ্যে পেয়ে তিনি নির্ভীকভাবে এই ঘোষণা করতে পেরেছেন। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে যে, 'যিনি সকল প্রাণীকে আত্মাতেই দর্শন করেন, এবং সকল প্রাণীতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি ইহার ফলে কাহাকেও ঘৃণা করেন না।'[৯২] অর্থাৎ সর্বপ্রাণীতে আত্মদর্শনই ঘৃণা না করার হেতু। শঙ্করাচার্যও ঐ মন্ত্রের ভাষ্যে বলেছেন ঃ সেই সমুদয় ভূতেরও (প্রাণীরও) আত্মা-রূপে নিজের আত্মাকে—অর্থাৎ যেমন এই দেহের (কার্যকারণ

৮৯। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩০৩; 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ'—বিধাতা পূর্বের মতো করেই আবার চন্দ্রসূর্য সৃষ্টি করলেন। [ঋগ্বেদ, ১০।১৯০।৩]

৯০। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬৬ ৯১। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৭৭-৮

৯২। ঈশোপনিষদ্‌, ৬

সঙ্ঘাতের) আত্মা আমি সকল প্রত্যয়ের সাক্ষিস্বরূপ—এই স্বরূপেই ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত প্রাণীর আমিই আত্মা—এইরূপে সকল জীবে নির্বিশেষ আত্মাকে যিনি দর্শন করেন—সেই দর্শনের ফলেই তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। ...সকল ঘৃণা আত্মা হতে অন্য দৃষ্ট পদার্থ দর্শনকারীরই হয়ে থাকে ; সর্বত্র নিরন্তরভাবে অত্যন্ত বিশুদ্ধ আত্মার দর্শনকারীর ঘৃণার নিমিত্ত (কারণ) কোনও অন্য পদার্থই নেই—এটা এসেই পড়ে।' ইহা লক্ষণীয় যে শঙ্করের ব্যাখ্যা সর্বত্রই তত্ত্বাভিমুখী। বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা তত্ত্বাভিমুখী হয়েও মানবাভিমুখী, সমাজাভিমুখী কারণ, তিনি বেদান্তের তত্ত্বকে শুধু মুমুক্ষুর মুক্তির জন্য প্রয়োগ করতে চাননি, মানবসমাজের উন্নয়নের জন্যও প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। এজন্যই বিবেকানন্দের মূলমন্ত্র ঃ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। এখানে শঙ্করের বেদান্তের থেকে বিবেকানন্দের বেদান্তের একটু উদ্দেশ্যগত বৈলক্ষণ্য দেখা যেতে পারে। তবে, শঙ্করও যে শুধু মুমুক্ষুর মুক্তির জন্যই বেদান্ত অবলম্বন, বেদান্ত প্রচার করেছিলেন তা নয়, তিনিও বৈদিক ধর্মের পুনঃ সংস্থাপন, সেই ভিত্তিতে সমাজগঠন, বৈদিক ধর্ম হতে ভ্রষ্ট উচ্চবর্ণগুলিকেও স্বধর্মে আনয়ন, প্রভৃতি বহু সামাজিক উদ্দেশ্যও সাধন করেছিলেন। বিবেকানন্দও একস্থানে বলেছেন যে, আচার্য শঙ্কর অনেক নিম্নজাতিকে উন্নীত করে বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে আশ্চর্য কর্ম সম্পাদন করেছিলেন।

ভগবদ্‌গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ 'সর্বত্র সমরূপে অবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শন করে আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না, তার ফলে পরমাগতি লাভ করেন।'[৯৩] এখানেও উপনিষদের উক্ত তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি করে সর্বত্র সমভাবে ঈশ্বরদর্শনকেই হিংসাত্যাগের হেতুরূপে বলা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বেদান্তের ব্যাখ্যায় বিবেকানন্দ তাঁর শ্রোতাদের উপযোগী করার জন্য কিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করলেও সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণরূপে শঙ্করের অনুগামী। তিনি যে বলেছেন একমাত্র শঙ্করই বেদের সুরটি ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছেন—একথাও তাঁর শঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রমাণ করে। যদিও তিনি কিছু মনস্তাত্ত্বিক কারণে কখনও কখনও শঙ্করকে কটাক্ষ করেছেন, কিন্তু তিনি শঙ্করকে এত স্থলে এত প্রশংসা করেছেন, বোধহয় আর কাউকে অত প্রশংসা করেননি। বহু ভাষণে তিনি শঙ্করের বিবেকচূড়ামণির উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। 'বেদান্তদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা শঙ্করাচার্য',[৯৪] 'শঙ্করাচার্য বেদের ধ্বনিটিকে ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন,'[৯৫] শঙ্কর যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন—সনাতন ধর্মকে তার মৌলিক শুদ্ধতায় ফিরিয়ে আনা—সেই কাজই এখনও চলছে, আরও বহুদিন চলবে ;[৯৬] শঙ্করের দার্শনিক প্রতিভা বর্তমান জগতেরও বিস্ময়[৯৭]—বিবেকানন্দের এই সকল সিদ্ধান্ত ও উক্তি শঙ্করের প্রতি তাঁর আস্থা ও আনুগত্যই প্রমাণ করে।

তবে দু-একটি বিষয়ে বিবেকানন্দের মনোভাব শঙ্করের থেকে বিলক্ষণ বলে বলা যায়। যেমন, বিবেকানন্দ মানুষের জীবনকে উন্নত করবার উৎসাহে ব্যবহারিক বেদান্ত

৯৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ১৩।২৮ ৯৪। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫
৯৫। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৮৯ ৯৬। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৫৯ ৯৭। তদেব

বা প্রয়োগাত্মক বেদান্ত (Practical Vedanta) প্রচার করতে গিয়ে বলেছেন—সকলেরই বেদান্ত অনুশীলনের প্রয়োজন আছে ও অধিকার আছে। বেদান্তের প্রধান সাধন যে ব্রহ্মাত্মচিন্তা, ব্রহ্মাত্মধ্যান তাতে সকল স্তরের মানুষেরই অধিকার, কারণ সকলেই এর দ্বারা উপকৃত হবে। ব্রহ্মাত্মধ্যান আত্মাশ্রিত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে ধ্যাতাকে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্টতর করবে। ছাত্র আরও ভাল ছাত্র হবে, উকীল আরও ভাল উকীল হবে, ধীবর আরও ভাল ধীবর হবে। ফল অবশ্য সকলের একপ্রকার হবে না, ঐ চিন্তা বা ধ্যানের উদ্দেশ্য অনুসারে হবে। যে টাকা চায় তার টাকা হবে, যে বিদ্যা চায় তার বিদ্যা হবে। আর যে মুক্তি চায়—মুমুক্ষু—তারই মুক্তিলাভ হবে। বিবেকানন্দের দাবি যে, এ তথ্যও তিনি উপনিষদ্ থেকেই পেয়েছেন। কঠোপনিষদে আছে ঃ 'এই যে ওঁকাররূপ অক্ষর ইহাই অপর-ব্রহ্ম, ইহাই পরব্রহ্ম ; এই অক্ষরকে জেনে যে যা ইচ্ছা করে সে তা-ই পায়।'[৯৮] এখানে প্রকরণ অনুসারে প্রাচীন ব্যাখ্যাকার শঙ্করাদি ব্যাখ্যা করেছেন—অপর-ব্রহ্ম অথবা পরব্রহ্ম এদুটির যা ইচ্ছা করে তা-ই পায়। কিন্তু বিবেকানন্দ আর একটি মুণ্ডকশ্রুতির সমর্থনে ঐ কঠশ্লোকের ব্যাপক অর্থ ধরে অর্থ করলেন—যে যা ইচ্ছা করে তা-ই পায়। মুণ্ডকোপনিষদের একটি শ্লোকে[৯৯] বলা হয়েছে ঃ 'আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব পুরুষ মনে যে যে লোককে চিন্তা করেন বা যে-সকল কাম্যবস্তু কামনা করেন, সেই সেই লোক, এবং সেই সকল কাম্যবস্তু জয় করেন। সুতরাং সমৃদ্ধিকাম জনেরা আত্মজ্ঞ পুরুষকে অর্চনা করবে।'

শঙ্করের মতে বেদান্তের উত্তমাধিকারী, মধ্যমাধিকারী ও মন্দাধিকারী থাকলেও—গৃহস্থেরাও বেদান্ত-সাধনার মধ্যম বা মন্দ অধিকারী হলেও মুমুক্ষুর, অর্থাৎ যে মুক্তি চায় তারই বেদান্ত-সাধনায়—ব্রহ্মাত্মধ্যানে অধিকার। যে মুমুক্ষু নয়, তার সে অধিকার নেই। বিবেকানন্দও বলেছেন যে, যে মুমুক্ষু—মুক্তি চায়—তারই শুধু মুক্তি হবে, অপরের তা হবে না। অন্যের লৌকিক ফল হবে, যে যা চাইবে, সেই ফলই পাবে। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন সকল মানুষকে যে-কোন উপায়ে বেদান্তের দিকে নিতে—ব্রহ্মচিন্তায়—আত্মচিন্তায় টেনে নিতে। তাই তাঁর প্রয়োগাত্মক বেদান্তের পরিকল্পনা। শঙ্করও অবশ্য 'যাবদায়ুস্ত্বয়া বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ'[১০০] বলে বেদান্তচিন্তায় সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল যাপন করতে বলেছেন—তথাপি তা সবার জন্য নয় ; যাঁরা মুক্তি চান, তাঁদেরই। বিবেকানন্দের নিজস্ব প্রকৃতিগত সকলের প্রতি সহানুভূতি, বিশেষ করে দরিদ্র, অবহেলিত, মূর্খ মানুষের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি তাঁকে ঐরূপ বেদান্তে সকলের অধিকার দানে সচেষ্ট করেছিল। তাঁর সে প্রচেষ্টায় তিনি কতটা সফল হতে পেরেছেন, তা বিতর্কিত বিষয়। যদিও আজকাল উপনিষদ্ বা বেদান্তের বুদ্ধিগত চর্চা শহরের শিক্ষিত সমাজে কতকটা দেখা যায়, কিন্তু তাঁরাও ব্রহ্মাত্মচিন্তা করেন কিনা সন্দেহ। অশিক্ষিত গ্রামের সমাজে তো বেদান্তের কোন চর্চাই নেই।

প্রয়োগাত্মক বেদান্তের আর একটি দিকে অবশ্য বিবেকানন্দ অনেকটা সফল হয়েছেন বলতে হবে। সেইটি হল তাঁর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। এটি অদ্বৈতজ্ঞানের—জীবেশ্বর

৯৮। কঠোপনিষদ্, ১।২।১৬ ৯৯। মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।১।১০ ১০০। তত্ত্বোপদেশ, ৮৬

অভেদজ্ঞানের—একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ। এ প্রেরণা তিনি বিশেষভাবে পেয়েছিলেন তাঁর তত্ত্বদ্রষ্টা গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের থেকে। শাস্ত্রীয় সমর্থনও তিনি পেয়েছেন—গীতার দুটি শ্লোকে—'সর্বভূতহিতে রতাঃ'—এই উক্তির থেকে।[১০১]

আচার্য শঙ্করও অবশ্য মানুষের দেহকে 'দেবালয়' বলে বর্ণনা করে দেহস্থিত পরমাত্মাকে 'শিব' বলে স্বীকার করেছেন,[১০২] কিন্তু সে কারণে জীবদেহের বা জীবের সেবা করতে হবে, তা কিছু বলেননি। হয়তো সেযুগে মানুষের এ জাতীয় সেবার উপদেশের তত প্রয়োজন ছিল না। বিদ্যাদান, ধর্মদান ও অধ্যাত্মজ্ঞানদান রূপ সেবা অবশ্য সর্বকালেই ছিল। এটা অবশ্যস্বীকার্য যে তমোগুণে আচ্ছন্ন জাতিকে—ভারতের জড়তাপন্ন সমাজকে রজোগুণের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে ক্রমশ সত্ত্বগুণের দিকে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই বিবেকানন্দ মানুষের সেবার উপর এত বেশী জোর দিয়েছিলেন। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তাঁকেও জীবনের শেষদিকে বলতে হয়েছিল, মৃতের সংস্কার মৃতেরা করুক, সমস্ত জগৎকে আমি একটা কদর্য পশুর মৃতদেহ বলে উপলব্ধি করেছি—ইত্যাদি।

বিবেকানন্দ অবশ্য ভারতের প্রতিনিধিরূপে ভারতের সকল দর্শন, সকল মতবাদ সম্পর্কেই অল্পাধিক আলোচনা করেছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিষয়ে কিছু বলেছেন। ঐগুলির ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রয়োজন আছে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তার চরম সিদ্ধান্ত যে বেদান্ত—বিশেষত শাঙ্কর বেদান্ত—তা নিঃসন্দেহ। ব্যাখ্যা কোন কোন স্থলে একটু বিজ্ঞানঘেঁষা, একটু আধুনিক যুক্তিবাদঘেঁষা হলেও মূলে সম্পূর্ণরূপে শঙ্করানুগামী। তবে বিবেকানন্দ দীন দরিদ্র অবহেলিতের প্রতি তাঁর স্বভাবগত সহানুভূতির এবং ভারত-ভাগ্য-বিধাত্রী জগন্মাতার আবেগে ইচ্ছায় সেই সকল তত্ত্বের প্রয়োগ করতে চেয়েছেন মানবসমাজের উন্নয়নে, বিশেষত ভারতের দরিদ্র, মূর্খ, অবহেলিত নিম্নজাতির উন্নয়নে—কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এরা সকলে উন্নত না হলে ভারত উন্নত হতে পারে না। এরা বঞ্চিত, মূর্খ, ধর্মজ্ঞানহীন, শাস্ত্রজ্ঞানহীন থাকার ফলেই ভারতের পরাধীনতা, ধর্মহীনতা প্রভৃতি সঙ্ঘটিত হয়েছে। তাই বিবেকানন্দের অদ্বৈতবেদান্তের উদ্দেশ্য ঃ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগতো হিতায় চ।' বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান গীতাতেও বলা হয়েছেঃ 'সকল প্রাণীর হিতসাধনে রত থেকে সংযতাত্মা ঋষিগণ পাপরহিত ও নিঃসংশয় হয়ে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।'[১০৩] শঙ্করও তাঁর ভাষ্যে একথাই ব্যাখ্যা করেছেন।

অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মতত্ত্বের উপলব্ধির উপায়রূপে বা সাধনরূপে বিবেকানন্দ যা যা বলেছেন সবই উপনিষদ্ তথা শঙ্করের সিদ্ধান্তের অনুযায়ী। বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'জ্ঞানমার্গের সাধকের সর্বপ্রথম আবশ্যক—শম ও দম। এই দুইটির ব্যাখ্যা একসঙ্গেই করা যাইতে পারে। ইহাদের অর্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখী হইতে না দিয়া স্ব স্ব কেন্দ্রে ধরিয়া রাখা। ...মনকে সংযত করিবার জন্য আমাদিগকে প্রথমে এই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে

১০১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫।২৫ ; ১২।৪

১০২। 'দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ।' [আত্মপূজা, ৮—শঙ্করাচার্য]

১০৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫।২৫

হইবে। বাহ্য ও আন্তর বিষয়ে মনের গতিরোধ করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব স্থানে সংযত রাখা—ইহাই হইল "শম" ও "দম" শব্দের অর্থ। মন বা অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম হইল শম এবং চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম দম।'[১০৪] এইরূপে আরম্ভ করে বিবেকানন্দ ক্রমে উপনিষদে এবং শঙ্করভাষ্যে বর্ণিত সকল সাধনের কথাই বলেছেন। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান—এই ষট্ সম্পদের ব্যাখ্যা করে তিনি ক্রমে শঙ্কর-কথিত সাধন চতুষ্টয়ের অন্য সাধনগুলির—অর্থাৎ মুমুক্ষুত্ব, নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ অর্থাৎ বৈরাগ্য বিষয়েও অনেক কথা বলেছেন। তিনি বৈরাগ্যের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিতিক্ষার ব্যাখ্যা তিনি শঙ্করের বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থ থেকেই করেছেন। শঙ্করের ঐ গ্রন্থ তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। বহু ভাষণেই ঐ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন, বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ '...আমরা জানি...হৃদয়েরই প্রয়োজন বেশী। হৃদয়ের দ্বারাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়...।[১০৫] আজ যে তোমার হৃদয়ে এতটুকু অনুভবশক্তি আছে, তাহাই প্রবল হইবে, ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে—দেবভাবাপন্ন হইতে থাকিবে, যতদিন না উহা সবকিছুতে, সর্ববস্তুতে একত্ব অনুভব করিতে পারে—নিজের মধ্যে ও অপরের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারে। বুদ্ধি (intellect=শাস্ত্রপাণ্ডিত্য) তাহা পারে না। "বিভিন্নরূপে শব্দযোজনার কৌশল, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন প্রণালী কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।" ...জগতে প্রায় সকল মহাপুরুষই অনুভবের (অপরোক্ষানুভূতির) উপর জোর দিয়াছেন।'[১০৬] প্রথম ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও আচার্য শঙ্কর বলেছেন ঃ 'অবগতিপর্যন্তং জ্ঞানং সন্‌বাচ্যয়ো ইচ্ছায়াঃ কর্ম। ...ব্রহ্মাবগতির্হি পুরুষার্থঃ।'[১০৭] এই অবগতি শব্দের দ্বারা অপরোক্ষানুভূতিকেই বলা হয়েছে।

অবশ্য, বিবেকানন্দ যে হৃদয়ের কথা—অনুভূতির কথা বলেছেন, তাতে মনে হয় অন্তঃকরণের চিন্তাশক্তির (thinking-এর) চেয়ে ভাবশক্তির (feeling, emotion-এর) উপর বেশী জোর দিতে চেয়েছেন। উপনিষদেও যে আছে—'হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি'[১০৮] ইত্যাদি, সেকথাও ভাববার বিষয়। তবে উপনিষদে আবার 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া...'[১০৯] ইত্যাদি বলে সূক্ষ্ম অগ্র্য বুদ্ধির (keen one-pointed intellect-এর) কথাই বলেছেন। আবার, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে একটি কথা পাওয়া যায়—'হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো...'[১১০]—অর্থাৎ হৃদয়ের দ্বারা, মনীষার (চিন্তাশক্তির) দ্বারা এবং মন-এর (ইচ্ছাশক্তির) দ্বারা তাঁকে (ব্রহ্মাত্মাকে) জানা যায়। তাতে মনে হয় যে, উপনিষদের অভিপ্রায় (তাৎপর্য) এই যে, চরম অনুভূতিতে—অপরোক্ষানুভূতিতে—এই তিনটিরই পরম উৎকর্ষ ঘটে—ইচ্ছাশক্তির, চিন্তাশক্তির ও ভাবশক্তির। Thinking, feeling (emotion), and 'will' converge in the final realization of the Self. ব্রহ্মাত্মানুভূতিতে চিন্তাশক্তি, ভাবশক্তি ও

১০৪। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩-৮৪

১০৫। 'হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি' [বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৩।৯।২৩ ; বিবেকচূড়ামণি, ৬০]

১০৬। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩৫-৩৬

১০৭। ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১—শাঙ্কর ভাষ্য ১০৮। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৩।৯।২৩

১০৯। কঠোপনিষদ্, ১।৩।১২ ১১০। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৪।১৭

ইচ্ছাশক্তি চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়ে মিলিত হয়।

আচার্য শঙ্কর হৃদয়ের কথা বা ভাবশক্তির (feeling-এর) কথা আলাদা করে কিছু বলেননি। মোক্ষের কারণ-সামগ্রীর মধ্যে ভক্তি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বলেছেন।[১১১] ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা বিবিদিষা তা-ও কৌতূহলমাত্র নয়, ব্রহ্মাত্মাকে জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা—তীব্র অনুরাগ। ব্রহ্মসূত্রের সংরাধনসূত্রের[১১২] ভাষ্যে শঙ্কর ভক্তিপূর্বক উপাসনা, ধ্যানের দ্বারাও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার স্বীকার করেছেন।

প্রথমদিকে বিবেকানন্দ 'অধিকার' শব্দটির বাংলা অর্থ right বা special right বা বিশেষ সুবিধা (special privilege)—এই অর্থ ধরে নিয়ে, এই বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন। দাক্ষিণাত্যে 'অধিকারবাদে'র বিরুদ্ধে একটি ভাষণও দিয়েছেন। তাঁর যা উদ্দেশ্য তা হল—জন্মগত কারণেই কেউ 'বিশেষ সুবিধা ভোগ' করবে, অন্যেরা বঞ্চিত থাকবে তা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে 'অধিকার' শব্দের অর্থ অন্যপ্রকার। অধিকার অর্থ যোগ্যতা—উপযুক্ততা (fitness)। এই অর্থে সবাই যে সবকিছুতে অধিকারী নয়—একথা বিবেকানন্দ বহু স্থানেই স্বীকার করেছেন। সবাই মোক্ষের অধিকারী নয়, তাদের জন্য ধর্ম, অর্থ, কামের ব্যবস্থা আমাদের সনাতন ধর্মেই আছে, বৌদ্ধ ধর্মে, খ্রীষ্টান ধর্মে তা নেই—ইত্যাদি বলে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেছেন।[১১৩] পরে যখন অধিকার শব্দটির শাস্ত্রীয় অর্থ জানতে পেরেছেন তখন বলেছেন ঃ '...যখনই তোমরা "অধিকার ভেদে"র অপূর্ব রহস্য বুঝিবে, তখনই উহা তোমাদের নিকট অতি সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।'[১১৪] এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, শাস্ত্রে যে বিভিন্ন ভাবের কথা রয়েছে, সেগুলিকে বিকৃত করে এক ভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই; আপাতবিরুদ্ধ হলেও অধিকারীভেদে অর্থাৎ যোগ্যতা ও কামনা ভেদে সে সবগুলির ব্যাখ্যারই উপযোগিতা আছে, প্রয়োজন আছে।

আর্যশাস্ত্রে তথা শঙ্করের দর্শনে অধিকার শব্দের অর্থ যে যোগ্যতা, তার নির্ণায়ক হল ঃ (১) ফলার্থিত্ব, (২) বিদ্বত্তা, (৩) সামর্থ্য ও (৪) অপর্যুদস্তত্ব। অর্থাৎ যে কর্মের যে ফল (শাস্ত্রে কথিত বা প্রসিদ্ধ আছে) সেই ফলার্থিত্ব বা ফলকামনা যার আছে, এবং সে কর্ম কিরূপে করতে হবে তা যার জানা আছে (বিদ্বত্তা), সে কর্ম করবার শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সামর্থ্য যার আছে (সামর্থ্য), এবং সেই কর্মটি যদি তার পক্ষে বিশেষভাবে (শাস্ত্রে) নিষিদ্ধ না থাকে (অপর্যুদস্তত্ব), তাহলে সেই কর্মে সে অধিকারী হয়। এ চারটির একটিরও অভাব হলে অধিকার থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে—শাস্ত্রে 'রাজসূয়' বা 'অশ্বমেধ' যজ্ঞের কথা আছে। তার ফল হল দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গতি। সেই ফলের কামনা যদি আপনার থাকে, এবং কি প্রকারে রাজসূয় করতে হবে তা যদি জানা থাকে, এবং সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবার মতো শারীরিক ও আর্থিক ক্ষমতা যদি আপনার থাকে, এবং 'রাজসূয়' যজ্ঞ যদি আপনার পক্ষে শাস্ত্রের

১১১। 'মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী' [বিবেকচূড়ামণি, ৩২]

১১২। ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৪—শাঙ্কর ভাষ্য ১১৩। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৬-৫৭

১১৪। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩০১

দ্বারা নিষিদ্ধ না থাকে, তবেই আপনি 'রাজসূয়' যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকারী হবেন। কিন্তু আপনি যদি ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হন, তবে অধিকারী হবেন না। কারণ, শাস্ত্রে বলা আছে—'রাজা (ক্ষত্রিয়) রাজসূয়েন যজেত'—ক্ষত্রিয় রাজারাই 'রাজসূয়' যজ্ঞ করবে; সুতরাং আপনি ব্রাহ্মণ বা শূদ্র—'রাজসূয়' যজ্ঞ আপনার পক্ষে পর্যুদস্ত বা নিষিদ্ধ। অধিকার-নির্ণায়ক অপর তিনটি (ফলার্থিত্ব, বিদ্বত্তা, সামর্থ্য) আপনার থাকলেও 'রাজসূয়ে' আপনার অধিকার নেই। সুতরাং বোঝা গেল যে, অধিকার অর্থ right বা স্বত্ব নহে; অধিকার অর্থ—যোগ্যতা, যার নির্ণায়ক হল উক্ত চারটি। এ অধিকারভেদ বিবেকানন্দও বহু স্থলে মেনেছেন।

সে যা হোক, অদ্বৈতবেদান্তের বা শাঙ্কর বেদান্তের যা মূলকথা সে সবই বিবেকানন্দ মেনেছেন শুধু নয়—তা-ই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত, তা-ও সর্বত্র প্রতিপাদন করেছেন। বলেছেন ঃ 'বেদান্তদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা শঙ্করাচার্য। তিনি অকাট্য যুক্তিসহায়ে বেদের সার সত্যগুলি সংগ্রহ করিয়া অপূর্ব জ্ঞানশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, যাহা তাঁহার ভাষ্যের মাধ্যমে শিক্ষণীয়...।'[১১৫] ছান্দোগ্যোপনিষদের যে বাক্যটি সনাতনধর্মের সকল সম্প্রদায় স্বীকার করেন—'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ'[১১৬]—অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত শুদ্ধ হলে ব্রহ্মাত্মবিষয়ক ধ্রুব অর্থাৎ দৃঢ় স্মৃতি উৎপন্ন হয় (ও মুক্তিলাভ হয়)—তার রামানুজকৃত ব্যাখ্যা ও শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা—দুইয়ের আলোচনা করে বিবেকানন্দ উভয় ব্যাখ্যাই আমাদের গ্রহণীয় এই সিদ্ধান্ত করেছেন। রামানুজ আহার অর্থ খাদ্য ধরে আহারশুদ্ধির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে খাদ্যকে জাতিদোষ, নিমিত্তদোষ ও আশ্রয়দোষ—এই ত্রিবিধ দোষ মুক্ত করতে বলেছেন। আর শঙ্কর 'ইন্দ্রিয়ৈঃ আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ'[১১৭]—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা যা-কিছু আহরণ করা হয়, তা-ই আহার এই অর্থ ধরে সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে শুদ্ধ দোষমুক্ত করতে বলেছেন। বস্তুত রামানুজের ব্যাখ্যাও এর ভিতরেই এসে যাচ্ছে। কারণ খাদ্যও রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা আহরণ করা হয়। সেটা শঙ্করভাষ্যে খুলে বলা নেই বলে বিবেকানন্দ খাদ্যের শুদ্ধিও বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় রামানুজের ব্যাখ্যাও গ্রহণীয় বলেছেন।

অনেকে মনে করেন, তত্ত্বাংশে বিবেকানন্দের বেদান্ত শঙ্করানুযায়ী হলেও সামাজিক ব্যাপারে বিবেকানন্দ আধুনিকদের মতোই শঙ্কর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। শঙ্কর শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম সমর্থন করে জন্মগত জাতিভেদকে সমর্থন করতেন, কিন্তু বিবেকানন্দ জন্মগত জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন। যদিও শঙ্কর থেকে দেড় হাজার বৎসর পরবর্তী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিবেকানন্দের-চিন্তা ও মত কিছু পৃথক হওয়া আশ্চর্য নয়, বিবেকানন্দ এই জন্মগত, বংশগত জাতিভেদ সম্পর্কে কি বলেছেন দেখা যাক। তিনি বলেছেন ঃ 'এ-বিষয়ে পুরোহিতগণ (মীমাংসক ও স্মার্তগণ) যাহাই বলুন, জাতি (জন্মগত জাতিভেদ) একটি সামাজিক বিধান-মাত্র, এক্ষণে স্ফটিকের মতো এক নির্দিষ্ট বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।'[১১৮] কিন্তু বংশগত জাতিভেদ নৈসর্গিক নয়,

---

১১৫। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫ ১১৬। ছান্দোগ্যোপনিষদ, ৭।২৬।২

১১৭। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৭২ ১১৮। বাণী-সঞ্চয়ন, পৃঃ ৭৪

সামাজিক প্রথা—বুঝেও বিবেকানন্দ তার সমর্থনে চিন্তনীয় বহু কথা বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ 'প্রাচীন জাতিবিভাগে অতি সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা ছিল—বর্তমান জাতিভেদের মধ্যে যেটুকু ভাল দেখিতে পাইতেছেন তাহা সেই প্রাচীন জাতিবিভাগ হইতেই আসিয়াছে।'[১১৯] আবার বলেছেনঃ 'সর্বদা মনে রাখিও, আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, পৃথিবীর আর কোন দেশেরই সেরূপ নহে। আমি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, অন্য কোথাও সেরূপ নহে। অতএব যখন জাতিভেদ অনিবার্য, তখন অর্থগত জাতিভেদ অপেক্ষা পবিত্রতা কৃষ্টি ও আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বরং ভাল। অতএব নিন্দাবাদ একেবারে পরিত্যাগ কর।'[১২০] শঙ্করাচার্যের ন্যায় বিবেকানন্দও তাঁর সুপরিণত চিন্তায় বর্ণাশ্রমের সমর্থকই ছিলেন। তিনি বলেছেনঃ 'নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, সহানুভূতিশূন্য প্রতিযোগিতাই ইওরোপের মূলমন্ত্র। আমরা কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম দ্বারা এই সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছি—এই বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিযোগিতা নষ্ট করে, তাহার শক্তিকে খর্ব করে, উহার নিষ্ঠুরতা হ্রাস করে; বর্ণাশ্রম দ্বারাই এই রহস্যময় জীবনের মধ্য দিয়া মানবাত্মার গমনপথ সরল ও মসৃণ হইয়া থাকে।'[১২১]

আরও বলেছেনঃ '...আমাদের প্রাচীন স্মৃতিকারগণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন, এবং এখন আমাদের জাতীয় আচার-ব্যবহারে যে-সকল পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে, সেগুলিও তাঁহারা যথার্থই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারাও জাতিভেদলোপকারী ছিলেন, তবে আধুনিকদিগের মতো নহে।'[১২২] 'সুতরাং উচ্চবর্ণকে নিম্ন করিয়া...কিঞ্চিৎ ভোগ-সুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা হইবে না; পরন্তু আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদান্তিক ধর্মের নির্দেশ পালন করে, প্রত্যেকেই যদি ধার্মিক হইবার চেষ্টা করে,...তবেই এই জাতিভেদ-সমস্যার সমাধান হইবে। ...ভারতবাসী সকলেরই প্রতি তোমাদের পূর্বপুরুষগণের এক মহান আদেশ রহিয়াছে। ...সে আদেশ এইঃ "চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে...।" বেদান্তের এই আদর্শ শুধু যে ভারতেই খাটিবে, তাহা নহে—সমগ্র পৃথিবীকে এই আদর্শ অনুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতিভেদের ইহাই লক্ষ্য। ইহার উদ্দেশ্য—ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ ধার্মিক হয়—অর্থাৎ ক্ষমা ধৃতি শৌচ শান্তিতে পূর্ণ হয়, উপাসনা ও ধ্যান পরায়ণ হয়।'[১২৩] এসব কথা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বিবেকানন্দ যে ক্রমে ব্রাহ্মণত্ব অর্জনই জাতিভেদের বা বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য বলেছেন তা এই ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, সদাচার অর্জন করার কথাই বলেছেন। এ যে শুধু আমাদের সকল জাতির জন্য তা নয়, সমগ্র মানবেরই এইগুলি প্রয়োজন। মনু যে বলেছেন—'এতদ্দেশপ্রসূত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর সকল

১১৯। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮-৪৯

১২০। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৮৯ ১২১। তদেব, পৃঃ ৯২

১২২। তদেব, পৃঃ ৮৬ ১২৩। তদেব, পৃঃ ৮৭-৮

মানব নিজ নিজ চরিত শিক্ষা করিবে।'[১২৪] —এর দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কেবলমাত্র ভারতের নিম্নবর্ণ নয় পৃথিবীর সকল মানবেরই প্রয়োজন এই ব্রাহ্মণের চরিত্র (ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, শৌচ, সদাচার প্রভৃতি) শিক্ষা করে ব্রাহ্মণত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া, ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করা। সুতরাং বিবেকানন্দের এ চিন্তাধারা শাস্ত্রবিরোধী বা শঙ্কর-বিরোধী নয়।

আদর্শ ব্রাহ্মণ হওয়া বা ব্রাহ্মণত্বই যে হিন্দুসমাজের আদর্শ, বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য তা বোঝাবার জন্য শঙ্করের কথা উদ্ধৃত করে বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ '...ব্রাহ্মণজাতিকে ধ্বংস করিতে হইবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ—শঙ্করাচার্য তাঁহার গীতাভাষ্যের ভূমিকায় ইহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কারণ বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার অবতরণের মহান উদ্দেশ্য। এই ব্রাহ্মণ, এই দিব্য মানব, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এই আদর্শ ও পূর্ণমানবের প্রয়োজন আছে; তাঁহার লোপ হইলে চলিবে না।'[১২৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুগের বিশেষ প্রয়োজনে দু-একটি বিষয়ে বিবেকানন্দের মনোভাব শঙ্করাচার্য থেকে একটু বিলক্ষণ হলেও অদ্বৈতবেদান্ত ব্যাখ্যানে কোনই পার্থক্য বা বিরোধ নেই। যুক্তিবিচারে, দৃষ্টিভঙ্গিতে, মূল সুরে বিবেকানন্দ শঙ্করকেই অনুসরণ করেছেন।

১২৪। মনুসংহিতা, ২।২০
১২৫। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৯০-৯১

ভারতের নবজাগরণ ঃ রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ

প্রস্তাবনা

স্বামীজী সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই অন্য আর এক ভারতপুরুষ সম্পর্কে উচ্চারিত এযুগের মহাকবির সেই বিশ্রুত পঙ্‌ক্তি দুটি মনে পড়েঃ 'একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।' পরাধীন পরপদলাঞ্ছিত আত্মবিশ্বাসহীন ভারতবর্ষকে তিনি যথার্থই একধর্মরাজ্যপাশে বেঁধে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং সে ধর্মের নাম মানবধর্ম, জীবনধর্ম। স্বামীজীর এই অবিশ্বাস্য কর্মসম্পাদন-প্রতিভা দেখেই রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন ঃ 'He himself was the embodied unity of a nation containing a hundred different nations, wherein each nation, divided and subdivided into castes and sub-castes, seems like one of those diseased persons whose blood is too liquid to congeal—and his ideal was unity, both of thought and of action. His claim to greatness lies in the fact that he not only *proved* its unity by reason, but *stamped* it upon the heart of India in flashes of illumination.'[১] সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তিই তাঁর আজীবনের সাধনা। সমন্বয়ী পরিপূর্ণ জীবনের তিনি রূপকার। ইউরোপীয় জীবননীতিতে যা-ই হোক, আমাদের ভারতসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত যাঁদের জানা আছে, তাঁরা জানেন এদেশে ইহ-পরকাল, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনচর্যার মধ্যে সত্যিকার কোন প্রভেদ নেই। এই কারণেই 'দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি, আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি ;'—কেবল কবিকথন নয়, জীবনানুগ বাস্তব সত্য। 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' —এ আমাদের চিরন্তন জীবনসংস্কার। তাই সর্বমোহমুক্ত কৈবল্যমুক্তির পরমানন্দে স্থিত 'জ্ঞানাগ্নিশুষ্ক' সন্ন্যাসীর 'আঁখি-পল্লবে এমন অশ্রুধারা উদ্গত।'[২] রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক—সব রকম বন্ধনমুক্তির আকৃতি পরিস্ফুট হতে দেখি বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর কর্মে-কথায়-তপস্যায়। এই সমন্বয়ের আদর্শই ভারতসংস্কৃতির মূল ঘোষণা। সবাইকে, সমাজের প্রতিটি মানুষকে একদিন পূর্ণের প্রাঙ্গণে পৌঁছাতেই হবে। সমাজের প্রতি স্তরের প্রতিটি মানুষের সহজ স্বচ্ছন্দভাবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার অধিকার স্বীকৃত ছিল এদেশে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় বন্ধনের থেকে আমাদের এই সামাজিক সংহতি ও সম্পর্ক ছিল আরও গভীর ও ব্যাপক। কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা সেই পূর্ণের সাধনা থেকে বিচ্যুত হলাম। খণ্ডিত হল জীবনবোধ। আশ্রয়

১। The Life of Vivekananda and the Universal Gospel—Romain Rolland, Advaita Ashrama, Calcutta, 1970, pp. 284-85

২। বাংলার নবযুগ—মোহিতলাল মজুমদার, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৮৭৯ শকাব্দ, পৃঃ ১২৩

করলাম কোনমতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে শম্বুকবৃত্তি। ফলে জাতি ও দেশ হিসাবে ঘটল আমাদের অবনতি ও অবক্ষয়।

অবক্ষয়ের ইতিবৃত্ত ঃ জাতির জীবনে এই অধঃপতন, অবক্ষয় ও অন্ধকারের ইতিবৃত্ত উদ্ধার করা খুব সহজ নয়। এককথায় বলা চলে ইহজীবনের প্রতি প্রচণ্ড ভ্রান্ত অনীহাই সেই সমন্বিত মহাজীবনের থেকে পতনের মূলীভূত কারণ। স্বামীজী কথিত সূত্র (Head, Hand and Heart)—মস্তিষ্ক বাহু ও হৃদয়ের সমন্বয়—একদিন ভারতবর্ষে ছিল। কিন্তু আমরা অতিরিক্ত অধ্যাত্মচর্চার দিকে মনঃসংযোগ করার ফলে প্রত্যহজীবনে সচ্ছলভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রামকে করেছি অবহেলা। এবং অতঃপর শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা থেকেও পতিত হয়েছি আচারবিচার কুসংস্কারের অতল অন্ধকারে, আধ্যাত্মিকতার ভণ্ডামিকেই প্রশ্রয় দিয়েছি আধ্যাত্মিকতার নামে। বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানাভাবে সমৃদ্ধি নিয়ে এলেও বুদ্ধের মহৎ ব্যক্তিত্বের অবর্তমানে বৌদ্ধধর্মের শেষ অধ্যায়ে সকলের জন্য ঢালাও সন্ন্যাসদান এবং অহেতুক অহিংসা নীতির সর্বত্র অন্ধ অনুবর্তন শেষ পর্যন্ত জাতি হিসাবে আমাদের বাস্তবজীবন-বিমুখ করে তুলেছিল। বৌদ্ধ মঠ ও সঙ্ঘারামগুলিও হয়ে উঠেছিল সাধক-সাধিকাদের লীলাবিহার এবং বিকৃত কামচর্চার কেন্দ্র। এবং তখনই ঘটে আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব। শঙ্কর অত্যধিক অস্বাস্থ্যকর হৃদয়চর্চার ক্ষেত্রে শুদ্ধ বুদ্ধি ও মস্তিষ্কপ্রধান অদ্বৈতবাদ এনে জাতির জীবনে ভারসাম্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এর অনতিকাল পরেই শুরু হল তুর্কী-তাতারদের বর্বর বিজয়-অভিযান। ইহসর্বস্ব সেমিটিক সভ্যতার প্রতিনিধি মুসলমান-আক্রমণে ছিন্ন-ভিন্ন বিধ্বস্ত হল ঐহিক সভ্যতার মাপকাঠিতে দুর্বল ভারতবর্ষ। বাস্তব জীবনের অন্যায় অবহেলা এমনি করে জাতির জীবনে নিয়ে এল চরম অভিশাপ ও দুর্গতি। তারপর কয়েকশ বছরের ইতিহাসে ভারতসংস্কৃতি শম্বুকবৃত্তি গ্রহণ করে কোনমতে বেঁচে থাকতে প্রয়াসী হল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আর একবার দেশে এসেছিল ভক্তি-আন্দোলনের ও নবজাগরণের জোয়ার। নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। কিন্তু সে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল পূর্ব ভারতে।

তবে পাঠান মোগল তুর্কী সকল মুসলমান বিজেতাই শেষ পর্যন্ত এদেশের মানুষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে একটি সমন্বয়ী ঐক্যে মিলেমিশে গিয়েছিল। এবং এই দুই সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে ও সমন্বয়ে কিছু কিছু নতুন ফসলও জাতির ভাণ্ডারে জমা পড়েছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা, বহিরঙ্গ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যা-ই হোক, মুসলমান যুগেও গ্রামে-গাঁথা কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ সামান্য শিথিল ও ভ্রষ্ট হলেও, কখনও একেবারে ভেঙে পড়েনি। ভারতসংস্কৃতির মৌল ধারাটি মোটামুটি অক্ষুণ্ণভাবেই প্রবাহিত ছিল।

ইংরেজ আগমন ঃ কিন্তু ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশী যুদ্ধের প্রহসনের পশ্চাতে সুড়ঙ্গপথে যারা এদেশে এল, তাদের আক্রমণের চেহারা গোড়া থেকেই অন্যরকম। ইংরেজ সবদিক থেকেই এদেশে একান্তভাবে বিদেশী। এবং আক্রমণও সর্বাত্মক। এদেশের মাটিতে বসতি স্থাপন করে এদেশকে তারা আপন করে নিল না। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে মুসলমান রাজশক্তির পরাজয় ও পতন, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ কর্তৃক

দিল্লীর বাদশাহ শাহ্ আলমের কাছ থেকে কোম্পানির নামে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ এসবের সম্মিলিত প্রভাবে বাংলা তথা ভারতের আকাশে ঘনিয়ে এল চরমতম দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনার কালো মেঘ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ এমনি করেই আমাদের ইতিহাসে শুরু হল কালান্তর। এমনি করেই আমরা জড়িয়ে পড়লাম বিশ্বধনতন্ত্রের ইতিহাসের সঙ্গে। অবাধ লুণ্ঠন, শাসনের নামে নির্মম শোষণ, উদ্বৃত্ত মূল্য অপহরণ, ধনতন্ত্রের এই নীতিহীন নীতি আমাদের শেষতম জাতীয় সম্পদটুকুও গ্রাস করতে উদ্যত হল। যদিও অর্থনৈতিক রাজনৈতিক চেতনা তখনও জাতির অন্তরে উন্মেষিত হয়নি, তবু ভিতরে ভিতরে ক্রমশ একটা প্রতিবাদ ও প্রত্যাঘাতের ঝড় উঠছিল জাতির মগ্নচৈতন্যের অন্তরে। সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় দেখা গেল তার সামান্য প্রকাশ। হরণ করা হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ওয়েলেসলির সময়ে। জড়তায় তামসিকতায় আচ্ছন্ন জাতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি সংস্কৃতির নানা দিক থেকে আঘাতের পর আঘাতে ছিন্নভিন্ন, খণ্ডক্ষিপ্ত, বিমূঢ় বেদনায় বিব্রত ব্যতিব্যস্ত। ইংরেজ শাসন ও শোষণ কেবলই যে আমাদের জীবন ও জীবিকাকে আঘাত করল, বিনষ্ট করতে উদ্যত হল আমাদের অর্থনৈতিক অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত, তা-ই নয়, তাদের শিক্ষা ও সাহিত্য, তাদের জীবনাদর্শ ও পদ্ধতির আপাতরমণীয় চাকচিক্য নিয়ে প্রবেশ করল একেবারে আমাদের জীবনের মর্মমূলে। আমাদের অন্ধ তামসিকতা, আমাদের যুগসঞ্চিত জড়তা, কুসংস্কার, অন্ধ লোকাচার—এসবের সুযোগ নিয়ে খ্রীষ্টান মিশনারী পাদরীর দল ও রাজপুরুষেরা তাদের সাহিত্য-শিল্প, তাদের ঐহিক সভ্যতার বিলাস ও ভোগের নানা সুলভ উপকরণ নিয়ে আঘাত হানল আমাদের ভাবজগতে। বাইরের বিজেতার ভূমিকার অন্তরালে একেবারে প্রবিষ্ট হল আমাদের গৃহাভ্যন্তরে।

ইংরেজ-আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল ঃ এদিকে অষ্টাদশ শতকের শিল্পবিপ্লব হল ইংরেজদের প্রধান সহায়। একদিকে শক্তিচালিত তাঁত, বাষ্পযান, রেলপথ, লোহার বাষ্পীয় পোত, অন্যদিকে ধানের কল, পাটকল, ছাপাখানা, ঘড়ি, বৈজ্ঞানিক নানা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রত্যহজীবনের নানা সম্ভারে সজ্জিত হয়ে দিগ্বিজয়ে নামল তারা। ফলে, আমাদের চিরাচরিত দুর্বল উৎপাদন রীতি ও গতির ঘটল আমূল পরিবর্তন। এবং স্বয়ংনির্ভর কুটিরশিল্প-প্রধান আমাদের গ্রামীণ অর্থনৈতিক ভিত্তি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। ইংলণ্ডের অনুসরণে এদেশেও ক্রমে নগরমুখী নতুন বণিকসভ্যতার পত্তন হল। ধ্বংস হয়ে গেল আমাদের বহুকালের পল্লীজীবনের ধীরমন্থর ধারা এবং মগ্ন মধুর নিথর প্রশান্তি।

নবজাগরণের রূপরীতি ও প্রয়োগ ঃ এই অর্থনৈতিক শোষণ মারাত্মক সন্দেহ নেই, তবু সেদিনকার ভাববিপ্লব বা ভাবের আঘাতই জাতির কাছে সবচেয়ে নিদারুণ আত্মিক সঙ্কটরূপে দেখা দিল। শুধু ভাববিপ্লব নয়, সর্বাত্মক সে আক্রমণ। প্রায় একই সময় একদিকে ফোর্ট উইলিয়মের সংস্কার এবং অন্যদিকে হিন্দু কলেজের গোড়াপত্তন। দেশের মানুষকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে আত্মভ্রষ্ট করে সমস্ত জাতটাকে কালো সাহেব বানিয়ে ভারতবর্ষকে তারা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার মতো আর একটি

উপনিবেশ বানাতে চেয়েছিল। সেদিনকার ভাববিপ্লবের বিরুদ্ধে আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাদের সে অপপ্রয়াস বহুলাংশে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম সত্য, কিন্তু আমাদের নবজাগরণের নেতৃস্থানীয়দের অনেকেরই দৃষ্টি পড়েনি ব্রিটিশ বেনিয়ার নির্মম অর্থনৈতিক শোষণের দিকে। কারণ আমাদের নবজাগরণের আন্দোলন ছিল একান্তই নগরকেন্দ্রিক। মুষ্টিমেয় ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ই সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাই অবাধ বাণিজ্যের নামে বিদেশী বেনিয়াদের যথেচ্ছ লুণ্ঠনে, নতুন সৃষ্ট জমিদার-ভূস্বামীদের অত্যাচার-উৎপীড়নে, নীলকর সাহেবদের হিংস্র নির্মম আক্রমণে এবং শিল্পবিপ্লবে সমৃদ্ধ ইংলণ্ডের নতুন উৎপাদনরীতির প্রয়োগে গ্রামে গাঁথা এই দরিদ্র দেশের কোটি কোটি কৃষক, মজুর, কুটিরশিল্পের নিপুণ অথচ অসহায় কারিগরশ্রেণী যে ক্রমশই নিষ্পিষ্ট নিপীড়িত হয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল—সেদিকে তাঁদের যথেষ্ট নজর পড়েনি। আবেদন-নিবেদন, নানা সাংস্কৃতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন, সভা-সমিতিতে নরম গরম বক্তৃতা, অজস্র পত্রপত্রিকা নিবন্ধ রচনা প্রভৃতি বহিরঙ্গ কর্মপ্রয়াসকেই তাঁরা জাতীয়তাবাদের পরাকাষ্ঠা বলে ঘোষণা করেছিলেন। বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে সংযোগ-সম্পর্কহীন তাঁদের কর্মপ্রয়াস তাই কখনও ফলদা স্বাতীর পুণ্যবারি হয়ে সমগ্র জাতিকে অভিষিক্ত করতে পারেনি। এই কারণেই সেদিনকার নবজাগরণ যথার্থই নবজাগরণ ছিল কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেউ একে বলেছেন আধখানা নবজাগরণ। কেউ বা বলেছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাময়িক উত্তেজনামাত্র।

কিন্তু বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর এ আন্দোলনের চেহারাটাই পালটে গেল। স্বামীজীর নতুন জীবনাদর্শ সামনে রেখে যথার্থ অর্থেই এ আন্দোলন তখন জাতীয় আন্দোলনে রূপান্বিত হয়ে উঠল। কারণ স্বামীজীর সমগ্র আন্দোলনই ঐ মূর্খ, দরিদ্র, নির্যাতিত-নিরন্ন জনসাধারণকে নিয়ে। স্বামীজীই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ জাতি বাস করে জীর্ণ পর্ণকুটিরে এবং সেদিকেই সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে। স্পষ্ট কণ্ঠে তিনি বললেন : 'আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে... ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না।'[৩] 'জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজসংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না—ক্ষতটি কোথায়। বিধবা-বিবাহের প্রচলন দ্বারা তাঁহারা জাতিকে উদ্ধার করিতে চাহেন। আপনি কি মনে করেন যে, বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপর কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে? ...সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।'[৪] স্বামীজী আরও বললেন : 'আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধুম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ

৩। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪৭২
৪। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৪৩৫

করিয়া দেখিলাম, সমাজসংস্কারসভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা "ভদ্রলোক" নামে প্রথিত ব্যক্তিরা "ভদ্রলোক" হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না!'[৫]

এযাবৎ ব্যর্থ নবজাগরণ-আন্দোলনের শ্রেণীসচেতন, অহমিকায় আক্রান্ত কর্মীদের হৃদয়ে অনুভব সঞ্চারিত করবার জন্যই যেন তিনি বললেন: 'তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগন আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এইসকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমনকি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।'[৬]

দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও অবক্ষয় নিয়ে স্বামীজীর আগেও কেউ কেউ যে আলোচনা করেননি তা নয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং রামমোহন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের কৃষকদের উপর গুরু করভারের প্রতিবাদ করেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দাদাভাই নওরোজী এবং গোবিন্দ রাণাডে আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। ১৮৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীল-আন্দোলনের মূল কারণও অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও অসাম্য। অষ্টাদশ শতকের পরার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রসারিত কালে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যে বিক্ষিপ্ত গণবিদ্রোহ হয়েছিল তারও মূল কারণ অর্থনৈতিক অসন্তোষ। 'সংবাদ কৌমুদী', 'সংবাদ প্রভাকর', 'স্পেক্টেটর', 'তত্ত্ববোধিনী', 'সঞ্জীবনী', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীও এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য অবদান। বঙ্কিম-রমেশচন্দ্র-হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা এ প্রবন্ধে পরে উল্লেখিত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকার দানও কম নয়। কিন্তু একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-সরকার এবং ভারতীয় ভূস্বামী ও অভিজাত বুদ্ধিজীবীদের হাতে দেশের কৃষক-শ্রমিকদের নির্মম নিষ্পেষণের মর্মন্তুদ কাহিনী স্বামীজীর মতো করে এর আগে কেউ তুলে ধরেননি। এবং জনসাধারণের অন্নহীনতা ও অশিক্ষাই যে সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের মূলীভূত কারণ তা এমন যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় এবং অনুভব দিয়ে তাঁর আগে বা পরে কেউ কোনও দিন এত স্পষ্ট প্রত্যয়ে উচ্চারণ

৫। তদেব, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৭৪

৬। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১১৬

করেননি। আর অবশ্যম্ভাবী শূদ্ররাজত্বের কথাও স্বামীজীর আগে কারও চেতনায় ধরা দেয়নি।

ধর্মকে কেন্দ্র করেই আমাদের নবজাগরণের আন্দোলন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। ধর্মকেন্দ্রিক ভারতবর্ষে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্মান্দোলনেরও মূল উদ্দেশ্য যে একটি সুস্থ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা এই সত্য বিস্মৃত হয়ে ধর্মের বহিরঙ্গ আলোচনায় এবং বিভিন্ন ধর্মের তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণে, বিশেষ বিশেষ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে কিংবা নব নব ধর্মমতের আমদানি করে তার সপক্ষে নতুন নতুন যুক্তি উপস্থাপনা করার দিকেই স্বামীজী-পূর্ব ধর্মান্দোলনকারীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যয়িত হচ্ছিল। ধর্ম সম্পর্কে এইসব তাত্ত্বিক আলোচনা কিংবা নতুন উদ্ভাসিত কোন বিশেষ ধর্মের নিগড়ে গোটা জাতিকে বেঁধে দেবার প্রয়াস—কিছুই যে শেষ পর্যন্ত দেশ ও জাতির কোন উপকারে আসবে না—তা স্বামীজী সুনিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন বলেই নতুন কোন ধর্ম স্থাপন না করে নতুন যুগের নব মানবধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বললেন ঃ 'ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?'[৭]

জাতির সার্বিক কল্যাণের কথা চিন্তা করেই নবজাগরণের সমস্ত কর্মপ্রয়াসকে যথার্থ জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনে স্বামীজী তৎকালীন সঙ্কট-মুহূর্তে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে আত্মকেন্দ্রিক আত্মোন্নতিমূলক ব্যক্তিগত ঈশ্বরোপাসনার কোন প্রয়োজন নেই বলে ঘোষণা করলেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণ, বিশেষ করে ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দ সমগ্র দেশের কথা ভুলে, মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিত নব্য বাঙালীকে খাঁটি আধুনিক বানাবার প্রয়োজনেই তাঁদের সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করেছিলেন। একেশ্বরবাদী এক এবং অদ্বিতীয় ব্রাহ্মধর্মের বুলডোজার চালিয়ে সমগ্র জাতিকে অখণ্ড ঐক্যে উত্তীর্ণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আমাদের বহু প্রাচীন ধর্মমত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে তাঁরা এক নতুন ধর্ম স্থাপনে তৎপর হলেন। বস্তুত, প্রাচীনকে পরিত্যাগ না করে, তার যুগোপযোগী সংস্কারসাধনই যে শ্রেয় পন্থা এবং নতুনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য বা অন্ধ বিদ্বেষ কোনটিই পোষণ না করে তাকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে বিচারপূর্বক গ্রহণই যে বেঁচে থাকার পথ, জীবনের পথ, স্বামীজীই সর্বপ্রথম তা উপলব্ধি করেছিলেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই বিপরীতমুখী সভ্যতার সঙ্ঘাতে সমগ্র দেশের ভাবজগতে যে আলোড়ন শুরু হয়েছিল ধর্ম-সাহিত্য-শিল্প-শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি—সবকিছুর মধ্য দিয়েই তা আত্মপ্রকাশ করেছিল। জাতীয়তাবোধ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছিল। মনে রাখতে হবে বিদেশী সভ্যতার সঙ্গে সঙ্ঘাতে কেবল হলাহলই ওঠেনি, কিছু দুর্লভ অমৃতের অধিকারও আমরা অর্জন করেছিলাম। কারণ ইংরেজ-রাজশক্তি শুধু এদেশে কামান-বন্দুক-গোলাবারুদ, শাঠ্য-লোভ-ষড়যন্ত্র-হিংসা-হানাহানির কুৎসিত সাম্রাজ্যবাদের অক্ষম উত্তরাধিকারই সঙ্গে নিয়ে আসেনি, সঙ্গে ছিল

৭। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৮

তাদের ইউরোপীয় রেনেসাঁর উৎকৃষ্ট ফসলসম্ভার : ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান, যুক্তিনিষ্ঠা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, স্বাধীনতাপ্রীতি, প্রকৃতিবাদ, কর্মৈষণা, রজোগুণাশ্রিত জীবনপদ্ধতির আরও নানা উজ্জ্বল মানবিকতার দায়ভাগও। আমাদের দেশের অনেক মহৎ জ্যেষ্ঠেরা সে সঞ্জীবনীর সন্ধানও পেয়েছিলেন। তাঁদের জীবনচর্যা ও কর্মপ্রয়াস আলোচনা করলেই বোঝা যাবে এই নবযুগরচনায়, দেশ ও জাতিকে স্বাধিকারে স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠায় কার কতটা অবদান।

রামমোহন ও বিবেকানন্দ : কালের বিচারে নবজাগরণের প্রথম প্রাণপুরুষ রামমোহন—এ-সম্পর্কে প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই একমত। মোহিতলালের ভাষায় : রামমোহন 'সকল বিষয়ে বাস্তব প্রয়োজন ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়া, সমাজ-শাসন বা শাস্ত্রবিধি অমান্য করিবার পন্থা নির্দেশ করিলেন; রামমোহনই সর্বপ্রথম এই মৃতকল্প জাতির ঘোর তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতার ভানমুক্ত করিয়া একটি রাজসিক আদর্শের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন।...অতি সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবাদের সন্ন্যাস-বৈরাগ্য ও সর্বপ্রকার গুহ্যসাধনা হইতে জাতির মনকে মুক্ত করা; যাহা একটা অন্ধবিশ্বাস মাত্রে পর্যবসিত হইয়া জীবনকে কুণ্ঠিত ও ভয়গ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং চারিত্রিক দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিতেছিল—তাহার উচ্ছেদ-সাধন। ...ইহাই সেযুগের প্রথম বিদ্রোহঘোষণা।'[৮] ধর্ম ও সমাজচিন্তায় জাতির যে অন্ধ তামসিকতা, চিরাচরিত প্রথানুগত্য ও জড়ত্বময় কর্মহীনতা—তার বিরুদ্ধে রামমোহনের মতো বিবেকানন্দও সক্রিয় কর্মোদ্যমে ব্রতী হয়েছিলেন। তবে অধ্যাত্মবোধ ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যেই যেমন মৌলিকতা ছিল, তেমনি পার্থক্যও ছিল প্রচুর। স্বামীজী পরবর্তীকালে Practical Vedanta-কে নবভারত সংগঠনের প্রয়োজনে, তাঁর সমস্ত কর্মপ্রয়াসের পশ্চাতে এক এবং অদ্বিতীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন, রামমোহনও বেদান্তধর্মকেই জাতীয় ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তবে একজনের কাছে যা ছিল creed বা বিশ্বাস, অন্যজনের কাছে তা policy বা সাময়িক কর্মপন্থামাত্র। যেহেতু যুক্তিনিষ্ঠ মানবিকতার (humanism) উপরই নবজাগ্রত জাতির প্রতিষ্ঠা রামমোহনের কাঙ্ক্ষিত ছিল, এবং যেহেতু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত মূর্তিপূজক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীর মধ্যে একটি সার্বভৌম ধর্মের প্রতিষ্ঠা ছাড়া জাতীয় জীবনে ঐক্যচেতনা আসবে না এবং ঐক্যচেতনা ছাড়া ভারতবর্ষের পক্ষে কোন রাজনৈতিক অধিকার বা সামাজিক সুযোগসুবিধা লাভ করা সম্ভব হবে না, সেইহেতুই বেদান্তকে নবজাগ্রত ভারতের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মিস্টার ডিগবীর কাছে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন : 'It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort.'[৯] রামমোহন কোন আধ্যাত্মিক আকূতির পথে ধর্মান্দোলনে নামেননি।

৮। বাংলার নবযুগ, পৃঃ ১-২

৯। স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ—সম্পাদনা : স্বামী সদাত্মানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, ১৩৭১, পৃঃ ১৩

ব্যক্তিজীবনেও রামমোহন ছিলেন সৌখিন ও বিলাসী।[১০]

ইউরোপীয় যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মর্তপ্রীতি, প্রকৃতিবাদ এবং সুস্থ স্বাভাবিক মানবিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই রামমোহন প্রায় হুবহু ইউরোপীয় জীবনাদর্শেই আমাদের দেশকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মেকলে-প্রবর্তিত ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করার এবং ইংরেজি পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থারও একজন গোঁড়া সমর্থক ছিলেন তিনি। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর তিনি আমহার্স্ট সাহেবকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা যে শক্তিশালী ভারতগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় স্বামীজীও একথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন শিক্ষাব্যবস্থাই পরিণামে কল্যাণপ্রদ হতে পারে বলে স্বামীজী মনে করতেন না। কারণ ঐ ধরনের শিক্ষা বাস্তব জীবনে কিছু সুখসুবিধা অর্জন করে আনতে পারলেও মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের সহায়ক হতে পারে না। অবশ্য নবযুগরচনায় রামমোহনের অবদান প্রচুর ; দেশ ও জাতির নানা সমস্যা নিয়ে তিনি ভেবেছেন এবং নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতো দেশের কল্যাণ ও প্রগতির জন্য বিবিধ কুশল কর্মে আত্মনিয়োগ করে গেছেন। তবে দেশ ও জাতির জন্য তিনি যা করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী গৌরব ও গুণগরিমা তাঁর উপর আরোপিত করা হয়েছে কিনা, তা বিচার্য। আচার্য মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থে এবং অতি সাম্প্রতিককালে বিশ্রুত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার 'On Rammohan Roy' গ্রন্থে রামমোহন প্রসঙ্গে বহুকাল প্রচলিত এবং সযত্নলালিত যে অতিশয়োক্তির ধূম্রজাল বা রামমোহন-মিথ বিরচিত হয়েছিল, বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবিশ্লেষণে ও ঐতিহাসিক তথ্য বিচারে তা বিদূরিত করে দিয়েছেন। তবুও ব্যক্তির স্বাধিকার স্থাপনের জন্য সমস্ত শাস্ত্রবিধি ও সমাজশাসনের অন্ধকার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রামমোহনের মধ্যে প্রত্যক্ষ। তাঁর যুক্তিবাদী সংস্কারকের ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। রামমোহনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, দেশপ্রেম, সমাজসংস্কার ও স্বাধীনতাস্পৃহা, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা না হলেও দেশে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁর কর্মপ্রয়াস প্রভৃতি বিশেষভাবে স্মরণীয়। আত্মীয় সভা (১৮১৮) এবং ব্রাহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা (১৮২৮), ব্রাহ্মণসেবধি, সংবাদ কৌমুদী ও ফার্সী সংবাদপত্র মীরাৎ-উল্-আখবার প্রভৃতির প্রকাশ, এ ছাড়াও উপনিষদ্ প্রভৃতির অনুবাদসহ প্রায় সত্তরখানি গ্রন্থ প্রণয়ন তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব ও সারস্বত প্রতিভার সাক্ষ্য দেয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে সংগ্রামে এবং ওয়েলেসলি-প্রবর্তিত মুদ্রাযন্ত্র-আইনের প্রতিবাদে তাঁর ফার্সী সংবাদপত্রের প্রকাশ তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদের ভাষা আমাদের দেশে নতুন। দেশীয় প্রেসের স্বাধীনতা ও রায়তের অধিকার প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিয়ে পঞ্চাশটি অনুচ্ছেদব্যাপী যে চিঠি তিনি চতুর্থ জর্জকে লিখেছিলেন, বিশ্বের মুক্তিচিন্তার ইতিহাসে তা অনেকের মতে (ডক্টর বিমান বিহারী মজুমদার প্রভৃতি) দ্বিতীয় অ্যারিওপ্যাজিটিকা বলে অভিহিত। সমাজসংস্কার এবং স্বাধীনতা-আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে বাংলা গদ্যের অন্যতম আদি রূপকার

১০। রাজা রামমোহন রায়—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী (প্রকাশ-সন অনুল্লেখিত), পৃঃ ৩৪

রূপে তাঁর দান অপরিসীম। যদিও শ্রদ্ধেয় ডক্টর মজুমদারের মতে যেমন তিনি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা নন, তেমনি প্রথম সংবাদপত্রের সম্পাদক কিংবা বাংলা গদ্যের আদি স্রষ্টার সম্মান—একটাও তাঁর প্রাপ্য নয়। 'On Rammohan Roy' গ্রন্থে এ-সম্পর্কে আনুপূর্বিক আলোচনা আছে। সতীদাহপ্রথা নিবারণ সম্পর্কেও রামমোহনের অনেক আগে একদিকে যেমন তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার সচেতন ও উদ্যোগী হয়েছিল, অন্যদিকে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু রামমোহনই প্রথম সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন করে যখন সতীদাহপ্রথা বন্ধ করার আয়োজন করেছিলেন, রামমোহন কিন্তু তার বিরোধিতা করেছিলেন কারণ তিনি আইনের বদলে সমাজচেতনা জাগাতে চেয়েছিলেন। প্রগতিবাদী রামমোহন হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথারও বিরোধী ছিলেন। এবং তিনি শুধু সমাজসংস্কার ও দেশের মুক্তি-আন্দোলনের অগ্রদূত নন, সারা বিশ্বের নিপীড়িত পরাধীন মানুষের সমস্ত মুক্তি-আন্দোলনের সপক্ষে তাঁর মহান ভূমিকাও শ্লাঘ্য। নেপলস-এর মুক্তিযুদ্ধের ব্যর্থতায় ব্যথিত রামমোহন নেপলস-এর জনযুদ্ধকে তাঁর ব্যক্তিগত যুদ্ধ এবং এ পরাজয়কে নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেন ঃ 'Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be, ultimately successful.'[১১] তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাসংগ্রামী গ্রীসকে, ঔপনিবেশিক স্পেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার গণ-অভ্যুত্থানকে এবং গণতন্ত্রের জন্য ফরাসীদের ন্যায়সংগ্রামকে তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন। তৎকালীন আমেরিকায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সেখানেও ছিল রামমোহনের অকুণ্ঠ সমর্থন। তাঁর এই বিশ্ববোধ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রগতিবাদেরই স্মারক। রামমোহনের এই আন্তর্জাতিকতা, সমন্বয়চেতনা, যুক্তিনিষ্ঠা, বিশ্বসংযোগ ও বৃহত্তর মানবতাবোধ স্মরণ করেই স্বামীজী তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিলেন ঃ 'যে-দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে-একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহা আরম্ভ হইয়াছে।'[১২]

প্রগতিশীল উজ্জ্বল মানবিকতাবোধসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন-চরিত্রের অনেক অসঙ্গতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষণীয়। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর ঐশ্বর্যপ্রিয়তা, ভোগাসক্তি ও মদ্যপান অনেকে পছন্দ করেন না। তাঁর ব্যক্তিগত উপার্জনসূত্রের উপরও কটাক্ষপাত করে ক্যালকাটা রিভিউতে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন ঃ 'By serving in this capacity (Dewan), he is said to have realized as much money as enabled him to become a Zemindar with an income of Rs. "ten thousand a year". If this assertion be true, it must raise in the mind a strong suspicion

১১। The English works of Raja Rammohun Roy, Vol. II—Edited by Jogendra Chunder Ghose, 1887, p. 631

১২। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২১৪

of the moral character of this extraordinary man.'[১৩] রেভারেণ্ড কে. এস. ম্যাকডোনাল্ডও ঐ একই অভিযোগ ব্যক্ত করেছেন।[১৪] 'রামগড়ে সেরেস্তাদার থাকাকালীন তাঁহার (রামমোহনের) কার্যকলাপ সম্বন্ধে অপ্রশংসাসূচক কথা (unfavourable mention of his conduct) আমার কানে আসিয়াছে।' এ মন্তব্য তৎকালীন ব্রিটিশ-রাজের রেভেনিউ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বুরিশ ক্রীস্প-এর। ক্রীস্প-এর স্বহস্ত লিখিত এই মন্তব্য নিজের চোখে দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একথা উল্লেখ করেছেন সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার প্রথম খণ্ডে।[১৫]

রামমোহন-চরিত্রের আরও কয়েকটি অসঙ্গতি ছিল। তিনি জাতিভেদ মানতেন না, সমস্ত প্রথানুগত্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকাচারের বিরুদ্ধে তাঁর ধর্মসংগ্রাম (crusade) অথচ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুন তারিখে রামমোহনের সহকর্মী মিস্টার অ্যাডামের উক্তি অনুযায়ী দেখা যায় যে, তিনি ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন উপবীত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রেখেছিলেন। এ-সম্পর্কে আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার যা বললেন তা রামমোহন চরিত্রের অসঙ্গতির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে : 'Rammohan condemned the caste system as an obstacle to the national improvement, but did not start any agitation against it; on the other hand, he not only fully observed the rules of caste distinction, as Adam says, but even symbolised his spirit in this respect by keeping on his body the sacred thread...till his death in Bristol.'[১৬] ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহনের নিজের রচনা 'পথ্যপ্রদান' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অতঃপর ডক্টর মজুমদার লিখছেন : '...in the opinion of Rammohan though both the remarriage of widows and the drinking of wine and eating meat have been prescribed by the *Shastras* the first cannot be regarded as good conduct *(Sadachara)* because it is forbidden by all sections of people, while the other is good conduct because many men drink wine and eat meat as prescribed by the *Shastras.*'[১৭] উপরোক্ত মন্তব্যে আর যা-ই হোক, যুক্তি বা নীতিবোধের সন্ধান মেলে না। রামমোহন আবার স্বগৃহে উৎসবে-অনুষ্ঠানে বাইজীর নৃত্যগীতের ও মদ্য পরিবেশনার ব্যবস্থা করতেন। ফ্যানী পার্কস-এর 'Wanderings of a Pilgrim, in search of the picturesque during four-and-twenty years in the east with Revelations of life in the Zenana (Vol. I, London, 1850)' গ্রন্থে রামমোহনের বাড়ির একটি

১৩। Calcutta Review, Vol. IV, No. VIII, p. 364

১৪। Rajah Ram Mohan Roy, the Bengali Religious Reformer—Rev. K. S. Macdonald, Calcutta, 1879

১৫। সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, প্রথম খণ্ড, 'রামমোহন রায়' শীর্ষক প্রবন্ধ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৮৩, পৃঃ ৩০-১

১৬। On Rammohan Roy—Ramesh Chandra Majumdar, The Asiatic Society, Calcutta, 1972, p. 41 ১৭। ibid., pp. 41-2

উৎসবের বর্ণনা (২৯-৩০ পৃষ্ঠা) থেকে এ তথ্য আমরা জানতে পারি। তাঁর যবনী উপপত্নীর সঙ্গে শৈববিবাহও বিশুদ্ধ নীতিবাদ এবং আমাদের জাতীয় আদর্শের দিক থেকে মেনে নেওয়া যায় না।*

পুত্র বলে পরিচিত রাজারামকে রামমোহন-জীবনীকার মেরী কারপেনটার হরিদ্বারের মেলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া এবং রামমোহন কর্তৃক পুত্ররূপে প্রতিপালিত ছেলে বলে উল্লেখ করলেও 'অনেকের মতে রাজারাম রামমোহনের শৈব বিবাহের মুসলমান পত্নীর গর্ভজাত পুত্র। এই বিবাহের ফলে এক কন্যাও জন্মগ্রহণ করে এবং হুগলীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হয়।'[১৮] ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ও ৮ নভেম্বরের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত দ্বিজরাজের খেদোক্তিও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[১৯] শ্রদ্ধেয় গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয়ও রামমোহন-চরিত্রের এইসব অসঙ্গতি ও অপূর্ণতার কথা উল্লেখ করেছেন: 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচারে' তিনি মদ্যপান সমর্থন এবং শিবের আজ্ঞাবলে যে কোন বয়সের এবং যে কোন জাতির স্ত্রীলোককে চক্রের সাধনায় শৈব বিবাহে শক্তিরূপে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজা বলেছেন, বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় শৈব বিবাহের স্ত্রীও অবশ্য গম্যা হয়। প্রবাদ এইরূপ, রাজা রামমোহন কোন মুসলমানীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করে বহুদিন পর্যন্ত তন্ত্রের সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন।[২০] 'রামমোহন তন্ত্রোক্ত বামাচারের সমর্থক, অথচ সহজিয়া সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত সাধনা ব্যাপারের উপর বিশেষরূপে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্যকে তিনি পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াছেন।' এবং ধর্মবিচার প্রসঙ্গে 'রামমোহন হইতে তাঁহার (বিবেকানন্দের) সূক্ষ্মদৃষ্টির' কথা উল্লেখ করেছেন গিরিজাশঙ্কর। পুরাণ ও তন্ত্রযুগ সম্পর্কে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের একদেশদর্শী দৃষ্টির চেয়ে বিবেকানন্দের অপক্ষপাত উদার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশী যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর ও মানবিক বলেও গিরিজাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন।[২১] জাতির মানসমুক্তির প্রধান পুরোহিত এবং নানা দিক থেকে আধুনিকতার অগ্রদূত হিসাবে সম্মানিত এবং প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব হলেও রামমোহন মূলত কিন্তু এক ক্ষয়িষ্ণু পতনশীল সামন্ততান্ত্রিক মুঘল সম্রাটের প্রতিভূ হয়েই সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। শেষ মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহর রাজদূত হয়ে তাঁর ফরমান হাতে নিয়ে রামমোহন ইউরোপ-যাত্রা করেছিলেন। তাঁর রাজা উপাধিটিও বাদশাহপ্রদত্ত। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, এক যুগসন্ধিক্ষণে

---

* শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার এ-সম্পর্কে বললেন: '...Rammohan supports the Śaiva marriage according to Tantrik rites which would be regarded today as tantamount to concubinage.' [On Rammohan Roy, p. 42]

১৮। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ—সুশীলকুমার গুপ্ত, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ, কলিকাতা, ১৩৮৩, পৃঃ ৫০-১

১৯। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৮৪, পৃঃ ১৷৷৶ ২০। রাজা রামমোহন রায়, পৃঃ ৩৪

২১। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, কলিকাতা, ১৩৩৪, পৃঃ ৭৮-৮৯

রামমোহনের আবির্ভাব, এবং একই চরিত্রের মধ্যে এরকম বৈপরীত্য ও অসঙ্গতির সমাহার সময়ের নিয়মেই সহজাত।

বলা হয়ে থাকে, অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বোধহীন যুক্তিহীন জড়তায় আক্রান্ত জাতীয় মনকে অশুভ ধর্মান্ধতা এবং তামসিকতা থেকে মুক্ত করার জন্যই রামমোহনের বেদান্তধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার। এবং ঐ একই কারণে হিন্দুর মূর্তিপূজাকে তিনি মনে করতেন কুসংস্কার এবং মানবতাবিরোধী। তাই দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্য তার সমূল উচ্ছেদসাধনে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। মুণ্ডক এবং কেন উপনিষদের অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখলেন ঃ '...idol-worship,—the source of prejudice and superstition, and of the total destruction of moral principle, as countenancing criminal intercourse, suicide, female murder and human sacrifice.'[২২] তাঁর ধারণা ছিল ঃ 'Idolatrous notions have checked or rather destroyed every mark of reason, and darkened any beam of understanding.'[২৩] প্রাচীন হিন্দুধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করলেন ঃ 'Hindus ..."have subjected themselves to disgrace and ridicule by the worship of idols, very often under the most shameful forms, accompanied with the foulest language, and most indecent hymns and gestures".'[২৪] দেশ ও জাতির পরম হিতৈষী, নবজাগরণের প্রথম পথিকৃৎ হয়ে রামমোহন যে ভাবে ও ভাষায় প্রাচীন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেছিলেন তা তাঁর মতো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কাছে কোন কারণেই প্রত্যাশিত নয়। যে নীলকরদের উৎপীড়নে সারা দেশ জর্জরিত এবং পরবর্তীকালে বৃহত্তর গণ-আন্দোলনে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' যাদের হিংস্র অমানুষিকতা ও অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, তাদের পর্যন্ত রামমোহন (জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের প্রয়োজনে) সমর্থন করতেন। রামমোহন-চরিত্রের এই অসঙ্গতির প্রসঙ্গ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আলোচিত হয়েছে রমেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থে।[২৫] শুধু রমেশচন্দ্র মজুমদারই নন, তিনি যে ভারতে ইংরেজ-রাজের সমর্থক ছিলেন তাঁর নিজের উক্তি থেকেই তা প্রমাণ করা চলে; 'ভারতবাসিগণের পরম সৌভাগ্য যে, তাহারা ভগবৎ করুণায় সমগ্র ইংরেজ জাতির রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়াছে, এবং ইংলণ্ডের রাজা, ইংলণ্ডের লর্ডগণ ও ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট ভারতবাসিগণের জন্য আইন প্রণয়নের কর্তা।'[২৬] 'ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লামেন্ট এবং ইংলণ্ডের সমাজনায়কগণের উদারতা ও সদিচ্ছায় রামমোহনের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইংলণ্ড ভারতের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও মুক্তিদাতা।'[২৭]

২২। The English works of Raja Rammohun Roy, Vol. I, 1901, p. 28

২৩। ibid., p. 48

২৪। On Rammohan Roy, p. 48   ২৫। ibid., pp. 47-8

২৬। The English works of Raja Rammohun Roy, Vol. IV—Edited by Kalidas Nag and Debajyoti Burman, 1947, p. 8

২৭। History of Political Thought, Vol. I—Biman Behari Majumdar, 1934, p. 46

'রামমোহন ছিলেন ভারতে ইংরেজ শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক।'[২৮] মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহন ইংলণ্ডের রাজার কাছে যে লিখিত আবেদন পেশ করেছিলেন তাতে তিনি ভারতবাসীকে 'মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বরের অতি বশংবদ প্রজাবৃন্দ' বলে উল্লেখ করেছিলেন। 'বস্তুত রামমোহনের অধিকাংশ কর্মপ্রয়াসই ভারতের অভিজাত জমিদার শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। এঁদের অনেকের মতেই ইংরেজ শাসন ছিল সমাজ প্রগতির বাহন।' সমালোচকের এ উক্তির মধ্যেও অনেক সত্য রয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই স্বামীজীর তেজোদৃপ্ত উক্তিরাশির কথা মনে পড়ে। খোদ পাশ্চাত্য দেশের মাটির উপর দাঁড়িয়ে তিনি বললেন ঃ 'ইংরেজি সভ্যতার উপাদান হইল তিনটি "ব"—বাইবেল, বেয়নেট ও ব্রাণ্ডি। ইহারই নাম সভ্যতা।'[২৯] ইত্যাদি। স্বাধীনতা সম্পর্কে বললেন ঃ 'তবু স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামি আর এক...স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তা-ই।'[৩০] Press Ordinance of 1823 প্রভৃতি ব্রিটিশ সরকারের যেসব নীতি ও অনুশাসন তাঁর মনঃপূত ছিল না তার বিরুদ্ধে রামমোহন বরাবরই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করে গেছেন এবং তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বাজাত্যাভিমান ও আত্মসম্মানবোধ অনেক সময়ই আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে—একথাও সত্য। কিন্তু যথার্থ স্বদেশপ্রেম বলতে যা বোঝায়—সেই সর্বসমর্পণ ও আত্মনিবেদন রামমোহনের মধ্যে কতটা ছিল এ নিয়ে সংশয় আছে। বলা চলে, প্রায় সমসাময়িক স্বাধীন চিন্তাবীর ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আমরা অনেকটা স্বদেশানুরাগের পরিচয় পেয়েছিলাম। ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষই প্রথম মাতৃভূমি প্রসঙ্গে স্বদেশপ্রেমের উৎকৃষ্ট কবিতা লেখেন। এবং ইংরেজ-রাজশক্তির বিরুদ্ধে এই ডিরোজিও এবং তাঁর হিন্দু কলেজের ছাত্রেরাই প্রথম যথার্থ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। রামমোহনের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রতি এক ধরনের বিমূর্তপ্রিয়তা (abstract love) ছিল ঠিকই, তাঁর আন্তর্জাতিকতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধও শ্লাঘ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতে জাতীয়তা এবং স্বদেশপ্রেমের গুরু হিসাবে সম্মান তাঁর কতটা প্রাপ্য এ-বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে ঃ এ মন্তব্যও শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয়ের। তা সত্ত্বেও রামমোহনের ব্যক্তিত্ব, নির্ভীকতা ও স্বাজাত্যাভিমানের প্রশংসা করতেই হয়। তাঁর জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায় এখানে। ভাগলপুরের তৎকালীন কালেক্টর ফ্রেডারিক হ্যামিলটনের অন্যায় অমানবিক আদেশ ও গালিগালাজ অগ্রাহ্য করে তাঁর সম্মুখ দিয়ে যেভাবে পালকিতে চেপে রামমোহন চলে গিয়েছিলেন তা নানা দিক থেকে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে এই অপমানের প্রতিকারের জন্য তিনি আবেদন করেছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে বিদেশী শাসকদের সামনে দেশীয় লোকদের পালকি থেকে নেমে যাবার বেআইনী আইন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৩১]

২৮। ibid., p. 47 ২৯। বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১১৪

৩০। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৩৫

৩১। সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, প্রথম খণ্ড, 'রামমোহন রায়' শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃঃ ২৪-৫

রামমোহন-বিবেকানন্দ-ব্রাহ্মসমাজ ঃ নবজাগরণের ঊষালগ্নে রামমোহন দেশ ও জাতির পুনর্গঠন সম্পর্কে নিশ্চয়ই চিন্তা করেছিলেন এবং নিদারুণ জাতীয় সঙ্কট ও নানা সমস্যার একটা যুক্তিগ্রাহ্য সমাধানেরও (নিজের যুক্তিবুদ্ধি মতো) সন্ধান করেছিলেন, কিন্তু মূলত বুদ্ধিবাদী বলে বুদ্ধি দিয়েই সবকিছু বিচার করে গেছেন, হৃদয় দিয়ে সমস্যাকে তত বুঝতে চাননি। অথচ হৃদয় ও বুদ্ধির সম্যক সমন্বয় না ঘটলে কোন জিনিসকেই তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব নয়। রামমোহনও তাই দেশ ও জাতির বহু সমস্যাকেই সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। রামমোহন যেভাবে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র, দেশাচার, এমনকি পুরাণ-ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে গেছেন, অস্বীকার করে গেছেন ঐতিহ্যকে, তাতে তাঁর সীমিত দৃষ্টিই প্রকাশ পেয়েছে। ইতিহাসের শিক্ষাই হল সত্য থেকে অধিকতর সত্যের দিকেই অভিযাত্রা, কখনও মিথ্যা থেকে সত্যের অভিমুখে ইতিহাসের গতি নয়। এই সত্যটি রামমোহন বুঝতে পারেননি। স্বামীজীর এ-সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ঃ 'হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য হইতে সত্যে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হইতেছে।'[৩২] এই কারণেই পুরাতনকে সম্পূর্ণ বর্জন করে নতুনের নির্মাণ সম্ভব নয়। ধর্ম-রাজনীতি, শিক্ষাপদ্ধতি-সমাজসংস্কার প্রভৃতি প্রতি ব্যাপারেই রামমোহন ঐ একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে গেছেন। সবকিছুই একেবারে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ে তুলতে গিয়েছিলেন। এবং এই নতুনকে ভালবাসা ও প্রাচীনের প্রতি বিতৃষ্ণ হওয়ার ব্যাপারটাও একেবারে একান্তই তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। কিন্তু শুধুমাত্র নিজের রুচিকে সম্বল করে একটা জাতির পুনর্গঠন সম্ভব নয়। তাছাড়া কোন জাতিই কখনও আর এক জাতির ছাঁচে গড়ে উঠতে পারে না। কারণ একজনের কাছে যা স্বধর্ম, অন্যের কাছে তা-ই পরধর্ম এবং পরধর্ম স্বভাবতই ভয়াবহ। রামমোহন সেই অঘটন ঘটাতে গিয়েই ব্যর্থতা ডেকে এনেছিলেন। ঐক্য ভিতরের জিনিস (unity within)—বাইরে থেকে আমদানি করে ঐক্যবোধ কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সাহিত্য-সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি কোথাও এভাবে ঐক্য বা সমন্বয়-স্থাপন-প্রয়াস সত্য হয়ে উঠতে পারে না। রামমোহনের বেদান্তধর্ম এই কারণেই জাতীয় ধর্ম হয়ে উঠতে পারল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ঐ একই ছাঁচে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ভুল করলেন।

বিভিন্ন বাসনালোক এবং রুচিপ্রকৃতি নিয়ে প্রতিটি ব্যক্তি স্বতন্ত্র। অধিকারভেদেরও প্রশ্ন আছে। সকলের জন্য তাই একই পথনির্দেশ সম্ভব নয়। তাছাড়া কত ভক্তসাধক আমাদের দেশের বিভিন্ন সাধনপদ্ধতিতে সিদ্ধিলাভ করে গেছেন। পুরাণেরও একসময়ে ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। রামমোহন এবং ব্রাহ্মধর্ম আমাদের পুরাণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতি, হিন্দুদের পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজা সবই বর্জন করলেন। কিন্তু এইসব বিচিত্র সাধনপথের অভিজ্ঞতা ছাড়া, এ-সম্পর্কে যথার্থ অধিকারী না হয়ে, বিভিন্ন ধর্মপন্থার সত্যমিথ্যা নির্ণয় করাও কি সম্ভব ? নয়। রামমোহন এবং ব্রাহ্মধর্মের অনুগামীরা

৩২। বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৫

সকলেই নতুনের প্রয়োজনে প্রাচীনকে, প্রাচীনের অনেক কিছুকেই অস্বীকার করলেন। কৃষ্ণকে লম্পট বললেই, ভাগবতধর্ম নষ্ট হয়ে যায় না। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ধর্ম সম্পর্কে যেমন, ঠিক তেমনি দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত সকলই সত্য। বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন পথ। এটাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। যুগের আশু প্রয়োজনে, সহজ সমাধানের প্রত্যাশায় রামমোহন-অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম, শিক্ষা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে অতীতের অনেক সারবস্তুকে অস্বীকার করে ভুল করলেন, অথচ বিবেকানন্দ বহু বিষয়ে রামমোহন-অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতৈক্য রেখেও একই সঙ্গে সমকালের এবং চিরকালের সংগঠন-পরিকল্পনা রচনা করে তুলে ধরতে পেরেছিলেন জাতির সম্মুখে। কারণ পরিব্রাজক বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পেয়েছিলেন চিন্ময়ী ভারতবর্ষকে ঃ তাঁর প্রকৃতি, তাঁর মানুষকে, তাঁর ঐশ্বর্য-আনন্দ, শক্তি-সাধনা, ত্রুটি-বিচ্যুতি-দুর্বলতা নিয়ে চিনেছিলেন, দেখেছিলেন, অনুভব করেছিলেন। এই অনুভবের ঐশ্বর্যেই স্বামীজীর প্রতিটি পরিকল্পনা এত জীবন-অভিমুখী হয়েও মহান আদর্শের অঙ্গীকারে এত সম্পন্ন ও সার্থক।

অথচ রেনেসাঁসের যে অন্যতম দান অসাম্প্রদায়িকতা তা কিন্তু রামমোহনের মধ্যে ছিল। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে কেউ কেউ রামমোহনকে বিবেকানন্দের পূর্বসূরী বলেছেন বটে, কিন্তু রামমোহনের চিন্তায় প্রাচ্যের ভূমিকা অধমর্ণের। রামমোহন সমমর্যাদায় পারস্পরিক ভাববিনিময়ের চেয়ে ইউরোপীয় জীবনদর্শনের আনুগত্য এবং ইংরেজ তথা ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবার কথাই বেশী বলেছেন। ইংরেজি শিখলে এবং ইউরোপীয়দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে (intercourse with European gentlemen), তাদের আচার-আচরণে দীক্ষিত হলে আমরা সভ্য হব, উপকৃত হব এবং সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের প্রভূত উন্নতি হবে—রামমোহন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। পক্ষান্তরে, স্বামীজীর ভূমিকা একদিকে যেমন গ্রহীতার, অন্যদিকে তেমনি অধ্যাত্মসম্পদে ধনী দাতারও। আমাদেরও দেবার মতো বহু সম্পদ আছে যা প্রতীচ্যের নেই। ঐহিক প্রয়োজনে আমরা অনেক জিনিস পাশ্চাত্যের কাছ থেকে নেব ঠিকই, কিন্তু আমরাও দেব—সম্রাটের মতো মাথা উঁচু করে দেব। কারণ স্বামীজীর স্থির বিশ্বাস ঃ 'ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে ; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া...।'[৩৩] 'ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে...চিরকাল শিষ্য থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে।...এখনও বহু শতাব্দী যাবৎ জগৎকে শিখাইবার বিষয় তোমাদের যথেষ্ট আছে। এখন এই কাজ করিতেই হইবে।'[৩৪]

'আমি হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রের গূঢ় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় ও তিনিই উপাস্য এই মূলমতে সকলেরই ঐক্য আছে, কেবল অবান্তর ভেদ লইয়া বাদবিসম্বাদ!' —এ উক্তি রামমোহনের। অথচ প্রাচীন হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে, বেদান্ত ছাড়া অন্যান্য ধর্মসাধনপন্থা ও সম্প্রদায় প্রসঙ্গে,

৩৩। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫ ৩৪। তদেব, পৃঃ ২১৩-১৫

বিশেষ করে হিন্দুর মূর্তিপূজা সম্পর্কে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন তা কিন্তু ঐ 'অবান্তর ভেদ লইয়া বাদবিসম্বাদেরই' উদাহরণ। এতৎসত্ত্বেও রামমোহন তাঁর বিশ্বভাবুকতা, উদার আন্তর্জাতিকতা, ভোগবাদের প্রশ্রয়ে লালিত হলেও সুস্থ সচ্ছল মানবিকতা, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারকল্পে তাঁর কর্মপ্রয়াস, নারীমুক্তি-আন্দোলনে তাঁর অগ্রগামীর ভূমিকা, তাঁর অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং তাঁর বেদান্তধর্ম গ্রহণ ও প্রচার—এসবের জন্য নবযুগরচনার একজন আদি রূপকার সন্দেহ নেই। এই কারণেই স্বামীজীর মতো মহামনস্বীও অন্তত তিনটি বিষয়ে রাঁমমোহনের ঋণ স্বীকার করেছেন ঃ '...his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussulman equally with the Hindu.'[৩৫]

বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ ঃ অতঃপর বাংলার নবজাগরণের দ্বিতীয় প্রাণপুরুষ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনা করব। মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় ঃ 'জাগরণের দ্বিতীয়যুগ বিদ্যাসাগরের যুগ; এই যুগেই যুগ-লক্ষণ সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। ...ব্যক্তির তথা জাতির জীবনে বৈষয়িক সিদ্ধিলাভকে পরম-পুরুষার্থরূপে বরণ করিবার জন্য যে বুদ্ধি-ধর্ম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ রামমোহনের বিদ্রোহ-ঘোষণার মূলে বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে তাহাই সত্যকার মানবপ্রীতি ও মানবসেবায় এক উদারতর ও গভীরতর প্রেরণা হইয়া দেখা দিল; যাহা মস্তিষ্কগত ছিল তাহাই এক্ষণে প্রাণশক্তিরূপে হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে; তাহার মন্ত্র হইল আরও স্পষ্ট, আরও প্রাণময়, আরও উদার।'[৩৬] দেশ জাতি ও তার সভ্যতাসংস্কৃতিকে আর চোখের আলোয় চোখের বাইরে দেখা নয়, এবারে অন্তরের গভীরে উপলব্ধির আলোকে প্রত্যক্ষ করা। দেশের মানুষের দুঃখ-দৈন্য-ব্যথা-ব্যর্থতা, পরাধীনতার জ্বালা বিদ্যাসাগর হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন; কিন্তু শুধু অশ্রুর তর্পণেই তাঁর কৃত্য সম্পাদন করেননি। তাঁর সমস্ত উদ্গত অশ্রুরাশিকে তিনি কর্মে ও সেবাধর্মে নিবেদিত করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিবেকানন্দ-চরিত্রের অনেক সাদৃশ্য। কর্মোদ্যমের বিভিন্নমুখিতায় রামমোহনের সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের মিল লক্ষিত হয়। কিন্তু অনুভবের গভীরতায়, পরার্থপরতায়, হৃদয়বত্তায় বিবেকানন্দের সঙ্গেই তাঁর অধিকতর সাদৃশ্য। এছাড়া স্বামীজীর মতো বিদ্যাসাগরের জীবনেও ইউরোপের কর্মনিষ্ঠা লক্ষ্য করবার মতো। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের নির্ভীকতা ও স্বাজাত্যাভিমান অভীঃ মন্ত্রের উপাসক বিবেকানন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কর্ম ও সেবাধর্মেও উভয়ে উভয়ের খুব কাছাকাছি। মানবাত্মার সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির যে আন্দোলন আমরা বিবেকানন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি তার সূচনা বিদ্যাসাগর থেকেই। দেশাচার, অন্ধ প্রথানুগত্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রভৃতি সাধারণ যুগলক্ষণ যদিও রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ সকলের মধ্যেই উপস্থিত, তবুও

৩৫। Notes on Some wanderings with the Swami Vivekananda—Sister Nivedita, Udbodhan Office, Calcutta, Third Edition (1948), p. 16

৩৬। বাংলার নবযুগ, পৃঃ ২-৩

সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এবং অজ্ঞেয়বাদী বিদ্যাসাগরের নামই এ-প্রসঙ্গে আমাদের সর্বাগ্রে মনে আসে। স্বামীজীর মতো বিদ্যাসাগরও অনেক বিষয়ে পাশ্চাত্যজীবনচর্যায় অনুগত। তিনিও সমন্বয়ী।

কিন্তু আমাদের 'অস্তি'র স্থিরপ্রত্যয়ী ভূমি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। জাতীয় ভিত্তির কোন্ স্তরের উপর ইউরোপীয় জীবনদর্শনের উপাদান যুক্ত করে জাতীয় মন্দির গড়তে হবে সে-সম্পর্কে স্বামীজীর মতো কোন স্পষ্ট নির্দেশ তিনি দিতে পারেননি। তাই তাঁর মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও আশু প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের প্রাচীন ষড়্দর্শনে 'আধুনিক কালের পক্ষে শিক্ষণীয় কিছু নেই'—একথা বলতে পারলেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসূচী থেকে তিনি বেদান্তদর্শনকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। অনায়াসে একথাও উচ্চারণ করতে পারলেনঃ 'বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ-সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই।'[৩৭] ভারতীয়দের শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতীয়ত্ব বজায় রেখেই যে বিদেশীয় জ্ঞানবিজ্ঞানশিক্ষার সার্থকতা—শিক্ষানীতির এই প্রাথমিক কথাটা বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করতে পারেননি। স্বভূমিতে সুদৃঢ় শিকড়-সন্নিধি না থাকলে কোন বৃক্ষশাখায়ই ফুল ফোটে না, ফল ধরে না। এদেশে ধর্মই যে জাতীয় শক্তির পরম উৎস এ সত্যও তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। এবং সেই ধর্ম, স্বামীজীর মতে, শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডবারিধির অনুষ্ঠান বা অন্ধ প্রথানুগত্য নয়। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে তা প্রকাশ করা এবং মানুষরূপী ভগবানের সেবাই স্বামীজীর কাছে ধর্ম। আমার মধ্যে যে ব্রহ্মশক্তি আছে তার জাগরণ তথা আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধও স্বামীজীর দৃষ্টিতে ধর্ম। 'ধর্ম যদি মানুষের সর্বাবস্থায়, তাহাকে সহায়তা করিতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই, উহা কতগুলি ব্যক্তির মতবাদমাত্র।' স্বামীজীর মতে হিন্দুধর্ম মানেই মানবধর্ম—সর্বজনীন ধর্ম—জীবনধর্ম—পরিপূর্ণরূপে একসঙ্গে সকলের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার ধর্ম। এই ধর্মকে অস্বীকার করে কোন মহৎ কর্মপ্রয়াসই সার্থক হয়ে উঠতে পারে না—বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো দেশে। এই সত্য বিদ্যাসাগর বুঝতে পারেননি।

অথচ ঈশ্বরপ্রসঙ্গ বাদ দিলে দেশের সংস্কৃতি, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অসাধারণ। রামমোহনের মতো সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা ও অনুবাদকর্ম বিদ্যাসাগরের জীবনেও দেখা যায়। নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন তিনি সংগ্রামী। শিক্ষার প্রসারে তাঁর কর্মযজ্ঞের তুলনা নেই। সবই সেই মহৎ মানবিকতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। অবশ্য দেশাচার, অন্ধ প্রথানুগত্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এসব সাধারণ যুগলক্ষণ রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ সকলের মধ্যেই স্পষ্ট। স্ত্রীজাতির জন্য অকপট অনুভব ও সহানুভূতি, তাদের দুঃসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার থেকে মুক্তি-আন্দোলনেও রামমোহন, রাধাকান্ত দেব, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, ডিরোজিও, তাঁর শিষ্য ও অনুরাগিবৃন্দ, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি

৩৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ (১৩৪৯), পৃঃ ৩১

থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত এযুগের সকলেই এগিয়ে এসেছিলেন। তথাপি নারীজাতি সম্পর্কে আন্তরিক অনুভবের গভীরতায় একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সঙ্গেই বিদ্যাসাগর তুলনীয়। দেশের দরিদ্র দুঃস্থ জনসাধারণ সম্পর্কেও করুণাসাগরের অপরিসীম আর্ত বেদনাবোধের একমাত্র তুলনা মেলে স্বামীজীর মধ্যে। কারণ দেশের দুঃস্থ দুঃখীর জীবন সম্পর্কে দুজনেরই ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। 'উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও নাই, যাহার উপর তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) প্রভাব না পড়িয়াছে!'[৩৮] এই মহৎ জ্যেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নিবেদিতার কাছে একদা স্বামীজী নিজেই বলেছিলেন একথা। আত্মপ্রত্যয় এবং তেজস্বিতায় তো বটেই—পাশ্চাত্য জীবনবোধ ও প্রাচ্য ঐতিহ্যের সমন্বয়প্রয়াসেও দুজন ছিলেন সমধর্মী।

একক ও বিচ্ছিন্ন ভাবে, বিবিধ কর্মপ্রয়াসে বিদ্যাসাগর জাতিকে আত্মস্থ করবার জন্য যা করে গেছেন তা বিস্ময়কর। তবে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্বামীজীর প্রজ্ঞা-প্রসারিত সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছিল না। স্বামীজী কেবলমাত্র আমাদের দোষত্রুটি-দুর্বলতা দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি এদেশের মানুষের কোথায় শক্তি, কি তাদের গুণ এ-সম্পর্কেও সমান সচেতন ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি তাদের ডেকে তাদের অনন্ত সম্ভাবনার কথাও অশ্রুর সঙ্গে আনন্দ মিশিয়ে সস্নেহে উচ্চারণ করে গেছেন : 'এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা...এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে ; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না ; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম !!'[৩৯] কিংবা 'বলিও না আমরা দুর্বল। আমরা সব করিতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন।' '"আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে"...সকলকে গিয়ে বল্—"ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও না ; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, একথা বিশ্বাস করো, তা হলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে"।'[৪০] স্বামীজীর রচনাবলী থেকে এরকম অজস্র উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। শিবমন্ত্র-স্বরূপ এমন আশ্বাস, এমন অভয়, এমন বিশ্বাসের বাণী কেউ কোনদিন মৃত জাতির কর্ণকুহরে এর আগে বা পরে উচ্চারণ করেননি। বিদ্যাসাগরও দেশ ও জাতির প্রতি সুগভীর মমতাবোধের থেকেই স্বদেশবাসীর আচার-আচরণে, হীনতায়, হীনম্মন্যতায়, কাপুরুষতায় এবং অমানবিক নানা আত্মপ্রকাশে ব্যথিত হয়েছেন, তাদের আঘাত করেছেন, কিন্তু স্বামীজীর মতো তাদের সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যেতে পারেননি। সাধারণ দুঃস্থ দুঃখী আর্ত মানুষের জন্য সর্বস্ব পণ করে অনেক কিছুই তিনি করেছেন, কিন্তু সব সময়ই মানসিকতার দিক থেকে একটি নিঃসঙ্গ দূরত্বের ব্যবধান রক্ষা করে। তাঁর অতিরিক্ত স্পর্শপ্রবণতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিলনের পথে

৩৮। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৭৬

৩৯। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮২

৪০। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১২-৩

অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণেই জাতীয় ব্যাধির সঠিক ঔষধ এবং শুশ্রূষার সন্ধান দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি দেশবাসীর শক্তির উৎস উদ্ধার করে আবার বেঁচে উঠবার পথের সন্ধান দেওয়া—প্রেমের স্বর্গ থেকে সঞ্জীবনী এনে বিশ্বাসের ছবি রচনা করে ভ্রষ্ট স্বর্গ পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্পে তাদের প্রতিষ্ঠা করা।

বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনী ও কর্মপ্রয়াস আলোচনা করে মনে হয়েছে একটি কেন্দ্রীয় ঐক্যের অভাবে তাঁর কর্মপ্রতিভা এত অসাধারণ ও বিচিত্রমুখী হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যাশিত সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে কর্মে ও সেবাধর্মে বিদ্যাসাগর ও স্বামীজীর মধ্যে প্রভূত মিল। কিন্তু সে মিল শুধু বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে। উভয়ের মূল দৃষ্টিভঙ্গিতে আকাশপাতাল তফাৎ। এবং সেখানেই নিহিত এই দুই মহাজীবনের প্রকৃত পার্থক্য। স্বামীজী যখন বলেন 'যদি মানুষের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলাম তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না'[৪১] কিংবা—'আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছি। ...সর্বত্রই আমি জনসাধারণের ভয়াবহ দুঃখ-দারিদ্র স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিয়া আকুল হইয়াছি, চোখের জল বাধা মানে নাই। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, প্রথমে ইহাদের দুঃখদারিদ্র দূর না করিয়া ইহাদিগকে ধর্মের কথা শোনাইয়া কোন লাভ নাই'—তখন মনে হয় এগুলি যেন বিদ্যাসাগরেরই কথা। কোন মন্দিরে যে কিছু উপকার হবে না, দরিদ্র মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো যে নিরর্থক, একথা স্বামীজীর মতো বিদ্যাসাগরও বিশ্বাস করতেন, কিন্তু মানুষের মধ্যে যে 'তাঁহারই উপাসনা করা হইতেছে'—তা তিনি বুঝতেন না বা বুঝতে চাইতেন না। বিদ্যাসাগরের সেবাধর্ম, শিক্ষাবিস্তার-প্রয়াস, বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, সাহিত্যরচনা—এ সবেরই উৎস তাঁর উজ্জ্বল মানবতাবাদ। কিন্তু তাঁর সমস্ত কল্যাণকর্মের পশ্চাতে যেখানে ছিল শুধুই মানবতাবাদ, সেখানে স্বামীজীর সেবাধর্মের তথা সমগ্র কর্মপ্রয়াসের পশ্চাতে মানবতাবাদ তো নিঃসন্দেহেই ছিল, অধিকন্তু সেই মানবতারও উৎসরূপে ক্রিয়াশীল ছিল বেদান্তভিত্তিক এক বিশ্বাত্মবোধ। ভালবাসাই যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যোগ তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে এই ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই তার আর কোন প্রতিকূল তরঙ্গে নিমজ্জিত হবার আশঙ্কা থাকে না। কেন ভাল মানুষকে ভালবাসা ? কেন শ্লাঘ্য প্রেমের ধর্ম ? স্বামীজীর কাছে এর উত্তর দিবালোকের মতো পরিষ্কার ছিল—অপরের মধ্যে আমিই বিরাজ করি, অপরের সুখ-দুঃখেই আমার প্রকৃত সুখ-দুঃখ, তাই অপরকে ভালবাসাই আমার স্বধর্ম। এই বৈদান্তিক সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই স্বামীজীর জীবনব্যাপী সেবাধর্ম এক অখণ্ড পূর্ণতায় প্রশান্তি লাভ করেছে। অপরপক্ষে, এর অভাবে বিদ্যাসাগরের জীবনব্যাপী মানবকল্যাণ-প্রয়াস শেষ জীবনে অন্তহীন শূন্যতায় অবসিত হয়েছে। কারমাটারে তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের করুণ কাহিনী কারও অবিদিত নেই।

নবজাগরণ ও মধুসূদন: মোহিতলাল মজুমদারের 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থে নতুন ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং অদ্বিতীয় রূপকার হিসাবে অতঃপর যে দুজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির

৪১। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৫১

নাম করা হয়েছে তাঁরা হলেন মহাকবি শ্রীমধুসূদন এবং অনুশীলনধর্মের প্রবক্তা, বন্দেমাতরম্- মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিম। 'রামমোহনে যাহা যুক্তি-তর্কের বিষয় ছিল, বিদ্যাসাগরে যাহা প্রেম ও কর্মের প্রেরণা...মধুসূদনের অন্তরে তাহাই কেবলমাত্র মুক্তিচেতনার অসীম আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল।'[৪২] এবং তারই আত্মপ্রকাশ 'মেঘনাদবধ কাব্য'। একথাই শ্রীগৌর পাল অন্যভাবে উচ্চারণ করেছেন : '...মাইকেল...সাহিত্যের আন্তর্জাতিক মহাসঙ্গমে জাতীয়তার প্রবাহকে অনন্য সাধনায় মিলিত করেছেন। ...মধুসূদন কবিতায় যা করেছেন বিদ্যাসাগরও তা-ই করেছেন স্বক্ষেত্রে। দুজনেই সহযোদ্ধার মতো শৃঙ্খল ভেঙেছেন, একজন কাব্য সংস্কারের অন্যজন সামাজিক সংস্কারের।'[৪৩] এক বিশিষ্ট নতুন ধাঁচের কাব্য সৃষ্টি করে মধুসূদন বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে এক অমর অবদান রাখলেন।

নতুন ঊষার দীপ্ত স্বর্ণচ্ছটার আবির্ভাবে আত্ম-আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল একদিন জাতি। জাতির এই আত্ম-আবিষ্কারের গানই হল মেঘনাদবধ মহাকাব্য। জীবন ও জগৎকে নতুন করে দেখার আনন্দ, নিজের মুখ নতুন করে দেখার ও চেনার এ যেন এক অবাক সূর্যস্বরলিপি। মেঘনাদবধ আসলে জাতির আত্মবন্দনা। এই কারণেই স্বামীজী এই কাব্যের উৎসাহী পাঠক, এই কবির গুণগ্রাহী ভক্ত। এই কাব্যের মহত্তম ভাবব্যঞ্জনা এবং অপরাজেয় মানবমহিমার সার্বিক রূপকল্পনার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র এই মহাকবি প্রসঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন : 'কাল প্রসন্ন, য়ুরোপ সহায়, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ "শ্রীমধুসূদন"।'

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ : 'রামমোহনে যাহা প্রধানতঃ বিচারের ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল, বিদ্যাসাগরে যাহা সেবা-ধর্মের আবরণে কতকটা আবৃত ছিল, এবং মধুসূদনে যাহা নিরুপদ্রব রসসৃষ্টিতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল...তাহাই এক্ষণে গুরুতর সমস্যারূপে... শুধুই মানবধর্ম নয়, ব্যক্তির স্বতন্ত্র ধর্ম-জিজ্ঞাসারূপে এক নূতন প্রেরণা হইয়া উঠিয়াছে।'[৪৪] এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ঠিক তখনই।

বঙ্কিম ইউরোপীয় জীবনবাদের মৌল প্রেরণাকে অস্বীকার করেননি, তবে তাকে ভারতীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে সমন্বিত করে, ধর্ম, শিক্ষা ও সবিশেষে মানবপ্রীতি ও বিশ্বপ্রীতির দিব্যমন্ত্রে শোধন করে নিয়েছিলেন। তাঁর অনুশীলনধর্মও সামঞ্জস্য ও ঐক্যবন্ধনের মধ্য দিয়ে সমগ্র জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ করার ধর্ম—বর্জনের পথনির্দেশ নয়। তবে বঙ্কিমে যা শুরু তা-ই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনার ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে যথার্থ সত্যপথের সন্ধান দিয়ে গেছে। বিজ্ঞানসম্মত মানবসেবাধর্ম এবং লোকহিতকে বঙ্কিম শ্রেষ্ঠ জীবননীতির অঙ্গীভূত করেছেন, কারণ ব্যক্তিমানুষের চেয়ে মনুষ্যজাতির কল্যাণকে তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। সমাজ বাঁচলে, দেশ বাঁচলে, মনুষ্যজাতি বাঁচলে ব্যক্তিমানুষও বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন করে নিতে পারবে—এই তাঁর বিশ্বাস। ঐ

৪২। বাংলার নবযুগ, পৃঃ ৬

৪৩। বিদ্যাসাগর স্মারক-গ্রন্থ—সম্পাদনা : আজহারউদ্দীন খান, উৎপল চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ, মেদিনীপুর, ১৩৮১, পৃঃ ৩৩৩

৪৪। বাংলার নবযুগ, পৃঃ ১৫

একই কারণে শিক্ষা ও ধর্মের অনুশীলনে তিনি এত জোর দিয়েছিলেন! স্বামীজী যেমন রজোগুণকেই সমকালীন দেশবাসীর পরমগ্রাহ্য ধর্ম বলে মনে করেছিলেন, 'এদেশের মতো এত অধিক তামসপ্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ...আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই।'[৪৫] কিংবা, সর্ব দেবদেবীকে বিসর্জন দিয়ে দেশজননীকে একমাত্র উপাস্য দেবতা বলে মনে করেছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশ বৎসর জন্মভূমি ভারতের মুক্তিই যেন আমাদের একমাত্র ধ্যানধারণার বিষয়বস্তু হয়। অন্য সব দেবদেবীর কথা ভুলিয়া যাও—আমাদের দেশ ও জাতিই জাগ্রত দেবতা ইহা সর্বদা মনে রাখিবে।'[৪৬]—বঙ্কিমের চিন্তায় ও রচনায় তারই পূর্বাভাস। স্বামীজীর মতো বঙ্কিমও কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। মহৎ কর্মের প্রেরণাদায়করূপেই বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের পরিকল্পনা ও ভাষ্য। মহাভারতের পার্থসারথি কৃষ্ণই তাঁর উপাস্য, গোপীজনবল্লভ বংশীধারী নন। এখানেও স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয়। বঙ্কিমসাহিত্যে এই রজোগুণেরই সংহত আত্মপ্রকাশ এবং বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে তার পূর্ণ পরিণতি। এই জন্যই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় যুবকদলের কাছে স্বামীজী বলেছিলেনঃ আনন্দমঠের সন্তানদের মতো দেশভক্তি লাভ করে জন্মভূমির সেবা সর্বপ্রধান কর্তব্য। কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে বঙ্কিমের এইসব চিন্তাই তাঁর অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে, শুদ্ধ তপশ্চর্যার আলোকে এবং মহান হৃদয়ের ব্যাপ্তিতে আরও গাঢ়, পরিব্যাপ্ত ও ভাস্বর। তাছাড়া বিবেকানন্দই প্রথম আমাদের এই গ্রামে গাঁথা দেশে গ্রামই যে মেরুদণ্ড সেকথা উচ্চারণ করেন এবং গ্রামের মানুষের উন্নতির উপরই যে জাতীয় উন্নতির ভিত্তি তা ঘোষণা করেন। জনসাধারণের কথা এমন অকপটে স্পষ্ট করে তাঁর আগে বা পরে কেউ বলেননি। স্বামীজী বললেনঃ 'আমাদের mission (কার্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য।'[৪৭] 'মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে। ...জাতির ভবিষ্যৎ ...নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখাইতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হইতে পার?'[৪৮] এই প্রফেটিক ভিশন (prophetic vision) বঙ্কিমের ছিল না। তবে সাধারণ চাষী-মজুরের জীবন ও আশাভরসা নিয়ে বঙ্কিমের প্রথম আমাদের সাহিত্যে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'বিড়াল' এবং 'সাম্য' প্রবন্ধত্রয় শুধু তাঁর মনীষা ও পাণ্ডিত্যের নয়, তাঁর দরদী মনেরও পরিচায়ক। এছাড়া 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এবং অন্যত্রও তিনিই প্রথম গ্রামের

৪৫। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩-৬৪

৪৬। Swami Vivekananda : Patriot-Prophet—Bhupendranath Datta, Nababharat Publishers, Calcutta, 1954, p. 371

৪৭। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১০৩

৪৮। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২

দুঃস্থ দুঃখী জনতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।* তাঁর মধ্যে বিবেকানন্দের তপশ্চর্যার শুদ্ধি ছিল না, তবু সহজাত বুদ্ধিতে তাঁর কাছেও দেশের এই যথার্থ স্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ পরিণতির চিত্রটি ধরা পড়ে। ঈষৎ কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বরে, কখনও বা ব্যঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি এ-প্রসঙ্গ প্রকাশ করে গেছেন। এবং এইখানেই তিনি বিবেকানন্দের যথার্থ পূর্বসূরী। জনসাধারণের শিক্ষার দিকেও, বিবেকানন্দের মতো সামগ্রিকভাবে না হলেও, বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন ছিলেন। এবং শিক্ষাবিস্তারই যে বহু সমস্যার সমাধান করে দেশের মানুষের মধ্যে যথার্থ ঐক্য আনতে সক্ষম হবে এ-বিষয়ে বঙ্কিমও নিশ্চিত ছিলেন।

স্বামীজীর মতবাদের মধ্যমণি মানুষ। তাঁর ধর্ম, তাঁর দর্শন, তাঁর সকল মতই পর্যবসিত হয়েছে মানবধর্মে। তাঁর দৃষ্টিতে ঃ 'Education is the manifestation of the perfection already in man.' এবং 'Religion is the manifestation of the divinity already in man.' শিক্ষা, সমাজসংস্কার, ধর্মান্দোলন, অর্থনৈতিক সচ্ছলতার পরিকল্পনা—সবকিছুরই উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ মানুষ তৈরী করা। এবং ঐ perfection ও divinity অর্থাৎ পূর্ণতা- ও দেবত্ব-জাগ্রত মানুষের সমষ্টিতে গড়ে উঠবে যে সমাজ তা-ই আদর্শসমাজ। আদর্শসমাজই প্রয়োজন হলে গড়ে তুলবে নিজেদের মতো করে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংহতি রেখে আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা। ইউরোপীয় প্রকৃতিবাদের কিঞ্চিৎ মিশ্রণ সত্ত্বেও মানবতাবাদ বঙ্কিমেরও অন্বিষ্ট ছিল।

দেশপ্রেম ঃ স্বামীজী, বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য ঃ আমাদের নবজাগরণের নেতৃস্থানীয় প্রায় প্রত্যেকেরই ইংরেজ বা ইউরোপ প্রীতি এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। ব্রিটিশ জাতি এবং বিদেশী রাজশক্তি সম্পর্কে সকলেরই কিছু কিছু দুর্বলতা ছিল। রামমোহন তো প্রকাশ্যেই ইংরেজ-শাসন এবং প্রত্যহজীবনে ইংরেজ-সাহচর্যকে আমাদের সভ্য ও উন্নত হবার পথ বলেই ঘোষণা করেছিলেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগরও শেষ পর্যন্ত এদেশে ইংরেজ-রাজত্বের সুফল সম্বন্ধে আশান্বিতই ছিলেন। তাই বিদ্যাসাগরের সমস্ত কর্মপ্রয়াস শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার এবং সেবাধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের স্রষ্টা-ঋষি হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ-রাজত্বকে সুশাসনের প্রতীক বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ঃ 'ইংরেজ-রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান্—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।'[৪৯] 'আর ফল যাহা হইবে ভালই হইবে, ইংরেজ না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।' 'ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।'[৫০]—এ সবই বঙ্কিমের উক্তি। 'ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে...।'[৫১]—একথাও বঙ্কিমের।

* গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবন ও গ্রামের চাষী-মজুরদের উন্নতি প্রসঙ্গ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অক্ষয়কুমার দত্তও আলোচনা করেছেন।

৪৯। বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ ৭৮৭
৫০। তদেব ৫১। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৯০, পৃঃ ২৪০

কেশবচন্দ্র সেনও ব্রিটিশ সরকারের গুণমুগ্ধ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 'ছোট ইংরেজ', 'বড় ইংরেজের' পার্থক্যের অন্তরালে স্বৈরাচারী ইংরেজ-সরকারের সব রকম সমালোচনাই এড়িয়ে গেছেন। এবং শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রকাশের পর শরৎচন্দ্রের চিঠির প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথের মহানুভব ইংরেজ-প্রশস্তির কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। যদিও কবিতায়—

কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন!
* * *
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর!
* * *
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্!!

—একথা রবীন্দ্রনাথ অকম্প্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন কিন্তু এই মহৎ জীবনসত্যকে জীবনে জীবনযোগ করার ধ্রুব অভিজ্ঞানে তাঁর প্রায় সমসাময়িক প্রেমিক-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দই কর্মে এবং প্রাণের অভীক আত্মপ্রকাশে বাস্তবায়িত করে তুলেছিলেন। স্বাধীনতা বিবেকানন্দের জীবনসঙ্গীত। 'স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তাহার আহার পোশাক বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন—তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কাহারও অনিষ্ট না করে।'[৫২] 'সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে-বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেইদিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যেসকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যেসকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।'[৫৩] জাতি হিসেবে ইংরেজের প্রতি স্বামীজীর সামান্যতম বিদ্বেষ ছিল না।—পাশ্চাত্য তথা ইংরেজ-জাতির অনেক সদ্‌গুণ ভারতীয়দের অনুসরণ করা কর্তব্য, একথা তিনি অনেকবার বলেছেন—কিন্তু ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র মোহও তাঁর ছিল না। তিনি স্পষ্ট দেখেছিলেন, স্বৈরাচারী ইংরেজ-রাজ জাতি-হিসাবে আমাদের বিকশিত হয়ে ওঠার পথে প্রতি মুহূর্তের কণ্টক। তাই তিনি এদেশের যুবকদের বলেছিলেন: 'পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তিলাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।'[৫৪] তাই দেখা যায় ভগিনী নিবেদিতা শুধু শিক্ষা সেবা ও অন্যান্য

৫২। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৪০ ৫৩। তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২৪
৫৪। ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৭৭, পৃঃ ৫৪৪

সংগঠনকর্মেই নয়, গুরুর তিরোধানের পর গুরুর দেশমাতৃকার চরণতলে সারাটা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। দেশের উদ্বুদ্ধ তরুণসমাজকে তিনি যেন সাক্ষাৎ জগদম্বারূপেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে নেত্রীত্ব দিয়েছেন। গুরু বেঁচে থাকলে তিনিও কি পারতেন বিদেশী শাসক ও শোষণের বিরুদ্ধে জাতিকে উদ্বুদ্ধ না করে? এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯০৫-এর পরবর্তীকালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় শ্রীমা সারদাদেবীর উক্তি : 'ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আজ তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত।'[৫৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননীর এই তাৎপর্যময় উক্তিই শুধু নয়, এর সমর্থনে আরও অনেক ঐতিহাসিক দলিল আছে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব দেবার সম্ভাবনার কথা কেবল বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তই নন, বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থে, তাঁর 'দেশের মুক্তিপ্রয়াসী স্বামীজী' প্রবন্ধে। দেশের বিপ্লবী যুবকদের তিনি 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে সম্বোধন করতেন। স্বদেশী যুগে বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের আস্তানা সন্ধান করে অনেক সময়ই পুলিস বোমা, গোলাবারুদ-বন্দুক-পিস্তল ও অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে খুঁজে পেত স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভারতে বিবেকানন্দ', 'পত্রাবলী' প্রভৃতি। এইসব কারণেই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনও ইংরেজের সন্দেহভাজন হয়েছিল এক সময়। কড়া নজর ছিল পুলিসের রামকৃষ্ণ মিশনের উপর।[৫৬] ইংরেজ-পুলিস স্বাধীনতা-আন্দোলনের রাজবন্দীদের, তাঁরা বৈদান্তিক কিনা, স্বামীজীর ভক্ত কিনা—এসব প্রশ্ন করত। 'পুলিস সার্চ করে বিপ্লবীদের কাছে সব জায়গায় স্বামীজীর বই পেয়েছে। এমন বিপ্লবী ছিল না যার বাড়িতে স্বামীজীর কোন না কোন বই ছিল না।'[৫৭] স্বামীজীর বিখ্যাত কবিতা 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'র মন্ত্রের মতো প্রভাব ছিল বিপ্লবীদের জীবনে, তাঁদের প্রত্যহ জীবনচর্যায়। আর. জি. প্রধান তাঁর 'India's Struggle for Swaraj' গ্রন্থে (পৃঃ ৬০) বলেছেন : 'Swami Vivekananda might well be called the father of modern Indian Nationalism ; he largely created it, and also embodied in his own life its highest and noblest elements.'[৫৮] বিপ্লবী এম. এন. রায় বলেছেন : স্বামীজীর জাতীয়তাবাদ হল আধ্যাত্মিক স্বরাজ্যবাদ কারণ স্বামীজীর ডাকে ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিজাতীয় ভাবধারায় আচ্ছন্ন তরুণ বুদ্ধিজীবীরা একটি গোঁড়া জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলে এবং গুপ্ত সমিতি গঠন করে হিংসা ও সন্ত্রাসের পথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়। ওয়েণ্ডেল টমাস দেশের সমস্ত বিপ্লবী উত্থান ও সমস্ত রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের একক উৎস হিসাবে স্বামীজীর নাম উল্লেখ করেন। তাঁর মতে স্বামীজীর মহাদর্শই সমস্ত 'Anarchist movement in Bengal and the

৫৫। মাতৃসান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮১), পৃঃ ১৪

৫৬। বিশ্ববিবেক—সম্পাদনা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ও শংকর, বাক্‌সাহিত্য, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৭৩), পৃঃ ২৫৮-৬১

৫৭। তদেব, পৃঃ ২৫২

৫৮। Quoted in History of the Freedom Movement in India, Vol. I—R. C. Majumdar, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1962, p. 361

more recent drives for "Civil Disobedience" which Manmohandas Karamchand Gandhi, the saintly politician, has been organizing on a nation-wide scale."[৫৯]—এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল। 'বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবনের গঠনকর্তা। তিনি ইহার প্রধান নেতা।' এ উক্তি শ্রীঅরবিন্দের। ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর গুরুদেব সম্পর্কে বলেছেনঃ 'সেসময় আমার প্রায় প্রতি প্রত্যহই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইত—ভারতের চিন্তা তাঁহার নিকট শ্বাসপ্রশ্বাসস্বরূপ'[৬০] ছিল। 'যে মুহূর্তে আমি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে আর এক অগ্নির দহন-জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি; সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উন্মাদনা নয়—দেশ ও জাতির দুর্দশা নিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস, ও তাহার নিষ্ফলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনাভোগ।'[৬১] 'The queen of his adoration was his Motherland.' 'India was his day dream, India was his nightmare.'

স্বামীজীর দেশপ্রেম আলোচনাকালে একথা মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য যে, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আত্মার অখণ্ডত্ব এবং অবিনশ্বরতার উপলব্ধিকেই পরম লক্ষ্য বলে মনে করতেন। তাই তাঁর মুক্তিবোধের পরিধি সাধারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে অনেক ব্যাপক ও গভীর। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন আত্যন্তিক লক্ষ্য হিসেবে নয়; সেই লক্ষ্যপথে একটি গুরুতর সহায়করূপে। কারণ, তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিজিত জাতির পরাধীনতা তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট—বাহ্যিক মানুষগুলিকে অতিক্রম করে তাদের মানসিকতার অন্তস্তল পর্যন্ত। তাই তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই জাতির স্বার্থে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মনে করেছেন। কিন্তু সমগ্র জাতির নবনির্মাণে স্বামীজী মনুষ্যত্বের সাধনাকেই অনেক বেশী মূল্য দিতেন। মানুষ আগে, মানুষের জন্যই সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতা। তাই তাঁর সমগ্র কর্মপ্রয়াস প্রধানত শিক্ষার প্রসারে, সমাজসংস্কারে, ধর্মের মর্মোদ্ঘাটনে এবং পরাধীন দেশবাসীর মানসে আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদার পুনঃস্থাপনেই ব্যাপৃত ছিল। কারণ, দেশবাসী মানুষ হিসেবে উন্নত না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা—দুই-ই অসম্ভব হয়ে পড়বে। স্বামীজীর দেশপ্রেমের আর এক বৈশিষ্ট্য, বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে এর কোন বিরোধ ছিল না। পৃথিবীর যে-কোন দেশের যে-কোন নিপীড়িত মনুষ্য-গোষ্ঠীর সঙ্গেই তিনি আন্তরিক একাত্মতা অনুভব করতেন। মানুষ যে স্বরূপত অসীম মুক্ত ও পূর্ণ, বৈদান্তিক উপলব্ধির আলোকে এই সত্য তিনি দর্শন করেছিলেন বলে যা কিছুই মানুষের সেই পূর্ণ স্বরূপকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করে—হোক না তা ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথা-নিয়ম-অনুষ্ঠান, হোক না তা এদেশে বা বিদেশে এক জাতির উপর

৫৯। উদ্বোধন, ৪৮ বর্ষ, পৃঃ ৫১৮

৬০। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪১

৬১। বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—মোহিতলাল মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃঃ ৯০

অন্য কোন জাতির অত্যাচার—তার বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর সংগ্রাম। পূর্ণের প্রাঙ্গণেই বিবেকানন্দের সমস্ত কল্যাণকৃত্যের উজ্জ্বল পরিপূর্তি।

জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা ঃ বঙ্কিমচন্দ্র দেশীয় সমাজের সঙ্গে বিশ্বমানবকল্যাণের আদর্শ যুক্ত করে একটি সমন্বয় সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দ তাঁর Practical Vedanta-কে ভিত্তি করে বিশ্বমানবতার অভেদত্ব প্রমাণ করে স্বদেশের ও স্বজাতির সর্বাত্মক মঙ্গলচিন্তায় সমর্পিত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, স্বামীজীর আদর্শ অনেক বেশী দর্শনভিত্তিক, ব্যাপক এবং সর্বজনগ্রাহ্য। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় ভাব ও আদর্শকে একটু গভীরভাবে গ্রহণ করেও যুগ ও সনাতনকে (অর্থাৎ চিরন্তন মানবিক সংস্কারকে) একই সূত্রে গ্রথিত করেছিলেন। বঙ্কিমের উপন্যাসেও এই ভোগ ও মোক্ষ বা যুগ ও সনাতনের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। বলা যায়, ইউরোপীয় প্রকৃতিবাদ ও ভারতীয় ব্রহ্মবাদ এই দুয়ের একটি সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন তিনি। বঙ্কিম প্রত্যহজীবনের প্রয়োজনকে অস্বীকার না করেও প্রত্যহকে এক বৃহতের অনুশাসনে, প্রত্যহের অতীত এক মহত্তম ধ্রুব আদর্শের সঙ্গে অন্বিত করতে প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের হিতবাদ বা অনুশীলনধর্ম বেদান্তের মতো মহৎ ব্যাপ্ত কোন দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলেই সার্বিক কোন সমাধানের পথ খুঁজে পায়নি। তাছাড়া বঙ্কিমের দৃষ্টিও কিন্তু হিন্দুত্বের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। বঙ্কিমকে সাম্প্রদায়িক বলা কতটা সঙ্গত হবে জানি না, তবে বঙ্কিমের ধর্মনীতি, রাজনীতি, এককথায় তাঁর জীবনদর্শন প্রধানত হিন্দুধর্ম-প্রভাবিত ছিল। তাই আনন্দমঠের ভবানী মন্দির পরিকল্পনায় মুসলমানদের প্রবেশাধিকার নেই। 'এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে ?'[৬২] যে আনন্দমঠ দেশে স্বদেশপ্রেমের বীজরূপে চিহ্নিত—সেই গ্রন্থ থেকেই উপরোক্ত উদ্ধৃতি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রামের প্রয়োজন বঙ্কিমও বুঝতে পেরেছিলেন এবং সে সংগ্রামের ভাষাও তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত ঃ 'যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক আমার গৃহে বা আমার শয্যাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে শত্রু আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতায়ুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে দস্যু ধৃতাস্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহে প্রবেশপূর্বক সর্বস্ব গ্রহণ করিতেছে যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্মানুগত। ...সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আতিলা বা জঙ্গেজ, তৈমুর নাদের, দ্বিতীয় ফ্রেডারিক বা নাপোলেয়ন পরস্ব ও পররাষ্ট্রাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পররাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও ধর্মতঃ বধ্য। এখানে হিংসাই ধর্ম।'[৬৩] বঙ্কিম রচনাবলী থেকে এরকম আরও অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া চলে যাতে স্বভাবতই মনে হয় বঙ্কিম প্রতিবাদ ও সংগ্রামের প্রয়োজন বুঝতেন এবং সংগ্রামের পথও তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু এদেশের যথার্থ শত্রু কে—

৬২। বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭২৭

৬৩। আমার দেশ—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ১৩৭০, পৃঃ ১৭২-৭৩

ইংরেজ, না মুসলমান—এ নিয়ে তাঁর সংশয় ছিল। পরদেশ-আক্রমণকারী তাতার-তুর্কী-মোগল-পাঠান নবাব-বাদশাদের হিংস্রতা ও অমানবিকতা দেখেই বোধ হয়, দেশের সমগ্র মুসলমান সমাজের উপরই তাঁর অপ্রেম প্রসারিত হয়েছিল। রামা কৈবর্তের সঙ্গে তিনি অবশ্য হাসিম শেখেরও দুঃখ-দুর্দশায় সমব্যথী হয়েছেন (বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধ) কিন্তু এদেশের মুসলমানেরা যে এদেশেরই মানুষ, তারা প্রায় কেউই যে ইরান ইরাক বা আরব দেশ থেকে আসেনি, এসে থাকলেও তারা যে এখন এদেশেরই মানুষ এবং এদেশের স্বৈরাচারী রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের মতোই সাধারণ দরিদ্র দুঃস্থ মুসলমান জনতারও যে কোন যোগ নেই, এ সত্য তিনি সব সময় স্মরণে রাখতে পারেননি। এই কারণেই বঙ্কিমকে অনেকেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের জনক আখ্যা দিয়ে থাকেন। হিন্দুর ঐতিহ্যবোধে সমধিক আকৃষ্ট ও মুগ্ধ ছিলেন বলেই তিনি মূলত রক্ষণশীল ছিলেন এবং অনেক যুগোপযোগী সংস্কার-আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধিতা তো ঐতিহাসিক ঘটনা। এছাড়াও নব্য বাংলার বহু সংস্কার-আন্দোলনকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। বিদ্যাসাগর যদিও নানা প্রগতি-আন্দোলনের কর্ণধার ছিলেন, যদিও তাঁর হৃদয়ের করুণাধারার উৎস সম্প্রদায়-জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সব আর্ত মানুষের জন্যই ছিল অবারিত তথাপি মূলত হিন্দু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই তাঁর অধিকাংশ কল্যাণকর্ম নিয়োজিত। 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যাণ্ড মিউচুয়াল এন্যুইটি ফাণ্ড' নামক অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধায়ক সংগঠন হিন্দুদের জন্য, এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনেও মুসলমান ছাত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। জাতিভেদ প্রসঙ্গেও কোথাও কোথাও তাঁর অনুদারতার পরিচয় রয়ে গেছে। শ্রীঅরবিন্দ গুহ সম্পাদিত 'Unpublished letters of Vidyasagar' গ্রন্থের একটি চিঠি থেকে জানা যায় সংস্কৃত কলেজে একটি সোনার বেনে ছাত্রকে তিনি প্রবেশের অনুমতি দিতে পারেননি। যদিও এই বিদ্যাসাগরই এক কালে 'সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন', কারণ 'তখন সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না।'[৬৪] শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমেও প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিভোজের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু 'জীবশিব' তত্ত্বে বিশ্বাসী স্বামীজী শুধুমাত্র হিন্দুদের বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীই নয়, মুসলমান সমাজ সম্পর্কেও সমান সহানুভূতিশীল ছিলেন। শুধু যে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণই ইসলাম ধর্ম সাধন করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তা-ই নয়, শিষ্যও তাঁর সমগ্র জাতিগঠনের কর্মযোজনায় মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সমভাবে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তাঁর কাছে হিন্দু কোন বিশেষ ধর্মীয় শব্দ নয়।[৬৫] এই দেশে যারা বসবাস করে আসছে পুরুষানুক্রমে, এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি উদার সার্বজনিক বোধ আছে, যারা মানবতার উপাসনা করে তারাই স্বামীজীর মতে হিন্দু বা ভারতীয়। স্বামীজীর ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকলের মিলিত দেশ। নববেদান্ত

৬৪। বিদ্যাসাগরচরিত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯১, পৃঃ ৩৬
৬৫। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৫-৬

সর্বমানবের কল্যাণে ব্রতী। মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে লিখিত স্বামীজীর পত্র এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ 'কর্মপরিণত বেদান্ত (Practical Advaitism)—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সর্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টিলাভ করে নাই। পক্ষান্তরে...কখনও যদি কোন ধর্মের লোক দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া থাকে, তবে একমাত্র ইসলামধর্মের লোকেরাই আসিয়াছে; ...আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। ...আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই...একমাত্র আশা। আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি...ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।'[৬৬] আর খ্রীষ্ট ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে তো স্বামীজীর শ্রদ্ধার অন্ত নেই। 'ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট' প্রবন্ধ[৬৭] শুধু নয়, আরও নানা জায়গায় তিনি খ্রীষ্টের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য জানিয়েছেন। আজও রামকৃষ্ণ মিশনে খ্রীষ্টের জন্মোৎসব শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। মুসলমানকেও স্বামীজী রামকৃষ্ণসঙ্ঘে সন্ন্যাসে দীক্ষার অনুমোদন করে গেছেন। বর্তমানেও রামকৃষ্ণ মিশনে এমন সন্ন্যাসী আছেন পূর্বাশ্রমে যাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং স্বামীজীর দৃষ্টিতে সব ধর্মের লোক নিয়েই যে ভারতবর্ষ তা-ই নয়, তিনি সমস্ত ধর্মের ঐক্য ও সমন্বয়ের ভিতরই ভবিষ্যৎ মহা ভারতের উন্নতি ও মুক্তি—একথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। এবং স্বামীজী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন চেয়েছিলেন জোর করে কোনও নিয়ম চাপিয়ে বা একত্বের রোলার চালিয়ে দিয়ে নয়—শিক্ষা এবং উদার ধর্মচেতনার সাহায্যে মানুষের স্বাভাবিক উত্তরণের মাধ্যমে (growth from within)। মুর্শিদাবাদে অনাথ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্বামীজী এক চিঠিতে লেখেন ঃ 'মুসলমান বালকও লইতে হইবে বইকি এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না। ...হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও, তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে, অর্থাৎ তাদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ্ হয়; আর ধর্মের যে সর্বজনীন সাধারণ ভাব, তা-ই শিখাইবে।'[৬৮] ধর্মের যে মৌল সর্বজনীন ভাবধারা শুধুমাত্র তা-ই শিখিয়ে মানুষকে বৃহৎ জীবনের অভিমুখে এবং পরিণামে যথার্থ সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব—এই ছিল স্বামীজীর আদর্শ জীবনপন্থা। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মহামিলনেই শক্তিশালী বীর্যবান সর্বসৌভাগ্যময়ী মহাভারতের জন্ম সম্ভব। কর্ম ও কথায় স্বামীজীর জীবনসাধনা সমগ্র ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে। বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর ও অন্যান্যদের মতো শুধুমাত্র বঙ্গদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষই আরাধ্যরূপে তাঁর মানসলোকে অধিষ্ঠিত। যা কিছু কর্মপ্রয়াস সবই হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রসারিত অখণ্ড ভারতবর্ষকে নিয়ে। তিনি শুধু বঙ্গবাসীর পরিত্রাতা নন, তিনি একাধারে ভারতভাগ্যবিধাতা এবং বিশ্ব-জন-গণ-ঐক্যবিধায়কও বটে।

৬৬। তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৩৯ ৬৭। তদেব, পৃঃ ৩১৬-৩৫ ৬৮। তদেব, পৃঃ ৭-৮

বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের ধর্মাদর্শঃ মানুষের দেহ-মন-প্রাণের সকল বৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতাই জীবনাদর্শ বলে বঙ্কিম মনে করতেন। প্রকৃতিকে স্বীকার করেই তাঁর প্রকৃতিবাদী ধর্মতত্ত্ব, অনুশীলনধর্ম। দেহ-মন-প্রাণের সমস্ত বৃত্তির সমানুপাতিক অনুসরণের মধ্যে যে অন্তিমে পূর্ণতা আসেই—তাকেই ঈশ্বর বলা যায়। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বরত্ব মানুষের জীবনের যতটুকু অনুগত ততটুকুই যথেষ্ট। উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্মবিধিকে বঙ্কিম অস্বীকার করেছেন। স্বামীজী ধর্মের কুসংস্কার, অন্ধ আচারবিচারকে নিন্দা করেছেন কিন্তু ধ্যান-জপ-বৈরাগ্যকে ধর্মের অঙ্গ হিসেবে শ্রদ্ধা করেছেন। স্বামীজীও বহুক্ষেত্রে pragmatic। 'অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্যরূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে।'[৬৯] বঙ্কিম যখন সমাজহিতসাধনকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবধর্ম বলেন তা মেনে নিতে আপত্তি নেই, কিন্তু কেন যে মানুষ লোকহিতসাধনে উৎসাহবোধ করবে তার কোন সঙ্গত কারণ বা দার্শনিক ভিত্তি তিনি স্থাপিত করতে পারেননি। স্বামীজীর Practical Vedanta এদিক থেকে অনেক স্থির দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া বঙ্কিম বৃহত্তর সমাজকল্যাণবোধে বৈচিত্রময় ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসাধনাকে একেবারে অগ্রাহ্য করে ভারতীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছেন। জাতিগতভাবে যেমন প্রত্যেক জাতির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেও তা-ই। যত ভালই হোক, কোন একটি বিশিষ্ট ধর্মমতকে সকলের জন্য একমাত্র গ্রাহ্য বলে ঘোষণা করা ভুল। স্বামীজী কখনও এ ভুল করেননি। জোর করে স্বামীজী কারও উপরে কিছু চাপাতে চাইতেন না। তাছাড়া এদেশে হাজার হাজার বছর ধরে মুনিঋষি সাধু-সন্তদের তপস্যালব্ধ সব সত্যোপলব্ধিকে উড়িয়ে দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার এবং বেদান্তধর্মের প্রতিষ্ঠার উৎসাহে রামমোহন যে ভুল করেছিলেন বঙ্কিমও এখানে সেই একই ভুল করলেন। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত নাগরিকদের সামনে রেখে তিনি যে অনুশীলনধর্ম স্থাপন করেছিলেন তা কোনদিনই সমগ্র জাতির কাছে গ্রাহ্য হতে পারেনি। পরলোক, ঈশ্বর প্রভৃতি কথা ইংরেজিশিক্ষিত নগরবাসীদের পছন্দ নয় বলে বঙ্কিম তাঁর ধর্মতত্ত্ব থেকে এসব প্রসঙ্গ একেবারে বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত সরলীকরণের ফলে যুক্তির দিক থেকে গ্রাহ্য একটি ধর্মমত হলেও এতে মানুষের ভিতরের আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্ত হয় না। অবশ্য সেজন্য অনুশীলনধর্ম সৃষ্টও হয়নি। যে উদ্দেশ্যে বঙ্কিম এই নব ধর্মতত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন—তাঁর সেই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ উন্নাসিক আত্মভ্রষ্ট, নাস্তিক্যের নেতির কবলে পতিত, পরধর্মলোলুপ তরুণ নব্যবঙ্গকে ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্রত কিছু পরিমাণে সফল হয়েছিল।

বঙ্কিম ও স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তাঃ মানুষের অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতার উদ্বোধনকেই স্বামীজী যেহেতু শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন, সেইহেতু শিক্ষার ব্যবহারিক

৬৯। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৪১

দিক সম্পর্কেও তিনি সমান সচেতন ছিলেন। আধুনিককালে বেঁচে থাকতে হলে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পবিদ্যা সবই আয়ত্ত করা দরকার। কারণ শিল্পোদ্যোগ ছাড়া জীবনের অর্থনৈতিক মান উন্নত করা সম্ভব নয়—একথা তিনি বুঝতেন। এমনকি সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত শিল্পশিক্ষাদানে আগ্রহী ছিলেন। শিল্পের নানা জ্ঞানে শিক্ষিত, যন্ত্রশিল্পে নিপুণ বিশেষজ্ঞ সন্ন্যাসীরাই যুবশক্তিকে যন্ত্রশিল্পে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নিতে পারেন বলে স্বামীজী মনে করতেন। তাঁরাই দেশের আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন। তাহলেই দেশের যুবকেরা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। এ-প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তা ও বর্তমান ভারত' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।[৭০] ভারতকে এযুগের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে কারিগরি বিদ্যার (technical education) একান্ত প্রয়োজন বলে স্বামীজী মনে করতেন। এমনকি মিশনের উদ্দেশ্যের মধ্যে 'মানুষের সাংসারিক উন্নতির জন্য' শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধনকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মঠের প্রাঙ্গণে একটি বৈদিক কলেজের সঙ্গে একটি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপনার কথা তিনি বার বার বলেছেন। 'আমাদের চাই কি জানিস? —স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি আর science (বিজ্ঞান) পড়ানো; চাই technical education (কারিগরিশিক্ষা)...যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।'[৭১] কেরানি-বানানো শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি স্বামীজীর কোনদিনই আস্থা ছিল না। বিদেশী সভ্যতার আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধায়ক কলেজী শিক্ষাকে তিনি শিক্ষা বলেই মনে করতেন না। 'তোরা ভাবছিস—আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুণ্ড শিখেছিস? কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করে মাথার ভেতরে পুরে পাস করে ভাবছিস, আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা!! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানিগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকিল হওয়া, না হয় বড়জোর কেরানিগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরি—এই তো! এতে তোদেরই বা কি হল, আর দেশেরই বা কি হল? একবার চোখ খুলে দেখ্, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কী হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি?— কখনও নয়।'[৭২] —উপরোক্ত উক্তি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, সত্যিকারের মানুষ গড়ার জন্য একটি সমন্বয়ী শিক্ষাদর্শই স্বামীজীর কাম্য ছিল। একদিকে অন্তরের ঐশ্বর্যে দীপ্ত পরিপূর্ণ এবং অন্যদিকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ-সমৃদ্ধ আধুনিক জ্ঞানের অধিকারী একজন 'International man', 'a citizen of the world' গড়ে উঠতে পারে এরকম শিক্ষাব্যবস্থাই প্রচলন করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী।

দেশের শিক্ষা সম্পর্কে এমন সামগ্রিকভাবে চিন্তা না করলেও পূর্বসূরী হিসাবে বঙ্কিমের শিক্ষা সম্পর্কে বক্তব্যগুলিও নানা দিক থেকে স্মরণীয়। 'যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ সুতরাং ধর্মবিরুদ্ধ।' কিংবা 'কলেজে ছেলে পাঠালেই ছেলে মানুষ হয় না, এবং কতকগুলি বই পড়িলেই পণ্ডিত হয় না।' কিংবা

৭০। স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ ৩২৭-২৮

৭১। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪০৩ ৭২। তদেব, পৃঃ ১৬৪

'যে লেখাপড়া জানে না—তাহাকে মূর্খ বলিও না; আর যে লেখাপড়া করিয়াছে তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান পুস্তকপাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে উপার্জিত হইতে পারে।' এসব উক্তির সঙ্গে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। 'জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতি অধিক মনোযোগ এবং কার্যকারিণী বা চিত্ত-রঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ'—সমস্ত অনর্থের মূল বলে বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন। তর্ককুশল বাগ্মী, সুলেখক বা বড় ইঞ্জিনীয়ার বা ডাক্তার হলেই যে শিক্ষার শেষ চরিতার্থতা সম্পাদিত হল, বঙ্কিমচন্দ্র স্বামীজীর মতোই তা মনে করতেন না। মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, মানুষের জন্য, দেশের জন্য, দশের জন্য অনুভব ও ভালবাসার উন্মেষঃ এই সবই সত্যিকার শিক্ষার ফলশ্রুতি। এই একই কারণে দুজনেই তাঁরা সমকালীন ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে পারেননি। অতিরিক্ত পুঁথিপড়া বিদ্যার দিকে নজর দিয়ে মুখস্থ করে পাস করার দিকে জোর দিয়ে জাতি স্বাস্থ্যহীন, উৎসাহহীন ও নীতিহীন হয়ে পড়ে—বঙ্কিমচন্দ্রের এই observation স্বামীজীর মতোই অভ্রান্ত। কিন্তু 'ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি আরও নিকৃষ্ট ছিল'—বঙ্কিমের এই মতবাদ স্বামীজী কখনও স্বীকার করেননি। স্বামীজী চেয়েছিলেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সংহতি ও সমন্বয়। 'ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ।'[৭৩] ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোল সবই আমাদের শিখতে হবে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই নিজেদের সংস্কৃতিসভ্যতাকে অবহেলা বা অস্বীকার করে নয়। কিছুতেই পায়ের নীচে আমাদের স্বভূমি এবং স্বধর্ম ত্যাগ করা চলবে নাঃ 'I do not want my home to be walled in on all sides and my windows to be stuffed. I want cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuge to be blown off my feet by any.' গান্ধীজীর এই সমন্বয়ী জীবনদর্শন আসলে স্বামীজীরই উত্তরাধিকার। এমনকি স্বামীজীর উপরি-উদ্ধৃত বাক্যাবলীর সঙ্গে আক্ষরিক মিল রয়েছে এই উদ্ধৃতির।

দয়ানন্দ সরস্বতী—আর্যসমাজ—অন্যান্যঃ উনবিংশ শতাব্দীতে জাতির আত্মনিষ্ঠ হবার সেই সংগ্রামে দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪-৮৩) আর্যসমাজেরও বিশিষ্ট একটি ভূমিক, রয়েছে। বেদের ধর্মকেই তাঁরা প্রকৃত ধর্ম মনে করতেন। বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যেই দেশের সর্বাত্মক কল্যাণ নিহিত। পৌরাণিক ধর্ম ও কর্মানুষ্ঠান, বিশেষ করে প্রতিমাপূজা ও হিন্দুদের পৌত্তলিকতাকে তাঁরা কুসংস্কার বলে মনে করতেন। এদিক থেকে ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে মিল আছে। তবে আর্যসমাজ অদ্বৈতবাদ বা একতত্ত্ববাদ স্বীকার করতেন না। ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি এই তিনটি স্বতন্ত্র তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা। কিছু কিছু গোঁড়ামি থাকলেও তাঁদের ধর্মগ্রন্থ 'সত্যার্থপ্রকাশে' যে দশনীতির উল্লেখ আছে মূলত সেগুলি কিন্তু মানবিকতার আদর্শে ভাস্বর। সত্য

৭৩। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৪

গ্রহণ, অসত্য বর্জন, প্রীতির প্রসার ও ন্যায়ধর্মের সমর্থন, সমগ্র মানবজাতির দৈহিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক হিতসাধন, অজ্ঞানের দূরীকরণ ও জ্ঞানের প্রসার, বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণবোধের সঙ্গে আত্মস্বার্থ এক করে দেখার অনুশীলন, জাতিভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার বিলুপ্তি, জাতির সর্বাত্মক কল্যাণ ও জাতীয় সংহতির সাধনা এই সবই বৃহৎ জীবনের অভিমুখী এবং মহৎ মঙ্গলবোধে সমুত্তীর্ণ। এদিক থেকে বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে আর্যসমাজের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রভাবিত বোম্বাইয়ের প্রার্থনাসমাজের নামও এখানে উল্লেখ্য। কুসংস্কার ত্যাগ, আন্তর্জাতিকতা-বোধ ইত্যাদির মাধ্যমে জাতির প্রাণে নতুন প্রাণবেগের সঞ্চার ছিল এ সমাজের উদ্দেশ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের আদর্শে প্রতিষ্ঠ থেকে বেশীদিন বেঁচে থাকতে পারেনি।

ডিরোজিও এবং হিন্দু কলেজ ঃ নবজাগৃতি-আন্দোলনে ডিরোজিও, হিন্দু কলেজ এবং ডিরোজিও শিষ্য-অনুরাগীদেরও একটি শ্লাঘ্য ভূমিকা ছিল। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের প্রথম সূচনা ডিরোজিওর মাধ্যমেই। স্বাধীন ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে রামমোহনের পরই তাঁদের স্থান। সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যাচর্চা ও মননশীলতার প্রসারেও এঁদের অনেক দান। পাপ ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা এবং সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা ও সত্যানুসন্ধান এঁদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এত সব মানবিক গুণের পরিচর্যা করেও পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির, বিশেষ করে ইউরোপীয় জীবনচর্যার প্রতি এঁদের অন্ধ অনুরাগ ও আনুগত্য এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমস্ত প্রাচীন আচারবিচারের প্রতি নির্বিচার অবহেলা, অবজ্ঞা এবং অকারণ আক্রমণ নবজাগরণ-আন্দোলনে এঁদের কোন স্থায়ী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। কারণ অতীতকে অস্বীকার করে ভবিষ্যৎ গড়া যায় না। স্বাধীনতার সপক্ষে এবং কুসংস্কারভঙ্গের নাম করে এঁদের অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা স্বেচ্ছাচার ও অনেক সময় বালসুলভ আচার-আচরণ (অন্যকে অকারণ আঘাত করা প্রভৃতি) বহুজনের চিত্তে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। মদ্যপান ও নিষিদ্ধ মাংসভক্ষণকে এঁরা কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলন বলে মনে করতেন। পরিণত যুক্তিনিষ্ঠ মনের পরিচয় বলে এইসব আচরণকে সমর্থন করা যায় না। তবু একথাও ঐতিহাসিক সত্য যে, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক ডিরোজিওই প্রথম ভারতজননীকে নিয়ে কবিতা লেখেন। ডিরোজিও-অনুবর্তিগণ সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বিধবাদের সামাজিক অবস্থা, জাতিভেদ প্রভৃতি দেশের তৎকালীন সমস্ত প্রগতি-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের নিজেদের সমিতি 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এ এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। প্রথম যৌবনে নানা যৌবনচাঞ্চল্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পেলেও পরবর্তীকালে ডিরোজিও-সমর্থকদের অনেকেই দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে অংশীদার ছিলেন। কেউ কেউ সংস্কৃতির নবজাগরণে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যও এঁদের অনেকের দানে সমৃদ্ধ। ডিরোজিও-অনুগামীদের মধ্যে রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ

চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দে, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার নবজাগরণ-আন্দোলনে এঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই একটি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত বিদ্রোহী কৃষ্ণমোহনেরও বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদান সামান্য নয়। ব্ল্যাক অ্যাক্টস-এর বিরুদ্ধে ভারতীয়দের স্বাধিকার সংরক্ষণের সংগ্রামে রামগোপাল ঘোষের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্র সংস্কার ও আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি একজন আদি পুরোহিত। অপর শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরে দুলাল'-এ কথ্য ভাষার ব্যবহার এবং তাঁর অন্যান্য রচনায়, যে জীবনজিজ্ঞাসা তা আমাদের আত্মমুক্তি-আন্দোলনে পাথেয় সংগ্রহ করেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বসূরী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদেরও অনেকেই ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য বা অনুগামী।

দেবেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ ঃ ব্রাহ্মসমাজের আদি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রামমোহনের নাম ঐতিহাসিক কারণে উল্লেখিত হলেও, ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ স্থপতি এবং ভাস্কর দুই-ই ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ।

ন্যায়বোধ, সাধুত্ব, নীতিপরায়ণতা এবং সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে তিনি সমুজ্জ্বল। অধ্যাত্মবেদনায় ব্যাকুল যুবক নরেন্দ্রনাথ একদা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন ঈশ্বরজিজ্ঞাসার সদুত্তর প্রার্থনায়। পরবর্তীকালেও বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সশিষ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উপস্থিত হয়েছিলেন এই শুদ্ধাচারনিষ্ঠ আদর্শবাদী ভক্ত ব্রাহ্মণের কাছে। যে ইহ-পর-সমন্বয়সাধনা ভারতবর্ষের আদর্শ ও অন্বিষ্ট, দেবেন্দ্রনাথের কর্মে ও কথায় তা অনেকটা সত্য হয়ে উঠেছিল। একদিকে হিন্দুধর্মের অন্ধ প্রথানুগত্য ও দেশাচার, অন্যদিকে রামমোহন প্রবর্তিত নির্বাণসর্বস্ব অখণ্ড অদ্বৈতবাদ, এই দুই পথই পরিত্যাগ করে তিনি অনুভবময় নিরাকার ব্রহ্মসাধনায় ও ভক্তিধর্মের আশ্রয়ে 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি' লাভ করেছিলেন। ভারতীয় সমাজ-জীবন-সভ্যতা —সবই যে ধর্মাশ্রিত, বিবেকানন্দের এই সত্যোপলব্ধি তাঁর চেতনায়ও ধরা পড়েছিল। তাই তিনি পরধর্মলুব্ধ দেশের যুবশক্তিকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়েছিলেন। ধর্মান্দোলনের মধ্য দিয়ে আসলে তিনি জাতির বুকে স্বীয় ঐতিহ্য ও স্বদেশপ্রীতির অঙ্কুর উদ্গমে সহায়তা করেছিলেন। ভারত ও ভারতবাসী সম্পর্কীয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের অকারণ কুৎসা-প্রচারের বিরুদ্ধে রামমোহনের মতো দেবেন্দ্রনাথকেও মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। যুবশক্তির মধ্যে শুদ্ধভাবের সঞ্চার, স্বজাতি ও স্বদেশকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনেই ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলনে তাঁর আত্মনিবেদন এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা প্রতিষ্ঠা (১৮৩৯, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)। ঐ স্বধর্ম রক্ষার প্রয়োজনেই তিনি সনাতন-পন্থী রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে যুক্তভাবে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ডাফ সাহেবের 'India and India's Mission' গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা প্রসঙ্গে মিশনারীদের ভারত সম্পর্কে অপপ্রচার ও ভারতবিদ্বেষের কথা যে তুলে ধরেছিলেন দেশের মানুষের চোখের সামনে, তা-ও দেশের সমূহ বিনষ্টির সম্ভাবনায় বিচলিত হয়েই। সেকালের স্বধর্মপ্রীতি আসলে স্বজাতিপ্রীতিরই নামান্তর। বিদেশী

স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর উদ্যত খড়্গের নীচে দাঁড়িয়ে স্বধর্মনিষ্ঠার প্রচ্ছন্ন আড়ালে থেকেই স্বাজাত্যাভিমান ও স্বদেশপ্রীতির বীজ উপ্ত করতে হয়েছিল সেদিনকার পরাধীন ভারতের নেতাদের বহুদিন পর্যন্ত। দেবেন্দ্রনাথ-রাজনারায়ণ বসু সেই পথেরই পথিকৃৎ।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এবং মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর প্রীতি দেবেন্দ্রনাথের স্বাজাত্যাভিমান ও স্বধর্ম-স্বদেশপ্রীতিরই পরিচয়। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় যে, কোন এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ইংরেজিতে লেখা পারিবারিক চিঠি তিনি ফেরত দিয়েছিলেন। এবং বিদেশী সংস্কৃতির আক্রমণের বিরুদ্ধে এই স্বধর্মরক্ষা ও স্বজাতির কল্যাণপ্রয়াসেই তিনি যুক্ত হয়েছিলেন তৎকালীন সকল দল ও মতের সঙ্গে এবং তত্ত্ববোধিনীর সারস্বত সম্মেলনে ডাক দিয়েছিলেন দল-মত-নির্বিশেষে সকলকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় ইহজীবনেও দেশ শক্তি ও সম্পদে বড় হয়ে উঠুক দেবেন্দ্রনাথ তা বরাবরই চেয়েছেন। এসব সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর ব্রাহ্মসমাজ শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশকে সমন্বিত মহাজীবনের অভিমুখে পথ চলার নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্রাহ্মধর্ম সমগ্র দেশ ও জাতির কথা ভুলে শুধুমাত্র নব্যশিক্ষিত মুষ্টিমেয় নগরবাসীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। তাই এই নবধর্ম দেশের দুঃখী দুঃস্থ অশিক্ষিত সাধারণ মানুষকে আশ্রয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। রামমোহনের মতো অসহিষ্ণু ভাষায় আক্রমণ না করলেও হিন্দুর পৌত্তলিকতা, বৈষ্ণব শাক্ত প্রভৃতি দ্বৈত সাধনার পথ, হিন্দুর পূজা-অনুষ্ঠান ও অন্যান্য লোকাচার প্রভৃতি কিছুই দেবেন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না। দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রাহ্ম-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই অসাধারণ মনীষা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মৌল লক্ষণই যে 'Unity in diversity' এবং অসীম সহনশীলতা ও সমন্বয়—তা অস্বীকার করেই ব্রাহ্মধর্মের নেতারা ভুল করলেন। বিভিন্ন মানুষের রুচি-প্রকৃতি ও সামর্থ্যের বিভিন্নতাকে অস্বীকার করে একেশ্বরবাদের আধুনিক রূপসম্মত এক ধর্ম সকলের উপর চাপাতে গিয়েই তাঁরা অসফল হলেন। বিবেকানন্দের ধর্মাদর্শ কিন্তু জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিল। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজী বললেন যে, তিনি এমন এক মহান ধর্মের প্রতিনিধি, যে ধর্ম অন্য সব ধর্মকে কেবলমাত্র সম-মর্যাদাসম্পন্ন মনে করে না, বা অন্য ধর্মাবলম্বীকে সমদৃষ্টিতেই দেখে না, পরন্তু সমস্ত ধর্মমতকে পরম সত্যে পৌঁছাবার এক একটি পথ বলে বিশ্বাস করে।[৭৪] এই উদার সার্বভৌম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই দেশ জাতি ও বিশ্বের সার্থক সমীকরণ করা সম্ভব হয়েছিল স্বামীজীর পক্ষে, এবং একমাত্র স্বামীজীর পক্ষেই। শুধু বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মকেই যে তিনি সত্য বলে ঘোষণা করেছেন তা নয়, হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়, পথ ও মতের মধ্যেও একটি সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কার করেছেন। স্বামীজী বলেছেন ঃ যেমন দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, তেমনি কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ—সবই আত্মোপলব্ধির বিভিন্ন পথ। বিভিন্ন ব্যক্তির বাসনালোকের ও সংস্কারের তারতম্যানুসারে তাদের বিশেষ মানসপ্রবণতায় তারা ভিন্ন ভিন্ন সাধনপথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে। শাক্ত, বৈষ্ণব, আউল-বাউল

৭৪। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯-১০

সম্পর্কেও ঐ একই কথা। শুধু ধর্ম ও দর্শন নয়, জগৎ ও জীবন সম্পর্কেও স্বামীজীর এই উদার সমন্বয়ী অভিমতের কথা স্মরণ করেই নিবেদিতা বললেনঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর থেকে হিন্দুধর্ম শুধু অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুই রইল না, সকল পন্থাকেই সঙ্গত জেনে গভীরতর প্রীতির সঙ্গে স্বাগত জানাল। সম্প্রদায় নয়, সমন্বয়; বিশেষ কোন উপাসনা মন্দির নয়, অধ্যাত্মসংস্কৃতির এক বিশ্ববিদ্যালয়।'[৭৫] ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়; কিন্তু সে ধর্মমত গণসমর্থনের অভাবে অতঃপর নিজেই ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, অক্ষয়কুমারের সহযোগিতায় দেবেন্দ্রনাথ যে নব্য 'ব্রাহ্মধর্ম' সংকলন করলেন এবং তাতে যে সমন্বয়চিন্তা জাতির সম্মুখে তুলে ধরা হল সে সমন্বয় বাইরে থেকে আমদানি করা আরোপিত সমন্বয়, জাতীয় চেতনার গভীর থেকে (within) উৎসারিত সর্বগ্রাহ্য জীবনসমন্বয় সেখানে নেই। সেখানে যুক্তি আছে, নিষ্ঠা আছে, পাণ্ডিত্য আছে, অধ্যবসায় আছে, কিন্তু নেই শুধু বড় হৃদয়ের, মহৎ অনুভবের জীবন্ত সংযোগ, যাতে সব সোনা হয়ে যেতে পারে। বাইরে থেকে, বিভিন্ন ধর্ম থেকে আহৃত উৎকলিত মন্ত্রগুচ্ছ সেখানে সঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু ভিতরের কোন মহৎ প্রেরণার উৎস থেকে তা জীবনমন্ত্র হয়ে ওঠেনি। কারণ বিভিন্ন ধর্মের একত্রীকরণ বা বিভিন্ন ধর্মমতের মৌল সূত্রের সারাংশের উৎকলনের নাম ধর্মসমন্বয় নয়।

'ঈশ্বর অশেষ শক্তির আধার, তিনি বিশ্বমানবের পিতা-স্বরূপ, তাঁর নিজস্ব কোনও স্থূল রূপ নেই—এই মোটামুটি তাঁর ধর্মমতের মূল উপাদান। যিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, যাঁর প্রকট রূপ নেই, তাঁকে মৃন্ময় মূর্তিতে রূপ দেওয়া তাঁর সংস্কারে অত্যন্ত বাধত। তাই তিনি সাকার উপাসনা কোন মতেই অনুমোদন করতে পারতেন না।...উপনিষদের সর্বব্রহ্মবাদকে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। সেও কিন্তু সেই একই কারণে—ঈশ্বরের প্রতি অত্যধিক ভক্তি হেতু। যিনি ঈশ্বর, যিনি সব থেকে পবিত্র, দেবেন্দ্রনাথের ধারণায় তিনি তাঁর সৃষ্ট জীব, মানুষ হতে পৃথক। মানুষ পাপ করে, মানুষ অপবিত্র, কাজেই মানুষ কখনও ঈশ্বরের অঙ্গ বা অংশ হতে পারে না।'[৭৬] দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বরভক্তি তাই উপনিষদের এই অদ্বৈতবাদের 'তত্ত্বমসি' বাণীকে গ্রহণ করতে পারল না। না পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সাকার উপাসনা, না উপনিষদের অদ্বৈতবাদ, কোনটিই তাঁর সমর্থন পেল না। দেখা যাচ্ছে, অনুভবময় নিরাকার ব্রহ্মসাধনা দেবেন্দ্রনাথের একান্ত ব্যক্তিগত নিজস্ব ধর্মমত। তিনি তাঁর সেই ব্যক্তিগত ধর্মকেই একমাত্র সত্য মনে করে সকলের গ্রাহ্য বলে ভাবলেন। তাঁর মতো অধ্যাত্মসাধনায় প্রাগ্রসর পুরুষের পক্ষে যা সত্য ধর্ম, তা সাধারণের পক্ষে অনেক সময় অবোধ্য, অতএব অগ্রাহ্য হওয়াই স্বাভাবিক। অধিকারী-ভেদের সত্যটি ব্রাহ্মধর্মের নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পারেননি—দেবেন্দ্রনাথও নন।

৭৫। The Web of Indian Life—Sister Nivedita, Advaita Ashrama, Mayavati, 1950, pp. 193-94

৭৬। দুই মনীষী—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃঃ ১৫৭

কেশবচন্দ্র সেন ঃ অবশ্য তৎকালীন ব্রহ্মবাদীদের অন্তত একজন এর ব্যতিক্রম ছিলেন—যাঁর চেতনায় নবযুগের সমন্বয়বাণী উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তিনি আচার্য কেশবচন্দ্র সেন। তাই একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মসমাজের নেতা হয়েও খ্রীষ্টকে আরাধনা করতে তাঁর বাধেনি। আবার দক্ষিণেশ্বরের নিরক্ষর পুরুতঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আনন্দেও তিনি সমান উদ্বেল। জীবন-অভিমুখী তাঁর ধর্মসাধনা—জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ করেই পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসা ও সচ্ছল সমাধানে মুখর এই কেশবচন্দ্র তাই তাঁর 'সুলভ সমাচারে' মানবজীবন সম্পর্কিত অত্যন্ত সব দুর্লভ সুসমাচারের সঞ্জীবনী অভিজ্ঞান পরিবেশন করেছিলেন জাতির কাছে। স্বামীজীর মতে কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানযোগ, দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত-অদ্বৈত, শাক্ত-বৈষ্ণব সব সাধনাই যে একই পরম সত্যের ঐক্যে বিধৃত কেশবচন্দ্রের জীবনে সেই সত্যানুসরণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই কারণেই অতিরিক্ত খ্রীষ্টভক্তি ও খ্রীষ্টানুসরণ দেবেন্দ্রনাথের সমর্থন না পেলেও একই সঙ্গে কেশবচন্দ্র যেমন দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে ভালবাসতেন গভীরভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় তাই কেশবচন্দ্র সম্পর্কে উক্তি করেছিলেন ঃ 'তোমারই ল্যাজ খসেছে—আর কারুর হয় নাই।'[৭৭] যথার্থ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে উদার মানবতাই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট দেবতা এবং তাঁর পায়েই তাঁর সমস্ত অঞ্জলি।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিবেকানন্দ ঃ যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তন এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় অক্ষয়কুমার রামমোহনের উত্তরাধিকারী। যা কিছু প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী তা-ই খারাপ এবং পরিত্যাজ্য—এ মতবাদ কেবল ডিরোজিও-শিষ্যদের নয়, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম শ্রেণীর নেতাদেরও এই ঐকদেশিক চেতনায় আচ্ছন্ন থাকতে দেখা যায়। রামমোহনের মতো তিনিও প্রাচীন দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতিকে, বিশেষ করে সংস্কৃত শিক্ষাধারাকে তীব্র অসহিষ্ণু ভাষায় আক্রমণ করে বলেছেন ঃ 'দেশবাসীকে অন্ধকারে রাখার জন্য সুপরিকল্পিত বন্দোবস্ত।' বোধ হয়, অতিরিক্ত বিজ্ঞানবোধ ও বিজ্ঞান-অনুসরণই তাঁকে এবংবিধ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল। ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষার মধ্যেই আমাদের জাতীয় মানসমুক্তি, রামমোহনের মতো এই ছিল তাঁরও আন্তরিক বিশ্বাস। যুক্তির কষ্টিপাথরে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে যা প্রমাণ করা যায় না, অক্ষয়কুমার তা মানতে রাজী ছিলেন না। এপথেই তিনি অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক অনুভূতি ধর্মের ইতিহাস থেকে এবং জীবন থেকেও বর্জন করেছিলেন। তাই 'ব্রহ্মতত্ত্বের চেয়ে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব তাঁহার রচনায় ফুটিত বেশী।'[৭৮] তিনি ঘোষণা করলেন ঃ বিশ্বরূপ মূলগ্রন্থ পাঠই প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ধর্মশিক্ষার একমাত্র পথ। তিনি বললেন ঃ বিজ্ঞানও শাস্ত্র, পুরাতত্ত্বও শাস্ত্র—বিশ্বসংসারই শাস্ত্র।[৭৯] আবার তিনিই বললেন যে, সব ধর্মের সারসত্যকে গ্রহণ করা কর্তব্য। এবং তাঁর সাহায্যেই সর্বধর্মের সার সংগ্রহ করে

৭৭। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ—শ্রীম-কথিত, শ্রীম-এর ঠাকুরবাটী, কলিকাতা, ১৩৮৭, পৃঃ ১৭৬
৭৮। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অজিতকুমার চক্রবর্তী, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯১৬, পৃঃ ১৭৭
৭৯। তদেব, পৃঃ ১৭৯

দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' সংকলিত হয়েছিল। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ বিজ্ঞানচর্চা একথা মানলেও বিজ্ঞানচর্চা করেই সব জ্ঞানের অধিকার অর্জন করা যায় না। অর্থাৎ বিজ্ঞান সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়! স্বামীজীও বিজ্ঞানচর্চা করেছেন, অধ্যাত্মবাদ ও আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গেও স্বামীজীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাঁর ধর্মব্যাখ্যার মধ্যে সেই বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সুস্পষ্ট। কিন্তু স্বামীজীর বিজ্ঞানচেতনার পশ্চাতে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনসাধনা ও তপস্যার অগ্নিশুদ্ধি ছিল বলে তাঁর কাছে ধর্ম ও বিজ্ঞান একই পরম সত্য আবিষ্কারের দুটি ভিন্ন পন্থারূপে প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু অক্ষয়কুমারের চিন্তাভাবনায়, ধর্মের স্থান গৌণ হয়ে বিজ্ঞানই মুখ্য স্থান অধিকার করেছিল। অক্ষয়কুমারের সপক্ষে একথা কেউ বলতে পারেন যে, তিনি বিজ্ঞানের পরাজয় ও ব্যর্থতা দেখে যাননি। কিন্তু স্বামীজীও তো প্রায় একই যুগের মানুষ, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তাঁর কালেও অব্যাহত। তবুও বৃহত্তর মানবকল্যাণের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে মিলিয়ে দেবার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁর লোকোত্তর প্রতিভায় পরবর্তীকালের বিজ্ঞানের অপূর্ণতার কথা আগে থেকেই ধরা পড়েছিল। এ-প্রসঙ্গে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর বক্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ: 'প্রাচীন পৃথিবী কেবলমাত্র ধর্মকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইত, এবং আধুনিক পৃথিবী শুধু বিজ্ঞানকেই ভিত্তি করতে চায়। ফলে দুইয়ের মধ্যেই দেখা গেছে ব্যর্থতা। এই দুইয়ের সম্মিলনেই গড়ে উঠবে নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ। জগৎ আজ এই সমন্বিত মহান মানবসভ্যতার জন্যই প্রতীক্ষমাণ। মানুষের চিন্তার জগতে মানবসভ্যতার ইতিহাসে এটাই হচ্ছে স্বামীজীর বিশিষ্ট অবদান।'[৮০]

রাজনারায়ণ বসু: বৃত্তিতে শিক্ষক, অক্লান্ত কর্মী রাজনারায়ণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারসাধন এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। 'জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা' ও 'সুরাপান নিবারণী সভা'র তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-কর্ণধার। জাতির চেতনায় স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতির সঞ্চার করাই এদের উদ্দেশ্য। 'জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা'য় ইংরেজি ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। মাতৃভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনা জাগ্রত হোক এ তিনি চাইতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এটি একটি বিশেষ অবদান। নিজে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজি ও বাংলায় বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সমস্ত গ্রন্থে এবং তাঁর ভাবগর্ভ উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতাবলীতেও তিনি যে দেশপ্রেমের ও জাতীয়তাবাদের মন্ত্র উচ্চারণ করেন, পরবর্তীকালের ইতিহাসে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতায় স্বধর্মের গৌরব ও মহিমা বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রীতির সঞ্চার করে গেছেন। পরবর্তীকালে নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলা' পরিকল্পনার পশ্চাতেও তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল।

বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি সেকালের বিভিন্ন প্রগতিমূলক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। রাজনারায়ণের প্রবল সাহিত্যানুরাগ এবং কর্ষিত ও মার্জিত

---

৮০ ।Swami Vivekananda's Synthesis of Science and Religion—Swami Ranganathananda, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, 1967, p. 60

সাহিত্যরুচি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম রসবোদ্ধা সমঝদার ও সার্থক সমালোচক ভাষ্যকার রাজনারায়ণ। রাজনারায়ণ এবং মধুসূদনের মধ্যে পরস্পর লিখিত পত্রাবলী আমাদের অন্যতম সাহিত্যসম্পদ। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সদা-উৎসাহী রাজনারায়ণ নবজাগরণের একজন মহৎ কর্মী সন্দেহ নেই। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনের কথা তিনিও বলেছেন। তিনি মনে করতেন ঃ 'ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা অতি শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে।' আবার এই রাজনারায়ণই 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতায় বলেছেন ঃ 'ক্রীতদাসের ন্যায় অন্য জাতির অনুকরণ করিলে আভ্যন্তরিক বীর্যের হানি হয় এবং কোন মতেই স্বীয় মহত্ত্ব সাধন হইতে পারে না; ...আমরা নিউজিল্যাণ্ডবাসী নহি যে, একদিনেই হেট্ কোট্ পরিয়া সকলে সাহেব সাজিয়া উঠিব, ইহা ক্রীতদাসের কার্য, আমরা কখনই এরূপ ক্রীতদাস নহি...।'

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঃ সনাতন হিন্দুধর্মে আস্থাশীল গোঁড়া ব্রাহ্মণ ভূদেবচন্দ্র তৎকালীন নব্যবঙ্গের সমস্ত রকম প্রগতিবাদী আন্দোলনেরই বিরোধী বলে অন্যায়ভাবে ইতিহাসে চিহ্নিত। বিশেষ করে ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিধবাবিবাহ' অসমর্থনের ফলে তাঁকে তৎকালে বহুজননিন্দিত হতে হয়েছিল। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তার সবটাই সত্য নয়। যেহেতু ভালমন্দ পাপপুণ্য সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব একটি ধারণা ছিল, সেই কারণেই অনেক ব্যাপারে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি পথ চলতে পারেননি। তাছাড়া এদেশের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ছিল সুগভীর আনুগত্য। তাঁর ঐ অতীত ঐতিহ্যমুখিতার জন্যই সমকালের মানুষ তাঁকে ভুল বুঝেছে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছে নতজানু হয়েও তিনি মুসলমান ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ছিলেন পরমসহিষ্ণু। জাতীয়তাবোধেরও ধারক ও বাহক ছিলেন। নিদারুণ সেই ভাববিপ্লবের যুগে, যখন চারিদিকে শুধু স্রোতের জলে ভেসে চলার আবেগ সঞ্চারিত, পরানুকরণ ও পরধর্মানুসরণের অন্ধতা জাতিকে গ্রাস করছিল, তখন ভূদেব-চরিত্রের এই অনমনীয় নৈষ্ঠিক সংযম, আত্মপ্রীতি ও রক্ষণশীল ঐতিহ্যানুসারিতা, শক্ত পায়ে স্বধর্মে স্থিতির প্রতিশ্রুতি একটি অত্যুজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বৃত্তাকার গতির ক্ষেত্রে যেমন কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) ও কেন্দ্রাভিগ (centripetal) শক্তির সমন্বয়েই বস্তুটি গতিশীল থাকে, ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন সম্পর্কেও সেই একই সত্য। ভূদেব আমাদের নবজাগৃতির আন্দোলনে কেন্দ্রাভিগ শক্তির কাজ করে জাতিকে স্থিতির প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। তিনি ব্যক্তিজীবনকে সুস্থ, সুন্দর ও নীতিভাস্বর করে গড়ে তুলতে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং দীর্ঘকাল 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদক ছিলেন। ঐ পত্রিকায় তাঁর বহু লেখার মধ্যেই ভারতীয় আদর্শের প্রতি গভীর আনুগত্য ও শ্রদ্ধাশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রাঙ্গণ থেকেই আমরা পৌছাতে পারি মনুষ্যত্বের পূর্ণতায় এবং ব্যক্তিজীবনে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জিত হলেই তা থেকে জন্ম নিতে পারে পারিবারিক সম্প্রীতি ও সামাজিক ঐক্যচেতনা এবং পরিশেষে তা-ই পূর্ণ হয়ে ওঠে, যথার্থ স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তায়। 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে এসব তত্ত্ব ও তথ্যই তিনি আলোচনা করেছেন।

ঐতিহ্যের প্রতি প্রত্যয় ও শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই শ্রেয় এবং জাতীয় জীবনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে স্বধর্মের স্থির ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই যে ইউরোপীয় জীবনের সদ্‌গুণরাজি গ্রহণ করা উচিত, ভূদেবের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় স্বামীজীর অনুরূপ। কিন্তু অপরের থেকে কিছু গ্রহণ করার ব্যাপারে ভূদেব এত রক্ষণশীল ছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত বহতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতীয় জীবনের মহৎ কল্যাণের প্রয়োজনেও কোন পরিবর্তনকে ভূদেব মেনে নিতে পারেননি। সমাজ যে জঙ্গম, নিত্য নানা পরিবর্তন, গ্রহণবর্জনের মধ্য দিয়েই যে জীবনকে এগোতে হয়, প্রাণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে—এই জীবনসত্য তিনি অস্বীকার করেছেন। 'ইংরেজের কাছ থেকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও কর্মিষ্ঠ উদ্যমশীলতা ছাড়া আর কিছুই যে আমাদের শিক্ষণীয় নেই'—একথা তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। কিন্তু ঐ গুণগুলি গ্রহণ করতে হলে আমাদের সমাজজীবনে যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন আসতে বাধ্য তা তিনি মানতে পারেননি। যেমন জাতিভেদপ্রথার বিলুপ্তি, আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি প্রগতিশীল পরিবর্তনগুলিকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। স্বামীজী কিন্তু আসন্ন গণ-অভ্যুত্থানের স্থির পদধ্বনি শুনতে পেয়ে সেখানে যে জাতিভেদের কোন স্থান নেই, অ-দ্ব্যর্থক ভাষায় তা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন আমাদের বহু জাতীয় দুর্বলতা ও পাপের মূল উৎস এই জাতিভেদপ্রথা। তবে 'উচ্চতর বর্ণকে নীচে নামাইয়া এ-সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে।'[৮১] আমাদের সকলের সাধনা ব্রাহ্মণের সাধনা। স্বামীজী মনে করতেন ব্রাহ্মণত্বই মনুষ্যসমাজের চরম আদর্শ, আর সত্যযুগ হচ্ছে বিভেদহীন আদর্শ সাম্য সমাজের যুগ। এবং এ-ও স্বামীজী জানতেন নতুন ভারত বের হবে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে, বের হবে মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বের হবে কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলেন জাতিভেদের সেখানে কোন স্থান থাকতে পারে না। স্বামীজীর এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি ভূদেবের ছিল না।

নবজাগরণ ও পারিবারিক সম্পর্ক : ভূদেব বহির্মুখী রাজনৈতিক বা সমাজসংস্কার আন্দোলনে যুক্ত হওয়া বা সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেবার চেয়ে ব্যক্তিচরিত্রের শুচিতা রক্ষা ও পারিবারিক জীবনের কল্যাণসাধনাকে অনেক বেশী শ্রেয় মনে করতেন, কারণ পরিবারকে কেন্দ্র করেই একদা গড়ে উঠেছিল আমাদের সমাজ। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন : 'উপাসনাপ্রণালীই বল, আর ধর্মপ্রণালীই বল, সামাজিকপ্রণালীই বল, আর শাসনপ্রণালীই বল এক পারিবারিক ব্যবস্থাই সকলের নিদানভূত।'[৮২] প্রত্যহজীবনচর্যায় অম্লান শুচিতা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁর পিতৃভক্তি এবং স্বজন-পরিবারের প্রতি আনুগত্য।

পারিবারিক জীবনের শুচিতা ও পরিবারের সংহতি রক্ষার প্রয়াসে বঙ্কিমও সদাজাগ্রত ছিলেন। আপন আত্মীয়স্বজন, পরিবারের শ্রদ্ধেয় প্রিয় সঙ্গীদের এবং প্রতিবেশীদের

৮১। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৯২

৮২। পারিবারিক প্রবন্ধ—ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৩০২, পৃঃ ।১/০

প্রতিই যদি হৃদয়ের অনুভব প্রসারিত না করা যায়, তবে দেশের বৃহৎ সমাজ ও জনজীবনকে মুক্তির পথ দেখাবে কোন্ অধিকারে, কোন্ আলোর অভিজ্ঞানে? দেশ ও রাষ্ট্র তো ভুঁইফোঁড় কিছু নয়, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকেই গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। তাই তিনি নতুন ভারতবর্ষের নবজীবন যোজনায় সুস্থ সুন্দর পারিবারিক জীবন রচনায় মনোযোগ দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের মাতাপিতৃভক্তির কথা তো বহুজনবিদিত। আবহমানকাল থেকে ভারতবর্ষীয় সমাজে যে একটি সুমধুর শুচিশুভ্র পারিবারিক সম্পর্কের ধারা চলে এসেছে, নবজাগরণের মহান সংগ্রামী বিদ্যাসাগরের জীবনেও তার পূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করি। কিন্তু দুঃখ ও নিদারুণ নৈরাশ্যের সঙ্গে বলতে হয়, নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ রামমোহনের জীবনে এই শুচিশুভ্র পারিবারিক বন্ধন বা পরিবারের প্রতি কোন সামান্যতম সহানুভূতি, সহৃদয়তা বা আনুগত্য দেখা যায়নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র প্রথম খণ্ড থেকে জানা যায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ৩,৩৩৮৵ ৫-এর জন্য পিতা রামকান্ত রায় হুগলীর দেওয়ানি জেলে বন্দী হন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন রায়ও সরকারের খাজনা বাকি থাকার জন্য মেদিনীপুরের দেওয়ানি জেলে বন্দী হন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জগমোহন রায় জেল ভোগ করেন। অথচ '১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি (রামমোহন) কলিকাতার টমাস উডফোর্ড নামে কোম্পানীর...একজন সিবিলিয়ানকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ দেন।' ১৮০৩-এ তিনি উডফোর্ডের (ফরিদপুরে) দেওয়ান নিযুক্ত হন। 'আর্থিক দুশ্চিন্তা ও দুর্দশার মধ্যে এই সময়ে—১২১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৮০৩, মে-জুন) বর্ধমানের বাড়িতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হইল।' আমরা জানি তখন রামমোহনের অবস্থা শুধু সচ্ছল নয়, তিনি রীতিমতো ধনী। ব্রজেন্দ্রনাথও লিখেছেন ঃ 'রামকান্তের মৃত্যু ও জগমোহনের কারাবাসের জন্য রায়পরিবার যখন দুর্দশাগ্রস্ত, তখন রামমোহনের অবস্থা বেশ সম্পন্ন। তিনি নিজেও এই কথার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন এবং আমরা তাঁহাকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লাঙ্গুল পাড়ায় একটি নূতন তালুক কিনিতেও দেখি।' ব্রজেনবাবু এ-ও লিখলেন ঃ 'রায়-পরিবারের এই ভাগ্যবিপর্যয় হইতে একমাত্র রামমোহনই মুক্ত রহিলেন।'[৮৩] এই সময় রামমোহনের জননী 'তারিণী দেবী বোধ হয় সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একদিন একাকিনী শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে একজন পরিচারিকাও লইলেন না। তথায় অবস্থানকালে তিনি প্রতিদিন জগন্নাথ-মন্দিরে ঝাঁট দিতেন। দুই বৎসর পরে—২১ এপ্রিল ১৮২২ তারিখে ...তারিণী দেবীর মৃত্যু হয়।'[৮৪] এর পরে আর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আদর্শরক্ষার জন্য কখনও কখনও হয়তো পরিবারের প্রিয়জনদের সঙ্গেও ভাবসঙ্ঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু নিজে সক্ষম গৃহী হয়েও পিতা এবং ভ্রাতার নিদারুণ আর্থিক বিপর্যয় এবং কারাবাসের মতো সামাজিক অবমাননার দিনে সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকার মধ্যে কোন আদর্শেরই পরিচয় মেলে না। তাছাড়া পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রের

৮৩। সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, প্রথম খণ্ড, 'রামমোহন রায়' শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃঃ ২০

৮৪। তদেব, পৃঃ ৪৩

সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট অবধি মামলা চালিয়ে যাওয়ার মধ্যেও উন্নত মানসিকতার পরিচয় মেলে না। কিংবা কোন আদর্শের প্রয়োজনেই কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে পারিবারিক বিত্তসম্পত্তি নিয়ে বিদেশী ইংরেজ বেনিয়ার বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। 'রায় পরিবারের চরম দুর্দিনে অনেক লেখালেখি, অনেক অনুনয় বিনয়ের পর লিখিত তমসুকে অনেক চড়া হারে সুদের কড়ারে রামমোহন এক হাজার টাকা মাত্র কর্জ দিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন রায়কে'—এ সংবাদও আমরা জানতে পারি ব্রজেনবাবুর 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' প্রথম খণ্ড থেকে।

অথচ এই প্রসঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন-আলেখ্য উন্মোচিত করলে ঠিক এর বিপরীত চিত্রই দেখতে পাই। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণকে বলা যায় স্ত্রী, জননী ও অন্যান্য ভক্তপরিজন-পরিবার নিয়ে ঘর করে গেছেন দক্ষিণেশ্বরের মাতৃমন্দিরে। স্ত্রী সারদাদেবীকে শুধু পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজাই করেননি, তাঁর প্রত্যহজীবনের প্রতিটি পথচর্যায় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সতর্ক স্নেহকোমল দৃষ্টি। সেবাপরিচর্যা করে আসতেন রোজ দুবেলা নহবতখানায় গিয়ে আপন জননী চন্দ্রাদেবীকে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও আপন জননী তাঁর কাছে পরম পূজ্যা, পরম আরাধ্যা। তন্ত্রসাধনার গুরু যোগেশ্বরী ভৈরবী-মায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তির কথাও এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দকেও আমরা দেখি—সন্ন্যাসী হয়েও মাতা ভুবনেশ্বরীর চরণপ্রান্তে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রণত। আর সঙ্ঘজননী সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে যে ঈশ্বরীয় ও আধ্যাত্মিক আর এক সংসার গড়ে উঠেছিল, সেখানে 'নেতা' হয়েও 'সন্তান' নরেন্দ্রনাথের ভূমিকা মাধুর্যে ও মহিমায় অতুলন।*

কবি ঈশ্বর গুপ্তঃ 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক 'মধ্যপন্থী স্বভাবকবি' ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্তের গুরুস্থানীয়; বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-গুরু। কোন্ সক্রিয় উজ্জ্বল ভূমিকা ব্যাপ্ত ছিল এই নবযুগরচনায় তার অবদান-চিহ্ন রয়েছে তাঁর সংবাদপত্র সম্পাদনায় ও বাংলা সাহিত্যকৃতিতে। যদিও নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার পার হয়ে নতুন দিনকে স্বাগত জানাবার মতো মধুসূদনের বলিষ্ঠ ডানা তাঁর ছিল না, তবুও নতুন প্রভাতের একটা অব্যক্ত আবেগ তাঁর কবিচেতনাকে স্পর্শ করেছিল। অন্তত কাব্যের বিষয়বস্তুতে, আঙ্গিকে, উপস্থাপনায় তার সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়ে গেছে। তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে লোক-কবিতা ও গীতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যদিও জীবনে একান্ত রক্ষণশীল ঈশ্বর গুপ্ত দেশের কোন প্রগতি-আন্দোলনেরই সহযোগী হতে পারেননি, বরং ব্যঙ্গবিদ্রূপের কড়া চাবুকে তিনি সমস্ত প্রগতি-আন্দোলনকেই আঘাত করেছেন, তবু মাতৃভাষার প্রতি জাতির প্রেমসঞ্চারের জন্য তাঁর কাব্য-উদ্যোগ শ্লাঘ্য। 'মাতৃভাষা যে মাতৃসম' এবং তার সেবাই যে পরম কৃত্য এই সুসমাচার তিনি তাঁর অনবদ্য কবিতা 'মাতৃভাষা'র মাধ্যমে জাতিকে দিয়ে গেছেনঃ 'মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা, তুমি তার সেবা কর সুখে।' এবং 'স্বদেশের কুকুর'ও যে বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে অনেক আপন

---

* এ-বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থের [সম্পাদনাঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক] স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই মহৎ অনুভবটি প্রকাশ করে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র দিয়ে গেছেন স্বদেশবাসীকে ঃ 'ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে, প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া। কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।'[৮৫] সংবাদপত্রের মাধ্যমে সেইযুগে তিনি মাতৃভাষার প্রসার, সমৃদ্ধি ও দেশপ্রেম জাগরণে ব্রতী হয়েছিলেন—সফলও হয়েছিলেন কিয়দংশে।

এই নবযুগরচনায় আরও বহুজনের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়লেও আমি শুধু এই আন্দোলনের কয়েকজন প্রাণপুরুষের সম্পর্কেই সংক্ষেপে আলোচনা করলাম।

নীল-বিদ্রোহ ঃ আমাদের ইতিহাসে নীলকর-বিদ্রোহ বিশেষ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আমাদের জাতীয় জীবনে যে সংহতি এসেছিল, যে স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমানের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছিল, তার তুলনা বিরল। নীলকরদের এই অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ-আন্দোলন আমাদের নাট্যকারকে প্রেরণা ও উপাদান জুগিয়েছিল প্রথম সার্থক জাতীয় নাটক রচনায়। সেই প্রথম আমাদের যথার্থ লোকজীবন সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করল। দীনবন্ধু মিত্রই সেই মহানাটকের অমর স্রষ্টা। এই নাটকের অভিনয় নিয়েই গড়ে ওঠে আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চ। এই সাধারণ মঞ্চ থেকেই পরবর্তীকালে জাতীয়তা ও স্বদেশ প্রেমের বহ্নিবীজ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশের মৌনমুখর মর্মমূলে। এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেই মধুসূদন তাঁর হাইকোর্টের চাকরি হারান। এই নাটকের প্রকাশক হিসাবেই অর্থদণ্ড হয় রেভারেণ্ড লং সাহেবের। সেই এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ শোধ করে দেন কোর্টের মধ্যেই। নীলকর সাহেবদের দেশব্যাপী অনাচার, অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বজ্রলেখনী ধারণ করেছিলেন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর সুযোগ্য সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এঁদের সকলের সংগ্রাম নেতৃত্বেই ক্রমে জাতীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে নীল-বিদ্রোহ। শেষ পর্যন্ত দেশব্যাপী সেই আন্দোলনের চাপেই বন্ধ হয়ে যায় নীলকরদের অত্যাচার।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অন্য নানাদিক থেকেও এযুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। স্বামীজীর প্রিয় কবি মধুসূদনকে প্রথম আনুষ্ঠানিক জনসংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী সভার মাধ্যমে। কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' তৎকালীন সমাজজীবনের নানা অসঙ্গতি, বিকৃতি, অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণতম একটি শ্লেষাত্মক দলিল হিসাবে বাংলা সাহিত্যে চিহ্নিত হয়ে আছে। আমাদের জাতীয় সংহতি সম্পাদনে এবং জাতীয়তাবোধের অভিসঞ্চারে কালীপ্রসন্নের অপর শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহাভারতের অনুবাদকর্ম।

এদেশের ইতিহাসে পাদরি সাহেবদের সাধারণ ভূমিকা মোটেই সুখস্মৃতিবহ নয়। তবু এঁদের মধ্যে যে কজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম আছেন, রেভারেণ্ড লং তাঁদের অন্যতম। এই রেভারেণ্ড লং সাহেবের প্রয়াসেই তৎকাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য-সাধনার ইতিবৃত্ত পঞ্জীর আকারে প্রথম সংগৃহীত হয়েছিল। সেই পঞ্জীটি আজও

৮৫। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা (প্রকাশ-সন অনুল্লেখিত), পৃঃ ৩৩১

'লং সাহেবের ক্যাটালগ' নামে খ্যাত হয়ে আছে। আর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' সেদিন যে অগ্নি-অক্ষরে রচনা করেছিল সমকালীন জাতীয় জীবনের ইতিহাস, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে চিরকাল এর মহান সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম। আর নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ? বাঙালীর আত্ম-আবিষ্কারের—আত্মজাগরণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে তাঁর কাহিনী।

অন্যান্য সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা ঃ অন্যান্য দেশের মতো ভারতের নবজাগরণেও তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। মাদ্রাজের 'হিন্দু' ১৮৭৮ (প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে দৈনিক), পুণার 'মারাঠা' ও 'কেশরী', বোম্বের 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া', কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকাগুলির নাম এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ারের সম্পাদনায় 'হিন্দু' দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে, ব্রিটিশ সরকার ও খ্রীষ্টান পাদরিদের সমালোচনায় এবং সংগঠনাত্মক নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞেও অগ্রগামীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা হলেও কৃতী ভারতীয়দের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানাতে পশ্চাৎপদ হত না। বালগঙ্গাধর তিলকের 'মারাঠা' ও 'কেশরী' জাতির মনে আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধার আবির্ভাব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। ইংরেজ সরকারের 'divide and rule' নীতি সম্পর্কে 'মারাঠা' ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতিকে সচেতন করিয়ে দেয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান মিরর' শুধু রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারেই নয়, নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক নানা সমস্যা সমাধানেও স্মরণীয় উদ্যোগ দেখিয়েছে। সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন শুধু পত্রিকার মাধ্যমেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও দেশের সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের শরিক ছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক কর্মতৎপরতা তো বহুজনবিদিত। 'মাদ্রাজ মেল', কলকাতার 'স্টেটসম্যান' ও 'ইংলিশম্যান', লাহোরের 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট', এলাহাবাদের 'পাইওনীয়ার' প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তল্পিবাহক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলিও অকারণ আক্রমণ এবং বিদ্বেষ প্রচার করে পরোক্ষভাবে আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল।

শ্রীরামপুর মিশনারী—খ্রীষ্টান পাদরি ও বিদেশীদের দান ঃ খ্রীষ্টান পাদরিদল এদেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ও নকীব হয়ে এলেও এবং সপার্ষদ উইলিয়াম কেরী ও শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বৈতভূমিকা স্মরণ করেও বলা যায়, সদ্যোজাত আমাদের বাংলা গদ্যের পুষ্টিসাধনে ও প্রসারে তাঁদের দান কম নয়। ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা পরিবেশনায়, বাইবেল ও নানা ধর্মগ্রন্থের বাংলা রূপান্তরণে, আরও অসংখ্য অনুবাদকর্মে, অভিধান ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে-প্রকাশনায় নবজাগ্রত জাতির মানসখাদ্য পরিবেশন করে তাঁরা পরোক্ষভাবে জাতির নবজাগৃতির প্রাণযজ্ঞে বহ্নিসঞ্চারণায় সাহায্য করেছিলেন। এই শ্রীরামপুর প্রেস থেকেই চার্লস উইলকিনস এবং পঞ্চানন কর্মকার ছেনি কেটে প্রথম বাংলা ছাপার অক্ষরের হাতিয়ার তুলে দেন বাঙালীর হাতে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজও ভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থাপিত ও পরিচালিত হলেও, বাংলা গদ্যের পরিচর্যায় এই কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলীর অবদান স্মরণীয়। যদিও পাদরি নন, তবু এই প্রসঙ্গে

আর একজন সাহেবসন্তান, স্যার উইলিয়ম জোনস, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে সংস্কৃত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রমাণ করে এবং গ্রীক ও লাতিন ভাষার চেয়েও শ্রীময়ী সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে আমাদের আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা ও আরও নানা সারস্বত কৃত্যের সম্পাদনায় এবং নানা সুন্দর কুশলকর্মে যুক্ত থেকে, বিদেশী হয়েও, তিনি আমাদের নবজাগৃতি-আন্দোলনের একজন অন্তরঙ্গ সহযোগী হয়ে উঠেছিলেন।

জাতীয় কংগ্রেস এবং স্বামীজী ঃ ভারতীয় নবজাগরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ বহু সংস্থা ও সংগঠনও এগিয়ে এসেছিল জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনে। বাংলার 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', বোম্বের 'বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন', 'ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন', পুণার 'সার্বজনিক সভা', 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', মাদ্রাজের 'মহাজন সভা', 'বোম্বে প্রেসিডেন্সী অ্যাসোসিয়েশন'—ইত্যাদি নানান সংগঠন গড়ে উঠেছিল ১৮৫১ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। দেশের প্রাগ্রসর চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে তখন থেকেই একটি সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ার প্রয়োজন ও সঙ্কল্প ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার অ্যালবার্ট হল-এ এক রাজনৈতিক সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম এই সঙ্কল্পকে রূপ দিতে এগিয়ে এলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে বোম্বেতে বসল অল ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল ইউনিয়নের প্রথম সভা। এই সভাটিকে কংগ্রেস বলে অভিহিত করা হল এবং শীঘ্রই এর নাম হল 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'। প্রথম সভাপতি হলেন উমেশচন্দ্র বোনার্জী। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে প্রতি বছরই কংগ্রেসের অধিবেশন হতে থাকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন প্রস্তাব ও আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল সেযুগের কংগ্রেসের ক্রিয়াকাণ্ড। এ-সম্পর্কে পট্টভী সীতারামাইয়ার বক্তব্য স্মরণীয় ঃ 'Congress resolutions and the addresses delivered by Congress Presidents... [were] that the English people are essentially just and fair, and that if properly informed they would never deviate from truth and the right, Congress was essentially loyal to the British throne....'[৮৬]

লক্ষণীয় বিষয়, ব্রিটিশরাজ সম্পর্কে কংগ্রেসের ঠিক বিপরীত মত ও মনোভাব পোষণ করতেন স্বামীজী। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সম্পর্কে স্বামীজীর মন্তব্য ঃ রাজনীতির নামে চোরের দল জনগণের রক্ত চুষে খাচ্ছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ 'ত্রাসের রাজত্ব', 'সাজানো তামাসা'। ইংরেজ-রাজত্ব সম্পর্কে কংগ্রেসী মতের পাশাপাশি স্বামীজীর মন্তব্য ঃ বণিকের রাজত্বে গরীবের ভিক্ষাপাত্রের কোনও দাম নেই। আর, অশ্বিনীকুমার দত্ত যখন স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন, 'কংগ্রেসের কাজকর্মে কি আপনার কোন আস্থা নেই?' স্বামীজী তার উত্তরে বলেন ঃ 'না, তা নেই। তবে "নেই মামার

৮৬। The History of the Indian National Congress, Part-I, 1946, p. 60

চেয়ে কানা মামা ভাল"। ঘুমন্ত জাতিকে সর্বদিক দিয়ে ঠেলে জাগাবার চেষ্টা করা ভাল। কিন্তু বলতে পারেন, কংগ্রেস জনসাধারণের জন্য কি করেছে? আপনি কি মনে করেন, কয়েকটা প্রস্তাব পাস করলেই স্বাধীনতা এসে যাবে? তাতে আমার বিশ্বাস নেই। প্রথম জাগাতে হবে জনসাধারণকে।'[৮৭]

উমেশচন্দ্র বোনার্জী, রমেশচন্দ্র দত্ত, পি. আনন্দ চার্লু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এন. জি. চন্দ্রভারকর, বিপিনচন্দ্র পাল, তিলক, হেনরী কটন, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, গোখেল, বীর রাঘবচারী, এস. আর. পান্টুলু প্রভৃতি থেকে শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী, গান্ধীজী পর্যন্ত অনেক কংগ্রেসী নেতার উপরই স্বামীজীর প্রভাব পড়েছিল। এবং অনেকেই ছিলেন স্বামীজীর একান্ত অনুরাগী। ফলত পরবর্তীকালের বিভিন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের বক্তৃতা ও কর্মধারায় স্বামীজীর গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুধ্যান লক্ষ্য করা যায়। স্বামীজীর আমেরিকা-বিজয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই কংগ্রেসের মধ্যেও ফিরে আসে আত্মশ্রদ্ধা, স্বাজাত্যাভিমান, ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পুণা অধিবেশনে সভাপতি সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অমরাবতী অধিবেশনে সভাপতি শঙ্করণ নায়ারের বক্তৃতায় এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতি আনন্দমোহন বসুর ভাষণে স্বামীজীর আত্মবিশ্বাস, জীবনাদর্শ ও কর্মপন্থারই একান্ত অনুসরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের পর তৎকালীন কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের তোষণনীতির সমালোচনা করে স্বামীজীর অনুরাগী মহামান্য তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় লিখলেন (১২.১.১৮৯৬) যে, গত বারো বছর ধরে কংগ্রেসীরা বৃথা চিৎকার করে গেছেন যা ব্রিটিশ সরকারের কাছে মশকের ভনভনানি ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি; এখন এমন পন্থা গ্রহণ করার সময় এসেছে যাতে আমরা সরকারকে আমাদের প্রতিবাদ শুনতে বাধ্য করতে পারি। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর লোকান্তরগমন এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতি লালমোহন ঘোষের কণ্ঠে আমরা তো প্রায় স্বামীজীর ঘোষণাই শুনতে পেলাম: 'Let us remember that we can never hope to realize our aspiration unless the Congress is fully sensible towards the masses of our people, and shape its policy as to bring them in line with us.'[৮৮] আর ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে স্বামীজীর শক্তিসাধনার আহ্বান নেতা এবং জনতাকে যে সমানভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তা সর্বজনবিদিত। এই আন্দোলনে প্রথম বিলেতি পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন যে নরেন্দ্রনাথ সেন (ইণ্ডিয়ান মিরর-এর সম্পাদক), তিনি ছিলেন স্বামীজীর একান্ত অনুরাগী, শিষ্যপ্রতিম।

১৮৮৫-১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের আঠেরোটি অধিবেশনের বারো জন ভারতীয় সভাপতির মধ্যে ছয় জনের সঙ্গে স্বামীজীর ছিল প্রত্যক্ষ পরিচয়। এছাড়া আরও বহু

৮৭। The Life of Swami Vivekananda, Vol. II—His Eastern and Western Disciples, Advaita Ashrama, Calcutta, Fifth Edition (1981), p. 354

৮৮। Sixty years of Congress—Satyapal and Prabodh Chandra, Lahore, 1946, p. 153

কংগ্রেসের নেতার সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। স্বামীজী ভারতের সার্বিক উন্নতির জন্য কৃষি, শিল্পোদ্যোগ এবং জনসাধারণকে কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষিত করার দিকে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এন. জি. চন্দ্রভারকরের সভাপতিত্বে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে অধিবেশনে প্রথম এই শিল্পোদ্যোগ ও কৃষিব্যাঙ্ক প্রসঙ্গ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়। এই এন. জি. চন্দ্রভারকরই স্বামীজীকে 'ভারতীয় নবজাগরণের নায়ক' বলে অভিহিত করেছিলেন। জাতির ঐহিক উন্নতির প্রয়োজনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বামীজী যে শিল্পমেলার কথা বার বার বলে গেছেন, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা অধিবেশন থেকে জাতীয় কংগ্রেসও সেই শিল্পমেলার অনুষ্ঠান শুরু করে। দেখা যাচ্ছে, জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি-অপূর্ণতার কথা স্বামীজী উল্লেখ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা থেকে মুক্ত হয়ে এবং জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জনতার সমস্যা সমাধানের সঙ্কল্প নিয়ে এই সংগঠন সত্যিকারের সংগ্রামী গণপ্রতিষ্ঠানে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছিল।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বহুকাল 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সম্পাদক এবং গ্রন্থাগারিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার ও গবেষণার প্রথম পথপ্রদর্শক। স্বদেশ ও স্বজাতির মহিমা ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের পটভূমিকায় প্রমাণ ও প্রচারেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনেও ছিল তাঁর অগ্রণীর ভূমিকা। 'তত্ত্ববোধিনী', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'সারস্বত সমাজ'-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি এবং কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে 'অভ্যর্থনা সমিতি'র সভাপতি ছিলেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'র সম্পাদনা তাঁর অনন্য সাহিত্য কীর্তি, তাঁর অপূর্ব পাণ্ডিত্য এবং মনস্বিতার পরিচয়।

শিক্ষাবিদ্, খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক, প্রথম কোষগ্রন্থকার ও ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম নেতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যায় পারঙ্গম রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন পরধর্মপ্রচার ছাড়াও দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই একজন উৎসাহী দেশকর্মী ছিলেন। ডিরোজিওর ছাত্র না হয়েও প্রখ্যাত ডিরোজিয়ান কৃষ্ণমোহন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভ্য হিসাবে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নানা বিষয়ে তাঁর নিজস্ব নির্ভীক মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। পরধর্ম গ্রহণ করেও দেশের কল্যাণ চিন্তায় দৃঢ়চরিত্র কৃষ্ণমোহন বরাবরই সমস্ত প্রগতি-আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন। 'দি এনকোয়ারার', 'সংবাদ সুধাংশু' প্রভৃতি সাময়িকপত্র-সম্পাদনা তাঁর উল্লেখযোগ্য সারস্বত কর্ম। তেরো খণ্ডে প্রকাশিত বাংলায় প্রথম কোষগ্রন্থ 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনন্য সংযোজন।

নব্য হিন্দুধর্ম ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকের পর থেকে ব্রাহ্মযুগের পতন শুরু হয় এবং নব্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা হয়। নব্য হিন্দুধর্মের সনাতন সংস্কৃতির মহান প্রবক্তা ও আধুনিক ভাষ্যকার হিসাবে এই সময়ে আবির্ভূত হলেন ঃ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি একালের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কগণ।

এরই অত্যল্পকাল পরে শুরু হল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাবের যুগ। ১৮৮০-১৯০৪—এই সময়কে ঐতিহাসিক কর্তৃক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত সঙ্ঘটিত দেশের সমস্ত বিভিন্নমুখী আন্দোলন, বিদ্রোহ ও সমর্পণকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দই নতুন যুগপ্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বিত করে নতুন এক ভাবধারা প্রচার করলেন, যার মধ্যে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র, ইহ ও পরজীবন এক অমল ঐকতানে মিলেমিশে গেল—যে জীবনদর্শনে একই সঙ্গে ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্র এবং বিশ্বজগতের সমস্ত সমস্যার এক আধুনিক সমাধান সম্ভব হল।

এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর রচনায়ঃ 'জাতীয় চাঞ্চল্যের শতাব্দীব্যাপী বহুবিধ স্রোতধারা কখন মিলিত হইয়া, কখন বিচ্ছিন্ন হইয়া, কখন এক পথে, কখন বিপরীত পথে, কখন একটানা স্রোতে, কখন ঘুরিতে ঘুরিতে, একদিন শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে, স্বামী বিবেকানন্দে আসিয়া জমিয়া ভরিয়া উঠিয়াছে। ...শত বৎসরের জাতীয় চাঞ্চল্য, যাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, তাহা শতাব্দীর শেষভাগে নানা দিক ও কেন্দ্র হইতে আহৃত ও সংহত হইয়া বাণী লাভ করিয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে। স্বামী বিবেকানন্দ একটা জাতির দীর্ঘ এক বিচিত্র বিক্ষিপ্ত শতাব্দীর যোগফল।'[৮৯]

নবজাগরণের পূর্ণ পরিণাম ও স্বামী বিবেকানন্দঃ নবজাগরণ সম্পর্কে এতক্ষণ যে আলোচনা করা গেল, তাতে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান—বিগত শতকের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্ঘাত সঙ্ঘর্ষ ও সমন্বয়ে উদ্ভূত যে ভাববিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল, তার প্রভাব জাতীয় জীবনের সর্বত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু বিগত শতকের আট দশক কাল পর্যন্ত প্রসারিত সময়ের এই যুগসন্ধিক্ষণে দেশের নেতাদের মধ্যে যেন কোন ঐক্যের বন্ধন ছিল না। সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, ধর্মান্দোলন সবই হয়েছে; কিন্তু জাতির পরাজয় এবং অধঃপতনের মৌল কারণটি ঠিক ঠিক কেউ যেন সন্ধান করতে পারছিলেন না। ব্যক্তিগত এবং দল হিসাবে, সংস্থা বা সমিতির মাধ্যমে অনেকেই অনেক কর্মপ্রয়াসে যুক্ত হয়েছিলেন নবজীবন রচনার সংগ্রামে; কিন্তু সমস্ত কর্মপ্রয়াস মিলেমিশে একটি ঐকতান হয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের নবজাগরণের এযাবৎ সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্মপ্রয়াসকে একটি পূর্ণ পরিণামের দিকে নিয়ে যেতে একজন দক্ষ নির্ভীক সেনাপতির প্রয়োজন ছিল। স্বামীজী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সেই যুগসন্ধিক্ষণে দুর্জয় মহান সেনাপতি। দেহ-মন-আত্মার বিকশিত পূর্ণতায় স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব এতই অনন্য ছিল, এমনকি শরীরী প্রতিভায়ও, দেখলেই তাঁকে সম্রাটের মতো মনে হত। রোমাঁ রোলাঁ তাই বলেছেনঃ '...his pre-eminent characteristic was kingliness. He was a born king and nobody ever came near him...without paying homage to his majesty.'[৯০]

বীর্যবান মানসিকতায় এবং উদাত্ত কর্মের ব্যাপ্তিতে তিনি ছিলেন একাধারে রাজা ও

৮৯। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী, পৃঃ ৯-১০

৯০। The Life of Vivekananda and the Universal Gospel, p. 5

ঋষি। প্রাচীন ভারতের রাজর্ষি ও Plato-র Philosopher King—এই দুইয়ের পরিপূর্ণ রূপায়ণ এবং সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল স্বামীজীর জীবনে ও চরিত্রে। পরাধীন ভারতের তিনি ছিলেন মুকুটহীন রাজা, রাজার রাজা এবং ভারতজনতার 'friend, philosopher and guide'। তাই তিনি বহুধা বিচিত্র জাতীয় আন্দোলনের, প্রতি-আন্দোলনের সমস্ত ধারাকে সমন্বিত করে, একটি যুগোপযোগী দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে সেই সংহত শক্তিকে প্রয়োজিত করেছিলেন সর্বাত্মক মানবকল্যাণে এবং একটি বিশেষ ভূখণ্ডের মানুষের সর্ববন্ধনমুক্তির প্রয়াসে। স্বামীজীর এই মহাসাধনা প্রত্যক্ষ করেই রোমাঁ রোলাঁ লিখলেন ঃ 'The world finds itself face to face with an awakening India.... And the magic watchword was unity.... Unity within the vast ocean of all religious thought and all rivers past and present, Western and Eastern. For—and herein lies the difference between the awakening of Ramakrishna and Vivekananda and that of Rammohun Roy and the Brahmo Samaj—in these days India refuses allegiance to the imperious civilization of the West, she defends her own ideas, she has stepped into her age-long heritage with the firm intention not to sacrifice any part of it, but to allow the rest of the world to profit by it, and to receive in return the intellectual conquests of the West.'[৯১]

শুধু ভারতবর্ষে নয়, বস্তুতপক্ষে জীবন ও জগৎ এবং পরাজগৎ সম্পর্কেও এই সর্বাত্মক সমন্বয়বাদই বিশ্বের কাছে স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ সুসমাচার। একালের মহান দার্শনিক তাই স্বামীজী সম্পর্কে বললেন ঃ '...a great advocate of equilibrium between warring forces of life ; reason and faith, matter and spirit, individual and society, science and religion, the past and the present, the East and the West, and last but not least, haves and have-nots.'[৯২]

স্বামীজীর কাছে আমরা যা পেয়েছি তা হল স্বদেশ তথা বিশ্বমানবের সর্বাত্মক উন্নয়নের পরিকল্পনা। সে পরিকল্পনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা দুই-ই অসাধারণ। জাতির প্রতিটি প্রয়োজনের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে আবার সঙ্গে সঙ্গে মহত্তম মানবিক আদর্শ অবিস্মৃত থেকে তিনি পরাধীন ভারতে প্রথম রচনা করেছিলেন একাধারে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ম্যাগনাকার্টা—আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিশ্বমানবের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান মুক্তিসনদ। সে সনদে কি আছে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

জীবন ও জগৎ অভিমুখী অভিসার ঃ এ কেমন সন্ন্যাসী, স্ত্রীকে ত্যাগ করেননি, মাকে ত্যাগ করেননি ; প্রায় একই সঙ্গে একই পরিধির মধ্যে বসবাস করেন! এ কেমন

৯১। ibid., pp. 287-88

৯২। The Philosophy of Vivekananda and the Future of Man—Govinda Chandra Dev, Ramakrishna Mission, Dacca, First Edition (1963), p. 105

ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মদর্শন করে, ব্রহ্মভূত অবস্থায় উপনীত হয়েও মানুষের সেবাকে 'মুক্তিসন্ধানের তুল্যই, অথবা তাহারও অধিক মূল্যবান মনে করেন!' মনে করেন যে, '...সে-ই যথার্থ মুক্তি ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে—যে জগৎকে তুচ্ছজ্ঞান করে না।' সন্ন্যাসীর মুখে এ কি আশ্চর্য কথা? এমন অপূর্ব কথা তো এর আগে কেউ শোনেনি। এ কেমন গুরু, নির্বিকল্প সমাধির মাধ্যমে ব্রহ্মে লীন হতে আকাঙ্ক্ষিত শিষ্যকে ভর্ৎসনা ও ব্যঙ্গ করে বলে ওঠেনঃ 'এই বুঝি তোমার পৌরুষ, এই বুঝি তোমার আত্মগৌরব—এই বুঝি বীরত্ব! তুমি জগতের আর সকলকে ফেলিয়া নিজের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছ!'[৯৩] বলেনঃ 'তোর মন এত ছোট যে, তুই জগতের ভাবনা না ভাবিয়া নিজের মুক্তির জন্যই এমন অস্থির!'[৯৪] এই আশ্চর্য গুরুর আশ্চর্য শিষ্যই স্বামী বিবেকানন্দ। ইহ-পর, লৌকিক-আধ্যাত্মিক এই দুই নিয়েই সমগ্র জীবন। এবং এই সমগ্র জীবনের পূর্ণায়তির—নব জীবনবাদই বাংলার নবজাগরণের অত্যাশ্চর্য ঘোষণা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনবদ্য ভাষায় বললেনঃ 'বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না। তা হলে যে ওজনে কম পড়বে।'[৯৫] এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই বিবেকানন্দের কণ্ঠে উৎসারিত হল নতুন যুগের প্রাণবার্তাঃ 'নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান—একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ! এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।'[৯৬] স্বদেশ ও স্বজাতির দিকে চেয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে বলে উঠলেনঃ 'যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।'[৯৭] বললেনঃ 'তুমি যদি নিজের মুক্তি খোঁজ, তবে তুমি নরকে যাইবে। তোমাকে খুঁজিতে হইবে অপরের মুক্তি।... যদি অপরের জন্য কাজ করিয়া তোমাকে নরকে যাইতে হয়, তবে নিজের মুক্তি খুঁজিয়া স্বর্গে যাইবার অপেক্ষা তাহার মূল্য অনেক বেশী।'[৯৮] এই হল নবযুগের রূপকার স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ রূপ। বাস্তব জীবনের দুঃখব্যথা দারিদ্র মায়ামাত্র নয়। পরন্তু সমস্ত মানুষ, সমস্ত প্রাণ সেই বিশ্বময়ীরই রূপ। সেরূপেই তাঁকে সেবা কর। পূজা কর। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তিই শেষতম কৃত্য হলেও আগে মানুষকে মানুষের মতো খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হবে। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এবং একাজ শুরু হবে গৃহাঙ্গন থেকে। এবং সেভাবেই তাঁর পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞের উদ্বোধন এবং ধাপে ধাপে সর্বাত্মক মুক্তির পথে তাঁর পদক্ষেপ।

৯৩। বাংলার নবযুগ, পৃঃ ১৫১ ৯৪। তদেব, পৃঃ ১৪৮-৪৯

৯৫। কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৭৯-৮০ ৯৬। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৪১২

৯৭। তদেব, পৃঃ ২৭ ৯৮। The Life of Swami Vivekananda, Vol. II, p. 426

নবজাগরণের সংজ্ঞা ঃ রেনেসাঁ সম্পর্কে মস্ত মস্ত পণ্ডিতদের তাবড় তাবড় কেতাব থেকে দুরূহ নিদারুণ সব উদ্ধৃতি না দিয়ে রেনেসাঁর যথার্থ অর্থোদ্ধারে স্বামীজী-কথিত (যা তিনি শুনেছেন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে) বহু প্রচলিত গল্পটির পুনরুক্তি করছি ঃ আসন্নপ্রসবা এক সিংহী শিকারের লোভে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এক ভেড়ার পালে এবং সেখানেই তার ভূমিষ্ঠ হল একটি শাবক। রাখালদের সমবেত আক্রমণে নিহত হল সেই সিংহী। এদিকে ছোট সিংহের বাচ্চা ভেড়ার পালের সঙ্গেই বড় হয়ে উঠতে লাগল। ভেড়ার পালের সঙ্গে থেকে ভেড়ার আচার-আচরণ সে শিখল। ভেড়ার মতোই ঘাসপাতা খায়, এমনকি তাদের মতো ভ্যা ভ্যা করে ডাকে। কিছুদিন পরে আবার এক রক্তলোলুপ সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ভেড়ার পালে শিকারের প্রত্যাশায়। সিংহের গর্জনে ভেড়ার পালের সঙ্গে শিশু সিংহও লেজ গুটিয়ে পালাতে গেল। আক্রমণকারী সিংহ ভেড়ার পালে নিজেদের জাতভাইকে দেখে আশ্চর্য হল। ঘাড় ধরে তাকে টেনে নিয়ে এল জলাশয়ের কাছে। সে তখন বড় সিংহের থাবার নীচে ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। বড় সিংহ বলল ঃ 'দ্যাখ, ভালো করে নিজের মুখ চেয়ে দ্যাখ দেখি! কে তুই জানিস? চিনতে পারছিস নিজেকে? আমিও যা তুইও তা। ডাক দেখি।' বড় সিংহ গর্জন করল। জলাশয়ে আত্মমুখ দেখে ভেড়ার পালের সিংহেরও আত্মবিশ্বাস ফিরে এল মনে। চিনল নিজেকে। সেও গর্জন করে উঠল। বড় সিংহ অর্ধমৃত শিকার ফেলে দিল তার মুখের কাছে। নে, খা। ছোট সিংহ প্রথম রক্তস্বাদ গ্রহণ করল। এবং বীরবিক্রমে শিকার মুখে বড় সিংহের সঙ্গে ঊর্ধ্বে লাঙুল তুলে উদ্দাম অরণ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। স্বামীজী তাই বলেছেন ঃ 'Sinners ? It is a sin to call a man so ; it is a standing libel on human nature. Come up O lions, and shake off the delusion that you are sheep.' অবক্ষয়ের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত আত্মসম্ভ্রমহীন দুর্বল জাতিকে তার হারানো আত্মমুখ দেখানোর সাধনাই ছিল বিবেকানন্দের। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের বিরাট অংশ জুড়েই তাই আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধনী সঙ্গীত। আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই ক্লীবতা ও দুর্বলতা থেকে মুক্তির জন্য তিনি অর্ধমৃত জাতির শিয়রে শিবমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। বললেন ঃ 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ, পরলোকেও তা-ই।'[৯৯] বললেন ঃ 'ক্লৈব্য পরিত্যাগ কর, হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। অভীঃ অভীঃ অভীঃ। ভগবানকে বিশ্বাস করিবার আগে নিজেকে বিশ্বাস কর।' বললেন ঃ 'সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে নিজেকে দুর্বল ভাবা।' সমগ্রভাবে জাতির উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 'কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা বিস্ময়কর কার্য করিবে। যে মুহূর্তে তোমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমরা শক্তিহীন।...ভয়ই সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার ; নির্ভীক হইলে মুহূর্ত মধ্যেই স্বর্গ আমাদের করতলগত হয়।'[১০০] বললেন ঃ '...কেবল

৯৯। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৩-৫৪
১০০। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২১৮

বিশ্বাসী হও।...বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি।...পশ্চাতে চাহিও না।...এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে।'[১০১]

শিকাগো ধর্মসভা ও স্বামীজীর বিশ্ববিজয়ঃ শুধু বক্তৃতায় আর রচনায় নয়, নিজের জীবনে আত্মবিশ্বাসের বিশ্ববিজয়িনী শক্তিকে প্রমাণ করে দেখালেন। নিঃসহায় নিঃসম্বল একজন সন্ন্যাসী হয়ে (এবং পূর্বাশ্রমে কলকাতার এক সহায়-সম্বলহীন বি. এ. পাস বেকার যুবক নরেন দত্ত) শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসের জোরে বিশ্বজয় করে ফিরে এলেন। পরাধীন ভারতের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে, 'The Cyclonic Hindoo of India' বিশ্বধর্মমহাসভায় যে জগৎ-জয় করলেন তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সমগ্র জাতির হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে পড়ল। এই একটি মাত্র কর্মসাফল্যে তিনি জাতির হৃদয়ে বিলুপ্ত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪-এর সম্পাদকীয়তে লিখলেন: 'He has done much more to elevate our nation in the estimation of people of the West than what has hitherto been done by our political leaders put together.' এবং অনেকের মতে স্বামীজীর আমেরিকা জয়ের ঘটনা থেকেই প্রথম স্বাধীনতাসংগ্রামের বীজ উপ্ত হয় জাতির মানসচৈতন্যে। নিবেদিতাও বললেনঃ 'ভারতবর্ষের নিজের দিক দিয়া এই ক্ষুদ্র ভাষণটি (শিকাগোয় প্রদত্ত) ছিল স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার এক সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্র।'[১০২] প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী জাতি হিসাবে আমাদের 'অস্তি'কে, আমরা যে বেঁচে আছি এই সত্যকে সেই প্রথম বিশ্বের দরবারে বিশ্বের মানুষের কাছে প্রমাণ করে দেখালেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পৌরুষের মধ্যেই ব্যক্তি ও জাতি হিসাবে বেঁচে থাকবার একমাত্র সঞ্জীবনী। তাই হীনম্মন্যতা, তামসিকতা ও জড়তায় আচ্ছন্ন জাতির উত্থানের জন্য রজোগুণকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। বলেছিলেনঃ 'যতদিন যাচ্ছে, তত আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পৌরুষই জীবনের সার বস্তু। এই আমার নতুন বার্তা।'[১০৩]

আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধনঃ আত্মবিশ্বাসে জেগে উঠলেই জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে জাতীয় আদর্শের সত্য স্বরূপটি। কি ছিলাম—কি হয়েছি—কি আমাদের হতে হবে—এ-সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি রেখাচিত্র স্বামীজী তুলে ধরলেন চোখের সামনে। ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে হলে বর্তমানকে জানতে হবে। ঐতিহ্যের প্রতি হতে হবে শ্রদ্ধাশীল। তবে শ্রদ্ধাশীলতা মানে অতীতের গৌরব নিয়ে ব্যর্থ কর্মহীন আস্ফালন অহঙ্কার নয়, তা-ও স্বামীজী স্পষ্ট করে বললেনঃ 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান...চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।...ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে,...সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে।'[১০৪] পশ্চিম থেকে অমৃত আসছে, গরলও আসছে।

১০১। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭ ১০২। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৩৮০
১০৩। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ১৪১ ১০৪। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১-৪

আত্মশ্লাঘা ও আত্মবিশ্বাস যে এক জিনিস নয়—এ-সম্পর্কেও সচেতন করে দিলেন স্বামীজী। আত্মশ্লাঘা তার নিজের ভিতরেই বহন করে ধ্বংসের বীজ। তাই ব্যঙ্গের ও বিদ্রূপের কণ্ঠে 'আর্যবাবাগণের জাঁক' করতে, প্রাচীন ভারতের গৌরব নিয়ে 'ডম্‌ম্‌ বলে ডম্‌ফই করতে' নিষেধ করলেন। কারণ 'স্বধর্মে তীব্র অনুরাগবশে যদি কেউ পরধর্মকে বা ভিন্ন সম্প্রদায়কে হেয়জ্ঞান করে, কিংবা অপরের ধর্মকে নিন্দা করে স্বধর্মের গুণগানকল্পে, তবে সে প্রকৃতপক্ষে স্বধর্মেরই সমূহ ক্ষতি সাধন করে থাকে।'

নতুন দিগ্বিজয়—উজ্জ্বল আশাবাদ ঃ ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বামীজী সুনিশ্চিত। তিনি শুনতে পেয়েছেন নবযুগের দৃপ্ত পদধ্বনি। বার বার বলেছেন সত্যযুগ এসে গেছে। আর ভয় নেই। ভারতবর্ষ আবার দিগ্বিজয় করে ঘরে ফিরবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ দিগ্বিজয়ের যথার্থ অর্থ কি তা-ও বললেন। বললেন ঃ মানুষের রক্তপাতে, অস্ত্রের ঝনৎকারে, পশুশক্তির আন্দোলনে এ দিগ্বিজয় নয়। কারণ ভারত-ইতিহাসে পররাজ্যলোলুপতার এরকম কোন অধ্যায় নেই যেখানে একজন রাজা-সেনাপতিও অস্ত্রের সাহায্যে বেরিয়েছিলেন পররাজ্য গ্রাস করে নিতে। ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি, এবং সর্বমানুষের কল্যাণসাধনাই তার দিগ্বিজয়ের একক হাতিয়ার। অতীতের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হবে, তবে এবারে শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূখণ্ড, চীন জাপান মাত্র নয়, ভারত বের হবে সমগ্র বিশ্ববিজয়ে। বললেন ঃ 'ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে ; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ-সহায়ে।'[১০৫]

স্বামীজীর সমন্বয়ী কর্মযোগ ঃ স্বামীজী যে বিশ্বের কাছে ভারতের যথার্থ রূপচিত্রটি তুলে ধরলেন, তা-ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। অতীতের মহাভারত হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানের মিলিত ভারতবর্ষ। এবং ভবিষ্যতে যে মহাভারত গড়ে উঠবে তার দায়দায়িত্বও হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকলের। সকলকে নিয়েই আমরা। ভারতবর্ষ বলতে বিশেষ একটি উদার সার্বভৌম শুদ্ধ মানবিক উত্তরাধিকার বোঝায়। সেই উত্তরাধিকার যিনি অর্জন করেছেন তাঁকেই ভারতবাসী বলতে পারি। রেনেসাঁর মানবধর্মের সঙ্গে, বলা বাহুল্য, সাম্প্রদায়িকতার শাশ্বত বিরোধ। বস্তুত এই সমন্বয়ী মানবধর্মই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত যুগধর্মের সার্থকতম বার্তা। তা না হলে স্বামীজী তত্ত্বের দিক থেকে যা বলেছেন তা নতুন নয়। নতুন যা, তা হল যুগের উপযোগী করে তার ভাষ্যরচনা এবং প্রত্যহ-জীবনচর্যায় তার প্রযুক্তি ; ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে মনুষ্যধর্মের সর্বাত্মক উদ্বোধনের প্রয়োজনেই তার অনিবার্য বিশ্বময় সম্প্রয়োগ। নিবেদিতা তাই বললেন ঃ 'তিনি যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হইয়াছেন, তাহা নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতেরও। বহু এবং এক—যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি—সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা ; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র

১০৫। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫

জীবনই ধর্মকার্য হইয়া যায়। যোগ ও ক্ষেম—ত্যাগ ও বর্জনের মতোই দায়স্বরূপ।'[১০৬] ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর এই অভিমতের প্রতিধ্বনি আমরা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও শুনতে পাইঃ 'প্রাচ্যসভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র; তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন পলিটিক্স সমস্তই আছে।'[১০৭] আমাদের দেশের ধর্ম শব্দের কোন প্রতিশব্দ ইউরোপীয় ভাষায় নেই। শুধু ভারতবর্ষের কাছেই নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত নতুন যুগের এই হল আধুনিকতম সুসমাচারঃ জীবনই ধর্ম। ভারতবাসীর কাছে এর সঙ্গে যোগ করে দিলেন উপরোক্ত বাণীখণ্ডেরই অন্য রূপান্তরঃ ধর্মই জীবন। এই জীবন ও ধর্মের সমন্বিত ঐকতানই ভারতবাসীকে স্বামীজী নতুন করে শোনালেন। এই কারণেই বাস্তব জীবনেও শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-চারুকলা-চিত্রবিদ্যা প্রসঙ্গেও স্বামীজীর উৎসাহের শেষ ছিল না। কারণ এ সবই যে সর্বাত্মক হয়ে ওঠার সাধনার অন্তর্গত। শিক্ষাদীক্ষা সঙ্গীত শিল্প ভাস্কর্য চারুকলা সবকিছুতেই উৎকর্ষ লাভ করবে নবজাগরণোত্তর ভারতবর্ষ এ বিশ্বাস স্বামীজী পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেনঃ 'জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।'[১০৮]

বস্তুত সবকিছু গ্রহণ করেই ভারতসভ্যতার পরিপূর্ণ অখণ্ডতা। সবকে নিয়েই সর্বেশ্বর। জীবনের বিচিত্র রূপে রূপে সেই একেরই প্রকাশ। একেরই উপাসনা। নিবেদিতা বলছেনঃ 'এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান প্রচারক-এ পরিণত করিয়াছে, তবে এই কর্ম—জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, পরন্তু উহাদের প্রকাশক। তাঁহার নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটিয়া ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই, তাঁহার নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নাই। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার সকল বাণীই এই মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্য বলিয়া বোধ হয়। এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "চারুকলা বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়।" '[১০৯] তবে জীবনে ঐ সমন্বয়দৃষ্টিকে কাজে লাগাতে মূলত কর্মযোগ ও সেবাধর্মের মিলিত পরিকল্পনা পেশ করলেন স্বামীজী বর্তমান ভারতের কাছে। জনসেবা তো ঈশ্বর-আরাধনারই ব্যবহারিক প্রকাশ, কর্মে পরিণত বেদান্তের একালীন জীবনভাষ্যও বটে। তবে স্বামীজী কর্মের উপরই বেশী জোর দিয়েছেন। তমোগুণাশ্রয়ী জড়ত্বের অন্ধকারে নিমজ্জিতদের জন্য কর্মযোগই যথার্থ মুক্তির পথ; ইহজীবনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার একমাত্র উপায়। তাই স্বামীজী বললেনঃ 'আলস্য সর্বপ্রকারে ত্যাগ করিতে হইবে। ক্রিয়াশীলতা অর্থে সর্বদাই "প্রতিরোধ" বুঝাইয়া থাকে। মানসিক ও শারীরিক সর্বপ্রকার অসদ্ভাবের প্রতিরোধ

১০৬। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৵

১০৭। রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পৃঃ ১০৯২

১০৮। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৭

১০৯। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৶

কর।'[১১০] নব্যভারতকে ডাক দিয়ে বললেন ঃ 'এস, আমরা কেবল কাজ করিয়া যাই। যে-কোন কর্তব্য আসুক না কেন, তাহা যেন আমরা সাগ্রহে করিয়া যাইতে পারি—সর্বদাই যেন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকিতে পারি। তবে আমরা নিশ্চয় আলোক দেখিতে পাইব।'[১১১] ইউরোপীয় জাত নিরলস শ্রমের বিনিময়েই অর্জন করেছে এত সব ভোগসুখের স্বাচ্ছন্দ্য, ইহজীবনের রূপবিলাস ও আনন্দস্বর্গ। ভারতও যদি এই কর্মকে গ্রহণ করে তবে একই সঙ্গে ইহজগতে সুখসমৃদ্ধি এবং বৃহৎ জীবনকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু কর্মবিমুখ জাতি কি করে এই সর্বাত্মক কর্মপ্রয়াসে যুক্ত হবে? স্বামীজী বললেন ঃ দেশকে ভালবাস, সমাজকে ভালবাস। এই ভালবাসার অর্থ দেশের সব নিয়ম নীতি মেনে চলা নয়, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুবর্তী হওয়াও নয়। দেশের দোষ-ত্রুটি দুর্বলতা-গৌরব-মহত্ত্ব-সম্ভাবনাকে ভাল করে জেনে দেশকে ভালবাসা।

ইহ-পর জীবনের সমন্বয় ঃ স্বামীজী এটা সুনিশ্চিত বুঝেছিলেন যে, বাস্তব জীবনে উৎকর্ষ ছাড়া আধুনিক পৃথিবীতে জাতি হিসাবে ভারতবর্ষের বেঁচে থাকার অন্য কোন উপায় নেই। এবং এই বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই জাতীয় ঐক্যের সন্ধান করেছিলেন, মানুষের মনে ভালবাসার অভিসঞ্চারে যত্নবান হয়েছিলেন তিনি। 'বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান!'—এ কাব্যপ্রার্থনার অনেক আগেই স্বামীজী, শুধু বাঙালী নয়, সমগ্র জাতি হিসাবে ভারতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং এপথে কর্মপ্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন। এই অখণ্ড জাতীয় ঐক্যবোধের প্রয়োজনেই জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অস্পৃশ্যতা বর্জনে তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে তাই ধরা দিয়েছিল ভারতজননীর বিশাল ব্যাপ্ত মহান বিশ্বরূপ। সুখে দুঃখে পতনে উত্থানে ভারতবাসী বলেই তিনি আহ্বান করে গেছেন অন্ত্যজ চণ্ডাল মুচি সকলকেই। এবং শুধুমাত্র ধোঁয়াটে ভাবালুতার উচ্ছ্বাসে হীন অন্ত্যজদের প্রতি তাঁর প্রেম প্রসারিত করেননি, পরন্তু একটি অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং দার্শনিক তত্ত্বের উপরে (Practical Vedanta) তাঁর মানবধর্মকে, সেবাধর্মকে এবং জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলেই তিনি এক নব সাম্যবাদের দীক্ষায় সমগ্র জাতিকে, সমস্ত পৃথিবীকে আকৃষ্ট করেছিলেন। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর দরিদ্রনারায়ণ, হরিজনপ্রীতি, আর্তের সেবা এবং জাতীয় ভিত্তিতে অস্পৃশ্যতা বর্জন-আন্দোলন স্বামীজীর ভাবাদর্শেরই প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলশ্রুতি। 'মহাত্মা গান্ধীর পতিতোদ্ধার-ব্রত ও গণ-উদ্বোধন-নীতির মূলে বিবেকানন্দের সেই বাণীই...প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান...!'[১১২] শুধু গান্ধীজীই নয়, তাঁর এই সেবাসুন্দর মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ হল সারা ভারতবর্ষ। রোমাঁ রোলাঁর ভাষায় ঃ 'The idea seized upon the imagination of India; and relief works for famine, flood, fire, and epidemic, such as were practically unknown thirty years before, Sevashramas and Sevasamitis have multiplied throughout the

---

১১০। তদেব, পৃঃ ৫৬ ১১১। তদেব, পৃঃ ৯৫

১১২। বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৩৯

country.'[১১৩] গান্ধীজীর সর্বোদয়-পরিকল্পনাটাই স্বামীজীর নব সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

নারীশিক্ষা ও নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ঃ এই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনেই স্বামীজীর নারীমুক্তি-আন্দোলন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন সমাজের অর্ধেককে অবহেলায় পিছনে ফেলে কোন জাতীয় উন্নতিই সম্ভব নয়, নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার অর্জন করতেই হবে এবং এজন্য সর্বপ্রথম চাই ব্যাপক নারীশিক্ষার প্রচলন। ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য, ইতিহাস-ভূগোল সবই নারীকে শিখতে হবে। তবে সব শিক্ষাদীক্ষার পরও শেষ পর্যন্ত জাতীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। যেহেতু নারীকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ সমাজ, তাই তাকে আদর্শ জননী হতে হবে। আদর্শ জননী ছাড়া আদর্শ সন্তান সম্ভব নয় এবং এই আদর্শ সন্তানই একদিন হয়ে ওঠে আদর্শ নাগরিক। এই কারণেই তিনি বার বার সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর আদর্শ তুলে ধরেছেন নারীজাতির চোখের সামনে।

নারীশিক্ষা, নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আমাদের আত্মমর্যাদার সংগ্রাম, জাতিভেদপ্রথার বিলোপসাধন, সমাজসংস্কারের অন্যান্য সমস্ত কর্মপ্রয়াস, এমনকি তাঁর সেবাপ্রকল্প ও আত্মবিশ্বাসের ঘোষণা ঃ সবকিছুর পিছনে একটিই উদ্দেশ্য ছিল—ভারতে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। এই man-making mission, মানুষ গড়ার দায়িত্বের কথা স্বামীজী বার বার বলেছেন। 'মানুষ তৈরীই আমার ধর্ম।' 'আর সেই মানুষ তৈরীর কাজ করেছেন দিনের পর দিন, অব্যাহত পরিশ্রমে—গুরুরূপে, পিতারূপে, শিক্ষকরূপে—যখন যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে।'[১১৪] যেহেতু বিকশিত ব্যক্তিত্বই সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্বের সর্বাঙ্গীণ স্থিতিবিধায়ক হয়ে উঠতে পারে, সেইহেতু সমস্ত কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনই তাঁর কাম্য ছিল। ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন কাম্য ছিল বলেই সকলের প্রসঙ্গে সমস্ত বিষয়েই—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকলকে স্বাবলম্বী করার নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। নারীসমাজ সম্পর্কেও তাই তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে, কোন্ জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক। তাহাদের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কথা বলিবার তোমরা পুরুষরা কে ?'[১১৫] সমস্ত মানুষ মূলত এক একথা স্বীকার করেও স্বামীজী প্রত্যেক ব্যক্তির বৈচিত্র, রুচি, সংস্কৃতি ও যোগ্যতানুসারে পৃথক পৃথক পথে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার পথকেই একমাত্র জীবনানুকূল সত্য পথ বলে মনে করতেন। নিজের আদর্শ, মত ও পথ যত সুন্দর ও সার্থকই মনে হোক, অন্যের উপর চাপাতে গেলেই সেখানে দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘাত অনিবার্য। তাই কারও ঘাড়ে কোন কিছু জোর করে চাপিয়ে দেবার স্বৈরনীতি তিনি মেনে নিতে পারতেন না। নিজের দেশ সম্পর্কেও যেমন, অন্য দেশ, অন্য সমাজ প্রসঙ্গেও তাঁর ঐ একই নীতি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমন্বয়বাদ প্রতি ধর্মের, প্রতি সংস্কৃতির, প্রত্যেক জাতির

১১৩। The Life of Vivekananda and the Universal Gospel, pp. 285-86

১১৪। নিবেদিতা লোকমাতা, প্রথম খণ্ড—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ (১৩৭৫), পৃঃ ১৩১

১১৫। বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, পৃঃ ২২১

লণ্ডন অক্টোবর ১৮৯৫

লণ্ডন ডিসেম্বর ১৮৯৬

নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে শ্রদ্ধাশীল। বস্তুত স্বামীজীর এই সমন্বয়চেতনা প্রত্যেক মানুষকে তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করে, নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভালবাসতে শেখায় এবং পরধর্ম ও সংস্কৃতিকে আত্মীয়বোধে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তি ও ভারতের স্বাধীনতা ঃ সর্বমানুষের সাম্যের উপরেই স্বামীজীর জীবন-অভিমুখী নয়া মানবতাবাদ এবং সার্বভৌম ধর্মসাধনার ভিত্তি। প্রতি মানুষের মধ্যেই এক পরম 'অস্তি'র আসন রয়েছে, শুধু তা-ই নয়, সেই একের সঙ্গে আমরা নিত্য যুক্ত। তিনিই আমি। আমিই তিনি। সোঽহং। অহং ব্রহ্মাস্মি। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং বলেই তো আমি নিত্যমুক্ত। বাস্তবেও এই নিত্যমুক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্বামীজী বললেন ঃ 'এই মুক্তির প্রকৃত অর্থ দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সব রকম স্বাধীনতা।' সব রকম শৃঙ্খল মোচন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের আন্দোলন, সামাজিক, অর্থনৈতিক নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে মুক্তি, শিক্ষার সংস্কার ও নতুন প্রয়োগরীতি প্রভৃতি মানুষের যে কোন মুক্তিপ্রয়াস, প্রচেষ্টা ও আন্দোলনকেই স্বামীজী মূলত আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধনারই বিভিন্ন রূপ বলে মনে করতেন। এই ভূখণ্ডের মানুষের বিদেশী শাসনশৃঙ্খল মোচনের সমস্ত আন্দোলনে তাই স্বামীজীর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন।

স্বামীজী দেশের কোন স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেননি একথা সত্য কিন্তু জাতির চেতনায় তিনিই প্রথম তীব্র স্বাজাত্যাভিমান ও স্বদেশপ্রেমের বহ্নি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। মানসপ্রস্তুতি হিসাবে সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন—তার সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর অগ্নিগর্ভ বক্তৃতামালা ও রচনাবলীর পৃষ্ঠায়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বধর্মমহাসম্মেলন। ১৮৯৭-এ দেশে প্রত্যাবর্তন এবং ১৯০২-এর ৪ জুলাই মহাপ্রয়াণ। এর আগের আট বছরের পরিব্রাজক জীবন—তাঁর কর্মযজ্ঞের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে। কারণ ঐ সময়েই দেশের সঙ্গে ঘটে তাঁর নিবিড়তম পরিচয়। একদিকে সর্বরিক্ত ভারতবাসীর প্রত্যহজীবনের ক্ষুধা মৃত্যুর সঙ্গে, দুঃখ ও ব্যর্থতার সঙ্গে পরিচয়, অন্যদিকে আবার এদেশের সাধারণ মানুষেরই যথার্থ শক্তির উৎসের অভিজ্ঞানও লাভ করেন এই একই সময়ে। দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ অসাধারণ সব মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের অন্তরঙ্গ একজন হয়ে তাদের শক্তি ও দুর্বলতা থেকেই এদেশের যথার্থ সত্য পরিচয় লাভ করলেন স্বামীজী। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে, অর্থনীতির ভাষায়, মাত্র একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেই দেশের মানুষকে একটি সুমহৎ ঐক্যের বন্ধনে বেঁধে দিতে পেরেছিলেন। প্রস্তুতিপর্বের যা কিছু কৃত্য সম্পাদন করে দেশ ও জাতিকে একটি মহৎ পূর্ণতা ও ব্যাপ্ত পরিণামের দিকে সুনিপুণ সেনাপতির মতো ডাক দিলেন। এবং সে ডাকে সমগ্র দেশ সাড়া দিল, সকলে সমবেত হল তাঁর গৈরিক পতাকাতলে। ঘনিয়ে এল মহাপ্রয়াণের দিন। কিন্তু তবু কি সব শেষ হয়ে গেল? না। ইতিহাস বলছে, না। 'যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে, নিশ্চয় সে জানি।' তাঁরই আরব্ধ কর্ম সম্পাদন করলেন তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁরই মানসপুত্র নেতাজী। ১৯৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জীবনে আবার ফিরে এল নবযৌবনের ঢেউ।

যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে?—সে অন্য প্রসঙ্গ। এজন্যই ঐতিহাসিক বললেনঃ 'Vivekananda did not die in 1902. He lived till 1946. His ideas, his sadhana flowed in different channels to enrich and vitalize the nation and enabled it to win the first round. With Gandhi and Bose closes the epoch which he had opened. A new chapter has begun. The future will show whether his soul has died or it will reincarnate to spiritualise the nation and to guide it to the conquest of mankind.'[১১৬]

শূদ্ররাজত্ব—সাম্যযুগ ও নয়া সাম্যবাদঃ স্বামীজী স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন যে দেখেছিলেন এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করে আশ্চর্য একটি পরিকল্পনা রচনা করে গিয়েছিলেন তার অভ্রান্ত প্রমাণ রয়েছে তাঁর রচনাবলীর মধ্যেই। ঐতিহাসিক প্রজ্ঞাদৃষ্টির বলেই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এক নতুন যুগের আগমনী সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন ইতিহাসের নিয়মেই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শূদ্রযুগ বা proletariat age আসছে। তিনি স্পষ্ট বললেনঃ 'এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে...শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে...।'[১১৭] তিনি জানতেন ভারতেও এই গণ-অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। একদিন এদেশে ব্রাহ্মণের রাজত্ব ছিল, তারপর এল ক্ষত্রিয়ের রাজত্ব; ক্ষমতার অপব্যবহার করে, মানুষকে অপমান করে তাদের পতন হল। এল বৈশ্যযুগ; নির্মম শোষণ ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের ফলে বৈশ্যযুগেরও শেষ লগ্ন সমাগত। এবারে শূদ্ররাজত্বের অভ্যুত্থান অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু হিংসার পথে অকারণ মানুষের রক্তস্রোত বইয়ে ভারতের মাটিতেও গণবিদ্রোহ ঘটুক তা স্বামীজী চাননি। তাই তিনি উচ্চবর্ণের জাতিগুলিকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন—এইসব মূক মূঢ় অসহায় নির্যাতিতের সঙ্গে সহযোগিতা করতে, তাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে, তাদের সহযাত্রী হতে। তাই তিনি বললেনঃ 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।' বললেনঃ মুচি-মেথর চণ্ডাল দুঃস্থ দুঃখী দরিদ্র ভারতবাসীকে ভাইয়ের মতো ভালবাসতে, তাদের বুকে তুলে নিতে। ইতিহাসের নির্মম নির্দেশে কোথাও পরিত্রাণ মেলেনি প্রেমহীন অত্যাচারীর। কিন্তু স্বামীজীর প্রাণের ভারতবর্ষে সেই একই ইতিহাসের রক্তাক্ত পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য তিনি সকলের মধ্যে সেই 'মানুষের নারায়ণে' শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নমস্কার করে ঘরে তুলে নিতে আবেদন জানালেন। এবং এই শূদ্ররাজত্বের রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজনেই বোধ হয়, প্রত্যহের মৌখিক ভাষাকে, যথার্থ গণবাণীকে, সাহিত্যের স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন স্বামীজী। কথ্যভাষাকে সাহিত্যে সম্প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বামীজী যে শুধু পথিকৃৎ তা-ই নয়, আমাদের বহু ব্যবহৃত প্রত্যহের লৌকিক ভাষার মধ্যে তাঁর মতো এমন শক্তির ও গতির সঞ্চার করতে পারেননি আমাদের সাহিত্যে আজ পর্যন্ত কেউ। এমন সহজ

১১৬। Studies in the Bengal Renaissance : Article on Swami Vivekananda—Atindra Nath Bose, pp. 120-21 ১১৭। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪১

সরল অনাড়ম্বর অথচ এমন সবল ওজঃ-শক্তিসম্পন্ন, এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র, প্রত্যক্ষ ও মর্মভেদী এবং এত ধ্বনিময় বাংলা কথ্য ভাষার একমাত্র তুলনা মেলে তাঁরই গুরু রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতে। স্বামীজীর 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি সাহিত্যকীর্তিগুলি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রসঙ্গত এখানে একথাও উল্লেখ্য যে, নবজাগরণের জন্মলগ্ন থেকেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই নবজাত জাতির আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত বাংলা ভাষার সন্ধান করেছেন। বিবেকানন্দও সেই বাংলা ভাষাকেই যুগের প্রয়োজনে প্রথম গণরাষ্ট্রের আদর্শ ভাষায় রূপান্তরিত করে গেলেন এবং এখানেই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা যুগপ্রবর্তক স্বামীজীর সার্থকতম মহান ভূমিকা। এবং এই একই কারণে স্বামীজীর সাহিত্যসৃষ্টিতে লালিত্যের চেয়ে মননধর্ম এবং কল্পনার রামধনুচ্ছটার থেকে তথ্য ও বিষয়বস্তুর প্রাধান্য। মানবাত্মার সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির প্রয়োজনেই তাঁর সাহিত্যসাধনা। অন্যথায় তিনি যদি শুধুমাত্র কাব্য বা সাহিত্যসাধনা নিয়েও থাকতেন তাহলে আমাদের সাহিত্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যরথী হতে পারতেন—এ মন্তব্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের।*

রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ ঃ আমার বার বার মনে হয়েছে, দুঃস্থ দুঃখী দেশের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে স্বামীজীর যে অনুভব ও অনুরাগ, এদের সম্পর্কে যে জীবনবাণী উচ্চারিত হয়েছে স্বামীজীর রচনাবলীর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, রবীন্দ্রনাথের 'অপমানিত' কবিতাটি যেন তারই কাব্যরূপমাত্র। দুই বছরের জ্যেষ্ঠ হলেও এযুগের মহাকবি এযুগেরই মহাযোগীর কাছ থেকে এই কবিতাটির ভাব ঋণ গ্রহণ করেছেন। স্বামীজীর জীবশিবতত্ত্ব এবং নরনারায়ণবাদ প্রচারের পূর্বে এই ভূখণ্ডের কোন কবির পক্ষেই 'মানুষের নারায়ণে' কথাটি ব্যবহার করা অসম্ভব বলেই আমার ধারণা। গীতাঞ্জলি-যুগের আরও অনেক কবিতায় (রবীন্দ্রনাথের) স্বামীজীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শুধু তা-ই নয়, এর আগের এবং পরের দেশ ও জাতি সম্পর্কিত কাব্যকবিতায়ও স্বামীজীর ভাবাদর্শ ও অনুপ্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়। 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির প্রথম অংশ স্বামীজীর নব সাম্যবাদের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় লিখিত—এতে কোন সন্দেহ নেই। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের আট বছর আগে কবিতাটি রচিত। স্বামীজীর ভাব ও ভাষার সঙ্গে পর্যন্ত সাদৃশ্য দেখা যায় এই কবিতাটির। স্বামীজীর স্বদেশমন্ত্র ('বর্তমান ভারত'-এর শেষাংশ) এবং রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতার ভাবসাদৃশ্যের প্রসঙ্গ অনেকেই আলোচনা করেছেন। অনেক পরবর্তী কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম'কেও মূলত, তাঁর কাব্যভাষা, কলাসৌন্দর্য এবং লিপিচাতুর্য বাদ দিলে, বিবেকানন্দের কর্মে পরিণত বেদান্ত (Practical Vedanta) তত্ত্বেরই ভাষ্যান্তর বলে মনে হয়। এবং রোমাঁ

---

* '...if Narendranath Datta had not been Swami Vivekananda, Bengal might have one more addition to the large number of her good poets of the nineteenth century. The same thing may be said of his historical knowledge, which was both profound and extensive.' [Swami Vivekananda : A Historical Review—R. C. Majumdar, First Edition, p. 95]

রোলাঁর রচনায়ও দুজনের এই চিন্তাসাদৃশ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। শুধু তা-ই নয়, আমাদের দেশ, জাতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা পড়তে পড়তেও স্বামীজীর রচনা-বক্তৃতা ও পত্রাবলীর অনেক খণ্ডাংশ মনে পড়ে। এইসব কারণেই রোমাঁ রোলাঁ বললেন ঃ 'The twin star of the Paramahamsa and the hero who translated his thoughts into action, dominates and guides her present destinies....The present leaders of India : the king of thinkers, the king of poets, and the Mahatma—Aurobindo Ghose, Tagore, and Gandhi—have grown, flowered, and borne fruit under the double constellation of the Swan and the Eagle—a fact publicly acknowledged by Aurobindo and Gandhi.'[১১৮]

স্বামীজীর নয়া সাম্যবাদ ঃ আগেই বলেছি শূদ্রজাগরণ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের মাটিতেও ইতিহাসের রক্তাক্ত নাটক অভিনীত হোক স্বামীজী তা চাইতেন না। কারণ বিপ্লব অনেক ধ্বংসের উপরেই কল্যাণের বীজ রোপণ করে। তাই স্বামীজী শ্রেণীবিশেষের উত্থান অবশ্যম্ভাবী স্বীকার করেও শ্রেণীসংগ্রামকে, বিশেষ করে শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতি হিসাবে তার যে অন্তিম রক্তাক্ত অধ্যায়টিও অনিবার্য বলে ঘোষিত—তা থেকে ভারতকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল যুগেরই বিশ্বের সভ্যতাসংস্কৃতির ভাণ্ডারে এমন অনেক অবদান রয়েছে যা মানুষের চিরকালীন সম্পদ। কোন কারণেই তার বিনষ্টি মানুষের বৃহত্তম কল্যাণের কথা ভেবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। বিপ্লব মানেই অনেক ধ্বংস, অনেক বিনষ্টি—একথা স্বামীজী জানতেন বলেই একটি গঠনমূলক পথ উদ্ভাবনে ব্রতী হয়েছিলেন। শূদ্রশাসনের অকল্যাণকর দিকগুলি ও অন্ধকার পরিণামগুলি এই জাতিকে যাতে স্পর্শ না করে, সেজন্য শান্তিপূর্ণ একটি নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে ইতিবাচক একটি পরিকল্পনা জাতির কাছে উপস্থাপিত করে গেছেন। দেশ ও জাতির প্রতি সুগভীর ভালবাসা ও মমত্ববোধের প্রেরণায়ই শূদ্র-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে সব রকম রক্তাক্ত হানাহানি, সঙ্ঘাত ও ধ্বংস এবং অকারণ হীন পাশববৃত্তির উদ্দাম আত্মপ্রকাশ পরিহার করতে একটি সহজ মিলনের ও ঐক্যপথের সন্ধান দিলেন। ইউরোপের মতো শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য এবং শূদ্রধর্মকর্মের সহিত শূদ্ররাজত্ব স্বামীজী কখনও চাননি। একদলকে মেরে কেটে নিশ্চিহ্ন করে আর এক দলের সিংহাসনপ্রাপ্তির পাশব পথ কখনও সভ্য মানুষের জীবনদর্শনের অন্তর্গত হতে পারে না। স্বামীজীর মতো বিশ্বমানবের কল্যাণকামীর পক্ষে তা কখনই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ইউরোপে এবং চীনে যেপথে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং তার পরেও বিভিন্ন সাম্যবাদী দেশে যে আরণ্যক হিংস্র জীবননীতির প্রসার ঘটেছে স্বামীজী থাকলে তা সহ্য করতে পারতেন না। চীনের সত্তর দশকের রাজনৈতিক অন্তর্বিরোধ স্মরণীয়। অথচ মানুষেরই হাতে নিপীড়িত মানবতার যে অপরিসীম লাঞ্ছনা ও দুর্গতি চলে এসেছে যুগযুগ ধরে, যে মনুষ্যত্বহীন সুবিধাবাদের আগ্রাসন, তার

১১৮। The Life of Vivekananda and the Universal Gospel, p. 288

প্রতিকারেই তো শূদ্ররাজত্বের প্রতিষ্ঠা, ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে। সকলে মিলেমিশে সহযোগিতায়-সহমর্মিতায়, বিশ্বের বিশাল মানবগোষ্ঠী কি একসঙ্গে সর্বাত্মক মনুষ্যত্বের উদ্বোধন সাধনায় বেঁচে থাকতে পারে না? স্বামীজী নিজেই এ প্রশ্নের সদুত্তর দিলেন। বললেন ঃ 'আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসে পড়েছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে।'[১১৯] এই সত্যযুগের উপযোগী সমাধানই স্বামীজী জাতির কাছে তুলে ধরলেন। শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উপনীত করতে হবে—এই তাঁর সাধনা। স্বামীজী কর্মানুগ জাতিভেদ বিশ্বাস করতেন কিন্তু জন্মগত জাতিভেদপ্রথার বিরোধী ছিলেন। স্বামীজীর মতে ব্রাহ্মণত্ব মানুষের একটি বিশেষ উন্নত অবস্থার নাম। এবং সাধনা দ্বারা সকলেই এখানে পৌঁছাতে পারে। তিনি বললেন ঃ সত্যযুগে, 'এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন।'[১২০] অর্থাৎ স্বামীজী-পরিকল্পিত শূদ্ররাজত্বের অবস্থায় এইসব কোন ভেদাভেদই আর থাকবে না। কারণ স্বামীজী সত্যযুগ বলতে এক শ্রেণীবৈষম্যহীন সর্ব বিভেদমুক্ত আদর্শ সাম্যে স্থিত, সুস্থ সুন্দর সমন্বিত সমাজব্যবস্থার (millenium) কথাই বলতে চেয়েছেন। দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই তিনি এই আদর্শ সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রস্থাপনার পরিকল্পনা করলেন। তিনি বললেন ঃ 'যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।'[১২১] অর্থাৎ 'সবার-পরশে-পবিত্র-করা-তীর্থ-নীরে' জাতীয়তার মঙ্গলঘট পূর্ণ করেই স্বামীজী ভারতের মাটিতে স্বদেশের ঐতিহ্যানুগত নব সাম্যবাদী রাষ্ট্রের উদ্বোধন মন্ত্র দিলেন।

স্বামীজী ও আন্তর্জাতিকতা ঃ স্বামীজীর জাতীয়তার মধ্যেই সন্নিহিত উদার আন্তর্জাতিকতার বীজ। দেশ-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সেই একই পরম 'অস্তি'র অম্লান অধিষ্ঠান ঃ বেদান্তের এই মূল সত্যানুভবের উপরই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা। আধ্যাত্মিক মানসিকতা বাদ দিলেও, শুধুমাত্র জাগতিক প্রত্যয়ের দিক থেকেও তাঁদের সর্বধর্মসমন্বয়ের সাধনা এবং 'যত মত তত পথে'র ধর্মাদর্শ সর্বদেশের সর্বকালের সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষের পৃথক স্বাধীন অস্তিত্বের সহজ স্বীকৃতিদানের এক মহান মুক্ত সনদ। তাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বধর্মসাধনা একদিকে যেমন স্বদেশের সকল সম্প্রদায়ের সকল মানুষকে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয়তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল, অন্যদিকে তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষকেও একই ঐক্যসূত্রে বেঁধে মহৎ এক দার্শনিক আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি স্থাপনা করে গিয়েছে। বাইরে থেকে এক ধর্ম, এক ভাষা বা একটি আদর্শের

১১৯। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১৮

১২০। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৫২ ১২১। তদেব, পৃঃ ৩৪৯-৫০

ভার চাপিয়ে সব দেশ ও জাতিকে ঐক্যবন্ধনে বেঁধে রাখার বহিরঙ্গ প্রয়াসে বস্তুত কোন সমস্যারই সমাধান হয় না, পরন্তু প্রতিটি দেশের অনন্য অস্তিত্ব, তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারাকে মেনে, অতঃপর অন্য জাতি ও ধর্মের সঙ্গে সহজ আদানপ্রদান, মেলামেশা ও দেওয়ানেওয়ার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সমন্বয় ও সহযোগিতার সম্পর্ক এবং পরিণামে সহৃদয় বন্ধুত্ব ঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমন্বয়তত্ত্ব এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। এবং এপথেই বিশ্বমানবের যথার্থ ঐক্য এবং মিলন সম্ভব। 'Instead of antagonizing, therefore, we must help all such interchange of ideas between different races, by sending teachers to each other, so as to educate humanity in all the various religions of the world ; but we must insist,...not to abuse others, nor to try to make a living out of others' faults ; but to help, to sympathize with, and to enlighten all.'[১২২]

বাইরে থেকে চাপানো আদর্শ ও ঐক্যের শ্লোগান যে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং স্বামীজী-প্রবর্তিত আন্তর্জাতিকতার নীতিই যে অভ্রান্ত দিগ্‌দর্শক, বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে তা বিগত পঞ্চাশ বছরেই প্রমাণিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ বলে আজকে আর পৃথিবীতে কিছু নেই। 'সারা দুনিয়ার কৃষকমজদুর এক হও'—শ্লোগান আজ অর্থহীন হয়ে পড়ছে, আর কার্যকরী হতে পারছে না বিশ্বরাজনীতির রঙ্গমঞ্চে। তথাকথিত সাম্যবাদী জগৎ চীন ও রাশিয়ার মধ্যে এবং অন্যান্য ছোটবড় সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যেও, এমনকি খোদ চীনে নিজেদের মধ্যে পর্যন্ত সাচ্চা কমিউনিজমের ধারক ও বাহক কে এ-নিয়ে তুমুল বাক্‌বিতর্ক আমরা লক্ষ্য করেছি। অথচ শুদ্ধ মার্কসীয় দর্শনে ও নীতিতে এ বিবাদবিতর্কের কথা ছিল না। কথা ছিল না Fatherland-এর দোহাই দিয়ে বর্বর নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করার। সাচ্চা মার্কসবাদীর Fatherland সেখানেই যেখানে কৃষক-মজদুরের সংগ্রামী শিবির ঐক্যবদ্ধ। অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক জগতে মুনাফাবাজ স্বার্থসর্বস্ব বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন জোটের ব্যর্থতার কথা সর্বজনবিদিত। বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরও সাম্প্রতিককালের মত হলঃ 'আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বলে এখন আর কিছু নেই। সবই এখন জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে।' প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রকে রক্ষা করে, তার ধারাবাহিক ঐতিহ্যপরম্পরাকে স্বীকৃতি দিয়েই নতুন করে গড়ে উঠতে পারে ঃ স্বামীজীর মতে এটাই বাঁচার পথ—নবজীবন রচনার যথার্থ নীতি। পরের ভঙ্গি নকল করে পরধর্ম গ্রহণ করে কোন জাতি বেঁচে থাকতে পারে না।

একই পরিবারে যেমন স্বামী দ্বৈতবাদী, স্ত্রী অদ্বৈতবাদী, পুত্রকন্যারা কেউ খ্রীষ্টানুসারী, কেউ বৌদ্ধ, কেউ বা মুসলমান ধর্মের উপাসক হতে পারেন, তাতে যেমন কোন

১২২। Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Part-2—Marie Louise Burke, Advaita Ashrama, Calcutta, Third Edition (1984), p. 376

আপত্তি নেই, যে যার বিশ্বাসে আন্তরিক হলেই হল, ঠিক তেমনি আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মীয় আদর্শের দেশ ও জাতিসমূহ নিজের নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে এবং একই সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত মানবসমাজের কল্যাণধর্মের আদর্শ সামনে রেখে, একই সঙ্গে একই পতাকাতলে মিলিত হতে পারেন। সেটিই ভবিষ্যতের আদর্শ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনদর্শনে তারই সূত্র রয়েছে।

পূর্ণের প্রাঙ্গণের অভিমুখে ঃ অন্য নানা কারণেও স্বামীজী সমস্ত দেশ ও জাতির পারস্পরিক উন্নতি ও সমঝোতার জন্য একটি মহামিলনপীঠের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী যে ক্রমশ এক জাতি এক বিশ্বের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে স্বামীজী তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই স্বামীজী বললেন ঃ 'রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যে-সকল সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান করা যায় না।...আন্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতেই উহাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই এযুগের মূলমন্ত্র। সকলের ভিতর একত্ব-ভাব বিস্তৃত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।'[১২৩] বিশ্বব্যাপী ক্রমবিস্তৃত এই একত্বভাব স্বামীজীর কাছে ধরা পড়েছিল বলেই এমন স্থির প্রত্যয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা উচ্চারণ করে গেছেন। 'আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা থাকিবে।'[১২৪] স্বামীজীর এই নীতি দেশের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, বিশ্বের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। কোন কারণেই কারও অধিকার হরণ করা চলবে না। কারণ সকলের জন্য সমান সুযোগ দান করাই স্বামীজীর আন্তর্জাতিকতার মৌল লক্ষ্য। 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'[১২৫]—বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে এই কথাই স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য। তিনি আরও বললেন ঃ 'সম্প্রসারণই জীবন—সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দ্বেষই মৃত্যু।'[১২৬] দু-দুটো মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপরে এই বিস্তৃতির, এই বিশ্বপ্রীতি ও প্রেমের পথেই স্থাপিত হয়েছে আবার জাতিসঙ্ঘ। নানা বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও ক্রমশই মানবকল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছে তার কর্মযোজনা। চারিদিকে তথাপি নানা বিরুদ্ধ শক্তির কর্মতৎপরতা ঃ লোভ-স্বার্থপরতা-শাঠ্য-ষড়যন্ত্র ঃ বর্ণবিদ্বেষ, জাত্যভিমান, কাঞ্চনকৌলীন্য, আগ্রাসী আক্রমণ, সাম্রাজ্যবাদ। তবু জানি, মানুষের শুভবুদ্ধিই পথ দেখাবে মানুষকে। স্বামীজীর প্রদর্শিত পথ ধরেই ভালবাসার অভিজ্ঞান বুকে করে মানুষের জন্যই মানুষের পৃথিবী ঘরে বাইরে আজ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে। সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মহৎ চেতনায় একজাতি

১২৩। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩ ১২৪। তদেব, পৃঃ ১৩৮
১২৫। তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪ ১২৬। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৮

একবিশ্বের নির্ভুল দুরন্ত অভিযাত্রা ক্রমশই এগিয়ে চলেছেঃ 'On to the bound of waste, on to the City of God.' ঋষিকবির কণ্ঠে আমরাও বলি 'শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তুনঃ ॥ আমাদের প্রেরণাসকল সম্মুখে চলুক, তাই দেবতার শক্তিরাজি শান্তির মধ্যে ফুটিয়া যেন ওঠে; জীবনের ধারা সব শান্তির মধ্যে প্রবাহিত হউক, আমরা যে উহা পান করিব। শান্তি শক্তি—শান্তির মধ্যে বিধৃত শক্তিধারা সম্মুখে যেন ছুটিয়া চলে।'[১২৭]

১২৭। বেদমন্ত্র—নলিনীকান্ত গুপ্ত, ১৯৬৬, পৃঃ ১৬১

নতুন পৃথিবীর সন্ধানে কার্ল মার্কস ও স্বামী বিবেকানন্দ

॥ ১ ॥

মস্কোর ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের পরিচালক ডক্টর ওয়াই চেলিশেভের উক্তি : '...many years will pass, many generations will come and go, Vivekananda and his time will become the distant past, but never will there fade the memory of the man who all his life dreamed of a better future for his people...Together with the Indian people, Soviet people who already know some of the works of Vivekananda published in the USSR, highly revere the memory of the great Indian patriot, humanist and democrat, impassioned fighter for a better future for his people and all mankind.'[১]

দুই সদৃশ বা আপাতসদৃশ ব্যক্তির মধ্যেই তুলনা চলে। কার্ল মার্কস ও স্বামী বিবেকানন্দের তুলনামূলক আলোচনা তাই অযৌক্তিক নয়। দুজনেই নিপীড়িত মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিশ্বের সমগ্র ইতিহাস মন্থন করে এই দুই জ্ঞানপুরুষ মুক্তির সোপান করে দিতে চেয়েছিলেন যা আজও অগণিত মানুষের মনে আশা জাগায়। মার্কস ও স্বামীজী উভয়েই বুঝেছিলেন, ব্যক্তিমানুষের প্রবুদ্ধ বিকাশের জন্য প্রয়োজন নতুন পৃথিবী ; উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বগুলির চাই বাস্তব প্রয়োগ। উভয়েই চেয়েছিলেন, দর্শনকে তার ভাবমূলক পথ থেকে বাস্তব ক্রিয়াকলাপের পথে, বাস্তব কার্যক্রমের সঠিক রাস্তায় নামিয়ে আনতে। তাঁরা বললেন, মানুষকে বিচার করতে গেলে দর্শন আর নির্লিপ্ত চিন্তাসমষ্টিরূপে প্রকাশ পায় না, দর্শন তখন হয়ে ওঠে programme of action। একদিকে মার্কস বললেন : The philosophers have only interpreted the world in various ways ; the point, however, is to change it; অন্যদিকে স্বামীজীও আমাদের চোখ ফেরালেন Practical Vedanta-র দিকে। বললেন তিনি : 'The abstract Advaita must become living—poetic—in everyday life.'

প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মার্কসবাদ যে সুবিধে পেয়েছে, স্বামীজীর মতবাদ তা পায়নি। বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ সহায়তায় মার্কসবাদ আজ সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত, কিন্তু স্বামীজীর ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। যদিও পরিব্রাজনকালে কয়েকজন রাজা তাঁকে গুরুপদে বরণ করেছিলেন, তবুও বিশ্বপরিক্রমায় তাঁকে সাহায্য করেছিল সাধারণ মানুষই।

দ্বিতীয়ত, নিজস্ব মতবাদ ধীরে ধীরে গড়ে তোলার ব্যাপারে মার্কস যে দীর্ঘ সময় পেয়েছিলেন, স্বামীজী তা পাননি। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস তাঁর ডক্টরেট উপাধি লাভ

১। Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume, Swami Vivekananda Centenary Committee, Calcutta, 1963, pp. 517-18

করেন। তেইশ বছর বয়স থেকে লেখা শুরু করে চৌষট্টি বছর বয়সে তাঁর শেষ লেখা (সাম্যবাদী ইস্তাহারের রুশ সংস্করণের ভূমিকা) রচিত হয়। দীর্ঘ একচল্লিশ বছর ধরে তিনি তাঁর মতবাদকে গড়ে তুলেছেন। পক্ষান্তরে স্বামীজী সময় পেয়েছিলেন মাত্র আট বছর। বসে বসে 'থিসিস' লেখার সময় তিনি পাননি। বিভিন্ন বক্তৃতা ও রচনার মধ্য দিয়ে সূত্রাকারে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখে গেছেন।

কিন্তু নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন দুজনেই, যে পৃথিবীতে নিপীড়ন থাকবে না, শোষণ থাকবে না, ব্যক্তিসত্তা যেখানে পরিপূর্ণ বিকাশের পথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তীর্ণ হবে। একদিকে ভাবাদর্শের সঙ্কট অন্যদিকে নেতৃত্বের দেউলেপনায় মানুষ যখন বিভ্রান্ত, সেই ক্রান্তিলগ্নে তাঁদের আবির্ভাব। এই দুই মহানায়কের মতবাদে মিল আছে অনেক, অমিলও প্রচুর। লক্ষ্য ও গতি সম্পর্কেও দুজনে সবসময় একমত নন। এ সত্ত্বেও আগামী প্রজন্ম তাঁদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে; কারণ তাঁরা যে শুধু মানুষকে আন্তরিকভাবে ভালবেসেছিলেন তা নয়, নতুন পৃথিবী গড়ার পথে বৈজ্ঞানিক প্রণালীরও সন্ধান দিয়ে গিয়েছিলেন।

মার্কসের মতবাদে মৌলিকতা কোথায়? তিনি নিজেই এ-সম্বন্ধে একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ 'What I did that was new was to prove :

1) that the existence of classes is only bound up with particular historical phrases in the development of production,
2) that the class struggle necessarily leads to the dictatorship of the proletariat,
3) that this dictatorship itself only constitutes the transition to the abolition of all classes and to a classless society.'[২]

এক বিশাল সর্বগ্রাহী ব্যক্তিত্ব নিয়ে স্বামীজীর আবির্ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়ঃ যে একটি শক্তি থাকলে মানুষ জগদ্বিখ্যাত হতে পারে, নরেনের মধ্যে সেরকম আঠারোটা শক্তি রয়েছে। বাস্তবিকই ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীজী যেসব বক্তব্য রেখেছেন, সেগুলি তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভারই পরিচায়ক। মার্কস যেমন অর্থনীতিকে ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য-ইতিহাস ইত্যাদি সবকিছুর উৎস বলে ধরেছেন, স্বামীজীও তেমনি সবকিছুর একটি উৎস খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতেঃ মুক্তির ইচ্ছাই সবকিছুর উৎস; মানুষের সমস্ত কাজের পিছনে এই আকৃতিই প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃতি ও সমাজ মানুষের সামনে নানান বাধার সৃষ্টি করছে, আর মানুষ সেই বাধাগুলিকে একের পর এক জয় করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে, সসীম মানুষ অসীম হতে চাইছে।

প্রতিটি জ্ঞান বা কাজের কারণ অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে, মানুষ তার সসীম সত্তাকে ছাড়িয়ে যেতে চাইছে। তার ইন্দ্রিয়, তার মস্তিষ্ক, তার হৃদয়, তার পরিবেশ

২। Selected Works (in one vol.)—Karl Marx and Frederick Engels, Moscow, 1970, p. 669

তাকে যে জ্ঞান এনে দিচ্ছে, বিশ্বপ্রকৃতির যে রূপ তাকে দেখাচ্ছে, তাতে সে সন্তুষ্ট নয়। মানুষ চাইছে ভিতরে ঢুকতে, গভীরে সন্ধান করতে। সে বুঝতে পেরেছে—'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্'—সোনালী ছায়া দিয়ে সত্যের মুখ ঢাকা আছে। তাই তার প্রার্থনা—'তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে'—হে বিশ্বধাতা, সত্যকে উপলব্ধি যাতে করতে পারি সেজন্য তুমি এই আপাতরূপ সরিয়ে নাও। এক টুকরো কাঠকে সকলেই কাঠ দেখে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বাইরের রূপে সন্তুষ্ট নন, তিনি প্রবেশ করতে চান গভীরে। বাইরের রূপ অতিক্রম করে তিনি দেখেন সেলুলোজ। আরও ভিতরে ঢুকে খুঁজে পান কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সিজেন। আরও আরও গভীরে গিয়ে দেখেন ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন। যেমন করে একজন জ্যোতির্বিদ্ সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে যান ছায়াপথে; পরে তাকেও অতিক্রম করে বাইরের নক্ষত্রজগতে। এমনি করেই শিল্পী চান মূর্ত বস্তুর অমূর্ত ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে, ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রজ্ঞার লীলায়িত গতিলক্ষ্য দেখতে পান, যেমন করে মনোবৈজ্ঞানিক সচেতন মন ছাড়িয়ে ধরতে চান অবচেতন মনকে।

হিমালয়ের চূড়ায় মানুষ কেন ওঠে? কেন যায় সমুদ্রের অতলে? সৌরমণ্ডল ভেদ করে কেন রকেট পাঠায় মহাকাশে? দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মিটানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য—এমন কথা কেউ স্বীকার করবে না। আসলে মানুষ তার প্রকৃতিদত্ত শক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, সসীম মানুষ অসীম হতে চায়। ডাক্তারীবিদ্যার নতুন নতুন আবিষ্কারে মানুষ চাইছে মৃত্যুকেও জয় করতে। সুদূর অতীতে উপনিষদের যুগে ভারতেরই এক নারী মৈত্রেয়ী বলেছিলেনঃ 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'— যা দিয়ে আমি অমৃত হতে পারব না, যা আমাকে অসীমে প্রবেশ করতে দেবে না, তা দিয়ে আমি কি করব?

বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, সমাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য—সবকিছুরই উৎপত্তি ও গতি মানবমনের এই গভীর আকৃতি থেকে। সসীম মানুষ অসীম হতে চাইছে। এই সাড়ে-তিন হাত শরীরটাই যে মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়, চার দেওয়ালের মাঝের জায়গাটুকুতেই যে তার সামগ্রিক অস্তিত্ব নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ই যে তার উপলব্ধির একমাত্র দরজা নয়—একথাটাই মানুষ বলতে চাইছে, বোঝাতে চাইছে।

কিন্তু কেন চাইছে? স্বামীজী বলছেন যে, মানুষ স্বরূপত ব্রহ্ম, স্বরূপত সে অসীম, অনন্ত, ভূমা। তার দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজের মধ্য দিয়ে অন্তরাত্মার সেই বাণী সে শুনতে পাচ্ছেঃ 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি', অল্পে সুখ নেই, ক্ষুদ্রত্বে আনন্দ নেই, বৃহত্তেই সুখ, অসীমেই আনন্দ। কস্তুরী মৃগের মতো সে ছুটে বেড়াচ্ছে অন্তরাত্মার খোঁজে। এই অবিচ্ছেদ্য মুক্তি-অভিযানেরই আর এক নাম ইতিহাস।

॥ ২ ॥

বিবেকানন্দ-মননালোকে কার্ল মার্কসের আবির্ভাবের তাৎপর্য বুঝতে গেলে স্বামীজীর ইতিহাসচিন্তার তাত্ত্বিক দিকটির সাথে পরিচিত হওয়া দরকার। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থ দুটিতে স্বামীজী একদিকে যেমন বিশ্বের বিভিন্ন সমাজের বিকাশধারা ব্যাখ্যা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন কালে ও দেশে রাষ্ট্রশক্তি কোন্ শ্রেণীর হাতে ছিল তা-ও আলোচনা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারটি শ্রেণী পৃথিবীর সর্বত্রই সর্ব যুগে বিদ্যমান[৩] এবং রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনা করছে একাদিক্রমে এই শক্তিগুলিই। মানুষ তার সভ্যতার পরিপূর্ণতার পথে যে-সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয়েছে, তার সমাধান করার চেষ্টা করেছে চারটি উপায়ে—জ্ঞানের সাহায্যে, অস্ত্র ও ভূমির সাহায্যে, অর্থের সাহায্যে আর কায়িক শ্রমের সাহায্যে। যুগপ্রয়োজনে এক এক সময় এক একটি পথ মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং চারটি শ্রেণীর এক একটি সে সমাধানে প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করে। জ্ঞানের সাহায্যে যুগসমস্যার সমাধান করতে যে শ্রেণী এগিয়ে আসে তারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়শক্তি এগিয়ে আসে অস্ত্র ও ভূমির সাহায্যে, বৈশ্য অর্থের দ্বারা আর শূদ্র কায়িক শ্রমকেই প্রধান করে তোলে। জ্ঞান যেযুগে প্রধান হয়ে ওঠে, সেযুগে আবির্ভাব হয় বড় বড় বাগ্মী, লেখক, চিন্তাশীল মনীষীর। মানুষ তখন ব্যগ্র হয়ে ওঠে জ্ঞানপিপাসায় এবং চিন্তাশীল লোকেরাই সমাজে বেশী সম্মান পান। বস্তুত, সমাজব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই জ্ঞানীরাই তখন হন প্রধান নিয়ন্তা। শৌর্যযুগে প্রাধান্য ঘটে ক্ষত্রিয়শক্তির। মানবসমাজ তখন জ্ঞান ও বিদ্যা চর্চার চেয়ে রাজকীয় শৌর্যবীর্যের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। আর্থিক যুগে ঘটে বৈশ্যশক্তির উদ্ভব। মানুষ তখন অর্থের পিছনে ছুটে চলে, বিদ্যাচর্চার মূল উদ্দেশ্য অর্থ, জ্ঞানীরা অর্থনীতির সাহায্যেই সকল সমস্যার সমাধান করতে চান এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকেই সর্বোচ্চ স্বাধীনতা বলে মনে করা হয়। এই বৈশ্য-প্রধান যুগের পর শূদ্রযুগ। কায়িক শ্রমকে যারা পেশা করেছে তারাই এযুগের নিয়ন্তা। এইভাবে চারটি শক্তির লীলাকেন্দ্ররূপে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে স্বামীজী এক মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন।[৪] চীন, মিশর, ভারত, ইসরায়েল প্রভৃতি দেশে প্রাচীনযুগে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল ব্রাহ্মণশ্রেণীর হাতে। পরবর্তীযুগে সেই শক্তি এল ক্ষত্রিয়দের হাতের মুঠোয়। ইউরোপে এই যুগের ক্ষত্রিয়শক্তির পরে সমাজনিয়ন্তারূপে আবির্ভূত হল বৈশ্যশক্তি। এই বৈশ্যশক্তির চমকপ্রদ উন্নতি ঘটাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব। শিল্পবিপ্লব যখন নিত্যনতুন আবিষ্কারে

৩। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ(১৩৮৩), পৃঃ ২২৯

৪। স্বামীজীর এই সিদ্ধান্ত ইতিহাস-অনুমোদিত। কিভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন কিংবা তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ও বিচারের যৌক্তিকতা আলোচনা করা আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। কৌতূহলী পাঠক 'মার্কসীয় ইতিহাস-তত্ত্বের সীমা' (লেখক : অমিতাভ, প্রকাশ : শারদীয়া বসুমতী, ১৩৭৬) কিংবা 'ইতিহাসপ্রসঙ্গে মার্কস ও বিবেকানন্দ' (লেখক : ব্রহ্মচারী অমিতাভ, প্রকাশ : সমাজশিক্ষা, ১৫ বর্ষ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম সংখ্যা) প্রবন্ধে স্বামীজীর এই ব্যাখ্যার আলোচনা দেখতে পারেন। স্বামীজীর ইতিহাসচিন্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং কার্ল মার্কস থেকে তাঁর প্রভেদ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে সুন্দর আলোচনা করেছেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত তাঁর 'বিবেকানন্দের সমাজদর্শন' নামে গবেষণামূলক বইটিতে। এই শতাব্দীর বর্তমান দশকেও বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই চার শ্রেণীর শাসন চলছে। সেদিকে তাকালেও স্বামীজীর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ ও তাৎপর্য স্পষ্ট বোঝা যায়। বিষয়টি বিরাট। সাপ্তাহিক 'জনবাণী' পত্রিকায় (কলকাতা-৯) গত ১৯৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে 'একালীন বিশ্ব ও বিবেকানন্দ' প্রবন্ধটিতে (লেখক : 'মিত্র কৌটিল্য') এটি সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রবলভাবে নিজের শক্তি বাড়িয়ে তুলেছে, কার্ল মার্কসের আবির্ভাব সেই আর্থিকযুগে, বৈশ্যশক্তির চরম অভ্যুদয়কালে। মার্কস তাই শিল্পবিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত, অভিভূত। আর্থিকযুগে তাঁর আবির্ভাব বলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপরেই তাঁর মূল দৃষ্টি। বৈশ্যযুগ শেষ হয়ে আসছে, তাই আগামী শূদ্রযুগের প্রবল সমর্থক ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে তাঁর আবির্ভাব। বিবেকানন্দ-মননালোকে মার্কসের আবির্ভাবের তাৎপর্য এখানেই। শিল্পবিপ্লবের দ্বারা অভিভূত ছিলেন বলে তৎকালীন মূল্যবোধের সাহায্যে কার্ল মার্কস বিশ্বের সকল সমস্যাকে দেখতে চেষ্টা করেছেন।

স্বামীজী শূদ্র-অভ্যুত্থানকে আবাহন জানিয়েছিলেন সমস্ত অন্তর দিয়েই। কিন্তু মার্কসের মতো কেবল এই শূদ্রশক্তিকে কেন্দ্র করেই স্বীয় বক্তব্য গড়ে তোলেননি। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারটি শ্রেণীর মধ্যে স্বামীজী দেখতে পেয়েছিলেন সামাজিক ক্রিয়াকলাপের চারটি মৌলিক শক্তি। নতুন পৃথিবীর আবাহনে তাই তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন, এই শক্তিগুলির কল্যাণকর দিকগুলি যাতে সম্মিলিত হতে পারে। তিনি এই শক্তি-নেতৃত্বসমূহের ভালমন্দ দুটি দিকই তুলে ধরেছিলেন এবং এই শক্তিগুলির সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে আগামী পৃথিবীর রূপান্তর দেখতে চেয়েছেন। মার্কস কিন্তু কেবলমাত্র একটি শ্রেণীর স্বার্থেই নতুন পৃথিবীকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ব্যাখ্যা ও পথের মধ্যে একদিকে যেমন অতিসরলীকরণের দোষ থেকে গেছে, অন্যদিকে পরবর্তীকালে মার্কসবাদীরা তাঁদের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ভাষ্যে অনবরত পরিবর্তন ঘটিয়ে মূল চরিত্র বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। 'ইতিহাস নিয়ন্ত্রণে চরম শক্তি হল বাস্তব জীবনে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন' (২১।৯।১৮৯০ তারিখের এক চিঠিতে[৫] এঙ্গেলস) এই সিদ্ধান্তের উপরে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে মার্কস সমগ্র ইতিহাসকেই অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। পাশাপাশি স্বামীজী ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে[৬] মনস্তত্ত্বকে এক প্রধান স্থানে বসিয়েছেন। মানসিক গঠনানুসারে সমাজের পরিচালিকাশক্তি ও সাধারণ মানুষের যে বৈশিষ্ট্য তাঁর চোখে ধরা পড়েছে তার উপরে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে তিনি ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিকে বোঝাতে চেয়েছেন। মানুষের ইতিহাসে বস্তু এবং মনের মধ্যে মনই অধিকতর প্রভাব প্রয়োগ করেছে। সি-পি-আই তাত্ত্বিক নেতা শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন বলেন, 'ইতিহাসের প্রকৃতি অনুধাবন করে যে-প্রতীতি তাঁর (মার্কসের) এসেছিল তা হল এই যে যুগে যুগে মানুষের বাস্তব জীবনব্যবস্থার ছাপ পড়েছে তার চিন্তা, তার স্বপ্ন, তার আদর্শ, তার ধ্যানধারণার উপর। চিন্তা কর্মকে নির্ণীত করে না, কর্মই চিন্তাকে নির্ণীত করে, চেতনা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, জীবনই চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে।'[৭] —তখন আর এক মার্কসবাদী অ্যাডাম শাফের বক্তব্য ঃ 'ব্যক্তি শুধুমাত্র পরম শ্রেয় এবং যাবতীয় ক্রিয়ার লক্ষ্য মাত্রই নয়,

---

৫। Selected Works (in one vol.), p. 682

৬। মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে জাতিবৈশিষ্ট্য, ধর্মবোধ, ভৌগোলিক পরিবেশ, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদিও ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করে। [এ-বিষয়ে স্বামীজীর চিন্তা আলোচিত হয়েছে অন্য একটি প্রবন্ধে—'বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনার ভূমিকা'—ব্রহ্মচারী সর্বচৈতন্য, বিশ্ববাণী, আষাঢ় ১৩৮১]

৭। 'কার্ল মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধ, এক্ষণ পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, পৃঃ ৪৮

নিজের বিকাশের কর্তাও সে নিজে। তার নিজের জগতে যেসব মূল্যবোধ তা অন্য কোন জগৎ থেকে আহৃত নয়, তার নিজেরই তৈরী, সামাজিক ব্যক্তির তৈরী। এই মূল্যবোধ অনুযায়ী কাজ করাও তার কর্তৃত্বাধীন। ব্যক্তি তার নিজের ইতিহাস নিজেই তৈরী করে এবং সেজন্য সর্বতোভাবে দায়ী সে নিজেই।'[৮] মার্কসের মতবাদ নিয়ে যে বিভিন্ন ভাষ্য হয়েছে তার কারণ মার্কসবাদ একটি বিশেষ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। ফলে, একে নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কালোপযোগী, দেশোপযোগী করে নেবার চেষ্টা মার্কসবাদীদের মধ্যে স্বতই লক্ষিত হয়। স্বয়ং লেনিন মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'আমরা মনে করি না মার্কসবাদ সম্পূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয়।'[৯] ভারতের বিখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক শ্রীভবানী সেন স্পষ্টরূপে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন[১০] যেখানে লেনিন মার্কস থেকে স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

প্রথমত, কেবলমাত্র বৈশ্যযুগ থেকে শূদ্রশাসনে উত্তরণের উপায় এবং দ্বিতীয়ত, বৈশ্যযুগের অর্থনৈতিক শোষণকেই শোষণের একমাত্র রূপ বলে গ্রহণ করা—এই দুটি বিষয়ের জন্য মার্কসবাদে যে অপূর্ণতা দেখা দিচ্ছিল তাকে এড়ানোর জন্যই মার্কসবাদীরা বর্তমানে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ধনতন্ত্রের পরবর্তী ধাপ সাম্রাজ্যবাদের যুগে যে নতুন কতগুলি সমস্যা দেখা দিল তার সমাধানে মার্কসবাদকে অর্থনীতির বদলে মানবতাবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস আজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীর দার্শনিক জর্জ লুকাস প্রথম বলেন যে, স্বরূপচ্যুতিকে (Alienation theory) ভিত্তি করেই মার্কসবাদ দাঁড়িয়ে আছে। পরবর্তী যুগে পোলাণ্ডের দার্শনিক অ্যাডাম শাফ 'A Philosophy of Man' বইটি লিখে প্রমাণ করলেন যে, মানবতাবাদই মার্কসবাদের মূল বক্তব্য। তিনি বললেন ঃ 'বর্তমান যুগে, সমাজ প্রকৃতি এবং মানুষের মনের গতি এমন সব প্রেরণায় প্রভাবিত হচ্ছে যে, মানবতার প্রয়োজনীয়তা আবার নতুনভাবে অনুভূত হচ্ছে। ফলে মার্কসের মানবতাবাদের দিকেও নজর পড়ছে এবং মার্কসের আলোচনায় আজ নতুন একটা দিক খুলছে। মার্কসের সমস্ত রচনাই এক নতুন দৃষ্টিতে

৮। 'Marx and Contemporary Humanism' শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ, এক্ষণ পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, পৃঃ ৮১

৯। প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি, এক্ষণ পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, পৃঃ ১০২

১০। নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ—ভবানী সেন, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৪, পৃঃ ৩০৫-০৭। মার্কসবাদীদের মধ্যেই আজ 'new left movement' শুরু হয়েছে যার প্রবক্তারা স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে মার্কসবাদকে যুগোপযোগী করে তোলার চেষ্টা করেছেন। ফলে, বিভিন্ন ভাষ্য ও টীকায় মার্কসবাদের মধ্যে বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়েছে। এ-বিষয়ে নিম্নোক্ত বইগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) Marxism and Beyond—L. Kolakowski (Paladin, 1971)
(২) Between Ideal and Reality : A Critique of Socialism and Its Future—S. Stojanovic (tr. G. S. Sher, Oxford, 1973)
(৩) One-Dimensional Man—Herbert Marcuse (Beacon Press, 1964)
(৪) Soviet Marxism—Herbert Marcuse (Pelican, 1971)
(৫) In Search of Method—J. P. Sartre (Menthen, 1965)
(৬) The Turning Point of Socialism—R. Garandy (Fontana, 1970)

দেখা হচ্ছে। বস্তুত মানবতাবোধ থেকেই মার্কসবাদের জন্ম—এই চেতনারও জন্ম হয়েছে এবং মানবপূজারী মার্কসের চরিত্র 'আবিষ্কারে'র চেষ্টাই চারধারে আজকাল হচ্ছে।'[১১]

স্বামীজীর মতবাদের মধ্যমণি 'মানুষ'। তাঁর ধর্ম, তাঁর দর্শন, তাঁর সকল মতই পর্যবসিত হয়েছে মানবধর্মে। এই মানবধর্মের মধ্য দিয়েই তিনি মানুষের উত্তরণ চেয়েছেন। রাষ্ট্রনীতি তাঁর চোখে মানবসমাজের একটি অঙ্গ মাত্র, প্রধান অঙ্গ অবশ্যই নয়। মানুষের জীবনের আংশিক চাহিদা মিটানো ছাড়া রাষ্ট্র যে বেশী কিছু করতে পারে না, এ-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। তাই রাষ্ট্রের বা সমাজের সর্বগ্রাসী পরিবেশে ব্যক্তিত্বের বিসর্জন তাঁর কাম্য নয়। তাঁর সকল চিন্তার পিছনে ব্যক্তিত্বের বিকাশই মুখ্য হয়ে থাকত। ফলে তিনি মনে করতেন, সমস্ত রাষ্ট্রনীতি, সমস্ত সমাজনীতি গড়ে তুলতে হবে মানবতাবাদকে ভিত্তি করে। স্বামীজীর এই মানবতাবাদ কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য মানবতাবাদ নয়। মিল, কোঁত, বেন্থাম চেয়েছেন 'নর'কে নরোত্তম করে তুলতে, স্বামীজী চাইলেন 'নর'কে তার স্বরূপ নারায়ণে প্রতিষ্ঠিত করতে। পাশ্চাত্য মানবতাবাদ চেয়েছে মানুষের মধ্যে নতুন নতুন গুণ প্রবিষ্ট করাতে, স্বামীজী চেয়েছেন মানুষ তাঁর স্বরূপ ফিরে পাক—যে স্বরূপ জীবনজিজ্ঞাসার সমাধান এনে দেয়। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়ঃ 'পাশ্চাত্য মানবতাবাদ লোহার খাঁচাকে সোনার খাঁচায় পরিণত করেছে, বিবেকানন্দের মানবতাবাদ মুক্ত অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেদান্তই তাঁকে সেই সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস দিয়েছে; তাঁর মানবতাবাদ ও বেদান্তবাদ, একে অপরের পরিপূরক।'[১২] বেদান্তের যে রূপ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে মূর্ত হয়েছিল সেই 'জীবই শিব'-তত্ত্বের ব্যবহারিক কর্মপ্রণালীকে ভিত্তি করেই স্বামীজীর মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত।

কোন জাতির উন্নতি করতে গেলে—স্বামীজীর মতে—সেই জাতির মূল ভাব অনুসারেই তা করা উচিত। তিনি বলছেনঃ 'সকল জাতিরই এক-একটি প্রধান আদর্শ আছে—তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তি, কাহারও বা সামাজিক উন্নতি, কাহারও বা মানসিক উন্নতিবিধান, কাহারও বা অন্য কিছু।'[১৩] 'প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতিনীতি সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতির জীবন ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী উপায়রূপ আচার ছাড়া, আর সমস্ত রীতিনীতিই বাড়ার ভাগ। এই বাড়ার ভাগ রীতিনীতিগুলির হ্রাস-বৃদ্ধিতে বড় বেশী এসে যায় না; কিন্তু যদি সেই আসল

১১। 'Marx and Contemporary Humanism' শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ, এক্ষণ পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, পৃঃ ৭৫

১২। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানবতাবাদের আলোকে বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৬৪, পৃঃ ১৮৩

১৩। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৬৬

উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে, তখুনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে।'[১৪] ফরাসী, ইংরেজ ও ভারতীয়দের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দিয়ে স্বামীজী ব্যাখ্যা করেছেন এই বিষয়টি। তাঁর মতে, উন্নতির সময় এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যটিকেই জাতির মেরুদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে বিশ্বসংস্কৃতিতে সেই জাতির আসন নেওয়া প্রয়োজন। বিশ্বসংস্কৃতি যেন এক বিরাট বহুতন্ত্রী বীণা এবং জাতীয় সংস্কৃতিগুলি তার এক-একটি তন্ত্রী। বীণার প্রতিটি তারের সুরবৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সমস্ত তারগুলি যখন স্বীয় সুরবৈশিষ্ট্যে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে তখনই বহুতন্ত্রী বীণার সম্মিলিত সুরমাধুর্য এক অপূর্ব সুরলহরীর সৃষ্টি করে। এইভাবেই স্বামীজী আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সম্মিলন ঘটিয়েছেন।[১৫]

বিভিন্ন জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে কিনা এবং জাতীয় উন্নতির সময় সেই বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দেওয়া উচিত কিনা, এ-বিষয়ে মার্কস সরাসরি কিছু বলেননি। যদিও তিনি প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজে চারটি সংগঠনের (এশিয়াটিক, স্ল্যাভোনিক, প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল এবং জার্মানিক) উল্লেখ[১৬] করেছেন, যদিও তিনি বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রগতিতে বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন গতিপ্রকৃতির কথা[১৭] বলেছেন, যদিও তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমাজদ্বয়ের অগ্রগতিতে পার্থক্য লক্ষ্য[১৮] করেছেন, তবুও জাতীয় চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কোন ব্যাখ্যা তাঁর রচনায় নেই। কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর না দিয়ে বিপ্লবের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে সঠিক ধারণায় আসা সম্ভব নয়; ফলে, পরবর্তী যুগে মার্কসবাদের নানান ভাষ্যে বিভিন্ন দেশের মার্কসবাদীরা নিজ নিজ দেশের জাতীয়

১৪। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৮। আবার স্বামীজী লিখেছেনঃ 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র—ভাষা মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য করছে—সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যেদিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সেদিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র, ঘরে-বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক। ইউরোপীয়দের তেমনি একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা না হলে সংসার চলবে না; তাই ওরা প্রবল। একেবারে নিঃশক্তি হলে কি মানুষ আর বাঁচে? জাতিটা ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র; একেবারে নির্বল নিষ্কর্মা হলে জাতটা কি বাঁচবে?' [বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫০]

১৫। লাহোরে এক বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'প্রত্যেক জাতিকেই এক-একটি বিধিনির্দিষ্ট পথে চলিতে হয়, প্রত্যেক জাতিরই জগতে কিছু বার্তা ঘোষণা করিবার আছে, প্রত্যেক জাতিকেই ব্রতবিশেষ উদ্‌যাপন করিতে হয়। অতএব প্রথম হইতেই আমাদিগকে জানিতে হইবে—জাতীয় ব্রত কি, জানিতে হইবে—বিধাতা এই জাতিকে কি কার্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে—বিভিন্ন জাতির প্রগতিতে ইহার স্থান কোথায়, জানিতে হইবে—বিভিন্ন জাতির সঙ্গীতের ঐকতানে তাহাকে কোন্ সুর বাজাইতে হইবে।' [বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৭০]

১৬। Pre-Capitalist Economic Formations—Karl Marx, Edited & Introduction by Eric Hobsbawm, trans. by Jack Cohen, London, 1964, p. 95

১৭। A Contribution to the Critique of Political Economy—Karl Marx, বইয়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। [Selected Works (in one vol.), p. 182]

১৮। Capital—Karl Marx, Vol. III, Moscow, 1960, p. 328

বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দিতে শুরু করেছেন।[১৯] ইতালীর এন্টনী গ্রামসী এবং পালমিরো তোগলিয়াত্তি, ফ্রান্সের মরিস থোরেজ এবং জর্জেস পুলিটজার, বুলগেরিয়ার তোদর পাভলভ, ব্রিটেনের মরিস কনফর্থ, জাপানের কেনজুরো ইয়ানাগিদ, যুগোশ্লাভিয়ার টিটো, উত্তর কোরিয়ার কিম-ইল-সুং প্রমুখের লেখা পড়লেই এ-বিষয়টি ধরা পড়ে। মার্কসবাদী গণতন্ত্রের রূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাও-সে-তুং সরাসরিই বলেছেন ঃ 'This new-democratic republic will be different from the old European-American form of capitalist republic.... On the other hand, it will also be different from the socialist republic of the Soviet type under the dictatorship of the proletariat which is...in the U.S.S.R....for a certain historical period, this form (i.e., Soviet type) is not suitable for the...colonial and semi-colonial countries...therefore, a third form of state must be adopted in...all colonial and semi-colonial countries, namely, the new-democratic republic.'[২০]

'If such a republic (i.e., new-democratic) is to be established in China, it must be new-democratic not only in its politics but also in its economy.'[২১]

'New-democratic culture is national.... It belongs to our own nation and bears our own national characteristics.'[২২]

চীন ও রাশিয়ার গায়ে লাগানো মার্কসবাদী রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া। তার প্রধান রাষ্ট্রনায়ক কিম-ইল-সুং জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়ে বলেছেন ঃ 'Some advocate the Soviet way and others the Chinese, but is it not high time to work out our own ?'[২৩] রুশ নেতৃবৃন্দের প্রতি সেই বিখ্যাত গোপন চিঠিতে প্রখ্যাত রুশ সাহিত্যিক সলঝেনিৎসিনও একই কথা বলেছেন ঃ 'To run a country like Russia you need to have a national policy and to feel constantly at your back all the eleven hundred years of its history, not just the last fifty-five—five per cent.'[২৪]

১৯। মার্কসবাদীদের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক কেন এবং তার সমাধান কিভাবে করার চেষ্টা হচ্ছে তা নিয়ে অন্য একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে ('বিবেকানন্দের ইতিহাসচিন্তায় প্রাচ্য-সমাজ'—ব্রহ্মচারী সর্বচৈতন্য, বিশ্ববাণী, ফাল্গুন ১৩৮০) আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধেও পরে এ-বিষয়টি আলোচিত হবে।

২০। Selected Works of Mao-Tse-Tung, Vol. II, Foreign Languages Press, Peking, 1977, p. 350 ২১। ibid., p. 353 ২২। ibid., p. 380

২৩। Selected Works of Kim-Il-Sung, Vol. I, Pyongyang, 1971, p. 591

২৪। Letter to Soviet Leaders—Alexander Solzhenitsyn, London, June 1974, p. 58

॥ ৩ ॥

অ্যালিয়েনেশন-তত্ত্বের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে মার্কস ও স্বামীজীর মানবতাবাদ। উভয়ের মতে, জনগণই ইতিহাসের মহানায়ক। দুজনেই মনে করতেন, স্বাধীনতার মধ্যেই মানুষের শ্রেয় নিহিত। তবে একটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন, মার্কসীয় মতে 'স্বাধীনতা মানুষের স্বরূপ লক্ষণ',[২৫] কোন আগন্তুক ধর্ম নয়। কথাটি ঠিক নয়।[২৬] বেদান্তদর্শন অনুযায়ী স্বামীজী মুক্তিকে স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। মার্কস কিন্তু এই ধারণা পোষণ করতেন না। তাঁর মতে, মানুষ জড়েরই এক পরিণাম এবং জটিল সঙ্ঘটনের মাধ্যমে তার চেতনা প্রকাশিত। এই চেতনার সাহায্যে মানুষ যখন একদিকে সব রকম শোষণ থেকে মুক্ত হবে, অন্যদিকে বিভিন্ন সৃষ্টিমূলক কাজে নিজেকে নিয়োগ করতে পারবে, তখনই সে স্বাধীন বা মুক্ত মানুষ হিসাবে রূপান্তর লাভ করবে।[২৭]

হেগেল তাঁর দর্শনে বললেন যে, মানুষ তার বিভিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলে, আর সেজন্য মানুষের শ্রমই হল ইতিহাসের প্রধান সঞ্চালক শক্তি। এই শ্রম শুদ্ধচেতনারই (pure spirit) আত্মচ্যুত অবস্থা। নির্বিশেষ-প্রত্যয়ের (abstract categories) ছায়াই হচ্ছে ব্যক্তিমানুষ, আর এদের সঙ্ঘাতই হচ্ছে ইতিহাস। মার্কস হেগেলের প্রথম বক্তব্যটিকে স্বীকার করে দ্বিতীয়টিকে করলেন প্রত্যাখ্যান। তিনি হেগেলের অপূর্ণতা দেখিয়ে বললেন যে, সামাজিক সংস্থাগুলির সঙ্গে অ্যালিয়েনেশনের যে যোগ আছে সেকথা স্বীকার করা সত্ত্বেও হেগেল দেখাতে পারলেন না কিভাবে এগুলির পরিবর্তন করে অ্যালিয়েনেশন নিরাকরণ করা যায়। মার্কস তাই বললেনঃ হেগেলের 'alienation of idea'-র জায়গায় বসাতে হবে 'alienation of man' তত্ত্বকে।[২৮]

ফয়েরবাখের সঙ্গে মার্কসও একমত যে, নৃতত্ত্বই ইতিহাসের চাবিকাঠি, কিন্তু ফয়েরবাখের মতো মানুষের শাশ্বত সত্তাকে (human essence) তিনি স্বীকার করলেন না। মার্কসের মতে, যদিও নিষ্প্রাণ জড় থেকেই চেতনার সৃষ্টি তবুও চেতন মানুষের মধ্যে অসীম শক্তি লুকিয়ে আছে। সমাজেই মানুষ মনুষ্যনামধারী প্রাণী হয়ে ওঠে, আবার এই সমাজই সময়ে সময়ে মানুষকে অমানবিক করে তোলে, পুঁজিবাদ তাকে করে তোলে আত্মচ্যুত।

২৫। 'কার্ল মার্কস ও অ্যালিয়েনেশন' শীর্ষক প্রবন্ধ, এক্ষণ পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, পৃঃ ১৪০

২৬। '...human essence is no abstraction inherent in each single individual. In its reality it is the ensemble of the social relations.' [Selected Works (in one vol.), p. 29]

২৭। The German Ideology—Karl Marx and Frederick Engels, Progress Publishers, Moscow, 1968, pp. 43-6

২৮। Economic and Philosophic Manuscripts of 1844—Karl Marx, Progress Publishers, Moscow, 1974. See the Chapter 'Critique of the Hegelian Dialectic and Philosophy as a Whole.'

স্বামীজী এই অ্যালিয়েনেশন বা স্বরূপচ্যুতির সমস্যাটি প্রধানত বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। জীব মূলত ব্রহ্ম—অসীম জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ। কিন্তু অজ্ঞানের প্রভাবে সে নিজেকে সসীম ভেবেই স্বরূপচ্যুত হয়ে পড়েছে। এই অজ্ঞান বা মায়া যা খণ্ডরূপে ব্যক্তিমানসরূপে প্রতিভাত হয়, তার দ্বারাই পঞ্চকোশবিম্বিত ব্রহ্ম জীবরূপে আপাত-প্রতীয়মান হন। এই হচ্ছে স্বামীজী-বর্ণিত আত্মচ্যুতির মূল কথা। 'অবিদ্যাই সকল দুঃখের প্রসূতি এবং মূল অজ্ঞান এই যে, আমরা মনে করি—সেই অনন্তস্বরূপ যিনি, তিনি আপনাকে সান্ত মনে করিয়া কাঁদিতেছেন; সমস্ত অজ্ঞানের মূলভিত্তি এই যে, অবিনাশী নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আত্মা হইয়াও আমরা ভাবি, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহমাত্র।'[২৯]

মার্কস-কথিত জৈবসত্তা থেকে মানুষকে ব্রহ্মসত্তায় টেনে নিয়ে গেলেন স্বামীজী। কিন্তু এই আত্মচ্যুতির পরিসরকে কেবল আধ্যাত্মিক জীবনেই সীমাবদ্ধ না করে স্বামীজী এর কার্যকারিতার প্রভাব রাজনীতির ক্ষেত্রে, সমাজজীবনে, অর্থনীতির বিষয়েও ব্যাখ্যা করে দেখালেন।

হেগেলের অনুসরণে মার্কস বললেন, অ্যালিয়েনেশনের উৎস শ্রমবিভাগ এবং এর ফলেই 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি'র আবির্ভাব। সমাজে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই শ্রমিকের দল নিজেদের শ্রমকে অন্যের স্বার্থে ব্যবহার করে নিজেদের জীবনযাত্রার মানকে ক্রমশই নীচে নামিয়ে আনে। এইভাবে শ্রমিকদের সৃষ্ট বৈষয়িক সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন শ্রমিকদের জীবনযাত্রার গ্লানি বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে ক্রমশই বেশী সংখ্যক মালিকের ভাগ্যে দুর্দিন ঘনিয়ে আসে, যার ফলে সমগ্র সমাজই অ্যালিয়েনেশনের সর্বগ্রাসী গহ্বরে নিমজ্জিত হয়। 'The Holy Family' গ্রন্থে মার্কস বলছেন: 'The propertied class and the class of the proletariat present the same human self-alienation. But the former class finds in this self-alienation its confirmation and its good, its own power; it has in it a semblance of human existence. The class of the proletariat feels annihilated in its self-alienation; it sees in it its own powerlessness and the reality of an inhuman existence.'[৩০]

পুঁজির সাহায্যে এভাবে অ্যালিয়েনেশন ঘটে সমগ্র সমাজে। মার্কসের মতে, এই আত্মচ্যুতি চার রকমের[৩১]:

১) Alienation from the process of work—শ্রমিক যত বেশী শ্রম করছে, ততই সে শোষিত হচ্ছে।

২) Alienation from the products of labour—নিজের সৃষ্ট বস্তু পণ্যরূপে অন্যের ভোগে যাচ্ছে, কিন্তু শ্রমিক তা ব্যবহার করতে পারছে না।

২৯। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৬

৩০। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উদ্ধৃতি, এক্ষণ পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, পৃঃ ১৪৬

৩১। Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, pp. 64, 65, 69 and 70

৩) Alienation of the worker from himself—শ্রমিক ক্রমশই নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে এবং মনের মধ্যে এক অবহেলিত দাসত্বের ভাব পোষণ করে।

৪) Alienation of the worker from others—শ্রমিকের চোখে তার মালিক সর্বময় নিষ্ঠুর প্রভু আর অন্যান্য শ্রমিকেরা হতভাগ্য ক্রীতদাস মাত্র। শ্রমিকের মনের মধ্যে জগৎ সম্পর্কে এই ভাব গড়ে ওঠে।

এইভাবে অ্যালিয়েনেশন-তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে মার্কস কেবল অর্থনৈতিক শোষণের উল্লেখই করেছিলেন। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থনীতি কিভাবে মানুষকে অ্যালিয়েনেটেড করে তোলে, সেকথাই তিনি বুঝিয়ে গেছেন 'ক্যাপিটাল', 'হোলি ফ্যামিলি', 'ইকনমিক অ্যাণ্ড ফিলজফিক ম্যানিউস্ক্রিপ্টস অব ১৮৪৪' বইগুলিতে।

সমাজব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে কিভাবে অ্যালিয়েনেশন প্রভাব বিস্তার করে সেসম্বন্ধে মার্কস কেবল ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিরই উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি অ্যালিয়েনেশনকে এক সামাজিক সমস্যা হিসাবেই ধরেছেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন যুগে এর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন, তবুও তাঁর মতে পুঁজিবাদী সমাজেই এর ব্যাপকতা দেখা যায়। স্বামীজী কিন্তু আরও গভীরে গিয়ে অ্যালিয়েনেশনের ব্যাপক কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে, সমাজে শোষণ কেবল অর্থের সাহায্যেই হয় না। বলছেন তিনি ঃ 'বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার ধারণা মনুষ্যজীবনের কলঙ্কস্বরূপ।...প্রথমে আসে পাশব সুবিধার ধারণা—দুর্বলের উপর সবলের অধিকারের চেষ্টা। এই জগতে ধনের অধিকারও ঐরূপ। একটি লোকের অপরের তুলনায় যদি বেশী অর্থ হয়, তাহা হইলে যাহারা কম অর্থশালী, তাহাদের উপর সে একটু অধিকার স্থাপন বা সুবিধা ভোগ করিতে চায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের অধিকার-লিপ্সা সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী। যেহেতু একটি লোক অন্যদের তুলনায় বেশী জানে শোনে, সেইজন্য সে অধিকতর সুবিধার দাবি করে। সর্বশেষ এবং সর্বনিকৃষ্ট অধিকার হইল আধ্যাত্মিক সুবিধার অধিকার।...যাহারা মনে করে "আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা বেশী জানি", তাহারা অন্যের উপর অধিকতর দাবি করে।...কিন্তু বৈদান্তিক কাহাকেও শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোনরূপ অধিকার দিতে পারেন না, একেবারেই নয়।'[৩২]

স্বামীজীর চোখে তাই শোষণ বা নিপীড়নের চারটি রূপ ঃ

(১) জ্ঞানবলে বা বুদ্ধিবলে বলীয়ানের অত্যাচার,

(২) অস্ত্রশক্তিতে বলীয়ানের অত্যাচার,

(৩) অর্থশক্তিতে সম্পদশালীর অত্যাচার, এবং

(৪) কায়িক শ্রমের শক্তিতে অত্যাচার।

স্বামীজীর মতে, এই চার রকম নিপীড়নই মানুষের স্বাধীন বিকাশের প্রতিবন্ধক এবং সেজন্য এগুলির নিরাকরণ চাই। ইতিহাসের নিদর্শন দিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ 'মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারিটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেকটির শাসনকালে রাষ্ট্রে দোষগুণ

৩২। বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ৩৩৭-৩৮

উভয়ই বর্তমান। পুরোহিত-শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সঙ্কীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকার রক্ষার জন্য চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে—তাঁরা ছাড়া বিদ্যা শিখবার অধিকার কারও নেই...এযুগের মাহাত্ম্য এই যে, এসময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন। ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদার নন। এযুগে শিল্পের ও সামাজিক কৃষ্টির চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে। তারপর বৈশ্যশাসন-যুগ। এর ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্ত-শোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—ভয়াবহ! এযুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়! সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এযুগের সুবিধা হবে এই যে, এসময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সংস্কৃতির অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।'[৩৩]

মার্কস যেহেতু মনে করতেন যে, একমাত্র অর্থনৈতিক শোষণই অ্যালিয়েনেশনের মূল, তাই তাঁর দাবি—সমাজের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মানুষ একদিকে যেমন সামাজিক উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে বিচ্যুত, অন্যদিকে সে বিচ্যুত তার স্বীয় শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য থেকে। মানুষের আত্ম-জাগরণের পথ তাই একটিই—উৎপাদন-উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার নিষেধ হলেই ব্যক্তিমানুষ তার স্বরূপ খুঁজে পাবে। আর এই সমাজ-রূপান্তরের কর্মকাণ্ডকে মার্কস অভিহিত করেছেন 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' নামে, যেপথ নিয়ে যাবে আদর্শ মানবসমাজ communist society-র দিকে। তাঁর ভাষায়ঃ '*Communism* as the *positive* transcendence of *private property* as *human self-estrangement,* and therefore as the real *appropriation* of the *human* essence by and for man; communism therefore as the complete return of man to himself as a *social* (i. e., human) being—a return accomplished consciously and embracing the entire wealth of previous development.'[৩৪]

আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে স্বামীজী বলছেনঃ 'যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।'[৩৫] কিন্তু সমস্ত সামাজিক দুর্দশার মূলে, স্বামীজী

৩৩। তদেব, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৪৯

৩৪। Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, p. 90

৩৫। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯-৫০

শিক্ষার অভাবকেই দেখতে পেয়েছেনঃ 'কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের—ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish colonists (আইরিশ উপনিবেশবাসীরা) আসিতেছে—ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ-মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে; তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে "ভয় ভয়" ভাব নাই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ Irishman-কে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল, "প্যাট (Pat), তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।" আজন্ম শুনিতে শুনিতে Pat-এর তা-ই বিশ্বাস হল, নিজেকে Pat হিপনটাইজ করলে যে, সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল—"প্যাট, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই তো সব করেছে, তোর আমার মতো মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ।" Pat ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।"'[৩৬]

'সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।...পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইবার জন্যই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।'[৩৭]

এই শিক্ষার অভাবেই সাধারণ মানুষ নিজের উন্নতির পথ বুঝতে পারে না। আর এর ফলে অন্যান্য আনুষঙ্গিক অভাব, যেমন বহির্জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, নিম্নমানের জীবনযাত্রা, একতা ও উচ্চ আদর্শের প্রতি উদাসীনতা ইত্যাদি সহজেই এসে পড়ে। প্রশ্ন উঠতে পারে—যেদেশে শিক্ষিতের হার প্রায় শতকরা একশ সেদেশে কি দুঃখকষ্ট নেই? এই প্রশ্নটি বিচার করার আগে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা দরকার। (স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা নিয়ে এই গ্রন্থে ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় আলাদাভাবে আলোচনা করেছেন বলে আমরা আর এর আলোচনায় যাচ্ছি না।) শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উপর অর্থনৈতিক অত্যাচার যে কমবে তার কোন স্থিরতা আছে কি? স্বামীজীর চিন্তাধারা ও বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা আমাদের এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেয়। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা বেড়ে ওঠে। আর এর ফলে, দেশে প্রবর্তিত হয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন,

---

৩৬। তদেব, পৃঃ ৩৭৪-৭৫ ৩৭। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫

নানান রাজনৈতিক দল, আদালতগুলির অতিরিক্ত শক্তি এবং সর্বোপরি দেশের জাতীয় অর্থনীতি-পরিকল্পনায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ। এইভাবে স্বামীজী দেখিয়েছেন, শিক্ষার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ এনে সকল রকম শোষণের নিরাকরণ করা যায়।

॥ ৪ ॥

আজ পর্যন্ত বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দেশে যে নানান রকম শাসনতন্ত্র দেখা গেছে, তার কারণ কি? সমাজে শোষণের নিরাকরণ। সমাজনিয়ন্তারা যখনই জনসাধারণের চেয়ে কিছু বিশেষ সুবিধা বা অধিকার (special privilege) দাবি করেন তখনই শোষণের সূত্রপাত ঘটে। এই শোষণ একটা সীমা ছাড়িয়ে বেড়ে উঠলেই ঘটে বিদ্রোহ বা বিপ্লব। সমাজনিয়ন্ত্রণের ভার যায় নতুন শাসকের হাতে, তৈরী হয় নতুন শাসনতন্ত্র। একচ্ছত্র রাজার যুগ শেষ করে প্লেটো চাইলেন আদর্শ শাসকের (Philosopher King) উপর শাসনের ভার দিতে। অ্যারিস্টটল একজন দার্শনিক রাজার উপর ভরসা না করে সমাজের জ্ঞানিগুণীদের নিয়ে অভিজাততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাইলেন। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জাত ম্যাকিয়াভেলি পোপের কর্তৃত্বনাশ করে রাজতন্ত্রকে সমর্থন জানালেন। হবসের চিন্তায় আবার জনসাধারণের অধিকারের কথা উচ্চারিত হল। লক-এর বক্তব্যে তা আরও জোরদার হয়ে উঠে রুশোর সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীতে তার পরিণতি ঘটল। হবস-লক-রুশোর চেষ্টায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর আবার দেখা গেল শোষণ। গণতন্ত্র মানুষকে যে স্বাধীনতা দেয় তার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা ক্ষমতা একচেটিয়া করা শুরু করল। ফলে, নতুন করে ধ্বনিত হতে লাগল সমাজতন্ত্রের বাণী। ফেবিয়ান সোস্যালিজম থেকে শুরু করে নাইহিলিজমে এর চূড়ান্ত রূপের কথা ঘোষিত হল। স্বামীজী বলছেন: সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতখানি হওয়া উচিত এবং সমাজের জন্য ব্যক্তি কতখানি আত্মত্যাগ করবে, এই প্রশ্নের উত্তরদানের চেষ্টাই হচ্ছে রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাস। যে মত ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকেই সর্বোচ্চ স্থান দিতে চায় তা গণতন্ত্র, আর যে মত সমাজকেই মুখ্য বলে ধরে তা হচ্ছে সমাজতন্ত্র।'[৩৮]

গণতন্ত্র-প্রসঙ্গে লেনিনের মত হচ্ছে: 'প্রভু শ্রেণীর কোন্ লোকটি পার্লামেন্টে জনগণকে দমিত ও দলিত করবে, কয়েক বছরে একবার করে তা স্থির করা—এই হল বুর্জোয়া পার্লামেন্ট-প্রথার আসল মর্মার্থ, এবং সেটা শুধু পার্লামেন্টী নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেই নয়, সর্বাধিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও।'[৩৯] রাষ্ট্রকে মার্কস দেখেছেন শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসাবে। নির্বাচনের নামে অর্থ দিয়ে এই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ধনীরা। পরে বিরাট আমলাবাহিনী এবং সশস্ত্র সেনাবাহিনী দিয়ে সমগ্র দেশটাকে নিজেদের মুঠোয় নিয়ে আসে। আমলাতন্ত্রকে দিয়ে তারা দেশের শাসনব্যবস্থা চালায়,

৩৮। তদেব, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৭০

৩৯। রাষ্ট্র ও বিপ্লব—ভি. আই. লেনিন, মস্কো, পৃঃ ৪৬

শ্রমিকদের দিয়ে উৎপাদন চালু রাখে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনী দিয়ে নিজেদের আসন অটুট রেখে এরা কোন কাজ না করেই নিজেরা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে; ফলে, নামে গণতন্ত্র হলেও দেশটি পরিণত হয় ধনীদের অবাধ লীলাক্ষেত্রে যেখানে ধনীরা আরও ধনী হয় আর গরীবেরা আরও গরীব হয়। মার্কস তাই সমাজতন্ত্রকে স্বাগত জানিয়েছেন।[৪০] প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণাগুলির দুর্বলতা দেখিয়ে তিনি নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা গড়ে তুললেন। অন্যান্য সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করে তিনি বললেন: 'সমালোচনামূলক ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের যা তাৎপর্য তার সঙ্গে ঐতিহাসিক বিকাশের সম্বন্ধটা বিপরীতমুখী। আধুনিক শ্রেণী-সংগ্রাম যতই বিকশিত হয়ে সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে থাকে, ঠিক ততই এই উদ্ভট সংগ্রাম পরিহারের, শ্রেণীসংগ্রামের বিরুদ্ধে এইসব উদ্ভট আক্রমণের সকল ব্যবহারিক মূল্য ও তাত্ত্বিক যুক্তি হারায়। সেইজন্যই, এই সমস্ত মতবাদের প্রবর্তকেরা অনেক দিক দিয়ে বিপ্লবী হলেও তাঁদের শিষ্যরা প্রতিক্ষেত্রে কেবল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীতেই পরিণত হয়েছে।...তাই তাদের অবিচল চেষ্টা যেন শ্রেণী-সংগ্রাম নিস্তেজ হয়ে পড়ে, যেন শ্রেণী-বিরোধ আপসে মিটে যায়।...আর এই আকাশকুসুম বাস্তব করার জন্য আবেদন জানায় বুর্জোয়াশ্রেণীর সহানুভূতি ও টাকার থলির কাছে।...আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিস্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে কেবল সমস্ত প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সবল উচ্ছেদ মারফত।'[৪১] মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের তাই আবশ্যিক অঙ্গ হবে 'প্রলেতারিয়েত ডিক্টেটরশিপ' এবং কর্মসূচীর মধ্যে থাকবে জমি-মালিকানার অবসান, সব রকমের উত্তরাধিকার বিলোপ, রাষ্ট্রীয় পুঁজি ও নিরঙ্কুশ একচেটিয়া অধিকার-সহ একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক মারফত সমস্ত ক্রেডিট রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ, যোগাযোগ, পরিবহন, উৎপাদন-উপকরণের রাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদি।[৪২] মার্কসের মতে, এই ধরনের সমাজতন্ত্রেই ঘটবে মনুষ্যত্বের বিকাশ: 'The transformation, through the division of labour, of personal powers (relationships) into material powers, cannot be dispelled by dismissing the general idea of it from one's mind, but can only be abolished by the individuals again subjecting these material powers to themselves and abolishing the division of labour. ...In the previous substitutes for the community, in the State, etc., personal freedom has existed only for the individuals who developed within the relationships of the ruling class, and only insofar as they were individuals of this class. The illusory community, in which individuals have up till now combined, always took on an independent existence in relation to them, and was at the same time, since it was the combination of one class over against

৪০। কমিউনিস্ট ইস্তেহার—মার্কস ও এঙ্গেলস, মস্কো, ১৯৭০, পৃঃ ৫৫

৪১। তদেব, পৃঃ ৬৮-৯ ও ৭২ ৪২। তদেব, পৃঃ ৫৬

another, not only a completely illusory community, but a new fetter as well. In the real community the individuals obtain their freedom in and through their association.'[৪৩]

স্বামীজী বুঝেছিলেন যে, মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেবার জন্য নয়। বরং ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতালাভে সহায়তা করবে এইটিই সমাজের প্রধান লক্ষ্য। তিনি চেয়েছিলেন, রাষ্ট্র যেহেতু বৈচিত্র্যময় অসংখ্য ব্যক্তিত্বের সমষ্টি, সেহেতু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া। তাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি তো বটেই, পরন্তু ভাবাদর্শের মুক্তি বা স্বাধীনতাই রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তির প্রধান দাবি। বিভিন্ন সঙ্ঘাত ও মিলনের মধ্য দিয়ে সমাজকে দ্রুতবেগে অগ্রসর করিয়ে দেবার জন্য চিন্তা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক।

স্বামীজীর লেখাগুলি পড়লেই মনে হয়, গণতন্ত্রের এত বড় পূজারী দুর্লভ। নিজেও তিনি বলছেন, 'আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে—ব্যক্তিত্বের বিকাশ।'[৪৪] যে রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপ ঘটাতে চায়, সে রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধনে তিনি আহ্বানও জানিয়েছেন,[৪৫] কারণ তাঁর মতে, ব্যক্তিত্ববিকাশের একমাত্র শর্ত হচ্ছে—স্বাধীনতা। 'চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা।'[৪৬] তাঁর মানসপটে যে আদর্শ রাষ্ট্রের ছবি ভেসে উঠেছিল, সে রাষ্ট্রের শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধনব্যবস্থা-প্রমে থাকবে জনসাধারণের অবাধ সমান-অধিকার। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বকীয়তা আছে বলে তাকে স্বাধীনভাবে বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। এই সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থায় চাই জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা।

গণতন্ত্রের জয় ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী এর দুটি ত্রুটিও উল্লেখ করেছেন। একটি আসে প্রজাদের দিক থেকে, অন্যটি শাসকদের কাছ থেকে। গণতন্ত্রের অত্যধিক প্রয়োগে প্রজাদের উচ্ছৃঙ্খল হবার সম্ভাবনা, ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বার্থপর স্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়: '...বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গি অপূর্ব বাসনার উদয় করিয়েছে।'[৪৭] আর শাসকেরা? স্বামীজী বলছেন: 'ও তোমার "পার্লেমেন্ট" দেখলুম, "সেনেট" দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র!... শক্তিমান পুরুষেরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।...রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে...সে ঘুষের ধুম, সে দিনে ডাকাতি,

---

৪৩। The German Ideology, p. 90   ৪৪। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪

৪৫। স্বামীজী লিখেছেন: 'সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে-বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে-সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত।' [বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২৪]

৪৬। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২   ৪৭। তদেব, পৃঃ ১৫৯

যা পাশ্চাত্যদেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে তো মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে।'[৪৮]

সমাজতন্ত্রের ভাল দিকটি কি? স্বামীজীর মতে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের কাছে নতি স্বীকার করানোর কঠোর শিক্ষার মস্তবড় গুণ হচ্ছে— সমাজনির্দেশিত কাজে ব্যক্তির নিপুণতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ নিজের স্রোতে চলে।[৪৯] আর এর দোষ কি? সমাজের কাছে ব্যক্তির দাসত্বের পরিণামে উৎসাহ-উদ্যম, মননশীলতা, তীব্র অনুভূতির ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এইসব হতভাগ্য লোকেরা বুঝতে পারে না স্বাধীনতার জ্যোতির্ময় দ্যুতি কি বস্তু। বলছেন স্বামীজীঃ '(সমাজ-নির্দেশিত কর্ম) মনুষ্য প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে করে...নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের আদর নাই।...এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কিনা, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।'[৫০]

স্বামীজী তাই এই দুই মতবাদের বিশ্লেষণ করে যথার্থ কল্যাণকর রাস্তাটি বেছে নিতে চেয়েছিলেন। গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করেই সমাজতন্ত্রকে সার্থক করে তুলতে হবে। ইতিহাসচেতনার সাহায্যে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, রেজিমেন্টেড সমাজ সভ্যতার অনুকূল নয়। বৈচিত্রকরণের উপরে গণতন্ত্রী যে অধিক গুরুত্ব দেন তা যেমন সঙ্গত, তেমনি সমাজতন্ত্রীর যৌথস্বার্থের গুরুত্বও সঙ্গত। এই জায়গাতেই স্বামীজী বেদান্তদর্শনের উপরে ভিত্তি করে সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। এক ব্রহ্ম থেকেই বৈচিত্রময় জগৎ বেরিয়ে এসেছে যাতে ওতপ্রোতভাবে ব্রহ্মই জড়িয়ে আছেন। বহুত্বের মধ্যে একত্ব আর একত্বের মধ্যে বহুত্ব—এই বৈদান্তিক তত্ত্বকেই তিনি রাষ্ট্রনীতির মূলে লাগিয়েছেন। বৈচিত্রের ভিত্তিতে যেমন বৈষম্য ও বিশেষ-সুবিধারূপী অন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তেমনি একত্বের ভিত্তিতে জীবনের ধর্ম প্রাণের খেলা রুদ্ধ হয়। তাই দুয়েরই প্রয়োজন রাষ্ট্রসঙ্গঠনে। 'ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণ'—এই নীতির সাহায্যেই তিনি যুগসমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন। আর এ সার্থক হবে একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা, আত্মিক অনুশীলনের সাহায্যে, যখন মানুষ স্বেচ্ছায় নিঃস্বার্থ হতে পারবে। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেনঃ 'বহুর জন্য একের সুখ—একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ...বলপূর্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? ...আমি বলি, বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পার বন্ধন খোল।... বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে?...সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন তো তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, সে ঢের দূর! আবার তার রাস্তা কি

৪৮। তদেব, পৃঃ ১৬১-৬২। পরমকুডিতে এক বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'দেশের সব ধন, সব ক্ষমতা অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের হাতে; তাহারা নিজেরা কোন কাজ করে না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারী দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার ক্ষমতা রাখে। ... পাশ্চাত্য জগৎ মুষ্টিমেয় "শাইলকে"র শাসনে পরিচালিত হইতেছে। আপনারা যে প্রণালীবদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পার্লামেণ্ট-মহাসভা প্রভৃতির কথা শোনেন—সেগুলি বাজে কথামাত্র। পাশ্চাত্য দেশ শাইলকগণের অত্যাচারে আর্তনাদ করিতেছে।' [বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫০-১] ৪৯। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৭০-৭১ ৫০। তদেব, পৃঃ ১৭১

জুলুমের উপর দিয়ে?....যে বীর, সেই ত্যাগ করতে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোখ মুচছে আর এক হাতে দান করছে, তার দানে কি ফল?...একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়।'[৫১] আর এ সম্ভব হবে একমাত্র বেদান্তের ভিত্তিতে মানুষ যখন সর্বপ্রাণীকে স্বীয় আত্মারই বিভিন্ন রূপ বলে ভাবতে শিখবে। আত্মিক চেতনার সাহায্যেই কেবল মানুষ এই সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সামঞ্জস্য করতে পারে।

গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতার ভিত্তিতে সাম্য—এই ছিল স্বামীজীর ধ্যাননেত্রে। হেগেল-মার্কস-বোসাঙ্কে-গ্রীন প্রমুখের সঙ্গে মিল-বেন্থাম-স্পেনসারের চিন্তাধারার একটি সার্থক সমন্বয় তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। বেদান্তের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই তিনি যুগসমস্যার অপূর্ব সমাধান দিলেন: 'ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর।'[৫২]

মার্কসবাদীরা আজ ক্রমশ এই গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝতে পারছেন। পোল্যাণ্ডের ভিয়েলোভিয়েস্কি লিখেছেন: 'Socialism will become a stimulating ideal for the people only if it is closely identified in their consciousness with democratization. People are willing to undertake great efforts and accept new sacrifices only when social goals are determined with their active participation.'[৫৩] মার্কসবাদী রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী শাসনক্ষমতা যে মানুষের স্বকীয় উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এ কথাটি আজ মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা অস্বীকার করতে পারছেন না। অস্ট্রিয়ার মার্কসবাদী পণ্ডিত আর্নেস্ট ফিশার ব্যথিত হৃদয়ে মন্তব্য করেছেন: '...a new alienation is created when power passes, by institutionalization and bureaucratization, from revolutionary organs into the hands of a central authority.'[৫৪] আজ এজন্যই বিভিন্ন মার্কসবাদী রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এ-প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব।

॥ ৫ ॥

মার্কসের মতানুসারে রাষ্ট্র হচ্ছে এক শ্রেণীর দ্বারা অন্যান্য শ্রেণীকে দমন করার হাতিয়ার। তিনি তাই পরিণামে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি চেয়েছেন। 'অ্যান্টিদ্যুরিং' গ্রন্থের 'ওগেন

৫১। তদেব, পৃঃ ১৭২-৭৩ ৫২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯

৫৩। Przed trzecim przypieszeniem (Before the Third Acceleration)—Andrej Wielowieyski (Warshaw, 1968). Quoted in the paper 'Problems of Communism' (Edited Paul A. Smith, Jr.), Washington, DC, July-August 1975, p. 70

৫৪। Art against Ideology—Ernest Fisher, London, 1969, p. 90

দ্যুরিং কর্তৃক বিজ্ঞান উৎখাত' অধ্যায়ে এঙ্গেলস এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, সর্বহারা-শ্রেণী বিপ্লবের সাহায্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে 'প্রলেতারিয়েত ডিক্টেটরশিপ' প্রতিষ্ঠা করবে, ফলে এদের হাতে আসবে উৎপাদনের উপায়গুলি এবং ধনী ও পূর্বতন শাসকশ্রেণীর উচ্ছেদ হবে। এই স্তরে রাষ্ট্রের কাজ সর্বহারা-শ্রেণীর সাহায্যে অন্যান্য শ্রেণীর দমন। এইভাবে যখন সমস্ত শ্রেণীর উচ্ছেদে শ্রেণীতারতম্য ঘুচে যাবে, তখন চূড়ান্ত পর্যায় (যাকে মার্কস বলেছেন কমিউনিজমের দ্বিতীয় ধাপ) শুরু হয়ে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটবে। লেনিন এর ব্যাখ্যা করে বলেছেনঃ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের 'উচ্ছেদ' (expropriation) হয়, কিন্তু প্রলেতারিয় রাষ্ট্র 'শুকিয়ে মরে' (withers away)।[৫৫] 'শুকিয়ে মরে' কথাটার অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্রে যখন কোন শ্রেণী থাকবে না তখন দমনকার্যের জন্য কোন হাতিয়ারও দরকার হবে না; এর ফলে ধীরে ধীরে প্রাচীন যুগের মতো 'সমিতি'র (commune) আবির্ভাব হবে যেখানে প্রতিটি মানুষই সমাজপরিচালনার ব্যাপারে আগ্রহান্বিত থাকবে। এইভাবে 'সমিতি' এসে সরকারের স্থান গ্রহণ করে ও রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে। এর বিশদ ব্যাখ্যা করে লেনিন বলছেনঃ 'Only in Communist society, when the resistance of the capitalists has been completely crushed, when the capitalists have disappeared, when there are no classes (i.e., when there is no distinction between the members of society as regards their relation to the social means of production), only then "The state...ceases to exist", and it becomes possible to speak of "freedom". Only then will a truly complete democracy becomes possible and be realized, a democracy without any exceptions whatever. And only then will democracy begin to wither away, owing to the simple fact that, freed from capitalist slavery, from the untold horrors, savagery, absurdities and infamies of capitalist exploitation, people will gradually become accustomed to observing the elementary rules of social intercourse that have been known for centuries and repeated for thousands of years in all copy book maxims.'[৫৬]

সর্বহারা-বিপ্লবের পর প্রথম পর্যায় 'সর্বহারার একনায়কত্ব' যেখানে প্রতিটি শ্রমিক সমাজকে যেটুকু দেবে সেই পরিমাণে সে পাবে। ('After a deduction is made of the amount of labour which goes to the public fund, every worker, therefore, receives from society as much as he has given to it.')[৫৭] এই পর্যায়ে কিন্তু রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকছে। পরবর্তী পর্যায়ে যখন রাষ্ট্র শুকিয়ে যাচ্ছে তখন মার্কসের ভাষায়ঃ 'In a higher phase of communist society, after the enslaving subordination of the individual of the division of labour and

৫৫। রাষ্ট্র ও বিপ্লব, পৃঃ ১৭-২৩

৫৬। Marx Engels Marxism—V.I. Lenin, Moscow, 1968, p. 338 ৫৭। ibid., p. 341

with it also the anti-thesis between mental and physical labour has vanished, after labour has become not only a livelihood but life's prime want, after the productive forces have increased with the all-round development of the individual, and all the springs of co-operative wealth flow more abundantly only then can the narrow horizon of bourgeois right be crossed in its entirety and society inscribe on its banners : From each according to his ability, to each according to his needs.'[৫৮]

বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখা যাক। লেনিন মনে করতেন (মার্কসীয় মতানুসারেই নিশ্চিত), ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ হলে মানুষ আর স্বার্থপর হবে না, তখন সে স্বেচ্ছায়ই সমাজের জন্য কাজ করবে। যখন শ্রমবিভাগ থাকবে না, মানুষ তখন আর শ্রমকে জীবিকা-অর্জনের উপায় হিসাবে দেখবে না (কারণ সমাজই তাকে দেবে প্রয়োজনীয় সবকিছু) ; সে তখন নানান কর্মবৈচিত্রে নিজের স্রষ্টারূপ বিকশিত করবে। মানুষ তখন আদর্শ মানুষে পরিণত হবে, পৃথিবী পরিণত হবে আদর্শ পৃথিবীতে। রাষ্ট্র তখন আর নেই, সামাজিক কাজগুলি রাজনৈতিক থেকে পরিণত হবে সাধারণ ব্যবস্থাপনার কাজে। মার্কস মনে করেন, এটাই সমগ্র বিশ্বের স্বাভাবিক গতি। ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় সকল তন্ত্রই শেষ পর্যন্ত সর্বহারার একনায়কত্বরূপী মার্কসীয় সমাজতন্ত্রে পর্যবসিত হবে এবং পরিণামে আদর্শ সমাজে রূপান্তর লাভ করবে।

মার্কসের এই সিদ্ধান্তের পিছনে কতকগুলি ত্রুটি দেখা যায়। তিনি মনে করেন, ইতিহাস এভাবেই এগিয়ে চলছে অনিবার্য গতিতে, একে থামিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। স্বভাবতই, এ অনেকটা ভাববাদী ধারণা, যে ধারণা অন্ধ নিয়তিতে বিশ্বাসী। ইতিহাসের মধ্যে একটি সূত্র খোঁজা যেতে পারে, কিন্তু সে সূত্র গাণিতিক সূত্র নয়। শিল্পে অনগ্রসর রাশিয়াতে লেনিন শ্রমিকবিপ্লব গড়ে তুললেন অথচ শিল্পোন্নত জার্মানীতে লাইবনীখ্‌ট ব্যর্থ হলেন, মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে আধুনিক যুগে তুরস্ককে উন্নীত করলেন কামাল পাশা অথচ আফগানিস্তানে আমানুল্লা ব্যর্থ হলেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বাংলায় বিপ্লব ঘটেনি অথচ আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যেও ফ্রান্সে বিপ্লব হয়েছে বহুবার—এইসব বিভিন্ন ঘটনা প্রমাণ করেছে ইতিহাস ঠিক গাণিতিক সূত্র মেনে চলে না। হেগেল যেমন বিশ্বাস করতেন যে, ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রজ্ঞার উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে চলেছে, মার্কস সেই কথাটিকেই একটু ঘুরিয়ে বলেছেন মাত্র। জড়বাদী কোন মানুষের পক্ষে এ ধরনের ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব কি ? হেগেল যেমন মনে করেছিলেন, প্রুশীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘর্ষ থেমে যাবে, মার্কসও কমিউনিস্ট সমাজ সম্বন্ধে তা-ই মনে করেন।

শ্রেণীসংগ্রামই ইতিহাসের একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। বরং অতীতে গৃহযুদ্ধ যত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী হয়েছে জাতিতে জাতিতে কিংবা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ। গত দুটি বিশ্বযুদ্ধের একটিও শ্রেণীসংগ্রাম নয়। ইতিহাসের কিছু ঘটনা শ্রেণীসংগ্রাম বলে ব্যাখ্যা

৫৮। ibid., pp. 343-44

করা যেতে পারে, কিন্তু জাতীয়তা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভূমি, সম্পদ ইত্যাদির ভূমিকা যুদ্ধের ব্যাপারে সুপ্রচুর। বর্তমান দশকে চীন-রাশিয়ার অপ্রীতিকর সম্পর্ক কিংবা পাক-ভারত যুদ্ধগুলির কারণ নিশ্চয়ই শ্রেণীসংগ্রাম নয়!

ধনতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অতিসরলীকরণ-দোষে দুষ্ট। শোষক ও শোষিত, কেবলমাত্র এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে বর্তমান সমাজ ক্রমশই জটিল আকার ধারণ করছে। বিশেষত, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং যুবসমাজ যে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন হয়ে আজকের সমাজে দণ্ডায়মান তার কোন সমাধান মার্কস দিয়ে যাননি।

সাম্রাজ্যবাদী যুগ সম্বন্ধেও মার্কসের বিশ্লেষণ যথেষ্ট নয়। একটিমাত্র দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব—একথা তিনি কখনও বলেননি, অথচ রাশিয়াতে তা সম্ভব হয়েছে। মার্কসের মতানুসারে, উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা হবে, যে কথাটি আজ শুধু নিরর্থকই হয়নি, বিপরীত প্রতিপন্ন হয়ে এমন দেশে এ বিপ্লব ঘটাল যেদেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কোনও ঐতিহ্যই ছিল না।

মার্কসের মতে, সর্বহারা-শ্রেণীর মধ্যে সত্যচৈতন্যের প্রকাশ হবে, অন্যদের চৈতন্য মিথ্যা প্রকাশ মাত্র। কেন বললেন? শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইতিহাস সাম্যবাদী সমাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—এই কথাটা, মার্কসের মতে, একমাত্র সর্বহারা-শ্রেণীই বুঝতে পেরেছে। এবং এই তত্ত্বটি যে যত পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছে, সত্যচৈতন্যের প্রকাশ তার মধ্যে তত বেশী উদ্ভাসিত। মার্কসের একথাটায় কিছুটা স্ববিরোধ রয়ে গেছে।[৫৯] ডারউইনের মতে বিজয়ীর আচরিত ধর্মই নীতিধর্ম। কথাটা মার্কস প্রাথমিকভাবে স্বীকার করে নিয়েও শেষ পর্যন্ত সর্বহারা-শ্রেণীর ক্ষেত্রে তা অপ্রযোজ্য বললেন, কারণ নাহলে সর্বহারা-শ্রেণীর নীতিধর্মও একপেশে বলে গণ্য হবে। তিনি যখন সর্বহারা-শ্রেণীর নীতিধর্ম বললেন তখন তা যুগনিরপেক্ষ নীতিধর্ম বলেই মেনে নিলেন (যেহেতু ইতিহাসের অনিবার্য গতি সাম্যবাদী সমাজে—এটাই সর্বহারা শ্রেণীর নীতিধর্ম)। দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদে এ ধরনের যুগনিরপেক্ষ নীতিধর্মের ব্যাপারটা টেকে না যেহেতু এই জড়বাদ আপেক্ষিকতাবাদী। অথচ এই প্রশ্নে মার্কস হেগেলের মতো ভাববাদী হয়ে পড়লেন।

তাছাড়া, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ হলেই মানুষের মন থেকে হিংসা-দ্বেষ দূর হয়ে যাবে না। মনস্তত্ত্বানুসারে ক্ষমতালিপ্সা বা প্রভুত্বপ্রিয়তা অর্থনৈতিক চাহিদা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয় না। ভবিষ্যতের 'কমিউন' বা সমিতির পরিচালকেরা ক্ষমতালিপ্সায় আক্রান্ত হবেন না, এই ধরনের আশা অতিরিক্ত আশাই। মানুষের মনের এই মৌলিক দোষ দূর করার উপায় জড়বাদী নীতিবাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

রাশিয়ায় স্তালিন ও ক্রুশ্চেভ এবং চীনে লিউ-শাও-চি ও লিন-পিয়াও-এর পরিণতি এই আশঙ্কাকেই প্রমাণ করে। সাম্যবাদী সমাজের নতুন মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে রুশ ও চীনা নেতৃবৃন্দ যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাতেও আশানুরূপ ফল পাওয়া

৫৯। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'মার্কসবাদের সমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ, এক্ষণ পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, পৃঃ ১৬২-৬৩

যাচ্ছে না। রাশিয়া ও চীনে সরকারী ও বেসরকারী মহলে যে দুর্নীতি দানা বেঁধেছে তাতে উভয় সরকারই চিন্তিত। চীনা নেতৃবৃন্দ একে 'বুর্জোয়া পাপ-অবশেষ' বলে অভিহিত করলেও রাশিয়া তার অক্টোবর-বিপ্লবের দীর্ঘকাল পরেও এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারছে না। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ক্রুশ্চেভ নিজ দেশের এই দুর্নীতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'ঘুষ বিভিন্ন ব্যাপারে দেওয়া হয়, যেমন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য, বাড়ি তৈরীর পারমিট আদায়ের জন্য, জমি দেওয়ার ব্যাপারে, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে, এমনকি ডিপ্লোমা বিতরণের ক্ষেত্রেও। ...এই দুর্নীতি, এই ঘুষের চল আমাদের কেন্দ্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানেও অনুপ্রবেশ করেছে যাতে বহু উচ্চপদস্থ পার্টিসদস্যও জড়িত আছেন।'[৬০] ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর সলঝেনিৎসিন রুশ নেতৃবৃন্দকে যে গোপন চিঠি পাঠান তাতে তিনি লিখেছিলেন : 'I assume you know about the state of affairs throughout our national economy and throughout our gargantuan civil service : people don't put any effort at all into their official duties and have no enthusiasm for them, but cheat as much as they can and spend their office hours doing private jobs. Everybody is trying to make more money for less work. ...Bearing in mind the state of people's morals, their spiritual condition and their relations with one another and with society, all the *material* achievements we trumpet so proudly are petty and worthless.'[৬১]

কলকাতার চীনপন্থী পত্রিকা 'লালতারা' তার ৭।৬।৭৪ তারিখের সংখ্যায় মন্তব্য করেছিল : 'বস্তুত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সমগ্র ইতিহাসটাই...সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু এই মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা লক্ষণীয়। অধিকাংশ নেতাই একটি ঐতিহাসিক কালখণ্ডে তাঁদের ইতিবাচক ভূমিকা রেখে গেছেন, বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ; কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যকার বিপ্লব-বিরোধী ঝোঁক ক্রমশ বাড়তে শুরু করে এবং পরিশেষে প্রতিবিপ্লবীতে পরিণত হয়ে পড়েন।'

রাষ্ট্রবিলুপ্তি-তত্ত্বটির বাস্তবতা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক উঠতে পারে। দুটি দিক থেকে ব্যাপারটি যাচাই করা যায়। 'শ্রেণীদমনের হাতিয়ার'কেই রাষ্ট্র বলা হয়—এটাই যদি রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় সংজ্ঞা হয়, তবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যে রাষ্ট্রে শ্রেণীদমন নেই তা রাষ্ট্র নয়। বর্তমান রাশিয়া কি তবে রাষ্ট্র নয়? সরকারী ভাষ্যকারদের মতে, রাশিয়ায় বর্তমানে শ্রেণীতারতম্য বিদায় নিয়েছে, অথচ তাঁরাই আবার রাশিয়াকে এখনও রাষ্ট্র বলে যাচ্ছেন। (বর্তমান চীনে যে শ্রেণীতারতম্য রয়েছে একথা চীনা নেতারা স্বীকার করেন।) মার্কস শ্রমিকরাষ্ট্রের যে ছবি এঁকেছিলেন তাতে সরকারী সৈন্যবাহিনী ও পুলিসের বদলে সশস্ত্র জনগণের দ্বারা ন্যাশনাল মিলিশিয়া তৈরীর কথা বলেছিলেন।

৬০। Pravda (Nov. 20, 1962) ; USSR-এ দুর্নীতি কিভাবে বিভিন্ন স্তরে দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে Steven J. Staats-এর 'Corruption in the Soviet System' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য, quoted in the paper 'Problems of Communism,' July-August 1975, pp. 40-7

৬১। Letter to Soviet Leaders, pp. 34-5

মার্কসবাদী রাষ্ট্রগুলির এ ব্যাপারে অনীহা দেখা যাচ্ছে। আসলে, রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র শ্রেণীদমনের হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করা শূন্যগর্ভ সংজ্ঞারই পরিচায়ক। দ্বিতীয়ত, ধরা যাক ভবিষ্যতে সত্যিই রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজকর্ম রাজনৈতিক স্তর থেকে সরে গিয়ে সাধারণ ব্যবস্থাপনায় চলতে লাগল। তখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাষ্ট্রের বদলে 'সমিতি' (commune) নাম রাখলেই কি রাষ্ট্র বিলুপ্ত হবে (withers away) ? সামাজিক কাজ সব সময়ে রাজনৈতিক নাও হতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক কাজ সব সময়েই সামাজিক। সামাজিক কাজেরই একটা অংশ রাজনৈতিক কাজ। অতএব ভবিষ্যতে রাজনৈতিক কাজগুলি সামাজিক ব্যবস্থাপনায় হবে, কথাটা আমাদের জ্ঞানের কোন পরিবর্তন ঘটায় না। লেনিন অবশ্য এই স্তরটিকে অর্থনৈতিকভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেনঃ 'From each according to his capacity and to each according to his need'[৬২]—এই নীতিই রাষ্ট্রপরবর্তী ধাপের চরিত্র। এটা একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হতে পারে, কিন্তু কোন ব্যাখ্যা নয়। আসলে, রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নিয়ে মার্কসের সিদ্ধান্ত অপর্যাপ্ত বলেই 'রাষ্ট্র বিলুপ্ত হওয়া' ব্যাপারটিও পরিষ্কার নয়। আর একটি প্রশ্নঃ 'To each according to his need' বক্তব্যের 'his need' স্থির করবে কে? সমিতি (কমিউন), না ব্যক্তি নিজে?

রাষ্ট্র সম্বন্ধে স্বামীজীর মত বাস্তবানুগ। একে তিনি মানবসমাজের necessary evil বলেই ধরেছেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র শাসনে রাষ্ট্রের ভালমন্দ দিকগুলি তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে। এই সবের মধ্যে তিনি যে তত্ত্ব দেখতে পেয়েছেন তা হচ্ছেঃ 'সমাজ-জীবন গড়িয়া ওঠার সময় হইতেই এই দুইটি শক্তি কাজ করিয়া আসিতেছে—একটি ভেদ সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি ঐক্য স্থাপন করিতেছে। ইহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন আকারে দেখা দেয় এবং ইহা বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়।... সমগ্র বিশ্ব—বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের এবং ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্রের ক্রীড়াক্ষেত্র; সমগ্র জগৎ—সাম্য ও বৈষম্যের খেলা; ...অধিকার-বিলোপ আমরা নিশ্চয়ই ঘটাইতে পারি। সমগ্র জগতের সম্মুখে ইহাই যথার্থ কাজ। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের সামাজিক জীবনে ইহাই একমাত্র সংগ্রাম। এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা স্বভাবতই বেশী বুদ্ধিমান—ইহা আমাদের সমস্যা নয়; আমাদের সমস্যা হইল এই যে, বুদ্ধির আধিক্যের সুযোগ লইয়া এই শ্রেণীর লোক অল্পবুদ্ধি লোকদের নিকট হইতে তাহাদের দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যও কাড়িয়া লইবে কিনা। এই বৈষম্যকে ধ্বংস করিবার জন্যই সংগ্রাম। ...এই অধিকারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। অন্যকে বঞ্চিত করিয়া নিজে সুবিধা ভোগ করার নামই অধিকারবাদ এবং যুগযুগান্ত ধরিয়া নীতিধর্মের লক্ষ্য এই অধিকারবাদকে ধ্বংস করা। বৈচিত্রকে নষ্ট না করিয়া সাম্য ও ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র কাজ।'[৬৩] রাষ্ট্র যেহেতু বৈচিত্রময় অসংখ্য ব্যক্তিত্বের সমষ্টি, সেহেতু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের

৬২। Marx Engels Marxism, pp. 344-45

৬৩। বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬-৫২

বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া। আদর্শ রাষ্ট্র প্রসঙ্গে তিনি বলছেনঃ 'যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব?'[৬৪] এই প্রসঙ্গে আমরা আগে আলোচনা করে এসেছি। আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষণ কি হওয়া উচিত তার নির্দেশ দিলেন স্বামীজী অতীত-বর্তমানের সমস্ত ভাল দিকগুলির সম্মিলন করে। কিন্তু আবার বললেনঃ 'এ কি সম্ভব?' মানুষ যতদিন স্থূলদেহ আর পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর ভিত্তি করে সমাজ গড়তে চায়, ততদিন সেই সমাজের ধ্বংসের বীজ থাকে তার মনের মধ্যেই, স্বাভাবিক ছয় রিপুর অন্তরালে। মনের উপর মানুষ যতক্ষণ না তার বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখছে, ততক্ষণ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের আকর্ষণে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকেই।

মার্কস এ সমস্যা দূর করতে চেয়েছেন কঠোর সামাজিক আইনের সাহায্যে। অর্থাৎ কঠোর আইনের সাহায্যে মানুষকে কতকগুলি সৎ-অভ্যাসের সমষ্টি করে তুলতে চান তিনি। এ-বিষয়ে স্বামীজীর মন্তব্য তীক্ষ্ণঃ 'নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভাল হয়, পূর্বপুরুষানুক্রমে সমাগত রীতিনীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম হয়, বল, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্মিক কে? রেলের গাড়ির চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তরখণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গো-মহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে দেখিয়াছে? অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান রেলের গাড়ির ইঞ্জিন—তাহারাও জড়; চলে-ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর ঐ যে ক্ষুদ্র কীটাণুটি রেলের গাড়ির পথ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া গেল, ওটি চৈতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করিতে চায় না; কীটটি নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়।'[৬৫] শুধুমাত্র আইনের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র গড়ে উঠুক, এটা স্বামীজী চাননি।

রাষ্ট্রে বিপ্লব ঘটে বা শাসকের পতন ঘটে কেন? মার্কস বলছেন, শাসকদের শোষণের ফলে জনসাধারণের সঙ্গে তাদের বাধে সঙ্ঘর্ষ যার আর এক নাম শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ। স্বামীজী আরও গভীরে ঢুকে বলছেন যে, সমাজনেতৃত্বের শক্তির আধার জনসাধারণ, শাসকসম্প্রদায় যখনই এই শক্ত্যাধার জনসাধারণের কাছ থেকে সরে গিয়ে নিজেদের অভিজাত করে তুলে এদের অবহেলা করতে থাকে এবং বিশেষ-অধিকার দাবি করে ক্ষমতা একচেটিয়া করতে থাকে, তখনই ঘটে বিপ্লব।[৬৬] সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার

৬৪। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯-৫০ ৬৫। তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৭১-৭২

৬৬। 'সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা—যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া

উদ্দেশ্যেই প্রথম যুগে ব্রাহ্মণের আধিপত্য। জ্ঞানী বা বিচারকের মতো তিনি সকলের কাজ স্থির করে দেন। ব্রাহ্মণের পতনের সময় (ন্যায়বিচার ভুলে যখন স্বার্থোদ্দেশ্য নিয়ে জনসাধারণকে কর্মে লিপ্ত করানো হতে লাগল) জনসাধারণ ক্ষত্রিয়ের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করল। কেন? কারণ এতদিন সমাজপরিচালক জ্ঞানী কর্মবিভাগ স্থির করে দিলেও ক্ষত্রিয়েরাই শান্তিশৃঙ্খলার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। ক্ষত্রিয়-অত্যাচার বেড়ে উঠলে জনসাধারণ বৈশ্যের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করল, কারণ সমাজের খাদ্যবণ্টন-ব্যবস্থা বৈশ্যের হাতে ছিল। বৈশ্যেরা অত্যাচারী হয়ে উঠলে শূদ্র-অভ্যুত্থান ঘটে। এই শূদ্র-অভ্যুত্থানের রূপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, একথার উপরে স্বামীজী জোর দিলেও মার্কস নীরব। এ-বিষয়টি আমরা আগেই আলোচনা করেছি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভূমিকা তুলে ধরে স্বামীজী এক মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং পূর্ব জার্মানী—এই রাষ্ট্রগুলিতে যদি সত্যিই প্রলেতারিয় ডিক্টেটরশিপ চালু থেকে থাকে, সর্বহারাদের কাছে, জাতীয়তাবোধ যদি সত্যিই 'বুর্জোয়া সেন্টিমেন্ট' হয়, মার্কসের ছকবাঁধা রাস্তাই যদি শ্রমিকরাষ্ট্রের উন্নতির একমাত্র পথ হয়, তবে উপরোক্ত রাষ্ট্রগুলি একসঙ্গে মিলে গিয়ে একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করছে না কেন? COMECON পরিকল্পনায় পূর্ব-ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিকভাবে খুবই ঘনিষ্ঠ। অর্থনীতির উপরেই যদি রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়ে থাকে তবে উপরোক্ত রাষ্ট্রগুলি একসঙ্গে মিলে যাচ্ছে না কেন? চীন, ভিয়েতনাম ও কোরিয়া কৃষকপ্রধান দেশ হয়েও সম্মিলিত হয়ে কনফেডারেশন গঠন করছে না কেন? প্রতিটি মার্কসবাদী রাষ্ট্রই নিজস্ব রাষ্ট্রসীমা, সংস্কৃতি, শাসনবৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাশিয়ার জনগণের মধ্যে 'শ্রমিকরাষ্ট্র রক্ষা'র চেয়ে 'পিতৃভূমি রক্ষা'র মানসিকতাই প্রধান হয়ে উঠেছিল।[৬৭] সাম্প্রতিক বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মার্কসবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রতিটিই নিজস্ব জাতীয় নেতার (National Leader) গুণগানে অ-মার্কসবাদী রাষ্ট্রগুলিকে ছাপিয়ে গেছে। চীনে মাও-সে-তুং, উত্তর কোরিয়ায় কিম-ইল-সুং, যুগোশ্লাভিয়ায় টিটো, কিউবায় ক্যাস্ত্রো যতখানি সম্মান পান সেরকম ব্যক্তিপূজা আমেরিকা-ব্রিটেন-জাপান-অস্ট্রেলিয়া-মিশর এমনকি সৌদী আরবেও দেখা যায় না।

ভবিষ্যতে সমস্ত রাষ্ট্রের চরিত্র একই রকম হবে—এরকম কল্পনা স্বামীজীর ছিল

তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া, প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে। সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এই ভাব থাকিবে ততকাল রহিবে।' [বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪২-৪৩]

৬৭। Letter to Soviet Leaders, p. 45

না। তিনি চেয়েছিলেন,.জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন জাতি নিজস্ব রাষ্ট্র গড়ে তুলুক। এই আগামী রাষ্ট্রগুলিতে যেন বিশেষ-অধিকার (special privilege) কারও না থাকে এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের আদর্শ সম্মিলিত করে যথার্থ কল্যাণকামী চরিত্র গড়ে ওঠে।[৬৮] লেনিন যেখানে মনে করতেন যে, কঠিন আইনের সাহায্যেই সমাজে নিয়মশৃঙ্খলা আনতে হবে,[৬৯] স্বামীজী সেখানে নজর দিয়েছেন বিশেষ-অধিকার ধ্বংস করে value of life সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করতে। বিষয়টি পরে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

॥ ৬ ॥

মার্কস যাদের প্রলেতারিয়েত বলেছেন, স্বামীজী তাদেরই শূদ্র[৭০] নামে অভিহিত করেছেন। বর্তমান যুগ শূদ্র-অভ্যুত্থানের যুগ—উভয়েই এ-বিষয়ে একমত। তবে বিশ্বে প্রথম কোথায় শূদ্র-অভ্যুত্থান ঘটবে সে-সম্পর্কে মার্কসের ধারণা ছিল যে, ব্রিটেন-ফ্রান্স-জার্মানীর মতো শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই তার সূচনা হবে, কিন্তু স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'You take it from me, this rising of the *Sudras* will take place first in *Russia*, and then in *China*.'[৭১]

শ্রমিকদের দূরবস্থার কারণ কি? মার্কস অর্থনীতির মধ্যে এর উত্তর খুঁজেছেন। মধ্যযুগে তাঁতের মালিক তাঁতীই মালিক হত উৎপন্ন কাপড়ের। শিল্পযুগে তেমনি ফ্যাক্টরীর মালিক অধিকারী হয়ে উঠল উৎপন্ন দ্রব্যের, পুঁজির অভাবে প্রতিযোগিতায় হটে গিয়ে তাঁতী সে ফ্যাক্টরীর শ্রমিকে রূপান্তরিত হল। উৎপাদন-উপায়ের মালিক

৬৮। অমিতাভের 'বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে রাষ্ট্রনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ, মাসিক বসুমতী পত্রিকা, চৈত্র (১৩৭৬) এবং বৈশাখ (১৩৭৭) সংখ্যাদ্বয় দ্রষ্টব্য।

৬৯। '(We) demand the strictest control by society and by the state over the measure of labour and the measure of consumption; but this control must start...by a state of armed workers...the complete subordination of the entire work...(to) the state of the Soviets of Workers' and Soldiers' Deputies.' [Marx Engels Marxism, p. 345]

৭০। স্বামীজী 'শূদ্র' বলতে হিন্দুসমাজের তথাকথিত শূদ্রদের ধরেননি, কারণ তাঁর মতে মুখোপাধ্যায়-চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি পদবীধারীও শূদ্র হতে পারে। তিনি বলছেনঃ 'ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তার মানে নেই; হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে।' [বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪০৯] 'শূদ্রপূর্ণ রোমকদাস ইউরোপ ক্ষত্রবীর্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে;' নগণ্য জাপান খধূপতেজে শূদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক গ্রীস ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরস্ক-স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য।' [বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪১] স্বামীজী 'শ্রেণী' বলতে কি বুঝিয়েছেন এবং শ্রেণীসংগ্রাম প্রসঙ্গেই বা তাঁর মত কি, এ-বিষয়ে ব্রহ্মচারী অমিতাভের 'শ্রেণী-সংগ্রাম প্রসঙ্গে মার্কস ও বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধ, 'সমাজশিক্ষা' পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা (১৩৭০) দ্রষ্টব্য।

৭১। Swami Vivekananda: Patriot-Prophet—Bhupendranath Datta, Nababharat Publishers, Calcutta, 1954, p. 335

হিসাবে ধনী ব্যবসায়ী উৎপন্ন দ্রব্যকে দখল করে কাপড়গুলোকে পণ্যে পরিণত করল। শ্রমিক একটা কাপড় তৈরী করে মালিকের কাছে পেল তিন টাকা। মালিক কিন্তু সেই কাপড়টিকেই বাজারে বিক্রি করল সাত টাকায়। অর্থাৎ কাপড়টির বাজারদর সাত টাকা হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক তার শ্রমের উপযুক্ত দাম পেল না। এই যে অতিরিক্ত চার টাকা, মার্কস এর নাম দিলেন উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value)। (মেশিনের খরচ, যোগাযোগব্যবস্থা ইত্যাদিতে এই উদ্বৃত্ত মূল্য চার টাকার কিছু কম হবে।) এখন মালিকের চেষ্টা চলে কি করে উদ্বৃত্ত মূল্য আরও বাড়ানো যায়। উৎপাদনের খরচ কমানো এবং পণ্যের দাম বাড়ানো—এই দুই পথের আশ্রয় নেয় মালিক। উৎপাদনের খরচ কমানোর জন্য বসানো হয় নানারকম স্বয়ংক্রিয় ও উন্নত ধরনের যন্ত্র, এবং এর ফলে বিভিন্ন কারখানা থেকে হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয় এবং যারা টিকে থাকে তারাও নামমাত্র মজুরি পেয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়। ওদিকে পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে সাধারণ লোকেরাও দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকে। ফলে, ক্রেতার অভাবে মালিকের গুদামে জমা হয় কাপড়ের বিরাট স্তূপ। এভাবে ধনতান্ত্রিক জগতের সঙ্কট দেখা যায়। কাঁচামাল ও বাজার দখলের জন্য শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন।

এর নিরাকরণে মার্কস নির্দেশ দিলেন সশস্ত্র শ্রমিকবিদ্রোহের। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে উৎপাদনের উপায়গুলিকে রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করে তিনি পুঁজিবাদী চরিত্রকে বিদায় দিতে চাইলেন।

স্বামীজী শ্রমিক-কৃষকদের দুরবস্থার কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। উদ্বৃত্ত ভোগ করার মাধ্যমেই যে মালিকেরা শোষণ চালায়, সে বিষয়টি তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়েছেন,[৭২] কিন্তু একেই একমাত্র কারণ বলে না ধরে অন্যান্য কি কি শক্তি এর পিছনে আছে তা দেখবারও চেষ্টা করেছেন। শিক্ষার অভাব,[৭৩] বহির্জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা,[৭৪] নিম্নমানের জীবনযাত্রা,[৭৫] শ্রমের উপযুক্ত দাম না পাওয়া,[৭৬] কেবল একটি কর্মে অভিজ্ঞতা,[৭৭] একতা ও উচ্চ আদর্শের অভাব,[৭৮] জনসাধারণের সহানুভূতির অভাব[৭৯] ইত্যাদি বিষয়গুলিও তিনি দুরবস্থার কারণ হিসাবে উল্লেখ[৮০] করেছেন। অনুরূপভাবে, তার নিরাকরণের উপায় হিসাবে যেসব পথের উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে শিক্ষার সাহায্যে এদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন করে তোলা,[৮১] জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন,[৮২] একাধিক পেশায় সুশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পারিশ্রমিক প্রদান।

৭২। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩০, ২৩৯, ১৬২ ৭৩। তদেব, পৃঃ ৪৩৫
৭৪। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬ ৭৫। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৪১
৭৬। তদেব, পৃঃ ১০৬, ২০৪; তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১০৮ ৭৭। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭৪
৭৮। তদেব, পৃঃ ২৪০-৪১ ৭৯। তদেব, পৃঃ ৩৮৯; তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৩৫
৮০। ব্রহ্মচারী অমিতাভের 'শ্রমিক-কল্যাণ প্রসঙ্গে মার্কস ও বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধ, 'সমাজশিক্ষা' পত্রিকা, ১৪ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।
৮১। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৪১; তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১০৭
৮২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৪১-৪২; তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৪

শূদ্র-অভ্যুত্থান যে অবশ্যম্ভাবী একথা স্বামীজী স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন।[৮৩] তিনি বুঝেছিলেন, অবিলম্বে যদি এদের ন্যায্য অধিকারকে স্বীকার না করা হয়, তবে সঙ্ঘর্ষকে এড়ানো যাবে না। বলছেন স্বামীজী ঃ 'জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একই ভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐরকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐকথা বুঝতে পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই ঐকথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা ছোট জাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতরজাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ। ...তা না হলে কিন্তু তোদের (ভদ্র জাতিদের) কল্যাণ নেই। তোরা চিরকাল যা করে আসছিস—ঘরাঘরি লাঠালাঠি করে সব ধ্বংস হয়ে যাবি! এই mass (জনসাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাদের ওপর তোদের (ভদ্রলোকদের) অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর civilization (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে।'[৮৪]

স্বামীজী শ্রেণীসংগ্রামকে সম্ভাব্য[৮৫] বলে ধরলেও অনিবার্য বলে ধরেননি। শান্তিপূর্ণ পথে শূদ্র-অভ্যুত্থান সম্ভব—একথা তিনি স্পষ্টই বলেছেন।[৮৬] সঙ্ঘর্ষ ছাড়াই শূদ্রেরা অন্যান্য শ্রেণীর সমকক্ষ হতে পারবে, একথা স্বামীজী বলেছেন শিল্পবিপ্লবের দিকে তাকিয়ে। এ আলোচনায় পরে আসছি।

মার্কস প্রলেতারিয়েত ডিক্টেটরশিপ-এর কল্যাণকর রূপটিই শুধু দেখতে পেয়েছিলেন। এর যে অন্য দিকও থাকতে পারে সেকথা তাঁর মনে ওঠেনি। স্বামীজী স্বীয় প্রজ্ঞাদৃষ্টির সাহায্যে অনায়াসেই এই শাসনের ভালমন্দ দুটি দিক দেখতে পেয়েছিলেন। বলছেন তিনি ঃ 'এযুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সংস্কৃতির অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।'[৮৭] মার্কসবাদী দেশগুলিতে আজ সাধারণ শিক্ষা ও খাওয়াপরার সুবিধে আগের চেয়ে বেড়েছে, কিন্তু দার্শনিকচর্চা সেখানে নেই বললেই

৮৩। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪১ ৮৪। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১০৮-০৯

৮৫। 'দরিদ্রগণ যখন ধনিগণের দ্বারা পদদলিত হয়, তখন শক্তিই দরিদ্রদের একমাত্র ঔষধ।' [বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১৬]

৮৬। 'এইসব নীচ জাতদের ভেতর বিদ্যাদান জ্ঞানদান করে এদের ঘুম ভাঙাতে যত্নশীল হ। এরা যখন জাগবে—আর একদিন জাগবে নিশ্চয়ই—তখন তারাও তোদের কৃত উপকার বিস্মৃত হবে না।' [বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১০৯-১০ এবং পৃঃ ১০৮ দ্রষ্টব্য।] ৮৭। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯

চলে, যা আছে তা মার্কসীয় ভাষ্যরচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া সরকারী বিধিনিষেধের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য ভালভাবে ফুটে উঠতে পারছে না। বিজ্ঞানের চমকপ্রদ উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যে স্তরে দার্শনিক হয়ে যান (যেমন জেমস জীনস, আইনস্টাইন, স্রডিনজার, বারট্রাণ্ড রাসেল, হাইজেনবার্গ প্রমুখ) সেই মনোভাব ঐসব দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে তাকিয়েই সলঝেনিৎসিনের কাতরতা ঃ 'Allow us a free art and literature, the free publication...allow us philosophical, ethical, economic and social studies, and you will see what a rich harvest it brings and how it bears fruit—for the good of Russia. ...let the people breathe, let them think and develop !'[৮৮]

বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জাপান ও জার্মানী তিরিশ বছরের মধ্যে বিদেশী সাধারণ ক্রেতাদের মনোরঞ্জনে যে সাফল্য দেখিয়েছে, অক্টোবর-বিপ্লবের প্রায় ষাট বছর বাদেও রাশিয়া সে স্তরে পৌছাতে পারেনি। পকেট রেডিও, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার থেকে শুরু করে সিন্থেটিক রেয়ন, ফাউন্টেন পেন, সিগারেট লাইটার ইত্যাদি ছোটখাট জিনিসের রপ্তানিতে মার্কসবাদী রাষ্ট্রগুলি বিদেশী সাধারণ ক্রেতাদের কাছে মোটেই জনপ্রিয় হতে পারেনি। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীকে পাশাপাশি বিচার করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। একই রাষ্ট্রের জনগণ, অথচ দেশ ভাগ হয়ে পৃথক শাসনব্যবস্থায় উভয়ের উন্নতি সমহারে হয়নি। গণতন্ত্রী পশ্চিম জার্মানী আজ যেখানে আমেরিকা-ইউরোপের অর্থনীতিকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখে, সেখানে মার্কসবাদী পূর্ব জার্মানীর অগ্রগতি আর পাঁচটি দেশের চেয়ে উল্লেখযোগ্য নয়।

স্বামীজী শূদ্রশাসনকে মনে করেছেন অগত্যা-আদর্শ মাত্র, পূর্ণাঙ্গ আদর্শ নয়। মানুষের প্রাথমিক চাহিদা মিটাবার জন্যই তিনি সমাজতন্ত্রকে কাম্য মনে করেছেন। ১।১১।১৮৯৬ তারিখের এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ 'আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী (socialist), তার কারণ এ নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল "নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল"—এই হিসাবে। অপর কয়টি প্রথাই জগতে চলেছে, পরিশেষে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হলেও অভিনবত্বের দিক থেকে এটিরও একবার পরীক্ষা করা যাক।'[৮৯] এই শূদ্রশাসনের অকল্যাণকর দিকগুলির দিকে তাকিয়ে স্বামীজী সমাধান খুঁজলেন শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করার মধ্য দিয়ে। শূদ্রশাসনে আইনের সাহায্যে কঠোর শাসন নয়, বরং লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। বিশেষ-অধিকার নষ্ট করে মানুষকে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে, ব্যক্তির মধ্যে যে অনন্ত শক্তি লুকিয়ে আছে, তার বিকাশে ঘটবে সংস্কৃতির উন্নতি। দৈনন্দিন জীবনযাপনই শুধু নয়, আত্মিক খোরাকের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষের

৮৮। Letter to Soviet Leaders, pp. 56-7

৮৯। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০

বিকাশ ঘটানো চাই। নানান বিদ্যার চর্চা করতে হবে মুক্ত মন নিয়ে। তবেই ঘটবে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ। আর এই স্বাধীন চিন্তাই মানবসমাজকে করে রাখবে নিত্য প্রগতিশীল।

শূদ্রশাসনে অপসংস্কৃতির সম্ভাবনা স্বামীজী কেন আশঙ্কা করেছিলেন ? তিনি দেখেছেন যে, যুগ যুগ ধরে শূদ্রদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তারই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অতীতের সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক ধারার উপরও এরা আক্রমণ চালাবে। ফলে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তা অবিলম্বে পূরণ করা সম্ভব হবে না। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব স্বামীজীর এই আশঙ্কাকেই সত্য বলে প্রমাণ করেছে। রাশিয়াতেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এই ঝোঁক দেখা গিয়েছিল, প্রলেত-কাল্ট নামে আন্দোলনও শুরু হয়েছিল।[৯০] লেনিন তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন বলেই রাশিয়া এই বিপদ থেকে প্রাথমিকভাবে কিছুটা রক্ষা পেয়েছিল। স্তালিন-যুগের 'ব্যক্তিপূজা' সেই অপসংস্কৃতিকেই আবার জীবনদান করলেও পরবর্তী যুগে তাকে শুধরে নেবার চেষ্টা চলেছে।[৯১]

স্বামীজীর বিপ্লবভাবনা ছিল আপামর জনসাধারণকে নিয়ে। বিপ্লব তাঁর কাছে কেবল রাজনৈতিক তাৎপর্যই বহন করত না, মানুষের জীবনের পূর্ণ রূপটি ভেসে উঠত তাঁর কাছে। ভারত ছিল তাঁর কাছে এক 'ঘুমন্ত লেভিয়াথান'। নতুন যুগের আবাহনে তিনি এই ভারতবর্ষকেই মহিমান্বিত করে বললেন ঃ 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।' 'Men-rebels' আর 'women-rebels'-কে আহ্বান জানালেন তিনি, বললেন ঃ '...নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। ...এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে ; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না ; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। ...এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।'[৯২]

এই প্রশ্নে অনেকে স্বামীজীকে মার্কসীয় বিপ্লবী বলে মনে করেন। মনে রাখতে হবে, যেমন তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তেমনি ব্যবহারিক দিক দিয়েও মার্কসীয়-বিপ্লবের সঙ্গে স্বামীজী-কথিত বিপ্লবের একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, স্বামীজী-কথিত বিপ্লবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।[৯৩] সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কি ?

তার আগে মার্কসীয় বিপ্লবের ব্যবহারিক দিকগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। কার্ল মার্কস মনে করতেন যে, শ্রমিকদের সম্মিলিত শক্তি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই

৯০। নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩১৩

৯১। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিংশ কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহ দ্রষ্টব্য।

৯২। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮২

৯৩। অমিতাভের 'বিপ্লব-চিন্তায় বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধ, সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকা, ২।১১।১৯৭২ তারিখের সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শাসকদের উচ্ছেদ করবে এবং এটাই হচ্ছে বিপ্লবের প্রধান কর্তব্য। লেনিন তাকে সংশোধন করে বললেন, শ্রমিক ও কৃষকের যুগ্ম শক্তি সশস্ত্র বা নিরস্ত্র যে-কোন পথেই হোক শাসনক্ষমতা দখল করুক। মাও-সে-তুং বললেন—না, সশস্ত্র সংগ্রামই হচ্ছে একমাত্র পথ। তাঁর মতে বিপ্লবের কর্মপ্রণালী হল ঃ গ্রামাঞ্চলে অভ্যুত্থান—গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও—শ্রমিক-কৃষক ফৌজ গড়ে তোলা—দীর্ঘকালস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রাম—আতঙ্কসৃষ্টির সাহায্যে দেশের জনগণকে নিষ্ক্রিয় করে সরকারী শাসনব্যবস্থাকে অচল করা—গ্রামাঞ্চলের সৈন্যবাহিনী দিয়ে শহরে অভিযান করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। চে গুয়েভারার মত হচ্ছে, কিছু নির্ভীক দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বিপ্লবী গেরিলাবাহিনী গঠন করে শহর থেকে গ্রামে অভিযান চালালেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যাবে। ফিদেল ক্যাস্ট্রো বললেন, জনগণ নয়, নিজেদের শক্তির উপরেই বিপ্লবীদের নির্ভর করতে হবে। আবার রেজি দ্যব্রে মনে করেন যে, কোন তত্ত্বের মধ্যে না গিয়ে উপস্থিত মতো স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে সামরিক কৌশলের সাহায্যেই বিপ্লব আনা যায়। চারু মজুমদারের বক্তব্য, শ্রমিক ও কৃষকের সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামই বিপ্লবের পথ। আমেরিকার বিপ্লবতাত্ত্বিক মার্টিন ওপেনহাইমার বলেছেন, গেরিলাবাহিনীই সিদ্ধান্ত নেবে জনসাধারণ প্রস্তুত কিনা এবং জনস্বার্থে কি করণীয়, কখন কোথায় কি উপায়ে সংগ্রাম চলবে এ-ও স্থির করবে গেরিলাবাহিনীই। তাঁর মতে, আবহাওয়া ও পরিবেশ যদি অনুকূল হয় এবং সংগ্রাম যদি চলে, তবে সংগ্রামী কার্যধারা থেকেই বিপ্লবপন্থার কর্মসূচী তৈরী হয়ে যাবে।

উল্লিখিত বিপ্লবীদের থেকে স্বামীজীর মৌলিক পার্থক্য কোথায়?

১) বন্দুকের নল কখনও শক্তির উৎস হতে পারে না। শক্তির উৎস মানুষ। স্বামীজীর বিপ্লবচিন্তার প্রথম কথা তাই মানুষ গড়া। অন্যান্য বিপ্লবীরা যেখানে বিপ্লবের কর্মকৌশল নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, স্বামীজী সেখানে জোর দিয়েছেন বিপ্লবীদের চরিত্রের উপর।

২) অন্যান্যদের মতো স্বামীজী কোন দল বা পার্টি কেন্দ্রিক নন, তাঁর মতে দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষই শক্তির উৎস।

৩) স্বামীজীর মতে, বিপ্লব কোন শ্রেণীর একচেটিয়া দায়িত্ব নয়।

৪) অন্যান্যেরা মনে করেন, বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে শ্রমিক ও কৃষক। স্বামীজীর মতে সমাজের তরুণ-সম্প্রদায়ই নেতৃত্ব দেবে।

৫) অন্য বিপ্লবীরা জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেন না। কিন্তু স্বামীজীর মতে, গণচেতনায় সুদৃঢ় জাতীয়তাবাদ ও আত্মবিশ্বাসের সঞ্চারই বিপ্লবীদের প্রধান কর্তব্য।

৬) গেরিলাবাহিনী গঠন করাই যেখানে অন্যান্য বিপ্লবীদের লক্ষ্য সেখানে স্বামীজী স্পষ্টই মনে করেন যে, কয়েকজন লোকের 'শিভালরী' দেখানোই বিপ্লব নয়, বিপ্লবের অর্থ গভীর ও ব্যাপক। স্বামীজীর মূল লক্ষ্য—দেশের জনসাধারণ। গণশিক্ষা, গণসংগঠন ও গণচেতনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলাই তাঁর মতে বিপ্লবের প্রধান কাজ।

৭) সশস্ত্র সংগ্রামই বিপ্লবের একমাত্র পথ নয়। গণচেতনাকে না জাগিয়ে বিপ্লব-অভিযান একটি রোমাঞ্চকর ছেলেখেলা মাত্র। এই হচ্ছে স্বামীজীর মত।

৮) শাসনক্ষমতা অধিকারই বিপ্লবীদের প্রধান লক্ষ্য—একথা স্বামীজী কখনও মনে করেননি।

৯) অন্যান্য বিপ্লবীরা সমাজের সৌধগুলি ভেঙে ফেলতে অত্যধিক উৎসাহী। কিন্তু স্বামীজীর মতে, বিপ্লবের সময়ে ধ্বংসের চেয়ে গঠনমূলক কাজকর্মের দিকেই নজর রাখতে হবে বেশী করে।

১০) শ্রেণীসংগ্রামকে স্বামীজী সম্ভাব্য বলে মনে করলেও অনিবার্য বলেননি।

এইভাবে স্বামীজীর বিপ্লবচিন্তার মৌলিক চরিত্রটিই ছিল স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তিনি মনে করতেনঃ ভারতে এক নতুন ধরনের বিপ্লব হতে চলেছে। এই বিপ্লবের চরিত্র অন্যান্য বিপ্লব থেকে পৃথক। বলেছেন স্বামীজীঃ 'ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ-সহায়ে।'[৯৪] এবং বিপ্লবের এই অভিনব চরিত্রে আকৃষ্ট হবে সমগ্র জগৎ।

আগেই বলেছি, স্বামীজী শূদ্রশাসনকে ইতিহাসের শেষ যুগ বলে মনে করতেন না। তিনি বলেছেন, এর পরে আবার ব্রাহ্মণ-আদর্শ দেখা দেবে। কিভাবে? জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের সাথে জনসাধারণের ঘুম ভাঙলে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা-শক্তি থেকে তাদের দূরে রাখা যাবে না। অতীত যুগের চেয়ে তারা আরও বেশী করে রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে চাইবে। সেইসঙ্গে কারিগরিশিল্পের উন্নতি ঘটায় শূদ্রদের অধিকাংশ কাজ যন্ত্রই (machine) করে দেবে। ধীরে ধীরে বেগারখাটা শ্রম থেকে মুক্ত হয়ে জনসাধারণ ক্রমশ বিদ্যাচর্চার দিকে বেশী করে ঝুঁকবে এবং মুক্তচিন্তার ধারা বেয়ে জীবনরহস্যের সমাধান করতে চাইবে। এর ফলে ধর্মচর্চা বা আধ্যাত্মিকতার ব্যাপকতা দেখা দেবে। জ্ঞানচর্চার এই প্রসারতা সমাজে যে পরিবর্তন আনবে, তা সমাজের পরিচালিকা-শক্তি হিসাবে জ্ঞানিগুণীদেরই সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুলবে। ফলে আবার ব্রাহ্মণশাসন দেখা দেবে। ইতিহাসের মধ্যে স্বামীজী এই যুগ-আবর্তনকেই দেখতে পেয়েছেন।

বিভিন্ন মার্কসবাদী রাষ্ট্রগুলির দিকে আজ তাকালে স্বামীজীর মতের যৌক্তিকতা বোঝা যাবে। ঐসব দেশের সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশই স্বাধীন চিন্তার পক্ষে সংগ্রাম জোরদার করছেন। রাশিয়ার সাহিত্যিকেরা তাঁদের বিভিন্ন গল্প-কবিতা-উপন্যাসের মাধ্যমে এই মুক্ত মনের সপক্ষে গোপন প্রচার করে যাচ্ছেন। মান্দেলশতাম, ম্যাক্সিমভ, শালামভ ইয়েভতুশেংকো, পাস্তারনেক প্রমুখের লেখা ইতিমধ্যেই রুশ নেতৃবৃন্দের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। (এই ধরনের লেখকদের অনেকগুলি লেখা একত্র করে মাইকেল স্ক্যামেলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'Russia's other Writers : Selections from Samizdat Literature', New York, 1971) জোরিন এবং আলেক্সিভের লেখা 'Time will not wait', আমলরিকের 'Will the USSR survive until 1984 ?', শাখারভের 'Thoughts on Progress', 'Peaceful Co-existence and Intellectual Freedom' ইত্যাদি বইগুলিতে যে

৯৪। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫

বক্তব্য রাখা হয়েছে, তার মূল কথা হল জনসাধারণকে দেশের শাসনব্যাপারে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। এই লেখকেরা রুশ নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতাকে স্বীকার না করলে সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। নোবেল-পুরস্কার বিজয়ী পরমাণুবিজ্ঞানী শাখারভ, শাফারেভিচ, পোদিয়াপোলস্কি প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা মিলে রাশিয়াতে 'Committee for Human Rights' গঠন করেছেন যার সাহায্যে তাঁরা গণচেতনাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মার্কসবাদী রাষ্ট্র পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছে 'উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্ঘ'।[৯৫] 'Znak' এবং 'Wiez' পত্রিকা দুটির মাধ্যমে এঁরা নিজেদের মতবাদ প্রচার করে যাচ্ছেন। তাঁরা '...interested in gradually implementing the programme of democratization...in all spheres of national life' (At the Polish Intersection, Warshaw, 1972—Janusz Zablocki)।[৯৬] পোল্যাণ্ড-সরকার এই উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের বই একসঙ্গে পাঁচ হাজার কপির বেশী ছাপতে অনুমতি দেন না যদিও এঁরা এই সংখ্যাকে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার করতে দেবার দাবি জানিয়ে যাচ্ছেন। চেকোশ্লো-ভাকিয়াতে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রুশ আগ্রাসনের মূল লক্ষ্য ছিল চেক উদারনৈতিকদের স্তব্ধ করে দেওয়া। ঐদেশের উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা তৎকালীন সরকারের উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অন্দ্রেজ কোপ্‌কক রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে উদারনীতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন; ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কসবাদী তাত্ত্বিক জুলিয়াস স্ত্রিংকা শাসনতন্ত্রে বিরোধী দলের আবশ্যকতা তুলে ধরলেন এবং জ্‌দেনেক স্লাইনার 'World Marxist Review' পত্রিকায় (ডিসেম্বর ১৯৬৫ সংখ্যায়) 'Theory and Practice of Building Socialism' প্রবন্ধে বিভিন্ন বিরোধী দলের আবশ্যকতা স্বীকার করে নিলেন।

মার্কস যে বলেছিলেন 'সাম্যবাদী সমাজ ইতিহাসের শেষ স্তর', একথা যুক্তিযুক্ত নয়। মার্কস এখানে পূর্ণতাবাদী হয়ে উঠেছেন। যদিও তিনি নিজের মতকে বস্তুনিষ্ঠ বলে দাবি করেছেন, তবুও অদৃষ্টক্রমে এই মত ভাববাদী হয়ে পড়ে পূর্ণতাবাদের কথাই প্রচার করেছে, কারণ এই মতে সাম্যবাদী সমাজ ত্রুটিহীন সমাজ। আসলে, মার্কসের principle of linear progress তত্ত্বটিই অবৈজ্ঞানিক। সমাজ কখনও সরলরেখায় চলে না, ঢেউয়ের আকারে বৃত্তাবৃত্তে তার গতি।

॥ ৭ ॥

কমিউনিস্ট সমাজ, যাকে মার্কস আদর্শ সমাজ বলেছেন, তার রূপ কি সে-বিষয়ে আগেই আমরা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছি। এখানে মার্কসের নিজস্ব উক্তির উল্লেখ

৯৫। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত তথ্যাদির জন্য Adam Bromke-এর 'Catholic Social Thought in Communist Poland' শীর্ষক প্রবন্ধ (গ্রন্থালোচনা), Problems of Communism পত্রিকা, July-August 1975 সংখ্যা, পৃঃ ৬৭-৭২ দ্রষ্টব্য। ৯৬। তদেব, পৃঃ ৬৯

করি : 'As soon as the distribution of labour comes into being, each man has a particular, exclusive sphere of activity, which is forced upon him and from which he cannot escape. He is a hunter, a fisherman, a shepherd, or a critical critic, and must remain so if he does not want to lose his means of livelihood ; while in communist society, where nobody has one exclusive sphere of activity but each can become accomplished in any branch he wishes, society regulates the general production and thus makes it possible for me to do one thing today and another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticise after dinner, just as I have a mind, without ever becoming hunter, fisherman, shepherd or critic.'[৯৭]

মার্কস-কল্পিত এই সমাজ শোষণহীন স্বাধীন মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় গড়ে ওঠা নতুন সমাজ। শ্রমবিভাগের গ্লানি নেই, অর্থ ও লোভের দাসত্ব নেই, ব্যক্তিসত্তার আলোকে সেখানে মানবসত্য প্রতিফলিত, প্রয়োজনের রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে মানুষ উত্তীর্ণ, ক্ষমতালিপ্সা ও সঙ্কীর্ণ বিষয়গুলি থেকে মুক্ত মানুষ তখন সমাজের সেবায় স্বেচ্ছায় নিবেদিত। 'Economic and Philosophic Manuscripts of 1844', 'Capital', 'Critique of the Gotha Programme', 'The German Ideology' বইগুলির বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশে মার্কস আগামী সমাজের ছবি এঁকেছেন।

মার্কসের এই 'আদর্শ সমাজের রূপ' নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে। প্রথমত, ষড়রিপু (কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য) যখন মানবমনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তখন সামগ্রিকভাবে কোন সমাজের বা দেশের প্রতিটি লোকের মন থেকেই এইসব প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব কি? দ্বিতীয়ত, মার্কস যে বলছেন, 'Society...makes it possible for me to do one thing today and another tomorrow'—এটা কি অতিকথন-দোষে দুষ্ট নয়? স্কুলের শিক্ষক যদি আজকে কারখানার পরিচালক, কালকে বাড়ি তৈরীর ইঞ্জিনীয়ার, পরশু ফুটবল-টীমের ক্যাপ্টেন হতে চান, কিংবা কোন সঙ্গীতজ্ঞ যদি আজ অফিসের কেরানি, কাল বাসের ড্রাইভার, পরশু মহাকাশ-অভিযানে যেতে চান—তবে সমাজব্যবস্থা টিকতে পারে না। শ্রমবিভাগের অবলুপ্তি মার্কস চেয়েছিলেন কারণ তিনি দেখেছিলেন যে শ্রমবিভাগটি বাধ্যতামূলক নিপীড়নে দাঁড়িয়েছে। মার্কস আসলে এই 'বাধ্যতামূলক' নিপীড়ন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চাইছিলেন। এই ধারণা অনুসরণ করেই তিনি এমন এক উক্তি করলেন (one thing today and another tomorrow) যা, মনে হয়, তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রমবিভাগ সমাজে থাকবেই, নাহলে সমাজ টিকতে পারে না, কিন্তু দেখতে হবে এ যেন মানুষের পক্ষে বাধ্যতামূলক নিপীড়ন হয়ে না দাঁড়ায়। তৃতীয়ত, আজ যা মানুষের কাছে আদর্শ, কাল তার বদলে অন্য রূপের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মানবমনের নিরন্তর বিকাশের

৯৭। The German Ideology, pp. 44-5

ফলে মানুষের জাগতিক ও আত্মিক চাহিদা তো নিত্যই বদলাচ্ছে। অতএব ভবিষ্যতে তা বদলাবে না, একথা কি করে বলা যায়? মানুষ চিরকালই চাইবে—সুন্দর, আরও সুন্দর সমাজ তৈরী করতে। চতুর্থত, ভালমন্দ চিরকালই সমাজে থাকবে, যেহেতু 'যুগনিরপেক্ষ ভাল' কোন কিছুর ধারণা সাধারণ মানবমনে দেখা যায় না। পঞ্চমত, মানবসত্তার প্রকৃত স্বরূপের ব্যাখ্যা যখন মার্কসবাদে দেওয়া হয়নি, তখন আদর্শ সমাজে মানুষ তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে—এ কথাটার অর্থ কি? ষষ্ঠত, মার্কসবাদ শেষ পর্যন্ত কি একটি নীতিবাদে পরিণত হল না, যে নীতিবাদ 'ইউটোপিয়ান' প্রভাব থেকে মুক্ত নয়?

পাশ্চাত্য নীতিবাদের (মার্কসীয় নীতিবাদ যার অন্তর্ভুক্ত) প্রধান দোষ, এর বিশ্লেষণ খুব গভীর নয়। পরের উপকার কর—এ-বিষয়ে এই নীতিবাদ বলে যে, সবাই মিলে ভালভাবে বেঁচে থাকতে হবে বলেই মানুষের উচিত পরের জন্য স্বার্থত্যাগ করা। অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—ভালভাবে বেঁচে থাকা। পশুযূথের একটি পশু যে কারণে অন্য সঙ্গীকে আক্রমণ করে না, পাশ্চাত্য নীতিবাদ সেই কারণেই মানুষকে সংযত থাকতে বলে। সুখই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে সুযোগমাত্র গোপনে অন্যকে ফাঁকি দিয়ে (যে ফাঁকি ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই) মানুষ আরও বেশী সুখী হবে না কেন? তাছাড়া, সুখের মানদণ্ডও তো এক নয়! শিশুর সুখ আর বৃদ্ধের সুখ, বৈজ্ঞানিকের সুখ আর সৈনিকের সুখ, পুরুষের সুখ আর নারীর সুখ—সুখ সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা দেয় না। তাই পরের উপকার কেন করব—এই প্রশ্নে পাশ্চাত্য নীতিবাদের উত্তর খুব গভীর নয়।[৯৮]

স্বামীজী এই সমস্যার সমাধান করেছেন বেদান্তদর্শনের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে। মানবজীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি। এই মুক্তির সাধন হিসাবে তিনি চেয়েছিলেন ব্যবহারিক বেদান্তের (Practical Vedanta) প্রচলন। কাজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। অতএব সামাজিক কাজের মধ্য দিয়েই তাকে বেঁচে থাকতে হবে। নিঃস্বার্থ পরোপকারই হোক তার সামাজিক কাজকর্মের মূল দৃষ্টিভঙ্গি। পরের উপকার কেন করব? কারণ পরের উপকার করার অর্থ নিজেরই উপকার করা। মানুষ যত বেশী পরোপকারে অভ্যস্ত হবে ততই তার স্বার্থচিন্তা কমে গিয়ে ত্যাগের পথে উত্তরণ ঘটবে। তার মন ততই শুদ্ধ হতে থাকবে এবং চিত্তশুদ্ধিরই চরম পরিণতি স্ব-স্বরূপ-উপলব্ধি বা মুক্তি। বিদ্যাসাগর অর্থসাহায্য করে উপকৃত গরীবদের সকল সমস্যা মিটাতে পারেননি। (এমনকি মাইকেল মধুসূদনের মতো শিক্ষিত গুণীও নিজের ভোগ ও দেনা করার প্রবৃত্তি দূর করতে পারেননি, যদিও বিদ্যাসাগর তাঁকে বহুবার অর্থসাহায্য করে বাঁচিয়েছেন) কিন্তু নিজে তিনি পরিণত হয়েছিলেন দয়ার সাগরে। স্বামীজী তাই বলছেন, পরোপকার করে পরের সকল সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারি না, তবে আমরা উপকৃত হই, মুক্তির পথে এগিয়ে যাই। এবং মুক্তিই যখন মানবজীবনের উদ্দেশ্য তখন এই উদ্দেশ্য সাধন ছাড়া মানবজীবনের অন্য কোন অর্থ নেই। সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মুক্তি আংশিক মুক্তি মাত্র, মানুষের যথার্থ মুক্তি স্ব-স্বরূপ-উপলব্ধির

৯৮। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৬

মধ্যে। এই বৈদান্তিক নীতিবাদ দিয়েই স্বামীজী সমস্যার সমাধান করেছেন। (স্বামীজী তাঁর 'কর্মযোগ' বইটিতে এই মত ও পথের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডেই এই 'কর্মযোগ' বইটি রয়েছে।)

বেদান্ত মানুষকে যে কেবল যথার্থ নীতিবাদীই করে তোলে তা নয়, মানুষকে এ করে আত্মবিশ্বাসী। মানুষ যখন স্বরূপত ব্রহ্ম, অসীম শক্তির উৎস, তখন সে কেন স্বরূপকে ভুলে আত্মচ্যুতির গ্লানি বহন করে বেড়াবে? বেদান্তের এই বাণী অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে স্বামীজীর ভাষায়ঃ 'মেঘের ওপারে অবস্থিত স্বেচ্ছাচারী, শূন্য হইতে খুশীমতো সৃষ্টিকারী, মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণাদায়ক এক ঈশ্বরের পরিবর্তে বেদান্ত শিক্ষা দেয়—ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্যামী, ঈশ্বর সর্বরূপে—সর্বভূতে।'[৯৯] 'অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানগণ তেজস্বী হউক, তাহাদিগকে কোনরূপ দুর্বলতা বা কোন বাহ্য অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা তেজস্বী হউক, নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াক—সাহসী সর্বজয়ী সর্বংসহ হউক। সর্বপ্রথমে তাহারা আত্মার মহিমা সম্বন্ধে জানুক। এই শিক্ষা বেদান্তে—কেবল বেদান্তেই পাইবে।'[১০০]

এইখানে হয়তো মার্কসবাদীরা আপত্তি তুলবেন, কারণ মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে মার্কসের কোন সঠিক ধারণা না থাকলেও বেদান্তোক্ত এই তত্ত্বকে মার্কস স্বীকার করেননি। তাহলে, মুক্তির উদ্দেশ্য কি? তাৎপর্যই বা কি? এই প্রশ্নেই আমরা এবার আলোচনা শুরু করব।

॥ ৮ ॥

ক্রমবিকাশের তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছেনঃ '...জড়ের মধ্যে যে চেতনের ক্রমিক পরিচয়লাভ—তা-ই হল সভ্যতার ইতিহাস।'[১০১] তাঁর মতে, জড়ের বিরুদ্ধে চৈতন্যের সংগ্রাম এবং ক্রমাধিপত্যই হচ্ছে ক্রমবিকাশের ইতিহাস। 'যা nature-এর against-এ rebel (প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ) করে, তা-ই চেতন; তাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে।'[১০২]

চৈতন্যের আদি অভিব্যক্তি অ্যামিবা (স্বামীজী বলেছেন যে, এর আগে চৈতন্য অব্যক্তাবস্থায় সূক্ষ্মাকারে থাকে, জড়ের মধ্য দিয়ে সে যখন নিজেকে প্রকাশ করে তখনই আমরা সাদা চোখে চৈতন্যের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি)।[১০৩] সেই এককোষী জীব অ্যামিবার অঙ্গ ছিল, ছিল না কোন প্রত্যঙ্গ। তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল বেঁচে থাকার জন্য, খাদ্যসংগ্রহের জন্য, চলার জন্য। প্রকৃতির বিরুদ্ধে, জড়ের বিরুদ্ধে তার এই সংগ্রাম ছিল অব্যাহত। জড়ের উপরে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাতে এর প্রতিটি ক্ষণ ব্যয়িত হত। এই সংগ্রামের ফলেই এল নতুন প্রজাতি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই নতুন প্রজাতি একটু বেশী শক্তিশালী অ্যামিবার চেয়ে। সেও করে চলল

৯৯। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৫ ১০০। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৭

১০১। তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৪ ১০২। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ১২

১০৩। নিউইয়র্কের এক বক্তৃতায় স্বামীজী এর ব্যাখ্যা করেছেন। [দ্রষ্টব্যঃ বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৭]

সংগ্রাম—প্রকৃতির উপর, জড়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম। জড়ের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম জন্ম দিল নবতর প্রজাতির। এইভাবে নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়ে চলল, প্রতিটি প্রজাতিই পূর্ববর্তীর চেয়ে অধিকতর সংগ্রামক্ষম। আর এই সংগ্রামের তাগিদেই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও উদ্ভব হতে লাগল। সৃষ্টির সেই আদিম যুগে ক্রমশই বড় বড় প্রাণীর আবির্ভাব হতে লাগল। এল ন-ফুট দীর্ঘ সামুদ্রিক বৃশ্চিক, কুড়ি ফুট লম্বা সামুদ্রিক মাছ, ড্রাগন-মাছি যার পাখার বিস্তার ছিল আড়াই ফুট, চুরাশি ফুট লম্বা ডিপ্লোডেকাশ কর্নোগিয়াই আর একশ ফুট লম্বা জাইগানটোরাস। কিন্তু শুধুমাত্র দৈহিক বিশালতাই যে জড়ের বিরুদ্ধে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার নয়, একথা যেন প্রাণিজগৎ বুঝতে পারল। দৈহিক বিশালতা এল কমে, উদ্ভব হল পালক বা লোম আর ডানার। পৃথিবীর উষ্ণতা কমে আসছে, তাই ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য লোমের উদ্ভব, স্থল আর জলের মতো অন্তরীক্ষেরও বাধা জয় করার জন্য উদ্ভূত হল ডানা। সৃষ্টি হল বেশী কষ্টসহিষ্ণু প্রাণিকুলের। তাদের মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতার বৃদ্ধি হতে লাগল। পৃথিবীর আদি জীব অ্যামিবার জন্মের বহু কোটি বছর পরে আবির্ভাব হল আদিম বানরের। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য দীর্ঘ বহু কোটি বছরের সাধনার পর প্রাণিজগৎ যেন এই প্রথম আশার আলো দেখতে পেল। সংগ্রামের ধারা বেয়ে এল মানুষ। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জড়ের উপরে চৈতন্যের ক্রমাধিপত্যের ইতিহাসই ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

বহু কোটি বছর ধরে প্রাণিজগতের যে ক্রমবিকাশ চলছিল দৈহিক স্তরে, মানুষের আবির্ভাবের পর সেই সূত্র হঠাৎ যেন ছিন্ন হয়ে গেল। ক্রমবিকাশের ধারা দৈহিক স্তর থেকে চলে এল মানসিক স্তরে। প্রস্তরযুগের মানুষ তার মানসিক স্তরে ক্রমবিকাশ লাভ করেই বিংশ শতাব্দীর মানুষে পরিণত হতে পেরেছে। গাছের ফলমূল আর পশুর মাংস দিয়ে সে তার দেহের খিদে মিটিয়েছে। এর পরেই এসেছে মনের খিদে মিটানোর তাগিদ। জীবজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই রয়েছে এই তাগিদ। এই খিদে মিটাতেই আদিম মানুষ গুহায় ছবি এঁকেছে, তৈরী করেছে মাটির পুতুল, জানতে চেয়েছে বৃষ্টি কেন হয়, ভূমিকম্পে কোন্ দৈত্য মাথা নাড়ে—সমস্ত রহস্যের পিছনেই একটা যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করেছে। সে শিখেছে আগুন জ্বালাতে, গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে বাড়ি আর কাপড় তৈরী করতে। উদ্দেশ্য ছিল—অন্ধকার-বৃষ্টি-রোদ-ঝড়-শীতকে জয় করা, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। বহিঃপ্রকৃতিকে মানুষ যত বেশী করে জয় করছে, তার সভ্যতা ততই উন্নত হচ্ছে। বড় হচ্ছে মানুষ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে রহস্যভেদ করতে চাইছে দূরের ঐ নীলাকাশের, পৃথিবীর, মাটির, জলের, আপনজনের মৃত্যুতে চিন্তা করছে মৃত্যু কি, আর জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি? এভাবেই সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্ম। সবকিছুর মধ্যেই কিন্তু একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—সসীম (finite) মানুষ অসীম (infinite) হতে চাইছে। স্বামীজী একেই 'ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রমণের চেষ্টা'[১০৪] (attempt to transcend the limitation

---

১০৪। বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২০

of senses) বলে অভিহিত করেছেন। এই যে অসীম হবার চেষ্টা, তারই প্রতিফলন ঘটেছে শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-ধর্মের চিন্তাধারার মধ্যে। এ সমস্ত প্রয়াসের সমষ্টিই সংস্কৃতি। যে জাতি যত সুন্দরভাবে যত সার্থকভাবে অসীমের সঙ্গে তার মিলনের আকৃতি প্রকাশ করতে পেরেছে, যত গভীরভাবে সেই অসীমকে অনুভব করতে পেরেছে, সে জাতির সংস্কৃতি তত উন্নত হয়েছে। এভাবেই স্বামীজী ইতিহাসের গতিসূত্রটিকে উদ্ধার করেছেন। জড়ের উপরে চৈতন্যের ক্রমাধিপত্যই যখন ইতিহাসের গতি তখন ইতিহাসের, মানবজাতির লক্ষ্য কি? নিঃসন্দেহে জড়ের উপরে চৈতন্যের পূর্ণাধিপত্য। আর ধর্ম মানুষকে এই উদ্দেশ্যর দিকেই নিয়ে যেতে চায়, লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন করে। স্বামীজী বলছেন: 'তিনি (যোগী) এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে চান, যেখানে আমরা যেগুলিকে "প্রকৃতির নিয়মাবলী" বলি, সেগুলি তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না, সেই অবস্থায় তিনি ঐসব অতিক্রম করিতে পারিবেন। তখন তিনি আন্তর ও বাহ্য সমগ্র প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ করিবেন। মনুষ্যজাতির উন্নতি ও সভ্যতার অর্থ—শুধু এই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করা।'[১০৫]

এ কারণেই স্বামীজী ধর্মকে সমাজের আবশ্যিক অঙ্গ বলে মনে করেছেন। Practical Vedanta-র তাৎপর্যে তিনি একদিকে যেমন মানবজীবনের রহস্য সমাধানে মানুষকে উৎসাহিত করেছেন, অন্যদিকে দেখিয়েছেন যে, মানবসভ্যতার গতি ঐ একই দিকে—জড়ের উপর চৈতন্যের পূর্ণাধিপত্যে।

উপসংহার

স্বামীজীর নতুন পৃথিবী তাই হবে ব্যক্তিমানসের বিকাশের অসীম সম্ভাবনাময় উৎস। জোর করে আইনের সাহায্যে নয়, মানুষ গড়ে উঠবে তার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে, নিজস্ব বিবেকবুদ্ধির কল্যাণী শক্তির প্রেরণায়। রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী রূপ তিনি দেখতে চাননি, তা সে রাষ্ট্র যতই কল্যাণকর হোক। বলেছেন তিনি: 'হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ পায়। সর্ব বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূর্তি কখনও হয় না। ...দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখন স্বায়ত্তশাসন শিখে না;...ঐ "পালিত" "রক্ষিত"ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল।'[১০৬] প্রাথমিক সামান্য কয়েকটি দায়িত্ব পালন করা ছাড়া রাষ্ট্রের কোন কর্তব্য থাকবে

১০৫। তদেব, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২১৯

১০৬। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২২৩-২৪। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন: 'জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।' [বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৪১৯]

না।[১০৭] স্বাধীনতার পরিপূর্ণ আবহাওয়ায় মানুষ নিজেকে গড়ে তুলবে।[১০৮] রাষ্ট্রদায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে মানুষ যে কেবল জনসাধারণের রাষ্ট্রনীতি ব্যাপারেই দক্ষ হবে তা নয়, সমবায়শক্তিরও যথার্থ উদ্বোধন ঘটবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনগণ নিজেদের উন্নতির পরিকল্পনা নিজেরাই করবে, আর তার সঙ্গে শিখবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ একত্র হয়ে কিভাবে প্রচণ্ড বল সংগ্রহ করতে পারে। আসল কথা, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির মতো কোনও শ্রেণী বা মার্কসবাদী রাষ্ট্রের মতো কোনও গোষ্ঠী দ্বারা শাসনকাজ নয়, এর ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে জনগণের মধ্য থেকে। স্বামীজী বলছেন যে, আগ্রহ না থাকলে মানুষ খাটে না ; তাই সকলকে দেখানো উচিত যে, প্রত্যেকেরই কাজে ও সম্পত্তিতে অংশ আছে এবং কার্যধারা সম্বন্ধে মত প্রকাশের ক্ষমতা আছে। আমাদের দেশের একটি প্রধান দোষ হচ্ছে যে, আমরা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না, আর এর কারণ হচ্ছে যে, আমরা অপরের সঙ্গে কখনও দায়িত্ব ভাগ করতে চাই না, আর আমাদের পরে কি হবে তা কখনও ভাবি না।[১০৯]

জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও জাতীয় সংস্কৃতিতে দৃঢ়মূল হয়ে মানুষ গড়ে তুলবে নিজের দেশকে।[১১০] ইতিহাস থেকে স্বামীজী দেখিয়েছেন কিভাবে জাতীয়তাবাদে সঞ্জীবিত হয়ে গ্রীস, আরব, স্পেন, ব্রিটেন, জার্মানী, জাপান উঠে দাঁড়িয়েছিল,[১১১] আবার এই জাতীয়তাবাদের অভাবেই তুরস্ক আর অস্ট্রিয়ার পতন।[১১২] ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন : 'ভারতবর্ষ জয় করা ইংরেজের পক্ষে এত সহজ হইয়াছিল কেন ? যেহেতু তাহারা একটি সঙ্ঘবদ্ধ জাতি ছিল, আর আমরা তাহা ছিলাম না।'[১১৩] তাই স্বামীজীর দৃপ্ত আহ্বান : 'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।'[১১৪]

১০৭। 'তাহাদের (জনগণের) চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জানিতে পারে—জগতে কোথায় কি হইতেছে। তাহা হইলে তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নরনারী নিজের উদ্ধার নিজেই সাধন করিয়া থাকে। আমাদের কর্তব্য—কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া, বাকি যা-কিছু তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে।' [বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৪১-৪২] ১০৮। ৪৫ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য

১০৯। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৪২-৩

১১০। 'We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and *raise the masses.*' [বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১২] ১১১। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৩

১১২। তদেব, পৃঃ ১৩২ ১১৩। তদেব, পৃঃ ৪৩৪ ১১৪। তদেব, পৃঃ ২৪৯

তবে কি নতুন পৃথিবী তৈরী হবে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি জাতি নিয়ে? ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে থাকবে অনন্ত ব্যবধান? না। স্বামীজীর মতে, জাতি হিসাবে গড়ে ওঠা প্রাথমিক কর্তব্য, কিন্তু এর লক্ষ্য আন্তর্জাতিকতা। বিশ্বের বহুতন্ত্রী বীণায় নিজস্ব সুর তাকে বাজাতে হবে নিখুঁতভাবে, সমগ্র সুরলহরীর দিকে লক্ষ্য রেখে মানুষকে দেখতে হবে অন্যান্য জাতি কিভাবে এগিয়ে চলেছে; বিশ্বের চিন্তাধারার সঙ্গে রাখতে হবে অবাধ আদানপ্রদান।[১১৫] ভগিনী নিবেদিতাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন তিনিঃ 'এই আন্তর্জাতিক মেলামেশার মতলবটা খুব ভাল—যে রকমে পার, ওতে যোগ দাও; আর যদি তুমি মাঝ থেকে কয়েকটি ভারতীয় নারী-সমিতিকে এতে যোগ দেওয়াতে পার, তবে আরও ভাল হয়।'[১১৬] নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ নিজস্ব সংস্কৃতিকে গড়ে উঠে বরণ করবে আন্তর্জাতিকতাকে। বিশ্বের সকল মানুষের মাঝে একই সর্বব্যাপী আত্মা, একই ঈশ্বরের সন্তান সকলে। বৈদিক ঋষি একদিন যেমন 'শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে সকলকে আহ্বান জানিয়ে গভীর বিশ্বমানবতাবাদের ডাক দিয়েছিলেন, সেই সুরে আগামী পৃথিবীর মানুষও ডাকবে সকলকে। প্রতিটি জাতির মধ্যে যে ভাল দিকগুলি আছে তাকে আত্মস্থ করে পরিণত হতে হবে বিশ্বমানবে। পাশ্চাত্যের কর্মকুশলতার সাথে প্রাচ্য প্রজ্ঞার সম্মিলনে গড়ে উঠবে সার্বভৌম পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

নতুন পৃথিবীর আগামী প্রজন্ম কাজ করবে খাওয়ার জন্য নয়, ভোগের জন্য নয়; তার প্রতিটি কাজই হবে পরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কাজ তার কাছে তখন আর কেবল 'কাজ' নয়, 'উপাসনা'—চিত্তশুদ্ধির উপায়। তার সমগ্র জীবনই তখন পরিচালিত হবে পরম পুরুষার্থের অনুপ্রেরণায়, মুক্তির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হবে তার সমগ্র জীবন। মানবজীবন তখন দেবজীবনে রূপান্তরিত হবে। সত্ত্বগুণের বিকাশে মানুষ যথার্থ 'মানুষ'-এ পরিণত হবে। এই নতুন পৃথিবীর আবাহনেই স্বামীজীর জীবন, স্বামীজীর বাণী। এ পথ সহজ নয় যতক্ষণ না মানুষ কামনাবাসনার উপর তার বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখছে। স্বামীজী তাই ধর্মের উদ্বোধন চেয়েছেন। ধর্মের পথে, আধ্যাত্মিকতার পথে মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি যখন দেখা দেবে তখনই গড়ে উঠতে পারবে নতুন পৃথিবী। আর এই নতুন পৃথিবীরই সন্ধান দিয়ে গেছেন স্বামীজী।

১১৫। তদেব, পৃঃ ৩৪২ ১১৬। তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৯৮

শিক্ষাচার্য বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

জগতের সম্মুখে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম পরিচয় ধর্মপ্রচারকরূপে। শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য স্বামীজী ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আমেরিকা যাত্রা করেন, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে দেশে ফিরিয়া আসেন। তিন বৎসরের কিছু বেশী কাল তিনি আমেরিকায় অবস্থান করেন। ইহার মধ্যে ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও পরিভ্রমণ করেন। পশ্চিমে অবস্থানকালে ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতা ছাড়াও বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তিনি অনেক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। নানা উপলক্ষে নানা মনস্বী-জনের সহিত যেসকল কথোপকথন হইয়াছিল তাহার বিবরণও আমাদের অপরিজ্ঞাত নহে। সেদেশের সাংবাদিকদের সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণও অনেক লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল ভাষণ, কথন, সাক্ষাৎকার প্রভৃতির মধ্য দিয়া সেদিন স্বামীজী জনসাধারণের সম্মুখে প্রধানতঃ ধর্মাচার্যরূপেই উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশে ফিরিয়াও বক্তৃতাদি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সংখ্যা কম। তবে শিষ্য সেবক ভক্ত জিজ্ঞাসুদের সহিত আলোচনার বিরাম ছিল না। তাহার মধ্য দিয়াও যে মানুষটি আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়াছেন তিনি যে একজন ধর্মগুরু একথা কে অস্বীকার করিবে?

সন্ন্যাসী-মাত্রই ধর্মগুরু হইবেন এমন কথা নাই। কিন্তু যে-সন্ন্যাসীকে ধর্মগুরুরূপে দেখিতেছি তাঁহাকে কি আর কোনরূপে দেখিতে পারি না? অন্য সন্ন্যাসীর পক্ষে হয়তো তাহার সম্ভাবনা থাকিত না কিন্তু এই নবীন সন্ন্যাসীর কথা স্বতন্ত্র। ইনি কামকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইলেও মানুষকে ত্যাগ করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার সন্ন্যাস 'জগদ্ধিতায়' এবং 'জনহিতায়'। একজন দুইজনের সংসার হইতে নিজেকে সরাইয়া আনিয়া জগজ্জনের সহিত কুটুম্বিতা। এক হিসাবে সেইটাই তাঁহার ধর্ম। সাধারণ মানুষের কাছে বেদ-বেদান্ত দ্বৈত-অদ্বৈত সমান। আমরা তাঁহাকে যদি ভালবাসিয়া থাকি, ভক্তি করিয়া থাকি তো কেবল এই জানিয়া করিয়াছি যে, নরের মধ্যে তিনি নারায়ণকে দেখিয়াছেন এবং নরসেবাকেই তিনি নারায়ণের সেবা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

নারায়ণের সেবা পোয়াটাক আতপচাল এবং গুটিকয়েক তুলসীর পাতা হইলেই চলিয়া যায় কিন্তু নরসেবাটি এত সহজসাধ্য নহে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সারাটা জীবন- ধরিয়া তাহার অনেক অভাব অনেক দাবি। সে দাবি ব্যক্তি হইতে পরিবার, পরিবার হইতে সম্প্রদায়, সম্প্রদায় হইতে জাতি, এমনি করিয়া ঘর হইতে বিশ্ব পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। নরসেবার দায় যে স্বেচ্ছায় শিরে তুলিয়া লয় তাহার গুরুত্ব জানিয়াই লয়। স্বামীজীও জানিয়াই লইয়াছিলেন। তাই বেদান্ততত্ত্ব যেখানে বলিবার এবং যাহাকে বলিবার বলিয়াছেন কিন্তু তাহার পূর্বে ক্ষুধার্তকে অন্নদানের কথা ভাবিয়াছেন, ব্যাধিতকে ঔষধ দিবার কথা চিন্তা করিয়াছেন, অজ্ঞানকে জ্ঞানদানের চেষ্টা করিয়াছেন।

দেশটা অজ্ঞানের অন্ধকারে আবদ্ধ হইয়া আছে—জ্ঞানের আলোকে তাহাকে মুক্তি দিতে হইবে। শিক্ষার পথেই সেই মুক্তি।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, বৈদান্তিক বিবেকানন্দ, ধর্মগুরু বিবেকানন্দ একদিকে প্রতীচ্যের কাছে নূতন বাণী শুনাইয়া পশ্চিমের জনগণকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছেন; আর একদিকে দীনদরিদ্র-বৎসল বিবেকানন্দ, স্বজাতিসেবক বিবেকানন্দ, নরনারায়ণ-পূজারী বিবেকানন্দ অন্নহীন বস্ত্রহীন অজ্ঞান অশিক্ষিত ভারতবাসীর জন্য অশ্রুমোচন করিতেছেন।

'ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম।'[১] সেই পার্থক্য দূর করিবার জন্য তাঁহার চিন্তা যে-পথে ধাবিত হইয়াছে এ-প্রবন্ধে তাহারই সন্ধান করিব। আর এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারার সহিত কোথায় তাহার মিল দেখা যায় তাহাও লক্ষ্য করিব।

শিক্ষার অভাবই আমাদের সকল প্রকার দুর্গতির আদি কারণ। শিক্ষার ব্যবস্থা যাহা আছে তাহাও অপ্রতুল। অভাব এবং অপ্রতুলতা তবু ভাল কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার অনেকাংশই অনুপযোগী এমনকি অহিতকর। কারণ শিক্ষার যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, যাহা প্রকৃত তাৎপর্য একালের শিক্ষাবিধানের সাহায্যে তাহার অর্জনের সম্ভাবনা নাই। স্বামীজীর মতে, শিক্ষার অর্থ অন্তরের বিকাশ।

'শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।'[২]

'ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব-প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।'[৩]

সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত শক্তি মানুষের মধ্যেই আছে, অনন্তকাল ধরিয়া আছে। সরিষার মতো একটি ক্ষুদ্র বীজ দেখিয়া ধারণা করা কঠিন যে উহারই মধ্যে এক বিরাট বটবৃক্ষের সম্ভাবনা নিহিত আছে। কিন্তু আছে যে তাহা তো নিঃসংশয়। আমাদের মধ্যেও মহতী শক্তির অবস্থান। সে শক্তি অব্যক্ত কিন্তু অস্তিত্ববিহীন নহে। যথোপযুক্ত রস ও রৌদ্রের সাহায্যে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহার পর একদিন বনস্পতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের অন্তর্নিহিত যে শক্তিবীজ তাহার ক্ষেত্রে রস-রৌদ্রের কাজ করে শিক্ষা। গুরু শিষ্যকে এমন শিক্ষা দিবেন যেন সে স্বকীয় শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। গুরু শিষ্যকে শক্তি দান করেন না, তাহার শক্তির বিকাশে সাহায্য করেন। যেসকল বহিরাবরণ শক্তি প্রকাশের অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে তাহাকে অপসারিত করিয়া দেন। 'চক্ষুরুন্মীলিতং যেন জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া'—তিনিই গুরু। জ্ঞানচক্ষু নিমীলিত হইয়া আছে। সে চক্ষু অন্ধ নয় তাহার দৃষ্টিশক্তি আছে কিন্তু চোখের পাতা বন্ধ। গুরু অঞ্জনশলাকা দিয়া কেবল চোখের পাতাটি খুলিয়া দেন।

শিক্ষক যখন জ্ঞান দান করিবার ব্রত লইবেন তখন শিষ্যের শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। 'বিশ্বাস করিতে হইবে যে, প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধারস্বরূপ, আর আমাদিগকে তাহার মধ্যে অবস্থিত সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।'[৪]

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৭৪-৭৫ ২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৪০০ ৩। তদেব

৪। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৩৪২

স্বামীজী লক্ষ্য করিয়াছেন আমাদের দেশে মৌলিক চিন্তার বড় অভাব এবং তাহাই আমাদের হীনাবস্থার একটি প্রধান কারণ। এই দুর্গতি দূর করিতে পারেন একমাত্র শিক্ষকসমাজ। শিশুদের শিক্ষা দিবার সময় তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে যে, পুঁথির পাঠ মুখস্থ করাইয়া দিলেই তাঁহাদের কর্তব্য সমাপ্ত হইল না। তাহারা স্বাধীনভাবে যাহাতে চিন্তা করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। যেদেশের ছেলেমেয়েরা এই ভাবের শিক্ষা পায় সেদেশের মানুষ পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে না। জীবনের নানা সমস্যার সমাধান তাহারা নিজেরাই করিয়া থাকে।

শিক্ষার এই দুর্গতির দিকটি স্বামীজীর সমকালীন আর একজন মনীষীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শিক্ষা-সংস্কার প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন ঃ 'এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সেকথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের পাণ্ডিত্য অল্প কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আমাদের উদ্ভাবনা শক্তি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে না, আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই। ...আমরা নকল করি, নজির খুঁজি, এবং স্বাধীন মত বলিয়া যাহা প্রচার করি, তাহা হয় কোন না কোন মুখস্থ বিদ্যার প্রতিধ্বনি, নয় একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। হয় মানসিক ভীরুতাবশতঃ আমরা পদচিহ্ন মিলাইয়া চলি, নয় অজ্ঞতার স্পর্ধাবশতঃ বেড়া ডিঙ্গাইয়া চলিতে থাকি। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির যে স্বাভাবিক খর্বতা আছে একথা কোন মতেই স্বীকার্য নহে।'[৫]

রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন 'আমাদের বুদ্ধির...স্বাভাবিক খর্বতা' নাই তাহা বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের কথা। স্বামীজীও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া যখন বলেন 'প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধারস্বরূপ' তখন তিনিও এদেশের কথা ভাবিয়াই বলিয়াছেন, যদিও তাঁহার উক্তির আক্ষরিক অর্থ সমগ্র বিশ্বের শিশুসমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কিন্তু স্পষ্ট করিয়া দেশের নাম করিয়াও কম বলেন নাই।

'ভিতরে অদম্য শক্তি রহিয়াছে। শুধু "আমি কিছু নই" ভাবিয়া ভাবিয়া বীর্যহীন হইয়া পড়িয়াছি। তুমি কেন?—সমস্ত জাতিটাই হইয়া পড়িয়াছে।' আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীই আমাদের মনকে দুর্বল করিয়া তুলিতেছে। সে প্রণালীর যাঁহারা প্রবর্তক তাঁহারাই বেশী করিয়া আমাদের অক্ষমতার অভিযোগ করেন। 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ঃ 'আমাদের বিদেশী গুরুরা প্রায়ই আমাদিগকে খোঁটা দিয়া বলেন যে, এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্থবিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।'[৬] যে দোষটা মূলত শিক্ষাপদ্ধতির সে দোষটার দায় ভোগ করি আমরা।

স্বামীজী বলিতেছেন ঃ 'ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, ভারত বরাবরই কর্মকুশল। আজকাল আমাদের শেখানো হয়—হিন্দুরা হীনবীর্য ও নিষ্কর্মা; যেসকল

৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ২৯২-৯৩

৬। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৭৫, পৃঃ ৫৮৪

ব্যক্তির নিকট এই শিক্ষা পাই, তাঁহাদের নিকট অধিকতর জ্ঞানের প্রত্যাশা করি।'[৭] কিন্তু আমাদের সে প্রত্যাশা যতটা পূর্ণ হইয়াছে কুফল ফলিয়াছে তাহার অপেক্ষা অধিক। 'তাঁহাদের শিক্ষায় এই ফল হইয়াছে যে, অন্যান্য দেশের লোকের নিকট ইহা একটি কিংবদন্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, হিন্দুরা হীনবীর্য ও নিষ্কর্মা।'[৮] স্বামীজী বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, আমরা হীনবীর্য নহি—আমরা নিষ্ক্রিয় নহি—আমরা নির্বোধ নহি। মহাশক্তির আধার আমরা। একটা ক্ষণিক আবরণে সে শক্তি ঢাকা পড়িয়াছে মাত্র। প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা সে আবরণ অপসারিত করিতে হইবে। প্রায় একই সুরে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন ঃ 'সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তি দান করে।...আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব—ইহাই শিক্ষার ফল।'[৯]

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ বাহ্যতঃ দুইপথের পথিক। একজন সন্ন্যাসী আর একজন কবি। কিন্তু দুইটি মানুষের মধ্যে চিন্তায় ও মানসিকতায় আশ্চর্য মিল। দুইজনেই মানুষের মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং সেই মানুষের মধ্যে ভগবত্তা যেখানে সুপ্ত তাহাকে উদ্বোধিত করাকে জীবনের কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন। দুইজনেই বিশ্বপ্রেমিক এবং বিশ্বের সকল মানবের প্রতিই দুইজনের অকৃত্রিম অনুরাগ। তৎসত্ত্বেও দুইজনের স্বদেশপ্রেম অকপট এবং একনিষ্ঠ। স্বজাতির সেবার মধ্য দিয়াই তাঁহারা বিশ্বমানবের সেবা করিয়াছেন। দেশের অশিক্ষিত নরনারীকে শিক্ষিত করার প্রয়াস সেই স্বদেশ-সেবারই প্রধান অঙ্গ।

অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান করার আবশ্যকতা সম্বন্ধেই শুধু নয় শিক্ষাদানের প্রণালী সম্বন্ধেও দুইজনের ঐকমত্য দেখা যায়। স্বামীজী মনে করিতেন প্রাচীন ভারতবর্ষে ছাত্রগণ যে গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইত, চরিত্র গঠনের পক্ষে তাহার উপযোগিতা ছিল অপরিমেয়। 'একটা জ্বলন্ত character-এর কাছে ছেলেবেলা থেকেই থাকা চাই, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই।'[১০] 'সেই জন্যই "গুরুগৃহবাস" ইত্যাদি চাই। চাই...ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়।'[১১] ইউরোপে যে এক সময় মঠপ্রথায় শিক্ষাদানের পরীক্ষা হইয়াছিল এবং সে প্রথায় কোন কোন অঞ্চলে সুফল হইয়াছিল সেকথাও স্বামীজী উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামীজী এই চিন্তাকে কার্যতঃ প্রয়োগ করিবার তেমন সুযোগ পান নাই। কিন্তু শিক্ষার এই প্রাচীন পদ্ধতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ এতখানি আকৃষ্ট হন যে নিজেই একটি আদর্শ তপোবন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সে বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁহার উক্তি ঃ 'ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল আধুনিককালের কোনো একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। ...তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনে তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যদের

৭। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৩ ৮। তদেব

৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৩১৯-২০

১০। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৬২-৬৩ ১১। তদেব, পৃঃ ৪০১

চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন এই যে প্রেরণা পাচ্ছে সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষায় সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান।'[১২]

ব্রহ্মচর্য সম্পর্কেও দুই মনীষীর চিন্তার ধারা প্রায় অভিন্ন। স্বামীজী ছাত্রগণের ব্রহ্মচর্য পালনের আবশ্যকতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ '...সর্বদেশে ব্রহ্মচর্য শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে যে, অপবিত্র হইলে এবং ব্রহ্মচর্যের অভাবে আধ্যাত্মিকভাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজ—সবই চলিয়া যায়। এই কারণেই দেখিতে পাইবে, জগতে যে-সব ধর্মসম্প্রদায় হইতে বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছেন, সেই-সকল সম্প্রদায়ই ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। ...কায়মনোবাক্যে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করা নিতান্ত কর্তব্য।'[১৩]

রবীন্দ্রনাথের মতেঃ 'জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্যপালনের উদ্দেশ্য।'[১৪] সুতরাং যতদিন অধ্যয়নের কাল ততদিন গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করার প্রাচীন পদ্ধতিকে রবীন্দ্রনাথ পুনঃপ্রবর্তন করিতে অগ্রসর হইলেন।

ব্রহ্মচর্য শব্দটিকে স্বামীজী যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত অর্থের সঙ্গে তাহার মিল নাই এমন নয়, তবে কিছু পার্থক্য আছে। স্বামীজীর আদর্শ গুরু সন্ন্যাসী। গুরুগৃহ সন্ন্যাসীর আশ্রম। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ গুরুগণ সন্ন্যাসী নহেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কি ছিল তাহা এই কয়টি কথায় ব্যক্ত হইয়াছেঃ 'একদিন তপোবনে ভারতবর্ষের গুরুগৃহ ছিল এইরূপ একটা পুরাণকথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ...যেকালে এই সকল আশ্রম সত্য ছিল সেকালে তাহারা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে পারিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, এই সকল আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা গৃহী ছিলেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মতো তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন।'[১৫] রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, একালকার টোলেও সেই পুরাতন ভাবটাই কতকটা চলিয়া আসিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ গুরু গৃহী হইলে কি হইবে তাঁহাদের গার্হস্থ সন্ন্যাসের পাশাপাশিই চলে। আসল কথা, অধ্যয়নের পরিবেশ। গৃহী গুরুর আশ্রমই হউক, আর সন্ন্যাসী গুরুর আশ্রমই হউক, প্রথম শিক্ষার্থীর শিক্ষাক্ষেত্র যেন শিক্ষাগ্রহণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল হয়। বইয়ের পড়াটাই সেখানকার আসল কথা নয়। সেখানে সর্বদাই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার একটা হাওয়া বহিতে থাকিবে। ছেলেরা লেখাপড়া করিবে, গুরুও

১২। রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ১৯৭৪, পৃঃ ৩১৫-১৬

১৩। বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ২৬২-৬৩

১৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৩০০ ১৫। তদেব

লেখাপড়া লইয়া থাকিবেন। সেখানকার জীবনযাত্রা সাদাসিধা হইবে, বৈষয়িকতা বিলাসিতা বিদ্যার্থীর মনকে বিক্ষিপ্ত করিবার সুযোগ পাইবে না। সংসারের মাঝখানে থাকিলে নানা লোকের সঙ্ঘাতে নানা দিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া তাহাদের মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে, এই আশ্রমে তাহা হইবার যো নাই। কবি বলিয়াছেন এইরূপ আশ্রমবাসের ফলে 'শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময় ও সুবিধা পায়'।[১৬]

কেবল ব্রহ্মচর্য পালন নয়, গুরুর আশ্রমে অবস্থানকালে বিদ্যার্থী বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য পায়। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সেটার আবশ্যকতা দুই মহাপুরুষই উপলব্ধি করিয়াছেন।

স্বামীজী জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। বলিয়াছেন ঃ 'প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষে যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ওইটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐপথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।'[১৭] 'সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।...তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।'[১৮]

রবীন্দ্রনাথও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে দেশের সাধারণ জনগণের যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হইয়াছেন ঃ 'একালে যাকে এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল কিন্তু যে যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব। শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে ; তারাই হল এন্‌লাইটেণ্ড, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ।'

এই তথাকথিত এন্‌লাইটেণ্ড সমাজ সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তি আরও কঠোর ঃ 'যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।'[১৯] 'ভারতের চিরপতিত বিশ কোটি নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে?...তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারছে না; তারা শিক্ষা পাচ্ছে না। কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বলো?'[২০]

মানুষে মানুষে যে ভেদ তাহাই মানুষকে সর্বাধিক দুর্বল করে। জাতিভেদ আমাদের দুর্বলতার এক প্রধান কারণ। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন জাতি তো আছেই, তাহাদের মধ্যে

১৬। তদেব ১৭। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪ ১৮। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫
১৯। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৮৯ ২০। তদেব

আবার অসংখ্য উপবিভাগ। কাহার জল চলে, কাহার জল চলে না—তাহা লইয়া কত বাদ কত বিতণ্ডা। ইংরাজ শাসনে আর এক নূতন রকমের জাতিভেদ দেখা দিল। যাঁহারা ইংরাজী পড়িয়া 'এন্‌লাইটেণ্ড' সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন সৌভাগ্যবান একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়া গেলেন। সর্বসাধারণের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ রহিল না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেনঃ 'ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড় জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।'

স্বামীজী এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শ্রেণীগত বিভেদকে আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় বিবেচনা করিতেন এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই যে এই বিপত্তি দূর করিবার একমাত্র উপায় সে-বিষয়ে উভয়ের মনে কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না।

সর্বসাধারণের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। তবে তাহাদের জন্য কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়? স্বামীজী কি চিন্তা করিয়াছিলেন সেটা প্রথমে দেখা যাক। স্বভাবতই ধর্মশিক্ষার কথা তাঁহার প্রথমেই মনে আসে। কারণ, শিক্ষা বলিতে তিনি বুঝেন মনুষ্যত্বের উদ্বোধন এবং তাহার সহিত ধর্মের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তো থাকিবেই। তবে সে ধর্ম কোন আনুষ্ঠানিক ধর্ম নহে। 'যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম—জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখো।...ধর্মের যে সর্বজনীন সাধারণ ভাব, তা-ই শিখাইবে।'[২১]

এই ধর্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক শিক্ষা দিবার কথাও স্বামীজী বলিয়াছেন। লৌকিক শিক্ষা বলিতে স্বামীজী কি বুঝিয়াছিলেন এবং সে শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে বিকিরণের কি ব্যবস্থাই বা তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন?

জনসাধারণকে সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতাই তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। পৃথিবী আকাশ সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র এসকল বিষয়ে সাধারণের কোন জ্ঞান নাই। সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে লোকের মনে যে কত অন্ধ সংস্কার আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানের অভাবই এই সকল সংস্কারের মূল কারণ। তাহাদের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে তাহাদের শিক্ষাদান করিতে হইবে। ভূগোল সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা নাই। পৃথিবীতে কত জাতির মানুষ আছে, কোন্ দেশে কোন্ কালে কত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, কোথায় কখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিরূপ প্রসার হইয়াছে—এসব খবর ইতিহাসের বই ধরিয়া নহে, মুখের কথায় গল্পের ছলে তাহাদের শিখাইতে হইবে। স্বামীজী বলিয়াছেন, এসব শিখাইবার জন্য ছোটখাট আধুনিক যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করিতে হইবে। গ্লোব, ম্যাপ, বিবিধ চিত্র, ম্যাজিক লণ্ঠন, কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য—এসব সংগ্রহ করিতে হইবে।

স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা স্বামীজী ভাবেন নাই তাহা নহে কিন্তু তিনি বুঝিয়াছেন কোটি

২১। তদেব, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৮

কোটি-পল্লীবাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য যত বিদ্যালয় আবশ্যক তত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। অর্থসঙ্গতি আমাদের কোথায়? আর বিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে সরকারী সাহায্য সেদিন তো কল্পনাতীতই ছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইলেই তো কাজ শেষ হইল না। বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করিবে কে? ছাত্রদের বেতনে স্কুল চলিতে পারে না। যাহাদের দুবেলা অন্ন জুটে না তাহারা বেতনই বা পাইবে কোথা হইতে? অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও ছাত্র পাওয়ার সম্ভাবনা কম। স্বামীজী বলিতেছেন: '...গ্রামে গ্রামে গরীবদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তথাপি তাহাতে কোন উপকার হইবে না, কারণ ভারতে দারিদ্র এত অধিক যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া পিতাকে তাহার কৃষিকার্যে সহায়তা করিবে, অথবা অন্য কোনরূপে জীবিকা-অর্জনের চেষ্টা করিবে; সুতরাং যেমন পর্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্বতের নিকট গিয়াছিলেন, সেইরূপ দরিদ্র বালক যদি শিক্ষালয়ে আসিতে না পারে, তবে তাহাদের নিকট শিক্ষা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।'[২২]

এ কাজ, এমন নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কাজ, করিবার লোক কোথায়?—এইখানেই সন্ন্যাসীর প্রয়োজন। স্বামীজীর আদর্শ সন্ন্যাসী—কেবল জপ তপ যাগ যজ্ঞ করিয়া নিজের মুক্তি খুঁজিয়া বেড়াইবে না, সে তাহার চারিদিকে তাহার সম্মুখে নিরন্তর যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি দেখিতেছে তাহার সেবা করাই জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করিবে। স্বামীজী কল্পনা করিয়াছিলেন: '...কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী— গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না।'[২৩] '...কোন একটি গ্রামের অধিবাসিগণ সারাদিনের পরিশ্রমের পর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া কোন একটি গাছের তলায় অথবা অন্য কোন স্থানে সমবেত হইয়া বিশ্রম্ভালাপে সময়াতিপাত করিতেছে। সেই সময় জন-দুই শিক্ষিত সন্ন্যাসী তাহাদের মধ্যে গিয়া ছায়াচিত্র কিংবা ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে কিংবা বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ছবি দেখাইয়া কিছু শিক্ষা দিল। এইরূপে গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে মুখে মুখে কত জিনিসই না শেখানো যাইতে পারে!'[২৪]

এই কল্পনাকে ব্যাপকভাবে কাজে রূপদান করিতে পারিলে কি হইত বলা যায় না কিন্তু সম্ভবতঃ উপযুক্ত কর্মীর অভাবেই তাহা হইয়া উঠে নাই। অল্প বয়সে দেহত্যাগ না করিলে হয়তো স্বামীজী তাঁহার কল্পনাকে সার্থক করিয়া যাইতে পারিতেন।

স্বামীজীর একটি উপদেশ: 'জনসাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও।'[২৫] এই উপদেশটি শুধু তাঁহার কালের জন্য নহে, সর্বকালের জন্য সত্য। সংস্কৃত ভাষার চর্চা দেশের পক্ষে আবশ্যক বলিয়া তিনি মনে করিতেন কিন্তু প্রচলিত ভাষা পরিত্যাগ

২২। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৪২ ২৩। তদেব, পৃঃ ৪১২
২৪। তদেব, পৃঃ ৪৩৬-৩৭ ২৫। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৮৮

করিয়া নহে। এই প্রসঙ্গে তিনি বুদ্ধদেবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামীজীর মতে বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়াছিলেন এবং সেইটা তাঁহার পক্ষে ভুল হইয়াছিল। কিন্তু প্রচলিত ভাষা পালিতে যে তিনি তাঁহার উপদেশগুলি জনগণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন তাহা স্বামীজীর মতে যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল। 'অবশ্য ভালই করিয়াছিলেন—লোকে তাঁহার ভাব বুঝিল, কারণ তিনি সর্বসাধারণের ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন।'[২৬]

শিক্ষার বাহন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও যে এই মত তাহা সর্বজনবিদিত। কেবল জনশিক্ষার ক্ষেত্রে নহে, শিক্ষার সকল স্তরেই মাতৃভাষার প্রবর্তনের জন্য তিনি সারাজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই মাতৃভাষার মধ্য দিয়া লোকশিক্ষা বিস্তারের একটি পরিকল্পনাও রচনা করিয়াছিলেন। সে পরিকল্পনা পুরোপুরি সার্থক না হইলেও একেবারে নিষ্ফল হয় নাই।

২৬। তদেব, পৃঃ ১৮৭

ভারতচেতনার ত্রিমূর্তি ঃ রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ

॥ ১ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বারো বছরের মধ্যে আবির্ভূত তিন লোকোত্তর মহামনীষীর বিষয়ে আলোচনার প্রারম্ভে স্মরণ করছি উত্তররামচরিতে ভবভূতির প্রশস্তিবাক্যটি ঃ

ইদং কবিভ্যঃ পূর্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে।
বিন্দেম দেবতাং বাচমমৃতামাত্মনঃ কলাম্ ॥[১]

প্রণাম টেনে আনে এই তিনটি নামই রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ। এঁদের কর্ম ও ভাবমণ্ডল বিভিন্ন পরিধিতে হলেও প্রায় একসূত্রে গাঁথা। ভারতচেতনার শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি এই ত্রয়ীর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এঁরা শুধু ভারতপথিক নন, বিশ্বপথিক, সর্বজনসাক্ষী। তিনজনেই অন্তরচেতনার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, শুভকর্মকে আবাহন করেছেন, প্রেম-ভক্তি-সেবাকে জীবনের নৈবেদ্য করে শাশ্বত মানবতার জয়গান করেছেন, অর্ঘ দিয়েছেন পরম ভাগবতকে। কবি হয়েছেন স্রষ্টা ; সন্ন্যাসী কর্মযোগী, জীবসেবায় তৎপর ; জ্ঞানী শুধু মানস সরোবরের অরবিন্দ নন, আত্মসৃষ্টিতে নিমগ্ন, যা মনকে করে অতিমানসের অভিমুখী।

আজ আমরা একটা সঙ্কটের যুগে বাস করছি। সে সঙ্কট শুধু বাইরের নয়, ভিতরেরও। ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে নানা প্রশ্ন, নানা সমস্যা। শুধু অন্নচিন্তা চমৎকারা নয়, ক্ষমতার অধিকারীদের প্রচণ্ড হুঙ্কার, ক্ষুধিতের বিড়ম্বনা, অতৃপ্তের প্রবঞ্চনাবোধ, বাণীবিলাসীর কণ্ঠে নানা ভর্ৎসনা। সঙ্কট প্রতিযুগেই আসে, সমস্যার সমাধানও হয় জোড়াতালি দিয়ে, তবু নিত্যকালের সত্যমানুষের শেষ প্রশ্ন থেকে যায়ই। দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, সৃষ্টির প্রাথমিক দিন থেকে মানুষের মনে, ধ্যানে, জ্ঞানে, জাগরণে, তন্দ্রায় প্রশ্ন জেগেছে চরম প্রার্থনা নিয়ে, পরম আকূতি দিয়ে ভয়চকিত দৃষ্টিতে ঃ কে তুমি, কি তুমি, কোন্ পথ গ্রাহ্য, কোন্ পথ বাহ্য ? তবু চলেছে চিরন্তনীর রথ—পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা ভেদ করে এবং নানা বিচ্ছিন্নতাবোধ (alienation) সত্ত্বেও বদলাচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাস। প্রতিদিনই জীবনের ভারসাম্য উলটে যাচ্ছে।

ইতিহাসের দিক থেকে বলা যায় যে, গুপ্তযুগের পূর্ব থেকেই এক অস্ফুট ভারতচেতনা একটা বৃহত্তর অখণ্ড রূপের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমরা শুধু এক দেবদেবীরই পূজা করছি না, বুদ্ধকে সমুদ্রপারে চালান করে দিচ্ছি না, তাঁকে দক্ষিণেও দেখছি, পূর্বেও দেখছি, পশ্চিমেও দেখছি,—তন্ত্রের মাধ্যমে মহাকালকে শিবে পরিণত করছি—জীবাত্মা, পরমাত্মা, মায়াবাদ, পুনর্জন্ম, চাতুর্বর্ণ্য মানছি, বেদকে অপৌরুষেয় বলছি, ধর্মশাস্ত্র-

---

১। উত্তররামচরিতম্—ভবভূতি, প্রথম শ্লোক, প্রথমাঙ্ক

সূত্র-স্মৃতির অনুশাসন গ্রহণ করছি। নানা বিভেদের মধ্যেও এই মৌলিক ঐক্যটির কথা ভুললে চলবে না। দক্ষিণের কবি ও স্রষ্টা শ্রীসুব্রহ্মণ্য ভারতী বলেছিলেন, ভারতমাতার ত্রিশকোটি মুখ, তিনি আঠারোটি ভাষায় কথা কন, কিন্তু তাঁর মন একটি। সেকথা শুধু আজই সত্য নয়, যুগ যুগ ধরে এই শাশ্বত মনকে খুঁজতেই ছুটেছেন ভারতের সাধক শিল্পী যোগী ত্যাগী জ্ঞানিগুণীর দল। সেই ঐক্যকে তাঁরা পেয়েছিলেন শুধু বাইরের ইতিহাসের বর্ণাঢ্য সমারোহের মধ্যে নয়, একান্তে নিভৃতে নিজের অন্তরের অমৃতলোকেও। তাই শত বৈচিত্র, শত বিভেদ, শত বিবাদের মধ্যেও ফুটে উঠেছিল একটি ঐক্যের সুর। কূল ভাঙে, কূল গড়ে,—একটা ধারাবাহিকতার মধ্যেই সৃষ্টি প্রবহমানা—সেই সৃজনশীল বিবর্তনের মাঝেই আছে ইতিহাসের সত্যিকার চাবিকাঠি। এরই মধ্য দিয়ে চিরন্তনীর রথযাত্রা। একদিকে আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামকামনা-তিক্ততা-লুব্ধতা-ভয়-ভালবাসা-মোহ, আর একদিকে আনন্দের বিধুত চেতনা, অপরিমেয় মন। একেই বিবেকানন্দ বলেছেন মায়াতীতের মায়াখেলা, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জীবভাব আর বিশ্বভাব, অরবিন্দ বলেছেন জড় ও চেতনার মধ্যে প্রাণের আভাস, যা পূর্ণত্ব পায় মানসাতীতের উপলব্ধিতে। জীব আছে আপন উপস্থিতিকে আঁকড়ে, জীব চলেছে আশু-প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা, সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে? না যেদিকে সে বিচ্ছিন্ন, যেদিকে তার পূর্ণতার স্বভাব, সেদিকে সে যেন ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। একেই বলা যেতে পারে বিশ্বমানবতা। ভারতচেতনা এই দুই প্রয়োজনকেই মিলিয়ে দেয়—সংযত সংহত হতে শেখায় একটি অখণ্ড জীবনপ্রত্যয়ে যা জীবনবাদ নয়, জীবনবেদও নয়, জীবনবোধ অর্থাৎ উপলব্ধিতে জ্ঞাত সত্য। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দের অবিস্মরণীয় কথাগুলি মনে পড়ে যায়ঃ 'Never forget the glory of human nature. We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean....'[২]

॥ ২ ॥

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা উচিত যে, ভারতীয় ঐতিহ্যে সংস্কৃতির রূপরেখা ধরে একটি ঐক্যের সূত্রের কথা নিবেদন করলেই একদল সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সমালোচক তখনই বলবেন—ইতিহাসকে ভাবালু করে ঘোরালো করার সার্থকতা থাকলেও সত্য নেই। আর যেখানে এতগুলি ভাষা, এত বিভেদ, এত দূরত্ব, সেখানে ঐক্যের কথা তোলা বাতুলতা। ভারতবর্ষের ঐক্যচেতনা গ্রীকো-লাতিন প্যাগান সভ্যতা পুষ্ট ইউরোপীয় মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সংহতির চেয়েও শ্লথ। কিন্তু সত্যিই কি বিভিন্ন

২। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VII, Advaita Ashrama, Calcutta, Sixth Edition (1964), p. 78

রাজ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চেতনার মধ্যে একটা ঐক্য (unity of thought and theme) নেই? বেদ-উপনিষদ্ যখন উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণে গৃহীত হল, দ্রাবিড় ও আর্য সভ্যতা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়াল, তখন চিন্তা ও সংস্কৃতির রাজ্যেও এল এক মিলনের পরিভাষা। তখন বৈষ্ণব গাথায়, রামায়ণী কথায়, শৈব সাহিত্যে, গল্প বলবার ভঙ্গিতে (যেমন বৃহৎকথা), নাটকের পদ্ধতিতে (ভাসের নাটক তো দক্ষিণেই পাওয়া গেছে), চম্পূ ও দূত কাব্যে, জীবনচর্চার রীতিতে, ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশে আমরা ঐক্যেরই পরিচয় পাই। আজ এই যুক্তচেতনা দক্ষিণের নটরাজকে উত্তরের অবলোকিতেশ্বরের সঙ্গে, গুর্জরের গান্ধীজীকে বাংলার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, তামিল্‌নাদের রমণ মহর্ষিকে, পরমপুরুষ রামকৃষ্ণকে, বিবেকানন্দকে, অরবিন্দকে সারা ভারতের চিত্তে বসিয়ে দিয়েছে। সব নদীর জলের মধ্যেই আমরা গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরীর জল সন্নিহিত হোন বলে আবাহন করি।

শুধু দক্ষিণেই নয়, ঐ শ্রীপতি উত্তরের মন্দিরে-মঠেও প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুরূপে, রামরূপে—কাম্বানের রামায়ণ আমারই রামায়ণ, মহীশূরের চামুণ্ডা বাংলাদেশেরই দুর্গা। মাদুরার মীনাক্ষী এবং কামরূপের কামাখ্যা একই শক্তির বিভিন্ন লীলার রূপ। তাছাড়া, আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, ভারতীয় ঐতিহ্যে সংস্কৃত হচ্ছে দেবভাষা, জ্ঞানিগুণীদের ভাষা এবং ভারতের বহুস্থানেই সাহিত্যের ভাষা। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে শঙ্করাচার্যের যুগ পর্যন্ত প্রধান সাহিত্যের কথা বললেই সংস্কৃতে লেখা গ্রন্থাদিই বোঝায়। আর্যসভ্যতা যখন দ্রাবিড়-সভ্যতাকে গ্রাস না করে আত্মস্থ করল তখনই ভবিষ্যৎ ভারতের বেদী রচিত হল। সেই ভারতচেতনার এই ছন্দটিই তার জীবনজিজ্ঞাসার বিচিত্র রূপকে প্রকাশ করেছে। তাই উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে আমরা শুনেছি সেই একই ভারতবর্ষের কথা, একই শিবের কথা, একই ধর্মরাজের কথা, একই দেবীর কথা, একই বিষ্ণুর কথা। কোথায় সেই তিরুপতি, আর কোথায় লক্ষ্মীজনার্দন, রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ! আমাদের এই বিরাট দেশে অনেক সাম্রাজ্যের পতন-অভ্যুদয় ঘটেছে, অনেক ধর্মবিশ্বাসের অভ্যুত্থান ও বিলুপ্তি হয়েছে, আমরা বহুবার আক্রান্ত, অত্যাচারিত, নির্যাতিত হয়েছি। মানুষ ও প্রকৃতি আমাদের উপর দিয়ে অনেক দুর্যোগের ঝঞ্ঝা বইয়ে দিয়েছে। কিন্তু তবুও আমরা আমাদের ভাবগত, আত্মিক ঐক্য হারাইনি। আমরা একই মূল থেকে সাংস্কৃতিক রসচেতনার উপাদান সংগ্রহ করেছি, জীবননীতিতে তার রূপ ও প্রতিরূপ দেখেছি। বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ ও তার ক্রিয়াকল্পনাও কালে পুনরায় মূলকাণ্ডের সঙ্গে মিলে গেছে। আজও আমাদের মনে নটরাজ ও পার্বতী উত্তরের বুদ্ধ ও প্রজ্ঞাপারমিতার পাশে বসেছেন, গোমতেশ্বর ও অবলোকিতেশ্বর একই সিংহাসনে সমাসীন। এমনকি মধ্যযুগে ইসলামেরও বহু জিনিসকে আমরা গ্রহণ করেছি, যেমন চেষ্টা হয়েছিল যীশুর বাণীকে (Precepts of Jesus) নিতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তাই ভারতচেতনাকে শুধু বহিরঙ্গের ইতিহাসের ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিক মালমশলা-রূপে নয়, একটি জীবনবেদ, জীবনবাদ ও জীবনবোধের প্রতীক রূপেই গ্রহণ করব। ঊনবিংশ শতাব্দীর জিজ্ঞাসা সেটিকে প্রখর মুখর করে তুলেছিল। বিশেষ করে প্রতীচ্যের সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবোধের চেতনায় সিঞ্চিত হয়ে এবং তার বিশেষ রূপ

বিবেকানন্দে, রবীন্দ্রনাথে, অরবিন্দে।

উঠ জাগ মুসাফির! ভোর ভই,
অব রৈন কহাঁ জো সোবত হৈ?
জো সোবত হৈ বহ খোবত হৈ,
জো জাগত হৈ বহ পাবত হৈ।[৩]

—হে পথিক! ভোর হয়েছে, ওঠ জাগ,এখন রাত্রি কই যে শুয়ে আছ? যে ঘুমিয়ে থাকে সে হারায়, যে জাগে সে পায়। ভারতচেতনা শুধু এই বিপ্লবী মহিমার পদযাত্রাকেই মহিমান্বিত করেনি, তাকে সংযত সংহত আত্মস্থ করে, যে হীন যে নগ্ন তাকে প্রেমনিমগ্ন ত্যাগী করে, আকাশভরা সূর্যতারার আরতিতে বিশ্বভরা গানের ছন্দে স্পন্দনে সংবৃত করে নব নব বিশ্বামিত্রের নব মন্ত্র শুনিয়েছে। রামমোহন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ সেই মন্ত্রেরই উত্তরসাধক। দোষত্রুটি, অভাব-অভিযোগ-অনটন, উত্থান-পতন, অর্থনৈতিক দুর্দশা-দারিদ্রের মধ্যেও একটি বাণী শাশ্বত হয়েছে, উদ্দীপ্ত ভাস্করের মতো কিরণ বিকিরণ করেছে—তুমিই আমি—আকাশে উচ্চরন্ত সূর্যের মাঝে তাকে দেখেছি, দেখেছি দীনদরিদ্রের পর্ণকুটিরে, অভাবের তাড়নায়—এই সাম্যবাদই ভারতচেতনা—এর materialistic রূপ যেমন দরকার, অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই স্বাস্থ্য, চাই বল আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু—তেমনি চাইঃ 'হে ভারত,...ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত।' অন্য দেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মতো এতে 'ইনসেনটিভ' নেই। কারণ All life is Yoga, সমগ্র জীবনই যোগ। আলাসিঙ্গা পেরুমলের কাছে লেখা পত্রে স্বামীজী বলছেনঃ 'অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্যরূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে।'[৪]

আবার তাঁর প্রশ্নঃ 'একজন লোকও কেন না খাইয়া মরিবে?'[৫] এ প্রশ্ন যেমন সমীচীন, তেমনি এই তিনজনই জোর দিয়েছেন আত্মশক্তির জাগরণে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেনঃ 'This is the first lesson to learn : be determined not to curse anything outside, not to lay the blame upon any one outside, but be a man, stand up, lay the blame on yourself. You will find, that is always true. Get hold of yourself.'[৬]

রবীন্দ্রনাথের কথাও ডক্টর আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার উদ্ধৃত করেছেন 'কালান্তর' থেকেঃ 'দেশের যে আত্মাভিমানে...বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্ব-সভায় আমাদের আসন পাতা চাই; আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি "খবরদার! ধর্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, এমনকি ব্যক্তিগত ব্যবহারে

৩। The Epic Fast—Pyarelal, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1932, p. 146

৪। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪১

৫। তদেব

৬। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. II, Tenth Edition (1963), p. 8

কর্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না"।'[৭]

অরবিন্দ এর সমাধান করলেন, অন্যভাবে নয়, পাত্রান্তরে গোত্রান্তর ঃ

Every image made divine
In our temples is but thine.[৮]

এ তো সেই পুরনো কথা 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'[৯]—আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে, সংসারে, সমাজে, রাষ্ট্রে যা-কিছু ঘটছে সবই সেই মহাশক্তির খেলা। বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানমন্দিরও তপস্বীর যজ্ঞশালা। আজকের বৈজ্ঞানিক, তাত্ত্বিক, রসবেত্তা গুণীও অন্নময় ভূমি থেকে দেখছেন সেই প্রাণময়ী প্রকৃতিকে। এই তো বিশ্বরূপদর্শনের প্রথম ধাপ। দেশকাল আধারও নয়, আধেয়ও নয়—তারা বস্তুর অবধারণ মাত্র। কিন্তু কোন মৌলিক রূপ (primary qualities) নেই, তার গতি (motion) ব্যাপ্তি (extension) বা জড়মান (mass) সবই আপেক্ষিক (relative)। হাইজেনবার্গ-স্রডিনজার তো বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করলেন না—শুধু সম্ভাবনার তরঙ্গমালা (waves of probability)। আগামী যুগে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে ভেদই হয়তো থাকবে না।

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।

ধরিত্রীকে শুনতে হবে সেই অনিঃশেষের কাহিনী—Nothing ends, all but began, সেই আরম্ভের গান, সদা-বিবর্তনের গান, চাওয়া পাওয়া নেওয়া দেওয়ার ঊর্ধ্বে হওয়ার (to be) গান। ডুপ্ ডুপ্ করে একতারা বাজিয়ে ঐ যে বাউল বৈরাগী চলেছে গান গাইতে গাইতে ঃ

কি সাধনে পাইব তারে
যে আমার জীবনের ধন রে,
আমি সেই আশাতে ঘুরে বেড়াই।
দরগা-মসজিদ সব ঘুইরাছি,
মোল্লা-মুনসী সব জিগাইছি,
আমি কোন্‌খানে তারে বা পাই॥

তাই মনের মানুষকে মনের মাঝেই অন্বেষণ করতে হয়, শুদ্ধ সহজ প্রেমসাধনার কথা তাই বৈষ্ণব বাউল ফকির সূফীদের মর্মকথা। বিবেকানন্দে রবীন্দ্রনাথে অরবিন্দে এসে দেখলাম, তাঁরা বলছেন, কর্মে তাকে পরিণত করতে হবে, জীবনের ধর্মে, অপ্রমত্ত হয়ে। এই তো গীতারও শেষ কথা। এই তো যজ্ঞ।

৭। চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ—আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা, ১৩৮০, পৃঃ ১৭৪

৮। Sri Aurobindo, Vol. VIII, Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Pondicherry, 1972, p. 310

৯। ঈশোপনিষদ্, ১

॥ ৩ ॥

ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটা ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত অচেতন ভারতের শবদেহ নিয়ে ব্যস্ত ছিল যখন শিবাগৃধিনীর দল, তখন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল যার সুদূরপ্রসারী ফল ফলেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে—Long action time-bomb-এর মতো ঃ

(১) ব্রিটিশ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের শিক্ষাদীক্ষা-বিজ্ঞান-রাষ্ট্রবোধের চেতনা ধাক্কা দিল ভারতচেতনায়—হল খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের আবির্ভাব, তুলনামূলক বিচার—এমনকি রব উঠল ঃ India must be won for Christ.

(২) ফলে ভারতচেতনায় নতুন করে আত্মবিচার হল শুরু।

(৩) পশ্চিমের মনীষিসম্প্রদায় ভারতের ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন নিয়ে গবেষণায় ও অনুশীলনে ব্রতী হলেন।

(৪) ভারতবাসীরাও নিজেদের সংস্কৃতির পুনরায় পর্যালোচনা করতে বসলেন।

(৫) জাতীয়তার উন্মেষ হল এই সূত্রে। তা থেকে নতুন করে পেলাম 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'।[১০] অর্থাৎ ধর্ম কি ও কোথায়, একেশ্বরবাদ, না সর্বেশ্বর মহেশ্বরবাদ, আস্তিক্য না নাস্তিক্য, ভোগ না ত্যাগ ইত্যাদির সমূহ আলোচনা।

(৬) এল সমাজসংস্কারের জন্য উৎসাহ, উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস, দর্শনের তুলনামূলক বিচার।

(৭) নব নব সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা, রাষ্ট্র-অধিকারের দাবি এবং অর্থনৈতিক সুবণ্টনের প্রসার ইত্যাদি।

নব্য-ভারতের প্রথম পুরোহিত রামমোহনই এইসব চিন্তাচেতনার প্রথম উদ্গাতা। দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সাথী। মহর্ষি সংসারী হয়েও আত্মোপলব্ধির পথ ছাড়েননি—ব্রাহ্মসমাজকে বিশিষ্ট ধর্মসঙ্ঘ রূপে চিহ্নিত করার কীর্তি তাঁরই। তাঁরই পুত্র রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সমাজকল্যাণের চেষ্টায় ব্রতী হলেন, শিক্ষার অনুশীলনের জন্য বঙ্কিম এলেন এগিয়ে, বন্দেমাতরম্ মন্ত্র গীত হল তাঁর কম্বুকণ্ঠে। তারপর এলেন মহান সমন্বয়ের গতির ও স্থিতির মহাসাধক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, যিনি নির্বিকারে ঘোষণা করলেন নিজের চেতনালব্ধ উপলব্ধির সমস্ত উজ্জ্বল দিক দিয়ে ঃ সর্বরূপে সর্বভূতে সেই একই ঈশ্বর। জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল। বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি ছিলেন পরমহংসদেব। তাঁরই মহান শিষ্য বিবেকানন্দ শুধু সারা জগৎকেই বাণী শুনিয়ে এলেন না—করলেন সংগঠন (Organization), আনলেন উদ্দীপনা, উৎসাহ, কর্মপ্রচেষ্টা। শুরু হল চিন্তাজগতে বিপ্লব। সন্ন্যাসীকে সম্যক ন্যস্ত করতে হয়, বনে পালিয়ে গিয়ে নয়, নিজের মনকে নিরাসক্ত করে গেরুয়ার রঙে ছুপিয়ে ; নিজের জন্য অশন বসন ভোজন নয়, পরের

১০। ব্রহ্মসূত্রং নাম বেদান্ত দর্শনম্—শ্রীমন্মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বাদরায়ণ-বেদব্যাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, 'জিজ্ঞাসাধিকরণ' নামক প্রথম অধিকরণের প্রথম সূত্র

জন্য, অন্যের জন্য—এই তো চিন্তানায়ক বিবেকানন্দের অপূর্ব ভাবসিদ্ধি। কি জানি কেন, মননের কোন্ রাজ্যে, কোন্ ইঙ্গিতে, কোন্ প্রেরণায় প্রায় সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথও গেয়ে উঠলেন ঃ

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান।
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান ॥

শ্রীঅরবিন্দও চললেন এগিয়ে। সম্মান-অপমানের কথাই শুধু নয়—তিনি বসলেন ধ্যানে। তিনি চাইলেন মননকে ছাড়িয়ে চলে যেতে এক ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্বতর, ঊর্ধ্বতম রাজ্যে ঊর্ধ্বতর মানসের (higher mind) বিভাসিত চেতনার (illumined mind) স্তর ছাড়িয়ে অধিমানসের (overmind) রাজ্য পেরিয়ে অতিমানসের (supermind) জগতে। এই ঊর্ধ্বতমের আলো পরিস্ফুট হবে নিম্নের প্রতিটি চেতনায় রোমে রোমে। পরশমণির স্পর্শে সবকিছু হবে স্বর্ণময় (golden light)। এই আশাতেই তাঁর সাবিত্রীতে পড়ছি Let us salute the Dawn—আলো, আলো। আলোকের এই ঝরনাধারাতেই স্নান করবে সকলে।[১১]

এরই সূত্রপাত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্মেলনে। নিবেদিতার ভাষায় ঃ '...infinite inclusiveness.'[১২] রোলাঁ বললেন ঃ 'ত্রিশ কোটি নরনারীর দুহাজার বছরের আধ্যাত্মিক জীবনের একটা চূড়ান্ত সার্থকতা।'[১৩]

॥ ৪ ॥

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

এ গান গেয়েছিলেন এমন একটি নিবেদিত মানুষ যিনি ইতিহাসকে উলটে দিতে চেয়েছিলেন—যে ইতিহাস রাজনৈতিক ইতিহাসের আবেদন-নিবেদন ছাপিয়ে অন্তর্নিহিত সত্তার দৈবী বিকাশের কথা ও কাহিনী, যার রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে। সর্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম, সেখানেই বিস্তার। যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ। এই তো স্বামীজীর মূল কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে এসেছিল একটা নতুন স্বীকৃতি, একটা নতুন প্রেরণা, একটা নতুন দিগ্‌দর্শন। রামমোহনের নেতৃত্বে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা,

---

১১। Sri Aurobindo, Vol. X, 1971-এর Commentary on 'The Divine Dawn' দ্রষ্টব্য।

১২। The Master as I saw him—Sister Nivedita, Udbodhan Office, Calcutta, Twelfth Edition (1977), p. 199

১৩। The Life of Ramakrishna—Romain Rolland, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition (1970), p. 13

দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে ও কেশব সেনের বাগ্মিতায় যার প্রতিপত্তি, সেই সমাজ তখন বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যৌবনশতদলে টলমল করছে। কিন্তু ইতিহাস বলে সেটা উপরতলাতেই প্রাধান্য পেল—সেই সত্য ভারতচেতনার মৌলিক আভাস নেমে এল না ভূমার মাটিতে, প্রলেতারিয়েতের দুয়ারে, দরিদ্রের পর্ণকুটিরে। সাধারণ মানুষ বুঝতে চায় শুধু বুদ্ধির, বিদ্যার, তর্কের, বিচারবিশ্লেষণের পরিমার্জিত ছায়ায় নয়; পরন্তু প্রেমে, ভালবাসায়, অনুভবে, বিস্তারে, দীনের কুটিরে, হীনের দুয়ারে। শুধু নির্গুণ নিরাকার হিসাবে নয়, সগুণ সাকারেও। ভারতচেতনার ঐতিহ্য তা-ই। দক্ষিণেশ্বরে দক্ষিণপাণি দেবতার আবির্ভাব শুধু ভক্তের কাতরকণ্ঠের আহ্বানে নয়, ইতিহাসের দুর্মর দুর্জয় ইঙ্গিতেও। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীকূলে দেবী ভবতারিণী নামবেন 'মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাম্'[১৪] —কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং রূপে—কিন্তু তাঁকে সম্যকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাই একজন গদাধর চাটুজ্যের আবির্ভাব, যিনি স্বীকৃতি পাবেন দেশে দেশান্তরে। 'This is the story of a phenomenon.'[১৫]—বললেন ইশারউড, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে।

হেস্টি সাহেব থেকে শুরু করে ম্যাক্সমূলার পর্যন্ত এই 'সত্যিকার মহাত্মা'র কথা বুঝতে আরম্ভ করলেন, শুধু এর আধ্যাত্মিক প্রতিবেদনে নয়, সাংস্কৃতিক মূল্যে নয়, সামাজিক প্রতিক্রিয়ায় নয়, সর্বস্তরের উন্নয়নে। সবই যে মায়ের মন্দির—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, ভবানীর মন্দির। বঙ্কিম আনলেন মন্ত্র, বিবেকানন্দ দিলেন উদ্দীপনা ও সংগঠন, রবীন্দ্রনাথ আনলেন রূপ রস ও ঐশ্বর্যের বর্ণসমারোহ, ভাষার অনুপম ঝঙ্কার, শ্রীঅরবিন্দ বসলেন ধ্যানে—'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্...ভর্গো দেবস্য'।[১৬] উর্ধ্বতন লোকের আলো যাতে গ্রহীতার আধারে নীচে নামতে পারে, উত্তরণ-অবতরণের মাঝে স্থিতিবান ক্রিয়াশীল হতে পারে। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রই হচ্ছে 'অগ্নিমীলে'[১৭]—সেই আগুনকে জ্বালিয়ে দিতে হবে প্রাণসমিধে—তবেই আলোক বন্দনা মন্ত্রজপে মৃত্তিকার মর্তপটে চিরসুন্দরের প্রাণমূর্তি প্রকাশ পাবে ঋষির অভীপ্সায়, সাধকের তপস্যায়, সেবার দীপ্তিতে। অশ্বপতি অর্থাৎ জীবনের অধীশ্বর তখনই নামাতে পারবেন আলোকের ঐ ঝরনাধারা। সু মানেই সৃষ্টি—সবিতাই জগতের প্রসবিতা, সাবিত্রী তারই শক্তি—

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
... ...

১৪। স্তবকুসুমাঞ্জলি—সম্পাদনা : স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, নবম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ২৮৭

১৫। Ramakrishna and his Disciples—Christopher Isherwood, Advaita Ashrama, Calcutta, 1965, p. 1

১৬। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৬।৩।৬

১৭। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম মন্ত্র দ্রষ্টব্য

শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি, যতবার ভুলি কেন নাম,
তবু তাঁরে করেছি প্রণাম।

এই পূর্ণ যোগের কথাই তো সাবিত্রীর ব্রতকথা। রুরু, নচিকেতা ও সাবিত্রী তিনজনেই যমকে (অর্থাৎ শেষ নিয়তি বা নিয়মকে) আবাহন করেছিলেন মানসিক দ্বৈরথে। প্রত্যেক মানুষ সেই পরিপূর্ণতার জন্য জেগে থাকবে—A divine life in a divine body, আছো জাগি পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন। এ তো স্বামীজীরও কথা। যা বড় তা-ই ধর্ম, যা বৃহৎ তা-ই আদর্শ, যা মহৎ তা-ই স্বপ্ন। সেইজন্য চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। বক্তৃতায় নয়, কূটনীতির কৌশলে নয়, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে নয়, অর্থনীতির প্রাচুর্যে নয়—এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে চাই নিষ্ঠা, প্রেম, ত্যাগ, সারাজীবনের সমগ্রতার সাধনা। রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায় ঃ 'পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণাকাতর'—অরবিন্দকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। একথা তাঁর নিজেরই। ১৮।৮।১৯৩৫ তারিখের এক চিঠিতে একথা পাই। শ্রীঅরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার পরে মুক্তি পেয়ে (যেখানে জেলে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পান ও তাঁর বাণী তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, একথা বহুবার পরবর্তী জীবনে স্বীকার করেছিলেন) পণ্ডিচেরী যাবার পূর্বে বাংলায় 'ধর্ম' নামে এক পত্রিকার সম্পাদনার ভার নেন। তাতে ২৬ পৌষ, ১৩১৬ সাল 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত' শিরোনামায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে তিনি লেখেন ঃ 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি ও তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত পুস্তক রচিত হইয়াছে তৎপাঠে জানা যায় যে তিনি দেশে যে নূতন ভাব গঠিত হইয়াছে, যে ভাবরাশি সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে, যে ভাবতরঙ্গে মত্ত হইয়া কত যুবক সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আত্মাহুতি প্রদান করিতেছে, সে ভাবের কথা তিনি কিছুই বলেন নাই, সর্বভূতান্তর্যামী ভগবান তাহা দেখেন নাই; একথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? যাঁহার পাদস্পর্শে পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার স্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যাঁহার আবির্ভাবে বহুযুগ সঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত, যে শক্তির সামান্য মাত্র উন্মেষে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে; যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম প্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরূপ; তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই একথা আমরা বিশ্বাস করি না—আমাদের বিশ্বাস যাহা তিনি মুখে বলেন নাই, তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতকে, ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলিয়া কিছু দাবি করেন নাই। লোকগুরু তাঁহাকে যেভাবে গঠিত করিয়াছিলেন তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা। তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিচার ছিল না—তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণ বীরসাধক ভাবে গঠন করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন, "তুই যে বীর রে"! তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে শক্তি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্যকরজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাবে সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বেপরোয়া হইয়া দেশের কার্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবৎ-বাণী স্মরণপথে রাখিতে হইবে "তুই যে বীর রে"!'[১৮]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'ব্রহ্মই কালী, কালীই ব্রহ্ম' শ্রীঅরবিন্দযোগের সূত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। তারপর বাঙালী হচ্ছে মহাপ্রকৃতির সাধক—মহামায়া, মহামেধা, মহাস্মৃতির উপাসক—সা জগন্মূর্তি—'ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ'।[১৯] সেই মহাপ্রকৃতিই সত্যভূতা সনাতনী, প্রিয়া, জায়া, কন্যা, মাতা, সংবিৎ। বাংলাদেশ মায়ের পীঠস্থান। শুধু অক্ষরব্রহ্ম তার লক্ষ্য নয়, সে হ্লাদিনী শক্তিতে বিরাজিত সত্তাকেই চিনতে চায়। শক্তির সর্বাঙ্গীণ সাধনাই বীর্যের সাধনা, রসের সাধনা। বাঙালী মায়ের সন্তান। তাই শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত গুপ্ত বললেনঃ 'রামমোহনে আধুনিক বাংলার প্রথমে জাগিল অন্তরাত্মা, বঙ্কিমচন্দ্রে ফুটিয়াছে তাহার মন আর বিবেকানন্দে ফুটিয়াছে তাহার প্রাণ।'[২০] আর এই সব কটি থেকেই পুষ্প চয়ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর ভাষায় 'বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা'[২১] যিনি মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করতে পারেন। বলতে পারা যায় যে, রামকৃষ্ণের মধ্যে সর্বধর্মের যেমন সমন্বয় দেখি, স্বামীজীর মধ্যে তেমনি সর্বকর্মের সমন্বয় দেখি। নববেদান্তের প্রয়োগ—মায়ামোহময় সংসারেও সেই অনিত্যদের সুখ ও আরামের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। তাই ভারতের সনাতন অন্তরের নবজাগ্রত বীর বিগ্রহ হলেন বিবেকানন্দ। ধর্মসাধনায় শুধু নয়, কর্মসাধনায় এই যুগলপ্রতিভা (শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ) এক অভিনব সুর বাঙালীর চেতনায় প্রবুদ্ধ করে দিয়েছেন। 'তাঁহার পূর্বে আরও মনীষী আসিয়াছিলেন—ভারতের নবজাগরণের বার্তা লইয়া, আরও কর্মী আসিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া, ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ হইতেছেন ঋষি, যিনি দেখিলেন, সৃষ্টি করিলেন সেই মন্ত্র যাহার বলে ভারতের দেবত্ব জাগ্রতবিগ্রহ ধরিয়া প্রাণবন্ত হইয়া আবির্ভূত হইল। ঋষি তিনি, যিনি একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, দৃষ্টির তেজেই যাঁহার সৃজন-প্রতিভা।'[২২] বিবেকানন্দ দুটি কথার উপর জোর দিয়েছিলেন—অভীঃ, অহং ব্রহ্ম—ভয় নাই তোমার ভয় নাই—'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'। ভারতচেতনারই বাঙ্মূর্তি এই কথাগুলি। বিবেকানন্দ বলতে চাইলেনঃ তুমি যে ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহৎ, মহৎ, তুমি যে শিব, ময়োস্কর ময়োভব কল্যাণকৃৎ।[২৩]

১৮। Sri Aurobindo, Vol. IV, 1972, p. 239   ১৯। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ১১।৩৮

২০। বাঙ্গলার প্রাণ—নলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ১৯৬৩, পৃঃ ২৩

২১। তদেব, পৃঃ ৪৯   ২২। তদেব, পৃঃ ৬৫-৬

২৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৪৭৭

সম্পূর্ণ প্রণামটি এইরূপঃ

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,

নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

তোমার সাধনা, তোমার সত্য জীবত্বে জাগ্রত হওয়া। জাগো, জাগাও। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।[২৪] শুধু নিজের দিকে চেয়ে নয়, পরের দিকে চেয়ে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'ভবানী মন্দির' পত্রিকায় (তখন বেনামী এবং for private circulation only) লিখলেন ঃ 'চেয়ে দেখ সর্বভূতে শক্তিরূপেই তিনি অবস্থিতা—আজ যদি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর—দেখতে পাবে দিকে দিকে শক্তির জয়স্তম্ভ,—যুদ্ধের শক্তি, অর্থের শক্তি, বিজ্ঞানের শক্তি, এরই মধ্যে আছে বিস্ফোরণের দাহিকা, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে এই বিশ্ব।... বলা হয় যে, আজকে বিজ্ঞানকেই শক্তির বাহন করে নিতে হবে।...সেকথা সত্য কিন্তু বিজ্ঞানের শক্তি রাক্ষসের হাতে ভীমসেনের গদার মতো। দুর্বলতার জন্য সে তা তুলতে পারে না, তার চাপে নিজেই মারা পড়ে।'[২৫] শ্রীঅরবিন্দের কথা ঃ 'Bhakti is the leaping flame, Shakti is the fuel.'[২৬] ভক্তি হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী অগ্নিশিখা, শক্তি হচ্ছে তার ইন্ধন। তিনি আরও বলছেন ঃ এই বৃদ্ধ ক্লান্ত পরপদলেহী ভারতবর্ষকে নবযৌবন দান করতে হবে। ভারতবর্ষ হবে শক্তিমান, বীর্যবান, নির্লোভ, তপস্বী, জ্ঞানী, মহাসমুদ্রের মতো শান্ত, ধীর,[২৭] কখনও বা শক্তির লীলাতে তার একহাতে থাকবে শঙ্কাহরণ মন্ত্র আর এক দিকে খড়্গ, এক দিকে বরাভয় আর এক দিকে অসিখর্পর। শ্রীঅরবিন্দ বললেন ঃ 'ভারতের নবজন্ম চাই, নবজাগৃতি, সারা বিশ্বের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন।'[২৮] তার পরে এল সেই পরমা স্বীকৃতি ঃ 'What was the message that radiated from the personality of Bhagawan Ramakrishna Paramhansa ? What was it that formed the kernel of the eloquence with which the lion-like heart of Vivekananda sought to shake the world ?... It was to initiate this great work, the greatest and most wonderful work ever given to a race, that Bhagawan Ramakrishna came and Vivekananda preached.'[২৯]

এই বিরাট বিচিত্র কর্মযজ্ঞের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, এরই জন্য প্রচারে বেরিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ বা শ্রীঅরবিন্দ (এবং কতকটা রবীন্দ্রনাথও) স্বাধীনতা বলতে শুধু রাষ্ট্রিক আন্দোলনকেই, বা অর্থনৈতিক মুক্তিই বুঝতেন না। শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন ঃ 'It will give the same freedom to man's seeking for political and social perfection and to all his other powers and aspirations. Only it will be vigilant to illuminate them so that they may grow into the light and law of the spirit, not by suppression and restriction, but by a self-searching, self-controlled expansion and a many-sided finding of their greatest, highest and deepest

---

২৪। মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।২।৪

২৫। The Life of Sri Aurobindo—A. B. Purani, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1964, pp. 75-6 ২৬। Sri Aurobindo, Vol. I, 1972, p. 64

২৭। ibid., pp. 64-5 ২৮। ibid., p. 66 ২৯। ibid., pp. 65-6

potentialities. For all these are potentialities of the spirit.'[৩০] স্বাধীনতার এই সংজ্ঞা তাঁকে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের সহযোগী করে তোলে। এই স্বাধীনতা 'স্ব'-এর অধীনতা, শুধু রাষ্ট্রিক ক্ষমতা লাভ নয়, পার্টি বা দলগত অভ্যুত্থান নয়, সমগ্রভাবে জনগণের জাগরণ। সাধনার বিষয়ে তিনি বিবেকানন্দের কাছে যে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন সেকথাও আমাদের তিনি বলে গেছেন। আলিপুর জেলে ধ্যানমগ্ন শ্রীঅরবিন্দের কাছে বিদেহী স্বামী বিবেকানন্দের আগমন, সান্নিধ্য ও সাহচর্য—একথা অনেকের কাছে অলীক মনে হলেও শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা তুলে দিচ্ছিঃ 'Vivekananda came and gave me the knowledge of intuitive mentality. I had not the least idea about it at that time. ...The contact lasted for about three weeks and then he withdrew.'[৩১] এ-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে তাঁর উক্তি হচ্ছেঃ 'For myself it was Ramakrishna who personally came and first turned me to this Yoga. Vivekananda in the Alipore Jail gave me the foundations of that knowledge which is the basis of our Sadhana.'[৩২]

মন্দির গড়তে চেয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ; তবে তা শুধু বাইরে নয়, শুধু সাহিত্যের মন্ত্রমুগ্ধ স্তরে নয়, অন্তরাত্মার পরম প্রকাশ রূপে ও পূর্ণ যোগের মাধ্যমে। সৃষ্টির পরিণাম এই চৈতন্যের মুক্তির অভিব্যক্তিতেঃ মন মে হরি কা নাম, হাথমে দুনিয়া কা কাম, তব মিলে পরমাত্মা রাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই ঘোর ঘন নিবিড় তন্দ্রারাশি যেন ছুটে যাচ্ছে, কি রাষ্ট্রীয় বিবর্তনে, কি সামাজিক পরিবর্তনে পরিবর্ধনে, কি পরিশীলিত মনের বিচারে বিশ্লেষণে—বিশেষ করে রাষ্ট্রিক পরিণতির ফলে এসেছে প্রতীচ্যের শিক্ষাদিক্ষা জ্ঞানবিজ্ঞান জীবনচেতনার ভাব, কর্ম ও আদর্শের ছায়া। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় চিন্তাধারায়, সামাজিক বিন্যাসে, রাষ্ট্রনৈতিক গণ্ডগোলে, অর্থনৈতিক দুরবস্থায়, মুষ্টিমেয় ফিউড্যাল সমাজের বৃহৎ বটচ্ছায়ায় সম্বর্ধিত নববাবুদের বিলাসে, জমিদার ব্যবসাদার ইংরেজদের মুষ্টিমেয় দালালদের যুগে জীবনের গণচেতনা ভাষ্য তো পায়ইনি, ভাষাও হারিয়েছিল। জাতীয় জীবনের যখন প্রায় নাভিশ্বাস, তখনই তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ও পশ্চিমী শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে পরিচিতির ফলে এক নতুন রসসঞ্জীবনী বন্যা বাংলাদেশকে প্লাবিত করেছিল। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, এমন একটা সমাজচেতনার সূত্রপাত হয়েছিলঃ '...a society electric with thought and loaded to the brim with passion.'[৩৩]

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মপুণ্যলগ্ন, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এলেন শ্রীঅরবিন্দ। বাংলার মননের যুগে তখন এক অভাবনীয় ঋতুপরিবর্তনের যুগ। পশ্চিমের দুর্বার স্রোত, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, প্রয়োগবিদ্যা তাদের পসরা নিয়ে ধাক্কা দিয়ে শুধু রেল টেলিগ্রাফ ডাকঘরকেই নিয়ে আসছে না, আনছে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত উপকরণের বহু আয়োজন প্রয়োজন। শিক্ষার

৩০। ibid., Vol. XV, 1971, p. 170 ৩১। Life of Sri Aurobindo, p. 213
৩২। Sri Aurobindo, Vol. XXVII, 1972, p. 435 ৩৩। ibid., Vol. III, 1972, p. 78

নতুন রীতিনীতি এসে গেছে। 'ইয়ং বেঙ্গল' তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ অরবিন্দের বাল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে নতুন মূল্যমান নিয়ে এসেছে। এর উপরতলার লোক সাহেবঘেঁষা, পুত্রদের লণ্ডন অক্সফোর্ড কেমব্রিজে পাঠাবার তালে আছেন—যেমন শ্রীঅরবিন্দ ভ্রাতৃগণসহ গিয়েছিলেন খাস 'হোমে' শিক্ষালাভের জন্য।

আবার একই সময়ে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পর্ব সামাজিক জীবনে আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে দিয়েছে। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার। ওদিকে আন্তর জীবনে আর এক বিপ্লবের ভিত্তিস্থাপন হচ্ছে দেখতে পাই। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন এমন একজন পুণ্যবতী ধর্মশীলা মহিলা (রানী রাসমণি) যাঁর প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে সাধারণ ব্রাহ্মণ পূজক তন্ত্রধারক মেলাই ভার। কিন্তু যা ঘটল তা আরও বৈপ্লবিক। ব্রাহ্মণ্যাভিমানী টুলো পণ্ডিতেরা কেউ মায়ের পূজায় এলেন না বটে, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হাত ধরে এলেন এমন একজন যিনি ভারতবর্ষের নবযুগের পরিত্রাতা রূপে চিহ্নিত হয়ে রইলেন ইতিহাসে, যাঁর সংস্পর্শে এসে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হল। মহান গুরুর সঙ্গে এসে যুক্ত হলেন তাঁরই উপযুক্ত শিষ্য। শুরু হল 'Ramakrishna-Vivekananda Movement'। এই ঘটনাটি 'a positive fact in Indian history', রোমাঁ রোলাঁর কথা ধার করে বলা যায়—এই স্রোত যেন একটি বেগবতী নদীর ধারা—'*Chemin qui marche* (road which marches) in the words of our Pascal.'[৩৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে স্বামীজীর সমকালীন যুগে এবং স্বামীজীর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি কবির কি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেকথা অনুমান করেই নিতে হয়। এ-বিষয়ে আমি এর পূর্বে অন্যত্র বহুস্থানে যা আলোচনা করেছি,[৩৫] সেইগুলিরই পুনরুল্লেখ করে বলতে হয় যে, কাছাকাছি বাড়ি বলে দত্তবাড়ির ছেলেমেয়েরা ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং স্বামীজীর সঙ্গে কবিগুরুর দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজের গানের আসরে এবং অন্যত্র। আচার্য ব্রজেন শীল মহাশয়ের লেখায় পড়ি যে, স্বামীজীর দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত ও পরমহংসদেবের শিষ্যত্বগ্রহণ ব্রাহ্মসমাজের (শুধু সাধারণ বা নববিধান নয়) অনেকেই খুব ভাল চোখে দেখেননি। নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী মহর্ষি-সন্দর্শনে গিয়েছিলেন, মহর্ষি তাঁর আমেরিকায় সাফল্যে একটি পত্রও দিয়েছিলেন, সেকথাও পড়ি। এর পূর্বেও স্বামীজী ভগবচ্চিন্তার অনুধ্যানে অধীর হয়ে মহর্ষির কাছে গিয়েছিলেন, একথাও সত্য। স্বয়ং পরমহংসদেবও মথুরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষি-সাক্ষাতে যান, এও তো জানা কথা। রবীন্দ্রনাথের উপর এর কিছু প্রভাব পড়েছিল কিনা সেটা বিচার্য। একথাও স্পষ্ট স্বীকার করতে কোন রকম লজ্জা নেই যে, কবিগুরুর যৌবনের লেখায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে বেশ কিছুটা তুষ্ণীম্ভাব

৩৪। The Life of Ramakrishna, p. 2

৩৫। স্বামীজী প্রসঙ্গে—সম্পাদনা ঃ পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ১৩৭৮, পৃঃ ৪১-৬০

ছিল। কিন্তু পরিণত বয়সে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি নিজের অসীম শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। তরুণ রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তরুণতর নরেন্দ্রনাথ পরিচিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহের আসরে রবীন্দ্ররচিত গান গীত হয়েছিল বিবেকানন্দের কণ্ঠে। উপাসনাসভায় সঙ্গীতবাহিনী lead করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং ঐ choir-এর একজন সুযোগ্য অংশীদার ছিলেন বিবেকানন্দ এইরূপ জনশ্রুতি। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন যে, প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত তিনি শোনেন কাশীতে বিবেকানন্দের কণ্ঠে ঃ

সখী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল
নিশিভোরে যোগী ভিখারী।

আজ আমাদের কল্পনা করতেও মন রোমাঞ্চিত হয় যে রবীন্দ্রনাথের গান গাইছেন বিবেকানন্দ আর শুনছেন পরমহংসদেব অর্ধসমাহিত হয়ে 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে এই যুগে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে বা লেখায় স্বামীজীর সম্বন্ধে কেন উল্লেখ নেই। অবশ্য শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কাছে শুনেছি যে নিবেদিতার এক চায়ের আসরে তিনি ও বিবেকানন্দ মিলিত হয়েছিলেন।

॥ ৫ ॥

রবীন্দ্রনাথের উপরে তরুণ বিবেকানন্দের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে এ-বিষয়ে আলোচনার পূর্বে একথাটি স্মরণ রাখা উচিত যে, কবি-জীবনে ১৮৯০-১৯০২ একটি বিশিষ্ট যুগ—তাঁর মন ঝুঁকেছে উপনিষদের বাণীর দিকে, তপোবনের আদর্শের দিকে—গৃহী সংযমী গুরুর দিকে—প্রকৃত ব্রাহ্মণকে তিনি খুঁজছেন, আবার স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা তাঁর চেতনাকে স্পর্শ করছে। বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তিতে তাঁর বিশ্বাস নেই।

মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারাবেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজা-খেলা

কিংবা

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ।

বাইরের সন্ন্যাসকে তিনি কোনদিন গ্রহণ করেননি যতদিন না অন্তরের সন্ন্যাস কবি-বাউলকে গেরুয়ার রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে। এই সময়ে কবির ধারণা যে, আমরা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পেতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভব। তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়ে রামমোহন রায়, রাণাডে ও বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ করেছেন। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর মত ঃ

'অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।'[৩৬]

দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয় ॥

এই বোধই তাঁকে নিয়ে যায়—

না থাকে তার মান অপমান
লজ্জা শরম ভয়,
একলা তুমি সমস্ত তার
বিশ্বভুবনময়—

সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ (an entire-seeing of the Divine is the condition of an entire conscious self-surrender)—এ হচ্ছে সব সাধকেরই কথা—এরই তো প্রতীক আলোর অভ্যুদয় (The Symbol Dawn)। সাবিত্রীর রূপকে অপূর্বতম কল্পনার মধ্যে ফুটে উঠল সমস্ত যোগের মূল ছন্দ। রাত্রির ঘন অন্ধকার পেরিয়ে,—সূচীভেদ্য অন্ধকার ছাড়িয়ে, নিশ্ছিদ্র নিঃসীম কালের মাঝে বসে আছেন সাধক শবাসনে। অর্থাৎ সবকিছুই মৃত—সবকিছুকেই উজ্জীবিত করতে হবে। তান্ত্রিকের উদ্দেশ্যই তাই—মাকে নামাবেন তিনি ভূমা থেকে ভূমিতে—সবকিছু আনন্দময়ী হবে। তিনি যে ভবতারিণী। সে ভব শুধু সাধারণ পৃথিবীর দুঃখ অভাব অভিযোগ নয়, অন্তরের গভীর কালো, যেখানে transcendent-ও নেই, immanent-ও নেই এবং সেই অতল কালোর মাঝখানেই আলোর ক্ষীণরেখা ফুটে উঠবে। এই কল্পনাই শ্রীরামকৃষ্ণের, স্বামী বিবেকানন্দের, শ্রীঅরবিন্দের। রবীন্দ্রনাথের—আলো, আরও আলো; শ্রীঅরবিন্দের উপমা হচ্ছে—'In her unlit temple of eternity',[৩৭] অর্থাৎ আলো জ্বলেনি তা নয়, আমি জ্বালাতে পারিনি। তাই বেদের যুগ থেকে ঋষিরা উপমা দিচ্ছেন ঊষার—যে ঊষা শাশ্বতী, যে ঊষা প্রাক্তনী—প্রথমে একটু আলোর রেখা—'A long lone line of hesitating hue'।[৩৮] এই তো উন্মেষের, জাগরণের শুরু—শুচিশুভ্র দীপ্তরুচি উচ্ছ্রিত তপোবীর্য—'ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং'[৩৯] এসে গেলেন, যিনি মহাদ্যুতি। আলোয় আলোয় ভরে গেল আকাশ। যা ঘটে বাইরে, তারই প্রতিফলন হয় ভিতরে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বললেন ঃ এই মনোময় রাজ্যের মানুষকেই হতে হবে বুদ্ধ, প্রবুদ্ধ,

৩৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ১৯৭৩, পৃঃ ২৬৬
৩৭। Sri Aurobindo, Vol. XXVIII, 1970, p. 1
৩৮। ibid., p. 2 ৩৯। স্তবকুসুমাঞ্জলি, পৃঃ ২৮৬

সম্বুদ্ধ—'And in her bosom nursed a greater dawn.'[৪০] রাত্রির অন্ধকারের পর সূর্যোদয় অবশ্যম্ভাবী, এ বিবর্তন হবেই; তবে একে ত্বরান্বিত করাই সাধনা।

॥ ৬ ॥

বিবেকানন্দের, রবীন্দ্রনাথের বা অরবিন্দের আত্মিক সম্পর্ক কোন্ পর্যায়ে পড়ে তার আলোচনা করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ নীরস জ্ঞানমার্গ বা ত্যাগমার্গের পথিক নন—তিনি বিচিত্রের দূত, রসিকরঞ্জন-সভার সভাকবি, সগুণ ব্রহ্মের (তথাকথিত পৌত্তলিকতার নয় যা ভীষণং ভীষণানাং ছিল তাঁর পিতা মহর্ষির কাছে) উপাসক। রূপ থেকে রূপান্তরে তাঁর গতি। জল পড়ে পাতা নড়ে, বিস্ময়ে তাঁর প্রাণ জাগে, গান সাড়া দেয়—আকাশে দ্যুলোকে ভূলোকে তিনি দেখেন প্রাণকে, আনন্দকে—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'।[৪১] সমালোচক বলবেন, এ তো এক ধরনের প্যাগান অনুভব, প্যানথিজমে তাঁকে ঘিরে আছে। তিনি প্রাণদেবতার উপাসক—'প্রাণায় স্বাহা'[৪২] তাঁর মন্ত্র। আবার তিনি লিখছেন: 'ভারতবর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে।...দারিদ্রের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে অবিশ্বাসে অনাচারে অনুকরণে এখনও ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই।...সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ...আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ-সহিষ্ণু, উপবাসব্রতধারী—তাহার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত,...যাহা উদ্বেলিত পশ্চিমসমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনও ঝড় আসে, দশ দিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব, ঐ অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে...'[৪৩]। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারতের কাছেই তিনি মন্ত্র চেয়েছিলেন—পিতামহ আমাকে মন্ত্র দাও। সে মন্ত্র ভূমার সঙ্গে, বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হবার ধ্যান: 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' তাই মনে হয় সমসাময়িক কালের অবিচলিতবোধি, মহৎ শক্তিধর সন্ন্যাসীর সঙ্গে সমকালের শ্রেষ্ঠ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ভাববিরোধ হতেই পারে না। ভারতচেতনার গভীরতম মর্মবাণী একটি অখণ্ড অমল ঐক্যের সূত্রে বিধৃত আছে, যার পরিণতি মহামানবত্বের কল্পনায় এবং 'জীবশিব'-তত্ত্বের উদার অভ্রান্ত আত্মোপলব্ধিতে (Humanity of Divinity, Divinity of Humanity)। এ-প্রসঙ্গে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে (Oxford-এ) Hibbert Lectures দিতে গিয়ে কবির একটি 'কনফেশন' প্রণিধানযোগ্য।

৪০। Sri Aurobindo, Vol. XXIX, 1970, p. 724 ৪১। মুণ্ডকোপনিষদ্, ২।২।৭

৪২। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৪।৪।১৮ শ্লোক এবং এর টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৬৮-৬৯

একে বলা যেতে পারে তাঁর শেষ Testament of Faith : 'The solitary enjoyment of the infinite in meditation no longer satisfied me, and the texts which I used for my silent worship lost their inspiration without my knowing it. I am sure I vaguely felt that my need was spiritual self-realization in the life of Man through some disinterested service.'[৪৪]

এই কথাগুলি কি স্মরণ করিয়ে দেয় না আরও তীব্র সোচ্চার ভাবে লেখা আর এক মনীষীর সুস্পষ্ট জীবনবেদ ও জীবনবাদকে, যার ভাস্বর প্রতিমূর্তি পাই তাঁর অক্ষর অমর জীবনবোধে ? —

ওরে মূর্খদল !
জীবন্ত দেবতা ঠেলি',
অবহেলা করি'
অনন্ত প্রকাশ তাঁর এ ভুবনময়,
... ...
কর তাঁর উপাসনা, একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা... ।

১৩৩৫ সনের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এক অনুক্রমণিকা লিখে দেন শ্রদ্ধেয় অমিয় চক্রবর্তী ও ডক্টর সরসীলাল সরকারের পত্রালাপের মুখবন্ধ হিসাবে। তিনি বলেন ঃ আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণীর প্রচার করেছিলেন। সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন ঃ তোমাদের সকলের মধ্যে আছে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও রোলাঁর কথোপকথনের মধ্যেও দেখা যায় যে রোলাঁর মতে স্বামী বিবেকানন্দের মত ছিল এইরূপ ঃ 'All those who knew him bear witness to his absolute respect for the intellectual freedom of those near him.... The beautiful text which follows breathes his ideal of harmonious freedom : Nisthā (devotion to one ideal) is the beginning of realization. Take the honey out of all flowers ; sit and be friendly with all ; pay reverence to all ; say to all : "Yes, brother, yes brother" ; but keep firm in your own way. A higher stage is actually to take the position of the other.'[৪৫] কবি হয়তো বুঝেছিলেন যে বিবেকানন্দের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে contradictions যথেষ্ট। তা না হলে পরম বৈদান্তিক, কালীভক্তের পূজক ও সেবক, সোঽহং সন্ন্যাসিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা হয়েও পরম ভক্তিভরে কি করে দুর্গাপূজার উৎসব করেন ? ঐতিহাসিক চেতনা, বৈজ্ঞানিক

৪৪। The Religion of Man—Rabindranath Tagore, George Allen & Unwin Ltd., London, 1953, pp. 165-66

৪৫। The Life of Vivekananda and the Universal Gospel—Romain Rolland, Advaita Ashrama, Calcutta, 1970, p. 311

দৃষ্টি, প্রলেতারিয়েত শূদ্র বিপ্লবের যিনি ইঙ্গিত দেন, তিনিই অনেক বিষয়ে প্রাচীন সংস্কারকে বর্জন করলেন না কেন? এর প্রাসঙ্গিক উত্তর কিছুটা আছে দিলীপকুমার রায়ের স্মৃতিচারণে—রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় যেমন তিনি লিখছেনঃ 'কিন্তু আশ্চর্য এই মসিয়ে রোলাঁ যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মহত্ত্ব আপনি এত দূরে থেকেও এভাবে এত সহজে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন যে ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভ্যুদয় যে একটা কত বড় ঐতিহাসিক ঘটনা সেটা আজ পর্যন্ত আমরাই, অর্থাৎ ভারতীয়েরাই পুরোপুরি উপলব্ধি করিনি।...

'তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে দিলীপ, টলস্টয় তাঁর শেষ জীবনে বিবেকানন্দের লেখায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পরম বন্ধু পল বিরুকফ ও আরও অনেক সাহিত্যিক এখনও বিবেকানন্দের নাম জপ করেন। বিশেষ করে রুশদেশে এমন আরও অনেক লোক আছেন।'[৪৬] একটি প্রমাণ দেখুন মারি লুইস বার্কের লেখা গ্রন্থেঃ 'আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে এমন একটি ব্যক্তিত্বের দেখা পাব যাঁকে দেখলেই মনে হবে ইনি সেই আনন্দোজ্জ্বল উদ্ভাসিত পুরুষ। যখন গুরুগম্ভীর সংস্কৃত স্তোত্র আরম্ভ হল—গমকে গমকে, নাদে নাদে—*"it rang so true"*। যখন তিনি বললেনঃ "Blessed are the pure in heart for they shall see God." আজ যেন মনে হল নতুন সুরে নতুন শক্তিতে আমার সর্বেন্দ্রিয় জাগ্রত হয়ে উঠল—আর অর্ধশতাব্দী পরেও যেন সেই রেশ আমার কানে বাজছে।'[৪৭]

মানুষে মানুষে মিলিয়েই মহাদেবতা। তাঁকেই জীব বলি, শিব বলি, The Universal, The Eternal বলি, Cosmic Law বলি, চৈতন্য-পুরুষ বলি, মনের মানুষ বলি। তাঁরা আস্তিক্যবাদী কি নাস্তিক্যবাদী, তাঁরা যুগযন্ত্রণায় বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী, এসব কথাও এহ বাহ্য, আমরা শুধু জানি দুঃখকষ্টের অতীত এক স্তরে আত্মোপলব্ধির মহিমায় সমাসীন যাঁরা, ত্যাগব্রতে দীক্ষিত যাঁরা, তাঁরাই নমস্য। কর্মী, জ্ঞানী, ধ্যানীর আসন সেইখানে—Everything can be done if God-touch is there. এই God কিন্তু conventional God নন, ভারতচেতনার ত্রিমূর্তি এই শিক্ষাই দিয়েছেন—কর্মে জ্ঞানে ভক্তিতে ত্রিকায়ে ত্রিযোগে ত্রিধারায় সেই পরমই পরিস্ফুট।

৪৬। তীর্থঙ্কর—দিলীপকুমার রায়, কালচার পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৫১, পৃঃ ২২-৩

৪৭। Swami Vivekananda : His Second Visit to the West—Marie Louise Burke, Advaita Ashrama, Calcutta, Second Edition (1982), pp. 631-32

সর্বোদয়চিন্তা ঃ মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দ

সর্বোদয় কথাটি মহাত্মা গান্ধীই প্রথম ব্যবহার করেন। কথাটির অর্থ 'সকলের কল্যাণ'। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী জন রাস্কিন-লিখিত 'আনটু দিস লাস্ট' বইখানির গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করে তার নাম দেন 'সর্বোদয়'। 'আনটু দিস লাস্ট' বইটির যে মূল তত্ত্বগুলি গান্ধীজীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল সেগুলি হল ঃ (১) সমষ্টির কল্যাণের মধ্যেই ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত, (২) সকলেরই যখন কর্মের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের অধিকার আছে তখন একজন উকিলের কাজের মূল্য একজন নাপিতের কাজের মূল্যের সমান, (৩) প্রত্যেক শ্রমজীবীর, প্রত্যেক চাষীর, প্রত্যেক কারিগরের জীবন মর্যাদাপূর্ণ এবং সম্মানীয়। 'আনটু দিস লাস্ট' বাক্যাংশ যদিও বাইবেল (ম্যাথু, ২৪।১৪) থেকে উদ্ধৃত, তবুও রাস্কিন খ্রীষ্টান সমাজবাদের সমর্থক ছিলেন না। 'সকলের জন্য সমান মজুরি'র পরিবর্তে 'নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট মজুরি' নীতির তিনি সমর্থক ছিলেন। উপরে বর্ণিত তিনটি আদর্শের ভিত্তিতে গান্ধীজী যে সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন তারই নাম সর্বোদয়সমাজ। পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রে প্রত্যক্ষবাদী সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল 'অধিকতম লোকের প্রভূততম কল্যাণ' সাধন। সর্বোদয়নীতি এই মতের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। গান্ধীজীর অভীষ্ট ছিল 'সকল মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণ'। সর্বোদয়সমাজ সকল প্রকার শোষণমুক্ত, রাষ্ট্রীয় শাসনমুক্ত, অহিংসা ও প্রেমে সমৃদ্ধ সাম্যবাদী সমাজ। এই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সর্বোদয়কর্মীর আত্মশুদ্ধি, শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতনতা, সকল ধর্মমতকে সমান সত্য বলে স্বীকার করা, 'সত্যই ঈশ্বর' এই বোধকে সদা জাগ্রত রাখা এবং সমাজে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার প্রবর্তন করা। সার্থক সর্বোদয়কর্মীর কয়েকটি চারিত্রিক গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। সেগুলি হল ঃ অহিংসা, সত্যবাদিতা, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য এবং অভয়।

অহিংসা ঃ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে 'অহিংসা' কথাটি নেতিবাচক নয়। অহিংসার অর্থ প্রেম এবং এই প্রেমের উৎস হল মানুষের হৃদয়। হৃদয়ের আবেদনকে যদি আমি অবহেলা না করি, তাহলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আমি সকল প্রাণীকে ভালবাসব। অবশ্য একথা ঠিক যে, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে জীবনধারণের জন্য কোন-না-কোন ভাবে হিংসার আশ্রয় নিতেই হবে। কিন্তু আমার পক্ষে যতখানি অহিংস থাকা সম্ভব তা আমি থাকব না কেন? গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন যে, মানুষ এক মুহূর্তকালও কোন-না-কোন প্রকারে কিছু প্রাণসংহার না করে বাঁচতে পারে না। তার আহার বিহার প্রভৃতি কর্মের মধ্যে ন্যূনতম হিংসার স্থান থাকবেই। তবুও গান্ধীজীর মতে প্রেম বা অহিংসা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তিকে যতটা প্রসারিত করা যাবে ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। ভাবাত্মক দিক থেকে অহিংসার অর্থ যেমন প্রেম বা ভালবাসা, তেমনি অ-ভাবাত্মক দিক থেকে অহিংসার অর্থ হল

চিন্তায়, বাক্যে এবং কর্মে কোন প্রাণীর ক্ষতি না করা। অহিংসা দুর্বলের ধর্ম নয়, ভীরুর ধর্মও নয়। অহিংসা হল আত্মশক্তিতে বলীয়ান বীরের অস্ত্র। যে লোক অহিংস-সংগ্রামী সে অন্যায়কারীকেও ভালবাসে। এ ভালবাসার অর্থ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। অসহায়ভাবে অন্যায়কে মেনে নেওয়াও নয়। অন্যায়কারীকে ভালবাসার অর্থ হল অহিংস-প্রতিরোধের মাধ্যমে তার মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করা। তার সঙ্গে অসহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা। আত্মশক্তি-প্রয়োগের দ্বারা যখন আমি কোন অন্যায় বিধি বা ব্যবস্থা অমান্য করে চলি এবং ফলস্বরূপ যথাযথ শাস্তি মাথা পেতে নিই, তখনই আমি অহিংস-অসহযোগের পথ অনুসরণ করি। এই জাতীয় অহিংস-প্রতিরোধের ক্ষমতা অপরিসীম। অহিংস-সংগ্রামী ক্রোধকে প্রেমের দ্বারা, অন্যায়কে সত্যাগ্রহের দ্বারা, অসূয়াকে ক্ষমার দ্বারা জয় করে থাকেন। হিংসাত্মক সংগ্রামের চাইতে অহিংস-সংগ্রামের ক্ষমতা অনেক গভীর এবং স্থায়ী। গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তের মূলে দুটি সংশয়াতীত প্রত্যয় কাজ করছেঃ (১) প্রত্যেক মানুষের মনে শুভবুদ্ধি সুপ্ত আছে অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই স্বভাবত সৎ, এবং (২) অহিংসা ও সত্যাগ্রহের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন করা সম্ভব। হিংসার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছেন যে, আসলে হিংসা হল মানসিক দুর্বলতার প্রকাশ। যে লোক নির্ভীক সে তো প্রেম ও মৈত্রীর দ্বারাই বিরোধী পক্ষের হৃদয় জয় করে নিতে পারে। অপরপক্ষে ভয়সঞ্জাত হিংসা, হিংসার আশ্রয় ও লক্ষ্য—উভয় ক্ষেত্রেই আরও ভয়, আরও ঘৃণার উদ্রেক করে এবং ভয়—হিংসা—ঘৃণা—অধিক ভয়—অধিক হিংসা—অধিক ঘৃণা—এই চক্র চিরন্তন কাল ধরে চলতে থাকে। এর ফলে উভয় পক্ষই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মনুষ্যত্বের চরম অমর্যাদা করে থাকে। অহিংসার পূজারী গান্ধীজী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হিংসা-প্রয়োগের সুপারিশ করেছেন, একথা অবশ্য মনে রাখা দরকার। নারীর মর্যাদা ও শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য অন্য কোন পথ উন্মুক্ত না থাকলে অবশ্যই হিংসার আশ্রয় নিতে হবে। মনুষ্যেতর কোন প্রাণী যদি উন্মত্ত অবস্থায় নির্বিচারে মানুষের প্রাণহানি করতে থাকে, তাহলে সেই প্রাণীকে হত্যা করায় কোন দোষ নেই। তেমনি শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণ থেকে নিজের দেশকে রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজন হলে হিংসার পথ গ্রহণ করতে হবে। গান্ধীজী বলতেনঃ যদি ভীরুতা ও হিংসা—এই দুটির মধ্যে একটা আমাকে বেছে নিতে হয়, তাহলে আমি অবশ্যই হিংসাকে বেছে নেব। ভারতবাসী নিজের দেশের সম্মান, মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে গিয়ে অসমর্থ হয়ে ভীরুর মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকুক—এ আমার কাম্য নয়। বরং সে দেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অস্ত্র ধারণ করুক, আমি তা-ই চাইব।[১]

সত্যনিষ্ঠাঃ সর্বোদয়কর্মীর দ্বিতীয় আবশ্যিক গুণ হল সত্যনিষ্ঠা। চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে তাকে সর্বদা সত্যের পথে চলতে হবে। সত্য স্বয়ংপ্রকাশ, তাকে আবিষ্কার করতে হলে চাই মোহমুক্ত মন, অনুসন্ধানী বুদ্ধি। অজ্ঞানের আবরণ অপসারিত হলেই সত্য

১। Selections from Gandhi—Nirmal Kumar Bose, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, First Edition (1948), pp. 155-56

নিজের দ্যুতিতে প্রতিভাত হবে। যদি চিরায়ত ঐতিহ্যের সঙ্গে আমার বিচারের বিরোধ ঘটে, তাহলে আমি কোন্ পথ অবলম্বন করব? এই প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজী বলেন ঃ ঈশ্বর আমাকে যে বিচারের ক্ষমতা দিয়েছেন, তা বিসর্জন দিয়ে আমি কখনও ঐতিহ্যের কাছে মাথা নত করব না। বুদ্ধিবিচার-প্রয়োগের সময় যদি আমি সংস্কারমুক্ত থাকতে পারি, কামনাবাসনাকে সংযত রাখতে পারি তাহলে কেন আমি সত্যের সন্ধান করতে পারব না? যতক্ষণ আমি ছ-টি রিপুর অধীনে থাকব ততক্ষণ সত্যের পথে চলা আমার পক্ষে সহজ হবে না। কাজেই সত্যসন্ধানের জন্য আত্মসমীক্ষা ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। সত্যকে সে-ই জানতে পারে, যে চারিত্রিক বলে বলী, যার জীবন ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে লোক সত্যকে আশ্রয় করে চলে, তার মনে কোন প্রকার ভয় বা সঙ্কোচ থাকে না। সে অকপটে নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করতে পারে, নিজের ভুল সংশোধনের জন্য সে সকল প্রকার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকে। গান্ধীজীর নিজের জীবনে একটি ভুলকে তিনি পর্বতপ্রমাণ ভুল বলে স্বীকার করেছেন। ক্ষেত্র প্রস্তুত করার আগেই আমেদাবাদের কিছু লোককে তিনি আইন-অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। পরে তিনি বুঝতে পারেন যে, এ কাজটি ভুল হয়েছে। গান্ধীজীর মতে ঃ বাক্যে ও কর্মে সত্যানুসরণ তখনই স্বতঃস্ফূর্ত হয় যখন মানুষ তার প্রতিবেশীকে ভালবাসতে শেখে। ভালবাসার ধনকে কখনও প্রবঞ্চনা করা যায় না, তাকে মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে ভোলানো যায় না। কাজেই যেখানে প্রেম সেখানেই সত্যনিষ্ঠা। এককথায়, সত্য ও প্রেম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

অস্তেয় ঃ পরস্ব অপহরণ না করা, অপরকে শোষণ না করা সর্বোদয়কর্মীর অপর একটি গুণ। সম্পত্তি হল মানুষের বাইরের জীবন, কাজেই সম্পত্তি থেকে একজনকে বঞ্চিত করার অর্থ পরোক্ষভাবে তার প্রাণনাশ করা। অস্তেয় গুণটিও প্রেম থেকে উদ্ভূত। যাকে সত্যিই ভালবাসা যায় তার সম্পত্তি অপহরণ করা যায় না। একটু ব্যাপকভাবে দেখলে বলা যায়, অস্তেয় মানে শুধু চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকা নয়, সকল প্রকার শোষণ থেকে বিরত থাকা। পুঁজিবাদী কারখানার মালিক যখন শ্রমের ন্যায্য মূল্য থেকে শ্রমিককে বঞ্চিত করেন তখন তিনি এক ধরনের চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হন। তেমনি আমি যদি আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ সঞ্চিত করে রাখি, তবে আমিও এক ধরনের চোর।

অপরিগ্রহ ঃ অপরের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় কিছু গ্রহণ না করা একটি গুণ। বর্তমান সমাজে নিরঙ্কুশ অপরিগ্রহের অবকাশ নেই। কাজেই গান্ধীজী আপেক্ষিক অর্থে 'অপরিগ্রহ' কথাটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, আশু-প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস সংগ্রহের চেষ্টা অন্যায়। সর্বোদয়কর্মী মাত্রেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী হবেন এবং ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সেই শক্তি অর্জন করবেন, যে শক্তি নরনারায়ণ-সেবার সহায়ক হবে। যেহেতু ঈশ্বর কোনদিন কিছু সঞ্চয় করেন না, সেইজন্য মানুষের ঈশ্বরবিশ্বাস যদি অটুট থাকে, তবে সে প্রয়োজনের সময় নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দান থেকে বঞ্চিত হবে না। গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন, প্রকৃত প্রেমের মহিমা ত্যাগে, ভোগে নয়। দেহই তো আমার শেষ সম্বল। প্রেমের চরিতার্থতার জন্য যদি দেহকেও ত্যাগ

করতে পারি, তবেই আমার প্রেম সার্থক। কিন্তু সংসারী জীবের পক্ষে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজসাধ্য নয়। তবুও এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য মানুষের অনলস সাধনা চলেছে যুগ যুগ ধরে।

ব্রহ্মচর্য ঃ ব্রহ্মচর্য কথাটি গান্ধীজী ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্মচর্য মানে শুধু যৌনপ্রবৃত্তির সংযম নয়, মনের সার্বিক সংযম, চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই সংযত জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়। আহার, বিহার, বসন, শয্যা প্রভৃতি স্তরে নিরন্তর পরীক্ষা করে দেখতে হবে আমার কোন্ আচরণ আমাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। যে আচরণ আমাকে ঈশ্বরমুখী করে, সেই আচরণই ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্যের লক্ষ্য হল কামকে প্রেমে উজ্জীবিত করা।

অভয় ঃ সর্বোদয়কর্মীকে সব দিক দিয়ে ভয়শূন্য হতে হবে। রাজভয়, লোকভয়, মৃত্যুভয়, অত্যাচারের ভয়, ক্ষুধার ভয়, অপমানের ভয়, এমনকি ভূতের ভয় পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারলেই উপযুক্ত সমাজসেবক হওয়া যায়। নির্ভীক মানুষই সত্যের সন্ধান করতে পারে, নির্ভীক মানুষই সকল প্রাণীকে ভালবাসতে পারে। প্রেম থেকেই আসে অভয়, আবার ভালবাসার গোড়ার কথাই হচ্ছে অভয়। যে ভীরু সে কেমন করে বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে সত্যের পথে অগ্রসর হবে? কেমন করেই বা সে সকল হৃদয় উজাড় করে দিয়ে ভালবাসবে?

এ তো হল সর্বোদয়কর্মীর গুণাবলীর কথা। এখন সর্বোদয়সমাজের রূপরেখাটি কেমন হবে? এ প্রশ্নের জবাবে দেখা যায়, গান্ধীজীর প্রত্যয়ের দুটো দিক আছে, একটি অ-ভাবাত্মক, অপরটি ভাবাত্মক। অ-ভাবাত্মক দিক থেকে বলা যায় যে, সর্বোদয়সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে বাধাগুলি আগে দূর করতে হবে। বাধার উৎস হল ঃ রাষ্ট্রযন্ত্র, শিল্পায়ন, সংখ্যাগুরুর শাসন এবং রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। ভাবাত্মক দিক থেকে সর্বোদয়সমাজ প্রতিষ্ঠার মূলে যে সত্য কাজ করছে, তা হল ঃ পঞ্চায়েত-রাজ, আধ্যাত্মিক সমাজতন্ত্রবাদ, শ্রমের মর্যাদা, অর্থনৈতিক সাম্য, অছিবাদ ও শিক্ষাবিস্তার।

বৈষ্ণব কবি গেয়েছিলেন ঃ 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' সর্বোদয়চিন্তার প্রথম কথাও তা-ই ঃ মানুষই প্রাথমিক সত্য, মানুষের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। গান্ধীজী কখনও কখনও নিজেকে অদ্বৈতবাদী বলেছেন, আবার একথাও বলেছেন যে, দ্বৈতবাদের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ নেই। আসল কথা, দর্শনবিচারের কোন সূক্ষ্ম তত্ত্বের মধ্যে গান্ধীজী প্রবেশ করতে চাননি। তাঁর প্রধান কথা হল, সকল মানুষই এক ঈশ্বরের সন্তান। সেই দিক থেকে পৃথিবীর সকল মানুষই এক অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ। সর্বোদয়সমাজে মানুষের মর্যাদা ও তার সকল প্রকার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে এবং তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের সকল রকমের সুযোগ দিতে হবে।

গান্ধীজীর মতে ঃ ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র হল তার গ্রাম। তাই ভারতবর্ষের গ্রামজীবনকে উজ্জীবিত করতে পারলেই নতুন ভারতের জন্মলাভ হবে। ইংরেজশাসনের আগে ভারতবর্ষের গ্রামগুলি ছিল আত্মনির্ভর এবং অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভর। আজ দ্রুত নগরায়নের

ফলে মানুষ সামান্য চাকরির লোভে গ্রাম ছেড়ে নগরের দিকে ছুটছে। ফলে একদিকে গ্রামগুলি হয়েছে হতশ্রী, গ্রামের মানুষ নিঃসঙ্গ, অপরদিকে শহরের শিল্পায়নের ফলে অর্থসম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে, আর তারা নানাভাবে শ্রমিককে শোষণ করছে। কাজেই ভারতের সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে স্বাধীন স্বয়ম্ভর গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির অগ্রগতির মধ্যে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের লক্ষ্য হবে তাদের অভাববোধকে যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা। আর যেখানে সম্পদের প্রাচুর্য থাকবে না, সেখানে সম্পদ-সংরক্ষণের জন্য পুলিশ বা মিলিটারির প্রয়োজন হবে না। বর্তমান বিশ্বে সংসদীয় গণতন্ত্র এবং কমিউনিজমের যে রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রায় চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। গণতন্ত্রে এখন আর জনগণের অবাধ অভিমত জানবার উপায় নেই, শাসনকার্যে তাদের সরাসরি শরিক হবারও কোন অবকাশ নেই। মুষ্টিমেয় নেতৃবৃন্দ ভোটের জোরে যে মত জনগণের উপর চাপিয়ে দেবেন, জনগণকে তা-ই বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। কমিউনিস্ট-শাসনেও দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তির চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে স্বাধীনতা নেই। শাসকদলের রাষ্ট্র এই স্বাধীনতা বরদাস্ত করছে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে খর্ব করার বিরুদ্ধে সর্বোদয় একটি মূর্ত প্রতিবাদ। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সর্বোদয়চিন্তায় বিকেন্দ্রীকরণ একটি উপায় মাত্র, উপেয় নয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য হল : গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সুস্থ, সবল, শোষণমুক্ত, সৃষ্টিশীল নাগরিক তৈরী করা। সোজা কথায়, গ্রামবাসীরা যাতে নিজেদের শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিজেরাই করতে পারে, সেইভাবে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল না হয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনীয় আইনকানুন তৈরী করে নেবে, এইটাই ছিল গান্ধীজীর অভিপ্রেত। বহুযুগের পরাধীনতার ফলে এবং অস্পৃশ্যতাদোষে দুষ্ট সমাজে বসবাস করার ফলে গ্রামবাসীরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। কাজেই সর্বোদয়কর্মীর প্রথম কাজ হবে, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। এই কাজের জন্য প্রয়োজন কিছু স্বার্থত্যাগী, উদারচেতা ও প্রাণবন্ত যুবকের। তারা হবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান। সর্বোদয়ের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হচ্ছে জনগণ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী বা সংসদ নন। কাজেই জনগণকে জনসেবার যোগ্য করে তুলতে হবে। তাদের সেই স্তরে উন্নীত করতে হবে যেখান থেকে জনসেবার দায়িত্বকে তারা সহজ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে, মানুষের পক্ষে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ যেমন স্বাভাবিক, জনসেবাও তেমনি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। রাজনীতির স্থান গ্রহণ করবে লোকনীতি। সরকারী শাসনের পরিবর্তে আত্মনিয়ন্ত্রণ, শক্তির পরিবর্তে স্বাধীনতা, দমনের পরিবর্তে নিয়মানুবর্তিতা, অধিকার-অর্জনের প্রতিযোগিতার পরিবর্তে কর্তব্যপরায়ণতা—এই হবে সর্বোদয়সমাজের লক্ষ্য।

সর্বোদয়সমাজ প্রকৃত গণতন্ত্রের দ্যোতক। প্রকৃত গণতন্ত্র অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর উদ্ভব হয় ব্যক্তিমানস থেকে। অর্থাৎ গণতন্ত্র বাইরে থেকে আমদানি করে কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দেওয়া চলে না, প্রকৃত গণতন্ত্রে মানুষে মানুষে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক থাকতে পারে না। সেখানে সকলেই সমান স্বাধীনতা ভোগ করে,

সেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রভু। আমাদের যতগুলি মৌলিক অধিকার আছে, তার মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা ও বাক্‌স্বাধীনতা অন্যতম। প্রকৃত গণতন্ত্র এই দুই প্রকারের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার সকল রকমের সুযোগ দেয়। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতেঃ গণতন্ত্রের প্রকৃত মূল্যায়ন হয় সত্যাগ্রহের পথে। সত্যাগ্রহীকে একদিকে যেমন ভয়মুক্ত হতে হবে তেমনি অপরদিকে প্রতিপক্ষকে বিশ্বাস করতে হবে। প্রতিপক্ষ যদি বার বার প্রতারণাও করে, তবু তার প্রতি বিশ্বাস হারানো চলবে না। গণতন্ত্রে নানা মত, নানা পথ থাকবেই। 'কেবল আমার মতটাই ঠিক'— এই মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হলেই গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটবে। সত্যের দ্যুতি নানাভাবে, নানা দিক থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমি হয়তো তার একটা দিক দেখেছি, অপরে অন্যান্য দিক বা প্রকাশগুলি দেখছে। কাজেই অপরের মতকে কোনভাবেই অবহেলা করা চলবে না, ভ্রান্ত বলে বর্জন করাও চলবে না। প্রতিপক্ষের ভূমিকায় নিজেকে বসিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারলে পৃথিবীর অনেক দুঃখ-কষ্ট দূর করা যায় এবং অনেক ভুল বোঝাবুঝিরও অবসান হয়। গান্ধীজী বলেছেনঃ 'এই (সর্বোদয়) গণতন্ত্রে অগণিত গ্রামকে কেন্দ্র করে ক্রমশ বৃহত্তর গণ্ডির সৃষ্টি হবে। জীবন এখানে পিরামিডের মতো হবে না, যেখানে শীর্ষবিন্দু ভূমিতলের উপর দণ্ডায়মান। এই সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সমুদ্রের তুল্য বিশাল বৃত্তের সৃষ্টি হবে। ব্যক্তি সর্বদা গ্রামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে এবং এক একটি গ্রাম অন্যান্য গ্রামের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করবে। এইভাবে সবকিছুর সমবায়ে যে জীবন গড়ে উঠবে তাতে থাকবে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এ মানুষ কখনও উদ্ধত হবে না। সদাসর্বদা বিনীত থেকে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে বৃহত্তর জীবন যাপন করবে। এই বৃহত্তর জীবনেরই সে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিজেকে মনে করবে।

'সুতরাং বৃহত্তর বৃত্ত কখনও অন্তর্বর্তী ক্ষুদ্রতর বৃত্তের উপর বলপ্রয়োগ করবে না, পরন্তু ক্ষুদ্রতর বৃত্তের কাছ থেকেই সে তার শক্তি অর্জন করতে পারবে।...যদি কোনদিন ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামই এক একটি স্বতন্ত্র গণতন্ত্র হিসেবে গড়ে ওঠে তা হলে আমার পরিকল্পনার একটি ছবি পাওয়া যাবে।'[২]

একটু গভীরভাবে গান্ধীজীর চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাঁর মতে প্রকৃত গণতন্ত্র ও প্রকৃত সমাজতন্ত্রে কোন প্রভেদ নেই। যে সমাজতন্ত্রকে গান্ধীজী রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, তাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক সমাজতন্ত্র। এই সমাজতন্ত্র সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক দলের প্রভুত্বের পরিণামে এই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, কোন দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে জোর করে খর্ব করলেও এই সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটবে না। ব্যক্তির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে এই সমাজতন্ত্রের সূচনা। প্রথমে যে ব্যক্তি এই জাতীয় সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হবে, সমাজতন্ত্রকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করবে, সে হবে সত্যাশ্রয়ী, অহিংস, শুদ্ধমনা ও আত্মোৎসর্গের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত। ধীরে ধীরে একজনের

২। সর্বোদয়—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ৮৪

উপলব্ধি দশজনের মধ্যে সঞ্চারিত হবে, দশজন থেকে একশ জন, এইভাবে সমাজতন্ত্র সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়বে। গান্ধীজী বলেছেনঃ তাঁর কাছে এই সমাজতন্ত্রবাদের প্রেরণা এসেছে ঈশোপনিষদ্ থেকে। প্রথম শ্লোকে আমরা দেখছিঃ

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥[৩]

জগতে যা কিছু চঞ্চল বিষয় আছে তা সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন, এই সত্য উপলব্ধি করে ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে। পরের সম্পদে লোভ করবে না।

এই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হল নিরন্তর অসত্য, অন্যায় ও হিংসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়া। গান্ধীজী প্রশ্ন করেছেনঃ যে লোক দরিদ্র, যে বুভুক্ষু, যে আশ্রয়হীন, তার কাছে 'সর্বভূতে ঈশ্বর বিরাজ করছেন' এই তত্ত্বের কি মূল্য আছে? কোন মূল্যই নেই। তার কাছে মুক্তি, ঈশ্বর, ন্যায় প্রভৃতি অর্থহীন কথা মাত্র। বুভুক্ষুর জন্য সর্বপ্রথমে অন্নের সংস্থান করতে হবে, আশ্রয়হীনকে সর্বপ্রথমে আশ্রয় দিতে হবে। ঈশ্বরের কথা আসবে এই সব অভাবপূরণের পরে। তাই গান্ধীজী বললেনঃ 'দরিদ্রের কাছে অন্নই অধ্যাত্ম। উপবাসী লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আপনার আর কোন আবেদন পৌঁছাইবে না,—তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু আপনি তাহাদের কাছে অন্ন লইয়া যান, তাহারা আপনাকে তাহাদের ঈশ্বররূপে ভক্তি করিবে। আর কোন চিন্তা করার ক্ষমতা তাহাদের নাই।'[৪] দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে যাঁরা লঙ্গরখানা খুলে অন্ন বিতরণ করেন, গান্ধীজী তাঁদের বিরোধী। কারণ এ ব্যবস্থায় দরিদ্রের মনুষ্যত্বকে অপমান করা হয়। এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট পথ হল সমর্থ দরিদ্রের কর্মসংস্থান করা এবং সে যাতে ন্যায্য মজুরি পায় তার ব্যবস্থা করা। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর মতে শ্রম এবং পুঁজির সম্পর্ক কি সেটা বুঝে নেওয়া দরকার। এ-বিষয়ে গান্ধীজীর উপর রাস্কিনের প্রভাব সুগভীর। গান্ধীজী প্রচলিত মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, পুঁজি বা মূলধনের চাইতেও বড় সম্পদ হল শ্রমিকের শ্রম। এই সম্পদের এমনই বৈশিষ্ট্য যে, কোন পুঁজিপতিই একে সম্পূর্ণভাবে নিজের দখলে আনতে পারবেন না। এ মূলধন জীবন্ত ধন, এ জিনিস কখনও নিঃশেষ হয় না। গান্ধীজী এমন একটি সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন, যেখানে মূলধন, শ্রম ও অন্যান্য উৎপাদকের মধ্যে সমন্বয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হবে। তাঁর নিজের কথায়ঃ 'মূলধন যদি ক্ষমতার উৎস হয় তা হলে শ্রমও তা-ই। উভয় শক্তির যে-কোনটিই ধ্বংসাত্মক অথবা গঠনমূলক কাজে লাগানো যেতে পারে। পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। যে মুহূর্তে শ্রমিকরা নিজস্ব শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে, সেই মুহূর্ত থেকে তারা দাসত্বের পর্যায় থেকে পুঁজিপতির সহকর্মীর পর্যায়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু শ্রমিক যদি সমস্ত ক্ষমতা নিজের মুঠোয় আনতে চায় তা হলে সে স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী রাজহংসীকে নিজে হাতেই হত্যা করে বসবে।'[৫] শ্রমের মূল্য,

৩। ঈশোপনিষদ্, ১

৪। গান্ধীবাণী—সম্পাদনাঃ মনকুমার সেন, গান্ধী শতবার্ষিকী কমিটি, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ (১৯৬৮), পৃঃ ৩৬

৫। সর্বোদয়, পৃঃ ৫৬

বিশেষত দৈহিক শ্রমের মূল্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর চিন্তাধারা টলস্টয় ও রাস্কিনের দ্বারা প্রভাবিত। গান্ধীজীর মতেঃ প্রত্যেক সুস্থ সবল মানুষ তার খাদ্য আহরণের জন্য পরিশ্রম করবে এবং তার মানসিক বৃত্তিগুলি প্রভূত ধনসঞ্চয়ের জন্য ব্যবহার না করে জনসেবার জন্য ব্যবহার করতে হবে। এই মতের সার্বিক প্রয়োগ যদি সার্থক হয়, তবে পৃথিবী থেকে দারিদ্র সহজেই দূরীভূত হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রমকে যজ্ঞ হিসাবে পরিগণিত করা হয়েছে। গান্ধীজী গীতার আদর্শ অনুসরণ করে বলেছেনঃ কোন লোক নিজ দেহধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তার চাইতে বেশী খাদ্য যদি গ্রহণ করে তাহলে সে একজন চোর। গান্ধীজী বলেন যে, কোন মানুষেরই প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহ করার কোন অধিকার নেই। অপরপক্ষে, যে কোনও লোক পরিশ্রম করবে, তাকে পরিশ্রমের মূল্য দিতেই হবে। প্রকৃতির হিসাবের খাতায় জমা ও খরচ—দুই দিকেই সমান অঙ্ক লেখা আছে। তাই লোভী মানুষ যখন অপরকে বঞ্চিত করে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করে, তখনই সে প্রতিবেশীর মধ্যে বুভুক্ষার সঞ্চার করে। সংসার-আশ্রমে যদি আমরা দৈহিক শ্রমের যথার্থ মর্যাদা দিই, তাহলে ভৃত্য নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। গৃহস্থ যদি নিজেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সাহায্যেই জল তোলা, কাপড় কাচা, আবর্জনা পরিষ্কার করা, কাঠ কাটা প্রভৃতি কাজ করেন, তাহলে প্রত্যেকেই যেমন শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন, তেমনি সংসারে বাড়তি একজন ঝি বা চাকরের প্রয়োজন হয় না।

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে শ্রম যেমন অবশ্যকর্তব্য, তেমনি শ্রমের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল, শ্রমের মাধ্যমে অপরের সেবা করা। সংসার-আশ্রমে আরাম এবং আলস্যের কোনও স্থান নেই, প্রত্যেক মানুষকেই সদিচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজ করতে হবে, যে কাজের লক্ষ্য হবে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়।

গান্ধীজীর সমালোচকগণ গান্ধীজীর ভাবধারা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে অভিযোগ করেছেন যে, তিনি দৈহিক শ্রমের মূল্যকে যতটা বড় করে দেখেছেন, মানসিক বা বৌদ্ধিক শ্রমকে ততটা বড় আসন দেননি। গান্ধী-সাহিত্যের সহৃদয় পাঠক এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন, তা সহজেই বুঝতে পারবেন। বৌদ্ধিক শ্রম বলতে যাঁরা বোঝেন জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কেবল তথ্য সংগ্রহ করা, গান্ধীজী তাঁদের দলে নন। গান্ধীজী মানসিক শ্রম বলতে বোঝেন বিবেকজ্ঞান—ভালমন্দ ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদ করবার ক্ষমতা। যে মানুষ প্রত্যহ নিয়মিত দৈহিক শ্রম করছে, সে যদি মনে করে যে, নির্দিষ্ট মজুরি উপার্জন করাই তার লক্ষ্য, তাহলে সে ভুল করবে। আসল কথা হচ্ছে, দৈহিক শ্রম আমি কেন করছি, কি উদ্দেশ্য নিয়ে করছি তা আমাকে ভাল করে বুঝতে হবে। কর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমার কৌতূহল উদ্দীপিত না হয়, তাহলে আমার কাজে উৎসাহ এবং আনন্দ আসবে কোথা থেকে? একথা সকলকেই বুঝতে হবে যে, শ্রমিক মাত্রেই কর্মী, কিন্তু শ্রমিক মাত্রেই বেতনের দাস নয়। শ্রমিকের সকল কাজের লক্ষ্যই হবে মনপ্রাণ দিয়ে দরিদ্রের সেবা করা।

গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ বা রমণের মতো চিন্তানায়ককে দৈহিক শ্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত কিনা? এই প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজী বলেছেন ঃ কোন মানুষই দৈহিক শ্রমের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বা রমণের মতো চিন্তানায়ক যদি ন্যূনতম আবশ্যিক দৈহিক শ্রমে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে তিনি মানসিক বা বৌদ্ধিক শ্রমের ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী হবেন।

শ্রমের মূল্য কিভাবে এবং কতটুকু অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী খাদি ও শিল্পায়নের আলোচনা করেছেন।

খাদি বা তাঁতশিল্প, গান্ধীজীর মতে, স্বদেশীর মূল সত্য। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার একটি শ্লোক গান্ধীজী এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন ঃ 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহঃ।' গীতায় স্বধর্ম সম্পর্কে যেকথা বলা হয়েছে, গান্ধীজী স্বদেশী সম্বন্ধেও সেই কথা বলতে চান। এখানে অবশ্য গান্ধীজীকে অনেকে ভুল বুঝেছেন। অনেকের ধারণা, গান্ধীজী চরকাকে ব্যক্তি ও জাতির জীবনে যে-স্থান দিয়েছেন, তা আধুনিক যন্ত্রসভ্যতায় পশ্চাদ্‌গামিতা, এবং শিল্প-অগ্রগতির সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে চলার উপযোগী নয়। এই প্রসঙ্গে অনেক বিতর্কের ঝড় উঠেছে, অনেক বাদবিতণ্ডা হয়েছে, কিন্তু গান্ধীজীর মত খুব সরল, স্পষ্ট এবং বস্তুনিষ্ঠ। তিনি বলেছেন ঃ স্বদেশীর সঙ্গে স্বার্থত্যাগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমন সময় আসতে পারে যখন একজন স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষিত সেবকের কাছে বহুজনের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগ করাই একমাত্র প্রয়োজন বলে মনে হবে। গান্ধীজী বলেছেন ঃ গ্রামে যদি কখনও প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয়, তাহলে আমি অবশ্যই আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ করব। এই সেবার ফলে যদি আমি সপরিবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই, তাহলেও মনে করব একজন স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষিত সেবক হিসাবে আমি আমার কর্তব্য করেছি।

খাদির সর্বজনীন প্রসারের ফলে মিল-মালিকের প্রভূত ক্ষতি হবে এমন কথা গান্ধীজী মনে করেন না। উদাহরণ হিসাবে গান্ধীজী বলেছেন ঃ চোরের উপর নৈতিক চাপ সৃষ্টি করে যদি চুরি করা জিনিস ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে অন্যায় হবে কেন?

গান্ধীজী নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে অভিহিত করেছেন। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর একটি নিজস্ব ধারণা আছে যা কোন প্রামাণ্য গ্রন্থরাজির অধ্যয়নসঞ্জাত নয়। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বোধ খুব স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল। পুঁজিপতিদের পুঁজির অপব্যবহারের ফলে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, একথা গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলেছেন ঃ 'পূর্বপুরুষরাই আমাদের সমাজতন্ত্রের যথার্থ পাঠ দিয়ে গেছেন। তাঁরা শিখিয়েছেন ঃ "সমস্ত জমিই গোপালের সুতরাং তাতে সীমারেখার অবকাশ কোথায়? সীমারেখার সৃষ্টি করেছে মানুষ, সুতরাং মানুষই এই ভাগাভাগি তুলে দিতে পারে।" গোপাল কথার মানে রাখাল; আর একটি অর্থ ভগবান। আধুনিক পরিভাষায় গোপাল মানে রাষ্ট্র অর্থাৎ জনসাধারণ। আজ জমি যে জনসাধারণের হাতে নয়, একথা খুবই সত্যি। তা বলে পূর্বপুরুষের শিক্ষায় কোন গলদ নেই। আমরাই সেই শিক্ষাকে জীবনে যথাযথ প্রয়োগ করতে পারিনি, সুতরাং গলদ আমাদেরই।'[৬] এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে,

৬। তদেব, পৃঃ ৬৩

গান্ধীজী জমিদারিপ্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ চাননি। অহিংস-বিপ্লবের মাধ্যমে জমিদারশ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই বলেছেন: 'কৃষকসম্প্রদায়ের এ ধারণা হওয়া উচিত নয় যে, সমস্ত জমির মালিকানা একান্তভাবে তাদেরই, জমিদারদের কোন অধিকার নেই। উভয় সম্প্রদায়েরই নিজেদের এক বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত বলে মনে করা উচিত। এই পরিবারের কর্তা জমিদার। তাঁর কাজ হবে পরিবারের সবাইকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করা।'[৭] এই উদ্দেশ্য নিয়েই গান্ধীজী অছিবাদের কথা বলেছেন। মানুষ তার কায়িক অথবা মানসিক শ্রমের সাহায্যে কোটি কোটি অর্থ উপার্জন করুক, তাতে কোন বাধা নেই। কিন্তু তার সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সে এই অর্জিত অর্থের অছিমাত্র, আসল মালিক জনগণ অথবা জনসমাজ। তার জীবনধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু রেখে বাকি অর্থ সমাজের অথবা জনগণের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। এইসঙ্গে আরও মনে রাখতে হবে যে, যে ধনী ব্যক্তি অর্থসম্পদের দিক থেকে সমাজের অছিমাত্র তার সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে তার বংশধররা কখনই পাবে না। কারণ সম্পত্তির আসল উত্তরাধিকারী হচ্ছে সমাজ। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে, অছিবাদের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক সাম্য আসতে পারে। অর্থনৈতিক সাম্য বলতে গান্ধীজী বুঝতেন অর্থের সুষম বণ্টন এবং সুষম বণ্টনের মূলকথা হল যার যতটুকু প্রয়োজন তাকে ততটুকু দিতে হবে। এদিক থেকে গান্ধীজীর চিন্তাধারার সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তাধারার খানিকটা মিল দেখা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হাতি ও পিঁপড়ের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ এক নয়। ঠিক তেমনি, একক অবিবাহিত কোন যুবকের সংসারে যা প্রয়োজন, স্বামী, স্ত্রী ও দুটি সন্তানকে নিয়ে যে পরিবার তার প্রয়োজন সে তুলনায় আরও বেশী। অহিংসার উপর যে সর্বোদয়সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকবে না।

আমাদের দেশে শ্রমিক-আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছেন যে, পুঁজিপতিদের নিষ্ক্রিয় করবার পরিবর্তে শ্রমিকরা চায় পুঁজি নিজের দখলে এনে নিজেরাই এক একজন পুঁজিপতি হয়ে বসতে। ফলে অবস্থার অবনতি ঘটে। কারণ পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে শক্তিপ্রয়োগ করে শ্রমিকসঙ্ঘ ভেঙে দেয়, অথবা বিরোধী শ্রমিকসঙ্ঘ গঠন করে, অথবা শ্রমিক-নেতাদের প্রলোভন দেখিয়ে সঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনে। কাজেই, ধনীরা স্বেচ্ছায় উদ্বৃত্ত ধন জনকল্যাণের জন্য যাতে ব্যয় করতে পারে সেরকম পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে হবে। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছেন: 'কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ধনীরা দরিদ্রদের প্রকৃত রক্ষকের দৃষ্টিতে না দেখে, এবং দরিদ্ররা যদি তাদের চাপে নিষ্পেষিত হয়ে ক্ষুধায় প্রাণত্যাগ করে চলে, তাহলে কি করা উচিত? এই সমস্যার যথার্থ সমাধান হিসেবে আমি অহিংসা-নীতিসম্মত অসহযোগ এবং আইন অমান্যের কার্যক্রম বেছে নিয়েছি। দরিদ্রদের সহযোগিতা ছাড়া সমাজে ধনীরা সম্পদশালী হতে পারে না—এই ধারণাটি

৭। তদেব, পৃঃ ৬৩-৪

একবার যদি দরিদ্রদের মনে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে তা হলে তারা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে। যে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক অসমতার দরুন তারা আজ অনাহারের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, সেই অন্যায়ের হাত থেকে তারা মুক্ত হবে অহিংসা-নীতিসম্মত আন্দোলনের পথে।'[৮]

॥ ২ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারার তুলনা করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার, স্বামীজী মাত্র ন-বছর (১৮৯৩-১৯০২) তাঁর মতামত প্রচারের জন্য সময় পেয়েছিলেন, আর গান্ধীজী পেয়েছিলেন তেত্রিশ বছর কাল (১৯১৫-৪৮)। গান্ধীজী স্বামীজীর কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন, বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর প্রতি তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছেন। স্বামীজী ও গান্ধীজী উভয়েই নিপীড়িত মানুষকে মর্যাদা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ভারতবাসীর দারিদ্র, কুসংস্কার ও কুশিক্ষা দূর করে সর্বস্তরে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য আনবার চেষ্টা করেছেন। উভয়ের জীবনের লক্ষ্য প্রায় এক ধরনের হলেও, কয়েকটি বিষয়ে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও লক্ষণীয়। গান্ধীজীর অভিমত ঃ মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন নয়। স্বামীজীর অনুভব ঃ প্রত্যেক জীবই স্বরূপত ব্রহ্ম। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একই সচ্চিদানন্দ সুপ্ত আছেন। গান্ধীজী সর্বোদয়সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন অছিবাদ প্রবর্তন, সমাজে রাষ্ট্রশক্তির বিকিরণ, উৎপাদন-ব্যবস্থার যথাসাধ্য বিকেন্দ্রীকরণ, কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল সত্যকে সম্পূর্ণ অধিগত করেছে এমন অভিমান বর্জন, ভোটদানের বয়ঃসীমা নির্ধারণ (৫০ বছর বয়স অতিক্রান্ত হলে মানুষের আর ভোটদানের অধিকার থাকবে না), অহিংসানীতি অবলম্বন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ ইত্যাদি। স্বামীজীর লক্ষ্য ছিল অন্য ধরনের।

স্বামীজী বলতেন ঃ আমার কাজ হল যারা নিঃস্ব, যারা বঞ্চিত, সর্বহারা, তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ভাব, অভয়ের ভাব ছড়িয়ে দেওয়া, তাদের লুপ্ত মনুষ্যত্বকে আবার জাগিয়ে তোলা, পৃথিবীর চারিদিকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে কি ঘটছে সেবিষয়ে তাদের সচেতন করে তোলা। এ সবকিছুর জন্যই প্রয়োজন দরিদ্র চাষী ও শ্রমজীবীকে প্রকৃত শিক্ষা দান। বাকিটা কার্যকারণসম্পর্কের মতো স্বাভাবিকভাবেই ঘটবে। তাই স্বামীজী ভাবী সমাজের জন্য নির্দিষ্ট আইনকানুন বেঁধে দেননি। এ কাজের ভার মানুষের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। এখানে গান্ধীজীর সঙ্গে স্বামীজীর মৌলিক প্রভেদ। স্বামীজী ও গান্ধীজী উভয়েরই গণচেতনা ছিল সুগভীর। উভয়েই শ্রেণীবৈষম্য দূর করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উভয়ের পন্থা এক নয়। গান্ধীজী ব্রাহ্মণকে শূদ্রে পরিণত করতে চেয়েছেন, স্বামীজী শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করতে চেয়েছেন। গান্ধীজী বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা প্রবর্তনের

৮। তদেব, পৃঃ ১১৩

বিরোধী। তাঁর ধারণা, ভারতবর্ষের বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মশিক্ষা প্রবর্তন করলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হবে। তিনি বরং নৈতিক শিক্ষা প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন, কারণ সকল ধর্মের অন্তর্গত নৈতিক মূল্যগুলি প্রায় এক ধরনের। যে গুণগুলিকে সর্বোদয়কর্মীর পক্ষে আবশ্যিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি সকল মানুষের পক্ষে অভীষ্ট। কাজেই, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকে ঐ গুণগুলি শেখানোর ব্যাপারে কোন বাধা থাকতে পারে না। এখানেও গান্ধীজীর সঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ। স্বামীজীর মতে, শিক্ষার মর্মকেন্দ্র হচ্ছে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা। এমনকি, ব্যবহারিক বা লৌকিক শিক্ষাও ধর্মের মাধ্যমে দিতে হবে, একথা তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন।[৯] স্বামীজী ঠিক কি অর্থে ধর্মশিক্ষা অনুমোদন করেছেন তা যদি গান্ধীজী আর একটু গভীরভাবে অনুধাবন করতেন, তাহলে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরোধের অবকাশ থাকত না। শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে অবশ্য উভয়েরই একমত। গান্ধীজী বলেছেনঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন, অর্থাৎ নির্ভীকতা, আত্মিক শক্তি ও নিঃস্বার্থ সেবা প্রভৃতি গুণগুলির বিকাশসাধন। এই প্রত্যয় থেকে আর একটু গভীরে গেলেই স্বামীজীর শিক্ষা সম্পর্কিত সূত্রটি পাওয়া যাবে—মানুষের অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতার বিকাশের নামই শিক্ষা (Education is the manifestation of the perfection already in man.)।

এই প্রবন্ধের সূচনায় বলা হয়েছে 'সর্বোদয়' কথাটি গান্ধীজী প্রথম প্রবর্তন করেন। স্বামীজীর স্বদেশভাবনার মধ্যেও সর্বোদয়ের কথাই পাওয়া যাবে, যদিও 'সর্বোদয়' কথাটির পরিবর্তে স্বামীজী 'সমাজতন্ত্রবাদ' কথাটি ব্যবহার করেছেন। স্বামীজীর ধ্যানধারণা থেকে যে মৌল সত্যগুলি গান্ধীজী আহরণ করেছেন সেগুলি হচ্ছেঃ (১) দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হচ্ছে। (২) প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার না হলে সংসদীয় গণতন্ত্র ভারতের কোন রকম কল্যাণ করতে পারবে না। (৩) বর্ণ ও জাতি এক কথা নয়। বর্ণাশ্রমধর্ম গুণ ও কর্তব্যকর্মের বিভাগ অনুসারে সৃষ্ট হয়েছে। এর সঙ্গে অস্পৃশ্যতার কোন অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক নেই। অর্থনীতির দিক থেকে বর্ণাশ্রমধর্মের সার্থকতা আছে। (৪) দরিদ্র চাষী ও শ্রমজীবীর যতদিন অভ্যুদয় না ঘটছে, ততদিন ভারতের সামগ্রিক কল্যাণ শুধু কল্পনাবিলাসের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। (৫) বিপ্লব শুরু করার আগে চাই বিপ্লবী-চরিত্র। যে মানুষ নিজের ভোগেচ্ছা ত্যাগ করে সমাজের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হতে পেরেছে সে-ই বিপ্লবী হতে পারে।

সামগ্রিক উন্নয়নের পন্থাটা কি হবে স্বামীজীর মতে? সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে নিশ্চয়ই নয়! '...গোটাকতক শক্তিমান পুরুষ যা করছে, তা-ই হচ্ছে; বাকিগুলো খালি "ভেড়িয়া-ধসান" বই তো নয়। ও তোমার "পার্লেমেন্ট" দেখলুম, "সেনেট" দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল। ...অবশ্য ভোট-ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না, কিন্তু

৯। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition (1964), p. 213

রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নেই। ...যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিত হলে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো তো সেইখানেই মারা গেল...।'[১০] পশ্চিমী সংসদীয় গণতন্ত্রের ত্রুটিগুলো স্বামীজী আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সত্যি, কিন্তু তাই বলে তিনি আসলে গণতন্ত্রবিরোধী ছিলেন না। তিনি সূত্রাকারে একটি কথা বার বার বলেছেন ঃ স্বাধীনতাই হচ্ছে আত্মবিকাশের ভিত্তিভূমি। রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ভিন্ন কোন ব্যক্তি বা সমাজ বিকাশ লাভ করতে পারে না। তিনি বলতেন ঃ 'একটা কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে?'[১১] নিশ্চয়ই মানুষে আইন করে, কিন্তু সে কোন্ মানুষ? সমাজের উপরতলার অভিজাত, বিত্তবান, ক্ষমতাশালী শোষক-সম্প্রদায় নয়, আসল আইনপ্রণেতা হল সাধারণ মানুষ, মেহনতী জনতা, শ্রমজীবী, চাষী, মজুর। এরাই স্বামীজীর মতে Legislative Body, আইনসভার সদস্য। যে আইন জনগণের সমর্থন লাভ করে না, সে আইন আইন নয়। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর আর একটি সূত্র মনে রাখতে হবে। সেটি এই ঃ 'বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য—যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য; ঐকথা মনে থাকে না—গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।'[১২] স্বামীজীর মতে, সাধারণ প্রজাই সমস্ত শক্তির আধার। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভাবে এবং অতিমাত্রায় স্বার্থান্বেষী হবার জন্য জনসাধারণ পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করেছে এবং নিজেদের সকল ন্যায্য অধিকার থেকে নিজেরা বঞ্চিত হয়েছে। এই শক্তির আধার বা উৎস থেকে যে সম্প্রদায় যে পরিমাণে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে, সে সেই পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়বে। ইতিহাসের পাতা থেকে প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী উদ্ধার করে স্বামীজী এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। আর প্রশ্ন করেছেন ঃ 'যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে সর্বকালে "জঘন্যপ্রভবো হি সঃ" ...ভারতের সেই "চলমান শ্মশান", ভারতেতর দেশের "ভারবাহী পশু" সে-শূদ্রজাতির কি গতি?'[১৩]

শূদ্রজাতির বর্তমান দুর্গতি দেখে স্বামীজী নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েননি। বরং দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ঃ শূদ্রের অভ্যুত্থান একদিন হবেই হবে, কেউ একে রুখতে পারবে না। 'এই mass (জনসাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাদের ওপর তোদের (ভদ্রলোকদের) অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর civilization (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে।'[১৪]

১০। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১৬১-৬২

১১। তদেব, পৃঃ ১৬২ ১২। তদেব, পৃঃ ২৩৮ ১৩। তদেব, পৃঃ ২৪০

১৪। তদেব, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১০৯

কিন্তু এই ভেঙে দেওয়াটাই কি স্বামীজীর অভিপ্রেত ছিল? কখনই নয়। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্বগুলি যেমন স্বামীজীর অধিগত ছিল, তেমনি অপরদিকে ইতিহাস সৃষ্টি করার প্রচুর উপাদানও তাঁর অনুভবের মধ্যে ছিল। শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ তাঁর মতে অনিবার্য নয়। প্রকৃত শিক্ষার সাহায্যে, প্রেমের সাহায্যে শ্রেণীসঙ্ঘর্ষকে রোধ করা যায়।

স্বামীজী বলেছেন: 'জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একই ভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐ-রকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐকথা বুঝতে পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ...এখন ইতরজাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ।

'তাই তো বলি, তোরা এই mass (জনসাধারণ)-এর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলগে, "তোমরা আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ; আমরা তোমাদের ভালবাসি, ঘৃণা করি না।" তোদের এই sympathy (সহানুভূতি) পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞান-সহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা...আদানপ্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।'[১৫]

আশঙ্কা হতে পারে, নিম্নশ্রেণীর মানুষকে বিদ্যাশিক্ষা দিলে তারা আবার উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতো উন্নাসিক ও অলস হবে না তো? এই আশঙ্কার উত্তরে স্বামীজী বললেন: 'জ্ঞানোন্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে, জেলে জেলেই থাকবে, চাষা চাষই করবে। জাত-ব্যবসা ছাড়বে কেন? ...জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম যাতে আরও ভাল করে করতে পারে, সেই চেষ্টা করবে।'[১৬] অন্যত্র বলছেন: 'তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।'[১৭]

জ্ঞানোন্মেষ হলেও জেলে জেলেই থাকবে, শূদ্রকর্ম-সহিত শূদ্রাধিপত্য একদিন আসবেই—স্বামীজীর এসকল উক্তির বিশেষ তাৎপর্য আছে। শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ 'ঘরাঘরি লাঠালাঠি করে' উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা একদিন সব ধ্বংস হয়ে যাবে, এ ছিল স্বামীজীর দৃঢ়প্রত্যয়। কিন্তু তিনিও তো এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক সমাজ বা সর্বোদয়সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কাজেই, কোন সম্প্রদায়ের চরম বিনাশ তাঁর লক্ষ্য হতে পারে না। আবার সামাজিক চলমানতার (social mobility) ফলে নিম্নশ্রেণীর লোক প্রতিভা ও বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে চিরতরে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকুক, এটাও তাঁর কাম্য নয়। কাজেই, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে জ্ঞান বিতরণের কাজ

১৫। তদেব, পৃঃ ১০৮ ১৬। তদেব, পৃঃ ১০৯ ১৭। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪১

খুব আন্তরিকতার সঙ্গে করতে হবে। ইতিহাস পর্যালোচনা করে স্বামীজী দেখিয়েছেন যে, শূদ্রকে ধনসঞ্চয় এবং জ্ঞানার্জনের সুযোগ কোন কালেই দেওয়া হয়নি। 'পুরোহিত যে প্রকার সর্ববিদ্যা কেন্দ্রীভূত করিতে সচেষ্ট, রাজা সেই প্রকার সকল পার্থিবশক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে যত্নবান।'[১৮] স্বামীজীর মতে, বিদ্যা ও পার্থিব শক্তির কেন্দ্রীকরণ সমাজের শৈশবাবস্থায় প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু সমাজের যৌবনাবস্থাতেও যদি রাজশক্তি ও পুরোহিত-শক্তি সর্বস্তরে প্রাধান্য বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে রাজা-প্রজায় সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য। তাই স্বামীজী সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন ঃ 'শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।'[১৯]

স্বামীজী বলেছেন ঃ 'পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের একটি বিষম প্রত্যবায় আছে, সেটি গুণগত জাতি। ঐ গুণগত জাতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশেও প্রচার থাকিয়া শূদ্রকুলকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রজাতির একে বিদ্যার্জন বা ধনসংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই-একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হন, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন। তাঁহার বিদ্যার প্রভাব, তাঁহার ধনের ভাগ অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাঁহার নিজের জাতি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনের কিছুই পায় না।'[২০]

পুরাণ-ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবরজননীর পুত্র বেদব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ-দ্রোণ-কর্ণাদি প্রভৃতি সমাজের নিম্নস্থান থেকে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা ছিলেন বিদ্যা ও বীরত্বের আধার। এই উন্নয়নের ফলে নিম্নশ্রেণীর কি লাভ হল? স্বামীজীর প্রশ্ন ঃ 'তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর বা সারথিকুলের কি লাভ হইল বিবেচ্য।'[২১]

স্বামীজী সমস্যাটার গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। যদি নিম্নশ্রেণীর মানুষকে বিদ্যাদানের ফলে তাদের মধ্যে কেউ প্রতিভাবলে নিজ সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উচ্চশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই আত্মস্থ হয়ে যায়, তাহলে সমস্যা তো আরও জটিল হয়ে দাঁড়াবে, আর উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ব্যবধান দিনে দিনে আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই স্বামীজীর বক্তব্য হল, নিম্নশ্রেণীর মানুষ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে লীন হয়ে যাবে এটাও কাম্য নয়, আবার তারা উচ্চশ্রেণীর মানুষের যুগযুগান্তরব্যাপী অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে এটাও বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁর সুপারিশ হল, শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করে নিতে হবে। স্বামীজীর কাছে 'ব্রাহ্মণত্ব' একটি আদর্শ, বর্ণ জাতি বা সম্প্রদায় নয়। সেই ব্যক্তিই

১৮। তদেব, পৃঃ ২৩৬ ১৯। তদেব, পৃঃ ২৩৫
২০। তদেব, পৃঃ ২৪১-৪২ ২১। তদেব, পৃঃ ২৪২

ব্রাহ্মণ যে সকল স্বার্থবুদ্ধিকে বিনাশ করেছে, যে ত্যাগ এবং সেবার আদর্শে নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে, যার একমাত্র শক্তি হচ্ছে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বল। এই ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে যদি সমাজ পৌঁছাতে পারে, তাহলে আর দেশশাসনের জন্য পুলিস বা মিলিটারির প্রয়োজন হয় না।

শূদ্রশাসন কি সমাজে অবিমিশ্র মঙ্গল আনতে পারবে? স্বামীজী তা মনে করেন না। এই শাসনে সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নতি হবে, সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হবে এবং সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটবে। দোষের মধ্যে, এই শাসনের ফলে উচ্চতর সংস্কৃতি লুপ্ত হবে এবং বিরাট প্রতিভার আবির্ভাব ক্রমশই কমে আসবে। তাই স্বামীজী আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করলেন এই রকম ঃ 'যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব?'[২২] কার্যত, এমন একটি আদর্শ রূপায়িত করা যে কঠিন তা স্বামীজী নিজেই স্বীকার করেছেন। সেইজন্যই তাঁর দ্বিধাহীন ঘোষণা ঃ '...নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।'[২৩]

এই নতুন ভারতের স্বরূপটা কি? স্বামীজীর মূলমন্ত্র হল ঃ বর্জন নয়, গ্রহণ। স্বামীজীর নতুন ভারত বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করবে; সে ভারত হবে শোষণমুক্ত, উদার মানুষের সম্মেলনক্ষেত্র, সে মানুষ ত্যাগ ও সেবার ব্রতে দীক্ষিত, ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে সমবায়ের সমন্বয় সে ভারতের চিত্রকে উজ্জ্বলতর করে তুলবে, যেখানে ব্যষ্টির কল্যাণের সঙ্গে সমষ্টির কল্যাণের কোন বিরোধ থাকবে না। এই ভারতই হল স্বামীজীর স্বপ্নের ভারত। এই ভারতের জীবনদর্শন স্বামীজী এইভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ '...সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব।'[২৪]

প্রশ্ন হতে পারে, যে স্বামীজী 'জীবশিব'-বাদের উদগাতা, মানুষের অমৃতত্বের যিনি জয়গান গেয়েছেন, 'শিবোঽহম্' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্র গানের তানের মতো যাঁর সকল চিন্তায় দীপ্তিমান, তিনি কি সমষ্টির কাছে ব্যষ্টিকে বিসর্জন দেবার কথা বলছেন? তা মনে হয় না। তিনি যা বিসর্জন দেবার কথা বলছেন তা হল সঙ্কীর্ণ, স্বার্থময় 'আমি' বা 'কাঁচা আমি'। অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই ভাগবত-শক্তি সুপ্ত আছে, প্রত্যেক মানুষই মূলত সচ্চিদানন্দ। উপনিষদের শ্লোক স্মরণীয় ঃ

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥[২৫]

২২। তদেব, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৪৯-৫০
২৩। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮২ ২৪। তদেব, পৃঃ ২৩৮ ২৫। ঈশোপনিষদ্, ৬

—যিনি আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন, আবার সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। ফল কথা, জীবব্রহ্মবাদ গ্রহণ করলে অপরকে ঘৃণা করার অর্থ হয় নিজেকে ঘৃণা করা, অপরকে হত্যা করার অর্থ আত্মহত্যা। এ জিনিস কোন মানুষেরই অভিপ্রেত নয়। এই তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন ঃ 'যদি ভিতরে চলিয়া যাও, তবে এই একত্ব দেখিতে পাইবে—মানুষে মানুষে একত্ব, নর-নারীতে একত্ব, জাতিতে জাতিতে একত্ব, উচ্চ-নীচে একত্ব, ধনী-দরিদ্রে একত্ব, দেবতা-মনুষ্যে একত্ব, সকলেই এক ; যদি আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ কর—দেখিবে ইতর জীবজন্তুও—সবই এক। যিনি এইরূপ একত্বদর্শী হইয়াছেন, তাঁহার আর মোহ থাকে না। তিনি তখন সেই একত্বে পৌঁছিয়াছেন, ধর্মবিজ্ঞানে যাহাকে "ঈশ্বর" বলিয়া থাকে।'[২৬] এই দৃষ্টিতে ব্যষ্টি-সমষ্টির সম্পর্ক অনুভব করলে আর সংশয় থাকে না যে, সমষ্টির মঙ্গলের মধ্যেই ব্যষ্টির মঙ্গল নিহিত আছে।

স্বামীজী-প্রদর্শিত সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্যে পৌঁছাবার একমাত্র পথ সমাজের সর্বস্তরে প্রকৃত শিক্ষা বিতরণ। শিক্ষার লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন ঃ মানুষের স্বাভাবিক, অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতার সুষ্ঠু বিকাশের নামই শিক্ষা। এই শিক্ষার কোরক হচ্ছে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম বলতে এখানে জপ, তপ, হোম, উপবাস, মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি বুঝায় না। সেই লোকই ধার্মিক যার মনে আছে পবিত্রতা, যার হৃদয় ভয়শূন্য, যে নিজেকে অমৃতের সন্তান বলে জানে। এমনকি ব্যবহারিক শিক্ষা অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাও ধর্মের মাধ্যমে দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মনে শ্রদ্ধা, পবিত্রতা, নির্ভীকতা যদি না থাকে, তবে তাকে কোন শিক্ষাই দেওয়া যাবে না। শিক্ষার মাধ্যমে, আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে নিপীড়িত, নিঃস্ব জনসাধারণের মধ্যে যে ব্রহ্ম সুপ্ত রয়েছেন, তিনি আবার জেগে উঠবেন, এই ছিল স্বামীজীর জ্বলন্ত বিশ্বাস। প্রয়োজন একদল নিঃস্বার্থ সমাজসেবীর, বিশেষত সন্ন্যাসীর, যাঁরা সকল স্তরের মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রচার করবেন।

স্বামীজীর মতে প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। ভারতবাসীর জাতীয় উদ্দেশ্য মুক্তি বা পারমার্থিক স্বাধীনতা অর্জন। এই জন্যই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রে রাখতে হবে আধ্যাত্মিকতাকে। ভারতের প্রাণপাখিটা ধর্মে। 'সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে।'[২৭] আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে আমাদের জাতীয় শক্তি শুধু সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য নিয়োগ করলে চলে না? এ প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক। 'অগ্নি তো এক, প্রকার বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে। কিন্তু এই মহাশক্তির প্রেরণায় শতাব্দী-কতক নানা সুখ-দুঃখের ভেতর দিয়ে ফরাসী বা ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং তারই প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ। বলি,

---

২৬। বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৭৭-৭৮

২৭। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬০

আমাদের লাখো বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা, না তোমার বিদেশীর দু-পাঁচশ বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা? ইংরেজ কেন ধর্মপ্রাণ হোক না, মারামারি কাটাকাটিগুলো ভুলে শান্ত শিষ্টটি হয়ে বসুক না?

'আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১,০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে?'[২৮]

স্বামীজীর এ জাতীয় বহু উক্তি তাঁর রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এ থেকে একটিমাত্রই সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বামীজীর সমাজতন্ত্রবাদের মূল ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম। অধ্যাপক বিনয় সরকার এই মতকে রোমান্টিক সমাজতন্ত্রবাদ বলেছেন, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই সমাজতন্ত্রবাদে বিপ্লবের অবকাশ নেই বলে আক্ষেপ করেছেন। স্বামীজীর ইতিহাসচেতনার মূল কথাগুলি আর একবার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, হিংসাত্মক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে সমাজতন্ত্র আসে তা কল্যাণের হয় না। তার ফল স্থায়ী হয় না। কারণ তার ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে শ্রেণীবিদ্বেষের উপর, অবিমিশ্র ঘৃণার উপর। তিনি চেয়েছিলেন প্রেমের দ্বারা ঘৃণাকে জয় করতে। তাই দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর সতর্ক নির্দেশঃ 'দেখো যেন গরীব চাষী, শ্রমজীবী আর ধনিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে বোসো না।'[২৯]

॥ ৩ ॥

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁর প্রতি প্রণতি নিবেদন করতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেনঃ আমি স্বামীজীর গ্রন্থগুলি ভাল করেই পড়েছি এবং তাঁর রচনাবলী পড়বার পরে আমার দেশপ্রেম সহস্রগুণে বেড়েছে।

গান্ধীজীর কর্মময় জীবনের সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনি স্বামীজীকে অনেক বিষয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। তাঁর অস্পৃশ্যতাবর্জন আন্দোলনের মূলে স্বামীজীর প্রভাব সুস্পষ্ট। স্বামীজীর মতো গান্ধীজীও শূদ্রজাতির মধ্যে যে দেবত্ব সুপ্ত আছে তাকে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন। শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে গান্ধীজী আরও বিশদ ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, কায়িক পরিশ্রমে সকলকেই অংশগ্রহণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এবং রমণও বাদ যাবেন না। প্রত্যেকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা অর্জন করবেন। এই ছিল গান্ধীজীর লক্ষ্য। কিন্তু গান্ধীজীর অছিবাদের সাফল্য সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেন তাঁদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু অন্যতম। গান্ধীজী একদিকে বলেছেনঃ ঈশ্বর যেহেতু ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করেন না, মানুষের পক্ষেও তেমনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় না করে দিনের উপার্জন দিনেই ব্যয় করা উচিত। অপরপক্ষে তিনি জমিদার ও পুঁজিপতিদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করবার। শুধু তাদের কর্তব্য হবে নিজের প্রয়োজনের

২৮। তদেব

২৯। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VI, Seventh Edition (1963), p. 428

অতিরিক্ত সম্পদ সমাজের অন্যান্য লোকের মধ্যে বিতরণ করার জন্য নিজের কাছে গচ্ছিত রাখা। নেহরু প্রশ্ন করেছেন : আমাদের মধ্যে যাঁরা সর্বোত্তম তাঁদের প্রতি আমাদের এই আস্থা কি যৌক্তিক? তাছাড়া জনসাধারণ কি সত্যিই চায় যে এই জাতীয় জনহিতব্রতে উদ্বুদ্ধ অতিমানব তাদের মাথার উপর শাসন করুক?[৩০]

পুঁজিবাদের, সামন্ততন্ত্রের বিশ্লেষণে স্বামীজী আশ্চর্য রকমের ইতিহাসনিষ্ঠ। তাঁর বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক ধারা মার্কসবাদের বিশ্লেষণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বামীজী দেখিয়েছেন পুঁজিবাদী আমলে শোষণটা চলে নিঃশব্দে এবং এই শোষণ শ্রমিকের রক্ত শুষে নেয়। আরও বলেছেন : 'কোথায় ইতিহাসের কোন্ যুগে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত ও ধর্মধ্বজিগণ দীনদুঃখীর জন্য চিন্তা করিয়াছে?—তাহাদের ক্ষমতার জীবনীশক্তি ইহাদের নিষ্পেষণ হইতেই উদ্ভূত!'[৩১] গান্ধীজীর মন্তব্য এত তীক্ষ্ণ না হলেও এ জাতীয় কথা তিনিও বলেছেন। তাঁর মতে, ধনিক জমিদারশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী এক পরিবারভুক্ত হয়ে থাকবে। ধনিক হবে দরিদ্র শ্রমিকের অছি। আর স্বামীজীর মতে আমরা ইতিমধ্যে পর্যায়ক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শাসন দেখেছি। এখন চলছে বৈশ্যশাসন। কিন্তু এ শাসনের ধ্বংস অনিবার্য। শূদ্রের আধিপত্য অনিবার্য, কেউ একে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। শূদ্র-অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্যের সঙ্গে যাতে তার নতুন করে সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মকেন্দ্রিক প্রকৃত শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রেমের সেতু রচনা করতে হবে।

গান্ধীজীর উপরে স্বামীজীর প্রভাব অপরিসীম। এই প্রভাব সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন ছিলেন না তা নয়, তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, স্বামীজীর বইগুলি তাঁর দেশপ্রেম আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে স্বামীজী সমগ্র দেশে যে ব্যাপক প্রভাব রেখেছিলেন, তাতে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে বহু নেতাই স্বামীজীর চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। গান্ধীজী স্বামীজীকে যে পুরোপুরি অনুসরণ করেছিলেন তা নয়, নিজস্ব চিন্তাধারায় স্বামীজীর প্রভাব মেনে নিয়েও তিনি মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। গান্ধীজীর উপরে স্বামীজীর যেসব প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা যাক :

(১) স্বামীজীর বিপ্লবচিন্তার মৌলিকতা হল, তিনি বিপ্লবী-চরিত্র গঠন করার উপরে জোর দিয়েছেন। বিপ্লবীকে হতে হবে আত্মত্যাগী, চরিত্রশক্তিতে সমুজ্জ্বল আদর্শ মানুষ। গান্ধীজীর বিপ্লবচিন্তার প্রধান কথাও এটি। সর্বোদয়কর্মীর চরিত্র যদি আদর্শনিষ্ঠ না হয় তবে বিপ্লব ব্যর্থ হবে। তাই গান্ধীজী অহিংসা-ব্রহ্মচর্য-অস্তেয় ইত্যাদিকে মূলসূত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

(২) গ্রামে, দরিদ্রের কুটিরেই যে ভারতের জাতীয় জীবন লুকিয়ে রয়েছে—একথা স্বামীজী শুধু যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেই বুঝিয়েছেন তা নয়, ভারতীয়দের দৃষ্টিও সেদিকে

৩০। Evolution of the Political Philosophy of Gandhi—Buddhadeva Bhattacharyya, Calcutta Book House, Calcutta, 1969, pp. 244-45

৩১। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৫

টেনে নিয়ে গিয়েছেন। গান্ধীজীও এই নীতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে তাঁর সর্বোদয়বিপ্লবের কাঠামো রচনা করেছিলেন।

(৩) ভারতে যে-কোন আন্দোলনই ধর্মের মধ্য দিয়ে করতে হবে—স্বামীজীর এটি দৃঢ় অভিমত। গান্ধীজীও এই ধর্মকেই মেরুদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করলেন।

(৪) স্বামীজী চেয়েছিলেন—কর্মোৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য আর ধর্মসাধনে খাঁটি প্রাচ্য ঃ এইভাবে মানুষ গড়ে উঠুক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভাল দিকগুলির সম্মিলনে আদর্শ মানুষ গড়ে উঠুক। পাশ্চাত্যের কর্মতৎপরতার সঙ্গে মিলুক ভারতের শান্ত সংযত মন। গান্ধীজীও এই আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন। পাশ্চাত্যলোকের নিয়মানুবর্তিতা, সময়সচেতনতা ও কর্মতৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের সংযত জীবন কিভাবে মিলাতে হবে, তারই আদর্শ হিসাবে গান্ধীজী নিজের জীবনকে গঠন করলেন।

(৫) বর্ণব্যবস্থাকে (Caste system) স্বামীজী সমাজব্যবস্থা মনে করতেন, ধর্মীয় কোন অঙ্গ নয়। সমাজে সমবায়প্রথায় উৎপাদনের জন্য এবং পুরুষানুক্রমিক সংস্কারকে কাজে লাগানোর জন্যই এই বর্ণব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল—স্বামীজীর এই মতকে গান্ধীজীও মেনেছেন।

(৬) বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রনীতিকে মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে যাতে রাষ্ট্র-পরিচালনায় মানুষ আরও প্রত্যক্ষভাবে মতামত জ্ঞাপন করতে পারে—স্বামীজীর এই মতটিকে গান্ধীজী নিজের অন্যতম প্রধান ভাব বলে দাঁড় করিয়েছেন।

(৭) প্রাক্-স্বাধীনতাকালীন আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের ত্রুটি কোথায় সেকথা বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন, কংগ্রেসীরা গ্রামীণ লোকদের কাছে ডাকছে না এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে (বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ) দেশের লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না। জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীজী নেতা হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার পরে দেখা যায় যে, কংগ্রেস উপরোক্ত ত্রুটিগুলি দূর করার চেষ্টা করছে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে স্বাধীনতার জন্য জনগণকে উদ্দীপ্ত করা গান্ধীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

(৮) বিশ্বসভায় ভারতকে স্থান করে নিতে হবে এবং সমগ্র জগৎকে আত্মিক শক্তির মহিমা শেখাতে হবে—স্বামীজীর এই মতকে গান্ধীজীর জীবনে রূপায়িত হতে দেখা যায়।

মূল বিষয়গুলিতে গান্ধীজীর উপরে স্বামীজীর অপরিসীম প্রভাব সত্ত্বেও কতকগুলি বিষয়ে উভয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন ঃ

(১) গান্ধীজী অহিংসার উপরে অত্যধিক ঝোঁক দিয়েছেন। স্বামীজী অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ আচার মেনে নিয়েও একে বীরের ধর্ম বলেই গণ্য করেছেন। হিংসার উপর ভিত্তি করে কোন মানবনীতি বা রাষ্ট্রনীতি দাঁড়াতে পারে না ঠিকই, কিন্তু স্বামীজীর মতে ঃ বৌদ্ধযুগে অহিংসার অত্যধিক প্রচারে ভারতের ক্ষতিই হয়েছে। স্বামীজী তাই শক্তিসাধনার উপরে জোর দিয়েছেন। আত্মিক শক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু যতদিন তা অর্জন করা না যাচ্ছে ততদিন দৈহিক ও মানসিক শক্তির চর্চা পুরোমাত্রায় চালাতে হবে। অহিংসাকে স্বামীজী সর্বসাধারণের উপযোগী বলে মনে করতেন না।

(২) গান্ধীজী প্রগতি বলতে সামাজিক উন্নতিই মনে করতেন, যে উন্নতি ব্যষ্টির

উন্নতির উপর নির্ভরশীল। স্বামীজীর কাছে সামাজিক উন্নতি পথ মাত্র, লক্ষ্য নয়। মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যই সামাজিক উন্নতির প্রয়োজন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার বিকাশ যদি না হয়, মানুষ যদি সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগরিত করতে না পারে, তবে সে উন্নতির কোনও অর্থ নেই। স্বামীজী চেয়েছিলেন এমন এক শোষণমুক্ত সুন্দর সমাজ, যেখানে মানুষ তার স্বীয় শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ খুলে ধরতে পারে।

(৩) যন্ত্র ও বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার গান্ধীজীকে কিছুটা বিচলিত করেছিল। পাশ্চাত্য জগতের অত্যধিক যন্ত্রনির্ভর সভ্যতাকে তিনি অভিশাপ বলেই মনে করতেন। স্বামীজী কিন্তু বিজ্ঞানের এই প্রগতিকে সানন্দে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় পরিকল্পনায় তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমাদের চাই কি জানিস ?— স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি আর science (বিজ্ঞান) পড়ানো ; চাই technical education (কারিগরি শিক্ষা), চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে ; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।'[৩২] যন্ত্রনির্ভর সভ্যতাকে স্বামীজী আদর্শ মনে করেননি। তাঁর ইচ্ছে ছিল পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় ঔপনিষদিক জ্ঞানের মিলন ঘটুক। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মিটাতে পারলে সে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে মন দিতে পারবে।

(৪) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ের খুঁটিনাটি গান্ধীজী প্রায়ই বিশদভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। স্বামীজী কিন্তু জোর দিয়েছেন মানুষকে নির্ভীক স্বাবলম্বী ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী করার উপর। তাঁর মতে, মানুষ যখন এই তিনটি মৌলিক গুণের অধিকারী হবে তখন তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বলছেন তিনি ঃ 'আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটি যন্ত্র চালাইয়া যাইব—যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর পুরুষই হউক আর নারীই হউক—নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ এবং অন্যান্য জাতি জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা সকলে জানুক। বিশেষতঃ তাহারা দেখুক—অপরে এক্ষণে কি করিতেছে। তারপর তাহারা কি করিবে, স্থির করুক।'[৩৩]

(৫) গান্ধীজী যখন বলেন, মানুষকে পবিত্র করলেই সামাজিক গ্লানি দূর হবে, তখন তা স্বামীজীর মতেরই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। কিন্তু স্বামীজী আরও গভীরে ঢুকে এর বিশ্লেষণ করেছেন। স্বামীজীর আদর্শ সমাজ বস্তুবাদী সভ্যতার উপকরণ-প্রাচুর্যকে অবহেলা করার মূঢ়তা যেমন একদিকে পরিহার করবে, অন্যদিকে 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে' সমাজের পুনর্বিন্যাসে ব্রতী হবে। সমাজের প্রতিটি লোক একদিকে যেমন 'তত্ত্বমসি'কে অবলম্বন করে স্বকীয় শক্তির অসীম সম্ভাবনার প্রস্রবণ খুলে দেবে, অন্যদিকে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'-কে আশ্রয় করে নিষ্কাম সেবার হাত বাড়িয়ে দেবে প্রতিবেশীর দিকে। 'বনের বেদান্তকে ঘরে এনে' স্বামীজী সন্ধান দিয়েছিলেন ভাবী সমাজ ও জনসাধারণের প্রকৃতির। গান্ধীজী বলেছেন যে, বিবেকের অনুসরণ করেই

৩২। তদেব, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪০৩ ৩৩। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯১-৯২

মানুষ সমাজের কল্যাণ করবে। কিন্তু স্বামীজীর মতে, এই বিবেক ইউটিলিটারিয়ান (utilitarian) ধরনের নীতিবাদ হলে চলবে না, এর ভিত্তি হবে বেদান্তদর্শন। যা সর্বোচ্চ সত্য, তারই ব্যবহারিক দিক হবে এই বিবেক। 'পরের উপকারে নিজেরই উপকার'—এই দর্শনভিত্তিমূলক নীতিবাদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠবে ভাবী মানুষের বিবেক।

'ধর্ম ছাড়া রাজনীতি হতে পারে না'—গান্ধীজীর উক্তি। 'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন কর'—স্বামীজীর উক্তি। দুই মহাপুরুষের এই নির্দেশগুলি মেনে যদি আজ সমাজসেবীরা অগ্রসর হন, তাহলে সর্বোদয়সমাজ প্রতিষ্ঠা একেবারে অসম্ভব মনে হবে না। সমাজসেবার অভিযাত্রায় স্বামীজীর কথা বার বার স্মরণে রাখতে হবেঃ 'সমাজের একটা অঙ্গ পড়ে গেল। অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—এটা নিশ্চিত জানবি।'

যুগনায়ক ও দেশনায়ক ঃ স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র*

॥ প্রস্তাবনা ॥

ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে নরেন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ এবং বিংশ শতাব্দীতে সুভাষচন্দ্র থেকে নেতাজীর উত্তরণ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও যুগান্তকারী ঘটনা। বিবেকানন্দের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন আলোর দিশারী, বিভ্রান্ত নরেন্দ্রনাথের প্রাণে তিনি ছুঁইয়েছিলেন আগুনের পরশমণি আর সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের কাছ থেকে নেতাজী হবার বহ্নিবাণী। শুধু সুভাষচন্দ্র নন, বাংলাদেশের যে সমস্ত নরনারী বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষের মুক্তিস্বপ্ন দেখেছিলেন বা দেখতে চেয়েছিলেন, অল্পবিস্তর প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই বিবেকানন্দ ছিলেন প্রেরণাপুরুষ। এ আমার কথা নয়—এ মুক্তিসংগ্রামীদেরই স্বীকারোক্তি—ব্রিটিশ সরকারের গোপন নথিপত্রে প্রকাশিত হয়েছে এ তথ্য—এ এখন ইতিহাস। ভারতবর্ষে কমিউনিজমের প্রথম প্রবক্তা এবং প্রখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে অরবিন্দ এবং বিপিনচন্দ্র বিপ্লবাত্মক স্বাদেশিকতার প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার উৎস ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক স্বদেশভাবনা সেযুগের শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়কে একেবারে উদ্বেল করে তুলেছিল, তাদের অন্তরে স্বদেশপ্রেমের তীব্র বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করেছিল।[১] বলা বাহুল্য, সেসময়ে বাংলাদেশই ভারতের জাতীয় জাগরণের আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। সুতরাং সমসাময়িককালের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মানেই ছিল ভারতবর্ষ। স্বামীজীর জীবন এবং বাণী অবসন্ন, আত্মবিস্মৃত, পরাধীন জাতির নিস্তরঙ্গ জীবনে তেজ আর আলো এনে দিয়েছিল অন্তহীন উৎসরূপে। তিরোধানের আগে সমগ্র দেশকে বিস্ফোরণোন্মুখ একটি বারুদস্তূপে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু উপযুক্ত নেতার অভাবে দেশের রাজনৈতিক জগতে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল আর পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো ক্ষোভে দুঃখে রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছিল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের হৃদয়। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পক্ষে সক্রিয় রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ বেলুড় মঠের যে সংবিধান তিনি প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে রাজনীতি থেকে

---

* স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, বাণী, চিন্তা, কর্মতপস্যা এবং তাঁর সর্বন্ধর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ('সর্বন্ধর' কথাটি জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন) কিভাবে বর্তমান যুগের অন্যতম মুখ্য পুরুষ সুভাষচন্দ্রকে তাঁর বিচিত্র জীবনের চিন্তা ও কর্মে আজীবন সঞ্জীবিত এবং অনুপ্রাণিত করেছে তা বর্তমান প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তুত, বিবেকানন্দই যে তাঁর জীবনের মূল প্রেরণাপুরুষ একথা সুভাষচন্দ্র নিজেই বহু জায়গায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন।

১। দ্রষ্টব্য ঃ India in Transition—Manabendra Nath Roy, Nachiketa Publications Limited, Bombay, 1971, pp. 192-94

দূরে থাকার বিধান তিনিই দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের সেই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে তাঁর বিপুল ও দুর্নিবার দেশপ্রেম তাঁর চিন্তারাজ্যে সেদিন প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং তাঁর পক্ষে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া হয়তো অসম্ভব ছিল না—হয়তো ছিল অপরিহার্য। কিন্তু 'এ গ্রেট ম্যান নোজ হোয়েন টু ডাই অ্যাণ্ড হাউ টু ডাই'। মহাপুরুষরা নিজেদের জীবন এবং বাণীতে জাতিকে দিয়ে যান তাঁদের আদর্শ এবং করণীয় যা, তা হয়ে গেলে আর এক মুহূর্তও তাঁরা থাকেন না। থাকা চলে না। বিবেকানন্দ ছিলেন যুগপুরুষ—যুগনায়ক। তাই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্রহ্মবান্ধব, নিবেদিতা, অরবিন্দ এবং সদ্যোজাগ্রত ভারতবর্ষের দুর্বার যুবশক্তিকে তাঁর ভাবীকালের পরিকল্পনা এবং অনিবার্য দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি মহাপ্রয়াণ করলেন। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে ব্রহ্মবান্ধব, অরবিন্দ এবং নিবেদিতা হলেন স্বামীজীর উত্তরসাধক এবং তাঁদের রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থানের পর এলেন গান্ধীজী স্বামীজীর স্বদেশভাবনায় সঞ্জীবিত হয়ে এবং সবশেষে এলেন সুভাষচন্দ্র—স্বামীজীর উত্তরাধিকারের আগ্নেয় অভীপ্সা নিয়ে। সুভাষচন্দ্রের বাবা জানকীনাথ বসুর জন্ম ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, বিবেকানন্দের ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং আক্ষরিক অর্থেই সুভাষচন্দ্রকে বিবেকানন্দের উত্তরপুরুষ বলা যায়। সুভাষচন্দ্র বহুবার স্বীকার করেছেন এবং নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, বাল্যকাল থেকেই বিবেকানন্দের ভাবৈশ্বর্যে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুল থেকে সতীর্থ এবং সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন ঃ 'সুভাষের সঙ্গে আবাল্য খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। তাই আমি জোর করে বলতে পারি যে, বিবেকানন্দের প্রভাব যদি সুভাষের উপর না পড়ত তবে সুভাষ "সুভাষ" হত না—"নেতাজী" হত না। হয়তো অ্যাডভোকেট জেনারেল হত কিংবা ব্যারিস্টার হত, কিন্তু আই. এন. এ. যে ফর্ম করেছে সেই "নেতাজী সুভাষচন্দ্র"কে আমরা পেতাম না।'[২] দীর্ঘ সাতাশি বছরের প্রবীণ জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসের একজন বিদগ্ধ সাক্ষী। তিনি বলেছেন ঃ 'সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে আমার নিজের মনে হয়েছে, বিবেকানন্দের প্রভাব ছাড়া যে সুভাষচন্দ্রকে ভারতবর্ষ দেখেছে তার আত্মপ্রকাশ সম্ভবই ছিল না।'[৩] বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি লিখেছেন ঃ 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনে যে স্বামীজীর খুব বেশী প্রভাব ছিল নেতাজীর সহিত কথোপকথনে আমি তাহার বহু পরিচয় পাইয়াছি।'[৪] যৌবন এবং জীবনের পরবর্তী স্তরে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যে গুণগুলি দেখা গিয়েছে, যেমন—সাহস, সেবাপরায়ণতা, ত্যাগ, সংযম, নিয়মানুবর্তিতা, সংগঠনপ্রতিভা, দেশপ্রেম এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিক মানসিকতা—সেগুলির উন্মেষ হয়েছিল তাঁর জীবনের পূর্বাহ্ণেই

২। লেখকের নিকট স্বাক্ষরিত বিবৃতি (২।১।১৯৭৭)—টেপরেকর্ডেড সাক্ষাৎকার থেকে অনুলিখিত।

৩। লেখকের নিকট স্বাক্ষরিত বিবৃতি ঃ ৮।১১।১৯৭৬

৪। লেখকের নিকট প্রেরিত বিবৃতি ঃ ৪।৪।১৯৭৭

—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে। সেই অভিজ্ঞতার সম্পদ ও সঞ্চয় তাঁর জীবনের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল—প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেছিল। যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে তিনি ভাগ্যনির্দিষ্ট ছিলেন, যেন প্রথম থেকেই চলছিল তার জন্য আত্মপ্রস্তুতি। কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের বিবেকানন্দ-অনুরাগ, মূলত আবেগের মধ্যেই যার আত্মপ্রকাশ, পরবর্তীকালের নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিশীলিত ব্যক্তিগত জীবনে এবং পরিণত রাজনৈতিক জীবনে হয়ে উঠেছিল কর্ম, দর্শন, শক্তি, পরিকল্পনা এবং অনুপ্রেরণার প্রধান উৎসভূমি। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের পটভূমিকায় একদিন যখন তিনি অসহযোগ-আন্দোলনের একজন অবিসংবাদী নেতারূপে দেখা দিলেন এবং পরবর্তীকালে অল্প সময়ের ভিতরে বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রণপণ্ডিত সেনানায়করূপে সহসা আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন ঘটনার আকস্মিকতায় সমগ্র জগৎ মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু তাঁর অন্তরজীবনের খবর যাঁরা রাখতেন তাঁরা জানতেন যে, সে বিস্ময়ের বাস্তবায়নের সম্ভাবনা তাঁর কৈশোর এবং উন্মুখ যৌবনের গর্ভেই বীজাকারে সমাহিত হয়ে ছিল। বীজ থেকে মহীরুহ—তার মধ্যে কোথাও আকস্মিকতা কিছু নেই। সুভাষের সেই অন্তরজীবনের একজন ঘনিষ্ঠতম সাক্ষী চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাই যথার্থই বলেছেন : 'I. N. A. was actually born at Cuttack—কটকেই আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর জন্ম এবং তার উৎস স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী।'[৫]

তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার কয়েক বছর আগে সুভাষচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখছেন : 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী, তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাবে আমার জীবনের উন্মেষ। নিবেদিতার মতো আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের (স্বরূপের) দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁহাকে আমি নিশ্চয়ই গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব—একথা বলাই বাহুল্য।'[৬] স্বামীজীর সম্পর্কে নেতাজী কী অপরিসীম শ্রদ্ধা, কী গভীর ভালবাসা এবং কী প্রগাঢ় অনুরাগ পোষণ করতেন, তার আবেগময় স্বীকারোক্তি এই পত্রাংশটি। বাস্তবিক, স্বামীজীর কথা ভাবতে, বলতে অথবা লিখতে গেলেই সুভাষচন্দ্র 'আত্মহারা' হয়ে যেতেন।[৭] সুভাষচন্দ্র লিখেছেন : 'ত্যাগে বেহিসাবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন স্বামীজীর জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমনি বহুমুখী।...আমাদের জগতে এরূপ ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই বিরল। স্বামীজী ছিলেন পৌরুষসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ।... ঘণ্টার পর

৫। লেখকের নিকট বিবৃতি : ২।১।১৯৭৭

৬। দ্রষ্টব্য : জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী সুন্দরানন্দ, বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃঃ ৮

৭। ৬ মে ১৯৩২ সিওনি (মধ্যপ্রদেশ) সাব-জেল থেকে পুনার বিখ্যাত 'মারাঠা' (Mahratta) পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক এ. আর. ভাটকে লেখা ইংরেজি প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র একথা লিখেছেন। আমরা ঐ প্রবন্ধের সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়-কৃত বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করেছি। [দ্রষ্টব্য : সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪৬, পৃঃ ৩২৩]

ঘণ্টা বলে গেলেও সেই মহাপুরুষের বিষয় কিছুই বলা হবে না। এমনি ছিলেন তিনি মহৎ, এমনি ছিল তাঁর চরিত্র—যেমন মহান তেমনি জটিল।... আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণেই আশ্রয় নিতাম।'[৮] 'ব্যক্তি' বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ না মিললেও সুভাষচন্দ্র 'আদর্শ' বিবেকানন্দের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। বস্তুত, বিবেকানন্দ কোন ব্যক্তি নন, তিনি একটি আদর্শ, একটি প্রেরণা, লক্ষকোটি ভারতবাসীর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সাধনার মূর্ত প্রতীক। এবং সুভাষচন্দ্র যেখানে নিজেকে উৎসর্গ করেন সেখানে সামগ্রিকভাবেই করেনঃ 'Where I surrender, I do so with all my heart.'[৯]

জীবনের এক ক্রান্তিলগ্নে, যখন কিশোর সুভাষের অন্তর্জগতে এক 'বিষম ওলটপালট' শুরু হয়েছে, তিনি এক 'অসহ্য মানসিক অশান্তিতে' ভুগছেন, কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই তাঁর জীবনে বিবেকানন্দের নাটকীয় অনুপ্রবেশ। আত্মজীবনীতে সুভাষ লিখেছেনঃ 'Vivekananda entered my life'।[১০] ইতিপূর্বে স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস বালক সুভাষের মধ্যে প্রকৃতিপ্রেম, কাব্য ও সৌন্দর্যচেতনা, আদর্শবাদ এবং নীতিবোধকে জাগ্রত করে দিয়েছিলেন—জীবনে এক নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এমন কোন আদর্শের সন্ধান দিতে পারেননি যার উপর ভিত্তি করে সমস্ত জীবনটাকে গড়ে তোলা যায়, যা সমগ্র সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে।[১১] এদিকে মানসিক দ্বন্দ্বের যন্ত্রণাবিদ্ধ অভিজ্ঞতা ক্রমেই তাঁকে সংক্ষুব্ধ করে তুলছে। প্রকৃতি ও কাব্যের সৌন্দর্য তখন আর তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারছিল না। জীবনের মৌল উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে এক গভীরতর জিজ্ঞাসা তখন তাঁর অন্তর্জগতে সূচনা করেছে এক তীব্রতম ঝটিকার। এই সময়ে হঠাৎ একদিন তাঁর হাতে এল স্বামী বিবেকানন্দের রচনা।[১২] এবং 'কয়েক পাতা উলটেই', আত্মজীবনীতে সুভাষচন্দ্র লিখছেনঃ 'বুঝতে পারলাম এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। বইগুলো বাড়ি নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয়মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল।... দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময়

৮। সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পৃঃ ৩২৩-২৫

৯। Subhas Chandra Bose : Correspondence (1924-1932), Netaji Research Bureau, Calcutta, First Edition (1967), p. 403

১০। An Indian Pilgrim—Subhas Chandra Bose, Asia Publishing House, Calcutta, 1965, p. 33

১১। ভারত পথিক—সুভাষচন্দ্র বসু, সিগনেট প্রেস, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫৭), পৃঃ ৪৩

১২। সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, সুভাষচন্দ্রের হাতে যিনি বিবেকানন্দের বই তুলে দেন তাঁর নাম কৃষ্ণচন্দ্র সেন। তিনি অন্য স্কুলের একজন শিক্ষক। [সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন—সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৫৭, পৃঃ ২৮] সুভাষের আবাল্য সুহৃদ ও সহপাঠী চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ও সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মতকেই সমর্থন করেছেন। [লেখকের কাছে বিবৃতি] কিন্তু সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনীর মতে, সুভাষচন্দ্রের হাতে যিনি স্বামীজীর বই দিয়েছিলেন তিনি কৃষ্ণচন্দ্র সেন ছিলেন না, তাঁর নাম ছিল সুহৃদচন্দ্র মিত্র। [ভারত পথিক, পৃঃ ৪৩]

হয়ে রইলাম।... বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল।... তাঁর মধ্যে আমার মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম।'[১৩] যে আদর্শকে পাওয়ার নেশা যৌবনের প্রত্যুষে সুভাষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল সেই 'আদর্শের সন্ধান দিলেন বিবেকানন্দ'।[১৪] এ এক পরম প্রাপ্তি—যেন এক বিরাট আবিষ্কার! বিভ্রান্ত সুভাষের সামনে যেন গর্জে উঠল ভারতের 'বিরাট প্রাণপুরুষের'[১৫] বজ্রবাণী : 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—Arise ! Awake ! and stop not till the goal is reached.' তারপর সেই দৃপ্ত, বলিষ্ঠ ঘোষণা : 'I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute ; I am He, I am He !'

জমাট অন্ধকার ভেদ করে যেন হঠাৎ ঝলসে উঠল একটি তেজোময় আলোর শিখা, যার দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল ভাবীকালের এক মহাসৈনিকের মানস দিগন্ত। যুগপুরুষের হস্তধৃত দীপাবলীর আলোর আশীর্বাদে ভবিষ্যতের দেশনায়কের[১৬] আন্তর তমিস্রা নিমেষে হল দূরীভূত। একটার পর একটা খুলে গেল জ্যোতির তোরণ। জীবন থেকে জীবনে, প্রদীপ থেকে প্রদীপে 'আত্মাজাগানিয়া'র[১৭] হৃদয়ের অগ্নি এভাবে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে—গোষ্পদে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে মুহূর্তে মহাসাগরের ব্যঞ্জনা। নিবেদিতা বলেছেন, তিনি প্রাণের শিখা জ্বালিয়ে দিতেন। '...he knew how to light a fire. Where others gave directions, he would show the thing itself.'[১৮]

বয়সের তুলনায় সুভাষের মানসিক পরিপক্বতা এসেছিল অনেক আগেই। আচার্য বেণীমাধবের কাছে যে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁর মানসিক উত্তরণে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। খেয়ালী প্রকৃতির বিচিত্র ও গোপন সৌন্দর্য কিশোর সুভাষের চোখে এক অপূর্ব মহিমায় প্রতিভাত হয়েছিল। প্রকৃতির সঙ্গ তাঁকে সমাহিতচিত্ত করে তুলেছিল। যার ফলে তিনি ক্রমশ হয়ে উঠছিলেন নির্জনতাপ্রিয় এবং আত্মভাবনায় উদ্বুদ্ধ। সুভাষের অন্তরে এল গভীরতর জিজ্ঞাসা—জীবনের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য কি? কিসে জীবনের সার্থকতা—ত্যাগে, না ভোগে? প্রকৃতির সঙ্গ তাঁর প্রাণে একটি কাব্যিক প্রেরণাও জাগিয়ে দিয়েছিল। ফলে, ব্যাস ও বাল্মীকি, কালিদাস ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রতি তিনি বোধ করতেন এক অনিবার্য বিহ্বল আকর্ষণ। অপরদিকে যৌবনোন্মুখ সুভাষের জীবনে তখন সবে উন্মেষ হচ্ছে স্বাভাবিক এক জৈবিক চেতনার যার সঙ্গে তাঁর সদ্যোমুকুলিত নৈতিক চেতনার হল এক তীব্র সঙ্ঘাত। অন্যান্যদের পক্ষে যা ছিল স্বাভাবিক সুভাষের জীবনে তা-ই এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি হিসাবে দেখা দিল। কারণ বেণীমাধবের

১৩। ভারত পথিক, পৃঃ ৪৩-৪   ১৪। তদেব, পৃঃ ৪৩

১৫। কথাটি অরবিন্দ স্বামীজীর সম্পর্কে ব্যবহার করেছেন। [দ্রষ্টব্য : ভারতপুরুষ-শ্রীঅরবিন্দ—উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৫০, পৃঃ ৪০]

১৬। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্রকে 'দেশনায়কের' পদে বরণ করেন। [রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পৃঃ ৩৮৭-৯০]

১৭। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছেন 'The Awakener of Souls'—আত্মাজাগানিয়া। দ্রষ্টব্য : [The Master as I saw him—Sister Nivedita, Udbodhan Office, Calcutta, Twelfth Edition (1977), p. 82]   ১৮। The Master as I saw him, p. 82

প্রেরণায় সুভাষের পরিশীলিত চেতনা কিশোর সুভাষকে তাঁর বয়সের বেড়া ডিঙিয়ে ভাবতে শিখিয়েছে। এ-সম্পর্কে আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন: 'আমাকে আর দশজনের মতো ভাবলে ভুল করা হবে, কারণ আমার মনের গড়নটা ছিল বেশ একটু অস্বাভাবিক ধরনের। আমি যে শুধু আত্মকেন্দ্রিকই ছিলাম তা নয়, অনেক দিক দিয়ে অকালপক্বও ছিলাম। এর ফলে, যে বয়সে আমার ফুটবল মাঠে সময় কাটাবার কথা সেসময়ে আমি বসে বসে গুরুগম্ভীর নানারকম সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতাম।'[১৯] বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং নবজাগ্রত নৈতিক চেতনার সঙ্গে তার সঙ্ঘর্ষ কিশোর সুভাষের পক্ষে 'অত্যন্ত প্রাণান্তকর' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক এই সময়ে বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী তাঁকে উদ্বেল অথচ আত্মস্থ করে তুলল এক অব্যক্ত প্রেরণায়। 'Subhas saw light. His inward conflict was at an end, and a new ideal inflamed his soul.'[২০]

॥ ১ ॥

বিবেকানন্দের আদর্শের সঙ্গে যখন সুভাষ পরিচিত হলেন তখন তাঁর বয়স বছর 'পনেরও' হবে কিনা সন্দেহ। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেই আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের বিশালতাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ অথবা সম্যক উপলব্ধি করার ক্ষমতা সুভাষের ছিল না,[২১] কিন্তু বিবেকানন্দের পৌরুষদীপ্ত চেহারা, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা এবং ওজস্বী চিঠিপত্রের এমন একটি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল যা সুভাষের তরুণ মনে 'চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গিয়েছিল'।[২২] ক্রমশ বিবেকানন্দই হয়ে উঠলেন তাঁর কাছে 'আদর্শ পুরুষ'।[২৩] বিবেকানন্দের 'ideal' হল তাঁরও 'ideal'।[২৪] স্কুলে সুভাষের সেই সব বন্ধু বা শিক্ষকদেরই পছন্দ হত যারা ছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুরাগী।[২৫]

বিবেকানন্দ থেকে ক্রমে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীর প্রতি সুভাষ আকৃষ্ট হলেন।[২৬] রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, আত্মসংযম ছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব। তাঁর উপদেশের মূল কথা—কামকাঞ্চন ত্যাগ—যে জৈবিক প্রবৃত্তির দিকে মানুষের

১৯। ভারত পথিক, পৃঃ ৪১ ২০। Story of the I.N.A.—S. A. Ayer, 1972, p. 6

২১। সুভাষচন্দ্র অবশ্য আজীবনই মনে করতেন যে স্বামীজীর 'সুগভীর, জটিল ও ঋদ্ধি-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব'কে উপলব্ধি করা একটি দুরূহতম ব্যাপার। 'মারাঠা' (Mahratta) পত্রিকার অন্যতম সম্পাদকের কাছে প্রেরিত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন (৬ মে ১৯৩২): 'খুব কম লোকের পক্ষে—এমনকি তাঁর (অর্থাৎ স্বামীজীর) সংস্পর্শে থাকার সুবিধা যাঁদের হয়েছিল তাঁদের পক্ষেও তাঁর সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা বা তাঁকে গভীরভাবে বুঝতে পারা অসম্ভব বলেই মনে করি।' [দ্রষ্টব্য: সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পৃঃ ৩২৩] ১৩৩৭ সালে বেলুড় মঠে স্বামীজীর 'ঊনসপ্ততিতম জন্মতিথি উৎসবে' সভাপতির অভিভাষণেও সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন: 'স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার ব্যাখ্যা করা বড় কঠিন।' [দ্রষ্টব্য: বিশ্ববিবেক—সম্পাদনা: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শঙ্কর, বাক্-সাহিত্য, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৭৩), পৃঃ ১৯৩]

২২। ভারত পথিক, পৃঃ ৪৪ ২৩। তদেব

২৪। পত্রাবলী—সুভাষচন্দ্র বসু, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৬৮), পৃঃ ৪১ ২৫। ভারত পথিক, পৃঃ ৪৫ ও ৫৬ ২৬। তদেব, পৃঃ ৪৪

স্বাভাবিক আকর্ষণ তার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে তাকে একটি মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা। বিবেকানন্দও বলেছেন, আত্মশক্তির উদ্বোধন করতে হলে চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন। তাঁদের আদর্শকে সুভাষ জীবনের 'মূলমন্ত্র' হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।[২৭] কটক, কলকাতা, কেমব্রিজ এবং জীবনের পরবর্তী স্তরগুলিতে সুভাষচন্দ্র তাঁর চরিত্রের চারিদিকে একটি নৈতিক দীপ্তির দুর্ভেদ্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। কামনার বিলোল তরঙ্গ সেখানে প্রতিহত হয়ে ফিরে যেত—কোন বিক্ষোভ, কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারত না তাঁর অন্তরে—আর করলেও তাকে অবদমন করার ক্ষমতাও তিনি অর্জন করেছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কল্যাণে। 'অবিদ্যারূপিণী মহামায়া'র[২৮] দৃষ্টি নরেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পবিত্রতার জ্বলন্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি। তাঁর শিবনয়নের অগ্নিবৃষ্টিতে অবিদ্যারূপিণীর দৃষ্টির আবিলতা মুহূর্তে দগ্ধ হয়ে যেত। যৌবনে বন্ধুসমাজের প্রাণস্বরূপ নরেন্দ্রনাথের সামনে কোন বন্ধু হালকা রসিকতা করারও সাহস পেত না। তাঁর এক যৌবনসহচর বলেছেন ঃ 'নরেনের ভেতর থেকে যেন একটা আধ্যাত্মিক তেজ ফুটে বেরোত, তার কাছে তিষ্ঠানো যেত না।'[২৯] স্বামীজীর এই চারিত্রিক তেজ ও শুভ্রতাই ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রেরণা ও শক্তির উৎস। সুভাষের উপস্থিতিতে তাঁর কোন বন্ধুর ইতরজনোচিত ঠাট্টা-ইয়ারকি করার সাহস হত না। সুভাষবন্ধু দিলীপকুমার রায় লিখেছেন ঃ কেমব্রিজে তাঁদের একজন পাঞ্জাবী যুবক বন্ধু যিনি অশ্লীল আলোচনায় অত্যধিক মাত্রায় উৎসাহী ছিলেন, তিনি সুভাষের সামনে একেবারে নিস্তেজ হয়ে থাকতেন।[৩০] সুভাষ 'সর্বান্তঃকরণে' বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের ব্রহ্মচর্যের বিধিনিষেধের সত্য সার্বকালিক ও সার্বজনীন। 'এ-বিশ্বাস যে ওর মনে শিকড় গেঁথেছিল সেও স্বামী বিবেকানন্দেরই উদ্দীপনায়। নইলে হয়তো ও বিলেতে এসে বিলিতি মেয়েদের সংস্পর্শ এত সাবধানে বর্জন করে চলত না।'[৩১] যৌবনে বন্ধুদের চোখে তিনি প্রতিভাত হয়েছিলেন 'শক্তির স্তম্ভ, পবিত্রতার পরম গৌরব' হিসাবে।[৩২]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত সুভাষ কৈশোরেই ধ্যান এবং যোগাভ্যাস শুরু করেছিলেন। যোগ আর সাধনার ভিতর দিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী তাঁর কাছে এক নতুন প্রেরণার ইঙ্গিত ও দ্যোতনা বহন করে নিয়ে আসে। কিশোর সুভাষ বোধ করলেন যোগ অভ্যাস করে তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসংযম আগের চাইতে অনেক বেড়ে গিয়েছে।[৩৩] এই সময় বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সন্ন্যাসিসঙ্গ-কামনা সুভাষের মধ্যে খুব তীব্র হয়ে ওঠে। সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির কোথাও এসেছেন একবার খোঁজ পেলেই ছুটতেন সেখানে। চেষ্টা করতেন তাঁদের অন্তরঙ্গ

২৭। তদেব, পৃঃ ৬৬

২৮। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৪৯ ২৯। তদেব, পৃঃ ৮৪

৩০। আমার বন্ধু সুভাষ—দিলীপকুমার রায়, মিত্রালয়, কলিকাতা, পৃঃ ৩৩

৩১। স্মৃতিচারণ—দিলীপকুমার রায়, ১৩৬৭, পৃঃ ৩৩৯

৩২। আমার বন্ধু সুভাষ, পৃঃ ৩৭ ৩৩। ভারত পথিক, পৃঃ ৪৯

হতে। তাঁদের কেউ বাড়িতে এলে তাঁকে যথাসাধ্য দান করে বালক নরেন্দ্রনাথের মতো সুভাষও মনে এক অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পেতেন।[৩৪] তাঁদের মধ্যে অবশ্য যাঁরা সংসারত্যাগী এবং ভোগবিমুখ তাঁরাই তাঁকে আকর্ষণ করতেন বেশী।[৩৫] ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় যখন তিনি পড়তে এলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন এই প্রবণতা আরও বেড়ে গেল। শুধু সন্ন্যাসিসঙ্গই নয়, নিজে সন্ন্যাসজীবন যাপনের জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে লাগলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের ছুটিতে কলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে হুগলী নদীর ধারে শান্তিপুরে কয়েকজন বন্ধুসহ গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী হয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে এলেন।[৩৬] তাঁর বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকজন ছিলেন যাঁরা পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, যেমন, হেমন্তকুমার সরকার, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।[৩৭] সুভাষের রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি এঁদের কাছে। বন্ধুদের মধ্যে সবাই ছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত। সুভাষচন্দ্র এই বন্ধুগোষ্ঠীকে 'নিও-বিবেকানন্দ গ্রুপ' বলে অভিহিত করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। শান্তিপুরে তাঁরা সন্ন্যাসজীবনের সব রকম কৃচ্ছ্রতাই অভ্যাস করেছিলেন। যেমন ডিসেম্বরের শেষরাত্রে উঠে গঙ্গার ঠাণ্ডা জলে আকণ্ঠ গা ডুবিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো, ইত্যাদি।[৩৮] কলকাতায় যখন তাঁরা ফিরে এলেন তখন তাঁদের দেখে মনে হল 'প্রত্যেকে যেন এক-একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—সন্ন্যাসী হওয়ার জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞা সকলের চোখে মুখে'।[৩৯] স্বামীজীর আদর্শে ক্রমশ তরুণ সুভাষ এত বেশী অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েছিলেন যে, সমস্ত বাধানিষেধ, স্নেহপ্রীতির বন্ধন তুচ্ছ করে এক বন্ধুর সঙ্গে ঘরছাড়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন হিমালয়ের পথে।[৪০] তখন তিনি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। কিছুদিন পরে অবশ্য

৩৪। তদেব, পৃঃ ৫২ ৩৫। তদেব, পৃঃ ৫০

৩৬। তদেব, পৃঃ ৭৫ ; জীবন প্রবাহ—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩০ ?), পৃঃ ১৯০-৯১ এবং সুভাষের সঙ্গে বারো বছর : ১৯১২-২৪—হেমন্তকুমার সরকার, ১৯৪৬, পৃঃ ২১-৩

৩৭। সুভাষের সঙ্গে বারো বছর (পৃঃ ১৯-৩৬) এবং সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী 'জীবন প্রবাহ' গ্রন্থে (পৃঃ ১৭০-৭১ এবং ১৯০-৯৪) স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত সুভাষের ঐ সময়কার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ লেখককে তাঁর স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে (১৭।১০।১৯৭৬) জানিয়েছেন : '১৯১৩ সালে কলকাতায় সুভাষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তখন সুভাষের বয়স বছর ষোল এবং আমার নিজের একুশ। ...ঐ সময়ে সুভাষের মধ্যে চারটি জিনিস আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলাম : রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দের প্রতি তার গভীর আবেগময় ভক্তি, ধর্মভাব, সেবাপরায়ণতা এবং নির্ভীকতা। পরবর্তীকালেও তার এই গুণগুলি অটুট ছিল এবং আরও বিকশিত হয়েছিল। সুভাষের অন্তর্জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন যে শেষোক্ত তিনটি চারিত্রিক গুণের বিকাশের মূলে যে প্রেরণাটি সক্রিয় ছিল তা হল, আমি যার প্রথমেই উল্লেখ করেছি, সুভাষের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগ।' শান্তিপুরের দলে প্রফুল্লচন্দ্র এবং হেমন্তকুমারও ছিলেন। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরও যাওয়ার কথা ছিল ; কিন্তু অপরিহার্য কারণবশত তাঁকে 'এই সাধুসঙ্গের অপূর্ব সুযোগ' থেকে 'বঞ্চিত' হতে হয়েছিল। প্রফুল্লচন্দ্র লেখককে বলেছেন দলে হরিপদও ছিলেন। তবে তিনি বলেছেন যে দলে সবাই গেরুয়া পরলেও তিনি নিজে (অর্থাৎ প্রফুল্লচন্দ্র) পরেননি। ৩৮। জীবন প্রবাহ, পৃঃ ১৯১ ৩৯। তদেব, পৃঃ ১৯৩

৪০। ভারত পথিক, পৃঃ ৮৫। সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনীর মতে বন্ধুটি হলেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। হরিদ্বারে হেমন্তকুমার সরকার এসে যোগ দেন।

তাঁকে ঘরে ফিরে আসতে হয়েছিল,[৪১] কিন্তু সন্ন্যাসজীবনের প্রতি তথা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি ছিল তাঁর আজীবন আকর্ষণ এবং বলা বাহুল্য, এই আকর্ষণের প্রেরণাগোমুখী ছিলেন বিবেকানন্দ। সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে তীব্র তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সে যাত্রায় ফিরে আসার পরেও কিন্তু তাঁর ঐ আধ্যাত্মিক মানসিকতায় বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। তাই ফিরে আসার পরেই যখন শুনলেন যে একজন জ্যোতিষী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'contrary influence-এর জন্য সে সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না—সংসারী হইবে'—তিনি বন্ধু হেমন্ত সরকারকে লিখলেন (১৯।৬।১৯১৪): 'তাঁর মাথায় লাঠি। তিনি কচুপোড়া জানেন।'[৪২] এর ঠিক দু-মাস পরে (২১।৮।১৯১৪) হেমন্তকে আবার লিখছেন ঃ 'আমার নিজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং হৃদয়ে অনন্ত শক্তি।...আর আমার শক্তি বেশী এইজন্য যে কাহাকেও তিলমাত্র care করি না—so long I was a sannyasi in disguise—now I am going to be a full-fledged sannyasi...গৃহত্যাগ করিতে হয় তাহাও করিব আনন্দের সহিত।'[৪৩] দার্জিলিঙ থেকে আর একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন (২০।১১।১৯১৫)ঃ 'চারিদিকে পাহাড়, খালি পাহাড়—আর অভ্রভেদী হিমশিখর শুভ্রতুষার কিরীটী কাঞ্চনজঙ্ঘা'। কত সুন্দর এ স্থান! ভাবিতে গেলে চোখে জল আসে। গগনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শুভ্রতুষারময় গিরিমালা...। বহুদূরে পর্বতগাত্রে লামাদের বৌদ্ধ মঠ আছে, Extreme individualistic life যাপন করিতে গেলে পরিব্রাজকের জীবনের মতো এত আনন্দময় জীবন নাই। ইচ্ছা করে পাহাড় দিয়ে সিকিম নেপাল চলিয়া যাইতে। তিব্বত যাইবার পথ আছে।...কিন্তু পরিব্রাজকের জীবনযাপনে বর্তমান যুগে বঙ্গীয় যুবকের সাজায় না। তার স্কন্ধে গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে। ...আমার জীবন enjoyment-এর জন্য নহে—my life is a mission—a duty। (তাঁর প্রতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ ছিল—প্রচলিত সন্ন্যাসজীবন নয়, অন্তরে বৈরাগী থেকে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করতে হবে তাঁকে। মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ প্রেরণার বীজ তখন সুভাষের চিন্তায় অঙ্কুরিত

৪১। সুভাষ ঘরে ফিরে এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই এবং তৎকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের পরামর্শে। [সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, পৃঃ ৩৬] স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন বারাণসীতে ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী নির্বাণানন্দের মুখে শুনেছি, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সুভাষকে বলেছিলেন যে সন্ন্যাস তাঁর ক্ষেত্র নয়, তাঁর জীবন ব্যয়িত হবে অনলস দেশসেবায়। দেশসেবার ক্ষেত্রে তাঁকে ভবিষ্যতে এক বিরাট এবং চিহ্নিত ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, সেকথাও তিনি বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, অন্তরে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা থাকলেও দেশপ্রেমই হবে তাঁর জীবনের প্রধান প্রেরণা। অথচ সুভাষের মনে তখন আধ্যাত্মিকতার ভাবই প্রবল। দেশসেবার কোন স্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে তখন আসেইনি। কিন্তু মহাপুরুষের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি যে কত অভ্রান্ত তা কয়েক বছর পরেই প্রমাণিত হয়েছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দের 'কৃপা' এবং পরামর্শেই যে তাঁর জীবনের গতি বদলে গিয়েছে সেকথা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সুভাষ পরবর্তীকালে বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন। [স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩২৭ ও ৩৩৫] সে যাত্রায় উত্তর ভারতের অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে সুভাষের খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং তাঁর বৈরাগ্যপূত ঈশ্বরতন্ময় জীবন ও আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে সুভাষ এক অপরিসীম শ্রদ্ধা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। [পত্রাবলী, পৃঃ ৫৬] পরবর্তীকালেও সে শ্রদ্ধা তাঁর অটুট ছিল। [লেখকের নিকট চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবৃতি]

৪২। পত্রাবলী, পৃঃ ৪০ ৪৩। সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, পৃঃ ৪৭

হতে শুরু করেছে) ...বাস্তবিক হিমাচল প্রদেশ দেবতার বাসস্থান—স্বর্গ। আমাদের এক অজ্ঞ পাচক-ঠাকুর কার্সিয়ং-এ কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—"ঐ দিকে স্বর্গ"। সকলে তার কথা শুনিয়া হাসিল। আমি কিন্তু মনে করিলাম তার কথা metaphorically সত্য।'[৪৪] কেমব্রিজ থেকে লেখা (২৩।৩।১৯২০) অপর একটি চিঠিতে লিখছেন : 'তোমার দীর্ঘ পত্রে অনেক সত্য কথা আছে। তবে দুইটা বিষয়ে ঠিক বল নাই। (প্রথমত) আমাকে সন্ন্যাসী বলিলে আমি এখনও চটি না। আমি এখন সন্ন্যাসী নামের অযোগ্য হইতে পারি—কিন্তু সন্ন্যাসী বলিলে আমি এখন পূর্বের ন্যায় গৌরব অনুভব করি।'[৪৫] I.C.S. থেকে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়ে বন্ধু চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখছেন (২২।৪।১৯২১) : 'কি করব এখনও ঠিক করতে পারিনি। একবার ইচ্ছে হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবো।'[৪৬] সুভাষের আধ্যাত্মিক মানসিকতার এক আশ্চর্য দলিল আলোচ্য চিঠিখানি। অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে তিনি লিখছেন : 'তুমি জান কর্তব্যের আহ্বানে একবার জীবনতরী ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। সেই তরী এখন রম্যকাননে উপনীত হয়েছে যেখানে Power, Property, Wealth আমার করতলগত। কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে সাড়া আসছে—"তোমার এতে আনন্দ নাই। তোমার একমাত্র আনন্দ সাগরের ঊর্মিমালার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেড়ানো।"* সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ তাঁরই হাতে জীবন-তরী ভাসিয়ে দিলাম। তিনি জানেন, এ তরী কোথায় পৌঁছবে।'[৪৭] বিবেকানন্দের আদর্শ তাঁর অন্তরে অহরহ বৈরাগ্যের প্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখেছিল। সেই আদর্শই ছিল তাঁর শক্তির উৎস, তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : 'সুভাষচন্দ্রকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ...তাইতো সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় মাত্র আট মাসের চেষ্টায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েও নিজেকে বিদেশী শাসনের দাসত্বে আবদ্ধ করতে পারেননি। বাঙ্গালীর সেই ঈপ্সিত পদ, অর্থ, সম্মান সব তিনি অবহেলায় এক মুঠো ধুলোর মতো পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন।'[৪৮]

পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও তাঁর এই মিস্টিক মানসিকতা, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি এই নস্ট্যালজিয়া অম্লান হয়ে বর্তমান ছিল। নেতাজীর বিশ্বস্ত সহকর্মী এবং আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রচারমন্ত্রী আইয়ার লিখেছেন : '*Sannyasi* was writ large on his forehead even when the Supreme Commander's cap rested majestically on his head at an alluring angle over his right brow.'[৪৯] সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর যখন সদর কার্যালয়, সেই সময় নেতাজী প্রায়ই রাত্রি গভীর হলে কাউকে জানতে না দিয়ে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে যেতেন এবং পট্টবস্ত্রে

৪৪। পত্রাবলী, পৃঃ ৬৪-৫ ৪৫। তদেব, পৃঃ ৯২ ৪৬। তদেব, পৃঃ ১১৫

* এই কথাগুলির সঙ্গে স্বামীজীর 'The Song of the Sannyasin' কবিতার একটি পঙ্‌ক্তির শব্দগত মিল লক্ষণীয় : 'Like rolling river free/Thou ever be.

৪৭। পত্রাবলী, পৃঃ ১১৫ ৪৮। সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন, পৃঃ ৫৫

৪৯। Unto Him a Witness—S. A. Ayer, Thacker & Co. Ltd., Bombay, First Edition (1951), p. 268

দেহ আবৃত করে 'shut himself up in the prayer room, rosary in hand, and spent a couple of hours in meditation'।[৫০] অনেক সময় আবার রাত্রে খাওয়ার পর নেতাজী তাঁর নিজের গাড়িটি সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠাতেন তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্বরানন্দকে তাঁর বাসভবনে নিয়ে আসার জন্য এবং তিনি এলে তাঁর সঙ্গে একাকী দু-ঘণ্টা বা তারও বেশীক্ষণ ধরে নানা আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ করতেন। কোন কোন দিন তাঁদের আলোচনা মধ্যরাত্রি অতিক্রম করত।[৫১] স্বামী ভাস্বরানন্দ এগুলির সঙ্গে একদিনের একটি চিত্র সংযোজন করেছেন। সেদিন ছিল সারদাদেবীর পুণ্য জন্মতিথি। ভাস্বরানন্দজী মন্দিরে পূজারত। নেতাজী সেদিন মিশনে এসেছিলেন এবং মন্দিরে গিয়ে অনেকক্ষণ 'ধ্যানাবিষ্ট' ছিলেন। যতক্ষণ পূজা চলল ততক্ষণ তিনি সেখানে ছিলেন। পূজার পরে প্রসাদ গ্রহণ করে 'প্রায় এক ঘণ্টা' তিনি মহারাজের সঙ্গে ধর্মালোচনা করলেন। তারপর একখানা 'চণ্ডী'র জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় মহারাজ তাঁর নিজের চণ্ডীখানি তাঁকে উপহার দিলেন। নেতাজী এতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।[৫২] বলা বাহুল্য, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই রামকৃষ্ণ মিশন এবং মিশনের সাধুদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। মিশনের সেবামূলক কাজকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং দেশের সর্বত্র তার প্রসার কামনা করতেন।[৫৩] আইয়ারের গ্রন্থ এবং স্বামী ভাস্বরানন্দের সংযত স্মৃতিচারণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর চেয়ে বয়সে তিন-চার বছরের ছোট স্বামী ভাস্বরানন্দের

৫০। ibid., p. 269 ৫১। ibid.

৫২। দ্রষ্টব্য ঃ স্বামী ভাস্বরানন্দের 'শোনানে (সিঙ্গাপুরে) নেতাজী' শীর্ষক প্রবন্ধ, উদ্বোধন, ৫১ বর্ষ, পৃঃ ৬৫ এবং Subhas Chandra Bose in Self-Exile—S. N. Bhattacharyya, Metropolitan Book Co. Pvt. Ltd., Delhi, p. 104। 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে ঐ দিনেই সুভাষচন্দ্র 'চণ্ডী' চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজি গ্রন্থে প্রদত্ত বিবৃতিতে অন্য একদিনের কথা বলা হয়েছে। আমরা 'উদ্বোধন'কেই এক্ষেত্রে অনুসরণ করেছি।

৫৩। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত কলকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান (বর্তমানে সেবাপ্রতিষ্ঠান) ও দেওঘর বিদ্যাপীঠ দেখে সুভাষচন্দ্র অভিভূত হয়েছিলেন এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের উপরেই যে দেশের প্রকৃত কল্যাণ নির্ভর করছে তা দ্বিধাহীন ভাষায় উল্লেখ করেছিলেন। [দ্রষ্টব্য ঃ Diamond Jubilee Souvenir (1976) : Ramakrishna Mission Calcutta Students' Home, p. 66 ; Souvenir 1975-76 : Ramakrishna Mission Seva Pratishthan, p. 17 এবং স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের বিবৃতি ঃ ৩।৫।১৯৭৮] স্বামী ভাস্বরানন্দের স্মৃতিচারণ থেকেও জানা যায় যে, নেতাজী রামকৃষ্ণ মিশনের কাজের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সিঙ্গাপুরে তাঁর বিশিষ্ট জাপানী বন্ধুদের কাছে মিশনের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ভাস্বরানন্দজী লিখেছেন ঃ 'এখানকার (অর্থাৎ সিঙ্গাপুরের) মিশনের অনাথালয়ের জন্য আবেদন জানাইলে তিনি (অর্থাৎ নেতাজী) বাড়িঘর তৈরী করিবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। বাড়ি নির্মাণের জন্য তিনি নিজে প্রায় ৫০,০০০ ডলার দান করেন এবং আরও ৫০,০০০ ডলার সংগ্রহ করিয়া দেন। তিনি স্বয়ং আসিয়া Boys' Home-এর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। অনাথালয়ের ছেলেমেয়েদের জন্য অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাও তিনিই করিয়া দিয়াছিলেন ; কারণ যুদ্ধকালীন Blackmarket ও Food Control-এর দিনে তিনশ ছেলেমেয়ের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে একটা কঠিন সমস্যা হইয়াছিল।' [উদ্বোধন, ৫১ বর্ষ পৃঃ ৬৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য তখন নেতাজীর নিজেরই অর্থের প্রয়োজন ছিল খুব বেশী। তাই সেই মুহূর্তে নেতাজীর এই দান যে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবামূলক কাজের প্রতি তাঁর গভীরতম শ্রদ্ধারই

প্রতি তিনি কী গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারির প্রথমদিকে নেতাজী তাঁর কর্মকেন্দ্র সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করেছিলেন। রেঙ্গুনে অবস্থানকালেও স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের (রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি) সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রেখেছিলেন নেতাজী। মিশনে তিনি প্রায়ই যেতেন এবং মন্দিরে গিয়ে ধ্যান করতেন।[৫৪] ২৪ এপ্রিল ১৯৪৫—যেদিন রাত্রিতে নেতাজীকে প্রায়-শত্রুকবলিত রেঙ্গুন ত্যাগ করতে হয় তার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল রাত্রের একটি অনবদ্য মর্মস্পর্শী ঘটনাচিত্র দিয়েছেন নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী ঃ 'সেদিনটি ছিল সত্যিই এক বিচিত্র ও আশ্চর্য দিন। আত্মনিবেদনের এক অবিস্মরণীয় দিন। রেঙ্গুন ত্যাগের পূর্বাহ্ন। আজীবনের স্বপ্ন ও আদর্শের গোটা আলেখ্য নিজের চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়ছে ঝুর ঝুর করে। সম্মুখে শুধু অন্ধকারের পারাবার। সেই চরম সঙ্কট-মুহূর্তে, রেঙ্গুন ত্যাগের পূর্বক্ষণে, নেতাজী সামরিক পরিচ্ছদ খুলে পরেছিলেন পট্টবস্ত্র। শুচি-শুভ্র নির্বিকার যোগী একাকী চলে গিয়েছিলেন তাঁর আদর্শ পুরুষের প্রাণদেবতার সেবায়তনে। রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দিরে। বসেছিলেন যুগঋষির মূর্তির সম্মুখে সমাহিত হয়ে। তদ্গত। তন্ময়। উজাড় করে দিয়েছিলেন নিজেকে। মহাপ্রয়াণের পূর্বাহ্নে নিজেকে কি দেখতে চেয়েছিলেন তিনি? চিনেও কি ছিলেন? মৃত্যুই যে মরা নয়, একথা কি তাঁর মনে জেগেছিল?—কে জানে?

'বিবেকানন্দের জীবন যাঁর সাধনা-স্পর্শে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেই জীবনের প্রভাব কত গভীর ও তীব্র হলে এই পরম সঙ্কট-মুহূর্তে—যে সঙ্কটের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারিনে, নেতাজী অমন করে নিজেকে সমাহিত করতে পেরেছিলেন, তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।'[৫৫] আইয়ার বলেছেন, যে অফুরন্ত শক্তি, সাহস, মানসিক প্রশান্তি এবং আত্মবিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন নেতাজী তার উৎস হচ্ছে তাঁর অগাধ ঈশ্বরবিশ্বাস ঃ 'Most intensely he sought the guidance of God. He felt that in every step forward that he took, God Himself was leading him by both hands ; hence that immobile face, iron determination, supreme but quiet self-confidence, and an ascetic indifference to success or failure.'[৫৬] একটি জপের মালা ও একখানি পকেট-গীতা ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী।[৫৭]

নিদর্শন, তা বলা বাহুল্য। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তার সময় লক্ষ্য করেছিলেন যে, 'রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য সম্বন্ধে তাঁহার খুব উচ্চ ধারণা ছিল।' [লেখকের নিকট প্রেরিত বিবৃতি ঃ ৪।৪।১৯৭৭]

৫৪। আজাদ হিন্দ্ সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা এবং নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী দেবনাথ দাস রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নেতাজীর গভীর যোগাযোগের কথা সুভাষচন্দ্রের অপর একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং কারাসঙ্গী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর কাছে বলেছিলেন। [লেখকের নিকট নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর পত্র ঃ ২০।১।১৯৭৭]

৫৫। লেখকের নিকট পত্র ঃ ১৮।১১।১৯৭৬। ঘটনাটির বিবরণ তিনি পেয়েছিলেন দেবনাথ দাসের কাছে।

৫৬। Unto Him a Witness, p. 269 ৫৭। ibid.

'খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে প্রতিদিনই কিছুক্ষণ তিনি গীতা ও চণ্ডী পাঠ করতেন।'[৫৮] হিন্দু পূজা-অর্চনায়ও তাঁর খুব নিষ্ঠা ছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মান্দালয় জেলে তিনি দুর্গাপূজা এবং সরস্বতীপূজা করেছিলেন। এর জন্য সরকারের সঙ্গে তাঁর অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছিল।[৫৯] জেলে তিনি রোজ কালীর ধ্যান করতেন।[৬০] ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বন্দীমুক্তি-আন্দোলনের শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য তাঁর বছর খানেকের মতো কারাদণ্ড হয়। জেলে এই সময়ে তিনি গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি জেলেও তিনি দুর্গাপূজা করেছিলেন। তাছাড়া জেলের মধ্যে নিত্য পূজা, পাঠ, জপধ্যানাদি তো ছিলই।[৬১] বিশ্বাসী হিন্দুর মতো সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, 'ভয় জয় করার উপায় শক্তি সাধনা। দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্তি শক্তির রূপবিশেষ। শক্তির যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের দুর্বলতা ও মলিনতা বলিস্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে। পূজার উদ্দেশ্য—মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা।'[৬২] তামসিকতায় আচ্ছন্ন জাতির মধ্যে রজঃশক্তির উদ্বোধন ও যথার্থ পৌরুষ সঞ্চার করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন দেশে শক্তির আরাধনা হোক। তাতে ক্ষাত্রশক্তির জাগরণ হবে। রক্ত দেখে বাঙালী ভিরমি খায়, সেজন্য বেলুড় মঠে যেবার প্রথম তিনি দুর্গাপূজা করান সেবার তাঁর ইচ্ছা ছিল পশুবলি হোক। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা শক্তিপূজার প্রতি প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তার মূলে ছিল বিবেকানন্দের বিরাট প্রভাব।[৬৩] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে সুভাষচন্দ্রের শক্তিভাবনা তাঁর মন্ত্রগুরু, 'Kali the Mother' শক্তিমন্ত্রের স্রষ্টা, বিবেকানন্দের প্রভাবেরই সুস্পষ্ট ফল।[৬৪] সুভাষের অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপকুমার রায় লিখেছেন ঃ 'পরে রাজনৈতিক জনতা-কল্লোলে সদাসর্বদা ভেসে চলতে বাধ্য হওয়ার দরুন ওর (অর্থাৎ সুভাষের) স্বভাবের একটু পরিবর্তন হয়েছিল বটে, কিন্তু সে বাহ্য। ও অন্তরে চিরদিনই ছিল নিঃসঙ্গ বৈরাগীই—যাকে টানত ভারতের অন্তর্মুখী সাধকদের ভাবধারা। এইখানেই ওর জীবনে এসেছিল খানিকটা অন্তর্দ্বন্দ্ব। কারণ ওর সমৃদ্ধ ব্যক্তিরূপের নানা দিক ছিল। একটা দিক ছিল জ্ঞানার্থী, একটা দিক চাইত অশ্রান্ত কর্মের মধ্যে দিয়ে কীর্তিপ্রতিষ্ঠ হতে, আর একটা দিক হতে চাইত ধ্যানী সাধক। ও আমাকে বলত যে, ঘুমের আগে প্রায়ই ও দুই ভূর মধ্যে জ্যোতি দেখে। ...একটি পত্রে ও আমাকে লিখেছিল যে, ওকে টানত কখনও কালী কখনও কৃষ্ণ কখনও শিব। ...এই আদর্শ-বিরোধের ফলে মানুষ অনেক সময়েই আরও বিচিত্র হয়ে

৫৮। নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা—সমর গুহ, ১৯৭০, পৃঃ ১২৭

৫৯। পত্রাবলী, পৃঃ ১৯৩, ২০৯ ও ২২৯ ৬০। স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩৬৮

৬১। নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ—নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭৪, পৃঃ ৪৯-৫১, ৭৭, ৮৮-৯৬, ১০৫, ১৫৩, ১৫৯, ১৬৮-৭৩ ৬২। পত্রাবলী, পৃঃ ২১৮

৬৩। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ (১৩৬৩), পৃঃ ২৬৯

৬৪। লেখকের নিকট স্বাক্ষরিত বিবৃতি ঃ ৮।১১।১৯৭৬

ফুটে ওঠে। সুভাষের মধ্যে দুটি মূল আদর্শের স্রোত বইত নিরন্তরই—এক ভারতের ধর্মজীবন, যার টানে ও একবার সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়। আর এক হল ওর দেশাত্মবোধ—যার নিষেধে ও আধ্যাত্মিক সাধনাকে কিছুতেই পুরোপুরি বরণ করতে পারেনি। অথচ এজন্যে ওর মনের অতলে একটা চাপা বেদনা ছিল বরাবরই।'[৬৫] তাঁর বিদেশিনী বান্ধবী শ্রীমতী কিটি কুর্তি বার্লিনের রাস্তায় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন তখনই তাঁর মনে হয়েছিল ঃ 'No doubt...a mystic, a spiritual man...a person of obvious spirituality.'[৬৬] অনেকে বিশ্বাস করেন যে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী মারা যাননি এবং যৌবনে যে আকর্ষণ তাঁকে হাতছানি দিয়েছিল সেই সন্ন্যাসের পথেই হয়তো তিনি চিরদিনের মতো চলে গিয়েছেন।[৬৭] শ্রীমতী কুর্তিও এমন একটি সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারেননি। বন্ধুত্বের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে শ্রীমতী কুর্তি লিখেছেন ঃ 'Where are you now, my friend ? Deeply buried in the Japanese earth ? Mingling with its soil ? Dead, my friend ? Or as the story goes, are you in some hidden monastery, an adorer and initiate of the great Universal Spirit ? Or are you a wandering beggar and *sannyasin,* appearing now and then in this or that village ; talking now and then with this or that peasant or worker or saint ?'[৬৮]

সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের এই আধ্যাত্মিক প্রবণতা—যার মূলে ছিল তাঁর উপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব—তাঁর জীবনে বরাবর ছিল; কিন্তু পূর্ব-উল্লিখিত গীতা এবং জপের মালা ছাড়া ধর্মের আর কোন বাহ্যিক প্রকাশ তাঁর জীবনে ছিল না এবং এ দুটির কথাও বহুদিন পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত ভৃত্য ছাড়া আর কেউ জানত না।[৬৯] 'This was itself typical of the strictest privacy in which Netaji lived with his God. His faith was not an article for parade....He never even once *spoke* his God in public. He *lived* Him.'[৭০] এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি

৬৫। স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩০০

৬৬। Subhas Chandra Bose as I Knew Him—Kitty Kurti, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, First Edition (1966), p. 3

৬৭। নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য—বরুণ সেনগুপ্ত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ৮৫। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এরকম একটা সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। তিনি অবশ্য দৃঢ় নিশ্চিত যে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী মারা যাননি। [লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঃ ৩০। ১। ১৯৭৭] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ত্রিপুরী কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র হিমালয়ের পথে পরিব্রাজক-জীবন গ্রহণের কথা চিন্তা করেছিলেন। [দ্রষ্টব্য ঃ My Uncle Netaji—Asoke Nath Bose, ESEM Publications, Calcutta, 1977, pp. 246-47]

৬৮। Subhas Chandra Bose as I Knew Him, p. 57

৬৯। Unto Him a Witness, p. 269 ৭০। ibid.

অতি পরিচিত উক্তি মনে পড়েঃ 'ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে।'[৭১] অর্থাৎ প্রচারবিমুখতা আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের প্রথম সর্ত। সুভাষচন্দ্র তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এ তাঁর 'গুরু'র গুরুদেবের নির্দেশ—যাঁদের তিনি মনে করতেন 'একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুইরূপ' এবং কলেজ-জীবনে জীবনটাকে সব দিক দিয়ে যাঁদের অধ্যাত্ম-পতাকাবাহী হিসাবে গড়ে তোলার ব্রত নিয়েছিলেন।

সুভাষের আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গঠন করার ফলে 'দেশের স্বাধীনতার দিন দশ বৎসর এগিয়ে এসেছিল'।[৭২] একথা স্বীকার করে নিয়েও গভীর আক্ষেপ করে দিলীপকুমার রায় লিখেছেন ঃ 'এ-দুঃখ আমার কোনও দিনই যায়নি—যাবেও না—যে, তার মতন আধার বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে রাজনীতির পঙ্কিল পথে পা বাড়ালো, আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে নবজাতি গঠনের চিরন্তন আদর্শ ছেড়ে এমন সামরিক সাধনায় ওর বিরল প্রাণশক্তিকে বলি দিল যে-সাধনা ওর পক্ষে খানিকটা পরধর্মই বলব।'[৭৩] দিলীপকুমারের আক্ষেপ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ তিনি নিজে আজীবন অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সুভাষচন্দ্র ধর্মনায়ক না হয়ে রাজনৈতিক নেতা বা রণনায়ক হয়ে মোটেই 'পরধর্ম'কে বরণ করেননি। দেশের প্রতি ভালবাসাই ছিল তাঁর আত্মার মূল প্রেরণা যা তাঁর মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন বিবেকানন্দ এবং যার সহজ পরিণতিই আমরা দেখেছি তাঁর রাজনৈতিক ও সৈনিক জীবনের মধ্যে। স্বদেশসেবার সম্মিলিত কর্মযজ্ঞে তিনি নিষ্কামভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সেও তো ধর্মের আর একটা নাম। সেই 'সম্মিলিত সাধনার' একজন প্রধান পুরোহিত ছিলেন তিনি। অবশ্য অভিমানবশে একবার তিনি বলেছিলেন ঃ 'রাজনীতি আমার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নয়; আমি কেবল ঘটনাচক্রে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে এসে পড়েছি।'[৭৪] কিন্তু এ তাঁর নিছক অভিমানের কথা। অন্তরে গভীর অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা থাকলেও মূলত কর্মের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। অবশ্য কর্মকে তিনি সাধনার অঙ্গ হিসাবেই দেখেছিলেন—'কর্মযোগ' হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। দেশসেবার কর্মযজ্ঞ। ভারতের সেবা ছিল তাঁর উপাসনা, তাঁর জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, আদর্শ। রাজনীতি, সামরিক সাধনা—যা-কিছু তিনি করেছেন তা ঐ এক উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। নিজের জীবনাদর্শের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ 'রাজনীতি আমি পেশা বা বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিনি, মাতৃভূমি আমার জপতপ ও স্বাধ্যায়, সাধনা ও মুক্তির সোপান।'[৭৫] তাই তাঁর স্বদেশপ্রেম ইংরেজি patriotism-এর প্রচলিত গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না। তা ছিল তাঁর কাছে একটি আধ্যাত্মিক প্রেরণা যাকে সঞ্জীবিত করেছে তাঁর অন্তরের ধর্মপ্রাণতার ফল্গুধারা। বস্তুত, ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষ কখনও পূর্ণাঙ্গ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, পারবেও না। কি সমাজনীতি, কি রণনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি—ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মই একমাত্র ভিত্তি। রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে শুরু করে অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন, ধর্মপাল,

---

৭১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ—শ্রীম-কথিত, শ্রীম-এর ঠাকুরবাটী, কলিকাতা, ১৩৮৭, পৃঃ ২১

৭২। স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩৮৭ ৭৩। তদেব, পৃঃ ৩৭৬

৭৪। পত্রাবলী, পৃঃ ৩৫৬ ৭৫। উদ্ধৃত ঃ নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা, পৃঃ ৫২

লক্ষ্মণসেন এবং সেদিনের ইতিহাসের শিখ-অভ্যুদয় এবং মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত পর্যন্ত—সেই একই ট্রাডিশন সমানে চলে এসেছে। শুধুমাত্র শিবাজীর শারীরিক শক্তি এবং রাজনৈতিক মেধার জন্যই মারাঠাশক্তির জাগরণ হয়নি ; তার পশ্চাতে ছিল সন্ন্যাসী রামদাসের অনুপ্রেরণা, যিনি শিবাজীর অন্তরে সঞ্চার করেছিলেন ধর্মভাব, দেশাত্মবোধ এবং বৈরাগ্য। গান্ধী, অরবিন্দ, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র এবং তাবৎ স্বাধীনতাসংগ্রামী স্বীকার করেছেন যে, ভারতবর্ষকে জাগরণের বীজমন্ত্র দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর অভীঃমন্ত্র জাতিকে মগ্নচৈতন্য থেকে,আত্মঘ্ন ক্লৈব্য থেকে, জড়ধর্মী তামসিকতা থেকে মুক্ত করেছিল। সারা দেশে স্বদেশপ্রাণতার যে প্লাবন এসেছিল তার মূলে ছিল একটা আধ্যাত্মিক অগ্নিপ্রেরণা ঃ তোমরা মানুষ হও আর আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য দেশমাতৃকা হোক তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে আধ্যাত্মিক জাগরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতীয় জাগরণকে অনুপ্রাণিত এবং ত্বরান্বিত করেছে। সুভাষচন্দ্র বলেছেন ঃ আধ্যাত্মিক জাগরণের ফলে শুধুমাত্র ভারতেই যে স্বাধীনতাসংগ্রাম সূচিত হয়েছে, তা নয়। ইতালীর রিসর্জিমেন্টো আন্দোলনে ম্যাট্‌সিনিই প্রথম ইতালীর জনগণকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা দান করেন। বীর যোদ্ধা গ্যারিবল্ডী ছিলেন তাঁরই অনুবর্তী। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবী সিন্‌ফিন্ দলের উদ্ভবের মূলেও ছিল একটি আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা।[৭৬] তবে ভারতের বৈশিষ্ট্য, এখানে ধর্মই হচ্ছে তার সকল চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি ও প্রেরণা। বিবেকানন্দ বলিষ্ঠ পৌরুষের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন ঃ 'Our life-blood is spirituality. If it flows clear, if it flows strong and pure and vigorous, everything is right ; political, social, any other material defects even the poverty of the land, will all be cured if that blood is pure.'[৭৭] ধর্ম মানে কি ? বিবেকানন্দ বললেন ঃ ধর্ম মানে নিষ্ক্রিয়তা নয়, শুধু গিরিগুহায় জীবনবিমুখ তপশ্চরণ নয়—ধর্ম মানে ঈশ্বরবিশ্বাস, নিজের উপর বিশ্বাস, ধর্ম মানে জীবন, ধর্ম মানে চরিত্র, ধর্ম মানে বৈরাগ্য, ধর্মের আর এক নাম সম্প্রসারণ, গতিশীলতা। রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি এবং জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ একমাত্র তাঁরই নেতৃত্ব স্বীকার করবে ধর্ম যাঁর চিন্তা ও কর্মের প্রেরণা। গান্ধীজীর জনপ্রিয়তার কারণ ছিল তাঁর অন্তরের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য। সুভাষেরও তা-ই। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে শিবাজীর প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল গান্ধীজীর, প্রয়োজন ছিল নেতাজীর। শিবাজীর জীবনে যেমন রামদাস, নেতাজীর জীবনে তেমনি বিবেকানন্দ ছিলেন মুখ্য প্রেরণাপুরুষ। নেতাজীর রাজনীতিদর্শন স্পষ্টত আধ্যাত্মিকতার উপাদানে অভিষিক্ত এবং এই সমন্বয়, যা ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য, বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা, দেশপ্রেম এবং দার্শনিক চেতনা দ্বারা প্রধানত প্রভাবিত, এবং বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রচিন্তায় আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রবক্তা বিবেকানন্দ। আগেই উল্লেখ করেছি প্রথম

৭৬। Selected Speeches of Subhas Chandra Bose, Government of India, 1962, p. 203

৭৭। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, Advaita Ashrama, Calcutta, Ninth Edition (1964), p. 288

যৌবনে সুভাষের সন্ন্যাসী হওয়ার বাসনায় গৃহত্যাগ এবং আজীবন সন্ন্যাসের প্রতি তাঁর আকর্ষণের মূলে ছিল বিবেকানন্দের প্রেরণা। বাহ্যত সন্ন্যাসীর গেরুয়া তিনি পরেননি ঠিকই, কিন্তু সমস্ত অন্তরসত্তাকে ত্যাগব্রতে দীক্ষিত করেই তিনি ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন। স্বামীজীর 'The Song of the Sannyasin' তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। প্রায়ই তিনি ওর থেকে আবৃত্তি করতেন : 'Have thou no home, what home can hold thee, friend ?'[৭৮] সুভাষ-সতীর্থ চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন : 'Vivekananda was his ideal—throughout... স্বামীজীর "সন্ন্যাসীর গীতি" ছিল ওর গীতা। ওর আদর্শ। প্রায়ই ওর মুখে শোনা যেত ঐ কবিতাটি।'[৭৯] দেশের কাজের জন্য সর্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত এরকম বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, আত্মবিশ্বাসী এবং সর্বোপরি ক্ষাত্রবীর্য এবং ব্রহ্মতেজ সমন্বিত একশটি তাজা যুবক বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসেই। তাঁর স্বদেশের মাটিতে পদার্পণ করার (২৬।১।১৮৯৭) ঠিক তিন দিন আগে অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারি পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন সুভাষচন্দ্র। আমাদের মনে হয় এই যোগাযোগ আকস্মিক নয়। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই যোগাযোগ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। স্বামীজী যেমন চেয়েছিলেন তেমন 'একশত যুবক' তিনি পেয়েছিলেন কিনা জানি না, তবে তাঁর মহাসমাধির ঠিক দু-দশক পরে সেদিনের সেই নবজাতকের মধ্যে এমন একজন যুবককে ভারতবর্ষ পেয়েছিল যিনি একাই একশ—যাঁকে মোহিতলাল স্বামীজীর 'মানসপুত্র'[৮০] বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ছে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া হল-এ 'আমার সমরনীতি' বক্তৃতায় স্বামীজী প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিকের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে তিনটি মূল সর্তের উল্লেখ করেছিলেন।[৮১] সুভাষচন্দ্রের জীবনে আমরা সেগুলির চরিতার্থতা লক্ষ্য করেছি। আর একটি আশ্চর্য যোগাযোগ—সন্ন্যাসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সেই যুবককে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন বিবেকানন্দেরই গুরুভাই, শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ক্রান্তদর্শী ঋষি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন সেদিনের সেই তরুণ সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ, তাঁর বিরাট সম্ভাবনার সহজ ফলশ্রুতি! যার যা 'ভাব' তাকে সেদিকেই উৎসাহিত করেছিলেন তিনি—যেমন করতেন তাঁর গুরুদেব।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন সুভাষ প্রেসিডেন্সি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হলেন তখন থেকেই তিনি 'ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ' ছিলেন। ছেলেদের নিয়ে দল বেঁধে কলকাতা থেকে যেতেন দক্ষিণেশ্বর কিংবা বেলুড় মঠ।[৮২] 'দক্ষিণেশ্বর তাঁকে আকর্ষণ করত। দক্ষিণেশ্বরের আকাশে বাতাসে তখনও রয়েছে সেই মহাপুরুষের নিঃশ্বাস। তাঁর সেই

৭৮। স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩৬১ ৭৯। লেখকের নিকট বিবৃতি : ২।১।১৯৭৭

৮০। বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—মোহিতলাল মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ১৪৪

৮১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ১১৬-১৭

৮২। ভারত পথিক, পৃঃ ৭৪ ; সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন, পৃঃ ৬০ এবং সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, পৃঃ ১৯

কোণের ঘরখানিতে তখনও রয়েছে তাঁর বিদেহী আত্মা। তার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তাঁর (অর্থাৎ সুভাষের) অন্তর দিব্য প্রেরণায় ভরে উঠত। এই পরিবেশে তাঁর অন্তরে বেজে উঠত বৈরাগ্যের সুর।'[৮৩] অধিকন্তু ছিল সেই পরমপুরুষের চরণছোঁয়া তীর্থরেণুর আকর্ষণ। এই দক্ষিণেশ্বরেই তো 'জন্মলাভ' করেছিলেন সেই অমিত শক্তিধর দেশপ্রাণ পুরুষটি—যিনি অকস্মাৎ অ্যাটম বোমার মতো, দ্বিতীয় সূর্যের মতো, ফেটে পড়েছিলেন ভারত তথা পৃথিবীর বুকে; যাঁর দীপ্ত আবির্ভাবে সমগ্র পৃথিবী চমকে উঠেছিল। সারা ভারত জুড়ে প্রবাহিত হয়েছিল দেশপ্রেম আর কর্মের অভূতপূর্ব উদ্দীপনা। বস্তুত অ্যাটম বোমা হিরোসিমাতেও ফাটেনি, নাগাসাকিতেও ফাটেনি—ফেটেছিল শিকাগোতে—যাতে সমস্ত আমেরিকা আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। মহাসাগরের ব্যবধান ডিঙিয়ে আঘাত করেছিল ভারতবর্ষের মর্মমূলে।[৮৪] কেঁপে উঠেছিল ভারতবর্ষের ভিত্তি। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেট্রয়েটে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেনঃ আমি ভারতের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দেব। জাতির ধমনীতে স্তিমিত রক্ত আবার অগ্নি-চঞ্চল হয়ে উঠবে। 'দেখিবে ভারতের মূলগ্রন্থি পর্যন্ত নড়িয়া উঠিবে, তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিবে, বিজয়োল্লাসে ভারতবাসী আমায় বুকে তুলিয়া লইবে।'[৮৫] রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি সমসাময়িক কালের কবিতায় ('এবার ফিরাও মোরে'ঃ চিত্রা) আমেরিকায় স্বামীজীর সেই শিহরণকারী আবির্ভাবকেই কি স্মরণ করেছেন?

ওরে, তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা! কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে!...বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

* * *

সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি—
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি

৮৩। সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন, পৃঃ ৬০

৮৪। এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী অরবিন্দের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২ মে আলিপুর বোমার ব্যাপারে এক বিরাট পুলিস বাহিনী পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট ক্রেগান সাহেব এবং চব্বিশ পরগণার ক্লার্ক সাহেবের নেতৃত্বে অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে তাঁর ৪৮ নং গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে। ঘর সার্চ করে 'dangerous material' পাওয়া গেল এক কৌটো মাটি—যা আনা হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর থেকে 'considering it sacred' [Sri Aurobindo in the First Decade of the Century—Monoj Das, Sri Aurobindo Ashrama, Pondicherry, 1972, p. 44] অরবিন্দ নিজে এ ঘটনাটি সম্পর্কে লিখেছেনঃ 'মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধ চিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না।' [কারাকাহিনী—অরবিন্দ ঘোষ, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর, ১৩২৮, পৃঃ ৫-৬]

৮৫। স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু, ১৩৬৩, পৃঃ ৫৮১

আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।[৮৬]

কবিতাটি যখন লেখা হয়েছে তখন সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়নি। কিন্তু যে আদর্শের কথা রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন—যা মূর্ত হয়ে উঠেছিল স্বামীজীর জীবন এবং কর্মতপস্যার মধ্যে—তাকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে সামনে রেখেই যেন গড়ে উঠেছিল সেদিনের ভাবী জাতকের জীবন।

বেলুড় মঠ—স্বামীজীর হাতেগড়া বেলুড় মঠ—যেখানে তাঁর অশরীরী আত্মা সাক্ষাৎ প্রেরণারূপে বিরাজ করছে, তার আকর্ষণও সুভাষের কাছে ছিল দুর্নিবার। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বলেছেন : '১৯১৩ থেকে ১৯১৫—এই দু-বছর আমি সুভাষের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলাম এবং এইসময়ে আমরা একসঙ্গে বহুবার বেলুড় মঠে গিয়েছি। বস্তুত, তখনকার দিনে স্বাধীনতাকামী এমন বাঙালী কেউ ছিলেন না বললেই চলে যিনি দক্ষিণেশ্বর-বেলুড় মঠ যাননি। স্বামীজীর কয়েকজন গুরুভায়ের ভালবাসা এবং তাঁদের খুব কাছে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা ঐ সময়।'[৮৭]

॥ ২ ॥

সুভাষ যখন কটকে স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই বিবেকানন্দের আদর্শে সেবাধর্ম-অনুশীলনের জন্য একটি বেশ বড় দল গড়ে তুলেছিলেন। ইতিমধ্যে বিবেকানন্দের প্রভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি একটি আকর্ষণ তাঁর অন্তরে অঙ্কুরিত হতে শুরু হয়েছে—যার উল্লেখ আগেই করেছি। 'ধীরে ধীরে', আত্মজীবনীতে সুভাষচন্দ্র লিখছেন : 'বুঝতে পারছিলাম আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জনসেবা অপরিহার্য। এই ধারণা বিবেকানন্দই আমাকে দিয়েছিলেন, তিনিই জনসেবা তথা দেশসেবার আদর্শ প্রচার করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, দরিদ্রের সেবাকেও তিনি অবশ্য কর্তব্য বলে স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলতেন দরিদ্রের মধ্য দিয়ে ভগবান আমাদের কাছে আসেন, কাজেই দরিদ্রের সেবা মানেই ভগবানের সেবা।'[৮৮] সুভাষ যে দল গঠন করেছিলেন তার মূলমন্ত্র ছিল বিবেকানন্দের বাণী : তোমার বাড়ির কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক রয়েছে, তাদের যথাসাধ্য সেবা কর। যে পীড়িত, তাকে ঔষধপথ্য যোগাড় করে দাও এবং শরীরের দ্বারা তার সেবাশুশ্রূষা কর। যে খেতে পাচ্ছে না, তাকে খাওয়াও।[৮৯] ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের প্রথম ছুটিতে এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে 'ওটেন ইনসিডেন্ট'-এর পর সুভাষ যখন কটকে ফিরে যান তখন তিনি স্বামীজীর এই বাণীকে জীবন দিয়ে

৮৬। কবিতাটির রচনাকাল ফাল্গুন ১৩০০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ মার্চ ১৮৯৪। স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতাকাল সেপ্টেম্বর ১৮৯৩। এর অব্যবহিত পরেই স্বামীজীর শিকাগো-আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে সংবাদ পরিবেশিত হতে থাকে তাতে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছিলেন—এরকম ধারণা করা অসঙ্গত নয়। সংবাদপত্রে আলোড়নের ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', প্রথম খণ্ড (১৩৮২) এবং 'Vivekananda in Indian Newspapers' (1969) গ্রন্থ দুটিতে প্রামাণিক তথ্যাদি পাওয়া যাবে।

৮৭। লেখকের নিকট বিবৃতি : ২৭। ১০। ১৯৭৬ ৮৮। ভারত পথিক, পৃঃ ৫২

৮৯। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৩৫

রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। সেসময় উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে কলেরা ও বসন্তের মহামারীর ছিল প্রবল উৎপাত। একটা 'নার্সিং ব্রাদারহুড' গড়ে সুভাষ অকুতোভয়ে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। কিন্তু সুভাষের জেহাদ ঘোষণাভিত্তিক ছিল না, ছিল কর্মভিত্তিক। দলে দলে লোক মারাত্মক সংক্রামক রোগে কাতরাচ্ছে অথবা মৃত্যুবরণ করছে, আত্মীয়স্বজনও তাদের ত্যাগ করে চলে গিয়েছে—সেখানে দলবল নিয়ে মূর্তিমান সেবার মতো সুভাষ এসে উপস্থিত। প্রাণপণ সেবায় তাদের সুস্থ করে তুলছেন অথবা নিজেরা ঘাড়ে করে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে মৃতদেহের সৎকার করছেন। কেউ হয়তো পরিবার-পরিজন নিয়ে বিপন্ন—আহার অথবা অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছে—খবর পেয়েই সুভাষ ছুটে গিয়েছেন তাদের পাশে—বাড়িয়ে দিয়েছেন কষ্টার্জিত সাহায্যের উপকরণ। এ তো স্পষ্টত বিবেকানন্দের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ এবং আত্মনিবেদিত একটি প্রাণেরই কাহিনী। এই সূত্রে মনে পড়ে সেই মহাপ্রাণ সন্ন্যাসীর একটি মর্মস্পর্শী রূপ যিনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের প্লেগ-মহামারীতে ক্লিষ্ট কলকাতার পথে বস্তিতে সদলবলে নেমেছিলেন পরিত্রাতার ভূমিকায়। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য স্বামীজী গিয়েছিলেন দার্জিলিং। সেখানে সংবাদ পেলেন যে কলকাতায় প্লেগ দেখা দিয়েছে এবং মহামারীর সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যা ম্যাকলাউডকে লিখলেন (২৯ এপ্রিল ১৮৯৮)ঃ '...I am determined to make myself a sacrifice ; and that I am sure is a "Darn sight, better way to Nirvana" than pouring oblations to all that ever twinkled.'[৯০] এ একমাত্র বিবেকানন্দের পক্ষেই বলা সম্ভব। কারণ এ 'দুঃসাহসের' মূল প্রেরণা তিনি পেয়েছেন তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে,[৯১] যিনি তাঁর কাছে শুধু 'অবতারবরিষ্ঠ'ই ছিলেন না, ছিলেন ঈশ্বরের চেয়েও বেশী; যাঁর মধ্যে, রোমাঁ রোলাঁ[৯২] এবং অরবিন্দের[৯৩] ভাষায়, বিগত দু-হাজার বছরের ভারতীয় প্রজ্ঞা ও অধ্যাত্মসাধনার চূড়ান্ত পরিণতি প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে একজন সন্ন্যাসী বলছেন—প্লেগরোগীদের সেবা তাঁর কাছে নির্বাণলাভের প্রকৃষ্টতর উপায়! স্বামীজী বাণীসর্বস্ব ছিলেন না, ছিলেন বাণীমূর্তি। তাই পড়ে রইল তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধার। কলকাতায় নেমে এসে গুরুভাই এবং শিষ্যদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি প্লেগের মোকাবিলা করতে। কিন্তু তাঁরা সন্ন্যাসী-ফকির মানুষ। এত বড় কাজে শুধু কায়িক শ্রমই যথেষ্ট নয়, প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন। জনৈক গুরুভাই জিজ্ঞেস করলেনঃ 'টাকা আসবে কোথা থেকে?' বিবেকানন্দের দৃপ্ত উত্তরঃ 'কেন? দরকার হলে নূতন মঠের জমি-জায়গা সব বিক্রি করব। আমরা ফকির; মুষ্টিভিক্ষা করে গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা-জমি বিক্রি করলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারা যায় তো কিসের জায়গা আর কিসের জমি?'[৯৪] স্বামীজীর

৯০। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VIII, Third Edition (1959), p. 451

৯১। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৮২-৮৩

৯২। The Life of Ramakrishna—Romain Rolland, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition (1970), p. 13

৯৩। Sri Aurobindo, Vol. 1, Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Pondicherry, 1972, p. 799

৯৪। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৮৬), পৃঃ ১০৫

স্বপ্নের বেলুড় মঠ—যার জন্য তিনি হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, যার চিন্তায় তিনি অতিবাহিত করেছেন কত বিনিদ্র রজনী—তা তিনি অক্লেশে বিক্রি করে দেব বললেন! সৌভাগ্যবশত প্রয়োজনীয় অর্থ অন্য সূত্রে হাতে আসায় বাস্তবে মঠ বিক্রি করতে হয়নি। কিন্তু কত বড় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন বিবেকানন্দ এই ঘটনা থেকে তার কিছুটা ধারণা করা যায়। অবশ্য তার পূর্ণাঙ্গ ধারণার কাছাকাছি যাওয়াও আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। ব্রহ্ম নয়, ঈশ্বর নয়—তাঁর দেবতা পাপীনারায়ণ, তাপীনারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ—অজ্ঞরা যাদের ভুল করে 'মানুষ' বলে। একমাত্র এই ভগবানেই তাঁর বিশ্বাস এবং এঁর পূজার জন্য তিনি বার বার জন্মগ্রহণ এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করতে হাসিমুখে প্রস্তুত। এই তাঁর নববেদান্ত—যিনি গভীরতম প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারেন—'I have touched the feet of God!'[৯৫]—আমি ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করেছি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুলাই বালকের উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে বিবেকানন্দ লিখছেন মেরী হেলকে ঃ '...যদি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভেতর কেমন কাজ করছে, কলেরা-আক্রান্ত "পারিয়া"র মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের সেবাশুশ্রূষা করছে এবং অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে...!'[৯৬] সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, জনসেবা বলতে বিবেকানন্দ 'স্বদেশের সেবাও বুঝেছিলেন'।[৯৭] দেশকে ভালবাসতে হলে আগে দেশের মানুষকে ভালবাসতে হবে। স্বামীজী বলেছিলেন ঃ '...আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য...অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত;...কোন্ অকেজো দেবতার অন্বেষণে তুমি ধাবিত হইতেছ...তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না?...প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা;...পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে...।'[৯৮] বিবেকানন্দ যে ভারতকে সুভাষের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন তা হল দরিদ্র, নিরন্ন, নিঃস্ব ভারতবর্ষ। সেই তাঁর ঈশ্বর, তাঁর একমাত্র দেবতা। 'সে (অর্থাৎ সুভাষ)', দিলীপকুমার রায় লিখছেন ঃ '...নিরন্তরই আমাকে বলত বিবেকানন্দের কথা ঃ

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"।'[৯৯]

স্বামীজীর সেবাদর্শকে সুভাষ কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন সে-সম্পর্কে তাঁর পরবর্তীকালের দুটি উক্তি উল্লেখ করছি। তখন তিনি কংগ্রেসের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা, মান্দালয় জেলে বন্দী। জেলে যাওয়ার আগে তিনি দক্ষিণ কলকাতায় একটি সেবাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। সেই সেবাশ্রম প্রসঙ্গে তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জেল থেকে একটি চিঠিতে লিখছেন ঃ '...আমি খেয়ালের বশবর্তী হইয়া সেবাশ্রমের কার্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। আজ প্রায় ১২/১৪ বৎসর ধরিয়া যে গভীর বেদনা তুষানলের মতো

৯৫। The Master as I saw him, p. 329
৯৬। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪১২
৯৭। ভারত পথিক, পৃঃ ৪৩ ৯৮। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮-৯৯
৯৯। স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩২২

আমাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি—তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। "দরিদ্র নারায়ণের" সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব!'[১০০] ঐ একই চিঠিতে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি লিখছেনঃ 'আজ বাঙ্গলার অনেক কর্মীর মধ্যে ব্যবসাদারী ও পাটোয়ারী বুদ্ধি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।...আমি জিজ্ঞাসা করি—নরনারায়ণের সেবা ব্যবসাদারীতে, contract-এ কবে পরিণত হইল? আমি তো জানিতাম সেবার আদর্শ এই—"দাও আর ফিরে নাহি চাও থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।" যে বাঙ্গালী এত শীঘ্র দেশবন্ধুর ত্যাগের কথা ভুলিয়াছে—সে যে...স্বামী বিবেকানন্দের "বীরবাণী" ভুলিবে—ইহা আর বিচিত্র কি?'

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া এবং পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় ব্যাপক বন্যা ও দুর্ভিক্ষের ফলে বহু নরনারী দুর্দশাগ্রস্ত হয়। তাদের সেবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ এইচ. আর. জেমস এবং যুগ্ম সম্পাদকদের অন্যতম ছিলেন সুভাষচন্দ্র—তিনি তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সুভাষচন্দ্রই যে কলেজ রিলিফ কমিটির প্রধান সংগঠক এবং প্রধান কর্মী ছিলেন তা তাঁর সেসময়ের একটি চিঠি থেকে বোঝা যায়। ২৯।৭।১৯১৫ তারিখের চিঠিতে তিনি লিখছেন হেমন্ত সরকারকেঃ 'College famine fund-এর Secretary করেছে। তার জন্য একটু খাটিতে হইবে। উপস্থিত আর কেহ নাই।'[১০১] সুভাষ তখনও পর্যন্ত রাজনীতির দিকে তেমন আকৃষ্ট হননি। জনসেবার দিকেই তাঁর তখন আকর্ষণ ছিল বেশী। ত্রাণ কমিটির প্রধান উদ্যোগীর ভূমিকা নেওয়ায় তাঁর পড়াশুনোর খুব ক্ষতি হয়েছিল এবং ফলে আই. এ. পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হয়েছিল। এর পরে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষদিকে উত্তরবঙ্গে প্রচণ্ড বন্যা দেখা যায়। সুভাষচন্দ্র তখন সবে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। শরীর সুস্থ নয়। তবু তিনি সর্বশক্তি নিয়ে বন্যাপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন। বন্যাসহায়ক সমিতির তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। বন্যাত্রাণের কাজে দু-হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত হয়েছিল। তারা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, কর্মনৈপুণ্য ও সেবাধর্মী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল তা অভূতপূর্ব। স্বামী বিবেকানন্দ দুঃখ করে বলেছিলেন যে, ভারতবাসীর স্বভাবে সংগঠন-চেতনা নেই। অথচ সংগঠনই জাতির শক্তি। তাঁর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মূলে সেও ছিল একটা কারণ—অর্গ্যানাইজেশন কি করে গড়তে হয়, পরিচালনা করতে হয় তা দেশকে দেখিয়ে দেওয়া। স্বামীজীর এই শিক্ষাটি সুভাষ একেবারে বাল্যকাল থেকেই অনুশীলন ও আত্মস্থ করেছিলেন। আগেই বলেছি, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ('ওটেন ইনসিডেন্ট'-এর পরে) যখন সুভাষ কটকে ফিরে গেলেন তখন তিনি সেখানে পাড়ার পঞ্চাশ-ষাট জন ছেলেকে নিয়ে একটি 'নার্সিং ব্রাদারহুড' গড়েছিলেন। তারা কটক থেকে মাইল আষ্টেক দূরে নরাজ পর্যন্ত সুভাষের

১০০। পত্রাবলী, পৃঃ ২৫৬ ১০১। তদেব, পৃঃ ৪৯

নেতৃত্বে সুশৃঙ্খলভাবে রুট মার্চ করে 'বন্দেমাতরম্' এবং 'সন্ন্যাসীর গীতি' গাইতে গাইতে যেত। পুলিশ সন্দেহ করল এরা সন্ত্রাসবাদের মহড়া দিচ্ছে। চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, সুভাষকে তখন দেখে মনে হত যেন 'বাডিং বিবেকানন্দ' এবং ভবিষ্যতের আই. এন. এ.-র সূত্রপাত সেখানেই।[১০২]

॥ ৩ ॥

সুভাষের নেতৃত্বে 'নার্সিং ব্রাদারহুডে'র কর্মপরিধি শুধুমাত্র আর্তসেবা এবং রুট মার্চের মধ্যে সীমায়িত ছিল না। বিবেকানন্দ চাইতেন দেশের যৌবনকে শারীরিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেখতে। তিনি চেয়েছিলেন এমন কয়েকটি যুবক যাদের থাকবে লৌহদৃঢ় মাংসপেশী, ইস্পাতকঠিন স্নায়ু এবং বজ্রদুর্জয় মানসিকতা। বলেছিলেন ঃ 'গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে। ...তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরও ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।'[১০৩] অর্থাৎ শক্তিমূর্তি শ্রীকৃষ্ণই আমাদের আদর্শ—কিন্তু সেই আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করতে গেলে প্রথম আবশ্যিক সর্ত—নিজে শক্তিমান হওয়া। উপনিষদ্‌ও এই শক্তিমন্ত্রই প্রচার করেছেন। বলেছেন ঃ 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'— একমাত্র শক্তিমানের পক্ষেই আত্মোপলব্ধি সম্ভব। বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ দৈহিক শক্তির দৈন্যে মানুষের জীবন বিফল ও বিড়ম্বনাময় হয়ে ওঠে। শারীরিক দুর্বলতাই সকল অনিষ্টের মূল। 'সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি তাই সেদিকেও প্রসারিত হল। গড়ে উঠল ব্যায়াম ক্লাব। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় চলতে লাগল ব্যায়াম চর্চা।'[১০৪] পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, যুবসমাজকে তার কাজের তালিকায় শরীরচর্চাকে একটি আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। গীতার মহতী বাণীতে উদ্বুদ্ধ হতে হবে দেশের যৌবনকে। কারণ তিনিও মনে করতেন ঐ বাণী অমর যৌবনেরই বাণী যা দেহ ও মনের ক্লৈব্যকে দূর করে মানুষকে অমিত বীর্যে উদ্বোধিত করে। এছাড়া দেশসেবার প্রয়োজনে দলের ছেলেদের বিতর্কযুদ্ধে শক্তিশালী করবার জন্য একটি ডিবেটিং ক্লাবও গঠন করেছিলেন তিনি। ছেলেদের যাতে চিন্তাশক্তির স্ফুরণ হয় এইজন্য তিনি বিতর্কসভায় নানা আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট করে দিতেন। কটকে ডিবেটিং ক্লাব গঠনের পশ্চাতে ছিল সুভাষের অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য। কারণ প্রেসিডেন্সি কলেজের বিতর্কসভার উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনিই। কলেজে ডিবেটিং ক্লাব গঠনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দিলীপকুমার রায়কে তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমাদের মধ্যে তর্কবিতর্কের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কারণ এদেশে বড় বড় বক্তা, বাক্‌যোদ্ধার বিশেষ প্রয়োজন—মানে, স্বাধীনতার জন্যে মুখপাত্র।'[১০৫] অর্থাৎ পরাধীন ভারতবর্ষের ব্যাপারে বিশ্বনায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে, দেশের

১০২। লেখকের নিকট বিবৃতি ঃ ২।১।১৯৭৭ ১০৩। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪
১০৪। সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন, পৃঃ ৮০ ১০৫। আমার বন্ধু সুভাষ, পৃঃ ৫

লোকের চিন্তাজগতে আলোড়ন তুলতে হলে, নিজেদের বক্তব্যকে গুছিয়ে তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। যুক্তির অস্ত্রবর্মে সুসজ্জিত হয়ে জগতের সামনে নিজেদের সমস্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সুভাষচন্দ্র ডিবেটিং ক্লাবের সপক্ষে দিলীপকুমারকে আরও বলেছিলেন : 'আমি চাই যে ছেলেরা দ্রুত চিন্তা করতে শিখুক। চিন্তাশক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রত্যয় আসবে—সেটাই তো বড় লাভ। আমরা ভারতবাসীরা, পরের মুখ চেয়ে চলতেই বড় বেশী অভ্যস্ত—কাজে, কর্মে, মতামতে, কোন কিছুর উদ্দীপনায় সবতাতেই আমরা আর-একজনের অপেক্ষায় বসে থাকি। তাই আমি এই বিতর্কসভার মধ্যে দিয়ে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা অর্জন করে নিতে চাই।'[১০৬] আমার বিশ্বাস, সুভাষের এই বিতর্কসভা গঠনের মূলে ছিলেন স্বামীজী। ভারতবর্ষ, আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে ভারতের আত্মার বাণী, তার আদর্শ, তার ধর্ম, দর্শন এবং আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের কথা এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতের দুরবস্থা এবং মর্মবেদনা তিনিই সর্বপ্রথম বলিষ্ঠ ভাষায় তুলে ধরেছিলেন। আধুনিক জগতের কাছে ভারতের যোগ্যতা এবং মহত্ত্বকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন ভিক্ষুকের দীনতা নিয়ে নয়, শ্রেষ্ঠতরের মর্যাদায় এবং একাজে তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতাই প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সবচেয়ে বেশী সহায়ক হয়েছিল। বিবেকানন্দের ভক্ত সুভাষ তা জানতেন। অরবিন্দ তাঁর অনবদ্য ভাষায় বলেছেন : 'The going forth of Vivekananda, marked out by the Master as the heroic soul destined to take the world between his two hands and change it, was the first visible sign to the world that India was awake not only to survive but to conquer.'[১০৭]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে তখন তিনি প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত। তাই দেখা যায় একদিকে আর্তত্রাণ, যুবসংগঠন, ব্যায়াম এবং বিতর্ক ইত্যাদি বাইরের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি করে চলেছেন নিভৃত ধ্যান, চিত্তশুদ্ধি, ব্রহ্মচর্য এবং আত্মবিশ্লেষণের সযত্ন অনুশীলন। সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সুভাষের এই সময়কার একটি ডায়েরী জাতীয় হাতেলেখা খাতা দেখেছিলেন।[১০৮] সেই খাতায় টুকরো টুকরো প্রবন্ধের আকারে সুভাষ তাঁর মনের অনেক কথা লিখে রেখেছিলেন। খাতাখানি সুভাষের কলেজের এক মুসলমান বন্ধু মহাসম্পদের মতো নিজের কাছে রক্ষা করেছিলেন বহুকাল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেখানি এখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ঐ খাতাতে সুভাষ নিজের হাতে একটি সুন্দর চার্ট এঁকেছিলেন। সেই চার্টে তাঁর সেই সময়কার মনের চিত্র খুব স্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছেন : 'তাতেই দেখেছিলাম, চিত্তশুদ্ধি ও সংযমকে তিনি জীবনে কতখানি স্থান দিয়েছিলেন এবং জীবনের চরম লক্ষ্যস্বরূপ তাতে অঙ্কিত ছিল, দেশ ও মানবতার শেষ ধাপের ওপর আত্ম-মুক্তি।'[১০৯] সুভাষের এই চিন্তা তাঁর উপর

১০৬। তদেব, পৃঃ ৯ ১০৭। Sri Aurobindo, Vol. 2, 1972, p. 37

১০৮। সুভাষচন্দ্র—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পি. কে. বোস অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, পৃঃ ৪৮-৯

১০৯। তদেব, পৃঃ ৫০

বিবেকানন্দ-দর্শনের সুগভীর প্রভাবেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রাবস্থায় সুভাষের জীবনের একটি ঘটনার কথা বলেছেন সুভাষের সতীর্থ চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'যাতে বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল'।[১১০] ঘটনাটির সঙ্গে তিনি (চারুচন্দ্র) প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর মতে এটি এখনও কেউ বলেননি। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা—সুভাষ তখন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। সুভাষ এবং স্যার যদুনাথ সরকারের ভাগ্নে হরিশ্চন্দ্র সিংহের নেতৃত্বে কলকাতার বস্তি-অঞ্চলে দু-জায়গায় দুটি নাইট স্কুল খোলা হয়েছিল। চারুচন্দ্রও দলে ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ঃ 'বস্তির লোকদের লেখাপড়া শেখানো আর through talks তাদের ভিতর revolutionary ideas ঢোকানো। ভারতবর্ষের ধর্ম এবং ইতিহাসের সঙ্গেও তাদের মোটামুটিভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হত। চেষ্টা করা হত দেখাতে কিভাবে ইংরেজ আমাদের সর্বনাশ করেছে।'[১১১] অবশ্য কয়েক মাস চলার পর পুলিসের দৃষ্টি পড়ায় স্কুল দুটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু, চারুচন্দ্র দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন ঃ 'এই যে আঠারো বছরের ছেলের (সুভাষের বয়স তখন আঠারো বছর) through education mass-এর মধ্যে history and revolutionary ideas spread করার চিন্তা—এ সে পেয়েছিল বিবেকানন্দের থেকে।'[১১২] দেশের জনশক্তিকে বিবেকানন্দ বলেছিলেন 'ঘুমন্ত লেভিয়াথান', 'রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন', 'এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারে'। তিনি জানতেন এরাই ভারতের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। তিনি বলেছিলেন ঃ '...এইসব নীচজাতদের ভেতর বিদ্যাদান জ্ঞানদান করে এদের ঘুম ভাঙাতে যত্নশীল হ্।'[১১৩] ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থা এবং মানসিকতার সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। তাই তিনি জানতেন যে, তাদের ছেলেরা বরং মাঠে গিয়ে অভিভাবকদের চাষের কাজে সাহায্য করবে অথবা অন্য কোন ভাবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করবে কিন্তু স্কুলে আসবে না। কারণ সে মানসিকতা তখনও তাদের এবং তাদের অভিভাবকদের তৈরী হয়নি। তাই স্বামীজী স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন—দরিদ্র বালক যদি বিদ্যালয়ে না আসতে পারে তাহলে শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে হবে দরিদ্রের কুটিরে। পর্বত যদি না আসে মহম্মদের কাছে তাহলে মহম্মদকেই যেতে হবে পর্বতসন্নিধানে।[১১৪] জনশিক্ষার জন্য সুস্পষ্ট কর্মসূচীও তিনি দিয়েছিলেন জাতিকে। বলেছিলেন ঃ 'শহরের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকানির্মিত কুটির ও হল প্রস্তুত কর। গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীব অনুন্নত, এমনকি, চণ্ডালগণকে পর্যন্ত জড় কর ; তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম উপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও।'[১১৫] জনশিক্ষার ব্যাপারে এত বৈজ্ঞানিকভাবে আর কেউ তাঁর আগে এদেশে

১১০। লেখকের নিকট বিবৃতি ঃ ২।১।১৯৭৭ ১১১। তদেব

১১২। তদেব ১১৩। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১০৯

১১৪। তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৪৪২ ১১৫। তদেব, পৃঃ ৪৩১-৩২

চিন্তা করেননি। পরাধীনতার অভিশাপ এবং ইংরেজ-শাসনের কুফল সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণ অবহিত হোক অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তারা রাজনৈতিক দিক দিয়ে জাগরিত হোক—বিবেকানন্দ তা চেয়েছিলেন এবং তিনি জানতেন যে তারা যখনই শিক্ষার আলোক পাবে তখন স্বাভাবিকভাবেই তা সম্ভব হবে।[১১৬] স্বামীজীর এই Mass Education Programme যুবক সুভাষচন্দ্রকে কিরকম প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে কেম্‌ব্রিজ থেকে লেখা ২৩ মার্চ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের একটি চিঠিতে।[১১৭]

মনকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে বিবেকানন্দই তাঁকে সাহায্য করেছিলেন—সুভাষচন্দ্র একথা লিখেছেন আত্মজীবনীতে।[১১৮] স্কুলজীবনে এবং ওটেনাইজেশনের পর কটকে দুঃস্থ ও আর্ত ত্রাণের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র ছুঁৎমার্গ তথা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সংগ্রামের প্রেরণাও তিনি পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের কাছ থেকে। অস্পৃশ্যতাদূরীকরণ সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা যে মহাত্মা গান্ধীই ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের পথিকৃৎ; কিন্তু গান্ধীজীর আগে স্বামীজীই আধুনিক ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম তাঁর বাণী ও কর্মের মাধ্যমে এই আন্দোলনের বলিষ্ঠ সূচনা করেছিলেন। সমাজের এই দুষ্ট ক্ষতের সংক্রমণক্ষমতার ব্যাপ্তি দেখে তীব্র বেদনায় কঠিন বিদ্রূপের সঙ্গে তিনি লিখেছেনঃ ' ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ...।'[১১৯] গভীর ক্ষোভের সঙ্গে প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলেছেনঃ 'আমরা এখন বৈদান্তিকও নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই; আমরা এখন কেবল "ছুঁৎমার্গী", আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে। ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর, আর ধর্মমত—"আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি মহাপবিত্র!" যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলা-গারদে যাইতে হইবে!'[১২০] আত্মজীবনীতে সুভাষচন্দ্র লিখেছেনঃ 'যে পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছিলাম সেটা মোটামুটি উদারভাবাপন্ন হলেও অনেক ক্ষেত্রে সমাজ ও পরিবারের বিরুদ্ধে আমাকে বিদ্রোহ করতে হয়েছে। আমার বয়স যখন চোদ্দ কি পনেরো সেসময়...প্রতিবেশী আমার এক সহপাঠী (দেবেন দাস) একদিন আমাদের কয়েকজনকে তার বাড়িতে খেতে বলে। মায়ের কানে কথাটা যেতেই তিনি স্রেফ আমাদের যেতে বারণ করে বসলেন। হয়তো বন্ধুটি আভিজাত্যে আমাদের চাইতে ছোট ছিল কিংবা আমাদের চেয়ে নিচু জাতের ছিল বলেই মা আপত্তি করেছিলেন...কিন্তু এক্ষেত্রে মায়ের আপত্তি আমার কাছে অত্যন্ত অসঙ্গত বলে মনে হল। আমি মায়ের নিষেধ অমান্য করেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম...পরে...প্রায়ই বাবা-মার নিষেধ অমান্য করতে হয়েছে। কিন্তু তার জন্য মনে কিছুমাত্র দ্বিধাও জাগেনি, কারণ তখন বিবেকানন্দের আদর্শ আমি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি—বিবেকানন্দ বলতেন আত্মোপলব্ধির জন্য সব বাধাকেই তুচ্ছ জ্ঞান করতে হবে। ভূমিষ্ঠ হয়েই শিশু যে কাঁদে, তার কারণ

১১৬। তদেব, পৃঃ ৪৩৫-৩৭ ১১৭। পত্রাবলী, পৃঃ ৯৪
১১৮। ভারত পথিক, পৃঃ ৫৭ ১১৯। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৮২
১২০। তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৮

আর কিছুই নয়, যে বাধানিষেধের গণ্ডির মধ্যে সে ভূমিষ্ঠ হয় তার বিরুদ্ধে তার স্বাধীনসত্তা বিদ্রোহ করে ওঠে।'[১২১]

॥ ৪ ॥

ভবিষ্যতে যিনি দুরভিসারের পথে, অনিশ্চিতের পথে, প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর পথে যাত্রা শুরু করবেন তাঁর কি পারিবারিক বিধিনিষেধের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকা চলে? বিবেকানন্দ তো জীবন দিয়ে সেই আদর্শই দেখিয়ে গিয়েছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে তাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ '...পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।'[১২২] 'চরৈবেতি'—উপনিষদের এই এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্রই জাতিকে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি অবশ্য তা পেয়েছিলেন তাঁর গুরু উপনিষদ্‌মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেই আদর্শকে সুভাষচন্দ্র 'মনেপ্রাণে' গ্রহণ করেছিলেন। তাই যখন আবেগময় ভাষায় তাঁকে তাঁর সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে আহ্বান জানাতে শুনি—হয় ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছব নতুবা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব[১২৩]—তখন মনে হয় এ যেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দেরই সেই নির্ভীক কণ্ঠস্বর যা জাতির অবসন্ন শক্তিকে সর্বপ্রথম অভীঃমন্ত্রে দীক্ষিত করে মুক্তির সূর্যতোরণের দিকে পরিচালিত করেছিল—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' ছিল যাঁর জীবনের মন্ত্র। বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ 'তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত।... অগ্রসর হও...পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।'[১২৪] ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক যখন তাঁর সৈন্যদের রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দিলেন তখন তাঁর কণ্ঠেও উচ্চারিত হল সেই একই বাণীঃ 'রক্তের ডাক এসেছে। ওঠো—জাগো! আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। অস্ত্র হাতে তুলে নাও। তোমাদের সম্মুখে যে পথ সে পথ আমাদের পূর্ববর্তী মহাপুরুষরা রচনা করে গিয়েছেন। ঐ পথ দিয়েই আমরা অগ্রসর হব। শত্রুসৈন্যের সারিবদ্ধ ব্যূহ ভেদ করে আমরা আমাদের পথ করে নেব। আর যদি ঈশ্বর চান, আমরা শহীদের মৃত্যু বরণ করব। এবং অন্তিম নিদ্রায় চুম্বন করে যাব ঐ পথকে যা আমাদের সেনাদলকে দিল্লী পৌঁছে দেবে। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী!'[১২৫] তথাকথিত অহিংস-আন্দোলন এবং আবেদন-নিবেদনের পথকে

১২১। ভারত পথিক, পৃঃ ৫৯-৬০ ১২২। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৯

১২৩। Selected Speeches of Subhas Chandra Bose, p. 196

১২৪। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭

১২৫। নেতাজীর মূল উক্তিটির জন্য The Springing Tiger—Hugh Toye, Allied Publishers Private Limited, Calcutta, First Edition (1959), p. 103 এবং সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পৃঃ ২০১ দ্রষ্টব্য।

স্বামীজী পছন্দ করতেন না। অশোকের অহিংসানীতির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ভারতের রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং ভারতবর্ষের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ অহিংসার ছদ্মবেশে আত্মঘ্ন তামসিকতার তথা নিষ্ক্রিয়তার অন্ধ অনুবর্তন।[১২৬] কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত অর্জুনকে সেই তামসিকতার মোহপাশ থেকে মুক্ত করেছিলেন গীতামূর্তি শ্রীকৃষ্ণ। ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামে স্বামীজী সেই পার্থসারথির ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র নবযুগের পার্থসারথির গীতোপদেশকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারতের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি অহিংসার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত অনুরাগকে অন্যতম বলে দায়ী করেছেন।[১২৭] স্বামীজী বলেছিলেনঃ কাপুরুষতাকে আমি ঘৃণা করি। আমার শিষ্যেরা যেন কখনও কোনমতে কাপুরুষ না হয়। সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্বামীজীর যথার্থ অনুগামী—সাহস, শক্তি ও ক্ষাত্রবীর্যের জীবন্ত বিগ্রহ। কারও মধ্যে কাপুরুষতা দেখলে ঘৃণায় তাঁর শরীর 'রিরি' করে উঠত। স্বাধীনতাকে রক্ত দিয়েই অর্জন করতে হবে।[১২৮] রক্তের বিনিময়ে অর্জিত না হলে স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য জাতি বুঝতে পারবে না—এ ছিল সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস। স্বামীজীও বিশ্বাস করতেন একথা। তাই স্বাধীনতার জন্য নিজের বুকেই প্রথমে ব্রিটিশের আঘাতকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তিনি।[১২৯] সৈনিকদের কাছে যখন সুভাষচন্দ্রের সেই উদাত্ত আহ্বানের কথা স্মরণ করি, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তার বিনিময়ে তোমাদের জানাব স্বাধীনতা অর্জনের শপথ স্বীকৃতি', তখন মনে হয় এর উৎস যেন বিবেকানন্দের সেই আগ্নেয় ঘোষণাঃ 'ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস কংগ্রেস করে মিছামিছি হৈ চৈ করছে কেন? কতকগুলো হাউড়ো লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলাবাজি করলেই কি কাজ হয়? চেপে বসুক, নিজেদের Independent বলে declare করুক, হেঁকে বলুক, "আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম", আর সমস্ত স্বাধীন Government-কে নিজেদের Declaration-পত্র পাঠিয়ে দিক্...কেবল কি গলাবাজিতে কাজ হয়? বেপরোয়া হয়ে কাজ করতে হবে...তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক,...পড়ুক গুলি আমার বুকে... Congress জোর গলায় নিজেদের স্বাধীনতা declare করুক, শুধু...বসে বসে কাঁদুনি গাইলে কি হবে?'[১৩০] স্বামীজী জানতেন ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা সহজে দেবে না, তা জোর করে আদায় করে নিতে হবে এবং তার জন্য রক্তপাত হবে অনিবার্য। ভিক্ষুকের আবেদন-নিবেদন নয়, বীর্য প্রকাশই ছিল তাঁর নীতি। তিনি ছিলেন বীর্যমূর্তি। 'শক্তি' ভিন্ন আর কিছু তিনি উচ্চারণ করেননি। তাই কেউ বলিদানে আপত্তি করলে শক্তির উপাসক

১২৬। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৩-৫৭ এবং নবম খণ্ড, পৃঃ ১৫১-৫২

১২৭। ভারতের মুক্তি সংগ্রাম, প্রথম খণ্ড—সুভাষচন্দ্র বসু, নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৭৭), পৃঃ ১১৯

১২৮। Selected Speeches of Subhas Chandra Bose, p. 177

১২৯। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৩), পৃঃ ১৯১

১৩০। তদেব, পৃঃ ১৯০-৯১

স্বামীজী খুব সহজ কণ্ঠে বলেছিলেন ঃ 'ছবিখানা নিখুঁত করবার জন্য হলই-বা একটু রক্তপাত!'[১৩১] এই বিদ্রোহী সন্ন্যাসীকে ব্রিটিশ সরকার রীতিমতো ভয় করত। তার কারণ সম্পর্কে স্বামীজী নিজেই একবার ইঙ্গিত করেছিলেন—'পাছে গৈরিক বসনের নীচে আর একজন শিবাজী লুক্কায়িত থাকেন'।

ভারত তথা পৃথিবীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান পরিচয় তিনি ভারতের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের এক বরেণ্যতম প্রতিভূ—নবযুগের বুদ্ধ অথবা শঙ্করাচার্য। কিন্তু ত্যাগের মহিমময় দীপ্তিতে তাঁর আর একটি পরিচয়ের অস্তিত্ব তাঁর অন্তরঙ্গ যাঁরা তাঁরা ছাড়া অনেকের আছে অপ্রকাশিত থেকে গিয়েছে। গৈরিক বস্ত্রের অন্তরালে দেশপ্রেমিক, বিদ্রোহী এবং সৈনিক বিবেকানন্দের অস্তিত্বকে অনেক সময় অবদমিত করে রেখেছিলেন সেই পেট্রিয়ট প্রফেট। কিন্তু অগ্নি যেমন ভস্মাচ্ছাদিত থাকতে পারে না, বিবেকানন্দের সেই দুর্বার বহ্নিসত্তারও তেমনি মাঝে মাঝে বিস্ফোরক আত্মপ্রকাশ ঘটত; কিন্তু ভবিষ্যৎ-বিশ্বের চিরন্তন পারমার্থিক কল্যাণের দিশারির যে ভূমিকা গ্রহণ করতে তিনি ঈশ্বরনির্দিষ্ট ছিলেন তার প্রয়োজনে তাঁর সহজাত সেই সত্তাকে তিনি সুকঠিন সংযমের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছিলেন। অবশ্য সেই বহ্নিস্ফুলিঙ্গকে তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন ভাবীকালের প্রজন্মের শোণিত-অভ্যন্তরে যার জ্বলন্ত প্রকাশ আমরা দেখেছি নেতাজীর মধ্যে। নেতাজীর বাহ্যিক পরিচয় ছিল দেশপ্রেমিক, বিদ্রোহী এবং মুক্তিসৈনিক, কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন আজীবন বৈরাগীই এবং তাঁর এই জীবনদর্শনের জন্য তিনি ঋণী ছিলেন স্বামীজীর কাছে। মোহিতলাল তাই তাঁকে শুধু স্বামীজীর 'উত্তরসাধক'-ই বলেননি, বলেছেন 'মানসপুত্র'। পুত্রের মধ্যেই বেঁচে থাকেন পিতা—যেমন বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং তাঁর অন্যান্য সন্ন্যাসী সন্তানদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মোহিতলাল লিখেছেন ঃ 'নেতাজী যে এক অর্থে স্বামীজীর মানসপুত্র তাহাতে সন্দেহ নাই; একজনের হৃদয়ে যাহা বীজরূপে ছিল আর একজনের জীবনে তাহাই বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তিতত্ত্বকেও গৌণ করিয়া যে সাক্ষাৎ-মুক্তি স্বামীজীর অন্তরে একটি প্রবল শক্তিরূপে বিরাজ করিত, নেতাজীও সেই মুক্তিকে অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন—দুইজনের প্রেমও সেই মুক্ত-প্রাণের পরার্থ-প্রীতি। স্বামীজীর যে হৃদয়—সঙ্কুচিত নয়—আপনাকে দমন করিয়া, যে-কামনাকে চরিতার্থ করিতে চায় নাই, সেই বিশাল হৃদয়ের নিপীড়িত কামনাই নেতাজীর মধ্যে অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বামীজী যদি গেরুয়া ত্যাগ করিতেন তবে সে আর কিছুর জন্য নয়—ঐ আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের "নেতাজী" হইবার জন্য। সেই প্রেম তাঁহারও ছিল, কেবল সেজন্য জ্ঞানের তপস্যাকে সংবরণ করিয়া কিছুকাল প্রেমের সমাধিতে সংজ্ঞাহারা হইতে হইত। অতএব স্বামীজীর মধ্যে আমরা যেমন নেতাজীর ঐ প্রেমের মূল দেখিতে পাই, তেমনই নেতাজীর মধ্যে স্বামীজীর সেই বাণীকেই মূর্তিমান হইতে দেখি—সেই একমন্ত্র—"Believe that you are free, and you will be" '[১৩২]

১৩১। The Master as I saw him, p. 136

১৩২। বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৪৪

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাছে ভারতবর্ষ শুধুমাত্র মৃন্ময়ী মাতৃভূমি ছিল না, ছিল তাঁর আরাধনার দেবী, 'the queen of his adoration'।[১৩৩] ভারতবর্ষের চিন্তা ছিল তাঁর কাছে প্রতি মুহূর্তের নিঃশ্বাসবায়ু—'the air he breathed'।[১৩৪] দেশকে এমন ভালবাসা বোধহয় ভারতবর্ষে এর আগে আর কেউ বাসেননি এবং 'দেশ' অর্থে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষকে সম্ভবত তাঁর আগে আর কেউ এমন জ্বলন্তভাবে হৃদয়ে অনুভব করেননি। নিবেদিতা লিখেছেনঃ 'যে মুহূর্তে আমি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে...এক অগ্নির নিরন্তর দহন-জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি; সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উন্মাদনা নয়—দেশ ও জাতির দুর্দশা-নিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস, ও তাহার নিষ্ফলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনাভোগ।'[১৩৫] ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও ঐ একই কথা বলেছেনঃ 'দেশের জন্য বেদনা, দেশের জন্য ব্যথা। ...বিবেকানন্দের হৃদয়ে ইহার যন্ত্রণাময় সাড়া পড়িয়াছিল। ...ঐ ব্যথার কথা ভাবি—বেদনার কথা চিন্তা করি—আর জিজ্ঞাসা করি—বিবেকানন্দ কে! দেশের জন্য ব্যথা কি কখন শরীরিণী হয়? যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।'[১৩৬] নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদও ছিল স্বদেশের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা এবং তার জন্য তিনি নিজেকে তিল তিল করে নিঃশেষে উৎসর্গ করেছিলেন। সে ইতিহাস তো আমাদের সকলেরই জানা। স্বাধীনতা—ভারতবর্ষের পূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা ছিল বিবেকানন্দ এবং সুভাষচন্দ্র উভয়ের একমাত্র স্বপ্ন এবং বিবেকানন্দকে ভালবেসেই সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নাকি রোমাঁ রোলাঁকে বলেছিলেন, বিবেকানন্দকে জানলেই ভারতবর্ষকে জানা যাবে। কারণ, একমাত্র বিবেকানন্দের চোখেই ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপটি প্রতিভাত হয়েছিল। তাকে তিনি শুধু প্রাণের আলোকে অনুভব করেননি, ধ্যানের গভীরে উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতের প্রতি তাঁর ভালবাসার পশ্চাতে প্রধানত ছিল সেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির স্বচ্ছ, নির্মল ধ্যানদৃষ্টি। ভারতবর্ষ ছিল তাঁর কাছে 'পুণ্যভূমি', 'দেবভূমি', যা-কিছু মহান, যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু পবিত্র তার প্রতীক, জ্ঞানচৈতন্যের জন্মদাত্রী। ভারতের অধ্যাত্মসত্তার সেই শাশ্বত রূপ যেন তাঁর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। রোমাঁ রোলাঁ তাঁকে বলেছেন, 'the Conscience of India, its Unity and its Destiny'।[১৩৭] নেতাজীর ভারতচেতনায়ও একটি অধ্যাত্মদৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে নদী, পাহাড়, প্রান্তর, জনপদ সমন্বিত একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ডমাত্র ছিল না, ছিল 'দেবাত্মভূমি'—'the divine motherland'। সেই দেবাত্মভূমি ভারতবর্ষের তিনি আধ্যাত্মিক তীর্থপথিক,—তিনি 'ভারতপথিক'। আত্মজীবনীতে তিনি নিজেকে এই নামেই

১৩৩। The Master as I saw him, p. 41 ১৩৪। ibid., p. 40

১৩৫। দ্রষ্টব্যঃ বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৯০ ১৩৬। উদ্ধৃতঃ বিশ্ববিবেক, পৃঃ ৯৩

১৩৭। The Life of Swami Vivekananda and the Universal Gospel—Romain Rolland, Advaita Ashrama, Calcutta, 1970, p. 22

অভিহিত করতে চেয়েছেন। নেতাজীর সেই স্বদেশচেতনার মূল সুরটির উৎস স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে ভারতের একটি 'মহিমময় ভবিষ্যৎ' আছে, সমস্ত জগতের জন্য তার একটি মহান 'বাণী' আছে যার জন্য জগৎ প্রতীক্ষা করছে। তিনি বলেছেন ঃ '...আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক। ...আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।'[১৩৮] স্বামীজী দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন ভারতবর্ষ ক্রমশ সেই গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং তার সার্থকায়ন নির্ভর করছে ভারতের ভাবী প্রজন্মের উপর। নেতাজীও স্বামীজীর প্রতিধ্বনি করে পরবর্তীকালে বলেছিলেন ঃ 'ভারতীয় জাতি একাধিকবার মরেছে—কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতের অস্তিত্বের সার্থকতা ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎ-সভায় শুনাতে হবে ; ভারতের শিক্ষার (Culture) মধ্যে এমন কিছু আছে যা বিশ্বমানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না। ...দেশান্তরে কারাবাসে মাসের পর মাস যখন কাটিয়েছি তখন প্রায়ই এই প্রশ্ন আমার মনে উঠত—"কিসের জন্য, কিসের উদ্দীপনায় আমরা কারাবাসের চাপে ভগ্নপৃষ্ঠ না হয়ে আরও শক্তিমান হয়ে উঠছি ?" নিজের অন্তরে যে উত্তর পেতাম তার মর্ম এই ঃ "ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে ; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব"।'[১৩৯] পরবর্তীকালে তিনি টোকিওতে ঘোষণা করেছিলেন—ভারতের সনাতন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে এক নতুন ধর্মবীর জাতিগঠনই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তিসাধকদের মধ্যে একমাত্র অরবিন্দ ছাড়া আর কারও স্বদেশচেতনার মধ্যে ভারতবর্ষের আত্মিক মহিমার এই রূপটি ফুটে ওঠেনি। তাই একথা জোর করে বলা যায় যে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সুভাষের অধ্যাত্মসত্তাই বিবেকানন্দের আত্মার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের উৎস প্রসঙ্গে সুভাষবন্ধু দিলীপকুমার রায় লিখেছেন ঃ 'স্বামীজীর দেশভক্তির এই দিব্য আদর্শ যে সুভাষকেও আকৈশোর অনুপ্রাণিত করেছিল এ আমার কথার কথা নয়। বিনিদ্র রাতে কতদিনই তার সঙ্গে এ-আলোচনা হয়েছে আমার, শুধু এদেশে নয় বিলেতেও। তাই আমি একথা অকুতোভয়েই বলতে পারি যে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের তপঃশক্তিই বিবেকানন্দের প্রসূতি, তেমনি বিবেকানন্দের তেজঃশক্তিই নেতাজীর দেশাত্মবোধের জনয়িত্রী তথা ধারয়িত্রী ছিল প্রথম থেকেই।'[১৪০]

বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তায় সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান ছিল না—প্রাদেশিকতার কোন মালিন্যস্পর্শ ছিল না। দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বলেছেন ঃ আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। মূর্খ-দরিদ্র-অজ্ঞ-মুচি-মেথর-ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, আমার

১৩৮। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫০-৫১

১৩৯। তরুণের স্বপ্ন—সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৫২), পৃঃ ১১-৩

১৪০। বিশ্ববিবেক, পৃঃ ২৩৪

রক্ত। শূদ্রের গলায় ব্রাহ্মণের পৈতে ঝুলিয়ে দিয়ে, ভাঙ্গী এবং মুসলমানের হাতে অন্ন গ্রহণ করে তিনি জাতিহীন, বর্ণহীন, শ্রেণীহীন, সম্প্রদায়হীন এক মহান ও মিলিত ভারতবর্ষের আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। স্বামীজী চেয়েছিলেন 'ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত' 'মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে' জেগে উঠবে—হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির ঐক্যে—'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহের' সুচারু সমন্বয়ে।[১৪১] সিস্টার ক্রিস্টিন লিখেছেন : 'To him India was not the land of the Hindu only, it included all. "My brother the Mohammedan" was a phrase he often used.'[১৪২]

ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল সদাজাগ্রত দৃষ্টি। তাই জাতীয়তাবোধকে তিনি ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মিলনের ভিত্তিভূমিতে সংহত করতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী যে আদর্শের সূচনা করেছিলেন নেতাজী তাকে যে শুধু বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তৃততর করে রূপদান করেছিলেন তা-ই নয়, তাকে ভারতের জাতীয় চেতনার তন্ত্রীতে সংযুক্ত করেছিলেন। তাঁর 'আজাদ হিন্দ্ বাহিনী' সংগঠিত হয়েছিল ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশের জওয়ানদের সম্মিলিত শক্তি ও আত্মত্যাগে। যে বলিষ্ঠ জাতীয়চেতনার উন্মেষ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে তার পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন : 'The greatest lesson that we can draw from Netaji's life is the way in which he infused the spirit of unity amongst his men so that they could rise above all religious and provincial barriers and shed together their blood for the common cause.'[১৪৩] বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন ধর্ম এবং বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্ব সত্ত্বেও ভারতবর্ষের আত্মা এক। সেই আধ্যাত্মিক ঐক্যের বাণী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং ঐ ঐক্যভূমিতে বর্তমান যুগে তিনি 'এক নূতন মহাভারতের ভিত্তি' স্থাপন করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই ভিত্তির উপর সৌধ রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। জাতীয় ঐক্যচেতনার সেই প্রথম বার্তাবহ প্রসঙ্গে মোহিতলাল বলেছেন : 'ঐ বাণীই তাঁহার বাণী ; উহাই জাতীয়তার মন্ত্র-বাণী। এই বাণীই নেতাজীকে অনুপ্রাণিত করিয়া তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিকে সম্ভব করিয়াছে। স্বামীজীর সেই অধ্যাত্ম-দৃষ্টি নেতাজীর বাস্তব-দৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। তিনিও সর্বজাতি ও সর্বসম্প্রদায়ের ভেদ ঘুচাইয়া, স্বামীজীর সেই ধ্যানলব্ধ "মহাভারত"কে সাকার করিয়া তুলিয়াছেন।'[১৪৪]

কিন্তু বিবেকানন্দ এবং সুভাষচন্দ্রের স্বদেশভাবনার মধ্যে একটি লক্ষণীয় পার্থক্য

১৪১। বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৩৯

১৪২। Reminiscences of Swami Vivekananda—His Eastern and Western Admirers, Advaita Ashrama, Calcutta, First Edition (1961), p. 208

১৪৩। Netaji : His Life and Work—Edited by Ram Sharma, Shiva Lal Agarwala & Co. Ltd., Agra, First Edition (1948), p. iii

১৪৪। বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৪৫

আছে। সুভাষচন্দ্রের স্বদেশচেতনা—তা যত গভীরই হোক না কেন—শুধু ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করেই সীমায়িত ছিল, কিন্তু বিবেকানন্দের স্বদেশচেতনা মহাভারতের সীমানা অতিক্রম করে এক অখণ্ড বিশ্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। বিবেকানন্দের চেতনায় এই বিশ্ববাণীর বীজ বপন করেছিলেন তাঁর গুরু 'যত মত তত পথ' মন্ত্রের উদ্গাতা শ্রীরামকৃষ্ণ এবং প্রতীচী দিগন্তের সংস্পর্শে এসে তাঁর মধ্যে সেই বিশ্ববাণীর চেতনা, রোমাঁ রোলাঁ যাকে বলেছেন 'ইউনিভার্সাল গস্পেল', তা পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ আগস্ট নিউইয়র্ক থেকে ই. টি. স্টার্ডিকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন : 'ভারতকে আমি সত্য সত্যই ভালবাসি; কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশতঃ লোকে যাহাদিগকে "মানুষ" বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই "নারায়ণের"ই সেবক।'[১৪৫] ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর আলাসিঙ্গাকে লিখছেন : 'আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের।'[১৪৬] তাই আমেরিকার নিগ্রোদের অপমানে তাঁর অন্তরাত্মা বেদনায় হাহাকার করে ওঠে। মিশরের দেহোপজীবিনীদের দেখে নারীত্বের দুর্দশায় করুণার ঢল নামে তাঁর দু-চোখে। নতজানু দেহপসারিনীদের সামনে তিনি প্রতিভাত হন ঈশ্বরমানবের মহিমায়, যাঁর ললাটে লেখা রয়েছে : 'I am not come to destroy, but to fulfil.'[১৪৭] বস্তুত, শুধু ভারতে নয় সমগ্র জগতের চিন্তা ও কর্মে যেখানে যত অপূর্ণতা ছিল তার পূর্ণতা সাধন করতেই তাঁর আসা। বিবেকানন্দ-সুভাষচন্দ্র আলোচনা প্রসঙ্গে কথাটি মনে রাখা দরকার যে ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের একটি বিরাট ভূমিকা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ছিল শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিবেকানন্দ এসেছিলেন একটা যুগের প্রয়োজনে, মানুষকে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করে দিতে এবং শুধু ভারত, ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যেই তাঁর কর্মক্ষেত্র সীমিত ছিল না—সমগ্র বিশ্বের পটভূমিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে তিনি দৈবনির্দিষ্ট ছিলেন। শুধু ভারতের মানুষের মুক্তিরই নয়—বিশ্বমানবের মুক্তিরও তিনি ছিলেন একজন প্রধান বার্তাবহ। তাই তাঁর স্বদেশপ্রেম যে বিশ্বধর্মেরই নামান্তর হবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তবে ভারতবর্ষ ছিল তাঁর জন্মভূমি এবং গুরুর শিক্ষায় তিনি 'শুকনো সন্ন্যাসী' হননি। সেই দুর্ধর্ষ বৈদান্তিকের মধ্যে নিবেদিতা মূর্তিমান প্রেমের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং সেই প্রেম বিশেষভাবে তাঁর মাতৃভূমির চরণে ছিল নিবেদিত। 'পর্বতের মতো অটল, পাষাণের মতো কঠিন সেই পুরুষ' অক্লেশে স্বীকার করেছিলেন : 'আমার চরিত্রের সর্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, আমি আমার দেশকে ভালবাসি, বড় একান্তভাবেই ভালবাসি।'[১৪৮] তাঁর হৃদয়ের সেই অগ্নিময় প্রেরণাকে তিনি সঞ্চার করে দিয়েছিলেন জাতির অন্তরে এবং সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক নেতা না হয়েও তিনি ছিলেন 'ভারতীয় স্বাধীনতার

১৪৫। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৯১ ১৪৬। তদেব, পৃঃ ১৯৬

১৪৭। The Holy Bible, New Testament, Saint Matthew, Authorized or King James Version, Universal Book and Bible House, Philadelphia, U.S.A., 1948, 5/17

১৪৮। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৮

জনক'[১৪৯]—'আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিকস্রষ্টা।'[১৫০] তাঁর অগ্নিবাণী ভারতবর্ষকে তার আত্মঘ্ন আত্মবিস্মৃতি থেকে মুক্ত করে এক অখণ্ড জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে রোমাঁ রোলাঁ মন্তব্য করেছেনঃ 'If the generation that followed, saw, three years after Vivekananda's death, the revolt of Bengal, the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi, if India today has definitely taken part in the collective action of organized masses, it is due to the initial shock, to the mighty "Lazarus, come forth!" of the Message [delivered by Swami Vivekananda] from Madras.'[১৫১] স্বামীজী জীবিতকালেই লেভিয়াথানের নিদ্রাভঙ্গ লক্ষ্য করেছিলেনঃ 'সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হইতেছে।... নিদ্রিত শব জাগিয়া উঠিতেছে, তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না; বিকৃতমস্তিষ্ক যে, সে বুঝিতেছে না—আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে...কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না...কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙিতেছে।'[১৫২] স্বামীজী স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন বিদেশী শাসনের মৃত্যুঘণ্টা, জাগ্রত ভারতবর্ষের অদূরাগত দৃপ্ত পদধ্বনি। তাঁর এই নির্ভুল প্রফেটিক দৃষ্টি সুভাষচন্দ্রকে উদ্দীপ্ত করেছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ আগস্ট ভারতবর্ষের উদ্দেশে তাঁর বাণীতে নেতাজী গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন—স্বাধীনতার সিংহদ্বারে আমরা এসে পৌঁছেছিঃ 'ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমরা মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস হারিও না। পৃথিবীর কোন শক্তিই আর ভারতবর্ষকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতে পারবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই এবং সেদিনের আর দেরি নেই।'[১৫৩] নেতাজী শূন্যে ইমারত গড়তে প্রয়াসী হননি। বিশ্বাসের প্রস্তরভূমিতে ছিল সেই ইমারতের সুদৃঢ় ভিত্তি। সে বিশ্বাস যে কত সত্য ছিল তা অচিরেই প্রমাণিত হল। ঠিক দু-বছরের মাথায় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। নেতাজী এর আগেও বহুবার বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দিন অভ্রান্ত গতিতে এগিয়ে আসছে। তাঁর সেই দৃঢ় প্রত্যয়ের পশ্চাতে যে স্বামীজীর অমোঘ বাণীর সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঐ বাণীই ছিল তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই।' ১৮৯৭ থেকে পঞ্চাশ বছর অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দটিকেই কি তিনি চিহ্নিত

১৪৯। বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৯৯; উক্তিটি চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর।

১৫০। ভারতের মুক্তি সংগ্রাম, পৃঃ ২১

১৫১। The Life of Swami Vivekananda and the Universal Gospel, pp. 113-14

১৫২। বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৮

১৫৩। Selected Speeches of Subhas Chandra Bose, p. 240

করতে চেয়েছিলেন? আরও আশ্চর্যের বিষয়—স্বামীজী ঐ বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে এবং তার ঠিক পঞ্চাশতম ফেব্রুয়ারিতেই অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মেজর অ্যাটলীর কমন্স সভায় এক ঘোষণায় ভারতবর্ষকে তার নিজের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার-স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[১৫৪] এই পঞ্চাশটি বছর ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল। এই সময়ের মধ্যে ভারতের জাতীয় সংগ্রাম বিভিন্ন সশস্ত্র আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন, অসহযোগ-আন্দোলন, লবণ-সত্যাগ্রহ, ভারতছাড়-আন্দোলন এবং সর্বশেষে ভারতের পূর্ব সীমান্তে নেতাজীর সৈন্যসমাবেশ ও যুদ্ধঘোষণা প্রভৃতি নানা ধারায় প্রবাহিত হয়ে অবশেষে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল এবং একথা বললে একটুও অতিশয়োক্তি হবে না যে বিপ্লব-আন্দোলনের এই বিচিত্র ধারার অনুপ্রেরণার উৎসকেন্দ্র ছিল প্রধানত স্বামীজীর স্বদেশভাবনা, কর্মতপস্যা এবং অগ্নিবর্ষী রচনা ও বক্তৃতা।

বস্তুত, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর পার্থিব দেহের অবসান হলেও তাঁর জীবন ও বাণী স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষকে প্রচণ্ডভাবে সঞ্জীবিত ও প্রভাবিত করে চলেছিল এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ সেই অব্যাহত প্রভাবেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামে ভারতবর্ষ জয়ী হয়েছে। রাজনৈতিক মুক্তি আজ জাতির করায়ত্ত। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর একটি মুক্তিসংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। সে সংগ্রাম অবশ্য কোন বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে নয়—সে সংগ্রাম আমাদের অন্তরের মালিন্যের বিরুদ্ধে—সে সংগ্রাম আমাদের সব রকম নৈতিক অধঃপতন থেকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে উত্তরণের সংগ্রাম। আগামী দিনে যে সংগ্রাম প্রত্যাসন্ন তা হবে মূলত আমাদের মানসজগতে। কারণ সে সংগ্রাম চরিত্রের, সে সংগ্রাম বিবেকের, সে সংগ্রাম পরিপূর্ণতার। সে সংগ্রাম জাতিকে নৈতিক মূল্যবোধের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার—যার ফলে ভারতবর্ষ বিবেকানন্দ-কল্পিত আধ্যাত্মিক বিশ্ব জয়ের যোগ্যতা অর্জন করবে। স্পষ্টত সেই সংগ্রাম হবে পূর্ববর্তী সংগ্রামের চেয়ে আরও কঠিন, আরও দীর্ঘ এবং আরও অনেক বেশী আত্মত্যাগের। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, ঐ সংগ্রামেও ভারতবর্ষ জয়ী হবে। কারণ বিবেকানন্দের কালজয়ী বাণী পূর্বের মতো এখনও প্রাসঙ্গিক, বরং অধিকতর প্রাসঙ্গিক, এবং সে প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ বেড়েই চলবে। বিবেকানন্দের বাণী তো কোন ব্যক্তিবিশেষের বাণী নয়, তা অমর ভারতাত্মারই বাণী। বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা দেখেছি তার দেহধারী প্রকাশ। ব্রিটিশ-পদানত ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য স্বামীজীর অনুপ্রেরণায় যে জাতীয় সংগ্রামের সূচনা তার সমাপ্তি হয়েছিল যথাক্রমে গান্ধীজী এবং নেতাজীর নেতৃত্বে। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা-অর্জনের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের ভাবী সুদীর্ঘ ও বন্ধুর আধ্যাত্মিক অভিযাত্রার প্রাথমিক প্রতিবন্ধকটি অপসারিত হয়েছে মাত্র। আমাদের সামনে এখন বিরাট চ্যালেঞ্জ।

১৫৪। Militant Nationalism in India—Bimanbehari Majumdar, General Printers & Publishers Private Limited, Calcutta, 1966, p. 46

কিন্তু বিবেকানন্দ দিয়েছেন আমাদের চূড়ান্ত আশ্বাসবাণী : 'I have given...enough for fifteen hundred years !'[১৫৫]—আমি যে বাণী রেখে যাচ্ছি তা আগামী দেড় হাজার বছরের প্রয়োজনের চেয়েও বেশী। সুতরাং অনাগত দিনের মুক্তিসংগ্রামের যাঁরা অরবিন্দ, গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্র তাঁরা নিশ্চয় সেই 'আত্মাজাগানিয়া'র আত্মার আলোকে নিজেদের প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে ভবিষ্যৎ ভারতগঠনে অগ্রসর হবেন। কারণ বিবেকানন্দের পথই ভারতবর্ষের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির একমাত্র পথ। নান্যঃ পন্থাঃ। একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা লিখেছেন : 'Vivekananda did not die in 1902. He lived till 1946. His ideas, his *sadhana* flowed in different channels to enrich and vitalise the nation and enabled it to win the first round [i.e. to achieve independence from the British rule]. With Gandhi and Bose close the epoch which he had opened. A new chapter has begun. The future will show whether his soul has died or it will reincarnate to spiritualise the nation and to guide it to the conquest of mankind.'[১৫৬]

॥ ৫ ॥

স্বামীজী বলেছিলেন—ভারতের ঐতিহ্যই তার প্রাণসম্পদ এবং সেই ঐতিহ্যের ভিত্তি হল ধর্ম এবং অধ্যাত্মজীবন। বহু সঙ্কট ও বিপত্তি স্বীকার করেও ভারত যে আজও নিজের সত্তাকে অবিকৃত রেখে বেঁচে আছে তার কারণ এই জীবনপ্রদ শক্তির অস্তিত্ব। তাই ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতাকেই জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিত্তি করার কথা স্বামীজী নির্ভীক পৌরুষের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন এবং আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে ভারতবর্ষের মাটিতে জাতীয় আদর্শকে বাদ দিয়ে বিদেশী কোন রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক মতবাদ বা কাঠামো কখনও কল্যাণকর হবে না। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : 'Do you want that the Ganga should go back to its icy bed and begin a new course ? Even if that were possible, it would be impossible for this country to give up her characteristic course of religious life and take up for herself a new career of politics or something else...this religious line...is the line of life, this is the line of growth, and this is the line of well-being in India.'[১৫৭] স্বামীজী জানতেন যে বর্তমান পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কোন জাতি বা কোন দেশ বেঁচে থাকতে পারবে না। সুতরাং ভারতবর্ষকে বিদেশ থেকে কিছু নিতেই হবে। তাছাড়া, বৈচিত্রের মধ্যে সমন্বয়, বিরোধের মধ্যে ঐক্যস্থাপন ভারতের চিরন্তন ধর্ম; গ্রহীষ্ণুতা ভারতসংস্কৃতির সনাতন বৈশিষ্ট্য।

১৫৫। The Life of Swami Vivekananda, Vol. II—His Eastern and Western Disciples, Advaita Ashrama, Calcutta, Fifth Edition (1981), p. 590

১৫৬। Studies in the Bengal Renaissance—Edited by Atulchandra Gupta, 1958, pp. 120-21 ১৫৭। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, p. 179

অই স্বামীজী বলেছেন, বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে নয়, জাতীয় ঐতিহ্যকে বর্জন করে নয়। আমরা অবশ্যই ভিক্ষাপাত্র নিয়ে পাশ্চাত্যের দ্বারে উপস্থিত হব না। বিনিময়ে আমরা তাদের দেব আমাদের ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতা। অনুকরণ নয়, সুস্থ আদানপ্রদান এবং সমন্বয়ের ভিত্তিতে গড়তে হবে ভবিষ্যৎ ভারতের মূল নীতি। তিনি বলেছেন ঃ 'ঘরের...সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন বাইরের উগ্র তরঙ্গাঘাতে 'আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি' যেন 'ভাসিয়া' না যায়। সেজন্য 'ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে'।[১৫৮] আমরা অবশ্যই প্রাচীনকালের জীবনধারাকে গ্রহণ করব না তবে আধুনিকতার নামে আমরা যদি পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিকতা ও বাহ্যিক জলুসকে গ্রহণ করি তাহলে আমরাই রচনা করব আমাদের ভবিষ্যতের সমাধি। স্বামীজী তাই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ 'বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান!'[১৫৯]

ভারতপুরুষ বিবেকানন্দের আর্যপ্রজ্ঞায় যে সত্যটি অভ্রান্ত আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল তা যেন প্রতিফলিত দেখি নেতাজীর জীবনে ও মানসিকতায়। তিনিও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়, যেন স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন ঃ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরিবেশ ও সংস্কৃতির বুনিয়াদে গড়ে তুলতে হবে আজিকার ভারতের জীবনবেদ। আমাদের জীবন গড়ে তুলতে হবে আধুনিককালে এবং আধুনিক পরিবেশে। কিন্তু আমি তাদের দলভুক্ত নই যারা আধুনিকতার উৎসাহে অতীতের গৌরবকে ভুলে যায়। অতীতের বুনিয়াদে আমাদের দাঁড়াতে হবে। ভারতের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, যাকে ভারতের নিজস্ব ধারায় বিকাশোন্মুখ করে তুলতে হবে। এককথায় আমাদের একটি সমন্বয়ে আসতে হবে। একদিকে আমাদের বেদের যুগে ফিরে যাওয়ার আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, অন্যদিকে আধুনিক ইউরোপের অর্থহীন বিলাস ও পরিবর্তনের লালসার প্রতিরোধ করতে হবে।... আমাদের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে আমরা একটি নূতন ও আধুনিক জাতি গড়ে তুলতে চাই।'[১৬০] অর্থাৎ ভারত ভারতই থাকবে। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, আমস্টারডাম অথবা মস্কোর দ্বিতীয় সংস্করণ হবে না। যদি উল্লেখ করে না দেওয়া হয় তাহলে যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন ও রচনার সঙ্গে পরিচিত তাঁদের পক্ষে উপরের কথাগুলি স্বামীজীর বলে মনে হওয়া অসঙ্গত নয়। বিবেকানন্দের প্রভাব সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শনকে এমনই সঞ্জীবিত করেছিল।

স্বামীজী জানতেন পাশ্চাত্যের অগ্রগতির মূলে রয়েছে বিজ্ঞান এবং শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের উন্নতি। স্বামীজী চাইতেন ভারতবর্ষেও বিজ্ঞান এবং শিল্পের প্রসার হোক। তাই জগদীশচন্দ্রের সাফল্যে তিনি বালকের উল্লাসে আত্মহারা হয়েছিলেন এবং স্বামীজীর

১৫৮। বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৪ ১৫৯। তদেব, পৃঃ ২৪৭

১৬০। দ্রষ্টব্য ঃ নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা, পৃঃ ১৫০

কাজ হিসাবেই পরবর্তীকালে নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করাকে নিজের একটি প্রধান ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অনেকেই জানেন না যে আজকের বিজ্ঞান-গবেষণার সারস্বতকেন্দ্র 'বসু বিজ্ঞানমন্দিরের' একজন প্রধান রূপকার ছিলেন নিবেদিতা—নেপথ্যে থেকে তিনি জগদীশচন্দ্রকে সব সময় সাহস দিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন, দিয়েছেন তাঁর অমূল্য সময়ের অনেকখানি অংশ, দিয়েছেন বহু বিনিদ্র রজনীর শ্রম এবং ব্যবস্থা করেছেন আর্থিক নির্ভরতার। বস্তুত, নিবেদিতার সহযোগিতা না পেলে জগদীশচন্দ্রের পক্ষে 'বসু বিজ্ঞানমন্দিরের' পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব ছিল না।[১৬১] নিবেদিতার এই আন্তরিকতার মূলে ছিল ভারতে বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য তাঁর প্রিয়তম গুরুদেবের স্বপ্নকে রূপায়িত করার ঐকান্তিক প্রয়াস। আজকের শিল্পনগরী জামসেদপুরের যিনি স্রষ্টা সেই জামসেদজী টাটা স্বামীজীর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন প্রথম প্রেরণা।[১৬২] ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং শিল্পোন্নতির জন্য স্বামীজীর বাস্তবমুখী চিন্তাকে সুভাষচন্দ্রও গ্রহণ করেছিলেন এবং এজন্য স্বামীজীর নির্দেশমতো বিদেশের সাহায্য গ্রহণকে তিনি অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। দেশে যন্ত্রশিল্পায়নের তিনি ছিলেন একজন প্রধান সমর্থক। কংগ্রেস সভাপতিরূপে তিনি যে 'প্ল্যানিং কমিশন' গঠন করেছিলেন তাতে শিল্পোন্নয়নকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ব্যক্তিজীবনে আধ্যাত্মিক মানুষ হলেও 'জাতীয় জীবনের পক্ষে ঐহিক সমৃদ্ধির প্রয়োজনকে তিনি কখনও অগ্রাহ্য করতে পারেননি। ঐহিকতা থেকে মানুষ আধ্যাত্মিকতায় উত্তীর্ণ হতে পারে তা তিনি জানতেন; স্বামী বিবেকানন্দের মতো অপরপক্ষে তিনি বিশ্বাস করতেন—গণমানুষের স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের পক্ষে ঐহিক সমৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন; আধ্যাত্মিকতার নাম করে মানুষকে তার স্বাভাবিক জীবন-প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত করার মতো অন্যায় আর কিছু নেই। মৃতের সন্তোষ অপেক্ষা জীবিতের অসন্তোষ তাঁর কাছে বড় জিনিস বলে মনে হয়েছিল। এমন মনে করার শিক্ষা তিনি আধুনিক ভারতের সবচেয়ে বড় অধ্যাত্মনেতা স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।'[১৬৩] গুরুর কথার প্রতিধ্বনি করে স্বামীজী বলেছিলেন 'খালিপেটে ধর্ম হয় না'। অর্থাৎ সুস্থ সমাজব্যবস্থা গঠন করতে হলে অধ্যাত্মসাধনা এবং বস্তুবাদ, চৈতন্য এবং জড়, আত্মা এবং দেহ—দুয়ের সমন্বয় সাধন করতে হবে, যেমন অতীতে ভারতবর্ষ করেছিল। অভাবমুক্ত সমাজে মানুষ সহজে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন করতে উৎসাহী হবে। তাই দৈনন্দিন জীবনে সচ্ছলতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তারপর ধর্মের উপদেশ কার্যকরী হবে। স্বামীজী বলেছিলেন, যে ক্ষুধার্ত তার কাছে রুটিই হচ্ছে একমাত্র ঈশ্বর। কিন্তু যন্ত্রসভ্যতা বা বিজ্ঞানকে স্বাগত জানালেও স্বামীজী তাকেই আদর্শ বলে মনে করেননি। আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূরক হিসাবেই যে বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়-সাধন প্রয়োজন—তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। স্বামীজীর সেই একান্তভাবে বাস্তবমুখী এবং যুগোপযোগী সমন্বয়ী

১৬১। দ্রষ্টব্য: নিবেদিতা লোকমাতা, প্রথম খণ্ড—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ (১৩৭৫), পৃঃ ৫৪৩-৭৫৭ ১৬২। বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৪৩-৪৫

১৬৩। সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, জয়শ্রী প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭০, মুখবন্ধ ঘ

দৃষ্টিভঙ্গিই নেতাজীর জীবনদর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে : 'ভারতের ইতিহাসে সেইদিনই ছিল গৌরবময় যুগ যখন জড় ও চেতন, দেহ ও আত্মার দাবির সুবর্ণ সামঞ্জস্য বিধান এবং দুদিকেই প্রগতি সম্ভব হয়েছিল। দেহ ও আত্মার গভীর সম্বন্ধের ফলে দেহের উপেক্ষা শুধু জাতির দেহকেই দুর্বল করে না, কালস্রোতে জাতির আত্মাকেও অক্ষম করে দেয়। আজকের ভারতবর্ষ দেহের লাঞ্ছনায়ই ভুগছে না—আত্মার ক্ষীণতায়ও ভুগছে। জীবনের একদিককে অবহেলা করার ইহাই অনিবার্য পরিণতি। যদি আমাদের জাতীয় জীবনের পুনঃ সংস্থান করতে হয় তাহলে দুদিকেই আমাদের সমানভাবে এগিয়ে যেতে হবে।'[১৬৪] হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্র উপস্থাপিত করেছিলেন এবং 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২৯-৩০) ভবিষ্যৎ ভারতের প্রয়োজনে এক নূতন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও লক্ষ্যের যে খসড়া তিনি রচনা করেছিলেন তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে চিন্তানায়ক বিবেকানন্দের প্রভাব উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট পরিমাণে ক্রিয়াশীল ছিল। বিবেকানন্দ কোন রাজনৈতিক নেতা, সমাজবিজ্ঞানবেত্তা কিংবা অর্থনীতিবিদ্ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী—একজন প্রচণ্ড দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী। কিন্তু তাঁর প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী এবং 'সর্বন্ধর'।

স্বামীজী জানতেন ভারতবর্ষের রাজনীতি এবং সমাজব্যবস্থায় একটি বিরাট পরিবর্তন আসছে। আসছে শূদ্রযুগ—আসছে সত্যযুগ—যার সূচনা হয়েছে, স্বামীজীর মতে, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এবার সবাই এক হয়ে যাবে। তবে ব্রাহ্মণকে নামিয়ে দিয়ে নয়, শূদ্রকে ব্রাহ্মণের পদবীতে উন্নীত করে। শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে জড়বাদী কমিউনিজম নয়, সমন্বয়ী সমাজবাদের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদকে বৈদান্তিক মানবতাবাদের ভাগবত স্তরে উত্তরণ করার মন্ত্র দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই প্রথম সমাজবাদের আদর্শের কথা উচ্চারণ করেছেন। স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—'আই অ্যাম এ সোস্যালিস্ট'—'আমি একজন সমাজবাদী।' কিন্তু প্রচলিত অর্থে যে সমাজবাদ, অর্থাৎ মার্কসীয় সমাজবাদ, সেই সমাজবাদকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না ; তাকে ঐক্য ও মানবতাধর্মী ভারতীয় বেদান্তদর্শন এবং ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও মানসিকতার সঙ্গে সমন্বিত করে একটি অভিনব সমাজবাদে রূপান্তরিত দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। তারই ভিত্তিতে ভারতবর্ষের নিপীড়িত মানুষকে এক নতুন সমাজ-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত দেখা ছিল তাঁর স্বপ্ন। নেতাজীর সমাজবাদের প্রেরণাও স্বামীজীর এই ভাগবতরসে সঞ্জীবিত সমাজবাদ থেকেই উদ্ভূত। চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে, মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে—ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবীদের মধ্য থেকে যে 'নূতন ভারতের' আবির্ভাবকে স্বামীজী স্বাগত জানিয়েছিলেন তার সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বলেছেন : কার্ল মার্কসের বই থেকে এই সমাজবাদের জন্ম হয়নি। ভারতের চিন্তা

১৬৪। দ্রষ্টব্য : নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা, পৃঃ ১৪৯

এবং সংস্কৃতিতেই রয়েছে এর উৎস। বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা সেই উৎস থেকেই প্রবাহিত, যার রূপায়ণের উপর নির্ভর করছে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতি।[১৬৫]

॥ ৬ ॥

রাজনৈতিক জীবনের ব্যস্ততার মধ্যে শিক্ষা নিয়ে সুভাষচন্দ্র গভীরভাবে চিন্তা করার সময় পাননি। যদিও বিলেত থেকে ফিরে আসার পরে 'জাতীয় বিদ্যাপীঠে'র অধ্যক্ষ হিসাবে দেশবন্ধুর জাতীয় শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়িত করার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের আহ্বানে তাঁর সে চেষ্টায় ছেদ পড়ে। দেশবন্ধুর জাতীয় শিক্ষাচিন্তা ছিল পরোক্ষভাবে স্বামীজীরই শিক্ষাচিন্তা। কারণ, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তিনি স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[১৬৬] স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার মূল কথা হলঃ 'Man-making' এবং 'Character-building'—এককথায় মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, যার দুটি আবশ্যিক সর্ত হল জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা। স্বামীজীর মতে যথার্থ শিক্ষার সংজ্ঞা হল—যার ফলে মানুষের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগবে, ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনচিন্তা ও আত্মসচেতনতার উন্মেষ হবে, চরিত্রবল ও সিংহসাহসিকতা আসবে, মানুষ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারবে এবং তার মধ্যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হবে তা-ই শিক্ষা। সুভাষচন্দ্র তাঁর বহু চিঠি এবং বক্তৃতায় স্বামীজীর এই শিক্ষাচিন্তাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ্ সরকারের জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনায় এই আদর্শকেই কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন। আজাদ হিন্দ্ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে প্রচারিত 'Religious Instructions' থেকে জানা যায় যে নেতাজী তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় পুঁথিগত বিদ্যা নয়, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন অর্থাৎ চরিত্রগঠনের উপরই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র বলতেন, 'চরিত্রগঠনের জন্য "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য" অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।'[১৬৭]

১৬৫। Selected Speeches of Subhas Chandra Bose, p. 50

১৬৬। দেশবন্ধু তাঁর জাতীয় শিক্ষানীতির আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবেঃ 'আমাদের শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে যদি না আমাদের দেশের অন্তরের যোগ থাকে, তার রাষ্ট্র, তার সমাজ ও আচার ব্যবহার, তার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যদি তার সম্পর্ক লুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে সে শিক্ষা জাতির স্বাভাবিক উত্থানের পথে বাধার সৃষ্টি করবে এবং তার মনুষ্যত্বকে খর্ব করে রাখবে। যে শিক্ষা মনুষ্যত্ব বাড়ায়, সাহস বাড়ায়, নিজের অধিকার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা এনে দেয়, যে শিক্ষায় বাঙালী বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারে—আমি শুধু বাঙালী নই, আমি পরিপূর্ণ মানুষ, জাতি হিসাবে স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার, ন্যায্য দাবি—সেই শিক্ষাই আমাদের জাতীয় শিক্ষা।' [সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পৃঃ ১৯-২০]

১৬৭। বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৯৭

॥ ৭ ॥

স্বামীজী ভারতীয় সমাজে নারীকে এক মহান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গার্গী, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে সঙ্গে বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ-এর আবির্ভাবকেও তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি বলতেন ঃ '(এদেশের মেয়েদের) বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এসময়ে তাদের মধ্যে self-defence শেখা দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ দেখি ঝাঁসির রানী কেমন ছিল!'[১৬৮] ভারতের নারীসমাজকে বীর্যের মন্ত্রে উদ্বোধিত করার জন্য তিনি আহ্বান করেছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের অগ্নিকন্যা, 'প্রকৃত সিংহিনী' মার্গারেটকে—যিনি পরে রূপান্তরিত হয়েছিলেন ভারতভগিনী 'নিবেদিতা'তে। নারীর শক্তির উপর স্বামীজীর কি অগাধ বিশ্বাস ছিল সে-সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন ঃ 'With five hundred men, he (i.e. Swamiji) would say, the conquest of India might take fifty years : with as many women, not more than a few weeks.'[১৬৯] নারীশক্তি সম্বন্ধে নেতাজীও সেই একই মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর আজাদ হিন্দ্ বাহিনীতে একটি শক্তিশালী নারী বাহিনীও ছিল—'ঝাঁসির রানী' বাহিনী। মোহিতলাল নেতাজীর 'ঝাঁসির রানী' বাহিনীকে পরোক্ষভাবে 'স্বামীজীর কীর্তি' বলেই অভিহিত করতে চেয়েছেন।[১৭০]

॥ ৮ ॥

যে 'অভীঃ' মন্ত্র সুভাষচন্দ্র আশৈশব জপ করতেন তারই অভ্রান্ত প্রেরণায় নিঃশঙ্ক চিত্তে দুঃখ ও অনিশ্চয়তার জীবনকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। বাঁধাধরা নিয়ম এবং ছকে-বাঁধা জীবনের প্রতি ছিল তাঁর একটা প্রবল বিতৃষ্ণা। জীবনের প্রত্যূষেই জীবনদেবতা যাঁকে দুর্গম পথের তীর্থপথিক হিসাবে অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি সহজ পথের পথিক হবেন কি করে? বিবেকানন্দের মতো অজানার দুরভিসারকে তথা ভয়ঙ্করকে তিনি ভালবাসতেন সর্বান্তঃকরণে। যা অপ্রতিরোধ্য, যা দুরতিক্রম্য তার প্রতি সুভাষচন্দ্রের ছিল এক দুর্নিবার আকর্ষণ। 'অসম্ভব' এই শব্দটা তাঁর কাছে একেবারে অপরিচিত ছিল। যেমন ছিল বিবেকানন্দের কাছে। বাধা যতই প্রবল হত, সুভাষচন্দ্রের সঙ্কল্পের শক্তি ততই প্রবলতর হত। মৃত্যুকে তিনি শুধু যে গ্রাহ্য করতেন না তা নয়, মৃত্যুকে তিনি ভালবেসেছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ 'There is nothing that lures me more than a life of adventure away from the beaten track and in search of the unknown.... To this path I call my countrymen.'[১৭১] এ যেন বিবেকানন্দের কথারই প্রতিধ্বনি ঃ এস আমরা ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর জেনেই আলিঙ্গন করি...দুঃখকে দুঃখের জন্যই বরণ করি।[১৭২] বিবেকানন্দ ভালবাসতেন ভয়ঙ্করকে—পছন্দ করতেন

১৬৮। বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪২৬

১৬৯। The Master as I saw him, p. 260   ১৭০। বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৪৩-৪৪

১৭১। স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩৬১   ১৭২। The Master as I saw him, p. 135

অসীম দুঃসাহসের জীবন। সহজ পথ ছেড়ে অজানার পথে দুরভিসারকে তিনি অকুতোভয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাই তাঁর পক্ষেই একথা বলা সম্ভব ছিল—'মৃত্যুকে, অথবা কালীকে উপাসনায় সাহসী হয়েছে কত অল্প মানুষ! এস, আমরা মৃত্যুকে উপাসনা করি'।[১৭৩] বিবেকানন্দের ভক্ত সুভাষচন্দ্রও ছিলেন আমরণ শক্তিসাধক—কৈশোরেই গঙ্গাজলে নেমে আবৃত্তি করতেন বিবেকানন্দের 'Kali the Mother'[১৭৪] ঃ

Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance,
To him the Mother comes.

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

বিবেকানন্দের কাছে সন্ন্যাসের আর এক নাম 'মৃত্যুকে ভালবাসা'। তাই বিবেকানন্দকে ভালবাসার অধিকার আছে একমাত্র তারই যার মৃত্যুকে ভালবাসার সাহস আছে, প্রতি পদক্ষেপে পরাজয়, অপমানকে যে কণ্ঠহার হিসাবে গলায় ধারণ করতে প্রস্তুত, কলম্বাসের মতো যে বলতে পারবে—'ডেথ ইজ দা ব্রেথ অব মাই লাইফ'। সুভাষচন্দ্র ছিলেন তেমনই একজন। স্বামীজীর 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটি ছিল তাই সুভাষচন্দ্রের খুব প্রিয়।[১৭৫] প্রায়ই ওর থেকে আবৃত্তি করতেন সংযত উচ্ছ্বাসে, যেন ওর মধ্যে পেয়েছিলেন নিজের আদর্শের বাণীপ্রতিমাটি ঃ

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে ॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন শত্রুর শ্যেনদৃষ্টিকে উপেক্ষা করে জার্মানী থেকে জাপান—এই বিরাট দূরত্ব সাবমেরিনে অতিক্রম করার ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়ে যে চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয় সুভাষচন্দ্র দিয়েছিলেন, সমগ্র পৃথিবীর মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। অবশ্য এর আগে আরও একবার তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর এবারের যাত্রা ছিল আরও ভয়াবহ। সমগ্র ইংলিশ চ্যানেল এবং আটলান্টিকের সমস্ত নাব্য অঞ্চল ছিল মাইন পরিপূর্ণ, শত্রুপক্ষের রেডার ছিল অতিমাত্রায় সক্রিয়, অধিকন্তু ছিল সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত জবরদস্ত ব্রিটিশ নৌ এবং বিমান বাহিনী। এই বিপদসঙ্কুল পথে আটলান্টিক

১৭৩। ibid. ১৭৪। স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩৬৭
১৭৫। স্বামী ভাস্বরানন্দের বিবৃতি। [দ্রষ্টব্য ঃ Subhas Chandra Bose in Self-Exile, p. 104]

অতিক্রম করে তাঁকে যেতে হবে মাদাগাস্কারের চারশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা জায়গায়। সেখানে উঠতে হবে অপেক্ষারত একটা জাপানী সাবমেরিনে টোকিওর উদ্দেশে। প্রহরারত যুদ্ধজাহাজ অথবা সামরিক বিমানের চোখে পড়লে যে কোন মুহূর্তেই সব শেষ হয়ে যাবে। প্রত্যেক মুহূর্ত উত্তেজনার, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গে সুভাষবন্ধু চারুচন্দ্র বলেছেন, জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রকে তাঁর ঐ পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা হয়েছিল ঃ 'The chance of success is only five per cent.' কিন্তু সুভাষচন্দ্র দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন ঃ 'Even if the chance had been one per cent I must go.' সুভাষচন্দ্রের এই চরম দুঃসাহসিক চরিত্রের মূলে ছিল তাঁর উপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রচণ্ড প্রভাব। সুভাষচন্দ্রের ঐ উক্তি প্রসঙ্গে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে চারুচন্দ্র বলেছেন ঃ 'একথা কে বলতে পারে? একমাত্র বিবেকানন্দ যাকে অনুপ্রাণিত করেন সে ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।'[১৭৬]

বিবেকানন্দ চাইতেন তাঁর শিষ্যেরা বীর হবে, বেপরোয়া হবে, দুর্ধর্ষ হবে, জীবনমৃত্যুকে তারা 'পায়ের ভৃত্য' জ্ঞান করবে। এই প্রসঙ্গে একটা ছবি মনে পড়ছে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হিমালয়ে খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে 'ঊর্ধ্বশ্বাসে' পাহাড়ী ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। 'মাইলের পর মাইল চড়াই ও মাইলের পর মাইল উৎরাই—রাস্তাটা কয়েক ফুট মাত্র চওড়া, খাড়া পাহাড়ের গায়ে যেন ঝুলে আছে, আর বহু সহস্র ফুট নীচে খাদ!' হঠাৎ কি খেয়াল হল তাঁর, শিষ্য বিরজানন্দকে একদিন ডেকে বললেন, 'আয়, তোকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দিই'। বিরজানন্দ সম্ভবত এর আগে কখনও ঘোড়ায় চড়েননি। তার উপর এই দুরন্ত চড়াই-উৎরাই-এ! এমনিতেই ঘোড়ায় চড়তে তাঁর ভয় রয়েছে। তিনি তো কিছুতেই রাজী হবেন না। কিন্তু আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জকে যিনি চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারেন সেই বিবেকানন্দের শিষ্য পৃথিবীতে ভয় বলে একটি বস্তু আছে তা স্বীকার করবে! এ তো তিনি কল্পনাই করতে পারেন না। জোর করে শিষ্যকে তুলে দিলেন ঘোড়ায় আর চাবকে দিলেন ঘোড়াটাকে সপাসপ্। ভয়ার্ত আরোহীকে নিয়ে বিরজানন্দের ঘোড়া চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে। গুরুর উল্লাস তখন দেখে কে! তৃপ্তির হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠলেন তিনি—তাঁর সন্তানরা যে বীর হবে, বেপরোয়া হবে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়বে। আর তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করবেন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য—কার শক্তি বেশী—মৃত্যুদেবতার, না তাঁর আত্মজের। বিবেকানন্দের আত্মার আলোতে যার অন্তরের মশাল জ্বলেছে, মৃত্যু তো তার কাছে খড়কুটো!

॥ ৯ ॥

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—গীতার এই কর্মযোগের জ্বলন্ত বিগ্রহ ছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি চাইতেন কাজ—শুধু কাজ এবং এ-ও জানতেন যে কোন বড় কাজ করতে গেলে বাধাও অনুরূপভাবে বড় হবে। প্রতি পদে পরাজয়, তবু

১৭৬। লেখকের নিকট বিবৃতি ঃ ২।১।১৯৭৭

সংগ্রাম, অবিরত সংগ্রাম—এই ছিল তাঁর আদর্শ। নিন্দা বা স্তুতি কোন কিছুই তিনি গ্রাহ্য করতেন না। তিনি শুধু বিশ্বাস করতেন অন্তর পরিষ্কার করে সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। ফল? সে ঈশ্বরের যা অভিপ্রায় তা-ই হবে। তিনি তাঁর যন্ত্রমাত্র। তাঁর কর্মদর্শন প্রসঙ্গে স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখছেনঃ 'And work? What is work? Whose work?...I am Mother's child. She works, She plays. Why should I plan? What should I plan? Things came and went, just as She liked, without my planning. We are Her automata. She is the wirepuller.'[১৭৭] গীতার তথা স্বামীজীর এই আদর্শকে জীবনের মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র জীবনের শুরুতেই। অল্প বয়সের লেখা একটি চিঠিতে তিনি তাঁর গর্ভধারিণীকে লিখছেনঃ 'আমরা সকলে তাঁহার (অর্থাৎ ভগবানের) ক্রীড়াপুত্তলী—আমাদের ক্ষমতা কতটুকু—সবই তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করে। আমরা বাগানের মালী—বাগানের মালিক তিনি। আমরা বাগানে কাজ করি কিন্তু বাগানের ফলে আমাদের কোনও অধিকার নাই। আমরা বাগানে কাজ করি, বাগানে যাহা ফল উৎপন্ন হয় তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দিই। কার্যে আমাদের অধিকার আছে—কার্য আমাদের কর্তব্য—কিন্তু ফল তাঁহার—আমাদের নয়।'[১৭৮] কর্মের এই মহান আদর্শ সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শনের মূল কথা। ইনসিন জেল থেকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন (১৯২৭)ঃ 'স্বাধীনতা এবং সত্যই আমাদের আদর্শ, রাত্রির পর যেমন দিন আসে, আমাদের চেষ্টাও ঠিক তেমনি সত্য...আমাদের চেষ্টার সফল পরিণতি দেখিবার মতো সৌভাগ্য কাহার হইবে একমাত্র ভগবানই তাহার বিধানকর্তা। আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, আমি আমার কাজ করিয়া যাইব, তারপর যাহা হয় হইবে।'[১৭৯] পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে মুক্তিসেনাদের তিনি বলেছিলেনঃ 'আমাদের কাজ মোটেই অনায়াসসাধ্য নয়; (কারণ) আসন্ন যে সংগ্রাম তা হবে দীর্ঘস্থায়ী এবং ভয়ঙ্কর, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যের সাধুতা এবং অভ্রান্ততা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ। ভারতবর্ষের আটত্রিশকোটি মানুষের... স্বাধীন হবার অধিকার আছে এবং স্বাধীনতার জন্যে তারা আজ মূল্য দিতে প্রস্তুত।'[১৮০] কিন্তু তিনি তাঁর সৈন্যদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে 'বিজয়লাভ আয়ত্তের মধ্যে হলেও তোমরা যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখবার জন্য বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে থাক তাহলে তা হবে একটা মারাত্মক ভ্রান্তি। আমাদের কারও মধ্যে যেন স্বাধীনতার আনন্দ ভোগ করার জন্য বেঁচে থাকার বাসনা না থাকে... আমাদের আজ শুধু একটি বাসনাই থাকবে—তা হল মৃত্যুকে বরণ করার বাসনা যাতে ভারতবর্ষ বেঁচে থাকতে পারে, থাকবে শুধু শহীদের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার আকাঙ্ক্ষা যাতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথ শহীদের রক্তে সুগম হতে পারে।'[১৮১] এই আদর্শে

১৭৭। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VIII, p. 517

১৭৮। পত্রাবলী, পৃঃ ১৮ ১৭৯। তদেব, পৃঃ ৩১২

১৮০। Selected Speeches of Subhas Chandra Bose, p. 196 ১৮১। ibid., p. 215

তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলে পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে ভগ্নোৎসাহ করতে পারেনি। সৈন্যদের তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন পরবর্তী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে এবং বলেছিলেন ঃ হতাশ হয়ো না, ভারতের যথার্থ সন্তান হিসাবে তোমাদের 'কর্তব্য' তোমর করেছ।

॥ ১০ ॥

সুভাষচন্দ্রের সমস্ত জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনি, তাঁর নিজের কথায়, 'একটা আদর্শ ধরিয়া দণ্ডায়মান'।[১৮২] সেই আদর্শের নাম বিবেকানন্দ—সুভাষচন্দ্রের জীবনদেবতা। সেই অমিতদ্যুতি বিবেকপ্রজ্ঞা যেন ভারতবর্ষের প্রয়োজনে সুভাষচন্দ্রের হৃদয়ে প্রেরণা হয়ে প্রবেশ করেছিলেন। 'নেতাজীর প্রেম, নেতাজীর ত্যাগ, নেতাজীর জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাস—একদিকে অসুরের মতো কর্মশক্তি বা রাজসিক উদ্যমশীলতা, অপর দিকে যোগযুক্তের মতো "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ"—আত্মার সেই অবিক্ষুব্ধ প্রশান্তি ; একদিকে অতি তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ ও কার্যকুশলতা বা "দক্ষতা" অপর দিকে কবির মতো উচ্ছ্বাসপ্রবণ হৃদয়...।'[১৮৩]—এ সবই সেই সূর্যের প্রতিফলিত রশ্মিকণার বিচ্ছুরিত দীপ্তি। সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনীতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন যে তাঁর জীবনদর্শনের মূল প্রেরণা তিনি পেয়েছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাছ থেকে ঃ 'জীবনের প্রতি পদে যেসব দ্বিধা, যেসব সংশয় মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলতো, সুচিন্তিত একটি জীবনদর্শন ছাড়া আর কিছুতেই তাদের জয় করা সম্ভব ছিল না। বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ আমাকে এইরকম একটি আদর্শের সন্ধান দিলেন। এই আদর্শকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করার ফলে বহু সমস্যা, বহু সঙ্কট আমি সহজেই পার হয়ে এসেছি।'[১৮৪]

সুভাষচন্দ্রের একটি অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ ছিল নিবেদিতার 'The Master as I saw Him'। এই বইটি থেকে স্বামীজীর বিভিন্ন কথা তিনি প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন। তবে এইটি ছিল তাঁর 'বিশেষ প্রিয়'[১৮৫] ঃ 'Had I lived in Palestine, in the days of Jesus of Nazareth, I would have washed His feet, not with my tears, but with my heart's blood !'[১৮৬]—যীশুখ্রীষ্টের সময় আমি জীবিত থাকলে চোখের জলে নয়, বুকের রক্তে আমি তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম। যীশুর চিরন্তনী আত্মার কাছে বিবেকানন্দের রক্তাক্ত প্রণতি সুভাষচন্দ্রকে উদ্বেল করে তুলতো। চিরন্তনের আর এক নাম বিবেকানন্দ। সুভাষচন্দ্র ছিলেন সেই 'চিরন্তনের তীর্থযাত্রী'। যীশুর উদ্দেশে স্বামীজীর প্রণতিমন্ত্র আবৃত্তি করে সুভাষচন্দ্র কি তাঁর অন্তরের আকুতিকেই নিবেদন করতে চাইতেন তাঁর জীবনদেবতার কাছে?

১৮২। পত্রাবলী, পৃঃ ৩১২ ১৮৩। বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৪৪ ১৮৪। ভারত পথিক, পৃঃ ৬৬-৭

১৮৫। স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩৯২। 'মারাঠা' (Mahratta) পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক এ. আর. ভাটকে লেখা ইংরেজি প্রবন্ধেও সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর এই উক্তিটির উল্লেখ করেছেন। [দ্রষ্টব্য ঃ সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পৃঃ ৩২৪] ১৮৬। The Master as I saw him, p. 233

পরিশিষ্ট

বিপ্লব-আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব

বিপ্লব-আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব? উত্তরে একটা কথাই যথেষ্ট—তাঁর প্রভাব ও প্রেরণা সর্বাধিক। তাঁর বাণীর উদ্দীপনা ছাড়া বিপ্লব-আন্দোলন ঐভাবে হত কিনা সন্দেহ।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের একটা ঘটনার কথা বলি। আমি তখন ঢাকা সেলুলার জেলে বন্দী হয়ে আছি। গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে এলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমার কাছে এসে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বৈদান্তিক? আমি বললুম, হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিবেকানন্দের ভক্ত? আমি বললুম, নিশ্চয়ই।

রোনাল্ডসে অমন জিজ্ঞাসা করলেন কেন আমাকে? মনে হয় তিনি ঠিক করতে চাইছিলেন বিপ্লব-আন্দোলনের পিছনে কার প্রভাব আছে। পুলিস সার্চ করে বিপ্লবীদের কাছে সব জায়গায় স্বামীজীর বই পেয়েছে। এমন বিপ্লবী ছিল না যার বাড়িতে স্বামীজীর কোন-না-কোন বই ছিল না।

বাংলাদেশের বিপ্লব-আন্দোলন ব্যাপারটা কি? কতকগুলো ছেলে ঠিক করল, মরতে হবে। নিজেরা মরে যদি অপরকে বাঁচতে শেখানো যায়! তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তাই মরণের আগুনে। বিবেকানন্দ তাদের টেনে ঘরের বাইরে করে দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের কথাগুলো জ্বলছিল আগুনের মতো। আমরা তাঁর কথা জপ করতুম আর কাজ করতুম। আমরা গাইতুম 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ'! আর বলতুম স্বামীজীর কথা—'বলি চাই'।

স্বামীজীর বাণীর শক্তির প্রমাণ দেব? শ্রীরামকৃষ্ণের অন্য সন্ন্যাসী-শিষ্যদের সঙ্গে আমাদের চেনা ছিল। বিবেকানন্দ সোসাইটিতে এবং অনুশীলন সমিতিতে (৪১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট) গীতাক্লাস নিতেন স্বামী সারদানন্দ। অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্যারিস্টার পি. মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মের আদর্শকে কার্যকরী করবার জন্য। অনুশীলন সমিতিতে নানা রকম শিক্ষা দেওয়া হত। শরীরচর্চার ব্যবস্থা ছিল। ইতিহাসের ক্লাস হত, সখারাম গণেশ দেউস্কর ইতিহাস পড়াতেন। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি শেখাবার জন্য গীতাক্লাস নিতেন স্বামী সারদানন্দ। সারদানন্দের গীতাক্লাস যথেষ্ট উদ্দীপনাপূর্ণ হত। কিন্তু ক্লাস থেকে বাড়ি ফিরে মনে হত—স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়লেই কিন্তু অনেক বেশী শক্তি পেতুম।

স্বামীজীর কথাকে আমরা অভ্রান্ত বলে জানতুম। তিনি নাকি যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের (গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনির সুবিখ্যাত জীবনীকার) বাড়ির সদর ঘরে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন—১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হবে। দেওয়ালে ইটের উপরে সে লেখা ছিল। আমরা বার বার যেতুম সে লেখা দেখতে। স্বামীজী লিখে দিয়ে গেছেন! কথাগুলো মনে হত দৈববাণী।

আর স্বামীজীর ভালবাসা! কে তার মাপ করবে? সে ভালবাসা কত বড় আর একটি ভালবাসার কাহিনী বলে তা বোঝাবার চেষ্টা করতে পারি। বিপ্লবী শচীন সেন

মুরারিপুকুরের বোমার মামলার পরে মুক্তি পেয়ে বেলুড় মঠে যোগদান করল। তাতে আমরা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলুম।.কেন সে গেল, কী সে পেল সেখানে? বন্ধু নরেন (এম. এন. রায়) এবং আমি ঠিক করলুম বেলুড়ে গিয়ে শচীনের কাছ থেকে প্রত্যক্ষে ব্যাপারটা জেনে আসা যাক। কোদালিয়া থেকে দুজনে হেঁটে বেলুড়ে হাজির হলুম। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন। পৌঁছাতে দুপুর হয়ে গেল। হেঁটে ক্লান্ত, পেটে কিছু নেই। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, সামনের ঘরেই শচীন আছে। দরজা ভেজানো, শচীন শুয়ে আছে। তার ঘরে বসে অনেকক্ষণ কথা হল তার সঙ্গে। তারপর ক্লান্তিতে আর খিদেয় তিনজনেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুম ভেঙে গেল দরজায় ধাক্কায় আর চেঁচানিতে। দরজা খুলতেই এক মূর্তি—বগলে পাকানো কাপড়, কৌপীন পরা—বাবুরাম মহারাজ দাঁড়িয়ে। চেঁচিয়ে গালাগালি করে যাচ্ছেন—শূয়াররা, তোমরা এখানে না খেয়ে পড়ে আছ? আমাদের টেনে নিয়ে গেলেন ঠাকুরঘরে। খুঁজে পেতে জিলিপি যোগাড় করে খেতে দিলেন। তারপর বললেন, হতভাগারা, আজ বাড়ি যেতে পারবি না; রাত্রে এখানে থাকবি।

কি করি, অগত্যা থেকে যেতে হল। রাতে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে খেতে বসেছি। রুটি, সুজির পায়স, আর কি একটা তরকারি। পাশে বসেছেন বাবুরাম মহারাজ। নিজের পাত থেকে রুটি তুলে দিলেন আমার পাতে। আমি নেব না কিছুতে, অপরের এঁটো খাবো কেন? বটে—খাবি না? বাবুরাম মহারাজ ঘাড় ধরে মুখে গুঁজে দিলেন।

স্বামীজীর কথা শুনতে চাইলুম তাঁর কাছে। স্বামীজীর কথা বলতে বলতে বাবুরাম মহারাজ যেন ডুবে গেলেন। স্বামীজীর ভালবাসা? ওরে তোদের সে জিনিস কি করে বোঝাবো? বাবুরাম মহারাজ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

আমরা অবাক হয়ে গেলুম, নতুন জিনিস দেখলুম। একজনের ভালবাসার কথা বলতে আর একজন কাঁদে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমার জন্ম। কোদালিয়া গ্রামে আমরা তিনজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলুম—নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), শৈলেশ্বর বসু এবং আমি। তিনজন অভেদাত্মা। একটা কিছু করতে হবে বলে ছটফট করছি। সে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মতো সময়। রামদাস বাবাজীর সঙ্গে সেই সময় আমাদের পরিচয় হল। তিনি আমাদের সন্ন্যাসী করতে চাইলেন। আমরা দ্বিধায় দুলছি। এমন সময়ে শৈলেশ্বরের কাকা কেদারনাথবাবু আমাদের স্বামীজীর বই এনে দিলেন। তিনি বিবেকানন্দ সোসাইটির সভ্য ছিলেন। প্রথম হাতে পড়ল স্বামীজীর 'কর্মযোগ'। চোখে পড়ল লেখা আছে—It is better to be attached than to be unattached. এ কী কথা! সন্ন্যাসী বলছেন অ্যাটাচমেন্টের কথা! সারারাত 'কর্মযোগ' পড়লুম—উত্তেজিত হয়ে উঠলুম এমনই যে, রাত্রে ঘুম হল না। কিছুদিন পরে স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত' পেলুম। এবার আমাদের জীবনের গতি স্থির হয়ে গেল। স্বামীজীর কর্মসন্ন্যাসই আমাদের আদর্শ। কর্মত্যাগের সন্ন্যাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন মতের কথা শুনেছি। যতীন মুখার্জীর (বাঘাযতীন) সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। চোখের সামনে ভাসছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মা যা হইবেন' সেই স্বপ্ন। বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ', 'বর্তমান ভারত' দিল আমাদের অনুসরণের আদর্শ আর

কর্মপন্থা। রামদাস বাবাজী ডেকে পাঠালেন, সারা রাত বোঝালেন, কিন্তু কিছু হল না, স্বামীজীর পথই আমাদের পথ—আমাদের দেবতা আমাদের দেশ। আমাদের বৃহত্তর দলের মধ্যে ধীরেন চক্রবর্তী কেবল বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী হয়। তার নাম হয়েছিল গৌরাঙ্গদাস বাবাজী। সে বৃন্দাবনে খুব বড় সন্ন্যাসী হয়েছিল ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

আমরা তিনজনই স্বামীজীর খুব ভক্ত ছিলুম। আর স্বামীজীর ভক্ত ছিল না কে? রংপুরের বিখ্যাত যতীন রায়, আশু দাস, যাদুগোপাল, এই সব বড় বড় বিপ্লবীরা সকলেই বিশেষ স্বামীজী-ভক্ত। যারা পরে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হয়ে যায় তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। যতীন মুখার্জীর কথাই ধরা যাক। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপ্লব আন্দোলন যতীনদার সৃষ্টি। তাঁর যে কী আকর্ষণী শক্তি ছিল—সকলকে তিনি কাছে টেনে রাখতে পারতেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে তিনি ছিলেন সুপার লীডার। তাঁর নেতৃত্বে যে বিপ্লব পরিষদ গড়ে উঠেছিল তার কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিল যাদুগোপাল, আমরা ছিলুম সদস্য। সে যা-ই হোক, একবার নরেনের (এম. এন. রায়) সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক ও ঝগড়া। আমি স্বামীজীর অদ্বৈতবেদান্তকে গ্রহণ করেছি, মূর্তিপূজা আর ভগবানে বিশ্বাস করি না, নরেনের মূর্তি এবং ভগবান, দুয়েই বিশ্বাস। আমি বললুম, স্বামীজীর মত ভগবান নেই, নরেন বলল, স্বামীজীর মত ভগবান আছেন। যতীনদা ঝগড়ার কথা শুনলেন। শুনে বললেন, চল আমার গুরুর কাছে। তাঁর গুরু ভোলাগিরি। তিনি কলকাতায় এসে রয়েছেন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ভক্তের বাড়িতে। যতীনদার সঙ্গে আমরা প্রবেশ করতেই তিনি 'আরে বেটা' বলে যতীনদাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। তাতেই যতীনদার উপর তাঁর ভালবাসার পরিমাণ বোঝা গেল। যতীনদা আমাদের সমস্যার কথা জানালেন। ভোলাগিরি তখন আমার দিকে ফিরে বললেন—বেটা, তোমার কথাই ঠিক, ভগবান নেই। আমার বুক দশহাত—চেয়ে দেখি নরেনের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। তারপর নরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, না, ভগবান আছেন। পরে বললেন, যার যেমন ভাব। আমরা হতভম্ব। বাইরে আসতে আমরা যতীনদাকে বললুম, এ কী হল, উত্তর যে পেলাম না! যতীনদা বললেন, আরে স্বামীজীর কথা নিয়ে কি ঝগড়া করতে আছে? তিনি কত বড় ছিলেন তার ধারণা করবে কে? তাঁর কথা যদি ভারত শোনে, ভারতের মহিমার কি সীমা থাকবে?

যতীনদা ছিলেন ভোলাগিরির শিষ্য। তবু স্বামীজীর প্রতি তাঁর এই ভাব।

নরেন অবশ্য পরে মেটিরিয়ালিস্ট হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে যুক্তিপ্রবণতা একটা দেখা যেত গোড়া থেকেই। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমি বাবার কাছে আসামে চলে যাই। ফিরে এসে দেখি নরেন সূর্যোপাসক হয়েছে। শিবনারায়ণ স্বামীর দলে ভিড়েছে। আমি বললুম, হাঁরে, তোর বেদান্তের কি হল? সে বলল, দেখ, সৃষ্টির পিছনে কোন শক্তি আছে কিনা জানি না, কিন্তু প্রত্যক্ষ শক্তি সূর্যের, তাই সূর্যোপাসক হয়েছি। অবশ্য সূর্যোপাসনায় উৎসাহ পরে তার দেখিনি।

ইউরোপে যাওয়ার পরে নরেনের প্রত্যক্ষের প্রতি বিশ্বাস আরও বেড়ে যায় এবং সে জড়বাদী হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার ধারণা তার মেটিরিয়ালিজমের পিছনে একটা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত ছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এ র‍্যাডিক্যাল পার্টির

বাৎসরিক সভা। নিও-হিউম্যানিজমের থীসিস সেখানে গ্রহণ করা হয়। বিখ্যাত মারাঠী পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যোশী, এম. এন. রায় এবং আমরা কাছাকাছি বসে আছি। লক্ষ্মণ শাস্ত্রী গান্ধীজীর কাছে ছিলেন, পরে এম. এন. রায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে চলে আসেন। দুজনের মধ্যে দিনের পর দিন গভীর দার্শনিক আলোচনা হয়। কথা হতে হতে লক্ষ্মণ শাস্ত্রী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—Roy, don't you accept Shakti ? নরেন হেসে বলল, No, but I want সচ্চিদানন্দ।

নরেন কি অর্থে ঐ কথা বলেছিল আমি সঠিক বলতে পারব না, কারণ সে-বিষয়ে পরে জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু আমার ধারণা, শক্তি মানলে যে আপাত দ্বৈতবাদ মানতে হয় নরেন তাতে রাজী হয়নি, সে বেদান্তের সচ্চিদানন্দকে শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে ধরে রেখেছিল।

স্বামীজীর প্রভাব আমাদের মনে নানাভাবে কাজ করেছিল। স্বামীজী অনেককে শক্তিবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, আমাদের মতো অল্পসংখ্যককে তিনি বেদান্তে বিশ্বাসী করেছিলেন। স্বামীজীর বেদান্ত অনুযায়ী আমি একবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ করেছিলুম। অনুশীলন সমিতিতে রক্তের অক্ষরে মন্ত্রগুপ্তির প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হত। আমি অস্বীকার করলুম যখন সতীশ বসু তা-ই করতে বললেন। আমি বললুম, আমার মুখের কথা মিথ্যে হয়ে যাবে আর রক্ত দিয়ে লেখা কথা কটা সত্য হবে? তার জন্য আমাকে চার দিন অবরুদ্ধ থাকতে হয়। পরে এই পদ্ধতিটি উঠে যায়। আমি বিবেকানন্দের বেদান্তের মানবমহিমার কথা স্মরণ করেই কথাটা বলেছিলুম।

বিবেকানন্দের আদর্শকে আমরা ভারতীয় রাজনীতিতে সম্পূর্ণ সফল করতে পারিনি একথা ঠিক। তার অনেক কারণ আছে। প্রথমত আমাদের সামনে সব ছেড়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আন্দোলন সৃষ্টি করাটাই বড় হয়ে উঠেছিল। সেই সময় বিবেকানন্দের গণবিপ্লবের কথাটা বড় করা যায়নি, স্বামীজীর আদর্শে চারিত্রশক্তি বৃদ্ধির কথাটাই তুলে ধরা হয়েছিল। পরবর্তী কালে যখন বিপ্লবীদলকে সরকার পীড়নে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে, তখন গান্ধী আবির্ভূত হলেন ভারতীয় রাজনীতিতে। তিনি দেশকে মুগ্ধ করে ফেললেন। গান্ধীজীর মতো নেতা আমাদের ছিল না। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস করাতেই আমাদের দিনের পর দিন লড়াই করতে হয়েছে। এই অবস্থায়, যখন স্বামীজীর আদর্শে গণবিপ্লবের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা উচিত অথচ তা করা হয়নি, তখন তৈরী আদর্শ চলে এল রাশিয়া থেকে এবং আমাদের একটা বড় দল কমিউনিজমকে গ্রহণ করল। গান্ধীজী জনজাগরণ এনেছেন ঠিকই, সেটা দেশের পক্ষে প্রয়োজনও বটে, কিন্তু আমরা সেই জনজাগরণকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের পথে চালিত করতে চেয়েছিলুম, যেটাকে বিবেকানন্দের আদর্শ বলে আমরা মনে করতুম। গান্ধীজী পূর্ণ স্বাধীনতা গোড়াতে চাইতেন না। তাই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস করাতে আমাদের দশ বছর লড়াই করতে হয়েছে। এই লড়াইয়ে আমাদের এত শক্তিক্ষয় হয়েছিল যে, স্বাধীনতার পূর্বে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে উপস্থিত করতে পারিনি। একবার মাত্র সে চেষ্টা আংশিক সফল হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জলপাইগুড়িতে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে

কংগ্রেসের প্রাদেশিক কনফারেন্সে আমরা সমাজতন্ত্রের প্রস্তাব পাস করাই, তবে সে-ও আংশিক সমাজতন্ত্র।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমাজতন্ত্র দেশে দেশে ভিন্নরূপ নেবে। ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্র তার সভ্যতার ভিত্তিকে ত্যাগ করতে পারে না। সে ভিত্তি আধ্যাত্মিকতার। আমি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছি; ভাল হোক মন্দ হোক সেখানে মানুষের যে আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা দেখেছি, তাকে বাদ দেওয়া যাবে কি করে? ভারতের সভ্যতার গতি অন্তরের দিকে। আমি যুক্তিবাদ স্বীকার করি। কমিউনিজমের ব্যবহারিক পরিকল্পনাতেও আমার আপত্তি নেই সম্পূর্ণভাবে, কিন্তু ভারতের মাটিতে যদি তাকে সফল হতে হয় ভারতের সাধনার সঙ্গে তাকে যুক্ত হতে হবে। স্বামীজী, শ্রীঅরবিন্দ এই সামঞ্জস্যের কথা বলে গেছেন। এই সামঞ্জস্যবিধানের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাই ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মীর উচিত স্বামীজীর রচনাবলীর মধ্যে ফিরে যাওয়া, দেখতে হবে সেখানে কি আছে, তিনি কোন্ পন্থা নির্দেশ করেছেন। যদি বিবেকানন্দের পথে সমাজতন্ত্রের আন্দোলন করা যায় তবে তার সফলতা সুনিশ্চিত।

দেশের মুক্তিপ্রয়াসী স্বামীজী

বিগত দিনগুলি স্মরণপথে এখনও জেগে ওঠে। শুধু জেগে ওঠে না, মৃদু মধুর গুঞ্জনও তোলে। তার মাধুর্য আজও অনবদ্য। কত লোককে এই মোহনীয় স্বপ্নের আকর্ষণ আবিষ্ট করে ঘরবাড়ির মিষ্ট পরিবেশ থেকে ছাড়িয়ে ঢেউয়ের ওপর ঢেউ তুলে দিগ্‌দিগন্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

পাখিরা বাসা ছাড়ল—নিরুদ্দেশের পথে উড়ে চলল—নতুন নীড়ের আশায়—শুধু আশায়—আর কিছু নয়। দুঃখ-কষ্ট, অশেষ যন্ত্রণা, নিষ্পেষণ, নিপীড়ন, যাযাবরত্ব, কারাবরণ, দ্বীপান্তর ও ফাঁসির মঞ্চে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ সেযুগে মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছিল।

ভাবি এটা কি এমনি হয়? রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হয়। কিন্তু অভিনয় করবার লোক থাকে বলেই নাট্যবিকাশ সম্ভব হয়। বিশ্বমঞ্চে এই যে এতবড় একটা খেলা হয়ে গেল—সে খেলা কে খেলাল? শত শত লোককে এমন নেশায় মশগুল কে করেছিল? কার ইঙ্গিতে এত ব্যক্তি নতুন তীর্থের পথে পাড়ি দিয়েছিল? এখন সেদিন এসেছে যখন ইতিহাসের গতির এই তত্ত্বকে কালের কষ্টিপাথরে ফেলে যাচাই করতে হবে। অনুসন্ধানে দুটো শক্তি প্রতিভাত হবে—একটা আভ্যন্তরীণ—আর একটা প্রতিবেশ-প্রভাব-জনিত।

নিজেদের কথায় আসি। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ৪ জুলাই ভারতের ভাগ্যাকাশ থেকে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহাশক্তিধর দিক্‌পাল লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন। তিনি হচ্ছেন বীর স্বামী বিবেকানন্দ।

'ফিরিঙ্গি ভয়হারী' ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নিজের কথায় বলি—

'দিন কয়েকের জন্য আমি বোলপুর আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইস্টিশনে পা দিলাম অমনি কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন—শুনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ান কথা নয়—ঠিক যেন ছুরি বিঁধিয়া গেল। ...একটা প্রেরণা হইল—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয় ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে বিলাত যাইব। ...বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম—বিবেকানন্দ কে। যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সাগরপারে লইয়া যায়—সে বড় সোজা মানুষ নয়।'

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি অনুশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্রে যোগ দিই। কলকাতার ৪৯ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে এই সমিতির অফিস ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল। এটি দেশের ভাবী মুক্তিকামীদের প্রস্তুত করার ক্ষেত্র ছিল। সারা বাংলায় এটির বহু শাখা গড়ে উঠেছিল।

তখনও কিন্তু প্রধানতর প্লাবনীশক্তি ছিল বিবেকানন্দের। চরিত্র গঠন কর, মানুষ হও, সমাজসেবাব্রতে এগিয়ে পড়, দেশকে মা জ্ঞানে পূজা কর, সমাজের দুর্বলতা দূর

কর, কেন্দ্রীভূত হও, অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত হও। সমাজে যারা অনুন্নত, হীন, দরিদ্র, মূর্খ, নিপীড়িত তাদের সেবায় লেগে যাও। এ সবই স্বামী বিবেকানন্দের দেওয়া কর্মতালিকা। এর ওপর ছিল ঋষি বঙ্কিমের সন্তান ধর্ম।

প্রতি রবিবারে আমাদের moral class হত। এটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এখানে নীতিকথা, ইতিহাস, ধর্ম, চরিত্রগঠন, রাজনীতি, সেবাব্রত এবং দেশহিতৈষণার বিশেষ অনুষ্ঠান হত। স্বামী সারদানন্দ—রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সেক্রেটারি—আমাদের গীতাক্লাস নিতেন।

এখানেও যাঁরা বড় ছিলেন তাঁদের ওপর স্বামী বিবেকানন্দ ও মিশনের প্রভাব প্রবল ছিল। উচ্চ পর্যায়ের সভ্যরা বেলুড়ে যেতেন। বঙ্গভঙ্গ নিরোধ আন্দোলন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে হয়। অনেকে বলতেন স্বামীজী থাকলে নেতৃত্ব করতেন! ক্রমে আমরা বড় হয়ে উঠতে লাগলাম। বহু বিজ্ঞজনের উপদেশ লাভ করলাম।

আমাদের মনের ক্ষুধা—অর্থাৎ বিপ্লবী জীবনের আত্মিক আহারের প্রয়োজন প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগল। এর জন্য বিপ্লবী সাহিত্য পাঠের প্রয়োজন খুব জোরদার হল এবং তার তাগিদ মেটানোর জন্য দেশবিদেশের ইতিহাস আমাদের অন্বেষণ করতে হত। আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালীর বিপ্লবীদের ইতিহাস পড়তে হত অনুপ্রাণনার জন্য। রুশ নিহিলিস্টদের কথাও জানতে লাগলাম। এ তো গেল বিদেশের কথা। প্রেরণার জন্য বিদেশ থেকে দেশের দিকে মন ফিরান হল। সেখানে শিখ, রাজপুত, মারাঠা জীবনের ইতিহাস আমাদের প্রয়োজন মেটাত। কিন্তু মনে বড়ই খেদ ও ক্ষোভ হতে লাগল যে, বাঙালীদের অবদান তেমন পাওয়া গেল না। তখন দিশেহারা আমরা স্বামীজীর লেখা ও বক্তৃতা থেকে পর্যাপ্ত প্রেরণা পেতে লাগলাম। স্বামীজী অবশ্য বলছেন না ইংরেজকে ধর, মার, কাট। কিন্তু আশা, ভরসা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, নতুন যুগের পাগলকরা আগমনী বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন, যেমন ঃ

'তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা ; ভারতের বল আছে, মাল আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতাভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।'

'শূদ্রযুগ আসিবেই আসিবে—উহা কেহই রোধ করিতে পারিবে না। স্বর্ণমুদ্রার মূল্যে সকল মূল্য ধার্য করার ফলে গরীবরা আরও গরীব এবং ধনীরা আরও ধনী হইতেছে। ...আমি যে একজন সোস্যালিস্ট, তার কারণ ইহা নয় যে, আমি এ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলিয়া মনে করি—তবে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।'

'আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে সাহস করে নিজের দেশকে সমর্থন করছে—আর যা তারা হিন্দুদের কাছ থেকে আশা করেনি, তা-ই আমি তাদের দিয়েছি—তারা যেমন ইট মেরেছে তার বদলে আমি পাটকেল মেরেছি—সুদে আসলে।'

'ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, সাধারণ এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে।'

একদিকে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' এবং অন্যদিকে স্বামীজীর উৎসাহবাক্য নতুন ভোরের খবর দিতে লাগল। 'পত্রাবলী', 'ভারতে বিবেকানন্দ', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত', 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া স্বামীজীর ইংরেজি

বক্তৃতাগুলিও—যেমন *Lectures from Colombo to Almora*—পড়তাম। স্বামীজীর অবদান হিসাবে এসব তো গেল গৌণ (indirect) প্রভাব। আমাদের মনে তার চেয়েও মুখ্য (direct) প্রভাব বিস্তার করল অনুশীলনের স্থাপয়িতা সতীশ বসুর উক্তি। তার সংক্ষিপ্তসার এইখানে উল্লেখ করছি। স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল জাগ্রত, সমুন্নত, একযোগে যুক্ত স্বাধীন ভারত। ভারত আবার বড় হবে এটা তাঁর কাছে করামলকবৎ প্রত্যক্ষ ছিল।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দোলপূর্ণিমার দিন অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। সমাজসেবা জনকল্যাণ থেকে রক্ত-বিপ্লবের দুর্মদ কঠোর কার্যকলাপ এ সমিতির উদ্দেশ্যের মধ্যে আসে। এর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ—দুটি দিক ছিল। অন্তরঙ্গ ছিল একেবারে গুপ্ত সমিতির অন্তর্গত। মাথার ওপর ছিলেন অরবিন্দ, প্রমথনাথ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে নাম হয় স্বামী নিরালম্ব), ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি। একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, ভূপেন দত্ত (স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) প্রভৃতি কর্মীরা সরাসরি ব্রিটিশ শক্তিকে আক্রমণের কর্মতালিকা নিয়ে অনুশীলনের নাম ব্যতিরেকে দুর্ধর্ষ একটা দল তৈরী করতে অগ্রসর হন। প্রমথনাথ মিত্র সকলের মাথার উপর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে মতান্তর হল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'যুগান্তর' নামক একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা এঁরা প্রকাশ করেন। ভূপেনবাবু এটির প্রথম সম্পাদক হন। এমনি করে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের বীজ বপন হয়। গুপ্ত সমিতির ইতিহাসের মধ্যে আর অগ্রসর হব না। সতীশচন্দ্র বসু বলেন, দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার উৎসাহ স্বামী বিবেকানন্দ দিতেন। এর থেকে বোঝা যায় মঠ ও মিশন (বেলুড়ের) কেন ইংরেজের সন্দেহভাজন হয়েছিল। স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ অনেক চেষ্টায় এটিকে মেঘমুক্ত করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল রামকৃষ্ণ মিশনকে যুবকদের আদর্শ বলে গণ্য করতে উপদেশ দেন। অর্থাৎ সোজাসুজি বিপ্লবী রাজনীতির চেয়ে সমাজসেবা বড় ও বাঞ্ছনীয়। ঢাকার বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ ডক্টর ভূপেন দত্তকে যে বিবৃতি দিয়েছেন তার সারাংশ নীচে দিলাম। এই বিবৃতিটি হেমবাবু ১৮.৫.১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভূপেনবাবুকে দেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী ঢাকা সফরে যান। যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথা শোনার জন্য অনেক যুবক একত্রিত হন। তাঁদের মধ্যে হেমবাবুও ছিলেন। হেমবাবুর সঙ্গে তাঁর সহযোগী শ্রীশ পালও ছিলেন। (বাংলার প্রথম মৃত্যুঞ্জয়ী বীর প্রফুল্ল চাকীকে [ক্ষুদিরামের সাথী] ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করার জন্য সাব-ইনস্পেকটার নন্দলাল ব্যানার্জীকে শ্রীশ পাল হত্যা করেন—কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে।) স্বামীজী এঁদের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে সম্বোধন করেন। স্বামীজীর স্পর্শ ও উৎসাহ ও বাণী এঁদের প্রাণে ভেলকি খেলিয়ে দেয়। তিনি মানবধর্মী ও সাম্যবাদের দীক্ষা এঁদের দেন। শরীর শক্ত করে গড়াকে গীতা পাঠের চেয়ে বড় বলে উল্লেখ করেন। পৌরুষ, বীরনীতি, মাতৃজাতিকে মহামায়ার প্রতীক বলে সম্মান করতে উপদেশ দেন—আর বলেন জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। তিনি সঙ্ঘবদ্ধ ও সেবাব্রতী হতে বলেন। দরিদ্রনারায়ণকে সেবা করতে শেখান। আরও বলেন—ভারত আর পুণ্যভূমি নাই—হয়ে গেছে দাসভূমি—যো-হুকুম আর ছুঁয়া-ছুতের দেশ। হে নবীন

বঙ্গ—ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইকে আদর্শ কর। অষ্টপাশে যে বিদেশী ভারতকে বেঁধে রেখেছে তাদের বন্ধন ছিন্ন কর। তিনি একথাও বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র পড়, তাঁর শেখান দেশভক্তিও গ্রহণ কর। সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর। দেশভক্তি ও সন্তানধর্মকে মাথায় করে রাখ। এর থেকে বোঝা যায় দেশের কল্যাণ সাধনায় কোনও দিক তাঁর সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারেনি।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতে জাতীয় জাগরণ*

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ১৯ তারিখ। স্বামীজী সেদিন প্রথম ঢাকায় পদার্পণ করেন। সেদিনই তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। স্বামীজীর ট্রেন স্টেশনে পৌছানোর অনেক আগে থেকেই স্টেশনে এত ভিড় হয়েছিল যে সকলের দম আটকে যাবার যোগাড় হয়েছিল। আর তাঁকে নিয়ে ট্রেন যখন স্টেশনে এসে পৌছাল তখন স্টেশন ছাপিয়ে গেল মানুষের ভিড়। স্বামীজীকে স্বাগত-অভ্যর্থনা জানাতে সেদিন ঢাকার সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সম্মানে এক বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন হয়েছিল। অত প্রকাণ্ড এবং অত স্বতঃস্ফূর্ত শোভাযাত্রা ঢাকার মানুষ তার আগে কখনও দেখেছিল বলে মনে হয় না। সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত—সকলেই সেই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল। তবে সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল যুবকদের, বিশেষ করে ছাত্রদের উৎসাহ-উদ্দীপনা। দলে দলে অসংখ্য ছাত্র ঐ শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিল। সে-দৃশ্য আমার চোখের সামনে আজও যেন ভাসছে। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট কিন্তু অসাধারণ ঘটনার কথা মনে পড়ছে। শোভাযাত্রায় যেসব ছাত্ররা যোগ দিয়েছিল তারা এবং অন্যান্যরা বার বার পরমহংসদেবের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। কিন্তু একবার ছাত্ররা স্বামীজীর নামে জয়ধ্বনি দেয়। মাত্র একবারই। কিন্তু যেইমাত্র শোভাযাত্রা থেকে সমস্বরে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দেওয়া হল তৎক্ষণাৎ স্বামীজী তার প্রতিবাদ করলেন এবং তার পুনরাবৃত্তি করতে নিষেধ করলেন। গভীর আবেগের সঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন: 'আমি পরমহংসদেবের দাসানুদাস। জয়ধ্বনি যদি আপনারা দিতে চান শুধু তাঁর নামেই জয়ধ্বনি দিন।' বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের গুরুভক্তি এবং বিনয়ের দৃষ্টান্তে সবাই তখন একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।

অন্যান্য অসংখ্য যুবক ও বয়স্ক দর্শনার্থীর মতো আমি এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা রোজই স্বামীজীকে দর্শন ও প্রণাম করতে ঢাকায় স্বামীজীর বাসস্থান ফরাসগঞ্জে মোহিনীবাবুর (মোহিনীমোহন দাসের) বাড়িতে যেতাম। পরম আগ্রহে তাঁর কথা শুনতাম। এইভাবে আমি এবং আমার বন্ধুরা স্বামীজীর শিষ্যদের, বিশেষ করে গুপ্ত মহারাজের (স্বামী সদানন্দের) নজরে পড়ি এবং তাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় আসতে সমর্থ হই। স্বামীজী এবং তাঁর শিষ্যরা ঢাকা এবং ঢাকার কাছাকাছি যে-সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থান দেখতে গিয়েছেন আমি সর্বত্রই তাঁদের সঙ্গে গিয়েছি। ঠাকুরের ভক্ত নাগমশায়ের জন্মস্থান দেওভোগেও আমি স্বামীজীর সঙ্গে গিয়েছি। মোট চোদ্দ দিন তাঁর সান্নিধ্য আমি লাভ করেছি। ঢাকার জগন্নাথ কলেজের হল-এ এবং পগোজ স্কুলের মাঠে স্বামীজী

---

* প্রখ্যাত স্বাধীনতা-সংগ্রামী হেমচন্দ্র ঘোষের [১৮৮২ (৩?)—১৯৮০] সঙ্গে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ কয়েকবার সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণগুলি প্রথমে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ও পরে একত্রিতভাবে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তকটির নাম—'স্বামী বিবেকানন্দ: মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে'। বর্তমান গ্রন্থের জন্য স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ তারই কিছু অংশ নির্বাচন করে দিয়েছেন।

ইংরেজিতে দুটি অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দুটি বক্তৃতাতেই প্রচুর লোক হয়েছিল। জগন্নাথ কলেজের বক্তৃতায় কয়েক হাজার লোক হয়েছিল। পগোজ স্কুলের বিরাট মাঠে আরও বেশী। দুটি বক্তৃতাই আমি শুনেছি। সুতরাং অসংখ্য মানুষের সঙ্গে স্বামীজীর অপূর্ব বাগ্মিতা এবং তাঁর সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্য আমাদেরও হয়েছিল—যার দ্বারা পাশ্চাত্যের মানুষকে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন—জয় করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে আমি ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মীনেতার বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে বাগ্মী হিসেবে তাঁদের কারুরই তুলনা হয় না। স্বামীজীর কী বীর্যময় দৃপ্ত ভঙ্গি, কী তাঁর রাজোচিত অপূর্ব পৌরুষময় চেহারা! বক্তৃতার সময় শ্রোতাদের মনগুলোকে যেন তিনি তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতেন। শ্রোতারা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনত। আর ইংরেজি ভাষার উপর কী তাঁর অসাধারণ দক্ষতা! কী অনবদ্য সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দভাবে তিনি অনর্গল বলতে পারতেন ইংরেজি! আর যখন বলতেন তখন কত শক্তিময় হয়ে উঠত সেই ভাষা! আর সবার উপরে ছিল তাঁর সেই অপূর্ব মাধুর্যময় কণ্ঠস্বর এবং তাঁর বিরাট উজ্জ্বল দুটি চোখ। মানুষের তো দূরের কথা, দেবতারও দুর্লভ বোধহয় ঐরকম অপূর্ব চোখ। আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে আমি স্বামীজীকে দেখেছি, তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু আজও সেই অপূর্ব চোখ দুটিকে আমি ভুলতে পারিনি। আর তাঁর সেই স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর যেন আজও আমার কানে বাজছে। জীবনে বহু বড় বড় মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছি। তাঁদের মধ্যে দু-চারজনই মাত্র আমার মনে স্থায়ী কোন দাগ রেখেছেন। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখছি যে, একমাত্র স্বামীজীই আমার সত্তার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন।

যদিও স্বামীজীকে তাঁর ঢাকায় আসার প্রথম দিনেই আমি দর্শন করেছিলাম, তবু আমি মনে করি, তাঁকে সত্যিকারের 'প্রথম' এবং 'প্রকৃত' দর্শন আমি করেছিলাম স্বামীজীর ঢাকা থেকে চলে যাবার দু-একদিন আগে। যে-কারণে ঐদিনটিকে আমার স্বামীজীকে 'প্রথম' এবং 'প্রকৃত' দর্শনের দিন বলছি তা হল এইঃ ঐদিনই স্বামীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এবং একান্তে দেখা করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার স্পর্শ পেয়েছিলাম আমরা সবাই সেদিন। আমাদের সকলকে এক অপূর্ব চৈতন্যালোকে নিয়ে গেল তাঁর স্পর্শ, তাঁর বাণী। ঐদিন এবং তার পরের দিন স্বামীজীর সঙ্গে আমার ঐ সাক্ষাতের ফলে আমি জীবনে এক নতুন আলোকের সন্ধান পেয়েছিলাম, যা আমার জীবনের গতিপথকে নির্ধারিত করে দিয়েছিল। অবশ্য ঐ দুর্লভ দর্শনের এবং তাঁর আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা লাভের সৌভাগ্য শুধু আমার একারই হয়নি। আমার সঙ্গে ঐ দুদিনই ছিল আমার 'বাছাইকরা' কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যেমন শ্রীশচন্দ্র পাল, আলিমুদ্দিন আমেদ প্রভৃতি। সবসুদ্ধ আমরা ছিলাম দশ-বারোজন। তাদের মধ্যে একমাত্র আমি ছাড়া আর সকলেই আজ পরলোকের বাসিন্দা। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, আমাদের ঐদলের প্রত্যেকেই পরবর্তী কালে হয়েছিল এক-একজন দুর্ধর্ষ মুক্তি-সংগ্রামী। যুগনায়কের সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকার তাই শুধু আমারই জীবনের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথকে উন্মুক্ত করে দেয়নি, আমাদের সেই বন্ধুগোষ্ঠীর সকলেরই করেছিল। আমাদের সকলের কাছেই সেই সাক্ষাৎকার যেন একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।

তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে আমি এবং আমার বন্ধুরা সবাই দেশের মুক্তির জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলাম। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আমরা কয়েকজন ঢাকায় 'মুক্তিসঙ্ঘ' গঠন করেছিলাম যা পরে আরও বৃহৎ আকারে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এ রূপান্তরিত হয় ব্যাপক কর্মসূচী ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে। সুতরাং 'মুক্তিসঙ্ঘ' অথবা পরবর্তীকালের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর প্রকৃত অর্থে জন্মলাভ হয়েছিল তখনই যখন স্বামীজীর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য আমরা পেয়েছিলাম। স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের ঐ সাক্ষাতের আগে আমরা ছিলাম বন্ধু—'ফ্রেণ্ডস্'। আর তার পর থেকে আমরা হলাম একই আদর্শে বিশ্বাসী ও একই উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত মরমী সুহৃদ্—'কম্‌রেড্‌স-ইন্-ফেইথ'। স্বামীজীর প্রেরণা আমাদের প্রত্যেককে একটি অখণ্ড এবং অচ্ছেদ্য বন্ধনসূত্রে চিরকালের জন্যে বেঁধে দিয়েছিল।

এটা এখনও আমার কাছে মাঝে মাঝে একটা রহস্য বলে মনে হয় যে, কেন, কি জন্যে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ আমাদের জন্যে এতখানি করলেন? কারণ, আমি তো জানি, স্বামীজীর সেই দুর্লভ অনুগ্রহ পাওয়ার কোন যোগ্যতাই আমাদের ছিল না। তবে এ-পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে যা পড়েছি বা জেনেছি তাতে আমার মনে হয় যে, ভারতের জন্যে তাঁর অপরিসীম উদ্বেগ এবং দেশের তরুণ ও যুবকদের উপর তাঁর বিরাট আশা—যাদের তিনি উত্থিত ও জাগ্রত দেখতে চেয়েছিলেন—এর একমাত্র ব্যাখ্যা। আর আমরা যতই অযোগ্য হই না কেন, এটা তো ঘটনা যে বিবেকানন্দ নামক সেই আগ্নেয়গিরির, সেই বিরাট আগুনের কয়েকটি ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে আমাদের সত্তায় প্রবেশ করেছিল। এবং সেই মহা-আগুনের অণুমাত্রও যদি কারুর মধ্যে কোনভাবে একবার প্রবেশ করে তাহলে তা কখনই নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারবে না। সে ব্যক্তি সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হোন বা না হোন, একদিন না একদিন দেখা যাবেই যে, সেই ক্ষুদ্রতম অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি ক্রমশ বিস্তৃত হতে হতে তাঁর সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। আর ঠিক তা-ই হয়েছে আমাদের ক্ষেত্রে। ভারতের স্বাধীনতা যারা ছিনিয়ে নিয়েছিল, 'মুক্তিসঙ্ঘ' অথবা 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' যদি ভারত থেকে তাদের দূর করে দেওয়ার ব্যাপারে সামান্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, তবে তার মূলে ছিল সেই আগ্নেয়গিরি থেকে, সেই বিরাট আগুন থেকে ছিটকে আসা কয়েকটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যেগুলি একদিন গুটিকয় কিশোর এবং তরুণের বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং যেগুলিই নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালে তাদের অকুতোভয়ে মুক্তির দুঃসাহসিক অভিযানে ব্রতী করেছিল। বিপ্লব-পথের সেই নির্ভীক অভিযাত্রীদের ভবিষ্যৎ স্বামীজী নিশ্চয় তখনই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শুধু প্রত্যক্ষই করেননি; তারা যখন তাঁর পদপ্রান্তে বসেছিল সেই ক্ষণগুলিতে তিনি যেন নিজের হাতে তাদের ললাট-লিপি লিখে তাদের ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করেছিলেন। বাস্তবিক সেই মুহূর্তগুলি ছিল আমাদের কাছে 'মোমেন্টস অব ইপিফ্যানি'—আমাদের জীবনে এক পরম আবির্ভাবের মুহূর্ত।

স্বামীজী ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ—সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। আমাদের চোখে তিনি ছিলেন যুগনায়ক। শুধু আমাদের কেন, সারা দেশের অধিকাংশ হিন্দুর, বিশেষত যুবসম্প্রদায়ের, মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল আমাদের

ভাবনায়। শিকাগোতে যে অভূতপূর্ব ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছিল সে তো মাত্র কয়েক বছর আগেকার টাটকা ঘটনা তখন। শিকাগোর ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর সেই দৃপ্ত আবির্ভাবের সংবাদ ব্রিটিশপদানত ভারতবর্ষের উপর যেন একটা প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শকের মতো কাজ করেছিল। ঐ আকস্মিক আঘাতেই ভারতের ঘুম ভেঙেছিল। আর সেটাই ছিল বর্তমান ভারতবর্ষের জাগরণের প্রথম স্পষ্ট চিহ্ন—তার প্রায় হাজার বছরের গভীর জড়তা ভেঙে উত্থানের প্রথম সুস্পষ্ট লক্ষণ।

শঙ্করাচার্যের পর এরকম ব্যাপক জাগরণ আর হয়নি। ভারতের মানুষ অধীর আগ্রহে এবং উল্লাসে লক্ষ্য করেছিল কি অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে স্বামীজী পাশ্চাত্যে ভারতের মহিমা ও গৌরবকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভারতের জন্যে পাশ্চাত্যের কাছে তিনি কোন করুণা ভিক্ষা করেননি। উপরন্তু তিনি স্পষ্ট ভাষায় পাশ্চাত্যের মানুষকে বলেছিলেন, জ্ঞান এবং কৃষ্টির পীঠস্থান এই মহান প্রাচীন দেশকে যে-চোখে পাশ্চাত্য এতদিন দেখে এসেছে তার জন্য তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতের গরিমার কথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ কোন আজগুবী গল্প বানাননি, কোন অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেননি। ভারতের মহিমার কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী ইতিহাসের কোন তথ্য বিকৃত করেননি। It was not his story, but history, pure and simple—ভারতবর্ষের যা সনাতন রূপ, ভারতবর্ষের যা শাশ্বত, চিরন্তন রূপ—তার কথাই স্বামীজী বলেছিলেন তাদের কাছে। বর্তমানকালে তিনিই ছিলেন সেই ভারতবর্ষের যোগ্যতম প্রবক্তা। পাশ্চাত্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বামীজী বলেছিলেন, মানুষের মহত্তম চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষই সারা পৃথিবীর আচার্য এবং পাশ্চাত্যকে আজও ভারতবর্ষের পায়ের তলায় বসে তার পাঠ নিতে হবে। ভারতকে স্বামীজী বলতেন সভ্যতার জন্মদাত্রী। অতীতের ভারতবর্ষ কিভাবে জগতের চিন্তা ও কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেছে স্বামীজী তার খতিয়ান তুলে ধরেছিলেন। শুধু সেখানেই তিনি থামেননি। তিনি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, ভবিষ্যৎ মানবপ্রগতির ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ অতীতের চেয়ে আরও মহান ভূমিকা পালন করতে দৈবনির্দিষ্ট। আবার কঠোর ব্যঙ্গ এবং তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে স্বামীজী পাশ্চাত্যের মানুষের মুখের উপরে বলেছিলেন যে, তারা যে-সভ্যতার এত বড়াই করে সেই সভ্যতা হল আসলে একটা মুখোশমাত্র, যার আড়ালে রয়েছে পাশ্চাত্যের ভয়ঙ্কর স্বরূপ যা বর্বরতা আর পাশবিক হিংস্রতায় ভরা। বছরের পর বছর ধরে প্রাচ্যের অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিগুলির উপর পাশ্চাত্য যে নির্লজ্জ অত্যাচার ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে স্বামীজী সেকথা বলেছিলেন।

ভাবতেই পারা যায় না যে, পাশ্চাত্যেরই একটি জাতির পদানত, দরিদ্র ও দুর্বল ভারতবর্ষের এক দরিদ্র ও অজ্ঞাত তরুণ সন্ন্যাসী শক্তিশালী পাশ্চাত্যের বুকের উপর দাঁড়িয়ে ঐ সমস্ত কথা বলেছেন। শুধু যে বলেছেন তা-ই নয়, পাশ্চাত্যকে তা স্বীকারও করিয়েছেন। এর ফলে শুধু পাশ্চাত্যেরই নয়, ভারতের চোখও খুলে গিয়েছিল। যে-ভারতবর্ষ এতকাল নিজের মহিমা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, যে-ভারতবর্ষ প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তার অতীত গৌরবময় ইতিহাসের কথা—সেই ভারতবর্ষ যেন আবার নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এর ফল হল ম্যাজিকের মতো।

অকস্মাৎ সেই বিরাট লেভায়াথান (leviathan) যেন ঘুমের নেশা ছিঁড়ে গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। আর বস্তুত সেইক্ষণ থেকেই ভারতের সত্যিকারের জাগরণের সূচনা হল। স্বামীজী যেন কশাঘাত করে সেই ঘুমন্ত লেভায়াথানকে জাগিয়ে দিলেন।

বাস্তবিক, স্বামীজীই তো ভারতে জাতীয় জাগরণের জন্মদাতা। দেখেছি, ব্রহ্মবান্ধবের মতো নেতারাও নিজেদের 'Products of Swamiji's influence' বলে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করতেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব আমাদের বলেছিলেনঃ 'বিবেকানন্দই আমার চোখ খুলে দিয়েছে। যদিও সে ছিল আমার বন্ধু, আমার সহপাঠী, আমারই সমবয়সী, তবুও তাকে আমার "গুরু" বলে, আমার "চৈতন্যদাতা" বলে ভেবে আমি গর্ব অনুভব করি। বিবেকানন্দকে আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখি না, দেখি দেশপ্রেমের একটা জ্বলন্ত অতিকায় অগ্নিশিখারূপে, যে অগ্নিশিখা থেকে একটা ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ ছিটকে আমার বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। আর তার ফলেই আজ তোমরা আমাকে এখানে দেখছ। এই ব্রহ্মবান্ধব বিবেকানন্দেরই সৃষ্টি। শুধু আমি নই, আমার মতো অনেকেই স্বামীজীর প্রভাবে নবজন্ম লাভ করেছে। We are all products of Swamiji's influence.'

স্বামীজীকে আমি দেখেছি এবং তাঁর আশীর্বাদও লাভ করেছি শুনে ব্রহ্মবান্ধব অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কাহিনী তাঁকে বলেছিলাম। বলেছিলাম, স্বামীজীর সঙ্গে সেই সাক্ষাৎই আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছিলাম, স্বামীজীর উদ্দীপনাময় বাণী এবং আশীর্বাদই প্রধানত আমাদের বিপ্লবের পথকে বরণ করতে এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মুক্তিসঙ্ঘ' সংগঠন করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। সেকথা শুনে গভীর আবেগভরে ব্রহ্মবান্ধব বলেছিলেনঃ 'আমরা জানি বা না জানি, নবীন প্রবীণ আমাদের সকলের পিছনেই রয়েছে ঐ সাইক্লোনিক বিরাট মানুষটি। সে-ই আমাদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জাগরণের পিতা। আর পরমহংসদেব হলেন সেই জাগরণের পিতামহ।' এই প্রসঙ্গে বলি যে, আমাদের দলের 'মুক্তিসঙ্ঘ' নামটি ব্রহ্মবান্ধবের খুব পছন্দ হয়েছিল।

আমার কাছে এখন কেউ এলেই তাকে স্বামীজীর কথাই বলছি। তাঁর কথা মানেই তো ভারতবর্ষের কথা, ভারতবর্ষের উত্থানের কথা। কোন নেগেটিভ কথা ছিল না তাঁর। সবসময় আশা, উদ্যম আর এগিয়ে চলার কথা। পিছনে ফেরাকে, হতোদ্যম হওয়াকে তিনি ঘৃণা করতেন। দেশের আজ দুর্দশা দেখে অনেকে আমার কাছে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কিন্তু আমি ওঁদের দলে নই। বিবেকানন্দের কাছে আমরা ও-জিনিস শিখিনি। এ একটা ইতিহাসের পাসিং ফেজ। এ চলে যাবে। স্বামীজী বলেছেনঃ 'আমাদের ভবিষ্যৎ গৌরবময়। অতীতের সব গৌরবচ্ছটা সেই গৌরবের মহিমার কাছে ম্লান হয়ে যাবে।' এ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির বাণী। এ তো ব্যর্থ হতে পারে না। আসলে আমরা যারা কাঁদুনি গাইছি আজ তারা আমাদের দেশকে, আমাদের সমাজকে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে কি দিতে পেরেছি, কতখানি দিয়েছি তার কথা কেউ ভাবি না। বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছিলেন, আমাদের ভরে দিয়েছিলেন, আমাদের আত্মাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। সেই শক্তিতে আমরা চলেছিলাম,

আমরা লড়াই করেছিলাম। তারপর আমরা তাঁকে ভুলে যাবার চেষ্টা করেছি, অস্বীকার করার চেষ্টা করেছি। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছি শক্তি সঞ্চয়ের ; দেশ গঠনের, জাতি গঠনের, সমাজব্যবস্থা গঠনের পরিকল্পনা করেছি, সমস্যার সমাধান খুঁজেছি অন্যতর পথে, ভিন্নতর আদর্শে। তবে আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষ আবার স্বামীজীর কাছেই ফিরে আসবে এবং আসছেও। আসলে আমরা হারিয়ে ফেলেছি একটা মূলবস্তু যেটা স্বামীজী আমাদের দিয়েছিলেন—আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, আমাদের জাতীয়তাবোধ।

জাতীয়তাবোধ—ন্যাশনালিজম—এই বস্তুটি ভারতবর্ষে স্বামীজীরই দান। বাস্তবিক স্বামীজী যে জাগরণ এনেছিলেন তা-ই ভারতবর্ষে সামগ্রিকভাবে ন্যাশনালিজম-এর উন্মেষ ঘটিয়েছিল। কিন্তু ন্যাশনালিজম-এর যে ধারণা ভারতবর্ষ স্বামীজীর কাছ থেকে পেয়েছিল তার সঙ্গে 'ন্যাশনালিজম' বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় তার একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। স্বামীজী যে ন্যাশনালিজম-এর চেতনা ভারতবর্ষে সঞ্চার করেছিলেন তার মূলে ছিল একটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। একে আমরা 'স্পিরিচুয়াল ন্যাশনালিজম' বলতে পারি। 'দেশ' শুধু দেশ নয়, দেশ হল 'মা', আর জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সারা দেশের মানুষ হল পরস্পরের ভাই। কারণ তারা সবাই সেই বিরাট মায়ের সন্তান। এই দৃষ্টি, এই চেতনা, এই বোধ বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে দিয়েছিলেন। 'ন্যাশনালিজম'—বলতে আমরা সাধারণত বুঝি জাতীয়তাবাদ। আর স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যাশনালিজম হল জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবোধ দুই-ই। প্রথমটি বাইরের ব্যাপার। তার প্রধান তাৎপর্য রাজনৈতিক। দ্বিতীয়টি ভিতরের বস্তু, মানসিক ব্যাপার। তার তাৎপর্য শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে অনেক গভীরে তার ব্যাপ্তি। 'বোধ' প্রথমে একটা ভিত্তি প্রস্তুত করে মনে, পরে তা ক্রিস্ট্যালাইজড্ হয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। সেটা হয় 'বাদ'। স্বামীজীর ন্যাশনালিজম এই 'বোধ' ও 'বাদ' এর মিলিত রূপ। এর মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষের মানুষের মনে জাগ্রত করে দিতে পেরেছিলেন বাংলা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, গুজরাট, কাশ্মীর—যে-প্রদেশের আমরা লোক হই না কেন, যে-ভাষায় আমরা কথা বলি না কেন আমরা সকলেই ভারতবাসী এবং ভারতবাসী একটাই জাতি। ভারতবর্ষ সকলেরই জন্মভূমি—নিজ জননীরই আর এক রূপ।

আধুনিক ভারতবর্ষে স্বামীজীর পূর্বসূরীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই ধারণার আংশিক প্রকাশ দেখা যায়। 'আংশিক' বলছি এই কারণে যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেশমাতৃকা' এবং 'দেশবাসী'র ধারণা বাংলা এবং বাঙালীকে কেন্দ্র করেই সীমিত ছিল। 'বন্দেমাতরম্'-এ যে দেশজননীর বন্দনা করা হয়েছে তিনি স্পষ্টতই বাংলা-মা আর যে 'সপ্তকোটি' মানুষের কথা বলা হয়েছে তারাও নিঃসন্দেহে বাঙালী। সেসময়ে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় সাত কোটি। রবীন্দ্রনাথ কয়েক বছর পর বলছেন ঃ 'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।' ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'বন্দেমাতরম্' এবং 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন ঃ 'এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা বাংলাকেন্দ্রিক।' ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারেরও ঐ একই রকম ধারণা বলে

আমাকে জানিয়েছেন। স্বামীজীর চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই আংশিক ভাবনাই পূর্ণতা পেয়েছে। ব্রহ্মবান্ধবও একথা আমাকে বলেছেন। ঐতিহাসিক হিসেবে রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই মতের সমর্থক। স্বামীজী যখনই বলেছেন, 'Our country' (আমাদের দেশ) অথবা 'My country' (আমার দেশ) তখন তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের কথাই বোঝাতেন। যখন বলেছেন, 'Our countrymen' (আমাদের দেশবাসী) অথবা 'My countrymen' (আমার দেশবাসী) তখনও সমস্ত ভারতবাসীর কথাই বলতে চেয়েছেন। আর সেই চেতনাই তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে সঞ্চার করতে। বলেছেন ঃ 'সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' বলেছেন ঃ 'বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ।' স্বামীজীর এই বাণীই ছিল আমাদের মন্ত্র। সেযুগে তা-ই ছিল আমাদের আদর্শ। শুধু সেযুগে কেন আজও তা-ই। স্বামীজীর আগে জাতীয়তার এর চেয়ে মহত্তর বাণী এযুগে আর কেউ শোনাতে পারেননি। আর পরেও কি কেউ পেরেছেন? স্বামীজী শুধু বাণীই দেননি, তিনি নিজেই ছিলেন তাঁর বাণীর মূর্ত পরাকাষ্ঠা। নিবেদিতা তাঁর সম্বন্ধে বলতেন ঃ স্বামীজী ছিলেন 'Incarnation of India's national life' (ভারতের জাতীয় জীবনের মূর্ত বিগ্রহ)। বলতেন ঃ 'Swamiji was himself the living embodiment of that idea which the word "nationalism" conveys' ('জাতীয়তা' শব্দটি যে ভাবকে প্রকাশ করে স্বামীজী ছিলেন সেই ভাবের জীবন্ত দেহধারী প্রকাশ)। যা সত্যি তা-ই বলেছেন নিবেদিতা। ভারতবর্ষ এক, ভারতবাসীও এক—এই বাণী স্বামীজী দেশের সর্বত্র প্রচার করেছিলেন এবং নির্মাণ করে দিয়েছিলেন এক অখণ্ড ভারতবর্ষের বনিয়াদ, যে ভারতবর্ষ একদিন সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল। আমি সেই মহাভারতের রূপ এবং তার রূপকারকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি আমার জীবনে। তাই ভারত-বিভাগকে আমি কোনদিন মেনে নিতে পারিনি।

তাঁর আদর্শের প্রেরণাতেই পরাধীন ভারতবর্ষ কাপুরুষতার বিরুদ্ধে, লজ্জাকর বিদেশী-অধীনতার বিরুদ্ধে, অত্যাচারী ব্রিটিশ-রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হয়েছিল। তিনি প্রত্যক্ষভাবে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেননি—যেমন নেমেছিলেন রাণা প্রতাপ, শিবাজী অথবা গুরু গোবিন্দ সিংহ। কিন্তু ভিন্নভাবে, প্রেরণার দিক দিয়ে সমগ্র জাতিকে তিনি ফায়ার করে দিয়েছিলেন। তিনি সংগ্রামের পটভূমি রচনা করে দিয়েছিলেন। তাঁর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে এসেছিল সহস্র সহস্র সৈনিক এবং সেই সংগ্রাম পরিচালনার জন্য যোগ্য সেনাপতিরা। প্রতাপ, শিবাজী, গোবিন্দ সিংহ—এঁদের গভীর দেশপ্রেম ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁদের দেশপ্রেম ছিল ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে দেশপ্রেম সমগ্র ভারতবর্ষের জন্যে ছিল না। স্বামীজীর দেশপ্রেম ছিল সারা ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে। তাঁর বেদনা ছিল গোটা ভারতবর্ষের পরাধীনতার জন্যে। সেই প্রেম, সেই দৃষ্টি প্রতাপ, শিবাজী, গোবিন্দ সিংহ কারুর ছিল না। তবে স্বামীজীর কথা মনে হলে আমার শিবাজীর গুরু স্বামী রামদাসের কথা মনে পড়ে। স্বামী রামদাস ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের এক সার্থক পূর্বসূরী; যদিও ক্ষুদ্র ছিল

তাঁর প্রভাবের পরিধি, সীমিত ছিল তাঁর ঐক্য-চেতনার দৃষ্টি। কিন্তু তবু তিনি চিরস্মরণীয়। কারণ তিনি ছত্রপতি শিবাজীর স্রষ্টা। ঐ সন্ন্যাসীর বাণীকেই পাথেয় করেছিলেন শিবাজী। তাঁর 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা' ছিল স্বামী রামদাসের গৈরিক অঙ্গবাস। আর স্বামীজীর আদর্শকে সম্বল করে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা তুলেছিলাম আমরা, তুলেছিলেন একালের শিবাজী নেতাজী। স্বামীজীর দেওয়া দেশপ্রেমিকের যে রূপরেখা আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল সেই সর্বত্যাগী, দুঃসাহসী, সত্যাশ্রয়ী ভারতপ্রেমিক দেশনায়কের প্রতিচ্ছবি আমি দেখেছি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। স্বামীজীর ধারণা অনুসারী ছিল নেতাজীর দেশপ্রেমের ধারণা। দেশ ছিল তাঁর ধর্ম, তাঁর ধ্যানের দেবতা, তাঁর সাধনার বীজমন্ত্র—আর সে দেশ 'অখণ্ড ভারতবর্ষ'। ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্রই ছিলেন স্বামীজীর যথার্থ উত্তরসাধক।

সুভাষচন্দ্র আমাকে বলেছিলেন ঃ 'ভারতবর্ষকে আমি ভালবেসেছি বিবেকানন্দ পড়ে। আর বিবেকানন্দকে আমি চিনেছি নিবেদিতার লেখায়।' বস্তুত বিবেকানন্দের দেশপ্রেমের ফায়ারকে নিবেদিতা তাঁর জীবনের মধ্যে ধারণ করেছিলেন। শুধু ধারণই করেননি তিনি, সেই আগুনকে তিনি বহনও করেছিলেন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। ভারতবর্ষের যেখানে তিনি গিয়েছেন, যেখানে তিনি থেকেছেন, সেখানেই তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় প্রচার করেছেন স্বামীজীর ভাব, স্বামীজীর বাণী, স্বামীজীর আদর্শ। সেইসঙ্গে তিনি প্রচার করেছেন ভারতবর্ষকে। বস্তুত বিবেকানন্দকে আমরা তো চিনলাম নিবেদিতার মাধ্যমে, তাঁর সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে এসে। ভারতবর্ষকেও তো আমাদের চেনালেন তিনি। স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় মাত্র চৌদ্দ দিনের। কিন্তু নিবেদিতার সঙ্গে মিশেছি অনেক বেশী। সুভাষচন্দ্রের মতো নিবেদিতার মাধ্যমেই স্বামীজীকে আমরা চিনতে পেরেছি, সেইসঙ্গে চিনেছি ভারতবর্ষকে। সুভাষচন্দ্রের অবশ্য নিবেদিতার সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে আসা হয়নি। নিবেদিতার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ঃ স্বামীজীর বাণী ও ভাব প্রচারের ব্যাপারে তিনি দুটি ভূমিকা পালন করেছেন। একটি মহাদেবের, অপরটি ভগীরথের। স্বামীজীর বাণী ও আদর্শের প্রবল বেগকে তিনি মহাদেবের মতো নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন, আবার ভগীরথের মতো সেই দুর্মদ স্রোতধারাকে তিনি বহন করে বেড়িয়েছেন।

নিবেদিতা আমাদের বলতেন ঃ 'India was Swamiji's greatest passion. The thought of India was virtually an obsession with him. India throbbed in his breast, India beat in his pulses, India was his day-dream, India was his nightmare. Not only that. He himself became India. He was the embodiment of India in flesh and blood. He was India, he was Bharat—the very symbol of her spirituality, her purity, her wisdom, her power, her vision and her destiny.' স্বামীজীর সম্পর্কে এর চেয়ে যোগ্যতর বর্ণনা কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই, আর কেউ কখনও করতে পারবেন বলেও আমি মনে করি না। স্বামীজীর সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। কিন্তু কী গভীরতায়, কী বর্ণনায়, নিবেদিতার 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' এখনও সর্বশ্রেষ্ঠ।

ভবিষ্যতেও তাঁর লেখাকে অতিক্রম করতে কেউ পারবেন না বলে আমার ধারণা। এখনও পর্যন্ত নিবেদিতাই স্বামীজীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। নিবেদিতাকে তিনি বলেছিলেন—(জানি না স্বামীজীর কোন জীবনীতে একথা লিপিবদ্ধ আছে কি না)—নিবেদিতার নিজের মুখ থেকে আমি শুনেছি, 'আমিই ভারতবর্ষ'। সেই ভারতবর্ষের জন্যই নিঃশেষে নিবেদন করেছিলেন নিজেকে নিবেদিতা। ভারতবর্ষের জন্য ? অথবা বিবেকানন্দের জন্য ? কারণ নিবেদিতার চেতনায় ভারতরর্ষ ও বিবেকানন্দ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ ঃ ভারতবর্ষের এক নাম বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দের আর এক নাম ভারতবর্ষ।

আজকের ভারতবর্ষের মানুষের, বিশেষ করে যুবক ও ছাত্রদের, জানা দরকার যে, আমাদের দেশমাতৃকা কী বিরাট এক পুরুষকে, কত বড় এক দেশপ্রেমিককে প্রসব করেছিলেন। তাদের জানা দরকার চীন, রাশিয়া বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কাছে তাদের 'বৈপ্লবিক' এবং 'প্রগতিশীল' চিন্তার জন্য হাত পাততে হবে না। তাদের জানা প্রয়োজন অন্যত্র কোথাও কোন 'চেয়ারম্যান' অথবা কোন 'ম্যানিফেস্টোর' জন্যে তাদের বৃথা অন্বেষণ করে শক্তিক্ষয় করার প্রয়োজন নেই। ভারতের উন্নতির জন্যে যা-কিছু প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী তারা পাবে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মধ্যে। বিদেশের কোন নেতার পথ ও আদর্শ অথবা বিদেশ থেকে আমদানি করা কোন 'ইজম্' ভারতের কোন কাজেই আসবে না।

স্বামীজী কঠোর ভাষায় আমাদের অন্ধ পরানুকরণকে সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, ভারতের মৌলিকতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, ভারতের ঐতিহ্য ও অতীত ইতিহাসকে অস্বীকার করে ভারতবর্ষকে ইউরোপ বা আমেরিকা বানানোর চেষ্টা করলে তা হবে চূড়ান্ত হঠকারিতা। নেব আমরা নিশ্চয় যা আমাদের উন্নতির সহায়ক, যা আমাদের সমৃদ্ধির পরিপূরক। কিন্তু কিভাবে নেব, কতটা নেব ? সেটাই প্রশ্ন ঃ তা-ও শিখিয়েছেন স্বামীজী। সেই কৌশল হল ঃ স্বকীয়তাকে বিসর্জন না দিয়ে যা কল্যাণকর, যা বলপ্রদ, যা জীবনপ্রদ তাকে গ্রহণ করা। নিবেদিতাও সেকথা আমাদের বলেছেন। নিবেদিতার মুখে বহুবার শুনেছি ঃ 'India must grow in her own line of growth. India must remain India always and ever.' (ভারতবর্ষকে তার স্বকীয় বিকাশের ধারাতেই এগিয়ে যেতে হবে। ভারত চিরকাল ভারতই থাকবে।) এ আসলে স্বামীজীরই কথা, নিবেদিতা তাঁর কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। দেশের বর্তমান ঐতিহাসিকদের উচিত ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণে স্বামীজীর ভূমিকাকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা। ব্রিটিশের অত্যাচারে ভারতবর্ষ যখন জর্জরিত, তখন স্বামীজী ভারতবর্ষকে কি দিয়েছিলেন তার যথার্থ মূল্যায়ন করা তাঁদের একটি পবিত্র দায়িত্ব।

একটা কথা ইদানীংকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন যে, ভারতবর্ষ যে-দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল, পাকিস্তানের জন্ম হল, তার জন্যে অনেকাংশে দায়ী হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ যার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এঁরা বলছেন বিপ্লবী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল, সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল যে, এই আন্দোলন বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্মের

আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

প্রাথমিক দৃষ্টিতে এই তথ্যকে এক কথায় ভুল বলা যাবে না এবং ভয়টা সেখানেই। যা মিথ্যা বলে সঠিক জানা যায় তার সম্বন্ধে মানুষ সাবধান হতে পারে। কিন্তু মিথ্যার চেয়ে ভয়াবহ জিনিস হচ্ছে অর্ধসত্য, যার মধ্যে কিছুটা সত্য রয়েছে। এটা সত্য যে স্বামীজীর প্রচারের ফলে হিন্দুধর্মের মরা গাঙে বান এসেছিল এবং পাশ্চাত্যে তাঁর একটি প্রধান পরিচয়ও ছিল তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী—'দি হিন্দু মঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া'। কিন্তু তখনকার পাশ্চাত্য দেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে আবার এ-ও বলা হয়েছে যে তিনি বৌদ্ধ। আবার বলা হয়েছে তিনি রামমোহন রায়ের অনুগামী, এ-ও দেখেছি। আবার বলা হয়েছিল ঃ তিনি ভারতীয় সন্ন্যাসী। কিন্তু ঐসব ঐতিহাসিকরা শুধু ঐ 'হিন্দু মঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া' এবং সে-হিসাবে তাঁর প্রভাবের প্রতিক্রিয়াকেই বড় করে দেখছেন এবং দেখাচ্ছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ-প্রচারিত ধর্মের যে সার্বজনীন রূপ, যে বিরাট উদারনৈতিক দিক, যা অবশ্য হিন্দুধর্মেরই সত্যিকার রূপ, যার প্রতীকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরু সর্বধর্মসমন্বয়মূর্তি রামকৃষ্ণদেব, যার প্রতিফলন ঘটেছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মধ্যে, বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের মধ্যে—সেই দিকটিকে এঁরা হয় দেখতে পাচ্ছেন না অথবা ইচ্ছা করে দেখছেন না।

এইসব ইতিহাস-লেখকরা খবর রাখেন কিনা জানি না যে, এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজ সরকারের দিক থেকে বিশেষ রকম চেষ্টা করা হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ করার। রমেশচন্দ্র মজুমদারের সূত্রে ব্রিটিশ সরকারের এই চেষ্টার সত্যতা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি। স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিসের গোপন রিপোর্ট, শুধু উচ্চপদস্থ নয়, উচ্চতম ব্রিটিশ রাজপুরুষদের সে-বিষয়ে মন্তব্য প্রভৃতি তিনি নিজে দেখেছেন বলেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের অপরাধ, মিশনে এমন অনেকে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের সন্ন্যাসপূর্ব জীবনে ছিলেন 'সন্ত্রাসবাদী'। তাছাড়া আরও বহু মানুষ যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ছিলেন বিপ্লব-আন্দোলনের সমর্থক, তাঁরা ছিলেন মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, মিশনের ভক্ত, মিশনের শুভানুধ্যায়ী। ইংরেজ সরকার এ-ও লক্ষ্য করেছিল বহু দেশপ্রেমিক শিক্ষিত যুবক, ছাত্র মিশনে যাতায়াত করে, উৎসবে, বন্যাত্রাণ প্রভৃতিতে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করে। তারা বিবেকানন্দের ভক্ত। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের বদ্ধমূল ধারণা হল ঃ রামকৃষ্ণ মিশনও গোপনে গোপনে বিপ্লব-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি লালন করে এবং বিপ্লবীদের মদত যোগায়।

রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, সেই রিপোর্টগুলির কোনও জায়গায়, কোনও সূত্রে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এ অভিযোগ করা হয়নি যে, রামকৃষ্ণ মিশন অথবা তার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ অথবা তার সমকালীন কর্তৃপক্ষ কোনরকম সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। সহায়ক-তথ্য হিসেবে এটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ ডক্টর মজুমদার দেখেছেন এই গোপন রিপোর্টগুলির বিষয়বস্তু স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে, বিপ্লবীদের উপরে

স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচণ্ড প্রভাব যা কিনা ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে বড় রকম আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্যে রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ করার কথা তাঁরা গুরুত্বসহকারে ভাবছিলেন এবং কিভাবে তা করতে পারেন তার জন্য ফন্দি-ফিকির খুঁজছিলেন। সেক্ষেত্রে কূটনৈতিকভাবে স্বামী বিবেকানন্দকে 'সাম্প্রদায়িকতার প্রচারক' এবং রামকৃষ্ণ মিশনকে তার প্রতিষ্ঠাতার অনুগামী একটি 'সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান' আখ্যা দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ করার কাজটি খুব সহজ হত। অথচ সে আখ্যা তাঁরা দিতে পারলেন না। উপরন্তু, রমেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে শুনেছি তিনি নিজে দেখেছেন ব্রিটিশের গোয়েন্দা পুলিসের গোপন রিপোর্টে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারিত ধর্মের উদারতা ও সার্বজনীনতাকে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অসাম্প্রদায়িক কাজকর্মকেই নথিবদ্ধ করা হয়েছিল। অভিযুক্ত করতে গিয়ে তাঁরা এমন একটা বিরাট সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে যা এখন আমাদের কাজে লাগবে। ব্রিটিশের গোয়েন্দা পুলিস্ এই তথ্যটিকে স্বীকার না করে পারেননি। তাই তাঁরা তাঁদের গোপন রিপোর্টে তা নথিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেসব ঐতিহাসিক স্বামীজীকে তথাকথিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক আখ্যা দেন এবং উনবিংশ শতকের জাগরণকে মূলত হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ বলেন যার ফলে পরবর্তী কালে ভারত খণ্ডিত হয়েছিল বলে থীসিস লেখেন তাঁদের এই বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।

'হিন্দু' অর্থে যদি সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষকে বোঝায় তাহলে নিশ্চয়ই স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের আগে এবং তাঁর সময়েও বিদেশের মানুষ 'হিন্দু' বলতে সারা ভারতবর্ষের মানুষকেই বোঝাত— সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক অথবা আর কিছু হোক—এবং 'হিন্দ' বা 'হিন্দুস্থান' বলতে ভারতবর্ষকে বোঝাত। যতদূর মনে পড়ছে বোধহয় ট্রটস্কির একটা লেখায় পড়েছিলাম যে তিনি লিখছেন একজন ভারতীয় মুসলমানের নাম, তারপর কমা দিয়ে লিখছেন 'A Hindu' (একজন হিন্দু)। স্বামীজী যদি হিন্দু জাগরণ ঘটিয়ে থাকেন তা সেই বৃহত্তর অর্থেই—সকল হিন্দু বা সারা হিন্দুস্থানের জাগরণ। আমার অনেক মুসলমান বিপ্লবী বন্ধু ছিলেন, অনেক মুসলমান বিপ্লবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, শহীদও হয়েছেন। তাঁরাও তো আমাদের মতো স্বামীজীকে আদর্শ বলে জানতেন। আমি যেসব বন্ধুদের নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম তার মধ্যে একজন ছিলেন মুসলমান— সৈয়দ আলিমুদ্দিন আমেদ, 'মাস্টার সাহেব' নামে যাঁর পরে পরিচিতি হয়েছিল বেশী। তিনিও স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন আমাদেরই মতো স্বামীজীরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। মাস্টার সাহেবের দুজন অনুগত জন নৈমুদ্দিন আমেদ এবং আব্দুল জব্বারও ছিলেন তাঁরই মতো স্বামীজীর অনুরাগী। স্বামীজীর ভক্ত মুসলমান বিপ্লবীদের মধ্যে আরও অনেক ছিলেন। ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে স্বামীজীর কি ধারণা ছিল, তাঁর স্বপ্নের ভবিষ্যৎ ভারতের জাগরণ যে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাগরণ ছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে তাঁর সরফরাজ হোসেনকে লেখা সেই বিখ্যাত চিঠিতে যেখানে

তিনি বলছেন: 'For our own motherland a junction of the two great systems, Hinduism and Islam—Vedanta brain and Islam body—is the only hope. I see in my mind's eye the future perfect India rising out of this chaos and strife, glorious and invincible, with Vedanta brain and Islam body.' (আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির একমাত্র আশা হিন্দু ও ইসলাম এই দুই মহান মতের সমন্বয়—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ। আমি মানসচক্ষে দেখছি, এই সব বিবাদ-বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারতবর্ষ বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহামহিমায় অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠছে।)

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে যাঁরা বলেন তিনি তথাকথিত হিন্দুধর্ম প্রচার করতে বিদেশে গিয়েছিলেন তাঁরা মূর্খ। তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন ভারতবর্ষকে প্রচার করতে। আর যদি ধর্মই প্রচার করে থাকেন তিনি সে-ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। তা হল বেদান্ত, যার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে ধর্মের সমগ্র রূপ, ধর্মের সার্বজনীন রূপ। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সকলের জন্য সেই ধর্ম। বিবেকানন্দের সেই ধর্ম হচ্ছে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ধর্ম। হিন্দুধর্মের কথা যেখানে তিনি বলেছেন সেখানে সেই হিন্দুধর্মকে বুঝিয়েছেন উদারতায় যা আকাশের মতো, গভীরতায় যা সমুদ্রের মতো। বস্তুত হিন্দুধর্ম আসলে বিশ্বধর্ম। যে-হিন্দুধর্মের রূপ আমরা সাধারণত জানি সে ঐ হিন্দুধর্মের বিকৃত রূপ। আর হিন্দুধর্ম বলেও কোন ধর্ম তো আসলে নেই। 'হিন্দু' শব্দ তো একটা ভৌগোলিক শব্দ। সিন্ধুনদের এদিকে যারা থাকত প্রাচীনকালে পারসিকরা, গ্রীকরা তাদের 'হিন্দু' বলত। তারা 'স' উচ্চারণ করতে পারত না। আমাদের ধর্মের সঙ্গে 'হিন্দু' শব্দটি জুড়ে গিয়েছে মুসলমান আমলে, প্রধানত ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে অন্য ধর্মের সঙ্গে আমাদের ধর্মের পার্থক্য বোঝাতে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে তো 'হিন্দুধর্ম' বলে কোন ধর্ম পাই না, শঙ্করাচার্যও তো 'হিন্দুধর্ম' বলছেন না। যা আছে তা হল 'সনাতন ধর্ম', 'বেদান্ত-ধর্ম'। এসব তো ইতিহাস। আসলে যেসব ইতিহাস-লেখক স্বামীজীকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বলেন, হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট বলেন, রিঅ্যাকশনারী বলেন তাঁরা তা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বলেন। স্বার্থান্বেষী চক্রের এইসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়াসকে বানচাল করতে যথার্থ ও সৎ ঐতিহাসিকদের এগিয়ে আসতে হবে। যাঁরা বলেন স্বামীজী রিঅ্যাকশনারী তাঁদের কাছে আমার চ্যালেঞ্জ যে, শুধু বর্তমান ভারতের ইতিহাসেই নয়, সারা পৃথিবীর আধুনিককালের ইতিহাসে স্বামীজীর চেয়ে বেশী প্রোগ্রেসিভ চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একজন মানুষের কথা কেউ আমাকে বলুন। আমি জানি, মুক্ত মন নিয়ে বিচার করলে একজনের কথাও তাঁরা বলতে পারবেন না।

স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন: 'তোরা মানুষ হ। মানুষের শক্তি লাভ করে পরস্বাপহারীদের দেশ থেকে দূর করে দে। পরাধীন জাতির কোন ধর্ম নাই, পরাধীন জাতির শ্রাদ্ধাধিকার নাই। হাজার বছর ধরে গোলামি করে তোরা মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছিস্। গোলামের ইহকালেও অন্ধকার, পরকালেও অন্ধকার। গোলাম কি আর মানুষ! গোলাম পশুরও অধম। আসল দরকার হল "মানুষ"—মানুষের মতো মানুষ। ভারতমাতা ঐরকম সহস্র মানুষ বলি চান, জানোয়ার নয়। তোরা ওঠ, জাগ। গোলামির

শিকল ছিঁড়ে ফেল, ছিনিয়ে নে দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা কি এমনি কেউ দেয় রে? তা অর্জন করতে হয়। যা ভারত হারিয়েছে তা তোদের পৌরুষের বলে, মানুষের শক্তিতে আবার পুনরুদ্ধার কর। পশুও চায় না বন্দী হয়ে থাকতে। গরুকে বেঁধে রাখলে গরুও দড়ি ছিঁড়তে চায়, ছিঁড়তে চেষ্টা করে। আর তোরা কি করছিস! তোরা ওঠ, তোরা জাগ। তোরা মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠ। আর হাতে কৃপাণ ধর, ধর বন্দুক। চলুক গুলি-গোলা। ভীমা রণরঙ্গিণী মহাকালীর সন্তান আমরা। ভয় কাকে? কিসের ভয়?'

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন: 'বিবেকানন্দের সঙ্গে যখন আমার শেষ সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি আমাকে ব্যাকুলভাবে বলেছিলেন, ভাই, সকলের আগে "মানুষ" চাই। সত্যিকারের মানুষ। মানুষ না হলে কিছু হবে না। স্বাধীনতা পাঁচ বছর পরে আসবে, কি বিশ বছর পরে আসবে, কি পঞ্চাশ বছর পরে আসবে সেটা বড় কথা নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বাধীনতা অর্জন করার যোগ্য আমরা হয়েছি কিনা, আরও বড় কথা স্বাধীনতা পেয়ে তা বজায় রাখতে পারব কিনা।' বিবেকানন্দ তাই বলতেন 'Man-making is my mission'—প্রকৃত মানুষ গড়াই আমার ব্রত। স্বাধীনতা লাভের এত বছর পরেও দেখছি স্বামীজী কতবড় সত্যি কথা বলেছিলেন। আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু 'মানুষ' হইনি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু জাতিগঠন হয়নি।

আমার জ্যাঠতুতো ভাই বেলুড় মঠে সাধু হয়েছিল। তার নাম হয়েছিল স্বামী মোক্ষানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তার দীক্ষা হয়েছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সে আমাকে স্বামীজীর দুটি অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলেছিল। সে বলেছিল যে, স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বলেছিলেন 'আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অভাবনীয়ভাবে বিনা রক্তপাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে এবং স্বাধীনতা লাভের পর চীনের দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রান্ত হবে।' আমরা দেখেছি স্বামীজীর এদুটি ভবিষ্যদ্বাণী কত অভ্রান্ত। আর আমাদের কাছে স্বামীজী যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা-ও কম চমকপ্রদ নয়। স্বামীজী বলেছিলেন: 'পৃথিবীতে শূদ্র জাগরণ আসছে। সে জাগরণ প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং তারপর চীনে। তারপর পালা ভারতবর্ষের।'

এই অসাধারণ মানুষটিকে আমি দেখেছি। জীবনে আর দ্বিতীয় একজন মানুষকেও দেখিনি যাকে স্বামীজীর পাশে দাঁড় করাতে পারি। বিবেকানন্দ আমার চোখে পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ মানুষ—সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

আমি বিশ্বাস করি, অন্তর থেকে বিশ্বাস করি, স্বামীজীর পথই ভারতবর্ষের একমাত্র পথ, তাঁর আদর্শই আমাদের সামনে একমাত্র আদর্শ—যে পথ, যে আদর্শই—আজ পারে ভারতবর্ষকে উত্তোলন করতে, তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে। আমার জীবনে সেদিনটি হয়তো দেখা হবে না। কিন্তু আমি জানি নতুন দিন আসছে। আজ যেসব দুর্লক্ষণ দেখছি তা আগামী প্রজন্ম কাটিয়ে উঠে গঠন করবে এক সুখী, সুন্দর, শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ; যে-ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ

এবং যে-ভারতবর্ষের ধারণা ও তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব তিনি আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন।

আজকের অশুভ পরিস্থিতিতেও আমি আশাবাদী। আমি বিশ্বাস করি, সকল গ্লানি দূর করে, সকল ক্লৈব্য ও সংশয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এই জাতি ও তার তারুণ্যশক্তি সেই গন্তব্যস্থানেই একদিন পৌঁছাবে—যেখানে পৌঁছাবার স্বপ্ন আমরা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ (অর্থাৎ স্বামীজীকে দেখার সময়) থেকে অদ্যাবধি দেখে আসছি।

স্বামীজী বলেছিলেন, ভারতবর্ষকে ভালবাস*

৫৪ ওয়েস্ট, ৩৩ নং স্ট্রীট, নিউইয়র্ক। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি আমি আমার বোনের সঙ্গে এই বাড়িতে গিয়েছিলাম। এখানেই আমি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রথম শুনি। তিনি তাঁর বসবার ঘরে ছিলেন। ১৫-২০ জন ভদ্রমহিলা এবং ২-৩ জন ভদ্রলোক মিলে ঘর ভর্তি। কোন চেয়ার খালি না থাকায় আমি মেঝেতেই বসলাম। স্বামীজী ছিলেন কোণে দাঁড়িয়ে। তিনি কিছু বললেন, ঠিক কথাগুলো আমার মনে নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তা আমার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হল। তাঁর দ্বিতীয় কথাটিও সত্য বলে মনে হল, তৃতীয় কথাটিও তা-ই। তারপর আমি সাত বছর তাঁর কথা শুনেছি। যা-কিছু তিনি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছেন, তা-ই আমার কাছে সত্য বলে মনে হয়েছে এবং তখন থেকেই আমার কাছে জীবনের অর্থ আর এক রকম হয়ে গেছে। তিনি যেন আমাকে অনুভব করিয়েছেন—আমি অনন্তে বিরাজমান।

তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই আমরা ধ্যানের অভ্যাস করতাম, আর গীতাও পড়েছিলাম যত্ন করে। আমার মনে হয়, বিবেকানন্দ-রূপ মহাশক্তিকে চেনবার পক্ষে এগুলো পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে কাজ করেছিল। অন্যকে সাহস যোগানো—সম্ভবত এর মধ্যেই ছিল তাঁর শক্তি। তাঁকে নিজের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সজাগ মনে হত না। অন্যের প্রতিই ছিল তাঁর আগ্রহ। তিনি বলতেন: 'জীবনের গ্রন্থ যখন উন্মোচিত হয়, তখনই মজার শুরু।' তিনি আমাদের উপলব্ধি করিয়ে দিতেন, জীবনে ঐহিক ভাবাপন্ন কিছু নেই—সবই আধ্যাত্মিক, সবই পবিত্র। বলতেন: 'তুমি যে একজন আমেরিকাবাসী, একজন স্ত্রীলোক—এগুলো আকস্মিক ঘটনা। আসলে চিরকালই তুমি ভগবানের সন্তান। দিনরাত নিজেকে বল—কে তুমি, নিজের স্বরূপ কখনও ভুলে যেও না।'

তাঁর উপস্থিতির মধ্যেই ছিল একটা সক্রিয় উদ্দীপনা। নিজের না থাকলে এ-শক্তি অন্যকে দেওয়া যায় না, টাকা না থাকলে যেমন টাকা দান করা যায় না।

সেবার বসন্তকালের এক রাত্রিতে আমরা মিস্টার ফ্রান্সিস এইচ লেগেট-এর বাড়িতে নৈশভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। মিস্টার লেগেট পরে আমার ভগ্নীপতি হন। আমরা তাঁকে বলেছিলাম: 'আমরা আপনার সঙ্গে খেতে পারি, কিন্তু সন্ধ্যেটা আপনার সঙ্গে কাটাতে পারব না।' তিনি বলেছিলেন: 'ঠিক আছে, একসঙ্গে খাওয়াই যাক শুধু।' খাওয়া হয়ে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'কোথায় যাচ্ছেন আজকে সন্ধ্যেবেলা?' বললাম: 'একটা বক্তৃতা শুনতে যাচ্ছি।' তিনি বললেন: 'আমি কি আসতে পারি?' আমরা বললাম: 'হ্যাঁ।' তিনি এলেন, বক্তৃতাও শুনলেন। বক্তৃতা শেষ হলে মিস্টার লেগেট স্বামীজীর কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন:

---

* অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত Reminiscences of Swami Vivekananda গ্রন্থ থেকে জোসেফিন ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

'স্বামীজী, আমার সঙ্গে কবে আপনি আহার করবেন?' ইনিই আমাদের সামাজিকভাবে স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

তারপরে আমি আর আমার বোন যখন বোনের বিয়ের পোশাক কিনতে প্যারিস গেলাম, স্বামীজী গেলেন সহস্রদ্বীপোদ্যানে। সেখানে দু-সপ্তাহ ধরে তিনি সেই অপূর্ব বাণী বিতরণ করলেন—যা দেববাণী নামে পরিচিত। আমার মনে হয়, তাঁর সেই বাণীগুলিই সবচেয়ে সুন্দর। কারণ, সেগুলো উচ্চারিত হয়েছিল কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্য-শিষ্যাদের উদ্দেশ্যে। তারা তাঁর শিষ্য হলেও আমি কিন্তু তখনও তাঁর বন্ধু ছাড়া আর কিছুই ছিলাম না। সহস্রদ্বীপোদ্যানের সেই বাণীগুলিতে তিনি কি এক অদ্ভুত উৎকর্ষ দান করেছিলেন! সেই বাণীগুলির মধ্যে তাঁর অন্তস্তল যেন পরিপূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়েছে। আমার মনে হয়, তাঁর আর কোন বাণীতেই এমনটি হয়নি।

আগস্ট মাসে তিনি মিস্টার লেগেটের সঙ্গে প্যারিসে এলেন। সেখানে আমি আর বোন হল্যান্ড হাউসে উঠেছিলাম। স্বামীজী আর মিস্টার লেগেট উঠেছিলেন আলাদা একটা হোটেলে। তা সত্ত্বেও আমরা প্রতিদিনই তাঁদের কাছে যেতাম। মিস্টার লেগেটের একজন পিয়ন ছিল। সে সবসময়ই স্বামীজীকে বলত: 'আমার রাজা!!' স্বামীজী বলতেন: 'আমি তো রাজা নই, আমি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী।' পিয়নটি বলত: 'আপনি তা বলতে পারেন, কিন্তু আমি রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে চলে অভ্যস্ত। কাউকে দেখেই আমি বুঝতে পারি কে কি।' তাঁর এই রাজোচিত ব্যক্তিত্বে সকলেই আকৃষ্ট হত। তবুও একবার কেউ যখন তাঁকে বলেছিল, 'স্বামীজী, আপনি এত আভিজাত্যপূর্ণ যে কি বলব!' স্বামীজী তখন উত্তর দিয়েছিলেন: 'আমি নই, আমার হাঁটার ধরন।'

স্বামীজীর পাণ্ডিত্য ছিল অ-প্রাকৃত পর্যায়ের। একবার আমার বোনের মেয়ে অ্যালবার্টা স্টারজেস (পরবর্তীকালে লেডি স্যান্ডুইচ) স্বামীজীর সঙ্গে রোমে যায়। অ্যালবার্টা স্বামীজীকে রোমের দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। বড় বড় স্মৃতিস্তম্ভগুলো কোথায় অবস্থিত সে-সম্বন্ধে স্বামীজীর জ্ঞান দেখে সে তখন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

সে-বছর শরৎকালে স্বামীজী সুইজারল্যাণ্ড হয়ে ভারতে ফিরে গেলেন, সঙ্গে গেলেন মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ার এবং জে. জে. গুডউইন। সেখানে গোটা জাতি তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। 'Lectures from Colombo to Almora' গ্রন্থ থেকে এ-সম্বন্ধে জানা যেতে পারে। মিস্টার গুডউইন ছিলেন স্বামীজীর স্টেনোগ্রাফার। ৫৪ ওয়েস্ট, ৩৩ নং স্ট্রীটেই স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি ধরে রাখার জন্য তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এর আগে তিনি ছিলেন কোর্টের স্টেনোগ্রাফার—প্রতি মিনিটে দুশো শব্দ নিতে পারতেন। তাই তাঁর পারিশ্রমিক খুব বেশী ছিল। তা সত্ত্বেও আমরা তাঁকেই নিয়েছিলাম—কারণ বিবেকানন্দের একটি কথাও আমরা হারাতে চাইনি। এক সপ্তাহ পরেই গুডউইন জানালেন যে, তিনি আর টাকা নেবেন না। তিনি বললেন: 'বিবেকানন্দ যদি তাঁর জীবন দিয়ে দিতে পারেন, আমি অন্তত আমার সেবাটুকু দিতে পারি।' স্বামীজীর অনুবর্তী হিসেবে সারা পৃথিবী ঘুরেছেন তিনি, যার ফলে সাত খণ্ড বইয়ের [বর্তমান স্বামীজীর ইংরেজি রচনাবলী—আটখণ্ডে সম্পূর্ণ] মধ্যে আমরা পেয়েছি স্বামীজীর মুখনিঃসৃত বাণী। গুডউইনই সেসব লিখে নিয়েছিলেন।

স্বামীজী ভারতে ফিরে যাবার পর আমি তাঁকে চিঠি লিখিনি। অপেক্ষা করছিলাম, তিনিই লিখবেন। অবশেষে তাঁর চিঠি পেলাম, লিখেছেন : 'তুমি চিঠি লেখ না কেন?' তখন আমি উত্তর লিখলাম : 'আমি কি ভারতে আসব?' উত্তরে তিনি লিখলেন : 'হ্যাঁ, আসতে পার—যদি তুমি নোংরা-আবর্জনা, অধঃপতন আর দারিদ্রের ছবি দেখতে প্রস্তুত থাক; যদি প্রস্তুত থাক এমন মানুষ দেখতে, যাদের পরিধেয় বলতে কোমরে একফালি নেকড়া, অথচ তারা ধর্মকথা বলছে। এছাড়া আর কিছু যদি চাও, এসো না। আর সামান্যতম সমালোচনাও আমরা সহ্য করতে পারব না।' পরের জাহাজেই আমি রওনা হলাম।

১২ ফেব্রুয়ারি বম্বে পৌঁছলাম। এখানে মিস্টার আলাসিঙ্গা আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। আলাসিঙ্গা কপালে লম্বা লাল তিলক দিতেন—বৈষ্ণবদের যেমন রীতি। পরে স্বামীজীর সঙ্গে কাশ্মীর যাওয়ার সময় আমি একবার বলে ফেলেছিলাম : 'ভারী অদ্ভুত ব্যাপার যে, আলাসিঙ্গা কপালে বৈষ্ণবদের মতো ঐরকম তিলক কাটেন।' স্বামীজী তৎক্ষণাৎ আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে বললেন : 'চুপ কর! তোমরা এতদিন কি করেছ?' আমি কি অপরাধ করেছি আমি তখন বুঝতে পারিনি। আমি অবশ্য কোন উত্তর দিইনি, কিন্তু চোখে জল এসে গিয়েছিল। পরে জেনেছিলাম, আলাসিঙ্গা পেরুমল একজন ব্রাহ্মণ যুবক। মাদ্রাজের একটি কলেজে দর্শনের অধ্যাপক। মাসে আয় ১০০ টাকা। মা, বাবা, স্ত্রী এবং চারটি শিশু সন্তানের ভরণপোষণ করতে হয়। তা সত্ত্বেও সে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্থভিক্ষা করেছিল বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্যে পাঠানোর জন্য। হয়তো আলাসিঙ্গা না থাকলে আমরা (পাশ্চাত্যবাসীরা) বিবেকানন্দকে পেতামই না। এই কারণেই আলাসিঙ্গার প্রতি সামান্যতম কটাক্ষেও স্বামীজী এত রেগে গিয়েছিলেন।

বম্বেতে পৌঁছলে সেখানকার সকলে চেয়েছিলেন, আমরা সেখানেই থাকি। আমরা কিন্তু প্রথম ট্রেনেই কলকাতা চলে এলাম। পরদিন সকাল চারটায় দশ-বারো জন শিষ্যসহ স্বামীজী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। দু-একদিনের মধ্যেই বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে স্বামীজীর কাছে গেলাম। বিকেলে স্বামীজী বললেন : 'আমরা নতুন যে মঠবাড়ি কিনছি, সেখানে তোমাদের নিয়ে যাব।' আমি বললাম : 'কিন্তু স্বামীজী, এটাই কি যথেষ্ট বড় জায়গা নয়?' বাগানবাড়িটা ছিল খুবই সুন্দর—ছোটখাট; বিঘে তিনেক জায়গা; একটা ছোট পুকুর আর অজস্র ফুল। কিন্তু তিনি সবকিছুই অন্যদের থেকে আলাদাভাবে চিন্তা করতেন। কাজেই, ছোট ছোট নালা অতিক্রম করে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন বর্তমান মঠবাড়িতে। নদীতীরের বাড়িটাকে খালি দেখে আমি আর মিসেস ওলি বুল বললাম : 'স্বামীজী, আমরা এই বাড়িটা ব্যবহার করতে পারি না?' তিনি বললেন : 'এটা এখনও থাকার মতো হয়নি।' আমরা বললাম : 'আমরা বাড়িটাকে ঠিক-ঠাক করে নেব।' তখন তিনি অনুমতি দিলেন। কাজেই আমরা তখন বাড়িটাকে নতুন করে চুনকাম করতে লেগে গেলাম। আর বাজার থেকে মেহগনি কাঠের পুরনো আসবাবপত্র কিনে একটা ড্রইংরুম বানিয়ে ফেললাম যার অর্ধেকটা ভারতীয় আর অর্ধেকটা পাশ্চাত্য। খাওয়ার ঘরটা থাকল বাইরের দিকে।

আর থাকল শোবার ঘর, আর ভগিনী নিবেদিতার জন্য আলাদা একটা ঘর। কাশ্মীর যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিবেদিতা আমাদের এখানে অতিথি হয়ে ছিলেন। পুরো দু-মাস আমরা সেখানে ছিলাম। স্বামীজীর সান্নিধ্যে আমরা যে দিনগুলি কাটিয়েছি, তার মধ্যে এই সময়টাই বোধহয় সবচেয়ে সুন্দর ছিল। প্রতিদিন সকালে তিনি চা খেতে আসতেন—বড় আমগাছের তলায় বসে চা খেতেন। সেই গাছটা এখনও আছে, আমরা সেটাকে কাটতে দিইনি। তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন যে, আমরা গঙ্গাতীরে একটা বাড়িতে বাস করছি—যাঁরা তাঁর কাছে আসতেন, তাঁদের সকলকেই তিনি এই বাড়িতে নিয়ে আসতেন। দেখাতেন যে, যেটাকে তিনি বাসের অযোগ্য মনে করেছিলেন, সেটাকে আমরা কী চমৎকার একটা বাড়ি করে তুলেছি। বিকেলবেলা ঘরের সামনে চায়ের মজলিস বসত। নদীটা ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যেত। মালবোঝাই নৌকাগুলো স্রোতের বিপরীত দিকে যাচ্ছে—এই সুন্দর দৃশ্য। একদিন রাতে খুব বৃষ্টি হল,—মনে হচ্ছিল যেন সব জলাকার। তিনি আমাদের খাওয়ার ঘরের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে বলে চললেন কৃষ্ণর কথা, তাঁর প্রেমের কথা এবং জগতে সে-প্রেমের কি প্রভাব, সেকথা। তাঁর একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল—যখন তিনি ভক্ত, প্রেমিক, তখন তিনি কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগকে এমনভাবে সরিয়ে রাখতেন যে সেগুলোর যেন কোন দামই নেই। আবার যখন তিনি কর্মযোগী, তখন কর্মকেই তিনি প্রধান বিষয় করে তুলতেন। জ্ঞানযোগ সম্বন্ধেও ঠিক তা-ই। কখনও কখনও কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি একটা বিশেষ ভাবে ডুবে থাকতেন। ঠিক এর আগেই যে ভাবে ছিলেন, সে-সম্বন্ধে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই!

১২ মে ১৮৯৮ আমরা কাশ্মীরের পথে রওনা হলাম। আমরা নৈনিতাল থামলাম। সেখানে শত শত ভারতীয় তাঁর সঙ্গে দেখা করত। তারা তাঁকে একটা সুন্দর পাহাড়ী ঘোড়ায় বসিয়ে তাঁর সামনে ফুল-ফল ছড়িয়ে দিত—ঠিক যেমন যীশুখ্রীষ্ট জেরুজালেমে প্রবেশ করার আগে লোকেরা করেছিল। আমার তক্ষুনি মনে হয়েছিল—এটা তাহলে একটা প্রাচ্য প্রথা।

সেখান থেকে আমরা আলমোড়া গেলাম। আলমোড়ায় স্বামীজী মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ারের অতিথি হয়েছিলেন। আমরা নিজেদের জন্য একটা বাংলো ভাড়া করে সেখানে একমাস থাকলাম। স্বামীজী সবসময়ই আলমোড়াকে তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যদের 'হিমালয় আবাস' বলে মনে করতেন, আর আশা করতেন যে, সেখানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু মিস্টার সেভিয়ার, যিনি এই মঠ-স্থাপনার ব্যাপারটা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে নিয়েছিলেন, আমাদের প্রতিদিনের চায়ের মজলিসের ভিড়ে উত্ত্যক্ত হয়ে ঠিক করলেন যে, আরও চল্লিশ মাইল ভেতরে গিয়ে মঠ করতে হবে। কাজেই, আশ্রম যখন হল, সেটা হল মায়াবতীতে—রেলস্টেশন থেকে ৮০ মাইল দূরে, সেখানে যাওয়ার ভাল রাস্তাও ছিল না।

আমাদের সেখানে থাকাকালীনই খবর এল মিস্টার গুডউইন উটকামন্ডে মারা গেছেন। খবরটা পাবার পর স্বামীজী অনেকক্ষণ তুষারাবৃত হিমালয়ের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেনঃ লোকের কাছে আমার শেষ কথাটি বলা হয়ে

গেল। এরপরে খুব কমই তিনি সাধারণের মধ্যে বক্তৃতা দিয়েছেন।

২০ জুন আমরা আলমোড়া থেকে কাশ্মীর রওনা হই। রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত ট্রেনে গেলাম। সেখানে আমরা টাঙা পেলাম। টাঙাগুলোকে টেনে নিয়ে যায় পাশাপাশি তিনটে ঘোড়া। ঐগুলো আমাদের দুশো মাইল টেনে নিয়ে যাবে ওপরে কাশ্মীর পর্যন্ত। প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর ঘোড়া বদলানো হল; আমরা ঐ চমৎকার রাস্তা দিয়ে সবেগে ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। তারপর পৌঁছলাম বারামূলাতে। আমরা চারটে হাউসবোট ভাড়া করলাম—একটা মিসেস বুল আর আমার জন্য; একটা মিসেস প্যাটারসন ও ভগিনী নিবেদিতার জন্য, আর একটা স্বামীজী ও আর একজন সন্ন্যাসীর জন্য। এছাড়া খাওয়ার জন্য একটা আলাদা নৌকো ছিল—সেখানে আমরা সবাই খাবার সময় জড়ো হতাম। আমরা কাশ্মীরে চার মাস ছিলাম। প্রথম তিন মাস কাটালাম ঐ সাদাসিদে ছোট নৌকোর মধ্যে। সেপ্টেম্বরের পর এত ঠাণ্ডা পড়ল যে, আমরা আগুনের ব্যবস্থা আছে এরকম একটা সাদাসিদে হাউসবোট ভাড়া করলাম। সেখানে আমরা সত্যিকারের বাড়ির আরাম পেলাম। ওখানে স্বামীজীর সঙ্গে যেসব কথোপকথন হয়েছিল, ভগিনী নিবেদিতা তার অনেকটাই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। স্বামীজী ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে পড়তেন। তারপর টানা দু-ঘণ্টা পায়চারি করতাম আমরা, যতক্ষণ না সূর্যের আলো গরম হয়। স্বামীজী আলোচনা করতেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে—ভারতীয় জীবনের আদর্শ কি, ইসলাম কি করেছে এবং কি করেনি, এসব নিয়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারতীয় স্থাপত্য, ভারতীয়দের রীতি-নিয়মপ্রথা—কথা বলতে বলতে তিনি এসবের গভীরে ডুবে যেতেন।

স্বামীজী এরপর সারদানন্দ মহারাজকে আমাদের কাছে আসতে বললেন। স্বামীজী সোজা কলকাতা চলে যাবেন, আর সারদানন্দ মহারাজ আমাদের নিয়ে ঘুরবেন; লাহোর, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানগুলো দেখাবেন। তা-ই হল। আমরা পৌঁছনোর আগেই তিনি বেলুড়ে আমাদের ঐ ছোট্ট ঘরটাতে মঠ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। আমরা ফিরে আর সেখানে থাকতে পারলাম না, বালী থেকে দু-মাইল দূরে একটা বাড়ি ভাড়া করে ফেললাম। পাশ্চাত্যে ফিরে যাবার আগে পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।

মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য মিসেস ওলি বুল কয়েক হাজার ডলার দিয়েছিলেন। আমার তো খুব অল্পই ছিল; কয়েক বছর লাগল আটশ ডলার যোগাড় করে উঠতে। একদিন স্বামীজীকে বললাম: 'আমার সামান্য কিছু টাকা আছে, আপনি যদি ব্যবহার করেন।' তিনি বললেন: 'বল কি? আছে নাকি?' আমি: 'হ্যাঁ।' 'কত টাকা?'— তিনি জানতে চাইলেন। আমি বললাম: 'আটশ ডলার।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বললেন: 'যাও, তোমার ছাপাখানা করে ফেল।' তিনি ছাপার মেশিন কিনে ফেললেন; তাতে রামকৃষ্ণ মিশনের সাময়িক পত্র 'উদ্বোধন' বের হতে লাগল। ১৮৯৯-র জুলাইয়ে স্বামীজী আবার ইংলণ্ডে এলেন, সঙ্গে নিবেদিতা। সেখানে সিস্টার ক্রিস্টিন এবং মিসেস ফাঙ্কি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সেখান থেকে তিনি আমেরিকা এলেন। আর রিজলি ম্যানরে আমাদের কাছে এলেন ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। সেখানে তিনি এবং তাঁর

দুই গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের জন্য আমরা একটা কটেজ ছেড়ে দিলাম। নিবেদিতা আর মিসেস ওলি বুলও সেখানে ছিলেন। আমরা যারা স্বামীজীকে ভালবাসতাম ও শ্রদ্ধা করতাম, তাদের নিয়ে রীতিমতো একটা গোষ্ঠী গড়ে উঠল। আমার বোন মিসেস লেগেটকে তিনি মা বলে ডাকতেন, খাবার টেবিলে সবসময় তাঁর পাশে বসতেন। স্বামীজী চকলেট আইসক্রিমটা বিশেষ করে ভালবাসতেন। বলতেন ঃ 'আমার গায়ের রং চকলেট কিনা, তাই চকলেট আইসক্রীম ভালবাসি।' একদিন আমরা স্ট্রবেরী খাচ্ছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করল ঃ 'স্বামীজী, আপনি স্ট্রবেরী ভালবাসেন?' তিনি বললেন ঃ 'আমি কখনও স্ট্রবেরী খাইনি।' 'খাননি? কেন, রোজই তো খাচ্ছেন।' তিনি বললেন ঃ 'ওর ওপরে তো ক্রীম মাখানো থাকে! ক্রীম লাগালে পাথরও ভাল লাগবে।'

সন্ধ্যেবেলা রিজলি ম্যানরের হল-এ বড় আগুনের জায়গাটির চারধারে আমরা সবাই মিলে বসতাম আর তিনি কথা বলে চলতেন। একদিন কোন একটা বিষয়ে স্বামীজী যখন আলোচনা করছেন, একজন মহিলা আমাদের মধ্যে থেকে বললেন ঃ 'স্বামীজী, এই জায়গায় আমি আপনার সঙ্গে একমত নই।' 'নও? তাহলে এটা তোমার জন্য নয়'—তিনি উত্তর দিলেন। আর একজন বললেন ঃ 'কিন্তু স্বামীজী, আমার তো এই জায়গাটাতেই আপনার কথা ঠিক বলে মনে হচ্ছে।' 'ও, তাহলে মনে হচ্ছে ওটা তোমার জন্যই।' এভাবেই তিনি অপরের মতের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিনের কথা। বিকেলের আলোচনাসভায় আমরা সেদিন দশ-বারো জন আছি। স্বামীজী সেদিন অদ্ভুত এক ভাবে বিভোর হয়ে কথা বলে যাচ্ছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কোমল আর মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে ভেসে আসছে। সন্ধ্যা হয়ে এলে আমরা যে-যার ঘরে চলে গেলাম। এমন একটা পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যে আমরা পরস্পরকে 'গুড নাইট' বলতেও ভুলে গিয়েছিলাম। এরপরে আমার বোন মিসেস লেগেট একটি ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন, নিমন্ত্রিত শ্রোতাদের মধ্যে একজন কাঁদছেন। তিনি একজন মহিলা—অজ্ঞেয়বাদী আমার বোন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কি হয়েছে?' সেই মহিলা উত্তর দিলেন ঃ 'ঐ মানুষটি আমাকে অনন্ত জীবন দিয়েছেন। আমি আর তাঁর কথা শুনতে চাই না।'

স্বামীজী যখন রিজলি ম্যানরে, তখন আমি একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটি লিখেছেন একজন অপরিচিত মহিলা। তিনি লিখেছেন ঃ আমাদের একমাত্র ভাই লস এঞ্জেলসে গুরুতর অসুস্থ। তাঁর ধারণা আমাদের ভাই আর বাঁচবে না, আর আমাদের খবরটা জানা উচিত। দু-ঘণ্টার মধ্যে আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। রওনা হবার সময় স্বামীজী একটা সংস্কৃত আশীর্বচন উচ্চারণ করলেন। বললেন ঃ 'ওখানে একটা ক্লাসের ব্যবস্থা কর, আমি আসব।'

আমি সোজা লস এঞ্জেলসে গেলাম, আমার অসুস্থ ভাইয়ের কাছে। সেখানে গিয়ে দেখলাম, ভাইয়ের বিছানার ওপরে স্বামীজীর একটা পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। দশ বছর ভাইকে দেখিনি। দেখলাম যে, সত্যিই সে গুরুতর অসুস্থ। প্রায় ঘণ্টাখানেক ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে গৃহকর্ত্রী মিসেস ব্লজেটের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বললাম ঃ 'আমার

ভাই তো খুবই অসুস্থ।' তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ।' আমি বললামঃ 'মনে হয়, ভাই আর বাঁচবে না।' তিনি বললেনঃ 'আমারও তা-ই ধারণা।' জিজ্ঞেস করলামঃ 'শেষ কটা দিন সে এখানেই থাকতে পারে কি?' তিনি বললেনঃ 'স্বচ্ছন্দে।' এর পরে আমি জিজ্ঞেস করলামঃ 'আমার ভাইয়ের বিছানার ওপরে যাঁর প্রতিকৃতি আছে তিনি কে?' সপ্ততিবর্ষোচিত গাম্ভীর্যে পূর্ণ হয়ে তিনি বললেনঃ 'পৃথিবীতে যদি কোন ভগবান থাকেন, তবে ইনিই।' 'তাঁর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?'—আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ '১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। যখন সেই যুবক দাঁড়িয়ে বললেন "আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ", তখন সাত হাজার লোক অজ্ঞাত কোন কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে দেখলাম, দলে দলে মেয়েরা বেঞ্চ ডিঙিয়ে তাঁর কাছে যাবার চেষ্টা করছে। আমি তখন মনে মনে বলছি, "বাছা, তুমি যদি এই আক্রমণ সহ্য করতে পার, তবে আমি বুঝব তুমি সত্যিই ভগবান।"' আমি তখন মিসেস ব্লজেটকে বললামঃ 'আমি তাঁকে চিনি। নিউইয়র্কের ক্যাটসকিল পর্বতের ছোট্ট গ্রাম স্টোনরিজ, দুশো লোকের বাস সেখানে। আমি সেখান থেকেই আসছি, আর তিনি এখন সেখানে। আপনি তাঁকে এখানে আসতে অনুরোধ করুন না?' তিনি অবাক হয়ে বললেনঃ 'আমি তাঁকে আসতে বলব?' 'তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।'—আমি তাঁকে বললাম। তিন সপ্তাহের মধ্যে আমার ভাই মারা গেল; আর ছ-সপ্তাহের মধ্যে স্বামীজী সেখানে এলেন। সেখানে এসে তিনি তাঁর ক্লাস আরম্ভ করলেন প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থিত ক্যালিফোর্নিয়ায়।

বেশ কয়েকমাস আমরা মিসেস ব্লজেটের অতিথি ছিলাম। ছোট্ট বাড়িটায় তিনটে শোবার ঘর, একটা রান্নাঘর, একটা খাবার ঘর আর একটা বসবার ঘর। স্নানের ঘরটা ছিল রান্নাঘরের ঠিক সঙ্গেই। প্রতিদিন সকালে আমরা শুনতাম স্বামীজী স্নান করছেন আর সংস্কৃতে কিছু আবৃত্তি করছেন। এরপরেই তিনি এলোমেলো চুলে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন, তারপর প্রাতরাশের জন্য তৈরী হতেন। মিসেস ব্লজেট আমাদের জন্য খুব সুস্বাদু প্যানকেক তৈরী করতেন। রান্নাঘরের টেবিলে বসেই আমরা সেগুলো খেতাম। স্বামীজী খেতে খেতে মিসেস ব্লজেটের সঙ্গে কত বিষয়ে আলোচনা করতেন। বুদ্ধিদীপ্ত ও যথোচিত প্রত্যুত্তর দিতে স্বামীজীর জুড়ি ছিল না।

মিসেস ব্লজেট স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে খুব কমই যেতেন। তিনি বলতেনঃ তাঁর কর্তব্য হল আমরা ফিরে এলে আমাদের সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা। স্বামীজী এখানে হোম অব ট্রুথ এবং অন্যান্য নানা হল-এ অনেকগুলি বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু আমার শোনা বক্তৃতাগুলির মধ্যে সর্বোত্তম বোধহয় 'নাজারেথের যীশু' সম্পর্কিত বক্তৃতাটি। বক্তৃতার সময় তিনি যীশুখ্রীষ্টের মহিমা ও শক্তির মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। আর তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বশরীর যেন একটা শুভ্রজ্যোতি বিকিরণ করছিল। সেই সুস্পষ্ট জ্যোতি আমাকে এতটা অভিভূত করেছিল যে, যখন একসঙ্গে ফিরছিলাম তখন আমি তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলতে সাহস করিনি। কারণ, আমি ভেবেছিলাম, এখনও তিনি সেই উচ্চ ভাবে ভরপুর আছেন, পাছে আমি কথা বলে তাতে ব্যাঘাত করে বসি। হঠাৎ তিনি আমাকে বললেনঃ 'আমি বুঝতে পেরেছি,

কিভাবে ওটা করতে হয়।' আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'কোন্‌টা স্বামীজী?' 'কি করে মালি গ্যাটনী স্যপ হয়...।' এই আত্মসচেতনতা ও আত্মগৌরববোধের একান্ত অভাব সম্ভবত তাঁর চরিত্রের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য। তিনি যেন মানুষের শক্তি সামর্থ্য ও মহিমা সুস্পষ্ট দেখতে পেতেন। যে-কেউ তাঁর কাছে আসত, সে-ই অনুভব করত সাহস ও শক্তির অনুপ্রবেশ, আর ফিরে যেত সতেজ, সঞ্জীবিত হয়ে—নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। এই কারণে যখনই আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেছে 'আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন কি?', আমি সব সময়ই বলেছি, 'পূতচরিত্র ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে মানুষ যে-সাহস পায়, সেই সাহসই তাঁর আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন।' স্বামীজী বলতেন: 'ত্রাণকর্তাদের কর্তব্য হল তাঁর শিষ্যদের পাপতাপ বিপদ-বিপর্যয় নিজের উপর টেনে নিয়ে শিষ্যদের মুক্ত আনন্দে পথ চলতে দেওয়া।' রিজলি ম্যানরে একবার আমার বোনের মেয়েকে আর একটা কথা বলেছিলেন: 'অ্যালবার্টা, জীবনের কোন ঘটনাই কখনও কল্পনার সমান হবে না।'

একদিন মিসেস ব্লজেট স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করাবার জন্য তিনজন মহিলাকে নিয়ে এলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সরে এলাম, স্বামীজী যাতে তাঁদের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে পারেন সেইজন্য। আধঘণ্টা পরে তিনি আমার কাছে এসে বললেন: 'এই মহিলারা তিন বোন। এঁরা চান আমি প্যাসাডেনায় এঁদের কাছে একবার যাই।' আমি বললাম: 'যান তাহলে।' তিনি বললেন: 'যাব?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ, যান।' ঐ মহিলারা হলেন মিসেস হ্যান্সবরো, মিস মীড এবং মিসেস ওয়াইকফ্‌। মিসেস ওয়াইকফ্‌দের বাড়ি বর্তমানে হলিউডের বিবেকানন্দ ভবন।

ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যালাম্যাডা থেকেই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি আমাকে সেই চিঠিটি লিখেছিলেন, যেটি আমার বিচারে তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ চিঠি। 'দেববাণী'র শেষ চিঠি এটি।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দেই এর পরের দিকে আমার বোন এবং মিস্টার লেগেট প্যারিসে একটা বাড়ি নিলেন বক্তৃতার জন্য। আমরা জুন মাসে সেখানে গেলাম, স্বামীজী আগস্ট মাসে।

প্যারিসেই মধ্যাহ্নভোজনের সময় গায়িকা মাদাম এমা কালভে বললেন যে, শীতকালে তিনি মিশর যাচ্ছেন। আমি বললাম আমিও তাঁর [কালভের] সঙ্গে যেতে পারি। তৎক্ষণাৎ তিনি স্বামীজীকে লক্ষ্য করে বললেন: 'আপনি আমার অতিথি হয়ে আমাদের সঙ্গে মিশর আসবেন কি?' তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। আমরা রওনা হলাম। ভিয়েনায় দুদিন, কনস্টানটিনোপল-এ ন-দিন আর এথেন্সে চারদিন থেকে মিশরে। কয়েকদিন পর স্বামীজী বললেন: 'আমি এবার যেতে চাই।' জিজ্ঞেস করলাম: 'কোথায় যেতে চান?' 'ভারতে ফিরে যেতে চাই।' আমি বললাম: 'হ্যাঁ, যান।' 'যাব?'—তিনি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম: 'নিশ্চয়ই।' মাদাম কালভেকে গিয়ে বললাম: 'স্বামীজী ভারতে ফিরে যেতে চাইছেন।' তিনিও বললেন: 'নিশ্চয়ই।' তাঁর জন্য একটা ফার্স্ট ক্লাস টিকেট কিনে তাঁকে তিনি ভারতে পাঠিয়ে দিলেন। ভারতে পৌঁছেই তিনি মিস্টার সেভিয়ারের মৃত্যুসংবাদ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে চিঠি লিখে জানালেন,

মিসেস সেভিয়ার এই মৃত্যুকে কতটা প্রশান্তভাবে, কতটা সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি মায়াবতীতেই থাকছেন—যেন তাঁর স্বামী সেখানেই আছেন।

নীলনদ ধরে এগিয়ে চলবার সময় আমি কয়েকজন ইংরেজের সংস্পর্শে এসেছিলাম। চমৎকার লোক তাঁরা। তাঁরা আমাকে জাপান যেতে বিশেষ করে বলায় আমি পথিমধ্যে ভারত হয়ে যাবার একটা সুযোগ পেলাম। আবার আমার স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, আমি যদি তাঁকে যাবার জন্য লিখি তবে তিনিও জাপান যাবেন। জাপানে ওকাকুরা কাকুজুর সঙ্গে পরিচয় হল। টোকিওতে চারুকলা বিষয়ে যে বিজিৎ সুইন চিত্রবিদ্যালয় আছে, তার ইনি প্রতিষ্ঠাতা। তিনি খুব চেয়েছিলেন যে স্বামীজী জাপানে আসুন, তাঁর অতিথি হয়ে থাকুন। কিন্তু স্বামীজী আসতে না চাওয়ায় [শারীরিক অসুস্থতার কারণে] মিস্টার ওকাকুরাই আমার সঙ্গে ভারতে গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কিছুদিন পরে বেলুড়ে ওকাকুরা আমাকে কতকটা রুক্ষভাবেই বললেনঃ 'বিবেকানন্দ আমাদের। তিনি প্রাচ্যের, তোমাদের নন।' এটি আমার জীবনের একটি আনন্দদায়ক মুহূর্ত। দু-একদিন পরে স্বামীজী আমাকে বললেনঃ 'আমার মনে হচ্ছে বহুদিনের হারানো ভাই যেন ফিরে এসেছে।' তখন আমি বুঝলাম এই দুজন ব্যক্তির মধ্যে সত্যিকারের মনের মিল হয়েছে। তারপর স্বামীজী যখন তাঁকে বললেন, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে?' তখন মিস্টার ওকাকুরা বললেনঃ 'না, এই জগতের সঙ্গে বোঝাপড়া এখনও আমার শেষ হয়ে যায়নি।' এবং এটা সত্যিই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত।

আমি সেবারে গোটা বছরটাই মাঝে মাঝে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছি। এপ্রিল মাসে একদিন তিনি আমাকে বললেনঃ 'জগতে আমার কিছু নেই। এক পয়সাও নিজের বলতে নেই। আমাকে যে-যা দিয়েছে সব বিলিয়ে দিয়েছি।' আমি বললামঃ 'স্বামীজী, আপনি যতদিন বাঁচবেন প্রতিমাসে ৫০ ডলার করে দেব।' তিনি এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেনঃ 'তাতে আমার চলে যাবে তো?' আমি বললামঃ 'হ্যাঁ চলে যাবে। তবে আপনি বোধহয় তাতে আইসক্রীম খেতে পারবেন না।' আমি তাঁকে দুশো ডলার দিলাম। কিন্তু চারমাস হতে-না-হতেই তিনি চলে গেলেন।

বেলুড় মঠে একদিন ভগিনী নিবেদিতা কয়েকজন ব্যায়ামবীরকে পুরস্কার দিচ্ছিলেন আর আমি স্বামীজীর ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। তিনি তখন আমায় বলেছিলেনঃ 'আমি চল্লিশ বছর অবধি বাঁচব না।' আমি জানতাম তাঁর বয়স উনচল্লিশ। বললামঃ 'কিন্তু স্বামীজী, বুদ্ধ তো তাঁর বড় বড় কাজগুলো চল্লিশ আর আশির মধ্যেই করেছেন।' তিনি বললেনঃ 'আমি আমার বাণী দিয়ে দিয়েছি। আমাকে যেতে হবেই।' জিজ্ঞেস করলামঃ 'কেন স্বামীজী?' তিনি বললেনঃ 'বড় গাছের ছায়ায় থাকলে অপেক্ষাকৃত ছোট গাছগুলো বড় হয়ে উঠতে পারে না। অন্যকে জায়গা করে দেবার জন্যই আমাকে যেতে হবে।'

এর পরে আমি আবার হিমালয়ে চলে গিয়েছিলাম। স্বামীজীকে আমি আর দেখিনি। রাজার জুবিলি উপলক্ষে ইউরোপ ফিরে গিয়েছিলাম। আগেই বলেছি, আমি তাঁর শিষ্য ছিলাম না—বন্ধু মাত্র। কিন্তু আমার পরিষ্কার মনে আছে, ১৯০২-এর এপ্রিলে, আমি যখন ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছি—আর কখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না—বিদায় নিতে

গিয়ে তাঁকে আমার শেষ চিঠিতে এই কথাটা লিখেছিলামঃ 'ডুবি বা বাঁচি—আপনার সঙ্গেই থাকব।' কথাটা আমি তিনবার পড়লাম, আর নিজেকেই বললামঃ 'আমি কি এটা মন থেকেই বলছি?' মন থেকেই বলেছিলাম। চিঠিটা তাঁর উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিলাম। তিনি পেয়েওছিলেন—যদিও আমি আর উত্তর পাইনি। ১৯০২-এর ৪ জুলাই তিনি দেহ রাখলেন।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে শেষ দেখেছিলেন ২ জুলাই। তিনি তাঁর স্কুলের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলেন যে, কোন একটা বিশেষ বিজ্ঞান সেখানে পড়ানো উচিত হবে কিনা। স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেনঃ 'হয়তো তুমি যা ভেবেছ, তা-ই ঠিক। কিন্তু আমার মন এখন অন্য বিষয়ে দিয়ে দিয়েছি। আমি এখন মৃত্যুর জন্য তৈরী হচ্ছি।' নিবেদিতা ভেবেছিলেন, তিনি হয়তো অন্য কিছু ভাবছেন। তারপরে স্বামীজী বললেনঃ 'তোমাকে খেয়ে যেতে হবে।' ভগিনী নিবেদিতা সবসময় হিন্দু-রীতিতে আঙুল দিয়ে খেতেন। তাঁর খাওয়া হয়ে গেলে, স্বামীজী তাঁর হাতে জল ঢেলে দিলেন। সত্যিকারের শিষ্য ছিলেন বলেই ভগিনী নিবেদিতা বলে উঠলেনঃ 'আপনি এরকম করছেন, এ আমার ভাল লাগছে না।' তিনি উত্তর দিলেনঃ 'যীশুখ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।' ভগিনী নিবেদিতার মুখে এসে গিয়েছিলঃ 'কিন্তু সে তো তাঁদের শেষ সাক্ষাতের সময়!'

তাঁরও স্বামীজীর সঙ্গে সে-ই শেষ দেখা। শেষের সেই দিনে নিবেদিতার কাছে তিনি আমার কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন আরও অনেকের কথা। কিন্তু আমার কথা বলবার সময় বলেছিলেনঃ 'ও পবিত্রতার মতোই পবিত্র, ভালবাসার মতো ভালবাসাময়।' আমি কথাগুলোকে আমার প্রতি স্বামীজীর শেষ বাণী হিসেবে নিয়েছি। দুদিনের মধ্যেই তিনি দেহ রাখলেন। তার আগে বলে গেলেনঃ 'বেলুড় মঠে যে আধ্যাত্মিক শক্তি ঘনীভূত হয়েছে, তা পনেরোশ বছর স্থায়ী হবে। আর এই মঠ এক বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠবে। মনে করো না, আমি এ কল্পনা করছি, আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি।'

৪ জুলাই আমার কাছে তারবার্তা পাঠানো হয়েছিলঃ 'স্বামীজী নির্বাণলাভ করেছেন।' বেশ কয়েকদিন আমি মুহ্যমান হয়ে রইলাম। সে তারের আর উত্তর দিইনি। তারপরে এক অদ্ভুত শূন্যতা অনুভব করতে থাকলাম।—যে-শূন্যতা আমাকে বছরের পর বছর কাঁদিয়েছে। অবশেষে মেটারলিঙ্কের এই কথাগুলো পড়লামঃ 'যদি তুমি কারও দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাক, তবে চোখের জলে নয়, জীবন দিয়ে তা প্রমাণ কর।' এরপরে আমি আর কাঁদিনি, আমেরিকায় ফিরে গিয়েছিলাম। খুঁজে বের করতে চেষ্টা করলাম সে-জায়গাগুলো যেখানে যেখানে তিনি থেকে গেছেন। থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে গিয়ে মিস ডাচারের অতিথি হলাম। কুটিরটি তাঁরই। স্বামীজী যে-ঘরটায় থাকতেন, তিনি আমায় সেই ঘরটাই দিয়েছিলেন থাকতে।

ভারতে ফিরতে ফিরতে চোদ্দটা বছর কেটে গেল। অধ্যাপক গেডেস এবং মিসেস গেডেসের সঙ্গে ভারতে ফিরে দেখলাম—ভারত তো শূন্য হয়ে যায়নি। গোটা ভারত স্বামীজীর ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ছ-সাতটা মঠ গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে অসংখ্য কেন্দ্র ও সমিতি। তার পর থেকে প্রায়ই ভারতে যাচ্ছি। মঠের সকলে চান, আমি

মঠের অতিথিভবনেই উঠি। কারণ, আমি তাঁদের কাছে বিবেকানন্দকে জীবন্ত করে তুলি—তাঁরা তো কেউ তাঁকে দেখেননি। আমিও ভালবাসি ভারতবর্ষে থাকতে। কারণ, আমার মনে পড়ে, স্বামীজীকে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ 'স্বামীজী, কিভাবে আমি আপনাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারি ?' স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন ঃ 'ভারতবর্ষকে ভালবাস।' তাই বেলুড় মঠের অতিথিভবনের ওপরতলাটা এখন আমারই হয়ে গেছে। প্রতিবছর শীতকালে ওখানে যাই ; সম্ভবত জীবনের শেষ বছর পর্যন্ত যাব।

তাঁকে যেমন দেখেছি*

বহু বছরের ব্যবধানে মাঝে মাঝে এই পৃথিবীতে এমন একজনের আবির্ভাব ঘটে যিনি নিঃসন্দেহে ভিন্ন জগতের মানুষ। যে সুদূর লোক থেকে তিনি আসেন, সেখানকার মহিমা, শক্তি ও দিব্যবিভা তিনি এই দুঃখময় জগতে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তিনি এসে মর্তমানুষের মধ্যেই চলাফেরা করেন, কিন্তু এই পৃথিবী তাঁর জায়গা নয়। এখানে যেন তিনি পথিক, অপরিচিত—যেন একরাত্রির জন্য তাঁর আসা।

তাঁর চারপাশে যাঁরা থাকেন, তাঁদের জীবনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সুখদুঃখের ভাগীদার হন। তাঁদের আনন্দে হাসেন, দুঃখে সমব্যথী হন। কিন্তু এসবের মধ্যেও কখনও তিনি ভোলেন না—কে তিনি, কোথা থেকে এসেছেন, আর কি উদ্দেশ্যেই বা তাঁর আসা। নিজের দৈবসত্তা কখনই তিনি বিস্মৃত হন না। সবসময় তিনি মনে রাখেন যে, তিনি সেই মহামহিমময় আত্মা; এসেছেন সেই অনির্বচনীয় দিব্যলোক থেকে, যে লোকে চন্দ্র-সূর্যের প্রয়োজন নেই, যে-লোক আলোকিত সেই আলোয়—সব আলোর যে-আলো। তিনি জানেন—'সমস্ত দেবশিশু মিলে যখন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছিল' সেই অনাদিকালের আগেও তিনি ছিলেন।

এরকম একজন মানুষকে আমি দেখেছি, তাঁর বাণী শুনেছি, আমার অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি তাঁর পাদপদ্মে ঢেলে দিয়েছি।

এরকম মানুষকে কোন তুলনা দিয়ে বোঝানো যায় না। কারণ, সমস্ত সাধারণ মাপকাঠি ও আদর্শকে তিনি অতিক্রম করে যান। অন্যেরা যদি উজ্জ্বল হয়, তিনি তবে জ্যোতির্ময়—কারণ, তাঁর ছিল সেই অসাধারণ ক্ষমতা যার দ্বারা সকল জ্ঞানের উৎসস্থলের সঙ্গে সরাসরি যোগস্থাপন করা সম্ভব। সাধারণ মানুষ জ্ঞানলাভের যে-সব অপেক্ষাকৃত ধীর পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে, তার দ্বারা তাঁকে আর সীমাবদ্ধ করা যায় না। অন্যেরা হয়তো বিরাট হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা বিরাট তাঁদের সমপর্যায়ের মানুষের সঙ্গে তুলনায়। অন্যেরা হয়তো সৎ, শক্তিমান ও প্রতিভাবান হতে পারেন—তাঁদের সমশ্রেণীর লোকের ঐসব গুণ তাঁদের মধ্যে বেশী আছে বলে। একজন মানুষকে হয়তো সন্ত বলা যেতে পারে, সাধারণ মানুষের তুলনায় তিনি অধিকতর পবিত্র ও একচিত্ত বলে। কিন্তু এগুলো সবই শুধু তুলনার ব্যাপার। স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে তুলনার কোন প্রশ্ন চলে না। তিনি এক স্বতন্ত্র ভূমিতে একাকী বিরাজমান। অন্য এক শ্রেণীর মানুষ তিনি। এই জগতের নন তিনি। ঊর্ধ্বলোক থেকে নির্দিষ্ট জীবনব্রত নিয়ে অবতীর্ণ এক দিব্যসত্তা। আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে, বেশী দিন তিনি এখানে থাকবেন না।

---

* অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত Reminiscences of Swami Vivekananda গ্রন্থ থেকে সিস্টার ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

এটা কি আর কোন বিস্ময়ের যে, এই ধরনের মহাপুরুষের জন্মলগ্নে প্রকৃতি নিজেই আনন্দে মেতে ওঠে, স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় আর দেবদূতরা স্তুতিগীতি করতে থাকে!

যে-দেশে তিনি জন্মেছেন সে-দেশ ধন্য। তাঁর সময়ে এই পৃথিবীতে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও ধন্য। আর সবচেয়ে ধন্য, অত্যন্ত ধন্য সেই কয়েকটি মানুষ যাঁরা তাঁর পদপ্রান্তে বসতে পেরেছিলেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। ফেব্রুয়ারি মাসের এক শীতের সন্ধ্যায় আমি কতকটা অনিচ্ছাভরেই ডেট্রয়েটের ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা শুনব বলে রওনা হয়েছিলাম। তখন আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝিনি যে, আমি এমন কিছু করতে যাচ্ছি যা আমার সমগ্র জীবনের ধারাটাই পালটে দেবে; এমন অর্থ বহন করে আনবে, আমার পরিচিত মাপকাঠি দিয়ে যার মূল্যায়ন করতে পারব না। বক্তৃতা শোনাটা তখন ভয়ঙ্কর একঘেয়েমিরই অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নতুন বা উচ্চভাবদ্যোতক কথা কদাচিৎই শোনা যেত। সেবার শীতে ডেট্রয়েটে যেসব বক্তা এসেছিলেন, তাঁরাও অস্বাভাবিক নীরস বক্তৃতা করছিলেন। এইজন্য 'ভারতের একজন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের' এই বক্তৃতাটি আমি অনিচ্ছাভরেই শুনতে গেছিলাম, এবং তা-ও গেছিলাম আমার বন্ধু মিসেস মেরি সি ফাঙ্কির উপরোধে পড়ে। নিশ্চয়ই বিগত অসংখ্য জন্মেও আমরা কখনও এত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিইনি। কারণ, তখন পাঁচ মিনিটও হয়নি তাঁর বক্তৃতা শুনেছি, আমরা উপলব্ধি করলাম যে, যে-পরশমণির সন্ধান এতকাল করে এসেছি, তার সন্ধান আমরা পেয়েছি। আমরা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলাম: 'যদি এই সুযোগ হারাতাম!'

সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আগত এই প্রচারকের বয়স বড়জোর তিরিশ। কালজয়ী যৌবনে সে যুবক, সুপ্রাচীন প্রজ্ঞায় বৃদ্ধ। এই প্রথম আমরা ভারতের সনাতন বাণী শুনলাম, শুনলাম আত্মা-সম্পর্কীয় শিক্ষা। সুদৃশ্য কাশ্মীরী শালের মতো উজ্জ্বল বর্ণময় করে তিনি তাঁর বক্তব্য-বিষয়কে সাজিয়ে তুলছিলেন আর শ্রোতারা নির্বাক হয়ে শুনছিল। মানুষ স্বরূপত দৈবীস্বভাব। তার ভেতরে রয়েছে পূর্ণতা, যে-পূর্ণতা চিরন্তন। বর্তমানেরও বাস্তব সত্য সেই পূর্ণতা। 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই। এই মুহূর্তেই এ সত্য। একে উপলব্ধি করতে হবে, তা ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। এই উপলব্ধি চোখের পলকেই এসে যেতে পারে, আবার লক্ষ বছর পরেও আসতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকেই 'সেই সূর্যকরোজ্জ্বল শিখরদেশে পৌঁছবে'। এই বাণীকে যথার্থই বলা হয়েছে 'পরমাত্মার অপূর্ব সুসমাচার'। আমরা নিজেদের যেমন অসহায় সীমিত ভাবি, প্রকৃতপক্ষে আমরা তা নই। বস্তুত আমরা জন্মমৃত্যুরহিত; অমৃতের সন্তান। আমরা যেন সোনার খনির উপর দিয়ে হাঁটছি, তবুও নিজেদের ভাবছি গরীব। আমরা সেই সিংহের মতো—ভেড়ার পালে জন্ম হওয়ায় যে নিজেকে ভেড়া ভাবত। অবশেষে একদিন এক সিংহ এল। ভেড়ার পালের মধ্যে সিংহশিশুকে ভেড়ার মতো 'ভ্যা ভ্যা' করতে দেখে সেই সিংহ তাকে ডেকে বলল: 'তুমি ভেড়া নও। তুমি সিংহ। তোমার কোন ভয় নেই।' সিংহ তৎক্ষণাৎ তার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বিরাট এক গর্জন করে উঠল।

ইউনিটেরিয়ান চার্চের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই সব মহাসত্যই স্বামীজী ঘোষণা করে চলেছিলেন। এবং তা করছিলেন এমন কণ্ঠে, যে-রকম কণ্ঠস্বর আগে কেউ শোনেনি।

সেই কণ্ঠস্বরের এমনই মূর্ছনা যে তাতে প্রতিটি ভাব নিখুঁতরূপে প্রকাশ পাচ্ছিল। এক্ষুনি হয়তো তা বিষাদের সুরে অন্তরের গভীরতম তন্ত্রীতে বেদনার অনাস্বাদিতপূর্ব তরঙ্গ তুলে দিয়ে গেল; তারপর, সেই বিষাদের যন্ত্রণা যখন প্রায় দুঃসহ হয়ে উঠছে, তখন সেই একই কণ্ঠস্বর আবার মানুষকে হাসিতে আনন্দে আকুল করে দিল। সেই উচ্ছ্বসিত হাস্যরোল হঠাৎই মাঝপথে থমকে গেল যখন আত্যন্তিক ভাবগাম্ভীর্যে সেই একই কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল বজ্রসদৃশ, ভয়-মিশ্রিত সম্ভ্রমে স্তব্ধ হয়ে সকলে শুনতে লাগল জাগরণের তূর্যনিনাদ। বস্তুত, সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর না শোনা পর্যন্ত বোঝা যায় না, প্রকৃত সঙ্গীত কি।

আমরা যারা সেসময় তাঁর বক্তৃতা শুনেছি, তারা কখনও ভুলতে পারব না, ভারতের এই সুপ্রাচীন বাণীগুলি শ্রবণ করার সময় আমাদের মনে কিরকম আলোড়ন দেখা দিয়েছিল—'অমৃতের পুত্র তোমরা, শোন; ঊর্ধ্বলোকবাসী তোমরাও শোন, আমি সেই সনাতন পুরুষকে দেখেছি; যাঁকে জানলেই কেবল মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়।' অন্তর্নিহিত আত্মার স্মৃতি স্পষ্টতই জাগরিত হয়ে উঠেছিল তখন। কিংবা সিংহশিশু ও ভেড়ার পূর্বোক্ত গল্পটি। কী অপূর্ব সত্য! তোমার মেষের মতো কান্না, তোমার ভীরুতা—সবকিছু সত্ত্বেও তুমি কখনই মেষ নও। সর্বদাই তুমি সিংহ, সিংহই ছিলে সর্বদা—শক্তিমান, নির্ভীক, পশুরাজ। ভ্রান্তির আবরণটি শুধু দূর করতে হবে। তুমিই সেই—তত্ত্বমসি। এই মুহূর্তেই। তাঁর এই বাণীগুলির সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম শক্তি কিংবা প্রভাব নির্গত হয়েছিল যা আমাদের পবিত্রতর ঊর্ধ্বতর এক পরিমণ্ডলে পৌঁছে দিয়েছিল। এই বাণী শোনার পর, এই অনুভূতি অনুভব করার পর আর কি কারও পক্ষে সম্ভব ছিল আগের মতোই থেকে যাওয়া? আমাদের পূর্বপোষিত সমস্ত মূল্যবোধ পালটে গেল। আধ্যাত্মিকতার অমোঘ বীজ বপন হয়ে গেল—সেই বীজের অঙ্কুর বড় হয়ে চলবেই, বছরের পর বছর ধরে, এবং অনিবার্যভাবে তা একদিন ফল প্রসব করবে। এটা ঠিক যে, তাঁর এই মহান বাণী নতুন কিছু নয়, অতি পুরাতন। এ-ও হয়তো সত্যি যে, প্রতিটি হিন্দু নরনারীই এই বাণী জানে, তাদের অনেকেই সুস্পষ্টভাবে এগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে—কিন্তু বিবেকানন্দ একথাগুলি বলেছিলেন স্বতন্ত্র অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে। তাঁর কাছে এ কোন অনুমানের দর্শন ছিল না—ছিল জীবন্ত সত্য। তিনি এটি উপলব্ধি করেছিলেন। এবং নিজের উপলব্ধি হয়ে যাবার পর, তাঁর জীবনের আর একটিমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল—তা হলঃ যে বাণী প্রচারের দায়িত্ব তাঁর উপরে অর্পিত ছিল তা পালন করা, মানুষকে জীবনের প্রকৃত পথ বলে দেওয়া এবং সেই চরম লক্ষ্যের যারা অভিযাত্রী তাদের সকলকে সাহায্য করাঃ 'ওঠো, জাগো। লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।'

উপনিষদ্ থেকে অনর্গল উদ্ধৃতি দিতেন তিনি—প্রথমে মূল সংস্কৃত মন্ত্রটি আবৃত্তি করতেন, পরে তার কাব্যিক ভাবানুবাদ করে দিতেন। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীগুলি যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করত, তাঁর মন্ত্রোচ্চারণের প্রভাব হত তার চেয়েও বেশী। অন্তরের অতলান্ত দেশ পর্যন্ত তাতে আলোড়িত হয়ে যেত। মন্ত্রের ছন্দগুলি যখন শ্রোতাদের কানে এসে পড়ত, শ্রোতারা একমনে রুদ্ধশ্বাস হয়ে শুনত।

আমাদের ভারতপ্রেমের জন্ম হয়েছিল মনে হয় সেই মুহূর্তটিতে যখন আমরা তাঁর সেই অদ্ভুত কণ্ঠে 'ভারতবর্ষ' কথাটি উচ্চারিত হতে শুনেছিলাম। পাঁচ অক্ষরের একটা ছোট শব্দে যে এত কিছু প্রকাশ করা যায়, তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। তাতে ছিল ভালবাসা, গভীর আবেগ, গৌরববোধ, তীব্র ইচ্ছা, পূজা, বিষাদ, শৌর্য, ঘরে ফেরার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এবং ভালবাসা আর ভালবাসা। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখেও কারও মনে এরকম ভাব সঞ্চারিত করা সম্ভব নয়। এমন এক যাদুশক্তি ছিল তার মধ্যে যে, যে তা শুনত তার মধ্যেই ভারতপ্রেম জেগে উঠত। তার পর থেকেই ভারতবর্ষ হয়ে উঠত তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষিত ভূমি। ভারতবাসী, ভারতের ইতিহাস, স্থাপত্য ও সংস্কৃতি, ভারতের স্থলভূমি, পাহাড়-পর্বত ও নদনদী, ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার ও প্রথা-পদ্ধতি, ভারতের শাস্ত্র ও তার মহান আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা—ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় সবকিছুই তার কাছে হয়ে উঠত আকর্ষণীয় ও জীবন্ত। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হত তার নতুন জীবন—যে-জীবন অনুশীলনের, অনুধ্যানের। যে-জীবনে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুটি স্থান পরিবর্তন করেছে।

ডেট্রয়েট থেকে স্বামীজী নিউইয়র্ক গেছিলেন। যে-নির্দিষ্ট জীবনব্রত পালনের প্রেরণা অন্তরে অনুভব করছিলেন, স্বামীজী আশা করেছিলেন আমেরিকার এই সংস্কৃতিসম্পন্ন মহানগরীতে তাকে বাস্তবায়িত করার কোন পথ খুঁজে পাবেন। এখানে তিনি শিগ্গিরই একদল ধনী বন্ধু-গোষ্ঠীদ্বারা পরিবৃত হয়ে পড়লেন। তাঁরা তাঁকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁদের আকর্ষণ করত। কিন্তু যে বাণীপ্রচারের জন্য তিনি উদ্গ্রীব, সে ব্যাপারে তাঁদের কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁকে অত্যন্ত বিলাসের মধ্যে রাখা হয়েছিল। কিন্তু স্বামীজী নিজেকে বিপন্ন বোধ করলেন। তিনি বুঝলেন, তাঁকে শুধুমাত্র একজন সামাজিক আকর্ষণ-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বরূপে পরিগণিত করা হচ্ছে। স্বামীজীর ভেতর থেকে আবার সেই মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগল ঃ 'এ নয়। এ নয়। এই রকম পরিস্থিতিতে থেকে আমি কখনই আমার কাজ করতে পারব না।'

তারপরে তিনি ভাবলেন, একা একা থেকে সর্বসাধারণের জন্য ক্লাস খুলে শিক্ষা দিলে হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। তিনি ল্যান্ডসবার্গকে বললেন তাঁদের দুজনের জন্য অল্পভাড়ায় ঘর দেখতে। যে জায়গায় বাড়ি ভাড়া পাওয়া গেল (৫৪ ওয়েস্ট, ৩৩ নং স্ট্রীট), সেটা এমন পাড়া যে কেউ যেতে চায় না। তাঁকে আভাসে-ইঙ্গিতে বলা হয়েছিল যে, যারা ঠিক লোক, বিশেষত যারা মহিলা, তারা এরকম জায়গায় আসবে না। কিন্তু তারা এল—সেই অপরিচ্ছন্ন ঘরগুলোতেও সবরকম স্তরের পুরুষ এবং মহিলারাই ভিড় করে আসতে থাকল। তারা চেয়ারে বসত ; চেয়ার ভর্তি হয়ে গেলে টেবিল, সিঁড়ি বা ওয়াশস্ট্যাণ্ডের উপরে বসে শুনত। যারা লক্ষপতি তারাও খুশিমনে মেঝেতে একেবারে তাঁর পায়ের কাছে বসে থাকত। এসবের জন্য কোন বেতন দিতে হত না। ফলে, প্রায়ই ঘরভাড়া দেওয়ার পয়সাও থাকত না। গোটা শীতকালটা তিনি এভাবে যতটা পারলেন কাজ করলেন। এইসময় কয়েকজন সঙ্গতিসম্পন্ন লোক তাঁর কাজটির জন্য অর্থসাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তবে তাঁরা কয়েকটি শর্ত করলেন। 'উপযুক্ত জায়গা' ঠিক করতে হবে আর 'উপযুক্ত লোক'দের

আকর্ষণ করতে হবে। তাঁর চিরমুক্ত সন্ন্যাসী মানসিকতায় এই প্রস্তাব অসহ্য ঠেকল। এইজন্যই কি তিনি সংসার ত্যাগ করেছেন? এইজন্যই কি নামযশকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন? সামান্য আর্থিক সাহায্য ত্যাগ করা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। ঠিক করলেন, কোন মানুষের সাহায্যের উপর তিনি আর নির্ভর করবেন না। যদি এই কাজ তাঁর মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়াই প্রভুর অভিপ্রেত হয়, তবে তার উপায় এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যও আসবেই। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি, বৈষয়িক কর্মপদ্ধতির সঙ্গে আপস করতে তিনি অসম্মত হলেন। সেই সময়কার একটা চিঠিতে তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছেঃ '...আমাকে "ঠিক ঠিক" লোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চান। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি এটাই বুঝেছি যে, প্রভু যাঁদের পাঠান একমাত্র তাঁরাই "ঠিক ঠিক লোক" আর বাকি যারা—প্রভু তাদের সকলের কল্যাণ করুন, এবং আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচান। ...প্রভু, মানুষের পক্ষে তোমার দয়ায় বিশ্বাস করা কী কঠিন! শিব! শিব! ঠিক ঠিক লোক কোথায়? মন্দই বা কোথায়? সবই যে তিনি! ব্যাঘ্রের মধ্যে তিনি আর মেষশাবকের মধ্যেও তিনি। সাধুর মধ্যে তিনি, পাপীর মধ্যেও তিনি। আমি তাঁর আশ্রয় নিয়েছি; আমার শরীর-মন-আত্মা সব তাঁর শরণাগত। সারা জীবন কোলে করে নিয়ে এখন কি তিনি আমায় ত্যাগ করবেন? ...এই "ঠিক ঠিক লোকদের" কথা থাক। হে শিব, তুমি আমার ভাল, তুমিই আমার মন্দ! প্রভু, শিশুকাল থেকেই আমি তোমার শরণাগত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিংবা শীতল মেরুপ্রদেশে; পর্বতের উচ্চ শিখরে কিংবা সমুদ্রের গভীরে—তুমি আছ আমার সঙ্গে। তুমিই আমার গতি, আমার নিয়ন্তা, আমার আশ্রয়, আমার সখা, আমার গুরু, আমার ভগবান, আমার স্বরূপ—তুমি কখনও আমায় ছাড়বে না, কখনই না। ...যদি কেউ ভাল লোকের উপরে ভার দেয় তাকে কখনও ঠকতে হয় না। প্রভু, তুমি সকল ভালর ভাল, তুমি তো জানই সারা জীবন আমি তোমার—কেবল তোমারই দাস! তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে, যাতে অপরে আমায় ঠকিয়ে যাবে বা আমি মন্দের দিকে ঢলে পড়ব? না, তিনি কখনই আমায় ত্যাগ করবেন না, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

এর পরে কয়েকজন আগ্রহী শিক্ষার্থী এই কাজের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তারপর থেকে আর এসব অসুবিধে থাকে না। এই সময় তিনি লিখেছিলেনঃ 'জগতের ইতিহাসে এমন কি কখনও হয়েছে যে, ধনীদের দিয়ে কোন বড় কাজ হয়েছে? হৃদয় আর মস্তিষ্কের শক্তিতেই বড় কাজ হয়, চিরকাল তা-ই হয়েছে—অর্থের শক্তিতে নয়।

সারা শীতকাল জুড়েই কাজ হয়ে চলল। তারপর মরশুম শেষ হয়ে গরম এল, গ্রীষ্মের প্রথম পর্যন্ত ক্লাস চলল। এইসব একনিষ্ঠ শিক্ষার্থীরা চাচ্ছিল না যে, শিক্ষায় ছেদ পড়ুক। তাদের একজনের সেন্ট লরেন্স নদীর ওপর থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে একটা বাড়ি ছিল। স্বামীজীর কাছে প্রস্তাব করা হল যে, যদি গ্রীষ্মকালটা স্বামীজী ও তারা সকলে সেখানে কাটান। স্বামীজী তাদের আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হলেন, সম্মত হলেন তিনি। তিনি অনুভব করলেন, তাঁর কাজ এবার সত্যিই শুরু হল। বস্তুত, থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে যারা সম্মিলিত হয়েছিল তারা সকলে প্রকৃত অর্থেই ছিল শিষ্য।

জুনের প্রথম দিকেই স্বামীজী এবং আরও তিন-চারজন থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে

চলে এলেন। অবিলম্বে শিক্ষা শুরু হল। আমরা (আমি এবং ফাঙ্কি) পৌঁছলাম ৬ জুলাই, ১৮৯৫, শনিবার। যাঁরা আমাদের আগেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সোমবার দিনই তাঁদের কয়েকজনকে স্বামীজী দীক্ষা দেবেন ঠিক করেছিলেন। রবিবার বিকেলে তিনি বললেনঃ 'আমি এখনও তোমাদের খুব ভাল করে জানি না যে বুঝব, তোমরা দীক্ষার জন্য উপযুক্ত।' এরপর তিনি কতকটা লজ্জিতভাবে বললেনঃ 'আমার একটা ক্ষমতা আছে অন্যের মনের ভেতর কি আছে পড়তে পারি। খুব কমই আমি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করি। তোমরা যদি আমায় অনুমতি দাও, তাহলে আমি তোমাদের মনের ভেতর কি আছে, দেখি। কারণ, আগামীকাল অন্যদের সঙ্গে তোমাদেরও দীক্ষা দিতে চাই।' আমরা সানন্দে রাজী হলাম। নিশ্চয়ই তিনি আমাদের মন পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কারণ, পরদিন অন্য কয়েকজনের সঙ্গে তিনি আমাদেরও একটা মন্ত্র দিলেন এবং আমাদের শিষ্য করে নিলেন।

থাউজ্যান্ড আইল্যাণ্ডস্ অর্থাৎ এক হাজারটি দ্বীপ। এই দ্বীপগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যেটি বড় সেটিই থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক। ন-মাইল লম্বা আর চওড়ায় এক মাইল কি দু-মাইল। দ্বীপটির তীরে স্টীমার এসে লাগে। তখন দ্বীপের বাকি অংশ প্রায় জনশূন্য ছিল। যে বাড়িতে আমরা ছিলাম, সেটা ছিল গ্রাম থেকে এক মাইল চড়াইয়ে একটা টিলার উপর। চারপাশে ঘন জঙ্গল। এখানে আমরা বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম, অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কাছাকাছিই ছিল। আমরা চারদিকে ইচ্ছেমতো ঘোরাফেরা করতে পারতাম এবং কখনও কোন মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। স্বামীজী যখন বেড়াতে বের হতেন তখন কখন কেবল ল্যান্ডসবার্গকে কখন বা আমাদের দু-একজনকে সঙ্গে নিতেন। মাঝে মাঝে সকলকে একসঙ্গে নিয়েও বের হতেন। বেড়ানোর সময় বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ তিনি প্রায় তুলতেনই না। সম্ভবত সেই নির্জনতা আর বনভূমি তাঁর মনে পুরনো স্মৃতি জাগিয়ে তুলত, ভারতবর্ষের বনজঙ্গলে তিনি যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন সেসব কথা তাঁর মনে পড়ে যেত। আমাদের কাছে বলে চলতেন তাঁর পরিব্রাজক জীবনের গোপন উপলব্ধির কথা।

প্রথমে ঠিক ছিল যে, এখানে সকলে জোট বেঁধে থাকা হবে। বাড়ির কাজে প্রত্যেকেই অংশ নেবে, কোন পরিচারক থাকবে না। প্রায় সকলেই ছিল গৃহস্থালি কাজকর্মে অনভ্যস্ত, আর এই ধরনের কাজও ছিল তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই ফল হয়েছিল কৌতুককর। শুধু তা-ই নয়, ক্রমশ তা বিপর্যয় ঘটাতে চলেছিল। এসব ছোটখাটো কাজের মধ্যে দিয়ে চরিত্রের যে পরীক্ষা হতে দেখেছি, তা ভারী অদ্ভুত। সাধারণভাবে যেসব দুর্বলতাকে সারা জীবন লুকিয়ে রাখা যায়, এই ধরনের গোষ্ঠীজীবনে একদিনেই তা প্রকাশ পেয়ে যায়। এটা বাস্তবিকই আশ্চর্যের। স্বামীজী কিন্তু এইসব দুর্বলতাকে অন্যভাবে দেখতেন। যদিও দলের একজনই শুধু বয়সে তাঁর চেয়ে ছোট ছিলেন, তবুও ধৈর্য ও স্নিগ্ধতায় তাঁকে আমাদের পিতৃতুল্য—না, মায়ের মতন—মনে হত। যখন বুঝতেন যে, আমাদের মানসিক চাপ খুব বেশী হয়ে পড়ছে, তখন অত্যন্ত মধুরস্বরে তিনি বলতেনঃ 'আজ আমি তোমাদের রেঁধে খাওয়াব।' ল্যান্ডসবার্গ কিন্তু শুনেই পাশ থেকে আঁৎকে উঠতঃ 'ভগবান রক্ষা কর।' ব্যাখ্যা করে তিনি

বলতেন—নিউইয়র্কে স্বামীজী যেদিন রাঁধবেন বলতেন, ল্যান্ডসবার্গ প্রায় মাথার চুল ছিঁড়তেন। কারণ, রান্নার পরে বাড়ির সব বাসনপত্র তাঁকে মাজতে হত [অর্থাৎ স্বামীজী রান্নার সময় সব বাসন ব্যবহার করবেন]।

কিন্তু প্রয়োজনীয় গৃহকর্ম শেষ করে আমরা যেই ক্লাসঘরে সমবেত হতাম, সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়াটা পালটে যেত। ক্লাসঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে কোন বিক্ষেপ কোন বিঘ্নই ঢুকতে পারত না। মনে হত, আমাদের শরীর এবং শরীর সম্পর্কীয় সমস্ত বোধ যেন ঐ ঘরের বাইরে ফেলে এসেছি। আমরা অর্ধবৃত্তাকারে বসে অপেক্ষা করতাম—অসীমের কোন্ বাতায়ন উন্মুক্ত হবে আজ? কোন্ দিব্যদর্শন আজ আমাদের নয়ন সার্থক করবে? অজানার রোমাঞ্চ প্রতিদিনই আমাদের জন্য অপেক্ষা করত।

তিনি আমাদের বাগানের সেই গল্পটা বলতেন। খুব সুন্দর এক বাগান। পাঁচিল টপকে একজন বাগানের মধ্যে উঁকি দিল। এত আকর্ষণীয় মনে হল তার যে, বাগানের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর ফিরল না। তারপরে আরও একজন লাফিয়ে পড়ল, তারপরে আরও একজন। কিন্তু আমাদের বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল এমন একজন আচার্যলাভের যিনি পাঁচিলে উঠে বাগানের শোভা সমভাবেই আস্বাদ করেছেন, কিন্তু তাঁর অসীম করুণাবশে তিনি ফিরে এসেছেন—এইজন্য যে, যারা এপাশে রয়েছে তাদের বাগানের গল্প বলবেন ও সেখানে পৌঁছতে সাহায্য করবেন। এইভাবেই সকাল থেকে মাঝরাত্রি পর্যন্ত কাটত। যে গভীর প্রভাব তিনি আমাদের মনে ফেলেছেন, তা লক্ষ্য করে কখনও কখনও মৃদু হেসে বলতেনঃ 'গোখরো সাপ তোমাদের কামড়েছে; আর রক্ষা নেই।' কখনও বা বলতেনঃ 'আমার জালে তোমরা ধরা পড়েছ, আর বেরোতে পারবে না।'

প্রথম দিন সকালেই আমরা জানলাম, স্থূল চেতনার চেয়েও এক উচ্চতর চেতনার অবস্থা আছে—তাকে সমাধি বলে। আমরা যে চেতন ও অ-চেতন বলে দুটো ভাগ করে থাকি তার চেয়ে এরকম তিনটে ভাগ করাই সঠিক—অবচেতন, চেতন, অতিচেতন। পাশ্চাত্যভাবে চিন্তা করলে এখানেই গুলিয়ে যাবার সম্ভাবনা। পাশ্চাত্য চিন্তাপদ্ধতি অনুযায়ী চৈতন্যের দুটো ভাগ—অ-চেতন বা অবচেতন এবং চেতন। তাঁরা কেবল মনের স্বাভাবিক অবস্থাটা স্বীকার করেন। তাঁরা ভুলে যান যে, স্বাভাবিক চৈতন্য অবস্থার ঊর্ধ্বেও চৈতন্যের আর একটা স্তর আছে—অতিচেতন অবস্থা। দৈবপ্রেরণা এই অতিচেতন অবস্থাতেই এসে থাকে। কি করে আমরা বুঝব যে, এ-অবস্থা ঊর্ধ্বতর অবস্থা? স্বামীজীর উক্তি আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত করে বলা যায় 'এক অবস্থায় [স্বপ্ন অবস্থায়] মানুষ "মানুষ" রূপে প্রবেশ করে আর অজ্ঞান রূপেই বেরিয়ে আসে। আর এক অবস্থায় মানুষ "মানুষ" হয়ে প্রবেশ করে ভগবান হয়ে ফিরে আসে।' তিনি সবসময় বলতেনঃ 'মনে রেখো যে, অতিচেতন অবস্থার সঙ্গে যুক্তিবুদ্ধির কোন বিরোধ নেই। অতিচেতন অবস্থায় মানুষ বুদ্ধিকে অতিক্রম করে যায়, কিন্তু বুদ্ধির বিরুদ্ধতা কখনই করে না। ধর্মবিশ্বাস আর সাধারণ বিশ্বাস এক নয়। ধর্মবিশ্বাস মানে চরম সত্যের উপর অধিকার, দিব্যজ্ঞান।'

সত্য সকলের জন্য, সবার মঙ্গলের জন্য। সত্য গোপন নয়—পবিত্র। সত্যলাভের সোপান কি? —শ্রবণ; প্রথমে শুনতে হবে, তারপর 'মনন'। সত্য সম্বন্ধে যুক্তিবিচার

করতে হবে। 'বিচারের স্রোত সত্যের ওপর দিয়ে বয়ে যাক। তারপরে "নিদিধ্যাসন"। সত্য সম্বন্ধে ধ্যান কর, তোমার মনকে এর ওপর একাগ্র কর, সত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও।' নীরবসাধনায় শক্তি অর্জন কর এবং আধ্যাত্মিকতার বিদ্যুৎ-আধার হয়ে ওঠো। ভিখারি কি দান করবে? রাজাই কেবল দান করতে পারে। আর সে-ই রাজা, যে নিজের জন্য কিছু চায় না।

'তোমার অর্থ থাকলে তুমি মনে কর যে তা ভগবানের—তুমি তার তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। তার প্রতি কোন আসক্তি রেখো না। নাম-যশ-অর্থ যাক। এগুলি ভয়ঙ্কর বন্ধন। মুক্তির অপূর্ব আনন্দ অনুভব কর! তুমি মুক্ত, চিরমুক্ত, মুক্ত তুমি! আমি ধন্য! আমিই মুক্তি! আমি অসীম! আমার আত্মা অনাদি অনন্ত। সর্বভূতে আমার আত্মা। অবিরাম বলতে থাক এই কথা।'

জীবন-মৃত্যুর পরপারে যে জগৎ, সেই জগতের পর্দা আমাদের চোখের সামনে থেকে সরে যেত, যখন তাঁকে গভীর ঘৃণায় বলতে শুনতাম 'জীবনকে এরকম নোংরাভাবে আঁকড়ে থাকা!!!' —সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরে সেই মহাগৌরবময় মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হত। মায়ার বেষ্টনী ছিন্ন করার অধীর আগ্রহে উদ্‌গ্রীব এক আত্মাকে আমরা প্রত্যক্ষ করতাম। আমরা দেখতে পেতাম এমন একজনকে, যার কাছে দেহ শুধু দুঃসহ বন্ধন বা সীমাবদ্ধতা নয়, দেহ মানে অধঃপতন, অসম্মান। পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরীর মতো পায়চারি করতে করতে তিনি আর্তনাদ করতেনঃ 'আজাদ, আজাদ! মুক্তি!' হ্যাঁ, সত্যিই তিনি ছিলেন সিংহসদৃশ—তবে সেই সিংহ যার পিঞ্জর লোহার নয়, বাঁশের। আর একদিন তিনি একটি গানের শেষ কথাগুলো গাইছিলেন যার অর্থঃ 'এবার যেন ধরা না পড়ি। কতবার মায়া আমাদের ফাঁদে ফেলেছে। কতবার মুক্তির বদলে চিনির পুতুল নিয়েছি—যে পুতুল জলে গলে গেছে। এবার যেন ধরা না পড়ি।' এইভাবে আমাদের মনে মুক্তির মহতী আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল। মুক্তির জন্য যে তিনটি জিনিস অবশ্য প্রয়োজন, তার দুটি আমরা ইতিমধ্যেই লাভ করেছিলাম, তা হল—মনুষ্য-জন্ম আর সদ্‌গুরু। এখন তিনি আমাদের তৃতীয় বস্তুটি দান করছিলেন—তা হল মুমুক্ষুত্ব, মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা। এই সময়ই তিনি 'সন্ন্যাসীর গীতি' কবিতাটি রচনা করেছিলেন।

তবে কেবল বেদান্ত আর গুরুগম্ভীর কথাই হত না। মাঝে মাঝে ক্লাসের পর শুধু মজা হত, নির্ভেজাল মজা। সেরকম মজা আমরা অন্য কোথাও দেখিনি। স্বামীজী অনেক হাসির গল্প জানতেন। তার মধ্যে কয়েকটা তিনি বার বার বলতেন। যেমন, খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকের গল্প। একটা দ্বীপে গেছে সে, সেই দ্বীপের লোক মানুষ খায়। সেখানে পৌঁছে সেই ধর্মপ্রচারক তাদের জিজ্ঞেস করছে—'আমার পূর্ববর্তী প্রচারককে তোমাদের কেমন লেগেছে?' তারা উত্তর দিল—'সু-স্বা-দু!' আর একটা গল্প বলতেন নিগ্রো প্রচারক সম্বন্ধে। আদমের উৎপত্তি বর্ণনা করতে করতে সেই প্রচারক বলছেনঃ 'ভগবান আদমকে সৃষ্টি করলেন, তারপর শুকোনোর জন্য বেড়ার ওপর ফেলে রাখলেন।' এইটুকু বলেছেন, এমন সময় শ্রোতাদের মধ্যে একজন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলঃ 'এখানে একটা প্রশ্ন পাদরি মশাই! ঐ বেড়াটা কে তৈরী করল?' এই কথা

ক্যালিফোর্নিয়া ১৯০০

সম্প্রতি আবিষ্কৃত স্বামীজীর ছবি

গ্রীনএকার আগস্ট ১৮৯৪

শুনে সেই নিগ্রো-প্রচারক প্রচার-বেদীর ওপর ঝুঁকে পড়ে গম্ভীরভাবে বললেন ঃ 'এরকম আর একটা প্রশ্ন করলেই তুমি আমাদের সমস্ত ধর্মতত্ত্ব ভেঙে চুরমার করে দেবে।' এই হাস্যকৌতুকের কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দেখতাম যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আবহাওয়ার মধ্যে বসে আছি—স্বামীজী শকুন্তলার গল্প বলছেন! কবিসুলভ কল্পনা মিশিয়ে এমনভাবে তিনি শকুন্তলার কাহিনী বলতেন যে, আমাদের মনে হত, 'রোমান্স' বলতে কি বোঝায়, এর আগে আমরা তার কিছুই বুঝিনি; আমরা যা বুঝেছি, তা প্রকৃত রোমান্সের এক বিবর্ণ নিষ্প্রাণ ছায়া মাত্র! সমস্ত প্রকৃতি—গাছ, ফুল, পাখি, হরিণ, সবকিছু—বিলাপ করছে, 'শকুন্তলা চলে গেছে! শকুন্তলা চলে গেছে!' তাঁর মুখে এই বর্ণনা শুনতে শুনতে মনে হত গোটা প্রকৃতি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তখন নিজেদেরও মনে হত শোকার্ত, শূন্য। এরপরেই হয়তো তিনি বলতেন সাবিত্রীর গল্প—সেই পতিব্রতা নারী—যার পতিভক্তি ভয়ঙ্কর মৃত্যুদেবতাকেও অভিভূত করেছিল। শুধু 'মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত নয়', তার ভালবাসা এত বিরাট যে, মৃত্যুই সেই ভালবাসার সামনে পশ্চাদপসরণ করেছে। বলতেন সতীর কথা—স্বামীর নিন্দা কানে যাওয়া মাত্র যিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। উমারূপে ভিন্ন দেহধারণ করেও তিনি সেই স্বামীর অনুরাগী ছিলেন। সীতার সম্বন্ধে তিনি কখনও বেশীক্ষণ বলতে পারতেন না। কারণ, সীতা-চরিত্র তাঁকে যেভাবে স্পর্শ করত সাবিত্রীর চরিত্রও তা পারত না। এই চরিত্রের আবেদন তাঁর কাছে এত গভীর, এত মূল্যবান ছিল যে, বাইরে প্রকাশ করতে চাইতেন না। মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা বাক্য বা বাক্যাংশ, বড়জোর একটা অনুচ্ছেদ সীতা সম্বন্ধে বলতেন। 'সীতা—পবিত্রতাস্বরূপিণী, বিশুদ্ধতামূর্তি।' 'সীতা—আদর্শ স্ত্রী। এই চরিত্র সর্বকালে একবারই শুধু রচিত হয়েছে।' 'ভারতীয় নারীদের ভবিষ্যৎকে অবশ্যই সীতার আদর্শে গড়ে তুলতে হবে।' তিনি সাধারণত সীতা-প্রসঙ্গ শেষ করতেন এই বলে 'আমরা সবাই সীতার সন্তান।' —কথাগুলো বলতে বলতে যেন ভাবাবেগে দ্রবীভূত হয়ে যেতেন। এইভাবেই আমাদের মনে ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠেছিল।

স্বামীজী বলেছিলেন যে, একসময় তিনি সমদর্শিতা লাভ করবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রায়ই তিনি উদ্ধৃত করতেন ঃ 'যিনি সর্বভূতে পরমেশ্বরকে একইভাবে উপস্থিত দেখেন, নশ্বর বস্তুতেও যিনি অবিনাশী পরমাত্মাকে দেখেন, তিনিই ঠিক ঠিক দেখেন। সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখেন বলে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে তিনি হিংসা করতে পারেন না। তিনি তখন পরম গতি প্রাপ্ত হন।'

আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, কিভাবে তিনি এই আদর্শকে জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও প্রয়োগ করতেন। কলকাতার সঙ্গে জড়িত এক মিশনারী পরিবার তাঁকে ডেট্রয়েট থেকে উৎখাত করবার চক্রান্ত করেছিল। যখন আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন তিনি এদের বিরুদ্ধে আত্মসমর্থন করছেন না, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ 'হাতি যখন বাজার দিয়ে চলে যায়, কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। তাতে কি হাতির কিছু হয়? হাতি কি তাতে ভ্রূক্ষেপ করে?' যাঁর সঙ্গে তাঁকে থাকতে হত, তাঁর খুব বদমেজাজ ছিল। একজন বলেছিল ঃ 'আপনি ওর সঙ্গে আছেন কেন?' তিনি বলেছিলেন ঃ 'আহা, আমি তো ওকে মনে মনে আশীর্বাদ করি। ও আমাকে আত্মসংযম অভ্যাস করার

সুযোগ দেয়।' পাশ্চাত্য মানসিকতাবশত আমরা যারা যে-কোন মূল্যে স্বাচ্ছন্দ্য পেতে অভ্যস্ত, তাদের কাছে এ ছিল এক নতুন আদর্শের উন্মোচন! এইভাবে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমরা গীতার উচ্চ আদর্শগুলিকে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে বাস্তবায়িত হতে দেখতাম। শত্রু-মিত্র নিন্দুক-স্তুতিকার—সবার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখা, সম্মান-অসম্মানে অবিচল থাকা—এই ছিল তাঁর নিরন্তর সাধনা।

তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন রাতারাতি—আরও সঠিক করে বলতে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই। ঐরকম অল্প বয়সে এভাবে খ্যাতিলাভ খুবই বিরল ঘটনা। কিন্তু বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে ধর্মমহাসভায় সেই বিরল ঘটনাই ঘটেছিল। একে শুধু খ্যাতি বললে কম বলা হয়। যে উদ্দীপনা তিনি জাগিয়েছিলেন, কখনও কখনও সেটা তাঁর উন্মত্ত প্রশস্তিতে পর্যবসিত হয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণের এই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস-প্রশস্তির মাঝেও তিনি ছিলেন শান্ত, যেন হিমালয়ের গুহায় একাকী বিরাজমান। যে খ্যাতির জন্য মানুষ সাধারণত সারা জীবন চেষ্টা করতে প্রস্তুত থাকে, সেই খ্যাতিকে অক্লেশে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি বলতেন: 'নাম-যশের নোংরা নেকড়া।'

কখনও কখনও স্বামীজী এমন একটা ভাবে থাকতেন, যখন মনে হত তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন। একদিন এরকম একটি মুহূর্তে বলেছিলেন: 'পরবর্তী যে বিরাট অভ্যুদয় হবে, যার ফলে এক নতুন অধ্যায়েরই সূচনা হবে, তা আসবে রাশিয়া কিংবা চীন থেকে। আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না এ দুদেশের কোথা থেকে—তবে হয় রাশিয়া নয় চীন।' তাঁর ক্ষেত্রে এসব কখনই একটা মতপ্রকাশ মাত্র ছিল না। তিনি বলেননি যে, 'আমার এটা মনে হয়।' দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন কথাগুলি—যার সত্যতা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিশ্চিত। একটু পরেই তিনি বলেছিলেন: 'ইউরোপ একটা আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে। আধ্যাত্মিকতার বন্যায় যদি ঐ আগুন নেভানো না হয়, তবে অগ্ন্যুৎপাত হবেই।' ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন একথা বলেছিলেন তখন ইউরোপ সমৃদ্ধিশালী ও শান্তিপূর্ণ। কিন্তু বিস্ফোরণ ঠিকই ঘটেছিল—কুড়ি বছর পর!

ভারতবর্ষের মুঘলরা যেন স্বামীজীর ওপরে একটা যাদুশক্তি বিস্তার করে রেখেছিল। ভারতীয় ইতিহাসের এই অধ্যায়টি তিনি এমন নাটকীয়ভাবে আত্মহারা হয়ে গিয়ে বর্ণনা করতেন যে, আমাদের মনে হত, তিনি বোধহয় তাঁর নিজের অতীত জীবনের কাহিনীই বলছেন। আমাদের প্রায়ই মনে হত সেই পরাক্রান্ত মুঘল সম্রাট আকবরকেই কি আমরা আমাদের সামনে দেখছি? স্বামীজীর মধ্যে? নাহলে কি করে তিনি এই শ্রেষ্ঠ মুঘল-সন্তানের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবন-উদ্দেশ্য এত গভীরভাবে বুঝতে পারলেন? মুঘল যুগের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো তিনি এমন অদ্ভুত ভাবে বর্ণনা করতেন যে, সেযুগের শাসক, রানী, প্রধানমন্ত্রী, সেনানায়ক—প্রতিটি চরিত্রই আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠত; মনে হত তাঁরা যেন সজীব নারী-পুরুষ; আমাদের কতকালের পরিচিত।

স্বামীজীর এই এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল—তাঁর চোখে কোন ব্যক্তি বা জাতির মহৎ দিকগুলোই শুধু ধরা পড়ত। কাজেই, তাঁর মতো মানুষ যে মুসলমানদের আন্তরিক ও গভীরভাবে বুঝতে পেরেছেন, তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। তাঁর কাছে ভারতবর্ষ শুধু

হিন্দুদের দেশ ছিল না—তাতে সকলের স্থান ছিল। 'আমার মুসলমান ভায়েরা'—এই কথাটি তিনি প্রায়ই বলতেন। তাঁর এই মুসলমান ভাইদের সংস্কৃতি, ধর্মভাব, পৌরুষশক্তি প্রভৃতি গুণগুলিকে তিনি যেভাবে বুঝতেন এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, তা বিস্ময়কর। এই সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা ও একাত্মতার মনোভাবে খুব কম মুসলমানও স্বামীজীকে ছাড়িয়ে যেতে পারত। আমাদের মধ্যে একজন একবার তাঁর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রায় সঙ্গী হয়েছিল। তাঁর কাছে শুনেছি, জাহাজ যখন জিব্রালটারে লেগেছিল আর মুসলমান নাবিকেরা 'দীন দীন' শব্দ করতে করতে মাটিতে লাফিয়ে পড়ছিল, তখন স্বামীজী সেই দৃশ্য দেখে গভীর আবেগে বার বার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলেন।

স্বামীজীর সান্নিধ্যে যখন প্রথম এলাম, আমরা ভাবতে পারিনি যে, একটা চিন্তা দিন-রাত তাঁর মনকে আলোড়িত করে রেখেছে। 'কাজ! কাজ! কি করে ভারতে কাজ শুরু করব! কি তার পথ; কি তার পদ্ধতি!'—এই সবসময় বলতেন তিনি। সেই কাজ ধীরে ধীরে তাঁর নিজস্ব রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। এটা নিশ্চিত যে, আমেরিকা ত্যাগ করবার আগেই কর্মপ্রণালী কি হবে তার খুঁটিনাটি সবকিছুই তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন, ভারতের সমস্যার প্রতিকার অর্থ নয়, প্রচলিত অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তা-ও নয়—অন্য ধরনের এক শিক্ষা। মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ মনে করিয়ে দিতে হবে, তার দেবত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দিতে হবে। যদি এই উপলব্ধি তার মধ্যে সদাজাগ্রত থাকে, তাহলে আর সবকিছুই আপনা থেকেই আসবে—শক্তি, সাহস, পৌরুষ—সবকিছু। আবার সে প্রকৃত 'মানুষ' হবে। এবং এই বাণীই তিনি কলম্বো থেকে আলমোড়া সর্বত্র ঘোষণা করেছিলেন।

স্বামীজীর পরিকল্পনা ছিল এরকম ঃ প্রথমে গঙ্গাতীরে একখণ্ড জমি কিনবেন। তাতে একটা মন্দির থাকবে যেখানে নিত্য পুজো হবে। আর একটা মঠবাড়ি, যেখানে তাঁর গুরুভাইরা থাকবেন আর যুবকদের শিক্ষা দেবেন। যুবকদের কি কি শেখানো হবে? ধ্যান এবং ধর্মজীবনের প্রয়োজনীয় বিবিধ বিষয়, যেমন—উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা, সংস্কৃত, প্রভৃতি। বিজ্ঞানও শেখানো হবে। এইভাবে কয়েকবছর শেখানোর পর যখন মঠের প্রধান মনে করবেন যে তারা যথেষ্ট প্রস্তুতিলাভ করেছে, তখন তাদের বাইরে পাঠানো হবে। তারা নতুন নতুন মঠ করবে, ভাবপ্রচার করবে, আর্ত-পীড়িতের সেবা করবে; দুর্ভিক্ষ ও বন্যার সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, যে-ভাবে প্রয়োজন হয় মানুষের সেবা করবে।

একজন ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীর পক্ষে এত ব্যাপক কর্মের পরিকল্পনা সেসময় প্রায় পাগলামি বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে আমরা দেখেছি, এর প্রতিটি অক্ষর কার্যে রূপায়িত হয়েছে।

স্বামীজী যখন গ্রীনএকারে ছিলেন, তখন মার্কিনী জীবনযাত্রার এক নতুন ধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। একদল চমৎকার তরুণ-তরুণী—মুক্ত ও সাহসী। কোন রকম যুক্তিহীন বাঁধাধরা নিয়মে তারা আবদ্ধ না হয়েও আত্মসংযত। এদের দেখে স্বামীজীর মনে নতুন চিন্তা দেখা দিয়েছিল। তিনি অত্যন্ত চমৎকৃত হয়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে, নারী-পুরুষ বাধাহীনভাবে মিশছে অথচ তাতে অপবিত্রতার নাম-গন্ধ নেই। তিনি

বলেছিলেনঃ 'এদের এই সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক আমার ভাল লেগেছে।' এক এক সময় কয়েকদিন ধরে এই সমস্যাটি তাঁর মন অধিকার করে থাকত। এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করতেন আর প্রায়ই তাঁর মুখ থেকে কয়েকটা স্বগতোক্তি বেরিয়ে আসতঃ 'কোন্‌টা ভাল, আমেরিকার সমাজের স্বাধীনতা, না ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বিধিনিষেধ? আমেরিকার সমাজ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, নিম্নতম মানুষকেও সুযোগ দেয়। স্বাধীনতা ছাড়া অগ্রগতি সম্ভব নয়। কিন্তু স্বাধীনতার সুস্পষ্ট বিপদও আছে। তথাপি, ভুল থেকেও তো মানুষ শিখতে পারবে। এই ব্যবস্থায় আছে ব্যাপ্তি। আবার ভারতের সমাজ-ভিত্তিক ব্যবস্থায় রয়েছে গভীরতা। দুটোকেই কি করে রাখা যায়; সেটাই প্রশ্ন।' তিনি এমন এক পথ বের করতে চেয়েছিলেন, যাতে এদেশের কাঠামোর সঙ্গে বিদেশের যা-কিছু ভাল যোগ করে দেওয়া যাবে, অথচ দেশীয় কাঠামোটি বিপন্ন হবে না।

ভারতীয় নারীর উন্নতির জন্য স্বামীজী কি ধরনের কাজের কথা ভেবেছিলেন? এর উত্তর পেতে হলে আর একটি প্রশ্ন করা প্রয়োজন। তা হলঃ পৃথিবীর পটভূমিতে, বিশেষত বর্তমান ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের কি তাৎপর্য? এই আধ্যাত্মিক ভাবোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যে নতুন শক্তি নতুন জীবনের আবির্ভাব হয়েছে, তা শুধু পুরুষদের জন্য নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু ভারতের নারীদের কাছে তা কি করে নিয়ে যাওয়া যাবে? সেই আদর্শের আগুনে শুদ্ধ হয়ে কি তারা হয়ে উঠবে প্রজ্বলিত মশাল—যা থেকে লক্ষ লক্ষ নারীর জীবনবর্তিকা জ্বলে উঠবে? এইটি তাঁর অন্যতম চিন্তা ছিল। তিনি বলেছিলেনঃ 'এই কাজের জন্য একজন নারী চাই। কোন পুরুষ এ-কাজ করতে পারবে না। কিন্তু কোথায় সেই নারী?'

যখন তিনি দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, তখনই তিনি সচেতনভাবে সন্ধান করেছেন এই কাজের উপযুক্ত নারী পাওয়া যায় কিনা। একজনের পর আর একজনকে দিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন—তাঁরা সকলেই ব্যর্থ হয়েছেন। একজনের সম্বন্ধে তাঁর অনেক আশা ছিল। আমরা জিজ্ঞেস করেছিলামঃ 'তিনি কি এ-কাজ করতে পারেন না?' তিনি বলেছিলেনঃ 'দেখ, সে তার নিজের কাজই শুধু করতে চায়।' এটা কোন সমালোচনা নয়, বাস্তবের বিবৃতি। বার বার এরকম ঘটতে দেখা গেছে যে, যাঁদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে তিনি জাগাতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা স্বামীজীর মধ্যে থেকে নিঃসৃত শক্তিকেই নিজেদের শক্তি বলে ভুল করেছেন। তাঁরা নিজেদের কাজ করতে ব্যস্ত থাকেন—তাঁর কাজ করতে চান না। এমন নারী খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল, যার প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত যোগ্যতা থাকবে, যার থাকবে শিষ্যের মতো ভক্তি, যে হবে নিঃস্বার্থ এবং যে তার জীবনের আগুন অন্যের মধ্যে সঞ্চার করে দিতে পারবে। এরকম একজনকে খুঁজে নিয়ে শিক্ষা দিয়ে যোগ্য করে নিতে হবে। সে আবার অন্যদের শেখাবে, যাদের মধ্যে পাঁচ-ছ জন অন্তত এই কাজ চালিয়ে নেবে ও কাজের পরিধি বাড়িয়ে তুলবে। এই পাঁচ-ছ জন নারীকে অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিকতার এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হবে। প্রাচীন ও নবীনের মহত্তম সম্পদগুলোর সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা তাদের মধ্যে থাকতে হবে। এটিই ছিল লক্ষ্য। কিন্তু কি করে তা সাধিত হবে? কি ধরনের শিক্ষার ফলে এরকম নারী গড়ে উঠবে?

তাঁর মতে, যে তাঁর কাজ করবে তার এ-কয়েকটি গুণ থাকতে হবে—পবিত্রতা, শিষ্যের আনুগত্য ও ভক্তি। তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ 'আমি পবিত্রতা ভালবাসি।' বলতেন ঃ '(নারী-কল্যাণ সম্পর্কিত) সমস্ত প্রচেষ্টাই সীতার আদর্শকে ভিত্তি করে গড়ে তোলা উচিত। সীতা—পবিত্রতার চেয়েও পবিত্রতর; বিশুদ্ধতার চেয়েও বিশুদ্ধতর। সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি—ভারতীয় নারীর আদর্শস্বরূপ। ভারতীয় নারীদের যা হওয়া উচিত, সীতা তারই প্রতিরূপ। ভারতীয় নারীত্বের সমস্ত আদর্শ-ই এই এক সীতা চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে গড়ে উঠেছে। এই আর্যাবর্তে প্রতিটি নারী-পুরুষ-শিশুর আরাধ্যা দেবীরূপে হাজার হাজার বছর ধরে সীতা এখানে স্বমহিমায় বিরাজিতা।'

পবিত্রতার কথা তিনি সবসময় বলতেন। আর একটি আদর্শের কথা কদাচিৎ বললেও যেসব কাহিনী তিনি বলতেন তা থেকে বোঝা যেত, এই আদর্শটি না থাকলে কোন নারীকেই স্বামীজী পূর্ণাঙ্গ বলে মনে করবেন না। নারীত্বের ধারণার সঙ্গে এই আদর্শটি অবশ্য সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয়। সেটি হল রাজপুত নারী-সুলভ বীরত্ব। বার বার তিনি সেই রাজপুত-রমণীর গল্প বলতেন, যে স্বামীকে যুদ্ধ-সাজে সাজিয়ে দিতে দিতে বলেছিল ঃ 'হয় জয়ী হয়ে ফিরে এস, নয়তো বীরের মৃত্যু বরণ কর।' পদ্মিনীর উপাখ্যান কী নিখুঁতভাবেই না বর্ণনা করতেন। তেজ, কমনীয়তা ও সৌন্দর্যময় তাঁর সেই চোখ-ঝলসানো রূপ—সব নিয়ে রাজপুত রানী পদ্মিনী যেন আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়াতেন। সেই বীর রাজপুতকুলের প্রতিটি নারীই মুসলমান আক্রমণকারীর লোলুপ দৃষ্টির চেয়ে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়াই শ্রেয় মনে করেছিল। যেসব ভীরুপ্রকৃতির নারী ভালবাসার পাত্রের জন্য শুধু অশ্রুবিসর্জন করতেই জানে তাদের প্রতি স্বামীজীর সহানুভূতি ছিল না। স্বামীজী বলতেন ঃ 'রাজপুত-রমণীদের মতো হও।'

ভারতবর্ষ এখন একটা সন্ধিক্ষণের মধ্যে দিয়ে চলেছে—প্রাচীন থেকে নবীনে, আধুনিক যুগে তার উত্তরণ ঘটছে। অনেক দিক দিয়েই এই অবস্থান্তর নারী-সমাজকে বিশেষ করে প্রভাবিত করছে। নগরজীবনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জনবহুল শহরে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়তে হচ্ছে। যদি তারা দরিদ্র অথচ উচ্চবর্ণের হয়, তবে মাসের পর মাস এই আবদ্ধ অবস্থাতেই কাটাতে হয়। অর্থনৈতিক চাপও অবিশ্বাস্যভাবে ভয়ঙ্কর। দুশ্চিন্তা, অপুষ্টি, আলো-বাতাস ও নিয়মিত শরীরচর্চার অভাব থেকে আসে অশান্তি; রোগ ও অকালমৃত্যু। এই ধরনের নারীদেরই স্বামীজী বিশেষ করে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। 'নারীদের অবশ্যই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে'—স্বামীজী বলেছিলেন। তারপরে বলেছিলেন ঃ 'তাদের অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে।' স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে স্বামীজী অনেক স্পষ্ট ছিলেন এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম বলে দিয়েছিলেন। মেয়েদের শিক্ষা পাশ্চাত্যপদ্ধতিতে হবে না—হবে ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী। পড়া আর লেখাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে লেখাপড়া তাকে একটা মহৎ উদ্দেশ্যের অভিমুখী করে, সেবাপরায়ণা করে তোলে। লেখাপড়া যেন তাকে অসংযমী না করে, এ যেন বহির্মুখ জীবন-যাপনের একটা উপায় হয়ে না দাঁড়ায়। লেখাপড়া শিখে নারী যদি কুরুচিপূর্ণ হাল্‌কা চটকদার গল্পের অনুকরণ করতে থাকে, তবে বরং তার নিরক্ষর

হয়ে থাকাই ভাল। কিন্তু এই লেখাপড়াই যদি ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান ও দেশীয় সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের চাবিকাঠি হয়, তবে তা হবে আশীর্বাদস্বরূপ। যাত্রা, কথকতা, গল্পপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে রামায়ণ-মহাভারতের মহান আদর্শগুলো সবসময় তাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে, যতক্ষণ না সেগুলি তাদের অস্তিত্বের অংশ হয়ে জীবন্ত, মহামূল্যবান, মহাশক্তিমান রূপে প্রতিভাত হয়। এরকম হলে কালক্রমে দেশে এক মহান নারীজাতির উদ্ভব হবে।

শুরুতে মাতৃভাষা ভালভাবে শেখাতে হবে, তারপরে সংস্কৃত, ইংরেজি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্ক আর ভূগোল। এর সঙ্গে থাকবে হাতের কাজ—সেলাই, সূচীশিল্প, তাঁত চালানো, রান্না, ধাত্রীবিদ্যা কিংবা যে-কোন দেশীয় হাতের কাজ। পাশ্চাত্য সমস্ত বিদ্যা, বিশেষত বিজ্ঞান, অবশ্যই শেখাতে হবে। কিন্তু ভারতীয় আদর্শ ও ভারতীয় ঐতিহ্য যেন অতি পবিত্র সম্পদ হিসেবে সামনে রাখা হয়। শিক্ষা দিতে হবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমস্ত উচ্চ আদর্শের সমন্বয়-সাধন করে। যে-কোন শিক্ষাই হোক না কেন—তা যদি ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে ভারতীয় নারীদের বিশ্বাস নষ্ট করে দেয়—তবে তা শুধু নিরর্থকই হবে না, হবে ক্ষতিকারক। সেই শিক্ষালাভের চেয়ে অশিক্ষাই ভাল। গণিত শিখে তার মনে আসবে এক ধরনের শৃঙ্খলাবোধ, সব ব্যাপারে সে তখন নির্ভুল ও সত্যানুসারী হতে শিখবে; ইতিহাস তাকে প্রতি বিষয়ের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করবে, অতীত ভুলের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক করে দেবে। নারীমুক্তি বলতে স্বামীজী বুঝতেন সব রকম সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি—যা নারীর প্রকৃত শক্তির উন্মোচন ঘটিয়ে দেবে।

পাশ্চাত্যে যেসব প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত, সেগুলি শুধু মনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এর সঙ্গে ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ভাষা সম্পর্কিত কিছু বিষয় যোগ করে দেওয়া হয়েছে মাত্র। এই শিক্ষা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, মানুষ কেবল মন নয়। মানুষের প্রকৃত স্বরূপের উপর ভিত্তি করে এক নতুন শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলা হোক না কেন! যখন কোন নতুন জ্ঞান পৃথিবীতে আসে, তা অবশ্যই জীবনের সকল দিককেই আলোকিত করে তোলে। যদি মানুষকে এখন আমরা দৈবীস্বভাব বলে স্বীকার করে থাকি, তবে শিক্ষাকে অবশ্যই হতে হবে তার অন্তর্নিহিত জ্ঞানের উন্মোচক। 'মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনই হল শিক্ষা'—স্বামীজী বলেছিলেন।

আমাদের একটা নতুন পরীক্ষা করে দেখা যাক। শিক্ষার কিছু কিছু পুরনো ধারণা থেকে আমরা না হয় সরে আসি। আমরা না হয় একটা ব্যাপক ধারণাকে ভিত্তি করি, একটা মহত্তর লক্ষ্যকে সামনে রাখি। ভারতীয় নারীদের উচ্চশিক্ষিত হতেই হবে। শুধু তা-ই নয়—তাদের কয়েকজনকে অন্তত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হতে হবে। মেধাশক্তিতে সেই কয়েকজন যেন পৃথিবীর যে-কোন দেশের নারীর সমতুল্য হয়। আর যে প্রচণ্ড অধ্যাত্মসূর্য ইদানীংকালে গোটা পৃথিবীকে আলোকিত করেছে, তার তেজে সেই নারীদের অধ্যাত্মদীপশিখা যেন প্রজ্জ্বলন্ত হয়ে ওঠে। সেই কয়েকজন নারীর মূলমন্ত্র হবে ত্যাগ ও সেবা। এরকম কয়েকজন নারীই পারে এদেশের

নারী-সমস্যাগুলির সমাধান করে দিতে। অতীতে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির জন্য নারীকে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করতে দেখা গেছে। বর্তমানে কি কয়েকজন মাত্র নারীও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা তার চেয়ে অনেক মহত্তর এই উদ্দেশ্যে শরীর মন সর্বস্ব অর্পণ করবে? স্বামীজী বলতেনঃ 'আমাকে কয়েকটি ছেলে-মেয়ে দাও যারা পবিত্র ও নিঃস্বার্থ। দেখবে, সারা পৃথিবী কাঁপিয়ে দেব।' নারীদের জন্য এই কাজ কোন পুরুষ করতে পারবে না। এই কাজ নারীকেই করতে হবে। এই বিষয়ে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, বলতেনঃ 'আমি কি মেয়ে যে আমি মেয়েদের সমস্যার সমাধান করব? হাত সরিয়ে নাও। মেয়েরা নিজেই তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে।' মেয়েদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও মহিমা সম্বন্ধে তাঁর যে অসীম বিশ্বাস ছিল, এই উক্তি সেকথাই আবার প্রমাণ করে। তাঁর বিশ্বাস ছিল—'প্রতিটি নারীই জগন্মাতার অংশ, মূর্তিমতী শক্তি।' এই শক্তিকে জাগাতেই হবে। যদি নারীদের শক্তি ভালর থেকে মন্দভাবেই বেশী ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়ে থাকে, তাহলে তার কারণ তার উপরে এতদিন অত্যাচার করা হয়েছে। তার পায়ের শৃঙ্খল খুলে পড়লেই নারী তার অন্তর্নিহিত সিংহিনীকে জাগিয়ে তুলবে। যুগ যুগ ধরে সে কষ্ট সহ্য করেছে। তার ফলে সে অর্জন করেছে অসীম অধ্যবসায় ও সহনশক্তি।

যেমন তাত্ত্বিক দিক দিয়ে আমরা এখন আর শিখাই না যে, মানুষ দুঃখ ও পাপের সন্তান, অসাম্যের মধ্যেই তার জন্ম, বরং শিখাই যে, প্রত্যেকেই ভগবানের সন্তান, পবিত্র ও পূর্ণ—ঠিক তেমনিভাবে শিক্ষা সম্পর্কেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি পালটাতে পারি না? ছাত্রদের কি ভাবতে পারি না জ্যোতির তনয়—স্বাধীনভাবে মহানন্দে যে তার উজ্জ্বল ভবিতব্যকে একটু একটু করে উন্মোচন করে চলেছে? তা যদি হয়, তাহলে এই শিক্ষাপদ্ধতি থেকে এক নতুন প্রজাতি জন্ম নেবে—মহান মানব-মানবীদের নিয়ে গড়ে উঠবে এক নতুন শ্রেণী। এতে সবই হবে। শিশুদের জন্য স্কুল, বিধবাদের বাসস্থান, সেবাকেন্দ্র, যতভাবে সেবা ও কাজ করার প্রয়োজন সবই এর দ্বারা সম্ভব হবে। জীবনের প্রতিটি স্তর নতুন জীবন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশে নতুনভাবে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠবে। শিক্ষা নিয়ে এই পরীক্ষা যদি ব্যর্থ হয়, পুরোপুরি ক্ষতি হবে না। কারণ, মানুষের মনে শক্তি, উদ্যোগ, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি গুণ তো জাগবেই। আর যদি সফল হয়—আর অবশ্যই তা হবে—তাহলে লাভ হবে সহস্রগুণ বেশী। সেই লাভ কত বিপুল পরিমাণে হবে এখনই তা বোঝা কঠিন। তবে এই শিক্ষাপদ্ধতিতে যে নারী গড়ে উঠবেন তিনি অবশ্যই হবেন মহামহীয়সী। এরকম কয়েকজন নারী বর্তমান সঙ্কট-মুহূর্তে অবশ্য প্রয়োজন।

আমাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, নারীশিক্ষা-সম্পর্কিত স্বামীজীর চিন্তাগুলিকে সঠিকভাবে যদি কার্যকর করা যায়, তাহলে এমন এক শ্রেণীর নারী গড়ে উঠবে জগতের ইতিহাসে যাদের তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রাচীন গ্রীসের নারীরা যেমন শারীরিক দিক দিয়ে প্রায় নিখুঁত ছিলেন, এই নারীরা তেমনি বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে তাদের পরিপূরক হবেন—করুণাময়ী, প্রেমময়ী, কোমলতায় পূর্ণ, সহিষ্ণুতার মূর্তি, হৃদয়বত্তা ও বুদ্ধিমত্তায় মহান; তবে সবচেয়ে মহান আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে।

স্বামীজী সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী

লিও টলস্টয়

১৮২৮—১৯১০। বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক। তাঁর মহোত্তম উপন্যাস 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'। শতাধিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসটি, অধিকাংশ সমালোচকের মতে, আজ পর্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা ঃ 'আন্না কারেনিনা', 'দি ডেথ অব ইভান ইলিচ', 'মাস্টার অ্যাণ্ড ম্যান', 'রেজারেকশান' ইত্যাদি।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর টলস্টয় একটি চিঠিতে অনেন্দ্র কুমার দত্তকে লেখেন (অনেন্দ্র কুমার দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' গ্রন্থটি টলস্টয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন) ঃ 'আপনার পাঠানো চিঠি ও বইটি পেয়েছি। এজন্য অনেক ধন্যবাদ। বইটি অসাধারণ, এটি পড়ে অনেক শিক্ষালাভ করেছি। মানুষের "আমি"-র প্রকৃত স্বরূপ কি—এই প্রশ্নের দার্শনিক দিকটির আলোচনা অপূর্ব। মানবজাতি জীবনের মহৎ এবং সত্য আদর্শ থেকে বার বার সরে এসেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনও তাকে অতিক্রম করতে পারেনি।'

বিবেকানন্দের প্রথম এই যে বইটি টলস্টয় পড়লেন, পড়ামাত্রই সেই গ্রন্থটি টলস্টয়ের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে এবং এটি চিরদিন তাঁর প্রিয় ছিল।

বিবেকানন্দের রচনাবলী সংগ্রহ করতে টলস্টয় সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ মে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং বন্ধু ডি. পি. ম্যাকোভিটস্কিকে (১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে টলস্টয়ের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সর্বক্ষণের সঙ্গী) বলেন ঃ 'ঈশ্বর, আত্মা, মানুষ, ধর্মীয় ঐক্য ইত্যাদি তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দ বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী।'

টলস্টয় অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বিবেকানন্দের রচনাগুলি পাঠ করেছিলেন। ঐ সমস্ত রচনায় যেসব অংশগুলি তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে সেই অংশগুলি তিনি লিখে নিয়েছিলেন এবং কিছু কিছু লাইনের তলায় দাগ দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত বইগুলি, যতদূর জানা যায়, খুঁজে পাওয়া যায়নি। টলস্টয়ের নিজের দিনলিপিতে এবং ম্যাকোভিটস্কির প্রতিদিনের নোটের মধ্যে এই বইগুলির উপরে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুন টলস্টয় ম্যাকোভিটস্কিকে বলেন ঃ 'আজ সকাল ছটা থেকে আমি বিবেকানন্দের কথা ভাবছি। গতকাল সারাদিন বিবেকানন্দের গ্রন্থ পড়েছি। সেখানে "অন্যায়-প্রতিরোধে হিংসা-আশ্রয়ের যৌক্তিকতা" সম্পর্কে একটা অধ্যায় আছে। এটি অত্যন্ত প্রতিভাদীপ্ত রচনা।'

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন ডি. পি. ম্যাকোভিটস্কি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন ঃ 'গতকাল টলস্টয় স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর তিনটি খণ্ডের মধ্যে একটি খণ্ড সঙ্গে

নিয়ে "হলে" এসেছিলেন।... তিনি বললেন, "অসাধারণ বই। বার বার পড়ার মতো অনেক ভাব বইটিতে রয়েছে।"'

টলস্টয়ের ডায়েরীতে লিখিত ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুনের একটি অংশ থেকে উদ্ধৃতি ঃ

'"তুমি"-র মধ্যে "আমি" যে সম্পূর্ণ লোপ পেতে পারে—বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন—এই প্রথম অনুভব করলাম সেটি সম্ভব ; এই প্রথম অনুভব করলাম ত্যাগের যৌক্তিকতার দিকটি। সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত এই ত্যাগ, কোনও স্বার্থের সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট নয়।... "আমি" ও "আমার" এই ভয়ানক বাসনা থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন, কিন্তু তবুও তা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমিত্ব ত্যাগ যে সম্ভব সেটি আমি এখন—জীবনের শেষ প্রান্তে এসে—উপলব্ধি করতে পারছি। [আমার পক্ষে] এটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়।'

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই টলস্টয় তাঁর দিনলিপিতে লিখলেন ঃ '"ভগবান" বিষয়ে বিবেকানন্দের প্রবন্ধটি পড়লাম। অদ্ভুত, অপূর্ব! এটা অনুবাদ করা প্রয়োজন। আমি নিজে এই সম্পর্কে ভেবেছি। শোপেনহাওয়ারের ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে মতবাদ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের সমালোচনা সর্বাংশে সত্য। শুধু যেখানে তিনি (বিবেকানন্দ) জগতের বস্তুগত বিচার দিয়ে শুরু করেছেন সেইটুকু ঠিক নয়।'

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ আগস্ট তারিখে সমাপ্ত 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' নামক একটি প্রবন্ধে টলস্টয় বিবেকানন্দের মূল্যায়ন করেছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি তাঁর অনেক রচনার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। তিনি মানবসমাজকে পৃথিবীর অন্যান্য মহাপুরুষদের ভাবগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দের ভাবও গ্রহণ করবার উপর জোর দেন।

উল্লিখিত প্রবন্ধে তিনি লেখেন ঃ 'প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানলাভের অনিবার্যতা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্তমানকালে মানবজাতির অগ্রণী চিন্তাবিদ্‌গণের প্রধান দায়িত্ব। তাঁদের কর্তব্য মানুষের কাছে তুলে ধরা যে, বহু পূর্বে এই প্রজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞান মানবজাতি অর্জন করেছিল এবং তা ধর্মের উপদেশ ও ঋষিদের বাণীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। মানুষকে দেখানো ঃ এটা শুধুমাত্র ভারতীয়, মিশরীয়, গ্রীক এবং রোমান মহান ব্যক্তিদের মাধ্যমেই নয়, পরবর্তীকালে কান্ট, শোপেনহাওয়ার, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীদের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছিল।'

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি টলস্টয় বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার তৃতীয় খণ্ডটি একজন ভারতীয়ের কাছ থেকে উপহার পান। ম্যাকোভিটস্কি এ-বিষয়ে তাঁর ডায়েরীতে লেখেন ঃ টলস্টয় এই গ্রন্থটি পড়েছেন এবং বিবেকানন্দের রচনাবলীর অন্য দুটি খণ্ডের মতো এটিও তাঁর অত্যন্ত ভাল লেগেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের রচনার একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা টলস্টয়ের মনে ছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে সমাপ্ত 'শিক্ষা সম্পর্কে' প্রবন্ধে সক্রেটিস, রুশো, কান্ট প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্‌দের পাশাপাশি বিবেকানন্দের নাম তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মে টলস্টয় 'পোসরেদনিক প্রকাশন সংস্থা'র (এই সংস্থা

টলস্টয়ের রচনাবলী প্রকাশ করত) সম্পাদককে বলেন ঃ 'ভারতীয় আধুনিক চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর লেখা প্রকাশ করা উচিত।'

টলস্টয় বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পাঠের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে চলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুন তিনি 'ভেখি' (বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের রাশিয়ার দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ক রচনার সুপরিচিত সংকলন) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন ঃ 'রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, বিবেকানন্দ এবং যীশুর বাণীর মতো সম্পদ যাদের আছে তাদের কাছে "ভেখি" পাঠের কোন সার্থকতা নেই।'

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে টলস্টয়ের জীবনাবসান হয়। জীবনের শেষ বছরটিতে যেন তিনি বিবেকানন্দ রচনাবলী এবং ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি অ্যানি বেশান্ত-এর 'থিয়োজফি অ্যাণ্ড মডার্ন সাইকোলজি' গ্রন্থটি সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে তিনি একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন ঃ 'এঁর (বেশান্তের) বিষয়বস্তু হল যা-কিছু দুর্বল, যা-কিছু ভুল—তা-ই। আর বিবেকানন্দ দাঁড়িয়ে আছেন সত্যের উপর।'

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত চিন্তাবিদ্, রাজনীতিবিদ্ এবং বিপ্লবী জান মাসারিকের (Jan Massaryk) সঙ্গে টলস্টয়ের সাক্ষাৎ হয়। টলস্টয় মাসারিককে বলেছিলেন ঃ বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১—১৯৪১। বিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী, শিক্ষাবিদ্ ও নোবেল পুরস্কারে ভূষিত বিশ্বখ্যাত কবি। এশিয়াবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদের জন্য ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প, উপন্যাস, গীতিনাট্য প্রভৃতি সাহিত্যের সব শাখাতেই তিনি অনায়াসে বিচরণ করেছেন। এছাড়া তিনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রশিল্পী। তাঁর আর এক কীর্তি বোলপুরে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা।

অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।[২]

যদি তুমি ভারতকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জানো। তাঁর মধ্যে সবকিছুই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছু নেই।[৩]

১। দ্রষ্টব্য ঃ টলস্টয় অ্যাণ্ড বিবেকানন্দ—এ. পি. ন্যাচুক-দানিলচুক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৯৮৬

২। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৮৭, পৃঃ ২৬৬

৩। এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোমাঁ রোলাঁকে বলেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্যে দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান।

একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এ তো কোন বিশেষ আচারের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়। ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েছে। তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হতে পারে বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে। সে-অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা।

বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।[৪]

আজ মহাভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর। সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ লইয়া আজ আমাদের এক মহাসম্পূর্ণতাকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। গণ্ডিবদ্ধ থাকিয়া ভারতের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র করিয়া না তুলি।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন মনীষীগণ একথা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামমোহন রায়, রানাডে এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি। ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধনাকে একীভূত করিতে চাহিয়াছেন; ইঁহারা বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান শুধু এক দেশ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে; পৃথিবীতে যে-দেশেই যে-কেহ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন তিনিই আমাদের আপন—তিনি ভারতের ঋষি হউন বা প্রতীচ্যের মনীষী হউন—তাঁহাকে লইয়া আমরা মানবমাত্রেই ধন্য।[৫]

...রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী, ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।[৬]

চরকা কাটা একটা বাহ্যক্রিয়া—এটাকে একটা লৌকিক আচার করে তোলা যেতে পারে। কিন্তু আচার প্রায়ই প্রবল হয়ে বিচারকে উপেক্ষা করে। কোনো একটা অভ্যস্ত দৈহিক কর্মকে যখনি উচ্চ সাধনার মূল্য দেওয়া হয় তখনি সে আন্তর সত্যের চেয়ে বাহ্য আচারকে বড়ো জায়গা দেয়। আমাদের সমাজে তার অনেক প্রমাণ আছে। আরো একটা নতুন আচার যোগ করে আমাদের মনোবৃত্তির জড়তা তাতে বাড়ানো হবে বলে আশঙ্কা করি।

একা একা বসে যাঁরা চরকা কাটেন তাঁরা মনে মনে ভাবতে পারেন যে চরকা কেটে সুতো উৎপাদন করে তাঁরা দেশের ধন বৃদ্ধি করছেন। কিন্তু একথা মনে রাখতে বেশী

স্বামী অশোকানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে রোমাঁ রোলাঁ এই তথ্যটি জানান। স্বামী অশোকানন্দের সূত্রে আমরা এটা জেনেছি। ৪। 'বিশ্বভারতী'র সৌজন্যে

৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৬১২। ('পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে বঙ্গদর্শনে [ভাদ্র ১৩১৫] প্রকাশিত হয়। উদ্ধৃত অংশটি সেখান থেকে নেওয়া।)

৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, ১৩৮৫, পৃঃ ৪৫২

লোকে বেশী দিন পারবে না—ক্রমেই এটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়ে বুদ্ধিকে ম্লান করেই দেবে।

বস্তুত চরকা কাটো একথার মধ্যে কোনো মহৎ অনুশাসন নেই এইজন্যে একথায় পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায় না। আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলেরই মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েচে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেচে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েচে তখনি শক্তি দিয়েচে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ-মনকে বিচিত্র ভাবে প্রাণবান করেচে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে আঙ্গুলকে নয়। ভয় হয় পাছে আচারের সংকীর্ণ অনুশাসন সেই নবোদ্বোধিত তেজকে চাপা দিয়ে ম্লান করে দেয়, কঠিন তপস্যার পথ থেকে যান্ত্রিক আচারের পথে দেশের মনকে ভ্রষ্ট করে।[৭]

শ্রীঅরবিন্দ

১৮৭২—১৯৫০। বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, যোগী ও দার্শনিক। আবাল্য ইংলণ্ডে থেকে পড়াশুনা ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাস। দেশে ফিরে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান। বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলায় ধৃত হবার পর অধ্যাত্মচিন্তায় মনোনিবেশ ও পণ্ডিচেরিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা। বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধের রচয়িতা। অধিকাংশই ইংরেজি ভাষায় লেখা। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'দি লাইফ ডিভাইন'।

একজন অশিক্ষিত হিন্দু যোগী, যিনি আত্মদীপ্ত ভাবোন্মাদ মিস্টিক—যাঁর মধ্যে বিদেশী শিক্ষার সামান্যতম স্পর্শ বা চিহ্ন ছিল না—কলকাতার সর্বোত্তম শিক্ষিত যুবকেরা যখন তাঁর চরণতলে প্রণত হল, তখন যুদ্ধজয় হয়ে গিয়েছে। বিবেকানন্দের সম্বন্ধে তাঁর গুরু বলেছিলেন, তিনি জগৎকে দুহাতে ধরে বদলে দেবার মতো শক্তিমান পুরুষ, সেই বিবেকানন্দের যাত্রা জগতের সামনে প্রথম প্রকাশ্যে দেখিয়ে দিল, ভারত জেগেছে—শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়—জয় করবার জন্য সে জেগেছে।[৮]

যাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) পাদস্পর্শে পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার স্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যাঁহার আবির্ভাবে বহুযুগ সঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত, যে শক্তির সামান্যমাত্র উন্মেষে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে; যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম প্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরূপ; তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন

৭। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃঃ ২৮৫-৮৬। ('চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য' শিরোনামায় প্রকাশিত)

৮। Sri Aurobindo, Vol. 2, Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Pondicherry, 1972, p. 37

নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই একথা আমরা বিশ্বাস করি না—আমাদের বিশ্বাস যাহা তিনি মুখে বলেন নাই, তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতকে, ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলিয়া কিছু দাবি করেন নাই। লোকগুরু তাঁহাকে যেভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা। তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিচার ছিল না—তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণ বীরসাধকভাবে গঠন করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম হইতেই বীর, এটা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন, 'তুই যে বীর রে'! তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে-শক্তি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্যকরজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাবে সাধনা করিতে হইবে। তাহাদিগকে বেপরোয়া হইয়া দেশের কার্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবদ্‌বাণী স্মরণপথে রাখিতে হইবে 'তুই যে বীর রে'![৯]

যীশুখ্রীষ্ট সেন্ট পলকে উপযুক্ত আধার মনে করিয়া প্রথমে তাঁহাকেই গঠিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, সমস্ত ইউরোপ তাঁহার পদতলে। ছবির মতো স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন যে, সেন্ট পল রোমে দাঁড়াইয়া যে ভাব প্রচার করিতেছেন, সেই ভাব সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তেমনি যখন স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সমস্ত ভারত তাঁহার নিকট আসিয়াছে, সমস্ত ভারত তাঁহার পদতলে মস্তক লুটাইতেছে, সমস্ত ভারত তাঁহাকে সর্বস্ব দান করিতে আসিয়াছে। ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাই বারিসিঞ্চনে বর্ধিত করিয়াছিলেন। তাই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে অতি যত্নে গঠিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, ইঁহার দ্বারাই ভারতের এবং সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে। তিনিও ছবির মতো প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন যে, স্বামীজী তাঁহার আদেশ সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করিতেছেন। বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয়-জীবন গঠনকর্তা। তিনিই ইহার প্রধান নেতা। তাই কাল যাহা তাঁহার আদর্শ ছিল, আজ সেই আদর্শ লইয়া ভারতবাসী জীবন-পথে অগ্রসর হইয়াছে।[১০]

৬ চৈত্র রবিবার (১৩১৬) আমরা বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। সে রামকৃষ্ণ নাই, সে বীর তেজস্বী বিবেকানন্দ নাই, কিন্তু তাঁহাদের শক্তি, তাঁহাদের ভাব সমগ্র ভারতকে অমরত্ব দিবার জন্য মহাশক্তি ধারণপূর্বক

৯। ibid., Vol. 4, 1972, p. 239. ('ধর্ম', ১৮শ সংখ্যা, ১৯ পৌষ, ১৩১৬, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)

১০। দ্রষ্টব্য ঃ বিশ্ববিবেক—সম্পাদনা ঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ও শঙ্কর, বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ১৬৬-৬৭। (ধর্ম, ৩০ ফাল্গুন, ১৩১৬ ; 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ')

ছুটিয়াছে। সম্মুখে যাহাকে পাইতেছে, তাহাকে অমৃতবারি-সিঞ্চনে বরণ করিয়া লইতেছে, অতিথির বেশে স্বদেশ মূর্তি ধারণ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতেছে।[১১]

রামকৃষ্ণ কি ছিলেন? মানুষী আধারে প্রকট ভগবান। আর বিবেকানন্দ—মহাদেবের নয়ননিঃসৃত এক দীপ্ত কটাক্ষ। —কিন্তু তাঁর পিছনে ছিল সেই ভাগবত দৃষ্টি যা থেকে উদ্ভূত বিবেকানন্দ, মহাদেব স্বয়ং, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বিশ্বাতীত ওম্।

বিবেকানন্দের প্রভাব এখনো বিপুলভাবে কাজ করে চলেছে আমরা দেখতে পাই—ঠিক জানি না কি রূপে, বলতে পারি না কোথায়, এমন কিছুতে যা এখনো স্পষ্ট নয়; এমন কিছু যা সিংহপ্রতিম, বিরাট, সম্বোধিদীপ্ত; যা সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রবেশ করছে ভারতের মর্মকেন্দ্রে এবং তা দেখে আমরা সোচ্ছ্বাসে বলে উঠি, ঐ দেখ, বিবেকানন্দ এখনো জেগে মাতৃমর্মে, মাতৃসন্তানদের মর্মলোকে।

মাদ্রাজী পণ্ডিতের প্রতি বিবেকানন্দের প্রসিদ্ধ উক্তিটিই ধরো। তাঁর কি একটা কথায় সংশয় প্রকাশ করে পণ্ডিত বলেছিলেন, 'কিন্তু শঙ্কর তো তা বলেন না।' তাতে বিবেকানন্দের জবাব, 'না, আমি বিবেকানন্দ, তা বলছি।' পণ্ডিত একেবারে হতবাক।

'আমি বিবেকানন্দ'—তাঁর এই কথা সাধারণের কাছে হিমালয়প্রমাণ অহমিকার মতো শোনাবে। কিন্তু বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় কিছু ভুয়ো বা ঝুটো ছিল না। আর এ তাঁর অহমিকা নয়, এ একটি অতি মহতের বোধ, যেজন্য তাঁর জীবন, যাঁর প্রতিনিধিরূপে তাঁর সংগ্রাম—তাঁকে কেউ খর্ব বা তুচ্ছ করবে, তা তাঁর সহ্য হত না।[১২]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

১৮৬১—১৯০৭। প্রখ্যাত সাংবাদিক, শিক্ষক ও দেশপ্রেমিক। পূর্বনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। প্রথমে প্রোটেস্টান্ট, পরে ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। দেহত্যাগের দু-মাস আগে আবার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলেতে যান এবং অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে হিন্দুদর্শন ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি যে-কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: দৈনিক 'সন্ধ্যা', সাপ্তাহিক 'স্বরাজ'। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা: 'বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি', 'সমাজতত্ত্ব', 'আমার ভারত উদ্ধার'।

দিন কয়েকের জন্য আমি বোলপুর আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইস্টিশনে পা দিলাম অমনি কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। —শুনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন একখানা ছুরি বিঁধিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে। কেন—তাহার তো অনেক উপযুক্ত বিদ্বান গুরুভাই আছেন—তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন একটা প্রেরণা

১১। তদেব, পৃঃ ১৬৭। (ধর্ম, ১৪ চৈত্র, ১৩১৬; 'জন্মতিথি উৎসব')

১২। তদেব, পৃঃ ১৭০-৭১। (নীরদবরণ 'স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন জয়শ্রী পত্রিকার 'স্বামীজী ও নেতাজী সংখ্যা'য়—পৌষ ১৩৫৯। শ্রীঅরবিন্দের উক্তিগুলি সেখান থেকে সংকলিত)

হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে তুমি ততটুকু কাজে লাগাও—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি-জয় ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে, বিলাত যাইব। আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবি নাই যে, বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবড়ার ইস্টিশনে স্থির করিলাম—বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম—বিবেকানন্দ কে। যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সুদূর সাগরপারে লইয়া যায়—সে বড় সোজা মানুষ নয়। তাহার কিছুদিন পরেই সাতাশটি টাকা লইয়া বিলাতে যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম। অবশেষে বিলাত গিয়া উক্ষপার (Oxford) ও কামব্রজে (Cambridge) বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলাম। বড় বড় অধ্যাপকেরা আমার ব্যাখ্যান শুনিলেন ও হিন্দু অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া বেদান্ত-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। ঐ অধ্যাপকেরা যে-সকল চিঠি আমাকে লিখিয়াছেন তাহা আমি ছাপাই নাই। ছাপাইলে বুঝিতে পারা যাইবে বিলাতে বেদান্তের প্রভাব কিরূপ গভীর হইয়াছিল। আমি সামান্য লোক। আমার দ্বারা যে এতবড় একটা কাজ হইয়া গেল—তাহা আমার কাছে ঠিক একটি স্বপ্নের মতো। এই সমস্তই বিবেকানন্দের প্রেরণাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—অঘটন ঘটিয়াছে—আমি মনে করি। তাই অনেক সময় ভাবি—বিবেকানন্দ কে। বিবেকানন্দ যে প্রকাণ্ড কাজ ফাঁদিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিবেকানন্দের মহত্ত্বের ইয়ত্তা করা যায় না।

আর একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে কলিকাতার হেদোর ধারে আমার দেখা হয়। আমি বলিলাম—ভাই চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন? এস—একবার কলিকাতা শহরে একটা বেদান্ত-বিজ্ঞানের বোল তোলা যাউক। আমি সব আয়োজন করিয়া দিব, তুমি একবার আসরে আসিয়া নামো। —বিবেকানন্দ কাতরস্বরে বলিল—ভবানী ভাই—আমি আর বাঁচিব না (তাঁহার তিরোভাবের ঠিক ছয় মাস পূর্বের কথা)—যাহাতে আমার মঠটি শেষ করিয়া কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারি—তাহার জন্য ব্যস্ত আছি—আমার অবসর নাই। সেই দিন তাহার সকরুণ একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লোকটার হৃদয় বেদনাময় ব্যথায় প্রপীড়িত। কাহার জন্য বেদনা, কাহার জন্য ব্যথা? দেশের জন্য বেদনা, দেশের জন্য ব্যথা। আর্যজ্ঞান আর্যসভ্যতা বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে—তাহার স্থলে যাহা ইতর, যাহা অনার্য তাহাই সূক্ষ্মকে, উদার বস্তুকে, আর্যতত্ত্বকে পরাভূত করিতেছে—আর তোমার সাড়া নাই, ব্যথা নাই। বিবেকানন্দের হৃদয়ে ইহার যন্ত্রণাময় সাড়া পড়িয়াছিল। সেই সাড়া এত গভীর যে, উহাতে মার্কিন ও য়ুরোপের চৈতন্য হইয়াছিল। ঐ ব্যথার কথা ভাবি—বেদনার কথা চিন্তা করি—আর জিজ্ঞাসা করি—বিবেকানন্দ কে! দেশের জন্য ব্যথা কখনও শরীরিণী হয়? যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।[১৩]

স্বামীজী! আমি তোমার যৌবনের বন্ধু—তোমার সহিত কত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি—বনভোজন করিয়াছি—গল্পগাছা করিয়াছি। তখন জানিতাম না যে, তোমার প্রাণে সিংহবল আছে, তোমার হৃদয়ে ভারতের জন্য আগ্নেয় পর্বতভরা ব্যথা আছে।

১৩। স্বরাজ, ২২ বৈশাখ ১৩১৪, পৃঃ ৯৯। ('বিবেকানন্দ কে?')

আজ আমিও আমার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া তোমারই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি।...এই ঘোর সংগ্রামে যখন ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত হইয়া পড়ি—অবসাদ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে—তখন তোমার প্রদর্শিত আদর্শের দিকে দেখি—তোমার সিংহবলের কথা ভাবি—তোমার গভীর বেদনার অনুধ্যান করি—অমনি অবসাদ চলিয়া যায়—কোথা হইতে দিব্যালোক দিব্যশক্তি আসিয়া প্রাণমনকে ভরপুর করিয়া ফেলে।[১৪]

বালগঙ্গাধর তিলক

১৮৪৬—১৯২০। ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম মহান নায়ক ও সুবিখ্যাত রাজনীতিক। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ, আইনজ্ঞ, মারাঠী গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা। ধর্মীয় ভাব-ভাবনায় এবং স্বদেশপ্রেমে তিনি বহুল পরিমাণে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দ দ্বারা প্রভাবিত। তিনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একযোগে 'মারাঠী' ও 'কেশরী' নামে দুখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বিখ্যাত গ্রন্থ ঃ 'গীতারহস্য'।

স্বামী বিবেকানন্দের নাম জানেন না এমন কোন হিন্দু আছেন কিনা সন্দেহ। উনবিংশ শতাব্দীতে জড়বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হয়েছে। এ অবস্থায় ভারতবর্ষের শত সহস্র যুগ-সঞ্চিত অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে অপূর্ব ব্যাখ্যার সাহায্যে উপস্থাপিত করে পাশ্চাত্যের মনীষিমণ্ডলীর কাছ থেকে প্রশংসা এবং শ্রদ্ধা লাভ করা এবং সেই সঙ্গে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জননীস্বরূপা ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব সৃষ্টি করা অতিমানবিক শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। ইংরেজি শিক্ষার সাহায্যে জড়বিজ্ঞানের বন্যা যেভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তার গতিপথ পরিবর্তন করতে অসাধারণ মনীষার প্রয়োজন ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি এই কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু এটা অবিসংবাদিত সত্য যে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের পতাকাটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।...

ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন দেশে হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার এই সুকঠিন দায়িত্ব স্বামী বিবেকানন্দই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী পিছিয়ে গেলে আমরা কেবল শঙ্করাচার্যকেই পাই যিনি আর একটি বিশাল ব্যক্তিত্ব। শঙ্করাচার্য আমাদের ধর্মের পবিত্রতার কথা কেবল মুখেই বলেননি ; এই ধর্মই যে আমাদের শক্তি ও সম্পদ এবং জগতের সর্বত্র এই ধর্মের প্রচার করা যে আমাদের পবিত্র কর্তব্যের অন্তর্গত—একথা তিনি শুধু মুখে বলেই ক্ষান্ত থাকেননি, কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্যের সমান মাপের ব্যক্তি...।[১৫]

বিপিনচন্দ্র পাল

১৮৫৮—১৯৩২। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তাঁর জাতীয়তাবোধের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ধর্মবোধ এবং আধ্যাত্মিকতা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তিনি পুরোধা। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে

১৪। দ্রষ্টব্য ঃ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, প্রথম খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ৩৫১

১৫। কেশরী, ৮ জুলাই ১৯০২। (মারাঠী থেকে অনূদিত)

'বন্দেমাতরম্' নামে দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিটি শাখায় ছিল তাঁর অনায়াস বিচরণ।

বিবেকানন্দ একা নন। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শুধু ভারতবর্ষের নয়, বর্তমান কালের বৃহত্তর পৃথিবীর আধুনিক মানুষের সম্বন্ধ-বিচারে এই দুইজন প্রায় অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্মিলিত হয়ে আছেন। বর্তমান যুগের মানুষ শুধুমাত্র বিবেকানন্দের মধ্য দিয়েই পরমহংসদেবকে বুঝতে পারে, তেমনি আবার বিবেকানন্দকেও তাঁর গুরুর জীবনালোকেই বুঝতে পারা যায়। তাঁর গুরু ছিলেন এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি। অতএব সে-যুগে 'যুক্তিবাদে'র বাঁধা বুলিতে বিভ্রান্ত মানুষের কাছে তিনি অবশ্যম্ভাবীভাবে এক রহস্যময় মানুষরূপে দেখা দিয়েছিলেন। বস্তুত এই যুক্তিবাদের অর্থ, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণস্বরূপ যে ভাবুকতা, তার অভাব ভিন্ন আর কিছু নয়। ভাব আর খেয়াল এক জিনিস নয়। ভাব প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অগম্য এক বোধশক্তি। রামকৃষ্ণের আবির্ভাব যে-যুগে, সে-যুগে ভাবুকতার দৈন্য দেখা দিয়েছিল। কাজেই সে-যুগের নিকট তিনি এক দুর্বোধ্য রহস্য।

পরমহংসদেবের জীবনবেদ ও বাণী এ-যুগের মানুষের বোঝবার উপযোগী ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রচারের ভার বিবেকানন্দের উপর ন্যস্ত হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন সম্প্রদায় বা নামের গণ্ডির মধ্যে ছিলেন না, অথবা অন্যভাবে এটাও বলা চলে যে, তিনি ভারতীয় ও অভারতীয় সব সম্প্রদায় ও নামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন খাঁটি 'সর্বজনীনতাবাদী', কিন্তু তাঁর সর্বজনীনতা বস্তুনিরপেক্ষ সর্বজনীনতা নয়। বিশ্বজনীন ধর্মকে উপলব্ধি করতে তিনি বিভিন্ন ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বর্জন করেননি। সূর্য ও ছায়ার মতো তাঁর কাছে 'শাশ্বত' ও 'বিশিষ্ট' সর্বদা অঙ্গাঙ্গিভাবে বিরাজ করত। সেজন্য জীবন ও চিন্তার অনন্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে তিনি সর্বজনীন সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। গুরুর এই উপলব্ধিকে বিবেকানন্দ আধুনিক 'মানবতা'র বেশ পরিয়েছিলেন।...

সাধারণত দেখা যায় সত্যদ্রষ্টাগণ অতীন্দ্রিয়বাদী হয়ে থাকেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না; যীশুও ছিলেন না, মানুষের আধ্যাত্মিক নেতৃগণের মধ্যে কেউ ছিলেন না। জনসাধারণ তাঁদের বুঝতে পারে না; সবচেয়ে কম বুঝতে পারেন তাঁদের সমকালের পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা। তবুও দর্শন যাকে অন্ধকারে খুঁজে বেড়ায় তাঁরা তাই-ই প্রকাশিত করে যান। যীশুখ্রীষ্টের মতো রামকৃষ্ণ পরমহংসকেও ব্যাখ্যা করার জন্য এবং সে-যুগের মানুষের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দেবার জন্য, একজন ভাষ্যকারের প্রয়োজন ছিল। সন্ত পলের মধ্যে যীশু এইরকম একজন ভাষ্যকার পেয়েছিলেন; বিবেকানন্দের মধ্যে রামকৃষ্ণ তাঁকে লাভ করলেন। অতএব রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপলব্ধির আলোকেই বিবেকানন্দকে বুঝতে হবে।...

বিবেকানন্দের বাণী সাধারণের উপযোগী বৈদান্তিক চিন্তাধারা অবলম্বনে প্রচারিত হলেও আসলে তা আধুনিক কালের মানুষের কাছে তাঁর গুরুর বাণী। প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দের বাণী আধুনিক 'মানবতা'র বাণী। স্বদেশবাসীদের কাছে তাঁর আবেদন

ছিল, 'তোমরা মানুষ হও।'...

সমস্ত ধর্মীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্য মানুষকে তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করা। বিবেকানন্দ যখন তাঁর দেশবাসীদের মানুষ হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন তিনি আসলে এইকথাই বুঝাতে চেয়েছিলেন। দেবতার পূজার সময় ব্রাহ্মণ এই মন্ত্রটি ব্যবহার করেনঃ 'আমি ব্রহ্ম। এছাড়া আমি আর কেউ নই। আমি শোক-তাপের অতীত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত।' পরমহংসদেবের এই বাণীই বিবেকানন্দ বর্তমান পৃথিবীকে দিয়ে গিয়েছেন।...[১৬]

ভারতে কেউ কেউ মনে করেন, ইংলণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি, তা তাঁর হিতৈষী ও ভক্তবৃন্দের অতিরঞ্জিত বর্ণনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম সর্বত্র তিনি এক সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে গিয়েছেন। ইংলণ্ডের অনেক জায়গায় আমি এমন অনেক লোকের সংস্পর্শে এসেছি যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। একথা সত্য যে আমি তাঁর সম্প্রদায়ের লোক নই এবং তাঁর সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আমার মতপার্থক্য আছে, তবুও আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, বিবেকানন্দের প্রভাবে এখানে অনেকের চোখ খুলে গিয়েছে এবং হৃদয় প্রসারিত হয়েছে। তাঁর শিক্ষার গুণেই এখানকার অধিকাংশ লোক আজকাল বিশ্বাস করে যে, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রগুলোর মধ্যে বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলো নিহিত আছে। শুধু যে এই ভাবটি তিনি জাগিয়েছেন তা নয়, ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে তিনি সফল হয়েছেন।

মিঃ হাউইস্ (Mr. Haweis)-এর লেখা 'বিবেকানন্দ-বাদ' ও 'দি ডেড্ পাল্পিট' শীর্ষক প্রবন্ধ হতে আমি যে-উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম, তা হতে সকলে স্পষ্ট বুঝেছেন যে, বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারের ফলেই শত শত ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। বাস্তবিক, এদেশে তাঁর কাজের গভীরতা ও ব্যাপকতা নিচের ঘটনাটি হতে স্পষ্ট বোঝা যাবে।

কাল সন্ধ্যায় লন্ডনের দক্ষিণপ্রান্তে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলায় রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে কোন্ দিকে যাব ভাবছিলাম, এমন সময় একজন ভদ্রমহিলা একটি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে আসলেন—মনে হল আমাকে পথ দেখাবার অভিপ্রায়ে এসেছেন। তিনি আমাকে বললেন, 'মশায়, নিশ্চয়ই পথ খুঁজে পাচ্ছেন না? আমি সাহায্য করতে পারি কি?' তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'কাগজে দেখেছি আপনি লন্ডনে আসছেন। আপনাকে প্রথম দেখামাত্রই আমি আমার ছেলেকে বলছিলাম, "ঐ দেখ—স্বামী বিবেকানন্দ"!' তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরবার জন্য অতি দ্রুত চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, তাঁকে বলবার সময় পাইনি যে, আমি বিবেকানন্দ নই। বিবেকানন্দকে ব্যক্তিগতভাবে না জেনেই তাঁর প্রতি স্ত্রীলোকটির এমন শ্রদ্ধার ভাব দেখে আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। এই মধুর ঘটনাতে

১৬। Prabuddha Bharata, July 1932, pp. 323-25

আমি খুবই তৃপ্তিলাভ করলাম এবং যার দৌলতে এই সম্মান পেলাম সেই গেরুয়া পাগড়ীকে ধন্যবাদ জানালাম।[১৭]

মহাত্মা গান্ধী

১৮৬৯—১৯৪৮। কুড়ি বছর (১৮৯৩—১৯১৪) দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে থেকে অত্যাচারিত ভারতীয় ও স্থানীয় অ-শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে কাজ করেন। শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্ট' পরিচালনা করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংস নীতির প্রবর্তন করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করবার জন্য 'লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন' আরম্ভ করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 'ভারত ছাড় আন্দোলন' শুরু করেন। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে তাঁরই নেতৃত্বে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি দিল্লীতে প্রার্থনাসভায় যাবার সময় এক আততায়ীর গুলিতে তিনি প্রাণ হারান। গান্ধীজীর জীবন, দর্শন ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি 'জাতির জনক'-রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁর আত্মজীবনীঃ 'দি স্টোরি অব মাই এক্সপেরিমেন্ট্স উইথ ট্রুথ'।

আজ (৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১) স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে এখানে (বেলুড় মঠে) এসেছি। তাঁর রচনাবলী আমি অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে অনুশীলন করেছি এবং সেগুলি পাঠ করার পর আমার মাতৃভূমির প্রতি আমার ভালোবাসা সহস্রগুণ বেড়ে গিয়েছে। হে যুবকবৃন্দ! যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ বাস করেছেন এবং শরীর ত্যাগ করেছেন সেই পুণ্যভূমির কিছু মাহাত্ম্য আত্মস্থ না করে তোমরা শূন্যহাতে ফিরে যেয়ো না—তোমাদের কাছে এই আমার আবেদন।[১৮]

জওহরলাল নেহরু

১৮৮৯—১৯৬৪। প্রখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিবিদ্ ও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন সময়ে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক (১৯২৩), সাধারণ সম্পাদক (১৯২৮) এবং মোট সাত বার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট থেকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ 'দি ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া', 'লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার', 'গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্লড্ হিস্ট্রি' ইত্যাদি।

স্বামী বিবেকানন্দ একদিকে যেমন অতীত ভারতের ভাবধারায় অভিস্নাত এবং প্রাচীন ভারতের গৌরবে গৌরবান্বিত, অন্যদিকে তেমনি মানুষের জীবনসমস্যার বিষয়ে আধুনিক মনোভাবাপন্ন। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের মধ্যে তিনি ছিলেন একপ্রকার মিলনসেতু।...

অনন্যসাধারণ পুরুষ। সম্ভ্রম-উদ্রেককারী ব্যক্তিত্ব। সর্বদা মানসিক সমতা রক্ষা করতে সক্ষম। মর্যাদাসম্পন্ন। নিজের এবং নিজের জীবনব্রত সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়। সক্রিয় জ্বলন্ত

১৭। Indian Mirror, 15 February 1898

১৮। Prabuddha Bharata, May 1963, p. 170

শক্তিতে তিনি ভরপুর। ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা সবসময় তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল। হতাশ আদর্শ-ভ্রষ্ট হিন্দু-মানসে তিনি সঞ্চার করেছিলেন শক্তি। তাকে দান করেছিলেন আত্মবিশ্বাস এবং অতীত সম্পদের কিছুটা উত্তরাধিকার।[১৯]

বর্তমানকালের যুবসমাজের কতজন স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনাবলী পড়ে থাকেন, আমার জানা নেই। তবে আমাদের সময়ের অনেকেই যে তাঁর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন—একথা আমি আপনাদের বলতে পারি, এবং আমি মনে করি তাঁর বাণী ও রচনা পাঠ করলে এখনকার লোকেদেরও প্রভূত কল্যাণ হবে ; তা থেকে অনেক কিছুই তাঁরা শিখতে পারবেন। যে-আগুন স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত অন্তঃকরণ জুড়ে প্রজ্বলিত ছিল, যে-আগুন শেষ-পর্যন্ত তাঁর অকালে দেহরক্ষার কারণ হল, সেই আগুনের কিঞ্চিৎ উপলব্ধি সম্ভব তাঁর বাণী ও রচনার অনুশীলনের মাধ্যমে—যেটি আমাদের সময়কার কেউ কেউ করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ের ঐ আগুনের জন্যই...তিনি যা বলতেন তা কোন ফাঁকা বুলি ছিল না। তাঁর বাণীর মধ্যে তিনি তাঁর সর্বসত্তা ঢেলে দিতেন। এইজন্যই তিনি একজন মহান বাগ্মী হতে পেরেছিলেন। বাগ্মীসুলভ পটুতা বা বাক্যবিন্যাসের দ্বারা শুধু নয়, গভীর প্রত্যয় এবং আন্তরিকতার শক্তিতে। তাই তিনি ভারতের বহু মানুষের হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এবং পরবর্তী দুই-তিন প্রজন্মের যুবসমাজ নিঃসন্দেহে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।...

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনাবলী পড়লে, সেগুলোর যে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যটি আপনাদের চোখে পড়বে তা হচ্ছে—সেগুলো একটুও পুরনো নয়। আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর আগে (জওহরলাল নেহরু ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বক্তৃতাটি করেছিলেন) উচ্চারিত হলেও সেগুলো আজও নতুন, আজও প্রাসঙ্গিক। কারণ, তিনি তাঁর বক্তৃতা ও রচনায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার কতগুলো মূল বিষয় ও দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই তাঁর বাণী ও রচনা কখনও পুরনো হবার নয়। আজকে পড়লেও সেগুলো নতুন বলেই মনে হয়। বস্তুত, তিনি আমাদের এমন কিছু দিয়েছেন যার ফলে আমাদের অতীত সম্পদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে একপ্রকার গর্বের মনোভাবেরই সৃষ্টি হয়েছে। তিনি কিন্তু আমাদের ছেড়ে কথা বলেননি। আমাদের দুর্বলতা এবং ভুলত্রুটির কথাও বলেছেন। কোন কিছুই লুকোতে চাননি তিনি, আর সেটা তাঁর উচিতও হত না। আমাদের ভুলত্রুটি অক্ষমতা দূর করতে হবে, তাই তিনি সেগুলো নিয়েও আলোচনা করেছেন। কখনও কখনও তিনি কঠোরভাবে আমাদের কশাঘাত করেছেন। আবার কখনও বা তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন সেইসব মহান আদর্শের প্রতি, অতীত ভারতবর্ষ যে-আদর্শগুলির প্রতিভূস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল ; যে-আদর্শগুলি অবলম্বন করে ভারতবর্ষ তার অধঃপতনের দিনেও স্বীয় মহিমা কিছুটা রক্ষা করতে পেরেছিল।

কাজেই স্বামীজী যা লিখেছেন বা বলেছেন, তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পরেও সেগুলির গুরুত্ব বা আকর্ষণ নিশ্চয়ই অনুভূত হবে এবং সম্ভবত অনাগত বহুকাল ধরে সেগুলি

১৯। The Discovery of India, Meridian Books Limited, London, 1960, p. 338

আমাদের প্রভাবিত করে চলবে। সাধারণ অর্থে রাজনীতিবিদ্ বলতে যা বোঝায়, স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে তা ছিলেন না। তবুও তিনি ছিলেন ভারতের আধুনিক জাতীয় আন্দোলনের একজন স্রষ্টা। আপনারা মনে করলে এর বদলে অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু আমি তাঁকে এইরকমই মনে করি। পরবর্তীকালে যাঁরা জাতীয় আন্দোলনে কমবেশী সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকেই সেই প্রেরণা পেয়েছিলেন। প্রত্যক্ষভাবেই হোক কিংবা পরোক্ষভাবেই হোক, আজকের ভারতবর্ষকে তিনি প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছেন। প্রজ্ঞা, তেজ এবং শক্তির এই যে প্রবাহ স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে উৎসারিত হয়েছে, আমি মনে করি, আজকের তরুণ-তরুণীরা তার সদ্ব্যবহার করতে ভুলবে না।[২০]

সুভাষচন্দ্র বসু

১৮৯৭—?। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। 'নেতাজী' নামে বেশী জনপ্রিয়। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিপুরা কংগ্রেসের এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দেই 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী করে এবং স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখে। তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করে ছদ্মবেশে দেশত্যাগ করেন এবং সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছান। সেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় বিভিন্ন অধিবাসী ও আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন ও আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠন করেন। এই পুনর্গঠিত বাহিনী নিয়ে তিনি ভারত ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন ও ইম্ফলে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন। 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজে'র অভিযান শেষ পর্যন্ত সফল না হলেও পরোক্ষভাবে তা যে ইংরেজদের ভারতত্যাগ ত্বরান্বিত করেছে—একথা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন। কথিত হয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ আগস্ট তাইহোকুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী নিহত হয়েছেন। কিন্তু এই ঘটনার সত্যতা অনেকেই স্বীকার করেন না। সুভাষচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'তরুণের স্বপ্ন', 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল: ১৯২০-৪২'।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তব্যের জন্য বর্তমান গ্রন্থে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের প্রবন্ধ 'যুগনায়ক ও দেশনায়ক: স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' দ্রষ্টব্য।

জাকির হোসেন

১৮৯৭—১৯৬৯। প্রথমে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ও পরে রাষ্ট্রপতি। 'ভারতরত্ন' উপাধিপ্রাপ্ত। বার্লিন থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট। জামিয়া মিলিয়া ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। রাজনীতির লোক হলেও মূলত ছিলেন শিক্ষাবিদ্। গান্ধী অর্থনীতি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক দিক নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন।

ছাত্রজীবনের দিকে তাকালে স্পষ্টই স্মরণ করতে পারি, মহান স্বামী বিবেকানন্দের কিছু কিছু রচনা কিভাবে আমার মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ বইয়ে দিয়েছিল। ঐকালে তাঁর দর্শন বুঝবার সামর্থ্য আমার ছিল না। কিন্তু যথার্থ এক ধর্মপুরুষের উপলব্ধির চরিত্র

২০। Sri Ramakrishna and Vivekananda, Advaita Ashrama, Calcutta, 1960, pp. 4-7

কি হতে পারে, তা অনুভব না করে পারিনি। তাঁর মধ্যে সেই ধর্মের মানুষকে দেখেছিলাম—যিনি ধর্মকে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করেননি; যিনি ধর্মকে ব্যবহার করে এমন সব সঙ্ঘাতশীল গোষ্ঠী তৈরীতে সাহায্য করেননি যেসব গোষ্ঠী নিজেদের সম্বন্ধে আমরাই সত্যের একচেটিয়া দাবিদার এমন ঘোষণা করে সত্যকেই অস্বীকার করে থাকে। তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মাল।

এই তরুণ সন্ন্যাসী, প্রকৃতি যাঁর পৃথিবীবাসের মেয়াদ মাত্র চল্লিশ বৎসরের মতো নির্ধারণ করেছিলেন—বিশ্ব পরিক্রমণ করে ভারতের পরাধীনতার অমাপ্রহরেও ভারতীয় সংস্কৃতির মহিমা তুলে ধরেছেন, জনগণের উত্থানের জন্য অবিরাম কাজ করে গেছেন, জনগণকে দিয়েছেন স্বাধীনতার পথে যাত্রার শক্তি। রামকৃষ্ণ মিশন নামক অপূর্ব সেবাপ্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করেছেন। যে-বিরাট কার্য-পরিকল্পনা তাঁর ছিল, তিনি জানতেন তা সম্পন্ন করতে হলে ব্রতী মানুষদের প্রয়োজন হবে। ব্রত পালনের মনোভাবই মাত্র যথার্থ ফলপ্রদ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্যরা তাঁদের কীর্তির জন্য সত্যই গর্ববোধ করতে পারেন।

তিনি এমন একটি পুরুষ ছিলেন যিনি বেঁচে থাকেনই। তিনি আমাদের মধ্যে আছেন, থাকবেনও ভবিষ্যতে।

আমরা যেন ভুলে না যাই, যে জাগরণের দ্বারা আমাদের বর্তমান জাতি-রাষ্ট্রগঠন সম্ভব হয়েছে, তার মূলে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সর্বজনীন প্রেম, স্বামী বিবেকানন্দের সর্বজনীন ধর্মের প্রাণময় প্রচার, এবং মহাত্মা গান্ধীর সত্য ও অহিংসার দান কম নয়।

কেবল কথার মালা গেঁথে সমস্যা সামলানো যাবে না। স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে সাহসের শিক্ষা নিতে হবে—কিভাবে সমাজসেবার লাইনের উপর দিয়ে নৈতিক বিশ্বাসের ইঞ্জিন চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। ...কাজ কাজ কাজ! নীরব, নিঃস্বার্থ নিবেদিত কাজ! জনগণের ঐহিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পুনর্গঠনের জন্য স্থির অতন্দ্র কাজ।

স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীকে সশ্রদ্ধচিত্তে অনুশীলন করবার পরে আমি এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছি, যেকথা আমি বলেও এসেছি—বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে স্বামীজীর দাবির রূপ ঐপ্রকার। আহা, যদি তিনি আমাদের মধ্যে তখনও থাকতেন! কারণ সেক্ষেত্রে তাঁর অগ্নিময় বিশ্বাসে আমাদের দ্বিধা দগ্ধ হয়ে যেত, এবং তাঁর আহ্বান অগ্রাহ্য করার উপায় থাকত না।[২১]

বিনোবা ভাবে

১৮৯৫—১৯৮২। মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ ভারতে অস্পৃশ্যদের জন্য 'মন্দির-প্রবেশ' আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীকালে তিনি 'ভূদান আন্দোলনে'র সূচনা করেন। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তাঁকে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ শুধুমাত্র আমাদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন করেননি, আমাদের দোষত্রুটিগুলিও দেখিয়ে দিয়েছিলেন।...ভারত তখন তমোগুণে (অজ্ঞতা এবং অজ্ঞানে)

২১। দ্রষ্টব্যঃ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, সপ্তম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ (১৩৯৪), পৃঃ ২৮৮-৮৯

আচ্ছন্ন ছিল এবং দুর্বলতাকে ত্যাগ ও শান্তি বলে ভুল করেছিল। সেজন্য বিবেকানন্দ একথাও পর্যন্ত বলেছিলেন যে, অলসতা ও কর্মবিমুখতার চেয়ে অন্যায় আচরণও শ্রেয়। তিনি মানুষকে তাদের তামসিক অবস্থা সম্বন্ধে এবং তা থেকে মুক্ত হবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন—যাতে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বেদান্তের শক্তিকে নিজের নিজের জীবনেই উপলব্ধি করতে পারে। যাদের কাছে দর্শন ও শাস্ত্র চর্চা বিলাস মাত্র কিংবা অবসর বিনোদনের উপকরণ ছাড়া আর কিছু নয়, তাদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ঐ-ধরনের শাস্ত্রচর্চার চেয়ে ফুটবল খেলা অনেক ভালো। বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন, তার মাধ্যমে তিনি ভারতের আত্মিক শক্তির গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেনঃ 'একই আত্মা সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন। যদি তুমি এটা বুঝতে পারো তাহলে তোমার কর্তব্য সবাইকে তোমার ভাই মনে করা এবং মানবজাতির সেবা করা।' সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল যে, তত্ত্বজ্ঞান (আত্মজ্ঞান) লাভ করবার যদিও সবার সমান অধিকার, তবুও উচ্চনীচের ভেদটা দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণ ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে বজায় রাখাই উচিত। স্বামীজী আমাদের এই সত্যটি দেখিয়ে দিলেন যে, আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে, আমাদের চারপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গে দৈনন্দিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-তত্ত্বজ্ঞানের কোন ভূমিকা থাকে না, সেই তত্ত্বজ্ঞান নিষ্প্রয়োজন এবং অর্থহীন। তাই তিনি আমাদের উপদেশ দিয়েছেন দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তাদের নৈতিক তথা সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে। ('দরিদ্রনারায়ণ' অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত ও নিঃস্ব মানুষকে ঈশ্বরের মূর্ত প্রকাশ হিসেবে দেখা) 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটি বিবেকানন্দের সৃষ্টি, এবং গান্ধীজী এটিকে জনপ্রিয়তা দান করেছেন।[২২]

রোমাঁ রোলাঁ

১৮৬৬—১৯৪৪। বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক ও মনীষী। কর্মজীবনে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প-ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। 'জাঁ-ক্রিস্তফ' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি ছিলেন বিপ্লবী এবং ব্যক্তিত্ববাদী মানবিকতার পক্ষপাতী। মাইকেল-এঞ্জেলো, টলস্টয়, বীঠোফেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি জগদ্বরেণ্য পুরুষদের জীবনী রচনা করেছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন।

তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) ছিলেন মূর্তিমান শক্তি; কর্মই ছিল মানুষের কাছে তাঁর বাণী। বীঠোফেনের মতো তাঁর কাছেও সমস্ত সদ্‌গুণের মূলে ছিল কর্ম।...

তাঁর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর রাজকীয়তা; আজন্ম সম্রাট তিনি। কি ভারতবর্ষে, কি আমেরিকায়, কোথাও এমন কেউ তাঁর পাশে আসেননি, তাঁর সেই রাজকীয়তার প্রতি যিনি সম্ভ্রম প্রদর্শন করেননি।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগোতে কার্ডিনাল গিবন্স ধর্ম-সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন। এই উদ্বোধনী সভায় ত্রিশ বছরের এই সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবক যখন

২২। Prabuddha Bharata, May 1963, pp. 172-73

আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন তাঁর উপস্থিতির পাশে সভার অন্যান্য সভ্যদের কথা মানুষ ভুলে গেল। বিবেকানন্দের দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য, মনোরম মাধুর্য ও প্রশান্ত মহিমা, সম্ভ্রম-জাগানো রূপ, কালো চোখের উজ্জ্বল জ্যোতি, এবং বক্তৃতাকালীন তাঁর সুগভীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অপূর্ব সঙ্গীতময় মূর্ছনা বিপুল সংখ্যক মার্কিন অ্যাংলো-স্যাক্সন শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে ফেলল—যারা তাঁর গায়ের রঙের জন্য তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব নিয়ে সভায় এসেছিল। ভারতবর্ষের এই সৈনিক দ্রষ্টার চিন্তাধারা আমেরিকার বুকে গভীরভাবে দাগ কেটে রাখল।

বিবেকানন্দকে দ্বিতীয় স্থানে কল্পনা করা অসম্ভব। যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তিনি প্রথম স্থানে আসীন।...তাঁকে দেখামাত্রই প্রত্যেকে বুঝতে পারত ঃ ইনি একজন নেতা, একজন ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ ; এমন এক চিহ্নিত ব্যক্তি যাঁর মধ্যে সুস্পষ্ট প্রকাশিত অপরকে পরিচালিত করার শক্তি। একবার হিমালয়ে এক পর্যটক তাঁকে না চিনলেও বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল—বলে উঠেছিল ঃ 'শিব!'...

তাঁর প্রিয় দেবতাই যেন তাঁর কপালে নিজের নামটি লিখে দিয়েছিলেন।...

চল্লিশ বছরেরও কম বয়সে এই মল্লবীর চিতাশয্যা গ্রহণ করেন।...

কিন্তু সে চিতার আগুন আজও নেভেনি। প্রাচীন কালের ফিনিক্স পাখির মতোই তাঁর চিতাভস্ম থেকে নতুন করে ভারতের বিবেক—সেই ঐন্দ্রজালিক পাখি—জেগে উঠেছে। জেগে উঠেছে ভারতের ঐক্যে মানুষের বিশ্বাস। আর জেগেছে ভারতের মহান বাণীতে দেশবাসীর শ্রদ্ধা। এই মহান বাণীর ধ্যান এই প্রাচীন জাতি আর তার অন্তরাত্মায় সেই বৈদিক যুগ থেকেই করে আসছে। ভারতবাসীকে আজ অবশিষ্ট মানবজাতির কাছে এই বাণীর হিসাব দিতে হবে।

কলম্বোতে তাঁর (বিবেকানন্দের) বক্তৃতাগুলো মানুষকে অভিভূত করল।... রামেশ্বরমে তিনি জনসাধারণের কাছে যে-বক্তৃতা দিলেন, তা খ্রীষ্টের বাণীর মতোই শুনাল।...

কিন্তু বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতাগুলো মাদ্রাজের জন্যই ছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এক ধরনের অধীর আগ্রহের মধ্যে মাদ্রাজ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল।...

জনসাধারণের প্রবল প্রত্যাশার প্রত্যুত্তরে তিনি 'ভারতের প্রতি তাঁর বাণী' ঘোষণা করলেন। যেন শঙ্খধ্বনি হল ; যে-শঙ্খধ্বনি রামচন্দ্র, শিব ও কৃষ্ণের দেশকে আবার জেগে উঠতে আহ্বান করল, তার শৌর্যশীল মানস-সত্তাকে, তার অমর আত্মাকে সংগ্রামের জন্য এগিয়ে যেতে বলল। দক্ষ সেনাপতির মতো তিনি তাঁর 'যুদ্ধের পরিকল্পনা' ব্যাখ্যা করে জনসাধারণকে সামগ্রিকভাবে জেগে উঠবার আহ্বান জানালেন ঃ 'হে আমার ভারত! জাগো!'...

'আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য...অন্যান্য সব অর্থহীন দেবতা আমাদের মন থেকে বিদায় নিক। একমাত্র জাগ্রত দেবতা, আমাদের স্বজাতি ; সর্বত্রই তাঁর হাত, সর্বত্র তাঁর পা, সর্বত্র তাঁর কান। তিনি সবকিছুকেই আচ্ছন্ন করে আছেন। অন্যান্য সব দেবতা নিদ্রিত। যে বিরাট ভগবান আমাদের চারদিকে রয়েছেন, তাঁর পুজো না করে আমরা কোন্ অর্থহীন দেবতার পিছনে ছুটবো?...আমাদের চারদিকে যাঁরা আছেন—সেই

বিরাটের পুজোই আমাদের প্রথম পুজো হবে।...এইসব মানুষ ও প্রাণী—এরাই আমাদের ভগবান, এবং আমাদের সর্বপ্রথম উপাস্য আমাদের স্বদেশবাসী...।'

* * *

এই কথাগুলো কী প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করল, তা কল্পনা করুন!...

ঝড় কেটে গেল। দেশের উপর দিয়ে বয়ে চলল জল ও আগুনের বন্যা। সেইসঙ্গে এল আত্মার শক্তির কাছে, মানুষের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা ভগবান এবং তাঁর অনন্ত সম্ভাবনার কাছে দুর্জয় এক আবেদন! আমার চোখে ভেসে উঠছে প্রাচ্যের এই ঋষির সেই ঊর্ধ্ববাহু-মূর্তি—ঠিক যেন ল্যাজারাসের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রেমব্রান্টের ভাস্কর্যের যীশুমূর্তি : মৃতকে আদেশ করছেন তিনি উঠে দাঁড়াতে, নবজীবনের আস্বাদ গ্রহণ করতে, আর তাঁর শৌর্যময় ভঙ্গিমা থেকে সঞ্জীবনী শক্তির তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।...

কিন্তু মৃত কি জাগল? তাঁর বাণীর ধ্বনিতে রোমাঞ্চিত ভারত কি তার এই অগ্রদূতের প্রত্যাশায় সাড়া দিল? তার উদ্দাম উদ্দীপনা কি কাজে পরিণত হল? ঐ সময়ের জন্য মনে হল, প্রায় সম্পূর্ণ আগুনই বুঝি ধোঁয়ায় হারিয়ে গেছে। দুবছর বাদে বিবেকানন্দ অত্যন্ত তিক্তভাবে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর বাহিনী গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় তরুণদলের ফসল ভারতভূমি থেকে ওঠেনি। যে-জাতি স্বপ্নে সমাধিস্থ, কুসংস্কারে শৃঙ্খলিত, সামান্যতম বিরুদ্ধতার মুখেই ভেঙে পড়তে অভ্যস্ত এক মুহূর্তেই সেই জাতির অভ্যাসগুলো বদলে দেওয়া কি সম্ভব? কিন্তু বিবেকানন্দের কঠোর চাবুকের আঘাতে এই প্রথম সে তার গভীর নিদ্রার মধ্যেও পাশ ফিরে শুল...। সেদিন থেকে এই অতিকায় কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙার শুরু। বিবেকানন্দের মৃত্যুর তিন বছর পরে তাঁর বংশধরেরা যদি বাংলার বিদ্রোহ এবং তিলক ও গান্ধীর আন্দোলনের সূচনা দেখে থাকেন, ভারত যদি আজ জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ কাজের মধ্যে আপনার সুনির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করে থাকে, তবে তার জন্য সে প্রথম প্রেরণা পেয়েছিল মাদ্রাজের সেই শক্তিময় আহ্বানেই : 'ল্যাজারাস, উঠে এস।'

শক্তির এই বাণীর দ্বিবিধ অর্থ ছিল : একটি জাতীয়, অন্যটি বিশ্বজনীন। অদ্বৈতবাদী এই মহা সন্ন্যাসীর কাছে বিশ্বজনীন অর্থটিই বেশী প্রাধান্য লাভ করলেও অন্য অর্থটিই ভারতের পেশিগুলিকে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তুলল।

* * *

তাঁর কথাগুলো ছিল সঙ্গীতের মতো; বীঠোফেনের মতো সেগুলোর বাক্যাংশের বিন্যাস, আর হ্যাণ্ডেলের কোরাসের মতো প্রাণ-মাতানো ছন্দ। তাঁর এইসব কথা ছড়িয়ে আছে ত্রিশ বছর আগে লেখা (এই কথাগুলি রোমাঁ রোলাঁ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছেন) বইগুলোর মধ্যে। কিন্তু তবুও যখনই আমি সেগুলো পড়ি, আমার সারা শরীর দিয়ে যেন চকিতে তড়িৎস্পর্শের মতো শিহরণ বয়ে যায়। তাহলে কথাগুলো যে-সময় এই

বীরের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, সেই মুহূর্তে সেগুলো কী শিহরণ, কী উন্মাদনারই না সৃষ্টি করেছিল!

নিষ্ফলা চিন্তার ভিত্তিহীন চোরাবালিতে ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী ধরে ডুবে ছিল। তার একজন সন্ন্যাসীই তা থেকে ভারতবর্ষকে টেনে তুললেন। তার ফলে অতীন্দ্রিয়বাদের ভাণ্ডারে এতদিন যে-শক্তি সুপ্ত ছিল, তা সমস্ত বাধার বাঁধ ভেঙে তরঙ্গের পর তরঙ্গে কর্মের রূপ ধরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এইভাবে যে প্রচণ্ড শক্তি মুক্তিলাভ করেছে, তার সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের সচেতন থাকা উচিত।

জগৎ তার মুখোমুখি দেখছে এক জাগ্রত ভারতকে। বিশাল অন্তরীপ জুড়ে শায়িত ভারতবর্ষ যেন তার বিপুল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালিত করে তার বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্র করে আনছে। এই নবজাগরণে গত শতাব্দীর তিন পুরুষ ধরে নেতৃস্থানীয়েরা যে ভূমিকাই গ্রহণ করুন না কেন (তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি, প্রকৃত অগ্রদূত যিনি, তিনি হলেন রামমোহন রায়) চূড়ান্ত তূর্যনিনাদ কিন্তু হয়েছিল কলম্বো এবং মাদ্রাজে—বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলিতে।

তাঁর যাদুমন্ত্র ছিল ঐক্যের। এই ঐক্য—ভারতের প্রত্যেক নরনারীর ঐক্য (সেইসঙ্গে বিশ্বের ঐক্যও); স্বপ্ন, কর্ম, যুক্তি, প্রেম—সমস্ত মানস-শক্তির ঐক্য; এই ঐক্য—ভারতের অসংখ্য জাতির ঐক্য—যাদের সহস্র ভাষা, শত-সহস্র দেবতা; কিন্তু তা সত্ত্বেও যে জাতিগুলির রয়েছে একটি সাধারণ ধর্মীয় কেন্দ্র যা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভারত পুনর্গঠনের মূল শক্তি।

এই ঐক্য হিন্দুধর্মের সহস্র সম্প্রদায়ের ঐক্য। ধর্মীয় চিন্তার মহাসমুদ্রে অতীত ও বর্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যত নদী এসে মিশেছে, তাদের সকলের ঐক্য। কারণ—আর এখানেই নিহিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জাগরণের সঙ্গে রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজের জাগরণের পার্থক্য—ভারত এখন পাশ্চাত্যের এই উদ্ধত সভ্যতার প্রাধান্যকে অস্বীকার করছে। সে তার নিজস্ব চিন্তাগুলোকে এখন রক্ষা করতে চায়। দৃঢ় পদক্ষেপে সে তার যুগব্যাপী অতীত ঐতিহ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সেই ঐতিহ্যের একটুও সে আর ত্যাগ করতে চায় না। সে তার ঐতিহ্যের অংশ দিয়ে জগৎকে উপকৃত হতে দেবে এবং বিনিময়ে গ্রহণ করবে তাকে, পাশ্চাত্য তার বুদ্ধির জয়যাত্রায় যা অর্জন করেছে। কোন অসম্পূর্ণ বা আংশিক সভ্যতার প্রাধান্যের যুগ চলে গিয়েছে। এশিয়া ও ইউরোপ, এই দুই অতিকায় পুরুষ, এই সর্বপ্রথম সমান মর্যাদার সঙ্গে পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। তারা যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে তারা একসঙ্গে কাজ করবে এবং তাদের যৌথ পরিশ্রমের সুফল বিশ্ববাসী একসঙ্গে ভোগ করবে।

এই 'মহত্তর ভারত', এই নতুনতর ভারত—যার বিকাশের কথা রাজনীতিক ও পণ্ডিতরা...আমাদের কাছে এতদিন লুকিয়ে এসেছেন এবং যার আশ্চর্যজনক প্রভাব এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—রামকৃষ্ণের সত্তায় তা পরিপূর্ণ হয়েছে। পরমহংস এবং যে-বীর পরমহংসের চিন্তাকে কর্মে রূপদান করেছিলেন—তাঁদের যুগল নক্ষত্র বর্তমানে ভারতকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করছে। তাঁদের উষ্ণ জ্যোতি ভারতের মাটির মধ্যে ময়ানের মতো কাজ করে তাকে উর্বর করছে। ভারতের বর্তমান নেতারা—মনীষীদের

রাজা, কবিদের রাজা এবং মহাত্মা—অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী—এই 'রাজহংস' ও 'ঈগলে'র পক্ষপুটে, এই যুগল নক্ষত্রের আলোকে বিকশিত পুষ্পিত ও ফলবান হয়েছেন। অরবিন্দ এবং গান্ধী প্রকাশ্যেও একথা স্বীকার করেছেন।...

যাঁর গ্যেটের মতো প্রতিভা ভারতের সব নদীর মিলনস্থলে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একথা ধরে নেওয়া চলে যে, তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের (এটা তাঁর মধ্যে তাঁর পিতা মহর্ষি-কর্তৃক সঞ্চারিত হয়েছিল) এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নববেদান্তবাদের দুটি ধারা মিলিত ও সমন্বিত হয়েছিল। উভয়ের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে অথচ উভয় থেকেই মুক্ত থেকে তিনি তাঁর মানসলোকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সার্থক মিলন ঘটিয়েছিলেন। সমাজ ও জাতির দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব চিন্তাগুলোকে প্রকাশ্যভাবে সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিলেন—আমার যদি ভুল না হয়—১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাকালে, অর্থাৎ বিবেকানন্দের দেহরক্ষার চার বছর পরে। বিবেকানন্দের মতো একজন অগ্রদূতের প্রভাব যে তাঁর চিন্তাজগতের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা নিঃসন্দেহ।

* * *

গান্ধীর মেজাজটি রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের বিপরীতধর্মী। কিন্তু সম্প্রতি আমি আনন্দিত হয়ে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি তাঁর 'আন্তর্জাতিক মৈত্রী সঙ্ঘে'র বন্ধুদের কাছে ধর্মীয় গ্রহীষ্ণুতার বিশ্বজনীন মূলনীতির দিকটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যেহেতু তাঁরা ধর্মপ্রচারের পবিত্র উৎসাহটা বড্ড বেশী দেখাচ্ছিলেন। বিবেকানন্দ ঐ মূলনীতির কথাই প্রচার করেছিলেন। গান্ধীজী বলেছেন : '...হিন্দুধর্ম আমার কাছে যেমন প্রিয়, প্রতিটি ধর্মই আমার কাছে প্রায় তেমনই প্রিয়। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আমার নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার অনুরূপ। অতএব, ধর্মান্তরিতকরণের চিন্তা অসম্ভব। এই মৈত্রীসঙ্ঘের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একজন হিন্দুকে আরও ভাল হিন্দু হতে, একজন মুসলমানকে আরও ভাল মুসলমান হতে, একজন খ্রীষ্টানকে আরও ভাল খ্রীষ্টান হতে সাহায্য করা।'...

মানবজাতির ক্রমবিকাশের এই স্তরে, অন্ধ এবং সচেতন এই দ্বিবিধ শক্তিই সমস্ত প্রকৃতিকে এই নীতির দিকে টানছে—'হয় সহযোগিতা নয় মৃত্যু'। এখন একান্তভাবে প্রয়োজন মানুষের চেতনাকে ঐ শিক্ষার সাহায্যে পরিপুষ্ট করে তোলা, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ অপরিহার্য নীতিটি একটি স্বতঃসিদ্ধ মন্ত্রে পরিণত হয় যে—প্রত্যেক ধর্মের বাঁচবার সমান অধিকার আছে; প্রত্যেক মানুষেরই দায়িত্ব এবং কর্তব্য প্রতিবেশী যাকে শ্রদ্ধা করে, তাকে শ্রদ্ধা করা। আমার মতে, গান্ধীজী যখন অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে এই কথাগুলোই বলছিলেন, তখন তিনি নিজেকে রামকৃষ্ণেরই উত্তরাধিকারীরূপে প্রকাশ করেছিলেন।

আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি এই শিক্ষাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ না করে পারেন। এই কথাগুলোর লেখক তার সমস্ত জীবন ধরে এই উদার আদর্শটি উপলব্ধির

জন্য অস্পষ্টভাবে চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভব করছে যে, তার ঐ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার মধ্যে বহু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে! গান্ধীর এই মহান শিক্ষা তাকে ঐ লক্ষ্যের পথে সাহায্য করেছে বলে সে কৃতজ্ঞ। বস্তুতপক্ষে, ঐ এক শিক্ষাই বিবেকানন্দও দিয়ে গেছেন; এবং আরও বেশী করে যিনি তা দিয়েছেন, তিনি রামকৃষ্ণ।[২৩]

উইল ডুরান্ট

১৮৮৫—১৯৮১। আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক, দার্শনিক, লেখক ও শিক্ষাবিদ্। তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দশ খণ্ডে রচিত 'দি স্টোরি অব সিভিলাইজেশন'।

বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত হিন্দু ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের যে-কোন জনের মতবাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন একটি মতবাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশে প্রচার করেছেন:

'আমরা চাই সেই ধর্ম যা মানুষ তৈরী করে...দুর্বলকারী অতীন্দ্রিয়বাদগুলো পরিত্যাগ কর, সাহসী হও...পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের জন্য...অন্যান্য সব অর্থহীন দেবতা আমাদের মন থেকে বিদায় নিক। একমাত্র দেবতা যিনি জাগ্রত সে আমাদের জাতি, সর্বত্র তাঁর হাত, সর্বত্র তাঁর পা, সর্বত্র তাঁর কান; তিনি সর্বব্যাপী...। আমাদের চারদিকে যাঁরা আছেন তাঁদের পূজা সর্বাগ্রে প্রয়োজন...। এঁরাই আমাদের ভগবান, এঁরা সকলে—মানুষ এবং ইতর জীব-জন্তুরা; এবং প্রথম আমাদের যে দেবতাদের পূজা করতে হবে তাঁরা হলেন আমাদের স্বদেশবাসী।'

গান্ধীজী প্রকৃতপক্ষে এই আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন।[২৪]

সি. রাজাগোপালাচারী

১৮৭৯—১৯৭২। বিশিষ্ট ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ভারতীয় রাজ্যপাল। তারপর ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জওহরলাল নেহরু মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী। অল্পদিন পরে নেহরু কংগ্রেসের সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং 'স্বতন্ত্র পার্টি'র প্রতিষ্ঠা। তিনি মহাভারতের একটি জনপ্রিয় সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছেন।

আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে যে-কেউ স্পষ্ট দেখতে পাবে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত ঋণী! ভারতের আত্মমহিমার দিকে ভারতের নয়ন তিনি উন্মীলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি রাজনীতির আধ্যাত্মিক ভিত্তি নির্মাণ

২৩। The Life of Vivekananda and the Universal Gospel, Advaita Ashrama, Calcutta, 1970, pp. 4-7, 106-14, 146, 286-89, 307-10

২৪। The Story of Civilization : Our Oriental Heritage, Vol. I, Simon and Schuster, New York, 1954, p. 618

করেছিলেন। আমরা অন্ধ ছিলাম, তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক,—আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা।[২৫]

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি না থাকলে আমরা আমাদের ধর্ম হারাতাম এবং স্বাধীনতাও লাভ করতে পারতাম না। আমাদের সবকিছুর জন্য তাই আমরা বিবেকানন্দের কাছে ঋণী। তাঁর বিশ্বাস, সাহস এবং প্রজ্ঞা আমাদের চিরকাল অনুপ্রাণিত করুক, যাতে তাঁর কাছ থেকে যে-সম্পদ আমরা লাভ করেছি, তাকে সযত্নে রক্ষা করতে পারি।[২৬]

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

১৮৮৮—১৯৭৫। বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক ও রাজনীতিক। ধর্ম ও দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে মহীশূর, কলকাতা এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত, ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'অ্যান আইডিয়ালিস্ট ভিউ অব লাইফ', 'ইস্টার্ন রিলিজিয়নস্ অ্যাণ্ড ওয়েস্টার্ন থট' ইত্যাদি।

আজ আমরা এক মহা সঙ্কটের সম্মুখীন। শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও এ এক সঙ্কটময় অধ্যায়। অনেকের ধারণা আমরা সর্বনাশের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি। জীবনের মূল্যবোধ বিকৃত, নৈতিক মান অবনমিত, পলায়নী মনোবৃত্তি সর্বত্র। সর্বজনীন উন্মত্ততায় আমরা আক্রান্ত। —মানুষ এইসব সমস্যার কথা ভাবে আর হতাশা, নৈরাশ্য এবং উপায়হীনতায় অবসন্ন হয়ে পড়ে। আমাদের সামনে আজ এছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু মানুষের আত্মার প্রতি এই অবিশ্বাস বস্তুত মনুষ্যত্বের মর্যাদার প্রতি ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা; মানব-প্রকৃতির অবমাননা। কারণ, বিশ্বজগতে যত বড় বড় পরিবর্তন ঘটেছে, মানব-প্রকৃতিই তো সেগুলো সম্ভব করে তুলেছে। যদি বিবেকানন্দের কোন বাণী এখন আমাদের স্মরণ করতে হয় তা হল আমাদের আধ্যাত্মিক মহিমার প্রতি নির্ভরতার জন্য তাঁর সেই আহ্বান। ...মানুষের মধ্যে অফুরন্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ নিহিত আছে। মানুষের আত্মাই সর্বোচ্চ, মানুষ অদ্বিতীয়, অপূর্ব। জগতে কোন সমস্যা বা বিপদই অবশ্যম্ভাবী কিংবা অনিবার্য নয়। মানুষ আমরা চরম বিপদ এবং অক্ষমতার সম্মুখীন হলেও তাকে কাটিয়ে আসতে পারি। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, আমরা যেন আশা না হারাই। বিবেকানন্দ আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে আশ্রয় দিয়েছেন, দুঃখের মধ্যে দিয়েছেন আশা, হতাশার মধ্যে সাহস।[২৭]

২৫। দ্রষ্টব্য: বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৯৯

২৬। Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume, Calcutta, 1963, p. xiii

২৭। ibid., p. x

ই. পি. চেলিশেভ

১৯২১—। সোভিয়েত রাশিয়ার একজন অগ্রগণ্য ভারততত্ত্ববিদ্। মস্কোর ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের ভূতপূর্ব অধিকর্তা। সোভিয়েত রাশিয়ার সায়েন্স অ্যাকাডেমির অ্যাকাডেমিশিয়ান, সোভিয়েত রাইটার্স ইউনিয়নের সদস্য। জওহরলাল নেহরু শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত। 'কমিটি ফর কম্প্রিহেনসিভ স্টাডি অব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মুভমেন্ট'র তিনি অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট। মস্কোর বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট।

সোভিয়েত রাশিয়ায় বিবেকানন্দ বেশ কিছুকাল থেকেই একটি জনপ্রিয় নাম। সোভিয়েত রাশিয়ায় আমার মতো বহু মানুষ আছেন যাঁরা বিবেকানন্দকে ভালবাসেন, বিবেকানন্দের লেখা ভালবাসেন। কত সহজ অথচ কত বলিষ্ঠ তাঁর লেখা। আর মানুষের প্রতি কী গভীর দরদ! প্রায় নব্বই বছরের পুরনো হলেও তাঁর লেখা আজও সমান তেজোদীপ্ত, সমানভাবে প্রেরণাপ্রদ। বিবেকানন্দ সম্পর্কে আরও বেশী করে জানার আগ্রহ এবং কৌতূহল আমার দেশবাসীর মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে। আমরা মনে করি, বিবেকানন্দের চিন্তা, তাঁর আদর্শ, তাঁর রচনা শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র বিশ্বের সম্পদ।

আমাকে এ-দেশের এমন একজন যথার্থ মার্কসবাদীর নাম বলুন বিবেকানন্দ যাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়? আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে প্রস্তুত। আমার যেসব মার্কসবাদী বন্ধু বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন না, তাঁরা হয় বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু জানেন না, বিবেকানন্দের বই তাঁরা পড়েননি, অথবা অজ্ঞতাবশত বিবেকানন্দকে তাঁরা নিছক একজন ধর্মীয় সংগঠক হিসেবে ধরে নিয়ে বসে আছেন।

বিবেকানন্দের রচনাবলী আমি খুব ভালভাবে পড়েছি এবং তার উপর পড়েছি তাঁর কয়েকখানা প্রামাণিক জীবনী। তার ভিত্তিতে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, বিবেকানন্দকে যদি শুধুমাত্র একজন তথাকথিত ধর্মীয় প্রচারক হিসেবেই দেখা হয়, তাহলে তা হবে একটা বিরাট ভ্রান্তি। সাধারণ অর্থে একজন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা বলতে যা বোঝায়, বিবেকানন্দ কিন্তু তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ব্যাপক ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্মের পরিধি। তিনি ছিলেন শান্তি, সমন্বয় এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান 'প্রফেট'। তিনি ছিলেন মৌলিক ভাবনাসম্পন্ন একজন চিন্তানায়ক, স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন একজন উদার মানবপ্রেমী। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক দেশপ্রেমিক, এক বরেণ্য গণতন্ত্রপ্রেমী এবং এক মহান মানবতাবাদী। তিনি তাঁর দেশবাসীকে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিনাশ চাইতেন সামাজিক অন্যায়ের, অবসান চাইতেন সকল রকম শোষণের—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়। সর্বপ্রকার বিশেষ অধিকার ও সুবিধাবাদের বিরোধী ছিলেন তিনি। সোভিয়েত দেশের মানুষের কাছে বিবেকানন্দ তাই এত জনপ্রিয়। তিনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সর্বহারাদের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রবাদী বলেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন শোষণমুক্ত, শ্রেণীহীন সচ্ছল এক নতুন

সমাজ প্রতিষ্ঠার। অবশ্য এই কাজ করতে গিয়ে তিনি ধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন হাতিয়ার হিসেবে।...

সে যাই হোক, এই নীতির সঙ্গে কম্যুনিস্টদের কোন বিরোধ থাকতে পারে না। লক্ষ্য যদি এক হয়, তাহলে মতের ভিন্নতা আপত্তির কারণ হতে পারে না। দেশ কাল অবস্থা ভেদে মতের পার্থক্য থাকতেই পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক। আর ভারতবর্ষ? তার মাটিতেই তো ধর্ম। তাই বিবেকানন্দের মতো বিচক্ষণ সমাজনায়ক যদি ধর্মকে ভিত্তি করে নিপীড়িত, শোষিত, অবহেলিত মানুষদের সামনের সারিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, তাতে দোষ কোথায়, বিরোধের অবকাশ কোথায়?...

তথাকথিত যে-ধর্মকে মার্কস-লেনিন নিন্দা করেছেন, তাকে তো বিবেকানন্দও নিন্দা করেছেন। সেটা হল ধর্মের নামে, অর্থাৎ ধর্ম বলে যা চলে তা—প্রীস্টক্র্যাফ্‌ট—পুরোহিততন্ত্র। সেটা তো সত্যিই শোষণের হাতিয়ার—কি ভারতবর্ষে, কি অন্য দেশে। বিবেকানন্দ যাকে ধর্ম বলে প্রচার করেছেন তা হল মানবতাবাদ, মানুষের প্রতি দরদ, মানুষের প্রতি ভালবাসা। বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল গভীর মানবপ্রেম।

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ—আধ্যাত্মিকতার দেশ। মার্কসবাদী হিসেবে আমি মনে করি, যে-কোন দেশের বাস্তব পরিস্থিতির চেহারা একজন কম্যুনিস্টের যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে যদি ধর্মীয় ভাবাবেগ স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান থাকে তা অনুধাবন করা উচিত। একজন প্রকৃত কম্যুনিস্টের বোঝা উচিত, তথাকথিত ধর্ম যেমন প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি যথার্থ ধর্মীয় চেতনা মানুষকে কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ করতেও পারে।

আসলে ধর্মের দুটো দিক আছে—একটা ইতিবাচক এবং অপরটি নেতিবাচক। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের ইতিবাচক দিকটিই বেছে নিয়েছিলেন। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উগ্র সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-বিভেদ বাড়িয়ে তোলে। শুধু ধর্মের ব্যাপারেই নয়, বিবেকানন্দের চিন্তা ও পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও নেতিবাচক কিছু স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন। তাই বিবেকানন্দকে এবং তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমরা প্রচলিত অর্থে নিছক ধর্মনেতা মাত্র বলে ভাবি না। বিশ্লেষণধর্মী কোন গবেষকের কাছেই তাঁদের সেভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। তাঁরা যেসব ধর্ম-উপদেশ প্রচার করেছেন সেগুলির সঙ্গে কোন পরিণত সমাজসংস্কারকের নীতির কোন পার্থক্য নেই, কোন যথার্থ মানবতাবাদী চিন্তাবিদের মতের কোন অমিল নেই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলছেন—'খালি পেটে ধর্ম হয় না', 'যার হেথায় নেই, তার হোথায়ও নেই' আর তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন: 'আমি সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না যে-ধর্ম বিধবার অশ্রু মোছাতে পারে না, পারে না ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিতে'; বলছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কি একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো'; বলছেন, 'জীবন্ত দেবতা মানুষের রূপ ধরে তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, তার সেবাই তোমার ধর্ম।' কোন দেশের কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মগুরুর মুখে কোন কালে এরকম কথা কেউ

শুনেছে? আমার মনে হয়, মার্কসীয় ডায়ালেক্টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ এদিক দিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম-দর্শনের বড় কাছাকাছি।...

বিবেকানন্দ রাশিয়ায় না গিয়েও বুঝেছিলেন সেখানে বিপ্লবের পটভূমি তৈরী এবং সেখানকার নিপীড়িত ও শোষিত জনগণ স্বৈরাচারী জার শাসনের উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সামাজিক কাঠামোর আসছে এক বিরাট পরিবর্তন আর সে পরিবর্তনের নেতৃত্ব আসবে প্রথম রাশিয়া থেকেই। বিবেকানন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা বলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর সেকথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েত জনগণ তাই বিবেকানন্দের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবান। বিবেকানন্দ তাই তাদের বড় কাছের মানুষ।

বিবেকানন্দ কোন বুজরুকিকে প্রশ্রয় দিতেন না। বেদান্তের ধর্মীয় দার্শনিক ভাবনাকে আত্মীকরণ করে তাকে নতুন যুগের প্রয়োজন এবং অবস্থার সঙ্গে উপযোগী করে উপস্থাপিত করেছিলেন তিনি। তাঁর বেদান্তের নাম দিয়েছিলেন তিনি 'প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত'। কম্যুনিস্টরা বেদান্তের অতীন্দ্রিয়বাদকে বুঝতে পারেন না। কিন্তু বিবেকানন্দের প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই, বরং সাযুজ্যই আছে।

বিবেকানন্দকে একদল ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদী বলে চিহ্নিত করেন, আর একদল বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে তাঁকে মার্কসবাদী আখ্যা দেন। আমার মতে, স্বামী বিবেকানন্দ এর কোনটাই নন। মার্কসের দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল কিনা সেটা বিতর্কের বিষয়। তবে পরিচয় থাকা অসম্ভব নাও হতে পারে। তবে অন্যান্য ইউরোপীয় সমাজদার্শনিকদের ভাবনার সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল তার প্রমাণ আছে। কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁর দর্শন গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজের মৌলিক চিন্তার ভিত্তিতে। শ্রমজীবী মানুষের জাগরণের ব্যাখ্যা তিনি তাঁর নিজের মতো করেই দিয়েছেন, সমাজের ব্যাখ্যাও তাঁর নিজস্ব। সামাজিক সমস্যা সমাধানের যেসব সূত্র তিনি দিয়েছেন সেগুলি আমাদের মতে ভাববাদী (idealistic)। সেসব বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বিবেকানন্দের পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব, তিনি যেভাবে ভেবেছেন বা বিশ্লেষণ করেছেন সেভাবে কোন বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ভাবেননি বা ব্যাখ্যা করতে পারেননি। তাঁর ধর্মের মধ্যে ভাববাদী যে-অংশটুকু তার সমর্থকও আমরা নই ঠিকই, কিন্তু তাকে উপেক্ষা অথবা অস্বীকারও আমরা করি না। কারণ একথা আমি আগেই বলেছি, দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ধর্মের ভাববাদ যদি তাঁর দেশের মানুষকে কল্যাণের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে অস্বীকার করব কি করে? আসল কথা হল মানুষের প্রতি মানুষের মমতা, সমাজের কল্যাণ এবং অবহেলিতের উত্থান। সেখানেই মার্কস ও বিবেকানন্দ উভয়েই একই ভাবনার শরিক, সেখানেই তাঁদের মিলনসূত্র।...

বিবেকানন্দের মানবতাবাদের ধারণার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় মতাদর্শের কোন মিলই নেই। সুতরাং প্রভাবের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। খ্রীষ্টীয় মতাদর্শ মানুষকে কর্মহীনতার দিকে নিয়ে যায়, মানুষকে ভগবানের করুণাপ্রার্থী ভিক্ষুকে পরিণত করে। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দের মানবতাবাদ মানুষকে কর্মের জোয়ারে ছুটিয়ে নিয়ে চলে, লড়াই করতে

প্রেরণা যোগায়। বিবেকানন্দ তাঁর মানবতাবাদের ধারণায় মানুষের মর্যাদাকেই উঁচু করে তুলে ধরেছিলেন। সেই চিন্তার মধ্যে তাঁর ব্রহ্মচেতনাই সম্পৃক্ত ছিল। তিনি তাঁর ধর্মচেতনা অথবা মানবতাবাদের চিন্তা-ভাবনার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে এবং সেই আদর্শকে তিনি দেশের সেবায় ব্যবহার করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনে যখন ভারতের জনগণের মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছিল তখন বিবেকানন্দের মানবতাবাদ তার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, নিজেদের মর্যাদা, দায়িত্ববোধ ও জাতীয় গৌরব সম্পর্কে সচেতন করেছিল। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের ঐক্যের ব্যগ্র বাসনাই বিবেকানন্দের মধ্যে শ্রেণী-সমন্বয়ের ধারণা সৃষ্টি করেছিল। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের সেই ঐক্যের ধারণা ভাববাদী হলেও তা ছিল তাঁর সামগ্রিক চিন্তাদর্শের মূল কথা এবং তার যৌক্তিকতা এবং অপরিহার্যতায় ছিল তাঁর গভীর বলিষ্ঠ বিশ্বাস। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তাঁর এই বিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে স্বীকার করতেই হবে। শুধু স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে সর্বাত্মক জাগরণ হয়েছিল তার প্রক্রিয়াকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শ। সোভিয়েত দেশের মানুষের চোখে রামমোহন রায় অথবা মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে নতুন ভারত গড়ার স্থপতি হিসেবে বিবেকানন্দের অবদান বেশী বলে স্বীকৃত হয়েছে।...

...বিবেকানন্দের রচনাবলী আমি পড়েছি—একবার নয়, বার বার, আর প্রত্যেকবার সেগুলির মধ্যে এমন নতুন কিছু পেয়েছি যা ভারতবর্ষকে গভীরভাবে বুঝতে আমাকে সাহায্য করেছে—সাহায্য করেছে ধারণায় আনতে তার দর্শন ও জীবনদর্শনের রূপ, তার জনগণের অতীত ও বর্তমানের আচার-আচরণ এবং তাদের ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা।[২৮]

সোভিয়েতের মানুষ মনে করেন যে, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বস্তুত অভিন্ন; বিধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধের গ্রাসাতঙ্কে বিপন্ন মানব-সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে তাঁদের বাণী একান্তই অপরিহার্য। আমরা বিশ্বাস করি যে একমাত্র তাঁদের বাণীই বর্তমানের আতঙ্কপীড়িত বিশ্বে শান্তি, সমন্বয় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সক্ষম। তাঁরা সাধারণ ধর্মনেতা মাত্রই নন—আরও অনেক বেশী গরীয়ান। শান্তি, সমন্বয় ও সৌভ্রাত্রের মহান প্রবর্তক পুরুষ তাঁরা। অতীতের ভারতে ও বৃহত্তর বিশ্বে তাঁদের বাণীর কালোপযোগিতা যেমন ছিল তেমনই সাম্প্রতিক ভারতের পরিস্থিতিতে এবং সমকালীন বিশ্ব-পরিপ্রেক্ষিতেও ততোধিক তার প্রয়োজন। এই কারণেই বহু সোভিয়েত গবেষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণ—বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ক চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন।[২৯]

বহু বছর পেরিয়ে যাবে, বহু প্রজন্ম অতিক্রান্ত হবে; বিবেকানন্দ ও তাঁর যুগ সুদূর অতীতে পরিণত হবে। কিন্তু সারা জীবন ধরে যিনি স্বদেশবাসীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের

২৮। উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৯১, পৃঃ ৬৪৯-৫৬

২৯। ২৮ নভেম্বর ১৯৮৩ তারিখে স্বামী লোকেশ্বরানন্দকে লেখা ডঃ ই. পি. চেলিশেভের পত্র থেকে উদ্ধৃত

স্বপ্ন দেখেছেন; ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, দুঃখপীড়িত দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলবার জন্য, অবিচার ও নিষ্ঠুরতার গ্রাস থেকে তাদের মুক্ত করবার জন্য যিনি এত কিছু করেছেন—সেই মানুষটির স্মৃতি, বিবেকানন্দের স্মৃতি কখনই ম্লান হবে না। সমুদ্রতীরের পাথুরে ঢালু অংশ যেমন তরঙ্গের আঘাত এবং ঝড়ঝঞ্ঝা প্রতিকূল আবহাওয়ার বিরুদ্ধে তীরভূমিকে সতত রক্ষা করে, সর্বদা নির্ভীক এবং নিঃস্বার্থ থেকে তেমনিভাবে বিবেকানন্দ তাঁর দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন।[৩০]

হুয়াং জিন চুয়ান

চীনের বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক এবং বেজিং-এ চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব সোস্যাল সায়েন্সেস-এর ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের ডেপুটি ডিরেক্টর। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চীনা ভাষায় তাঁর একটি গ্রন্থ বেজিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম ঃ 'দি মডার্ন ইণ্ডিয়ান ফিলোসফার বিবেকানন্দ ঃ এ স্টাডি'। 'কমিটি ফর কম্প্রিহেনসিভ স্টাডি অব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মুভমেন্টে'র তিনি অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

চীনদেশে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা একজন ধর্মীয় নেতামাত্র মনে করি না। আমরা তাঁকে আধুনিক ভারতবর্ষের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক হিসেবে দেখি। প্রমাণ আছে যে, ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। ভারতবর্ষের বহু বিপ্লবীর কাছে তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস।[৩১]

বর্তমান চীনে বিবেকানন্দ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও সমাজসেবী রূপে পরিচিত। তাঁর দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা এবং বীর্যদীপ্ত দেশপ্রেম কেবল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেই উদ্বুদ্ধ করেনি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ ক্যান্টন ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। মাদ্রাজের লোকদের লেখা একটি চিঠিতে তিনি সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। চীনদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর কিছুটা জ্ঞান ছিল। তিনি তাঁর লেখায় ও বক্তৃতায় প্রায়ই চীন সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিতেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। তিনি একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, চীনদেশের সংস্কৃতি অবশ্যই একদিন না একদিন 'ফিনিক্সের' মতো আবার জেগে উঠবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কৃষ্টির মিলনের মহৎ লক্ষ্য সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বিবেকানন্দের এই চিন্তাধারা কিভাবে গড়ে উঠেছিল তাঁর জীবনীকার রোমাঁ রোলাঁ তা বর্ণনা করেছেন। যখন বিবেকানন্দ প্রথমবার আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখন তিনি ভেবেছিলেন আমেরিকাই এই ব্রত উদ্‌যাপন করবে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয়বারের বিদেশ যাত্রায় তিনি বুঝেছিলেন যে, 'ডলার'-সাম্রাজ্যবাদের জৌলুস তাঁর ধারণাকে প্রতারিত করেছে। তাই তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র আমেরিকা নয়, চীন।

৩০। Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume, pp. 517-18 (সেন্টেনারি মেমোরিয়াল ভল্যুমে E. P. Chelishev নামটি ভুল করে Y. Chelysev ছাপানো হয়েছে)

৩১। Statesman, 8 November 1986

সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের পেষণে নিপীড়িত চীনদেশের জনসাধারণের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ছিল অসীম সহানুভূতি। তিনি তাদের সম্পর্কে বিরাট আশা পোষণ করেছেন। চীন পরিদর্শনের পর তিনি খুব মজার একটা মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ 'চীনা খোকা পুরোদস্তুর দার্শনিক। যে-বয়সে একজন ভারতীয় শিশু বড়জোর হামাগুড়ি দিতে শেখে, সে-বয়সে একটি চীনাশিশু কাজে যায়। প্রয়োজনের দর্শন সে খুব ভালোভাবেই শিখে নিয়েছে।' এ-থেকে বোঝা যায়, চীনের পুরনো সমাজের শিশুদের দুঃখকষ্টের প্রতি বিবেকানন্দের গভীর সহানুভূতি ছিল।

তাঁর কল্পিত সমাজতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভবিষ্যৎ সমাজ শ্রমজীবী মানুষদের দ্বারা শাসিত হবে এবং চীনেই এর সূত্রপাত হবে। 'বর্তমান ভারতে' তিনি মন্তব্য করেনঃ 'কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। ...মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে...তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে... শূদ্রধর্ম-কর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।...সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।'

উপরে আলোচিত বিষয় এবং তাঁর জীবন ও রচনা থেকেও আমরা দেখতে পাই, সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-শাসিত চীনা জনগণের সম্বন্ধে বিবেকানন্দ অত্যন্ত আগ্রহী ও সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁদের সম্বন্ধে তিনি গভীর আশা পোষণ করতেন।...

ভারতে গণতন্ত্রবাদী দেশপ্রেমিকদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি আমাদের গৌরবময় অতীত সংস্কৃতির প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং চীনের মেহনতি জনগণকে ভালোবাসতেন।[৩২]

অতীতে স্বামী বিবেকানন্দ চীনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় দৃঢ় সমর্থন ও গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাদের উৎসাহিত করেছিলেন সারা বিশ্বের জনগণের সঙ্গে একতাবদ্ধ হতে। চীনের জনগণ এরকম এক ব্যক্তিকে ভুলতে পারে না এবং সব সময় তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে।[৩৩]

কে. এম. পানিক্কর

১৮৯৫—১৯৬৩। অক্সফোর্ডের উজ্জ্বল ছাত্র। শ্রীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। কম্যুনিস্ট চীনে ভারতের রাষ্ট্রদূত। বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থের লেখক। 'দি ডিটারমিনিং পিরিয়ড্স্ অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

'আমরা সকলেই বিদেশীর শাসনাধীন'—এই সাধারণ ধারণার উপর নির্ভরশীল

৩২। হুয়াং জিন চুয়ান ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে 'স্বামী বিবেকানন্দ এবং চীন' এই শীর্ষক একটি বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতার সারাংশ সাইক্লোস্টাইল করে শ্রোতাদের মধ্যে বিলি করা হয়। স্বামী লোকেশ্বরানন্দকে অধ্যাপক চুয়ান ঐ বছরের ৭ জানুয়ারি তারিখে নিজের নাম স্বাক্ষর করে তার একটি কপি উপহার দেন। উদ্ধৃত অংশ সেখান থেকে নেওয়া।

৩৩। স্বামী লোকেশ্বরানন্দকে লেখা চিঠি, ৫।৫।১৯৮৪

রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ কিন্তু ভারতের খণ্ড ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রোধ করতে পারত না—যে-অভিজ্ঞতা ৪০০ বৎসরের অধিককাল ধরে অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীন, এবং ভারতের চেয়ে বহুলাংশে ক্ষুদ্রাকার, বলকান্ উপদ্বীপের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। হিন্দুদের মধ্যে এক অখণ্ড সমাজবোধই ভারতীয় জাতীয়তাকে গতিশক্তি দিয়েছিল—যা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বৃহৎ অংশকে অন্তত এক-রাষ্ট্রে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছে; আর তার কৃতিত্ব বহুলাংশে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাপ্য। এই নব শঙ্করাচার্যকে স্বচ্ছন্দে হিন্দু ভাবসমূহের ঐক্যবিধায়ক বলে স্বীকার করা যায়। সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে ইনি কেবল হিন্দু-উন্মাদনা সৃষ্টি করেননি, সেইসঙ্গে নূতন হিন্দু সংস্কার-আন্দোলনের ভিত্তিরূপে সর্বজনীন বেদান্ত প্রচার করেছিলেন। আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁর পূর্বেকার হিন্দু ধর্মীয় আন্দোলনগুলি স্থানীয় এবং সম্প্রদায়বদ্ধ, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব বেশি পড়েনি। আর্যসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, দেবসমাজ ইত্যাদি আন্দোলনগুলি নিজস্ব-ভাবে মূল্যবান কিন্তু তারা অপরপক্ষে সংস্কার-আন্দোলনের প্রাদেশিক চরিত্রকেই অধিকতর প্রকট করে তুলেছিল। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম হিন্দু আন্দোলনকে জাতীয়তাবোধ দান করলেন এবং অধিকাংশ আন্দোলনের মধ্যে সঞ্চারিত করলেন সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি।[৩৪]

যদুনাথ সরকার

১৮৭০—১৯৫৮। ভারতবর্ষে ইতিহাস রচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার পথিকৃৎ। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজি ও ইতিহাসে অনার্সসহ স্নাতক। স্নাতকোত্তরে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যাপক ভাইস-চ্যান্সেলর। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য। 'দি ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার', 'ক্রোনোলজি অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি', 'হিস্ট্রি অব ঔরঙ্গজেব', 'মিলিটারী হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

একথা বলব না, বিবেকানন্দের পূর্বে কিছু কিছু উন্নয়নকাজ হয়নি, বা জাতি-নির্বিশেষে সমাজসেবার কিছু কাজ ভারতবাসী করেনি। কিন্তু সেই ভারতবাসীরা তো হিন্দুসমাজত্যাগী, এবং তাঁরা ভারতবাসীর সুবৃহৎ দুঃখকষ্টের প্রান্তভাগ মাত্র স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। হস্তীকে জাগাবার কাজ তখনও বাকি ছিল। আর ঠিক সেই কাজটি বিবেকানন্দ করলেন। তিনি শুভ কর্মপথে হিন্দুসমাজের বিপুল জনশক্তি, সম্পদ ও সুপ্ত প্রাণশক্তিকে চালিত করলেন—একই সঙ্গে সেই কর্মকে যুক্ত করলেন অন্তঃশুদ্ধির সঙ্গে—আমাদের সকল শুভ কর্মের উৎস বেদান্তদর্শনের অনুশীলন ও প্রচারের দ্বারা।

হিন্দুধর্মের এই রূপান্তরকার্যের পরিকল্পনা ভারতের খ্রীষ্টধর্মের নিকট হতে অপহৃত—একথা বলা খুবই ভুল। আমি বরং বলব, আধুনিক খ্রীষ্টধর্ম তার সমাজসেবার দৃষ্টান্তের দ্বারা এদেশের মহাযান বৌদ্ধধর্মের দীর্ঘকাল-বিস্মৃত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে আমাদের সাহায্য করেছে। বিবেকানন্দ শুধু তাঁর সংগঠনরীতি খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক যেমন খ্রীষ্ট-ধর্মসঙ্ঘ তাঁদের সংগঠনরীতি ধার করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী রোমক সরকারের কাছ থেকে; আর আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, এই

৩৪। দ্রষ্টব্য ঃ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৬৯

সাম্রাজ্যবাদী রোমক সরকারেরই সাহায্যে প্রধানত খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বধর্ম হয়ে ওঠে। এই কারণে বিবেকানন্দ এবং তাঁর অনুসরণে ভগিনী নিবেদিতা, বৌদ্ধধর্মকে অত গভীরভাবে ভালবেসেছেন ও সমাদর করেছেন—তার অনুশীলনও করেছেন।[৩৫]

রমেশচন্দ্র মজুমদার

১৮৮৮—১৯৮০। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। 'করপোরেট লাইফ ইন অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া' নামক নিবন্ধ লিখে তিনি পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। প্রথমে অধ্যাপক ও পরে (১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) উপাচার্য হিসেবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একুশ বছর (১৯২১—১৯৪২) যুক্ত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য ভারত সরকার-কর্তৃক গঠিত সম্পাদক-মণ্ডলীর তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি সরকারের কাজ ছেড়ে নিজেই বই প্রকাশ করেন—'দি সিপয় মিউটিনি অ্যাণ্ড রিভোল্ট অব ১৮৫৭'। 'হিস্ট্রি অব ফ্রীডম মুভমেন্ট' গ্রন্থে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ 'বাংলাদেশের ইতিহাস', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস ও পৃথিবীর ইতিবৃত্ত', 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া', 'হিস্ট্রিয়োগ্রাফি ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া', 'হিস্ট্রি অব দি ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া', 'হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অব দি ইণ্ডিয়ান পিপল'।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ৪০০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিকাগোতে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের সপক্ষে বক্তৃতা করেছিলেন।... একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বিশ্বসংস্কৃতির আধুনিক মানচিত্রে সেদিন তিনি হিন্দুধর্মের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এর আগে পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সভ্য জাতিগুলি হিন্দুধর্মকে অত্যন্ত হেয় করে দেখতো। তারা মনে করতো যে হিন্দুধর্ম কুসংস্কার, দুরাচার এবং নীতিহীন লোকাচারের সমষ্টি এবং বর্তমান প্রগতিশীল জগতে হিন্দুধর্ম কোনরকম গুরুত্ব পাবার দাবি রাখতে পারে না। বিবেকানন্দের ব্যাখ্যার ফলে এই প্রথম তারা হিন্দুধর্মের উচ্চ তত্ত্বগুলিকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাল— শুধু তা-ই নয়, বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মকে তারা অত্যন্ত উঁচু আসন দিল। এর সুদূরপ্রসারী প্রত্যক্ষ প্রভাব হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর কিরকম হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।... এতদিন পর্যন্ত হিন্দু ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যখনই কোন তুলনামূলক বিচার হয়েছে তখনই শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে সর্বদাই একটা আত্মরক্ষামূলক এবং ক্ষমাপ্রার্থী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতি নিম্নমানের, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই প্রবল দাবি ভারতীয়রা প্রায় সত্য বলেই মেনে নিয়েছিল। এখন আকস্মিকভাবেই পটপরিবর্তন হয়ে গেল। পাশ্চাত্য প্রতিনিধিরা একযোগে হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যগুলির উচ্চ প্রশংসা করতে লাগলেন। এটি এমন একটি ঘটনা—যা হিন্দুদের শত্রু-মিত্র কেউই কল্পনাতেও আনতে পারেনি। এর ফলে হিন্দুদের মধ্যে তাদের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। শুধু তা-ই নয়, তাদের মধ্যে জাতীয় গৌরববোধ ও দেশাত্মবোধের চেতনাও দ্রুত জেগে উঠল।... ক্রম-বর্ধমান হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে এটি ছিল এক বিরাট অবদান।

৩৫। তদেব, পৃঃ ২৬৫-৬৬

ভারতে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করলেন যে, আধ্যাত্মিকতাই হিন্দুসভ্যতার ভিত্তি। তাঁর লেখায় ও বক্তৃতায় তিনি দেখালেন, মানবজাতির কল্যাণের জন্য ভারতের আধ্যাত্মিকতার মূল্য বা গুরুত্ব পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার চেয়ে কোন অংশে কম নয়—যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমৃদ্ধিকে খুব বড় করে প্রচার করা হয়, সেই সভ্যতার সমৃদ্ধি আমাদেরও চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তিনি অক্লান্তভাবে চেষ্টা করে গেছেন পাশ্চাত্যের চাকচিক্যে হতবুদ্ধি ভারতীয়দের দৃষ্টি তাদের নিজস্ব আদর্শের দিকে ফিরিয়ে নিতে। পাশ্চাত্যের সাথে তুলনামূলক মূল্যায়নে তিনি হিন্দু আদর্শ ও রীতিনীতির শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করেছিলেন, আর দেশবাসীকে সচেতন করে দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন সোনার বিনিময়ে রাঙ গ্রহণ না করেন।

তাই বলে বিবেকানন্দের কিন্তু পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে কোন গোঁড়ামি ছিল না। তাদের কৃতিত্বের সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি খোলাখুলি স্বীকার করেছিলেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতি একেবারে ত্রুটিহীন বা নিখুঁত নয়। পাশ্চাত্যের কাছে তাকে অনেক কিছুই শিখতে হবে, কিন্তু তা কখনই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির বিনিময়ে নয়।

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে একজন মহান সন্ন্যাসী ও নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিকের সমন্বয় ঘটেছিল।...ভারতের জাতীয় চেতনার জাগরণে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আজও তাঁর অনেক প্রাণস্পর্শী আবেদন ভারতের জাতীয় চেতনাকে তার মর্মমূল পর্যন্ত আলোড়িত করে।...

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা সুপ্ত হয়ে ছিল শুধু, কিন্তু একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। বিবেকানন্দের মনে যে-চিন্তাটি সর্বক্ষণের জন্য প্রধান হয়ে উঠেছিল সেটি হল ঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক সজীবতা ফিরিয়ে এনে ভারতবর্ষকে তার অকৃত্রিম অতীত গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

এই মহান সন্ন্যাসী যিনি তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে সংসার ত্যাগ করেছিলেন এবং গভীরভাবে নিজেকে আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি কিন্তু অক্লান্তভাবে প্রচার করেছিলেন যে, ভারতের জন্য ধর্ম ও দর্শন ততটা প্রয়োজনীয় নয়; ধর্ম ও দর্শন তার যথেষ্ট আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন তার লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য অন্ন, নিম্নশ্রেণীর মানুষের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার, দুর্বল জনগণের বুকে শক্তি ও উৎসাহ, পৃথিবীর মধ্যে একটি মহান জাতি বলে গৌরব ও আত্মমর্যাদা বোধের চেতনা। সমগ্র ভারতবাসীর উদ্দেশে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, তারা যেন সর্বপ্রকারের ভয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, শক্তিতে ভর করে মানুষের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই দৈবীসত্তা বর্তমান—বেদান্তের এই শাশ্বত সত্য তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই মহান সন্ন্যাসীর উপদেশ এবং আদর্শ জাতীয়-জীবনস্রোতে নববেগ যুক্ত করেছিল; নতুন উদ্যম এবং আশার সঞ্চার করেছিল এবং দেশসেবাকে ধর্মীয় সাধনার স্তরে উন্নীত করেছিল।[৩৬]

৩৬। History of the Freedom Movement in India, Vol. I, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1962, pp. 358-63

এ. এল. ব্যাসম

১৯১৪—১৯৮৬। *বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্‌। প্রাচ্যবিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার আমন্ত্রণ পান। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করে। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির 'বিবেকানন্দ অধ্যাপকে'র পদে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বৃত ছিলেন। 'কমিটি ফর কম্প্রিহেনসিভ স্টাডি অব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মুভমেন্টে'র প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি, ক্যানবেরার এমেরিটাস প্রফেসর ছিলেন। তাঁর রচিত সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ ঃ 'দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া'।*

পরবর্তীকালে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে খ্যাত হয়েছিলেন, সেই নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মের একশ বছর পরেও বিশ্ব-ইতিহাসের মানদণ্ডে তাঁর গুরুত্বের পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন। তাঁর দেহাবসানের পরে কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক কিংবা অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিক তাঁর যে মূল্যায়ন করেছিলেন তার চেয়ে তাঁর ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়ের পর থেকে কালপ্রবাহে অনেকগুলি বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেছে যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণা হয় যে, আগামী শতাব্দীগুলিতে তিনি বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম প্রধান রূপকার হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, বিশেষত এশিয়াতে। ভারতীয় ধর্মের সমগ্র ইতিহাসেও তিনি পরিগণিত হবেন একজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে। শঙ্কর ও রামানুজের মতো মহান আচার্যদের তিনি সমকক্ষ। এবং কবীর, চৈতন্য, দক্ষিণ ভারতের আলোয়াড়-নায়নমার প্রমুখ সাধু-সন্ত—যাঁদের প্রভাব কেবলমাত্র আঞ্চলিক—তাঁদের থেকে বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

আমি এও বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কারণ, প্রখ্যাত ডঃ সি. ই. এম. জোড একসময় যাকে বলেছিলেন 'প্রাচ্যের পালটা আক্রমণ' বিবেকানন্দই প্রকৃতপক্ষে তার সূচনা করেন। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব থেকেই ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম প্রচার করে এসেছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় ধর্মগুরু যিনি ভারতের বাইরে মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন।[৩৭]

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

১৮৯৪—১৯৭৪। *বিশ্ববরেণ্য পদার্থবিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক। বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিক্সের উদ্ভাবক। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রবক্তা। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত। বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' ও ভারত সরকারের 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিপ্রাপ্ত। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা।*

শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদানের পর তাঁর এবং তাঁর আদর্শের যে জয়যাত্রা শুরু হয় আজও তার গতি অব্যাহত। বর্তমানে আমাদের দেশে

৩৭। Swami Vivekananda in East and West, Ramakrishna Vedanta Centre, London, pp. 210-14

যে-সমস্ত শক্তি কাজ করে চলেছে, তার মধ্যে তাঁর আদর্শাবলম্বী আন্দোলন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

তাঁর নিজের মধ্যে যে অসীম শক্তির উৎস ছিল, তা সবসময়ে প্রকাশের পথ খুঁজত। সমস্ত জীবন এই অদম্য শক্তি তাঁকে পৃথিবীময় তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে। আর যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই মানুষ তাঁর মধ্যে এই প্রাণের প্রবাহ দেখে নিজেরাও উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের মানুষকে তার মোহনিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলার কাজে সেযুগে তাঁর চেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি কেউ ছিলেন না।

আমাদের দুর্ভাগ্য ভারতের আর এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্যের মতো বিবেকানন্দ অকালে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু শঙ্কর যেমন তাঁর সেই স্বল্পকালস্থায়ী জীবনের মধ্যে সারা ভারত বার বার পরিক্রমা করে ভারতীয়দের মধ্যে নতুন প্রাণরস সঞ্চার করার চেষ্টা করেছিলেন, স্বামীজীও তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঝড়ের মতো ভারত ও পশ্চিমের দেশগুলি পরিভ্রমণ করে রামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মমত-সমন্বয়সাধনের নতুন বাণী প্রচার করেছিলেন। গোঁড়ামিমুক্ত তাঁর এই নতুন ধর্মমতই শিকাগোতে এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমকে এত অভিভূত করেছিল।[৩৮]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৮৯০—১৯৭৭। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও জাতীয় অধ্যাপক। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ'। এ-বিষয়ে তাঁর গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশের পরই তাঁর নাম স্বদেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর লন্ডন থেকে 'ইন্দো-অ্যারিয়ান অ্যান্ড হিন্দী', 'কিরাত জনকৃতি', 'বেঙ্গলী ফোনেটিক রীডার' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। এরপর ভাষাতত্ত্বের সম্মেলন ও সেমিনার উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে এশিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার নানা স্থানে ভ্রমণ করে ভাষণ দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'ভাষাচার্য' উপাধি দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে তাঁকে হিন্দী ভাষায় অবদানের জন্য 'সাহিত্য বাচস্পতি' উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি পান। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্য অ্যাকাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা।

বিবেকানন্দ আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছেন এমন একজন মানুষ হিসেবে যাঁর হৃদয় মানবজাতির দুঃখকষ্টে গভীরভাবে আলোড়িত, বিশেষ করে ভারতের মানুষের জন্য। মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর তিরস্কারপূর্ণ কোন কোন বক্তৃতা আমাদের অন্তরের অন্তস্তলকে নাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের সামনে মানুষের মহৎ-সত্তার স্বরূপ তিনি প্রকাশ করেছিলেন—বিশেষ করে সেইসব মানুষের—যারা ভারতীয় সমাজে ঘৃণিত ও অবহেলিত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেদান্ত-নিহিত ভারতের মহত্তম ও প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ ভাবধারার মূল্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলেছিলেন। তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বেদান্তদর্শনের মধ্যে যা রেখে গেছেন তার একটি চিরন্তন মূল্য আছে এবং তা শুধু ভারতের জন্যই নয়, সমগ্র মানবজাতির

৩৮। দ্রষ্টব্য ঃ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯-৮০

জন্য—এর ফলে আমাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হয়েছিল; সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুন ধরনের উদ্দীপনার যার মূলে ছিল এই বোধ যে, আমরা সেই জনসমষ্টির অন্তর্গত যারা চিরকাল মানবজাতির সেবায় এক পবিত্র জীবনব্রত পালন করে এসেছে। হিন্দুজাতি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিল, বিবেকানন্দই সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করেছেন। সে-সময় আমাদের চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক অযৌক্তিক ও নির্মম সমালোচনা হত—বিশেষ করে সেগুলি করতেন প্রাচীনপন্থী খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা। বিবেকানন্দ এগুলির মূলোচ্ছেদ করেছিলেন। এসব কারণেই তিনি হয়ে উঠেছেন আমাদের অত্যন্ত আপনজন। এইজন্যই তঁকে আমরা একজন মহান আচার্য বলে মনে করি। তাঁকে আমরা দেখি এক নতুন ধরনের অবতার হিসেবে যিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমাদের সুন্দর শক্তিশালী মানুষের মতো জীবনযাপনের পথ দেখাতে।

বিবেকানন্দ প্রথমেই আমাদের জীবন থেকে বহু ভ্রান্ত সংস্কার দূর করে দিলেন। অনিত্য বস্তু—সামাজিক লোকাচার ও অনুরূপ বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট না করে শাশ্বত সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ভারতে যাকে আমরা 'জাতিভেদ প্রথা' বলি তিনি তার আপোষহীন শত্রু ছিলেন। একজন সন্ন্যাসী ও সাধারণ হিন্দু হিসেবে অস্পৃশ্যতা বস্তুটিকে সর্বদাই ঘৃণা করেছেন। ভারতীয় ইংরেজিতে প্রায়ই 'ডোন্ট-টাচিজিম' (don't-touchism) বলে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেটি তাঁরই সৃষ্টি। জনসাধারণের প্রতি ভালবাসা এবং করুণায় তাঁর হৃদয় প্লাবিত হয়েছিল। বেদান্তবিশ্বাসী ছিলেন বলে তিনি তাদের সেবা করতে চেয়েছিলেন ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসেবে—কারণ, বেদান্তমতে সব প্রাণীই ঈশ্বর। ভারতীয় ভাষায় তিনি একটি নতুন শব্দের সৃষ্টি করেছেন—'দরিদ্রনারায়ণ' অর্থাৎ 'দরিদ্র এবং অনুন্নতদের মধ্যস্থিত ভগবান।' সমগ্র ভারতবাসী এটি গ্রহণ করেছে এবং একদিক দিয়ে এই শব্দটি সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের দায়িত্ববোধ জাগিয়েছে। এই দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যেকটি মানুষ দরিদ্র, অনুন্নত, পীড়িত ও হতাশাগ্রস্তদের ঈশ্বরের মূর্তিমান বিগ্রহ (নরনারায়ণ) বা ঈশ্বরের অংশ বলে দেখবে। তাদের সেবাই সবার কাছে ঈশ্বরের সেবা হয়ে উঠবে। গুজরাটের বৈষ্ণব কবিদের ব্যবহৃত 'হরিজন' (অর্থাৎ 'ঈশ্বরের মানুষ') এই প্রাচীন শব্দটি মহাত্মা গান্ধী আবার প্রবর্তন করলেন। এটি একটি সুন্দর শব্দ। কিন্তু 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটির সাথে একটি কর্তব্যবোধের নির্দেশ জড়িয়ে আছে, যা বলে ঃ যদি কেউ ভগবানের সেবা করতে চায় তাহলে তাকে দরিদ্রের সেবা করতে হবে।...

সমাজে যারা অবিচারের বলি, বিবেকানন্দ তাদের সকলকেই ভালবাসতেন। তাদের মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।... ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা ও আধ্যাত্মিক শূন্যতার সেই দিনে, যখন সবকিছুই নৈরাশ্যজনক মনে হয়েছিল এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল তখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আহ্বান নিয়ে বিবেকানন্দ নামক একটি শক্তির আবির্ভাব কি করে সম্ভব হল, তা নিঃসন্দেহে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এরকম একজন মানুষ ঠিক তখনই এসেছিলেন যখন আমাদের সামনে কোন পথ ছিল না, আমরা যেন সব আশাই হারিয়ে

ফেলেছিলাম। এ-থেকে বোঝা যায়, করুণাময় ভগবান মানুষকে কখনই পরিত্যাগ করেন না। এই ঘটনা গীতার বহু-উদ্ধৃত সেই বাণীই সমর্থন করে—যখন ধর্মের অধঃপতন ও অধর্মের উত্থান হয় ভগবান তখন অবতার-রূপে অবতীর্ণ হন—মানুষকে মুক্তির সঠিক পথ দেখাতে পথ-প্রদর্শক হয়ে আসেন। এই অর্থে বিবেকানন্দ একজন অবতার, দৈব-অনুপ্রাণিত ও ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথ-প্রদর্শক—শুধুমাত্র ভারতের জন্য নয়, বর্তমান যুগের সমগ্র মানবজাতির জন্য।[৩৯]

৩৯। Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume, pp. 228-33

জীবনপঞ্জী

১৮৬৩ — ১২ জানুয়ারি (১২৬৯ সালের ২৯ পৌষ, সোমবার) সকাল ৬টা ৩৩ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ড, কৃষ্ণাসপ্তমী, মকরসংক্রান্তিতে জন্ম। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর ষষ্ঠ সন্তান।

১৮৬৯ — ৬-বছর বয়সে পাঠশালায় যোগদান।

১৮৭১ — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের নবম শ্রেণীতে (বর্তমান দ্বিতীয় শ্রেণী) যোগদান।

পাঠ্যাবস্থায় বাড়িতে থিয়েটারের দল ও ব্যায়ামাগার স্থাপন।

নবগোপাল মিত্রের ব্যায়ামাগারে যোগদান।

বক্সিং-এ পুরস্কার লাভ।

১৮৭৭ — তৃতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান অষ্টম শ্রেণী) পাঠকালে অসুস্থ-অবস্থায় পিতার নিকট রায়পুরে গমন। পিতার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা।

১৮৭৯ — কলকাতা প্রত্যাবর্তন। প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত শুরু।

১৮৮০ — প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। প্রেসিডেন্সি ত্যাগ।

১৮৮১ — জেনারেল এসেম্বলীতে পাঠকালে অধ্যাপক হেস্টির কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধির বিষয়ে সংবাদলাভ।

নভেম্বর, সুরেন মিত্রের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎলাভ।

ডিসেম্বর, প্রথম দক্ষিণেশ্বর গমন।

১৮৮২ — জানুয়ারি, দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বর গমন।

কয়েকদিন পরে—তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে।

১৮৮৪ — ১৯ ফেব্রুয়ারি, এ্যাঙ্কর অ্যাণ্ড হোপ লজ-এ ফ্রি-ম্যাসন হওয়ার জন্য যোগদান।

২৫ ফেব্রুয়ারি, রাতে পিতার পরলোকগমন।

জেনারেল এসেম্বলী থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

চরম আর্থিক সঙ্কট ও পারিবারিক গোলযোগ।

৫ এপ্রিল, ফ্রি-ম্যাসন টেস্টে উত্তীর্ণ।

২০ মে, মাস্টার-ম্যাসন উত্তীর্ণ।

বর্ষাকাল, শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে আর্থিক অভাবমোচনের প্রার্থনার জন্য শ্রীশ্রীকালীমায়ের নিকট তিনবার গমন কিন্তু তিনবারই লৌকিক প্রার্থনার পরিবর্তে বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তির জন্য প্রার্থনা নিবেদন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক পারিবারিক অভাবমোচনের আশ্বাস।

এটর্নী অফিসে কাজ ও পুস্তক অনুবাদ করে সংসারযাত্রা নির্বাহ।

১৮৮৫ — এপ্রিল, শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ।
চিকিৎসার সুবিধার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের শ্যামপুকুরে অবস্থান। কাশীপুরে অবস্থান।

১৮৮৬ — ১১ ফেব্রুয়ারি, শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক লোকশিক্ষার চাপরাস দান।
এপ্রিল, তারক (স্বামী শিবানন্দ) ও কালীর (স্বামী অভেদানন্দ) সঙ্গে বুদ্ধগয়া পরিদর্শন।
জুন, কয়েক সপ্তাহের জন্য মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের চাঁপাতলা-শাখার প্রধান শিক্ষকতা।
১৬ আগস্ট, শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি।
সেপ্টেম্বর/অক্টোবর, বরানগর মঠ স্থাপন।
ডিসেম্বর, আঁটপুরে সন্ন্যাসের সঙ্কল্প গ্রহণ।

১৮৮৭ — জানুয়ারি, মুঙ্গের থেকে রাখালের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রত্যাবর্তন, বরানগর মঠে যোগদান। উভয়ের আঁটপুর গমন।
তৃতীয় সপ্তাহ, বরানগর মঠে বিরজা-হোম অন্তে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসগ্রহণ। স্বামী বিবিদিষানন্দ নাম গ্রহণ।
গ্রীষ্মকাল, অসুস্থতা। শিমুলতলা ও বৈদ্যনাথধাম গমন।
কাশীতে শ্রীযুক্ত দ্বারকাদাসের আশ্রমে। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়। ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন। কাশী দর্শনান্তে বরানগর মঠে প্রত্যাবর্তন।
কিছুদিন পরে পুনরায় কাশীতে। প্রমদাদাস মিত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব।
কাশী হতে অযোধ্যায়, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রায়।

১৮৮৮ — আগস্ট, বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে। হরিদ্বারের পথে হাতরাস রেল স্টেশনে—শরচ্চন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ। শরচ্চন্দ্রের সঙ্গে হৃষীকেশে। শরচ্চন্দ্রের অসুস্থতা। হাতরাস প্রত্যাবর্তন ও অসুস্থতা।
স্বামী শিবানন্দ-কর্তৃক অসুস্থ-অবস্থায় মঠে আনয়ন।

১৮৮৯ — ৫ ফেব্রুয়ারি, কামারপুকুরের পথে আঁটপুরে এক সপ্তাহ যাপন (সঙ্গে শ্রীমা ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ)।
কামারপুকুর যাওয়ার পথে অসুস্থতা। প্রত্যাবর্তন।
গ্রীষ্মকালে, শিমুলতলা। উদরাময়ে পীড়িত—কলকাতা প্রত্যাবর্তন।
ডিসেম্বরের শেষে বৈদ্যনাথধাম যাত্রা।
স্বামী যোগানন্দ জলবসন্তে আক্রান্ত সংবাদ পেয়ে বৈদ্যনাথধাম থেকে এলাহাবাদ যাত্রা।

১৮৯০ — ২২ জানুয়ারি, গাজিপুরে উপস্থিতি। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে অবস্থান।
ফেব্রুয়ারি, প্রথম সপ্তাহ, পওহারীবাবার সান্নিধ্যলাভ।
মিস্টার রস, কর্নেল রিভেট কার্নাকের সঙ্গে পরিচয়।

রাজযোগ শিক্ষার জন্য পওহারীবাবার শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বরাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তি দর্শন। শিষ্যত্ব গ্রহণের সঙ্কল্প ত্যাগ।
এপ্রিলের শুরুতে কাশী প্রত্যাগমন।
১৩ এপ্রিল, বলরাম বসুর মৃত্যু।
কলকাতা প্রত্যাবর্তন।
২৫ মে, সুরেন মিত্রের মৃত্যু। মঠ সংরক্ষণে আর্থিক সমস্যা। গিরিশচন্দ্র, মাষ্টারমশাই (শ্রীম) প্রভৃতির সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।
জুলাই, প্রব্রজ্যার সঙ্কল্প। ঘুসুড়ির বাসায় শ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আশীর্বাদলাভ।
মাঝামাঝি, মঠ ত্যাগ। প্রব্রজ্যার পথে, সঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ।
আগস্ট, ভাগলপুরে। মন্মথনাথ চৌধুরীর আতিথ্যগ্রহণ। সাত দিন অবস্থান। কুমার নিত্যানন্দ সিংহের সঙ্গে পরিচয়। বৈদ্যনাথধামে একদিন। রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে পরিচয়। অতঃপর গাজিপুর, তৎপরে কাশীতে প্রমদাবাবুর আতিথ্যগ্রহণ। স্বামী অখণ্ডানন্দের পীড়াপীড়িতে অযোধ্যায়।
মহান্ত জানকীবর শরণের সঙ্গে পরিচয়ে আনন্দলাভ। নৈনিতাল। রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের আতিথ্যগ্রহণ। ছয় দিন অবস্থান, আলমোড়ার পথে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নববোধিলাভ।
আলমোড়ায় উপস্থিতি। অম্বা দত্তের বাগানে অপেক্ষারত। স্বামী অখণ্ডানন্দ-কর্তৃক স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দকে সংবাদ দান। লালা বদ্রী শা-র গৃহে গমন ও তৎ-কর্তৃক সাদর অভ্যর্থনা। শ্রীকৃষ্ণ যোশীর সঙ্গে সন্ন্যাস-বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা। ভগ্নীর আত্মহত্যার সংবাদলাভ।
৫ সেপ্টেম্বর, বদ্রীনারায়ণের পথে আলমোড়া ত্যাগ—সঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ।
কর্ণপ্রয়াগে তিন দিন অবস্থান।
বদরিকা আশ্রমের পথে স্বামী অখণ্ডানন্দের অসুস্থতা। আশ্রমের পথ দুর্ভিক্ষের জন্য বন্ধ। শ্রীনগরের পথে।
রুদ্রপ্রয়াগ। বাঙালী সাধু স্বামী পূর্ণানন্দের সঙ্গে পরিচয়। জ্বরাক্রান্ত। বদ্রীদেব যোশীর কবিরাজী চিকিৎসায় কিঞ্চিৎ সুস্থ। আলমোড়া থেকে ১২০ মাইল পদব্রজে আসার পর রুদ্রপ্রয়াগে ডাণ্ডীগ্রহণ।
শ্রীনগরে উপস্থিতি। অলকানন্দার তীরবর্তী কুটিরে একমাস অবস্থান।
টিহিরিতে উপস্থিতি। গঙ্গাতীরবর্তী কুটিরে পনের-কুড়ি দিন অবস্থান।
রাজপুর, স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
দেরাদুন। নবনির্মিত অসম্পূর্ণ এক গৃহে আশ্রয়লাভ। সহপাঠী খ্রীষ্টান বন্ধু, স্কুল শিক্ষক হৃদয়বাবুর গৃহে অসুস্থ স্বামী অখণ্ডানন্দের থাকার ব্যবস্থা কিন্তু অখণ্ডানন্দের আপত্তিতে পণ্ডিত আনন্দনারায়ণের গৃহে থাকার ব্যবস্থা। প্রায় তিন সপ্তাহ অবস্থান। হৃষীকেশের পথে। চণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের

কাছে পর্ণকুটির নির্মাণ করে স্বয়ং ও গুরুভ্রাতাদের অবস্থান। প্রবল জ্বরে ও ডিপথিরিয়ায় আক্রান্ত—নাড়ি লোপ। মৃত মনে করে গুরুভ্রাতাদের বিলাপ। অনাহূত সাধুর চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ। গুরুভ্রাতাদের পরিত্যাগ। হরিদ্বারে উপস্থিতি। কনখলে অবস্থিত স্বামী ব্রহ্মানন্দের আগমন ও সাক্ষাৎ। অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের উপস্থিতি।

সাহারানপুর। বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে অবস্থান।

নভেম্বর (আনুমানিক দ্বিতীয় সপ্তাহ), মীরাটে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের গৃহে স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে মিলন (অন্যমতে, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে)। দুই সপ্তাহ পরে, শেঠজীর বাগানবাড়িতে সকলের সঙ্গে অবস্থান। স্বামী অদ্বৈতানন্দের আগমন। আফগানিস্থানের আমীর আবদার রহমনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৮৯১ — জানুয়ারির শেষে সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করে একক যাত্রা।

দিল্লীতে উপস্থিতি। স্বামী বিবিদিষানন্দ নামে পরিচিতি।

পনের দিন পরে, মীরাট থেকে আগত গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও অনুসরণ না করার নির্দেশ।

ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগ, আলোয়ারে উপস্থিতি। ডাক্তার গুরুচরণ নস্করের সঙ্গে পরিচয়। বাজারের একখানি ঘরে স্থানলাভ। হাইস্কুলের উর্দূ ও পারসিক ভাষার মৌলবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। আলোয়ারের দেওয়ান রাজচন্দ্রজীর সঙ্গে পরিচয়—তাঁর মাধ্যমে মহারাজার সঙ্গে পরিচয়। দেওয়ানের কাছে শর্তসাপেক্ষে অবস্থানে সম্মতি (শর্ত ঃ যেসব গরীব-দুঃখী সাক্ষাতের জন্য আসবে সকলের প্রবেশাধিকার)।

২৮ মার্চ, আলোয়ার পরিত্যাগ। পাণ্ডুপোলে উপস্থিতি।

২৯ মার্চ, টাহলা গ্রামে উপস্থিতি। নীলকণ্ঠমন্দির-পার্শ্বে রাত্রিযাপন।

৩০ মার্চ, নারায়ণী গ্রামে উপস্থিতি। বসওয়া গ্রাম থেকে জয়পুর। পরিব্রাজকরূপে প্রথম ফটো গৃহীত।

জয়পুরে দুই সপ্তাহ অবস্থানকালে পণ্ডিতের নিকট পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী শিক্ষাপ্রয়াস। পণ্ডিতের ব্যর্থতা। স্বয়ং অধ্যায়ের পর অধ্যায় শিক্ষা। জয়পুরের প্রধান সেনাপতি হরি সিংহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

আজমীরে উপস্থিতি।

১৪ এপ্রিল, আজমীর ত্যাগ করে আবু পর্বতে উপস্থিতি।

আবু পর্বতে প্রথমে পর্বত গুহায় ও পরে উকিল সাহেবের বাংলোয় অবস্থান। মুন্সী জগমোহনের সঙ্গে পরিচয়। কোটার উকিল শ্রীযুক্ত মহারাও এবং ঐ রাজ্যের মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহের সঙ্গে পরিচয়।

৪ জুন, আবু পর্বতের গ্রীষ্ম-প্রাসাদে ক্ষেত্রীরাজ অজিত সিংহের সঙ্গে পরিচয়। ৬, ১১, ১৫, ২২, ২৩ জুন, ক্ষেত্রীপ্রাসাদে ক্ষেত্রীর মহারাজার

সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।

২৪ জুন, প্রাসাদে ক্ষেত্রীরাজের সঙ্গে শাস্ত্র-বিষয়ে আলাপ ও ভোজন এবং পরে সেখানে জলেশ্বরের ঠাকুর মুকুন্দ সিং ও আর্যসমাজী হরবিলাস সর্দা-র সঙ্গে পরিচয়।

৪, ৬, ৮, ৯, ১১, ১৪, ১৭, ১৮ জুলাই, ক্ষেত্রীপ্রাসাদে মধ্যাহ্ন-আহার ও রাজার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।

১৮ জুলাই, ক্ষেত্রীরাজ-আয়োজিত সঙ্গীত-আসরে উপস্থিতি। অন্যান্যদের মধ্যে রাঠোরের ঠাকুর ফতে সিংজী, জলেশ্বরের ঠাকুর মুকুন্দ সিংজী চৌহান, জামনগরের মানসিংহজী প্রভৃতির উপস্থিতি।

২৪ জুলাই, ক্ষেত্রী মহারাজার সঙ্গে ক্ষেত্রীর পথে।

২৫ জুলাই, জয়পুরে উপস্থিতি।

৩ আগস্ট, জয়পুর ত্যাগ—খৈরথলে রাত্রিযাপন।

৪ আগস্ট, কোটে উপস্থিতি।

৭ আগস্ট, সকালে ক্ষেত্রীতে উপস্থিতি।

৪ অক্টোবর, নবরাত্রি উৎসবের দিন ক্ষেত্রীরাজের সঙ্গে অশ্বারোহণে জীনমাতার মন্দির দর্শন-মানসে শিকর রাজ্য অভিমুখে যাত্রা।

৬ অক্টোবর, শিকরে উপস্থিতি।

শিকরের মহারাজা মাধো সিংজী ও ক্ষেত্রীরাজের সঙ্গে জীনমাতার মন্দির দর্শন।

১০ অক্টোবর, ক্ষেত্রীর উদ্দেশে শিকর পরিত্যাগ।

১১ অক্টোবর, ক্ষেত্রীতে উপস্থিতি।

১২ অক্টোবর, দশেরা উৎসবে যোগদান।

ক্ষেত্রীতে অবস্থানকালে পণ্ডিত নারায়ণদাসের কাছে পাতঞ্জলি মহাভাষ্যের পাঠগ্রহণ।

২৭ অক্টোবর (মতান্তরে পরদিন), ক্ষেত্রী পরিত্যাগ করে আজমীর যাত্রা। তিন-চার দিন হরবিলাস সর্দা-র পরে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার আতিথ্যগ্রহণ। আনুমানিক তিন সপ্তাহ আজমীরে অবস্থান।

গুজরাট যাত্রা।

আমেদাবাদে কয়েকদিন ভিক্ষান্নে জীবনধারণ, পরে লাল শঙ্কর উমিয়া শঙ্করের আতিথ্যগ্রহণ।

ওয়াধবান (কাথিয়াবাড়)।

কয়েকদিন অবস্থানের পর লিমড়ি। পথে পথে ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ। সাধুদের আশ্রয়ে বিপদ—এক বালক ভক্তের সাহায্যে লিমড়ি-রাজ ঠাকুর সাহেবের কাছে সংবাদ প্রেরণে—ঠাকুর সাহেব-কর্তৃক উদ্ধার—প্রাসাদে বাসের আমন্ত্রণ গ্রহণ। পাণ্ডিত্য দর্শনে পাশ্চাত্যগমনের জন্য ঠাকুর সাহেবের প্রস্তাব।

ঠাকুর সাহেবের পরিচিতি নিয়ে জুনাগড় যাত্রা। পথে ভাবনগর ও সিহোর দর্শন।
জুনাগড় রাজ্যের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইয়ের আতিথ্যগ্রহণ।
গির্ণার। গোরখনাথ দর্শন। নির্জন পর্বতগুহায় কয়েকদিন যাপন।
জুনাগড় প্রত্যাবর্তন। পরিচিতিপত্র নিয়ে ভুজে উপস্থিতি—দেওয়ানের আবাসে অবস্থান।
জুনাগড় প্রত্যাবর্তন। ভেরাওয়াল ও পাটনা সোমনাথ (প্রভাস) দর্শন। প্রভাসে কচ্ছের মহারাজার সঙ্গে ধর্মবিষয়ে আলোচনা।
জুনাগড় প্রত্যাবর্তন।
পোরবন্দর গমন। দেওয়ান শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গের অভ্যর্থনা। বিদেশ গমনের জন্য অনুরোধ। সুদামা-মন্দির পরিদর্শন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ—ত্রিগুণাতীতের হিংলাজ গমনের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা।
পোরবন্দর ত্যাগ করে দ্বারকা গমন। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত সারদামঠ দর্শন। বেট দ্বারকা গমন।
কচ্ছের মহারাজার আমন্ত্রণে মাণ্ডবীতে।
নারায়ণ সরোবর গমন।
আশাপুরী গমন।
মাণ্ডবী প্রত্যাবর্তন। স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে মিলন।
ভুজে। পরদিন স্বামী অখণ্ডানন্দের আগমন।
পুনরায় মাণ্ডবীতে। পক্ষকাল অবস্থান।
পোরবন্দরে। দেওয়ান শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গের গৃহে অবস্থান। এক সপ্তাহ পরে স্বামী অখণ্ডানন্দের আগমন।
একাকী জুনাগড় প্রত্যাবর্তন।
পলিতানায়।
নড়িয়াদ। দেওয়ানের গৃহে অবস্থান।
বরোদা গমন।
গ্রন্থাগার ও রবিবর্মার চিত্রকলা দর্শন।
বরোদা রাজ্যের মন্ত্রী বাহাদুর মণিভাই জে-র গৃহে অবস্থান।

১৮৯২ — এপ্রিল/মে, মহাবালেশ্বর। ঠাকুর সাহেব যশোবন্ত সিংজীর গৃহে অবস্থান।
১/২ মে, ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে পুনর্জন্মবাদ বিষয়ে আলোচনা।
৯-১১ মে, ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে আলোচনা।
১৮ মে, ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে অধর্ম ও পাপবাদ বিষয়ে আলোচনা।
২৩ ও ২৫ মে, ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।
পুনরায় স্বামী অভেদানন্দের আগমন।
জুন, পুনায়। সঙ্গে ঠাকুর সাহেব। এল্লাপা বলরামের আতিথ্য।
শেষাংশে, খাণ্ডোয়ায় (মধ্যপ্রদেশ)। স্থানীয় ব্যবহারজীবী হরিদাস

চট্টোপাধ্যায়ের আতিথ্যগ্রহণ। প্রায় তিন সপ্তাহ অবস্থান।
ইন্দোরে। জুনাগড়ের দেওয়ানের বন্ধু বেদেরকার-এর আতিথ
অহল্যাবাঈয়ের ছত্রীদর্শন।
পুনরায় খাণ্ডোয়ায়। অক্ষয় কুমার ঘোষের সঙ্গে পরিচয়।
বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদানের সঙ্কল্প।
জুলাই, শেষ সপ্তাহ, বোম্বাইয়ে উপস্থিতি। রামদাস ছবিলদাসের আতিথ্যগ্রহণ। দুই মাস অবস্থান।
কানহেরি গুহা দর্শন।
দাক্ষিণাত্যের পথে পুনায়। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া টারমিনাস-এ (বোম্বাই) পরিচয়। একসঙ্গে ট্রেনভ্রমণ ও তাঁর আতিথ্যগ্রহণ। ডেকান ক্লাবে (পুনা) আলোচনায় অংশগ্রহণ।
কোলহাপুরে। মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ। রানীর অনুরোধে নতুন গৈরিকবস্ত্র গ্রহণ।
১৫ অক্টোবর (আনুমানিক), বেলগাঁও। মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক মিস্টার ভাটের গৃহে আতিথ্যগ্রহণ।
১৮ অক্টোবর, হরিপদ মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁর অনুরোধে এবং ভাটের সম্মতিতে হরিপদ মিত্রের গৃহে অবস্থান। হরিপদকে মহাসম্মেলনে যাওয়ার সঙ্কল্প জ্ঞাপন।
স্বামী সচ্চিদানন্দ নাম গ্রহণ।
অক্টোবরের শেষে, মাড়গাঁও উপস্থিতি। তিন দিন রাচোল সেমিনারীতে অবস্থান ও সুব্রায়া নায়েকের আতিথ্যগ্রহণ।
ট্রেনে ধারওয়ার।
ব্যাঙ্গালোর। মিউনিসিপ্যাল মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার পি. পল্পুর আতিথ্যগ্রহণ। দেওয়ান স্যার শেষাদ্রি আয়ারের সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁর আতিথ্যগ্রহণ। মহীশূর রাজদরবারে। মহারাজার সঙ্গে পরিচয় ও প্রাসাদে অবস্থান। আবদুল রহমনের সঙ্গে পরিচয়। কোরান সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসা। বিদেশ গমনের সঙ্কল্প জ্ঞাপন। ত্রিচুর। পথে শিক্ষা বিভাগের অফিসার ডি. এ. সুব্রহ্মণ্য আয়ারের আবাসে আতিথ্যলাভ। আয়ার মারফৎ জেলা হাসপাতালের ডাক্তার ডি. সুজার সঙ্গে পরিচয়।
ক্রাণ্ডানোর। অশ্বত্থগাছের তলায় অবস্থানকালে দুই যুবরাজের সঙ্গে ধর্ম-আলোচনা। রাজপ্রাসাদের মহিলাদের আগমন—সংস্কৃতে আলোচনা।
ডিসেম্বরের প্রথম দিকে, কোচিনের এর্নাকুলামে। কেরালার নারায়ণ গুরু চট্টম্বি স্বামীর সঙ্গে পরিচয়।
১৩ ডিসেম্বর, ত্রিবান্দ্রমে উপস্থিতি। ত্রিবাঙ্কুর রাজপরিবারের গৃহশিক্ষক সুন্দররাম আয়ারের গৃহে অবস্থান। অধ্যাপক রঙ্গাচারিয়ার সঙ্গে পরিচয়।
১৪ ডিসেম্বর, যুবরাজ মার্তণ্ড বর্মার সঙ্গে পরিচয়।

১৬/১৭ ডিসেম্বর, মাদ্রাজের সহকারী এ্যাকাউনট্যান্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

২২ ডিসেম্বর, ত্রিবান্দ্রম ত্যাগ। নাগরাকোলে রত্নস্বামী আয়ারের আতিথ্যগ্রহণ। ডিসেম্বরের শেষে, কন্যাকুমারিকায় সমুদ্র-শিলাখণ্ডের উপর ধ্যান। নববোধিলাভ। পদব্রজে রামেশ্বর যাওয়ার পথে মাদুরায় রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ। রাজা-কর্তৃক ধর্ম-মহাসম্মেলনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

রামেশ্বরে উপস্থিতি।

১৮৯৩ — জানুয়ারি, মাদ্রাজে উপস্থিতি ও ডেপুটি এ্যাকাউনট্যান্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সেন্ট থোমে বীচ রোডের 'রমত বাগ' বাংলোয় অবস্থান।

মাদ্রাজ ট্রিপলিকেন লিটারারী সোসাইটিতে বক্তৃতা। মাদ্রাজে শিক্ষিত যুবকগণের কাছে পাশ্চাত্যগমনের পরিকল্পনা প্রকাশ। যুবকগণ-কর্তৃক পাথেয় হিসাবে পাঁচশ টাকা সংগ্রহ।

১০ ফেব্রুয়ারি, হায়দরাবাদে উপস্থিতি ও মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের আতিথ্যগ্রহণ।

১২ ফেব্রুয়ারি, হায়দরাধিপতি শ্যালক নবাব বাহাদুর স্যার খুরশিদ জা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ—পাশ্চাত্যগমন সম্পর্কে আলোচনা। নবাব-কর্তৃক এক হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি।

১৩ ফেব্রুয়ারি সকালে, নিজামের প্রধানমন্ত্রী আসমান জা-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার। বিকেলে, মহবুব কলেজে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'আমার পাশ্চাত্যগমনের উদ্দেশ্য'।

১৪ ফেব্রুয়ারি, বেগম বাজারের বণিকদের আগমন ও অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান।

থিয়সফিক্যাল সোসাইটি ও সংস্কৃত ধর্ম মণ্ডলের কিছু সদস্যের আগমন।

১৫ ফেব্রুয়ারি, পুনা পরিদর্শনের জন্য সেখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ কিন্তু সেই সময় যাওয়া সম্ভব নয় এই সংবাদ জ্ঞাপন।

১৬ ফেব্রুয়ারি, হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বাবা সরাফউদ্দীনের কবর এবং সালারজঙ্গের প্রাসাদ পরিদর্শন।

১৭ ফেব্রুয়ারি, হায়দরাবাদ পরিত্যাগ—বিদায় জানাবার জন্য সহস্রাধিক লোকের স্টেশনে উপস্থিতি।

মাদ্রাজে উপস্থিতি। ধর্মালোচনায় ও বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় অংশগ্রহণ।

মার্চ/এপ্রিল, মাদ্রাজী ভক্তগণ-কর্তৃক পাশ্চাত্যগমনের ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থসংগ্রহ। একান্ত ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমলের নেতৃত্বে শিষ্যগণের দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা। অর্থ-সংগ্রহকারীদের প্রতি নির্দেশঃ পাশ্চাত্যগমন যদি মায়ের ইচ্ছা হয় তাহলে তার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করতে হবে কারণ আমি জনসাধারণ এবং দরিদ্রের জন্যই পাশ্চাত্যে যাচ্ছি।

থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রধান কার্যালয়ে বক্তৃতা।
পাশ্চাত্যগমনে শ্রীমা সারদাদেবীর অনুমোদন পত্র লাভ।
এপ্রিল, দ্বিতীয় সপ্তাহ, মুন্সী জগমোহন লালের মাদ্রাজে উপস্থিতি এবং ক্ষেত্রী যাওয়ার জন্য মহারাজের অনুরোধ জ্ঞাপন।
ক্ষেত্রীর পথে বোম্বাইয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
কালীপদ ঘোষের আতিথ্যগ্রহণ।
ভাপিন্‌গানা ও জয়পুরে যাত্রাবিরতি।
২১ এপ্রিল, ক্ষেত্রীতে উপস্থিতি ও মহারাজার পুত্রসন্তান-লাভের উৎসবে যোগদান। মহারাজার অনুরোধে এতাবৎকাল ব্যবহৃত 'স্বামী সচ্চিদানন্দ' নামের পরিবর্তে 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ।
১০ মে, ক্ষেত্রী পরিত্যাগ।
আবু রোডে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে মিলন। তুরীয়ানন্দকে মঠে ফিরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ। 'হরি ভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে!'
৩১ মে, 'পেনিনসুলা'র জাহাজে বোম্বাই থেকে বিদেশ যাত্রা।
জুন, কলম্বোয় উপস্থিতি। শহর পরিদর্শন।
পেনাঙে (মালয়) উপস্থিতি।
সিঙ্গাপুরে উপস্থিতি। মিউজিয়াম ও বোটানিক্যাল গার্ডেন দর্শন।
হংকং-এ উপস্থিতি। তিন দিনের যাত্রা বিরতির সুযোগে ক্যান্টন পরিদর্শন। কয়েকটি মন্দির দর্শন। বৌদ্ধমঠ পরিদর্শনের ইচ্ছা কিন্তু বিদেশীদের নিকট মঠ-প্রবেশ নিষিদ্ধ। অদম্য ইচ্ছায় বৌদ্ধমঠে প্রবেশ এবং মারমুখী সন্ন্যাসীদের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে নিজেকে 'ভারতীয় যোগী' রূপে পরিচয় দেওয়ায় অবস্থার পরিবর্তন এবং মঠ পরিদর্শন।
নাগাসাকির পথে।
জুলাই, জাপান দেখার অভিপ্রায়ে কোবি-তে জাহাজ ত্যাগ করে স্থলপথে ইয়োকোহামায় উপস্থিতি। ওসাকা, কিয়োটো এবং টোকিও দর্শন।
১৪ জুলাই, 'এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া' জাহাজে ইয়োকোহামা পরিত্যাগ করে ভ্যাঙ্কুবারের পথে।
২৫ জুলাই, সন্ধ্যা সাতটায় ভ্যাঙ্কুবারে উপস্থিতি।
৩০ জুলাই, রাত সাড়ে দশটায় শিকাগো নগরে উপস্থিতি।
শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিত্ব করার নানাবিধ অসুবিধা ও অনিশ্চয়তা।
আগস্ট, দ্বিতীয় সপ্তাহ, খরচের জন্য এবং ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের অনিশ্চয়তার জন্য অপেক্ষাকৃত সুলভে জীবনযাত্রা নির্বাহের উদ্দেশ্যে বোস্টন যাত্রা। ট্রেনে শ্রীমতী ক্যাথেরিন এবট স্যানবর্নের সঙ্গে পরিচয়।

'ব্রিজি মেডোজে' শ্রীমতী স্যানবর্নের আতিথ্যগ্রহণ।

২২ আগস্ট, সারবোর্ন রিফরমেটারী ফর উইমেনে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী'।

২৪ আগস্ট, শ্রীমতী স্যানবর্নের ভ্রাতা এফ. বি. স্যানবর্নের সঙ্গে বোস্টনে উপস্থিতি।

২৫ আগস্ট, অ্যানিস্কোয়াম (ম্যাসাচুসেট্স্)-এ মিস্টার হেনরী রাইটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

২৬-২৭ আগস্ট, হেনরী রাইটের আতিথ্যগ্রহণ।

হেনরী রাইটের নিকট পরিচয়পত্র-লাভ ও ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের ব্যবস্থা। অ্যানিস্কোয়াম চার্চে বক্তৃতা।

২৮ আগস্ট, অ্যানিস্কোয়াম পরিত্যাগ করে সালেমে। 'থট অ্যাণ্ড ওয়ার্ক ক্লাবে'র উদ্যোগে ওয়েস্‌লি চ্যাপেলে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'হিন্দুধর্ম ও হিন্দুপ্রথা'। যাজকদের সঙ্গে প্রথম সঙ্ঘাত।

বিদুষী সাহিত্যিক শ্রীমতী কেট ট্যানাট উডস্-এর গৃহে এক সপ্তাহের জন্য আতিথ্যগ্রহণ।

২৯ আগস্ট, শ্রীমতী উডস্-এর উদ্যানে বালক-বালিকাদের সামনে 'ভারতীয় বালক-বালিকাদের জীবনরীতি, ক্রীড়াকৌতুক, বিদ্যাশিক্ষা' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা।

৩ সেপ্টেম্বর, ইস্ট চার্চ (সালেম)-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতের ধর্ম ও দরিদ্র স্বদেশবাসী'।

৪ সেপ্টেম্বর, সারাটোগা স্প্রিংস-এর উদ্দেশে সালেম পরিত্যাগ।

৫ সেপ্টেম্বর, আমেরিকান সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতে মুসলিম শাসন'।

৬ সেপ্টেম্বর সকালে, সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার'।

সন্ধ্যায়, উপরোক্ত সম্মেলনে আলোচনা।

৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, ট্রেনে শিকাগো যাত্রা।

৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, শিকাগোয় উপস্থিতি—স্টেশনে মাল রাখার জায়গায় একটা খালি বাক্সের (মতান্তরে মালগাড়িতে) মধ্যে রাত্রিযাপন।

১০ সেপ্টেম্বর সকালে, শিকাগোর পথে ভিক্ষায়। শ্রীমতী জর্জ হেলের গৃহের অদূরে প্রায় অবসন্ন অবস্থায় অবস্থান। শ্রীমতী হেল-কর্তৃক নিজগৃহে স্থানদান। মিস্টার জন বি. লায়নের ২৬২ মিশিগান এভিনিউর বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ।

১১ সেপ্টেম্বর, ধর্মমহাসভা শুরু। বৈকালিক অধিবেশনে ভাষণ—'সম্বোধন বাক্য' (আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ) উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অভিনন্দন। সন্ধ্যায়, শ্রী ও শ্রীমতী বার্লেটের গৃহে মিস্টার জে. এইচ.

ব্যারোজ-কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনাসভায়।

১২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, শ্রীমতী চার্লস সি. বনি আয়োজিত সম্বর্ধনাসভায়।

১৪ সেপ্টেম্বর, শ্রীমতী পটার পামার আয়োজিত প্রীতিসম্মেলনে সংক্ষিপ্ত ভাষণ। বিষয়ঃ 'ভারতীয় নারীসমাজ'।

১৫ সেপ্টেম্বর, ধর্মমহাসভায় ভাষণ।

১৯ সেপ্টেম্বর, ধর্মমহাসভায় 'হিন্দুইজম' (হিন্দুধর্ম) শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ।

২০ সেপ্টেম্বর সকালে, ধর্মমহাসভায় ভাষণ—খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের কার্যকলাপ বিষয়ে।

২২ সেপ্টেম্বর সকালে, বিজ্ঞান বিভাগে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম এবং বেদান্তদর্শন'।

বিকালে, বিজ্ঞান বিভাগে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতে বর্তমান ধর্মসমূহ'।

সন্ধ্যায়, আর্ট ইনস্টিটিউটের ৭নং কক্ষে শ্রীমতী পটার পামার আয়োজিত বিশেষ অধিবেশনে 'প্রাচ্য ধর্মে নারী' সম্পর্কে আলোচনা।

২৩ সেপ্টেম্বর, 'ইউনিভার্সাল রিলিজিয়াস ইউনিটি কংগ্রেস' (ধর্মমহাসম্মেলনের সঙ্গে সংযুক্ত)-এ বক্তৃতা।

২৪ সেপ্টেম্বর, (ধর্মসম্মেলনের বাইরে) শিকাগোর 'তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চে' বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'দি লাভ অব গড' (ঈশ্বরপ্রেম)।

২৫ সেপ্টেম্বর, বিজ্ঞান বিভাগে বক্তৃতাঃ 'হিন্দুধর্মের সারাংশ'।

২৬ সেপ্টেম্বর, বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আলোচনা-সভায় বক্তৃতা।

২৭ সেপ্টেম্বর, সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ।

৩০ সেপ্টেম্বর, ইভনস্টন নগরে তিনটি বক্তৃতার প্রথমটিঃ 'হিন্দু অলট্রুইজম' (হিন্দুদের পরমতে শ্রদ্ধা)।

৩ অক্টোবর, দ্বিতীয় বক্তৃতাঃ 'মনিজম' (অদ্বৈতবাদ)।

৫ অক্টোবর, তৃতীয় বক্তৃতাঃ 'রিইনকারনেশন' (পুনর্জন্মবাদ)।

৭ অক্টোবর, স্ট্রিয়াটর-এর 'প্লাম্ব অপেরা হাউস'-এ বক্তৃতাঃ 'ভারতের রীতিনীতি'।

৯ অক্টোবর, স্ট্রিয়াটর থেকে শিকাগোয় প্রত্যাবর্তন। হেল পরিবারে অবস্থান। শিকাগো ও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে বক্তৃতা।

২৭ অক্টোবর, 'ফর্টনাইটলি অব শিকাগো'য় (বা লেডিজ ফর্টনাইটলি ক্লাব-এ) বক্তৃতাঃ 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস'।

সম্ভবত এই সময় 'স্লেটন লাইসিয়াম লেকচার ব্যুরো'র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

২০ নভেম্বর, শিকাগো পরিত্যাগ। ম্যাডিসনে উপস্থিতি ও সন্ধ্যায় বক্তৃতা।

২১ নভেম্বর, মিনিয়াপোলিসে উপস্থিতি।

২৪ নভেম্বর সন্ধ্যায়, মিনিয়াপোলিসে 'প্রথম ইউনিটেরিয়ান চার্চে' বক্তৃতাঃ 'হিন্দুধর্ম'।

২৬ নভেম্বর, পূর্বোক্ত স্থানে বক্তৃতাঃ 'ভারতের ধর্মসমূহ'।

২৭ নভেম্বর, ডিময়েন-এ (আইওয়া স্টেটে) বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'হিন্দুধর্ম' এবং প্রীতিসম্মেলনে আলোচনা—বিষয়ঃ 'ভারতের রীতিনীতি'।

২৮ নভেম্বর, ডিময়েন-এ খ্রীষ্টান চার্চ-এ বক্তৃতাঃ 'পুনর্জন্ম'।

১৮৯৪—১৩ জানুয়ারি, নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী ক্লাবের আমন্ত্রণে মেমফিস-এ উপস্থিতি। সন্ধ্যায় শ্রীমতী এস. আর. শেফার্ড আয়োজিত সম্বর্ধনাসভায়।

১৪ জানুয়ারি, মেমফিস কমার্শিয়াল-এর সংবাদদাতা-কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

১৫ জানুয়ারি, নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী ক্লাবে বক্তৃতা ও পরে সম্বর্ধনা।

১৬ জানুয়ারি, অডিটোরিয়াম-এ বক্তৃতাঃ 'হিন্দুধর্ম'।

১৭ জানুয়ারি, উইমেনস কাউন্সিলের সভায় বক্তৃতাঃ 'মানুষের ভাগ্য'।

১৯ জানুয়ারি, লা স্যালিট একাডেমিতে বক্তৃতাঃ 'পুনর্জন্ম'।

২০ জানুয়ারি, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতাঃ 'ভারতের রীতিনীতি'।

২১ জানুয়ারি, একই স্থানে আলোচনাসভায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান। ইয়ং মেন্‌স্ হিব্রু অ্যাসোসিয়েশন হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'তুলনামূলক ঈশ্বরতত্ত্ব'।

২২ জানুয়ারি, শিকাগোর উদ্দেশে মেমফিস ত্যাগ।

২৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায়, শিকাগোয় বক্তৃতা।

১২ ফেব্রুয়ারি, ডেট্রয়েটের উদ্দেশে শিকাগো পরিত্যাগ।

রাত্রি একটায় (ইংরেজি মতে ১৩ ফেব্রুয়ারি) ডেট্রয়েটে উপস্থিতি। স্টেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ-কর্তৃক সাদর অভ্যর্থনা ও মিসেস জন. জে. ব্যাগলি-কর্তৃক স্বগৃহে নীত।

১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়, মিসেস ব্যাগলি আয়োজিত সম্বর্ধনাসভায়।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতাঃ 'ভারতীয় রীতিনীতি'। মিশনারী ডবলিউ. এক্স. নিণ্ডের সঙ্গে সঙ্ঘাত।

১৭ ফেব্রুয়ারি, ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'মানুষের দেবত্ব'।

২০ ফেব্রুয়ারি, ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতাঃ 'ঈশ্বরপ্রেম'।

২১ ফেব্রুয়ারি, মিসেস ব্যাগলির গৃহে বক্তৃতাঃ 'প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণ ও তাঁহাদের শিক্ষা'।

২২ ফেব্রুয়ারি, মিসেস ব্যাগলি আয়োজিত বিদায়সভায়।

২৩ ফেব্রুয়ারি, আডা (ওহিও) যাত্রা। সন্ধ্যায় বক্তৃতাঃ 'মানুষের দেবত্ব'। ডেট্রয়েট পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ-কর্তৃক প্রবলভাবে আক্রমণ শুরু।

৯ মার্চ, ডেট্রয়েট প্রত্যাবর্তন। ব্যাগলি পরিবারে আতিথ্যগ্রহণ।

১০ মার্চ, টমাস উইদারেন পামারের আমন্ত্রণে তাঁর আতিথ্যগ্রহণ।

১১ মার্চ, ডেট্রয়েট অপেরা হাউসে বক্তৃতাঃ 'ভারতে খ্রীষ্টীয় মিশন'।

১৫ মার্চ, এবার ডবলিউ কটরেল আয়োজিত নৈশ ভোজসভায়।

১৬ মার্চ, মিস্টার পামার আয়োজিত নৈশ ভোজসভায়।
১৯ মার্চ, অডিটোরিয়াম-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বৌদ্ধধর্ম'।
মিস্টার পামারের চেষ্টায় স্লেটন লেকচার ব্যুরোর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ।
২০ মার্চ, বে সিটিতে (মিশিগান) বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'হিন্দুধর্ম'।
২১ মার্চ, স্যাগিনো (মিশিগান)-তে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ধর্মসমন্বয়'।
২৪ মার্চ, ডেট্রয়েট ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতীয় নারী'।
১ এপ্রিল, নিউইয়র্কে উপস্থিতি। ডক্টর ও শ্রীমতী এগবার্ট গার্নসি-র আতিথ্য-গ্রহণ।
৫ এপ্রিল, ইউনিয়ন লীগ ক্লাব-এর সদস্য ও অন্যান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (বৈঠকী বক্তৃতা)।
১৩ এপ্রিল, নিউইয়র্ক পরিত্যাগ করে নরদ্যাম্পটন-এ উপস্থিতি—একটি বোর্ডিং হাউস-এ অবস্থান।
১৪ এপ্রিল সন্ধ্যায়, নরদ্যাম্পটন সিটি হল-এ বক্তৃতা।
১৫ এপ্রিল, আমেরিকার অন্যতম বিখ্যাত মহিলা কলেজ নরদ্যাম্পটন স্মিথ কলেজের সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভগবানের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব'।
১৬ এপ্রিল, ম্যাসাচুসেট্স্-এর লীন শহরে। মিসেস ফ্রান্সিস ডবলিউ. ব্রীড-এর গৃহে আতিথ্যগ্রহণ।
১৭ এপ্রিল, নর্থ শোর ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতের রীতিনীতি'।
১৮ এপ্রিল, অক্সফোর্ড হল-এ বক্তৃতা।
বোস্টনে। অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
২৪ এপ্রিল, নিউইয়র্ক। ওয়ালডর্ফ হোটেলে শ্রীমতী আর্থার স্মিথের 'আলোচনা চক্রে' বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারত ও হিন্দুধর্ম'।
২৯ এপ্রিল, ডক্টর গার্নসির গৃহে ভোজসভায়।
২ মে, শ্রীমতী মারি ফিলিপস্-এর গৃহে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতবর্ষ ও পুনর্জন্মবাদ'।
৬ মে, বোস্টনে উপস্থিতি।
৭ মে, শ্রীমতী জুলিয়া ওয়ার্ডহাউ-এর 'নিউ ইংল্যাণ্ড উইমেন্স ক্লাব'-এ বক্তৃতা।
৮ মে, র‍্যাডক্লিফ-এ একটি মহিলা কলেজে বক্তৃতা।
১০ মে, মিস্টার কলিজ-এর গৃহে গোলটেবিল-এ বক্তৃতা।
১৪ মে, অ্যাসোসিয়েশন হল-এ টাইলার-স্ট্রীট-এ ডে নার্সারীর সাহায্যকল্পে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতের রীতিনীতি'।
১৫ মে, লরেন্স-এ বক্তৃতাঃ 'ভারতীয় ধর্ম ও রীতিনীতি'।
১৬ মে, টাইলার-স্ট্রীট-এ ডে নার্সারীর সাহায্যকল্পে দ্বিতীয় বক্তৃতাঃ 'ভারতের ধর্মসমূহ'। সন্ধ্যায়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হার্ভার্ড রিলিজিয়াস ইউনিয়নের

উদ্যোগে 'সেভার হল'-এ বক্তৃতা।
গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার জন্য আমেরিকার সাধারণ সামাজিক জীবনে সাময়িক বিরতি। ২৮ জুন পর্যন্ত শিকাগোয় শ্রীমতী হেলের গৃহে অবস্থান।
২৮ জুন, শিকাগো থেকে নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন। থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কক্ষে ল্যাণ্ডসবার্গের সঙ্গে অবস্থান।
২৬ জুলাই, গ্রীনএকারে উপস্থিতি। একদল উৎসাহী ছাত্রছাত্রীর কাছে (যাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী ওলি বুল, ডক্টর লিউইস জি. জেন্‌স) বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যার জন্য দৈনিক ক্লাস গ্রহণ। 'গ্রীনএকারে আমাকে দৈনিক সাত থেকে আট ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে হয়েছে।'
১২ আগস্ট (মতান্তরে ১৩ আগস্ট), প্লীমাথ-এ উপস্থিতি। আর. ডবলিউ ইমারসন প্রতিষ্ঠিত 'ফ্রী রিলিজিয়াস অ্যাসোসিয়েশন'-এ বক্তৃতা।
ডক্টর ও শ্রীমতী গার্নসির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পুনরায় ফিস্‌কিল ল্যাণ্ডিং-এর বাড়িতে।
১৬ আগস্ট, অ্যানিস্কোয়ামে। মিসেস ব্যাগলির অতিথি।
৪ সেপ্টেম্বর, অ্যানিস্কোয়ামে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতের ধর্মসমূহ'।
৬ সেপ্টেম্বর, বোস্টনের পথে অ্যানিস্কোয়াম পরিত্যাগ।
বোস্টনে অবস্থান—বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা।
২৯ সেপ্টেম্বর, মেলরোজে উপস্থিতি ও বক্তৃতা।
৩০ সেপ্টেম্বর, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা।
২ অক্টোবর, শ্রীমতী ওলি বুলের আমন্ত্রণে কেম্‌ব্রিজে আগমন এবং তাঁর আতিথ্যগ্রহণ।
১২ অক্টোবর, ব্রুম্যান ভ্রাতৃত্রয়-এর অতিথিরূপে বাল্টিমোরে আগমন। বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীর হোটেলে অবস্থানের জন্য গমন ও বিতাড়িত। অবশেষে 'হোটেল রেন্নার্ট'-এ আশ্রয়লাভ।
বাল্টিমোর আমেরিকান পত্রিকার সাংবাদিক-কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ।
১৩ অক্টোবর, সানডে হেরাল্ড পত্রিকার প্রতিনিধি-কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ।
১৪ অক্টোবর, লাইসিয়াম থিয়েটারে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'প্রগতিশীল ধর্ম'।
২১ অক্টোবর, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বুদ্ধ'।
২২ বা ২৩ অক্টোবর, বাল্টিমোর পরিত্যাগ করে ওয়াশিংটনে। শ্রীমতী এনোক টটেন-এর আতিথ্যগ্রহণ।
২৮ অক্টোবর, পিপলস্‌ চার্চের ধর্মযাজকদের অনুরোধে দুইবার বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'সর্বধর্মের সাধারণ উৎস ও আর্যজাতি'।
১ নভেম্বর, বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'পুনর্জন্ম'।
২ নভেম্বর, বাল্টিমোরে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারত ও তার ধর্ম'।
নিউইয়র্ক প্রত্যাবর্তন এবং সেখানে সমিতি সংগঠন।
৫-২৭ ডিসেম্বর, কেম্‌ব্রিজে শ্রীমতী ওলি বুলের আবাসে। প্রতিদিন দুইবার

শাস্ত্রব্যাখ্যা—ক্লাস গ্রহণ।

শ্রীমতী বুলের অনুরোধে প্রদত্ত 'ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ' বক্তৃতায় মুগ্ধ শ্রোতাদের পক্ষ থেকে কলকাতায় জননীর নিকট শ্রদ্ধাপত্র ও যীশুক্রোড়ে মেরীর চিত্র প্রেরণ।

২৮ ডিসেম্বর, নিউইয়র্ক ও পরে ব্রুকলীনে এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতার জন্য গমন।

৩০ ডিসেম্বর, এথিক্যাল সোসাইটি আয়োজিত পাউচ ম্যানসনে সন্ধ্যায় বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতীয় ধর্মসমূহ'। দৈনিক ক্লাস নেওয়ার জন্য অনুরোধ ও স্বীকৃতি। পাউচ ম্যানসন ও অন্যত্র ক্লাস নেওয়া ও বক্তৃতার ব্যবস্থা। ক্লাসের জন্য অর্থগ্রহণে আপত্তি।

১৮৯৫—১ জানুয়ারি, শিকাগোয় হেল-পরিবারে আকস্মিক উপস্থিতি।

জানুয়ারি, তৃতীয় সপ্তাহ, ব্রুকলীনে উপস্থিতি।

২০ জানুয়ারি, এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পাউচ ম্যানসনে বক্তৃতা।

বিষয়ঃ 'নারীর আদর্শ—হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান'।

২৫ জানুয়ারি, ব্রুকলীনে মিসেস চার্লস আউয়েল-এর গৃহে বৈঠকী আলোচনা। বিষয়ঃ 'উপনিষদ্ ও আত্মা-সম্পর্কিত মতবাদ'।

আমেরিকায় নবপর্যায়ে শিক্ষাদান শুরু—লক্ষ্যঃ কতিপয় প্রকৃত বেদান্তী তৈরী। আমেরিকায় ভারতীয় চিন্তাধারার প্রসারের ভিত্তিস্থাপন।

২৭ জানুয়ারি, নিউইয়র্কে অধ্যাপক ল্যাণ্ডসবার্গ (পরে স্বামী কৃপানন্দ)-কর্তৃক ভাড়া-করা বাড়িতে অবস্থান ও ক্লাস গ্রহণ ব্যবস্থা। বর্ণবিদ্বেষের জন্য উপযুক্ত পল্লীতে স্থান না পাওয়ায় অপেক্ষাকৃত নিম্নপল্লীতে ঘর গ্রহণ এবং ঐচ্ছিক চাঁদায় ভাড়া পরিশোধের ব্যবস্থা।

ব্রুকলীনে প্রদত্ত 'ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ' বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া। রমাবাঈ গোষ্ঠীর তীব্র আক্রমণ, ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে অপবাদ রটনা—সংবাদপত্রে উভয়পক্ষের সমর্থকদের বাদানুবাদ।

২৯ জানুয়ারি, ৫৪ ওয়েস্ট ৩৩ নং স্ট্রীটের বাড়িতে মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

ব্রুকলীনে উপস্থিতি ও বৈঠকী আলোচনা।

৩ ফেব্রুয়ারি, ব্রুকলীন পাউচ ম্যানসনে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বৌদ্ধধর্ম—ভারতে যেভাবে গৃহীত হয়'।

১৭ ফেব্রুয়ারি, এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে পাউচ ম্যানসনে বক্তৃতা। শ্রীমতী করবিনের সংরক্ষণাগারে প্রতি রবিবার ক্লাস গ্রহণ শুরু।

২৫ ফেব্রুয়ারি, ব্রুকলীন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত লঙ্গ আইল্যাণ্ড হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি-র হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বিশ্বে ভারতের দান'।

২৮ ফেব্রুয়ারি, শ্রীমতী ওলি বুল আয়োজিত মিস্টার ও মিসেস এ. এল.

বারবার-এর ৮৭১ ফিফথ এভিনিউ-এর গৃহে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বেদান্তদর্শন—আত্মা'।

৭ মার্চ, বারবার বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বেদান্তদর্শন—ঈশ্বর'।

৮ মার্চ, হার্টফোর্ড মেটাফিজিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'আত্মা ও ঈশ্বর'। ৭ এপ্রিল, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু বিধবাশ্রমের সাহায্যকল্পে ব্রুকলীনে বক্তৃতা।

বিষয়ঃ 'হিন্দুদের কয়েকটি রীতিনীতি—তাদের প্রকৃত অর্থ এবং তাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা'।

১১ এপ্রিল, মিস এণ্ড্রুজ-এর গৃহে ক্লাস গ্রহণ। ঠিকানাঃ ৪০ ওয়েস্ট নাইন্থ স্ট্রীট।

১৩ এপ্রিল, মিস্টার লেগেটের গ্রামের বাড়ি রিজলি ম্যানরে।

২৩ এপ্রিল, নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন। ৫৪ ওয়েস্ট ৩৩ নং স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে অবস্থান।

১৩ মে, মট্স মেমোরিয়াল বিল্ডিং-এর উপরের হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ধর্মবিজ্ঞান'।

উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'যোগের যৌক্তিকতা'।

১ জুন, নিউইয়র্কে প্রথম দফা ক্লাসের সমাপ্তি।

৪ জুন, নিউইয়র্ক ত্যাগ করে মিস্টার ফ্রান্সিস লেগেটের নিউ হ্যাম্পসায়ার-স্থিত হোয়াইট মাউন্টেনের মাছ ধরার ক্যাম্পের উদ্দেশে যাত্রা।

৬ জুন, বেলা একটায় লেগেটের বার্চ লজে উপস্থিতি। নিউইয়র্ক থেকে স্টীমার-এ পোর্টল্যান্ড এবং সেখান থেকে ট্রেনে পার্শি।

১৮ জুন সন্ধ্যায়, সহস্রদ্বীপোদ্যানে (থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক) উপস্থিতি। শ্রীমতী মেরি এলিজাবেথ ডাচারের আতিথ্যগ্রহণ এবং সেখানে নিয়মিত ধর্ম-আলোচনার ব্যবস্থা। বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীঃ (১) শ্রীমতী এস. ই. ওয়াল্ডো (২) শ্রীমতী রুথ এলিস (৩) শ্রীমতী ডাচার (গৃহকর্ত্রী) (৪) ডাক্তার এল. এল. ওয়াইট (৫) শ্রীমতী ক্যাম্পবেল (অভিনেত্রী) (৬) ফ্রান্সিস গুডইয়ার (৭) ওয়াল্টার গুডইয়ার (৮) শ্রীমতী মেরী লুই (৯) ল্যাণ্ডস্‌বার্গ (১০) সিস্টার ক্রিস্টিন (১১) শ্রীমতী মেরি সি. ফাঙ্কি (১২) অজ্ঞাত।

১৯ জুন, ক্লাস শুরু। এই বক্তৃতাগুলিই পরে 'ইন্‌সপায়ারড টক্‌স' বা 'দেববাণী'-রূপে প্রকাশিত।

৭ জুলাই, শ্রীমতী মারি লুইসকে সন্ন্যাসদান (স্বামী অভয়ানন্দ)।

২২ জুলাই, ল্যাণ্ডসবার্গকে সন্ন্যাসদান (স্বামী কৃপানন্দ)।

শ্রীমতী ক্রিস্টিনকে ব্রহ্মচর্যদান।

২৩ জুলাই, 'সন্ন্যাসীর গীতি' রচনা।

২৭ জুলাই, ওক্ আইল্যাণ্ড বীচে প্রেরিত ভাষণ পাঠ।

৩০ জুলাই, জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাই-এর মৃত্যুতে শোক—মিসেস হেলকে এই মর্মে পত্র।
৮ আগস্ট, নিউইয়র্কে উপস্থিতি।
১৭ আগস্ট, ইউরোপ যাত্রা।
২৪ আগস্ট, প্যারিসে উপস্থিতি।
৯ সেপ্টেম্বর, ফ্রান্সিস লেগেট ও বেটি স্টার্জিসের বিবাহে উপস্থিতি।
১০ সেপ্টেম্বর, লণ্ডনে উপস্থিতি ও সেখান থেকে সোজা রিডিং-এ ই. টি. স্টার্ডির আবাসে।
স্টার্ডির সঙ্গে একযোগে নারদীয়ভক্তিসূত্রের অনুবাদের কাজ শুরু।
১৭ অক্টোবর, মেডেনহেড-এর টাউনহল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'প্রেম সম্পর্কে প্রাচ্য মতবাদ'।
২২ অক্টোবর, লণ্ডনে প্রিন্সেস হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'আত্মজ্ঞান'।
২৯ অক্টোবর, লণ্ডনে ৮০ ওক্‌লে স্ট্রীটের আবাসে অবস্থিতি।
৩০ অক্টোবর, শেষ ক্লাস চামিয়ারের গৃহে।
নভেম্বর, নতুন আবাসে ক্লাস আরম্ভ। প্রায় সারা নভেম্বর মাস সপ্তাহে আটটি করে ক্লাস গ্রহণ।
৫ নভেম্বর, বেলুন সোসাইটিতে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য সমাজ'। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা-অনুসারে বক্তৃতার বিষয়ঃ 'বেদান্তের আলোকে মানুষ ও সমাজ'।
১০ নভেম্বর, কনওয়ে এথিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে মনকিওর সাউথ প্লেস চ্যাপেলে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বেদান্ত-নীতিবাদের ভিত্তি'।
সন্ধ্যায়, লেডি ইসাবেল মার্গেসিন-এর ৬৩ সেন্ট জর্জেস রোডের বাড়িতে বক্তৃতা। মিস মার্গারেট নোবেল (ভগিনী নিবেদিতা)-এর প্রথম উপস্থিতি।
১৬ নভেম্বর, কুইন্স হাউস-এ মিসেস হাওয়েস-এর বৈঠকখানায় বক্তৃতা।
২৭ নভেম্বর, নিউইয়র্কের পথে লিভারপুল পরিত্যাগ।
৬ ডিসেম্বর, নিউইয়র্কে উপস্থিতি। ২২৮ ওয়েস্ট ৩৯ স্ট্রীট-এ দুই কামরার ভাড়াবাড়িতে অবস্থান।
৯ ডিসেম্বর, নতুন ক্লাস শুরু—প্রাথমিক বক্তৃতা।
১১ ডিসেম্বর, সকালে ও সন্ধ্যায় ক্লাস—'জ্ঞানযোগ'।
১২ ডিসেম্বর, দ্রুত লিপিকারের জন্য নিউইয়র্ক হেরাল্ড ও নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড-এ বিজ্ঞাপন।
জে. জে. গুডউইনের নিযুক্তি।
১৩ ডিসেম্বর, সকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাস—'কর্মযোগ'।
১৪ ডিসেম্বর, সকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাস—'রাজযোগ'।
১৫ ডিসেম্বর, প্রশ্নোত্তর ক্লাস।
১৬ ডিসেম্বর, সকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাসঃ 'ভক্তিযোগ'।

১৮ ডিসেম্বর, সকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাস ঃ 'জ্ঞানযোগ'।

২০ ডিসেম্বর, সকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাস ঃ 'কর্মযোগ'।

২১ ডিসেম্বর, সকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাস ঃ 'রাজযোগ'।

২২ ডিসেম্বর, প্রশ্নোত্তর ক্লাস।

২৩ ডিসেম্বর, সকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাস ঃ 'ভক্তিযোগ'।

২৪ ডিসেম্বর, খ্রীষ্টমাস যাপনের জন্য লেগেট দম্পতির আবাস 'রিজলি ম্যানর' অভিমুখে যাত্রা।

১৮৯৬ — ৫ জানুয়ারি, 'হার্ডম্যান হল'-এ বক্তৃতা। রবিবারের বক্তৃতামালা শুরু। বিষয় ঃ 'ধর্মের দাবি—তার সত্যতা ও উপযোগিতা'।

৬ জানুয়ারি, সকাল ও বিকালে ভক্তিযোগের প্রাথমিক ক্লাস গ্রহণ।

৮ জানুয়ারি, জ্ঞানযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।

১০ জানুয়ারি, প্রশ্নোত্তরের ক্লাস।

১১ জানুয়ারি, রাজযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।

১২ জানুয়ারি, রবিবারের বক্তৃতামালা। 'হার্ডম্যান হল'-এ দ্বিতীয় বক্তৃতা। বিষয় ঃ 'বিশ্বধর্মের আদর্শ'।

১৫ জানুয়ারি, জ্ঞানযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।

১৭ জানুয়ারি, ব্রুকলীন মেটাফিজিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা। বিষয় ঃ 'অমরত্ব'।

১৯ জানুয়ারি, রবিবারের বক্তৃতামালা। তৃতীয় বক্তৃতা ঃ 'সৃষ্টিরহস্য—নিখিল বিশ্ব'।

২০ জানুয়ারি সকাল, ভক্তিযোগ-এর প্রাথমিক শ্রেণীর শেষ ক্লাস।

২২ জানুয়ারি, জ্ঞানযোগের প্রাথমিক ছাত্রদের ক্লাস।

২৪ জানুয়ারি, প্রশ্নোত্তরের ক্লাস।

২৫ জানুয়ারি, রাজযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।

২৬ জানুয়ারি, রবিবারের বক্তৃতামালা। চতুর্থ বক্তৃতা ঃ 'সৃষ্টিরহস্য—নিখিল বিশ্ব'।

২৭ জানুয়ারি, ভক্তিযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।

৩১ জানুয়ারি, হার্টফোর্ড ইউনিটি হল-এ বক্তৃতা ঃ 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ'।

২ ফেব্রুয়ারি, ব্রুকলীন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এ বক্তৃতা। বিষয় ঃ 'ভগবান সম্পর্কে হিন্দু-ধারণা—আত্মা'।

৩ ফেব্রুয়ারি, ভক্তিযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।

৮ ফেব্রুয়ারি সকালে, রাজযোগের প্রাথমিক ক্লাস। বিকালে, রাজযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।

৯ ফেব্রুয়ারি, ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন-এ রবিবারের বক্তৃতামালা ঃ 'ভক্তিযোগ'।

১০ ফেব্রুয়ারি, ভক্তিযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
১৩ ফেব্রুয়ারি, ডাক্তার স্ট্রীটকে সন্ন্যাসদান।
১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে, রাজযোগের প্রাথমিক ক্লাস। রাজযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
১৬ ফেব্রুয়ারি, ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন-এ রবিবারের বক্তৃতামালা ঃ 'প্রকৃত ও আপাত মানুষ'।
১৭ ফেব্রুয়ারি, ভক্তিযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
২০ ফেব্রুয়ারি, কয়েকজন বিদেশী ও বিদেশিনীকে সন্ন্যাসদান।
২১ ফেব্রুয়ারি সকালে, রাজযোগের প্রাথমিক ক্লাস।
বিকালে, রাজযোগের অগ্রসর ছাত্রদের ক্লাস।
২৩ ফেব্রুয়ারি, ম্যাডিসন স্কোয়ারে রবিবারের শেষ বক্তৃতা। বিষয় ঃ 'মদীয় আচার্যদেব'।
৩ মার্চ, ডেট্রয়েট যাত্রা।
৪ মার্চ সকালে ও বিকালে, প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তৃতা। বিষয় ঃ 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ'।
১৫ মার্চ, বক্তৃতা ঃ 'বিশ্বের দরবারে ভারতের বাণী'।
এছাড়া ডেট্রয়েটে বাইশটি ক্লাস গ্রহণ।
১৮ বা ১৯ মার্চ, বোস্টনে প্রকোপিয়া ক্লাব-এ উপস্থিতি।
২১ মার্চ, প্রকোপিয়া ক্লাব-এ বক্তৃতা। বিষয় ঃ 'কর্মবিজ্ঞান'।
২২ মার্চ, শ্রীমতী ওলি বুলের গৃহে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে প্রস্তুতিমূলক বক্তৃতা।
২৩ মার্চ, প্রকোপিয়া ক্লাব-এ বক্তৃতা। বিষয় ঃ 'ভক্তি'।
২৪ মার্চ, শ্রীমতী ওলি বুলের গৃহে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে প্রস্তুতিমূলক বক্তৃতা।
২৫ মার্চ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে বক্তৃতা ঃ 'বেদান্তদর্শন'। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যদর্শন বিভাগের প্রধান আচার্যের পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।
২৬ মার্চ, প্রকোপিয়া ক্লাব-এ বক্তৃতা। বিষয় ঃ 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ'।
২৭ মার্চ, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয় ঃ 'অনুভূতি বা চরম ধর্ম'।
২৮ মার্চ বিকালে, 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাব'-এ বক্তৃতা। বিষয় ঃ 'বেদান্তের ব্যবহারিক দিক ও অন্যান্য দর্শনের সাথে এর পার্থক্য'।
সন্ধ্যায়, প্রকোপিয়া ক্লাব-এ দুটি বক্তৃতা। প্রথমটির বিষয় ঃ 'উপলব্ধি বা ধর্মের চরম পরিণতি'। দ্বিতীয়টি ঃ 'উপনিষদ্'।
৩০ মার্চ, বোস্টন হতে শিকাগো যাত্রা।
কয়েকটি ক্লাস গ্রহণ।
১১ এপ্রিল, নিউইয়র্ক প্রত্যাবর্তন।

১৩ এপ্রিল, 'বেদান্ত সোসাইটি'র অনুরাগীদের কাছে ক্ষুদ্র ভাষণ : 'বেদান্তের মূল তত্ত্ব ও আমেরিকায় তার প্রয়োগ'।
১৫ এপ্রিল, লণ্ডনের পথে নিউইয়র্ক ত্যাগ। লিভারপুল থেকে রিডিং-এ। মিস্টার স্টার্ডির আতিথ্যগ্রহণ।
কয়েকদিন মিস মূলারের আতিথ্যগ্রহণ।
এক সপ্তাহ পরে, লণ্ডনে। লেডি ইসাবেল মার্গেসনের ভাড়াবাড়িতে অবস্থান।
সঙ্গে স্বামী সারদানন্দ, গুডউইন, জন পি. ফক্স ও মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
৭ মে, ক্লাস আরম্ভ (৭ মে থেকে ১৬ জুলাই তারিখ পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে পাঁচটি করে ক্লাস গ্রহণ)।
১২ মে, সিসেম ক্লাব-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'শিক্ষা'।
২৮ মে, অক্সফোর্ড-এ ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎকার।
৭ জুন, রবিবারের বক্তৃতামালা শুরু। বিষয় : 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা'। স্থান : 'প্রিন্সেস হল'।
১০ জুন, শ্রীমতী জন বিডাল্‌প্‌ মার্টিনের গৃহে বক্তৃতা। বিষয় : 'আত্মা সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা'।
১৪ জুন, রবিবারের বক্তৃতামালা। বিষয় : 'বিশ্বধর্ম'।
২১ জুন, রবিবারের বক্তৃতামালা। বিষয় : 'প্রকৃত ও আপাত মানুষ'।
২৮ জুন, রবিবারের দ্বিতীয় বক্তৃতামালা শুরু। বিষয় : 'ভক্তিযোগ'।
৫ জুলাই, রবিবারের দ্বিতীয় বক্তৃতামালা। বিষয় : 'ত্যাগ'।
৯ জুলাই, অ্যানি বেসান্তের আমন্ত্রণে থিয়সফিস্ট ব্লাভাটস্কি লজ-এ বক্তৃতা। বিষয় : 'ভক্তিযোগ'।
১২ জুলাই, রবিবারের দ্বিতীয় বক্তৃতামালা। বিষয় : 'উপলব্ধি'।
১৮ জুলাই, লণ্ডন হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন-এ (মন্টেগু ম্যানসন) গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডে অবস্থিত ভারতীয়দের সভায় সভাপতিত্ব।
১৯ জুলাই, লণ্ডন ত্যাগ। ডোভার, ক্যালে, প্যারিস হয়ে জেনেভায়।
স্যামেনিক্স—মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক।
লিটল সেন্ট বার্নার্ড-এ খ্রীষ্টান সাধুদের মঠ দর্শন।
জারমট।
লুসার্ন।
শফহজেন।
হাইডেলবার্গ।
কবলেন্স।
কোলোন।
বার্লিন।
৮ সেপ্টেম্বর, কিয়েল নগরে উপস্থিতি।

৯ সেপ্টেম্বর, ডয়সনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
হ্যামবুর্গ।
ব্রেমেন।
১২ সেপ্টেম্বর, আমস্টারডাম।
১৭ সেপ্টেম্বর, হারউইচ বন্দর-অভিমুখে যাত্রা।
১৮ সেপ্টেম্বর, লণ্ডনে উপস্থিতি।
বৈঠকী বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'সভ্যতায় বেদান্তের কার্যকারিতা'।
৮ অক্টোবর, ৩৯ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে সাপ্তাহিক ক্লাস শুরু।
২০ অক্টোবর, সিসেম ক্লাব-এ বক্তৃতা।
নভেম্বর, চারটি রবিবার ওয়েস্ট ক্রোয়েনের ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা।
২১ নভেম্বর, কেম্ব্রিজ 'ইণ্ডিয়ান মজলিস'-এ প্রদত্ত রণজিৎসিংজী ও অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মানার্থে ভোজসভায় বক্তৃতা।
১০ ডিসেম্বর, লণ্ডনে শেষ বক্তৃতাঃ 'অদ্বৈতবেদান্ত'।
১৩ ডিসেম্বর, বিদায়-সম্বর্ধনা।
১৬ ডিসেম্বর, লণ্ডন ত্যাগ।
মিলানে (ইতালী) হেল দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
২১ ডিসেম্বর, রোম।
২৫ ডিসেম্বর, সেন্ট পিটার্স গির্জা পরিদর্শন।
নেপল্‌স্।
৩০ ডিসেম্বর, কলম্বোর পথে নেপল্‌স্ ত্যাগ।

১৮৯৭— ১৫ জানুয়ারি, বেলা চারটায় কলম্বো উপস্থিতি—বিপুল সম্বর্ধনা।
১৬ জানুয়ারি, প্রাচ্যে প্রথম বক্তৃতাঃ 'পবিত্রভূমি ভারত'।
১৭ জানুয়ারি, কচ্ছিকোড শিবমন্দির দর্শন ও পূজা।
১৮ জানুয়ারি, শ্রীযুক্ত চেলিয়া-র গৃহে আমন্ত্রিত।
সন্ধ্যায়, কলম্বো 'পাবলিক হল'-এ বক্তৃতা।
১৯ জানুয়ারি, কলম্বো ত্যাগ—ক্যাণ্ডি নগরে উপস্থিতি।
২০ জানুয়ারি, ঘোড়ার গাড়িতে অনুরাধাপুরম যাত্রা। ডাম্বুল নামক স্থানের কয়েক মাইল দূরে গাড়ির চাকা ভগ্ন—পদব্রজে কেকিরাওয়া ও গরুর গাড়িতে পরদিন বেলা দশটায় অনুরাধাপুরম।
২১ জানুয়ারি, অনুরাধাপুরমে উপস্থিতি।
২২ জানুয়ারি, বোধিবৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন—উক্ত বৃক্ষের নীচে বক্তৃতা।
২৪ জানুয়ারি, জাফনায় উপস্থিতি।
সন্ধ্যায়, মশাল শোভাযাত্রা—হিন্দু মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিপুল সম্বর্ধনা।
বক্তৃতা, বিষয়ঃ 'বেদান্তবাদ'।
ভারতের উদ্দেশে যাত্রা।

২৬ জানুয়ারি, পাম্বানে উপস্থিতি বিকেল ৩ টায়। তিনদিন সেখানে অবস্থান। রামনাদের রাজা-কর্তৃক অভ্যর্থনা।
২৭ জানুয়ারি, রামেশ্বর মন্দির দর্শন।
২৯ জানুয়ারি, রামনাদ অভিমুখে যাত্রা। সন্ধ্যায় উপস্থিতি।
৩১ জানুয়ারি, রামনাদ প্রাসাদ পরিদর্শন। মধ্যরাত্রে পরমকুডি অভিমুখে যাত্রা। মনমাদুরা।
২ ফেব্রুয়ারি, মাদুরা—কলেজে সম্বর্ধনা। কুম্ভকোণমের পথে মাদুরা ত্যাগ।
৩ ফেব্রুয়ারি ভোর চারটা, ত্রিচিনপল্লী স্টেশনে সম্বর্ধনা।
তাঞ্জোর।
কুম্ভকোণম্।
৬ ফেব্রুয়ারি, মাদ্রাজে উপস্থিতি।
৭ ফেব্রুয়ারি, সম্বর্ধনা সভা। ভিক্টোরিয়া হল-এর উদ্যানে গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা।
৯ ফেব্রুয়ারি, ভিক্টোরিয়া হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'আমার সমরনীতি'।
১১ ফেব্রুয়ারি, ভিক্টোরিয়া হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতের ঋষি'।
১২ ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে চারটা, হিন্দু থিয়সফিক্যাল হাইস্কুল পরিদর্শন। সন্ধ্যায়, পাচেয়্যাপ্পা হল-এ 'মাদ্রাজ চেন্নাপুরী অন্নদান সমাজম্'-এর বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব।
১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়, পাচেয়্যাপ্পা হল-এ বক্তৃতাঃ 'জাতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা'।
উপরোক্ত বক্তৃতার পরেই প্যাটারস্ গার্ডেন, রয়পেট্রা-য় গোবিন্দাস আয়োজিত অভ্যর্থনাসভায়।
১৪ ফেব্রুয়ারি, 'হার্মস্টন সার্কাস' তাঁবুতে শেষ সাধারণ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতের ভবিষ্যৎ'।
১৫ ফেব্রুয়ারি, মাদ্রাজ ত্যাগ। জাহাজযোগে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা।
১৮ ফেব্রুয়ারি, বজবজে উপস্থিতি—স্টীমারে রাত্রিযাপন।
১৯ ফেব্রুয়ারি, সকাল সাড়ে সাতটা, স্পেশাল ট্রেনে শিয়ালদহ উপস্থিতি—রাজকীয় সম্বর্ধনা। রিপন কলেজে ঘরোয়া সম্বর্ধনা। বাগবাজারের পশুপতিনাথ বসুর গৃহে মধ্যাহ্নভোজন। বিকালে, আলমবাজার মঠে।
২৮ ফেব্রুয়ারি, শোভাবাজার—রাজবাড়িতে নাগরিক সম্বর্ধনা।
৪ মার্চ, 'স্টার থিয়েটার'-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'সর্বাবয়ব বেদান্ত'।
ডাক্তারী পরীক্ষায় বহুমূত্র রোগ নির্ণয়—বিশ্রামের নির্দেশ।
৭ মার্চ, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে উপস্থিতি।
৮ মার্চ, দার্জিলিঙ যাত্রা। এম. এন. ব্যানার্জীর আতিথ্যগ্রহণ।
১৮ মার্চ, ক্ষেত্রীর মহারাজার কলকাতা আগমন।
২১ মার্চ, ক্ষেত্রীরাজের আগমন সংবাদে কলকাতা প্রত্যাবর্তন। শিয়ালদহ

স্টেশনে ক্ষেত্রীরাজ ও লোহারুর নবাব-কর্তৃক অভ্যর্থনা। বিকালে, রাজার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি—আলমবাজার মঠ পরিদর্শন।

২৩ মার্চ, দার্জিলিঙ প্রত্যাবর্তন।

২৮ এপ্রিল, দার্জিলিঙ থেকে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা।

১ মে, বিকেল ৩টায় বলরাম বসুর গৃহে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনার জন্য সভা।

৫ মে, মঠ-মিশনের সংবিধান গৃহীত। স্বামী যোগানন্দের সঙ্গে মতবিরোধ ও মীমাংসা।

৬ মে সকালে, মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শন।

বিকালে, আলমোড়ার উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ।

৭ মে, লক্ষ্ণৌ-এ রাত্রিযাপন।

৯ মে, কাঠগোদাম স্টেশনে উপস্থিতি।

১১ মে, লোদিয়া থেকে আলমোড়া শোভাযাত্রা—আলমোড়ায় অভ্যর্থনা।

১৮ মে, কুড়ি মাইল দূরে দেউলধার যাত্রা।

১৯ জুন, আলমোড়ায় প্রত্যাবর্তন।

২৭ জুলাই, জেলা স্কুলের সাধারণ সভায় হিন্দীতে বক্তৃতা। বিষয় ঃ 'বেদের উপদেশ—তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক'।

২৮ জুলাই, ইংলিশ ক্লাবে বক্তৃতা।

৩১ জুলাই, সাধারণের জন্য বক্তৃতা।

২ আগস্ট, আলমোড়া ত্যাগ।

ভীমতালে একদিন অবস্থান।

৯ আগস্ট, বেরিলিতে উপস্থিতি। সম্বর্ধনা।

১০ আগস্ট, আর্যসমাজ অনাথ-আশ্রম পরিদর্শন।

১১ আগস্ট, ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা। আর্যসমাজী সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী ঃ 'আয়ু আর মাত্র পাঁচ থেকে ছ-বছর'।

১২ আগস্ট, জ্বরাক্রান্ত। রাত্রে আম্বালা যাত্রা।

১৩ আগস্ট, আম্বালায় উপস্থিতি।

১৬ আগস্ট, লাহোরে। এক অধ্যাপকের অনুরোধে ফোনোগ্রাফে বক্তৃতাদান।

১৯ আগস্ট, হিন্দু-মুসলিম স্কুল পরিদর্শন।

২০ আগস্ট, অমৃতসরে।

৩১ আগস্ট, রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রা।

২ সেপ্টেম্বর, মুরি-তে উপস্থিতি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য বক্তৃতাদান স্থগিত।

৬ সেপ্টেম্বর, বারামূলা যাত্রা।

৮ সেপ্টেম্বর, বারামূলায় উপস্থিতি। নৌকাযোগে শ্রীনগর যাত্রা।

১০ সেপ্টেম্বর, শ্রীনগরে উপস্থিতি। ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্যগ্রহণ।

১৩ সেপ্টেম্বর, রাজপ্রাসাদ পরিদর্শন।

১৪ সেপ্টেম্বর, মহারাজের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভ্রাতা-কর্তৃক অভ্যর্থনা।

২০ সেপ্টেম্বর, হাউসবোটে পামপুর।

২২ সেপ্টেম্বর, হাউসবোটে অনন্তনাগ।

২৩ সেপ্টেম্বর, পদব্রজে মার্তণ্ড। তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগারে অবস্থান ও অনেক সাধুসন্তের সঙ্গে ধর্ম-আলোচনা।

২৪ সেপ্টেম্বর, আচ্ছাবল অভিমুখে যাত্রা।

৮ অক্টোবর, মুরি প্রত্যাবর্তন।

১৪ অক্টোবর, সন্ধ্যায় স্থানীয় বাঙালী ও পাঞ্জাবী অধিবাসিবৃন্দ-কর্তৃক সম্বর্ধনা। প্রত্যুত্তরে ভাষণ দান।

১৬ অক্টোবর, রাওয়ালপিণ্ডি উপস্থিতি। বিদ্বজ্জন-কর্তৃক সম্বর্ধিত।

১৭ অক্টোবর, সাধারণ সভায় বক্তৃতা।

১৮ অক্টোবর, আর্যসমাজী ও মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ দূরীকরণ প্রচেষ্টা।

২০ অক্টোবর, জম্মু যাত্রা।

২১ অক্টোবর, জম্মুতে উপস্থিতি।

২২ অক্টোবর, মহারাজের সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার।

২৩ অক্টোবর, সাধারণ সভায় বক্তৃতা।

২৪ অক্টোবর, পুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন।
বিকালে, সাধারণ সভায় বক্তৃতা।

২৯ অক্টোবর, মহারাজের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার—বিদায় সম্বর্ধনা।

৩১ অক্টোবর, শিয়ালকোটে উপস্থিতি। বক্তৃতা, বিষয়ঃ 'ধর্ম'। হিন্দীতে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভক্তি'।

৫ নভেম্বর, লাহোরে উপস্থিতি। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভবনে অবস্থান।
সাধারণ বক্তৃতা ঃ 'আমাদের সামনে সমস্যা'।

৯ নভেম্বর, সাধারণ বক্তৃতা হিন্দীতে। বিষয়ঃ 'ভক্তি'।

১২ নভেম্বর, লাহোর কলেজের ছাত্রদের ব্যবস্থাপনায় বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বেদান্ত'।

১৪ নভেম্বর, লাহোর টাউন হলের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নাগরিক সম্বর্ধনা।

১৫ নভেম্বর, দেরাদুনের পথে লাহোর ত্যাগ।
দেরাদুনে ব্রহ্মসূত্রের রামানুজভাষ্য বিষয়ে ক্লাস গ্রহণ।

২৬ নভেম্বর, দেরাদুন ত্যাগ করে সাহারানপুর যাত্রা।
দিল্লী।

১ ডিসেম্বর, দিল্লী হতে ক্ষেত্রীর উদ্দেশে ট্রেনে আলোয়ার যাত্রা।
আলোয়ারে রামস্নেহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। দরিদ্র বৃদ্ধার চাপাটি গ্রহণ।

৯ ডিসেম্বর, জয়পুর থেকে ক্ষেত্রী যাত্রা।

১২ ডিসেম্বর, ক্ষেত্রী থেকে বারো মাইল দূরে বাবাই-এ অভ্যর্থনার জন্য

মহারাজ অজিত সিং ও মুন্সী জগমোহনলালের উপস্থিতি।
ক্ষেত্রীতে উপস্থিতি ও বিপুল সম্বর্ধনা।
১৭ ডিসেম্বর, স্থানীয় বিদ্যালয়ে সম্বর্ধনা—পারিতোষিক বিতরণ।
২০ ডিসেম্বর, বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বেদান্তবাদ'।
২১ ডিসেম্বর, রাজার সঙ্গে জয়পুর যাত্রা। রাজা-কর্তৃক তিন হাজার টাকা উপহার।
২৪ ডিসেম্বর, জয়পুরে উপস্থিতি।
২৭ ডিসেম্বর, বক্তৃতা।

১৮৯৮ — ১ জানুয়ারি, জয়পুর ত্যাগ।
খাণ্ডোয়ার পথে কিষেণগড়, আজমীর, যোধপুর এবং ইন্দোর প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়ে গমন।
আনুমানিক তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতায় উপস্থিতি।
২৮ জানুয়ারি, ভগিনী নিবেদিতার কলকাতায় উপস্থিতি। জাহাজঘাটে অভ্যর্থনা।
৩ ফেব্রুয়ারি, বেলুড় মঠের জমির বায়না।
৬ ফেব্রুয়ারি, হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষ প্রতিষ্ঠিত মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিতি। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণামমন্ত্র 'স্থাপকায় চ ধর্মস্য' রচনা।
১৩ ফেব্রুয়ারি, মঠ আলমবাজার থেকে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে স্থানান্তরিত।
১৪ ফেব্রুয়ারি, স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে শ্রীমতী ম্যাকলাউড ও শ্রীমতী ওলি বুলের কলকাতা আগমন।
২২ ফেব্রুয়ারি, শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজা। 'খণ্ডন ভব বন্ধন' আরাত্রিক সঙ্গীত প্রথম গীত। পঞ্চাশ জন অব্রাহ্মণ ভক্তকে গায়ত্রীমন্ত্র ও উপবীত দান।
২৭ ফেব্রুয়ারি, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির কর্তৃপক্ষের আপত্তিতে বেলুড়ের পার্শ্ববর্তী বালীতে পূর্ণচন্দ্র দাঁ-র রাধারমণজীর ঠাকুরবাড়িতে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব পালিত। সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান।
৪ মার্চ, বেলুড় মঠের জমি ক্রয়।
প্রথমভাগে, বেলুড় মঠের পুরাতন বাড়ি সংস্কার করে শ্রীমতী ম্যাকলাউড, শ্রীযুক্তা ওলি বুল ও নিবেদিতার সেখানে অবস্থান।
১১ মার্চ, 'স্টার থিয়েটার'-এ নিবেদিতার বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব।
১৮ মার্চ, 'এমারল্ড থিয়েটার'-এ স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব।
২৫ মার্চ, মার্গারেট নোবলকে নীলাম্বরবাবুর বাগানে মঠ-মন্দিরে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা ও নিবেদিতা নাম প্রদান।

২৯ মার্চ, স্বামী স্বরূপানন্দ ও স্বামী সুরেশ্বরানন্দকে সন্ন্যাস দান।
৩০ মার্চ, দার্জিলিঙের পথে কলকাতা ত্যাগ।
তুষারপাত দর্শনের জন্য সন্দুকফু প্রভৃতি স্থান গমন।
দার্জিলিঙ প্রত্যাবর্তনের পর জ্বর ও সর্দিকাশি।
এপ্রিল, কলকাতায় প্লেগ মহামারী।
৩ এপ্রিল, দার্জিলিঙ হিন্দু পাবলিক হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'হিন্দুধর্ম'।
৩ মে, প্লেগদমনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কলকাতা প্রত্যাবর্তন।
১১ মে, আলমোড়ার উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ—সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, শ্রীমতী ওলি বুল, জোসেফিন ম্যাকলাউড, নিবেদিতা ও আমেরিকান কনসাল জেনারেলের স্ত্রী শ্রীমতী প্যাটারসন।
১৩ মে, নৈনিতালে উপস্থিতি।
১৬ মে, নৈনিতাল ত্যাগ।
১৭ মে, আলমোড়ায় উপস্থিতি।
২৫ মে, সীয়াদেবীতে গমন।
২৮ মে, আলমোড়া প্রত্যাবর্তন।
৩০ মে, হিমালয়ে আশ্রম স্থাপনের জন্য স্থান সংগ্রহের চেষ্টায় আলমোড়া ত্যাগ—সঙ্গে মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ার।
৫ জুন, আলমোড়া প্রত্যাবর্তন—পওহারীবাবা ও গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ লাভ।
১১ জুন, কাশ্মীরের উদ্দেশে আলমোড়া ত্যাগ।
১২ জুন, ভীমতালে।
১৫ জুন, মুরি।
১৮ জুন, শ্রীনগরের উদ্দেশে মুরি ত্যাগ।
ডুলাই ডাকবাংলোয়।
১৯ জুন, বিশ্রামান্তে বারামূলা অভিমুখে যাত্রা।
সন্ধ্যায়, উরি ডাকবাংলোয়।
২২ জুন, শ্রীনগরে—হাউসবোটে।
২৬ জুন, ক্ষীরভবানী।
২৯ জুন, শঙ্করাচার্য-পর্বতের উপরে শিবমন্দির দর্শন।
৪ জুলাই, আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন।
১০ জুলাই, সোনমার্গের পথে অমরনাথ শিবলিঙ্গ দর্শনমানসে কপর্দকহীন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় যাত্রা।
১৫ জুলাই, তুষারবর্ত্ম ধ্বসে রাস্তা যাওয়ার অযোগ্য হওয়ার জন্য প্রত্যাবর্তন।
১৯ জুলাই, সদলবলে নৌকাযোগে অনন্তনাগ অভিমুখে যাত্রা।
দুপুরে এক জঙ্গলের মধ্যে পান্ড্রেস্থান মন্দির আবিষ্কার।

২০ জুলাই, অবন্তীপুরে উপস্থিতি। অসুস্থতা।

২১ জুলাই, বিজবেহার মন্দির।

২২ জুলাই, অনন্তনাগ।

২৩ জুলাই, মার্তণ্ডের ধ্বংসাবশেষ দর্শন।

২৫ জুলাই, আচ্ছাবল। অমরনাথ দর্শনের সঙ্কল্প প্রকাশ—সঙ্গে নিবেদিতা।

২৬ জুলাই, অমরনাথের পথে মার্তণ্ড যাত্রা।

২৭ জুলাই, মার্তণ্ডে, রাত্রিযাপন।

২৮ জুলাই, পহলগাঁও।

৩০ জুলাই, চন্দনবাড়ির পথে।

৩১ জুলাই, ওয়াবজানে তাঁবুতে।

১ আগস্ট, পঞ্চতরণী।

২ আগস্ট, অমরনাথ।

৮ আগস্ট, শ্রীনগর প্রত্যাবর্তন।

২০ আগস্ট, মিস্টার ও মিসেস প্যাটারসনের আমন্ত্রণে ডাল হ্রদে।

৩ সেপ্টেম্বর, পুনরায় আচ্ছাবলের পথে যাত্রা।

৫ সেপ্টেম্বর, আচ্ছাবলে।

১০ সেপ্টেম্বর, পুনরায় মার্তণ্ড-মন্দির দর্শনে যাত্রা।

১১ সেপ্টেম্বর, অসুস্থতার জন্য শ্রীনগর প্রত্যাবর্তন।

৩০ সেপ্টেম্বর, ক্ষীরভবানী মন্দিরে নির্জনবাস।

৬ অক্টোবর, শ্রীনগর প্রত্যাবর্তন।

১১ অক্টোবর, বারামূলায়।

১২ অক্টোবর, রাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোরের উদ্দেশে যাত্রা। লাহোরে।

১৬ অক্টোবর, কলকাতার উদ্দেশে লাহোর ত্যাগ।

১৮ অক্টোবর, কলকাতায় উপস্থিতি।

১৯ ও ২০ অক্টোবর, মঠে হোমক্রিয়া সম্পাদন।

২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর, মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা।

২৭ অক্টোবর, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার আর. এল. দত্ত কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

নভেম্বর, মাঝে মাঝে চিকিৎসার জন্য বলরাম বসুর গৃহে অবস্থান।

১২ নভেম্বর, শ্রীমা-কর্তৃক মঠের নতুন জমি পরিদর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণের পটপূজা।

১৩ নভেম্বর, শ্রীমা-কর্তৃক নিবেদিতার স্কুল উদ্বোধন। অনুষ্ঠানে উপস্থিতি।

৯ ডিসেম্বর, বেলুড় মঠ উদ্বোধন।

১৯ ডিসেম্বর, বৈদ্যনাথধাম (দেওঘর) যাত্রা—সঙ্গে ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ। দেওঘরে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্যগ্রহণ।

২০ ডিসেম্বর, শ্রীমায়ের বেলুড় মঠ পরিদর্শন।

১৮৯৯ — ২ জানুয়ারি, নীলাম্বরবাবুর বাগান থেকে মঠ স্থানান্তরিত।

১৭ জানুয়ারি, অসুস্থতাবৃদ্ধির সংবাদে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী সদানন্দের দেওঘর যাত্রা।

২২ জানুয়ারি, কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

১৯ ফেব্রুয়ারি, নিবেদিতা সমভিব্যাহারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

২৬ ফেব্রুয়ারি, নিবেদিতার বক্তৃতাসভায় উপস্থিতি।

১১ মার্চ, 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার পক্ষ থেকে নিবেদিতা-কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

১৯ মার্চ, বর্তমান বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ জন্মোৎসবে নিবেদিতার ভাষণ শ্রবণ।

২৫ মার্চ, নিবেদিতাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীরূপে দীক্ষা দান।

২৮ মার্চ, বাগবাজারে স্বামী যোগানন্দের শরীরত্যাগের সময় উপস্থিতি। পুনরায় স্বাস্থ্যের অবনতি। কবিরাজ-কর্তৃক সমুদ্রযাত্রার নির্দেশ।

২২ এপ্রিল, 'ক্লাসিক থিয়েটার'-এ নিবেদিতার বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব।

২৬ এপ্রিল, বাগবাজারে গুজরাটী ভক্তদের সম্মুখে হিন্দীতে ভাষণ।

১৭ জুন, মাস্টারমশায়ের (শ্রীম) গৃহে।

১৯ জুন, দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাবার প্রাক্কালে বেলুড় মঠে বিদায় সম্বর্ধনা।

২০ জুন, পাশ্চাত্য যাত্রা—সঙ্গে নিবেদিতা, স্বামী তুরীয়ানন্দ, সতীশ চক্রবর্তী।

২৪ জুন, মাদ্রাজ থেকে আলাসিঙ্গা সঙ্গী।

২৮ জুন, কলম্বো বন্দরে অবতরণ। আলাসিঙ্গার মাদ্রাজ প্রত্যাবর্তন।

৮ জুলাই, এডেন বন্দরে।

৩১ জুলাই, লণ্ডন। বন্দরে অভ্যর্থনায় উপস্থিত ঃ নিবেদিতার মা ও বোন, সিস্টার ক্রিস্টিন, মেরি ফাঙ্কি।

আগস্ট, প্রথমদিকে, উইম্বলডনে।

১৬ আগস্ট, আমেরিকার পথে ট্রেনে গ্লাসগো।

১৭ আগস্ট, 'নুমিডিয়্যান' জাহাজে গ্লাসগো ত্যাগ।

২৮ আগস্ট, নিউইয়র্কে উপস্থিতি।

রিজলি অভিমুখে যাত্রা।

৭ নভেম্বর, রিজলি ত্যাগ করে নিউইয়র্কে।

নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে প্রশ্নোত্তর আসরে সভাপতিত্ব।

নিউইয়র্কে শ্রীমতী লেগেটের গৃহে অবস্থান।

১০ নভেম্বর, সাধারণ সম্বর্ধনা (বেদান্ত সোসাইটির গ্রন্থাগারে)।

ডাক্তার এগবার্ট গার্নসির গৃহে।

ডাক্তার গার্নসি ও ডাক্তার হেলমারের চিকিৎসাধীন—জ্বর ও সর্দি।

২২ নভেম্বর, নিউইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্ণিয়ার উদ্দেশে যাত্রা।

২৩ নভেম্বর, ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের অনুরোধে শিকাগোয় অবতরণ ও হেল পরিবারে আতিথ্যগ্রহণ।

২৭ নভেম্বর, ওয়ালটন প্লেস ফ্ল্যাটে বৈঠকী বক্তৃতা।

৩০ নভেম্বর, লস এঞ্জেলসের পথে শিকাগো ত্যাগ।

৩ ডিসেম্বর, লস এঞ্জেলসে উপস্থিতি। প্রথমে মিস স্পেনসার ও পরে মিসেস এস. কে. ব্লজেটের আতিথ্যগ্রহণ।

৮ ডিসেম্বর, প্রথম বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বেদান্তদর্শন বা ধর্ম হিসাবে হিন্দুধর্ম'।

১২ ডিসেম্বর, ইউনিটি চার্চে সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া একাডেমি অব সায়েন্সেস-এর উদ্যোগে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বসম্পর্কে বেদান্তমত'।

১৯ ডিসেম্বর, ব্ল্যানচার্ড হল-এ ক্লাস গ্রহণ।

২১ ও ২২ ডিসেম্বর, লস এঞ্জেলস 'হোম অব ট্রুথ'-এ ক্লাস গ্রহণ।

২৫ ডিসেম্বর, লস এঞ্জেলস 'হোম অব ট্রুথ'-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বিশ্বের কাছে খ্রীষ্টের বাণী'।

২৬ ডিসেম্বর, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা।

২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর, লস এঞ্জেলস 'হোম অব ট্রুথ'-এ ক্লাস গ্রহণ। বিষয়, যথাক্রমেঃ 'একাগ্রতার তত্ত্ব', 'একাগ্রতার অভ্যাস', 'প্রাণায়াম' ও 'পুনর্জন্ম'।

১৯০০ — ২ জানুয়ারি থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত 'পাইন হল'-এ প্রতিদিন সকাল দশটার সময় ক্লাস গ্রহণ।

২ জানুয়ারি সন্ধ্যায়, ব্ল্যানচার্ড ভবনের বক্তৃতা গৃহে ভাষণ। বিষয়ঃ 'ভারতের জনগণ'।

৬ জানুয়ারি, সন্ধ্যায় উপরোক্ত স্থানে ভাষণ। বিষয়ঃ 'ভারতের ইতিহাস'।

৭ জানুয়ারি, দুপুরে 'পাইন হল'-এ ভাষণ। বিষয়ঃ 'বিশ্বের কাছে খ্রীষ্টের বাণী'।

৮ জানুয়ারি, সন্ধ্যায় উপরোক্ত স্থানে ভাষণ। বিষয়ঃ 'মনের শক্তি'।

প্যাসাডেনায়। মীড-পরিবারে আতিথ্যগ্রহণ।

গ্যাব্রিয়েল পর্বতমালার লাউ নামক শৃঙ্গে আরোহণ।

১৪ জানুয়ারি, ইকো মাউন্টেন হাউসে বক্তৃতা।

১৫ জানুয়ারি, হোটেল গ্রীনে বৈঠকী বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভক্তিযোগ বা প্রেমধর্ম'।

১৬ জানুয়ারি, রেড ল্যাণ্ডস পরিদর্শন।

১৭ জানুয়ারি, গ্রীন হোটেলে বক্তৃতা।

১৮ জানুয়ারি, সেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতীয় নারী'।

২০ জানুয়ারি, সেক্সপীয়র ক্লাব কর্তৃক সম্বর্ধনা।

সেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'পারসিক শিল্পকলা'।

২২ জানুয়ারি, সেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বিশ্বধর্মের আদর্শ'।

২৫ জানুয়ারি, সেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'যোগবিজ্ঞান'।

২৭ জানুয়ারি, সেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'আমার জীবন ও ব্রত'।

২৮ জানুয়ারি, ইউনিভার্সালিস্ট চার্চে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বিশ্বধর্ম'।

৩০ জানুয়ারি, সেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'আর্যজাতি'।

৩১ জানুয়ারি, সেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'রামায়ণ'।

১ ফেব্রুয়ারি, সেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'মহাভারত'।

২ ফেব্রুয়ারি, সেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বৌদ্ধভারত'।

৩ ফেব্রুয়ারি, সেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বিশ্বের মহান আচার্যগণ'।

২২ ফেব্রুয়ারি, সানফ্রানসিস্কোয় উপস্থিতি।

২৩ ফেব্রুয়ারি, গোল্ডেন গেট হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ'।

২৫ ফেব্রুয়ারি, কংগ্রেস অব রিলিজিয়নস-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বর্তমান জগতে হিন্দুধর্মের দাবি'।

২৮ ফেব্রুয়ারি, সন্ধ্যায় ওকল্যাণ্ডের ফার্স্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বেদান্ত ও খ্রীষ্টধর্ম'।

মার্চ, প্রায় দৈনিক ক্লাস গ্রহণ।

৪ মার্চ, গোল্ডেন গেট হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ধর্মবিজ্ঞান'।

৫ মার্চ, পোস্ট স্ট্রীটে রেডমেন্স বিল্ডিং-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারত ও তার জনগণ'।

৬ মার্চ, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতে শিল্পকলা ও বিজ্ঞান'।

৭ মার্চ, ইউনিটেরিয়ান চার্চের ওয়েটে হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'জীবন ও মৃত্যুর বিধি'।

৮ মার্চ, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বিম্ব ও প্রতিবিম্ব'।

৯ মার্চ, পোস্ট স্ট্রীটে রেডমেন্স বিল্ডিং-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতের আদর্শাবলী'।

১১ মার্চ, ইউনিয়ন স্কোয়ার হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বিশ্বের কাছে খ্রীষ্টের বাণী'।

১২ মার্চ, ওয়েটে হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'মুক্তির পথ'।

১৩ মার্চ, রেডমেন্স বিল্ডিং-এ ওয়াশিংটন হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'মন—শক্তি ও সম্ভাবনা'।

১৫ মার্চ, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'মনের উৎকর্ষসাধন'।

১৬ মার্চ, একই স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'একাগ্রতা'।

১৮ মার্চ, ইউনিয়ন স্কোয়ার হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বিশ্বের কাছে বুদ্ধের বাণী'।

১৯ মার্চ, ইউনিটেরিয়ান চার্চের ওয়েটে হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতের রীতিনীতি'।

২০ মার্চ, রেডমেন্স বিল্ডিং-এ ওয়াশিংটন হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'প্রকৃতি ও মানুষ'।

২৩ মার্চ, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'আত্মা ও ঈশ্বর'।

২৫ মার্চ, ইউনিয়ন স্কোয়ার হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'মহম্মদ'।

২৬ মার্চ, ইউনিটেরিয়ান চার্চের ওয়েটে হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতের শিল্পকলা ও বিজ্ঞান'।

২৭ মার্চ, রেডমেন্স বিল্ডিং-এ ওয়াশিংটন হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'লক্ষ্য'।

২৯ মার্চ, রেডমেন্স বিল্ডিং-এ ওয়াশিংটন হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'প্রাণায়াম বিজ্ঞান'।

৩০ মার্চ, রেডমেন্স বিল্ডিং-এ ওয়াশিংটন হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'শিষ্যত্ব'।

এপ্রিল, টার্ক স্ট্রীট ফ্ল্যাটে প্রথম সপ্তাহে দৈনিক ক্লাস গ্রহণ।

১ এপ্রিল, ইউনিয়ন স্কোয়ার হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'কৃষ্ণ ও তাঁর বাণী'।

২ এপ্রিল, ইউনিটেরিয়ান চার্চের ওয়েটে হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভারতের আদর্শাবলী'।

৩ এপ্রিল, রেডমেন্স বিল্ডিং-এ ওয়াশিংটন হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ধ্যান'।

৫ এপ্রিল, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'কার্যপরিণত ধর্মঃ প্রাণায়াম ও ধ্যান'।

৮ এপ্রিল, ইউনিয়ন স্কোয়ার হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বেদান্ত কি ভবিষ্যতের ধর্ম?'

৯ এপ্রিল, রেডমেন্স বিল্ডিং-এ ওয়াশিংটন হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'উপাসক ও উপাস্য'।

১০ এপ্রিল, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বৈধীপূজা'।

১১ এপ্রিল, সানফ্রানসিস্কো থেকে অ্যালামেডা শহরে। 'হোম অব ট্রুথ'-এ অবস্থান।

ঐ দিনই টাকার হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'মানুষের চরম নিয়তি'।

১২ এপ্রিল, রেডমেন্স বিল্ডিং-এ ওয়াশিংটন হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভগবত প্রেম'।

১৩ এপ্রিল, টাকার হল-এ বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'রাজযোগ'।

১৪ এপ্রিল, সানফ্রানসিস্কোতে বেদান্ত সমিতি স্থাপন।

১৬ এপ্রিল, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'একাগ্রতা ও প্রাণায়াম'।

১৮ এপ্রিল, একই স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ধর্মসাধনা'।

২ মে, ক্যাম্প টেলর-এ বিশ্রাম।

১৬ বা ১৭ মে, সানফ্রানসিস্কো প্রত্যাবর্তন। স্বীয় শিষ্য ডাক্তার মিলবার্ন এইচ. লোগানের আতিথ্যগ্রহণ।

২৪ মে, ৬ নং গ্রীয়ারী স্ট্রীটে ডাক্তার লোগানের অফিস-বাড়িতে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভগবদ্গীতা'।

২৬ মে, ডাক্তার লোগানের বাসভবনের হলঘরে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভগবদ্গীতা'।

২৮ মে, উপরোক্ত স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভগবদ্গীতা'।

২৯ মে, একই স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ভগবদ্গীতা'।

৩০ মে, ইস্টকোস্ট অভিমুখে যাত্রা।

শিকাগোয়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য চারদিন যাত্রা বিরতি।

৭ জুন, নিউইয়র্কে উপস্থিতি। 'বেদান্ত সোসাইটি'তে অবস্থান।

৯ জুন, সকালে ক্লাস গ্রহণ। বিষয়ঃ 'ভগবদ্গীতা'।

১০ জুন, বেদান্ত সোসাইটিতে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বেদান্ত দর্শন'।

১২ জুন, সম্বর্ধনালাভ।

১৬ জুন, বেদান্ত সোসাইটিতে ক্লাস গ্রহণ। বিষয়ঃ 'ভগবদ্গীতা'।

১৭ জুন, একই স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ধর্ম কি?'

২৩ জুন, একই স্থানে ক্লাস গ্রহণ। বিষয়ঃ 'ভগবদ্গীতা'।

২৪ জুন, একই স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'মাতৃপূজা'।

৩০ জুন সকালে, একই স্থানে ক্লাস গ্রহণ। বিষয়ঃ 'ভগবদ্গীতা'।

১ জুলাই, একই স্থানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'ধর্মের উৎস'।

৩ জুলাই, ডেট্রয়েট অভিমুখে যাত্রা।

ডেট্রয়েটে সিস্টার ক্রিস্টিনের আতিথ্যগ্রহণ।

১০ জুলাই, নিউইয়র্ক প্রত্যাবর্তন। বেদান্ত সোসাইটিতে অবস্থান।

রামকৃষ্ণ মিশনের 'শীলমোহর' পরিকল্পনা।

২৬ জুলাই, ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা।

৩ আগস্ট, লে হ্যাবর-এ উপস্থিতি। ট্রেনে প্যারিস যাত্রা। প্রথমে এম. জেরাল্ড নোবল এবং পরে মিস্টার ও মিসেস লেগেটের আতিথ্যগ্রহণ। কয়েকদিন পরে জুল বোয়া-র আতিথ্যগ্রহণ।

২৪ আগস্ট, লেগেটের গৃহে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'হিন্দুদের ধর্ম ও দর্শন'।

৩-৮ সেপ্টেম্বর, কংগ্রেস অব দি হিস্ট্রি অব রিলিজিয়নস সভা। প্রায় অধিবেশনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অসুস্থতার জন্য দুইটি ভাষণ দান।

১৭ সেপ্টেম্বর, মিসেস ওলি বুলের নিমন্ত্রণে ব্রিটানি প্রদেশের অন্তর্গত পেরো গাইরেক নামক গ্রামে বিশ্রামের জন্য গমন।

৩০ সেপ্টেম্বর, প্যারিস প্রত্যাবর্তন।

২৪ অক্টোবর, প্যারিস পরিত্যাগ।

২৫ অক্টোবর, ভিয়েনায় উপস্থিতি।

২৮ অক্টোবর, কনস্টান্টিনোপল-এর পথে।
৩০ অক্টোবর, কনস্টান্টিনোপল-এ।
স্কুটারিতে পেয়র হিয়াসান্থ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ।
২ নভেম্বর, স্কুটারিতে অবস্থিত 'আমেরিকান কলেজ ফর গার্লস' নামক এক মহাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'হিন্দুধর্ম'।
আনুমানিক ৮ নভেম্বর, এথেন্স-এর পথে।
কায়রো।
২৬ নভেম্বর, ভারত যাত্রা।
৬ ডিসেম্বর, বোম্বাই-এ উপস্থিতি।
৯ ডিসেম্বর, বেলুড় মঠে।
সেভিয়ারের মৃত্যুসংবাদ লাভ।
২৭ ডিসেম্বর, মায়াবতীর পথে কলকাতা ত্যাগ।
২৯ ডিসেম্বর, কাঠগোদাম উপস্থিতি। লালা গোবিন্দ শাহ কর্তৃক অভ্যর্থনা।
৩০ ডিসেম্বর, মায়াবতীর পথে ভীমতালে মধ্যাহ্নভোজ।
ঢারী নামক স্থানে ডাকবাংলোয় রাত্রিযাপন।
৩১ ডিসেম্বর, পৌরহাপানীতে দোকানে রাত্রিযাপন।

১৯০১ — ১ জানুয়ারি, মৌরনল্লা ডাকবাংলোয় রাত্রিযাপন।
২ জানুয়ারি, ধুনাঘাটের ডাকবাংলোয় অবস্থান।
৩ জানুয়ারি, মায়াবতীতে উপস্থিতি।
৫ জানুয়ারি, স্বামী স্বরূপানন্দের কাছে মায়াবতী আশ্রমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বর্ণনা।
১৮ জানুয়ারি, মায়াবতী ত্যাগ।
চম্পাবত ডাকবাংলোয় রাত্রিযাপন।
১৯ জানুয়ারি, দেউড়িতে রাত্রিযাপন।
২১ জানুয়ারি, পিলিভিত-এ উপস্থিতি।
ক্ষেত্রীরাজের মৃত্যুসংবাদ লাভ।
২৪ জানুয়ারি, বেলুড় মঠে উপস্থিতি।
২৭ জানুয়ারি, বেলুড় এম. ই. স্কুলের পারিতোষিক বিতরণসভায় সভাপতিত্ব।
৩০ জানুয়ারি, মঠের ট্রাস্ট ডীড সম্পন্ন।
৬ ফেব্রুয়ারি, ট্রাস্ট ডীড রেজিস্ট্রীকৃত।
১০ ফেব্রুয়ারি, মঠের ট্রাস্টীগণের অনুমোদনক্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ ও স্বামী সারদানন্দ সম্পাদক নির্বাচিত।
১৭ ফেব্রুয়ারি, জুল বোয়া-র মঠে আগমন ও সাদর অভ্যর্থনা।
২৪ ফেব্রুয়ারি, বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে ভক্তগণকে সাদর অভ্যর্থনা।

১৮ মার্চ, পূর্ববঙ্গ যাত্রা। সঙ্গে সন্ন্যাসিশিষ্যগণ।
১৯ মার্চ, ঢাকায় উপস্থিতি।
৩০ মার্চ, ঢাকা জগন্নাথ কলেজে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'আমি কি শিখেছি'।
৩১ মার্চ, পগোজ স্কুলের সন্নিহিত উন্মুক্ত ময়দানে বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'যে ধর্মে আমরা জন্মেছি'।
দেওভোগে নাগমহাশয়ের গৃহে।
৫ এপ্রিল, চন্দ্রনাথ মন্দিরের পথে ঢাকা ত্যাগ।
কামাখ্যা দর্শন।
গোয়ালপাড়া।
গৌহাটিতে তিনটি বক্তৃতাদান।
শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি। শিলঙে।
স্যার হেনরি কটনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
বক্তৃতাদান।
১২ মে, বেলুড় মঠে উপস্থিতি।
স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি।
৭ আগস্ট, দার্জিলিঙ যাত্রা।
শেষ সপ্তাহে কলকাতা প্রত্যাবর্তন।
স্বাস্থ্যের কারণে জাপান যাওয়ার আমন্ত্রণ ত্যাগ।
১৮ অক্টোবর, মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা পূজা। শ্রীমায়ের উপস্থিতি। জ্বরাক্রান্ত।
১৯ অক্টোবর, অষ্টমীপূজার দিন শরীর কিছু সুস্থ এবং অঞ্জলি প্রদান।
নবমী পূজার রাত্রে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন।
শারীরিক অবস্থার অবনতি। ডাক্তার স্যাণ্ডার্সের চিকিৎসা।
মঠে লক্ষ্মী ও কালী প্রতিমা পূজা।
গর্ভধারিণী মাতার ইচ্ছা পূরণার্থে কালীঘাট মন্দিরে গমন।
নভেম্বর, শিমলায় নিজ বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপূজা ও সমগ্র অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধান।
২৩ ডিসেম্বর, কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন।
বালগঙ্গাধর তিলকের মঠে আগমন। সাদরে গ্রহণ।
মহাত্মা গান্ধীর মঠে আগমন। অনুপস্থিতির জন্য সাক্ষাৎ হয়নি।

১৯০২ — ৬ জানুয়ারি, ম্যাকলাউডের সঙ্গে ওকাকুরা ও হোরির আগমন।
ওকাকুরার সঙ্গে কথোপকথন।
ওকাকুরা ও হোরির মঠে অবস্থান।
২৭ জানুয়ারি, ম্যাকলাউড ও ওকাকুরার সঙ্গে বুদ্ধগয়া গমন।
ফেব্রুয়ারি, এক সপ্তাহ অবস্থানের পর বারাণসী গমন। শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি।
৮ মার্চ, বেলুড় মঠ প্রত্যাবর্তন।

৯ মার্চ, ওকাকুরার মঠে আগমন এবং সাক্ষাৎ।
১১ মার্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব।
১৬ মার্চ, সাধারণ উৎসব। অসুস্থতার জন্য উৎসবে যোগদানে অপারগ।
২ এপ্রিল, ওকাকুরার সঙ্গে জাপানী বুদ্ধমন্দিরের পুরোহিত শ্রীযুক্ত ওডার মঠে আগমন এবং বিশ্বধর্মমহাসভায় যোগদানের অনুরোধ।
৬ জুন, শিষ্যা মৃণালিনী বসুর আন্তরিক অনুরোধে তাঁর নদীয়া জেলার বারাজাগুলি-র গৃহে গমন।
১২ জুন, এক সপ্তাহ অবস্থানের পর বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন।
১৫ জুন, সখারাম গণেশ দেউস্করের মঠে আগমন এবং একটি সভায় সভাপতিত্বের অনুরোধ কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে প্রত্যাখ্যান।
১৯ জুন, স্বীয় জননীকে দর্শনার্থে কলকাতা গমন।
২৮ জুন, নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের আবাসে উপস্থিতি।
২৯ জুন, নিবেদিতার মঠে আগমন। সারাদিন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।
২ জুলাই, (একাদশী) নিবেদিতাকে স্বহস্তে আহার্য দান এবং স্বয়ং যীশুর মতো আহারান্তে হস্ত প্রক্ষালনের জন্য জলদান ও তোয়ালের দ্বারা হস্তমার্জনা।
৪ জুলাই, গুরুভাই ও শিষ্যদের সঙ্গে একত্রে অন্নগ্রহণ। পরদিন কালীপূজার নির্দেশ। দুপুরে ব্রহ্মচারীদের ক্লাসগ্রহণ। বিকালে স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে বেলুড় বাজার পর্যন্ত পরিভ্রমণ। সন্ধ্যায় ধ্যান। রাত্রি নটায় মহাসমাধি।

গ্রন্থপঞ্জী

জীবনী

আমাদের বিবেকানন্দ—স্বামী সত্যঘনানন্দ, কলিকাতা
যুগনায়ক বিবেকানন্দ (তিন খণ্ড)—স্বামী গম্ভীরানন্দ, কলিকাতা
যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ, বাঁকুড়া
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—স্বামী তেজসানন্দ, কলিকাতা
শ্রীবিবেকানন্দের কাব্যগীতি (কবিতা)—স্বামী শ্যামানন্দ, কলিকাতা
স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, কলিকাতা
আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ—মণি বাগচী, কলিকাতা
জগদ্‌গুরু বিবেকানন্দ—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা
বিবেকানন্দ-চরিত—প্রিয়রঞ্জন সেন, কলিকাতা
বিবেকানন্দ-চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কলিকাতা
বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী—রোমাঁ রোলাঁ, কলিকাতা
বীরবিবেক (কবিতা)—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা
যুগাচার্য বিবেকানন্দ ঃ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—মতিলাল রায়, কলিকাতা
স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য, কলিকাতা
স্বামী বিবেকানন্দ (দুই খণ্ড)—প্রমথনাথ বসু, কলিকাতা
স্বামী বিবেকানন্দ—ভূতনাথ ভৌমিক, কলিকাতা
স্বামী বিবেকানন্দ—মানদাশঙ্কর দাসগুপ্ত, কলিকাতা
স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা
স্বামীজীর জীবনকথা—কাননবিহারী মুখার্জী, কলিকাতা

Simple life of Swami Vivekananda—Brahmachari Amal, Narendrapur
Swami Vivekananda and his message—Swami Tejasananda, Belur Math
Swami Vivekananda : His life and legacy—Swami Tapasyananda, Calcutta
Vivekananda : A biography—Swami Nikhilananda, Mayavati
Vivekananda : A biography in picture, Mayavati
Comprehensive biography of Swami Vivekananda (Two vols.)—Sailendra Nath Dhar, Madras
Emersion of Vivekananda—Pilgrim (pseud.), Calcutta
The life of Swami Vivekananda (Two vols.)—Eastern and Western disciples, Mayavati

Life of Vivekananda and the universal gospel—Romain Rolland, Calcutta
Short life of Swami Vivekananda, Calcutta
Swami Vivekananda : awakener of modern India—R. Ramakrishnan, Madras
Swami Vivekananda : his life and message—Anil Chandra Ghosh, Calcutta
Vivekananda, Publication Division, New Delhi
Vivekananda : Prophet of the new age of India and the World—T. Muttucumaru, Calcutta

স্মৃতিকথা

কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা
লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (দুই খণ্ড)—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা
শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী (তিন খণ্ড)—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা
স্বামী-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, কলিকাতা
স্বামীজী ও তাঁর বাণী—ভগিনী নিবেদিতা, হাওড়া
স্বামীজীর কথা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা
স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা, কলিকাতা
স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা, কলিকাতা
স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন—স্বামী নির্লেপানন্দ, কলিকাতা

Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda—Sister Nivedita, Calcutta
Reminiscences of Swami Vivekananda—Eastern and Western admirers, Mayavati
Swamiji and his message—Sister Nivedita, Mayavati
Swami Vivekananda in Germany 1896, Calcutta
The Master as I saw him—Sister Nivedita, Calcutta

বিশ্লেষণ-ধর্মী আলোচনা

ইতিহাস চিন্তায় বিবেকানন্দ—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, কলিকাতা
কালের মাত্রায় বিবেকানন্দ—স্বপন সাহা, কলিকাতা
জনগণের বিবেকানন্দ—রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার
জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী সুন্দরানন্দ, কলিকাতা
জাতীয় সংহতি বিশ্বসংহতি বিশ্বশান্তি—মণীন্দ্রচন্দ্র আচার্য, কলিকাতা

বিচিত্র বিবেকানন্দ—নীরদবরণ চক্রবর্তী
বিপ্লবী বিবেকানন্দ—বিজয় গোপাল, কলিকাতা
বিবেকানন্দ ও আজকের সমাজ—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ (মিত্রকৌটিল্য), কলিকাতা
বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য—প্রণবরঞ্জন ঘোষ, কলিকাতা
বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (সাত খণ্ড)—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কলিকাতা
বিবেকানন্দ সাহিত্য ও সমাজ চিন্তা—হরপ্রসাদ মিত্র
বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা—সুব্রত গুপ্ত, কলিকাতা
বিবেকানন্দের ইতিহাস চেতনা—অমূল্যভূষণ সেন, কলিকাতা
বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা—অমিয়কুমার মজুমদার, কলিকাতা
বিবেকানন্দের বিপ্লব চিন্তা—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ (মিত্রকৌটিল্য), কলিকাতা
বিবেকানন্দের রাজনীতি—বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য, কলিকাতা
বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা—প্রণবেশ চক্রবর্তী, কলিকাতা
বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা—তামসরঞ্জন রায়, কলিকাতা
বিবেকানন্দের সমাজ দর্শন—সান্ত্বনা দাশগুপ্ত
বিবেকানন্দের সাধনা—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, কলিকাতা
বিবেকানন্দের সাধনায় মন্ত্রভাবনা ও সংগীত—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, কলিকাতা
বিবেকানন্দের সাহিত্য—জয়ন্ত মুখার্জী ও মায়াঞ্জনা গোস্বামী, কলিকাতা
মার্কস ও বিবেকানন্দ—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ (মিত্রকৌটিল্য), কলিকাতা
যুগ জাগরণে স্বামীজী—বিশ্বজিত মুখার্জী, কলিকাতা
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ—পদ্মনাভ ভট্টাচার্য, বারাণসী
সমাজ ও সাহিত্য চিন্তায় বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা—নলিনীরঞ্জন চ্যাটার্জী, কলিকাতা
সাহিত্য সাধক বিবেকানন্দ—অধীর দে
স্বামী বিবেকানন্দ ঃ সময় ও ইতিহাস চেতনা—ভবতোষ চ্যাটার্জী, কলিকাতা
স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, বেলুড়
স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ—নচিকেতা ভরদ্বাজ, তমলুক
স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বারীখাল
স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, কলিকাতা
স্বামী বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ—জীবন মুখার্জী, কলিকাতা
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ—সরলাবালা সরকার, কলিকাতা
স্বামীজী অনুধ্যানে জাতীয় সংহতি—মণীন্দ্রচন্দ্র আচার্য, কলিকাতা
স্বামীজী ও তাঁর ভাবনা—ভগিনী নিবেদিতা, কলিকাতা
স্বামীজী নেতাজীর ভাবনায় যুবসমাজ—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, কলিকাতা
ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ, কলিকাতা
নরেন্দ্রনাথ হইতে বিবেকানন্দ—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, আলমোড়া
বন্দি তোমায় ঃ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাঞ্জলি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, কলিকাতা
শক্তি সাধনায় স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী তেজসানন্দ, বেলুড় মঠ

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-রহস্য—স্বামী পূর্ণানন্দ, বজবজ
স্বামী বিবেকানন্দ ঃ মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, কলিকাতা
বিবেকানন্দ জীবন ও জিজ্ঞাসা—মনোমোহন গাঙ্গুলী
সহাস্য বিবেকানন্দ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কলিকাতা
স্বামী বিবেকানন্দ—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা
বিশ্ববিবেক—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর, কলিকাতা
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—মোহিতলাল মজুমদার, কলিকাতা

Cultural contact and fusion : Swami Vivekananda in the West, 1893-96 —Satish K. Kapoor
An exposition of Swami Vivekananda's Conception of Vedantism—D. V. Athlaye, Bombay
The Fire and flame of Swami Vivekananda—G. M. Jagtiani, Bombay
The Idealistic philosophy of Swami Vivekananda—G. Ranjit Sharma, New Delhi
Karl Marx and Vivekananda—Bijoy Chand Bhattacharya, Calcutta
Marx and Vivekananda : a comparative study—P. Parameswaran, New Delhi
The Message of Swami Vivekananda—Karan Singh, Madras
The Might of man in the social philosophy of Ramakrishna and Vivekananda—Benoy Kumar Sarkar, Madras
The Philosophy of man making : a study in social and political ideas of Swami Vivekananda—Santi L. Mukherjee, Calcutta
The Philosophy of Vivekananda and the future of man—Govinda Chandra Dev, Dacca
The Political philosophy of Swami Vivekananda—A. V. Rathna Reddy, New Delhi
The Quest for meaning of Swami Vivekananda : a study of religious change—George M. Williams, California
Quintessence of yoga philosophy : an exposition of Swami Vivekananda's conception of practical Vedantism (Neo-Hinduism)—D. V. Athlaye, Bombay
Quintessence of Vivekananda—G. S. Banhatti, Nagpur
Religious and moral philosophy of Swami Vivekananda—Shalil Kumar Ghosh, Patna
The social and political philosophy of Swami Vivekananda—Vijay Kumar Arora, Calcutta
The social philosophy of Swami Vivekananda—Trilochan Das, Calcutta
The socio-political ideas of Swami Vivekananda—B. K. Ray, New Delhi
Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda—Jawaharlal Nehru, Calcutta

Swami Vivekananda : a historical review—Ramesh Chandra Majumdar, Calcutta
Swami Vivekananda : a study—D. V. Athla New Delhi
Swami Vivekananda and America—Amiya Kumar Majumdar, New Delhi
Swami Vivekananda and his work in America—Swami Abhedananda, Calcutta
Swami Vivekananda and Indian nationalism—Subodh Chandra Sen Gupta, Calcutta
Swami Vivekananda and the Indian quest for socialism—Arun Kumar Biswas, Calcutta
Swami Vivekananda : his second visit to the West : New Discoveries—Marie Louise Burke, Mayavati
Swami Vivekananda in the West : New Discoveries (Six vols.)— Marie Louise Burke, Mayavati
Swami Vivekananda's synthesis of science and religion—Swami Ranganathananda, Calcutta
Swami Vivekananda : the educator—V. Sukumaran Nair, New Delhi
Swami Vivekananda : the man and his mission—Sanat Kumar Roy Chowdhury, Calcutta
Swami Vivekananda : the socialist—Bhupendranath Dutta, Dacca
Tolstoy and Vivekananda—A. P. Gnatuk Danil'chuk, Calcutta
Understanding Vivekananda—Amiya Kumar Majumdar, Calcutta
Vision of Vivekananda—Sanjib Chowdhury, Calcutta
Vivekananda and Indian freedom—Hiren Mukherjee, Calcutta
Vivekananda and Indian renaissance—B. K. Ahluwalia and Shashi Ahluwalia, New Delhi
Vivekananda in Indian Newspapers, 1893-1902—Sankari Prasad Basu and Sunil Behari Ghosh, Calcutta
A Vivekananda view of mythology (mythologem—mythologene)—Ananda (pseud.), Howrah
Vivekananda's concept of history—Swami Someswarananda (Satyabrata Chatterjee, tr.), Calcutta
Swami Vivekananda : his life and mission—Swami Ranganathananda, Calcutta
Swami Vivekananda : prophet and path finder—Swami Jitatmananda, Madras
Swami Vivekananda : Patriot-prophet : a Study—Bhupendra Nath Dutta, Calcutta
Swami Vivekananda : patriot saint of modern India—A. D. Pusalkar, Bombay

Swami Vivekananda : prophet of the modern age—Marie Louise Burke, Calcutta
Swami Vivekananda : the great world teacher and prophet of new India —Kamakhyanath Mitra, Calcutta
Swami Vivekananda : the militant Hindu monk—G. M. Jagtiani, Bombay
Swami Vivekananda : the prophet of Vedantic Socialism—V.K.R.V. Rao, New Delhi
Patriot Saint Swami Vivekananda—Tarini Sankar Chakraborty, Allahabad
Swami Vivekananda : Studies in Soviet Union, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta
Vivekananda : a dialect of power and a dialect of pain—K. C. Lahiri, Howrah

বিবিধ

অমিয়বাণী—উমাপদ মুখার্জী, কলিকাতা
উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা (১৩৭০)
প্রেমিক সন্ন্যাসী (কবিতা)—সুব্রত রুদ্র, কলিকাতা
বিবেকানন্দ-শিলা-স্মারকগ্রন্থ—অমিয়কুমার মজুমদার এবং প্রণবরঞ্জন ঘোষ, কলিকাতা
বিবেকানন্দ স্মৃতি—বিশ্বনাথ দে, কলিকাতা
বিবেকানন্দ-স্মরণিকা—তারকনাথ ঘোষ, কলিকাতা
সন্দীপন, ১৯৬৩ (বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী স্মারক), বেলুড় মঠ
স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ—স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, কলিকাতা
স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতি—সুজিত কুমার নাগ, কলিকাতা
স্বামীজী প্রসঙ্গে—পীযূষকান্তি চ্যাটার্জী, রহড়া
স্মারক গ্রন্থ—১৯৬৭, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বরানগর
বিবেকানন্দ স্মরণিকা—সম্পাদনা ঃ তারকনাথ ঘোষ, রিষড়া
বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, পুরুলিয়া
বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, দেওঘর
অতীতের স্মৃতি ঃ স্বামী বিরজানন্দ ও সমসাময়িক স্মৃতিকথা—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, কলিকাতা
ঠাকুর-মা-স্বামীজী—স্বামী সোমানন্দ, কলিকাতা
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও নির্মলকুমার ঘোষ (সম্পাদক), কলিকাতা
তব কথামৃতম্—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, কলিকাতা
ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, কলিকাতা
নিবেদিতা লোকমাতা (তিন খণ্ড)—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কলিকাতা
বিবেকানন্দের আলোয় সুভাষ—নন্দ মুখার্জী, কলিকাতা

মহাজীবন—অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ, কলিকাতা
রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ—ক্রিস্টোফার ইশারউড, কলিকাতা
শতরূপে সারদা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদক), কলিকাতা
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা (দুই খণ্ড)—স্বামী গম্ভীরানন্দ, কলিকাতা
শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ—চিত্রা দেব, কলিকাতা
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্ম প্রসঙ্গ—স্বামী ওঁকারানন্দ, হাওড়া
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও সর্বধর্মসমন্বয়—বীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার, কলিকাতা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কলিকাতা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, কলিকাতা
স্বামীজীর পদপ্রান্তে—স্বামী অব্জজানন্দ, বেলুড়
স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা—স্বামী বুধানন্দ, কলিকাতা
আমার ভারত অমর ভারত, কলিকাতা
বাংলার বিবেকানন্দ—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, বজবজ
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জীবনালোকে—স্বামী নির্লেপানন্দ, কলিকাতা
বিবেকানন্দ ঃ উপেক্ষিত অধ্যায় (অনুবাদ)—প্রদোষ ব্যানার্জী, কলিকাতা
বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ—নগেন্দ্রকুমার গুহরায়
বিবেকানন্দ যুগ—নরেশচন্দ্র ঘোষ
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা
ভক্ত বিবেকানন্দ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রলয় সেন
যুগবিপ্লবী বিবেকানন্দ—মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত
যুগর্ষি বিবেকানন্দ—শৈলেন্দ্র বিশ্বাস
যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ—অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ
সপ্তর্ষির ঋষি—সুমণি মিত্র, কলিকাতা
সংগীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু—দিলীপ কুমার মুখার্জী
স্বামী বিবেকানন্দ—রাণা বসু, কলিকাতা
স্বামী বিবেকানন্দ—সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ—নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চ্যাটার্জী, কলিকাতা
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ—রোমাঁ রোলাঁ, কলিকাতা
বিবেকানন্দ কবি চিরন্তন (কবিতা)—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কলিকাতা
স্বামীজীর হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তা—একনাথ রানাডে (সংকলক), কলিকাতা
মহামানব বিবেকানন্দ—ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য, কলিকাতা
সবার স্বামীজী, কলিকাতা

Parliament of religions—Swami Vivekananda Centenary Committee, Calcutta

Prabuddha Bharata : Swami Vivekananda Centenary Volume, Calcutta
Relations among religions today—Moses Jung and Swami Nikhilananda, Netherlands
Swami Vivekananda Centenary memorial volume—Ramesh Chandra Majumdar, Calcutta
Swami Vivekananda in east and west—Swami Ghanananda and Geoffrey Parrinder, London
Vedanta for the Western World—Christopher Isherwood, London
Vedanta Kesari : Swami Vivekananda Centenary Volume, Mylapore
Vivekananda Commemòration volume, University of Burdwan, Burdwan
What religion is in the words of Swami Vivekananda—John Yale, London
World thinkers on Ramakrishna-Vivekananda—Swami Lokeswarananda, Calcutta
The Apostles of Sri Ramakrishna—Swami Gambhirananda, Calcutta
Creative India from Mahenjodaro to the age of Ramakrishna-Vivekananda—Benoy Kumar Sarkar, Lahore
Enlightened citizenship, Ramakrishna Mission, New Delhi
Eternal values for a changing society—Swami Ranganathananda, Calcutta
The Extremist Challenge—Amalesh Tripathy, Calcutta
For seekers of God : spiritual talks of Mahapurush Swami Shivananda —Swami Vividishananda and Swami Gambhirananda, Calcutta
Glimpses of Bengal in the nineteenth century—Ramesh Chandra Majumdar, Calcutta
The Gospel of Sri Ramakrishna—Mahendra Nath Gupta (Swami Nikhilananda, tr.), Madras
History of the Ramakrishna Math and Mission—Swami Gambhirananda, Calcutta
An Indian pilgrim or autobiography (1897-1920)—Subhash Chandra Bose, Bombay
Indian unrest—Valentine Chirol, London
Letters of Sister Nivedita (Two vols.)—Sankari Prasad Basu, Calcutta
Practical Spirituality—Swami Lokeswarananda, Calcutta
Ramakrishna and his disciples—Christopher Isherwood, Calcutta
The Ramakrishna Movement : its meaning for mankind—Swami Budhananda, Calcutta
Religions of the world, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta
Service and Spirituality—Swami Swahananda, Madras

Sister Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda—Pravrajika Atmaprana, Calcutta
Spiritual ideals for modern man—Swami Vividishananda, Calcutta
Sri Ramakrishna : the great master (Two vols.)—Swami Saradananda (Swami Jagadananda, tr.), Madras
The Wonder that was India—A. L. Basham, Bombay
The Master and the Disciple—D. S. Sarma, Madras
President Radhakrishnan's Speeches and writings, Publication Division, New Delhi
The Discovery of India—Jawaharlal Nehru, Calcutta
Swami Vivekananda : Forgotten Chapter of his life—Benishankar Sharma, Calcutta
Life of Swami Vivekananda (drama) [12.1.1863 to 4.7.1902]—T.V. Narayanaswami, Calcutta
Europe reconsidered : perceptions of the West in nineteenth century Bengal—Tapan Roy Chowdhury, Calcutta
Spiritual masters from India—Shashi Ahluwalia, Delhi
Statics and dynamics of progress (Vivekananda Concept)—Ananda (pseud.), Howrah
History of Indian Social and Political Ideas from Rammohan to Dayananda—B. B. Majumdar, Calcutta
India and the World Culture—V. K. Gokak, Delhi
Dawn of Renascent India—K. K. Datta, Bombay
Modern Religious Movement in India—J. N. Farquhar, New York
Hinduism—R. C. Zaehner, London
The Heart of Aryavarta : The Psychology of Indian Unrest—Earl of Ronaldsay, London

পত্র-পত্রিকা

উদ্বোধন (কলিকাতা), বিশ্ববাণী (কলিকাতা), মাসিক বসুমতী (কলিকাতা), দেশ (কলিকাতা), সমাজশিক্ষা (নরেন্দ্রপুর)

Prabuddha Bharata (Mayavati), *Vedanta Kesari* (Madras), *Vedanta for East and West* (London), *Vedanta* (Gretz, Paris), *Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture* (Calcutta)

নির্দেশিকা

---

* অন্য কিছু উল্লেখ করা না থাকলে '' চিহ্নের মধ্যের নামটি বই বা পত্র-পত্রিকা বোঝাবে।

বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

- লিও টলস্টয়

আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলেরই মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েচে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেচে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েচে তখনি শক্তি দিয়েচে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ-মনকে বিচিত্র ভাবে প্রাণবান করেচে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যাবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে আঙুলকে নয়।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত হিন্দু ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের যে-কোন জনের মতবাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন একটি মতবাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রচার করেছেন ঃ 'আমরা চাই সেই ধর্ম যা মানুষ তৈরী করে... দুর্বল-কারী অতীন্দ্রিয়বাদগুলো পরিত্যাগ কর, সাহসী হও... পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের জন্য... অন্যান্য সব অর্থহীন দেবতা আমাদের মন থেকে বিদায় নিক।

- উইল ডুরান্ট

বিবেকানন্দ আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে আশ্রয় দিয়েছেন, দুঃখের মধ্যে দিয়েছেন আশা, হতাশার মধ্যে সাহস।

- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। চরিত্রগঠনের জন্য 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।

- সুভাষচন্দ্র বসু

তাঁর রচনাবলী আমি অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে অনুশীলন করেছি এবং সেগুলি পাঠ করার পর আমার মাতৃভূমির প্রতি আমার ভালোবাসা সহস্রগুণ বেড়ে গিয়েছে।

- মহাত্মা গান্ধী

আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে যে-কেউ স্পষ্ট দেখতে পাবে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত ঋণী! ভারতের আত্মমহিমার দিকে ভারতের নয়ন তিনি উন্মীলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি রাজনীতির আধ্যাত্মিক ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। আমরা অন্ধ ছিলাম, তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক,- আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা।

- চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

রামকৃষ্ণ মিশন
ইনস্টিটিউট
অব কালচার

Rs. 175.00

email : rmic@vsnl.com
www.sriramakrishna.org

ISBN 81-85843-29-5